সিপাহি বিদ্রোহের ১৫০ বছর

একটি ঐতিহাসিক দলিল

সিপাহি বিদ্রোহের ১৫০ বছর

একটি ঐতিহাসিক দলিল

কমল চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

SIPAHI BIDROHER 150 BACHAR
by KAMAL CHOUDHURI

শব্দগ্রন্থন : বীণাপাণি প্রেস, ১২/১এ বলাই সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
স্মরণে
এবং
সুহৃদ্বর
অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনায় আপনার আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শে আমি উপকৃত। কিন্তু আপনার আকস্মিক প্রয়াণে আমার অনেক ভাবনা অস্ফুট থেকে গেল।

দে'জ ইতিহাস গ্রন্থমালা

বিষয় নির্বাচন, বিষয়বিন্যাস এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সম্পাদকীয় নিবন্ধাদি সম্পূর্ণ আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী! এই পরিমার্জিত গ্রন্থের হুবহু পুনর্মুদ্রণ (সম্পূর্ণ অথবা অংশত) প্রকাশকের অনুমতি সাপেক্ষ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

১৮৫৭ সালের সেনা অভ্যুত্থান বা জাতীয় বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে বর্তমান সংকলন। সংকলনটিকে বিস্তৃত পটভূমিকায় উপস্থিত করাই ছিল সংকলকের লক্ষ্য। বিভিন্ন বাংলা ইংরেজি গ্রন্থ এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে, এই কাজে হাত দেওয়ার পর। বইটি সিপাহি অভ্যুত্থানের ধারাবাহিক বিবরণ নয়। সে বিষয়ে রজনীকান্ত গুপ্তর সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের ৫টি খণ্ডই এখন পাওয়া যায়। ভারতে ইংরেজের ক্ষমতা বিস্তারের প্রথম থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে তাদের লড়াই করতে হ'য়েছিল। 'ইতিহাসের কালপঞ্জী'তে তা পাঠক জানতে পারবেন।

ইংরেজের তুলনায়, বিদ্রোহীদের সেনাবল ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। তবুও হার স্বীকার করতে হয়েছিল বিদ্রোহীদের। সংকলনের বেশিরভাগেই আছে বাঙালি ঐতিহাসিক ও সমকালীন বাঙালিদের বক্তব্য। যারা এবিষয়ে বিস্তৃত গবেষণায় আগ্রহী বর্তমান সংকলন তাদেব অনেক উপকরণেরই সন্ধান দেবে। তাছাড়া আছে বিস্তৃত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার তালিকা। এর কিছু কিছু এখনও এদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য রচনাসমূহ বিনষ্টের মুখোমুখি। সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা সর্বত্র নেই।

বর্তমান সংকলনের অন্যতম আকর্ষণ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস ১ম খণ্ড। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে। একটি ছিন্ন কপি আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। সম্ভবত, পাঁচকড়ি লিখিত অন্য কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।

বর্তমান সংকলনের রচনা সংগ্রহের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তাঁর পরামর্শ আমার কাজকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সাহায্য করে। পূর্বভারতে বিশেষ করে বাংলায় সিপাহি বিদ্রোহের সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা শুরু করেন, সেটি বর্তমান সংকলনভুক্ত করার অনুমতি দেন। সেই রচনার প্রথমাংশ প্রকাশিত হয় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায়। পরবর্তী অংশ লিখছিলেন। তাঁর আকস্মিক জীবনাবসানে সম্পূর্ণ রচনাটি গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব হল না। "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত অংশটির পুনর্মুদ্রণ করা হল।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আশা করি বইটি হাতে নিয়ে তারা খুশি হবেন।

২৩৩ বিবেকানন্দ সরণি (কলুপুকুর)
বারাসাত, ২৪ পরগণা (উঃ)
কলকাতা—৭০০ ১২৪
দূরভাষ—২৫৬২-৪৯৫৯
৯৩৩৯৫০৫৫৮৩

নমস্কারান্তে
কমল চৌধুরী
আগস্ট ২০০৮

সূচিপত্র

যুদ্ধারম্ভ—মীরট, দিল্লি ও পাঞ্জাব

ভারতবর্ষ
(১৮৫৭)
নেপাল
ভুটান
ঢাকা
সম্বলপুর
হায়দরাবাদ
প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রের
আনুমানিক অঞ্চল ...
খণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র ... ...

TOO "CIVIL" BY HALF.

The Governor-General Defending the POOR Sepoy.

'Clemency Canning', the Punch *view*

PUNCH, OR THE LONDON CHARIVARI.—September 12, 1857.

JUSTICE.

The aftermath of the Mutiny, as seen by Punch

বারাকপুরে সিপাহিদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে

জিনত মহল

বাহাদুর শাহ

নানাসাহেব

জাওলা প্রসাদ

অজিম-উল্লা খান

টিকা সিং
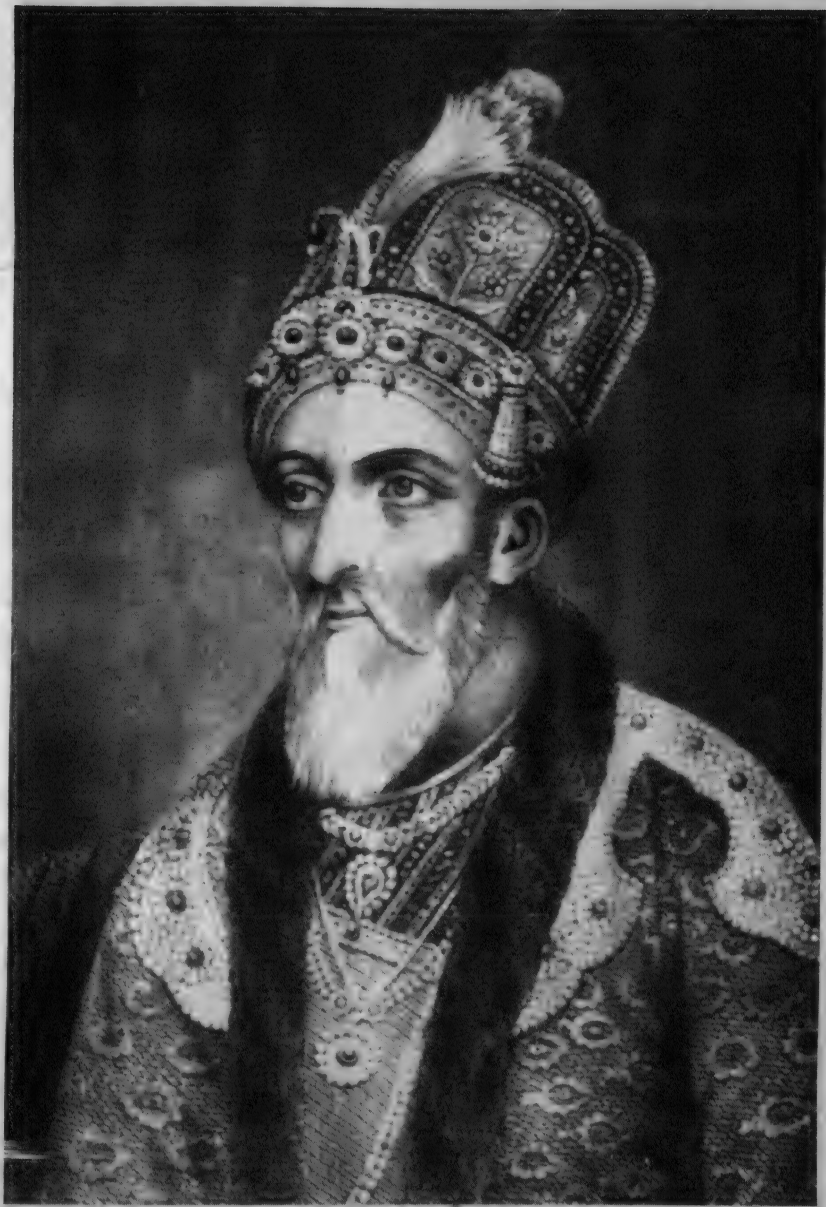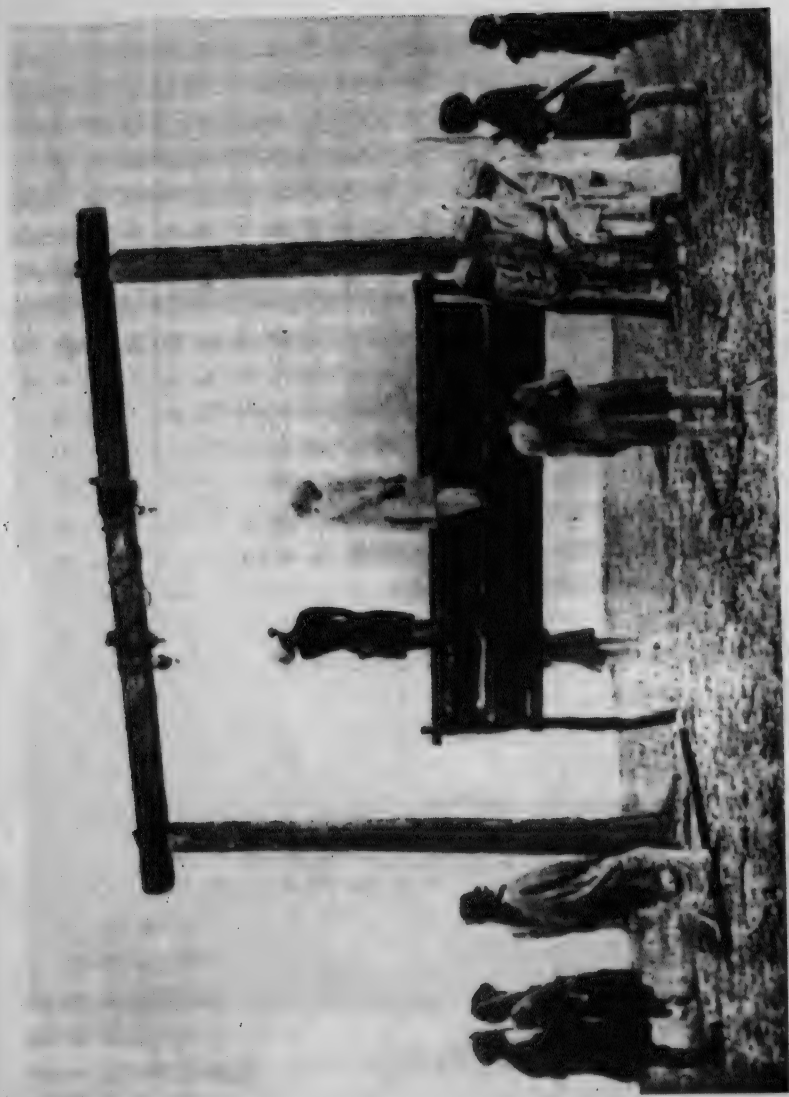
দুজন সিপাহির ফাঁসি

বেগম হজরত মহল

বেরিলিতে গাজিদের ওপর আক্রমণ

কানওয়ার সিং

ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই

ঝাঁসির দুর্গ

রানি মহল, ঝাঁসি
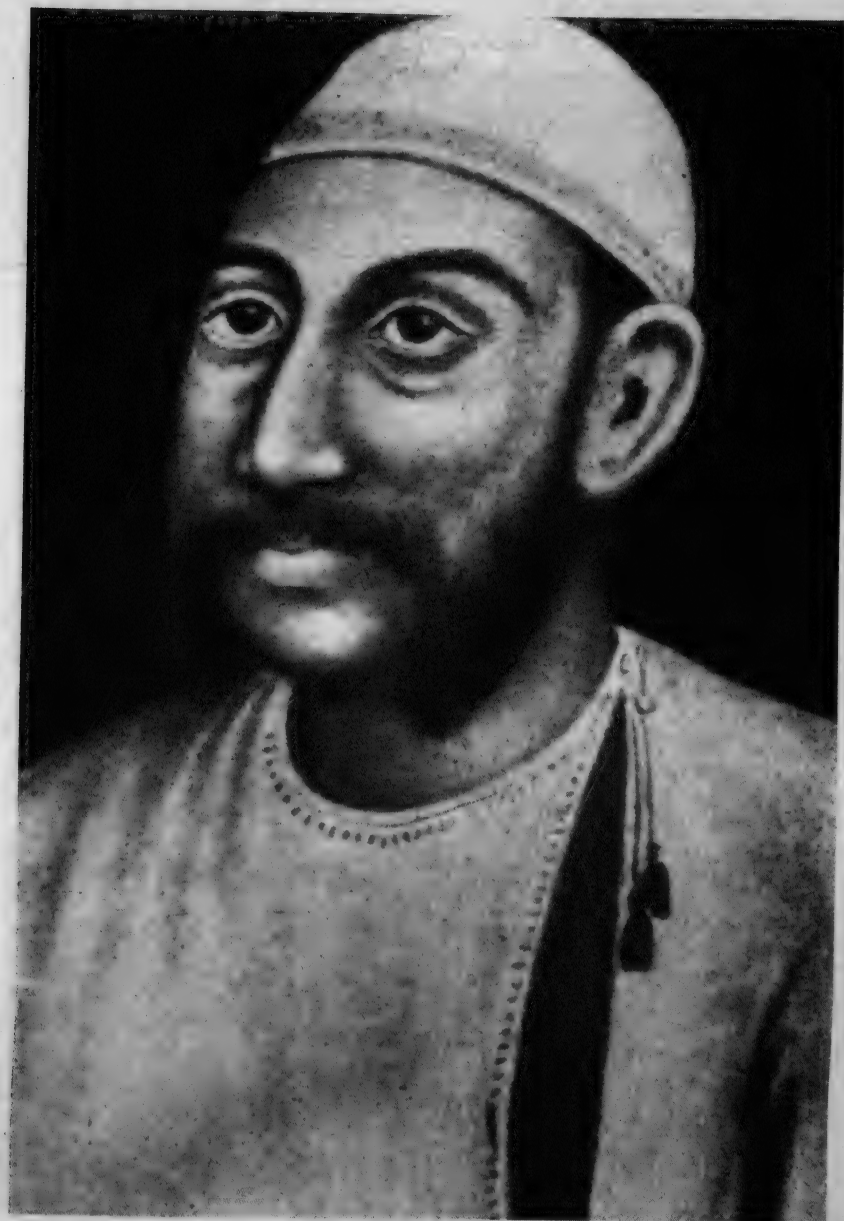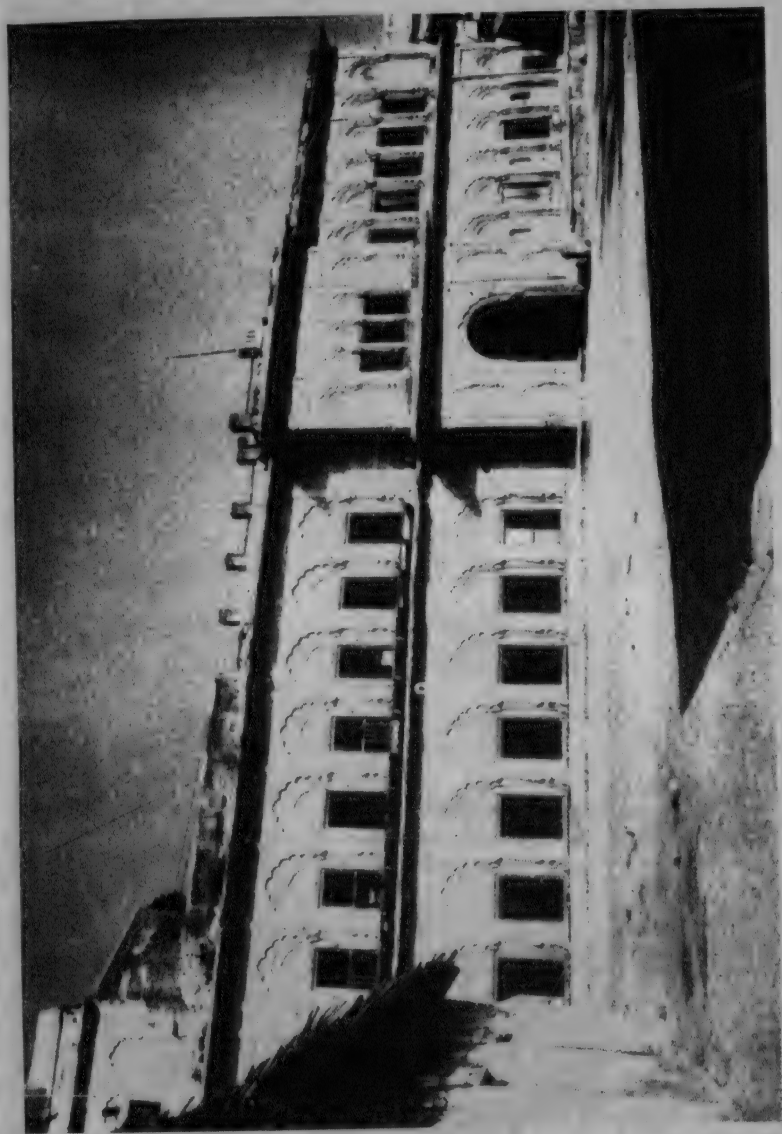
তাঁতিয়া টোপি

শিল্পী ভেরাশ্চেগিনের চোখে দেশীয় সিপাহিদের হত্যার দৃশ্য

নির্যাতিতের প্রত্যাঘাত

. .এই বিদ্রোহে ভারতের যত বিভিন্নমুখী শক্তির সমাবেশ হয়েছিল, আর কোনও বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে তেমন হয়নি। ব্রিটিশ শক্তির নিজেকে সংহত করার আগে ঐ ঐক্য প্রচণ্ড অত্যাচারের সাহায্যে দমন করিতে হয়েছিল। এ অভ্যুত্থান শুধুই ব্রিটিশের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা ভারতে যে সমস্ত নূতন ব্যবস্থাব আমদানি করছিল, সামগ্রিকভাবে ঐ অভ্যুত্থান ছিল তারই বিরুদ্ধে। বাইরে থেকে একে একটি সামরিক এবং বহুলাংশে মুসলিম বিদ্রোহ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল তার চাইতে অনেক বেশি কিছু। পৃঃ ৬২০

...সেই ওয়াহাবি বা ফরাজিরাই হোক—যাদের কোনও কোনও নেতার ৮০,০০০ অনুচর পর্যন্ত ছিল এবং যা যে কোনও ভূ-স্বামী সম্প্রদায়কে সরোষ অস্বস্তিতে ফেলতে পাবত; কিম্বা শাহারানপুর, দাক্ষিণাত্য, মালাবার ও মহীশূরের নিকটবর্তী স্থানসমূহ এবং অন্যত্র শত শত স্থানে যে কৃষকরা বিদ্রোহী হযে উঠেছিল তারা, অথবা আমাদের দেশের সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আদিবাসীরাই হোক, ত রা সকলে যে কোনও উপায়ে সম্ভব এই বিদেশি দখলদারদেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বলতে যা বোঝায়, এই সমস্ত সংগ্রামে সম্পূর্ণ তা না হলেও এ ছিল তারই সূচনা।" পৃঃ ৬২১

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৫৭ সালের সেনা অভ্যুত্থানকে ইংরেজ রাজকর্মচারী আর ঐতিহাসিকরা বলেছিল, Sepoy Mutiny, নিজেদের অপকর্মের ফলশ্রুতিতে এই অভ্যুত্থান—যা কেবল সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভারতের বৃহত্তম অংশের সাধারণ মানুষও এই অভ্যুত্থানের অংশীদার ছিল, একথা মেনে নেওয়া ইংরেজদের পক্ষে ছিল আত্মহত্যার সামিল। গো-শূকরচর্বির টোটা আর খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের অজুহাত তুলে, অভ্যুত্থানের প্রকৃতিকে বিকৃত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ভারতবাসী যে কত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেটিও প্রতিপন্ন কবার একটা কৌশলমাত্র। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট কতখানি গভীরভাবে ভারতবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তা স্বীকার করা সম্ভব ছিল না বিদেশী শোষণকারী সরকারের পক্ষে। ইংরেজের রেখে যাওয়া নথিপত্র ও বিবরণের সাহায্যে অভ্যুত্থানের যথার্থ প্রকৃতি নির্ধারণ সম্ভব হয়নি শতবর্ষ পেরিয়েও। ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না, যদি আমরা বিদেশীর আরোপিত খোলসটাকে খুলে না ফেলি। সাফল্য না আসার পিছনে কারণ ছিল অনেক। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের যে ভয়ঙ্কর প্রকাশ ঘটেছিল সেদিন, তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল পুঞ্জিভূত অসন্তোষের প্রতিচ্ছবি। সিপাহি অভ্যুত্থান ভবিষ্যতের জাতীয় জাগরণের পথ রেখার ইঙ্গিত রেখে যায়। বিদ্রোহ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল সাধারণ অভ্যুত্থানের দিকে।

অভ্যুত্থানের সূচনা ও পরিণতিব দিকে এগিয়ে গিয়ে যাওয়ার পিছনে ছিল বেঙ্গল আর্মির অসাধারণ ভূমিকা। প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে সেনা বাহিনীর তিনটি শাখা—বেঙ্গল,

মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মধ্যে সবথেকে বড় শাখা ছিল বেঙ্গল আর্মি। তখন বেঙ্গল আর্মির সেনানীর সংখ্যা ছিল ১৩৯, ৮০৭ জন দেশীয় সিপাহি এবং ২৬০৮৯ জন ইউরোপীয় অফিসার। এই বিশাল বাহিনী ব্যবহার করা হত ব্রিটেনের দখল প্রসারের অভিযানে। আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই আধুনিক সেনাদল নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী বিট্রেনের শক্তিস্তম্ভকে সুদৃঢ় করে গিয়েছিল। যেসব যুদ্ধে তারা অংশ নিয়েছিল তার অন্যতম কয়েকটি হল :

প্রথম আফগান যুদ্ধ	১৮৩৮-৪২	পাঞ্জাবের যুদ্ধ	১৮৪৮-৪৯
সিন্ধিয়াবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ	১৮৪৩	বার্মার দ্বিতীয় যুদ্ধ	১৮৫২
পাঞ্জাবের যুদ্ধ	১৮৪৫-৪৬	চিনের বিরুদ্ধে আফিং যুদ্ধ	১৮৪০-৪২

চিনের বিরুদ্ধে আফিং যুদ্ধ ১৮৫৬-৬০

নেপোলিয়নের পতনের পর (১৮১৫) বিশ্বে এ ধরনের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী আর কোথাও গড়ে ওঠেনি।

আত্মবিসর্জনকারী সেনানীদের পদোন্নতির সুযোগ ছিল কমই। অফিসার পর্যায়ের যাবতীয় পদই ছিল ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত। এই সেনাবাহিনীর এক্তিয়ার ভুক্ত ছিল সিন্ধু প্রদেশ বাদে সমগ্র উত্তর ভারত। গভর্নর জেনরেলের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির এই নিজস্ব বাহিনীতে লোক নেওয়া হত বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও বিহার এলাকা থেকে। সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত লোকদের বেশির ভাগই কথা বলত হিন্দুস্থানীতে এবং ছোটখাট জমির মালিক ছিল তারা। পদাতিক বাহিনীর ১১২০০০ জনের বেশির ভাগ ছিল ব্রাহ্মণ। তারপর রাজপুত, অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান ছিল। ১৯০০০ অশ্বারোহীর বেশির ভাগ ছিল সৈয়দ ও পাঠান মুসলমান। ৫০০০ জন নিয়ে গঠিত গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিল সব সম্প্রদায়ের মানুষ। সেনাবাহিনীর বৃহত্তম অংশের সিপাহিদের নিয়োগ করা হয়েছিল বর্তমান লখনউ ও ফৈজাবাদ ডিভিশন (পুরোন অযোধ্যা) থেকে। আর সিপাহি অভ্যুত্থানে এই অঞ্চলই ছিল সব থেকে উপদ্রুত। কারণ অযোধ্যা দখলের আগে ও পরে সেনানীদের পরিবারগুলির ওপর রাজস্ব পরিমাণ বাড়ছিল। জমিজমাও বেহাত হয়ে যেতে থাকে। ফলে তাদের চরম আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যা কয়েক পুরুষেও ঘটেনি।

ডক্টর সুশোভন সরকারের আলোচনা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

> একথা সত্য যে সিপাহিরা প্রথমে বিদ্রোহ করে, সাধারণ লোকের অভ্যুত্থান হয় তারপর। এতে আশ্চর্যের কিছু দেখি না, কারণ জনসাধারণের হাতে অস্ত্র ছিল না, সামনে ছিল আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সামরিক বাহিনী। লক্ষণীয় এই যে বিদেশী শাসকের হাত থেকে অস্ত্র খসা মাত্র দিকে দিকে লোকের অভ্যুত্থান হল। প্রকৃতিগত পাপবুদ্ধির চাইতে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বিস্ফোরণ এর সঙ্গততর ব্যাখ্যা নয় কি? সজ্জিত অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্রলোকের বিদ্রোহ সহজ নয়। এই সহজ কথাটা মনে রাখলেই বুঝতে পারি ভারতের নানা অঞ্চলে সেদিন বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি কেন। তার থেকে জনগণের আনুগত্য প্রমাণ হয় না। তেমনই বিশাল জনসংখ্যার সহানুভূতি ও সমর্থন থাকলে অভ্যুত্থানকে জনবিদ্রোহ না বলবার কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি?
>
> * * * *
>
> ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের মধ্যে জন বিদ্রোহের রূপ নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবা চলে না। যে ধরনের প্রমাণের জোরে অন্য দেশের ইতিহাসে আমরা জন বিদ্রোহের কথা বলি, তার

এখানে অভাব আছে বললে অত্যুক্তি হবে, তবে সেসব নজির যদি কোনও ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, তার জন্য দায়ী তাঁর দেখবার ধরন, তথ্যের অভাব নয়।

* * * *

মিউটিনির আমলে জাতীয়তাবোধকে অপরিণত কাঁচা বললে দোষ হবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতীয় আন্দোলনকে অনুরূপ বিশেষণে ভূষিত করা চলে। কিন্তু এদেশের এই বিরাট আন্দোলনকে মুক্তির লড়াই নয় ভেবে অস্বীকার করা ঐতিহাসিক অবিচার। আগেকার দিনের দেশীয় রাজন্যদের ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই-এর তুলনায় এর প্রকৃতি স্বতন্ত্র—সেসব যুদ্ধ বিগ্রহে এমন বিস্তীর্ণ মরণপণ সংগ্রাম এতখানি জনসংযোগ, ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব চোখে পড়ে না। আমাদেব ঐতিহাসিকেরা ভারতের সাবেকি ঐক্যে বিশ্বাসী, রাজপুতদেব বীরত্বে, আকবরের শাসননীতিতে মারাঠা অভ্যুত্থানেব মধ্যে জাতীয়ভাব আবিষ্কার করতে তারা সিদ্ধহস্ত অথচ যখন ভারতের অনেকখানি জুড়ে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহেব তোলপাড়ের কথা আসে, তখন তাঁরা হঠাৎ অন্য সুরে কথা বলেন, এ-ও কম বিচিত্র নয়।"*

আর একটি বিশ্লেষণ উল্লেখ করা যেতে পারে—

"ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম একশো বছরের ইতিহাস যেন একটি সুতোর মতো অবিচ্ছিন্ন এই বিদ্রোহের ধারা। জমিদাব, ছোটো ছোটো দলনায়ক এবং কৃষকদের মধ্যে যে পুবোনো সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততার যোগসূত্র ছিল তাকে আশ্রয় করে এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমিত হওয়ার ফলে এগুলি ছিল পারস্পরিক সম্পর্ক বিহীন। এদের দৃষ্টিও ছিল পিছনের দিকে—অতীতের দিকে। আধুনিক জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও স্বরূপ সম্পর্কে আধুনিক চেতনা, নতুন সামাজিক সম্পর্কের ওপর গঠিত নতুন সমাজবোধ এই বিদ্রোহ বিশ্লেষণ করলে এর কোনটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এগুলির যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন প্রাচীনত্বের প্রতিনিধি; তাদের চারিদিকের পৃথিবীতে কী পরিবর্তন ঘটছে সে সম্পর্কে তাবা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অনেক সময়ই তাদের দমন করার জন্য ব্রিটিশকে প্রচুর সৈন্য বল প্রয়োগ করতে হয়েছে, তবু ব্রিটিশের ক্ষমতার সঙ্গে সত্যিকার মোকাবিলা করার মতো প্রতিরোধ তাদের কাছে আসেনি। তবু তাদের মহৎ অবদান হচ্ছে এই যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আঞ্চলিক ঐতিহ্য তারা স্থাপন করে দিয়েছিলেন।"**

১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ কী কেবল সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্র বা বিবরণ থেকে জানা যায়—বিদ্রোহের সূচনা সিপাহিদের মধ্যে থেকে ঘটলেও, পরবর্তী সময়ে তা ব্যাপক সংখ্যক গ্রাম ও নগরবাসীর সমর্থন লাভ করে। তাদের মধ্যে জমাট বাঁধা বিক্ষোভের অগ্ন্যুপাত ঘটে একদিন। সিপাহিরা ছিল এদেশেরই সাধারণ মানুষ। দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারে তাদের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। সাধারণ পরিবার থেকে আসা সেনা বাহিনীর এই অসীম সাহসিক যোদ্ধারা একশ বছর ধরে দেখে আসছিল ইংরেজ সরকারের অবহেলা ও বৈষম্যের স্বরূপ। পুরস্কৃত হওয়া দূরে থাক, দিনে দিনে তাদের এক দুঃসহ জীবনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেনাবাহিনীর বিক্ষোভের কারণ হিসাবে যাই বলা হোক না কেন, পিছনে ফেলে আসা পারিবারিক জীবনেব দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে তারা মুক্ত ছিল না। যে

* *সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস-সুশোভন সরকার। পরিচয় ১৩৬৪ শ্রাবণ*

** *স্বাধীনতাসংগ্রাম—বিপানচন্দ্র-অমলেশ ত্রিপাঠী- বরুণ দে। পৃঃ ৫২-৫৩*

অর্থনৈতিক জীবন ধারায় গ্রামীন জীবন ছিল অভ্যস্ত ও স্বাভাবিক, ইংরেজের শোষণের যাঁতাকলে তার নিস্পেষণ ছিল ক্রমবর্ধমান। গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ দানা বাঁধ ছিল, সেনাবাহিনীর ভিতরেও তার প্রতিক্রিয়া কোন অংশে কম ছিল না। তারাও তো ঐ সব পরিবার থেকেই এসেছিল।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

> "...সম্ভবত বলা ভুল হবে না যে সারা দেশ জুড়ে বহু বিক্ষোভ দেশবাসীকে বিচলিত করে রেখেছিল, সিপাহিদের মধ্যে বিশেষত কতকগুলি গুরুতব অসন্তোষের কারণ প্রকট হয়ে উঠেছিল, আর সে যুগে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানেব পক্ষে যা ছিল একান্ত অপরিহার্য, সৈন্যবাহিনীতে সেই বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশেও যেন সাড়া পড়ে গিয়েছিল, নেতৃত্বের অভাবে বা অক্ষমতায় শেষ পর্যন্ত সাফল্য সম্ভব না হলেও কিছুকাল ইংরেজ রাজ্য বীতিমত টলে উঠেছিল। বাবাণসী অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক বিক্ষোভও এই ব্যাপক আলোড়নেব সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ইংরেজ শাসনের পক্ষে কঠোব সংকটের সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় অভ্যুত্থান বলতে যা বোঝায়, তা ১৮৫৭-৫৮ সালের ঘটনাবলীর মধ্যে পুবোপুবি আমরা দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তারপক্ষে অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি তখন ছিল না, প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনেব আবির্ভাব সে যুগে সম্ভব ছিল না। তবুও ভুললে চলবে না যে প্রধানত বাহাদুব শাহকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে ইংরেজ বিতাড়নেব আহ্বান যখন করা হয়েছিল, সিপাহিরা যখন বাদশাহকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের কথা ভেবেছিল, তখন বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম অস্পষ্ট সূচনা দেখা গিয়েছে বলা অসংগত নয়।" ... *ভারতের ইতিহাস—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৪৩০*

কোম্পানি আমলের আগে ভারতের মানুষেব আর্থিক স্বচ্ছলতা সংকটজনক ছিল না। দুধে ভাতে না হলেও, অন্তহীন অভাব তাদের তাড়া করে ফেরে নি। জমির ওপর অধিকার ছিল, সামাজিক সুস্থব্যবস্থা ছিল। মোগল আমলে ভারতের টাকা ভারতেই থেকেছে। কিন্তু ইংরেজ আমলে কোম্পানির কর্মকতাদের পাওনা মেটাতে আর ভারতে ইংরেজের যুদ্ধের খরচ জোগাতে এদেশের মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। রমেশচন্দ্র দত্তর *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস—১৭৫৭-১৮৩৭* থেকে সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, যা সমসাময়িক ভারতীয় অর্থনীতির সংকটজনক অবস্থা উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করবে।

> মন্টোগামারি মার্টিন "অর্ধ শতাব্দী ধরে আমরা বছরে বিশ থেকে ত্রিশ কখনো বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ভারতবর্ষ থেকে নিকাশ করে নিয়ে চলেছি। অর্থ গ্রেট ব্রিটেনে পাঠানো হয়েছে ব্যবসায়িক ফাটকাবাজির ঘাটতি মেটাবাব জন্য, ঋণ-সুদ দেবার জন্য, হোম এসটাবলিশমেন্ট রাখবাব জন্য এবং যারা হিন্দুস্থানে জীবন কাটিয়েছেন তাদের সঞ্চিত অর্থ ইংলন্ডের মাটিতে লগ্নীর জন্য। ভারতবর্ষের মতো একটা সুদূর দেশ থেকে বছরে ত্রিশ বা চল্লিশ লক্ষ পাউন্ডের নিরন্তর নিকাশ যা কোনদিন কোনভাবেই ফেরত যায় না—তাব কুফল পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিতে সম্ভব বলে মনে করি না।
> পৃঃ ৪২৯-৩০।*

> স্যব জন শোব . "আমি যখন প্রথম এদেশে পদার্পণ করি তারপর থেকে সতেবো বৎসরের বেশি সময় কেটে গেছে। কিন্তু আমি এখানে পৌছবার পর এবং কলকাতায বছরখানেক

থাকবার সময় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ভারতবাসীদের ওপর বর্ষিত আশীর্বাদ সম্পর্কে সেদিনের ইংরেজ জনমানসে যে স্থির, স্বচ্ছন্দ ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে কথা আমি পরিষ্কার স্মরণ করতে পারছি। আমরা যে দেশী সরকারকে উৎখাত করেছি তাদের তুলনায় আমাদের উৎকর্ষ, আমাদের প্রবর্তিত বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের চমৎকার ব্যবস্থা, আমাদের আত্মসংযম, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা সংক্ষেপে আমাদের সর্বপ্রকার গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে এত বিস্তারিত ভাবে আলোচিত যে তার বিবোধিতা করা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের সামিল ছিল। গ্রামের ভিতর যিনি বহু বৎসর কাটিয়েছেন এমন জনৈক ব্যক্তির কাছে বিপরীত প্রকৃতির কিছু ইঙ্গিত ও প্রমাণ শুনেছি বলে স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু অবিলম্বেই যে ঝড় তোলা হয়েছিল এবং প্রচলিত বিশ্বাসের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের ঝুঁকি নিতে পারতেন এমন জনৈক ব্যক্তি বিশেষের মস্তকে বজ্র যে বর্ষিত হয়েছিল, সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী ব্যক্তিকেও কাহিল করে ফেলার পক্ষে তা ছিল যথেষ্ট।

"এইভাবেই ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের নীতি ও রীতি সম্পর্কে আমি ক্রমশ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ি। এই কাজে অগ্রসর হয়ে সরকারও আমাদের জনসাধারণের ধারণা অনুধাবন করতে আমার কোন অসুবিধেই হয়নি। এর অন্যথা হলেই বরং অবাক হতাম। ইংরেজদের মূল নীতি ছিল নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার বিনিময়ে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে সর্বপ্রকারে গোলামে পরিণত করা। যতদূর সম্ভব উচ্চ পরিমাণে তাদের ওপর কর চাপানো হয়েছে। পরপর যে প্রদেশগুলি আমাদের অধিকারে এসেছে সেগুলির প্রত্যেকটিকেই ক্রমশ অধিক পরিমাণে শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। আর আমাদের গর্ব ভারতীয় শাসকগণ যে রাজস্ব আদায় করতেন, আমরা তার কত বেশি রাজস্ব আদায় করছি। সমস্ত সম্মান, মর্যাদা, অথবা যে পদ গ্রহণের জন্য নিম্নতম যোগ্যতার ইংরেজকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে হয় সেই পদ থেকেও ভারতীয়গণ বঞ্চিত। পৃঃ ৪৩০-৩১৪

স্যার জর্জ উইনগেট " ...যখন ভারতীয়দের কথা না ভেবে কেবলমাত্র আমাদের স্বার্থের জন্যই ভারত শাসন করেছি, তখন সেই শাসনের ব্যয়ভার বহন করবার জন্য একটি কপদকও না দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে আমরা স্পষ্টতই দোষী প্রমাণিত হই। ব্রিটিশ স্বার্থ যে মাত্রায় আমাদের ভারতীয় নীতি স্থির করে দিয়েছে, সেই মাত্রানুযায়ী আমাদের দেয় অংশ বিপুল বা সামান্যই হোক যথাযথভাবে তা শোধ করা উচিত ছিল। কিন্তু এ কাজটি কখনোই করা হয়নি এবং বর্তমানে যে বিপুল ঋণ আমাদের প্রতিকূলে জমে উঠছে তা শোধ করতে বহু বৎসর লাগবে। ইংল্যান্ড শক্তিশালী আর ভারত তার পদানত। সবলের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা দুর্বলের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

"ভারতের পরিস্থিতির ওপর এর অর্থনৈতিক প্রভাব প্রসঙ্গে বলা যায় যে গ্রেট ব্রিটেনকে যে নজরানা প্রদান করা হয় আমাদের বর্তমান নীতিতে সেটাই হল সন্দেহাতীত ভাবে সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় বিষয় যে দেশ থেকে রাজস্ব আহৃত হয় সেই দেশেই তা ব্যয় করা এবং এক দেশ থেকে রাজস্ব আহরণ করা ও অন্য দেশে তা ব্যয় করা ফলাফলের দিক থেকে দুটোর মধ্যে বিরাট ফারাক। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছ থেকে অবাধে আহৃত কর সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত লোকেদের দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের ব্যয়ের মারফতই আবার সেই কর কারিগরি শ্রেণির কাছে ফিরে আসে। তাতে ভিন্ন রকম বণ্টন ঘটে, কিন্তু জাতীয় আয়ের কোন অপচয় হয় না। সভ্যতার প্রাগসর দেশগুলিতে, যেখানে যান্ত্রিক

> আবিষ্কার ও প্রাকৃতিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার মানুষের উৎপাদন শক্তিকে প্রসারিত করে, সেসব দেশে জনসাধারণের ওপর বলতে গেলে কোন রকম চাপ দিয়েই বিপুল পরিমাণে কর ধার্য করা যায়। কিন্তু যে দেশ থেকে কর আহৃত হয়, যখন সে দেশে আর তা ব্যয়িত হয় না, তখন ঘটনাটা ভিন্নতর হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এক শ্রেণির নাগরিকের হাত থেকে অন্য শ্রেণির নাগরিকের কাছে জাতীয় আয়ের অংশ বিশেষের হস্তান্তরই ঘটে না, বরং কর-পীড়িত দেশ থেকে আহৃত সমগ্র অর্থেরই চরম অপচয় ও বিলুপ্তি ঘটে। জাতীয় উৎপাদনের ওপর প্রভাব সম্পর্কে বলা যায় যে ভিন্ন দেশে অর্থ পাঠানো হল, সেই দেশ থেকে সেই অর্থের কোন অংশ কোনভাবেই কর-পীড়িত দেশে আর ফিরে আসবে না।... যদি ভারত এই নিষ্ঠুর করভার থেকে মুক্তি পেত এবং ভারতে আহৃত সমস্ত রাজস্ব যদি ভারতেই ব্যয় হত, তাহলে সে দেশের রাজস্ব এমন স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করত যে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। পৃঃ ৪৩৭-৪৩৯*

ভারতের সম্পদ ও সমৃদ্ধি ইংরেজ কোম্পানিকে এদেশে বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি করতে প্ররোচিত করেছিল। দেশবিদেশে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পসম্ভারের চাহিদা তখন ব্যাপক। আন্তর্জাতিক বাজারে তার অবারিত দ্বার। সেই কৃষি ও বাণিজ্য আত্মসাৎ করে, ইংলন্ডে শুরু হয়েছিল শিল্প-বিপ্লব। ইংলন্ডের নিজস্ব কোন মূলধন বিনিয়োগে তাদের শিল্পপ্রসার ঘটেনি। তার জন্য অর্থ জুগিয়েছিল ভারত। আঠার শতকের শুরু থেকেই ইংলন্ডে ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের ওপর শুল্ক বসানো হয়। আর ইংলন্ডে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে অবাধে রপ্তানি হত। তার ওপর কোন শুল্ক ছিল না। সতের শতকে ইংলন্ডের বাজার ছিল ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একচেটিয়া কারবার, আঠার শতকের ভারতের বাজার দখলের উদ্যোগ নেয় ইংলন্ডের তৈরি বস্ত্র শিল্প। যা উনিশ শতকে সম্পূর্ণ রূপ পায়। সতের শতকে ভারত থেকে যে ৫ কোটি বর্গ গজ বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল, তার ৩ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ গজ যায় ইউরোপে। কিন্তু ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ইংলন্ডের বস্ত্র রপ্তানি ভারতে শতকরা ৬২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ক্রমশ তার পরিমাণ বাড়তে থাকে। আর ভারতের শিল্পযুক্ত কারিগররা কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। ক্রমশ তারা কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় জমির উপর চাপ বাড়তে থাকে। এভাবে চলতে থাকে। কিন্তু ১৮৪৬ সালে দেখা গেল, ভারতে তৈরি বস্ত্র বিদেশে এক গজও রপ্তানি হয়নি। কিন্তু ইংলন্ড থেকে ভারতের বাজারে আসে ২১৩, ৮৪০,০০০ গজ কাপড়।

> "১৭৫৭-১৮৫৭ সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিতে এমনিভাবে ইংলন্ডের সামগ্রিক প্রভুত্ব সম্পূর্ণ হয় এবং সেই সঙ্গেই ফেটে পড়ে সারা ভারতের তীব্র অসন্তোষ। সর্বস্বান্ত হবার পথে ভারতের সর্বশ্রেণি ও সর্বসম্প্রদায় এক নতুন একতার চেতনা লাভ করে—এই একতার চেতনাই ভারতের নবীন জাতীয়তা গঠনের প্রথম ধাপ।"**
>
> "সাতান্ন সালে ইংরেজ অধিকৃত ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে যে বিশাল অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল তার প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও মতদ্বৈধ আছে। কেউ কেউ বলেন একে 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বা 'জাতীয় বিদ্রোহ' নাম দেওয়া চলে না, কেন না, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় বিদ্রোহের সুপরিকল্পিত লক্ষণগুলি যথা অভীষ্ট লক্ষ্য ও পন্থার ঐক্য এতে

* *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৮৩৭)-রমেশচন্দ্র দত্ত*

** *সিপাহি বিদ্রোহের অর্থনীতিক পটভূমি—ভবানী সেন, পরিচয়।*

অনুপস্থিত ছিল। তারা একে 'আপাত ঘটনা' বা 'immediate events'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন।

"অপরপক্ষে আপাতঘটনা দিয়ে বিচার না করে কোন কোন ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সিপাহিদের সংক্ষোভের হেতু নিহিত রয়েছে ঋণ-রিক্ত, দারিদ্র্য, পীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে এবং 'Civil Rebellion' আখ্যা দিয়ে তারা সমাজের অপরাপর স্তরের বিভিন্ন বিক্ষোভগুলির সঙ্গে এই বিদ্রোহের একটি ঐক্য ও যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তারা সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী যে, সিপাহিদের সেই অভিঘাতের ফলে ভারতীয় জনমানসে একটি অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তি টলে ওঠে এবং সেদিন থেকে শিক্ষিত সমাজের মনেও ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে পরবর্তীকালে তা-ই জাতীয় সংগ্রামের নতুনতর পটভূমি রচনার চেতনায় ব্যাপ্ত হয়, হয়তো নীল বিদ্রোহ, প্রেস অ্যাক্ট ও ইলবার্ট বিল ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সেই অভীপ্সাই ফলবতী হয়েছিল। **১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানে বাঙালিদের কোন ভূমিকা কেন ছিল না এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে, তবে কারণ যা-ই হোক না, একথা বুঝতে এখন অসুবিধে নেই যে, সেদিন বাঙালি সেই বিদ্রোহের অংশীদার হলেও ইংরেজ শাসনের অকস্মাৎ অবসান ঘটতে পেত না এবং পরবর্তীকালে শিক্ষায়, শিল্পে, জ্ঞানে, সাহিত্যে এবং সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত জাতীয় আন্দোলনের অপ্রতিবদ্ধ ক্ষেত্ররূপে বাংলার বলাম্বিত আত্মপ্রকাশ ভারতের ইতিহাসকে এমন জটিল, বিচিত্র ও অমোঘ ক'রে তুলতে পারত না।"***

সিপাহিদের বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ আছে জওহরলাল নেহরুর "ভারত সন্ধানে" গ্রন্থে। তাঁর বিস্তৃত বিশ্লেষণ অধিকাংশ ইতিহাস লেখকই উপেক্ষা করে গেছেন। অথচ এত সহজে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক এবং সিপাহি বিদ্রোহের অনিবার্য সংঘাত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন কম ঐতিহাসিকই। জহরলাল লিখেছেন

..."হিন্দু ও মুসলমান জনতার মধ্যে এককালে কোনো পার্থক্য ছিল না বললেই হয়। পুরাতনকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সৌসাদৃশ্য দেখা যেত, সেখানেও দেখি চালচলন হাবভাব ছিল একই স্তরের। উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। অনেক আচার-ব্যবহার উৎসব প্রথাদি একই ধরনের ছিল। বিভেদ সর্বপ্রথম আসে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে-চিত্তবৃত্তি ও অন্যান্যক্ষেত্রে।

"গোড়াতেই বলে রাখা ভাল এই নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্যে ছিল না বললেই হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন, শিল্প-বাণিজ্যাদি পরিহার এবং সামন্তশ্রেণিগত রীতিপদ্ধতি অনুসরণের ফলে মুসলমানেরা পিছিয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে হিন্দু সমাজ এগিয়ে যায় এবং নিজেদের সুবিধা করে নেয়। দৌড় প্রতিযোগিতায় যে পক্ষ এগিয়ে যায়, সচরাচর বাজী তারাই জেতে—হিন্দুদের বেলাও তাই ঘটেছিল। গোড়ার দিকে ইংরেজদের শাসননীতি ছিল হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ও মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা। একমাত্র পঞ্জাবেই কেবল অন্য প্রদেশের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা কিঞ্চিদধিক উন্নত ছিল। কিন্তু পঞ্জাবের বাইরে অন্য সব জায়গায় হিন্দুরা ছিল অগ্রগামী। পঞ্জাব তো ইংরেজ কবলিত হয় অনেক পরে, তার আগে হিন্দুরা নিজেদের অবস্থা অনেকখানি গুছিয়ে নিয়েছে। এমনকি পঞ্জাবেও যদিচ সুযোগ সুবিধা উভয় সম্প্রদায়েরই প্রায় একই প্রকার

* *১৮৫৭-অমৃত সঞ্চয়-মহাশ্বেতা দেবী। গ্রন্থারম্ভের নিবেদন।*

ছিল, আর্থিক ব্যাপারে হিন্দুদের অবস্থা মুসলমানদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এবং তথাকথিত ইতরজনের মধ্যে বিদেশী বিদ্বেষ ছিল পুরো মাত্রায়। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এই দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রচেষ্টার ফলে, কিন্তু এই বিদ্রোহ প্রশমনের দুঃখটা মুসলমানদেরই বেশি করে লাগে কারণ অত্যাচারটাও তাদের উপর দিয়েই বেশি হয়। এই বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির মুসলমান সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত করার সকল স্বপ্ন অলীক কল্পনার মতো ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইংরেজ আসরে নামবার আগেই বাস্তবিকপক্ষে এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কিছু ছিল না। মারাঠারা ইতিপূর্বে মুঘল দর্পচূর্ণ করে দিয়েছিল এবং দিল্লি তখন ছিল তাদেরই আওতার মধ্যে। পঞ্জাবে রাজত্ব করছিলেন রণজিৎ সিংহ। ইংরেজদের হস্তক্ষেপ করার আগেই উত্তর-ভারতে মুঘল শাসন অন্তর্হিত হয়েছিল আর দক্ষিণ ভারতে মুঘল প্রভাব তো তার পূর্বেই লয় পেয়েছিল। তবু দিল্লির প্রাসাদে ছায়ামূর্তির মত, মাত্র নামে একজন সম্রাট বসেছিলেন এবং যদিচ তিনি প্রথম মারাঠাদের ও তৎপরে ইংরাজদের বরাদ্দ মাসোহারার উপর নির্ভর করতেন, তবু একটা বিখ্যাত বংশের প্রতীক স্বরূপ তিনি ছিলেন তো। সম্রাটের নিজস্ব অক্ষমতা এবং অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা নিজেদের কাজ হাসিল করবার উদ্দেশ্যে এই প্রতীকটিকে সাক্ষীগোপাল রূপে খাড়া করতে চেয়েছিল। বিদ্রোহদমনের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের এই শেষ চিহ্নটুকুও অপসারিত হয়।"*

সুশোভন সরকার সিপাহি অভ্যুত্থানের চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"মহাবিদ্রোহের মধ্যে ফিউডাল ধ্যান ধারণার অস্তিত্ব সহজেই লক্ষণীয়। তার পরিচয় পাই মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্থানীয় অভিজাত নেতার প্রতি আনুগত্য, অরাজক বিশৃঙ্খলার আভাস, পশ্চিমীসংস্কার চেষ্টার প্রতিকূলতা ইত্যাদির ভিতর। কিন্তু সেই কারণে বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা অসঙ্গত। অস্ত্রের জোরে মুক্তি সংগ্রামকে যদি বিধ্বস্ত না করা যেত, তবে তার মধ্যে থেকে নূতনশক্তি ও নবধারণার উদয় কিছু অসম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ করতে হলে, ইংরাজ কর্তৃক নূতন করে ভারত জয়ে বাধা দিতে গেলে নূতন আত্মশক্তি, পশ্চিমী যুদ্ধকৌশল, নবীন সংগঠন, দেশ জোড়া সহযোগিতা ইত্যাদির অনিবার্য প্রয়োজন আসত। মহা-বিদ্রোহ সফলতার দিকে এগিয়ে চললে যে এই নূতনের বাস্তব আবির্ভাব ও অবশ্যম্ভাবী হত এমন সিদ্ধান্ত চলে না, কিন্তু নূতন অগ্রগতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ কথা ঐতিহাসিকের জোর দিয়ে বলা অনুচিত। শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা না ঘটে উপায় ছিল না, বিশেষ কোনও সংকট মুহূর্ত সম্বন্ধে এই বিশ্বাস ইতিহাসে যান্ত্রিক ব্যাখ্যার পর্যায়ে পড়ে। আর, সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল না মেনে নিলেও তাতে করে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি প্রমাণিত হয় না।

"... ইংরেজ শাসনের প্রকৃতিকে যদি শোষণ মনে করি তবে তার বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের অভিযানকে প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়া বলা নিরর্থক। বিদ্রোহের স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত রূপ থেকে এই প্রমাণ হয় যে চলতি অর্থে একে ফিউডাল নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থান বলা চলে না। ইতিহাসে সুপরিচিত সামন্ত বিদ্রোহের ধরন অন্য জাতীয়—সেখানে শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান ও জন বিক্ষোভের দৃষ্টান্ত, বিদেশিপ্রভুর বিরুদ্ধে দেশ জোড়া লড়াই আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত বিরল। দেশে ফিউডাল ব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ রাজন্যবর্গের একজনও বিদ্রোহে যোগ দেননি। অযোধ্যার বাইরে জমিদারদের মধ্যেও বেশির ভাগ

---

* *ভারত সন্ধানে—জওহরলাল নেহরু। সিগনেট সংস্করণ। পৃঃ ৩৮১-৮২*

সেদিন ইংরেজের স্বপক্ষে। আসল ফিউডাল নেতারা বিদ্রোহে নেতৃত্ব করা দূরে থাক তাকে বানচাল করতেই ব্যস্ত থাকেন। তারা বিদ্রোহীদের মধ্যে ফিউডাল ধারণার দুর্বলতা তাদের দুর্ভাগ্য হতে পারে, দোষ নয়।

"মিউটিনিকে ফিউডাল প্রতিক্রিয়া আখ্যা দেবার আসল কারণ বোধহয় এই যে সেদিনকার ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি ছিল না। ভারতের পরবর্তী মহান জাতীয় আন্দোলন এই মধ্যশ্রেণি থেকে উদ্ভূত বলে সে আন্দোলনের ধারক অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষেরা যার থেকে দূরে ছিলেন তা কখনও প্রগতিশীল হতে পারে না। আর যেহেতু শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা হলেন বুর্জোয়া-গোত্রীয় অতএব অশিক্ষিত ফিউডাল ভাবাপন্ন লোকদের তোলপাড় যদি প্রচলিত ব্যবস্থায় বিপর্যয় এনে ফেলতে চায় তবে তা প্রতিক্রিয়া বইকি। কিন্তু আজ অতীতকে বিচার করতে বসে, ইতিহাস চর্চার বিস্তৃততর অভিজ্ঞতা নিয়ে, পূর্বপুরুষের দৃষ্টিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখা সাজে না। পূর্বতন কোনও যুগের বিশ্বাস মাত্রই সঠিক ও তখনকার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধারণা, এও একটা অন্ধ সংস্কার। ইয়োরোপে আধুনিক যুগের আদিপর্বে উদীয়মান বুর্জোয়ারা স্বদেশে প্রজা বিদ্রোহ ও বিদেশে জাতীয় বিদ্রোহকে অনেক সময় কি চোখে দেখেছে তার পরিচয় আমাদের অজানা থাকার কথা নয়। তার উপর আবার আমাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের অর্ধকলোনির আওতায় বসবাস করতে হত, বাস্তিক বিপ্লবের ছায়ামাত্র বহুদিন তাদের জগতে পদক্ষেপ করতে পারেনি।

বাংলার রেনেসাসের পুরোধাদের গৌরব এই যে, দেশের সনাতনী রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের অনেক দীনতা থেকে তারা মুক্তি চেয়েছিলেন, ফিউডাল সমাজের প্রাচীন দুর্বলতা তারা ধরতে পারতেন। পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে তার সমাদর তাদের অন্য কীর্তি। এদিক থেকে তারা দেশবাসীর চেয়ে অনেক এগিয়ে গেলেন। ইংরাজ মধ্য শ্রেণির অভিজ্ঞতাটুকু আয়ত্ত করে দেশের জন্য তারা অগ্রগতির একটা নিয়মতান্ত্রিক, উদারনৈতিক, অনুগ্র, ভদ্রপথের ছক কাটছিলেন। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে উনিশ শতকে বিদেশী শাসন তাদের কাছে অসহ্য মনে হত, অথবা ব্রিটিশ শোষণের পূর্ণ ভয়াবহ রূপটি তাদের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের আসল মূল্য দিতে হত দেশের সাধারণ লোককে। আধা-ফিউডালি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আমাদের বুর্জোয়ারা কিছু অপছন্দ করেনি। দেশের জনজীবন থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন, একথা বলা চলে। মহাবিদ্রোহের করাল রূপে তাদের আতঙ্ক পাবারই কথা, সেজন্য দোষ দেওয়াও অন্যায়। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আজও আশ্রয় করে থাকব এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভবিষ্যতের পক্ষে যত বিপ্লবী সম্ভাবনা থাকুক না কেন, সেদিন সে-শিক্ষায় এমন ধারণারও সৃষ্টি হয় যে ইংরেজের ভারত জয় ভগবানের মঙ্গলময় বিধান। কলোনি-বিস্তারের এমন বিচিত্র ব্যাখ্যায় আজকের দিনের ঐতিহাসিকদের কৌতুক বোধ করা ছাড়া উপায় কি।"*

"...বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিযোগের বহিঃপ্রকাশ এই বিদ্রোহ। সরকারি ভূমিরাজস্বনীতির বিরুদ্ধে অনেক অসন্তোষ জমা হয়েছিল কৃষক সম্প্রদায়ের মনে। যে নীতির ফলে তাদের জমি হাতছাড়া হয়েছিল; তার ওপর পুলিশ, নগণ্য সরকারি কর্মচারী, ছোটোখাটো আদালত—কারো অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রেহাই ছিল না। ভাবতীয়

* *পরিচয় ১৩৬৪ শ্রাবণ।*

সমাজে, বিশেষ করে উত্তর ভারতের সমাজে, যাঁরা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক, শাসন বিভাগে মোটা মাইনের উচুপদ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাদেরও দুরবস্থার সীমা ছিল না। পুরোহিত, পণ্ডিত, মৌলবি প্রমুখ যারা সাংস্কৃতিক বা ধর্মসংশ্লিষ্ট পেশা অবলম্বন করে জীবন যাপন করতেন, তাদের আয়ের উৎসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—তাদের পুরনো পৃষ্ঠপোষক রাজা, রাজপুত্র, জমিদারদের কোন বৈভবই আর অবশিষ্ট ছিল না। ১৮৫৬-এ আওধ অধিকারের ফলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; বিশেষ করে আওধে অসন্তোষের মাত্রা ছিল তীব্র। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের অনেকেই এসেছিল আওধ থেকে সুতরাং এ ঘটনা যে তাদের ক্রোধবহ্নি উদ্দীপিত করবে তা খুব স্বাভাবিক।...”

জমির করবৃদ্ধি, তালুকদার ও জমিদারদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণে তাদের ব্রিটিশের শত্রুতে পরিণত করা, ডালহাউসির আগ্রাসীর নীতির ফলে নানাসাহেব, ঝাঁসীর রানি এবং বাহাদুর শাহকে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধে সক্রিয় করে তুলেছিল। স্বল্প বেতন ও ব্রিটিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহার সিপাহিদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। একজন ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকের উক্তি ঃ

“সিপাহিকে গণ্য করা হয় নিকৃষ্ট জীব হিসাবে, তার সঙ্গে খুব কঠোর ব্যবহার করা হয়। গালাগালও জোটে তার ভাগ্যে। তাঁকে কখনো বলা হয় ‘নিগার’, কখনো ‘পিগ’ বা ‘শুয়ার’ বলে।... যারা অপেক্ষাকৃত তরুণ. .তারা সিপাহির সঙ্গে এমন ব্যবহাব করে যেন সে নিকৃষ্ট শ্রেণির কোন পশু।” সিপাহিদেব কর্ম জীবনে ছিল না উন্নতির কোন সম্ভাবনা। বড়জোর সুবেদার পর্যন্ত। বেতন বড়জোর ষাট সত্তর টাকা।

উত্তর ভারতের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহ কেবল সিপাহি ও অভিজাত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

“... এটা খুব লক্ষণীয় যে উত্তর ও মধ্য ভারতের যেখানে যেখানে সিপাহি-বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ ঘটে সেখানে সর্বত্রই পরে অসামরিক-গণ অভ্যুত্থানও দেখা দেয়। এ লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের হাতিয়ার ছিল কুড়ুল, বল্লম, তীরধনুক, লাঠি, কাস্তে, আর বড় জোর নিতান্ত সাধারণ গাদা বন্দুক। তবু, কৃষক ও কারিগর শ্রেণির ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ এ বিদ্রোহে প্রকৃত শক্তির সঞ্চার করেছিল, উত্তবপ্রদেশ ও বিহার সম্পর্কে এ কথা আবও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একটি হিসেব থেকে জানা গেছে যে আওধে ইংরেজেব সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১,৫০,০০০, তার মধ্যে ১,০০,০০০ জনই বেসামরিক নাগরিক।”*

সিপাহি অভ্যুত্থান সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর ইংরেজি বা বাংলা গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য মন্তব্য অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র, বিদ্রোহের চরিত্র ও ভারতীয় জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে ঘটেছে নতুন আলোকপাত। তিনি বলেছেন :

বারাকপুর মঙ্গল পাণ্ডে দ্বারা আক্রমণ, যা কম-বেশি মীরাটে অবস্থিত অশ্বারোহী দলের দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল, এই আন্দোলনকে নতুন দিকে নিয়ে গেল। বারাকপুব অথবা মীরাটের দলনেতারা সম্ভবত এটা ভাবতে পারেনি যে, যে কাজকে তারা একটি সীমাবদ্ধ ধরনের জাত ও ধর্ম রক্ষার জন্য কাজ হিসেবে ধরে নিয়েছিল তা সমগ্র উত্তর ভারত,

স্বাধীনতাসংগ্রাম—বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে পৃঃ ৫৩-৫৫

বিশেষ করে সমগ্র বাংলা প্রদেশকে একটি সাংঘাতিক তপ্ত কড়াইয়ের ভেতর ফেলবে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দূষিত ক্ষতের মতো অসন্তোষকে প্রকাশ করে দেবে, কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিশাল উত্থান পুরোপুরি সামরিক বিদ্রোহের চেয়ে আরও অধিকতর কিছু ছিল... (পৃঃ ৫)*

* * *

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ছিল। যেসময়ে নানা স্থানীয় যুদ্ধে জয়ী হয়ে ব্রিটিশ শক্তি ভারতীয় রাজ্যগুলোকে উৎখাত করেছিল সেই সময়েই বিচ্ছিন্ন বা বিজিত প্রদেশসমূহে রাজস্ব এবং কর নির্ধারণের জন্য ভূমিসংস্কারের কাজ, দেশের জমিদারশ্রেণির স্বার্থরক্ষার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জমি-জরিপ ও জমির পুনর্গ্রহণ ব্রিটিশ রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার এই উভয় দিকই জমির অভিজাততন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। প্রাচীন জমিদারদের প্রবল প্রতাপের এই পরাভব একটি গুরুতর সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।....(পৃঃ ৬)*

* * *

...যখন সারা দেশে একটি তীব্র দ্বেষের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সেই সময় অযোধ্যা রাজ্যের অধিকার হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সর্বাপেক্ষা প্রধান সহায়ক কারণ ছিল এই ঘটনাই এতে কোন সন্দেহ নেই।... যখন ১৮৫৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে এই খবর ফাঁস হয়ে গেল যে, অযোধ্যার রাজার আবেদনপত্র কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী (Court of Directors) বিবেচনা করবেন না, তখন সমগ্র অযোধ্যারাজ্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হয়ে উঠল।... বাস্তবিক পক্ষে অযোধ্যা দখল করার চেয়েও যে শাসনব্যবস্থা সেখানে প্রবর্তিত করা হয়েছিল তা বিদ্রোহের সক্রিয় কারণ হয়ে দাঁড়াল।... (পৃঃ ৯-১১)*

* * * *

...শেরার (Sherer) কানপুর বিদ্রোহের সুদীর্ঘ বিবরণীতে শেষের দিকে সম্পূর্ণ জোরে সঙ্গেই এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, জমিদারি বিক্রয়ের ব্যবস্থাই এই বিদ্রোহকে গণবিপ্লবের রূপ দেয়।... কার্তুজ কিংবা হাড় মিশ্রিত ময়দা এবং ধর্মসংক্রান্ত চিৎকার গ্রামীণ শ্রেণিকে এবং প্রধান প্রধান ভূস্বামীদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করেনি।... মাটিতে এবং বংশানুক্রমে প্রাপ্ত জমিতে তাদের অধিকার ও স্বার্থ—যাকে জীবনের চেয়েও মূল্যবান বলে তারা মনে করত সেইসব জমি হারাবার আশঙ্কাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।...(পৃঃ ১৪)*

* * *

শতাব্দী ব্যাপী ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক সঙ্গত কারণ জমে উঠেছিল। বিদেশি শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য তাই ১৮৫৭ সালের এই সত্যবদ্ধ প্রয়াস। স্বাভাবিক কারণেই ফিরিঙ্গিদের বহিষ্কার জারি করেছিল ভারতীয়রা, কারণ জনজীবনে ক্ষত সৃষ্টি করা ছাড়াও ইংরেজের আইনের বেড়াজালে জমিদার শ্রেণিকে প্যাঁচে ফেলে ধ্বংস করে দিয়েছিল। নীল, আফিম, বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত লাভজনক ব্যবসা অন্যায়

* *স্বাধীনতাসংগ্রাম—বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে পৃঃ ৫৩-৫৫*

** *সিপাহি বিদ্রোহ ও গণ বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শশীভূষণ চৌধুরী।*

ভাবে একচেটিয়া অধিকার হাতে নিয়ে এবং নানাপ্রকার কব ও চাহিদার ভারে মানুষকে জর্জরিত করেও স্ট্যাম্প-কাগজ ও কোর্ট ফির মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের ধ্বংস সাধন করেছিল।* পৃঃ ১৬

সিপাহি অভ্যুত্থানের অন্যতম দিক হল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ইংরেজদের আসবার আগে, এই দুই ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা নিয়ে বসবাস করেছে। বিদেশি বণিক যখন এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ নেয়, তখন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একই দুর্ভোগের শিকার হয়। পূববর্তী দেশ শাসকের সময়ে এমন অসহনীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা তাদের করতে হয়নি। দারিদ্র, অনাহার, নির্যাতন তাদের নিয়ে এসেছিল একই প্রতিরোধের পতাকা তলে। ইংরেজ কোম্পানির রাজ্য বিস্তারের অভিযানে ভারতীয়দের সশস্ত্র এই প্রতিরোধ ছিল স্বাভাবিক। যারা বিদেশী দখলদারদের কল্পনারও বাইরে ছিল।

"১৮৫৭-এর বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের শক্তিব অন্যতম উৎস ছিল হিন্দুমুসলমান ঐক্য। সিপাহি ও সাধাবণ মানুযের স্তরে এবং নেতাদের স্তরেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পবিক সহযোগিতা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল বিদ্রোহের সময়। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বোধকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল এ সহযোগিতা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিদ্রোহীরা যদি কোথাও জয় লাভ করত, হিন্দুদের মনোভাবের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারি হত কোথাও গোহত্যা যাতে না হয়। তা ছাড়া নেতৃত্বের সব স্তরেই হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বও ছিল সমান সমান। এক প্রবীণ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে অভিযোগ করেন "মুসলমানদের যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাব এক্ষেত্রে তারও উপায় ছিল না।" বস্তুতপক্ষে ১৮৫৭-র ঘটনাবলী থেকে একথা খুব ভালোভাবে প্রমাণিত হয় যে মধ্য যুগে এবং ১৮৫৮-র আগে ভারতের মানুষ এবং তাদের রাজনীতি আদৌ সাম্প্রদায়িক ছিল না।"*

সিপাহি অভ্যুত্থানের শতবর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকার সর্বসম্মত ইতিহাস গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি কর্মসমিতিও গঠন করা হয়। মত পার্থক্য ঘটায়, কর্মসমিতি থেকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বেরিয়ে আসেন এবং স্বতন্ত্রভাবে সিপাহি অভ্যুত্থান সম্পর্কে একখানি বই লেখেন। ভারত সরকারের সেই কর্ম সমিতির উদ্যোগে সুরেন্দ্রনাথ সেনের লিখিত বইটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এর একটি নতুন সংস্করণও বেরিয়েছে। দুটি গ্রন্থই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে সহায়ক। সামান্য মত পার্থক্য থাকলেও দুটি গ্রন্থেই সিপাহি অভ্যুত্থান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের অনেকেই তাদের বিশ্লেষণ স্বীকার করেননি।

রমেশচন্দ্র লিখেছেন :

The outbreak of 1857 would go down in history as the first great and direct challenge to the British rule in India on an extensive scale It must be admitted by all unprejudiced critics that the British Government and

* *সিপাহি বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শশীভূষণ চৌধুরী।*

** *স্বাধীনতা সংগ্রাম—বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে। পৃঃ ৫৬*

people bravely accepted the challenge and proved equal to the occasion. The resourcefulness, organizing ability and statesmanship of the Government, backed by devotion to duty, courage, and a spirit of fellow feeling and sacrifice among the officials which never yielded to privations and sufferings, however great, enabled the British to survive the fiery ordeal. Tribute must also be paid to British diplomacy which could gather round their banner the solid phalanx of the Sikhs–a proud nation of heroes who believed in their hearts that the British had defrauded them of thier dominious and independence by most ignoble means. And this had taken place less than ten years back, within the living memory of those who shed their blood for the British cause. Similarly the Pathan hill tribes on the North-West frontier, against whom the British had been waging bitter fight for years, were enlisted to support their cause, and these along with theirs mortal and hereditary enemies, the Sikhs, were fighting side by side to preserve the dominions of thieir common enemy, the British. A race which could successfully employ the sepoys agianst the Sikhs, and then the Sikhs against the sepoys, the sepoys against the Pathans and the Gurkhas, and then the Pathans and Gurkas aginst the sepoys, certainly deserves an empire. Similarly, credit is due to the British for having retained the allegiance of the Sindhia, who was so shabbily treated by Ellenborough in 1843-4, and of the Nizam who was compelled to cede Berar by force and fraud in 1853. Whether these examples redound to the credit of the British diplomacy, or merely betray the utter lack of national spirit among the Indians, may be questioned. But in either case, they point to one important factor, often ignored by historians, whith contributed largely to the success of the British and the failure of the Indians.*

It is true that many land lords joined the revolt but many also remained loyal and faithful to the British till the last. As regards the common people the contemporary British writers themselves admit that a large section of them in N.W.P. showed friendly feelings to the British. As an evidence thereof it is pointed out that otherwise supplies could not be obtained, and small groups of Enghishmen could not move through Rohilkhand without any escort and hold important posts amidist the swarns of mutinners passing up the Grand Trunk Road to Delhi." If there are instances where the Enghishmen were cruelly butchered, there are perhaps more numerous examples where English fugitives—men, women, and children–owed their lives to the kindness and sympathy of the Indians, both chiefs and common people. All this does not necessarily mean that these were loyal to the British; they might have been passive or indifferent, even though disaffected towards the British. But the existence

The Sepoy muting and the Revolt of 1857-Dr. Rc Majumdar P. 485 86

of a large element of such people certainly takes away from the universal character of the 'popular rising' which has been claimed by some writers."*

কারণ :

The revolt was attributed to the enlistment of high caste Brahmans and Rajputs in the Bengal Army, but as colonel hunter points out, caste did not cause Mutiny. The Santals are a casteless tribe, the Bhils acknowldge no caste distinction, but they also fraternised in some areas with the mutinous sepoy. The low caste sappers rose in arms at Meerut. The humble Pasi joined the religious war as did the highborn Brahman. An atmosphere of distrust and suspicion had been created by a series of well-intentioned but ill-judged legislative and administrative measures which shook to its very core the sepoys faith in the *bona fides* of the Sarkar, and successive Governor-Generals contributed unconsciously to the steady deterioration of public confidence in the good faith. Lord Dalhousie has generally been held responsible for the outbreak but no single act of his by itself would have caused the revolt Lord William Bentinck, Lord Amherst, Lord Auckland, Lord Ellenborough had each by some act of omission or commission either alienated orthodox opinion in the country or interfered with ancient rights and privileges dearly cherished by the people. The alien government was based not on the loyalty of the people but upon its armed forces. The sepoy felt that his was the strong arm that had sustained it so long, and he could overthrow it whenever he wanted He had hither to remained loyal to his salt, but when he thought that his employers aimed at nothing less than his ancestral faith, the very basis of that loyalty was shattered. The educated Indians might have bridged the gulf between the uneducated masses and the Government but they did not enjoy the confidence of their rulers. They formed a very small minority and had little contact with the rural population. Moreover thier ways gave as much offence to the orthodox opinion as those of their Christian masters. Even if a few educated Indians had been appointed to high offices of responsibility and trust it is doubtful whether they could have stemmed the tide. The revolt had been long brewing the greased cartridge only hastened it.*

ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের বিশ্লেষণে সিপাহি বিদ্রোহকে চিহ্নিত করা হয়েছে, 'বিদ্রোহ, যখন ছড়িয়ে পড়ল, তাতে কিছুটা নৃশংসতা ছিল ঠিকই, কিন্তু ইংরেজরা স্বাভাবিকভাবেই তাকে অতিরঞ্জিত করল এবং যে কারণে নিরীহ মানুষ ভীষণ রকম ক্ষেপে উঠল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বিদ্রোহী নেতাদের অনেকে এই নৃশংসতার নিন্দা করেছেন। দিল্লি পতনের পর ফিরোজ শাহ তাঁর দ্বিতীয় বিবৃতিতে নারী এবং শিশু হত্যাব

The sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 R. C Majumdar. P 130
Eighteen Fifty-Seven-Surendra Nath Sen. Page 39-40

মতো পাপ কাজের, যা "ঈশ্বরের নির্দেশ বিরুদ্ধ", কথা অস্বীকার করেন। ইংরেজরা এদেশে যে শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়ে এতটুকু অনুতাপও ১৮৫৮ সালের মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণায় ছিল না। এবং ভুলে গেলে চলবে না বিদ্রোহ কালের সারা সময় ধরে যত ইওরোপীয়ান খুন হয়েছে ইংরেজরা কোনো একটিমাত্র জায়গায় জান্তব বর্বরতার সঙ্গে তার থেকে অনেক বেশি সাধারণ মানুষ খুন করেছে।

"এটাও অনেক সময় ভুলে যায় লোকে যে ইংরেজদের কুকীর্তিগুলো অনেক সময় বিদ্রোহীদের নামে চালানো হয়েছে।

...সেই আবেগ এবং ক্ষতগুলি আমরা অনুভব করতে পারি যা সেই সময় সিপাহিদের অনুপ্রাণিত করেছিল এই বিদ্রোহ সংঘটিত করতে বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এতে অংশ নিতে। ভিন্ন মত অনুসারেও এর ব্যাখ্যা হচ্ছে কিন্তু কোনভাবেই তা বিদ্রোহীদের এই বিশাল কর্মকাণ্ডের গুরুত্বকে হ্রাস করতে পারেনি—এটি সেই বিদ্রোহ যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সশস্ত্র চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।...*

ব্যর্থতার কারণ :

"...সিপাহিরদলে কেহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনমান্য বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন না, যাহার কথা সকল সিপাহি সমভাবে অবনত মস্তকে মান্য ও গ্রাহ্য করে। সিপাহিরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। বহুকাল ইংরাজের সামরিক বিভাগের শাসননিগড়ের অধীনে থাকিয়া, এখন একেবারেই তাহারা স্বাধীনতা পাইয়াছিল। তাই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া সিপাহিসকল নিজ নিজ খেয়াল মতো কার্য করিতে আরম্ভ করিল। ইহার উপর তাহারাও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতালিপ্স হইয়া ইংরাজেব বন্ধন ছেদ করে নাই, তাহারা তো স্বদেশ ও স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র ও স্বাধীন করিবার মানসেই তরবারি কোষমুক্ত করে নাই—অসন্তোষ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও ঘৃণায়— শেষে প্রতিবিধিৎসার বৃশ্চিকদংশন জ্বালায় অধীর হইয়া সহসা তাহারা ইংরাজের বিরোধী হইয়াছিল। এ বিরোধের ভাব দুই দশটা ইংরাজ নরনারীকে বধ করিয়া, দুই দশটা সরকারি খাজনাখানা লুঠ করিয়া, দুই দশদিন মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দশদিকে ছুটাছুটি করিয়া এবং নানাস্থানে অবিচারে স্বীয় প্রতাপ ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া অবশেষে কর্পূরের ন্যায় উপিয়া গেল। পরিশেষে যখন সিপাহি দেখিল যে, "রামে মারিলেও মরিতে হয়, রাবণে মারিলেও মরিতে হয়" তাহাদের মারীচের দশা ঘটিয়াছে; ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিলেও মহারণপ্রাঙ্গণে প্রাণপাতের সম্ভাবনা আছে, নিরস্ত্র হইয়া দেশে ফিরিলেও ফাঁসিকাষ্ঠের ভয় আছে তখন সিপাহিদল তাহাদের সহজ বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সমর ব্যাপাবে যোগ্য সেনানায়কহীন হইয়া শত মাতঙ্গের বল প্রকাশ করিলেও কোন ফলোদয় হয় না, মরণই নিশ্চয় হয়। তাই সিপাহি মরিলও বটে, শেষে বীরের ন্যায় মরিলও বটে, পরন্তু এক কাঠা জমিও স্বাধীন করিতে পারিল না। দশজনকেও স্বাতন্ত্রের স্বাদ দিতে পারিল না—পরিণামে ইংরাজই জয়ী হইলেন।*

* *১৮৫৭ ইরফান হাবিব। শারদীয় গণশক্তি।*

* *সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯৩*

১. বিদ্রোহের কোনরকম সংগঠিত প্রাক্ প্রস্তুতি ছিল না।
২. পারস্পরিক সংহতি ছাড়াই, মহাবিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে।
৩. বিদ্রোহ কীভাবে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। একসময়ে বিভিন্নস্থানে বিদ্রোহ ঘটলে, ব্রিটিশের পক্ষে সমূহ বিপদ ঘটত।
৪. বিভিন্ন স্থানে অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না।
৫. বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোন ব্যক্তিত্বই ছিল না।
৬. বিদ্রোহ ছিল বিক্ষিপ্ত—বিচ্ছিন্ন। যার ফলে তুলনামূলকভাবে স্বল্প শক্তিধর ব্রিটিশের পক্ষে বিদ্রোহ দমন কঠিন হয়নি।
৭. ভাবতের বিভিন্ন স্থানে তীব্র অসন্তোষ থাকলেও, সর্বত্র অভ্যুত্থান হয়নি। বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশের কোন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়নি।
৮. ব্রিটিশের কূটনীতির সাফল্য ছিল অসাধারণ।
৯. বেশির ভাগ দেশীয় রাজ্য ছিল ব্রিটিশের পক্ষে।
১০. ইংরেজেব প্রধান সহায় ছিল শিখ, গোর্খা ও রাজপুত যোদ্ধারা।
১১ রেওয়া, রামপুর, পাতিয়ালা, কাশ্মীর, বর্ধমানের মহারাজা—এদেশের রাজা ও জমিদাররা ছিল ব্রিটিশের সহায়ক।
১২. বিদ্রোহীদের তুলনায় ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা ও সংগঠন ছিল সেরা।
১৩. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা, গোলাবারুদের প্রাচুর্য, সামরিক দক্ষতা ও শৃঙ্খলা ছিল ব্রিটিশের বিদ্রোহ দমনে অন্যতম শক্তি।
১৪. ব্রিটিশ নৌবাহিনী সৈন্য আমদানি ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
১৫. বিদ্রোহীদের সাহস ও উদ্দীপনা ছিল অপরিমিত—কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তা উশৃঙ্খলতায় পরিণত হয়।
১৬. বিদেশি শাসনের যন্ত্রণা থেকেই বিদ্রোহের যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা আদৌ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
১৭. বিদ্রোহীরা জানত পরাজয় অর্থাৎ মৃত্যু—সে কারণে তারা অকারণ নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেয়—ফলে তারা জনসমর্থন হারাতে থাকে। বেনিয়া ও মহাজনরা নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।
১৮. বিদ্রোহী সিপাহিরা সাধারণ মানুষদের প্রতি আদৌ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না—অবজ্ঞার চক্ষে দেখত—ফলে তাদের ওপর জনসমর্থন দ্রুত হ্রাস পায়।
১৯. কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজের মধ্যবিত্তশ্রেণির সঙ্গে বিদ্রোহের কোন সংযোগ ছিল না।
২০. কেবলমাত্র আবেগ আর অসমসাহসিকতায় যুদ্ধ জয় করা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন সংহতি ও মজবুত সংগঠন।

"অবশেষে অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই জয়লাভ করল। তার বিশ্ব বিস্তৃত ক্ষমতা তখন সমৃদ্ধির তুঙ্গে, তাছাড়া অধিকাংশ ভারতীয় রাজা এবং দলনেতাই তার দলে। অন্য দিকে

বিদ্রোহীদের অস্ত্র নেই, সংগঠন নেই, সামরিক শৃঙ্খলা নেই, তাদের মধ্যে সংকল্প দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বেরও অভাব। এ সব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার আগেই ব্রিটিশ তার বিপুল শক্তিব সম্ভার নিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করল অত্যন্ত নির্মমভাবে। ১৮৫৭-র ২০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দিল্লি দখল করল; বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ তাদের হাতে বন্দি হলেন। এ আঘাতে বিচলিত হলেও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারা বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু একে একে তাদেরও পরাজয় শুরু হল। নানা সাহেব কানপুরে পরাজিত হলেন ব্রিটিশের হাতে। তার বিশ্বস্ত সেনানায়ক তাঁতিয়া টোপি ১৮৫৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে বীরের মতো গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এক জমিদার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে তিনিও ধরা পড়লেন শত্রুর হাতে। ১৮৫৮-র ১৭ই জুন উন্মুক্ত তরবারি হাতে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ হারালেন ঝাঁসির রানি। ১৮৫৯ সালে বিহারেব কুনওয়ার সিং, বখত খান (ইনি প্রথমে সিপাহি ছিলেন এবং পরে স্বীয় ক্ষমতা বলে দিল্লিব বিদ্রোহীদেব অধিনাযক হন।) বেরিলির খান বাহাদুর খান, ফৈজাবাদের মৌলবি আহমদুল্লা প্রভৃতি নেতাদের মধ্যে আর কেউই জীবিত রইলেন না। আওধের বেগমকে নেপালে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে হল। ১৮৫৯-র শেষাশেষি ভারতে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রিটিশের প্রভুত্ব। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ তবু ব্যর্থ হয়নি। দেশকে রক্ষা করার এক আত্যন্তিক প্রয়াসের প্রকাশ এ বিদ্রোহ; এ প্রয়াসের পদ্ধতি পুরনো, নেতৃত্বও পুরনো শ্রেণি নির্ভর। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম মহান মুক্তি সংগ্রাম। সারা দেশে ঘরে ঘরে স্মরণীয় হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী বীরেরা, বিদেশি শাসকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে দেশবাসীর মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল তাঁদের নাম।"*

মহাশ্বেতা দেবীর রচনা উপন্যাস হলেও ইতিহাস উপেক্ষিত নয়। তাঁর বর্ণনা ও বিশ্লেষণে ইতিহাসের যাথার্থ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর বিবরণের মধ্যবর্তী পর্বে, তিনি লিখেছেন :

"ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তাকে আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না। এমন কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল তিন হাজার সওয়ার, সিপাহি ও গোলন্দাজদের ওপরে মাত্র কয়েকজন অফিসার, ইংরেজ। তাদের সংখ্যা পুরো একশও নয়। ভারতীয়রা যেন নতুন এক আগ্রহ নিয়ে, সতর্ক হয়ে হিসেব কষছিল আর অবাক হচ্ছিল। ভারতবর্ষের সর্বত্র এত এত সব ভারতীয় সিপাহি সওয়ার। আর শ্বেতাঙ্গ মাত্র ক'হাজার।

"নানারকম কথা, হাতে হাতে চিঠি বিলি এ সব চলছিল। সম্পূরণের মতো ধর্মোন্মাদ, যারা মনে করে তারা ঈশ্বর প্রেরিত, তাদের সংখ্যাও বাড়ছিল বইকি! রাজা, জমিদার, তালুকদার, গদীচ্যুত ভূম্যধিকারীরা ভাবছিলেন এরপরে দিল্লির বৃদ্ধ বাদশাহ তক্তে বসবেন। তারা স্বস্থানে সগৌরবে রাজত্ব করবেন।

"যারা জমি হারিয়েছে, সেইসব চাষি ভাবছিল তাদের জমি তারা ফিরে পাবে। অযোধ্যার লোকেরা ভাবছিল নবাবকে কলকাতা থেকে টেনে এনে আর একবার গদীতে বসালে তারা চাকরি পাবে, জমি পাবে, সব পাবে।

* *স্বাধীনতা সংগ্রাম—বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে। পৃঃ ৫৬-৫৭।*

"রেজিমেন্টে যারা ওপরে আছেন তারা ভাবছিলেন এরপর এদের ধ্বংস করতে পারলে আমরা স্বাধীন হব। যারা নিচে আছে, সেইসব সিপাহি কী ভাবছিল তাই জানা যায় না। তাদের ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা সাত টাকা মাইনেয় ঢোকে, চল্লিশ বছর বাদে তাদের মাইনে হয় ন'টাকা। এই টাকা দিয়ে খাদ্য ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে মাস গেলে সে কখনও এক টাকা কখনও এক আনা পায়, কখনও কিছুই পায় না। সিপাহি সুবাদার সহজে হয় না। উপরন্তু তারা অনেক অবিচার অনেক অপমান নিয়ত সহ্য করে। রিসালার সওয়ার প্রথমে সাতাশ টাকা মাইনেয় ঢোকে, অন্তিমে তাদের মাইনে হয় ত্রিশ টাকা। কখনো তারা ন' দশ টাকার বেশি পায় না। সওয়ার থেকে রিসালাদার মেজর হওয়া তাদের কাছে আশাতীত এক সম্ভাবনা। অথচ, সিপাহি যদিও জানে সে সুবাদার হবে না তবু সে সেই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই ড্রিল, প্যারেড এবং কুচ করতে থাকে। সওয়ারও রিসালদার মেজরের তিনশো টাকা মাইনের পদের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া ছোটাতেই থাকে।

এইসব জমিদার, তালুকদার, স্বার্থসন্ধী, নিঃস্বার্থ যোদ্ধা, সিপাহি সওয়ার ব্যতীতও সম্পূরণের মতো একদল ধর্মোন্মাদ এসে জুটেছিল। তাদের ধারণা হল ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের মহৎ কাজটি সাধনের ভার ঈশ্বর তাদেরই দিয়েছেন। তাদের কোনো স্বার্থ নেই। তারা জমি, টাকা বা ক্ষমতা চাইল না। তারা গাঁজা খেয়ে রক্তচক্ষু করে, ভাবোন্মাদে বক্তৃতা দিয়ে চলল। মানুষকে উৎসাহ দিতে লাগল সুদূর গ্রাম যেখানে এসব কথা কোনদিনও চিন্তা করেনি, সেখানেও হাটে বাজারে এরা হনা দিল।

কানপুরের অবস্থাকে বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত করতে, এইসব ধর্মোন্মাদ লোকেরা কথায় কথায় বিঠুরের গদীচ্যুত মহারাজের দৃষ্টান্ত দেখাতে লাগল। বিঠুরের মহারাজের সৈন্যদল এবং কানপুরের রেজিমেন্টের সৈন্যদল দু'দলের মধ্যে পত্র ও দূত বিনিময়ের অন্ত রইল না।

সম্ভবত বিঠুরের পেশবা মহারাজ জানলেনও না, যাদের উপর তার নির্ভর, তারা ইতিমধ্যেই সব স্থির করে ফেলেছে। তাকেই তারা নেতা বানাবে।

মজা হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজের নিজের কথা ভাবল, কেউ অপরের কথা ভাবেনি। বড় অফিসাররা সিপাহির কথা ভাবেননি। কোনো তালুকদার ভূমিচ্যুত প্রজার কথা ভেবে উদ্দীপিত হননি। লক্ষ্য এক, ইংরেজ বিতাড়ন। কিন্তু একতা নেই।" *

অভ্যুত্থানে বাঙালির ভূমিকা**

সিপাহি অভ্যুত্থানের সময় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হালটা বুঝে নেওয়া দরকার। ১৭৫৮ সালের ২৩ আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটির চাকরিতে যোগ দেন। সে সময়ের মধ্যে তাঁর একখানি মাত্র কবিতার বই ছাপা হয়েছিল। তাঁর গদ্য রচনার কোন রকম সংবাদ ছিল না। এ বছরেই বেরোয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান'। মধুসূদন ইংরেজি রচনার পথ থেকে সরে এসে লিখলেন প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। প্রকাশিত হল টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের দুলাল'। ১৮৫৯ সালে বেরোল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন'। এই যে পরিবর্তনের হাওয়া তাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে, আমরা

---

* *১৮৫৭-অমৃত সঞ্চয়। মহাশ্বেতা দেবী। পৃঃ ১৪৪-১১৫।*

** *৩৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন।*

একটি মানসিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গটিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর 'বঙ্কিম যুগ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :

"এক বিশেষ ধরনের সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ আমাদের প্ররোচিত করতে চায় এই সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপনে যে, সিপাহি বিদ্রোহের সময় বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ তোষণে মেতে বিরুদ্ধাচারণ করেছে এই বিদ্রোহের বা মহাবিদ্রোহের। এই যুক্তি আংশিক সত্য হতে পারে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। প্রকাশ্যে যে ঘটনাই ঘটুক, সিপাহি বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ বর্বরতাকে বাহবা ধ্বনিতে বরণ করে নেওয়ার যত বৃত্তান্তই শোনানো হোক-না কেন, কলকাতার দেশীয় অধিবাসীদের উপর সরকারি জুলুমকে নখে দাঁতে হিংস্রতর করে লেলিয়ে দিতে বেসরকারি ইংরেজ আর খ্রিস্টান আর ফিরিঙ্গি সমাজের তৎপরতা যে পরিমাণে অমানবিক ও অমানুষিক হয়ে উঠতে চেয়েছিল তখন, আর তার পরিণামে বাঙালি সমাজকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে ধরনের আত্মমর্যাদাহীন অপমান ও লাঞ্ছনার, আর সে বেদনা এবং বিক্ষোভ তখনই দানা বেঁধে উঠতে না পারার নিষ্ক্রিয়তাও যতখানি নিন্দনীয় হয়ে উঠুক, এইসব সত্যির সমান্তরালে রয়ে গেছে বা গিয়েছিল আরও বড় মাপের সত্যি, তা হল, সেই ভয়ঙ্কর প্রতিশোধপরায়ন মুহূর্তেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রগতিশীল অংশ সজাগ হয়ে উঠতে চেয়েছে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, এবং আত্ম-ঘোষণার উপযুক্ত ভাষার আবিষ্কারে। নিজেদের অন্তর্গত বেদনা-বিক্ষোভকে কোনো-না-কোনো ভাবে বিচ্ছুরিত করে দেওয়ার তাড়না এবং প্রেরণার শুরু সিপাহি বিদ্রোহের অগ্নিপর্বেই। এমন-কি ব্যক্তি হিসেবে নয়, ব্যক্তিনামকে গোপন রেখেই, সামাজিক মানুষ হিসেবে লেখকরা বেছে নিয়েছেন নিজেদের আত্মপ্রকাশের চোরাপথ। একটু নজর ছড়ালেই আমাদের চোখে পড়বে, সিপাহি বিদ্রোহের পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৮ থেকে বাংলা সাহিত্যে নানা বিষয়ে ঘটে যাবে বই বেরুনোর যে অকল্পনীয় জোয়ার সেখানে শতকরা ৯০ জন লেখকই নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন ছদ্মনাম। আমি কে সেটা বড় নয়, আমি কী বলতে চাইছি সেটাই বড়, এই রকমই উদার এবং দায়িত্ববান হয়ে উঠেছে সেই সময়ের লেখকদের সামাজিক ভূমিকা।"*

"...লর্ড ডালহাউসির আমলে এবং তাহার পূর্ব হইতেই উত্তর ভারতে এক বাঙালি জাতি ব্যতীত আর কোন জাতি ইংরাজি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে নাই। ফলে, কি পঞ্জাবে, কি পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, কি মধ্যপ্রদেশে, কি অযোধ্যায় ইংরাজ শাসন সম্প্রসারণ বিষয়ে ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালিই ইংরাজের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ছিল। এইসকল বাঙালি বিদেশে অর্থোপার্জনের চেষ্টাতেই গিয়াছিলেন এবং কিসে তাহাদের অর্থোপার্জন পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়, সেপক্ষেও তাহাদের দৃষ্টি তীব্র ছিল। কোম্পানির অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল বাঙালি পঞ্জাবে এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বড় বড় সর্দার এবং মহারাজ ও রাজার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংরাজ অপেক্ষা ইহাদের জ্বালা—এই বালির তাপ অযোধ্যা ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অভিজাতবর্গের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহারা রঙ্গ করিয়া বাঙালিকে "আঙ্গরেজকা গুরু" বলিতেন। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে উত্তেজিত ও উন্মত্ত সিপাহিগণ বাঙালিকে পাইলে তাহাকে নিহত করিতেন না বটে, কিন্তু নাক কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিতেন। ইংরাজ তখনও দেশ চিনেন নাই, দেশের

* *বঙ্কিমযুগ। পৃঃ ৩৩৬।*

অধিবাসীবর্গকেও চিনেন নাই, কাজেই শাসন বিষয়ে শান্তিস্থাপন বিষয়ে এবং দেশাধিকার ব্যাপারে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি এবং নিচ জাতীয় দেশীয় খ্রিস্টান ও ফিরিঙ্গিদিগের উপরেই নির্ভর করিতেন। ..."*

উন্মত্ত সিপাহিসকল মীরটে যে কেবল শ্বেতাঙ্গদিগের উপর উপদ্রব করিয়াছিল তাহা নহে। সামরিক বিভাগের কমিশেরিয়টের বাঙালি বাবুদিগের উপর তাহারা অত্যধিক মাত্রায় উৎপীড়ন করিয়াছিল। সিপাহিরা বাবুর কান কাটিয়া দিয়াছিল। কাহারও নাসিকাচ্ছেদন করিযাছিল এবং সকলেরই সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। "ইংরেজের গুরু" বলিয়া বাঙালিদিগকে এই নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেকে বাঙালি সন্ন্যাসী সাজিয়া প্রাণরক্ষা করেন, অনেকে মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে মড়া সাজিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন। বাঙালি মহিলাদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না; তাহাদের দুর্গতির কথা বুঝিবা ইতিহাসে লিখিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। আশ্চর্যের বিষয় পশ্চিমোত্তর সকল স্থানে বাঙালি ইংরাজের সহিত সমভাবে নিপীড়িত হইলেও কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকই একথা একবার ভুলিয়াও লেখেন নাই—সমবেদনা তো দূরের কথা।"*

বদলে গেল সাহিত্যের আঙিনা। বাঙালির চিন্তাভাবনার দ্রুত রদবদল ঘটতে থাকে। উন্মেষ ঘটল নতুন শক্তির। জাতীয় জীবনে নতুন আশা আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটল। একথা স্পষ্ট অক্ষরে লিখে গেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী।

সিপাহি অভ্যুত্থানে বাঙালির ভূমিকা নিয়ে গোপাল হালদার সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই দীর্ঘ আলোচনার কিছু অংশের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"বাঙালি সমাজে ও বাঙলা সাহিত্যে কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব সমসাময়িককালে দেখা যায়নি। অথচ খ্রিঃ ১৮৫৮ থেকেই বাংলা দেশে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হতে থাকে—বাংলা সাহিত্যেও তা ধ্বনিত হল ঈশ্বর গুপ্তের (খ্রিঃ ১৮১২ খ্রিঃ ১৮৫৯) কবিতায়, আর শেষে দীনবন্ধু মিত্রের (খ্রিঃ ১৮৩০—খ্রিঃ ১৮৭৩) যুগান্তকারী নাটক 'নীলদর্পণে' (খ্রিঃ ১৮৬০)। সিপাহি বিদ্রোহের দমন-পর্ব দেখেও বাঙালি সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখুজ্জে বা বাঙালি সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে নিস্তব্ধ হয়ে যায়নি। বরং বাংলার শিক্ষিত ও বিত্তবান শ্রেণি বাঙালিকৃষক শ্রেণির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সেই দেশব্যাপী বিভীষিকার মধ্যেও দুর্দমনীয় প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলেন—নিশ্চয়ই এ সত্যটা তাঁদের সাহস, ন্যায়বোধ ও স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল প্রমাণ। নীলচাষীর এই প্রতিরোধ বা বিদ্রোহকে বাঙালি সাহিত্যিকরা সতেজে সম্বর্ধিত করেন। অথচ তার সমসাময়িক সিপাহি বিদ্রোহ তাঁদের মনে কোন রেখাপাত করেছিল তার প্রমাণ নেই। পরবর্তী সময়েও সিপাহি বিদ্রোহ তাঁদের মনে অনুভূতির সঞ্চার করেছে—রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী থেকে তা মনে হয় না। এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দীপ্তোজ্জ্বল বাংলা সাহিত্যের অজস্র সম্পদের মধ্যেও সিপাহি বিদ্রোহের উল্লেখ বা প্রত্যক্ষ (direct) প্রভাবের প্রমাণ দুর্লভ।"

* *সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ : ১৫০
* *সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস*, পৃ : ২০২

বাংলা সাহিত্যে সিপাহি অভ্যুত্থান বিষয়ে শিক্ষিত শ্রেণির বিস্ময়কর নীরবতা ও ঔদাসীন্যের কারণ বিশ্লেষণ করে, শ্রীহালদার বলেছেন :

"(১) সিপাহি বিদ্রোহ একটা বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল—দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতকে তা স্পর্শ করতেও পারেনি। বাংলা দেশেও সিপাহি বিদ্রোহ যে রূপ নিয়ে দেখা দেয়, উত্তর ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ তা থেকে এক স্বতন্ত্র রূপ ও পরিণতি লাভ করে। সে অঞ্চলের বিদ্রোহ (ক) স্থানীয় সুপ্রতিষ্ঠিত সামন্ততন্ত্রকে আশ্রয় করতে পারে; (খ) সেখানে কোন শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব না হওয়ায় সামন্ত নেতারা ও সিপাহিরাই জন-বিক্ষোভের নেতৃত্ব লাভ করে। ফলে সিপাহি বিদ্রোহ (গ) উত্তর ভারতে ব্যাপক ও জনবিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে। বাংলায় এরূপ কোন সুযোগ সিপাহিরা গ্রহণ করতে পারেনি—(ক) বাংলার পুরাতন সামন্ত শ্রেণি, খ্রিঃ ১৭৯৩ থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়; নূতন জমিদার শ্রেণি ব্রিটিশরাজের সৃষ্টি; নূতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিও সরকারি চাকরি ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ের সঙ্গে জীবিকাসূত্রে জড়িত। দু-দলই শ্রেণিগত কারণে বিদ্রোহের বিরোধী হবার কথা। (খ) সিপাহিরা পশ্চিমা সিপাহি হিসাবে বাঙালি জনসমাজেব থেকে বিচ্ছিন্ন; উচ্চবর্ণের গোঁড়ামিতেও জনতার প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ থাকবার কথা। (গ) বিদ্রোহ এখানে তাই পশ্চিমা সিপাহির খণ্ড-খণ্ড অভ্যুত্থানই থেকে যায়।

(২) উত্তব প্রদেশের বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে বাঙালি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ সিপাহি বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করেছিল তাতে সে বিদ্রোহে তাদের উৎসাহ বা শ্রদ্ধা বোধ কবা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা ইংরেজি শিক্ষায় ও খ্রিস্টধর্মের বিষয়ে সন্দেহ ও বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার আন্দোলনের প্রসারেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহিরা ক্ষিপ্ত হয়েছে এরূপই ছিল হরিশ মুখুজ্জে—রাজনারায়ণ বসু, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পুরুষদের ধারণা। অবশ্য ধারণা কতকাংশে পুষ্ট হয়েছিল অতিরঞ্জিত লোকাতঙ্কে (panic), কতকাংশে সিপাহিদের উৎকট গোঁড়ামিতে, এবং বহুলাংশে রাজশক্তির প্রচারে, ঘোষণায়।...

শ্রীহালদার পরবর্তী বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে উত্তর ভারতের তুলনায় বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি ছিল স্বতন্ত্র। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বাঙালি বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। সামন্ততন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। উচ্চবিত্তের একাংশ আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সম্মিলিত রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হচ্ছে। চেতনার বিকাশেও তারা বলিষ্ঠ ও সচেতন। বিপদের ভয়ে বাঙালি সিপাহি বিদ্রোহ থেকে দূরে সরে ছিল আর ভয় নেই বলে নীল বিদ্রোহে এগিয়ে গিয়েছিল—একথা মেনে নেওয়া যায় না। শ্রীহালদারের সিদ্ধান্ত হল বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনায় সিপাহি বিদ্রোহ কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

"বুর্জোয়া সভ্যতা বা যুগধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশে তারা সত্যই তখনো সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতিনিধি ইংরেজ ও ইংরেজি শাসনের প্রতিও শ্রদ্ধান্বিত আর আরও ১৫/২০ বৎসর (রবীন্দ্রনাথের বালককাল ও লিটনের দমন পর্ব) না যেতে তাদের মোহভঙ্গ শুরু হয়নি। ইং. ১৮৫৭-৫৮তে সামন্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখে তারা সিপাহি বিদ্রোহের প্রতি উদাসীন ছিলেন—অথচ স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচতে চান মোটেই এমন নয়।

বরং বুঝতে পেরেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই সিপাহি বিদ্রোহের নিষ্ফলতায় তারা ব্যাহত বোধ না করে নীল-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৮৫৮এ ঘোষণা করলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।' আর বিদ্রোহ শেষ হতে না হতে সাহিত্যে আরম্ভ হল সৃষ্টির মহোৎসব।"*

সিপাহি বিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের কোনরকম সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু ইতিহাস বোধের অভাব ছিল না তাদের মধ্যে। এমনকি দেশপ্রেমের ঘাটতিও ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহ শেষ হতে না হতেই বাংলায় যে নীলকর বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়, তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায় বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। অথচ সিপাহি বিদ্রোহে তাদের সমর্থন তেমন ব্যক্ত হয়নি।

> এ বিষয়ে বিনয় ঘোষের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি : 'সিপাহি বিদ্রোহে'র সময় দেখা যায়, বাঙালি পরিচালিত বাংলা ও ইংরেজি সাময়িক পত্রে—সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকায়—বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। অধিকাংশ রচনায় বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক রূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ বিদ্রোহটা যে মূলত ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উদ্ধারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, একথা বিশেষ জোর দিয়ে বাংলা পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। অবশ্য বাংলা পত্রিকা এবং বাঙালি-পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকাগুলিও তখন হিন্দুদেরই ছিল। কিন্তু শুধু সেই কারণে তাঁরা যে বিদ্রোহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ আবিষ্কার করেছিলেন, তা বলা যায় না, তাছাড়া ভারতের হিন্দু সামন্তরাও অনেকে যে বিদ্রোহে যোগদান করেছিল, তাও তাদের অজানা ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেন 'সিপাহি বিদ্রোহ'কে ভারতে মুসলমান রাজ্য পুনরুদ্ধারের একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি, সেটাও চিন্তার বিষয়। তার চেয়েও লক্ষ্যণীয় হল, নতুন ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে পূর্বের মুসলমান রাজত্বের তুলনা করে প্রায় সকলে বলেছেন যে সেকালের মুসলমান শাসনে প্রত্যাবর্তন আধুনিক যুগ থেকে অতীতে ফিরে যাওয়ার মতোই কোন মতেই কাম্য নয়। ... বিদ্রোহের এই স্বরূপ বিশ্লেষণ থেকে প্রথমে এই কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে বিদ্রোহের 'জাতীয় রূপে'র বদলে সাম্প্রদায়িক রূপ'ই শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় কথা, অতীতের মুসলমান শাসিত সামন্ত যুগকে শিক্ষিত হিন্দুরা ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতি বলে মনে করতেন। কোন কারণেই, এমনকি ইংরেজ বর্জনের বিনিময়েও, ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌গতি নব্যশিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের কাম্য ছিল না। তাঁরা অগ্রগতির সমর্থক ছিলেন, তাই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন এবং তাকে 'জাতীয় বিদ্রোহ' অথবা 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে ভাবতে পারেননি।
>
> "সিপাহি বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া শুধু যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল তা নয়, ব্রিটিশ আমলের নতুন জমিদার শ্রেণিও রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন।...এই নতুন জমিদার শ্রেণির স্বার্থ এবং নতুন মধ্যবিত্তের স্বার্থ এক ছিল না। নতুন জমিদাররা নতুন মধ্যবিত্তদের জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তার আদৌ সুনজরে দেখতেন না...। কাজেই শ্রেণি স্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করলেও নতুন জমিদার

* *পরিচয় ১৩৬৩ চৈত্র।*

শ্রেণি ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির 'সিপাহি-বিদ্রোহ'—বিরোধিতারও কারণ যে ভিন্ন ছিল, সে কথা মনে রাখা দরকার। উপরের নতুন জমিদার ও মধ্যের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ভিন্ন দৃষ্টিতে বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও, বিদ্রোহকালে ইংরেজ শাসকদের নির্মম অমানুষিক অত্যাচার যে দেশের জনসাধারণের মনে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ইংরেজবিরোধী জাতীয় বিদ্রোহের ভাব সঞ্চারিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের এই মনোভাবই পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এবং বাংলাদেশে 'নীল বিদ্রোহ' থেকে তার সূচনা হয়।"*

বর্তমান সংকলনের প্রথমেই আছে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬০-১৯২৩) 'সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস' (১ম খণ্ড-১৯০৯-১০)। যতদূর জানা যায় আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। সিপাহি অভ্যুত্থানের অনেক পরে প্রথম খণ্ড ১৩১৬ সালে প্রকাশ করে হিতবাদী পত্রিকা গোষ্ঠী। এই বইটি তথ্যনির্ভর ও সত্যনিষ্ঠ করার জন্য পাঁচকড়ি সেকালের প্রাপ্য যাবতীয় বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। পাঁচকড়ির এই উদ্যোগকে ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখেনি। যে কারণে বইটি প্রকাশের পরই বাজেয়াপ্ত করা হয়। বইটিতে একটি সুদীর্ঘ মূল্যবান মুখবন্ধ আছে। অধুনা গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জীর্ণ এক খণ্ড বই আছে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে রজনীকান্ত গুপ্তের (১৮৪৯-১৯০০) 'সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস' (৫ খণ্ড) এবং ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪২-১৯৪৬) 'সিপাহি বিদ্রোহ বা মিউটিনি' (১৯০৫) প্রকাশিত হয়েছিল। রজনীকান্তের গ্রন্থের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনি আলোচিত বিষয়বস্তুও ব্যাপক। ভুবনচন্দ্রর বইটিও খুব ছোট নয়—প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩৪।

দেশপ্রেমিক রজনীকান্ত পাঁচ খণ্ডে অভ্যুত্থানের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তা লিখেছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ভাবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। আর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে, রজনীকান্ত তখন বেঁচে নেই। ৫ম খণ্ডের ভূমিকায় রজনীকান্ত লিখেছিলেন :

> "...আমি কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল হইল এই ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রের বহুবিধ আবর্তনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নানা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক সংকল্প সাধনে পুনর্বার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আশানুরূপ উপকরণের অভাবে আমার সংকল্প সিদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থলে উহার বিনিয়োগ দেশকালের অনিবার্য গতিও আমার প্রতিকূল হইয়াছে। আমি এই প্রতিকূলতার নিরোধে সমর্থ হই নাই।
>
> মহামতি কে. সাহেব প্রভৃতির ইতিহাস উপস্থিত গ্রন্থের অবলম্বন স্বরূপ। ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগ কালে আমিও সেইরূপ

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ পৃঃ ২৯৩-৯৪।

আমাদের জাতীয়ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমি জানি যে এ-বিষয়ে আমার প্রয়াস সর্বাংশে সফল হয় নাই। বিপত্তিময় পিচ্ছিল পথে আমাকে অনেক স্থলে স্খলিতপদ হইতে হইয়াছে।

* সিপাহি অভ্যুত্থানের প্রাক্-মুহূর্তে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা আছে *প্রথম খণ্ডে*। তাছাড়া আছে সিপাহিদের অসন্তোষের কারণ বর্ণনা।

* *দ্বিতীয় খণ্ডে* যুদ্ধের প্রারম্ভ, রাইফেল ও টোটার প্রতিক্রিয়া সহ বিভিন্ন স্থানে অভ্যুত্থানের সূচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহারে লেখকের মন্তব্য :

"যদি সিপাহিরা একদিনে ভারতবর্ষের সর্বত্র ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ প্রায় সমস্ত ইংরেজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। এরূপ অবস্থায় ভারতে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন অবশ্য ইংরেজের দুঃসাধ্য হইত। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করিলে আরও একটি বিষয় জানিতে পারা যায়। উত্তেজিত সিপাহিরা ইংরেজদিগের সহিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে যুদ্ধ করে নাই। কোন কোন যুদ্ধে তাহারা অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছে, সাহস ও বীরত্বের যথোচিত পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু তাহারা দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হয় নাই। তাহাবা নানা কারণে ইংরেজদিগের বিদ্বেষী হইয়াছিল। ঘোরতর বিদ্বেষ বুদ্ধিতে পরিচালিত হইলেও তাহারা সামরিক রীতিতে—একীভূত মন্ত্রণার ইংরেজ-শাসন পর্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহাদের সুশিক্ষিত যোদ্ধা ছিল, সুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তথাপি তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সামরিক রীতির অনুসরণ করে নাই। তাহারা এখানে ওখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে....কিন্তু একটি মহাদলে পরিণত হইয়া একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয় নাই।

.... যদি তাহারা ঐরূপ নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য ইংরেজদিগেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা একদিন সকল স্থানে যুদ্ধে উদ্যত হউক আর না হউক, আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বোধহয় অসমর্থ হইত না।"

* সিপাহি অভ্যুত্থানের *তৃতীয় খণ্ডে* কলকাতা, পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দিল্লি পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে গোর্খা সৈন্যদের সহায়তার উল্লেখ করে রজনীকান্ত লিখেছেন .

"এতদ্দেশীয়দিগের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ইংরেজ প্রথমে এ দেশে আপনাদের আধিপত্য-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন...এ সময়ে যখন সিপাহিরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, তখনও এতদ্দেশীয়েরা ইংবেজের সহায়তা করিতে বিমুখ হয় নাই; এতদ্দেশীয়রা এ সঙ্কট সময়ে আপনাদের স্বজাতির স্বদেশের ও স্বধর্মের লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিয়া, ইংরেজের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দেয়। প্রধানত ইহাদের সহায়তা বলে ইংরেজ এই ভীষণ বিপ্লব হইতে মুক্তিলাভ করেন;"

* *চতুর্থ খণ্ডে* পাঞ্জাব, দিল্লি, পেশোয়ার ও কলকাতার বিবরণ। বাঙালিদের রাজভক্তির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন রজনীকান্ত।

* সুবৃহৎ *পঞ্চম খণ্ড* প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে।

এরপর প্রকাশিত হয় ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "সিপাহি বিদ্রোহ বা মিউটিনি"। প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশক্রমেই অভ্যুত্থানের এই ইতিহাস লিখেছিলেন

ভুবনচন্দ্র। প্রকাশকের দৃষ্টিকোণে অগ্রসর হয়েও ভুবনচন্দ্র নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশে দ্বিধাবোধ করেননি। সিপাহিদের এই অভ্যুত্থানের পিছনে তিনটি কারণকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। সেগুলি হল :

১. লর্ড ডালহাউসির পররাজ্য গ্রাসনীতি।

২. সেনা বিভাগ থেকে সুযোগ্য অফিসারদের সরিয়ে নিয়ে অন্য কাজে নিয়োগ; এবং

৩. গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো টোটা।

দমদম ক্যান্টনমেন্ট-এর ঘটনা দিয়ে গ্রন্থ শুরু। তারপর বারাকপুর ও বহরমপুর হয়ে উত্তর ভারতের বিস্তৃত বিবরণ। ইংরেজদের বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে ভুবনচন্দ্র লিখেছেন :

> "কয়েকটি ইংরাজ বিবির প্রাণ বিনাশে ইংরেজের রক্ত গরম হইয়াছিল, বৈর নির্যাতনে উন্মত্ত প্রায় হইয়া তাহারা রক্ত প্লাবন উপস্থিত করিয়া ছিলেন, সাফাই দিবার জন্য তাহারা তৎকালে বলিয়াছিলেন, ধর্মানুসারে সুবিচারে প্রতিফল দেওয়া হইয়াছিল। যাহাদের শরীরে মানব শোণিত প্রবাহিত, যথার্থ মনুষ্যত্বে যাহাদের ভূষণ তাহারা ঘৃণাপূর্বক এরূপ উক্তি অগ্রাহ্য করিবেন।
>
> *   *   *   *
>
> "অসভ্য বর্বর বিদ্রোহী সিপাহিরাই ি-পুপ্রায় হইয়া ইউরোপীয় নরনারী হত্যা করিয়াছিল। ইংরাজেরা ক্ষমাগুণে স্থির হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন, স্থল বিশেষে অপরাধীগণকে সাজা দিয়াছিলেন, আর কিছুই করেন নাই। এ বিষয়ের প্রতিভূ কে হইবেন? বিদ্রোহের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, মধ্য অবসরে প্রতিফল দিবার সঙ্কল্পে অনেক ইংরেজ পুরুষ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। নগরে-উপনগরে, জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ভীষণ-ভীষণ-অতিভীষণ মহামারী সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। দেশীয় লোকদিগকে—স্ত্রীপুরুষ সকলকেই (আবালবৃদ্ধবণিতাগণকে) প্রতিফল দিবার ব্যাপদেশে নির্দয়রূপে খুন করা হইয়াছিল, নিষ্ঠুর লোকের নিষ্ঠুর আদেশে নিরীহ লোকদিগের গৃহে গৃহে অগ্নি লাগাইয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রুগ্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলিকে পর্যন্ত জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করা হইয়াছিল! দয়াময় ভগবানের রাজ্যে ইহারই নাম কি বৈর নির্যাতন? ইংরাজের ইতিহাসেই প্রকাশ, ক্রমাগত তিন মাসকাল প্রতিদিন আট আটখানা গরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া বাজারে বাজারে ও রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করাইয়া ভাগাড়ে ভাগাড়ে ও নদীতে নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল!"

ভুবনচন্দ্র ছিলেন সে সময়ের জনপ্রিয় লেখক। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সম্পাদক ভুবনচন্দ্র সোমপ্রকাশ, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা বইও সংখ্যায় কম ছিল না। সিপাহি অভ্যুত্থানের বিবরণে ভুবনচন্দ্র নিজের মনের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা কোথাও কোথাও প্রকাশ করে ফেলেছেন, যদিও প্রকাশকের নির্দেশে এই বই তিনি লেখেন। ভুবনচন্দ্রের বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন বসুমতী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯)। সেকালের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিসাবে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সুপরিচিত। তাঁর লেখা ভূমিকাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল, যা সমকালীন বাঙালির ধ্যানধারণার প্রতি ইঙ্গিত করে। উপেন্দ্রনাথের লেখায় আছে :

> "অর্ধশতাব্দ পূর্বে ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্নমেন্টের সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া সমগ্র

ভারতে মহান অনর্থ ঘটাইয়াছিল। সাধারণ যুদ্ধের ফল যেরূপ হইয়া থাকে, সিপাহি বিদ্রোহের যুদ্ধেও সেইরূপ শোচনীয় ফল ফলিয়াছিল, একথা বলাবাহুল্য। সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ, শান্তি রাজ্য বিপদাপন্ন, সর্বত্রই অশান্তির প্রাদুর্ভাব, এই পুস্তকে বিশদরূপে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্মরণাতীত কালাবধি জগৎসংসারে যুদ্ধের বিদ্যমানতা আছে। রাজায় রাজায় অথবা সমানে সমানে যুদ্ধ এক প্রকার, প্রজারা বা চাকরেরা বিদ্রোহী হইয়া রাজা অথবা প্রভুগণের সহিত যে যুদ্ধের অবতারণা করে তাহার প্রকৃতি অন্য প্রকার। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ শেষোক্ত প্রকারেব দৃষ্টান্ত। এইরূপ যুদ্ধেই অধিক অনর্থ। সিপাহি বিদ্রোহে তাহার পবিচয হইয়াছে।

সিপাহি বিদ্রোহ যে প্রকার ভীষণতা, তাহা অভূতপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন ভযঙ্কর ঘটনার দৃষ্টান্ত কোথাও নাই।

কিরূপ ঘটনায় এই বিদ্রোহের সূত্রপাত তদ্বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণে অনেক প্রকার তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। সংক্ষেপে সেই তত্ত্বের মূল এই স্থলে আলোচ্য। লর্ড ডালহাউসি বাহাদুর তাহার স্বদেশীয় বন্ধু-বান্ধবগণের মুখে সর্বপ্রধান গবর্নর জেনরেল পদবিতে গৌরবান্বিত। বাস্তবিক ভারতে তাহার গৌরবের অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু পররাজ্য গ্রাস কবিতে তাহার অতুলনীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল। এতদ্দেশীয় কতিপয় রাজার রাজত্ব ইংরাজাধিকার ভুক্ত করাতে তাহার প্রতি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের শ্রদ্ধা টলিয়াছিল। বিশেষত, ভাবতের শাসন-শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্বাবস্থায় নবাব ওয়াজিদ আলীকে বন্দি করিয়া অযোধ্যারাজ্য অধিকাব করাতে তাহার প্রতি এদেশের বিস্তর মুসলমান বীতরাগ হয়, বিস্তর মুসলমানেব প্রাণে আঘাত লাগে, সেই একটি মূল সূত্র; তাহার পর গো-চর্বি ও শূকর চর্বি মিশ্রিত টোটা কাটার জনরবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। হিন্দু-মুসলমানের চিরবিদ্বেষ কিন্তু এই উভয় শ্রেণী একমতাবলম্বী হইয়া ভারতের শ্বেত-পুরুষগণেব বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কবিয়াছিল, তাহাই অধিক বিপত্তির কারণ। তদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণের উল্লেখ আছে,—ইংবেজরা এদেশের হিন্দু-মুসলমান জনগণকে বলপূর্বক খ্রিস্টান করিয়া তাহাদের জাতিধমনাশ করিবেন, এইরূপ এক অমূলক জনরবে অবোধ লোকদিগেব চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল, অনেক জনরব অমূলক, তথাপি কুচক্রকারী লোকদিগের নানারূপ উত্তেজনায় অনেক আশুপ্রত্যয়ী অশিক্ষিত সিপাহি ভ্রান্তিবশে রাজবিদ্রোহে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমাগত সার্দ্ধৈকবর্ষব্যপী সংগ্রামে বহু প্রাণীক্ষয়ের পর জগদীশ্বর প্রসাদে লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের ধৈর্যগুণে এবং ইংরাজ বীরপুরুষগণের বিক্রমে সেই মহাবিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে। এই বিদ্রোহেব সময় সেই লৌহহৃদয় লৌহহস্ত লর্ড ডালহাউসি বাহাদুর যদি সমরক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ স্থল। ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলনের যেসব সবল ইন্ধন তিনি সাজাইয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল শুষ্ক কাষ্ঠে প্রচণ্ড অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, দোষী নির্দোষী সহস্র সহস্র প্রাণীর প্রাণ সেই হুতাশনে আহুতি হইয়াছিল, পরিশেষে শান্তিপ্রিয় ধৈর্যশীল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর সেই জ্বলন্ত অনলে শান্তি সলিল বর্ষণ করিয়া ভারতমাতাকে শান্তিজলে স্নান করাইয়াছিলেন। ধর্ম তাহার হৃদয়ে এতদূর বলীয়ান হইয়াছিল যে, অতবড় মহাসঙ্কট সময়েও একদিনের জন্যও তিনি কলিকাতার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্বক কুত্রাপি গমন করেন নাই। কলিকাতায়

বসিয়াই তিনি সকলকে অভয়দান করিয়াছিলেন, সর্বস্থানের সংবাদ রাখিয়া ছিলেন, সুবিবেচনাপূর্বক সৈনিক ও সিবিলিয়ান পুরুষগণকে যথাযথ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আশু প্রতিকারের সমস্ত উপায় স্থির করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বরীর ঘোষণাপত্রে তাহার গুণের পুরস্কারের সবিশেষ উল্লেখ আছে।"

বক্তব্যের কোথাও বিদ্রোহী ভারতীয়গণের প্রতি সহানুভূতিক একটি শব্দেরও উল্লেখ নেই। ইংরেজের গুণগান করাই ছিল, এক শ্রেণির বাঙালির লক্ষ্য। উপেন্দ্রনাথ তার বাইরে যেতে পারেননি।

বর্তমান সংকলনে যদুনাথ সর্বাধিকারীর "তীর্থভ্রমণ" গ্রন্থ থেকে সিপাহি অভ্যুত্থানের বিবরণ অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। যদুনাথের জন্ম ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে; বাংলা ১২১২ সালে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ১২৬০ সালে তীর্থ ভ্রমণে যান এবং ১২৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন তীর্থে পর্যটন করেন। এই সময়ের মধ্যেই সিপাহি অভ্যুত্থানে সারা ভারত কেঁপে ওঠে। যদুনাথ নিজে যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছিলেন রোজনামচার আকারে। ইংরেজ তোষণের কোন অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু ১৩২২ সালে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে রোজনামচাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অনেক অংশ বাদ দিয়ে ছাপার সময় বইটি উৎসর্গ করা হয় লর্ড কারমাইকেলকে।

সংকলনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কালীপ্রসন্ন সিংহর রচনাংশ এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এঁরা ছিলেন বাংলার সুপরিচিত নক্ষত্র বিশেষ। কিন্তু তাঁদের রচনার মধ্যে কোথাও নেই সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতিসূচক মন্তব্য। সে সময়ের আর একজন বিশিষ্ট বাঙালি দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। কার্যত তিনি নীরব হলেও, 'সুরধুনীকাব্যে'র মধ্যে আছে :

"ফতেগড় ছাড়িগঙ্গা পায় কানপুর,
যথায় দুরন্ত নানা নির্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরাজকুল কত বল ধবে,
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতি রাম সহ কচি ছেলে,
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।
সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল,
সময় বুঝিয়ে নানা বনে পলাইল।।

—অথচ, এই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ইংরেজ নীলকরদের অমানুষিক নির্যাতনের যে চিত্র ধরা পড়ে, তা সেকালের ইংরেজ শাসকদের হৃদকম্প ধরিয়ে দেয়। বইটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য রেভারেন্ড লঙ দণ্ডিত হয়েছিলেন।

"১৮৫৭ ও বাঙলার বুদ্ধিজীবী" নিবন্ধে নরহরি কবিরাজ বলেছেন এই বিদ্রোহ ছিল সব শ্রেণির "সর্বস্তরের নিপীড়িত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ—বিদেশী প্রভুর হৃদয়হীন শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ।" "সিপাহিদের সামনে রেখে, কৃষক, তালুকদার, দেশীয় রাজা, পণ্ডিত, ফকির সব শ্রেণির মানুষরা যোগ দিয়েছিল।"

"তদানীন্তন অবস্থায় সিপাহি ও কৃষকদের চেতনা নিম্নস্তরে থাকায় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবার ঐতিহাসিক স্তরটি তখনও উপস্থিত না হওয়ায়, বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব তদানীন্তন সমাজের প্রভাবশালী অংশ সামন্ত প্রভুদের ওপর পড়ে।"—তাহলেও বিদ্রোহের প্রাণশক্তি ছিল সাধারণ মানুষ।

> "১৮৫৭ সালের মধ্যে ভারতের মাটিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ-বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি উপকরণের জন্ম হলেও, এই সময়ে নতুন বুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত যে বুদ্ধিজীবীদের জন্ম হয়েছিল তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, সমগ্র সমাজের একটি মুষ্টিমেয় অংশ।...
>
> "এই শ্রেণিটিব তখন না ছিল টাকার জোর. না ছিল রাজনৈতিক দর কষাকষি করার সাধ্য।...১৮৫৭ সালের আগে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা চিন্তার অগ্রদূত হলেও তাদের অর্থনৈতিক স্টেটাস মোটেই উন্নত ছিল না। স্বাধীন বুর্জেয়া শ্রেণি বলতে যা বোঝায়, তা তাদের বলা যায় না। এরা হলেন ভবিষ্যৎ কালের স্বাধীন বুর্জোয়া শ্রেণির অগ্রদূত। অর্থনৈতিক স্টেটাসের দিক থেকে দুর্বল রুজিরোজগারের দিক থেকে বিদেশী শাসনের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল এই শ্রেণিটির পক্ষে রাজনীতি-ক্ষেত্রে সবলতা প্রদর্শনের বাস্তব ভিত্তি তখনও রচিত হয় নাই। এইজন্যই এই বুদ্ধিজীবীরা তখনকার অবস্থা বিবেচনা করে তাদের সাধ্যমত সমাজ-সংস্কার, দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচার, এবং নিয়মতন্ত্রের পথে ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটু আধটু আন্দোলন—এই কটিকেই তাদের কর্মসূচী হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারতের 'স্বাধীনতা' ও ভারতের স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীদের উপলব্ধি থাকলেও তাঁরা তখন ভাবতের মাটি থেকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের কথা কল্পনায়ও আনতে পারেন নি।
>
> "অথচ ঠিক এই সময়েই ভারতের জনগণ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ওয়াহবী বিদ্রোহ, ফরাজি বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মোপলা বিদ্রোহ সর্বশেষে ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ তার প্রমাণ। এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবীবা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার ফলে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।
>
> সেইজন্যই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক ট্র্যাজেডির আবির্ভাব হল। জনসাধারণ আন্দোলন করতে থাকলেন। বুদ্ধিজীবীরা থাকলেন তার নীরব দর্শক। আবার বুদ্ধিজীবীরা যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করলেন জনসাধারণ রইল তার থেকে দূরে। ফলে দুই ধারার আন্দোলন মিলতে পারল না।"

—সেই মিলনের জন্য সিপাহি অভ্যুত্থানের পর আরও কিছুকাল, স্বাধীন বুর্জোয়া শ্রেণির আবির্ভাব কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এরাই একদিন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসে। আবার তাদের কাছে পুরোন ইতিহাস, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান মর্যাদা ফিরে পায়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনির পটভূমিতে সৃষ্টি হল বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ' আর 'দেবী চৌধুরাণী'।

বঙ্কিম ঝাঁসির রানিকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে আগ্রহী হলেও তার সাহসে কুলায়নি। কারণ, আনন্দমঠ লেখার জন্য সাহেবরা খুব চটে ছিল, একথা বঙ্কিমই স্বীকার করে গেছেন।

সিপাহি অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের উপন্যাস 'চিত্তবিনোদিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রর উপন্যাস 'নানাসাহেব' প্রকাশিত হয়। নটকুল চূড়ামণি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন "চন্দ্রা" উপন্যাস। পটভূমি সিপাহি অভ্যুত্থান। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'কুসুমমালা' মাসিক পত্রিকায়। পরে বসুমতী কার্যালয়ে গিরিশ গ্রন্থাবলী ভুক্ত হয়। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল চণ্ডীচরণ সেনের "ঝান্সীর রানী" উপন্যাস। সিপাহি অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক কুনওয়ার সিং সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনির পটভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লেখেন উপন্যাস 'অমর সিং'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে।

সিপাহি অভ্যুত্থান বিষয়ে গ্রন্থ সংখ্যা কম নেই। অধিকাংশ আলোচনাই সামরিক দিক নিয়ে। আর বিদ্রোহের কারণও তারা নির্দেশ করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণে। কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. শশীভূষণ চৌধুরী বিদ্রোহের সঙ্গে সে সময়কার বেসামরিক মানুষের সংযোগ কত গভীর ছিল তার চুলচেরা বিচার করেছেন। জমিদার, কৃষক, দিনমজুর, হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণির মানুষই বিদেশী শক্তি অপসারণের জন্য মিলিত হয়েছিল। যার ফলে ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকার সেনা শিবিরগুলি বিপুল জনসমর্থনে ইংরেজ শক্তি উৎখাতে দ্রুত এগিয়ে আসে। তাই বলে এরা দেশপ্রেমিক ছিল না, কেবলই লুঠপাঠ ও হত্যাকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের লড়াই—এ মন্তব্য অসমীচিন। শ্রী চৌধুরী আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেন :

> "সমগ্রভাবে এই সিপাহি যুদ্ধের মহৎ ইতিহাস বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা এর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারব না, যদি না এটা বিবেচনা করা হয় যে, প্রথম দৃষ্টিপাতে এই উত্থানকে সামরিক ও প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ বলে মনে হলেও এই ঘটনা তার চেয়ে অনেক কিছু বেশি। কোনো সন্দেহ নেই, সিপাহিরাই এই হিংসাত্মক উত্থানের অগ্রগামী দল হিসেবে ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা সৈন্যদলের অসামরিক পরিচারকদের ভূমিকায় নেমে আসে এবং সামন্ততান্ত্রিক ভাড়াটে ফৌজেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ভূম্যধিকারী দল নেতাগণ প্রায় শুরু থেকেই শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছিল এবং নিজ নিজ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক অবস্থা অনুযায়ী তাদের কর্মতৎপরতাকে আকার দান করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোথাও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি অথবা সামন্ততান্ত্রিক বাধা নিষেধের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করেনি। পক্ষান্তরে তারা ব্রিটিশ জমি জরিপ ও রাজস্ব ব্যবস্থার সামন্ততন্ত্র বিরোধী প্রবণতাসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারেই অস্পষ্ট স্বদেশপ্রেমের অনুভূতির হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। পৃঃ ২০৩*

এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল বহুকারণে, রাজনৈতিক অপরিপক্কতা, ত্রুটিপূর্ণ সামরিক অধিনায়কত্ব এবং আকর্ষণশূন্য নেতৃত্বের জন্য। অনেক জায়গায় সিপাহিরা যে অমিতাচার করেছিল তার ফলে জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও

* সিপাহি বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৫৭-১৮৫৯)—ড. শশিভূষণ চৌধুরী।

একথা অনস্বীকার্য যে, এই উত্থান শুধুমাত্র বিক্ষুব্ধ লোকদের আন্দোলন ছিল না, কিন্তু এই আন্দোলন চলেছিল জনসাধারণের উত্থানের মধ্য দিয়ে অন্তত, তাদের একটি বৃহৎ অংশের সক্রিয়তায়; তারা যতই অস্পষ্টভাবে হোক একটি সমভোগী আবেগের আলোড়ন অনুভব করেছিল...একটি বিপ্লবের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু অনেক সময়ই জাতির অবচেতন মনে সঞ্চিত থাকে। যে সমস্ত কারণ একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত নিঃশব্দে ক্রিয়াশীল ছিল সেগুলো কখনোই চোখে দেখা যাবে না। কে বলতে পারে যে, বটবৃক্ষের-বীজের মতো জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবের বীজ ১৮৫৭-র উত্থানের মধ্যে নিহিত ছিল না? কেন না, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিছক ব্রিটিশ বিরোধী বস্তু, ছিল না, কিন্তু ছিল স্বাধীনতার জন্যে গভীরে নিহিত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।" পৃষ্ঠা ২০৭*

* সিপাহি বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৫৭-১৮৫৯)—ড. শশিভূষণ চৌধুরী।

[ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ গ্রন্থ : ১৩১৪]

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস

১ম খণ্ড

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩১৬ বঙ্গাব্দ
(১৯০৯-১৯১০)

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং সিপাহিযুদ্ধ ঘটিত অনেক পুরাতন কথা, অনেক অজ্ঞাত বিষয় বিলাতে ও ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল কথা বাঙালি পাঠকগণ জানেন না। আমি তাহাই পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য এই দুষ্কর কার্যে অগ্রসর হইলাম। 'হিতবাদী'র পরিচালকগণের পক্ষ হইতে একখানি সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিবার জন্য বহুদিন হইতে উদযোগ আয়োজন হইতেছিল, আমিও সে পক্ষে একটু চেষ্টা করিয়াছিলাম। আর সেই চেষ্টার ফলেই এই ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।

মুখবন্ধ

যে দিনে প্রথমে বহরমপুরের সেনানিবাসে সিপাহি বিপ্লবের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই দিন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বর্ষের অধিক সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কত ঐতিহাসিক, কত সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও কত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই সিপাহি যুদ্ধের কথা কতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—এখনও মধ্যে মধ্যে সিপাহি যুদ্ধ-বিষয়ক কত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। তথাপি সিপাহি যুদ্ধের প্রথম উন্মেষের সময়ে যে সকল প্রশ্ন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত, এখনও সেই প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এখনও শুনিতে পাই, কেন এমন হইল? কেন সিপাহি ইংরাজের প্রাধান্যে অবজ্ঞা করিয়া, ইংরাজ জাতির ও ইংরাজ প্রচলিত ভারতশাসন পদ্ধতির বিরোধী হইয়াছিল? কেন সিপাহি যুদ্ধের সময়ে বহুপ্রদেশেব গ্রামবাসী কৃষক ও মধ্যবিত্ত উচ্চজাতীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ ইংরাজ কর্মচারী বিশেষের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল? কেন অযোধ্যার বিপ্লববিধ্বস্ত প্রদেশ হইতে অঙ্গদের ন্যায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতুল্য গুপ্তচর ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিল? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর করিতে হইলে, দেশ, কাল ও পাত্র এই তিনের সম্যক্ আলোচনা করিতে হয়;—বুঝিতে হয়, কেন ইংরাজ বাণিজ্যজীবী হইয়াও এ দেশের শাসনকর্তা হইতে পারিয়াছিলেন,—বুঝিতে হয়, অজ্ঞাতকুলশীল ফরাসির অধীনতায় কেন আর্কটের হিন্দু যোদ্ধসমাজ সিপাহি সাজিয়া ইউরোপীয় সমরনীতি শিখিয়াছিল—বুঝিতে হয়, সে শিক্ষার প্রভাব কেন ভোজপুরে ও অযোধ্যায় বিসর্পিত হইয়াছিল,—বুঝিতে হয়, ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল হইতে লর্ড ডালহাউসির শাসনকাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে ভারতশাসন পদ্ধতি কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়-যুগলের মর্মে কতটা তীব্র আঘাত করিয়াছিল—বুঝিতে হয়, ইংরাজের সহিত আমাদের সম্পর্ক প্রথমে কেমন ছিল, পরেই বা কেমন আকার ধারণ করিল। এত কথা বুঝিলে, তবে বুঝা যাইবে, কেন সিপাহি যুদ্ধ সম্ভবপর হইয়াছিল, আর কেনই বা উহা অচিরে প্রশমিত হইয়াছিল।

ইংরাজ এ দেশে বণিক্‌বেশে আসিয়াছিলেন। বিধাতার প্রেরণায় বাংলার রাজসিংহাসনের নিকটবর্তী হইলেও বণিক থাকিতেই ইংরাজ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজ দিল্লিব বাদশাহের নিকট হইতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানির পরোয়ানা ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি নিজামতীর আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার নাজিম হইবার জন্য কখনও স্বপ্নেও আশা করেন নাই। সেই ইংরাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতের সর্বেশ্বর হইলেন। কোন্ পদ্ধতি অনুসারে এই সর্বৈশ্বর্য রক্ষা করিত তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা ভারতের কোন ইংরাজ বা এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকই পরিস্ফুটরূপে বর্ণনা করেন নাই।

তাই সর্বাগ্রে সিপাহির উদ্ভববৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্রের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে, তবে সিপাহি যুদ্ধের প্রহেলিকার মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারা যাইবে।

সিপাহির ইতিবৃত্ত

অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, মোগলপ্রাধান্য কালে হিন্দি সিপাহি শব্দের তেমন প্রচলন ছিল না। মোগলের শাসন সময়ে পদাতিককে পায়েক বলিত, অশ্বারোহীকে সওয়ার বলিত। ইহা ছাড়া বন্দুকচী, গোলন্দাজ ও তীরন্দাজ সৈনিকও ছিল। পাঠান ও মোগল উভয়েরই শাসনকালে যুদ্ধকার্যে সওয়ার বা অশ্বারোহী সেনার অধিকতর প্রয়োগ হইত। ভদ্র, উচ্চ জাতীয় ধনী মাত্রেই অশ্বারোহী সেনার নিযুক্ত হইতেন। অশ্বারোহী সেনার দলকে রেসালা বলিত। সেনানায়কের ফার্সি নাম সিপাহসালার মোগল সময়েও তত প্রচলিত হয় নাই। তখন পাঁচহাজারি, দশহাজারি মন্সবদারগণই সম্রাটের চমূ সকলের পরিচালনা করিতেন। বরং মোগলের সময়ে লস্কর কথার অধিক প্রচলন ছিল। কথায় কথায় সেকালের লোকে 'লোক লস্করের' কথা কহিতেন। এমন কি মোগল লস্করে পুরুষামুক্রমে চাকরি করাতে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেরই 'লস্কর' উপাধি হইয়াছে।

আমরা অধুনা যে জাতীয় অনুচরবর্গকে দরোয়ান বলিয়া থাকি, মোগলের আমলে সেই জাতীয় অনুচরগণকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া এক শ্রেণিকে হরকরা এবং অপর শ্রেণিকে সিপাহি বলা হইত। সিপাহি শব্দের অধিকতর প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই ছিল। বাদশাহী সামরিক বিভাগে যাহারা পদাতিক কার্য করিত, লোকে তাহাদিগকে 'শাহী লস্কর বা পায়েক' বলিত। আর শ্রেষ্ঠী, মহাজন, ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদারদিগের অধীনতায় যাহারা রক্ষকের কার্য করিত, সাধারণত তাহাদিগকেই লোকে সিপাহি বলিত। ফরাসি ও ইংরাজ ব্যবসায়ীর আড়ৎ বা কারখানার বেতনভোগী রক্ষিগণকেই সিপাহি নাম দেওয়া হইয়াছিল। ইহারাই সর্বপ্রথমে ফরাসি ও ইংরাজ সেনানীর অধীনতায় ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে সমরবিদ্যা শিক্ষা করে। সে শিক্ষার প্রভাবে পরে ইহারাই ভারতে দুর্জয় হইয়া উঠিযাছিল। এখনও ভারতে ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষার পক্ষে ইহারাই প্রধান অবলম্বনস্বরূপ।

অনেকের অনুমান যে, ফরাসি মনীষী দুপ্লে এই সিপাহির প্রথম সৃষ্টিকর্তা:--অর্থাৎ তিনিই প্রথমে ভারতীয় যোদ্ধৃজাতিদিগের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া সেনা সংগ্রহ করিয়া, সেই সেনা সকলকে ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে সমর-কৌশল শিখাইয়া, পরে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বজয়ী হইয়া প্রমাণ কবিযাছিলেন যে, ভারতবাসী ইউরোপীয় সেনানীর অধিনায়কত্বে ভারতক্ষেত্রে অজেয় হইতে পারে। পরন্তু ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, দুপ্লে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই। দুপ্লে ভারতে আসিবার পূর্ব পণ্ডীচেরী প্রদেশে আব একজন মনস্বী ফরাসি শাসন-পরিচালন করিতেন। তাঁহার নাম দুমা (M. Beniot Dumas)। ইনিই সর্বপ্রথমে তেলেঙ্গা সিপাহির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনিই সর্বপ্রথমে প্রাদেশিক মুসলমান সুবেদার ও সামন্ত নবাবদিগকে শিষ্টাচারে তুষ্ট করিয়া পণ্ডীচেরীতে ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে দুর্গ-প্রাকারাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সে দুর্গ প্রাকারাদি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনিই সিপাহির সৃষ্টি করেন। দুপ্লে দুমার সুব্যবস্থার ফলভোগী হইয়াছিলেন মাত্র। তিনি সিপাহিকে যোগ্যতর সামরিক যন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন বটে, সিপাহির সহায়তায় ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, পরন্তু তিনি সিপাহির সৃষ্টিকর্তা নহেন।

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে. সিপাহি স্বয়ংভুব—স্বয়ংসিদ্ধ। সিপাহিকে

কোনো ইউরোপীয় সৃষ্টি করেন নাই; সিপাহি আপনি উদ্ভূত হইয়াছিল। কথা এই আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান নবাবের উৎপাত উপদ্রব প্রজার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পোর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদিগের সময় হইতে ভারতীয় প্রজা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল যে, ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত যোদ্ধৃগণের সহিত সম্মুখ সমরে মোগল পাঠানের লস্কর বহুক্ষণ স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারে না। গবর্নর দুমার পত্রাদি হইতে জানা যায় যে দক্ষিণের তেলেঙ্গাগণ ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে সমরবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপযাচকরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। দুমা স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ফরাসি দেশকে উঠাইয়া আনিলেও সংখ্যার অনুপাতে ভারত জয় করা ফরাসি জাতির পক্ষে সম্ভবপর নহে, —অর্থাৎ কেবল ফরাসি সেনার সাহায্যে ভারতজয় অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, ফরাসি দেশের লোকসংখ্যা সে সময়ে পাঁচ কোটির অধিক ছিল না, ভারতের লোকসংখ্যা তখন পঁচিশ কোটির কম নহে। ফলে সমগ্র ফরাসি জাতি ভারত আক্রমণ করিলেও সংখ্যার অনুপাতে ভারতবাসীর এক পঞ্চমাংশ হইতে পারেন। সামরিক ত্রিরাশির মতে, দুমা বলিয়াছেন, প্রতি পাঁচজনে একজন করিয়া যোদ্ধা থাকিলে প্রকৃত যুদ্ধ হয় না। তাই 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'র হিসাবে—ভারতবাসীর সাহায্যে ভারবাসীকে পরাজিত করিবার আশায়—মনস্বী দুমা তেলেঙ্গা সিপাহিদিগে া প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

গবর্নর দুমা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, ফরাসি সেনানীদিগের পরিচালনাধীন সিপাহি সকলের সাজ পরিচ্ছদ মোগল পায়েকদিগের মতোই থাকিবে, কেবল তাহারা কুচকাওয়াজ ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা করিবে এবং সেনাবিন্যাসের আদেশবাণী সকল ফারাসি ভাষাতেই প্রচলিত থাকিবে। মান্দ্রাজের সেন্ট ঠোমের যুদ্ধ পর্যন্ত দুমার নির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতি ফরাসি সিপাহি দলে প্রবল ছিল, পরে দুপ্লে মহোদয় উহার পরিবর্তন সাধন করেন; ১৭৩৫ খ্রিঃ অব্দে দুমার তত্ত্বাবধানে পণ্ডীচেরীতে প্রথম সিপাহি সেনাদলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

দুপ্লে ও তাঁহার সিপাহি

১৭৪১ খ্রিঃ অব্দে দুপ্লে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তিনি এ দেশে আসিয়াই দুমার অবলম্বিত পন্থা প্রশস্ত বোধে গ্রাহ্য করেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সদ্ভাব রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনিও যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতেন; মধুর ভাষায়, স্তুতিবচন প্রয়োগে, যতদূর সম্ভবপর প্রাচ্য শিষ্টাচারের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, তিনি নবাব সুবাদার প্রভৃতি দেশনায়কগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুদিন অবস্থিতির পর বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের মুসলমান প্রধানগণের নিকট কেবল শিষ্টাচারের প্রভাবে ইষ্টসিদ্ধি হয় না; —শিষ্টাচারের অন্তরালে শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন থাকিলে অনেক অসাধ্য সাধনও সম্ভাব্য হইতে পারে। তাই দুপ্লে পণ্ডীচেরীর সিপাহি সেনাদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কেবল পদাতি সিপাহির দলই বর্ধিত করিলেন না, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সেনার দলও সিপাহির সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। পারাদী (Paradis) নামক একজন ফরাসি বীর ও ইঞ্জিনিয়ার গোলন্দাজ ফরাসি সিপাহি দলের প্রথম ও প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন। পারাদীর শিক্ষাগুণেই ফরাসি সিপাহি দাক্ষিণাত্যে দুর্জেয় হইয়া উঠিয়াছিল।

দুপ্লে এই সিপাহি সেনার সাহায্যেই দাক্ষিণাত্যে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন। তিনিই ইংরাজ জাতিকে এই পথ দেখাইয়া দেন,—তিনিই বুঝাইয়া দেন যে, ভারতবর্ষে কোন কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সাহায্যে একটা ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপন নিতান্ত অঘটন-ঘটনা হইবে না। দেশ, কাল ও পাত্র এ পক্ষেই বড়ই অনুকূল। কিন্তু তিনি মিত্রভাবে এ বিদ্যা ইংরাজকে শিখান নাই—শত্রুভাবেই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে ফরাসি জাতি এবং ইংরাজ জাতির মধ্যে এক বিষম সমর বাধিয়া গেল—ইহাকে বলে The War of Austrian succession বা অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার স্বত্ব লইয়া যুদ্ধ। এই দ্বন্দ্বের ফলে ভারতবর্ষে ফরাসি ও ইংরাজের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। দুপ্লে বুঝিয়াছিলেন যে, ফরাসি ও ইংরাজের মতো ইউরোপের দুইটি প্রবল জাতি ভারতে প্রতিবেশীরূপে থাকিতে পারে না। হয় ফরাসি প্রধান হইবে, না হয় ইংরাজ প্রধান হইবে। তাই তিনি ইউরোপে ফরাসি ও ইংরাজের মধ্যে যুদ্ধোদ্যমের সূচনা দেখিয়াই ভারতে ইংরাজ শক্তিকে চূর্ণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে রীতি ছিল যে, কোনো নবাবের সামন্ত জমিদার বা মহাজন অন্য কোনো সামন্ত বা মহাজনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, সেই নবাবের অনুমতি অপেক্ষা করিতে হইবে। ইংরাজের অধিকৃত মান্দ্রাজ এবং ফরাসির অধিকৃত পণ্ডীচেরী, এই উভয় নগরই কর্ণাটকের নবাবের অধীন ছিল। ফলে ইংরাজ ও ফরাসির কোনো বিষয় লইয়া যুদ্ধ করিতে হইলে কর্ণাটকের নবাবের অনুমতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইত। যদিও ইউরোপে দ্বন্দ্বের ফলে ভারতে ইংরাজ ফরাসির শত্রু হইয়াছিল, তথাপি সে সময়ে শত্রুতা সাধন করিতে ইংরাজের তেমন শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। মান্দ্রাজের ইংরাজ নায়েব মোর্স সাহেব (Mr. Morse) যোগ্য ব্যক্তি হইলেও তাঁহার অধীন অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ সেনা ছিল। পক্ষান্তরে ফরাসি দুপ্লের অধীনে প্রায় এক সহস্র সুশিক্ষিত সিপাহি ছিল। এই সিপাহিগণ যুদ্ধকৌশলে ইউরোপীয়দিগের প্রায় সমকক্ষই হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত দুপ্লের একটা ব্যক্তিগত প্রভাব ছিল। কর্ণাটকের নবাব বাহাদুর দুপ্লের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে, যে অনুমতির অপেক্ষায় ইংরাজ মোর্সকে স্থবিরের ন্যায় মান্দ্রাজে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল, কর্ণাটকের নবাবের নিকট হইতে সেই অনুমতি অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া দুপ্লে মান্দ্রাজ আক্রমণ করিলেন। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজ দুপ্লের করতলগত হইল। ফরাসি সেনানীর দ্বারা শিক্ষিত সিপাহিগণই মান্দ্রাজকে ফরাসি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল।

ইংরাজ মোর্স এবং অন্যান্য ইংরাজ সেনানী এই সময়ে সিপাহিদিগের কার্যপটুতা লক্ষ করিয়াছিলেন। তাহারা দেখিলেন যে, মোগলের লস্করদিগের ন্যায় এ সিপাহির দল নহে, —দেখিলেন যে, আকারে প্রকারে ভারতবাসী হইলেও সিপাহিগণ ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা করিয়াছে। মান্দ্রাজের ইংরাজ ফরাসির তেলেঙ্গা সিপাহি দেখিয়া নিজেদের অধীনতায় তেলেঙ্গা সিপাহি নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

দুপ্লে মান্দ্রাজ অধিকার করিবার সময়ে কর্ণাটকের নবাবকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া নবাবকে উহা অর্পণ করিবেন। কিন্তু মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া দুপ্লে বলিলেন, মান্দ্রাজের সকল গড়, পরিখা, প্রাকার নষ্ট না করিয়া উহা নবাবকে অর্পণ করিতে পারেন না। নবাব দুপ্লের এই ছলবাক্যে বিচলিত হইলেন। দুপ্লেকে শাসন করিবার

উদ্দেশ্যে তাহার পুত্র মহ্‌ফুজ খাঁর অধীনতায় প্রায় দশ সহস্র সেনাসমন্বিত এক বিরাট বাহিনী নবাব মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। মহ্‌ফুজ খাঁ মান্দ্রাজে আসিয়াই নগরের পানীয় জলের স্থান অধিকার করিলেন। পক্ষান্তরে পণ্ডীচেরীর ফরাসি গবর্নর (Despremesnil) দেপ্রেমেনিল চারিশত তেলেঙ্গা সিপাহি এবং দুইটি তোপ দুপ্লের সাহায্যার্থ মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২রা নভেম্বর তারিখে এই দুইটি তোপ ও সিপাহির সাহায্যে দুপ্লে নবাব-পুত্রকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পানীয় জলের সরবরাহ বজায় রাখিলেন। ইউরোপীয় জাতির সহিত এ দেশীয় বা মোগল শাসক-সম্প্রদায়ের ইহাই প্রথম যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধেই সর্বপ্রথমে সিপাহি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলও অপূর্ব; —ফরাসি পক্ষে একটি লোকও হত বা আহত হয় নাই, কিন্তু নবাবের প্রায় ৭০ জন মোগল অশ্বারোহী ধরাশায়ী হইয়াছিল।

যুবক মহ্‌ফুজ খাঁ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না; তাহার সেনাদল পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই দিনই সমাচার পাইলেন, যে, পণ্ডীচেরী হইতে দুইশত ত্রিশ জন ফরাসি সেনা এবং সাত শত সুশিক্ষিত সিপাহি মান্দ্রাজ অভিমুখে আসিতেছে। তিনি এই ক্ষুদ্র সেনাদলকে আক্রমণ করিবার মানসে আদীয়ার নদীর তীরে সেন্ট ঠোমের (St. Thome) নিকট আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। তখনও মহ্‌ফুজ খাঁর অধীনে প্রায় দশসহস্র সেনা বিদ্যমান ছিল। তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা উচ্চভূমি আদীয়ার নদীর অপর পারে বহুদূর পর্যন্ত তাহার তোপের গোলা এই স্থান হইতে পরিচালিত হইতে পারিত। ফরাসি সেনাদলের প্রধান ছিলেন মসিয়ে পারাদী (M. Paradis); ইহার পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। পারাদির ন্যায় বীর, তেজস্বী, নির্ভীক যোদ্ধা সে সময়ে ভারতবর্ষে অতি অল্পই ছিলেন। পারাদির মনীষা প্রভাবেই সিপাহি সেনার সৃষ্টি হইয়াছিল। পারাদী দেখিলেন, মহ্‌ফুজ খাঁর সেনা-অবস্থান অতি দুর্গম ও দুরারোহ স্থানে রহিয়াছে, অথচ এই সময়ে তিনি যদি অতি অল্প মাত্রায় ভয় বা সঙ্কোচের লক্ষণ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য ফরাসির প্রভাব, তথা ইউরোপীয় প্রতাপ, ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইবে। পারাদী তাহার সিপাহিদিগকে চিনিতেন; তাহাদের ক্ষমতা ও বীরত্বের পরিচয় রাখিতেন। তিনি আদীয়ার নদী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিঃসঙ্কোচে কাহাকেও ক্ষণকাল চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া সদলবলে নদীজলে ঝম্পপ্রদান করিলেন এবং মহফুজ খাঁর সেনানিবাসের বামদিকে ঘেঁষিয়া নদীর অপর পারে গিয়া উঠিলেন। তীরে উঠিয়া তিনি ক্ষণকালও চিন্তা করিলেন না, একেবারে সিক্তবস্ত্রে সাত শত সিপাহি লইয়া মহ্‌ফুজ খাঁর বিশাল বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। পারাদীর অধীন দুইশত ত্রিশজন ফরাসি সেনা নদীতীরে মহ্‌ফুজ খাঁর পূর্ব পার্শ্ব আক্রমণ করিল। একসঙ্গে এক সময়ে উভয় দিক হইতে এই ভীষণ আক্রমণের প্রভাবে মহ্‌ফুজের দশসহস্র অশ্বারোহী সেনা যেন প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকার ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া গেল। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সমবেত চেষ্টা ভারতীয় বীরগণের ব্যক্তিগত শৌর্যকে যেন ধূলিমুষ্টির ন্যায় ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া পারাদী মোগল মহিমাকে চূর্ণ করিয়া দিল। তাহার অধীন প্রত্যেক সিপাহি বুঝিল যে, ইউরোপীয় শিক্ষার সম্মুখে মোগলের উন্মাদ-বীরত্ব শুষ্কপত্রের ন্যায় উড়িয়া যাইবে। সেন্ট ঠোমের যুদ্ধে ভারতের সিপাহি নিজের মূল্য বুঝিয়া লইল। সেন্ট ঠোমের যুদ্ধের পর ইংরাজও সিপাহি সেনা রক্ষা করিবার

ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ইংরাজের অধীনতায় তেলেঙ্গা সিপাহি নিযুক্ত হইল।

ক্লাইব যখন বাংলা দেশে, কলিকাতার পুনরুদ্ধার মানসে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত ১২০০ দ্বাদশ শত তেলেঙ্গা সিপাহি ছিল। এই তেলেঙ্গা সিপাহিই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল। ক্লাইব পলাশীবিজয়ী হইবার পর বাংলার গোড়োগোয়াগা, পোদ ও বাগ্‌দীদিগকে লইয়া একটি সিপাহির দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারা তেলেঙ্গা সেনানীর অধীনতায় পরিচালিত হইত। পরে মেজর কার্নাক (Major Carnac), বক্সারের যুদ্ধের পূর্বে ভোজপুরের রাজপুত ও ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া আর তিনটি সিপাহির দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাই বিখ্যাত 'বেঙ্গল সিপয় আর্মি' (Bengal Sepoy Army) বা বাংলা দেশের সিপাহি দলের মূল। ইংরাজ শক্তি যেমন ধীরে ধীরে গঙ্গার উজান বাহিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিসর্পিত হইতে লাগিল, তেমনই ধীরে ধীরে ভোজপুর হইতে ছাপরা, ছাপরা হইতে গাজীপুর ও আজমগড় এবং আজমগড় হইতে অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসিবর্গ সিপাহির দলভুক্ত হইতে লাগিল।

সিপাহির দল

ক্লাইবের অধীন তেলেঙ্গা সিপাহি দলের পোশাক পরিচ্ছদ মোগল সেনার পরিচ্ছেদের অনুরূপ ছিল, এক একটা রেজিমেন্টে হাজার জন করিয়া সিপাহি থাকিত; প্রত্যেক রেজিমেন্টে দশটা ছোট দল ছিল; প্রত্যেক ছোটদলের উপর একজন হাবেলদার, একজন সুবাদার ও একজন জমাদার, এই তিনজন দেশীয় সেনানী নিযুক্ত থাকিতেন। এই সকল দেশীয় সেনানীর উপর তিনজন ইংরাজ কাপ্তেন (Captain) দুইজন মেজর (Major), একজন লেফটেনান্ট কর্নেল (Lieutenant Colonel) এবং একজন কর্নেল (Colonel) নিযুক্ত থাকিতেন। এই কর্নেল বা প্রধান অধিনায়ক (Commanding officer) সিপাহির দৃষ্টিতে সর্বেশ্বররূপে বিরাজ করিতেন। এই কর্নেলের কথাই সিপাহির পক্ষে আইন ছিল; তাঁহার কথায় সিপাহিরা উঠিত বসিত এবং তাঁহার শাসনব্যবস্থা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিত। সাধারণ সিপাহি প্রধান সেনাপতিকে (Commander-in-Chief) চিনিত না, জানিত না; প্রধান সেনাপতি মহাশয়ও কখনো রেজিমেন্টের কর্তার (Commanding officer) কোনো হুকুমের বিরুদ্ধে নিজের হুকুম চালাইতেন না। প্রত্যেক রেজিমেন্টই তখন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। সিপাহি ইংরাজ সেনানীর অধীনতায় ড্রিল (Drill) বা কুচকাওয়াজ শিখিত, প্রত্যহ প্রাতঃকালে চাঁদমারীতে লক্ষ্য স্থির করা (target practice) শিখিত, আর বাকি সময় নগরের হাটে বাজারে ঘুরিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইত। এই ব্যবস্থা ক্লাইব, ওয়ারেন হেস্টিংস্ এবং লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল পর্যন্ত প্রবল ছিল। এ সময়ে সিপাহিদিগের লাভও অত্যধিক ছিল; তাহাবা লুটের অংশ পাইত; আর নূতন দেশ জয় করিতে যাইলে তাহাদিগকে দ্বিগুণ ভাতা দিতে হইত। তাহারা কখনই রন্ধন কাষ্ঠ কিনিত না, গ্রামে ঢুকিয়া বা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের ব্যবহার্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলেই সিপাহিদিগের আমোদের আর পরিসীমা থাকিত না; কেননা, তাহারা জানিত যে, মোগল পরাজিত হইবেই এবং মোগল পায়েক ও লস্করদিগের দেহ হইতে তাহারা নূতন পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইতে পারিবে। সে সময়ে আবার অন্নশস্য খুব

সস্তা ছিল। ফলে, তখন ইংরাজের সিপাহির দলভুক্ত হইতে পারিলে যুদ্ধ ব্যবসায়ী হিন্দু উচ্চ জাতি সকলের কেবল যে আহার আচ্ছাদনের অভাব পূর্ণ হইত, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তাহাদিগের পদমর্যাদা বর্ধিত হইত, আর মোগলের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবদিগের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইত। এই সকল কারণে লর্ড ওয়েলেসলির সময়ের পূর্ব পর্যন্ত ইংরাজের সিপাহি একটা শ্লাঘার পদ ছিল, একটা ভাগ্যের পরিচয় ছিল।

লর্ড মর্নিংটন (Lord Mornnington) বা মার্কোয়েস ওয়েলেস্‌লি (Marquess Wellesley) ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়া ইংরাজের সিপাহির দলে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করিলেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে হইতে বিলাতের সামরিক বিভাগে এইরূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল যে, ইংরাজের অধীন সিপাহিদিগের পরিচ্ছদ ইংরাজ গোরার পরিচ্ছদের অনুরূপ হওয়া উচিত; আর, প্রত্যেক রেজিমেন্টে অধিকসংখ্যক ইংরাজ সেনানীর নিয়োগ সাতিশয় প্রয়োজন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই জল্পনা-কল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় সেনানীদিগকে অর্থাৎ জমাদার, সুবেদার, হাবেলদার প্রভৃতিকে অবনত করিয়া তাঁহাদিগের উপর Ensign, Lieutenent, Captain, Major, Lieutenant-Colonel ও Colonel (এন্‌সাইন, লেফ্‌টেনান্ট, কাপ্তেন মেজর, লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল ও কর্নেল) এই পর্যায় অনুসারে প্রায় কুড়িজন করিয়া ইংরাজ সেনানী নিযুক্ত করিলেন। অবশ্য এই সকল পরিবর্তন অতি ধীরে ধীরে সাধিত হইয়াছিল। ফলে, সিপাহিগণ এই পরিবর্তনের অসুবিধাটুকু সহসা বুঝিতে পারে নাই। বিশেষ, লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে নানাদিকে সমরানল প্রজ্বলিত থাকার এবং ভারতের সিপাহি সর্বত্র মহা আহবে নিযুক্ত থাকায় এই পরিবর্তনপুঞ্জের বিষ-দংশন তাহাদিগের অনুভূতিগম্য হয় নাই।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতের সিপাহি দলে নিযুক্ত হইবার পূর্বে ইংরাজের প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক হিসাবে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া একটা প্রতিশ্রুতি প্রার্থী সিপাহিদিগের নিকট গ্রহণ করা হইত। পক্ষান্তরে ইংরাজও সিপাহিদিগকে বলিতেন যে, সমুদ্রপারে, ম্লেচ্ছদেশে তাহাদিগকে কখনই যুদ্ধার্থ লইয়া যাওয়া হইবে না; যাহাতে তাহাদিগের জাতিধর্ম রক্ষা পায়,সেদিকে গবর্নমেন্টের তীব্র দৃষ্টি থাকিবে। অযোধ্যার সিপাহিদিগকে একটা বৃহত্তর অধিকারে অধিকারী করা হইয়াছিল—তাহারা নবাবী কর্মচারীর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলে সে দরখাস্তের পক্ষ সমর্থন লখনউ-এর ইংরাজ রাজদূত করিতেন। পরে অযোধ্যানিবাসী সকল সিপাহিরই দরখাস্ত ইংরাজ রাজদূতের মারফৎ লখনউ-এর দরবারে প্রেরিত হইত। তাই অযোধ্যা প্রদেশে যে সময়ে প্রচলিত কথা ছিল যে, 'সিপাহিকা উকিল আঙ্গরেজ এলচী অর্থাৎ সিপাহির উকিল ইংরাজ রাজদূত—ইহা বড় কম শ্লাঘার কথা নহে। এই হেতু অযোধ্যার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মাত্রেই ইংরাজ সিপাহির দলে নিযুক্ত হইতে সর্বস্ব পণ করিত। তাহারা ইংরাজের চাকরি পাইলে নূতন পদ্ধতি অনুসারে সমরবিদ্যা শিখিত, পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিত, পিতার পদে পুত্র অধিষ্ঠিত হইত এবং পেন্সন লইলে নবাব সরকারে উচ্চপদ এবং উচ্চ মান লাভ করিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

অনেক ইংরাজই এখন বলিয়া থাকেন এবং আমরাও প্রত্যেকে বেশ বুঝি ও জানি যে, প্রাচ্যবাসীদিগের মনে পাশ্চাত্য ভাব অনুপ্রবিষ্ট করাইলে হলাহল ব্যতীত অন্য কিছু উদ্গীর্ণ হয় না। ভারতবাসী ইংরাজের অধীন হইলেও, ইংরাজের জন্য নিজের হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া দিলেও ভারতবাসী ইংরাজকে চিরদিনই পর (Alien) বলিয়া মনে করিবে। ধর্মে, ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, আকার-প্রকারে, রীতি-পদ্ধতিতে, অশনে ভূষণে ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য ও বৈষম্য কখনও দূর হইবার নহে। ইংরাজ ভারতের বিজেতা জাতি, ইংরাজের দৃষ্টিতে তাঁহার সর্বস্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিত্য প্রতীয়মান হইবে; পক্ষান্তরে ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পরাজিত পরাধীন হইলেও অনন্ত অতীতের গৌরবমণ্ডিত বলিয়া তাঁহারা কখনই বিদেশীয়কে আধ্যাত্মিকতায়, সদাচারে এবং সদ্ধর্মসাধনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবেন না। ভারতের ভাগ্যবাদী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মনে স্থির জানেন যে, ভাগ্যচক্রের বিঘূর্ণনে তাঁহারা এখন তলাতলের নিম্নভাগে থাকিলেও আবার চক্রনেমির বিঘূর্ণন-প্রভাবে উচ্চপদে উন্নীত হইতে পারেন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদিগের পুরুষানুক্রমিক কর্মদোষের প্রভাবেই আজ তাঁহারা মোগল, পাঠান, ইংরাজ প্রভৃতি ভিন্নধর্ম ও ভিন্ন দেশীয় যবন জাতির অধীন রহিয়াছেন। কিন্তু অধীন আছেন বলিয়া আত্মাকে, জাতীয় সংস্কারকে, ইহকাল ও পরকালের অবলম্বন স্বরূপ ধর্মকে, বিদেশীয়ের অধীন রাখিতে পারেন না। কর্মভোগ-ভোগী দেহকে তাঁহারা ইংরাজের সেবার নিযুক্ত রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু ভোগাতীত আত্মাকে বিদেশীয়ের পদানত রাখিতে তাঁহারা কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

ইংরাজ ভারতের বিজেতা বলিয়া নিত্য গর্বিত; তিনি ভারতের হিন্দু মুসলমানকে একটু দয়ার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তিনি মনে করেন যে, আমাতে এমন কিছু আছে, যাহার প্রভাবে আজ আমি ভারতবিজয়ী সম্রাট, সেই যে 'কিছু', তাহা নিশ্চয়ই ইংরাজের ভাষায়, ভাবে, পুরুষত্বে, মেধায়, রীতি-পদ্ধতিতে প্রচ্ছন্ন আছেই; সুতরাং ইংরাজ মনে করেন যে, ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার ও সভ্যতার অপেক্ষা তাঁহার আচার-ব্যবহার সভ্যতা শ্রেষ্ঠতর। বিশেষ, একটি কথা ইংরাজ কখনও ভুলিতে পারেন না। তিনি জানেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় করিলে বিজিত জাতির উপর বিজেতার প্রভাব সম্যক্ সঞ্চারিত হয় না; যুদ্ধে জয় পরাজয় ঘটনাসাপেক্ষ, ভাগ্যসাপেক্ষ; আবার ভাগ্য ও ঘটনা অনুরূপ হইলে বিজেতা বিজিতের অবস্থা প্রাপ্ত হয়; পরাজিতও বিজয়দুন্দুভিনাদে জগৎকে কম্পিত করিয়া তুলে; সুতরাং যে বিজয়ের ফলে পরাজিত জাতি বিজেতার সর্বস্ব গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, সেই বিজয়ই প্রকৃত বিজয়। রোমক মনীষী সিসিরো প্রথমে এই মতের ব্যাখ্যান করেন, পরে মেকিয়াভিলি হইতে আরম্ভ করিয়া জমিনি (Jomini) ও বেন্থাম পর্যন্ত সকল ইউরোপীয় মনীষীই এই মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

ক্লাইব হইতে লর্ড কর্নওয়ালিস পর্যন্ত বঙ্গের সকল ইংরাজ শাসকই কেবল লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিয়াছিলেন; তাঁহারা জেতা ও বিজিতের পার্থক্য চিন্তা ক্ষণমাত্রও করেন নাই। লর্ড মর্নিংটন বা মার্কোয়েস ওয়েলেস্‌লি ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়া জেতা ও বিজিতের ভাবনা ভাবিয়াছিলেন। তিনিই ইংরাজ মনীষীবর্গের প্রথম ও প্রধান মেধাবী ইংরাজ ভারত শাসন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, কতক কতক দেশ জয় হইয়াছে বটে, ইংরাজের লাভের খাতের অঙ্ক কোটি অর্বুদে পরিণত

হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর ইংরাজ তিলমাত্রও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। কেবল ইহাই নহে, ইংরাজের ইংরাজিয়ানা ভারতে একটুও প্রবেশলাভ করে নাই। সেই পুরাতন মোগল পদ্ধতি অনুসারে দেশ শাসিত হইতেছে, সেই কাজি, মুফতি, সেই পণ্ডিত, মৌলবি, সেই সদরালা, সদর আমীন—পুরাতন নামে ও পদ্ধতি অনুসারে ইংরাজকে দেশশাসনে সহায়তা করিতেছে। গোরা সেনা ব্যতীত ইংরাজের ইংরাজিয়ানা ফুটাইবার পক্ষে অন্য কিছুই ছিল না। তাই তিনি ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়াই প্রথমে সিপাহিদিগের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। পরে তাহাদিগের বেতন ও ভাতা প্রভৃতির নির্দেশ ইংরাজি পদ্ধতি অনুসারে করিয়া দিয়াছিলেন। শেষে, তিনি দেশীয় সেনানী সম্প্রদায়কে অবনত করিয়া বিলাত হইতে বালকের দল আনিয়া সিপাহি রেজিমেন্ট সকলের কর্তা করিয়া দিয়াছিলেন। মারাঠা যুদ্ধ, টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বড় বড় রণোন্মাদে প্রমত্ত থাকায় ভারতীয় সিপাহি প্রথমে এই পরিবর্তনের মহিমা বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু যুদ্ধের অবসান হইলে আবার দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে সিপাহি দেখিল যে তাহার পূর্ব গৌরব অনেকটা মলিন বা সঙ্কুচিত হইয়াছে। যে সকল যুদ্ধনিপুণ জমাদার, সুবাদার ইংরাজের সেবায় শ্মশ্রুগুম্ফ শ্বেত করিয়াছিলেন, যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বলিয়া ইংরাজ সেনানীদিগের দ্বারা সম্মানিত হইতেন; তাঁহারা সহসা দেখিলেন যে জনকয়েক বালক ইংরাজের অধীনতায় তাঁহাদিগকে জীবনের বাকি অংশ অতিবাহন করিতে হইবে। ইহার উপর পরিচ্ছদের পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহাদের অনেকেই মনে মনে ভাবিলেন যে, বুঝিবা এমনই ধীরে ধীরে ইংরাজ ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণকে জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত করিয়া পরিণামে তাহাগিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবেন।

প্রাচ্যের সহিত যে পাশ্চাত্যের মিশ খায় না, কখনও খাইতে পারে না, তাহার প্রথম পরিচয় এই অসন্তোষেই প্রকাশ পাইল। এই অসন্তোষ ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ভেল্লোর নগরে প্রথমে পরিস্ফুট হয়। একদল সিপাহিসেনা ইংরাজ সেনানীবর্গের ইংরাজিয়ানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। সেনাপতি জিলেস্পির (Gillespie) দৃঢ়তার ফলে এই বিদ্রোহ মুকুলেই উন্মূলিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের বিষ অন্য সিপাহি দলে বিস্তারিত হইতে পায় নাই। ভেল্লোরের বিদ্রোহের ফলে কর্তৃপক্ষ কিছুকালের জন্য একটু সাবধান হইয়াছিলেন, কিন্তু সিন্ধুদেশে ও ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করিতে যাইবার পূর্বে সিপাহির দল আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্বপ্রথা এবং চুক্তি অনুসারে সিপাহিকে সমুদ্রের পারে ব্রহ্মদেশে পাঠাইতে ইংরাজ সহসা পারিলেন না; কিন্তু সিপাহি সেনা না হইলেও ত ইংরাজের দেশজয় হয় না; তাই গোটাকয়েক সিপাহি রেজিমেন্টের দল ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। ৪৭ নং সিপাহি রেজিমেন্ট ব্রহ্মদেশে যাইতে অস্বীকার করে; কিন্তু পিছন হইতে একদল ইংরাজ গোলন্দাজ সেনা সহসা তোপ দাগিয়া এই রেজিমেন্টের অর্ধেক উড়াইয়া দেয়; এই ভীষণ দণ্ডের পরিণামে অপর সিপাহি রেজিমেন্ট ব্রহ্মদেশে যাইতে স্বীকৃত হয়। কর্তৃপক্ষ এই অবসরে ৪৭ নং রেজিমেন্টের নাম সেনাশ্রেণি হইতে কাটিয়া তুলিয়া দেন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে যে সিন্ধুপ্রদেশ সিপাহি নিজ বাহুবলে জয় করিয়াছিল, সেই সিন্ধু প্রদেশকে অধিকারে রাখিবার জন্য ৩৪ নং সিপাহি রেজিমেন্টকে সিন্ধুদেশে পাঠাইবার কথা হয়। ৩৪ নং রেজিমেন্টের সিপাহিগণ সিন্ধুদেশে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর ৩৪ নং রেজিমেন্ট বলে যে, আমাদিগকে

অধিক বেতন না দিলে আমরা ফিরোজপুর হইতে একপদও অগ্রসর হইব না। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বড়লাট; তিনি মিষ্ট কথায় সকল পক্ষকে তুষ্ট করিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিপাহির মনের সন্দেহ দূর করিতে পারেন নাই। সিন্ধুদেশ হইত ফিরিয়া আসিলে ৩৪ নং সিপাহি রেজিমেন্টের নাম সেনাশ্রেণি হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পঞ্জাব বিজয় হইবার পরে দুইদল সিপাহি রেজিমেন্ট পঞ্জাবে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে পঞ্জাবে স্যর কলিন ক্যাম্বেল উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই উত্তেজনার ভাব ত্বরায় প্রশমিত করিয়া দিলেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অমৃতসরের নিকট গোবিন্দগড়ে ৬৬ নম্বরের উত্তর ভারতীয় সিপাহি রেজিমেন্ট ছিল। এই সময়ে পঞ্জাবে সেনাপতি হিয়ার্সে (Hear-say) উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দগড়ের সিপাহিগণ বলিল যে, আমরা আর অধিককাল এ দেশে থাকিব না। কিন্তু সেই সময়ে শিখ অশ্বারোহীর দল গোবিন্দগড়ে উপস্থিত থাকার এই উত্তেজনার ভাব অন্যত্র বিস্তারিত হইতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই রেজিমেন্টকে ছাড়াইয়া দিয়া ইহার স্থানে একটি গুর্খা রেজিমেন্টের সৃষ্টি করেন। বলিতে কি, গুর্খা রেজিমেন্টের ইহাই প্রথম উদ্ভব। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ে ৩৮ নম্বরের উত্তর ভারতীয় সিপাহি রেজিমেন্টকে ব্রহ্মদেশে আরাকান নগরে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। এই দলের সিপাহিগণ বলে, আমরা যখন দলভুক্ত হই, তখন আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছিল যে, সমুদ্রের পারে আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে না; সুতরাং আমরা দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে যাইব না; সমুদ্রপার হইলে আমাদিগের জাতি যাইবে। লর্ড ডালহাউসি দেখিলেন যে, গোড়ায় সিপাহিদিগের সহিত সত্য সত্যই এই ভাবের চুক্তি হইয়াছিল। কাজেই তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইতে পারিলেন না। লর্ড ডালহাউসির সহিত দ্বন্দ্বে সিপাহিগণ জিতিল। ব্রহ্মদেশ অধিকারের পর লর্ড ক্যানিং ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়া বাংলার সিপাহি রেজিমেন্টকে আর ব্রহ্মদেশে পাঠাইলেন না, পরন্তু মান্দ্রাজের তেলেঙ্গা সিপাহির দলকেই ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সিপাহির দাবি ও অধিকার

ক্লাইব ও হেস্টিংসের সময়ে প্রথমে যখন সিপাহি দলের সৃষ্টি করা হয়, তখন সিপাহিদিগকে বলা হইয়াছিল যে, যে দেশের লোক, তাহাকে সেই দেশের সীমার মধ্যেই রাখা হইবে। পরন্তু পরে ইংরাজের অধিকার-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সেনাধিনায়কগণ ব্যবস্থা করিলেন যে, ইংরাজের অধিকারের মধ্যে থাকিলে সিপাহিকে দ্বিগুণ ভাতা দেওয়া হইবে না; কেবল পররাজ্য-অধিকার করিতে যাইলে সিপাহিরা দ্বিগুণ ভাতা পাইবে, লুঠের অংশও পাইবে। কিন্তু ইংরাজের অধিকার-বিস্তৃতি ভারতব্যাপী হইলে সিপাহির দ্বিগুণ ভাতা পাইবার আশা একেবারেই লোপ পাইল। ইংরাজও সিপাহিদের প্রতি তেমন সু-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিলেন না। লর্ড ডালহাউসির সময় হইতে নিয়ম হইল যে, সিপাহিকে লুঠের অংশ আর দেওয়া হইবে না, দ্বিগুণ ভাতাও দেওয়া হইবে না এবং প্রয়োজন হইলে সিপাহিকে সমুদ্রের পরপারেও যাইতে হইবে।

সিপাহি দেখিল যে, তাহার বাহুবলেই ইংরাজ ভারতবিজয়ী; সিপাহির বীরত্বের প্রভাবে সেঁধিয়া, হোলকার, বাজীরাও পেশবে, নাগপুরের ভোঁসলাগণ, মহীশূরের টিপু সুলতান, সিন্ধু প্রদেশের বেলুচ মীরগণ, পঞ্জাবের খালসা সেনা ইংরাজের পদধূলি গ্রহণ

করিয়াছে। সিপাহি না থাকিলে পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভারতের বিশাল ভূভাগ ইংরাজের করায়ত্ত হইত না। যে শিখ কাবুলের আমীরকে নওসেরার মহারণ-প্রাঙ্গণে পর্যুদস্ত করিয়াছিল, যে শিখ ফরাসি সেনানী আলার্দ (Allard) ও ভেঞ্চুরা (Ventura) প্রভৃতির শিক্ষা প্রভাবে একরূপ অজেয় হইয়াছিল, সিপাহি সেই শিখকেই রণ-প্রাঙ্গণে চূর্ণ করিয়াছিল। তাই যখন ওয়েলেসলির সময় হইতে ডালহাউসির শাসনকাল পর্যন্ত ভারতের সেনাপতিগণ ভারতীয় সেনাবিভাগে বিলাতি আদব কায়দার প্রচলন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সিপাহি বুঝিল যে এইবার ত কাজ হাসিল হইয়াছে, এখন কোম্পানি বাহাদুর আমাদিগকে পদতলে দলিত করিবেনই ত। এই চিন্তার ফলে ধীরে ধীরে সিপাহি ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। সিপাহি মনে মনে ভাবিল যে, আমি ইংরাজকে আমার সসাগরা জন্মভূমির অধীশ্বর করিলাম, মোগলের খণ্ডিত শক্তিকে ধূলিসাৎ করিয়া ইংরাজকে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট করিলাম, আমার হৃদয়ের শোণিতের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া ইংরাজের বিজয়পথ সুস্নিগ্ধ ও কোমল করিয়া দিলাম, আমি হিন্দু হইয়া হিন্দুকে চূর্ণ করিয়াছি, শিখ গুর্খা মারাঠাকে গোলামের গোলাম করিয়াছি—তবে ত আজ ইংরাজ ভারতেশ্বর! মোগল ত ভারতবাসীর সহিত এমন ব্যবহার করে নাই। মোগল রাজপুতকে অবলম্বন করিয়া ভারতবিজয়ী হইয়াছিল, রাজপুতকেই চিরদিনের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভভাবে প্রতিপালন করিয়াছিল। যে দিন আওরঙ্গজেব এই রাজপুত জাতির হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন, সেই দিন হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। আমরা অযোধ্যার, ভোজপুরের, গোরক্ষপুরের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, আমাদের সমাজে পদমর্যাদা আছে, অন্নমুষ্টির সংস্থান আছে, কেবল নববিধ সমরবিদ্যা শিক্ষা করিবার আশায় আমরা ইংরাজের সিপাহি সাজিয়াছি। ইংরাজের সেবায় অগণিত যুদ্ধক্ষেত্রে হেলায় নিজেদের মুণ্ড ধূলায় লুটাইয়াছি। কার্নাক (Carnac), আয়ারকূট (Eyre Coote), ক্লাইব (Clive), ম্যালকলম (Malcolm), জিলেস্পি (Gillespie), অক্টরলোনি (Ochterlony), ওয়েলেস্‌লি (Wellesley), লেক (Lake), নেপীয়ার (Napier), হার্ডিঞ্জ (Hardinge), গাফ (Gough) প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ সেনানী সিপাহির বাহুবলের ও হৃদয়ের বলের উপর নির্ভর করিয়া জগজ্জয়ী সেনাপতির যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন। আর আমরা সেই সিপাহি হইয়াও এখন অবজ্ঞাত!

সিপাহি যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের প্রত্যেক সিপাহির মনেই এই কথা সদাই আন্দোলিত হইত। লর্ড ডালহাউসি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির শাসনকর্তা ছিলেন; তিনি ভাবুকতার মর্ম বুঝিতেন না। তাই সিপাহির আব্দার অভিমানকে তুচ্ছ করিয়া বিধিনিষেধের বন্ধনকে কঠোর হইতে কঠোরতম করিয়াছিলেন। সেই কঠোরতার ফলে সিপাহি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

পূর্বে সিপাহিগণ অনায়াসে গ্রামে নগরে বিচরণ করিতে পারিত, পঞ্জাব জয়ের পর হইতে সিপাহিদিগকে সাধারণ দেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হইতে দেওয়া হইল না। পূর্বে সিপাহিগণ তাহাদিগের কর্নেল বা 'কমান্ডিং অফিসার' সেনাধিনায়কের সহিত নির্ভয়ে কথাবার্তা কহিত, তাঁহাকে ক্ষোভ দুঃখ জানাইত এবং কর্নেল সাহেবের হুকুম অনুসারে কার্য করিত। কিন্তু বিলাতি সামরিক পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত হওয়ায় সেনাধিনায়কের ক্ষমতা হ্রাস পাইল; সিপাহি প্রধান সেনাপতির নিকট পর্যন্ত আপিল করিবার অধিকারী হইলেও দেখিল যে, তাহার ক্ষোভের কথা শুনিবার আর লোক নাই। দরখাস্ত করিলে অভিযোগের

প্রতিকার আর সহজে হয় না; দুঃখের কথা কাহাকেও জানাইলে কেহ আর তেমন পূর্বের মত স্নেহসিক্ত লোচন হইয়া তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে না। বিলাতি শাসনপদ্ধতির এই বাধার উপর বাধার, এই কর্তার উপর কর্তার অনন্ত বিন্যাসের অজ্ঞেয়তায় সিপাহি বিহ্বল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে, এ সকল সুব্যবস্থা নহে, ইহা তাহার অধিকার সঙ্কোচের ফন্দি মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচ্যের সহিত কখনো পাশ্চাত্যের সম্মিলন হয় না। ইংরাজ ভারতবর্ষে বিলাতের শাসনপদ্ধতি অবিকৃতভাবে প্রচলন করিতে উদ্যত হইয়াই এই গোল ঘটাইয়াছিলেন। যেভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াতে ইংরাজ সৈন্য, গোরা-বারিকের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিধিনিষেধের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে পারে, সিপাহির মনে সে ভাবের পূর্ণ অভাব চিরকাল থাকিবেই। সিপাহি জানে যে, সে চাকরি করিতে আসিয়াছে, সে মনে মনে বেশ বুঝে যে, ইংরাজ তাহার পর, ধর্মে, ভাষায়, সভ্যতার, সব বিষয়ে সম্পূর্ণ পর (alien)। কিন্তু ইংরাজ এ দেশে থাকিলে ইংরাজকে মাথায় করিয়া রাখিতে পারিলে তাহাদের স্বার্থের পুষ্টি সম্ভবপর, তাই সিপাহি ইংরাজের চাকরি পূর্বে করিত, এখন করে। সিপাহির এই চাকরিতে মনের মধ্যে একটু আত্মরক্ষার ভাবও ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের মুখে ভারতের সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করিতেছিল; প্রবল দুর্বলকে পীড়ন করিতেছিল, অসাধু সাধুকে নির্জিত ও তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠিত করিতেছিল, তাই আত্মরক্ষাকাম হইয়া সিপাহি প্রথমে ফরাসির, পরে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সিপাহি মনে মনে স্থির জানে যে, সে মরিতে পারে মারিতেও পারে, তাহাকে ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে সমরবিদ্যা শিখাইলে সে দুর্দম ও দুর্জয় হইয়া উঠিবে; তাই শত বৎসরের সেবার পর সিপাহি লর্ড ডালহাউসির নিকট বিশিষ্ট অধিকারের ভিখারি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লর্ড ডালহাউসি তখন ভারতে নূতন আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে চিনিতেন না, সিপাহিকে জানিতেন না; তাই তিনি ভিক্ষা দিলেন না। সিপাহি ইংরাজ গোরার কোনো অধিকারে অধিকারী না হইয়া গৌরাঙ্গ পদ্ধতির সকল দুঃখের ভাগী হইল; তাই সিপাহি বিগড়িল। এই বিদ্বেষের বা উত্তেজনার ভাব যে সহসা ১৮৫৭, খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দাবানলের জ্বালামালার ন্যায় শতজিহ্ব হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নহে; ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে তুষানলের বহ্নিবিকাশের মতো মধ্যে মধ্যে সিপাহির বিদ্বেষজ্বালা ইংরাজের অক্ষিগোচর হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই। বরং স্বীয় ব্যবহার দোষে তাঁহারা এই তুষানলে পর্যাপ্ত ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন।

ইহাই সিপাহির ইতিবৃত্ত। এখনও ভারতে সিপাহি আছে বটে, পূর্ববৎ ইংরাজের সেবাপরায়ণ হইয়া আছে বটে; কিন্তু এখন সিপাহি বাঘবন্দির বাঘের মতো, গোরা সেনার দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াই আছে।

কোম্পানি ও সিপাহি

এখনও কেহ বলিতে পারে না যে, ইংরাজ কবে ভারতের বিশেষত বাংলার রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ক্লাইব বাংলায় দেওয়ানিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'নিজামতি' কখনো গ্রহণ করেন নাই, অর্থাৎ ক্লাইব বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজকর আদায়ের 'মোস্তাজিরী' বা পত্তনি স্বত্ব, গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর শত বৎসরের অধিককাল আর কোন উচ্চবাচ্য কেহ করে নাই। বাংলার শেষ নবাব নাজিম

আমীর-উল-ওমরা মনসুর আলি খাঁ বিলাতে যাইয়া নিজের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষে বাংলার ছোটলাট স্যর এশলি ইডেনের মারফতে বিলাতে ভারতসচিবের কাছে নবাব নাজিম উপাধি বেচিয়া ফেলেন। তদবধি (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ হইতে) মুর্শিদাবাদের নবাবকে আর নবাব নাজিম কেহ কহে না, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর বলিয়াই তিনি এখন পরিচিত।

এই বিষয় উত্থাপনের একটু হেতু আছে. হেতু এই যে, প্রকৃত দেশজয় করিবার লিপ্সায় উত্তেজিত হইয়া ভারতপ্রবাসী কোম্পানির কোন কর্মচারী কোন দেশই জয় করেন নাই; এমন কি, দেশ-জয়ের চেষ্টা তাঁহাদের আদৌ ছিল না; তাঁহারা অর্থাগমের দিকেই অধিক দৃষ্টি করিতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিকে পরাজিত করিবার জন্যই ইংরাজ ভারতে শস্ত্রপাণি হইয়াছিলেন, সিপাহি সেনা রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কখনও ভারতবিজয়ী সম্রাট হইবার দুঃস্বপ্ন ক্লাইবও দেখেন নাই। ইহার ফলে ইংরাজের ভারতজয় ব্যাপার এখন একটা দুর্জ্ঞেয় কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কোথা হইতে কি হইল, কেমন করিয়া কি হইল, কেন এমন হইল—এই সকল প্রশ্নের উত্তর কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকই এখন দিতে পারেন না। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখনও আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধ ত বঙ্গবিজয়ের জন্য হয় নাই; এই যুদ্ধ হইয়াছিল সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন হইতে চ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে এবং ইংরাজের অনুকূল জাফর আলি খাঁকে নবাব করিবার বাসনায়। সুতরাং কোম্পানির প্রথমাবস্থার কার্যাবলীতে কোন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় না।

এই জন্ কোম্পানি বাহাদুর সিপাহির সর্বময় কর্তা ছিলেন! সিপাহি কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের ভাবনা ভাবিত না; কোম্পানি যে সামগ্রীটা কি, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিত না,—সে দেখিত, নিজের লাভ, আর দেখিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ, সেই 'কমান্ডিং অফিসার' বা সেনাধিনায়ককে। তাই যতদিন কোম্পানির কর্মচারিবর্গ সিপাহিকে আল্‌গাভাবে রাখিয়াছিলেন, ততদিন কোন দিকেই কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

কোম্পানির শাসনপদ্ধতির মধ্যেও একটু বৈচিত্র্য ছিল। একদল বড়লাট আসিয়া কেবল দেশ জয় করিতেন, আর একদল বড়লাট বিজিত দেশ সকলকে শাসনে রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন। দেশজয়ের সময়ে সিপাহির আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না। আর দেশ-শাসনের সময়ে, যখন ইংরাজ অধিকারে শান্তি বিরাজ করিত, তখন সিপাহিকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু কেবল বিজয়ের পরম্পরার মোহে সিপাহি তাহার এই ক্ষণিক অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করিত। সে মোহ ভাঙিল লর্ড অকলান্ডের শাসনকালে। আফগান যুদ্ধের ভীষণ পরিণতি দেখিয়া সিপাহি বুঝিল যে, ইংরাজ নিত্যজয়ী নহেন। ইংরাজের সমরশক্তির উপর সিপাহির যে প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, তাহা আকবর খাঁর উপদ্রবে কাবুলে, স্যর উইলিয়ম ম্যাকনাটন প্রমুখ ইংরাজ সেনানীবর্গের হত্যায়, সিপাহি সেনার পূর্ণ পরাজয়ে একেবারেই দূর হইয়া গেল। কেবল এইটুকুই নহে। পরাজিত সিপাহির দল যখন পঞ্জাব ভেদ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন পঞ্জাব স্বাধীন ছিল, মহারাজ রণজিৎ সিং জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে পরাজিত সিপাহিদিগকে তর্জনী হেলাইয়া খালসা শিখ সেনা অনেক বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল। সে বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তি বিষদিগ্ধ বানের ন্যায় সিপাহির মর্মে বিদ্ধ হইয়াছিল। উপর্যুপরি দুইবার পঞ্জাব সমরে। শিখ সেনাকে বিধ্বস্ত করিয়া ইংরাজের পরবীয়া সিপাহি সে জ্বালা সম্পূর্ণ দূর করিয়াছিল বটে,

কিন্তু এ ধারণা ত সে কখন ছাড়িতে পারে নাই যে, ইংরাজ হারিতেও জানে। পরে লর্ড এলেনবরোর আমলে সেনাপতি নটের এবং বলকের অধীনতায় ইংরাজের সিপাহি আবার কাবুল জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজের অপ্রতিহত শক্তির প্রতি সিপাহির যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহা আর উদ্দীপিত হইল না। তবে লর্ড এলেনবরো ভাবুক পুরুষ ছিলেন, তিনি সিপাহির ভাব বুঝিয়াছিলেন তাই সিপাহিকে সমাদর করিয়া সিপাহির মনের অনেক ময়লা দূর করিতে পারিয়াছিলেন। নইলে হয়ত বা, লর্ড এলেনবরোর আমলেই সিপাহি যুদ্ধের সূত্রপাত হইত।

বিলাতি সামরিক ব্যবস্থা

মার্কোয়েস ওয়েলেস্‌লির ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেস্‌লি, পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন এই উপাধি পাইয়া বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল। ইনিই লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া প্রখ্যাতি অর্জন করেন। শুনা যায়, এই হেতুই মহাবীর নেপোলিয়ন ওয়েলেস্‌লিকে সিপাহির সেনাপতি বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। ওয়াটালুর যুদ্ধের পর ডিউক অব ওয়েলিংটন বিলাতের সামরিক বিষয়ে সর্বপ্রধান হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ ইংলন্ডের সমরজীবীগণ বেদবাক্যের ন্যায় শিরোধার্য করিতেন।

ভারতে সিপাহি শ্রেণির মধ্যে ইংলন্ডের সামরিক রীতি পদ্ধতি প্রচলন করার পক্ষে বৃদ্ধ ডিউকই প্রধান উৎসাহী ও উদ্‌যোগী ছিলেন, তিনিই সিপাহির দলকে গোরার ছাঁচে ঢালিয়া গোরার অনুরূপ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে সিপাহির দলে অত্যন্ত অশান্তি ও উত্তেজনার ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের বিশেষত বিলাতি গোরার সহিত এতদ্দেশীয় সিপাহির সমতা সাধন চেষ্টা বিষময় ফলই প্রসব করিয়া থাকে, এবং এই চেষ্টার জন্যই সিপাহি যুদ্ধ যে কতকটা সূচিত হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। এই বৃদ্ধ সেনাপতি (ডিউক-অব-ওয়েলিংটন) আদেশ করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহি একসঙ্গে ও একত্র থাকিবে। অবশ্য তাঁহার আদেশ পূর্ণভাবে পালিত হয় নাই বটে, কিন্তু এই আদেশের পর হইতে সিপাহি রেজিমেন্টে জাতি বিচার রহিল না; অর্থাৎ ক্লাইব বা হেস্টিংসের আমলে যেমন রাঠোর, চৌহান, ব্রাহ্মণ, পাঠান প্রভৃতি জাতি বিচার করিয়া, এমন কি দেশ বিচার করিয়া, এক একটা রেজিমেন্ট তৈয়ার হইত, ডিউকের আদেশে ঠিক সেভাবে আর রেজিমেন্ট গঠন করা হইল না। একটা রেজিমেন্ট দশটা কোম্পানি, এইরূপ কোম্পানির মধ্যে হয়ত দশ রকমের জাতিকে সিপাহির কার্য করিতে হইল, এই ব্যবস্থার ফলে সিপাহিদিগের মনে বিরক্তির ভাব অত্যন্ত প্রবল হইলে উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এক একটা কোম্পানির মধ্যে আর দুই তিন জাতীয় সিপাহি নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা রহিল না।

স্যর আর্থার ওয়েলেসলি অর্থাৎ ডিউক-অব-ওয়েলিংটন সিপাহির অত্যন্তই অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেন না, কিরূপ ব্যবহার করিলে সিপাহি তুষ্ট থাকিতে পারে, আর কিভাবে আদর করিলে সিপাহি জাতি-ধর্মের নাশ-শঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে। কর্নেল ম্যালিসন (Colonel Malleson) বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ ডিউকের বিচক্ষণতার অভাবেই সিপাহি দলের মধ্যে অসন্তোষের বীজ সর্বপ্রথমে উপ্ত হইয়াছিল, তাই তিনি একটু ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এককালে যে

ওয়েলেস্‌লি সিপাহির শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন, সুদূর বিলাত হইতে প্রধান সেনাপতিরূপে সিপাহি সেনার সংস্কার মানসে নানাবিধ উদ্ভট আদেশ প্রচার করিয়া সেই ডিউক সিপাহির ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক সময়ে যিনি রক্ষক ছিলেন, অন্য সময়ে তিনি ভক্ষক স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ম্যালিসন অনুমান করেন যে, বিলাত হইতে এইরূপ নানাবিধ বিধি নিষেধের পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তনের আদেশ অনুমতির হাঙ্গামা না থাকিলে এত সহজে সিপাহি উত্তেজিত হইয়া উঠিত না।

কোম্পানির পরিণতি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের বিশাল ভূভাগের অধীশ্বর হইয়া বিলাতে একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিলাতের রাজনীতিক এবং শাসক সম্প্রদায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই অবস্থা পরিবর্তনে একটু ঈর্ষা হইয়া পড়িয়াছিলেন। লর্ড নর্থ (Lord North), লর্ড লিভারপুল (Lord Liverpool) প্রমুখ রাজনীতিকগণ স্পষ্টই বলিতেন যে, ব্যবসায়ীমণ্ডলীর হস্তে রাজশক্তি ন্যস্ত থাকা ঠিক নহে; দেশ শাসন ভার ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করা উচিত, আর কোম্পানির ব্যবসায় বাণিজ্য কোম্পানির কর্মচারিবর্গ নিজে চালাইতে থাকুন ইংলন্ডের দুইজন প্রধান মন্ত্রী এইরূপ মত প্রকাশ করায় সেই সময় ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, ইংলন্ডের মন্ত্রিসমাজ মধ্যে মধ্যে ভারত-শাসন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবেন এবং ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু পাইলে তাহার সংশোধনের উপায় নির্ধারণ করিয়া দিবেন। ইহা ছাড়া যে চার্টার বা রাজাদেশ অনুসারে কোম্পানি ভারত শাসন করিতেন এবং ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেন, সেই চার্টার বা রাজাদেশও মধ্যে মধ্যে কোম্পানিকে নূতন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত। ফলে, কোম্পানির ডিরেক্টরগণ অর্থাৎ বিলাতবাসী কর্তৃপক্ষ ভারতে রাজ্যাধিকার পাইয়া স্বদেশের সকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকেই সদা তুষ্ট রাখিতে ব্যস্ত থাকিতেন। এই তুষ্টি-চেষ্টায় ভারত শাসন নীতির পারম্পর্য কখনই রক্ষিত হইত না। কখনও বা শাসনকার্যে অতি শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইত, কখনও বা শাসক সম্প্রদায় অতিশয় কঠোরতার সহিত প্রজা শাসন করিতেন। কোম্পানির ভারতপ্রবাসী শাসক সম্প্রদায় খ্রিস্টান পাদরীগণকে কখনই সুনজরে দেখেন নাই; ইহার ফলে কেরী (Carey), মার্শম্যান (Marshman) প্রভৃতি বাংলার পাদরী প্রধানগণ দিনেমারদিগের (Danes) অধিকারে শ্রীরামপুরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। কোম্পানির শাসক সম্প্রদায় বুঝিতেন যে, পাদরীগণ কোম্পানি পক্ষ হইতে উৎসাহিত হইলে ভারতের হিন্দু মুসলমান সাধারণ প্রজা এবং সিপাহি উভয়েই কোম্পানির প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবে। তাই তাঁহারা ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতবাসীও এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনাতিপাত করিতেছিল। ১৮৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে নূতন চার্টার গ্রহণের সময়ে বিলাতের রাজনীতিকগণ কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, যে, খ্রিস্টান ধর্ম এবং খ্রিস্টান সভ্যতা ভারতে প্রচার করিতে না পারিলে ইংরাজ জাতির একটা প্রধান কর্তব্য সাধন করা হইবে না। কেবল অর্থগৃধ্নু ও রাজ্যপিপাসু হইয়া ভারত শাসন করিলে ইংরাজ প্রকৃতপক্ষে ভারতবিজয়ী হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ইংরাজের যাহা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, যাহা মনুষ্যত্বের উন্মেষকর ও পুষ্টিকর, তাহাই ভারতবাসীকে উপঢৌকন দেওয়া কর্তব্য।

এই প্রস্তাব অনুসারে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বা কর্তৃপক্ষ মিশনারিদিগকে খ্রিস্টধর্ম প্রচার পক্ষে উৎসাহ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সেই অঙ্গীকারের ফলে ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক (Lord William Bentinck) সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দেন। এই অঙ্গীকারের ফলেই মনীষী লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) ভারতে বিদ্যার্থিগণকে ইংরাজি বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু লর্ড মেকলের সঙ্কল্পেব বিরুদ্ধে লর্ড এলেনবরো লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরো বলেন যে ভারতবাসীকে ইংরাজি শিখাইলে, ইংরাজের স্বাতন্ত্র্যপ্রধান সাহিত্যের আস্বাদন দিলে, পরিণামে ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতা-পিপাসা অতি প্রবল হইয়া উঠিবে। তখন হয়ত বা সে বেগ সামলাইতে ইংরাজ পারিবেন না; হয়ত বা সে উদ্দাম ইচ্ছার সংঘর্ষে ইংরাজ জাতিকে বিপর্যস্ত হইতে হইবে। তাই লর্ড এলেনবরো ব্যবস্থা করেন যে, ভারতের হিন্দু তাহাদের পুরাতন টোল চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে থাকুক, ভারতের মুসলমান মক্‌তব-মদ্‌রসায় মৌলবিদিগের নিকট কোরান অধ্যয়ন করুক; ফারসি সাহিত্যের রসাস্বাদনে বিমুগ্ধ থাকুক; আর দেশের অভিজাতবর্গের মধ্যে হইতে জনকয়েককে বাছিয়া লইয়া দেশশাসন কার্যে পটু করিবার মানসে ইংরাজি শিখান হউক। পুরাতন মুসলমানি পদ্ধতি অনুসারেই দেশ শাসিত হইবে; সেই পুরাতন পাটোয়ারি, কারকুন, কানুনগো গ্রাম পল্লি শাসনে রাখিবে, রাজকর আদায়ের হিসাব রাখিবে।

লর্ড মেকলে উত্তরে বলেন যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ বন্ধন পূর্বানুরূপ কঠোর থাকিলে তাহারা কিছুতেই চিরকাল ইংরাজের শাসনাধীন থাকিবে না। ভারতের মধ্যবিত্ত ভদ্র জাতি সকলকে ইংরজি ভাষায় পটু করিলে, ইংরাজি সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদনে উন্মত্ত করিলে, তাহারা পুরাতন সমাজ বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণে—ইংরাজের আচার ব্যবহার, রীতিপদ্ধতি, অশনভূষণ, শিষ্টাচার সদালাপের অনুচিকীর্ষায় প্রমত্ত হইয়া উঠিবে, সেই প্রমত্ততার ফলে হিন্দু-মুসলমানের সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে, সমষ্টি ব্যষ্টিতে পরিণত হইবে—ভীষণ বিশাল প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ হইয়া বালুকারাশিতে পরিণত হইবে। এই শ্লথ-সমাজ-বন্ধন ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে তখন ইংরাজের শাসনাধীন রাখা অনায়াসসাধ্য হইবে। অতএব ভারতবাসীকে ইংরাজি বিদ্যা শিখান, ভারতবর্ষে ইংরাজি সভ্যতার ও সাহিত্যের-প্রচার, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হউক।

লর্ড মেকলের হেতুবাদ ও যুক্তিতর্ক সে সময়ে ইংরাজ বুধগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাই লর্ড এলেনবরোর পরামর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া ইংলন্ডের শাসক সম্প্রদায় লর্ড মেকলের পন্থা অবলম্বন করেন। লর্ড মেকলেও এই শুভ অবসর পাইয়া হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্রের, আচার ব্যবহারের, মুসলমানের কোরান ধর্মের ও রীতি পদ্ধতির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া, তাঁহার সেই উজ্জ্বল ভাষায় এক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুরাণ-কোরানের প্রবর্তিত বিদ্যা লইয়া আধুনিক সমাজে বাস কবিতে চাহিলে আর চলিবে না; ইউরোপের অভিনব বিজ্ঞানশাস্ত্র নিত্য নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছে, সৃষ্টিপদ্ধতির মূল কারণ নির্দেশ চেষ্টায় প্রকৃতি দেবীর অবগুণ্ঠনে প্রচ্ছন্ন কত অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত শক্তির তথ্য প্রকাশ করিতেছে। এখন অনুসন্ধিৎসাই সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ হইয়াছে; এ সময়ে আপ্তবাক্যে নির্ভর করিয়া চলিলে মানুষকে অন্ধের ন্যায় সংসারে বিচরণ করিতে হইবে।

মানুষ জন্ম হইতেই স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, মানুষকে সমাজ-শাসনের নিগড়ে, চিরাচীর্ণ রীতিপদ্ধতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা মহাপাপ; প্রত্যেক মানুষই নিজের বুদ্ধির ও বিচারশক্তির সাহায্যে সত্য আবিষ্কার করিয়া নিজ জীবনের পন্থা নির্ধারণ করিয়া লইবে। ভগবান মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন, সে শক্তি নিত্যসিদ্ধ এবং নিত্যস্বাধীন, তাহার উপর কোরান পুরাণের উৎপাত উপদ্রব চলে না, চালাইতে নাই।—এবংবিধ নানারূপ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া লর্ড মেকলে স্বীয় সন্দর্ভে জাতিবিচারের, হিন্দু বিধবার চিরবৈধব্য সাধনের, স্ত্রীজাতির অবরোধের, গঙ্গাসাগরে শিশুপুত্রাদির উৎসর্গের, চড়কে বাণ-ফোঁড়ার সম্বন্ধে অতি তীব্র নিন্দা লিপিবদ্ধ করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কও সতীদাহ প্রথা উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে চড়কে বাণ-ফোঁড়া, তীর্থক্ষেত্রে শিশুপুত্রের উৎসর্গ, শিশু কন্যার জীবননাশ প্রভৃতি উৎকট ব্যবহার আইনবিরুদ্ধ এবং দণ্ডবিধির অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় বলিয়া নির্দেশ করিলেন।

সিপাহির ভাবনা

এবংবিধ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় প্রজাসাধারণের মনে কোম্পানির বিরুদ্ধে যে কোনরূপ বিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা ত বোধহয় না। হিন্দু ও মুসলমান সমাজ হইতে যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছিল, তাহা সত্য; কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন আইন পাশ হইল, তখন প্রজা নিরুপায় ভাবিয়া নিরস্ত হইল। কিন্তু সিপাহি উল্টা বুঝিল। সিপাহি ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজ কোম্পানির সকল কার্যাকার্যের পারম্পর্য লক্ষ করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে, প্রধানত হিন্দুর জাতি মারিবার উদ্দেশ্যেই এবং পরিণামে হিন্দুকে খ্রিস্টান করিবার বাসনায় ইংরাজ কোম্পানি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সিপাহি ভাবিল যে মানুষ ধর্মহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; সিপাহির যদি জাতি যায়, তাহা হইলে হিন্দুত্বের হিসাবে সিপাহির ইহকাল ও পরকাল যাইবে;—সিপাহি পতিতচণ্ডালের ন্যায় হিন্দু সমাজে থাকিতে পারে না। অগত্যা প্রাণের দায়ে পরিণামে তাহাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেই হইবে; তাই ইংরাজ চাতুরী করিয়া প্রথমে সিপাহির জাতি মারিতে উদ্যত হইয়াছে, পরে তাহাকে খ্রিস্টান করিবে।

সিপাহি এইভাবে তর্ক করিল। সে বলিল যে, সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিলে দেশে যুবতী বিধবার সংখ্যা বর্ধিত হইবে, কালে বিধবাবিবাহ প্রচলন না করিলে সমাজ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে; ফলে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজে হিন্দুত্বের গ্লানি ও হানি হইবে; ব্রহ্মচর্যের আদর্শ মলিন হইবে; হিন্দু সমাজে নিকা ও সাঙ্গার প্রচলন হইবে; পরে হিন্দুকেও খ্রিস্টান হইতে হইবে। সিপাহি আরও ভাবিল,—রাজপুতদিগের মধ্যে কুলমর্যাদা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই কন্যাপ্রসূত হইলে, সূতিকাগারেই তাহাকে হত্যা করা হইত। এখন সে হত্যাকাণ্ডে কোম্পানি ব্যাঘাত ঘটাইলেন; ইহার ফলে রাজপুতদিগের মধ্যে কন্যার সংখ্যা অত্যধিক হইবে; কুলশীল রক্ষা করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করা রাজপুতের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে; পরিণামে রাজপুতের কুলগৌরব ধূলিসাৎ হইবে; হয়ত বা শেষে ইতর জাতিকেও কন্যাদান করিতে হইবে। তাহা হইলেই রাজপুতের জাতি ত গেল; সে জাতি যাওয়া অপেক্ষা খ্রিস্টান হওয়া ভাল—এই ভাবিয়া হয় ত রাজপুতগণ খ্রিস্টানধর্ম অবলম্বন করিবে।

সিপাহিগণ মনে করিয়া দেখিল যে;---মুসলমান তাহাদের ধর্মনাশ করিত বটে, কিন্তু এত চতুরতার সহিত নহে, এমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া নহে। মুসলমান সোজাসুজি হিন্দুকে কলমা পড়িতে বলিত; যে পড়িত না, তাহার মস্তকচ্ছেদন করিত; সকল আপদের শান্তি হইত। এই সকল আশঙ্কা, উপদ্রব যখন সিপাহির মনকে আন্দোলিত করিতেছিল, তখনই লর্ড ডালহাউসির শাসনকালে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল এবং খ্রিস্টানের উত্তরাধিকার আইনও বিধিবদ্ধ হইল। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধর্মত্যাগী, সমাজদ্রোহী পিতৃদায়াধিকারে বঞ্চিত হইয়া থাকে; এমন কি, ধর্মত্যাগী নিজের পত্নীরও সাহচর্য প্রার্থনা করিতে পারে না। ইংরাজ ব্যবস্থা করিলেন যে, খ্রিস্টান হইলেও পিতার পুত্র পিতার উত্তরাধিকারে কিছুতেই বঞ্চিত হইবে না এবং ইচ্ছা করিলে পত্নীর সাহচর্য লাভ করিতে পারিবে।

এই দুই আইন পাশ হইলে সিপাহির মনে নিশ্চয় ধারণা হইল যে, তাহার জাতি নাশ করিবার জন্যই ইংরাজ কোম্পানি এই সকল নূতন আইন পাশ করিতেছেন।

টোটা

মুসলমানের আমলে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক তেমন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত না। পাঠান ও মোগলদিগের প্রধান গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ার মুসলমান রুমী খাঁ যুদ্ধে তোপ গোলারই অধিকতর উপযোগিতা বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি মোগল গোলন্দাজদিগের মধ্যে বন্দুকচীর সংখ্যা অত্যন্ত কম করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষত সে সময়ে এক বারুদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কৃত না হওয়াতে বন্দুক ব্যবহাব করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কেননা, প্রত্যেক গুলিটি ছুঁড়িতে হইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বারুদ দিয়া পরে গুলি বসাইতে হইত এবং বন্দুক ছুঁড়িবার সময়ে পলিতা দ্বারা সেই বারুদে অগ্নি সংযোগ করিতে হইত। বন্দুক এবং তোপ ছোঁড়ার একই প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত; তাই মোগল সেনানীগণ বন্দুক অপেক্ষা তোপেরই আদর করিতেন।

ইউরোপে নেপোলিয়ানের যুদ্ধের সময়ে বন্দুক অপেক্ষা তোপই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সম্মুখ সংগ্রামে অশ্বারোহী সেনাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার পরে 'গন কটনের' আবিষ্কার হয়। এই অপূর্ব বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কারে 'ক্যাপের' প্রচলন অধিক হইতে আরম্ভ হইল। 'ক্যাপের' প্রচলন আরম্ভ হইবার পর হইতে বন্দুকের আদরও যোদ্ধৃ সমাজে অধিক হইল। এই 'গন কটন' আবিষ্কারের পর টোটার প্রচলন আরম্ভ হয়। একটা আধারে গুলি ও বারুদ একসঙ্গে ঠাস্ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যাহা হয়, তাহাকেই টোটা বলে। এই টোটা প্রথমে কাগজেরই নির্মিত হইত। প্রথমে ব্রাউন বেস (Brown Bess) নামক রাইফেল বন্দুকে টোটা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। কাগজের টোটা পাছে বন্দুকের নলের মধ্যপথে আটকাইয়া যায়, তাই ব্রাউন বেসের টোটার উপরে একটু মোম দিয়া কাগজটাকে চিক্কণ করিয়া লওয়া হইত; আর এই টোটা বন্দুকে গাদিবার পূর্বে সিপাহিকে টোটার অপরাগ্রভাগ দাঁত দিয়া একটু কাটিয়া দিতে হইত। দাঁত দিয়া উহাকে কাটিয়া দিলে টোটা গাদিবার সময়ে উহার অপর দিকের বারুদের গুঁড়া গড়াইয়া ক্যাপের মুখে যাইয়া পৌঁছিত এবং অনায়াসে বন্দুক আওয়াজ করা চলিত। ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সিপাহিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে এই টোটার কাগজ নিঃসঙ্কোচে দাঁতে কাটিয়া যুদ্ধ করিতেন; কারণ

তাঁহারা নিজেরাই মোম লাগাইয়া টোটাকে চিক্কণ করিতেন; সুতরাং টোটায় চর্বি প্রয়োগের আশঙ্কা হইবার তাঁহাদিগের অবসর ছিল না। আর বিশেষ সে সময়ে এতদ্দেশজ সুচিক্কণ কাগজের দ্বারাই টোটা নির্মিত হইত, সুতরাং জাতিনাশের পক্ষে সিপাহির কোন প্রকারের সন্দেহ হইবার সম্ভবনা ছিল না। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর এনফিল্ড রাইফেল (Enfield Rifle) তৈয়ার হইল। কোম্পানির বিলাতবাসী কর্তৃপক্ষগণ সিপাহির হস্তে সেই এনফিল্ড রাইফেল নামক বন্দুক অর্পণ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। এনফিল্ড রাইফেলের টোটা আকারে কতকটা আধুনিক টোটার মতোই ছিল, কিন্তু উহাও কাগজে নির্মিত হইত; উহাকেও দাঁতে কাটিয়া তবে বন্দুকে ব্যবহার করিতে হইত। অধিকতর লম্বা হওয়াতে এই নূতন টোটার কাগজ আরও মসৃণ করিবার প্রয়োজন হইল। বিলাতি টোটাব কাগজ অবশ্যই গো-শূকরাদির চর্বির দ্বারা মসৃণ করা হইত; কিন্তু ভারতে তাহার প্রচলন করা শঙ্কাজনক মনে হওয়ায় কোম্পানির সামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিলেন যে, দমদমায় এবং অম্বালায়, শিয়ালকোটে ও মীরাটে ভারতীয় সিপাহির ব্যবহার্য টোটা তৈয়ার হইবে। এই টোটার কাগজ অতি মসৃণ করিবার বাসনায় কোম্পানির কারিগরগণ প্রথমে মেষের চর্বির সহিত মোম মিশাইয়া কাগজের উপর প্রলেপ দিয়া দিতেন; কিন্তু ইহাতে ব্যয় অধিক পড়িতে লাগিল। তাই গোরাদের ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিলাতি আদর্শে টোটা নির্মিত হইতে লাগিল।

ভারতের সিপাহি প্রথম হইতেই টোটা দাঁতে কাটিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু সমরোন্মাদ ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা প্রবল, তাই ভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সিপাহিগণ লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড মিন্টো প্রভৃতি বড়লাটের শাসন সময়ে ভারতের নানা দেশে বড় বড় যুদ্ধে হেলায় টোটা কাটিয়া শত্রুদল মথন করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময় হইতে দেশে কিছুকালের জন্য শান্তি স্থাপিত হইলে পর সিপাহি পূর্বাপর সকল ঘটনা, সকল পরিবর্তন, একে একে চিন্তা করিয়া দেখিল। শেষে তাহাদিগের সব রাগ এই টোটার উপরেই পড়িল।

অধুনা কর্ডাইট (Cordite), ডিনামাইট (Dynamite) প্রভৃতি অপূর্ব অদ্ভুত বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কার হওয়াতে আর টোটার কাগজ দাঁতে কাটিতে হয় না, এখন তামা ও পিতলের পাত দিয়া টোটা তৈয়ার হয়। সুতরাং এখন আর টোটা কাটিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু এই টোটা কাটার ব্যাপার লইয়া একদিন ভারতে ইংরাজ প্রাধান্য ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই ইতিহাসকথা আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করিব। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা এইটুকুই দেখাইতে চাই যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বণিক ও ব্যবসায়ীর মণ্ডলী হইলেও, ভারতে কেবল বাণিজ্য ও ব্যবসায় কার্য চালাইবার জন্য আসিলেও, বিধাতার বিধানে দেশশাসনের গুরুভার তাঁহাদিগের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা দেশশাসন করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কেবল বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিস্তার পক্ষে যতটুকু প্রজারক্ষার কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাঁহারা ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ভাগ্যদেবী জোর করিয়াই তাঁহাদিগের স্কন্ধে ভারতের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব রীত্যনুসারে ক্লাইব ও ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো কোম্পানির যোগ্যতম কর্মচারী গবর্নর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইতে থাকিলে, অনুমান হয় যে, কোম্পানিকে পরিণামে এত বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত না। কিন্তু যেদিন হইতে

বিলাতি গবর্নমেন্ট সঙ্কল্প করিলেন যে, বিলাতের এক একজন প্রধান রাজনীতিক মধ্যে মধ্যে ভারতে যাইয়া বড়লাটের পদ অধিকার করিবেন, সেই দিন হইতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড ডালহাউসি প্রভৃতির ন্যায় উচ্চাশা উচ্চাকাঙ্ক্ষ গবর্নর-জেনারেল সকল কোম্পানির অধীনতায় ভারত শাসন করিতে না আসিলে, হয়ত বা মনে হয় কোম্পানিকে এত বিপন্ন হইতে হইত না। কোম্পানির ডিরেক্টরগণকে এক পক্ষে বিলাতের ভাবপ্রমত্ত রাজনীতিকগণের (doctrinaire) খেয়াল পুষ্টির জন্য নানা উদ্ভট ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইত। অন্য পক্ষে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই উভয়বিধ কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের অত্যন্ত অভাব ঘটিত। বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ এই সমতার অভাবে যে কি ক্ষতি হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু ভারতের স্থানীয় শাসনকর্তৃগণ এই অসামঞ্জস্যের জন্য ভাবী অমঙ্গলের ভাবনায় একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই চিন্তার কথা লর্ড ডালহাউসির গোচর করিয়া সেনাপতি কনিংহামকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। লর্ড ডালহাউসির ঔদ্ধত্যে, লর্ড মেকলের পাণ্ডিত্যাভিমানে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারত শাসন বিষয়ে অনেকটা স্থবির হইতে হইয়াছিল। এই স্থবিরতাই সিপাহি যুদ্ধের বিস্তার পক্ষে কতকটা সহায়তা করিয়াছিল।

স্যর চার্লস নেপীয়ার, স্যর হেনরি লরেন্স প্রমুখ ভারতের সেনানী ও শাসনকর্তৃগণ কোম্পানির কার্যে এই স্থবিরতা লক্ষ করিয়া বিলাতের ডিরেক্টরদিগকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই পরামর্শের কথা শুনিয়া লর্ড ডালহাউসি সেনাপতি নেপিয়ারের প্রতি একটু বিরূপও হইয়াছিলেন। প্রতিবাদ অসহিষ্ণু লর্ড ডালহাউসি নেপিয়ার লরেন্স প্রভৃতির পরামর্শ অনুসারে যদি পূর্ব হইতেই সাবধান হইতেন, যদি সিপাহির অভাব অভিযোগ দূর করিবার মানসে সমধিক যত্নশীল হইতেন, তাহা হইলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের ন্যায় সহসা ভারতাকাশকে আলোকিত করিয়া সিপাহিযুদ্ধের জ্বালামালা ইংরাজ জাতিকে সংক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত করিত না।

সেনানী ও সেনা

সিপাহি সেনাদলের উপর যে সকল পুরাতন ইংরাজ সেনানী শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, তাঁহারা সিপাহিদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, সর্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতেন। সিপাহিও এই সকল সেনানীকে পিতৃতুল্য জ্ঞানে ভক্তি করিত। সিপাহিযুদ্ধের পূর্বে যখন চারিদিকে চাপাটি অর্থাৎ সাঙ্কেতিক রুটি চলিতেছিল, তখন এই সকল সেনানীকে কেহ সাবধান করিয়া দিলে, কেহ আশু বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সিপাহিও কখন মনে করে নাই যে, সে দুর্বার ঘটনার আবর্তে পড়িয়া তাহার এই সকল পুরাতন সেনাপতিকে হত্যা করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্বন্ধ সত্ত্বেও সিপাহি যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

এইবার সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিবার নানা উপায়ের বর্ণনা করিব। প্রথম উপায় 'চাপাটি', দ্বিতীয় পদ্মফুল, তৃতীয় হাড়ের মালা, চতুর্থ জলের আধার এবং পঞ্চম আশীর্বচন।

চাপাটি

হাতে ঠাসিয়া হাতের চাপড়ে প্রস্তুত করা রুটিকেই চাপাটি বলে। চাপাটি তাওয়ায় পাক করা হয় না; উহাকে একেবারেই অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া সেক করিয়া লইতে হয়। পুরাকালে যখন সাক্ষর বিদ্যার প্রচলন আমাদিগের দেশে ছিল না, তখন দশটা বা বিশটা গ্রামের লোককে সম্মিলিত হইয়া কোন কার্য করিতে হইলে এই চাপাটির ইঙ্গিত প্রেরণ করা হইত। কোন ব্যক্তি চাপাটি পাইলে তিনি মনে করিতেন যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সকল যোগাড় হইয়াছে, উপায় ও কার্য পদ্ধতি বুদ্ধিমানের অগ্নি-পরীক্ষায় সংস্কৃত হইয়াছে, এইবার কার্যারম্ভের সময় উপস্থিত। হিন্দিতে প্রবচন আছে, 'আঈ চাপাটি, লেও লাঠি' অর্থাৎ চাপাটি আসিল, এইবার লাঠি ধর। ইংরাজের আমলে চাপাটির প্রচলন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। ডাকের সুবিধার জন্য, লোকের নানাস্থানে যাতায়াতের সুবিধা হেতু, সকলেই এখন সকল স্থানে অনায়াসে যাইতে পারে এবং সকলকে মনোভাব নিঃসঙ্কোচে জ্ঞাপন করিতে পারে; তাই পুরাকালের চাপাটির ব্যবস্থা বহুদিন হইতে ভারতের গ্রামে ও পল্লিতে অব্যবহৃত ছিল। সিপাহিযুদ্ধের পূর্বে ফয়জাবাদের বিখ্যাত মৌলবি আবার ভারতে এই চাপাটির প্রচলন কবিয়াছিলেন।

পদ্মফুল

পদ্মফুল, বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই প্রেরণ করা হইত। এই পদ্মের সঙ্গে একটা হিন্দি ছড়া সেই ব্যক্তির কর্ণে আবৃত্তি করিয়া দেওয়া হইত। সেই ছড়াটি এই—'কই কাহুমে মগন, ম্যায় ওয়াহীমে মগন' অর্থাৎ অন্য যে কেহ যাহাতে তাহাতে মগ্ন থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মন প্রাণ উহাতেই মগ্ন আছে; উহার অর্থ, পদ্মফুল, স্বাধীনতার চিহ্ন, জিষ্ণুর বা রাজশ্রীর দ্যোতক। ইহার নির্গলিত অর্থ এই যে, সুদিন এবং শুভ অবসর হইয়াছে, ভগবানের অনুকম্পাও আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে; তাই আবার পদ্মফুল ফুটিয়াছে; এইবার উদ্‌যোগী হও, এই পদ্ম হস্তে করিয়া ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য অগ্রসর হও। ভোজপুরের কুমার সিংকে বাংলার পঞ্চকোটের মহারাজ নীলমণি সিংকে এবং গিধৌড়ের মহারাজকে এইরূপ তিনটি পদ্ম সিপাহিযুদ্ধের পূর্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কেবল গিধৌড়ের মহারাজ জয়মঙ্গল সিং এই পদ্ম গ্রহণ করেন নাই।

হাড়ের মালা

ইহা ফকির, দরবেশ, সন্ন্যাসী ও সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরিত হইত। এই হাড়ের মালার অর্থ—পার যদি তোমার অধীন অথবা অথবা তোমার নিকটবর্তী সকল মনুষ্যকে একভাবে ও এক সূত্রে মালারূপে গ্রথিত কর। সে মালা দেশের পূজায় ব্যবহৃত হইবে। পাটনার কলেক্টর টেলার সাহেব (W. Taylor) এইরূপ মালা বিতরণকারী তিন চারিজন দরবেশকে ফাঁসি দিয়াছিলেন।

জলের আধার

ইহা একটি তাম্রপাত্র; ইহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র থাকিত। যিনি ইহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাঁহার দুই বাহু কাচের চুড়ির দ্বারা সুশোভিত থাকিত। ইহার অর্থ এই যে, মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেও তাহার ভাবের আধারে ভাবময় সলিলরাশি রক্ষা করিতে পারে না; কিন্তু যদি মানুষ দেখিতে জানে ত বুঝিতে পারে যে, সে বন্ধন কাচের চুড়ির মত, আঘাত লাগিলে আপনিই ভাঙিয়া পড়িয়া যাইবে; আর ভাবের আধারে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র তাহা পবাধীনতার ছিদ্র হইলেও অতি সূক্ষ্ম এবং অনায়াসে তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারা যায়।

আশীর্বচন

ইহা ব্রাহ্মণ অথবা মওলানা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। সিপাহি যুদ্ধের পূর্বে কেবল দুইজনই আশীর্বচন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম, নানা ধণ্ডুপন্থ; দ্বিতীয়, দিল্লির বাদশাহ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ। আব আশীর্বচন লইয়াছিলেন ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই। আশীর্বচনের সঙ্গে একটি মন্ত্রও উচ্চারিত হইত। সেই মন্ত্রের অর্থ এই যে, মৃত্যুই অতীত গৌরবকে ভবিষ্যতের শ্লাঘার সহিত সংযোগ করিয়া দেয়। সুতরাং মৃত্যুকে পণ করিয়া তুমি স্বকার্য সাধনে তৎপর হও।

এই পাঁচটি ইঙ্গিত ছাড়া বহুবিধ পুস্তক ও পুস্তিকা সিপাহিদিগের দলের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। অনেক মৌলবি সন্ন্যাসী নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সিপাহিদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এই উৎসাহদান কার্যে নারীও নিযুক্ত হইয়াছিল।

আমরা সিপাহির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কথা, তাহার ভাবনার এবং শঙ্কার কথা, তাহার প্রতি বিলাতি সামরিক বিভাগের উৎপাত-উপদ্রবের কথা, তাহার ধর্মহানির সম্ভাবনার কথা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যে স্থবিরতা ও বৈষম্যের কথা সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসের উপক্রমণিকারূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। ফরেস্ট ম্যালিসন প্রভৃতি আধুনিক ইতিহাস-তত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিকদিগের লিখিত ইতিহাস পুস্তক হইতে আমরা এইরূপ অনেক কথাই সংগ্রহ করিয়াছি।

এইবার ইতিহাসের সূচনা করিব। লর্ড ডালহাউসির শাসনকালে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল এবং তিনি কি ভাবে এতদ্দেশীয়গণের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যাকার্যের ফলস্বরূপ সিপাহিযুদ্ধ কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রথমেই দিব। পরে পর্যায়ক্রমে সিপাহিযুদ্ধের অপূর্ব কাহিনি আবৃত্তি করিব।

বলিয়া রাখা ভাল যে, কেবল ইংরাজ লিখিত ইতিহাস সকলের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই অপূর্ব কাহিনির পুনরাবৃত্তি করিব না, ফরাসি লেখকগণের ইতিহাস পুস্তক এবং 'সাস্তাওন্ কা গদর' শীর্ষক নানাবিধ হিন্দি পুস্তক হইতে সিপাহিযুদ্ধের অনেক নূতন কথাও প্রকাশ করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

লর্ড ডালহাউসির পরিচয়

ভারতে বৌদ্ধ সভ্যতার অবসান হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই দ্বিসহস্র শতাব্দীর ভারতেতিহাসের পর্যালোচনা করিলে অনুমান হয় যে, ভারতেতিহাস অসংখ্য বিয়োগান্ত নাটকের বিন্যাস মাত্র। যেদিন শক, হূণ, শবরাদি তাতার জাতীয় বর্বরগণ ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছে, যেদিন অসিরীয় মহারানি সেমিরামিস্ ভারত জয় করিবার আশায় বহুবাহিনীর সহিত সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যেদিন এশিয়া-বিজয়ী যবনরাজ অলক্ষ্যেন্দ্র (Alexander) ভারতের পশ্চিমোত্তর অংশ জয় করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতেতিহাস-কথায় বিয়োগান্তক নাটকের ভীষণ ঘটনা সকলের ঘাত-প্রতিঘাতের সূচনা হইয়াছে।

সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস একখানি অতি ভীষণ বিয়োগান্তক নাটক। ইহার ঘটনা-সঙ্গতি সম্পূর্ণ দৈবাধীন হইলেও, ইহার ফলপ্রাপ্তির ভীষণতায় ভারতবাসীকে এখন পর্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ইহার উদ্ভব অবিশ্বাস সন্দেহে এবং ভয়ে, ইহার বিস্তার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থবিরতা হেতু, ইহার পরিণতি ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায়ের পশুত্বেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভারতের প্রধান শাসনকর্তা লর্ড ডালহাউসি এই বিয়োগান্ত নাটকের সূত্রধর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে লর্ড ডালহাউসি ভারতের প্রধান শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি তারিখে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পদার্পণ করেন। তিনি আকারে ক্ষুদ্র এবং শীর্ণকায় ছিলেন; তবে তাঁহার সুপ্রসর ললাট, অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি এবং দর্পদম্ভ-বিমিশ্রিত ব্যবহার তাঁহাকে ইতর সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিল। তিনি আট বৎসর কাল ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ছিলেন, কিন্তু কার্যকালে, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ সময়ে তিনি দুর্দমনীয় ছিলেন। তিনি অন্যের বিরোধ বা সমালোচনা সহ্য করিতে পারিতেন, না। তিনি অতি পরিশ্রমী, অতি মেধাবী হইলেও সহসা কোন কার্য করিতেন না। কিন্তু যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হইয়া কার্যারম্ভ করিতেন, তখন জগতের বিরোধকেও তিনি তুচ্ছ করিতে পারিতেন। প্রত্যহ তিনি প্রত্যুষে ছয়টার সময়ে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং সর্বাগ্রে ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' পাঠ করিয়া তিনি দিনের কার্য আরম্ভ করিতেন এবং নিশাকালে দ্বিপ্রহর অতীত না হইলে তিনি শাসনকার্যের চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না। শয়নের পূর্বে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া 'বাইবেল' পাঠ করিতেন। লর্ড ডালহাউসি কদাচিৎ গাড়ি জুড়িতে চড়িতেন না। বিদেশে যাইতে হইলে বা নগর পরিভ্রমণ করিতে হইলে তাঁহার অপূর্ব 'মহারাজ' নামধেয় আরবদেশীয় অশ্বে তিনি আরোহণ করিতেন। তিনি পট্টবস্ত্রে প্রস্তুত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এবং এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজদিগের ন্যায় মাথায় পাগড়ি বাঁধিতেন। তিনি

আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ উৎসব ভালবাসিতেন না, কিন্তু রাজকীয় 'ডিনার' (ভোজ) প্রভৃতিতে তিনি অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিতেন এবং দরবার প্রভৃতি উৎসবে একটু ধূমধাম ভালবাসিতেন।

রাজকার্যে লর্ড ডালহাউসি কখনো পরের কথায় মুগ্ধ হইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। এই বিশাল ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সকল বিভাগের সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা তিনি স্বয়ং অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া তবে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিতেন। এই হেতু তাঁহাকে অত্যধিক মাত্রায় পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার পরিশ্রম প্রভাবে তাঁহার অধীন সকল রাজকর্মচারীকে অল্প কার্য করিতে হইত। পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি বিখ্যাত স্যর হেনরি ইলিয়ট লিখিয়া গিয়াছেন যে,—সৌভাগ্যক্রমে লর্ড ডালহাউসি ৮ বৎসরকাল ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, আর আমি তাঁহার অধীন পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি ছিলাম। এই আট বৎসর কাল আমাকে বড় বেশি কিছু করিতে হইত না, বড়লাট নিজেই সকল কার্য করিতেন; ফলে আমি এই অবসরে পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কত অপরিজ্ঞাত, বিস্মৃত, পুরাতন কাগজপত্র সংগ্রহ করিতাম; আর সেই সংগ্রহের ফলে আট ভলিউম্ (খণ্ড) ভারতেতিহাসমূলক দলিল-পত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। বাস্তবিক ইলিয়ট কর্তৃক সংগৃহীত পুরাতন দলিলপত্র সমন্বিত এই আট ভলিউম্ পুস্তক ভারতেতিহাসের মূল ভিত্তি বলিয়া এখনও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। লর্ড ডালহাউসি যেমন তাঁহার অধীন কর্মচারিবর্গকে অতি কঠোর শাসনে রাখিতেন এবং তাঁহাদিগের অবিনয়ী ব্যবহার তিলমাত্র সহ্য করিতেন না, তেমনই তিনি স্বয়ং বিলাতে ডিরেক্টরগণের অর্থাৎ পরিচালকবর্গের অধীনতা মান্য করিয়া চলিতেন। তিনি কখনই কোন পত্রে ডিরেক্টরগণের প্রতি অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করেন নাই।

লর্ড ডালহাউসি প্রাজ্ঞ, প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ জগদ্‌বিখ্যাত লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার গবর্নমেন্ট হাউসে যখন লর্ড ডালহাউসি প্রবীণ লর্ড হার্ডিঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া শাসনকর্তার প্রতিজ্ঞামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন,তখন যাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মনে হইয়াছিল যেন পিতার নিকট হইতে যোগ্য পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির ভার বুঝিয়া লইতেছেন। সম্মুখে পলিতকেশ, লোলচর্ম অথচ দীর্ঘবপু, বিস্তারিতবক্ষ, প্রসন্নললাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দণ্ডায়মান আছেন, আর তাঁহারই পুরোভাগে খর্বকায়, শীর্ণদেহ অথচ যৌবনমদদৃপ্ত তেজস্বী যুবক ডালহাউসি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে যেমন আকারের বৈষম্য, প্রকৃতির বৈষম্য, ব্যবসায়ের বৈষম্য ছিল, তেমনই বয়সেরও বৈষম্য ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধব্যবসায়ী এবং যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তাঁহার মন উদার ও উন্নত ছিল; তিনি ক্রূরতা, কুটিলতা, শঠতা, কপটতা জানিতেন না; তিনি ক্রূর ও কুটিল ব্যক্তির সাহচর্যও করিতেন না। পক্ষান্তরে লর্ড ডালহাউসি যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন; কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন নাই; কখনও স্বয়ং রাইফেল হাতে করিয়া একটা গুলিও ছোঁড়েন নাই; তাঁহার অস্ত্র লেখনী; তাঁহার অবলম্বন রাজনীতিক চাতুরী এবং কুটিলতা। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতে ইংরাজ অধিকারের অতিবিস্তারে শঙ্কিত হইয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবে শিখশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে, কাবুলের আমীরের সহিত ইংরাজের সদ্ভাব রক্ষিত হইলে, উত্তরে অযোধ্যা ও নেপাল স্বাধীন থাকিলে ইংরাজ নিশ্চিন্ত হইয়া স্বীয় অধিকারে তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাব

অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। তাই তিনি প্রথম পঞ্জাব যুদ্ধে জয়ী হইলেও গোলাব সিংকে কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া মান্য করিয়া লইয়াছিলেন, পঞ্জাবে মহারাজ দিলীপ সিংকে স্বাধীন রাখিয়াছিলেন। লর্ড ডালহাউসিকে রাজ্যভার অর্পণ করিবার সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছিলেন—'আমি যেভাবে দেশ শাসন করিলাম, সেইভাবে তুমি শাসনকার্য পরিচালনা করিলে আগামী সাত বৎসরের মধ্যে তোমাকে যুদ্ধোদ্যম করিতে হইবে না; হয়ত বা একটি বন্দুকও ছুঁড়িতে হইবে না।' কিন্তু লর্ড ডালহাউসি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি অতিশয় উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলেন, তিনি ভারতে কোম্পানির শাসনের পরিসমাপ্তি করিবার জন্য আসিয়াছিলেন--মহারাজ রণজিৎ সিং কর্তৃক কথিত 'সব লাল হো যায়েগা'—এই প্রবচনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে আসিয়াছিলেন। তাই লর্ড ডালহাউসি লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে পারেন নাই।

দুইটি সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া লর্ড ডালহাউসি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সংকল্প এই যে, ভারতে ইংরাজের শাসনের ছায়ায় যাহারাই থাকিবে, তাহাদিগকেই অধীন সামন্তভাবে, অথবা প্রজারূপে অবস্থিতি করিতে হইবে। ভারতে একা ইংরাজই রাষ্ট্রপতি ও নরপতি হইয়া থাকিবেন, অপর সকলে ইংরাজের সামন্তরূপে বিরাজ করিবে। তাঁহার দ্বিতীয় সংকল্প এই ছিল ে, ভারত শাসন বিষয়ে পুরাতন জটিল বাদশাহী নীতি ও পদ্ধতির তিনি অনুসরণ করিবেন না; ভারত শাসনকার্যে ইউরোপের রাজনীতি সিদ্ধান্ত সকল অবলম্বন করিবেন। রাজ্য যখন ইংরাজের, তখন ইংরাজের অবলম্বিত রাজনীতি এ দেশে প্রচলিত থাকা বিধেয়, ইহাই লর্ড ডালহাউসির ধারণা ছিল।

এই দুই সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে যাইয়া লর্ড ডালহাউসি উত্তরে পঞ্জাবের ও অযোধ্যার মধ্যপ্রদেশে ঝাঁসির ও নাগপুরের ভোঁসলাদিগের, দাক্ষিণাত্যে সাতারার, পূর্বে ব্রহ্মদেশের উন্নত মস্তক ব্রিটিশ পদতলে দলিত করিয়াছিলেন। আর, পুরাতন রীতি-পদ্ধতি অগ্রাহ্য করিয়া, পুরাতন চুক্তি-প্রতিশ্রুতি অমান্য করিয়া, দেশীয়দিগের সকল অধিকার এবং সমাজ ও ধর্ম বিষয়ের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যটুকুও তিনি চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার এই নীতির ফলে প্রত্যেক ভারতবাসীর মনই অনিশ্চিয়তার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সেই দুর্বার দুরাকাঙ্ক্ষার ফলে সিপাহিযুদ্ধ সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি সিপাহিযুদ্ধের অনুষ্ঠাতা ও প্রবর্তক ছিলেন, আর লর্ড ক্যানিং তাহার হলাহলটুকু উপভোগ করিতে আসিয়াছিলেন। অনেকের অনুমান এইরূপ করিয়া থাকেন যে, সিপাহিযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু লর্ড ডালহাউসির ন্যায় মদোদ্ধত ইংরাজ ভারতবর্ষে গবর্নর জেনারল হইয়া না আসিলে উহা হয় ত এত শীঘ্র সংঘটিত হইত না।

লর্ড ডালহাউসি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে তিলমাত্রও চিনিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, মার্কিন দেশের আদিম অধিবাসিগণ যেমন,—ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানগণও ঠিক তেমনই—একইরূপ বর্বর, একইরূপ মূর্খ এং একইরূপ কোমল প্রকৃতি ছিল। মার্কিন দেশে ইংরাজ যেমন বিলাতি রীতিনীতির প্রচলন কবিয়া সুখে বাস করিতেছেন, তেমনই ভারতেও ইংরাজ বিলাতি রীতি-পদ্ধতির প্রচলন করিয়া চিরদিনের জন্য রাজশক্তি, সমন্বিত হইয়া থাকিতে পারিবেন। দুই তিন বৎসরকাল ভারত শাসন করিবার পর যখন লর্ড ডালহাউসি বুঝিলেন যে, এ দেশ সে দেশ নহে,—ভারতবর্ষ মার্কিন নহে, ভারতের হিন্দু মুসলমান ক্ষত্রিয় পাঠান নিতান্ত বর্বর ও দুর্বলচিত্ত নহে,—তখন তাঁহার দাম্ভিক প্রকৃতি তাঁহাকে এই বুঝাইয়া রাখিল যে, পুরাতন স্থবির হিন্দু জাতির অতি পুরাতন রীতি-পদ্ধতি

ইংরাজ পদদলিত না করিলে আর কে করিবে? ইংরাজ মুসলমানকে শাসনাধীন না রাখিলে আর কে রাখিবে? লর্ড ডালহাউসি কোন এক শিখ সর্দারকে বলিয়াছিলেন যে, 'ইংরাজ তোমাদের রাজা; ইংরাজের ভাষা, ইংরাজের পোষাক পরিচ্ছদ, ইংরাজের রীতি-পদ্ধতি তোমাদের রাজার জাতির বলিয়া সর্বথা তোমাদের মান্য এবং তোমাদিগের আদর্শস্থানীয়; আমরা যাহা বলিব, তাহা শ্রেষ্ঠের ও পূজ্যের বাণী বলিয়া তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।'—যে শাসনকর্তার এমন স্পর্ধার কথা, সে শাসনকর্তা যে ভারতবাসীকে মর্মপীড়া দিবে, সে পক্ষে কি আর সন্দেহ আছে?

পঞ্জাব-বিজয়-আকাঙ্ক্ষা

১৮৪৫/৪৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড গাফ প্রথম শিখ যুদ্ধের অবসান করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশের পূর্বদিকের প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। খাস পঞ্জাবকে অভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দিলেও লাহোরে, ফিরোজপুর ও অম্বালায় ইংরাজ সেনানিবাস স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ মহারাজ দিলীপ সিংহের নাবালকী সময়ে খাল্সা সেনার অনেক অংশকে কর্মচ্যুত করিয়া সংখ্যায় শিখ চমূকে ক্ষুদ্রতর আকারে পরিণত করিয়াছিলেন। পূর্বে,—খাল্সার স্বাধীনতা কালে শিখদিগের শিক্ষিত সেনার সংখ্যা ৮৫ হাজার ছিল, আর তিন শত পঞ্চাশটি বিশালকায় তোপ ও তদুপযোগী গোলন্দাজ সেনা ছিল। ইহারা সকলেই সমরবিদ্যাবিদ্ ফরাসি ভেঞ্চুরা ও আলার্দের নিকট শিক্ষিত হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই বিশাল বাহিনীকে ২৪ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনায় পরিণত করিয়া পঞ্জাব প্রদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, আর ৩৫০টি তোপের স্থানে কেবল ৫০টি তোপ খাল্সা সেনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পঞ্জাবের সকল ঘাঁটিতে ইংরাজের সত্তর হাজার গোরা সেনা যুদ্ধার্থ সদাই সশস্ত্র ও প্রস্তুত ছিল। তিনি পশ্চিমোত্তর প্রদেশের সকল সেনানিবাসেই সেনাসংখ্যা দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। শতদ্রু নদের তীরে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তিনি পঞ্চাশ হাজার সিপাহি ও গোরা সেনার সন্নিবেশ করিয়াছিলেন এবং ৬০টি বিলাতি তোপের সকল উপকরণ সহ, অবস্থান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোর নগরে ইংরাজের অধীন নয় হাজার গোরা ও সিপাহি সদাই সশস্ত্র ও প্রস্তুত হইয়া থাকিত; পঞ্জাবের অন্য নগর ফিরোজপুরে অশ্বারোহী, পদাতি, গোলন্দাজ প্রভৃতি নানাবিধ সেনার দল সুসজ্জিত হইয়া থাকিত; ইহা ছাড়া দক্ষিণে সিন্ধু প্রদেশে, পর্বতসঙ্কুল বন্ধুর পশ্চিমোত্তর সীমান্ত দেশে; ইংরাজের সেনানিবাসসকল স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, লর্ড হার্ডিঞ্জ সমরবিদ্যাবিশারদ ছিলেন; তিনি সামরিক সুবিধা বুঝিয়া যাহা কর্তব্য, তাহাই সাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নীতি ছিল যে ভারতের সাধারণ প্রজা তাহাদিগের চিরপ্রচলিত চিরদিনের মান্য পদ্ধতি অনুসারে শাসিত হউক,—পারে ত তাহারা এই শাসনাধীনতায় সুখে থাকুক; ইংরাজ কেবল দেশে শান্তিরক্ষা কল্পে সামরিক স্থানগুলি স্বাধিকারে রাখিয়া বাণিজ্য কার্যে মনোনিবেশ করুন। তাই লর্ড হার্ডিঞ্জ ধরাবক্ষের নন্দনস্বরূপ কাশ্মীর প্রদেশকে মহারাজ গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন; আর জম্বু ও কাশ্মীরে গোলাব সিংহের ও তাঁহার বংশধরগণের অপ্রতিহত প্রভাব মান্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি অযোধ্যার নবাব বাহাদুরকে King বা রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং রাজোচিত মান্য দানে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তাই তিনি ভারতের

অন্যান্য নরপতিকে দত্তক গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই এবং তাঁহাদিগের শাসনকার্যে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাই তিনি ইংরাজের শিক্ষিত সিপাহিদিগকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন এবং তাহাদিগের আদর আব্দার রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেন।

লর্ড ডালহাউসি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে, পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে ভারত শাসন করিলে আর চলিবে না। তাই তিনি পুরাতনকে পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবার মানসে কার্য আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ইংলন্ডের রাজশক্তি সম্যক্ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই দুর্বলতার কালে ভারতে ইংরাজের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। সেই জন্যই প্রথমে ইংরাজ ভারতে রাজশক্তি পরিচালনা করেন নাই। যে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতে দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন, তিনিও কখন মনে করেন নাই যে, ইংরাজ ভারতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া সামন্ত ও অর্ধ-স্বাধীন রাজগণ পর্যন্ত সকলকেই কঠোর শাসনের সমসূত্রে সংবদ্ধ রাখিবেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজ কেবল ভারতীয় রাজন্যবর্গের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিবেন, ইংরাজের বাণিজ্য-বিস্তার পক্ষে যতটুকু দেশ খাস দখলে রাখা প্রয়োজন, ততটুকুই খাস দখলে রাখিবেন, বাকি সকল দেশই সামন্ত রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইবে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ ভারতবাসীকে কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন, আর পাছে ভারতের সামন্ত রাজগণ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ উপস্থিত করিয়া অভ্যন্তরীণ শান্তিভঙ্গ করেন, তাই ইংরাজ ভারতের নানাস্থানে সেনানিবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি বলিয়াছিলেন যে, পূর্বে কে কি ছিল, পূর্বে সেঁধিয়া হোল্‌কার বরোদা কেমন ছিলেন সে ভাবনা আমাদের ভাবিবার অধিকার নাই, আমরা যাহাদিগকে রাজা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে বংশপরম্পরায় তাহাদিগের দেশাচার ও ধর্মাচার অনুসারে রাজাসনে আসীন রাখিবই। সুতরাং ইংরাজ গবর্নমেন্ট এবং লর্ড ওয়েলেস্‌লির পর ভারতের অন্যান্য গবর্নর জেনারেল, ইংরাজের খাসদখলের দেশ ব্যতীত অন্য সর্বদেশেই প্রজাশাসন বিষয়ে একেবারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই ব্যবস্থার ফলে যে সর্বত্রই সুশাসন বিরাজ করিত, তাহা নহে; বহুস্থানের নবাব বা রাজা দুশ্চরিত্রতার ও লাম্পট্যের গভীর কূপে সদাই নিমগ্ন থাকিতেন। প্রজাবর্গ স্বার্থপর, হীন, ক্রূরমনা রাজকর্মচারীদিগের দ্বারা নিত্যই উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হইত; মধ্যে মধ্যে এই উৎপাত উপদ্রবের কাহিনি ইংরাজ গবর্নমেন্টের কর্ণগোচর হইত। অনেক সময়ে, থাকিতে না পারিয়া, কোন কোন বড়লাট দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করিতেন। লর্ড হার্ডিঞ্জকে অযোধ্যার শাসন-ব্যাপারে একটু হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।

লর্ড ডালহাউসি দেখিলেন যে, এ ত বড় মজার কথা—ইংরাজ যুদ্ধ করিবে, হৃদয়ের শোণিতে ভারতক্ষেত্রকে সুরঞ্জিত করিবে, অথচ ভারত শাসনের দায়িত্ব ও শ্লাঘা গ্রহণ করিতে পারিবে না! তিনি তাই কার্যভার গ্রহণ করিয়াই পুরাতন পদ্ধতির দোষ দেখিতে লাগিলেন। তাহার রঞ্জিত দৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন যে, পঞ্জাবের প্রজা উৎপীড়নে অধীর হইয়া আর্তনাদে দিগ্‌দেশ মুখর করিয়া তুলিয়াছে, দেখিলেন অযোধ্যায় প্রজা নবাবের উৎপীড়নে ও অত্যাচারে যেন নগ্নদেহ ও শীর্ণকায় হইয়া আছে; যেখানেই দেশীয় রাজ্য, দেশীয় শাসন, সেইখানেই লর্ড ডালহাউসি অত্যাচার উপদ্রব, পাপ ও শয়তানি দেখিতে লাগিলেন। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রথমেই পঞ্জাব প্রদেশকে ইংরাজের পূর্ণায়ত্ত

করিতে হইবে; বিশেষ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মধ্য এশিয়ায় ধীরে ধীরে রুশ এক বিশাল রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছে; কালে রুশের সেই বিশাল সাম্রাজ্যের সীমা হয়ত ইংরাজ রাজ্যের সীমার সহিত সংলগ্ন হইবে, অতএব পঞ্জাব জয় করিয়া রুশের গতিবিধি লক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজের আর একটু অগ্রসর হইয়া থাকা ভাল।

লর্ড অক্ল্যান্ডের আমলে স্যর হেনরি পটিঞ্জর মুসলমান বেশে মধ্য এশিয়ায় পর্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ইংরাজের পূর্বোক্ত subsidiary system বা সামন্ত পদ্ধতি অনুসারে রুশ মধ্য এশিয়ার খাঁদিগের অধিকৃত দেশ সকল আয়ত্ত করিতেছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সমধিক উদ্‌যোগী না হইলে রুশ কালে পারস্য সাম্রাজ্যকে গ্রাস করিবে; কাজেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে ইংরাজের অধীন রাখিতে হইলে ভারত হইতে ইউরোপে যাতায়াতের পথ নিষ্কণ্টক রাখিতে হইবে। লর্ড ডালহাউসি রাজনীতিবিদ্ পটিঞ্জরের এই সকল সিদ্ধান্ত কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাই তিনি সর্বাগ্রে পঞ্জাব বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর কুটিল রাজনীতিবিদ্ লর্ড ডালহাউসি মনের সকল ভাব ব্যক্ত করিবার পাত্র ছিলেন না, তাই তিনি প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া পঞ্জাবের প্রজাদিগের দুঃখকাহিনি গান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগের দুঃখে দুঃখানুভব করিয়া অজস্র ধারায় সমবেদনার নেত্রনীর প্রক্ষেপ করিয়া ভারতের ধূলিময় ধরাতল অভিসিঞ্চিত করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে তখন পঞ্জাবে লর্ড ডালহাউসি সমকক্ষ রাজনীতিবিদ্ কোন দেশীয় শাসনকর্তাই বর্তমান ছিলেন না; তখন পঞ্জাবের বীরগণ লোলাপাঙ্গীর বিলাসবিভ্রম-বিমূঢ়তায় আচ্ছন্ন ছিলেন, ইতিকর্তব্য নির্ধারণে তাহারা কেহই বিচক্ষণ ছিলেন না; আত্মদ্রোহ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও কলহ তখন পঞ্জাবের সর্দারগণকে সদাই নিপীড়িত করিত; তাই লর্ড ডালহাউসি পঞ্জাব অধিকার করিবার ছল অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, যুগযুগান্তরের ভারত-ইতিহাস এক একখানি বিয়োগান্ত নাটক মাত্র; সে নাটকে বিধাতার তাড়না আছে, নিয়তির বজ্রসূচীবেধ আছে, আর আছে শয়তানের শয়তানি। শয়তান নানারূপে নানাভাবে ভারতবাসীর করকবলিত দগ্ধ শোল মাছটিকে পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে—আর, অপহৃত প্রবঞ্চিত ভারতবাসী আত্মগ্লানির শত বৃশ্চিকদংশন-জ্বালায় অধীর হইয়া চিরদিনের জন্য শ্মশানের অরুন্তুদ শোক-ধ্বনিতে গৃহপ্রাঙ্গণকে পূর্ণ রাখিয়াছে।

পঞ্জাব-বিজয়ের বিয়োগান্ত নাটকে বিধাতার তাড়না খালসা সেনা ঔদ্ধত্যে প্রকাশ পাইয়াছিল; নিয়তির বজ্রসূচীবেধ মহারানি ঝিন্দনের রূপযৌবনবিকাশে, লাল সিং, তেজ সিং, গোলাব সিং প্রভৃতির বিলাসলালসার বিকট অভিব্যঞ্জনায় অনুভূত হইয়াছিল। এইটুকু বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে ভারতবাসী যতই কেন পাপাসক্ত বা পতিত হউক না, তাহার সারল্য কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, বুঝি যা করিতেও পারে না। ইউরোপের এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া উচ্চ রাজনীতির নামে আমরা যে কুটিলতার পরিচয় পাইয়াছি, তেমন কুটিলতা, তেমন ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠন-বিদারী অন্তর্ভেদী শাঠ্যের পরিচয় বুঝি বা বাদশাহ আলমগীরেরও ছিল না। ইতিহাসে আওরঙ্গজেবের যে চতুরতার পরিচয় পাইয়া থাকি, ইউরোপের রাজনীতিক চাতুরীর তুলনায় তাহাকে 'ছেলেখেলা' বলিলেও চলে। পঞ্জাব পতিত হইলেও ভারতের প্রকৃতিজাত সরলতা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই এবং পঞ্জাবের কোন সর্দারই মনে করিতেন না যে, যে আশ্বাস যে ভরসা লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রথম

শিখযুদ্ধের পরেই শিখজাতিকে দিয়া গিয়াছিলেন, সে আশ্বাস সে ভরসার বাণী চারি বৎসরের মধ্যে, শাসনভার গ্রহণ করিয়াই, লর্ড ডালহাউসি এত অনায়াসে ব্যর্থ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষে সকল প্রদেশেই 'মরদ্ কী বাত্, হাত্তী কা দাঁত' এই প্রবচনটি সকল অবস্থাতেই সকলে মান্য করিয়া থাকে। ভারতবাসী জানে যে, কাহারও পক্ষের কোন নায়েব যদি কাহাকেও কোন কথা বলিয়া আসে, তাহা হইলে সে কথা চিরকাল অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেই হইবে। তাই পঞ্জাবের সর্দারগণ ইংরাজের চাতুরীর পরিসর প্রথমে মাপিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়বার পঞ্জাবযুদ্ধের পর যখন এই চাতুরী প্রকাশ পাইল, তখন ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর বিরাগ অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরাজের পূরবীয়া সিপাহিগণই পঞ্জাব বিজয়কল্পে ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দেহের শোণিত শতধারায় প্রবাহিত করিয়াছিল; তাহাদের মনে যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধের সময়ে দুইটি ভাব সদাই জাগরুক থাকিত। প্রথম ভাব, শিখের প্রতি বিদ্বেষ। লর্ড অক্ল্যান্ডের আমলে কাবুলে ইংরাজের পরাজয়ের পর সিপাহি সেনা যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, আবার যখন সেনাপতি নট্ ও পলকের পরিচালনাধীন থাকিয়া প্রতিশোধ লইবার কামনায় অভিযান করিতেছিল, সেই দুই সময়েই খালসার উদ্ধত সেনাগণ সিপাহিদিগকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গে ব্যথিত করিয়াছিল। বীরের পক্ষে হৃদয়ের সে ব্যথা সহজে বিলীন হইবার নহে;—পরাজয়ের সে মর্মপীড়া শত্রুর উষ্ণ শোণিতেই বিধৌত হইয়া থাকে। ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের শোণিতপান হইতে পঞ্জাবযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিহিংসার এই বিধিই ভারতের বীর-সমাজে গ্রাহ্য ও মান্য ছিল। হিন্দু সিপাহি সে বিধির দুষ্ট সংস্কারের বশবর্তী ছিল; তাই ইংরাজ সেনানীদিগের আদেশে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে করিয়া সিপাহির দল পঞ্জাব বিজয়ের জন্য রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিল। সিপাহিদিগের মনের দ্বিতীয় ভাব, যুদ্ধবিলাস। সিপাহি যেমন আমোদ করিবার জন্য সকাল সন্ধ্যা ভাঙ খায়, তেমনই দুঃখে বা ক্ষোভে অধীর হইলে সে যুদ্ধ করিতে চায়। লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমল হইতে অবিচার ও উৎপীড়নের পারম্পর্যে পীড়িত হইয়া সিপাহি যখন অধীর হইত, তখনই সে যুদ্ধের উন্মাদনায় এই অধৈর্যের পর্যবসান করিত। সিপাহির দৃষ্টিতে লবণটা পরম পবিত্র; সিপাহি সহসা নিমকহারাম হইতে পারে না; তাই যতদিন সাধ্য, যতদিন সম্ভবপর, কোম্পানি বাহাদুরের লবণ খাইয়া ততদিন সে কোম্পানির সেবায় দেহপাত করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। দ্বিতীয় পঞ্জাব যুদ্ধের সময় সিপাহি ভাবিয়াছিল যে, প্রথম যুদ্ধের মতন ইহাও একটা যুদ্ধই হইবে, আর একবার সম্মুখ সমরে শিখকে পরাজয় করিবার সুখভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে; তাই সে উৎফুল্ল হৃদয়ে আত্মদান করিবার জন্য মহারণ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সিপাহি কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, ইংরাজ শিখজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকল্পে শিখকে পঞ্জাবের একটুকরা ভূমিও দিবেন না; সিপাহির কখন খেয়ালেও আসে নাই যে, এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাহারই সহায়তায় সমগ্র পঞ্জাবকে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড ডালহাউসি গ্রাহের ন্যায় দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। যুদ্ধের পরে যখন সিপাহি দেখিল যে, সত্য সত্যই পঞ্জাবের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল, তখন তাহার কঠোর নয়নের কোণে ক্ষোভের ও প্রবঞ্চনার এক বিন্দু অশ্রু যেন হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখ সমরের সূচনা

সোব্রাওনের ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে রণবীর লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ এই যুদ্ধের পর শিখ রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করেন নাই। তিনি শিখপ্রধানদিগকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র বালক দিলীপ সিংকে স্বাধীনভাবেই রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে মিঞামীরের সুপ্রসর ক্ষেত্রে এই সন্ধিপত্র উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত হয়। সন্ধির ব্যবস্থা অনুসারে কোম্পানি বাহাদুর শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী জলন্ধর দোয়াব গ্রহণ করেন এবং যে সমস্ত খালসা সৈন্য ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হয় ও তাহাদিগের সংখ্যা, পদাতিক ও অশ্বারোহী, প্রভৃতি ২৪ হাজারে পরিণত করা হয়। খালসা দরবারে অধিকৃত ৩৫০টি তোপের মধ্যে ৩০০টি কামান কাড়িয়া লইয়া মোট ৫০টি কামান এবং তদুপযোগী গোলন্দাজ সেনা লর্ড হার্ডিঞ্জ খালসা দরবারকে ছাড়িয়ে দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দেড় কোটি টাকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব কিংবদন্তী অনুসারে লোক-সাধারণের ধারণা ছিল যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ মৃত্যুকালে রাজ কোষাগারে ১২ কোটি টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পর লর্ড হার্ডিঞ্জ লাহোরের রাজকোষে মোট ৫০ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন; তাই তিনি এক কোটি টাকার নিমিত্ত কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রাজা গোলাব সিং এই সময়ের জম্বুর শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি লাহোর দরবারের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন এবং সুচতুর রাজনীতিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি কোটি মুদ্রা দিয়া কাশ্মীর প্রদেশ লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এই মিঞামীরের সন্ধিকে ঐতিহাসিক আর্নল্ড কসূরের সন্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সন্ধির সময়ে দিলীপ সিং অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে রক্ষা করিবার জন্য লাহোরে নয় হাজার ইংরেজ সেনার অধিষ্ঠান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর দেশ-শাসন কার্যভার দিলীপের মাতা মহারানি ঝিন্দনের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। মহারানি ঝিন্দন অসামান্যা রূপবতী ও সুন্দরী ছিলেন; তিনি বিলাসিনী হইলেও এবং অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইলেও, এক হিসাবে তিনি তেজস্বিনী নারী ছিলেন। তাহার যেরূপ বুদ্ধিপ্রাখর্য ছিল, যেরূপ অভিনিবেশসামর্থ্য ছিল, তাহাতে তিনি নারীহৃদয়ের অধিকারিণী না হইয়া যদি পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিপ্রভাবে লর্ড ডালহাউসি নিশ্চয়ই পরাজিত হইতেন; আর, পঞ্জাবের সূচ্যগ্র ভূমিও ইংরেজের অধিকৃত হইত না।

কিন্তু ঝিন্দন নারী ছিলেন, বৃদ্ধ স্বামীর যুবতী পত্নী ছিলেন; তাঁহার বিলাসের পিপাসা শতধা বিস্তীর্ণ হইয়া যেন সর্বদেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মহারানি ঝিন্দন প্রাজ্ঞ ও প্রাচীন গোলাব সিংকে মন্ত্রিত্ব পদ হইতে চ্যুত করিয়া রাজা লাল সিংকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করিয়াছিলেন। রাজা লাল সিং নীচ সূত্রধরের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লাল সিং সত্য সত্যই লাল সিং ছিলেন;—তিনি অতিশয় সুপুরুষ, অতিশয় সুকান্ত, মনোহর যুবক ছিলেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃতি তেমন সুন্দর ছিল না; তিনি রণনিপুণ ছিলেন না, রাজনীতিকুশল ছিলেন না; পরন্তু তোষামোদপ্রিয় বিলাসী ছিলেন; ফলে লাল সিং শিখসমাজে অতিশয় অযোগ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। গ্রিক কবি 'কিউপিড' বা কন্দর্পকে অন্ধ করিয়া সাজাইয়াছেন, তাই মহারানি ঝিন্দন প্রখর বুদ্ধিশালিনী হইলেও লাল সিংহের বিষয়ে একেবারেই অন্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় পাত্রকে ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণমনা ও ক্ষীণতেজা জানিয়াও মহারানি ঝিন্দন রাজ্যের শাসনভার তাহার হস্তেই সমর্পিত রাখিয়াছিলেন।

ভাগ্যদোষেই হউক, অথবা ভাগ্যপ্রভাবেই হউক, পঞ্জাব দীর্ঘকাল এই অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির ক্রীড়ার সামগ্রীর স্বরূপ ছিল না। গোলাব সিং সন্ধির নিয়মানুসারে তাঁহার ক্রীত সম্পত্তি কাশ্মীর অধিকার মানসে লাহোর ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে গমন করেন। এই সময়ে সেখ ইমামউদ্দীন নামক একজন মুসলমানের হস্তে কাশ্মীরের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। লাল সিং ইমামউদ্দীনের প্ররোচনায় প্রমত্ত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সৈন্য-সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া কাশ্মীর প্রদেশে গোলাব সিংহের গতিরোধ করিলেন। ওদিকে ইমামউদ্দীনও গোলাব সিংহের গতিরোধ বাসনায় কাশ্মীরে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দিলেন। সে ঘোষণাপত্রে ইংরাজের অযথা নিন্দা, গ্লানি ও কুৎসা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে হেনরি লরেন্স লাহোরে ইংরাজ পক্ষের রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কোনো কার্যই অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিবার পুরুষ ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন যে, কাশ্মীর অধিকার ব্যাপারটা লইয়া ইমামউদ্দীন ও লাল সিং একটা কি চক্রান্ত করিয়াছে এবং কাশ্মীর দখল করিতে হইলে গোলাব সিংকে যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতপাত করিতে হইবে, তখন তিনি দশ সহস্র শিখ অশ্বারোহী ও কতিপয় ইংরেজ গোলন্দাজ সেনা সঙ্গে লইয়া তুহিনমণ্ডিত পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হন। দুর্দান্ত ইমামউদ্দীন সেনাপতি হেনরি লরেন্সের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তিনি স্বরাজ্যে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যাহার করেন; সঙ্গে সঙ্গে রাজা লাল সিং যে গুপ্ত পত্র তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি হেনরি লরেন্সের সমক্ষে উপস্থাপন করেন। লরেন্স মহোদয় সব সহিতে পারিলেন, কিন্তু লাল সিংহের এই কপটতা সহিতে পারিলেন না। যাহাতে অচিরে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিধান ব্যবস্থা হয়, তাহারই জন্য তিনি একটি বিচার-সমিতি (Commission of Enquiry) স্থাপন করিলেন। এই সমিতিতে কেবল ইউরোপীয় রাজপুরুষেরাই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিচারে লাল সিং দোষী সাব্যস্ত হইলেন এবং বৃত্তিভোগী হইয়া আগরায় নির্বাসিত হইলেন।

রাজা লাল সিংহের অধঃপতনের পর রাজ্যে সুব্যবস্থা রক্ষার নিমিত্ত মহারানি ঝিন্দন পুনর্বার কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হন। বহরাবল নামক স্থানে এই সন্ধি লিপিবদ্ধ হয় বলিয়াই ইহাকে বহরাবলের সন্ধি বলে। এই সন্ধির ব্যবস্থা অনুসারে, লাহোর দরবার হইতে কতিপয় সুদক্ষ রাজনীতিক শিখ সর্দারের নির্বাচন করিয়া একটি শাসন-সমিতি স্থাপন করা হয়; ইংরাজ রেসিডেন্ট হেনরি লরেন্স সাহেব এই সমিতির কর্তা হন। দিলীপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, সন্ধির নিয়মানুসারে এই শাসকসমিতি দ্বারা রাজ্য শাসন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দাঁড়াইল এই যে, যতদিন মহারাজ দিলীপ সিং প্রাপ্তবয়স্ক না হন, ততদিন কোম্পানি বাহাদুর হেনরি লরেন্সের মারফতে দিলীপের অভিভাবক স্বরূপ হইয়া পঞ্জাবের প্রকৃত শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং বলিতে হয় যে, এই সময় হইতে হেনরি লরেন্সই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পঞ্জাবের হর্তা কর্তা বিধাতা হইলেন।

হেনরি লরেন্স অসাধারণ ইংরাজ রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে যোদ্ধা, বীর ও দক্ষ রাজনীতিক ছিলেন। তিনি নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া এই গুরুতর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম ও মনুষ্যত্ব ভাবিয়া সে ভার ও দায়িত্বে তিনি কখনই চাতুরীর কলঙ্ক-লেপ পড়িতে দেন নাই। হেনরি লরেন্সের প্রস্তাবে খালসার নিরস্ত্র সৈন্যগণ আবার ভূমিকর্ষণে মনোনিবেশ করিল, যোদ্ধার ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহারা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিল।

কিন্তু যৌবনপ্রমত্তা মহারানি ঝিন্দনের এ শান্তি, এ শাসন-কঠোরতা ভাল লাগিল না। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয় পুত্র ইংরাজের করসূত্রধৃত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, যাহা শিখের ও খালসার সর্বস্ব, সেই রণবিলাস ধীরে ধীরে হেনরি লরেন্সের শীতল শাসনের জলপ্রক্ষেপে যেন নির্বাপিত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, ইহা ত পরোপকার করা নহে, ইহা তো দিলীপকে রক্ষা করা নহে, ইহা তো পঞ্জাবের শাসন ও পালন নহে—ইহা পরোপকারের আবরণে স্বার্থসিদ্ধির মুখবন্ধস্বরূপ, ইহা দিলীপের স্বার্থরক্ষার ছলে তাহার সর্বনাশের সূত্রপাত, ইহা পঞ্জাব শাসনের ও পালনের চাতুরীতে পঞ্জাবকে নির্বীর করিবার উদ্যোগ। ধীরবুদ্ধি হেনরি লরেন্স এই তেজস্বিনী নারীর তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ নারী তাপময়ী অগ্নিশিখার ন্যায় সদাই প্রোজ্জ্বলা; তিনি বুঝিলেন, যে তাপ তুষানলের ন্যায় অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় সম্প্রসারিত হইয়া হৃদয়কে স্তরে স্তরে দগ্ধ করে, সে জ্বালার গতিরোধ কখনই সম্ভবপর নহে; সে জ্বালাকে একেবারেই নির্বাপণ করিতে হয়। তাই রেসিডেন্ট হেনরি লরেন্স সহসা স্থির করিলেন যে, মহারানি ঝিন্দনকে পঞ্জাব হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে। কোন অভিযোগ নাই, বিচারপদ্ধতির চিহ্ন মাত্র নাই, তদন্তের চেষ্টা মাত্র নাই--কেবল সর্বশক্তিমান রেসিডেন্ট ইচ্ছা করিলেন যে, মহারানি ঝিন্দন তাঁহার স্বামীর রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইবেন, আর অমনই তাঁহার নির্বাসনের উদ্যোগ হইল। ঝিন্দন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন; অবনত মস্তকে নির্বাক হইয়া এই গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিলেন। মুসলমান অধিবাসিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত সেখপুরা নামক নির্জন স্থানে ঝিন্দনের আবাস-গৃহ নিরূপিত হইল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট তারিখে

পঞ্জাবের লোক-ললামভূতা রূপৈশ্বর্য সম্পন্না যৌবনপ্রমত্তা বীরাঙ্গনা মহারানি ঝিন্দন, সেখপুরার কদর্য কারাগৃহে নিজ দেহকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, যেন রূপের ও মনীষার যুগল দীপশিখা স্বেচ্ছায় নির্বাপিত করিলেন। ইতর জাতীয় রাজা লাল সিং যে বিচারের অধিকারে বঞ্চিত হন নাই, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের হৃদয়বিলাসিনী মহারানি ঝিন্দন সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন—তাঁহার অপরাধের তদন্ত না করিতে, তাঁহাকে বিচারাধিকার প্রদান না করিতে হেনরি লরেন্স লজ্জাবোধ করেন নাই।

মহারানির এই কারাবাসের সমাচার পঞ্জাবে প্রচারিত হইলে, পঞ্জাববাসীর বিশাল বীর হৃদয় ফাটিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পঞ্জাবের গগন-পবনকে যেন সন্তপ্ত করিয়া তুলিল। লোকে বলিল, ইহাই কি 'শেষের' সূচনা? লোকে বলিল, 'ইহাই কি অপরাজেয় রণজিতের পুরুষকারের পর্যবসান?' হউন না কেন ঝিন্দন বিলাসিনী রূপোন্মাদিনী, তিনি তো রণজিতের পত্নী ছিলেন! নারী নারীই হইবে; যে দোষের দণ্ডস্বরূপ রাজ্যেশ্বরীকে কাঙ্গালিনী হইতে হয়, নারীর চাঞ্চল্য, নারীর প্রখরতা, পুরুষের কাছে তত বড় দোষ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়। ভারতবাসী সব হারাইতে পারে, কিন্তু স্মৃতিসুখটুকু হারাইতে পারে না। ভারতবাসী সব ভুলিতে পারে, কিন্তু মর্যাদাহানির মর্যাদাটুকু ভুলিতে পারে না—তাই মহরানি ঝিন্দনের নির্বাসনে স্মৃতির গুপ্ত কোটর হইতে ক্ষোভের যে জ্বালাবিকাশ হইযাছিল, সে জ্বালা বিকাশের ফলে পঞ্জাবে আবার সমরানলপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পঞ্জাবের খালসা ভাবিল, পারি ত এখনই—না পারিত, আর হইবে না; সে অতীত স্মৃতিকে জাগরূক রাখিতে হইলে এখনই সর্বস্বপণ করিতে হইবে, এ অগ্নি-পরীক্ষা হইতে যদি সুমার্জিত হইয়া বাহির হইতে পারি, তাহা হইলে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিনকালই সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নহিলে—এই শেষ!

মহারাজ রণজিৎ সিং তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে মুলতানে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। মুলতান লাহোর হইতে অতি দূরে অবস্থিত ছিল, সেইজন্য তৎপ্রদেশের শাসনসৌকার্যার্থে লাহোর দরবারের অধীনে একজন দাওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুলতানের তৎকালিক শাসনকর্তা শাবনমল্ল এক শত্রুর হস্তে নিহত হন। তদীয় পুত্র মূলরাজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্বরূপ, লাহোর দরবারের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া, স্বীয় বাহুবলে মুলতানের দেওয়ানি পদ অধিকার করেন লাহোর দরবার ভাবিয়াছিলেন যে, মূলরাজের কোষাগারে অনেক অর্থ সঞ্চিত ছিল; তাই তাঁহার নিকট-দেওয়ানি পদ গ্রহণের নজরানাস্বরূপ ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ ও তখনকার প্রধানমন্ত্রী রাজা হীরা সিং জীবিত থাকিলে ওই টাকা যথাসময়ে প্রদত্ত হইত; কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, লাহোর দরবারে একটা গোলমাল পড়িয়া যায় এবং মূলরাজের নিকট হইতে প্রার্থিত অর্থ আদায় করিবার তাগাদাও বন্ধ হইয়া যায়। মিঞামীরের সন্ধিস্থাপনের পর, রাজা লাল সিং মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি মূলরাজের নিকট হইতে পূর্ব প্রাপ্য টাকা ও রাজকর আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মুলতানে সৈন্য প্রেরণ করেন। দক্ষিণ পঞ্জাবের ঝঙ্গ নামক স্থানে মূলরাজের সৈন্য দরবারি সেনাদলকে পরাজিত করে। এই পরাজয়ে লাহোর দরবারে একটা বিষম গোলযোগ ঘটে। লাহোরের ইংরাজ রেসিডেন্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দেন। লাহোরের রেসিডেন্ট স্থির করেন যে,

মুলরাজ ঝঙ্গ বিভাগের স্বত্ব পরিত্যাগপূর্বক রাজকর, পূর্ব বাকির দরুন এবং নজরানা বাবদে বিশ লক্ষ টাকা লাহোর দরবারে অর্পণ করিবেন; অতঃপর মুলতানের দেওয়ানির জন্য বর্ধিত হারে বৎসরে বৎসরে কর দিতে থাকিবেন। এই নিষ্পত্তির পর মূলরাজ এক বৎসরকাল শান্তভাবে অতিবাহন করেন। কিন্তু মূলরাজ শান্ত থাকিবার পাত্র ছিলেন না, তিনি দুর্ধর্ষ ও দুর্মদ যোদ্ধা ছিলেন। মুলতানে প্রত্যাবর্তন করিলে, লাহোরের রেসিডেন্ট কৃত এই নিষ্পত্তি তাঁহার পক্ষে অতিশয় মর্মপীড়ক হইয়া উঠিল। এই মর্মপীড়া হইতে যেন নিষ্কৃতি লাভের জন্যই তিনি শীঘ্রই দেওয়ানি পদ পরিত্যাগ করিবেন, এই সংবাদ প্রচার করিলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবময় গুজব উঠিল যে, রেসিডেন্ট হেনরি লরেন্স পীড়াবশত শীঘ্রই পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। মুলরাজ তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় লাহোরে গমন করিলেন, কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায়, হেনরি লরেন্সের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। মুলরাজ এই হেতু তদানীন্তন অস্থায়ী রেসিডেন্ট জন লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পদত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। জন লরেন্স ওই সংকল্প পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দেন। কিছুদিন পরে মুলরাজ সত্য সত্যই একখানি পদত্যাগপত্র জন লরেন্সের হস্তে অর্পণ করেন। এই পদত্যাগের সম্বন্ধে তিনি দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। প্রথম, ভূমিঘটিত নূতন করের বন্দোবস্ত হওয়াতে তাঁহার রাজস্ব আদায়ে সম্যক ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল; দ্বিতীয়, প্রত্যেক প্রজারই লাহোর দরবারে আপীল করিবার অধিকার থাকাতে তিনি প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারিতেছিলেন না। জন লরেন্স এই পত্র পাইয়া উত্তরে দেওয়ানজিকে বলিলেন যে, —আপনি তো পদত্যাগ করিতেছেন, তিনি দেওয়ানির হিসাব নিকাশ না করিয়া দিলে আপনার পদত্যাগের পত্র গ্রাহ্য হইবে না। এই বলিয়া রেসিডেন্ট সাহেব দেওয়ানজির পদত্যাগ-পত্র যথারীতি লাহোর দরবারে প্রেরণ করিলেন। দরবার মুলরাজের পত্র গ্রাহ্য করিয়া, সর্দার খাঁ সিং নামক একজন মুসলমান শিখকে মুলতানের দেওয়ানি পদে নিয়োগ করিয়া, মুলতানে পাঠাইয়া দিলেন। পাছে সর্দার খাঁ সিং কোন গোলযোগে পড়েন, তাই লাহোর দরবার রেসিডেন্টের পরামর্শ অনুসারে দুইজন যুবক ইংরাজ কর্মচারীকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন। ইহাদের একজনের নাম ভ্যান্স এগনিউ (Vans Agnew), আর একজনের নাম লেফটেনান্ট এন্ডার্সন (Lieutenant Anderson)। ভ্যান্স এগনিউ ভারতীয় সিবিলিয়ান শাসকসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এগনিউ সাহেবের প্রতি এইরূপ গুপ্ত আদেশ ছিল যে, তিনি মুলতানে যাইয়াই সর্দার খাঁ সিংহের দোহাই দিয়া, মুলতানের শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিবেন; আর লেফটেনান্ট এন্ডার্সনের প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, তিনি কোনমতে বিনা শোণিতপাতে মুলতানের দুর্গ অধিকার করিবেন এবং সে দুর্গে ইংরাজ সেনা রক্ষা করিবেন। তাঁহারা সদলবলে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথমে মুলতানে যাইয়া উপস্থিত হন। প্রায় সপ্তাহকাল নানা পরামর্শ এবং যুক্তিতর্ক ও রাজনীতিক চাতুরীর প্রভাবে মুলরাজ, ১৯শে এপ্রিল তারিখে, বিনা বাধায় মুলতানের দুর্গ লেফটেনান্ট এন্ডার্সনের হস্তে অর্পণ করিলেন। সর্দার খাঁ সিং অবশ্য প্রথমে মুলরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মুলরাজ সর্দার খাঁকে দেখিয়া বিরাগের কোনো লক্ষণই প্রকাশ করেন নাই।

সর্দার খাঁ কিন্তু ইংরাজ কর্মচারিদ্বয়ের চাতুরী বুঝিয়া একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে এগনিউ ও এন্ডার্সন সাহেব, এত সহজে যে ইষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহা পূর্বে ভাবেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের 'অনায়াসলব্ধ প্রাধান্যে তাঁহারাও একটু বিহ্বল হইয়াছিলেন। মুলরাজ এত সহজে অধীনতা স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁহার ক্রোধ ও জিঘাংসাবৃত্তি শিষ্টাচারের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রতিবিধিৎসায় উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন।

তখন প্রথম নিদাঘ; মরুমারুতের উষ্ণ প্রভাব মুলতানের অঙ্গ তখন প্রথম স্পর্শ করিতেছিল। বিশেষত ১৯শে এপ্রিল তারিখে যেন মার্তণ্ডদেব শতগুণতপ্ত ময়ূখমালা বিস্তার করিয়া মুলতান দুর্গপ্রাকারকে দগ্ধ করিতেছিলেন। এগনিউ ও এন্ডার্সন উভয়েই নবাগত ইংরাজ। একে চৈত্র মাস, তাহার উপর সিন্ধুদেশের মরুক্রোড়ে অবস্থিত অতি তাপময়ী মুলতান নগরী, উভয় ইংরাজ কর্মচারীই দুর্গ অধিকারের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রদোষকালে তাঁহারা উভয়েই দুর্গত্যাগ করিয়া নগরের দিকে আগমন করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত অতি অল্পসংখ্যকই রক্ষী সেনা ছিল। পথে একস্থানে বহুলোককে সমবেত দেখিয়া পিপাসার্ত এগনিউ একটি লোককে ডাকিয়া এক পাত্র পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, 'জল দিতেছি।' এই বলিয়াই ত্বরিতগতিতে এগনিউ সাহেবের পৃষ্ঠদেশে, ঠিক স্কন্ধের নীচে ছোরা মারিল, সঙ্গে সঙ্গে একজন উন্মত্ত গাজী মুক্ত তরবারির দ্বারা লেফটেনান্ট এন্ডার্সনকে আঘাত করিল। তাঁহাদিগেব রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল এবং সন্নিকটে ঈদ্‌গাহ নামক মসজিদে যাইয়া আশ্রয় লইল। ঈদের সময়ে যে মসজিদে ও যাহার প্রান্তরে মুসলমানগণ ঈদের নমাজ পড়িয়া থাকেন, তাহাকেই ঈদ্‌গাহ বলা হয়। এগনিউ সাহেব ঈদ্‌গাহে পৌঁছিয়াই লাহোরের ইংরাজ রেসিডেন্টের নামে একখানি পত্র লিখিলেন। একদিকে তাঁহার অর্ধবিচ্ছিন্ন দক্ষিণ বাহুমূল সেলাই করা হইতেছিল, অন্যদিকে সেই দক্ষিণ হস্তেই লেখনী ধারণ করিয়া তিনি পত্র লিখিতেছিলেন। এই অবস্থাতেই তিনি আরও একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন: সে পত্রখানি বন্নুর কমিশনার সাহেবের নামে প্রেরিত হইল। কিন্তু লাহোর মুলতান হইতে দুই শত মাইল দূরে এবং বন্নুর শত মাইল দূরে অবস্থিত। এই দুইখানি চিঠি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে ও তদনুসারে ইংরাজ সেনানিবাস হইতে প্রতিশোধকল্পে সেনাদল আসিতে বহু বিলম্ব ঘটিবার কথা; তথাপি এগনিউ ও এন্ডার্সন উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত জানিতেন যে, ইংরাজ জাতি এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ অতি ভীষণভাবে লইবে।

যে ঈদ্‌গাহ মসজিদে লেফটেনান্ট এন্ডার্সন ও এগনিউ সদলবলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ঈদ্‌গাহ মসজিদ মুলতানদুর্গের প্রাচীরবিন্যস্ত তোপের আয়ত্তের ভিতরেই ছিল। ক্ষত স্থান চিকিৎসিত হইবার পর এন্ডার্সন দেখিলেন যে, দুর্গ হইতে দুইবার তোপ দাগিলেই ঈদ্‌গাহ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। নিকটে সুপেয় পানীয়ের কূপও ছিল না। দূরে অবস্থিত কূপ হইতে জল আনিবার চেষ্টা করিলে দুর্গের তোপের মুখে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই সব দেখিয়া ও বুঝিয়া লেফটেনান্ট এন্ডার্সন এগনিউ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মুলরাজ চতুর যোদ্ধা, আমাদের অনুপস্থিতিতে যে সে দুর্গ অধিকার করিবে না, তাহা নহে, আমাদের প্রতি এই পাশব অত্যাচারের কাহিনি

নিশ্চয়ই মুলতান নগরে লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছে; সর্দার খাঁ সিং নগরে আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে এতক্ষণ আমাদিগের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; যখন সে পক্ষেও কোন চেষ্টার লক্ষণ দেখিতেছি না, অদূরবর্তী দুর্গ হইতেও কোন সেনানী আমাদিগের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেছেন না, তখন আমাদের মৃত্যুই সুনিশ্চিত জানিও। এগনিউ সাহেব উত্তরে বলিলেন, 'মরিতে আসিয়াছি, নিশ্চয়ই মরিব, তাহাতে ভয় করি না— কিন্তু ভাবনা দুইটি—আমার প্রেরিত দুইজন সংবাদবাহক আমাদের অভীষ্ট স্থানে যথাকালে গিয়া পৌঁছিবে কি না; দ্বিতীয়, যতক্ষণ না মরি, ততক্ষণ এই উত্তপ্ত উন্মুক্ত স্থানে ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালায় অধীর হইয়া মরণের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।'

মূলরাজ সত্য সত্যই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। সেই রাত্রিতেই গোপনে মুলতান দুর্গ তিনি পুনরাধিকার করিলেন এবং মুলতান নগরে সর্দার সিংকে আটক রাখিলেন। সর্দার সিং বুঝিলেন যে, এ সময়ে নিশ্চেষ্টতাই জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন; ইংরাজ দুর্বল, ইংরাজের পক্ষপাতিতা করিতে যাইলে মুলরাজ তাঁহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন; পরন্তু প্রকাশ্যভাবে মূলরাজের সহিত যোগ দিলে, পরে ইংরাজের প্রতিহিংসার জ্বালায় ভস্মসাৎ হইতে হইবে। কাজেই তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া মুলতানে বসিয়া রহিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ ২০শে এপ্রিলের প্রত্যূষে মুলতান দুর্গের প্রাকার হইতে ঈদ্গাহ মসজিদের উপর ঘন ঘন গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। গোলার আঘাতে মসজিদ চূর্ণ হইয়া গেল। এই সময়ে লেফটেনান্ট এন্ডার্সন ও এগনিউ মসজিদের অপর দিকে, মসজিদের ছায়ায় উন্মুক্ত প্রান্তরে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। একটা ভাঙা খাটিয়ার উপর লেফটেনান্ট এন্ডারসন শুইয়া ছিলেন, কেননা তাঁহার উঠিয়া দাঁড়াইবার বা বসিবার ক্ষমতা ছিল না; আর নিম্নে, সেই বন্ধুর কঙ্করময় ভূমিশয্যায় খাটিয়ায় ঠেস দিয়া এগনিউ সাহেব মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন মসজিদ চূর্ণ হইয়া গেল, তখন দুর্গ হইতে একদল সেনা ঈদ্গাহ দখল করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তাহারা মসজিদের নিকট আসিয়া এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—মসজিদ জনশূন্য, সে প্রান্তর মনুষ্যশূন্য, চারিদিকে তপ্ত গোলা ছড়াইয়া রহিয়াছে, মাথার উপরে শত মার্তণ্ডতেজে ভাস্কর যেন বহ্নির প্রবাহ ঢালিয়া দিতেছেন; তখনও দ্বিপ্রহর হয় নাই কিন্তু সে সময়ের সূর্যের তাপ মুলতানী সেনার পক্ষেও অসহ্য হইয়াছিল। এই আকাশের ও পৃথিবীর স্তব্ধতাকে যেন মুখর করিয়া মধ্যে মধ্যে মুলতান দুর্গের প্রাকার হইতে তোপের ঘনঘোর গম্ভীর নাদ হইতেছিল, আর নিম্নে, প্রান্তরের উপর দুইটি ইংরাজ মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া যেন তাহার আগমন প্রতীক্ষায় স্থির ও ধীরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। মূলরাজের মুলতানী সেনা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না, সে দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহাদের হাবেলদার বলিলেন, —দুইজন অর্ধমৃত ফিরিঙ্গীর সহিত লড়াই করিব? তাও কি হয়? ফিরিয়া চল; চল দুর্গে যাই। আর যদি তোমাদের মনুষ্যত্ব থাকে, তবে যাও, ওই আহত ব্যক্তিদিগকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া আইস।

একজনও অগ্রসর হইল না; কিন্তু সেই দলের একটি চামার অগ্রসর হইয়া বলিল যে, উহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া আনিতে না পারি, উহাদের মুণ্ড তো আনিতে পারিব। লোকটা দেখিতে অতি কদাকার ছিল, খঞ্জ ও নুব্জাকার ছিল। সে ছুটিয়া যাইয়া তাহার বক্র

তরবারির দুই আঘাতে দুইজন ইংরাজের মুণ্ড কাটিয়া নিজের হাতে লইল। মরিবার পূর্বে এগনিউ সাহেব বলিয়াছিলেন যে—মূর্খ, আমাদিগকে মারিয়া করিবি কি? আমরাই ইংরাজদিগের শেষ নহি।

এদিকে ভান্স এগনিউ কর্তৃক লিখিত পত্র যথাসময়ে লাহোরে গিয়া পৌঁছিল; তখন লাহোরের রেসিডেন্ট স্যর ফ্রেডারিক কুরী (Sir Frederick Currie) সেই পত্র গ্রহণ করিলেন। জন লরেন্স ইত্যবসরে স্থানান্তরে (দিল্লিতে) গিয়াছিলেন। কুরী এগনিউয়ের পত্র পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, সেনাপতি মহাশয় যেন ফিরোজপুর হইতে পর্যাপ্ত সেনা সংগ্রহ করিয়া মুলতান আক্রমণ করেন। লর্ড গাফ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, এই নিদাঘের অসহ্য তাপে দুই শত মাইল বিস্তীর্ণ মরুভূমি ভেদ করিয়া মুলতানে যাইয়া উপস্থিত হওয়া ইংরাজ সেনাদলের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব; ফিরোজপুর হইতে ত্বরিতগতিতে মুলতানে পৌঁছিতে অন্তত ষোলো দিন লাগিবে। সে সময়ে লর্ড ডালহাউসি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, লড গাফ পঞ্জাব প্রদেশ জানেন, পঞ্জাবীদিগকে চেনেন, সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে এগনিউ কর্তৃক লিখিত দ্বিতীয় পত্র লেফটেনান্ট হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের হস্তগত হইল। এডওয়ার্ডস সাহেব তখন সিন্ধু নদীর তীরে, ডেহরা ফতে খাঁ নামক স্থানে তাম্বু গাড়িয়া অবস্থান করিতেছিলেন। যে লাল থলিয়ার মধ্যে এই পত্রখানি ছিল, সেই থলিয়ার উপর লিখিত ছিল 'To General Cortland in Bannu, or wherever else he may be' অর্থাৎ এই পত্র বন্নুতে জেনারেল কোর্টল্যান্ডের নিকটে যাইবে; তিনি যদি বন্নুতে না থাকেন, তবে তিনি যেখানে থাকিবেন, সেই স্থানে এই পত্র যাইবে। এডওয়ার্ডস সাহেব পত্রের শিরোনামার লিখনভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলেন যে, নিশ্চয়ই কোনো স্থানে কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাই এমনভাবে এই চিঠি বন্নুর কমিশনারের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। কোর্টল্যান্ড সাহেব তখন ওই প্রদেশে ছিলেন না; তাঁহাকে ওই পত্র পাঠাইয়া হুকুম আনাইতে অতি বিলম্ব ঘটিবে বুঝিয়া এডওয়ার্ডস সাহেব স্বয়ং সেই চিঠি খুলিলেন। চিঠি পড়িয়াই তিনি তাঁহার শাসনকার্যের কাগজপত্র তুলিয়া ফেলিলেন এবং সঙ্গের রক্ষী সেনা লইয়াই মুলতানের দিকে ধাবিত হইলেন। মুলতান ডেহরা ফতে খাঁ হইতে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। এডওয়ার্ডস পথে আরও কিছু সেনা সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মোট চারি শত যোদ্ধা ছিল। এদিকে মূলরাজ এডওয়ার্ডসের অভিযানের সমাচার পাইয়াছিলেন, তাই তিনি চারি হাজার খালসা সৈন্য ও ৮টি তোপ লইয়া এডওয়ার্ডসকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। মধ্যপথে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। মুলরাজের বিশাল বাহিনী দেখিয়া এডওয়ার্ডস একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি জেনারেল কোর্টল্যান্ডকে লিখিয়া পাঠাইলেন 'I am like a terrier barking at a tiger' অর্থাৎ আমি যেন ক্ষুদ্র সারমেয়ের ন্যায় ব্যাঘ্রের পশ্চাতে চিৎকার করিতেছি। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সারমেয়পাল ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের দারুণ গ্রীষ্মের সময় ধীরে ধীরে সেই শার্দূলকে মুলতানের দুর্গে পুনঃপ্রবিষ্ট করাইয়াছিল। এডওয়ার্ডস বাহাওয়ালপুরের নবাবের নিকট

হইতে দুই তিন দল পাঠান সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহারা এক প্রকার মরুজাত; সুতরাং সে গ্রীষ্মের তাপ তাহাদিগের পক্ষে অসহ্য হয় নাই। বিশেষ রণজিৎ সিংহের খালসা সেনার নিকট বারে বারে পরাজিত হইয়া তাহাদিগের মনে শিখ-বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই পাঠান সেনার সাহায্যে জুন ও জুলাই মাসে এডওয়ার্ডস মুলরাজের সেনাদলকে দুইটি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই দুই যুদ্ধেই মুলরাজের ৮টি তোপ হস্তান্তরিত হয়। মূলরাজ বাধ্য হইয়া মুলতানের দুর্গে আবার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইহাই দ্বিতীয় শিখ-সমরের সূচনা। পর্বেই বলিয়াছি যে, দিলীপ-মাতা মহারানি ঝিন্দনকে রেসিডেন্ট হেনরি লরেন্স সেখপুরা নামক মুসলমানপ্রধান গ্রামে কারারুদ্ধ রাখেন। মহারানিকে এরূপ স্থানে রাখিয়াও লরেন্স সাহেব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে লাহোর নগরে গুজব উঠিল যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে লাহোরে আর একটি ষড়যন্ত্র চলিতেছে। মহারানি ঝিন্দনের কয়েকটি প্রিয় সহচর এই ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে সিপাহিগণকে উত্তেজিত করাই নাকি এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল। ৭নং সিপাহি সৈন্যদলের কতিপয় সিপাহি তাহাদিগের সেনানীগণকে এই কথা জ্ঞাপন করে। একজন শিখ সেনাপতি খাঁ সিং ও মহারানির বিশ্বস্ত অনুচর গঙ্গারাম এবং আরও দুইজন শিখ রাজনীতিক অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হন। অচিরে লাহোরের প্রকাশ্য স্থানে এই ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। রেসিডেন্ট কয়েকজন শিখ রাজনীতিককে হত্যা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, এই ঘটনাসংসৃষ্ট, দোষী বলিয়া অভিযুক্ত, অন্য ব্যক্তিগণের প্রতিও যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের বিধান করিলেন। মহারানি ঝিন্দন অভিযুক্তা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। রেসিডেন্ট বাহাদুর সেখপুরার নির্জন কারাগারে মহারানি ঝিন্দনকে আর অধিককাল রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। অপ্রাপ্তবয়স্ক পঞ্জাবাধিপতি মহারাজা দিলীপ সিং তখন রেসিডেন্ট স্যর ফ্রেডরিক কুরীর হস্তে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। নির্দয় কুরী মহারানি ঝিন্দনের নির্বাসন-লিপি বা পরওয়ানা অম্লান বদনে মহারাজ দিলীপের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, তোমার মাতার নির্বাসনের পরওয়ানায় তোমারই মোহর অঙ্কিত থাকা বাঞ্ছনীয়। তুমি এই পরওয়ানায় স্বাক্ষর কর।

বালক দিলীপ, কুরী সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন; বলিলেন, ওই মোহর রহিয়াছে তুমি উহা তুলিয়া অঙ্কিত করিয়া লও, আমি সাক্ষিগোপাল, সাক্ষিগোপালই থাকিব। সাহেব তোমায় ধন্যবাদ যে, তুমি কৃপা করিয়া বারাণসীর পুণ্যক্ষেত্রে আমার জননীর কারাগার নির্দেশ করিয়াছ। জানি না আমি সেই স্থানে কখনও যাইতে পারিব কি না, কিন্তু মা আমার, আমার পিতৃদেবের গৌরব কনকমণ্ডিত বিশ্বনাথের মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া দেখিয়া যে অনেকটা শান্ত হইতে পারিবেন, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

এইরূপে রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনের নির্বাসন ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইল। ঝিন্দন দুঃখসঙ্গিনী সহচরী-পরিবৃতা হইয়া জন্মের মতো সেখপুরা ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে প্রথমে ফিরোজপুরে আনয়ন করা হয়, পরিশেষে ফিরোজপুর হইতে বারাণসীধামে প্রেরণ করা হয়। মেজর জর্জ ম্যাকগ্রেগার নামক একজন ইংরাজ সৈনিক মহারানির প্রহরীরূপে নিযুক্ত

হন। এই ব্যাপারে সমগ্র পঞ্জাব যেন ভূকম্পে বিলোড়িত আগ্নেয়গিরির ন্যায় সহসা বিচলিত হইয়া উঠিল। মহারানির প্রথম নির্বাসনে পঞ্জাব-কেশরিগণ কেবল দুঃখের তপ্ত শ্বাসই ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবার ক্ষোভের ও ক্রোধের হুহুঙ্কারে পঞ্জাব যেন প্রমত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রমত্ততায় চাঞ্চল্য ছিল না, আর্তনাদ ছিল না। উহা যেন বিষম ঝঞ্ঝার পূর্ব নিস্তব্ধতা, উহা যেন আগ্নেয়গিরির অনলোদ্‌গারের পূর্ব স্তম্ভম। ঠিক এই সময়ে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বীর মুলরাজের বহ্ন্যাস্ফোটের প্রতিধ্বনি সমগ্র পঞ্জাব দেশকে মুখর করিয়া তুলিল। আর কি রক্ষা আছে? পঞ্জাবের চতুর্দিকেই বিষম সমরানল জ্বলিয়া উঠিল।

ঝিন্দনের নির্বাসন-কাহিনি শুনিয়া কেবল যে পঞ্জাবই উন্মত্তবৎ হইয়াছিল, তাহা নহে; দূর কাবুল হইতে আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁও এই হেতু ইংরাজকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কাপ্তেন এবটকে (Abott) যে পত্র পাঠান, তাহাতে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, মহারাজ দিলীপ সিংহের মাতা ঝিন্দনকে কারারুদ্ধ ও দেশান্তরিত করাতে যে কেবল শিখজাতিই উন্মত্তবৎ হইয়াছে, তাহা নহে—হিন্দুস্থানের হিন্দু মুসলমান, কাবুলের পাঠান, নেপালের গুর্খা—ভারতের সকল ভদ্রজাতিই এই হেতু ইংরাজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়াছে। অধিক কি, স্বয়ং স্যব ফ্রেডারিক কুরী ও ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে গবর্নর জেনারেল মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, সেনাপতি শের সিংহের শিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, মহারানি ঝিন্দনের নির্বাসন সংবাদ-শুনিয়া খালসা সৈন্য সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিযাছে; তাহারা বলিতেছে, রানি ঝিন্দন খালসাদিগের মাতৃস্বরূপিণী ছিলেন, তাহাকেই যখন দেশান্তরিত করা হইয়াছে, তখন মহারাজ দিলীপ সিংহের ভাগ্যে যে পরে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং তাহারা কিছুতেই মূলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না।

এইখানে একটি গুপ্ত কথা বলিব। স্যর ফ্রেডারিক কুরী ল্যাহোর দরবারের সম্পূর্ণ অনভিমতে, সর্দার শের সিং প্রমুখ বীরগণের শত প্রতিবাদসত্ত্বে, গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসির একখানি গুপ্ত পত্রের উপর নির্ভর করিয়া মহারানি ঝিন্দনকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ঝিন্দনের নির্বাসন লর্ড ডালহাউসির ক্রূর নীতির প্রথম চাল। তিনি জানিতেন যে, মহারানি ঝিন্দনের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে পঞ্জাব ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিবে, আর তখন দ্বিতীয় পঞ্জাব যুদ্ধের ছলেরও অসদ্ভাব থাকিবে না। মুলতানে আর্ত ও বিপন্ন এগ্‌নিউ ও এন্ডার্সনের উদ্ধারহেতু সদ্য সদ্য ইংরাজ সেনা প্রেরণ না করিয়া তিনি দ্বিতীয় চাল চলিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এগ্‌নিউ ও এন্ডার্সন মুলতানের মরুক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবেই, আর সে সমাচার ভারতে তথা বিলাতে প্রচারিত হইলে, ইংরাজ মাত্রেই প্রতিবিধিৎসায় উত্তেজিত হইয়া উঠবে। পরে লেফটেনান্ট এডওয়ার্ডস যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মূলরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তিনি এডওয়ার্ডসের সহায়তা করিতে একদলও ইংরাজ সেনা পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। এডওয়ার্ডস বারংবার বড়লাটকে নিজের সঙ্কটের কথা জানাইয়াছিলেন, আর প্রতি পত্রেই লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লোক চাহেন না, লস্কর চাহেন না, সেনা চাহেন না, সেনাপতি চাহেন না—চাহেন গোটা কয়েক বড় বড় তোপ, পর্যাপ্ত গোলাগুলি ও বারুদ, আর চাহেন

মেজর নেপীয়ারকে। কিন্তু এ সকল পত্রের উত্তর দেওয়া যে আবশ্যক, লর্ড ডালহাউসি তাহাও মনে করেন নাই। লর্ড ডালহাউসি এডওয়ার্ডসকে সাহায্য করেন নাই বটে, কিন্তু সর্দার শের সিং একদল শিখ সেনা পাঠাইয়া এডওয়ার্ডসের বিপন্ন অবস্থায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

এইরূপে লর্ড ডালহাউসি লুতার তন্তু বিস্তারের ন্যায় একটি একটি করিয়া তাঁহার কুটিলতার রাজনীতিক সূত্র পঞ্জাবের সর্বাঙ্গে জড়াইতেছিলেন এবং সেই সূত্রনিচয়কে বিষসিক্ত বাগুরায় পরিণত করিয়া হেলায় পঞ্জাব কেশরিগণকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে রণজিৎ সিংহ আমরণ ইংরেজের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যে পঞ্জাবকেশরী কাবুল পরাজয়ের পর ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আগরা পর্যন্ত ইংরাজ অধিকৃত ভূভাগ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিতে পারিতেন সেই রণজিতের বিধবা পত্নী কাঙ্গালিনীর ন্যায় বিদেশবাসিনী হইলেন, সেই রণজিতের পত্রতুল্য খালসা সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতা হলাহলে জীর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়া গেল, আর সেই রণজিতের পঞ্চনদমেখলা জগৎসুন্দরী পঞ্জাব-ভূমি অচিরে ইংরাজের সদর্প বুট দলিত হইল! ইংরাজের সিপাহিগণ প্রথমে এত কথা বুঝিতে পারে নাই! পরে যখন পঞ্জাব গ্রাহকবলিত হইল, ওদিকে অযোধ্যা তাহার নখরাঘাতে জর্জরিত হইয়া উঠিল, তখন অদিনে অসময়ে সিপাহির জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। কিন্তু তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখসমর

দ্বিতীয় শিখসমরের আরও একটি কারণ ছিল। মহারাজ দিলীপ সিংহের সহিত হাজারার শাসনকর্তা সর্দার ছত্র সিংহের কন্যার বিবাহের কথা হয়। সর্দার ছত্র সিং শিখসেনাপতি মহাবীর শের সিংহের পিতা ছিলেন, শের সিং এ বিবাহে পূর্ণ মত দিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসির আদেশে রেসিডেন্ট স্যার ফ্রেডারিক কুরী এই বিবাহ সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করেন। এই সমাচার শুনিয়া সর্দার ছত্র সিং বলিলেন, ইংরাজ রেসিডেন্টের সহিত এ বিবাহের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? লাহোর দরবার এ বিষয়ে যাহা নিষ্পত্তি করিবেন, তাহাই সকলের মান্য। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্দার ছত্র সিং মহারাজের বিবাহের দিন নির্ধারণ করিতে আবেদন করেন। সে সময়ে তাহার পুত্র সেনাপতি শের সিং লেফটেনান্ট এডওয়ার্ডসের সংবর্ধনার্থ সসৈন্যে মুলতানের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভগিনীর বিবাহের বিষয় লইয়া শের সিং এডওয়ার্ডের সহিত অনেক কথা কহিয়াছিলেন। তাহার ফলে ২৮শে জুলাই তারিখে এডওয়ার্ডস শের সিংহের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া এবং সর্দার ছত্র সিংহের আবেদনের সমর্থন করিয়া, রেসিডেন্টের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে লেখা ছিল যে, সকলেই বলিতেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শীঘ্রই মুলরাজ ঘটিত বর্তমান গোলযোগ ও খাল্‌সা সেনার অসদ্ব্যবহারের ছল দেখাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন; এই সময়ে যদি সর্দার ছত্র সিংহের ন্যায় শিখ সমাজ পূজিত মহাজনের কন্যার সহিত মহারাজ দিলীপ সিংহের বিবাহের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে লোকে বুঝিবে যে, ইংরাজ সহসা পঞ্জাব দেশকে গ্রাস করিবেন না। রেসিডেন্ট কুরী এই পত্র পাইয়া একটু মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রকাশ্য দরবারের সদস্যদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন যে, কোম্পানি বাহাদুর মহারাজ দিলীপ সিংহের, তাঁহার বাগদত্তা বিবাহ-পাত্রীর এবং তৎপরিবারবর্গের সম্মান ও সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট উদ্‌যোগী আছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই কূট চাতুরী বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ইংরাজ রেসিডেন্টের ও দরবারের সুবিধা অনুসারে মহারাজের বিবাহ হইতে পারে; বিবাহ-বিষয়ে এত তাড়াতাড়ি কেন?

এই সকল সমাচার যথাসময়ে এডওয়ার্ডস মুলতানে পাইলেন এবং শের সিংকে তিনি সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। শের সিং এডওয়ার্ডসের সহিত পরামর্শ করিয়া হাজারাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। সর্দার ছত্র সিং ইহার পূর্বেই মহারানি ঝিন্দনের কারাবরোধ ও নির্বাসনের সমাচার পাইয়া ইংরাজের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন; ইহার উপর পুত্রের পত্রে সকল ব্যাপার অবগত হইয়া তিনি বুঝিলেন যে, ইংরাজ গোপনে গোপনে যেরূপ উদ্‌যোগ করিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই পঞ্জাব কোম্পানির মুল্লুক হইবে। তাই তিনি পত্রোত্তরে পুত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন—বাবা,

ভগিনীর বিবাহের কথা ভুলিয়া যাও, প্রিয়তম জন্মভূমির রক্ষার জন্য কৃতনিশ্চয় হও; প্রতিজ্ঞা কর,—আমাকে স্মরণ করিয়া, তোমার মাতৃচরণ স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, যতদিন গুরুগোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত, মহামায়ার চরণে উৎসর্গীকৃত শিখের শেষ রক্তবিন্দু তোমার ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন পঞ্জাবের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার, ততদিন পঞ্জাবের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য তোমার বদ্ধমুষ্টি হইতে ভবানীর তরবারি শিথিল হইয়া ধুলায় পড়িবে না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার অন্তর্দৃষ্টি তীব্রতর হইয়াছে; কে যেন আমার কানের কাছে বলিতেছে, যে, পঞ্জাবকেশরী রণজিতের 'সব্ লাল হো যায়েগা' এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সময় অতি সন্নিকট যখন সবই লাল হইবে. তখন তোমার আমার, পিতার পুত্রের, জননীর কন্যার, ভগিনীর পত্নীর শিখ জাতির উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহে যেন পঞ্জাবের বক্ষোদেশ অগ্নিময় লোহিত বর্ণ ধারণ করে।

এই পত্রের এবং এই পরামর্শের কথা পঞ্জাবের সর্বত্রই কে যেন বাহির করিয়া দিল। সর্দার ছত্র সিংহের শাসনাধিকারে কাপ্তেন এবট নামক রেসিডেন্ট কুরীর মন্ত্রশিষ্য সর্দারের নিকটে যেন প্রহরীরূপে থাকিত। এবট অতি সন্দিগ্ধমনা ও ক্রূর কর্মচারী ছিল। ছত্র সিংহকে বিরক্ত ও ব্যথিত করাই তাহার কর্ম ছিল। জ্বালা সাহী নামক ছত্র সিংহের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিখশ্রেষ্ঠের প্রতি অনুচিত সন্দেহ করিয়া এবট এতই অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল যে, তাৎকালিক রেসিডেন্ট হেনরি লরেন্স এবটের বিরুদ্ধে গবর্নর জেনারেলের নিকটে লিখিতে বাধ্য হন। জ্বালা সাহী হেনরি লরেন্সের সম্মানের পাত্র ছিলেন; কিন্তু কুরী সাহেবের নিকটে সম্মানভাজন ছিলেন না। এবটের কিন্তু এ সকল বিচার ছিল না; সে শিখ প্রধানগণকে অবমানিত করিতে পারিলেই সুখবোধ করিত। স্যর ফ্রেডারিক কুরীর বন্ধু দেশপূজ্য সর্দার ঝণ্ডা সিংহের সহিত এবট অতি ইতরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। এবটের সন্দেহের প্রভাবে ইংরাজের চারিজন প্রধান বন্ধু শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। সর্দার ছত্র সিং, জ্বালা সাহী, সর্দার ঝণ্ডা সিং এবং ছত্র সিংহের পুত্র শের সিং এই চারিজন প্রথমে ইংরাজের অত্যন্তই আনুকূল্য করিতেন, কিন্তু শেষে লর্ড ডালহাউসির প্রবর্তিত দুষ্ট নীতির প্রভাবে এই সকল ইংরাজ-বন্ধু ইংরাজের শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন। সর্দার ছত্র সিংহের আদেশে ও উত্তেজনায় সীমান্তের দুর্ধর্ষ হাজারা, মোমান্দ, আফরিদী ও পাঠানগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; খাইবার গিরিসঙ্কট বাহিয়া দলে দলে পাঠান সেনা পঞ্চনদের সুপ্রসর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; ইহাদের অভিযান দেখিয়া ও দক্ষিণে এডওয়ার্ডসের সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া রেসিডেন্ট কুরী বিচলিত হইলেন। দূর কলিকাতা হইতে লর্ড ডালহাউসি প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন 'Now is the time' অর্থাৎ এই তো অবসর। লাহোর হইতে একদল সিপাহি সেনা পশ্চিমদিকে পাঠানদিগের অভিযানমুখে অবরোধ ঘটাইবার জন্য অগ্রসর হইল; লর্ড গাফও এডওয়ার্ডসের পূর্বপ্রার্থিত কামান, গোলা, বারুদ ও গোলন্দাজ সেনার দল এডওয়ার্ডসের উদ্ধারার্থ মুলতানে পাঠাইয়া দিলেন। গোলন্দাজ সেনা ও তোপশ্রেণী যথাসময়ে মুলতানে যাইয়া উপস্থিত হইল; মুলতান দুর্গ অবরোধের সকল ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল; পরদিন প্রাতঃকালে ইংরাজের তোপ যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুর্গ প্রাচীরে তপ্ত গোলা বর্ষণ করিবে, সে ব্যবস্থাও ঠিক

হইল; কিন্তু নিশাকালে সর্দার শের সিং এডওয়ার্ডসকে বলিয়া পাঠাইলেন—এই তো আমারও সময়! আমি এইবার বিদায় হইব। এতদিন তুমি নিরাশ্রয় ছিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এখন তুমি বন্দুবান্ধব পাইয়াছ, সেনার দলও সেনাপতি পাইয়াছ, এইবার আমাকে অব্যাহতি দাও।

শের সিং বড় সময়েই ইংরাজের দল তাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি লাহোর হইতে আগত দরবারী সেনার দলও ইংরাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিল। যে ইংরাজ দণ্ডেক কাল পূর্বে মুলতানের ভীম দুর্গ অধিকারের দুরাশায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই ইংরাজ ত্রিযামা অতীত হইতে না হইতেই বুঝিতে পারিলেন যে, মুলতান দুর্গ জয় করা তো দূরের কথা, এখন ভালয় ভালয় প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিলে পরে মানরক্ষার অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বরের প্রত্যুষে ইংরাজ সেনা মুলতানের অবরোধ তুলিয়া ফিরোজপুরের দিকে পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। শের সিং যে সহসা ইংরাজের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন নহে; তাঁহার বৃদ্ধ পিতার প্রতি এবটের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবটের চাতুরীর প্রভাবে রেসিডেন্ট কুরী বৃদ্ধ সর্দার ছত্র সিংকে ২৩শে আগস্ট তারিখে হাজারার নিজামতি হইতে পদচ্যুত এবং তাঁহার খাস হবেলী জায়গির (অর্থাৎ যে জায়গিরের উপস্বত্ব হইতে সর্দার ছত্র সিংহের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত) বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে পিতার এই দুর্গতির সমাচার শের সিংহের শ্রুতিগোচর হয়, আর ১৪ই সেপ্টেম্বরে দ্বিপ্রহব যামিনী অতীত হইতে না হইতে শের সিং সদলবলে ইংরাজ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, এবং মুলরাজকে সহায়তা করিবেন বলিয়া মুলতান দুর্গে সমাচার পাঠাইয়া দিলেন। মূলরাজের পক্ষে ইহা অসম্ভাবিত সাহায্য বলিয়া মনে হইল; কিন্তু মূলরাজ নিজে বীর হইলেও জাতিতে বেনিয়া ছিলেন; ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ততা ও ঔদার্য তাঁহার বুদ্ধির দুরধিগম্য ছিল। তাই তিনি সহসা শের সিংকে সদলবলে মুলতানের দুর্গে প্রবেশ করিতে দিলেন না, উপরন্তু স্বীয় সৈনিকদিগকে দুর্গ প্রাচীরের অপর পার্শ্বে লইয়া গেলেন এবং শের সিংহের সৈন্যদলকে প্রাচীরের সম্মুখ ভাগে তাঁহার কামানের লক্ষ্য স্বরূপ করিয়া রাখিয়া দিলেন। মূলরাজের বৃথা সন্দেহের ফলে শের সিং দুর্গে প্রবেশ করিতে না পাইলেও দুই চারিদিন সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে মুলরাজের এই বৃথা সন্দেহে বিরক্ত হইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার আশায় সসৈন্যে মুলতান হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে লর্ড ডালহাউসি এই সকল সমাচার পাইয়া বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, একটা বিশাল পঞ্জাব যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই সঙ্গে তিনি ভারতের পূর্ব দেশ হইতে ১৭ হাজার সেনা পঞ্জাবের দিকে পাঠাইয়া দিলেন; দক্ষিণে, সিন্ধুদেশে ও বোম্বাই প্রদেশে সৈন্য সংগ্রহের ও সৈন্য প্রেরণের আদেশ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে বারাকপুরের লাট ভবনে একটি 'বল' নাচ হয়; সেই নাচের পূর্বে লর্ড ডালহাউসি বলিয়াছিলেন, If our enemies want war, war they shall have and with a vengeance—অর্থাৎ আমাদিগের শত্রুগণ যদি রণপিপাসু হইয়া থাকেন, তাহা হইলে

তাঁহাদিগের সহিত রণ আমরা করিব, আর সে রণে শত্রুদল নিশ্চয়ই সম্যক্ পরিতৃপ্তি লাভ করিবে; শত্রুর আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া আমরা যুদ্ধ করিব।

পরদিন প্রভাতেই লর্ড ডালহাউসি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পঞ্জাব প্রদেশের দিকে ধাবমান হইলেন। অন্য দিকে প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ সিমলা শৈল হইতে অবতরণ করিয়া ইংরাজের বিশাল বাহিনীর বিন্যাস ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথমে লর্ড গাফ বিংশতি সহস্র পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা এবং এক শত তোপ সঙ্গে করিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় শিখ সমর আরব্ধ হইল।

সেনাপতি লর্ড গাফ যুদ্ধোদ্যমকালে যেরূপ স্থবিরের ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, যুদ্ধের অভিযান আরম্ভ করিয়া সে স্থবিরতা একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সহসা রামনগরের নিকট দুই দল শিখ অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিলেন। রামনগরে কেবল শিখ অশ্বারোহী সেনারই সন্নিবেশ ছিল না, যথেষ্ট গোলন্দাজ সেনাও অশ্বারোহী সেনার অন্তরালে ছিল। সেনাপতি লর্ড গাফ রামনগরে শিখদলের নিকট একরূপ পরাজিতই হইলেন। পথে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে সাহদুল্লাপুর গ্রামের নিকটেও লর্ড গাফ আর একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে শিখ সেনার নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই দুইবার পরাজয়ে বৃদ্ধ সেনাপতি লর্ড গাফ একটু চঞ্চল হইয়া উঠেন।

অপর পক্ষে মুলতানের ভীম দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য লর্ড ডালহাউসি সেনাপতি হুইসকে (Whish) সপ্তদশ সহস্র সেনা এবং ৪৮টি বড় তোপ সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ওদিকে বোম্বাই হইতেও আর এক দলসেনা সেনাপতি হুইসের সহায়তার জন্য মুলতানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরাজ কখনও নিয়মিত ভাবে মুলতান দুর্গ অবরোধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ২৭শে ডিসেম্বরের পরে সেনাপতি হুইস যখন দেখিলেন যে, তাঁহার অধীনতায় পর্যাপ্ত সেনা সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তিনি যথাপদ্ধতি মুলতান দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, মুলবাজ যেরূপ রণনীতিবিশারদ, তাহাতে যে সহসা মুলতান দুর্গ অধিকার করা সম্ভবপর হইবে, এরূপ তো মনে হয় না; মুলতান দুর্গাভ্যন্তরে যদি অধিকসংখ্যক সেনা থাকে, মুলতানের অধিবাসিগণ যদি ইংরাজকে তিলমাত্র সহায়তা না করে, তাহা হইলে মুলতান জয় সুদূরপরাহত বলিয়া মনে করিতে হইবে। কিন্তু বলিয়াছি তো, দগ্ধ বিধাতা ভারতের ভাগ্যে মধ্যে মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটাইয়া দেন, যাহার প্রভাবে ভাবত শত্রুদিগেরই লাভ হয়, আর ভারতবাসীর সর্বনাশ হয়। মুলতান অবরোধ ব্যাপারে উভয়পক্ষই সমভাবে সমান তেজে যুদ্ধ করিতেছিলেন; বৃদ্ধ সেনাপতি হুইস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যে হইবে, এমন অনুমান অনেকেই করিয়াছিলেন; এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার পরে ইংরাজের একটা কামান হইতে একটা গোলা গিয়া মুলতান দুর্গের বারুদখানার ভিতরে পড়িল, আর সেই অগ্নির স্পর্শে মুলতান দুর্গের বিশাল বারুদখানা চকিতের ন্যায় উড়িয়া গেল, দুর্গের এক অংশ সমভূমি হইয়া পড়িল। তখন আর দুর্গ রক্ষা করা মনুষ্যসাধ্য নহে বুঝিয়া, নিয়তি তাঁহার প্রতি বিরূপ দেখিয়া, মুলরাজ সদলবলে আত্মসমর্পণ করিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে ইংরাজ মুলতান দখল করিলেন।

মুলতানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবে একটা হাহাকার উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে হাহাকার চিলিয়ানওয়ালা বিজয়গীতিতে অনেকটা স্তব্ধ হইয়াছিল। ইংরাজ কর্তৃক মুলতান অধিকৃত হইবার নয় দিন পূর্বে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে লর্ড গাফের বিশাল বাহিনী চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখ খালসা সেনার নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল। যদি শিখ সেনাপতি চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের পরে সবেগে ইংরাজ সেনাপতিকে এবং ইংরাজের অন্যান্য সেনাদলকে আক্রমণ করিয়া লাহোরে যাইয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে মনে হয়, ভারতের ইতিহাস-কথা অন্যরূপে এবং অন্যভাবে লিখিত হইত। চিলিয়ানওয়ালার পরাজয় সামলাইতে ইংরাজের নয় দিন সময় লাগিয়াছিল। শিখ পক্ষে উদ্‌যোগী সেনানী থাকিলে এই নয় দিনে অঘটন, ঘটাইতে পারিতেন। বলিয়া রাখা ভাল যে, চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্রে পূরবীয়া সিপাহি অল্পসংখ্যকই নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু চিলিয়ানওয়ালা বিজয়ী শিখ সর্দারগণ এই নয় দিন কাল উৎসব আনন্দে, বিলাসে প্রমোদে, অতিবাহন করিয়াছিলেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদিগকে সদ্যসদ্যই করিতে হইয়াছিল।

চিলিয়ানওয়ালার পরাজয় কাহিনি বিলাতে ১৩ই জানুয়ারি তারিখে পৌছিল। বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের দ্বারা লর্ড ''ফ পদচ্যুত হইলেন এবং স্যর চার্লস নেপীয়ার ইংরাজের প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। লর্ড গাফের ভাগ্যক্রমে মুলতান ইংরাজের অধিকৃত হইল; বিচক্ষণ সেনাপতি হুইস সদলবলে সেনাপতি গাফের সহায়তার জন্য উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গুজরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনাপতির সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই বিচক্ষণ ও বৃদ্ধ; কিন্তু একজন বিজয়োন্মাদে প্রমত্ত—অন্যজন পরাজয়ের জ্বালায় বিচলিত। স্যর চার্লস নেপিয়ার এই বিরাট ইংরাজ বাহিনীর ভার গ্রহণার্থ আসিবার পূর্বেই ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গুজরাটের বিস্তীর্ণ বালুকাময় ক্ষেত্রে লর্ড গাফ শিখ দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। গুজরাটের যুদ্ধ সহসাজাত যুদ্ধ এবং প্রাতঃকালের যুদ্ধ। পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে শিখ সর্দারগণ চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের পর বিলাসপ্রমত্ত না হইয়া উদ্‌যোগী পুরুষদিগের ন্যায় কার্য করিলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে ক্রোড়ে রক্ষা করিতে পারিতেন। যখন শিখ সর্দারগণ শুনিলেন যে, মুলতান ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে, মুলতানে অবস্থিত ইংরাজের সেনাদল উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে, শতদ্রুর পরপার হইতে দলে দলে সিপাহি রেজিমেন্ট যুদ্ধার্থে পঞ্জাবে প্রবেশ করিতেছে,—তখন তাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল; তখন তাড়াতাড়ি বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া, বারমুখীর নৃত্য গীতের হাবভাব ও লালসার লোভ পরিত্যাগ করিযা ত্বরিতগতিতে তাঁহারা ইংরাজ সেনার সম্মিলনে ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই অগ্রগমনের মুখেই গুজরাটের ক্ষেত্রে ইংরাজ বাহিনীর সহিত তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়, আর বিধাতার নির্বন্ধে চল্লিশ হাজার শিখ সেনা হত, পরাজিত ও বন্দি হয়। যুদ্ধারম্ভেই উভয় পক্ষের গোলন্দাজ সেনার মধ্যে অপূর্ব অগ্নিক্রীড়া হয়; কিন্তু এই তোপের খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবার সিপাহি শিখকে পরাজিত করে। শিখশক্তি, শিখগৌরব গুজরাটের ধূলিময় ক্ষেত্রে এইভাবে চিরকালের জন্য চূর্ণ হইয়া গেল।

লর্ড ডালহাউসি বুঝিলেন যে, এই বিজয়ই শেষ বিজয়; শিখ দলের মধ্যে আর তেমন

যোগ্য সেনানীও নাই, তেমন দুর্ধর্ষ বাহিনীও নাই; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দল দেশময় ছড়াইয়া থাকিতে পারে; তাহাদিগকে চূর্ণ করিতে না পারিলে শিখশক্তি একেবারে বিধ্বস্ত হইবার নহে। তাই তিনি সেনাপতি গিলবার্টকে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শিকারী যেমন শশকের পাল শিকার করে, যেমন ভাবে মৃগের দলকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেনাপতি গিলবার্ট তেমনই ভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিখ সেনাদলকে শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেনাপতি গিলবার্ট পঞ্জাব ঝাটাইয়া ১৬০টি তোপ সংগ্রহ করিলেন এবং প্রায় ৪১ হাজার খালসা সৈন্যের অধীনতার চিহ্নস্বরূপ ৪১ হাজার বন্দুক, তরবারি ও ঢাল সংগ্রহ করিলেন। এ সময়ে পঞ্জাব নির্বীর হইয়াছিল। বৃদ্ধ ছত্র সিং যুদ্ধের প্রারম্ভেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র বীর শের সিং বিশ্বাসঘাতকের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন; চিলিয়ানওয়ালা গুজরাটের ক্ষেত্রে মুলতান ও মুদকীতে, বাকি যে কয়েকজন বীর ছিলেন, একে একে তাঁহারা সকলকেই বীরশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। চালকবিহীন সেনানীবিহীন এবং আশাহীন হইয়া প্রায় ৫০ হাজার শিখ সেনা হেলায় পঞ্জাবের স্বাধীনতা বিস্মৃতির অতলতলে ডুবাইয়া দিয়াছিল। ফলে সেনাপতি গিলবার্ট ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখের মধ্যে পঞ্জাব প্রদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিলেন। শতদ্রুর তীর হইতে খাইবার গিরিসঙ্কট পর্যন্ত একটি শিখ সৈন্যও শস্ত্রপাণি রহিল না। এইরূপে পঞ্জাব বিজয় হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্জাব অধিকার

পঞ্জাব ইংরাজের পূর্ণ অধিকারে আসিবার পর সকলেই যেন একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—পঞ্জাব লইয়া করিবে কি? এই জিজ্ঞাসার একটু হেতু ছিল; প্রকৃতি প্রস্তাবে মহারাজ দিলীপ সিং পঞ্জাবের অধিকারী। ইংরাজ কোম্পানি তাঁহার অলি ও অছি। মহারাজ দিলীপ সিং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বীয় রাজ্য ইংরাজের নিকট হইতে বুঝিয়া লইবার অধিকার তাঁহার ছিল। মূলরাজের বিদ্রোহ, সর্দার ছত্র সিংহের উত্তেজনা, লাহোর দরবারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইংরাজ সেনাপতিগণের জিগীষার জন্য মহারাজ দিলীপ সিং দায়ী ছিলেন না। তিনি তো ইংরেজের পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিয়া ইংরাজের নিকটে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এমন কি, স্বীয় জননী মহারানি ঝিন্দনের নির্বাসনাজ্ঞার ঘোষণাপত্রে রেসিডেন্টে.. আদেশ মতো তিনি রাজকীয় মোহর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। নাবালককে অলি ও অছির অধীনতায় যেরূপ ভাবে থাকিতে হয়, মহারাজ দিলীপ সিং ঠিক সেইরূপ ভাবেই ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে কোনো দোষে দোষী করা চলে না। তাই ইংরাজ রাজনীতিক মাত্রেই লর্ড ডালহাউসিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাব লইয়া কি করিবে? আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ মানিতে হইলে, মনুষ্য সমাজের গ্রাহ্য সাধুতার নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে হইলে, যাহার পঞ্জাব তাহাকেই প্রত্যর্পণ করিতে হয়। কিন্তু লর্ড ডালহাউসি পূর্বাহ্ণেই নিজ সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন যে, 'There never will be peace in the Punjab as long as its people are allowed to retain the means and the opportunity of making war. There never can be now any guarantee for the tranquility of India, until we shall have effected the entire subjection of the Sikh people, and destroyed its power as an independent nation.' অর্থাৎ যতদিন পঞ্জাববাসী যুদ্ধ করিবার উপায় এবং অবসর করতলগত রাখিবে, ততদিন পঞ্জাবে শান্তি অসম্ভব; যতক্ষণ না শিখজাতিকে আমরা (ইংরাজ) পূর্ণ অধীনতায় রাখিতে পারিব, যতক্ষণ না স্বাধীন জাতিরূপে তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য আমরা নষ্ট করিব, ততক্ষণ ভারতের শান্তিরক্ষার পক্ষে আমাদের কোনরূপ নিশ্চয়তা থাকিবে না। মহারাজ দিলীপ সিংকে রাজা করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া ইংরাজ তাঁহার নামে পঞ্জাব শাসন করিতে পারেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে লর্ড ডালহাউসি লিখিয়াছেন, 'By maintaining the pegeants of a Throne we should leave just enough of sovereignty to keep alive among the Sikhs the memory of their nationality, and to serve as a nucleus for constant intrigue. We should have all the labour, all the anxiety, all the responsibility, which would attach to the territories if they were actually made our own; while we should not reap the corresponding benefits of increase of

revenue, and acknowledged possession.' অর্থাৎ একটা রাজারও রাজসিংহাসনের ধূমধাম বজায় রাখিলে আমরা (ইংরাজ) শিখজাতির মনে তাহাদিগের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের স্মৃতি সজীব রাখিতে পারিব; এই রাজা ও রাজসিংহাসন ভবিষ্যতে অনবরত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র স্বরূপ হইবে; এ দেশ আমাদের নিজের হইলে আমরা উহার শাসনের জন্য যতটা পরিশ্রম, যতটা উদ্বেগ, যতটা দায়িত্বের চিন্তা ও আগ্রহ প্রয়োগ করিতাম, ততটাই এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে, অথচ স্বায়ত্ত রাজ্যে রাজকর বৃদ্ধি করিবার অধিকার এবং স্বীয় রাজ্য বলিয়া শ্লাঘা করিবার অবসর আমাদিগের থাকিবে না।

আমরা বলিতে বাধ্য যে, লর্ড ডালহাউসি মনের কথা স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছিলেন; এই হেতু আমরা তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। পরন্তু দ্বিতীয় শিখ-সমরের সূচনা হইতে তিনি যদি এই সারল্য ও অকপটতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে পঞ্জাব অধিকারের জন্য তাঁহাকে এতটা গ্লানি সহিতে হইত না। জানি বটে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; ছলে, বাহুবলে, কৌশলে যিনিই ধরাসুন্দরীকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন, তিনিই দেশজয়ী হইবেন; কিন্তু ইংরাজ বিজয়ীরূপে ভারতে আগমন করেন নাই, দেশ অধিকার করিবার জন্য একটা যুদ্ধেও শোণিতপাত করেন নাই। অন্তত লর্ড ডালহাউসির পূর্বগামী রাজনীতিক ও ইংরেজ যোদ্ধৃবর্গ উল্টা কথাই কহিয়াছিলেন; বিজয়ীর দেশ জিগীষা সাধুভাবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন; বিশেষত লর্ড ডালহাউসির পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সাবাওনের ঘোরতর যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পঞ্জাবকে পূর্ণ গ্রাস করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, কেবল দেশজয় আমাদের বাসনা নহে, ভারতে হিন্দু স্বাধীনতা চূর্ণ করা আমাদের চেষ্টা নহে, পরন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থরক্ষা এবং ইংরেজ জাতির প্রতাপ ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য। লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারত ত্যাগের এক বৎসর পরেই তাঁহার সকল আশ্বাসবাণী লর্ড ডালহাউসি এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বড় সাধের পঞ্জাব প্রদেশ ছলে ও বলে ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইল।

লর্ড ডালহাউসির পররাষ্ট্র সেক্রেটারি ইলিয়ট সাহেব গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধিরূপে লাহোর দরবারে প্রেরিত হইলেন। এই সময় স্যর ফ্রেডারিক কুরীর কার্যকাল শেষ হওয়াতে স্যর হেনরি লরেন্স পুনর্বার রেসিডেন্টের কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলিয়ট সাহেব হেনরি লরেন্সের সহিত সম্মিলিত হইয়া ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে মহারাজ দিলীপ সিংহের হস্ত হইতে রাজকার্য কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করাইলেন। পরদিন ২৯শে মার্চ তারিখে লাহোরে শেষ দরবার বসিল। দিলীপ এই দিন জন্মের শোধ শেষবার পিতৃসিংহাসনে বসিলেন। চারিদিকে ইংরেজ সেনানী ও রাজনীতিকগণ, যেন তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওদিকে, দরবার চন্দ্রাতপের বাহিরে দলে দলে ইংরেজ সৈন্য সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান, তাহাদের পশ্চাতে সিপাহি গোলন্দাজের দল তোপ কামান লইয়া যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল; আর মহারাজের সম্মুখে ইংরাজ প্রতিনিধিগণের প্রতি বাষ্পাকুল নয়নে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দেওয়ান দীননাথ করযোড়ে এই অত্যাচার নিবারণের জন্য অপূর্ব বক্তৃতা করিতেছিলেন। দীননাথ কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, তিনি অসাধারণ ধীমান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তিনি পঞ্জাব রক্ষার পক্ষে নানাবিধ যুক্তিজালের অবতারণা করিলেন, শাস্ত্রের, মনুষ্যত্বের, সাধুতার দোহাই দিলেন; আবেদন, প্রবেদন, নিবেদন

করিলেন—শেষে আর থাকিতে না পারিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ দীননাথের জ্যোতির্ময় নয়ন দুইটি হইতে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে ধারাযুগল কপোল বাহিয়া শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফকে সিক্ত করিয়া বৃদ্ধের হৃদয় ভাসাইয়া দিল—দীননাথ রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—ভবী ভুলিবার নহে—লর্ড ডালহাউসির ঘোষণাপত্র সেই দরবারে পঠিত হইল। মহারাজ দিলীপ সিং উপায়ান্তর না দেখিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভূতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—দরবার শেষ হইল। অমনি মহারাজ রণজিতের লাহোর দুর্গের প্রাচীরের উপর ইংরাজ পতাকা উড্ডীন হইল; দুর্গ হইতে ঘন ঘন আনন্দ-তোপধ্বনি হইতে লাগিল—মহারাজ রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী 'সব্ লাল হো যায়েগা' সফল হইল।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে মার্চ তারিখে লর্ড ডালহাউসির পঞ্জাববিজয় ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের ইংরেজ অধিকৃত স্থানসমূহে প্রচারিত হইল। কোম্পানির গবর্নমেন্ট পঞ্জাব গ্রহণের অঙ্গীকারপত্রে মহারাজ দিলীপ সিংকে এবং তাঁহার পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকার পাইলেন। পঞ্জাববিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে, যুগে যুগে যে লোকপ্রসিদ্ধ কোহিনুর হীরক অঙ্গাধিপ মহারাজ কর্ণের কুণ্ডল হইতে, বিপ্লবের পর বিপ্লবে, যুগান্তরের পর নবযুগের সূচনায়, নানা জাতির এবং নানা বীরের অধিকৃত হইয়া, পরিশেষে পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, রণজিৎ যাহা সগৌরবে বাহুতে ধারণ করিতেন, যাহার মূল্যের কথায় একদিন রণজিৎ হাসিয়া ইংরাজ প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন যে, 'ইসকা কিস্মৎ পাঁচ জুতি', লর্ড ডালহাউসি সেই পাঁচ জুতি মূল্য দিয়া তাহা তাঁহার পুত্র দিলীপ সিংহের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। পঞ্জাব-স্বাধীনতালোপের সঙ্গে সঙ্গে স্যমন্তকসদৃশ কোহিনুর চিরদিনের জন্য ভারতক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া ইংল্যান্ডেশ্বরীর শিরোমণি হইল।

পঞ্জাব অধিকৃত হইল; মহারাজ দিলীপ সিং স্বীয় রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইলেন; ফতেগড়ে আপাতত তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার যে সমস্ত খাস সম্পত্তি ছিল, কোম্পানির গবর্নমেন্ট সে সকলও অধিকার করিতে নিরস্ত হন নাই। মহারাজ দিলীপ স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার খাস সম্পত্তির একটি মহল হইতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় ছিল; লবণের খনি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত; ইহা ছাড়া শাল, রুমাল, মণি, মুক্তা স্তূপে স্তূপে সঞ্চিত ছিল। কোম্পানির গবর্নমেন্ট দিলীপের পিতৃ-সম্পত্তির অছি-রূপ ছিলেন বটে, তথাপি পঞ্জাব বিজয়ের পর প্রকাশ্যভাবে ওই সকল মণিমুক্তা বিক্রয় করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই এবং লবণের খনি ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের খাস হাবেলির সম্পত্তি সকল বেমালুম বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে ফতেগড়ে দিলীপের আবাস বাটীতে তাঁহার অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। গবর্নমেন্ট ক্ষতিপূরণ হিসাবে ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, দিলীপ তাহা গ্রহণ করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্জাব বিজয়ের পর কোম্পানির গবর্নমেন্ট দিলীপ সিংকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্যচ্যুতির পরে দিলীপ সিংকে প্রথমে বার্ষিক এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র দিতেন। সাত বৎসর পরে উহা বাড়াইয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করা হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে দিলীপ সিংকে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা

দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। নানা কারণে ওই টাকা হইতে আবার বৎসরে প্রায় সত্তর হাজার টাকা কাটান যাইত; সুতরাং শেষে দিলীপ ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে বার্ষিক এক লক্ষ আশি হাজার টাকারও কম বৃত্তি পাইতেন। দিলীপ সিংহের আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের জন্য কোম্পানি বৎসরে এক লক্ষ আশিহাজার টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু ওই সকল আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকের মৃত্যু হওয়াতে কোম্পানিকে বোধ হয় প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক দিতে হইত না। অবশিষ্ট টাকা কখনই দিলীপের হস্তগত হয় নাই।

রাজ্যচ্যুতির সময় দিলীপ সিংহের বয়স ১১ বৎসর মাত্র ছিল। স্যর জন লগিন নামক একজন ইংরেজ তাঁহার শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফতেগড়ের একজন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক যুবক দিলীপকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহার এক বৎসর পরে খ্রিস্টান দিলীপ ইংল্যান্ডে উপনীত হন। শেষে ফরাসি রাজধানী প্যারিস নগরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। আর মহারানি ঝিন্দন,—লোকললামভূতা, রূপৈশ্বর্যসমন্বিতা, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পত্নী মহারানি ঝিন্দনের কি হইল?—তিনি বার্ধক্যে প্রায় অন্ধ হইয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে ইংল্যান্ডে তনয়ের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রকে পূর্বে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—বাবা, আমার কাশী গয়া তুমি, আমার ইহকাল পরকাল তুমি, মরণকালে তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মরিতে পারিলে তোমার পিতার কথা আমার মনে পড়িবে, আর আমি সুখে দেহত্যাগ করিতে পারিব। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে সেই বারিধিবারিবেষ্টিত ঘনতুহিনবিস্তার-বিমণ্ডিত অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে প্রাণাধিক তনয়ের ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্যভ্রষ্টা শ্রীহীনা মহিষীর জীবনস্রোত অজ্ঞেয় অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গেল।

এইবার ইংরাজ রাজনীতিকদিগের মতামতের কথা বলিব। পঞ্জাববিজয়ের বিরুদ্ধে, দুইজন ইংরাজ রাজনীতিক, স্যর হেনরি লরেন্স এবং লাডলো সাহেব অত্যন্ত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্যর হেনরি লরেন্স তো পঞ্জাব অধিকারের সমাচার পাইয়াই রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন; পরে অনেক বুঝাইবার শিখাইবার পর তিনি সেই পদ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লাডলো সাহেব তাঁহার লিখিত 'British India, its Races and its History' নামক ইতিহাসগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'দিলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দেই তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেন। আমরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন আমরা শেষবার তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হই, তখন (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের, ১৮ই নবেম্বর) প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, যাহারা শাসনসমিতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, তাহাদের শাস্তিবিধান জন্যই আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে। আমরা ছয় মাসের মধ্যে দিলীপ সিংহের রাজ্য ইংরাজের অধিকারভুক্ত করিয়া ওই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম! ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ পঞ্জাব রাজ্যের স্বাধীনতা শেষ হয়, আমাদের রক্ষিত বালক নির্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হয়েন, রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় এবং বিখ্যাত কোহিনুর মহারানির রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করে। সংক্ষেপে আমরা আমাদের রক্ষাধীন বালকের সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার "রক্ষা-কার্য" নির্বাহ করিলাম! ... ... একবার দিলীপ সিংহের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া পরক্ষণে তদীয় প্রজাদিগের অপরাধে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া সাতিশয় অব্যবস্থার

কার্য। আমরা বিদ্রোহী প্রজাদিগকে শাসন করিয়া অভিভাবকোচিত কার্য করিয়াছি মাত্র। ইহার জন্য দিলীপ সিংহকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার আমাদের কোনো অধিকার নাই। বিবেচনা কর, কোন বিধবা মহিলার কতকগুলি ভৃত্য বিদ্রোহী হইয়া পুলিশকে আক্রমণ করিল, পুলিশ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মহিলাব রক্ষার ভার লইল; উভয় পক্ষে আবার দাঙ্গা ঘটিল, আবারও পুলিশ জয়ী হইল। ইহার পর পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া বিধবাকে নম্রভাবে কহিলেন, তাঁহার ভদ্রাসন, সম্পত্তি, সমস্তই পুলিশের অধিকৃত হইবে। তিনি উহার পরিবর্তে সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে নিজের ভরণ পোষণোপযোগী কিছু অংশ পাইবেন মাত্র। অধিকন্তু তাঁহার বহুমূল্য হীরকের হার পুলিশের প্রধান কমিশনরের ব্যবহারার্থ দিতে হইবে। এক্ষণে যে দিলীপ সিংহ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হইয়া ইংল্যান্ডীয় অভিজাতশ্রেণিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার সরল ও নির্দোষ-ভাব-পূর্ণ বাল্যাবস্থায় আমরা যেরূপ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, উল্লিখিত ঘটনা কি তাহার অতিরঞ্জিত চিত্র?

পররাজ্যাধিকারস্থলে ব্রিটিশ ন্যায়পরতার সম্বন্ধে আমাদের লর্ড ডালহাউসির এইরূপ ধারণা ছিল। তদবধি ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ অধিপতি তিলমাত্রও বিচলিত না হইয়া বরং ওই ধারণার অনুমোদক হইয়া আসিতেছেন।'

এইরূপে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার এক বৎসরের মধ্যেই লর্ড ডালহাউসি পঞ্জাব বিজয় করিলেন। তাঁহার পঞ্জাব-বিজয়ের পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার অধীন সিপাহি সেনাগণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য সিপাহি যুদ্ধের দাবানলে ইন্ধন জোগাইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সিকিম ও ব্রহ্মদেশ

সিকিম। পঞ্জাব বিজয়ের অব্যবহিত পরেই লর্ড ডালহাউসি বঙ্গদেশের তুষারচূড়াতুল্য সিকিম রাজ্যকে ইংরাজ অধিকারভুক্ত করেন। এই রাজ্যাপহরণের অছিলা এই যে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার ক্যাম্বেল এবং উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ স্যর জোসেফ হুকার (Sir Joseph Hooker) সিকিমে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। উদ্ভিদতত্ত্ব বিদ্যার বিস্তার এবং নব নব উদ্ভিদ জাতির আবিষ্কারই নাকি এই পরিভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শুনা যায় যে, এই সাহেবযুগলের অনুচরবর্গ সিকিমে একটু উৎপাত উপদ্রবও করিয়াছিল। তাই সিকিম রাজাবল্লভগণ ডাক্তার ক্যাম্বেল ও স্যর জোসেফ হুকারকে একটু চাতুরী করিয়া আবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য যে, সিকিমরাজ ইহাদিগকে তাঁহার রাজ্যে ভ্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বটে, পরন্তু বৌদ্ধ মঠ ও বিতানের মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেন নাই। ইংরাজদ্বয় এরূপ বহুস্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজবল্লভদিগের উদ্দেশ্য ছিল যে, ইহাদিগকে ধৃত অবস্থাতেই সিকিম হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইবে। ইতোমধ্যে লর্ড ডালহাউসির নিকটে এই সমাচার গেল; তিনি আর দ্বিধা না করিয়া, সিকিমরাজের পক্ষের কোন কথা না শুনিয়া, একদল হাইলান্ডার সেনাকে সিকিম জয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমেই সিকিমরাজ তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণাংশ ইংরাজকে ছাড়িয়া দিয়া এবং ইংরাজের সামন্তরূপে অবস্থান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লর্ড ডালহাউসির সহিত সন্ধি করিলেন। এইরূপে সিকিমের উপর লর্ড ডালহাউসি ইংরাজ-প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। সিকিমের কাণ্ডের পর ভারতবর্ষে সকলেই লর্ড ডালহাউসির এই ব্যবহারে বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়াছিল। সে অসন্তোষের আঘাত যে সিপাহির দলে গিয়া লাগে নাই, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

ব্রহ্মদেশ। ব্রহ্মদেশে লর্ড ডালহাউসির একটু বিশেষভাবে রাজ্যপ্রসারের পন্থা পরিষ্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি বুঝাইতে হইলে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে ঐতিহাসিক সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

১৮২৪ হইতে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। এই যুদ্ধের ফলে, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ান্ডাবুর সন্ধির শর্ত অনুসারে ব্রহ্মদেশের পূর্বসীমাবর্তী বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ দেশসমূহ ইংরাজের করায়ত্ত হয়। রেঙ্গুন নগরে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার অনুমতিও এই সন্ধির বলে ইংরাজ পাইয়াছিলেন; ইংরাজ কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট ব্রহ্মসাম্রাজ্যের রাজধানী আভা নগরীতে অবস্থিতি করিবেন, এরূপও শর্ত ছিল।

ব্রহ্মরাজ ইয়াণ্ডাবুর সন্ধির অন্য সকল সর্তই অনায়াসে মানিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, পরন্তু আভায় ইংরাজ রেসিডেন্টের বাস তাহার পক্ষে চক্ষুশূল হইয়াছিল। তিনি ভিন্নধর্মা ভিন্নদেশীয় একজন রাজপুরুষকে পুণ্যপূত আভা নগরীতে থাকিতে দেখিয়া মর্মান্তিক পীড়ায় অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ পুরুষশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সন্ধির কোন শর্তই তিনি তাঁহার মরণকাল পর্যন্ত লঙ্ঘন করেন নাই। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজবংশের একটি পরিবর্তন ঘটে। নূতন রাজা, নূতন রাজবংশ আসিয়া রাজাসনে সমাসীন হন। এই নূতন রাজা ইয়াণ্ডাবুর সন্ধি শর্তকে পদদলিত করিয়া ইংরাজ রেসিডেন্টকে আভানগরী হইতে বিতাড়িত করেন। ইংরাজ রেসিডেন্ট প্রাণভয়ে আভা নগরী ত্যাগ করিয়া রেঙ্গুনে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় কাবুল যুদ্ধের পরাজয়ে কোম্পানির রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষে বিপর্যস্তবৎ হইয়াছিলেন, ফলে ব্রহ্মরাজের দূত অবমাননা তাঁহারা নীরবে সহ্য করিয়া লইলেন। ব্রহ্মরাজ কোম্পানির কর্মচারিবর্গকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রহ্মপ্রবাসী ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের উপর উৎপাত উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশ বৎসরকাল ইংরাজ ব্যবসায়ী এবং কোম্পানির গবর্নমেন্ট এই উৎপাত উপদ্রব নীরবে সহিয়াছিলেন।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রেঙ্গুনপ্রবাসী ইংরাজ বণিকগণ বড়লাট লর্ড ডালহাউসির নিকটে এক দরখাস্ত পাঠাইলেন। সেই দরখাস্তে লিখিত ছিল যে, এ দেশে আমাদের আর অধিককাল বাস করা সম্ভবপর হইবে না, ব্রহ্মরাজপুরুষগণ আমাদিগের উপর দিনে দিনে অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিতেছেন; আমরা ইংল্যাণ্ডেশ্বরের প্রজা, আমাদের আয়ুর্বিত্ত রক্ষা করা আপনাব কর্তব্য; যে ইয়াণ্ডাবুর সন্ধি অনুসারে আমরা এ দেশে আসিয়াছি, সেই ইয়াণ্ডাবুর সন্ধির কোন শর্তই ব্রহ্মরাজ গ্রাহ্য করেন না; আমরা তাই আপনার শরণাগত হইলাম।

লর্ড ডালহাউসি এরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পুরুষ ছিলেন না। তিনি ত্বরায় একজন ইংরেজ নৌ-সেনাপতির অধীনতায় তিনটি ইংরেজ রণতরী রেঙ্গুনে পাঠাইয়া দিলেন। নৌ-সেনাপতির প্রতি আদেশ রহিল যে, প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া শিষ্ট ভাষায় মিষ্ট ব্যবহারে কার্যোদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি রেঙ্গুনে যাইয়া প্রথমে ব্রহ্মরাজের প্রতিনিধি ও শাসনকর্তার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। দুই ঘণ্টাকাল তাঁহাকে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে আদেশের প্রতীক্ষায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। দুই ঘণ্টা পরে সংবাদ আসিল যে, প্রতিনিধি মহাশয় এখন নিদ্রিত, সুতরাং দেখা হইবে না। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি স্বীয় জাহাজে প্রত্যাবর্তন করিয়া লর্ড ডালহাউসিকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যুদ্ধ না করিলে ব্রহ্মরাজ শাসিত হইবেন না; ছোটখাট যুদ্ধ করিলেও চলিবে না; এমন যুদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে উত্তরে সুদূর পর্বতাধিক্যতায় অধিষ্ঠিত আভা নগরীতে ব্রহ্মরাজ ইংরাজের প্রভাব অনুভব করিতে পারেন।

এই পত্র পাইয়া লর্ড ডালহাউসি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেনাপতি গডউইন (Godwin) ইংরেজ সেনাদলের সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন। প্রায় বিংশতি সহস্র নানা শ্রেণির সেনা, তোপ, গোলাগুলি রসদ প্রভৃতির সহিত তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই ব্রহ্ম-যুদ্ধের সূচনায় দুইটি গোলযোগ

উপস্থিত হইল। প্রথম গোলযোগ, সিপাহিদিগকে লইয়া। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গের পূরবীয়া সিপাহির দল সমুদ্রপারে যুদ্ধ করিতে যাইবে না বলিয়া কোম্পানির কার্য গ্রহণ করিয়াছিল; কেবল ছয়, কি সাত দল সিপাহি সেনা বিদেশে যাইবে বলিয়া অঙ্গীকার করে এবং সেই অঙ্গীকার অনুসারে কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করে। কিন্তু পঞ্জাব বিজয়ের পর এই ছয়, কি সাত দল সিপাহি সেনা ভারতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত ছিল। যাহারা পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সাগরপারে যাইতে অস্বীকার করিতে পারে, লর্ড ডালহাউসি ব্রহ্ম-যুদ্ধের তাড়াতাড়িতে এমন সকল সিপাহির দল ব্রহ্মদেশে পাঠাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ৩৮ নম্বরের সিপাহি পদাতিক সেনার দল স্পষ্টই বড়লাটকে দরখাস্ত করিয়া জানাইল যে, তাহারা বড়লাটের অনুরোধে খুসকী পথে বা ভূমিপথে ব্রহ্মে যাইতে পারে, কিন্তু জাহাজে চড়িয়া সাগরপারে যাইলে তাহাদিগের জাতি যাইবার সম্ভাবনা আছে। লর্ড ডালহাউসি সিপাহিদিগের এই দরখাস্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইতে নিরস্ত হইলেন। কাজেই লর্ড ডালহাউসি মান্দ্রাজের গবর্নর স্যর হেনরি পটিঞ্জরের নিকটে সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। মান্দ্রাজি তেলেঙ্গা সিপাহি কোনরূপ সর্তের মধ্যে কোম্পানিকে আবদ্ধ করিয়া কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করে নাই; সুতরাং তাহাদিগকে যে দেশেই প্রেরণ করা হইবে, সেই দেশেই তাহারা যাইতে বাধ্য। কিন্তু মান্দ্রাজি লাট পটিঞ্জর মহোদয় লর্ড ডালহাউসির ঔদ্ধত্যে একটু ব্যথিত হইয়াছিলেন; তাই তিনি লর্ড ডালহাউসিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যদি সেনাপ্রেরণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি মান্দ্রাজি তেলেঙ্গা সিপাহির দলকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইতে পারি। লর্ড ডালহাউসি মান্দ্রাজি লাটের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিলেন; পরে স্যর হেনরি পটিঞ্জর যথারীতি মান্দ্রাজি সেনা ব্রহ্মদেশে পাঠাইলেন।

এদিকে বেতনবৃদ্ধির এবং ভাতা-লাভের লোভ দেখাইয়া বঙ্গীয় সিপাহি দলকে লর্ড ডালহাউসি ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিতে সম্মত করিয়াছিলেন। যে সকল সিপাহি এই স্বীকার পত্রে স্বাক্ষর করিল, তাহাদিগের সহিত পূর্ব প্রতিশ্রুতি নাকচ করিয়া লর্ড ডালহাউসির গবর্নমেন্ট নূতন ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে বঙ্গীয় সিপাহির দল ও মান্দ্রাজি তেলেঙ্গা সিপাহির দল ব্রহ্মজয়ের জন্য সর্বপ্রথমে সুমদ্রযাত্রা করিল।

দ্বিতীয় গোলযোগেব কথা, একটু মজার রকমের। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের বিবরণ পাঠ করিয়া লর্ড ডালহাউসি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল ব্রহ্মসেনার দলই সেদেশে ইংরাজের শত্রু নহে; সে দেশের জলবায়ু এবং জ্বর ও আমাশয় রোগ ইংরাজের সিপাহি ও গোরা সেনাদলের প্রবলতর শত্রু। তাই তিনি তাৎকালিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের সিদ্ধান্তানুসারে অভিযানের উদ্‌যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন। সিপাহিদিগকে কুইনিন ও নানাবিধ বিলাতি ঔষধ প্রদান করা হইয়াছিল। ছোট ছোট কাষ্ঠের ঘর তৈয়ার করিয়া কলিকাতা হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। প্রায় এক সহস্র সূত্রধর সেনাদলের সহিত ব্রহ্মদেশে গিয়াছিল। এই সকল কাষ্ঠনির্মিত কুটীরকে মধ্যে মধ্যে ফিনাইল দিয়া ধৌত করা হইত। সিপাহিদিগের রুটি তৈয়ারির জন্য গরম জল সরবরাহ করা হইত। এবংবিধ ব্যবস্থার প্রভাবে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে রোগে অল্পসংখ্যক সেনাই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু সিপাহিগণ ব্রহ্মদেশে যাইয়া এই সকল সুব্যবস্থার উল্টা অর্থ করিল। লর্ড ডালহাউসি সকল সুব্যবস্থাই করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিপাহিদিগের জাতিরক্ষার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে সিপাহিগণ স্কন্ধাবারের ভিস্তির প্রদত্ত গরম জল গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল। তাহারা ভাবিল, বুঝিবা তাহাদিগের জাতিনাশ করিবার জন্যই এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে অবস্থান কালে সিপাহিগণ এসকল কথা কাহাকেও বলে নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিপাহিগণ যখন দেখিল যে, অযোধ্যা, নাগপুর, ঝাঁসি, সাতারা প্রভৃতি সকল স্বাধীন হিন্দু রাজ্যই অনন্তকালসাগরে ডুবিয়াছে, তখন তাহারা ব্রহ্মদেশে ইংরাজের ব্যবহারের কথা তাহাদিগের বন্ধুবান্ধবগণকে জ্ঞাপন করিল। লর্ড ডালহাউসি খাজা ইংরাজ ছিলেন; এদেশের হিন্দু মুসলমানকে চিনিতেন না; তাই তাঁহার শুভচেষ্টার পরিণামে গরল উদ্‌গীর্ণ হইয়াছিল।

যাহা হউক, ইংরাজ সেনাবাহিনী রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব বীরত্বসহ রেঙ্গুন অধিকার করিল। লর্ড ডালহাউসিও ব্রহ্মযুদ্ধের পর রেঙ্গুনে যাইয়া সিপাহি ও গোরাদিগের বীর কীর্তির কথা শুনিয়া সেনাপতিকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'I cannot imagine General how your men ever got in at this place' অর্থাৎ সেনাপতি, আমি অনুমানই করিতে পারিতেছি না (ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিতেছি না) কেমন করিয়া তোমার সিপাহি ও গোরার দল এই দুর্গম স্থানে প্রবেশ করিয়া এই স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্রহ্মরাজের প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা রেঙ্গুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিলেন। পলায়ন করিতে করিতেও তিনি ইংরাজ সেনানীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, 'পারত তুমিও পলাও; কারণ, ভবিষ্যতে তোমার সর্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।' এদিকে লর্ড ডালহাউসি বুঝিতে পারিলেন যে, শুধু রেঙ্গুন দখল করিলে ব্রহ্মজয় করা হইবে না। তিনি রেঙ্গুন ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সকল অধিকার করিয়া প্রোম নগর অধিকার করিবার জন্য ইংরেজ সেনানায়ককে বলিলেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষে ইংরেজ প্রোম দখল করিলেন। প্রোম দখল করাতে রাজধানী আভা নগরীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। লর্ড ডালহাউসি বুঝিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মরাজ্য দখল করিতে পারেন, কিন্তু এ দখলে তাঁহাকে সহসা চীন সম্রাটের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে হইবে; এই হেতু তিনি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রোম, পেগু, নিগ্রেস, মার্তাবান উপদ্বীপ এবং দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া ব্রহ্মযুদ্ধ বন্ধ করিলেন। ব্রহ্মরাজ কিন্তু রাজ্যের দক্ষিণাংশ হারাইয়াও ইংরাজ কোম্পানির সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। যাহা হউক, স্যর আর্থার ফেয়ার (Sir Arthur Phayre) দক্ষিণ ব্রহ্মের প্রথম চিফ কমিশনার হইয়া কোম্পানির নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। একদিকে সিবিলিয়ান প্রধান স্যর জন লরেন্স পঞ্জাবের শাসনকর্তা হইয়া পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশের দুর্ধর্ষ জাতিগণকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপর দিকে সুদূর প্রাচ্য ব্রহ্মদেশে রাজনীতি-বিশারদ সেনানী কর্নেল ফেয়ার ইংরেজের প্রসার ও প্রভাবের বৃদ্ধিকামনায় ব্রহ্মশাসনে মনোযোগী হইলেন। নিয়তি লর্ড ডালহাউসির সাধ মিটাইয়া দিলেন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশ লর্ড ডালহাউসির একদিনের স্বপ্নগত আশানুরূপ বিসর্পিত হইয়া রহিল। এইবার তিনি ভারত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করিবার অবসর পাইলেন।

ইংরাজের চক্রবর্তিত্ব

লর্ড ডালহাউসি দেখিলেন যে, ভারতবর্ষে যদিও দেশীয় নরপতিগণের সহিত কোম্পানির সন্ধি হইয়াছে এবং সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে যদিও হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ বাক্যে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ জাতির চক্রবর্তিত্বের প্রভাব ভারতের ক্ষুদ্র হইতে মহৎ পর্যন্ত বিসর্পিত হয় নাই। এই চক্রবর্তিত্বের প্রভাব যে কেবল অধীন সামন্ত রাজগণের আনুগত্যেই প্রকট হইবে, তাহা নহে, দেশশাসন ও প্রজাপালন বিষয়েও পদে পদে অনুক্ষণ সামন্ত রাজগণকে এই চক্রবর্তিত্ব-প্রভাব স্মরণ করাইয়া চলিতে হইবে। লর্ড ডালহাউসি ভারতের সামন্ত নরপতিগণকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিলেন; প্রথম, আদিম ও বহুযুগস্থায়ী, যথা রাজপুতানার রাজপুত নরপতিগণ; দ্বিতীয়, অতীতকালের কোন মহারাজ চক্রবর্তীর প্রদত্ত জায়গির-উপভোগী, যথা সাতারা, করৌলীর অধিকারী প্রভৃতি, তৃতীয়, কোন অতীত চক্রবর্তী প্রভাবের অবসানকালে সমরনিপুণ বিজয়ী সেনানায়কগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যাধিকার সকল, যথা বরোদা, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, ঝাঁসি; গোয়ালিয়র প্রভৃতি। লর্ড ডালহাউসি বলিলেন যে, ইংরাজ চিরাচরিত প্রথা মানিতে বাধ্য; কিন্তু সে প্রথা চিরাচরিত হওয়া চাই; অতএব রাজস্থানের রাজপুত অধিপতিগণের আচার ব্যবহারকে চিরাচরিত বলিয়াই তিনি স্বীকার করিলেন; কেননা রাজস্থানের কোন রাজবংশই সহস্র বৎসরের কম পুরাতন নহেন। দ্বিতীয়, জায়গিরদারদিগের পক্ষে তিনি বলিলেন যে, ইঁহারা তো সাম্রাজশক্তির ইচ্ছাধীন মাত্র; ইঁহাদের অধিকার অনধিকার, ইঁহাদের কুলগত ও অধিকারগত আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই তো সম্রাটের শাসনাধীন। মোগল পাঠানদিগের শাসনকালে জায়গিরদারগণ তো এই ভাবেই সম্রাটের খোস মেজাজের উপর নির্ভর করিতেন; সুতরাং ইংরাজ জাতি যখন ভারতবর্ষে সম্রাট শক্তিসমন্বিত, তখন এই জায়গিরদারগণও ভারতের চিরাচীর্ণ পদ্ধতি অনুসারে ইংরেজ রাজশক্তির খোস মেজাজের উপর নির্ভর করিবেনই। তৃতীয় দলের বিষয়ে তিনি এই বলিলেন যে, যাহা বিজয়লব্ধ সামগ্রী, তাহা যতদিন বিজয় বৈজয়ন্ত অম্লান থাকে, ততদিনই উপভোগ্য। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় বাদশাহের বেতনভুক কর্মচারিগণ বা প্রজাদিগের মধ্যে উদ্ধত ও তেজস্বী ব্যক্তিগণ মূলত বিশ্বাসঘাতকতার প্রভাবে এবং পরে পুরুষকারের প্রতাপে এই সকল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজের নিকট এই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ সম্মুখ সমরে পরাজিত হওয়ায় তাহাদিগের রাজ্যাধিকারের স্বত্ব ও স্বামিত্ব ইংরাজের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। ইংরাজ তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই বটে, পরন্তু তাহাদিগের পূর্বেকার অক্ষুণ্ণ স্বামিত্ব সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব যদি ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় উল্লিখিত তিন শ্রেণির মধ্যে দুইশ্রেণির ভূপতিগণকে পূর্ণ আয়ত্ত রাখিবার বাসনা করেন, তাহা হইলে সে কার্য বিধিবিরুদ্ধ হইবে না; অর্থাৎ, শাদা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, লর্ড ডালহাউসি এই সকল সামন্ত নরপতিকে তাঁহার অথবা তাঁহার পরবর্তীদিগের খোস খেয়ালেব উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এই সঙ্গে লর্ড ডালহাউসি ব্যক্তিগত অধিকার এবং রাজনৈতিক দেশাধিকার, এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য করিলেন। তিনি বলিলেন যে, রাজ্য ও প্রজাপালনের অধিকার

ব্যক্তিগত অধিকার নহে, ইহা ন্যস্ত শক্তি; প্রজাকুল সমাজবন্ধন দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যে, দেশকে সুশাসনে রাখিবার কামনায়, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবার কল্পনায়, তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজন উদ্‌যোগী ও ধীমান পুরুষকে তাঁহাদিগের রাজা করিয়া রাখেন। যতদিন রাজকার্য সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হয়, যতদিন রাজা প্রজারক্ষায় ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন, ততদিন প্রজার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া নরপতির রাজ্যাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে, রাজ্যাধিকার ব্যক্তিগত সম্মতির ন্যায় যাহাকে তাহাকে বিলাইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ, যখন এবংবিধ রাজ্যাধিকার কোনো জাতির চক্রবর্তিত্বের অধীনতায় অবস্থিত থাকে, তখন মহারাজচক্রবর্তীর অনুমতি ব্যতীত এই সকল সামন্ত রাজ্যকে হস্তান্তর অধিকার কাহারও নাই। স্থূল কথা এই যে, লর্ড ডালহাউসি রাজস্থান ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের সামন্ত রাজগণকে বলিলেন যে, অতঃপর তোমাদের অধিকৃত রাজ্যের শাসনব্যাপারে ইংরাজের পরামর্শ ও অনুমতি প্রবলতর হইয়া থাকিবেই। রাজস্থানে যেমন এক একটা রাজবংশ আছে। সেই সকল রাজবংশ ও রাজপরিবার যেমন চিরকালের আচরিত রীতি পদ্ধতি দ্বারা শাসিত হয় (যে সকল রীতি পদ্ধতির উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন সম্রাটেরই নাই) তেমন রাজবংশ ও রাজপরিবার তোমাদের নহে; ইংরাজের আগমনে ও মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সন্ধিক্ষণে তোমাদিগের প্রায় সকলেই উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং ইংরেজের সামন্ত বলিয়া একসূত্রে তোমাদিগকে রাজপুতানার নরপতিগণের সহিত সংবদ্ধ রাখা চলে না; যতদিন তোমরা সুশাসনপ্রভাবে প্রজারক্ষা ও প্রজাপালন করিবে, ততদিন তোমাদের রাজ্যাধিকার তোমাদিগের করতলগত থাকিবে।

লর্ড ডালহাউসি শেষ কথা এই বলিলেন যে, ইংরেজ জাতি এখন ভারতে সম্রাটশক্তিসম্পন্ন ইংরেজ শাসক ও সম্প্রদায়ের এবং বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলীর বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে যে সকল রীতি নীতি এবং শাসন ও পালন পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, সেই সকলেরই অনুসরণ করিয়া এই সব সামন্তরাজ প্রজাপালন করিবেন এবং স্বীয় অধিকার রক্ষা করিবেন। লর্ড ডালহাউসি এইরূপ যুক্তিজালের বিস্তার করিয়া একটা অছিলা সৃষ্টির পথ বেশ সুপ্রসর করিয়া রাখিলেন। উপরিউক্ত যুক্তিবাদ যদি গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে যদি কেহ প্রমাণ প্রয়োগসহ দেখাইয়া দেয় যে, ভারতের সামন্তরাজগণ লম্পট, অযোগ্য, বিলাসী, প্রজাপীড়ক, মূর্খ এবং স্থবির, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, এই সকল সামান্ত রাজ্য যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হউক, অথবা ইংরাজরাজ্য ভুক্ত করা হউক। ভারতে প্রজাপালন ব্যাপারে ইংরাজের সমান কেহ নাই, অতএব ইংরাজ তাহা গ্রাস করিবেন।

বলিয়া রাখা ভাল যে, লর্ড ডালহাউসি যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, সে সকলের সূচনা লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বা তাঁহার পরবর্তী কোনো বড়লাটই লর্ড ডালহাউসির ন্যায় এত সোজা করিয়া এ সকল কথা বলিতে সাহস করেন নাই। ফলে, এই যুক্তির প্রচার ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ লর্ড ডালহাউসিরই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

THE DOCTRINE OF LAPSE অর্থাৎ বাজেয়াপ্তের তত্ত্ব। এই সকল যুক্তিতর্ক ভারতবাসীকে বুঝাইবার পর লর্ড ডালহাউসি প্রচার করিলেন যে, ভারতের সামন্ত রাজ্য

সকলে এই বাজেয়াপ্তি তত্ত্ব প্রচলিত হইল। অর্থাৎ এই সকল সামন্ত রাজ্যের কোন রাজা দেহত্যাগ করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারীর নির্ধারণ বিষয়ে ইংরেজেরই পূর্ণ অধিকার থাকিবে। যদি কোন রাজা অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী স্বামীর অনুমতিপত্রের দোহাই দিয়া কোন দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না; যদি করেন, তবে ইংরাজ কোম্পানির অনুমতি ব্যতীত সেই দত্তক পুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। সোজা কথা বলিলে বলা চলে যে, সামন্ত রাজ্যের রাজা অপুত্রক হইয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। লর্ড ডালহাউসি বলিলেন যে, হিন্দু পারলৌকিক মঙ্গলকামী হইয়া 'পুত্রচ্ছায়াবহ' দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন; অর্থাৎ ঔরস পুত্রানুরূপ দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া পুন্নাম নরকের জ্বালা হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং এই দত্তকপুত্র ঐ হিন্দুর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। এপক্ষে ইংরেজ শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিবেন না; কিন্তু কোন হিন্দু সামন্ত রাজা যে রাজ্য অধিকার করিয়া আছেন, সেই রাজ্য ও তাহার অধিকারস্বত্ব সম্রাট ইংরাজজাতির ইচ্ছাধীন হইল। সে রাজ্যের উত্তরাধিকার নির্ধারণ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্র ও দেশাচার যাহা বলে বলুক, সম্রাট শক্তি সম্পন্ন ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় যাহা বলিবেন, তাহাই সর্বজনমান্য হইবে। মোটের উপর লর্ড ডালহাউসি ভারতবাসীকে বলিয়া রাখিলেন যে, যে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নাই, বংশ রক্ষার পক্ষে যে রাজ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে হইবে, সেই রাজ্যে পোষ্যপুত্রকে রাজ্যাধিকারী না মান্য করিলেই ইংরাজ সে রাজ্যকে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন।

ইহাই লর্ড ডালহাউসির বাজেয়াপ্তি তত্ত্ব। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এই বাজেয়াপ্তি তত্ত্বকে মান্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভারতের অধিবাসিগণের পক্ষে এ তত্ত্ব একেবারেই নূতন ছিল। ভারতবাসী চিরকাল হইতেই জানে যে, উত্তরাধিকারসূত্রে, দানগ্রহণের দ্বারা এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়াই মানুষ ধনসম্পত্তির উপর স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে পারে; ইহাই হইল সম্পত্তি স্বত্বের তিনটি মৌলিক ব্যবস্থা। পিতার ধন পুত্রে পাইবে; পুত্রের এই অধিকার চিরমান্য; দাতা দান করিবে, গ্রহীতা গ্রহণ করিবে; গৃহীত সামগ্রী গ্রহীতারই চিরকাল ভোগে থাকিবে; ইহাও সর্বজনমান্য। আর সমর-বিদ্যাবিশারদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বীর স্বীয় অস্ত্রের সাহায্যে শত্রু পরাজয় করিয়া দেশ, রাজ্য অধিকার করিতে পারেন; এ বাহুবললব্ধ অধিকারে আপত্তি করিতে হইলে বল দ্বারাই করিতে হয়; কিন্তু সেই অস্ত্রলব্ধ রাজ্য যখন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বংশপরম্পরায় বহুকাল উপভুক্ত হয়, তখন এই উপভোগজন্য উহাতে বংশবিশেষের একটা জগন্মান্য অধিকার সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইউরোপে বিভিন্ন রাজার মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে চিরবিরোধ ঘটাইবার সম্ভাবনা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই internatioal law বা আন্তর্জাতিক বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইতালির মেকিয়াভেলি এবং ফরাসি উমোলিন হইতে আরম্ভ করিলে ইংরেজ বেন্থাম ও আধুনিক জর্মান ব্যবস্থাবিদগণ পর্যন্ত সকল রাজনীতিক ব্যবহারজীবী ও মনীষী এই আন্তর্জাতিক বিধি মান্য করিয়া আসিতেছেন। অধিকার-তত্ত্বের যে তিনটি মৌলিক অবস্থার কথা বলিলাম, তাহা ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক বিধি হইতেই সংগৃহীত। জার্মানি সাম্রাজ্যে অনেক সামন্ত রাজা আছেন; ইহাদিগের মধ্যে লর্ড ডালহাউসির ব্যাখ্যাত তত্ত্বসকল--কখনই প্রচলিত হয় নাই, হইবেও না। সামন্ত হইলেই যে একেবারে সম্রাটের

হাতের মোমের পুতুল হইতে হইবে, সং গড়িবার মাটি হইতে হইবে—এমন কথা কোন দেশের কোন কালের সম্রাটই বলেন নাই, বলিতে পারেন না। জানি বটে, ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে; ইউরোপে যে বিধিপদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে বিধিপদ্ধতি ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রচলন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ তো মানুষের দেশ; মানুষের সহিত মানুষকে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, ভারতবাসীর সে দাবিটুকু তো ইংরেজের নিকটে আছে। পরন্তু লর্ড ডালহাউসি এক নিশ্বাসেই গরমও হইলেন, নরমও হইলেন; তিনি নরম হইয়া, অথচ শ্লাঘায় যেন একটু স্ফীত হইয়া, ভারতবাসীর কাছে প্রকাশ করিলেন যে, ইউরোপ-মান্য সুসভ্য রীতি অনুসারে আমি ভারতবর্ষকে শাসন করিব এবং ইউরোপমান্য বাজেয়াপ্তি প্রথাকে ভারতবর্ষে প্রচলিত করিব। তবে হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধকে আমি লঙ্ঘন করিব না; আচার ব্যবহারে আমি হস্তক্ষেপ করিব না; প্রজাপালন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষণ বিষয়ে ইউরোপে যে প্রশস্ত পদ্ধতি সকল নির্ণীত আছে, আমি তাহারই অনুসরণ করিব। পক্ষান্তরে তিনি একটু গরম হইয়া বলিলেন যে, তোমরা—ভারতের সামন্তরাজগণ আমাদিগের পরাজিত দাসের স্বরূপ, তোমাদিগের বিষয়ে আমরা যাহা ব্যবস্থা করিব তাহাই তোমাদিগকে মানিতে হইবে। ইহাই হইল লর্ড ডালহাউসিব প্রচলিত ভারতের সর্বগ্রাসী নীতি। ইহারই প্রভাবে লর্ড ডালহাউসি ভারতবর্ষের অর্ধেক হিন্দু রাজ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর

সাতারা। সাতারা রাজ্য বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। এই প্রদেশ অনুচ্চ মহাবলেশ্বর পর্বতের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় অবস্থিত। প্রসন্নসলিলা কৃষ্ণার জল-প্রপাতে উহার পাদদেশ বিধৌত হইতেছে। অদূরে ভীমা ও নীরার প্রস্ফুট কুসুম-শোভিত অনুচ্চ শ্যামল ভূমি উহার আলেখ্যবৎ রমণীয়তা পরিবর্ধিত করিয়া দিতেছে। সাতারা যেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিলাসক্ষেত্র, সেইরূপ ইতিহাসেরও প্রিয় নিকেতন। যে অদীন পরাক্রম মহাপুরুষ মাতৃভূমির উদ্ধার মানসে বিশ্বত্রাস যুদ্ধরবে সকলকে কম্পিত করিয়াছিলেন, যাঁহার অতুল্য তেজঃ অতুল্য সাহস ও অনুপম বীরত্বে পরাক্রান্ত মোগল সেনা বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সাতারা সেই হিন্দুকুলগৌরব মহাপরাক্রান্ত শিবাজীর প্রিয়তম স্থান। ভারতে ইংরাজের আধিপত্য সময়ে সাতারার রাজাসনে প্রতাপ সিংহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতাপ সিংহ মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্থাপয়িতা মহাপরাক্রম শিবাজীর বংশধর, সুতরাং মহারাষ্ট্র-সমাজে তাঁহার বিশেষ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে যখন মারাঠা শক্তি এবং পেশবের প্রাধান্য ইংরাজ কর্তৃক চূর্ণ হইয়াছিল, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণের অভিমতক্রমে সাতারা রাজ্যের তাৎকালিক অধিকারীকে সেই রাজ্য প্রত্যর্পণ করা হয়। বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি যে পরোযানা প্রচার করিয়া সাতারা রাজের অভিষেক করেন, সেই পরোয়ানাতে লিখিত ছিল যে, তুমি তোমার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ইংরাজের সামন্তরূপে এই রাজ্য ভোগ দখল করিতে থাক। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এইরূপে সাতারা রাজ্য ইংরাজের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

সাতারাপতি সন্ধিবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি বিলক্ষণ সৌহার্দ্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের সন্ধির ২০ বৎসর পরে, গোয়ার পর্তুগিজ গবর্নমেন্টের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইংরাজ গবর্নমেন্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে, সাতারারাজ প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়। প্রতাপ সিংহ আরোপিত দোষের বিমোচনকল্পে যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার অপরাধের বিচারও হইল না। বিনা আইনে, বিনা বিচারে, রাত্রিকালে প্রতাপ সিংহকে নগর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী একখানি সামান্য পশু রাখিবার কুটীরে আবদ্ধ করিয়া পরে বারাণসীতে নির্বাসিত এবং তাঁহার ধন-সম্পত্তি অধিকার করা হইল। প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা আপা সাহেব, পেশবে বাজীরাওর হস্তে বন্দিরূপে ছিলেন, ইংরেজ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সাতারা রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল অপুত্রকাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শাস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এ দিকে রাজ্যচ্যুত প্রতাপ সিংহও

যথাবিধানে অন্য একটি দত্তকের পিতৃস্থানীয় হন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসি এই উভয় দত্তকই অসিদ্ধ বলিয়া (মত) প্রকাশ করেন। তাঁহার মতানুসারে সাতারা-রাজ যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন, তাহা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুমোদিত হয় নাই, সুতরাং নিয়ম অনুসারে, ওই দত্তক সাতারার রাজাসনের অধিকারী হইতে পারেন না।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি জানাইলেন যে, সম্রাট শক্তির অনুমোদন ব্যতীত কাহারও কোন দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় না, সুতরাং সাতারা রাজ্য ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইল। তিনি সাতারার পোষ্যপুত্রকে সাতারারাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধন, ঐশ্বর্য, মণি, মুক্তা প্রভৃতি অন্যান্য সামগ্রী দখল করিতে অনুমতি দিলেন এবং সেই সঙ্গে বলিলেন যে, ব্যক্তিগত হিসাবে সাতারার মৃত রাজা হিন্দু ছিলেন; তাঁহার গৃহীত দত্তক হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ব্যক্তিগত সকল অধিকারেই অধিকারী। পরন্তু রাজ্যশাসন সম্রাটের ইচ্ছাশক্তির অধীন; ইংরাজের সম্রাটশক্তি সাতারার দত্তককে এই রাজ্যশাসন অধিকারে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইতেছেন; কেননা, সাতারা রাজ্যের অধীন প্রজাদিগের সুখশান্তির জন্য ভারতের মহারাজচক্রবর্তী ইংরাজই দায়ী। সে সুখসম্পত্তি, অজ্ঞাতকুলশীল, অপ্রাপ্তবয়স্ক একজন পোষ্যপুত্রকে দিলে, রাজাধিকার রক্ষা হইবে না। সুতরাং প্রজাদিগের মঙ্গলকামী হইয়াই লর্ড ডালহাউসি যেন অতি অনিচ্ছায় সাতারা রাজ্য করতলগত করিলেন। তিনি তাঁহার ব্যবহারে দেখাইলেন যে, অতিসার রোগগ্রস্ত রোগী অরুচির মুখে যেভাবে ঔষধ সেবন করিয়া থাকে, তিনি যেন ঠিক সেই ভাবেই অতি অনিচ্ছায়, শুদ্ধ প্রজার মঙ্গলকামী হইয়া, সাতারা রাজ্য গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিলাতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ লর্ড ডালহাউসির এই কার্যের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন।

বোম্বাই লাট স্যর জর্জ ক্লার্ক লর্ড ডালহাউসির এই নীতির সমর্থন করিতে পারেন নাই। বিলাতেরও অনেকগুলি রাজনীতিক লর্ড ডালহাউসির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। লর্ড ডালহাউসি সর্বগ্রাসী ছিলেন। তিনি যাহা ধরিতেন, তাহাই গ্রাস করিতেন—যেন উপায়ান্তর ছিল না বলিয়াই গ্রাস করিতেন—তাই যখন সাতারাকে ধরিয়াছিলেন, তখন গ্রাস না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না।

সম্বলপুর। বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় সম্বলপুর প্রদেশ অবস্থিত। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় ইংরেজের প্রাধান্য বিস্তৃত হইবার পূর্বে সম্বলপুর নাগপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন কারণ বশত নাগপুরের ভোঁসলা বংশীয়গণ সম্বলপুরের উপর স্বীয় স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্বলপুরের প্রাচীন রাজার বংশধরকে ঐ প্রদেশ প্রত্যর্পণ করেন। অবশ্য এই প্রত্যর্পণকালে, যে সকল আদিম রীতি পদ্ধতি অনুসারে প্রাচীন রাজবংশ পরিচালিত হইতেন, সেই সকল রীতিপদ্ধতি কোম্পানি গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। পরন্তু ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে সম্বলপুরের শেষ রাজা নারায়ণ সিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইঁহার কোনো পুত্র ছিলেন না; কোন জ্ঞাতিপুত্রও বিদ্যমান ছিলেন না। নারায়ণ সিং কোন দত্তক পুত্রও গ্রহণ করিয়া যান নাই। মরিবার পূর্বে তিনি আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, ভারতের অব্রহ্মতৃণস্তম্ভ পর্যন্ত ইংরাজের উদরস্থ হইবে; মনুষ্যশক্তি ইহার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না; আমি ক্ষত্রিয়, এ কথা আমি মরণের সময়েও ভুলিতে পারিব না; ক্ষত্রিয় হইয়া আমি দত্তক গ্রহণের জন্য ইংরাজের দ্বারে ভিখারি হইতে পারি না; আমার ধর্ম, আমার

শাস্ত্র যাহা নির্দেশ করিয়াছে, তাহা আমারই কর্তব্য এবং আমার হিন্দু প্রজাগণ কর্তৃক নিত্য প্রতিপাল্য; কিন্তু সে কর্তব্য পালন পক্ষে ভারতের একমাত্র শক্তিধর ইংরেজের অনুমতির অপেক্ষা করিতে হয়, সেজন্য আমি না হয় সে কর্তব্য পালন করিলামই না; যাহা অপরিহার্য, তাহাই হউক; আমি পুত্রহীন মরিতেছি, আমার রাজ্য ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইবে, তাহাই হউক; মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, সর্বস্ব ইংরাজকে দান করিয়া গেলাম।—লর্ড ডালহাউসি এই দান গ্রহণ করিলেন। সম্বলপুর ইংরেজ রাজ্যভুক্ত মধ্যপ্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া রহিল।

ঝাঁসি। ভারতের কেন্দ্রস্থলে বুন্দেলখণ্ডস্থ অল্পায়তন বাজ্যসমষ্টির মধ্যে ঝাঁসি নামে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য আছে। এই রাজ্য মহারাষ্ট্র কুলগৌরব পেশবের আশ্রিত ও অনুগত মহারাষ্ট্র বংশীয়ের দ্বারা শাসিত। বুন্দেলখণ্ডস্থ রাজ্য সমষ্টি ইংরেজের করায়ত্ত হইলে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন ঝাঁসিরাজ রামচন্দ্র রাওর সহিত সন্ধি হয়। সন্ধির সর্ত অনুসারে রামচন্দ্র ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পুরুষানুক্রমে ঝাঁসির স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হন। এই সন্ধির পর রামচন্দ্র ইংরেজের প্রতি যাবজ্জীবন সৌজন্য ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে যখন লর্ড কম্বরমিয়র ভারতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন নানাপণ্ডিত নামে মধ্যভারতের জনৈক সর্দার বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহপূর্বক কাল্পি নগর অবরোধ করিতে সচেষ্ট হন। এই সঙ্কট সময়ে ঝাঁসিরাজ মিত্র ইংরাজের সাহায্যার্থ অবিলম্বে ৪০০ অশ্বারোহী, ১০০০ পদাতি ও দুইটি কামান প্রেরণ করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে কাল্পি নগর রক্ষা করেন।

এইরূপ সৌজন্য ও এইরূপ হিতৈষিতা দর্শনে ইংরেজ গবর্নমেন্ট রামচন্দ্র রাওয়ের প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে ঝাঁসির সুপ্রসর রাজভবনে সমৃদ্ধ দরবারে রামচন্দ্র রাওকে আহ্বান পূর্বক 'মহারাজ' উপাধি এবং ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজলক্ষণের উপকরণসমূহ প্রদান করিয়া তাঁহার গৌরব বর্ধন করেন। এইরূপ রাজসম্মানভোগের তিন বৎসর পরে রামচন্দ্র রাওর মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে চারি জন ঝাঁসির রাজাসন প্রার্থনা করেন। গবর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি রামচন্দ্রের পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত অধিকারী বিবেচনা করিয়া ঝাঁসির রাজাসন প্রদান করেন। রঘুনাথ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রজাসাধারণ তাঁহাকে সমাদরে মনোনীত করাতে তাঁহার নামেই ঝাঁসির রাজকার্য নির্বাহিত হয়। তিন বৎসর পরে রঘুনাথও অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগমন করেন।

রঘুনাথ রাওয়ের পরে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুনর্বার উত্তরাধিকারীর নির্বাচন সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এজন্য একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করেন। সমিতির সদস্যগণের অনুসন্ধানে রঘুনাথের ভ্রাতা গঙ্গাধর রাও প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন, সুতরাং ইংরেজ গবর্নমেন্টের কৃপায় ঝাঁসির রাজাসন তাঁহারই উপভোগ হয়।

কিন্তু ইহাতেও ঝাঁসির দুরদৃষ্ট ঘুচিল না। পূর্ববর্তী অধিকারিগণের ন্যায় গঙ্গাধর রাও

নিঃসন্তান হইলেন। তাহার উপর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া গঙ্গাধর রাও ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঔরস পুত্রের অভাবে ইংরাজ রেসিডেন্ট মেজর এলিস ও মেজর মার্টিন নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের সমক্ষে যথাবিধানে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন। এই দত্তকের সম্বন্ধে তিনি একদা রেসিডেন্টকে লিখিয়াছেন—'আমি এক্ষণে সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। একটি ক্ষমতাপন্ন গবর্নমেন্টের সবিশেষ অনুগ্রহ থাকাতেও এত দিনের পর আমার পূর্বপুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, আমার সাতিশয় মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। আমি এই জন্য ইংরেজ গবর্নমেন্টের সহিত আমাদের যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বিতীয় ধারা অনুসারে আনন্দ রাও নামক (দত্তক গ্রহণ ক্রিয়ার পর এই বালক দামোদর গঙ্গাধর রাও নামে অভিহিত হন) আমার একটি পঞ্চম বর্ষীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এবং আপনার গবর্নমেন্টের অনুগ্রহে আমি রোগ হইতে মুক্ত হই, এবং আমি যেরূপ তরুণ-বয়স্ক, তাহাতে যদি আমার কোন পুত্রসন্তান জন্মে, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্যপদ্ধতির অনুসরণ করিব। আর যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন ইংরাজ গবর্নমেন্ট এই বালকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নীকে যাবজ্জীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন; তাঁহার প্রতি যেন কখনও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করা না হয়।'

কিন্তু মুমূর্ষুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না। এই সময়ে লর্ড ডালহাউসি গবর্নমেন্টের সর্বেসর্বা ছিলেন। যিনি সন্ধিভঙ্গ করিয়া রণজিতের রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, যাহার দুরবগাহ রাজনীতির মহিমায় সাতারা রাজ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবংশীয়ের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, সেই লর্ড ডালহাউসি অবসর বুঝিয়া সাতারার ন্যায় ঝাঁসি গ্রহণেও কৃতসংকল্প হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে বিলম্ব হইল না, অচিরাৎ আদেশলিপি প্রচারিত হইল। ঝাঁসি ডালহাউসির লেখনীর আঘাতে মহারাষ্ট্র সম্ভূত রাও বংশীয়ের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল।

গঙ্গাধর রাওয়ের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাই আলোকসামান্যা নারী ছিলেন—রূপে আলোকসামান্যা, গুণেও আলোকসামান্যা। তাঁহার রূপে বিলাসের ন্যক্কারজনক বিভা কখনও ফুটিয়া উঠিত না; তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি বা স্বয়ং ভৈরবী জগতে শরীরিণী হইয়া অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলেই মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিত। তাঁহার সে আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলে বিলোল কটাক্ষ কেহ কখনও দেখে নাই; সে নয়ন দুইটি বহ্নিশিখার ন্যায়, কোন অজ্ঞেয় অতি প্রাকৃত বহ্নির যুগল শিখার ন্যায় অনবরত ধক ধক জ্বলিত। সে তেজোদৃপ্ত, সর্বদা প্রদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে মনুষ্য মাত্রকেই অবনত-মস্তক হইতে হইত। লক্ষ্মীবাই সন্ন্যাসিনী ছিলেন, কখনও বিলাসিনী হন নাই। সংযতা সন্ন্যাসিনী ছিলেন বলিয়াই তিনি বলবতী ও ক্ষমতাশালিনী হইয়াছিলেন। তিনি বীরের ন্যায় অশ্বারোহণে অসিচালনা করিতে জানিতেন; দেহকে তুচ্ছ করিয়া নির্ভয়ে শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন। আজ পর্যন্ত কেহ বর্ণনা দ্বারা বুঝাইতে পারিল না, ঝাঁসির রানি কেমন রূপসী ছিলেন। হেতু এই যে, কি ইংরাজ, কি মুসলমান, কেহই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মুখশ্রী লক্ষ করিতে পারে নাই; সে অপরূপ লাবণ্য প্রভাব-প্রগাঢ়তা বুঝিতে পারে নাই।

গুণে মহারানি লক্ষ্মীবাই অসামান্যা ছিলেন। সংযতা সাধ্বী নারী সর্বদিকপ্রসারিণী,

সর্ববিষয়ে অন্তস্থলগামিনী অপূর্ব-বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। ইংরাজ কোম্পানির চাতুরী বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। তিনি বুঝিলেন যে, ইংরাজ গ্রাহ তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি গ্রাস করিবার জন্য বদন ব্যাদান করিয়াছে। বুঝিলেন যে, এ সম্পত্তি রক্ষা করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু স্বামীর পুণ্যপূত নাম হৃদয়ে স্মরণ করিয়া তিনি মরিতে তো পারেন; সে পক্ষে বাধা ঘটাইবে কে? মরণের পূর্বে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিতে উদ্যতা হইলেন। তিনি কোম্পানির ডিরেক্টরগণের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন যে,—জানি বটে, ঝাঁসি রাজ্য ইংরেজের অধীন জায়গির মাত্র; কিন্তু ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের পর্যন্ত ইংরেজ ঝাঁসির অধিকারীদিগের সহিত জায়গিরদার হিসাবে ব্যবহার করেন নাই। মৃত গঙ্গাধর রাওয়ের ঔরস পুত্র নাই বটে, কিন্তু ঔরস-তুল্য পোষ্যপুত্র তো আছে। আর প্রজাপালন বিষয়ে যে অত্যাচার উৎপীড়নের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এক পক্ষের কথা মাত্র। যে ঝাঁসি রাজ্য পূর্বে একবার ইংরেজের দ্বারা শাসিত হইলে উহার আর বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকারও অধিক হইয়াছিল, গঙ্গাধর রাও প্রজাবর্গকে সুখে রাখিবার উদ্দেশ্যে দেবত্রা ব্রহ্মত্রা প্রচুর পরিমাণে দান করিয়া ওই আয় সাড়ে চারি লক্ষ টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন; ইহা প্রজাপীড়নের পরিচায়ক নহে, প্রজাপালনেরই পরিচায়ক। সুতরাং ঝাঁসি রাজ্য উহাব ন্যায়তঃ অধিকারীর হস্তে প্রত্যর্পিত হউক।

কিন্তু লর্ড ডালহাউসি মহারানির এবংবিধ কোনো কথারই সমর্থন করিলেন না। ডিরেক্টরগণ লর্ড ডালহাউসির হস্তে নাচের পুতুলের মতো নাচিতেছিলেন; ফলে লর্ড ডালহাউসির সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে তাঁহারা একটি কথাও কহিলেন না। লর্ড ডালহাউসি ঝাঁসির রানিকে, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি নির্দেশ করিয়া, দেশান্তরিত করিলেন। লক্ষ্মীবাই সুদূর মুঙ্গেরের দুর্গে কারাবরুদ্ধা হইয়া রহিলেন। দেশত্যাগ করিবার পূর্বে ঝাঁসির রানি ইংরাজ প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় যবনিকার অন্তরাল হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, 'মেরি ঝাঁসি ন দুঙ্গি'—অর্থাৎ আমার ঝাঁসি আমি দিব না। বজ্রাহতা ফণিনীর ন্যায় যে ভীষণ বাণী ঝাঁসির মহারানির কণ্ঠনির্গত হইয়াছিল, সিপাহি যুদ্ধের বিশ্বত্রাস ঝঞ্ঝাবাতের ঘোর নাদকেও ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে সেই বাণীর প্রতিধ্বনি ভারতবাসীর হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য। লর্ড ডালহাউসি তাঁহার সর্বগ্রাসিনী বাজেয়াপ্ত নীতির অনুসরণ করিয়া ভারতের বহুপ্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকল এই ভাবেই গ্রাস করিয়াছিলেন। এই সকল রাজ্যগ্রাসের ইতিহাস আমূল বর্ণনা না করিয়া আমরা উহাদের নামোল্লেখ করিয়াই নিরস্ত থাকিব। যথা, বুন্দেলখণ্ডের জৈতপুর, পঞ্জাবের বাগহাট, পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর বিভাগ অন্তর্ভুক্ত উদয়পুর, খান্দেশের বুদাবল, মান্দ্রাজের তাঞ্জোর, সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম অংশের একখণ্ড, কাছাড়ের উত্তর পূর্বাংশ এবং উড়িষ্যার দক্ষিণ দেশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। আশ্চর্যের কথা এই যে, উত্তর কাছাড় এবং দক্ষিণ উড়িষ্যায় নরবলি হইত বলিয়াই এই দুই প্রদেশ লর্ড ডালহাউসি ইংরাজের রাজ্যভুক্ত করেন। সিন্ধুদেশের পশ্চিমাংশের একজন আমির একটা জাল পরোয়ানার উপর নির্ভর করিয়া দেশ শাসন করিতেছিলেন, সুতরাং লর্ড ডালহাউসি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। এইরূপ নানা অছিলায় লর্ড ডালহাউসি

ভারতের নানা প্রদেশর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকল গ্রাস করিয়া ইংরেজ অধিকারের লোহিতবর্ণের বিস্তার সাধন করিলেন।

নাগপুর। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নাগপুর প্রদেশে আদিম গোঁদ ও খন্দ জাতীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন তাঁহারা কোনো কালে কখনই কোনো সাম্রাজ্য শক্তিসম্পন্ন ভারতেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তবে বাদশাহী আমলে আওরঙ্গজেবের সময়ে ইঁহাদের রাজ্যের মধ্য দিয়া মোগল বাহিনী যাতায়াত করিবার অধিকার মোগল বাদশাহগণ পাইয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর প্রদেশ এবং তৎসংযুক্ত অমরকণ্টকের অধিত্যকা এবং মধ্যভারতের বনভূমি মারাঠা অশ্বারোহীদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। ভোঁসলা বংশীয় সেনানায়কগণ এই স্থান নিজদিগের আয়ত্ত করিয়া লন। তখন নাগপুর রাজ্যের বিস্তার ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২ শত ৭৯ বর্গ মাইল ছিল; কিন্তু লোকসংখ্যা দুই কোটির অধিক ছিল না।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ আপ্পাসাহেব তাৎকালিক গবর্নর জেনেরল লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তখন রাজবংশীয়গণ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক একত্র হইয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করেন এবং ভোসলাবংশীয় একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে নাগপুরের সিংহাসন প্রদান করেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইংরেজ গবর্নমেন্ট তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন; তদনুসারে নাগপুর রাজ্য পুরুষানুক্রমে ভোঁসলাবংশীয়ের অধিকারে থাকিবার কথা হয়।

এই বয়ঃপ্রাপ্ত রাজার নাম তৃতীয় রঘুজি ভোঁসলা। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়। এই রাজা যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন দ্বিতীয় রঘুজির পত্নী বঙ্কবাই রাজকার্য করিতেন। বঙ্কবাই উন্নতচরিত্রা ও রাজ্য-শাসনোপযোগিনী ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তৃতীয় রঘুজি অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগত হওয়াতে বঙ্কবাই যশোবন্ত অহর রাও (সাধারণত ইঁহার নাম আপ্পাসাহেব) নামক তৃতীয় রঘুজির এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। রানির এই প্রস্তাব ইংরেজ রেসিডেন্ট মানসেল সাহেবকে জ্ঞাপন করা হয়। তিনি এ সম্বন্ধে এইরূপ উত্তর দেন যে, ইংরেজের সম্রাটশক্তির সম্মতি ব্যতীত তিনি কোন প্রকার দত্তক গ্রহণ বিধি-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। যাহা হউক, দত্তকগ্রহণ ক্রিয়া নাগপুর-প্রাসাদে যথাবিধি সম্পন্ন হয় এবং আপ্পাসাহেব তৃতীয় রঘুজির প্রেতকৃত্য—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি-নির্বাহ করেন। ইহার পর হইতে আপ্পাসাহেবের নাম হয় জনোজি ভোঁসলা।

মানসেল সাহেব যখন নাগপুররাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন, তখন লর্ড ডালহাউসি নববিজিত পেগু প্রদেশ পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন এ বিষয়ের কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নাগপুরের বিষয় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতি লো, স্যর জন মালকমের ন্যায় প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজধানীতে থাকিয়া তাহাদের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তাসহকারে নাগপুর রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসির নিকটে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রগাঢ় কর্তব্যজ্ঞান,

সকলই উপেক্ষিত হইল। তৃতীয় রঘুজির মৃত্যুর কিছুদিন পরে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি তারিখে লর্ড ডালহাউসি আবার এক আদেশলিপি লিখিয়া নাগপুররাজ্যও ইংরাজ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিলেন।

যশোবন্ত অহর রাও তৃতীয় রঘুজির অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার মাতা ময়নাবাই নাগপুরের রাজ-প্রাসাদেই অবস্থান করিতেন। এই প্রাসাদে অবস্থানকালেই ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানের জন্মগ্রহণের পর আনন্দ প্রকাশার্থ প্রাসাদ হইতে ২১টি তোপধ্বনি করা হয়। ওই মাসের ২৫শে তারিখে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দার ও অমাত্যগণ নাগপুররাজের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া মিষ্টান্ন বিতরণ উপলক্ষে ইংরেজ রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই নবজাত পুত্রের পরিচর্যার নিমিত্ত অনেক দাসদাসী নিয়োজিত হইল, তিনি যেখানে গমন করিতেন, দশ অথবা বার জন মাঙ্কুরী (রাজকর্মচারী বিশেষ), বল্লমধারী অনুচর এবং হস্তী ও অশ্বারোহীগণ তাঁহার অনুগমন করিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুমার দরবারস্থলে অথবা ইংরেজ রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ সময়ে মহারাজের সহিত এক আসনে উপবেশন করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের নিয়ম প্রচলিত, কিন্তু ময়নাবাইয়ের পুত্রের সম্বন্ধে নাগপুর-রাজ ওই নিয়ম লঙ্ঘন করেন। এ দিকে তৃতীয় রঘুজির সন্তান-সম্ভাবনা যতই অল্পতর হইতে লাগিল, ততই সাধারণে ময়নাবাইয়ের পুত্রকেই ভাবী নাগপুররাজ বলিয়া মনে করিতে লাগিল; সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, তৃতীয় রঘুজি শীঘ্রই ময়নাবাইয়ের পুত্রকে দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। অহর রাওর বিবাহে নাগপুররাজের আপাতত অসম্মতি দেখিয়া ওই বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। কিন্তু চাতুরীসর্বস্ব লর্ড ডালহাউসি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারির মন্তব্যলিপিতে এইরূপ আত্মীয় বালককে একজন 'সাধারণ মহারাষ্ট্রীয়' এবং স্থানান্তরে একজন 'বৈদেশিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে অহর রাওয়ের মাতা ময়নাবাইয়ের সহিত বঙ্কবাই অথবা তৃতীয় রঘুজির প্রধানা মহিষী অন্নপূর্ণা বাইয়ের কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। অনুমতি পাওয়া মাত্র সমবেত বন্ধুজনের সমক্ষে আপ্পাসাহেবের পিতা নানা অহর রাও ও ময়নাবাই স্বীয় সন্তানকে অন্নপূর্ণা বাইয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। রানি ও তাঁহাদের মন্ত্রীগণ ধীরভাবে এ বিষয়ে ইংরাজ রেসিডেন্টকে জ্ঞাপন করিয়া এ সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্নমেন্টের সম্মতির প্রতীক্ষা করেন। যখন নাগপুর অধিকারের আদেশ রানিদিগকে জ্ঞাপন করা হয়, তখন তাঁহারা যথাশক্তি এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল যুক্তিতর্কই লর্ড ডালহাউসির আদেশের মুখে বন্যার জলে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। তিনি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে তাঁহার মন্তব্যলিপিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন, "নাগপুররাজের কোনও পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই, রাজার বিধবা পত্নীগণও স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা রাজার মৃত্যুর পর কোনও বালককে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন নাই।"

লর্ড হেস্টিংস ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর রাজ্যের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা, করেন, তাহার সম্বন্ধে লর্ড ডালহাউসি লিখিয়াছেন, "আপ্পাসাহেব নিজের কর্মদোষে নাগপুর রাজ্য হারাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে বন্ধুত্ব সূচক সন্ধিভঙ্গ হইয়াছে, ইহা গবর্নর জেনারেল

বেশ বুঝিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে একটি বালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। নিজের ইচ্ছানুসারে তাঁহার একজন প্রতিনিধিও নির্বাচন করেন। সে সময়ে জাতক পুত্রের সম্বন্ধে কোনো কথাই হয় নাই। ওই বালক দত্তকপুত্র রূপে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই যে, লর্ড হেস্টিংস ওই বালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। রাজ্য ও রাজবংশের মধ্যে ওই বালকের অনুকূলে একটি দল ছিল বলিয়া কেবল রাজনীতির হিসাবেই সেই সময়ে লর্ড হেস্টিংস ওই বালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, বলিতে গেলে ইংরাজ গবর্নমেন্ট যাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাকেই নাগপুরের রাজাসন প্রদান করিতেন। ওইরূপ দান-কার্যে কোন প্রকার বিবেচনা অথবা বিচারের প্রভাব পরিলক্ষিত হইত না। উহা কেবল গবর্নমেন্টের স্বাধীন ইচ্ছা বা অভিরুচির উপর নির্ভর করিত।"

বলিতে কি, লর্ড হেস্টিংসের নিজের কথার সহিত লর্ড ডালহাউসির এই মন্তব্যের কোনোরূপ ঐক্যই পরিলক্ষিত হয় না। লর্ড হেস্টিংস ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে জিব্রল্টর হইতে ইংল্যান্ডের ডিরেক্টর সভায় রাজ্য শাসন সংক্রান্ত যে বিবরণ প্রেরণ করেন, তাহাতে নাগপুর রাজ্যের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "নাগপুরের একজন রাজ্যলোভী ব্যক্তি আপ্পাসাহেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নাগপুরের সিংহাসন অধিকার করেন। আপ্পাসাহেব এই ভাবে রাজ্যচ্যুত হইলে আমরা আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করি। অতঃপর সেই রাজ্যাপহারীর মতিভ্রংশ ও সম্পূর্ণ বাতুলতা উপস্থিত হইলে ইংরাজ গবর্নমেন্ট আপ্পাসাহেবের সিংহাসন প্রাপ্তির পক্ষে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত না হওয়াতে তিনিই নাগপুরের বিবিধসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন।" হেস্টিংস সাহেব আপ্পাসাহেবের বিশ্বাসঘাতকতা, তাঁহার পদচ্যুতি ও তন্নিবন্ধন নাগপুর রাজ্যের গোলযোগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন "নাগপুরের বিশৃঙ্খলাহেতু আমরা নূতন বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হই। রাজবংশের ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ওই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া সকলেই একবাক্যে ভোসলা বংশীয়ের একটি নিকটতম আত্মীয় বালককে নাগপুরের সিংহাসন দিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে উক্ত বালক আপ্পাসাহেবের স্থলে নাগপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন।"

লর্ড ডালহাউসি তাঁহার লিপির এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আপ্পাসাহেবের শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পর নাগপুর রাজ্য আমাদের বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই বৎসরেই ইংরেজ গবর্নমেন্ট, উক্ত রাজ্যের কিয়দংশ ভূতপূর্ব রাজার হস্তে সমর্পণ করেন, এবং ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের সন্ধি অনুসারে উক্ত অংশ পুরুষানুক্রমে তাঁহার অধিকারভুক্ত রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। মেজর ইবাম্সবেল এ বিষয়ে দুইটি গুরুতর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম কথা এই যে, নাগপুর রাজ্য কখনও ইংরেজ গবর্নমেন্টের বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। অবশ্য সামরিক নিয়ম অনুসারে নাগপুর রাজ্য তাঁহাদের করায়ত্ত বলিয়া ঘোষিত হইতে পারিত, কিন্তু ইংরাজ পক্ষ হইতে কখনও এরূপ ভাবের কোনও ঘোষণা করা হয় নাই। মেজর ইবাম্সবেলের দ্বিতীয় কথা এই যে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর রাজ্যের কিয়দংশ ভূতপূর্ব রাজাকে দান করা হয় নাই। তৃতীয় রঘুজি ভোঁসলা ইংরেজ গবর্নমেন্টের অনুগ্রহে সমস্ত অবিভক্ত নাগপুর রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের সন্ধির পঞ্চম ধারায় দৃষ্ট হইবে, আপ্পাসাহেবের শত্রুতাচরণ করিবার পূর্বে, নাগপুরে ইংরেজ গবর্নমেন্টের যে সৈন্য ছিল;

তাঁহার ব্যয় নির্বাহার্থ সাগর ও নর্মদা প্রদেশ এবং অন্যান্য স্থান দান করেন। ফলে ইংরেজ গবর্নমেন্ট কখনও নাগপুর অধিকার করিয়া, পরে পূর্বতন রাজাকে দান করেন নাই।

যাহা হউক লর্ড ডালহাউসি কেবল নাগপুর অধিকার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, নাগপুরের হতভাগ্যা রানিগণ আপনাদের রাজ্যরক্ষার্থ যে যে উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎসমুদয়েই তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাধা দিতে লাগিলেন।

মহারানি বঙ্কবাই প্রভৃতি একপ্রকার কারারুদ্ধ হইয়া রহিলেন, কয়েক মাস পর্যন্ত কেহই তাঁহাদের নিকটে যাইতে পারিত না। মেজর আউস্‌লে নাগপুরের সিংহাসন রক্ষার জন্য তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করাতে অবরুদ্ধ হইলেন, কতিপয় মহাজন আবশ্যক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে টাকা ধার দিয়াছিলেন বলিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে রঘুজির বিধবা পত্নীর দুরবস্থার একশেষ হইল। তাঁহাকে এক্ষণে নাগপুরের স্বত্ব ত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করাইতে বলপূর্বক ধরিয়া আনা হইল। এই শেষ সময়েও যশোবন্ত রাওয়ের অধিকার চ্যুতির সম্বন্ধে কোন কথা বলা হইল না। রঘুজির পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে কম্পান্বিত কলেবরা হইয়া স্বাক্ষর করিলেন, অবিলম্বে নাগপুরের সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হইল, বিশ্বস্ত ইংরাজ সৈন্য রাজ্যের যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইল, বিশ্বস্ত ইংরেজ কর্মচারী সন্দিগ্ধ সর্দারদিগের উদ্‌যোগ পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত হইলেন। এইভাবে ভোঁসলা শাসিত রাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও লর্ড ডালহাউসি রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজার দ্রব্যাদিও গ্রহণ করিলেন। নাগপুরের হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ব্যবহার্য পশু, মণিমুক্তা প্রভৃতি বাজারে উপস্থিত করা হইল। হস্তীঘোটক প্রভৃতি সীতাবলদীতে প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রিত হইল। এদিকে মণিমুক্তা প্রভৃতি কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ী হামিল্টন কোম্পানির দোকানের শোভা বর্ধন করিল। এতদ্ব্যতীত নাগপুরের প্রাসাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাসি করা হইল। অন্যতম রানির পর্যঙ্কের নীচে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারাদি প্রোথিত ছিল। কোম্পানির অনুচরগণ তাহা বাহির করিয়া আনিল। রানিগণ অবশেষে কোন সৎকার্যে আপনাদের নাম স্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনাদের অর্থদ্বারা কুমায়ুন নদীর উপর একটি সেতুনির্মাণের অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই শেষ ইচ্ছা, অন্তিম অনুরোধও পূর্ণ হইল না। এমন কি, রঘুজির বিধবা পত্নীগণ সাধারণ সৎকার্যে যে অর্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইংরেজ কোম্পানি তাহাও আত্মসাৎ করিলেন। লর্ড ডালহাউসির কার্যের কি অপূর্ব মহিমা! যখন ইংল্যান্ডের মহারানি প্রতীচ্য মিত্ররাজ্যের রক্ষাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ভারতের গবর্নর জেনারেল প্রাচ্য মিত্ররাজ্য আত্মসাৎ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন, যখন ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিভাগে সেক্রেটারি পোল্যান্ডদেশীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তিগ্রহণ সন্দেহে রুশিয়াকে তিরস্কার করিতেছিলেন, তখন ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট নাগপুরের সম্পত্তিগ্রহণে উদ্যত হইলেন।

রেসিডেন্ট মানসেল সাহেব নাগপুররাজের দ্রব্যাদি নাগপুরের রাজবংশীয়ের নিকটে রাখিবার প্রস্তাব করেন। তিনি এ সম্বন্ধে গবর্নর জেনারেলকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্ট লিখিত ছিল, 'প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় সম্পত্তি, ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকার মণিমুক্তা প্রভৃতি সমস্তই রাজপরিবারের নিকটে রাখা উচিত। তাঁহারা নিজের ইচ্ছা ও সাধারণের মতানুসারে যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। আমার

মতে রাজসিংহাসন ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়েই নাগপুরের রাজবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই সমান অধিকার আছে।' কিন্তু লর্ড ডালহাউসি রেসিডেন্টের এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিজের মর্যাদার অনুরূপ যে সমস্ত সম্পত্তি রাখা আবশ্যক, নাগপুরের রানিগণ তাহা রাখিতে পারিবেন, অবশিষ্ট সমুদয় বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণোপযোগী ধনভাণ্ডার স্থাপন করা যাইবে।

এইরূপে বিশাল নাগপুর রাজ্য, যাহা এখন ইংরেজ শাসিত মধ্যপ্রদেশ বলিয়া পরিচিত, ইংরেজের করতলগত হইল। ভোঁসলা পরিবারের বিধবা রানিদিগের মধ্যে অনেকে জীবনের শেষ সময়ে কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। কাশীর গঙ্গাতীরে ভোঁসলাদিগের হাবেলী, নাগপুরের পুরাতন স্বাধীনতার স্মারকস্বরূপ এখনও বিদ্যমান আছে। যে ক্ষোভ, যে দুঃখ, যে অমর্ষ এবং যে গ্লানির ভাব সাতারা, ঝাঁসি, পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ গ্রাস করিবার পর ভারতবাসীর হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা নাগপুরের অধঃপতনের সময়ে মহা ঘূর্ণিবায়ুর পূর্বগামী হাহাকার শব্দে পরিণত হইল। দেশীয় রাজন্যবর্গ চমকিয়া উঠিলেন; সেঁধিয়া, হোলকার, গায়কাড়, নিজাম প্রভৃতি ভারতের অগ্রণী সামন্ত রাজগণ ভবিষ্যৎ বিভীষিকাময় দেখিলেন। তাঁহাদিগেরও যে এরূপ দুর্দশা ঘটিতে পারে, সে ভাবনায় তাঁহারা রাজসিংহাসনে বসিয়াও বিচলিত হইলেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসি ভারতসংহারিণী শক্তির স্বরূপ হইয়া নির্মম হৃদয়ে কঠোর হস্তে একে একে ভারতবর্ষের দেবনির্মাল্যযোগ্য কুসুম সকল চয়ন করিয়া বিলাসের পুষ্পাধারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারতের কুসুম হাসিটুকুও এইবার চিরদিনের জন্য পরাধীনতার পল্লবে সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করৌলি, হায়দরাবাদ, কর্ণাটক, নানা ধন্দুপন্থ

করৌলি। যদিও লর্ড ডালহাউসি রাজপুতানাব সামন্ত রাজগণকে তাঁহার নূতন নীতির বিস্তারের বাহিরে রাখিয়াছিলেন, তথাপি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রাজপুতানার অন্তর্গত করৌলি রাজ্যের জায়গিরদার যখন পরলোকগত হন, তখন লর্ড ডালহাউসি পূর্ব অঙ্গীকার যেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। করৌলির অধিপতি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই ভরতপাল নামক তাঁহার একটি জ্ঞাতিপুত্রকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। অবশ্য এই দত্তক গ্রহণকালে তিনি গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে সেনাপতি লো নামক একজন উদারচেতা ইংরেজ সেনানী রাজপুতানায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট স্বরূপ কার্য করিতেছিলেন। তিনি করৌলির অধিপতির মৃত্যুর পরই বড়লাটের সকাশে এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, শীঘ্রই পোষ্যপুত্র ভরতপালকে করৌলির সকল অধিকারের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা কোম্পানির গবর্নমেন্টের অবশ্য কর্তব্য।

যেমন উত্তপ্ত মনুষ্যশোণিত পান করিলে ব্যাঘ্র আর কোন পশুকেই শিকার করিতে চাহে না, মনুষ্যকে পাইলেই তাহাকে শিকার করে, তেমনই সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশকে গ্রাস করিয়া লর্ড ডালহাউসি লোভলোলুপ দৃষ্টিতে করৌলি রাজ্যকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে আগস্ট তারিখে করৌলির সম্বন্ধে শাসন সংক্রান্ত মন্তব্য লিপি (Minute) লিখিতেন। সেই মন্তব্যলিপি তাহার শাসকমণ্ডলীর (Executive Council) বিশিষ্ট সদস্যদিগকে পাঠ করিতে দিলেন। স্যর ফ্রেডারিক কুরী এই সময় শাসকমণ্ডলীর সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি লর্ড ডালহাউসির মন্তব্য পাঠ করিয়া গবর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং করৌলির দত্তক পুত্রের স্বত্ব রক্ষার্থ উদ্‌যোগী হইলেন। ৩১শে আগস্ট তারিখে কুরী একটি স্বতন্ত্র 'মিনিটে' (মন্তব্যলিপি) স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাজপুতানার ইংরেজ রেসিডেন্ট সেনাপতি স্যর জন লোর পরে স্যর হেনরি লরেন্স রাজপুতানায় রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনিও স্যর জন লো এবং স্যর ফ্রেডারিক কুরীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই বিবাদতরঙ্গ কলিকাতা ও রাজপুতানাতেই আবদ্ধ ছিল না, ক্রমে উহা ইংল্যান্ডের উপর প্রসারিত হইল। জন ডিকিন্সন, হেনরি সেমূর প্রভৃতি কয়েকজন উদারমনা ইংরেজের উদ্‌যোগে ভারতসংস্কারক সভা নামে একটি সমিতি বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সভা করৌলিরাজের স্বত্ব রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, ক্রমে এই কথা পার্লামেন্ট সভায় উপস্থাপিত হইল। পার্লামেন্টের বহু উদ্‌যোগী সদস্য করৌলিরাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণও অগত্যা যথাসময়ে করৌলির ভাগ্য বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বিচারফলে করৌলির পক্ষই প্রবলতর হইল। ডিরেক্টরগণ একটি স্বতন্ত্র 'মিনিটে' নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহাদিগের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন :

'আমাদের নিকটে করৌলি ও সেতারা, এই উভয় রাজ্যঘটিত বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক

বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। গবর্নর জেনেরল এ বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া সেই বিবেচনার ফল স্বীয় 'মিনিটে' লিখেন নাই। সাতারা বাজা নূতন। উহা সর্বাংশে ইংরাজ গবর্নমেন্ট কর্তৃক সৃষ্ট; গবর্নমেন্ট যে ভূসম্পত্তি দান করেন, তাহা হইতেই ঐই রাজ্য উদ্ভূত হইয়াছে। পক্ষান্তরে করৌলি রাজ্য রাজপুতানার মধ্যে অতি প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। ভারতে ইংরাজ ক্ষমতা বদ্ধমূল হইবার বহুপূর্বে উহা ভারতবর্ষীয় রাজার অধীনতায় শাসিত হইয়া আসিতেছে। ওই রাজ্য এক্ষণে আমাদের আশ্রিত, উহার অধিপতি এক্ষণে আমাদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। অতি গুরুতর কারণ ব্যতীত এইরূপ রাজ্যে আমাদের আধিপত্যস্থাপন ভারতের কাহারও অভিপ্রেত নহে। আমাদের মতে তাদৃশ গুরুতর কারণ করৌলি রাজ্যে উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমরা ভরতপালকেই বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।'

কিন্তু ভরতপালের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না। ডিরেক্টরদিগের মন্তব্য ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বেই মদনপাল নামক আর এক ব্যক্তি ভরতপালের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ করৌলির রাজাসন অধিকার করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। মদনপাল ভরতপালের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং মৃত করৌলিরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর শোণিত সম্পর্কে সম্বন্ধ। করৌলির রাজপরিবারগণ, সর্দার সকল, এমন কি প্রকৃতিপুঞ্জ পর্যন্ত সকলেই মদনপালের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইংরেজ রেসিডেন্ট হেনরি লরেন্সও মদনপালের পক্ষপাতিতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কেননা, হেনরি লরেন্স বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দত্তকগ্রহণ করিতে হইলে হিন্দু শাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে যে যে কর্ম ও অনুষ্ঠানের আবশ্যক, ভরতপালকে দত্তকরূপে গ্রহণের সময়ে তাহার অধিকাংশই সম্পন্ন হয় নাই; এমন কি, করৌলির অধিবাসিগণও এই দত্তক গ্রহণ সমাচার জানিত না; সুতরাং উহা যে শাস্ত্রবিধিসিদ্ধ, তাহা স্বীকার করিতে তাহারা সম্মত ছিল না। ফলে হেনরি লরেন্সের পক্ষে মদনপালকে রাজাসনে বসাইয়া দেওয়া কঠিন হইল না। পূর্বে ভরতপালের কথা লইয়া বিলাতে ডিরেক্টরগণ যে 'মিনিট' লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভরতপালকে রাজাসন প্রদান করিবার কোন স্পষ্ট আদেশ ছিল না। ফলে স্যর হেনরি লরেন্স মদনপালের পক্ষ সমর্থন করিতে অনুরোধ করিয়া লর্ড ডালহাউসিকে একখানি পত্র লিখিলেন। লর্ড ডালহাউসি এমন তীব্র বিরোধ দেখিয়া করৌলি হস্তগত করিবার আশা ত্যাগ করিলেন এবং ভরতপালের পরিবর্তে মদনপালকে করৌলির অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই এক স্থলেই লর্ড ডালহাউসি সর্বগ্রাসিনী নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। লর্ড ডালহাউসি করৌলি গ্রাস করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুলাই তারখি পর্যন্ত তিনি গ্রাসোদ্যমের হলাহল উদ্‌গার করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার ব্যবহারভঙ্গি দেখিয়া ভারতবর্ষের দেশনায়কগণ একটু সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা লর্ড ডালহাউসির নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও এ কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই যে, রাজপুতানার রাজ্য সকল মোগল পাঠানের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। মারাঠা রাজ্যসকল এই তুলনায় অতি নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। এইরূপ প্রাচীন রাজপুত বংশ ও রাজপুত রাজ্য নবাগত ইংরাজ কোম্পানির অনায়াসক্ষিপ্ত কুঠারাঘাতে ছিন্নমূল হইবে ভাবিয়া ভারতের হিন্দু মাত্রেই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যখন সকলেই দেখিলেন যে করৌলি লর্ড ডালহাউসি গ্রাস করিতে পারিলেন না, তখন সকলেই

আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন বটে, পরন্তু লর্ড ডালহাউসি চাতুরীর প্রভাব চিন্তা করিয়া ভারতবাসী মাত্রেই ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।

হায়দরাবাদ। করৌলিতে পরাজিত হইলে লর্ড ডালহাউসির দৃষ্টি আর একটি রাজ্যের প্রতি পতিত হইল। লর্ড ডালহাউসি দেখিলেন যে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে বেরার ও পইসঘাট তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা এই দুই নদীর মধ্যস্থলে রাইচোর দোয়াবরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। উর্বরতা গুণে এই স্থান ভারতের অন্য সকল শ্রেষ্ঠ স্থানের তুল্য। উহা হায়দরাবাদের নিজামের আশ্রিত একটি করদ রাজ্য।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখে লর্ড ওয়েলেসলি নিজামের সহিত যে সন্ধি স্থাপনা করেন, সেই সন্ধির ফলে এইরূপ স্থির হয় যে, ইংরাজ কোম্পানির পক্ষ হইতে পর্যাপ্ত সেনার দল নিজাম রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সেনার ব্যয়ভার নিজামকে বহন করিতে হইবে। কিন্তু নিজামের পক্ষ হইতেই ইহা বলা কর্তব্য যে, চিরকাল এই সমস্ত সৈন্য যে নিজামরাজ্যে অবস্থিতি করিবে এবং চিরকাল যে নিজামকে এই সেনার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হইবে, এমন অঙ্গীকার তিনি করেন নাই। তবে নানা কারণে বাধ্য হইয়া, কতকটা বন্ধুতার অনুরোধেও নিজাম ৪০ বৎসর কাল ঐ সৈন্যের ব্যয়ভার নির্বাহ করিলেন। কিন্তু এই বন্ধুতার মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইতে হইল। লর্ড ডালহাউসির আমলে এই ঋণ ৭৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি সুযোগ বুঝিয়া নিজাম দরবারে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথা লিখিয়াছিলেন—"নিজামকে শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, নচেৎ বার্ষিক অন্যূন ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি ইংরাজ গবর্নমেন্টকে দিতে হইবে। কোম্পানি তিন বৎসরের মধ্যে ওই আয় হইতে আপনাদিগের আসল টাকা তুলিয়া লইবেন।" নিজাম বাহাদুর এই পত্র পাইয়া অবিলম্বে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং অবশিষ্ট ঋণ শীঘ্রই পরিশোধ করিবেন বলিয়া কোম্পানির নিকট বাগ্‌দত্ত হইলেন। কিন্তু যথাকালে সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইল না; ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে উহা আবার বর্ধিত হইয়া ৪৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইল। লর্ড ডালহাউসি কাহারও কোনো কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঋণের টাকা আদায়ের জন্য নিজামের অধিকৃত ভূসম্পত্তি বলপূর্বক অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। নিজামের মন্ত্রী নবাব সিরাজ-উল-মুল্ক এই অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন; ইংরাজকে বিনয়বিনম্র ভাষায় নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া কিছুকাল নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা শুনিল না, অবিলম্বে সন্ধিচ্ছলে নিজামের সম্পত্তি অপহরণের সর্তগুলি লিপিবদ্ধ হইল। রেসিডেন্ট কর্নেল লো একটু যেন 'ন্যাকামি' করিয়া নিজামকে বলিলেন যে, কলিকাতা হইতে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, উহাতে শীঘ্রই আপনাকে স্বাক্ষর করিতে হইবে। রেসিডেন্টের এই ছল-বাক্য নিজামের অসহ্য হইল। তিনি গভীর ক্ষোভ, রোষ ও অবমাননায় অধীর হইয়া রেসিডেন্টকে বলিলেন—আপনার ন্যায় অনেকেই কখনও বা ইউরোপে অবস্থিতি করেন, কখনও বা ভারতবর্ষে সমাগত হন; কখনও গবর্নমেন্টের চাকরি গ্রহণ করেন, কখনও সৈনিক কার্যে নিয়োজিত হন; এক সময়ে নাবিক-শ্রেণিতে প্রবেশ করেন, অন্য সময়ে বা বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকেন। আমি শুনিয়াছি, ইংরাজ জাতির অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত; সুতরাং আপনারা কখনই এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন না। আমি একজন স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি, সাত

পুরুষ হইতে এই রাজ্য আমার বংশের অধীন রহিয়াছে। আমি এই রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই রাজ্যে পরিবর্ধিত হইয়াছি এবং ভবিষ্যতে এই রাজ্যেই দেহত্যাগ করিব। আপনারা মনে করিয়াছেন, আমার রাজ্যের কোন অংশ কোম্পানিকে দিলে আমার অসুখের কারণ থাকিবে না, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; আমি রাজ্যের কোন অংশ ত্যাগ করিয়া কখনই সুখী হইতে পারিব না। রাজ্যের অংশ দিলে আমি আপনাকে যার পর নাই অবমানিত জ্ঞান করিব। আমি শুনিয়াছি, আপনাদের জাতির এক ব্যক্তি ভাবিয়াছেন, যদি আমি আর্কটের নবাব মহম্মদ ঘাউস খাঁর দশাগ্রস্ত হই, তাহা হইলেও আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহা হইলে আমার আর কোনও কাজ থাকিবে না, গবর্নমেন্টের পুরাতন চাকরের ন্যায় পেন্সন গ্রহণ করিয়া কেবল ভোজন, নিদ্রা ও উপাসনাতে কাল কাটাইব।' এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতি দুঃখেই নিজাম আরব্য ভাষায় একটি শব্দের উচ্চারণ করিলেন।

লর্ড ডালহাউসির সময় হইতে লর্ড কর্জনের সময় পর্যন্ত ৪৪ বৎসরের অধিককাল এই বেরার লইয়া নিজামের সহিত ভারতীয় ইংরাজ গবর্নমেন্টের বাদবিতণ্ডাই চলিয়া আসিতেছিল। শেষে লর্ড কর্জন বেরার দেশকে চিরদিনের জন্য নিজামের রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া লইলেন। তিনি নিজাম বাহাদুরকে এই বলিয়া বুঝাইলেন,—আপনি তো বেরার হইতে একটি পয়সাও পাইতেছেন না, বেরার শাসনকল্পে একটি পয়সাও খরচ করিতেছেন না; আর এই ৪৪ বৎসর কালেব মধ্যে উহা পুনর্বার হস্তগত করিতেও পারিলেন না, অতএব আসুন উভয়ের মধ্যে একটা সুলেফনামা করিয়া লওয়া যাউক; এই সুলেফনামা বা বান্ধবতার ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হউক যে, বেরার চিরদিনের জন্য ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল, তবে বেরারে আপনার স্বামিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজ গবর্নমেন্ট আপনাকে বার্ষিক ১৭ লক্ষ টাকা নজরানা বা উপঢৌকন স্বরূপ দিবেন।—এই ব্যবস্থা অনুসারেই বেরার পূর্ণভাবে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

এবম্প্রকারে বেরারকে করতলগত করায় ভারতের অধিবাসিগণ বুঝিলেন যে, কেবল হিন্দু রাজ্যই অপহরণ করা লর্ড ডালহাউসির উদ্দেশ্য ছিল না, অবসর পাইলে তিনি মুসলমান রাজ্যের অংশবিশেষ ছিন্ন করিয়া উদরস্থ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ইতঃপূর্বে লর্ড ডালহাউসির ব্যবহারে হিন্দুগণই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এই সূত্রে মুসলমানগণও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিলেন।

কর্ণাটক। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক নামে রাজ্য আছে। মোগলশাসন সময়ে উহা নিজামের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কর্ণাটকেই ইংরাজ কোম্পানির আদিম আশ্রয়স্থল সেন্ট ডেবিড দুর্গ অবস্থিত ছিল। এই স্থানে ইংরাজ ফরাসি কূট রাজনীতিক দুপ্লের সৌভাগ্য ও লালির জীবননাশের কারণ হইয়াছিল; এই স্থানে রবার্ট ক্লাইব সর্বপ্রথমে জয়শ্রীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই প্রসিদ্ধ হায়দর আলি ইংরাজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আপনার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ আলি ইংরাজ কোম্পানির সহায়তায় কর্ণাটকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময়েই কোম্পানি তাঁহাদিগের রাজ্যরক্ষার্থ কর্ণাটকের কতকগুলি সৈন্য রাখেন। নবাব ঐ সৈন্যের ব্যয়নির্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ক্রমে মহম্মদ আলি ঋণ জালে জড়িত হওয়ায় ইংরাজ কোম্পানি ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ আলির সহিত সন্ধি করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মহীশূরে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। নবাবের কর্মচারিগণ ঐ সময়ে প্রতিশ্রুত

টাকা আদায় করিয়া দিতে অসমর্থ হওয়াতে কোম্পানি যুদ্ধের সময়ে কর্ণাটকের সমগ্র শাসনভার গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস নবাবের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে ওই সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক হইয়া উঠে। সন্ধির নিয়মানুসারে নবাব রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র লইয়া কর্ণাটকের সমগ্র শাসনভার কোম্পানির হস্তে দিতে প্রতিশ্রুত হন।

মহম্মদ আলির পর ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ওমদুতুল ওমরা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নবাব টিপু সুলতানের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন বলিয়া তাৎকালিক গবর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সন্দিগ্ধ হন। কিন্তু ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে ওমদুতুল ওমরার মৃত্যু হয়। তখন ওয়েলেসলির সন্দেহ ওমদুতুল ওমরার পুত্র আলি হোসেনের উপর নির্ভর করে। ওমদুতুল ওমরার জীবিতাবস্থায় গবর্নমেন্ট স্বীয় হস্তে কর্ণাটকের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আলি হুসেনের নিকট সেই সন্ধিপত্র উপস্থিত করা হইলে তিনি ওই সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হন। আলি হুসেনের অসম্মতিহেতু ওমদুতুল ওমরার ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমুদ্দৌলা গবর্নমেন্টের মনোমত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া কর্ণাটকের সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে এই সন্ধি হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে আজিমুদ্দৌলা আপনার ব্যয়ের জন্য রাজস্বের এক পঞ্চমাংশ লইয়া দেওয়ানি ও ফৌজদারি সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই কোম্পানি হস্তে সমর্পণ করেন। যাঁহারা একদিন ব্রিটিশ কোম্পানির আশ্রয়-দাতা ছিলেন, তৃতীয় জর্জের ন্যায় নরপতি স্বহস্ত-লিখিত বন্ধুত্ব-সূচক পত্র ও উপহার প্রেরণ করিয়া একদিন যাঁহাদিগের সম্মান করিয়াছিলেন, এইরূপে তাঁহাদিগকে দুর্দশাগ্রস্ত করা হইল।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা আগস্ট আজিমুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আজিমজা নবাব হন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখে ইনি মহম্মদ ঘাউস খাঁ নামক একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। মহম্মদ ঘাউসের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত তদীয় পিতৃব্য আজিমজা তাঁহার অভিভাবক হন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে অপুত্রক অবস্থায় মহম্মদ ঘাউস খাঁর মৃত্যু হয়। আজিমজা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকটে সিংহাসন প্রার্থনা করেন। এই সময়ে লর্ড ডালহাউসি গবর্নর জেনারেল ছিলেন। বলা বাহুল্য, ডালহাউসি আজিমজার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের সন্ধিতে নবাব কেবল দেওয়ানি ও ফৌজদারি সংক্রান্ত ক্ষমতা ইংরাজ গবর্নমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, উহাতে পুরুষানুক্রমিক রাজসম্মান কি রাজসিংহাসন বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ গবর্নমেন্ট আজিমুদ্দৌলাকে স্বাধীন রাজা ও কর্ণাটকের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করেন। অধিকন্তু আজিমুদ্দৌলার পরেও ইংরাজ গবর্নমেন্ট অসঙ্কুচিতচিত্তে কয়েকজনকে আর্কটের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের সন্ধির উচ্ছেদপূর্বক কর্ণাটকের রাজ্যাধিকার নবাবের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। শেষে আজিমজা ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা পেন্সন লইয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইলেন।

তাঞ্জোর। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে তাঞ্জোর রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রপতি সরফজি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজের আবাস দুর্গ ও তৎসন্নিহিত স্থান ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের শাসন-ক্ষমতা ইংরাজ

গবর্নমেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সরফ্‌জির মৃত্যু হইলে তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবজি তাঞ্জোরের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর শিবজি দুইটি কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

শিবজির জ্যেষ্ঠ কন্যা তখন মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঞ্জোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ফরবস সাহেব শিবজির দ্বিতীয়া কন্যাকে সিংহাসন দিবার প্রস্তাব করেন। পুরুষের অভাবে রমণী যে সিংহাসনের অধিকারিণী হইতে পারেন, রেসিডেন্ট প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে তাহা দেখাইয়া দেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসি এই যুক্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কর্ণাটকের ন্যায় এই রাজ্যও ইংরাজের অধিকারভুক্ত করেন।

সম্প্রতি লর্ড ডালহাউসির এই পররাজ্যাপহরণ নীতির সমর্থন করিয়া সুধী লেখক ও সিবিলিয়ান স্যর উইলিয়ম হান্টার সাহেব একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, লর্ড ডালহাউসি বাধ্য হইয়া এই সকল রাজ্য করায়ত্ত করেন। তাঁহার পররাজ্য লিপ্সা আদৌ ছিল না; কিন্তু তিনি ভারতের প্রজাবর্গের, বিশেষত সামন্তরাজগণের অধীন প্রকৃতিপুঞ্জের, মঙ্গলকামী হইয়াই এই সকল রাজ্য ইংরাজের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। মঙ্গল অমঙ্গলের বিবেচনা ইতিহাস করিবে না। তুমি যাহাকে মঙ্গল বলিয়া থাক, অন্যে তাহাকে মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা না করিতে পারে। মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত রুচি ও অরুচির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এখনও ইংরাজ যাহাকে মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাকে ইংরাজিশিক্ষিত এবং ইউরোপীয় সভ্যতামোদী ভারতবাসী হয়তো মঙ্গল বলিয়া মনে করে না; সুতরাং মঙ্গলামঙ্গলের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উত্থাপন করিতে নাই। দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যে নীতি চিরপ্রচলিত, সেই নীতির মাপ কাটিতে লর্ড ডালহাউসির ব্যবহার মাপিলে কতটা কম পড়ে। প্রাজ্ঞ ভারতবাসীমাত্রেরই বিশ্বাস যে, লর্ড ডালহাউসি, এই সকল মিত্ররাজ্য ইংরাজের অধিকারভুক্ত করাতে ভারতবর্ষের মান্য নীতি ও সদ্ধর্মের হিসাবে গর্হিত কার্যই করিয়াছিলেন। ইদানীং জনকয়েক ইংরাজ লেখক ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের বৃত্তান্তকে ধর্মের ও সাধুতার আবরণে আবৃত করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করিতে উৎসুক হইয়াছেন। আমরা এ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে চাহি না। ভালই হউক আর মন্দই হউক, যে ব্যবস্থা অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, তথা লর্ড ডালহাউসির ন্যায় শাসনকর্তৃগণ ভারত শাসন করিয়াছিলেন এবং ভারতে ইংরাজ অধিকারের বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থার অনিবার্য ও অপরিহার্য পরিণতিস্বরূপ সিপাহিযুদ্ধ, তাহাই আমরা দেখাইতে চাহি। যদি সিপাহি যুদ্ধ এই ব্যবস্থায় বিষময় ফল বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাটাও যে ভারতবর্ষের পক্ষে বিষাক্ত ও বিষবৃক্ষসদৃশ, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

নানা ধন্দুপন্থ। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের শেষে পুণার পেশবে বাজীরাও ইংরাজ সেনাপতি জন ম্যালকলমের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। বাজীরাও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুণার সমুদয় স্বত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগপূর্বক আপনার ও পরিবারগণের ভরণপোষণ-নির্বাহার্থ নির্দিষ্ট বৃত্তি-ভোগী হইতে প্রতিশ্রুত হন, ম্যালকলমও পেশবেকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবার জন্য গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করেন।

অনেকে এ সম্বন্ধে ম্যালকলমের বিরুদ্ধবাদী হইলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—'যে

সকল রাজা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরাধের জন্য আপনাদের রাজ্য ও রাজকীয় ক্ষমতা ইংরাজ গবর্নমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহাদের প্রতি বিশেষভাবে সৌজন্য প্রদর্শন করা গবর্নমেন্টের কর্তব্য। ভারতবর্ষে প্রথমে প্রবেশ করিয়াই গবর্নমেন্ট এই নীতির অনুসরণপূর্বক কার্য করিয়া আসিতেছেন। আমি আহ্লাদসহকারে বলিতেছি যে, এই প্রকার কার্যে যে সৌজন্য প্রদর্শিত হয়, তাহা বাহুবল অপেক্ষা ভারতে ইংরাজ ক্ষমতা দৃঢ়তর করিয়া থাকে। এইরূপ সৌজন্যের ফলে লোকের চিত্ত বশীভূত হয় এবং যাহারা ভারতবর্ষীয় আচার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা পরোক্ষভাবে সুফল উৎপাদন করিয়া থাকে।' সকল ইংরাজই যে ম্যালকলমের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা নহে; মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন, ডেভিড অক্টরলোনি এবং টমাস মনরোর ন্যায় রাজ্য-শাসনক্ষম, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধৃবর্গ ম্যালকলমের পোষকতা করিয়া আপনাদের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বাজীরাও আপনার রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগপূর্বক বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কানপুরের প্রায় বার মাইল দূরবর্তী বিঠুর নামক স্থানে বাসের অনুমতি পাইলেন। বাজীরাও আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে ওই স্থানে গিয়া গঙ্গাতীরে জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গবর্নমেন্ট বাজীরাওকে বিঠুরে একটি জায়গির দিলেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ব্যবস্থা অনুসারে ওই জায়গিরের অধিবাসিগণ গবর্নমেন্টের দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাসন হইতে বিমুক্ত হইল।

বাজীরাওয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং বহুসংখ্যক অনুচর বিঠুরে বাস করিতে থাকায় ইংরাজ কিছু শঙ্কান্বিত হইল। কিন্তু তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিবার কোনো কারণই ছিল না। তিনি ইংরাজ গবর্নমেন্টের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে এতদূর আবদ্ধ ছিলেন যে, দুঃসময় উপস্থিত হইলে তিনি যথাশক্তি তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আফগানিস্তানের যুদ্ধে ইংরাজ গবর্নমেন্টের কোষাগার শূন্য হইলে ইংরাজ কোম্পানি যখন অর্থের অভাবে কাতরভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তখন বাজীরাও ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া সুহৃৎপ্রেমের পরিচয় দেন। কেবল ইহাই নহে, যখন পঞ্জাব ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করে, যখন দুর্ধর্ষ খালসা সৈন্য ইংরাজ রাজ্য আক্রমণের অভিপ্রায়ে অসীম সাহস সহকারে শতদ্রু পার হয়, তখন বাজীরাও ইংরাজকে নিজের ব্যয়ে এক সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতি সৈন্য দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিঠুরের জায়গির ও বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া বাজীরাও অনেক ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের অধিকারী কে হইবে, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে দত্তক পুত্র গ্রহণপূর্বক স্বীয় বংশ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিলেন। তিনি নিজের উইলে লিখিয়া যান : 'ধন্দুপন্থ নানা আমার প্রথম পুত্র, পাণ্ডুরঙ্গ রাও আমার দ্বিতীয় পুত্র, গঙ্গাধর রাও আমার সর্বকনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র, এবং সদাশিব পন্থ দাদা আমার দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুরঙ্গ রাওয়ের পুত্র: এই তিনটি আমার পুত্র ও একটি পৌত্র। আমার মৃত্যুর পর আমার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ধন্দুপন্থ নানা মুখ্যপ্রধান হইয়া আমার পেশবের গদির অদ্বিতীয় অধিপতি হইবে।'

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে বাজীরাও স্বীয় দত্তক পুত্রকে পেশবে উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তির বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট

আবেদন করেন, কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। কোম্পানি বলেন যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া পেশবের মৃত্যুর পর তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে ৭৭ বৎসর বয়সে বাজীরাও পরলোকগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র ধন্দুপন্থ 'নানা সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ। যখন বাজীরাওয়ের মৃত্যু হয়, তখন নানা সাহেবের বয়স ২৭ বৎসর। নানা সাহেব শান্তস্বভাব ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি যথারীতি কমিশনারের পরামর্শ অনুসারেই বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার অধিকারী হন। কমিশনারের রিপোর্টে জানা যায় যে, নানা সাহেব ১৬ লক্ষ টাকার গবর্নমেন্ট কাগজ, ১০ লক্ষ টাকার মণিমুক্তা প্রভৃতি, ৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা, ৮০ হাজার টাকার স্বর্ণাভরণ এবং ২০ হাজার টাকার রুপার বাসনের অধিকারী হন।

বাজীরাওয়ের সহিত তাঁহার যে সকল আত্মীয়স্বজন ও অনুচর বিঠুরে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার নানা সাহেবের স্কন্ধেই পড়ে। নানা সাহেব এজন্য বাজীরাওয়ের বৃত্তি পাইবার জন্য ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করেন। সুবাদার রামচন্দ্র পন্থ বাজীরাওয়ের সৎপরামর্শদাতা, তদীয় অনুচর ও সৎপথ-পরিচালক ছিলেন। তিনি এখন বন্ধু-পুত্রের স্বত্বরক্ষার্থ উদ্যত হইলেন। তিনি বিশেষ সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গবর্নমেন্টের প্রতি নানা সাহেবের অটল বিশ্বাসের কথা নির্দেশ করিয়া বলেন : 'মাননীয় ইংরাজ কোম্পানি যে ভাবে ভূতপূর্ব মহারাজকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া নানা সাহেব বর্তমান বিষয়ে সম্পূর্ণ আশান্বিত ও সর্বপ্রকার ভাবনাশূন্য হইয়াছেন। ইংরাজ গবর্নমেন্টের দয়া ও উদারতাই এক্ষণে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। তিনি গবর্নমেন্টের অভ্যুদয় দেখিতে সর্বদাই ইচ্ছা করেন; ভবিষ্যতেও তাঁহার এই ইচ্ছার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না।'

বিঠুরের ইংরাজ কমিশনর মর্ল্যান্ড সাহেব এই প্রার্থনার সমর্থন করিলেন; কিন্তু উহা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল না। টোমাসন সাহেব এই সময়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্নর ছিলেন। তিনি কমিশনরকে বিঠুরের আবেদনকারীদিগের হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিতে নিষেধ করিলেন। লর্ড ডালহাউসিও ইহাই চাহেন। তিনি অবিলম্বে গবর্নমেন্টের আদেশ-লিপি প্রচার করিলেন; তাহাতে তিনি লিখিলেন : "পেশবে ৪৩ বৎসরকাল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার জায়গিরের উপস্বত্ব ছিল। তিনি সেই সময়ে আড়াই কোটি টাকারও অধিক সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহাকে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয় নাই। তাঁহার কোন ঔরস পুত্রও বর্তমান নাই। তিনি মৃত্যুকালে আপনার পরিবারদিগের জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পেশবের যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন বর্তমান আছেন, গবর্ণমেন্টের বিবেচনা অনুসারে তাহাদের কোনও রূপ দাবি নাই। গবর্ণমেন্টের দয়ার উপরেও এসময়ে তাহারা কোনরূপ দাবি উপস্থিত করিতে পারেন না। কারণ পেশবে যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষণে যেরূপ বলা হইতেছে, সম্ভবত পেশবে তাহা অপেক্ষা অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।' যাহা হউক, ডালহাউসির মতানুসারে গবর্নমেন্টের এই আদেশ অবিলম্বে বিঠুরে ঘোষিত হইল। ডালহাউসি টোমাসনের মতের অনুমোদন করিয়া নানা সাহেবের বৃত্তিমাত্র বন্ধ করিলেন। টোমাসন বিঠুরের জায়গিরের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; সুতরাং উক্ত জায়গির নানা সাহেবেরই রহিল। ডালহাউসি ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। কিন্তু বাজীরাওয়ের

সময়ে ওই জায়গিরের অধিবাসিগণ যে নিয়মে আবদ্ধ ছিল, সে নিয়ম রহিত হইল। গবর্নমেন্ট ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ব্যবস্থা রহিত করিয়া বিঠুরের জায়গিরের অধিবাসীদিগকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাসনের অধীন করিলেন।

অনন্যোপায় হইয়া নানা ধন্দুপন্থ একেবারে বিলাতের ডিরেক্টর সভায় আবেদন প্রেরণের সঙ্কল্প করিলেন। বাজীরাও যখন জীবিত ছিলেন, তখন একবার এইরূপ আবেদনের প্রস্তাব হইয়াছিল; সুবাদার রামচন্দ্র পন্থের অন্যতম পুত্র এই আপিল চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কমিশনর সে সময়ে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিয়াছিলেন। নানা সাহেব এক্ষণে আর কমিশনরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিলাতে আপিল করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। যথারীতি আবেদনপত্র প্রস্তুত হইল। নানা সাহেব ওই আবেদনপত্রে লিখিলেন—'বাজীরাওয়ের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন কেবল ইংরাজ কোম্পানির প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিতেছেন। স্থানীয় গবর্নমেন্ট ইঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল তাঁহাদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয় নাই, এমন নহে, একটি প্রাচীন রাজবংশের প্রতিনিধির প্রাপ্য সত্ত্বেও ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইয়াছে। আবেদনকারী এই জন্য কেবল সন্ধির উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিতেছেন না, ইংরাজ কোম্পানি মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শেষ অধিপতির নিকট হইতে যে কিছু উপকার পাইয়াছেন, অংশত তাহার উপর নির্ভর করিয়াও এই আপিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পেশবে যখন আপনার উত্তরাধিকারিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আপনার রাজ্য ইংরাজ কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, তখন কোম্পানি পেশবে ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে তাহার মূল্য দিতে অবশ্যই বাধ্য। বিধিবন্ধন যদি একদিকে স্থায়ী হন, তাহা হইলে অপর দিকেও উহার স্থায়িত্ব সম্পাদন বিধেয়। কোম্পানি অন্যান্য রাজ বংশীয়দিগের সহিত পেশবের পরিবারবর্গের যেরূপ ইতর বিশেষ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহীশূরের শাসনকর্তা কোম্পানির সহিত শত্রুতা করেন, যে সমস্ত রাজার সাহায্যে সেই শত্রু পরাজিত হয়, আবেদনকারীর পিতা তাঁহাদের অন্যতম, যখন সেই অধিপতির পতন হয়, তখন কোম্পানি তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে কোনরূপ ইতর বিশেষ না করিয়া সকলকেই বাসস্থান দেন এবং সকলকেই সমানভাবে ভরণপোষণোপযোগী বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করেন। কোম্পানি দিল্লির সম্রাটের সহিতও এইরূপ, বরং ইহা অপেক্ষা অধিকতর উদারতার সহিত, সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এই অধিপতি পদচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, কোম্পানি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া রাজচিহ্ন সমর্পণপূর্বক যথেষ্ট পরিমাণে বৃত্তি দিতে ত্রুটি করেন নাই। সম্রাটের বংশধরগণ এখনও ঐ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। কিন্তু আবেদনকারীর বিষয়ে এরূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে কেন? সত্য বটে, পেশবে বহুদিন ইংরাজ গবর্নমেন্টের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া অর্ধ কোটি টাকার রাজস্ব দিয়া পরিশেষে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ইংরাজ সেনাপতির প্রস্তাব অনুসারে নির্দিষ্ট শর্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে কোম্পানির দয়ার পাত্র করিয়া যখন স্বীয় বহুমূল্য রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং কোম্পানি যখন তাঁহার বংশানুগত রাজ্যের উপস্বত্ব হইতে লাভবান হইতেছেন, তখন কোন বিধান অনুসারে সেই সন্ধির নিয়মও রাজচিহ্নের বিলোপ সাধন পূর্বক তাহার বংশধরদিগকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইল? কিরূপে কোম্পানির বিবেচনায় তাঁহার

বংশধরগণের স্বত্ব বিজিত মহীশূর ও কারারুদ্ধ মোগলের বংশধরগণের স্বত্ব অপেক্ষা ন্যূন হইল? ভূতপূর্ব পেশবে আপনার বৃত্তি হইতে পরিবারবর্গের ভরণপোষণোযোগী অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, এক্ষেত্রে এরূপ কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে না। ইংরাজ গবর্নমেন্ট সন্ধি অনুসারে ভূতপূর্ব পেশবে ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের ভরণপোষণার্থ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পেশবে ঐ বৃত্তি হইতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, ইংরাজ গবর্নমেন্টের পক্ষে তাহার অনুসন্ধান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ইংরাজ গবর্নমেন্টের যে সমস্ত বৃত্তিভোগী কর্মচারী আছেন, তাঁহাদের বৃত্তির টাকা কি পরিমাণে ব্যয়িত ও কি পরিমাণে উদ্বৃত্ত হয়, তাহা কি গবর্নমেন্ট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বৃত্তির টাকা অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই কথা তুলিয়া কি বৃত্তি বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত? গবর্নমেন্ট দয়া ও ন্যায়পরতার উপর নির্ভরশীল কোন রাজ বংশধরকে কি গবর্নমেন্টের কর্মচারী অপেক্ষা হীনতর বিবেচনা করা উচিত? যদি এ বিষয়ে ইংরাজ গবর্নমেন্টের মনে কোন রূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকে, তাহা হইলে আবেদনকারী তাহার উন্মূলন জন্য সম্মানসহকারে জানাইতেছেন যে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের সন্ধি অনুসারে পেশবে ও তৎপরিবারবর্গের ভরণপোষরার্থ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত হয় নাই। যে সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচর প্রবাসী পেশবের অনুগামী হয়, তাহাদের জীবিকা নির্বাহার্থ উহা নিরূপিত হইয়াছিল. গবর্নমেন্ট বিলক্ষণ জানিতেন, পেশবের যে রূপ সঙ্কীর্ণ আয়, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়স্বজনদিগের ভরণপোষণ হইতে পারে না। অধিকন্তু ভারতবর্ষীয় রাজগণ ক্ষমতাশূন্য হইলেও তাঁহাদিগকে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, যদি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, পেশবে বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দিয়া বার্ষিক যে ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে যাহা বাঁচাইয়াছেন তাহা অধিক হইবে না। পেশবে অতি সাবধানে স্বীয় সম্পত্তি বাঁচাইয়া যে কোম্পানির কাগজ করেন, তাঁহার মৃত্যুকালে উহা হইতে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা আয় হইতেছে। এইরূপ পরিণামদৃষ্টি ও পরিমিত ব্যয় কি তাঁহার মহাপাপ স্বরূপ হইয়াছিল? এই পাপে কি তাঁহার পরিবারবর্গ সন্ধি নির্দিষ্ট বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন?

বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টর বর্গের নিকট এই সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা বৃথা হইল। ধন্দুপন্থের এই কাতর প্রার্থনায় তাঁহাদের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। তাঁহারা পূর্বেই ডালহাউসির মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে লিপি প্রচারিত হয়, তাঁহাতে লিখিত ছিল : "আমরা সম্পূর্ণরূপে গবর্নর জেনারেলের নিষ্পত্তির অনুমোদন করিয়া নির্দেশ করিতেছি যে, ইংরাজ গবর্নমেন্টের উপর বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র বৃত্তি পাইয়া যে সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদেই তাঁহার পরিবার ও পোষ্যবর্গের পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা সংস্থান হইতে পারিবে।" এক্ষেত্রে ডিরেক্টরগণ আবেদনপত্র পাইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে লিখিলেন, "আবেদনকারীকে যেন জানান হয় যে, তাঁহার পিতার বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক নহে, সুতরাং উহাতে তাঁহার কোনরূপ দাবি নাই। তাঁহার আবেদনপত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইল। ডিরেক্টরদিগের এই সিদ্ধান্তের কথা বিঠুরে পঁহছিবার পূর্বেই নানা সাহেব আপনার স্বত্ব সমর্থনের উদ্দেশ্যে বিলাতে আজিমুল্লা খাঁ নামক একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবককে পাঠাইয়া দেন। আজিমুল্লা ইংল্যান্ডে উপস্থিত হইয়া বিডন নামক একজন ইংরাজের

সাহায্যে নানা সাহেবের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু ডিরেক্টরদিগের আদেশ পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, কাজেই তাঁহার সকল চেষ্টা, সকল উদ্যোগ, সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

এতাবৎকাল পর্যন্ত লর্ড ডালহাউসির আত্মসাৎ নীতির প্রভাবে যে সকল রাজ্য ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল বা যাঁহারা ন্যায্য ও প্রাপ্য বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেই হিন্দু হইলেও ব্রাহ্মণেতর জাতিভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ধন্দুপন্থকে বৃত্তিমুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া লর্ড ডালহাউসি হিন্দুর অতি কোমল মর্মস্থানে আঘাত করিয়াছিলেন। নানা ধন্দুপন্থ পুনার পেশবে বালাজি বিশ্বনাথের শোণিত সম্পর্কিত সাক্ষাৎ বংশধর না হইলেও সেই বংশের একজন বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি দুর্ভাগ্য (দ্বিতীয়) বালাজি বাজীরাওযের পোষ্যপুত্র ছিলেন। সামাজিক সম্মানে পোষ্যপুত্র ঔরসজাত পুত্রের তুল্য। ধন্দুপন্থ পেশবে বংশাবতংস এবং সেই পেশবেগণের ব্রাহ্মণ্য ধারার শেষ অধিকারী। বলা বাহুল্য পুনার পেশবেগণ ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজের শিরোমণি বলিয়া গণ্য হইতেন। এমন কি, তাঁহাদিগের পদধূলি পাইলে উদয়পুরের মহারাণাও নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। বিধির বিধানেই হউক, বা পূর্বজগণের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপই হউক, পেশবে বংশধর নানা ধন্দুপন্থ ইংরাজের বৃত্তির প্রার্থী হইয়াছিলেন। এ বৃত্তি ইংরাজ কোম্পানি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার পিতাকে দেন নাই; এ বৃত্তি ভারতে চিরাচীর্ণ পদ্ধতি অনুসারে পরাজিত হৃতসর্বস্ব অথচ সম্মানার্হ প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদারক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছিল। যাহা মর্যাদাজাত, যাহা সমাজপদ্ধতিবিহিত, তাহা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হইবেই, ইহাই ভারতের শিষ্ট সমাজের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দু সমাজের মুকুটমণি, ব্রাহ্মণ সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তিকে অপমান করিয়া লর্ড ডালহাউসি এবং কোম্পানির ডিরেক্টরবর্গ সুবিবেচকের কার্য করেন নাই।

যে মর্মান্তিক অবমাননার প্রদাহে রানি লক্ষ্মীবাই অগ্নিশিখা স্বরূপিণী হইয়া মুঙ্গের দুর্গে জীবনযাত্রা অতিবাহন করিতেছিলেন, সেই মর্মদাহী ক্ষোভের, অপমানের ও প্রবঞ্চনার জ্বালামালায় প্রোজ্জ্বল হইয়া নানা ধন্দুপন্থ অতঃপর বহ্নিশিক্ষার ন্যায় দেদীপ্যমান রহিলেন। যে প্রকৃতি নারীর কমনীয় দেহে অদম্য দৃঢ়তা ও অশ্রুতপূর্ব বীরতা সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল এবং কোমলা রাজান্তঃপুরবাসিনী রাজমহিষীকে সংহাররূপিণী ভৈরবীরূপে পরিণত করিয়াছিল, সেই প্রকৃতি, বুঝি বা সেই নিয়তি, ব্রাহ্মণের পুণ্যপূত সত্ত্বগুণ প্রধান দেহে রজোগুণ-যোগ্য ক্ষত্রিয়সেব্য অমর্ষের জিঘাংসাব এবং প্রতিবিধিৎসার রাবণের চিতা জ্বালিয়া খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক অভিনব ভার্গবের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই দুই অভিনব শক্তির উদ্ভবের জন্য লর্ড ডালহাউসি প্রধানত দায়ী এবং সে পক্ষে কঠোর প্রায়শ্চিত্তও ইংরাজকে করিতে হইয়াছে।

পূর্বেই বুঝাইয়াছি যে, ভারতে ইংরাজ প্রতাপের প্রতিষ্ঠা কেবলই যে ইংরাজের মনীষা বলে হইয়াছে তাহা নহে; সেই মনীষার সহিত অনুকূল ভাগ্য এবং ভারতবাসীর অন্ধ আনুকূল্য ও আনুগত্য সম্মিলিত হইয়া ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যরূপ অঘটন ঘটাইয়াছে। এ কথা কেবল আমরাই বলিতেছি না, হান্টার ও ম্যালিসন প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণও এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তুমি তোমার নিজ বুদ্ধি বলে যাহাকে ধরিয়া উঠিবে, গাছে উঠিয়া, স্থির অবলম্বন পাইয়া তাহাকে পদাঘাতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে তোমাকে সে কার্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সিপাহি যুদ্ধে ইংরাজকে সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। আর মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব যখন মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ রাজপুত জাতিকে

পদাঘাতে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তিনি মোগল জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের সূচনা করিয়াছিলেন। মোগল অতি বিলাসী, অতি দাম্ভিক এবং অতি মদোন্মত্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যপদেশে তাহাকে চিরদিনের জন্য বিস্মৃতিসাগরে ডুবিতে হইয়াছে। সিপাহিযুদ্ধের পূর্বে এবং পরে মোগলের মতো ইংরাজজাতির পুরুষকারের ততটা অপচয় ঘটে নাই। হ্যাভেলক, আউটরাম, হেনরি লরেন্স, ক্লাইড, রোজ, প্রভৃতি মনুষ্যপ্রধান ইংরাজ সেনানায়ক ও শাসনকর্তা উদ্ভূত হইয়া এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের তুষানলজ্বালা হেলায় নির্বাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে হাভেলক, আউটরামের মতো মোগল সেনানায়ক, হেনরি লরেন্স, ও জন লরেন্সের মতো মোগল রাজনীতিক জন্মগ্রহণ করিলে মোগল সাম্রাজ্য ধূলায় লুটাইত না। উহা পরিমার্জিত পরিবর্ধিত ও সংস্কৃত হইয়া এখনও লোকলোচনের গোচর থাকিত। পাপই কর, আর পুণ্যই কর, পুরুষকারের প্রভাব থাকিলে, মনুষ্যত্বের বিভা ফুটাইতে পারিলে মনুষ্য সমাজে নিজের প্রভাব ও প্রতাপ কিছুকালের জন্য বিস্তীর্ণ রাখা যায়।

পরন্তু লর্ড ডালহাউসি পররাজ্যালোলুপ হইয়া যে সকল অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছিলেন, ইংরাজ ভারতবাসীকে চিনিলে বা চিনিতে জানিলে, অথবা এবংবিধ পরিচয়ের যোগ্য ঔদার্য গুণে সমন্বিত থাকিলে সে সকল দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ সদ্য সদ্য সিপাহি যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষায় ইংরাজ জাতিব মনুষ্যত্বকে পরীক্ষিত হইতে হইত না। নানা ধন্দুপন্থ্ স্বয়ং যাহাই থাকুন, স্বয়ং যেমন ব্যবহারই করুন, তিনি যে পেশবে বংশধর, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলতিলক, এ কথা ভারতের কোন হিন্দুই কখনও ভুলিতে পারে না। তিনটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ভারতের হিন্দু একটু অধিক মাত্রায় বিকল হইয়া পড়ে। প্রথম, পিতৃপুরুষের আরাধনায় ব্যাঘাত ঘটাইলে; দ্বিতীয়, নারীর প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করিলে এবং তৃতীয়, ব্রহ্মস্বাপহরণ করিলে, হিন্দু একেবারেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুর সকল তীর্থই অপবিচত্র করিতে পারিয়াছিলেন, কেবল গয়া তীর্থে তিনি উদয়পুরের মহারাণা রাজসিংহ পরিচালিত হিন্দু সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ ফরোকসেয়ার পঞ্জাবের শিখ ধর্মাবলম্বিনী নারীদিগের উপর উৎপাত উপদ্রব করাতে নিরীহ সংযত শিখ জাতিকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধজাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। আর, বাঙ্গালা অধিকারের মুখে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়া বাঙ্গালায় যে বিপ্লবের সূচনা করা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসবিদমাত্রেই জানেন। তেমনি সিপাহি যুদ্ধের পূর্বে নানা ধন্দুপন্থকে পিতৃবৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া লর্ড ডালহাউসি সিপাহি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তায় পরিণত করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বা তাহার পরে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে 'সাত্তাওন বা গদর' অর্থাৎ ৫৭ সালের বিদ্রোহ ইতিশীর্ষক বহু পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল পুস্তিকা সিপাহিগণই অধিক পাঠ করিত। উপরে নানা ধন্দুপন্থের বৃত্তি প্রত্যাহারের সম্পর্কে যে সকল যুক্তির কথা লিখিত হইয়াছে, সে সকলই নানাভাবে ছন্দবন্ধে এবংবিধ পুস্তিকা সকলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, এই সকল যুক্তিবাদ সিপাহির মনকে যে বিচলিত করে নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অযোধ্যা

অযোধ্যা লর্ড ডালহাউসির শেষ গ্রাস। কিন্তু ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, লর্ড ডালহাউসি অযোধ্যার সর্বগ্রাস করিতে চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "I for my part therefore, do not advise that the Province of Oudh should be declared to be British Territory.*** It is my earnest counsel ** that while the king should be permitted to retain his royal title and rank, he should be required to vest the whole civil and military administration of Oudh in the hands of the Company and that its power should be perpetual in duration, as well as ample in extent". অর্থাৎ আমি আমার পক্ষ হইতে এই পরামর্শ দিই না যে অযোধ্যা প্রদেশ পূর্ণভাবে ইংরাজের অধিকারভুক্ত বলিয়া ঘোষিত হউক; অযোধ্যার রাজাকে তাঁহার রাজোচিত উপাধি এবং পদমর্যাদা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অযোধ্যার শাসন সম্পর্কিত এবং সামরিক সকল ভার কোম্পানি হস্তগত করুন; আর এই দেশশাসন ভার কোম্পানির পক্ষে চিরস্থায়ী ও পর্যাপ্ত হইয়া থাকুক, ইহাই আমার সনির্বন্ধ পরামর্শ।

লর্ড ডালহাউসির এই সনির্বন্ধ পরামর্শ বিলাতের ডিরেক্টরগণ গ্রাহ্য করিলেন না; তাঁহারা ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বর মাসে লর্ড ডালহাউসিকে হুকুম করিলেন যে, তুমি তোমার কার্য ত্যাগের পূর্বে অযোধ্যা ইংরাজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইবে।

অযোধ্যার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমায় নেপাল, পূর্ব সীমায় ইংরাজের অধিকৃত গোরক্ষপুর জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে এলাহাবাদ প্রদেশ, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব প্রদেশ এবং ফতেপুর, কানপুর ও ফরক্কাবাদ জেলা এবং পশ্চিমোত্তর সীমায় সাহজাহানপুর জেলা অবস্থিত। এই বিরাট প্রদেশের পরিমাণ ২৩৯২৫ বর্গ মাইল এবং উহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি ছিল। তবে কোম্পানির কর্মচারীরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, অযোধ্যার অধিবাসীর সংখ্যা ৫০ লক্ষের অধিক নহে। এই প্রদেশ পাঠানদিগের আমল হইতে দিল্লির অধীনতায় শাসিত হইত। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় যেমন দক্ষিণে হায়দরাবাদ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই মোগল বাদশাহের নবাব উজীর অযোধ্যায় স্বীয় স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরাজ সিপাহি সেনার নিকটে পরাজিত হন এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে নবাব স্বীকার পাইলেন যে, ইংরাজ কোম্পানির যে সমস্ত সৈন্য নবাবকে রক্ষা করিবার

জন্য অযোধ্যায় থাকিবে, সেই সমস্ত সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি বহন করিবেন। এতদ্ব্যতীত বক্সার যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ তিনি কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরাজের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মহীশূরের প্রসিদ্ধ হায়দর আলি নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান; তাহাতে তিনি এই ভাবের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন— "আপনি এত বড় বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, এমন দুর্ধর্ষ জাতির নরপতি হইয়া, কেন যে কেরেস্তান (খ্রিস্টান) ধর্মাবলম্বী ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা ত আমি বুঝিতেই পারি না। দক্ষিণে-আমি যেমন ইংরাজকে ব্যস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি, উত্তরে আপনিও সেইরূপ ইংরাজকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলে, বোধ হয়, আমাদের উভয়ের সমবেত চেষ্টায় ইংরাজ অচিরে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।" নবাব সুজাউদ্দৌলা এই পত্রের উত্তরে হায়দর আলিকে লিখিয়া পাঠান—"আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নহি। আমি বিষয়ী, আমার অধীনতায় বহু সংখ্যক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারী অবস্থান করিতেছে; উহাদের রক্ষা আমার প্রধান কর্তব্য। উহাদের সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি যাহাতে বর্ধিত হয়, তেমন কার্য আমার দ্বিতীয় কর্তব্য। আমার অধীনতায় যে সমস্ত সৈন্য আছে এবং আমার ভাণ্ডারে যে সকল যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত আছে, তাহা আমার প্রজারক্ষার পক্ষেই পর্যাপ্ত কি না, সে পক্ষে আমার সন্দেহ আছে। আমি প্রজারক্ষাকেই প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করি, সুতরাং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, আমার অধীন একটি পদাতিকও ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না।" এই দুইখানি পত্র পরে লখনউয়ের ইংরাজ রেসিডেন্টের হস্তগত হয়। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া তিনি নবাব সুজা উদ্দৌলার বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এত তুষ্টি এবং তৃপ্তি সত্ত্বেও সন্ধির তিন বৎসরের মধ্যেই জনরব উঠিল যে, সুজাউদ্দৌলা কোম্পানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং কোম্পানির অধিকার আক্রমণ মানসে বিশাল বাহিনীর সমাবেশ করিতেছেন। এ জনরব কে প্রচার করিল তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই। তবে কেন যে উহা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সেই সময়ে সদ্য সদ্যই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই জনরবের কথা শুনিয়া নবাব বাহাদুরের নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করিয়া পাঠাইলেন। নবাবের প্রদত্ত কৈফিয়তে কলিকাতায়, তথা বিলাতের কর্তারা তুষ্ট হইলেন না। সেই অসন্তুষ্টির ফলে কোম্পানি নবাবের সহিত একটা নূতন ব্যবস্থা কবিলেন; তাহাতে স্থির হইল যে, নবাব উজীর ৩৫ সহস্রের অধিক সৈন্য নিজের অধীনতায় রাখিতে পারিবেন না এবং নিম্নলিখিত হিসাবেই সৈন্য রাখিতে হইবে— অশ্বারোহী দশ হাজার, পদাতি দশ হাজার, নজীব ও নকির পাঁচ হাজার, কামান রক্ষক ৫০০, বাজে সৈন্য এবং আরদালি প্রভৃতি ৯৫০০। কোম্পানি নবাবকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, এই ৩৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে কোন সেনার দলকে অথবা কোন সেনানীকে নবাব ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করিতে পারিবেন না।

অযোধ্যাধিপতির চুণার দুর্গ ইংরাজ কোম্পানির এলাহাবাদ রাজ্যের এবং বারাণসী প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহাতে কোম্পানির সিপাহিদিগের পক্ষে পশ্চিমোত্তর

প্রদেশে গমনাগমনে বড়ই ব্যাঘাত ঘটিত। বিলাতের ডিরেক্টরগণ চূণার দুর্গ কোম্পানির অধিকারে আনিতে ওয়ারেন হেস্টিংসকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইংরাজ কোম্পানি নবাবের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা বক্সার যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ পাইতেন; সেই টাকারই প্রতিভূ স্বরূপ এই দুর্গ কোম্পানির হস্তে থাকে। নবাব উজীর এই টাকা শীঘ্রই পরিশোধ করিয়া দেন এবং কোম্পানিও বাধ্য হইয়া নবাবকে চূণার দুর্গ প্রত্যর্পণ করেন। সুতরাং হঠাৎ চূণার পুনরাধিকার করা যে সুবিধাজনক নহে, তাহা কোম্পানির কর্মচারিগণ বুঝিতে পারিলেন। কাজেই এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ছলও খুঁজিতে হইল। সে ছল খুঁজিয়া বাহির করিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

এই সময়ে বর্গী বা মারাঠা অশ্বারোহী সেনার হাঙ্গামায় সমগ্র আর্যাবর্তের অধিবাসিবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মারাঠা বর্গী রোহিলখন্দ হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত ভূভাগে উৎপাত আরম্ভ করে। অযোধ্যার দক্ষিণ বেড়িয়া নবাবের অধিকৃত এলাহাবাদ ও চূণার দুর্গ ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের সন্ধি অনুসারে নবাবের অধিকৃত কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দিল্লির সম্রাট শাহ আলমকে প্রদত্ত হয়। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ উহা আবার নবাবকে প্রত্যর্পণ করেন। এক্ষণে বর্গীর হাঙ্গামা হইতে অযোধ্যাকে নিরাপদ করিবার মানসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে মার্চ তারিখে নবাবের সহিত আর দুইটি সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির নিয়ম অনুসারে কোম্পানি চূণার দুর্গ গ্রহণ করেন এবং যাবৎ বর্গীর হাঙ্গামা প্রশমিত না হয়, তাবৎ এলাহাবাদ দুর্গ নিজদের হাতে রাখেন। কোম্পানি নবাবকে স্পষ্ট বলেন যে, চূণার ও এলাহাবাদ এই দুই দুর্গে গোরা সেনা ও সিপাহিদলের অবস্থান ব্যবস্থা করিতে হইবে; গোরা সেনা এই দুই ঘাঁটিতে থাকিলে বর্গীর হাঙ্গামা অনেকটা প্রশমিত হইবে। সেইজন্য বাধ্য হইয়া, যেন মিত্রের রাজ্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, ইংরাজ কোম্পানি ভারতের বক্ষোজাত এই দুই ভীম দুর্গ চিরদিনের জন্য নিজের করতলগত করিয়া রাখিলেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, গঙ্গার দক্ষিণে নবাবের যে সকল অধিকৃত স্থান ছিল, তাহাও এই দুর্গের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের শাসনাধীন হইল এবং এইরূপে বিনা যুদ্ধে, বিনা অর্থব্যয়ে অযোধ্যা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগের এক-তৃতীয়াংশ ইংরাজের অধিকারে আসিয়া পড়িল।

এদিকে কোম্পানির খাজানাখানায় অত্যন্ত অর্থাভাব হইল। বাহাত্তরের মন্বন্তরের প্রভাবে বাঙ্গালা শ্মশানসদৃশ হইয়াছিল; একটি পয়সাও দেওয়ানি বিভাগে আদায় হয় নাই, অথচ ব্যয় সমানই ছিল। টাকা ত চাই; ওয়ারেন হেস্টিংস টাকার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন, শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া অযোধ্যার কামধেনুকে আবার দোহন করিবার ছল খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ নবাবকে বিক্রয় করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,—দুর্গ দুইটি আমাদের অধিকারে থাকুক, কেবল দুর্গের প্রভাবভুক্ত ভূভাগ নবাব খরিদ করিয়া লউন। এই দুইটি ভূভাগের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা ধার্য হইল। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে চুক্তিনামা অনুসারে নবাব কোরা ও এলাহাবাদ ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করিলেন। উপরন্তু যে সমস্ত গোরা সৈন্য নবাবের প্রহরী স্বরূপ এলাহাবাদ, চূণার, লখ্‌নউ প্রভৃতি স্থানে থাকিবে, তাহাদের প্রত্যেক দলের নিমিত্ত প্রতি মাসে দুই লক্ষ দশ হাজার "সিক্কা" টাকা খোরপোষ স্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত মিত্রতা রক্ষা করিবার চেষ্টায় নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁহার

রাজ্যকে পঙ্গু করিয়া ফেলিলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জকে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া স্থবিরবৎ করিলেন।

১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক আসফউদ্দৌলা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। আসফউদ্দৌলা দাতা এবং পুণ্যাত্মা ছিলেন। তাঁহার পুণ্য এবং দানের প্রভাবে অযোধ্যায় অনেক তালুকদারের বংশের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি পরদুঃখে সাতিশয় কাতর হইতেন। কাইসার বাগ যখন তৈয়ার হইতেছিল, তখন একটি দরিদ্রের সন্তান ইট মাথায় করিয়া ছাদের উপর উঠিতেছিল। নবাব সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ঘর্মসিক্ত কলেবর বালককে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত হইয়া বালকের বোঝা নিজে বহিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আসফউদ্দৌলার রাজ্যকালে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, অযোধ্যায় দুঃখ বা দারিদ্র্য ছিল না। তিনি নিজে বিলাসী ছিলেন না, রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ মুষ্টি মুষ্টি করিয়া প্রজাদিগকে দান করিতেন, রাজকর আদায় পক্ষে তিনি কোনোরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতেন না। তাই এখনও লখ্‌নউ শহরে এই প্রবচন প্রচলিত আছে "যিস্কো ন দে খোদাতাল্লা, উস্কো দে আসফউদ্দৌলা"—অর্থাৎ যাহাকে ভগবানও দেয় না, যে পথের কাঙ্গাল ও ফকির, দাতা আসফউদ্দৌলা তাহাকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়া সুখী করেন। আসফউদ্দৌলার এমনই দান ছিল। তবে তিনি বিষয়ী ছিলেন না; তিনি ইংরাজ কোম্পানির সহিত নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রতিশ্রুত সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থের পরিমাণ আরও ৫৪ হাজার টাকা বাড়াইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বারাণসী, জৌনপুর ও গাজীপুর—গঙ্গার উত্তরপারের এই তিন জেলা—অযোধ্যা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধিকারে আনয়ন করেন।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে আসফউদ্দৌলা দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র মীর্জা আলি বা উজীর আলি পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হন। মির্জা আলি তেজস্বী যুবক ছিলেন; বোধ হয়, মনে মনে তিনি ইংরাজ কোম্পানির বিরোধীও ছিলেন। তাই তাৎকালিক বাংলার গবর্নর স্যর জন শোর মির্জা আলিকে অপসারিত করিয়া আসফউদ্দৌলার ভ্রাতা সাদৎ আলিকে অযোধ্যার রাজসিংহাসন প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সংকল্প-সিদ্ধির মানসে স্যর জন শোর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন। সেইখানে বসিয়া তিনি একদিন হঠাৎ প্রকাশ করিলেন যে, মির্জা আলি আসফউদ্দৌলার ঔরসজাত সন্তান কি না, সে পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তাই তিনি মির্জা আলিকে পদচ্যুত করিয়া সাদৎ আলিকে তৎপদে বরণ করিলেন। অবশ্য সাদৎ আলি ইংরাজ কোম্পানির পক্ষপাতিতা না করিলে এত অল্পায়াসে মির্জা আলিকে শের সাহেব রাজ্যচ্যুত করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, কোম্পানির অনুগ্রহে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তারিখে লখ্‌নউয়ের রাজসিংহাসনে সাদৎ আলি নবাবরূপে অভিষিক্ত হইলেন। ইহারই এক মাস পরে; ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে, স্যর জন শোর সাদৎ আলির সহিত আর এক নূতন সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির ব্যবস্থা অনুসারে নবাব গোরা সৈন্যের ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক মোট ৭৬ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। স্থির হয় যে এই সৈন্যের সংখ্যা দশ হাজারের কম থাকিবে না।

সাদৎ আলি বড়ই রসিক ছিলেন। এই সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের দস্তখত হইয়া গেলে স্যর জন শোরকে ফলমূলাদি নানাবিধ সামগ্রী আহার করিতে দেওয়া হয়। নানাবিধ ফল দেখিয়া শোর সাহেব নবাবকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতে কোন ফলটি সর্বাপেক্ষা মিষ্ট ও সুস্বাদু? সাদৎ আলি অমনি করযোড়ে কিঞ্চিৎ ন্যুব্জকায় হইয়া অধরৌষ্ঠে একটু ফিকা হাসি ফুটাইয়া বলেন—"হুজুর! হিন্দুস্থানমে ফল তো—ফল ফুট"—অর্থাৎ, হুজুর ভারতবর্ষে যদি কোন ফল থাকে, তবে সে ফল ফুট বা ফুটি (খোরমুজা)। ফুট শব্দ হিন্দীতে দ্ব্যর্থবাচক; এক অর্থে উহা ফল বিশেষকে বুঝায়; অন্য অর্থে, উহা অনৈক্য, আত্মদ্রোহ ও বিসংবাদকেই বুঝায়। নবাব এই উওরটি দিবার পর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা আলির সহিত জ্ঞাতি-বিরোধ বাধাইয়া তিনি যে অযোধ্যার কি সর্বনাশ ঘটাইয়াছিলেন, তাহা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। সে ক্ষোভ, সে পশ্চাত্তাপ এই একটি উত্তরেই তিনি ইংরাজের সম্মুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে লর্ড মর্নিংটন বা মার্কোয়েস ওয়েলেসলি ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন। সেই বৎসরের অক্টোবর মাসেই তিনি নবাবকে লিখিয়া পাঠান যে, হয় নবাব সাদৎ আলি পর্যাপ্ত বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানির হস্তে পূর্ণভাবে অর্পণ করুন, নতুবা রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরাজের গোরা সেনা ও সিপাহি দলের ব্যয় নির্বাহার্থ ছাড়িয়া দিন। লর্ড ওয়েলেসলি বলিলেন যে, অযোধ্যার চারি পার্শ্বে এবং ভিতরে মোট দশ হাজার সৈন্য রক্ষা করিলে পর্যাপ্ত হইবে না, আরও দুই তিন দল সেনা অযোধ্যায় রাখিতে হইবে।—এই আব্দারের এবং এই জোর জবরদস্তির ফলে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নবেম্বর তারিখে সাদৎ আলির সহিত লর্ড ওয়েলেসলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ হইতে আর এক সন্ধির সর্তে আবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধির ব্যবস্থা অনুসারে নবাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য এক কোটি, পঁয়ত্রিশ লক্ষ, সাতাশ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি অর্থাৎ সমস্ত অযোধ্যার অর্ধাংশেরও অধিক ভাগ তাঁহার দোস্ত কোম্পানির বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহা ছাড়া নবাব স্বীকার পাইলেন যে, His Excellency would establish such a system of administration, to be carried into effect by his own officers, as shall be condusive to the prosperity of his subjects and be calculated to secure the lives and property of the inhabitants অর্থাৎ বড়লাট অযোধ্যার উন্নতি কামনা করিয়া এবং অযোধ্যাবাসীর ধন ও জীবনরক্ষার জন্য অযোধ্যা দেশের শাসনকল্পে সুব্যবস্থা করুন; কোম্পানির কর্মচারিবর্গই অযোধ্যা প্রদেশে এই সুব্যবস্থা প্রচলন করিতে নিযুক্ত থাকিবেন। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, নবাব এবং তাঁহার অধীন রাজকর্মচারিবর্গ ইংরাজের আদর্শ অনুসারে অযোধ্যা শাসন করিতে পারিতেছেন না, এ কথা নবাব বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার দোস্ত অর্থাৎ পরম মিত্র ইংরাজ কোম্পানিকে, তথা গবর্নর জেনারেল বাহাদুরকে বলিলেন যে, "তোমার মত করিয়া তোমার লোকজনকে সঙ্গে লইয়া, তুমি আমার অযোধ্যা রাজ্য শাসন কর; তাহা হইলে তোমার হিসাবে আমার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং আমার প্রকৃতিপুঞ্জের ধন ও প্রাণ রক্ষা হইবে; তোমাদের এই দয়ার ও কৃপার সহায়তায় আমিও ধন্য ও কৃতার্থ হইব!"

নবাব সাদৎ আলি চরিত্রহীন পুরুষ ছিলেন না। তিনি পরবর্তী নবাবদিগের ন্যায়

বিলাসীও ছিলেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক হান্টার নবাব সাদৎ আলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "a miserable sensualist and debauchee, who failed to carry out the stipulations অর্থাৎ নবাব সাদৎ আলি অতি হীন লম্পট ও বিলাসী ব্যক্তি, তিনি সন্ধির সর্ত অনুসারে কার্য করিতে পারেন নাই।

এই সন্ধির পর ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে নবাব সাদৎ আলি ইহলোক ত্যাগ করিয়া সকল জ্বালার হাত এড়াইয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দর পিতার মৃত্যুর পর অযোধ্যার নবাব বলিয়া কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছিলেন। সাদৎ আলির মৃত্যুর সহিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থলোভ তিরোহিত হয় নাই। গাজীউদ্দীন বাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে ইংরাজ কোম্পানির সহিত মিত্রতার গৌরব রক্ষা করিতে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে যখন নেপাল যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন নবাব গাজীউদ্দীন কানপুরে লর্ড ময়রা বা মার্কুইস-অব-হেস্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই সাক্ষাতের ফলে নবাব কোম্পানিকে এক কোটি টাকা প্রদান করেন। লর্ড ময়রা একটু ধর্মভীরু লোক ছিলেন; তিনি নবাবের দানকে দান বলিয়া গ্রহণ না করিয়া বার্ষিক ছয় টাকা হারের সুদে এক কোটি আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু নেপাল যুদ্ধের ব্যয় এই টাকায় সঙ্কুলান না হওয়াতে নবাবের নিকট হইতে তিনি আর এক কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে বড়লাটের পরামর্শ অনুসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গাজীউদ্দীনকে পুরুষানুক্রমে king বা ভূপতি বলিয়া মান্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

গাজীউদ্দীনের পর নসীরুদ্দীন হায়দর অযোধ্যার রাজা হন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপিতৃব্য মহম্মদ আলি সাহ অযোধ্যার রাজা হইলেন। বড়লাট লর্ড অক্ল্যান্ড এই বৎসরের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আর এক প্রস্থ সন্ধি করেন। এই সন্ধির অষ্টম ধারায় নির্দেশ থাকে যে, নবাবের রাজ্যে উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা হইলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপযুক্ত কর্মচারী দ্বারা অযোধ্যা শাসনের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা সাধন করিবেন, পরে উহা নবাবের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মহম্মদ আলি সাহেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আমজাদ আলি সাহ অযোধ্যার রাজা হন। আমজদ আলি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লোকান্তরে গমন করেন এবং ঐ বর্ষের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ওয়াজিদ আলি শাহ অযোধ্যার রাজা হন। ইনিই অযোধ্যার শেষ নবাব রাজা। এই সময়ে কর্নেল শ্লিম্যান্ নবাবের দরবারে রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি যদিও নবাবের শাসন সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেন, তথাপি কখনও নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পরামর্শ দেন নাই। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে নবাবের সহিত কোম্পানি যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, বিলাতের ডিরেক্টরগণ তাহার অনুমোদন ও সমর্থন করেন নাই। এ সমাচার লর্ড অকল্যান্ড অযোধ্যার নবাবকে জানাইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। হয়ত বা ইচ্ছা করিয়াই দেন নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ভারতের বড়লাট হন, তখন তিনি লর্ড অকল্যান্ডের এই ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অযোধ্যার নবাব, লর্ড হার্ডিঞ্জের কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি পুরাতন সন্ধি অনুসারে কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে কোম্পানির কর্মচারিবর্গের মধ্যে অযোধ্যা গ্রহণের জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

এই জল্পনা কল্পনার মূলে তিনটি ভাব নিহিত ছিল; প্রথম—অযোধ্যাবাসী দুষ্ট ও অত্যাচারী শাসনকর্তার অধীন থাকায় তাহারা সদাই উৎপীড়িত হইতেছিল, ইহাই সাধারণ্যে প্রমাণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়—অযোধ্যার ভূপতি অত্যন্ত লম্পট ও বিলাসী ছিলেন, তাঁহার লাম্পট্যের ব্যয় সঙ্কুলান উদ্দেশ্যে প্রজাদিগের উপর উৎপাত করিয়া—এক হিসাবে প্রজাবর্গের সর্বস্ব লুণ্ঠনপূর্বক অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন—ইহাই অযোধ্যার কয়েকজন বিশিষ্ট প্রজার দ্বারা বলাইয়া লইতে হইবে। তৃতীয়—নেপালের ক্রোড়ে অযোধ্যা স্বাধীনভাবে অবস্থান করিলে ভারতের উত্তরখণ্ডে ইংরাজের শাসনপ্রভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। সুতরাং যে কোন উপায়েই হউক অযোধ্যাকে নবাবের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেই হইবে।

লর্ড ডালহাউসি, সেনাপতি আউটরাম ও স্যর হেনরি লরেন্সের পরামর্শে অযোধ্যাকে একেবারে গ্রাস করিতে চাহেন নাই; কিন্তু বিলাতের ডিরেক্টরগণ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে লর্ড ডালহাউসির প্রতি অযোধ্যা পূর্ণভাবে অধিকার করিতে আদেশ দেন। এই সময়ে সেনাপতি আউটরাম লখ্‌নউয়ের রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ অযোধ্যা রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন।

শীতকাল, জানুয়ারি মাস, লখ্‌নউ শহর ঘোর কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন—আর সেই কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া কাইসরবাগের প্রাঙ্গণে একটি বিরাট চন্দ্রাতপ খাটান হইতেছিল। কেন যে চন্দ্রাতপ, কেন যে দরবারের উদ্‌যোগ আয়োজন, তাহা স্বয়ং নবাব ওয়াজিদ আলিও জানিতেন না—সূর্যোদয় হইল, সে সূর্যরশ্মি ম্লান এবং নিস্তেজ; তখনও কুজ্ঝটিকা দূর হয় নাই। ওদিকে নবাবের অন্তঃপুরেও ঘোর কুহেলিকা। বেলা নয়টার সময়ে মন্ত্রী আলি নকী খাঁ নবাবকে সমাচার দিলেন যে, আজ দরবার বসিবে; সেই দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গবর্নমেন্ট স্বেচ্ছা প্রকাশ করিবেন। এই কথা বলিতে বলিতেই ইংরাজের গোলাধ্বনি হইল, আর ইংরাজেব প্রতিনিধি সেনাপতি আউটরাম বড়লাটের ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন এবং লক্ষ্ণৌবাসীকে জ্ঞাপন কবিলেন যে, অচিরে তাহারা ইংরাজের শাসনাধীন হইবে। মন্ত্রী আলি নকী ত্বরিত পদে বাহিরে আসিয়া রেসিডেন্ট মহোদয়ের নিকট স্বপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সময় চাহিলেন; নবাবমাতা যবনিকার অন্তরাল হইতে স্বীয় পদোচিত সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া আর্তস্বরে পুত্রের পুনর্বিচারের জন্য সেনাপতি আউটরামের নিকট প্রার্থনা করিলেন। রেসিডেন্ট সেনাপতি আউটরাম ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, এই মাসের শেষে আমরা অযোধ্যা দখল করিবই। মন্ত্রী আলি নকী অনুনয় বিনয় ব্যর্থ জানিয়া মস্তক অবনত করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে নবাব-মাতা মূর্ছিতা হইয়া অন্তঃপুবের মণিকুট্টিমে পড়িলেন এবং সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে নবাব ওয়াজিদ আলি রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। সেদিন নবাবের প্রাসাদ কামানশূন্য, রক্ষিগণ নিরস্ত্র, নবাব প্রাসাদের প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে দুইজন করিয়া গোরা সঙ্গীন চড়াইয়া প্রহরা দিতেছিল, নবাব কতিপয় বিশ্বস্ত অমাত্যের সহিত এই অবমাননাকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অধোমুখে রেসিডেন্টের ভবনে গমন করিলেন। কথাবার্তার পর তিনি রেসিডেন্টকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই প্রাসাদকক্ষেই আর একটি নূতন দরবারের সৃষ্টি হইল। এই ক্ষুদ্র দরবারে

রেসিডেন্ট গবর্নর জেনরেলের পত্র ও পরোয়ানা নবাবের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং নবাবকে বলিলেন, আপনি শান্তভাবে এই পত্রের ব্যবস্থা অনুসারে কার্য করুন। নবাব পশ্চিমাস্য হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিলেন এবং ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া নিজ মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া রেসিডেন্টের হস্তে প্রদান করিলেন; বলিলেন, সন্ধি কেবল তুল্যব্যক্তিদিগের সহিতই হইয়া থাকে। কিন্তু আমি আজ হৃতসর্বস্ব, প্রবঞ্চিত, মাতৃহীন পথের কাঙ্গাল; আমার রাজ্য তোমরা গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের সহিত কি আমার ন্যায় পতিত ব্যক্তির সন্ধিবন্ধন সম্ভবপর হয়? এই সন্ধির ঠাট্টা বা বিদ্রূপ আমাকে আর করিবেন না; নবাব সুজাউদ্দৌলার মিত্রতার যে ইহাই পরিণত হইবে, যেদিন রাজসিংহাসনে আরোহণ করি, সেই দিনই আমি তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমার পূর্বপুরুষগণের সহিত যেরূপ মিত্রতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ মিত্রতার ফলে যে আমাকে পরান্নভোজী ও পরাশ্রয়ে আশ্রয় হইয়া থাকিতে হইবে, তাহাও আমি জানিতাম। আমি নিয়তির ক্রীড়নক কন্দুকমাত্র, আমাকে তিনি যে অবস্থায় যেভাবে রাখিলেন, আমি সেই অবস্থায় সেইভাবে তুষ্ট থাকিব। কিন্তু দুঃখ এই যে, নিমকহারামের বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম কি হয়, তাহা দেখা বুঝি বা আমার ভাগ্যে ঘটিবে না।

এই বলিয়া নবাব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অযোধ্যার অধিপতি শেষে কলিকাতার মুচিখোলার নবাব বলিয়া অভিহিত হইয়া শেষ জীবন স্থবিরবৎ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে অযোধ্যার অবসান ঘটিলে সমগ্র অযোধ্যাবাসী ভাবী অজ্ঞেয় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। সিপাহি বুঝিল যে তাহার চিরকালের প্রাধান্য ও ভবিষ্যৎ সুখ এইবার বিলুপ্ত হইল। অযোধ্যার তালুকদারগণ বুঝিলেন যে অতঃপর তাঁহাদিগকে ইংরাজ শাসনের যন্ত্রে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় পিষ্ট হইয়া শুষ্ক শীর্ণভাবে থাকিতে হইবে। অযোধ্যার মুসলমান সম্প্রদায় বুঝিলেন যে, তাঁহাদের প্রাধান্যের সুখসূর্য এইবার চিরদিনের মত অস্তমিত হইল। অযোধ্যার প্রকৃতিপুঞ্জ বুঝিল যে, নবাবের অধীনতায় যে "বরক্কৎ" বা সচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দতা ছিল, তাহা আর থাকিবে না। অযোধ্যার সকলেই বুঝিল যে, এই রাজ-পরিবর্তনে সকল পক্ষেরই অসুবিধা ও কষ্ট হইবে। এই চিন্তায়, এই ভাবনায় আগ্নেয়গিরির পঞ্জর প্রচ্ছন্ন ভূস্তরের অগ্নিক্রীড়ার ন্যায় অযোধ্যাবাসীর মনে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রতিবিধিৎসার জ্বালামালা নিঃশব্দে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল; নিঃশব্দে অযোধ্যায় যোদ্ধৃসমাজের হৃদয়কে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল।

ইংরাজ এই ভাবপরিবর্তনের কোন সমাচারই রাখেন নাই। তিনি নিজের সব ভাল দেখেন, আপনাকে লইয়াই সদা প্রমত্ত, তাই তিনি পরের ভাবনা ভাবিতে পারিলেন না। এই ভাবপবিবর্তনে যে অযোধ্যার সমাজ দেহ হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের ন্যায় প্রতিবিধিৎসার তরলীকৃত প্রবাহধারা অচিরে পঞ্জর ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইবে, তাহাও ইংরাজগণের বোধগম্য হয় নাই। এত বড় রাজা, এমন কোটি নরনারী সেবিত কুঞ্জকাননে শ্যামলীকৃত এমন প্রহ্লাদিনী ভূমি যে এত অল্পায়াসে করায়ত্ত করা চলে না, তাহা ইংরাজ তখন বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই সিপাহি যুদ্ধের উদ্‌যোগ পর্বটা তাঁহাদের যথাকালে বোধগম্য হয় নাই।

সত্য বটে, আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। অর্থাৎ ধরাসুন্দরী বীরেরই

করতলগত হইয়া থাকেন। ইংরাজ যদি প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় দিয়া, নবাব সেনাদলকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিয়া অযোধ্যা প্রদেশ অধীন করিতেন, তাহা হইলে আমরা হয়ত কোন কথাই বলিতাম না। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর হইতে নবাব ওয়াজিদ আলির রাজোষ্ণীষ ত্যাগের দিন পর্যন্ত—এই দীর্ঘকালের মধ্যে—আমরা পর্যায়ক্রমে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, কিরূপ কৌশলে অযোধ্যা প্রদেশকে আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে অংশে অংশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অযোধ্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। এই চাতুরীপ্রভাবের অন্তরালে যে ইংরাজের দুর্নিবার শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এই শক্তি যদি বীরোচিত গাম্ভীর্য ও ঔদার্যের সহিত প্রদীপ্ত হইত, তাহা হইলে আমরা এত কথা কহিতাম না। যে শক্তি চক্রবর্তী প্রভাবে মণ্ডিত, যে শক্তি সম্রাটের উচ্চাসনে অবস্থিত, সে শক্তি একটা প্রদেশের রাজাকে লইয়া এতটা কৌশলজাল বিস্তার করিলে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়ই।

একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, গাজীউদ্দীন হায়দর যদি king বা ভূপতি উপাধি গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে অযোধ্যা প্রদেশ এত শীঘ্র ইংরাজের কবলিত হইত না। বাস্তবিক এই king (কিং) কথাটি ইংরাজ শাসনকর্তৃগণের কানে সদাই হলাহল ঢালিয়া দিত। 'কিং' বলিলেই সেই উপাধিধারী ব্যক্তিকে His Majesty বলিয়া ইংরেজ মাত্রকেই অভিবাদন করিতে হইবে। ইংরাজ ভাবিতেন ভারতে His Majesty ত এক ইংলন্ডেশ্বর, অন্য কেহ His Majesty হইবে কেন? ইংলন্ডেশ্বরের, তথা ইংরাজ জাতির সম্রাট শক্তির বিস্তার পক্ষে এই His Majesty সম্বোধনটি বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই ছলে কৌশলে অযোধ্যারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইংরাজ ব্যস্ত হইয়া *উঠিয়াছিলেন। সে ব্যস্ততার পরিণামে নবাব ওয়াজিদ আলির আট বৎসর শাসনকাল শেষ হইতে না হইতেই অযোধ্যা রাজ্য তাঁহার হস্তচ্যুত হইল—তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইয়াছিল।*

প্রায় সকল ইংরাজ ঐতিহাসিকই লিখিয়া গিয়াছেন যে, অযোধ্যায় অসহ্য অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন নিত্য বিদ্যমান ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে লখ্নউ নগরী অদ্বিতীয়া ভারতসুন্দরীর ন্যায় লোকলোচনে রমণীয়া হইয়াছিল কিরূপে? স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফ্, স্যার হেনরি লরেন্স, এমন কি স্যর জেমস্ আউটরাম পর্যন্ত লখ্নউকে "The Paris of the East" বলিয়া সমাদর করিয়াছিলেন। এই সকল ইংরাজ রাজপুরুষই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, নবাবী আমলে অযোধ্যায় শিল্পকলা অত্যধিক মাত্রায় উন্নতিলাভ করিয়াছিল। লখ্নউয়ের বস্ত্ররঞ্জন শিল্প, কিংখাপ মখমল বয়ন শিল্প তখন জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইত। ইতিহাসতত্ত্ববিদ্ বকল্ (Buckleule) বলিয়াছেন যে, যে যাহা বলে বলুক, যখন কোন প্রদেশের শিল্পের বাণিজ্যের উন্নতি হয়, যখন কোন প্রদেশের অধিবাসিবর্গ সুদৃঢ় ও সুন্দরকায় হয়, তখন সেই দেশের ও তদ্দেশীয় অধিবাসিবর্গের অবস্থা যে অতি ভাল এবং তাহারা যে অতি সুশাসনে রক্ষিত হইতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় মান্য করিতেই হইবে। নবাবী আমলে অযোধ্যায়—শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ত হইয়াছিল, তাহার উপর নরনারী সকল সদাই প্রোৎফুল্ল এবং সুদৃঢ়কায় ও সুন্দর হইয়াছিল, এ কথা কর্নেল শ্লিম্যান নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অযোধ্যায় পাঁড়ে, দুবে, তেওয়ারী ব্রাহ্মণগণ এবং সূর্যবংশীয় পুরাতন ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ সুগঠিত ও সুন্দর, সেরূপ সুগঠিত,

সুদৃঢ় মাংসপেশীবদ্ধ অথচ কোমল-কমনীয়তাপূর্ণ লাবণ্যেমণ্ডিত মনুষ্যদেহ পৃথিবীর আর কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় না। বারমাস অষ্ট প্রহর যে জাতি রাজশক্তির দ্বারা নিপীড়িত ও উপদ্রুত হইয়া থাকে, যে জাতির গৃহহারা ধনৈশ্বর্য, জীবন, মানসম্ভ্রম রাজকর্মচারিবর্গের খোসখেয়ালের উপর নির্ভর করে, সে জাতি কখনই এত সুন্দর এত মনোহর হইতে পারে না, সে জাতি কখনই মনীষার উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে শিল্পবাণিজ্যের এতটা উন্নতি করিতে পারে না। এ সিদ্ধান্ত আমাদেরই নহে, ইহা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণেরও বটে। এ সিদ্ধান্ত মান্য করিতে হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, হয় অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনি মিথ্যা, নয় অযোধ্যার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কথা এবং প্রজাদিগের দৈহিক সরলতার কথা মিথ্যা। কিন্তু নবাবী আমলের অযোধ্যায় শিল্পোন্নতির নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার সমকক্ষ সামগ্রী ইংরাজের সুশাসনের অধীন থাকিয়াও আর অযোধ্যায় শিল্প প্রস্তুত করিতে পারে না, এখনও ইংরাজের সেনাদলভুক্ত অযোধ্যার সিপাহিগণ, বিশেষতঃ অশ্বারোহীগণ দীর্ঘকায়, সুকান্ত এবং সুসভ্য। ম্যালিসন বলিয়াছেন যে, সিপাহিযুদ্ধের পূর্বে অযোধ্যায় সিপাহি সেনার দলকে কুচকাওয়াজের জন্য মাঠে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি ও ভঙ্গি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইত—এক একটা মানুষ যেন গ্রিসের পূর্ণযুগের ভাস্করের খোদিত পাথরের তুল্য। সুতরাং বলিতে হয় যে, এ পক্ষের কথাই সত্য, এবং অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনি ছল মাত্র। যে দেশের রাজা লখ্নউয়ের ন্যায় নগরী তৈয়ার কবিতে পারেন, যে দেশের রাজা প্রকৃতিপুঞ্জকে এত সুন্দর, এত মনোহর, এত সুদৃঢ়কায় ও সুখী করিয়া রাখিতে পারেন, সে দেশের রাজা উৎপীড়ক হইতেই পারেন না। গল্পে আছে যে, একদিন নবাব আমজদ আলি অশ্বারোহণে ইংরাজ রেসিডেন্ট স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফের সহিত আনন্দ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া গোরক্ষপুরের সীমান্তের তালুকদার ও জায়গিরদারগণ ভূমিহার ভূমিপালগণ করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন যে, অনাবৃষ্টিতে শস্য ভাল হয় নাই, আমাদিগের কিস্তি মাফ হউক। তাঁহারা এক কিস্তি মাফ চাহিয়াছিলেন, নবাব পেশকারকে হুকুম দিলেন যে, অযোধ্যার পূর্ব সীমার সকল প্রদেশে চারি কিস্তি মাফ হইল বলিয়া পরোয়ানা জারি কর। এই ব্যাপার দেখিয়া রেসিডেন্ট মেট্‌কাফ্ সাহেব বলেন—“এ কি হুজুর! এতটা দয়া করার ত প্রয়োজন ছিল না। আমি স্বয়ং ওই সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, অনাবৃষ্টি কিছুকাল হইয়াছিল বটে, তাহার ফলে সিকি ফসল না হইলেও হইতে পারে। একে ত প্রজাগণ আপনাকে অতি অল্প হারেই কর দিয়া থাকে, তাহার উপর একটু আধটু অনাবৃষ্টি হইলেই যদি চারি কিস্তি করিয়া কর মাফ হয়, তাহা হইলে প্রজারা আস্‌কারা পাইবে; নবাব সরকারকে প্রবঞ্চনা করিবার কেবলই অবসর খুঁজিবে।”

হাসিয়া নবাব বাহাদুর উত্তর করেন, “সাহেব! আমা অপেক্ষা, ঐশ্বর্যশালী পুরুষ আর দেখিয়াছ? আমার লখনউ নগরীর মত কি তোমার লন্ডন শহর? আমার এত ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি কাহাদের অর্থে হইয়াছে? উহারাই আমার ঐশ্বর্য, উহারাই আমার সর্বস্ব। উহারা যে মুখ ফুটিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছে, ইহাতেই আমি লজ্জায় মরমে মরিয়া গিয়াছি। আমার রাজ্যে কোথায় কি হইতেছে, কোথায় প্রজা কেমন আছে, তাহা আমি সবই জানি। জানিয়া শুনিয়াই প্রজার প্রার্থনার চতুর্গুণ আমি দান করিয়াছি। উহাদের অভাবের সময়ে আমি চতুর্গুণ দিলাম, আমার অভাবের সময়ে উহারা ইহার ষোলগুণ দিবে। সাহেব!

আমাকে ত এদেশের টাকা কুড়াইয়া বিদেশে লইয়া যাইতে হয় না; আমি ভবিষ্যতের ভাবনায় বিচলিত হইব কেন?"

স্যর চার্লস্ মেট্‌কাফ নবাবের কথায় বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। অযোধ্যার নবাব পরিবারের দান ভারত বিখ্যাত। আসফউদ্দৌলার কথা কহি না, তাহার দানশৌণ্ডতা অতুল্য। কিন্তু নবাব সুজাউদ্দৌলা হইতে নবাব ওয়াজিদ আলি পর্যন্ত সকল নবাবই অতি মাত্রায় দয়ালু ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। ইহারা কেহই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ বিচার করিতেন না—সমদৃষ্টিতে সকলকেই সমানভাবে শাসনে রাখিতেন। শিশ্নোদরপরায়ণ লম্পটে, দেহাত্মবুদ্ধি ভোগবিলাসী নরকীটে এত দয়া এত পরদুঃখকাতরতা সম্ভব না। লম্পট স্বার্থপর হয়, বিলাসী নিজদেহ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন চিন্তাই করে না। কিন্তু লখ্‌নউয়ের নবাবগণ দাতা ছিলেন, সুশাসক ছিলেন, পরদুঃখকাতর ছিলেন। কাজেই বলিতে হয় যে, ইহাদের বিরুদ্ধে বিলাসের ও লাম্পট্যের, উৎপীড়কের ও অত্যাচারীর অভিযোগ প্রকৃত অভিযোগ নহে।

যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া অধিক বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহা ঠিক যে অযোধ্যা গ্রহণের পর সিপাহি বিপ্লব ও সিপাহির যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল; ইহা সকল ঐতিহাসিকই এখন স্বীকার কবিতেছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের আদর্শ বন্দোবস্ত

মিঃ টোমাসনের ব্যবস্থা

পশ্চিমোত্তর প্রদেশ অর্থাৎ আধুনিক আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ একায়েক ইংরাজের হস্তগত হয় নাই। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধীরে ধীরে একে একে কর্মনাশার তীর হইতে প্রায় শতদ্রুর ক্রোড় পর্যন্ত, এই বিশাল ভূভাগ ইংরাজের অধীন হইয়াছিল। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর বক্সার হইতে কাশী পর্যন্ত ভূভাগ ইংরাজ অধিকার করেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির যুদ্ধের পর মারাঠা সৈন্য পরাজিত হইলে দিল্লি প্রদেশ ইংরাজের অধিকারে আসে। পরে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে আলিগড়ের যুদ্ধে এবং ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ফতেগড়ের যুদ্ধে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এবং উভয় তীরবর্তী প্রদেশ ইংরাজ অধিকার করেন। ইংরাজকে প্রথমে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে এই সকল প্রদেশকে Ceded and Conquered Provinces বলিয়া একজন ইংরাজ শাসনকর্তার অধীন রাখিতে হয়। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে নেপাল যুদ্ধ শেষ হইলে হিমালয়েব ক্রোড়স্থিত কুমায়ুন ও ঘাড়োয়াল প্রদেশ ইংরাজ লাভ করেন এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পিণ্ডারী যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর নর্মদা ও তাপ্তীর মধ্যস্থিত উপত্যকাভূমি ইংরাজ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রদেশই ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে একীকৃত হইলে একজন ছোটলাটের শাসনাধীন রাখা হয়। স্যর চার্লস্ মেটকাফ এই সকল প্রদেশের প্রথম লেফটেনান্ট গবর্নব বা ছোটলাট। তিনি আগ্রা নগরে তাহার রাজধানী নির্ধারিত করেন। এই সময়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ব্যাপ্তি প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল হইয়াছিল এবং অধিবাসীর সংখ্যা আনুমানিক দুই কোটি কুড়ি লক্ষ ছিল।

লর্ড ডালহাউসির শাসনকালে অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজ শাসনাধীন হইলে এবং নাগপুর ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে ভারতে ইংরাজের অধিকারের শাসন বিভাগের নূতন ব্যবস্থা হয়। দিল্লি প্রদেশকে পঞ্জাবের অধিকারভুক্ত রাখা হয়, নর্মদার উপত্যকাভূমি মধ্যপ্রদেশের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় এবং আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, ঝাঁসি, বারাণসী, জৌনপুর, ঘাড়োয়াল, কুমায়ুন প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশ নির্দিষ্ট হয়। এই শাসনখণ্ডের (পশ্চিমোত্তর প্রদেশের) প্রথম ও প্রধান শাসনকর্তা জেমস্ টোমাসন। তিনি শাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, জায়গির ও তালুকদারের উৎপীড়নে প্রকৃতিপুঞ্জ বড়ই পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। দেশের প্রকৃত শক্তি এই মধ্যবিত্ত তালুকদার ও জমিদারগণের হস্তেই ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক পল্লী বা গ্রাম যেন এক একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। সে রাজ্য অবিনশ্বর—চিরকাল স্থায়ী। কত রাজপরিবারের, রাজবংশের পরিবর্তন ঘটিয়াছে; হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ এবং পরিশেষে ইংরাজ কত জাতিই কতকাল চক্রবর্তীর প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারত সম্রাটের আসন গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লী ও পল্লীপদ্ধতি চিরদিন সমানভাবে আছে। এত পরিবর্তনেও ইহারা

কেবল রাজকর দেয় এবং সম্রাটশক্তির সম্মুখে অবনত হইয়া থাকে, কিন্তু কখনই কোন শক্তির দ্বারা ইহাদের প্রকৃতি বা পদ্ধতির পরিবর্তন হয় নাই। এই পল্লীগ্রাম ও পল্লীপদ্ধতি যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন হিন্দুর প্রকৃতি অবিকৃতভাবে থাকিবে! স্যর চার্লস্ মেটকাফ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এই পল্লীপদ্ধতির উপর এক মন্তব্য প্রকাশ করেন—The village communities are little republics, having nearly everything that they want within themselves, and almost independent of any foreign relations. they seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down; revolutions succeeds to revolution; Hindu, Pathan, Moghul, Maratha, Sikh, English are all masters in tern, but the village communities remain the same. In times of trouble they arm and fortify themselves; a hostile army passes through the country; the village communities collect their cattle within their walls, and let the enemy pass unprovoked.*** The union of the village communities each one forming a separate state in itself, has, I conceive, contributed more than any other cause to the preservation of the people of India through all the revolutions and charges which they have suffered. অর্থাৎ স্যর চার্লস্ মেটকাফ বলিয়াছেন যে, এই গ্রামসমষ্টির মধ্যে প্রত্যেক গ্রাম যেন এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য; তাহার (স্যর চার্লস্ মেটকাফের) মনে হয় যে, এই গ্রামসমষ্টি অন্য কিছু করিয়া থাকুক, বা নাই থাকুক, দেশের বারংবার অবস্থা-পরিবর্তন ও বিপ্লব সহ্য করিয়াও এই গ্রামসমষ্টি ভারতের জনগণকে বিনাশের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

এই গ্রামসমষ্টির উপর তালুকদার বা জমিদারের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। গ্রামীণগণ এই তালুকদার বা জমিদারের নিকট আপনাদিগের দেয় কর বা উৎপন্ন শস্যের নির্দিষ্ট অংশ জমা করিয়া দিত, তাহাকেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে করিত; তাহারা সম্রাট বাদশাহ কাহাকেও চিনিত না, কাহারও সমাচারও রাখিত না। ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায় দেখিলেন যে. ভারতবাসীর সমাজের ও গ্রামের এইরূপ অবস্থান ও শাসন-প্রণালী বিদ্যমান থাকিলে ইংরাজের চক্রবর্তী প্রভাব সমাজের সকল স্তরে অনুসৃত হইবে না। তাহারা বুঝিলেন যে, ভূমির উপর গ্রামের, এবং সমিষ্টিতে গ্রামবাসিগণের অধিকার অব্যাহত থাকিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির সহিত, লাভ ও আয়বৃদ্ধির সহিত, ইংরাজ গবর্নমেন্টের ভূমিকরের আয়ের বৃদ্ধি হইবে না। যতদিন না ভারতবাসী কৃষকও তাহার ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকারের ভাব প্রতিষ্ঠ করিতে পারিবে, ততদিন এই পুরাতন পদ্ধতি সজীব থাকিবেই। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে মি. হোল্ট মেকেঞ্জি এই কথার সূচনা কবিয়াছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই মতের সমর্থন করিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ভূমি সকলের জরিপ হওয়া প্রয়োজন এবং উহার নূতন বন্দোবস্তও হওয়া উচিত। লর্ড ডালহাউসি ছোটলাট টোমাসন সাহেবের পরামর্শ অনুসারে সেই জরিপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন।

জরিপ কার্য বৈজ্ঞানিক Trigonometrical survey বা ত্রিকোণমিতির পরিপ্রেক্ষণ পরিমাণ অনুসারে সাধিত হইবে। ভূমি বন্দোবস্তেব মূলে এই তত্ত্বটুকু নিহিত রহিল যে, ভূমিপাল স্বয়ং ইংরাজ; সেই ইংবাজের অধীন প্রজা স্বরূপ কৃষক ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে; কৃষকের ও তাহার কৃষ্ট ভূমিখণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ইংরাজ স্বীকার করিলেন। অর্থাৎ কৃষক

দ্বারা কৃষ্ট ভূমি হইতে কৃষকের কখনও উচ্ছেদ করা চলিবে না; ভূমিজাত শস্যের অনুপাতে এক অংশ শস্য রাজার খাজনাখানায় জমা করিয়া দিতে পারিলে কৃষক নিজ ভূমি স্বাধিকারে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু সেই ভূমির উপর কৃষকের অধিকারস্বত্ব থাকিবে না; কৃষক সেই ভূমিকে "আমার জমি" বলিতে পারিবে না—এই কৃষক ব্যতীত ভূমি সংক্রান্ত অন্য সকলেই—তালুকদার জমিদার ইজারদার সকলেই—ইংরাজ গবর্নমেন্টের খাজনা আদায়ের নায়েব স্বরূপই থাকিবেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেতনভোগী না হইয়া আদায়ী ভূমিকর হইতে তাহার এক অংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইবেন।

লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় ভূমি সম্পৃক্ত চিরস্থায়ী প্রথার প্রচলন করায় ইংরাজ কোম্পানিকে যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাহা তাহার পরবর্তী সকল বড়লাটই স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার জমিদার ও কৃষক উভয়েই ভূমির অধিকারী; ইংরাজ চক্রবর্তিশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই রাজকরের হিসাবে ভূমিকর আদায় করিয়া থাকেন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় খাজনা আইন প্রচারের পর জমিদারের অধিকার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেও ভূসম্পত্তির উপর দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ জমিদার যতক্ষণ জমিদার থাকেন, কৃষক যতদিন তাহার কৃষ্ট ভূমি আয়ত্তে রাখে এবং বিধিপদ্ধতি অনুসারে রাজকর নির্দিষ্ট সময়ে দিতে থাকে, ততদিন ভূমিগত স্বত্ব ও স্বামিত্ব সেই জমিদার ও কৃষকের অধীন থাকে। গবর্নমেন্ট এখনও বাঙালির নিকট হইতে এই ভূমির উপর স্বামিত্ব অপহরণ করিতে পারেন নাই। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পাছে এই ভ্রম আবার হয়, সেই জন্য ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় অতি সাবধানে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্বোক্ত প্রণালীতে জরিপের ফলে পশ্চিমোত্তর প্রদেশকে পঞ্চাশ হাজার অংশে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক অংশের আবাদী, গরআবাদী জমি, পতিত জমি, ডাঙ্গা ভূমি প্রভৃতির হিসাব ও নিরিখ তৈয়ার হইল। ইহার পরে থাকবস্তী জরিপ আরম্ভ হয়। সেই জরিপ অনুসারে নবাবী আমলের বা পুরাতন ছাড়পত্রাদি দেখিয়া প্রত্যেক কৃষকের কর্ষণভুক্ত জমি স্থির করা হইল এবং সেই জমিতে কত এবং কয়টা ফসল উৎপন্ন হয়, তাহারও নির্দেশ রহিল। এই দুই জরিপ অনুসারে প্রত্যেক কৃষক বা প্রজাকেই স্বীয় অধিকারভুক্ত জমি রেজিস্ট্রি করিয়া লইতে হয়। নম্বর অনুসারে এই রেজিস্ট্রি হয় বলিয়া ইহাকে নম্বরদারী সিস্টেম বলিয়া থাকে। গবর্নমেন্ট স্থির করিলেন যে, ৩০ বৎসর অন্তর এই ভাবে নূতন করিয়া বন্দোবস্ত হইবে এবং ৩০ বৎসরের জন্য রাজকরের যে হার নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহা বর্ধিত হইবে না। এখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কোন কোন স্থানে ২০ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

মন্বাদি আর্য ব্যবস্থাপকগণের সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকাল পর্যন্ত ভারতের কৃষক প্রজা কখনই নগদ টাকায় রাজকর পরিশোধ করে নাই। ভূমিজাত শস্যের ষষ্ঠাংশ বা পঞ্চমাংশ রাজার প্রাপ্য বলিয়া রাজকর্মচারিগণ প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। এই সংগৃহীত শস্য রাজা কিছু বা সেনাদলের আহার্যরূপে রক্ষা করিতেন, কিছু বা ভাবী অজন্মার আশঙ্কায় সরকারি গোলায় জমা করিয়া রাখিতেন এবং বাকি বিদেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। ইংরাজ এ দেশের রাজা হইয়া দেখিলেন যে পুরাতন ব্যবস্থা অনুসারে রাজকর আদায় করিলে তাহাদিগের কোন লাভই হইবে না। তাহারা প্রবাসী শাসনকর্তা, ব্যবসায় উপলক্ষে এ দেশে আসিয়া সহসা

দেশের শাসনকর্তা হইয়াছেন। এ দেশে ইংরাজ রাজা থাকিবেন না, এবং থাকিতেও পারেন না। রাজার জাতি ইংরাজ সেই রাজশক্তির ব্যবহার করিয়া লাভবান হইবেন মাত্র। সুতরাং এ দেশে নগদ টাকার অধিক প্রচলন না হইলে ইংরাজের লাভের পক্ষে সুবিধা নাই। তাই লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথমেই বঙ্গদেশে দশশালা বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় নগদ টাকায় রাজকর আদায়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং নগদ টাকার হারে ভূমিকর নির্ধারণ করেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের এই ব্যবস্থা পশ্চিমোত্তর প্রদেশেও প্রচিলত হইয়াছিল। বঙ্গে জমিদারের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে প্রত্যেক কৃষকের সহিত সে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করা সহজ নহে ভাবিয়া সে কার্য ইজারাদারদিগের হস্তে ন্যস্ত রাখা হয়। গবর্নমেন্ট এই সঙ্গে নিয়ম করেন যে, যে তালুকদার বা ইজারাদার যথাসময়ে এই নির্দিষ্ট রাজকর দিতে না পারিবেন, তাহার অধিকার ও সম্পত্তি sale law অনুসারে প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেন্ট নিলাম করিয়া লইবেন। এই সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে, কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক হইবে। এই নূতন বন্দোবস্ত ও আইনের কড়াকড়ি প্রভাবে এবং নগদ টাকায় রাজকর সংগ্রহের উৎপীড়নে ও উপদ্রবে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের বহু পুরাতন তালুকদার ও জমিদার একেবারে ভূমিশূন্য হইয়া পড়িলেন।

মৈনপুরীর রাজা পশ্চিমোত্তর প্রদেশের সম্ভ্রান্ত তালুকদার ছিলেন। তাহার সদানুষ্ঠান ও রাজভক্তির জন্য ইংরাজের নিকটেও তিনি সম্মানিত ছিলেন। তাহার বিস্তৃত তালুকের অধীন প্রায় দুইশত পল্লীগ্রাম ছিল। এই প্রদেশের ভূমি সম্পৃক্ত কর্মচারীও বুদ্ধিমান ও কার্যপটু ছিলেন। কার্য-নিপুণতায় ও ক্ষমতায় শেষে তিনি উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সাম্য-প্রণালীর উপাসক ছিলেন। সুতরাং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মচারী তালুকদারদিগকে যে চক্ষে দেখিতেন, তিনিও মৈনপুরী-রাজকে সেই চক্ষেই দেখিলেন। এডমনস্টোন মৈনপুরীর রাজাকে অক্ষম বলিয়া নির্দেশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না; তিনি বলিলেন যে রাজা সর্বদা দুষ্টবুদ্ধি কর্মচারিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন, যথারীতি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন না, পরন্তু সর্বপ্রকার পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তখন স্থির হইল যে, রাজাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মৈনপুরী-রাজের অধিকারে ১৪৯ খানি গ্রাম ছিল, বন্দোবস্ত কর্মচারী ইহার মধ্যে তাহাকে কেবল ৫১ খানি গ্রাম দিলেন, অবশিষ্ট গ্রামগুলি তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইল। তবে এই সকল গ্রামের জন্য তাহাকে কিছু অর্থ দেওয়া হইবে, এরূপও প্রস্তাব করা হইল।

রাজ্য-শাসন-বিভাগের শ্রেণী-অনুসারে বন্দোবস্ত-কর্মচারীর উপর যথাক্রমে কমিশনর, রেভিনিউ বোর্ড, লেফ্‌টেনান্ট গবর্নর অবস্থিতি করিতেন। জর্জ এডমনস্টোনের প্রস্তাব কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রবার্ট হামিল্টন যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার বলে বন্দোবস্ত-কর্মচারীর সমস্ত হেতুবাদ খণ্ডিত হইয়া যায়। হামিল্টনের মত এই যে, অর্থের বিনিময়ে ভূসম্পত্তি কখনও স্বত্বাধিকারীর হস্তচ্যুত করা যাইতে পারে না; রাজা যদি সম্পত্তি রক্ষণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অবসর গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার অসামর্থ্য হেতু তাহার বংশধরদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা কর্তব্য নহে। রবার্ট বার্ড এই সময়ে রেভিনিউ বোর্ডের পরিচালক ছিলেন। অভিনব রাজনীতিক মতের তিনি পোষকতা করিতেন। কাজেই তিনি কমিশনারের মতের অনুমোদন করিতে পারিলেন না।

রেভিনিউ বোর্ডের পর লেফটেনান্ট গবর্নরের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে তিনি কমিশনার রবার্ট হামিল্টনের যক্তিপূর্ণ মতেরই অনুমোদন করিলেন। কিন্তু বোর্ড এ বিষয়ে প্রতিকূল হওয়ায় এ সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের আদেশ-লিপি প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল।

জেম্‌স্‌ টোমাসন যখন ছোটলাট হইলেন তখন তিনি দেখিলেন, এই বিষয় তখনও গবর্নমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। তাহার অনুমোদনক্রমে মৈনপুরী-রাজ স্বীয় বিষয়ের তিন চতুর্থাংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর বোলডর্সন সাহেব তালুকদারী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। বোলডর্সনের পুস্তকে মৈনপুরী-রাজের বিষয় ব্যতীত পোয়েনীর রানির ভূসম্পত্তি-ঘটিত বিবরণ ছিল। ইংরাজগণ যখন উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন এবং যখন পর্যায়ক্রমে ভূমির বন্দোবস্ত হয়, তখন তাহার জমিদারির স্বত্ব অবিসংবাদিত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তথাপি রানির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উপস্থাপিত না হইলেও তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানের ফলেও রানি আপনার অধিকারভুক্ত সমস্ত বিষয়েরই প্রকৃত স্বত্বাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হন। উহার ছয় বৎসর পরে গ্রামের প্রধানদিগের সহিত তাহার সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস তাহাকে সহসা আপনাদের অধীন করেন।

এদিকে বিক্রয়-সংক্রান্ত আইনের (Sale Law) বলেও ভূস্বামীদিগের সর্বনাশ হইতে লাগিল। তালুকদারগণ দুর্ভিক্ষের সময়ে খাজানা দাখিল করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের সমস্ত বিষয় অবিলম্বে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইতে লাগিল। এইরূপ সম্পত্তি-বিক্রয়ে অনেক জমিদার ও তালুকদারই সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। সূক্ষ্মবুদ্ধি রবার্টসন ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল লিখিয়াছিলেন, "তালুকদারী বন্দোবস্ত, ভূমিক্রোক ভূমিবিক্রয়-সংক্রান্ত আইনের ফলে বর্তমান উচ্চ শ্রেণীর সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।" কেবল রবার্টসনই গবর্নমেন্টের কার্য-প্রণালীর এইরূপ নিন্দা করেন নাই; মার্টিন গবিন্স্‌ ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "রাজস্ব দানে অসমর্থ লোকদিগের প্রতি আমরা যে কঠোর ব্যবহার করিতেছি, তাহা রাজস্ব প্রণালীর একটি প্রধান দোষ। উত্তর ভারতের ভূস্বামীগণ এই প্রণালীর প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি যখন রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ছিলাম, তখন কোনও স্থানে কখনও আমি ওই নিয়মের প্রবর্তন করি নাই। ভারতীয় ভূম্যধিকারিগণের ন্যায় আমিও ওই নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকি।"

ডিরেক্টরসভার মনস্বী টুকরা ভূমির বন্দোবস্ত প্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "আমার মনে হয় যে, কৃষকদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীর তালুকদারগণের সম্বন্ধ রহিত করাই কৃষকদিগকে আজ্ঞানুবর্তী করিবার বা তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার প্রশস্ত উপায় নহে। আমরা এক শ্রেণীকে পূর্বতন অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের পূর্বস্মৃতি অথবা বর্তমান অনুভূতি নষ্ট করিতে পারি নাই। তাহারা এবং তাহাদের সন্তানগণ অবশ্যই বুঝিবে যে, তাহাদের সে সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

রাজ্যাধিপতিগণের ইচ্ছার অনুবর্তী হওয়া ভারতবর্ষীয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম। সেইজন্যই এখন তাহারা নীরবে আছে। কিন্তু যদি পশ্চিম সীমান্তে আমাদের কোন শত্রু উপস্থিত হয়, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে কোনরূপ বিপ্লব ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ঐ তালুকদারগণ বিপক্ষদলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহাদের অনুবর্তী প্রজাসমূহ সেই দলের পতাকার নিম্নে সজ্জিত হইয়াছে।" ইহার পঁচিশ বৎসর পরে উইলিয়াম এডওয়ার্ডস স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন— "১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের এক বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে আমি প্রকাশ্যরূপে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পত্তি-বিক্রয়-সম্বন্ধীয় কঠোর রীতি এবং তৎ-প্রযুক্ত সমাজের পরিবর্তন কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিয়াছি। আমি ইহার পর দেখাইয়াছি যে, যদিও আমরা প্রাচীন সম্প্রদায়কে স্থান-ভ্রষ্ট করিয়াছি, তথাপি তাহাদের পূর্বস্মৃতি কিংবা প্রজাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পারি নাই। আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, বিপ্লবের সময়ে এই ধনজনসম্পন্ন সম্প্রদায় এবং তাহাদের অনুচরগণ আমাদের শত্রুর দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল। বদাউনে নিম্নশ্রেণীর সকল অধিবাসীই সম্মিলিত হইয়াছিল, এবং সমগ্র বিভাগেই অরাজকতা ও বিপ্লব বিরাজ করিয়াছিল। প্রাচীন ভূস্বামিগণ এই অবসরে নিলাম ক্রেতাদিগকে হত্যা বা দূর করিয়া, আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি বিগত অনিষ্টের প্রতিবিধানার্থ কোন উপায় অবলম্বিত না হয়, এবং যদি প্রাচীন বংশাবলীকে তাহাদিগের পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তাহা হইলে অপরিমিত সৈন্যও আমাদের সাম্রাজ্যশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে না। আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি অসন্তোষের এই কারণ বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে যে পল্লীবাসিগণ সিপাহিদিগকে ঘৃণা করে, সেই পল্লীবাসিগণই সিপাহিদিগের সহিত ইংরাজ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত না। যে ভূসম্পত্তি ইহাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় সেই ভূসম্পত্তির অধিকারচ্যুতি ও পুরুষানুক্রমিক স্বত্ববিলোপই ইহাদিগকে এইরূপ উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।"

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নিষ্কর ভূমির সুব্যবস্থা করিবার ভার বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্মচারীদিগের উপর সমর্পিত হয়। নিষ্কর ভূমি সকল প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের অধীন রাখা ওই কর্মচারিগণের মধ্যে অনেকেরই অভিপ্রেত ছিল না। রবার্টসন এই বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্মচারিগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যে সকল নিষ্কর ভূমি রেজেস্টরি করা হয় নাই, বন্দোবস্ত-বিভাগের কর্মচারিগণ অনুসন্ধান না করিয়া তৎসমুদয়ই অধিকারিগণের স্বত্বচ্যুত করিয়াছেন। একটি জেলায় অর্থাৎ ফরাক্কাবাদে সন্ধিপত্রের নিয়ম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড লেকের ন্যায় ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে যে রীতি প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিও সম্পূর্ণরূপে অনাদর প্রদর্শিত হয়।" ওয়াইজ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বলিয়া গিয়াছেন যে "চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত অধিবাসীই উহাতে আপনাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, এবং ইহার ফলে একরূপ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইতে থাকে।"

যাহা হউক, এই সকল ব্যবস্থার ফলে এবং উৎপাত উপদ্রবের প্রভাবে তালুকদার ও জমিদারগণ গবর্নমেন্টের প্রতি সবিশেষ বিরক্ত এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন। তাহারা দেখিলেন যে তাহারা সত্য সত্যই গবর্নমেন্টের তহশীলদার মাত্র হইয়াছেন। পক্ষান্তরে

গ্রামের পাটোয়ারী এবং কানুনগোর আয় ও পদমর্যাদা ইংরাজের আমলে অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গেল। প্রত্যেক প্রজাই বুঝিল যে, ভূমিতে পূর্বে যেমন এক একটা পরিবারের বা সংসারের বা বংশের স্বত্ব ও স্বামিত্ব সমবেত ভাবে ন্যস্ত থাকিত, এখন আর তেমন রহিল না, প্রত্যেক প্রজাই স্বতন্ত্র ভাবে নিজের অধিকার বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার ফলে ভূমিসংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গেল, আর এই মামলা মোকদ্দমার ব্যয় সঙ্কুলানের চেষ্টায় প্রজাকে পরিণামে সর্বস্বান্ত হইতে হইল। যে সকল প্রদেশে পূর্বে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সকল প্রদেশে সিপাহিযুদ্ধের সূচনার পূর্বে আর একবার বন্দোবস্ত হয়। এই নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে গবর্নমেন্টে ভূমিকর পাঁচগুণ, সাতগুণ, এমন কি স্থান বিশেষে দশ গুণ পর্যন্ত বাড়াইয়া লইলেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অধিবাসিবর্গ বুঝিল যে, এইরূপ দুই তিনটা বন্দোবস্তের পরেই প্রজার ভাগ্যে ফেনটুকুও থাকে কিনা সন্দেহ, লবণটুকু পাওয়া সুদূরপরাহত হইবে।

অযোধ্যা, নাগপুর, ঝাঁসি দখল করিয়া লর্ড ডালহাউসি বা ইংরাজ কোম্পানি যে ভাবের বিদ্বেষ বা বিরক্তি ভারতবাসীর মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও তীব্রতর বিদ্বেষ ও বিরক্তির ভাব এই জমির বন্দোবস্তে প্রজার মনে জাগিয়া উঠিল। পঞ্জাব, অযোধ্যা, নাগপুর জয়ের ফলে প্রজার মনে পরদুঃখকাতরতার জন্য বিরক্তির ভাব জন্মিয়াছিল—অনাগত, অজ্ঞাত অথচ সম্ভাব্য বিপদের শঙ্কায় প্রজা পীড়িত হইয়াছিল. কিন্তু টোমাসনের ভূমিবন্দোবস্তের ফলে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক প্রজা মনে করিল যে, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য, কোম্পানির আইন কানুনের আখমাড়ার কলে তাহার দেহের এবং ভূমির সকল রস কোম্পানি চাপিয়া মাড়িয়া বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ বিদ্বেষের ভাব সিপাহির মনেও জাগিয়াছিল। কেন না প্রত্যেক সিপাহিই যে কৃষক, প্রত্যেক সিপাহিই যে গৃহস্থ—তাই তাহারা ভূমিসংক্রান্ত কঠোরতার অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এই কাণ্ড হইতে লাগিল, ওদিকে সুদূর বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ইনাম কমিশনের উৎপাতে প্রজাকুল আকুল হইয়া পড়িল। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজে আমাদের বাংলা দেশের দেবত্রা, ব্রহ্মত্রা পীরত্রার মতো ভূমিপাল অভিজাতবর্গ প্রজাকুলকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইতে পারিলে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারিলে, চিকিৎসা বিদ্যার চর্চা এবং রোগী-শুশ্রূষার পক্ষে উদ্‌যোগী হইতে পারিলে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের প্রধানগণ এই ইনাম দান করিতেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে পেশবে দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের অধঃপতন হইলে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের বহু ভূমিখণ্ড ইংরাজ কোম্পানির অধিকারে আসে। এই সকল ভূখণ্ডের মধ্যে পূর্বোক্ত ইনাম নামধেয় নিষ্কর ভূমি অনেক ছিল, ইংরাজ কোম্পানি এই সকল ইনামী ভূমির বন্দোবস্ত করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টোন্ এই ইনাম ভূমির বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করেন। সরকার পক্ষ হইতে কাগজে কলমে ব্যক্ত করা হইল যে, সহসা ন্যায়ের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহারা কোন ব্যবস্থা করিবেন না, তাহারা সকলের সকল দাবি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু অন্যদিকে কোম্পানির রাজস্ববিভাগের কর্মচারিগণ এই ইনামী মহল লইয়া এতই কঠোরতা আরম্ভ করিলেন যে, অল্প কালের মধ্যেই প্রকৃতিপুঞ্জ সর্বনাশ ভয়ে, বাস্তুভিটা হইতে উচ্ছিন্ন হইবার ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। দিনের পর দিন

বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, নিত্য নব নব আইন প্রণীত ও প্রচারিত হইতে লাগিল, তথাপি বোম্বাই প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সংশোধিত ও সুব্যবস্থিত হয় নাই। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার প্রভাবে ইনামী মহল সকলের সুব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কমিশনের নিয়োগ হয়। এই কমিশনে সামরিক বিভাগের কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারী সদস্যরূপে নিযুক্ত হন। ইনামী মহল সকলের অধিকাবী সম্ভ্রান্ত ও কুলমর্যাদা সম্পন্ন উচ্চজাতীয় ব্যক্তিগণই ছিলেন। ইহারা সকলেই পুরুষপরম্পরায় তরবারির উপর নির্ভর করিয়া চিরকারই স্বাধিকার স্বায়ত্তে রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই প্রকারের বহু জায়গিরদার ছিলেন। এই প্রকারের জায়গিরদার ও ইনামদার কখনই ভূমিঘটিত দলিল পত্রাদি যত্নপূর্বক রাখেন নাই। রাজমুখে বা প্রধানের মুখে দানের কথা তাহারা শুনিয়াছেন এবং দত্ত সম্পত্তি স্বীয় বাহুবলে অধিকার করিয়া পুরুষানুক্রমে রাজার বা প্রধানের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তরবারিই তাহাদিগের দলিল; তরবারিই তাহাদিগের স্বামিত্ব ও স্বত্ব রক্ষা করিবার একমাত্র কবচস্বরূপ ছিল। তাহারা ত জানিতেন না যে, ইংরাজের আমলে ইনাম কমিশন বসিবে। আর সেই কমিশনের দৃষ্টিতে বিলাতি প্রমাণ আইনের ব্যবস্থানুসারে লিখিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে! ইনাম কমিশনের সদস্যগণ যেন ধূমকেতুর ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গিয়া ইনামী ভূমি সকলের দলিল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কেহই দলিল দেখাইতে পারিল না। কাহারও এই পুরুষপরম্পরাগত সম্পত্তি রক্ষা পাইল না। প্রতিদিনই নিলামী ইস্তাহার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল, আর একে একে মহারাষ্ট্র প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ ভূমিশূন্য গৃহশূন্য হইয়া ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। লাডলো সাহেব তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এই কমিশনের কর্মচারিগণ লোকের গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া দ্বারের তালা ভঙ্গ করিতে এবং গৃহস্বামী অনুপস্থিত থাকিলে কখনও বা সেই সকল গৃহে প্রাপ্ত দলিলপত্র, পুস্তক, পুথি পুড়াইয়া ফেলিত, কখনও বা সেই সকল বহন করিয়া আপনাদের তাঁবুতে লইয়া যাইত। এই ভাবে কমিশনের সদস্যগণ ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রকারের সর্বসমেত ৩৫০০০ ইনামী ভূমিখণ্ড পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোম্পানির অধিকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজ প্রদেশে ইনাম কমিশনের এক প্রস্থ কার্য শেষ হয়, আর একপ্রস্থ নূতন ভাবে আরম্ভ হয়। ইহার উপব ইনাম কমিশনের সহযোগী কোম্পানির নিযুক্ত দেওয়ানি বিচারপতিদিগের বিচারে প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণ দলে দলে উদ্‌বাস্তু হইতে লাগিলেন। দেওয়ানি বিচারালয়ের ডিক্রি ও ক্রোকের প্রভাবে সহস্র বৎসরের সম্ভুক্ত সম্পত্তি সকল পরহস্তগত হইতে লাগিল এবং সমাজের পুরাতন নেতৃবর্গ স্থানচ্যুত হইয়া নূতন দলকে আমল দিলেন।

কেবল পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের জমিদার, তালুকদার, ইনামদার প্রভৃতিদিগের উপরেই অত্যাচার হয় নাই, ভারতের যে সকল প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশেরই জমিদার, তালুকদারগণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লর্ড ডালহাউসির শাসনকালের পূর্বে যে সকল স্থান ইংরাজের করায়ত্ত হয়, সেই সকল স্থানে এই নূতন নীতি প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল; পরে লর্ড ডালহাউসি কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহে এই নীতি প্রচলিত হইয়াছিল। পঞ্জাব, অযোধ্যা

বিহার প্রভৃতি অঞ্চলেও এই নূতন বন্দোবস্ত নীতি অনুসারে জমির স্বত্ব নিরূপিত হইয়াছিল।

তৎকালে পঞ্জাবের শাসনভার যাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহারা এই নূতন নীতির সমর্থন করিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের প্রাচীন সর্দার ও জমিদার, জায়গিরদার প্রভৃতি এই নূতন নীতির পেষণে পিষ্ট হইয়া সর্বস্বান্ত হইতেছিলেন, পঞ্জাবের রাজনীতিক শাসকবর্গ ইহা দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দেশ শাসনের অধিকারী, কোন বিধিপদ্ধতির পরিবর্তনের অধিকার তাহাদিগের ছিল না। কাজেই তাহাদিগকে নূতন ব্যবস্থায় বিরক্ত হইয়া পঞ্জাব প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। স্যর হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্ এই কারণেই পঞ্জাব প্রদেশ পরিত্যাগ করেন। স্যর হেনরী লরেন্স সর্দার ও ভূস্বামীদিগের পক্ষ সমর্থনের ত্রুটি করেন নাই; যেখানে তিনি কোন সর্দার বা ভূম্যধিকারীকে হৃতসর্বস্ব ও অবমানিত হইতে দেখিয়াছিলেন তিনি সেই স্থলেই যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া ভূম্যধিকারীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তিনি পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। অযোধ্যা প্রদেশেও অত্যাচারের বিরাম ছিল না। কেবল যে রাজবংশীগণ বা প্রাচীন ভূস্বামীগণ এই ব্যবস্থায় নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অনেক হিন্দু পুরোহিত ও সৈনিক পুরুষ, এই নূতন বন্দোবস্ত প্রণালী অনুসারে জমির স্বত্ব নির্ধারিত হইতে থাকায়, তাহাদের নিষ্কর ভূমি ও জায়গির হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ফলে, একদিকে যেমন প্রাচীন ও ক্ষমতাশালী ভূস্বামীগণ ইংরাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সৈনিক পুরুষেরাও অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ কোম্পানি যে সকল ব্রাহ্মণের নিষ্করভূমি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ হিন্দু প্রজাসাধারণের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে ইংরাজ গবর্নমেন্টের এ ভয়ানক অত্যাচার, এই অত্যাচারের ফলে বুঝিবা সনাতন ধর্ম লোপ পায়! ব্রাহ্মণ পুরোহিতেব এই আশঙ্কার কথা হিন্দু জনসাধারণের হৃদয়ে অতি সহজেই স্থান লাভ করে; কাজই হিন্দু জনসাধারণও উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এস্থলে আরও একটি বিষয় বলা আবশ্যক। ইংরাজ গবর্নমেন্ট নূতন বিধি পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া পরোক্ষভাবে প্রবঞ্চনার পথ সুপ্রসর করিয়াছিলেন, ইহাতে অনেক ইংরাজ রাজনীতিক প্রতিবাদ করিলেও কোন ফল হয় নাই; শাসকবর্গ এইরূপ প্রবঞ্চনার পন্থা সৃষ্টি করার জন্য লজ্জিত হন নাই। শুধু ইহাই নহে, কোম্পানির গবর্নমেন্টে প্রত্যক্ষভাবেও লোককে বঞ্চনা করিতে ছাড়েন নাই। মহারাজ নন্দকুমারকে যে ভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই সময়ে জ্যোতিঃপ্রসাদ নামক জনৈক ধনবান কন্ট্রাক্টরকেও সেই ভাবে দেশ-ছাড়া করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্যোতিঃপ্রসাদ আফগানিস্থান ও গোলালিয়রের যুদ্ধের সময়ে ইংরাজের সেনাদলের রসদ যোগাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথারীতি রসদ সরবরাহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষে ইংরাজ গবর্নমেন্টের কাছে জ্যোতিঃপ্রসাদের একলক্ষ টাকা প্রাপ্য হয়। গভর্নমেন্ট সে সময়ে জ্যোতিঃপ্রসাদকে ওই টাকা প্রদান করেন নাই। ইহার পর পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংরাজ গবর্নমেন্ট আবার জ্যোতিঃপ্রসাদকে রসদ সরবরাহের জন্য আহ্বান করেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ দেখিলেন যে একবার একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কোম্পানির সেনাদলের

রসদ সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানি সে অর্থ দেন নাই, আবার যদি তিনি এই ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এবারেও হয়ত তাহাকে প্রবঞ্চিত হইতে হইবে। সেই জন্য তিনি কোম্পানির গবর্নমেন্টের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু সুচতুর গবর্নমেন্ট তাহাকে বলিলেন যে, এবার যুদ্ধের সময় রসদ সরবরাহ করিলে তাহার প্রাপ্য টাকা ত তাহাকে দেওয়া হইবেই, অধিকন্তু তাহাকে একটি উপাধি দেওয়া হইবে। জ্যোতিঃপ্রসাদ সরলভাবে এই কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং নিঃসঙ্কোচে রসদ সরবরাহের ভার গ্রহণ করিলেন।

যথাসময়ে পঞ্জাবের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রাপ্য টাকার হিসাব গর্বনমেন্টের নিকট দাখিল করিলেন; কিন্তু কোম্পানির গবর্নমেন্ট এবারেও জ্যোতিঃপ্রসাদকে এক পয়সাও দিলেন না। পরন্তু অতিমাত্রায় ন্যায়পরায়ণ হইয়া গবর্নমেন্ট জ্যোতিঃপ্রসাদের হিসাবের পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কোম্পানির গবর্নমেন্ট কোন কোন স্থলে জ্যোতিঃপ্রসাদকে ভয় প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি কমিশরিয়েটের অর্থাৎ রসদ বিভাগের একজন কর্মচারী জ্যোতিঃপ্রসাদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপ, প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতির অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের কথা যথাসময়ে গবর্নমেন্টের কর্ণগোচর হইল; মনসা ধুনার গন্ধ আঘ্রাণের সুবিধা পাইল। গবর্নমেন্ট অবিলম্বে মেজর রাম্‌সে নামক একজন সেনানীকে এই ব্যাপারের তদন্ত করিবার আদেশ দিলেন। মেজর রাম্‌সে তদন্ত করিয়া সেনানী সমিতিতে প্রকাশ করিলেন যে, জ্যোতিঃপ্রসাদ নির্দোষ। সেনানী সমিতির তিনজন সদস্যের মধ্যে দুইজন মেজর রাম্‌সের রিপোর্ট সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, একজন তাহার রিপোর্টের সহিত একমত হইতে না পারায় বিষয়টি বড়লাটের সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। ফলে দুঃসময়ে যিনি কোম্পানির গবর্নমেন্টের সহায়তা করিয়াছিলেন নিজের অর্থ জলের মত ব্যয় করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ইংরাজের সেনাদলের আহার্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে সেই কোম্পানির গবর্নমেন্টের নিকট সেই কার্যের জন্যই অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইলেন! সাধারণত উত্তমর্ণই অধমর্ণের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ে, কোম্পানির গবর্নমেন্টের ন্যায়পরতা প্রকাশের দিনে, অধমর্ণই উত্তমর্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল।

যাহা হউক, আগ্রায় জোতিঃপ্রসাদের বিচার হইতে লাগিল। ব্যারিষ্টার মিঃ ল্যাঙ্গ জ্যোতিঃপ্রসাদের তরফে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজের ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রথমে কলিকাতায় পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও তাহার নামে ওয়ারেন্ট জারি হইল; তাহাকে কলিকাতা হইতে আগ্রায় লইয়া আসা হইল। দ্বাদশ দিন বিচারের পর জ্যোতিঃপ্রসাদ নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন।

যদিও বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ভূমিসংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল হইতেই প্রচলিত ছিল, তথাপি যে উৎপাত উপদ্রবে পশ্চিমোত্তর ও পঞ্জাব প্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, ভূমিসংক্রান্ত সেইরূপ উৎপাত উপদ্রব বিহারে ও বঙ্গে অতিমাত্রায় ঘটিয়াছিল। বিহারের হাতুয়া ডুমরাওন, টিকারী, বেথিয়া, দ্বারবঙ্গ, বনেলী প্রভৃতি বড় বড় জমিদারের ঘর মোগলের সময় হইতেই সামন্তরূপে সম্মানিত হইতেন। এই সকল স্থানের অধিপতিগণ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

ছিলেন। চিরস্থায়ী প্রথা প্রচলিত হওয়াতে ইহাদিগকেও জমিদারের তুল্য হইতে হইল। হাতুয়ার রাজা ফতে শাহী এই হেতু লর্ড ওয়েলেস্‌লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল। সে বিদ্রোহ লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ ফতে শাহীকে পরাজিত করিয়া তাহার স্থানে তৎপুত্র ছত্রধারী শাহীকে রাজা বলিয়া মান্য করেন। এদিকে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খড়্গপুরে রাজা রহমত আলি খাঁকে ভাগলপুর বিভাগের জজ ও কমিশনার লাটুর সাহেব সূর্যাস্ত আইনের দোহাই দিয়া সর্বস্বান্ত করেন। রাজা রহমত আলি খাঁর পিতামহ ক্ষত্রিয় ছিলেন। দিল্লির বাদশাহ ফরোকশেয়ারের কন্যা তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। এই হেতু বাদশাহ ফরোকশেয়ার রাজা রহমত আলি খাঁর পিতামহকে খড়্গপুর পরগণা (হাবেল ও মহলা) এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের আরও ৫/৭টি পরগণা লাখেরাজ স্বরূপ প্রদান করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইলে কোম্পানি রহমত আলির জমিদারিকে লাখেরাজ বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন না। রাজা রহমত আলি খাঁ রাজকর দিবার মানুষ ছিলেন না, সুতরাং সূর্যাস্ত আইনের ফলে তাহার জমিদারি নিলামে চড়িয়া গেল।

এদিকে বঙ্গদেশেও কৃষ্ণনগর ও নাটোরের রাজত্ব, সুষঙ্গ মহারাজের অধিকৃত গারো পর্বত সমূহ কোম্পানির কর্মচারিগণ আইনের নানা ছলে হস্তান্তরিত করিতে লাগিলেন। যাহারা চিরকাল দেশের অভিজাতবর্গ বলিয়া মান্য হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা এই রাজস্ব সংক্রন্ত বিধানের পেষণে পথের ভিখারী হইলেন। রাজা রহমত আলি খাঁর উপর উপদ্রব হেতু একপক্ষে পঞ্চকোটের মহারাজ নীলমণি সিং বিরক্ত ও ব্যথিত হইলেন, অন্যদিকে আরা জেলার জগদিশপুরের জায়গীরদার প্রসিদ্ধ কুমার সিং ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিলেন; কেন না ইহারা উভয়েই রাজা রহমত আলির বন্ধু ছিলেন। এই ক্রোধ ও বিরক্তির পরিণতি সিপাহিযুদ্ধের সময়েই ঘটিয়াছিল। পঞ্চকোট চিরকালই অর্ধ স্বাধীনভাবে অবস্থান করিত। বাদশাহী আমলে পঞ্চকোটের রাজার উপর কখনও কোনরূপ উৎপাত উপদ্রব ঘটে নাই। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী প্রথা অনুসাবে পঞ্চকোট রাজ্যকেও কোম্পানির কর্মচারিগণ জমিদারি বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন।

এইরূপ নানা কারণে রাজস্বসংক্রান্ত বিধি-পদ্ধতির প্রভাবে, ইনাম কমিশনের উৎপীড়নে, নগদ টাকায় রাজকর আদায়ের উপদ্রবে, টোমাসনের প্রবর্তিত অপূর্ব বন্দোবস্তের প্রভাবে এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গের সর্বগ্রাসিনী নীতির জ্বালায় যে বিরক্তি ও যে বিদ্বেষ জনগণের হৃদয়ে উদ্রিক্ত হইয়াছিল, সিপাহিযুদ্ধের সময়েই তাহার সম্যক বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

লর্ড ডালহাউসির রণনীতি ও সেনাবিন্যাস

লর্ড ডালহাউসি একদিকে পেশাবর পর্যন্ত অন্যদিকে ব্রহ্মদেশের পূর্বসীমা পর্যন্ত ইংরাজের অধিকার বিস্তার করিয়া ভাবিলেন যে, এ রাজ্য—এমন বিশাল ভূভাগ—শত্রুর আক্রমণ হইতে কেমন করিয়া রক্ষা করিব? এই ভাবনার ফলে তিনি স্থির সংকল্প করিলেন যে, ভারতের সকল প্রদেশ প্রথমে টেলিগ্রাফের তারের দ্বারা, পরে রেলগাড়ির লৌহবর্ত্মের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে ভারতের সর্বত্র ঘাঁটি বাছিয়া সেনানিবাস তৈয়ার করিয়া সেই সকল নিবাসে সেনার বিন্যাস করিতে হইবে। বিশেষত সর্বাগ্রে ইংরাজ গোরা ও দেশীয় সিপাহির মধ্যে সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। এই তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লর্ড ডালহাউসি একটি সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একদিকে টেলিগ্রাফের তার বিস্তারের ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে কলিকাতা হইতে প্রথমে রানিগঞ্জ পর্যন্ত, পরে লুপলাইন হইয়া কানপুর পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া যান। লর্ড ডালহাউসি তাহার মন্তব্যে স্পষ্টই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, রেললাইন প্রস্তুত করিলে ভারতের আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে বটে এবং সে উন্নতির প্রতি আমাদের (ইংরাজের) সর্বদা ও সর্বথা দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, কিন্তু রেল লাইন ভারতে ইংরাজ শাসন রক্ষার পক্ষে যে stratagical অর্থাৎ ঘাঁটি আগলাইবার প্রশস্ত উপায়, ইহা যেন ভারতের কোন শাসক বিস্মৃত না হন।

লর্ড ডালহাউসি সিপাহি সেনার শতমুখে সুখ্যাতি করিতেন বটে, কিন্তু শিখযুদ্ধের পরে প্রায় আড়াই লক্ষ সিপাহি সেনা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে সিপাহি ফৌজকে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজারে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি এত অধিক সংখ্যক সিপাহি সেনাকে আয়ত্তে রাখিবার উদ্দেশ্যে চারিটি উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথম, সিপাহি সৈন্যকে একস্থলে জমা করিয়া না রাখিয়া ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া দিলেন। দ্বিতীয়, ধীরে ধীরে গুর্খা সেনাদল সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৃতীয়, পঞ্জাবে শিখসেনার দলকে ইংরাজের কোম্পানির বেতনভোগী করিয়া The Punjab Irregular Force নামে এক প্রচণ্ড শিখ সেনার দল সংগ্রহ করিলেন। এই দলকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল,—প্রথম পাঠান সেনার দল, দ্বিতীয় জাঠ সেনার দল, তৃতীয় শিখ খালসা। ইহারা তখন সিপাহি বলিয়া পরিচিত ছিল না। চতুর্থ ব্যবস্থা ভারতে গোরা সেনার সংখ্যাবৃদ্ধি। এ ব্যবস্থা তিনি কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

যখন পঞ্জাব অধিকৃত হয় নাই, তখন ইংরেজ সেনা এবং সিপাহিও সমুদ্রের তীরের দিকেই অধিক থাকিত। লর্ড ডালহাউসি সেই সকল স্থান হইতে সেনা উঠাইয়া লইয়া

পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশে তাহাদিগের পুনঃ সমাবেশ করিলেন এবং মুলতান ও সীমান্তের পাঠান সেনাদলকে অযোধ্যার নানাস্থানে সুবিন্যস্ত রাখিলেন, আর দেশীয় অশ্বারোহী সেনার দলকে সংখ্যায় অনেক কমাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সিপাহির গোলন্দাজের দলকে একেবারে তুলিয়া দিবার জন্য বিলাতের ডিরেক্টরগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন; তবে তাহার সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

এই সকল ব্যবস্থা ও উদ্যোগ করিয়া লর্ড ডালহাউসি পদত্যাগ করিবার সময় কলিকাতার বিদায় ভোজে বলিয়াছিলেন "No prudent man will venture to give you assurance of continued peace" অর্থাৎ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই সহসা বলিতে পারেন না যে ভারতে শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে এবং সে আশায় কেহ অপরকে আশান্বিত করিতেও পারেন না।

দেশীয় সেনাদিগের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থার প্রকাশ লর্ড ডালহাউসিই প্রথম করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তার আসনে বসিয়া অম্লান মুখে বলিয়াছিলেন যে সিপাহি নিমকের মর্যাদা রাখিতে জানিলেও, হৃদয় শোণিত দিয়া বংশপরম্পরা ইংরাজের আনুগত্য করিলেও, সিপাহি সিপাহিমাত্র, ইংরাজ গোরা নহে। আর এই রাজ্য সিপাহির নহে, ইংরাজ জাতির, সুতরাং ইহার রক্ষা ও অধিকার বিষয়ে ইংরাজ জাতির সকলেরই সংখ্যাধিক্য রক্ষায় ব্যাপৃত থাকা কর্তব্য। গুর্খার নিয়োগ, জাঠ সেনাদের বিন্যাস, পাঠান সেনাদলের সৃষ্টি, অপরাজেয় রাজপুত ও ব্রাহ্মণ অশ্বারোহীদলের সংখ্যাসঙ্কোচ, দুর্ধর্ষ সিপাহি গোলন্দাজদিগের অসম্মান প্রভৃতি লর্ড ডালহাউসির উৎকট নীতির উৎকট ব্যবস্থা সকল সিপাহি সমাজ যে বুঝিতে পারে নাই, তাহা নহে। পূর্বে ভারতে শিখ গোলন্দাজদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলে মনে করিত, কিন্তু সাব্রাওণ ও গুজরাটের যুদ্ধে ব্রাহ্মণ রাজপুত গোলন্দাজগণ তাহাদিগের অব্যর্থ সন্ধানের প্রভাবে শিখ গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন। কোথায় কোম্পানি এই হেতু সিপাহিদিগকে সমাদর কবিবেন, না লর্ড ডালহাউসি তাহাদিগের ক্ষমতার সঙ্কোচ সাধনে উদ্যত হইলেন!

এক সেনাপতি স্যর চার্লস নেপীয়ার সিপাহির পক্ষ অবলম্বন করিয়া লর্ড ডালহাউসির ক্রূর নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সিপাহি ইংরাজ রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ; সিপাহিকে অবিশ্বাস করিলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইংরাজকেই করিতে হইবে, আর সে প্রায়শ্চিত্তে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের মূল পর্যন্ত টলিয়া উঠিবে। বিলাত হইতে লর্ড হার্ডিঞ্জ এই ক্রূর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিবাদের ফলে লর্ড ডালহাউসির প্রস্তাবিত তিন চারিটি ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা হয় নাই! সিপাহিযুদ্ধের পর্যবসান হইলে, স্যর জন লরেন্স বড়লাটের পদ পাইলে তবে সেই সকল ব্যবস্থা ধীরে ধীরে কার্যে পরিণত করা হইয়াছিল।

অধ্যাপক কাউয়েল সত্যই বলিয়া গিয়াছেন "English government in India is a government of makeships and experiments" অর্থাৎ যখন যে শাসন পদ্ধতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে, তখন সেই পদ্ধতি ইংরাজ গবর্নমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন, আর শাসন বিষয়ে এক একজন শাসনকর্তা এক একটা

খেয়ালের বশবর্তী হইয়া এক এক রকমের শাসনপদ্ধতি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানাভাবে মক্স করিয়া দেখিয়াছেন; যাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে উপযোগী হইয়াছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়াছেন, বাকি সব পরিত্যাগ করিয়াছেন। শাসনকার্যের বাকি সব পরিত্যাগ করিয়াছেন। শাসনকার্যের ক, খ, গ, ঘ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার বেদান্ত সূত্র পর্যন্ত সমস্তই ইংরাজ ভারতবাসীর উপর মক্স করিয়া শিখিয়াছেন, সুবিধাবাদ বা opportunism প্রথম হইতেই ইংরাজ শাসনের মূলমন্ত্র হইয়াছে। ইংরাজের এইরূপ ব্যবহারের ফলে ভারতবাসীর অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, আর ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর হৃদয়ে বিরক্তির ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দেশ, কাল ও পাত্র

পাঠান বা মোগল শাসনকালে উত্তর ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্ত ভূমিকে তাহারা অসংখ্য অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক অংশের উপর এক একজন করিয়া কর্তা থাকিতেন। ইনিই সেই ভূখণ্ডের অধিনায়ক স্বরূপ ছিলেন। ইনি ভাল লোক হইলে সেই খণ্ডভুক্ত অধিবাসিগণ সুখে বাস করিত, মন্দ লোক হইলে তাহাদিগের দুঃখের আর অবধি থাকিত না। ইংরাজের শাসনকালে যেমন এক রকমের বিধি পদ্ধতি দ্বারা দেশ ও সকল জাতি শাসিত হইয়া থাকে, পাঠান ও মোগলদিগের সময়ে সেরূপ হইত না। এক বাদশাহ এবং এক শাসন হইলেও দেশভেদে, জাতিভেদে এবং শাসনকর্তা ভেদে শাসনপদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। এলিয়ট বলেন যে, মুসলমানদিগের আমলে প্রত্যেক সুবা was on autonomous state অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশই পৃথকভাবে শাসিত হওয়ায় স্বয়ংসিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইত। বাংলার কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সলিমাবাদ পরগণার সুবাদারের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। অত্যাচারিত হইলে লোকে এইভাবেই গ্রাম, নগর পরগণা ত্যাগ করিত এবং দেশান্তরে যাইয়া সুখে থাকিবার চেষ্টা করিত। ইহা ছাড়া হিন্দু জায়গিরদার ও সামন্ত রাজা অত্যধিক সংখ্যায় ছিলেন। তাহারা প্রায় সকলেই সকল সময়েই প্রজারঞ্জক হইতেন, তাই মুসলমান সুবাদারের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে প্রজাগণ এবংবিধ হিন্দু জমিদার বা ভৌমিকের আশ্রয় গ্রহণ করিত। বাংলায় যে সময় কালাপাহাড়ের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময় উড়িষ্যার উত্তর খণ্ডের প্রজাগণ এক দিকে সম্বলপুর, অন্য দিকে গঞ্জাম প্রদেশের হিন্দু রাজার অধিকারে গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

এলিয়ট বলেন যে, মোগল শাসনকালে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই সৌরমণ্ডলের ব্যবস্থা অনুসারে যেন ব্যবস্থাপিত ছিল। সৌরমণ্ডলের মধ্যে যেমন সূর্যদেব অবস্থান করিতেছেন এবং তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তির দ্বারা নানা গ্রহ উপগ্রহ স্বস্থানে অবস্থান করে ও তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক গ্রহই স্বতন্ত্র এবং ভিন্নভাবে নির্মিত—দিল্লির বাদশাহ সেইরূপ মধ্যস্থিত সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিতেন, আর তাহার প্রভাবের আকর্ষণে কাবুল হইতে বাংলা দেশ পর্যন্ত সকল প্রদেশই আকৃষ্ট থাকিত, অথচ প্রত্যেক প্রদেশেরই স্বাতন্ত্র্য, সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইত। এ ব্যবস্থা পাঠানদিগের আমলে এবং পূর্বে হিন্দুদিগের আমলেও ছিল, পরন্তু আকবর বাদশাহ সচিব তোডরমল্লের পরামর্শ অনুসারে ইহা দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক সুবাকে সরকার, পরগণা, চাকলা প্রভৃতিতে ভাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক পরগণারই রীতিপদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল এবং শাসন ব্যবস্থাও স্বতন্ত্ররূপে করা হইত। কেবল রাজকর দানে, মোগল বাদশাহের প্রাধান্য স্বীকারে এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগকে রাজার জাতি বলিয়া সম্মান প্রদর্শনে মুসলমান অধিকারে

সমতা সংসাধিত হইত। ইহার ফলে প্রজার তৃপ্তি ও শান্তি পাইবার স্থান ছিল। এক শাসনকর্তার অধীনে কষ্ট পাইলে তাহারা অনায়াসে দেশান্তরে যাইত। কিন্তু ইংরাজ শাসন পদ্ধতির সমীকরণ প্রথার প্রভাবে সকল দেশ সকল জাতি এবং সকল শ্রেণির ব্যক্তিই সমভাবে সম্পীড়িত হইতে লাগিল; আসমুদ্র হিমালয় সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রজার জুড়াইবার স্থান রহিল না। এখন আর দেশান্তরে যাইলে, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতো সপরিবারে এক পরগণা তাগ করিয়া অন্য পরগণায় যাইলে, শাসন দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই, এই কথা বা এই সিদ্ধান্ত লর্ড ডালহাউসির শাসনকালেই ভারতবর্ষের প্রজাগণের মনে জাগিয়া উঠিল। এক পক্ষে সরকারি কাগজপত্রে অযোধ্যার নবাবগণের শাসন-দুষ্কার্যের কথা লিখিত হইতেছিল, অন্য পক্ষে গোরক্ষপুর জেলায় ইংরাজ-শাসিত প্রজাগণ দলে দলে অযোধ্যা রাজ্যে উঠিয়া যাইতেছিল, কিন্তু অযোধ্যা ইংরাজ অধিকারে আসিলে সব সমান হইয়া গেল; প্রজার পক্ষে পলাইবার আর স্থান রহিল না। এই অবস্থা প্রজার মনের পূর্বজ বিদ্বেষভাবে একটু তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইংরাজ রাজনীতিক জন ব্রাইট গত ১৮৭৫ হইতে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত শাসন বিষয়ে এই পুরাতন পদ্ধতি, এই স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা পুনঃ প্রচলিত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের আর গবর্নর জেনারেলের পদে কাহাকেও নিযুক্ত না রাখিয়া একজন "ভাইসরয়" বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত থাকুন; আর বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাংলা, পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি সকল প্রদেশই বাদশাহী ব্যবস্থা অনুযায়ী এক একজন সুবাদার বা গবর্নরের দ্বারা শাসিত হউক, এবং সেই সকল গবর্নর তাহাদের কার্যাকার্যের জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিলাতের মন্ত্রি-সমাজের নিকটে দায়ী থাকুন। পিনাল কোড, ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যপদ্ধতি আইন, ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রভৃতি ইংরাজ জাতির নানা আইন কানুন প্রদেশ ভেদে এবং প্রদেশবাসিগণের আচার ব্যবহার ভেদে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হউক। জন ব্রাইট আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী ইংরাজ শাসনের পূর্বে কখনই সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া বুঝিত না; বুঝিলে রাণা রাজসিংহ স্বচ্ছন্দে সমগ্র রাজপুতানা ও মধ্যভারতের হিন্দুগণকে সঙ্গে লইয়া আওরঙ্গজেবের উৎপাত উপদ্রব প্রশমন করিতে পারিতেন। কিন্তু যে মুহূর্তে আওরঙ্গজেব রাজস্থান হইতে জিজিয়া কর উঠাইয়া দিলেন, সেই মুহূর্তেই রাজস্থানের রাজপুতগণ তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া আবার অন্য দিকে মন দিলেন। মারাঠা অভ্যুত্থানের সময় বালাজি বাজি রাও ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে স্বপ্ন মোগল বাদশাহের পূর্ব প্রাধান্য ও তাৎকালিক অধঃপতন দর্শনে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাজি রাওয়ের ন্যায় মনীষী রাজনীতিক ভারতের সকল প্রদেশের হিন্দুগণকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া আদর করিতে পারেন নাই। তাই তিনি মহারাষ্ট্র দেশ ব্যতীত অন্য সর্বদেশেই চৌথ ও সরদেশমুখী করের প্রচলন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাইট সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভারতের সকল দেশকে সমভাবে এবং এক আইন কানুনের দ্বারা শাসন করিলে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইতে পারে না।

পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান স্যর লুই টপর, ব্রাইট সাহেবের অপেক্ষা আর এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি মধ্য এশিয়ায় রুশ শাসন পদ্ধতি দেখিয়া আসিয়া প্রস্তাব করেন যে, বোখারা সমরখন্দের খাঁদিগের অধিকৃত দেশের মতো ভারতবর্ষের সকল প্রদেশকে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করিয়া এক একটি দেশীয় রাজার অধীনতায় রাখিয়া দেওয়া হউক। আর ইংরাজ দেশের সকল ঘাট আগলাইয়া বড় বড় সেনানিবাস নির্মাণ করিয়া দেশ দখলে রাখুন। কেবল ব্যবসায়গত সকল কর এবং ভূমিকরের অর্ধাংশ তাহারা গ্রহণ করুন। ইংরাজের পরামর্শ এবং নির্দেশ অনুসারে দেশ শাসিত হউক এই প্রকার নানাবিধ প্রস্তাব করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইংরাজ প্রচলিত ভারত শাসনের সমীকরণ প্রথার দোষ, ইহারা সকলেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। ব্রাইট সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে এই দোষের জন্যই সিপাহি এত শীঘ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সিপাহি যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনটি কারণে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। প্রথম কারণ, ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, সেই বন্দোবস্তের প্রভাবে দেশের পুরাতন অভিজাতবর্গ স্থানচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হন এবং নূতন ও আধুনিক নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ ধনী ও ভূসম্পত্তিশালী হইয়া প্রজাবর্গের উপর উৎপাত উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। পূর্বে জমিদার বা জায়গিরদার স্বীয় প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন; প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার আশায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই সময়ে সময়ে সর্বস্বান্তও হইতেন। কিন্তু ইংরাজ প্রচলিত ভূমিসংক্রান্ত পদ্ধতি অনুসারে জমিদারের সহিত প্রজার আর পিতাপুত্র সম্বন্ধ রহিল না। ভূমি অন্য পণ্যের ন্যায় ব্যবসায়গত পণ্যে পরিণত হইল। কিসে ভূমি হইতে অধিক লাভ হয়, আয় বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়, নূতন জমিদারগণ সেই দিকেই তীব্র দৃষ্টি রাখিলেন। তাহাদের তো প্রজার উপর মমতা থাকিবার কথা নহে, তাহারা মূলধন ব্যয় করিয়া লাভের ব্যবসায় চালাইবার জন্যই জমিদার বা জায়গিরদার হইয়াছিলেন; সুতরাং লাভের দিকেই তাহাদের তীব্রতর দৃষ্টি থাকিবার কথা। ফলে প্রজাগণ ইংরাজের আইন কানুনের প্রভাবে অর্থোৎপাদক বস্তুর মধ্যে পরিণত হইল। কিসে প্রত্যেক প্রজার এক টাকার স্থানে পাঁচ সিকা কর নির্ধারিত হইতে পারে, জমিদার কেবল সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। এমন ব্যবস্থার পরিণাম অসন্তোষ।

বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ রেল ও তার বিস্তার। তখন দেশে শিক্ষার এত বিস্তার হয় নাই। বৈদ্যুতিক তারের ও রেলের তত্ত্ব অনেকেই জানিতেন না, কেহ কাহাকেও বুঝাইতেও পারিত না। সুতরাং এ সব বিষয় লইয়া যে যাহা বলিত, লোকে তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইত। বিশেষত এতদুপলক্ষে land acquisition বা জমি গ্রহণের উপদ্রবটা প্রজার পক্ষে বিষম বোধ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের প্রজা বেগার পদ্ধতি বুঝিত; কাহাকেও উদ্বাস্তু করিয়া তাহার সর্বস্ব গ্রহণ করার ব্যবস্থাও বুঝিত। কিন্তু সকলের জমি হইতে একটু একটু করিয়া জমি কাড়িয়া লওয়া প্রজার পক্ষে একটা অভিনব ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল। অজ্ঞানবশত এই নূতনত্বে একটা অননুভূত বিপদের আশঙ্কা করিয়া প্রজা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষত জমি গ্রহণ সম্পৃক্ত কর্মাচারিবর্গ অত্যধিক মাত্রায় উৎপীড়ন অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই সময় জনকয়েক লোক প্রজাগণকে বুঝাইল যে কোম্পানির সেনা যদি কলিকাতা হইতে এক রাত্রিতে পাটনায় আসিতে পারে, তাহা হইলে উৎপীড়ন উপদ্রব সর্বত্র সমভাবেই বিরাজ করিবে। ইহাতেও প্রজা অত্যধিক মাত্রায় শঙ্কিত হইয়াছিল। এমন কি, অনেকে রেল লাইনের ধার ছাড়িয়া দূর দূরান্তর গ্রামে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বিপ্লবের তৃতীয় কারণ, বিদেশীয়গণের অত্যন্ত প্রভাব। ইংরাজি না জানিলে ইংরাজের

দপ্তর রাখা তো সহজ কথা নহে। বিশেষ ইংরাজি নবীশ ভারতবাসী পাইলেই তো ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের সুবিধা হয়; তাহাদের মারফত তাহারা দেশের কথাও জানিতে পারেন এবং নিজেদের কথাও দেশবাসীকে জানাইতে পারেন। লর্ড ডালহাউসির আমলে এবং তাহার পূর্ব হইতেই উত্তর ভারতে এক বাঙালি জাতি ব্যতীত আর কোন জাতি ইংরাজি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে নাই। ফলে, কি পঞ্জাবে, কি পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, কি মধ্যপ্রদেশে, কি অযোধ্যায় ইংরাজ শাসন সম্প্রসারণ বিষয়ে ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালিই ইংরাজের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ছিল। এই সকল বাঙালি বিদেশে অর্থোপার্জনের চেষ্টাতেই গিয়াছিলেন এবং কিসে তাহাদের অর্থোপার্জন পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়, সে পক্ষেও তাহাদের দৃষ্টি তীব্র ছিল। কোম্পানির অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল বাঙালি পঞ্জাবে এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বড় বড় সর্দার এবং মহারাজ ও রাজার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংরাজ অপেক্ষা ইহাদের জ্বালা—এই বালির তাপ—অযোধ্যা ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অভিজাতবর্গের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহারা রঙ্গ করিয়া বাঙালিকে "আঙ্গরেজকা গুরু" বলিতেন। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে উত্তেজিত ও উন্মত্ত সিপাহিগণ বাঙালিকে পাইলে তাহাকে নিহত করিতেন না বটে, কিন্তু নাক কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিতেন। ইংরাজ তখনও দেশ চিনেন নাই, দেশের অধিবাসিবর্গকেও চিনেন নাই; কাজেই শাসন বিষয়ে শান্তি স্থাপন বিষয়ে এবং দেশাধিকার ব্যাপারে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি এবং নীচ জাতীয় দেশীয় খ্রিস্টান ও ফিরিঙ্গিদিগের উপরেই নির্ভর করিতেন। দেশের লোকে দেখিত, কাল যে পথের ফকির ছিল—ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য বলিয়া সকলের পরিত্যজ্য ছিল, আজ সে তাহার ইংরাজি বিদ্যার প্রভাবে জেলার মালিক হইয়া উঠিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র অতি উন্নত হইলে সে অত্যাচারী হয়ই; ফলে এই সকল সদ্য উন্নত ইংরাজ-নিযুক্ত কর্মচারিবর্গ অতিমাত্রায় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সকল কার্যেই কোম্পানির লাভ দেখাইয়া নিজেদের অর্থলিপ্সা পূর্ণ করিত, আর প্রজার তুষ্টি তৃপ্তির প্রতি ক্ষণেকের জন্যও দৃষ্টি রাখিত না। এই অত্যাচারের জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা ইংরাজ কর্মচারিবর্গকে দোষী করিতে পারি না।

ইংরাজের নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে নববিধ অভিজাতবর্গের অভ্যুত্থানে সমাজে একটা বিষম ওলটপালট উপস্থিত হইয়াছিল। সমাজ শাসনের এবং লোকশিক্ষার পুরাতন পদ্ধতি সকল ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। দেশে নগদ টাকার অত্যধিক প্রচলন করায় প্রজামাত্রেরই নগদ টাকা উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে অর্থোপার্জনের জন্য ধর্মাধর্ম, কর্তব্যকর্তব্যের বিচার কেহ করিত না; অর্থোপার্জন হইলেই সকলের সকল দোষ ঢাকিয়া যাইত। হিন্দু ধর্ম ও আচার কেবল গোটাকয়েক প্রাণহীন, অর্থহীন পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল। উচ্চ নীচের, পাপী পুণ্যবানে এবং পণ্ডিত ও মূর্খের তারতম্য কেহ করিত না, ধনী হইলেই তাহার সকল দোষ ঢাকা পড়িত। কিন্তু এই ধনলিপ্সার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ধারণাগুলিও একেবারে নষ্ট হয় নাই; তাই পুরাতনের ও নূতনের সংঘাতে তখন সমাজে একটা অপূর্ব বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নূতন আমলে নূতন রকমের না হইতে পারিলে সুখে কালযাপন করা সম্ভবপর হইবে না। অথচ পুরাতন ধারণা ও সংস্কারগুলি তখন হিন্দুমাত্রকেই উত্তেজিত করিত। যাহারা ইংরাজি শিখিয়া, ইংরেজি সভ্যতা গ্রহণ করিয়া

ইংরাজ সাজিয়াছিলেন, তাহাদিগের ব্যবহারে হিন্দু সমাজ একটু ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। হিন্দু মাত্রেই মনে করিত যে, এই সকল জাতিভ্রষ্ট দেশবাসীর প্রভাবে হিন্দু সমাজের বন্ধন ইংরাজ শিথিল করিয়া দিবে। মুসলমানের আমলেও হিন্দু-সমাজ-প্রচলিত পুরাতন বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অত্যধিক মাত্রায় আদর ছিল। বংশমর্যাদা সকলেই লক্ষ্য করিত। কিন্তু ইংরাজের আমলে সে সকলই একেবারে উল্টাইয়া গেল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এবংবিধ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরাজ ইতিহাসতত্ত্ববিদ বাকলের বিবৃতি অনুসারে বলিতে হইলে বলা চলে যে, ইংরাজের আমলেই ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সর্বপ্রথমে পরাধীন হয়; কেন না, ইংরাজ রাজার জাতি হইলেও এতদ্দেশবাসী হইতে পারেন নাই, পারিবেনও না। ইংরাজ জাতির সভ্যতা ও শিক্ষা ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই সভ্যতা ও শিক্ষা অনুসারে ইংরাজ নিজের মতো করিয়া স্বদেশের বিধিনিষেধ ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী এ দেশে প্রচলন করিয়া দেশশাসন করিতে লাগিলেন; সুতরাং সর্বপ্রকারে ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান ইংরাজের আমলে পরাধীনতার বৃশ্চিকদংশন জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। মুসলমানদিগের আমলে পাঠান ও মোগল এতদ্দেশবাসী হইয়াছিলেন এবং এতদ্দেশজ শাসনপদ্ধতি অনুসারে প্রজাবর্গকে শাসনে রাখিয়াছিলেন। বিশেষত, প্রজার জাতি হিন্দু, রাজার জাতি মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করিলে রাজার জাতির মধ্যেই পরিগণিত হইতেন। ভারতের মুসলমান সমাজ আরব ও পারস্য দেশের মুসলমান না হইলেও, তাহারা সাতশত বৎসরকাল ভারতে রাজার জাতি বলিয়া মান্য হইয়াছিলেন এবং ভারতের হিন্দুদিগের সহিত এক গ্রামে ও এক পল্লীতে বাস করিয়া এক রকমের আদব কায়দার দ্বারা শাসিত হইয়া সৌহার্দের হেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দু তথাপি মুসলমানকে বাদশাহের জাতি বলিয়া সম্ভ্রম করিতে ভুলিত না। সহসা ইংরাজের আগমনে মুসলমান সমাজের সে সমাদর তিরোহিত হইল এবং স্বাধীনতার এক নিগড়ে হিন্দু ও মুসলমান আবদ্ধ হইল। ইহার ফলে হিন্দু সমাজেও যেমন বিপ্লব ঘটিয়াছিল, মুসলমান সমাজেও তেমনই বিপ্লব ঘটিল। বড় বড় খান্দানী মুসলমানের ঘর পথের ভিখারী হইল, বড় বড় আমীর ওমরার বংশধর সমাজে অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন, আর যে-সে ইংরাজি শিখিয়া উচ্চ পদবীপ্রাপ্ত হইয়া সম্মানভাজন হইতে লাগিলেন। ইহার ফলে মুসলমান সমাজ ভাবী বিপদাশঙ্কা করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

যাহা যায়, তাহা পাইবার জন্য মানুষ অনেক সময় ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বশে সর্বস্ব পণ করিয়া অনেক সময় সর্বস্বান্ত হয়। ইংরাজের আগমনে ভারতের হিন্দু মুসলমানের যাহা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইল, যাহা আবার আসিবার নহে, তাহাকেই আবার পাইবার আশায়—সেই সুবিন্যস্ত সমাজকে আবার যথাস্থানে অধিষ্ঠিত করিবার আশায় সিপাহি যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। ভারতের হিন্দু মুসলমান জাতিগত, দেশগত ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ বৈষম্য লইয়া এতদিন ইংরাজের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু লর্ড ডালহাউসির শাসনকালে যখন কুমারিকা হইতে হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহারা এক শাসন শৃঙ্খলায় সংবদ্ধ দেখিলেন, তখনই ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান প্রবঞ্চিতের ন্যায়—অপহৃতের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া নষ্ট সামগ্রী উদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টা হয় তো দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষার

ন্যায় হৃদয়ের মধ্যে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইত, কিন্তু লর্ড ডালহাউসির চাতুরী, ভূমি বন্দোবস্তের কঠোরতা, সিপাহিদিগের অবমাননা পঞ্জাব নাগপুর ব্রহ্মদেশ সাতারা, ঝাঁসি, অযোধ্যা প্রভৃতি স্বাধীন ও সামন্ত প্রদেশ সকলকে ইংরাজের খাস অধিকারে আনয়ন প্রভৃতি নানা উৎপাত উপদ্রবে সে চেষ্টা সহসা কার্যে পরিণত করিবার জন্য ভারতবাসী সিপাহিগণ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া, পরিণাম দৃষ্টি বর্জিত হইয়া, সমর সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সমরানলে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব পরিবারের আশ্রিত এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ, ঝাঁসির রানি এবং তাহার আত্মীয় স্বজনগণ, নানা ধন্দুপন্থ এবং তাহার অনুচর সহচরবর্গ, দিল্লির বাদশাহের আত্মীয়স্বজন এবং ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রভাবে সর্বস্বহীন পুরাতন অভিজাতবর্গ পর্যাপ্ত ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। সিপাহিযুদ্ধের পূর্বে চক্রান্তের ধারা এই সকল কেন্দ্র হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। কানিংহাম সাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে, ভারতবাসী অজ্ঞেয়তাকে—অপরিজ্ঞাত বিষয়কে, যত ভয় করে, তত ভয় আর কিছুতেই করে না। যখন রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার বা প্রধান সেনানায়ক সিপাহিদিগের সর্বেশ্বর কর্তা ছিলেন, যখন জেলার কালেক্টর বা বিভাগের কমিশনার সেই জেলা বা বিভাগের সকল প্রজার "মা-বাপ" স্বরূপ ছিলেন, তখন সিপাহি ও ভারতবাসীর মনে কোন প্রকারের গোলমাল ঘটে নাই। কিন্তু যেদিন হইতে কর্তার উপর কর্তার সৃষ্টি হইল, বিলাত হইতে কি জানি কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে হুকুম বাহির হইতে লাগিল, যেদিন বড়লাটের হুকুমও খাঁটি হুকুম বলিয়া দেশের লোক বিশ্বাস করতে পারিল না, সেইদিন হইতে ভারতবাসীর মন এই অজ্ঞেয়তা দেখিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া গেল। যখন ইংরাজ শক্তি উন্মূলন করিবার জন্য সিপাহিগণ কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তখন কে রাজা হইবে, এই বিষয়ের বিবাদ বিতণ্ডা লইয়া অনেক সময় ব্যর্থ অতিবাহিত হইয়াছিল। শেষে দিল্লির বৃদ্ধ স্থবির পঙ্গু বাদশাহ বাহাদুর শাহকে আবার ভারতেশ্বর করিবার সংকল্প স্থির হয়। অর্থাৎ যাহাকে জানি চিনি, সর্বদা দেখিতে পাই, যাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝিতে পারি, ভারতের হিন্দু মুসলমান তেমন এক ব্যক্তিকে সম্রাট করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংরাজ শাসনের এই অজ্ঞেয়তা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই শেষে দিল্লির বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, অন্ধ, বুদ্ধিহীন বাদশাহ বাহাদুর শাহকেও শিরোমণি করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হয় নাই।

স্যর চার্লস নেপীয়ার বড়লাট লর্ড ডালহাউসির সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি প্রজাসাধারণের, বিশেষত সিপাহিদিগের, হৃদয়গত অসন্তোষের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। স্যর চার্লস নেপীয়ার বুঝিয়াছিলেন যে, তাহার অধীন সিপাহিগণ অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়াছে, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধিমূলক এবং অপরাপর কয়েকটি প্রার্থনায় গবর্নমেন্ট কর্ণপাত না করায় সিপাহিরা ইংরাজ গবর্নমেন্টের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে; এমন কি, তাহারা কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। স্যর চার্লস নেপীয়ার দিল্লি, মিরাট, হরিদ্বার, আগ্রা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াই সিপাহিদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাগজে কলমের রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাহার এবংবিধ ধারণা হয় নাই। তিনি এই সঙ্গে আরও বুঝিয়াছিলেন যে, সিপাহিগণ যদি কোম্পানির গবর্নমেন্টের উচ্ছেদ সাধনকল্পে অস্ত্র ধারণ করে, তাহা হইলে উৎপীড়িত ও অসন্তুষ্ট জনসাধারণ তাহাদিগের কার্যে সহায়তা করিবে। এই কারণে তিনি লর্ড

ডালহাউসির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সিপাহিদিগকে শান্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সিপাহিদিগের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করেন নাই, তিনি কেবল রিপোর্ট পাঠ করিয়াই দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন। কাজেই স্যার চার্লস নেপিয়ারের সহিত তাহার মতানৈক্য উপস্থিত হইল। সিপাহিদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য স্যার চার্লস নেপিয়ার যে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা লর্ড ডালহাউসির মনঃপূত হইল না; এই কার্যের জন্য স্যার চার্লস নেপিয়ারকে শেষে অবনতমস্তক হইতে হইল। তিনি ডিউক অব ওলিংটনের নিকটে পদত্যাগের প্রস্তাব করিলেন; প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

সিপাহির দল এই ব্যাপারে আরও অসন্তুষ্ট হইল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইংরাজ শাসনের মধ্যে কোন ব্যক্তি কর্তা, তাহারা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; এক্ষেত্রেও তাহাদিগের মনে সেই সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িল। প্রধান সেনাপতি স্যার চার্লস নেপীয়ারকে যখন বড়লাটের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইল, বিশেষত যখন তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে যাওয়াতেই স্যার চার্লস নেপীয়ারকে এই ভাবে বিড়ম্বিত হইতে লাগিল, তখন সিপাহির দল আরও অসন্তুষ্ট এবং আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এদিকে সাধারণ লোকে দেখিল যে, দুই জন প্রধান প্রধান শাসকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিরোধের পরিণাম তাহারা এইরূপ বুঝিল যে ইংরাজ কর্মচারিদিগের মধ্যেও দলাদলি আছে, অনৈক্য আছে। সাধারণ লোকে পূর্বে ভাবিত যে, ইংরাজেরা একতাসূত্রে আবদ্ধ, সেই জন্যই তাহাদিগের এত প্রতাপ। কিন্তু এখন তাহারা দেখিল যে, ইংরাজদিগের মধ্যেও দলাদলি হইয়াছে, একতাবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। ইহা দেখিয়াই তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, ভারতে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে; একবার ঝড় উঠিলে এই শাসনস্তম্ভ ভূমিসাৎ হইবেই। সুতরাং সিপাহিরা যেমন সুযোগ খুঁজিতেছিল, জনগণও সেইরূপ একটা প্রবল ঝটিকার সম্ভাবনা বুঝিয়াছিল। কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী এই সময়ে বোম্বায়ের গবর্নর স্যার জর্জ ক্লার্ককে বলিয়াছিলেন, "আমি অভিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে শুনিয়াছি এবং নিজের অভিজ্ঞতাতেও বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনটি মাত্র দুর্ঘটনায় ভারতে ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ হইতে পারে। দুর্ঘটনাত্রয়ের মধ্যে প্রথমটি এই যে, উচ্চপদস্থ ইংরাজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। ইংরাজগণের মধ্যে যাহাতে দলাদলি না হয়, অন্তত যাহাতে এই দলাদলির কথা ভারতের জনসাধারণ না জানিতে পারে, সে বিষয়ে সাবধানে থাকা উচিত।" ফল কথা, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জনসাধারণের মনে ইংরাজ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সম্ভাবনার কথা জাগাইয়া দিয়াছিল।

সিপাহিযুদ্ধের পূর্বে এইরূপে ইংরাজের প্রজাসাধারণ ও সিপাহির দল উত্তেজিত হইয়াছিল এবং ইংরাজের রাজ্য যে নষ্ট হইবে, ইহা ধরিয়া লইয়াছিল। যে সকল জমিদার, জায়গিরদার, ইনামদার নূতন বন্দোবস্ত প্রথা অনুসারে হৃতসর্বস্ব হইয়াছিলেন, যে সকল রাজা, মহারাজ নবাব ইংরাজ কর্মচারীর চাতুরী প্রভাবে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, যে সকল সিপাহি বার্ধক্যে স্বদেশে নবাবের নিকট হইতে জায়গির লাভের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, যে সকল সিপাহি সেনার দল লর্ড ডালহাউসির হঠকারিতায় আপনাদিগের উন্নতির ও সম্মানের পথ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়াছিল, সেই সকল জমিদার, রাজা সিপাহি—বলিতে কি, সর্বশ্রেণির লোকই—পূর্বে তো উত্তেজিত হইয়াছিলই, এক্ষণে

দুরবস্থার প্রতিকারের অবসর খুঁজিতে লাগিল।

সুতরাং দেশ কাল ও পাত্র তিনই সিপাহিযুদ্ধের অনুকূল হইয়াছিল। নববিজিত দেশে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। বিলাতে ক্রিমিয় যুদ্ধের পর বিলাতের সামরিক শক্তি কতকটা অবসন্ন হইয়াছিল। এদিকে পারস্যেও একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। ইংরাজের ভারতে অধিকার বিস্তারের শতবর্ষও পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবাসীর বুদ্ধিতে সিপাহিযুদ্ধের পক্ষে কালও অনুকূল হইয়াছিল। আর পাত্রের কথা, তাহা তো সবিস্তার আলোচিত হইল। কেন ইংরাজের প্রতি দেশের লোকের অভক্তি হইয়াছিল, কেন সিপাহি উদ্ধত হইয়াছিল, সে সকল কথা পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। সেনাপতি উইলিয়মস বলেন যে, যেমন ব্যক্তির ভাগ্য আছে, সেই ভাগ্য বিপর্যয়-সূচক জীবনে এক একটা মহামুহূর্ত আছে, একটা মহৎ পরিবর্তনের অবসর আছে—তেমনই জাতির ও দেশের ভাগ্য আছে, সেই ভাগ্য পরিবর্তনের মহামুহূর্তও আছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ ভারতবর্ষের ভাগ্যের মহামুহূর্ত মনে করিয়া ভারতবাসী পরিবর্তনের অজ্ঞেয়তার মধ্যে সকল জ্বালা জুড়াইবার উদ্দেশ্যে সিপাহিযুদ্ধের দাবদাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা বিধাতার প্রেরণাও বলিতে হইবে, জাতির কর্মফলও বলিতে হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লর্ড ক্যানিং

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে চার্লস জন ভাইকাউন্ট ক্যানিং লর্ড ডালহাউসির পরে ভারতবর্ষের বড়লাটের পদে নিযুক্ত হন। বিলাতের বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী ও রাজনীতিক জর্জ ক্যানিঙের ইনি তৃতীয় পুত্র ছিলেন। শান্ত, ধীর, স্থির, বিনয়ী লর্ড ক্যানিং যে সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ শাসন করিতে আসিয়াছিলেন, সে সন্ধিক্ষণের উপযোগী কঠোরতা তাহাতে না থাকিলেও দৃঢ়তা ও মেধা তাহার ছিল। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ৪৪ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পরই ভারতের বড়লাট হইয়াছিলেন। এই পদ গ্রহণ করিবার সময় বিলাতের ডিরেক্টরগণ একটি ভোজে তাহার সংবর্ধনা করিয়াছিলেন। সেই ভোজের শেষে তিনি যেন ভবিষ্যৎদর্শী হইয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন—"আমি জানি না, ভারতে অবস্থার ও ঘটনার গতি কিরূপ ভাব ধারণ করিবে। তবে আমি ইহা আশা করিতে পারি এবং সেই আশার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি যে, আমরা যেন কোনক্রমে যুদ্ধের আবর্তে পতিত না হই। আমার বড় সাধ যে আমার কার্যকাল শান্তিতেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু এ কথা তো ভুলিতে পারি না যে, পৃথিবীর অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের ভারত সাম্রাজ্যে সকল মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল শান্তি বহুবিধ ঘটনার ও অদৃষ্ট-চক্রের ঘূর্ণনের উপর অধিকতর নির্ভর করে। যদিচ ভারতের নভোমণ্ডল এখনও শান্ত ও স্থির আছে, কিন্তু ইহাও আমরা ভুলিতে পারি না যে, এই শান্ত স্থির আকাশে সহসা এমন একখণ্ড কালো মেঘের উদয় হইতে পারে, যাহা প্রথম উদয়ে মনুষ্যের অপেক্ষা বৃহত্তর না হইলেও ক্রমে বর্ধিতায়তন হইয়া আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিতে পারে এবং আমাদিগকে সর্বনাশের পেষণে চূর্ণ করিবার উদ্যম করিতে পারে। যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা আবার ঘটিতে পারে। যে সকল কারণে উপদ্রবের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হয় নাই। এখনও আমাদের অধীন এমন অশান্ত, বিরক্ত, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নানা জাতির সমাবেশ আছে; এখনও আমাদের প্রতিবেশিগণ এমন উদ্ধত, এমন চঞ্চল যে সামান্যমাত্র অসতর্ক হইয়া থাকা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক হইবে না। আমাদিগের রাজ্যের সীমান্ত-রেখা এমন ভাবে অঙ্কিত যে, যে কোন সময়ে একটা বিপ্লব বিদ্রোহ ঘটিতেই পারে; বিশেষত অনেক সামন্ত রাজার সহিত আমাদের সম্বন্ধ এমন জটিল ভাবে রহিয়াছে যে, আমার শঙ্কা হয়, এত বড় সুবিস্তীর্ণ এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যে অতি শক্তিশালী শাসক সম্প্রদায় অথবা গবর্নমেন্ট তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিতিক্ষা, উপেক্ষা ও ক্ষমা প্রয়োগ করিয়াও সর্বদা শান্তি রক্ষা করিতে পারিবেন কি না।"

লর্ড ক্যানিঙের এই বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাহার বচন-মাধুর্য ও ভাব-গাম্ভীর্য দেখিয়া সকলেরই মনে হইয়াছিল যে, ভারতের শাসনভার যোগ্য হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে

তিনি সস্ত্রীক মার্সেলস হইতে যাত্রা করেন এবং ১২ই তারিখে মিশর দেশের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। মিশরে তিনি প্রায় এক মাস কাল থাকিয়া, মিশরের দর্শনীয় নানা স্থান দেখিয়া ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে তিনি বোম্বাই নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে তাহাকে ভারতের শাসনকর্তার যোগ্য সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে তিনি মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাহার পুরাতন সহতীর্থ মান্দ্রাজ গবর্নর লর্ড হ্যারিসের অতিথি হন। ফেব্রুয়ারির শেষ দিনে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছান এবং পরদিন ১লা মার্চ তারিখে যথারীতি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।

লর্ড ওয়েলেসলির সময হইতে ভারত শাসনের যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেই পদ্ধতি অনুসারেই লর্ড ডালহাউসি এবং লর্ড ক্যানিং পরিচালিত হন। ভারতের শাসন-ব্যবস্থাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম, স্বরাষ্ট্র, দ্বিতীয় পররাষ্ট্র, তৃতীয় ব্যবস্থা, চতুর্থ রাজস্ব এবং পঞ্চম সামরিক বিভাগ। বড়লাট স্বয়ং পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপাইয়া থাকেন এবং আর চারি বিভাগের ভার আর চারজন ইংরাজ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের অধীন বিভাগের কার্যাবলীর উপর স্বীয় মত ও পরামর্শ লিপিবদ্ধ করিয়া বড়লাটের সকাশে পাঠাইয়া দেন। বড়লাট সেই সকল পরামর্শ দেখিয়া একটা হুকুম দিয়া থাকেন; সেই হুকুম অনুসারেই কার্য হয়। কেবল পররাষ্ট্র বিভাগে স্বতন্ত্র ভারপ্রাপ্ত সদস্য বা সচিব না থাকাতে স্বয়ং বড়লাট যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করেন। প্রত্যেক বিভাগের এবংবিধ কাগজপত্র একাধিক বাক্সে বোঝাই হইয়া প্রত্যহ বড়লাটের নিকটে পাঠান হয়। প্রত্যেক বাক্সের দুইটি করিয়া চাবি থাকে—তাহাদিগের মধ্যে একটি বিভাগীয় সদস্যের কাছে থাকে, অপরটি বড়লাটের নিকটে থাকে। অতি গোপনে, অতি সাবধানে সকল কার্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ সকল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণের অধীন একাধিক সেক্রেটারি বা লেখক নিযুক্ত থাকেন। বিভাগ অনুসারে ইহাদিগের নামের ও পদের নির্দেশ হইয়া থাকে।

লর্ড ক্যানিং যখন ভারতবর্ষের শাসনকর্তা হইয়া আসেন, তখন মিঃ বার্নস পিকক তাহার ব্যবস্থাপক সচিব ছিলেন। ইনি একজন অতি যোগ্য, সুপণ্ডিত ব্যবহারজীবী ছিলেন, পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়া ইনি অতিশয় যোগ্যতা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বরাষ্ট্রসচিব (Home member) ছিলেন জন পিটার গ্র্যান্ট; ইনি একজন প্রাজ্ঞ পুরাতন সিবিলিয়ান, পরে বঙ্গদেশের ছোটলাটের পদ পাইয়া সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন। সামরিক বিভাগে সদস্য স্বরূপ জেনরেল লো ছিলেন। লো সেকালের সেনানী, লর্ড ডালহাউসির আমলে সিপাহিদিগের মনে কি প্রকার ভাব সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি তাহা জানিতেন না। এই সময়ে সিসিল বীডন স্বরাষ্ট্র বিভাগে, এডমনস্টোন পররাষ্ট্র বিভাগে এবং কর্নেল বর্চি সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। সিসিল বীডন ও এডমনস্টোন সূক্ষ্মদর্শী ও কার্যকুশল ছিলেন, তাহারা যে যে বিভাগের কার্যে ব্রতী ছিলেন, সেই সেই বিভাগের সমুদয় বিষয় তাহাদের অভ্যস্ত ছিল। ব্যবস্থাপকসভায় এই সময়ে সাত জন সভ্য ছিলেন। ডোরিন উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ইলিয়ট মান্দ্রাজের, লি গেট বোম্বায়ের, ক্যারি বাঙালার এবং হ্যারিংটন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন। প্রধান বিচারপতি এবং স্যর আর্থার বুলার উহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন।

এই সকল সভ্যের কেহ উদার মত কেহ বা ডালহাউসির অবলম্বিত ক্রূর মতের সমর্থন করিতেন।

হ্যালিডে এই সময়ে বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কর্তব্যপ্রিয় ও শ্রমশীল ছিলেন, কিন্তু অনুদারতা ও অব্যবস্থিততা তাহার দোষ ছিল। তিনি মুখে মিষ্ট কথা বলিয়া সকলকে তুষ্ট করিতেন, এদিকে কার্যে হলাহলের ধারা প্রবাহিত করিয়া লোকের হৃদয় কলুষিত করিয়া তুলিতেন। সংবাদপত্রের উপর হ্যালিডের বিরক্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলেও তিনি মুদ্রণস্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় কিছু কাল মুদ্রণস্বাধীনতা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, হ্যালিডে তাহার এক জন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। এইরূপ নানা কারণে সিপাহিযুদ্ধের সময়ে তিনি ভারতবর্ষীয় ইংরাজসম্প্রদায়েরও অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

লর্ড হ্যারিসের হস্তে মান্দ্রাজের শাসনভার ছিল। তিনি দয়ালু এবং গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন, তিনি সাধুতা হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, সত্যনিষ্ঠার আদর করিতেন, উৎপীড়িত প্রজাগণের দুঃখ নিবারণকল্পে তিনি সকল প্রকার কষ্টই অম্লানমুখে সহ্য করিতেন। কর্তব্য পালনকালে তিনি লোক নিন্দাকে নিন্দা বলিয়াই মনে করিতেন না। লর্ড হ্যারিসের দোষের মধ্যে দীর্ঘসূত্রতা দোষটি ২ গুরুতর ছিল।

লর্ড এলফিনস্টোন বোম্বাইয়ের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর পূর্বে এলফিনস্টোন মান্দ্রাজের শাসন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে আতিথেয়তা ও আমোদপ্রিয়তায় তিনি লোক-প্রসিদ্ধ ছিলেন। উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে এই সময়ে লেফটেন্যান্ট গবর্নর কলবিন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কলবিন প্রথমত লর্ড অকলান্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। ইহার পর তিনি টেনাসরিম প্রদেশের কমিশনার ও সদর জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। শেষে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন।

এই সকল সহচর লইয়া লর্ড ক্যানিং ভারত শাসন-কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই, ভারতবাসীকে কখনও চিনিতেন না। কিন্তু ন্যায় ও ধর্মের, পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন, এমন সংকল্প করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। লর্ড ডালহাউসি কাহারও পরামর্শ লইতেন না। তিনি স্বয়ং মেধাবী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি নিজে যাহা বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। ফলে তাহার অধীনে যাহারা কার্য করিতেন, তাহারা অনেকটা আজ্ঞাবাহী কেরানির মতোই ছিলেন। তাহারা স্বালম্বনশূন্য ছিলেন, ডালহাউসিকে পরামর্শ দিবার যোগ্যতা তাহাদিগের ছিল না। সুতরাং ইহারা কেহই ভারতের আশু বিপদে, সিপাহিযুদ্ধের তরঙ্গাভিঘাত কালে, লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় শাসনকর্তাকেও সুপরামর্শ দিবার যোগ্য ছিলেন না।

লর্ড ক্যানিং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, অযোধ্যা প্রদেশে দুইজন প্রধান ইংরাজ কর্মচারী নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া একটা গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। মিঃ কভার্লি ম্যাকসন এবং মিঃ মার্টিন গবিন্স অযোধ্যা নগরের অধঃপতনের পর সেই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই অতিশয় অযোগ্য কর্মচারী ছিলেন। উভয়েই নিজের খেয়ালমতো কার্য করিতেন। উভয়েই উভয়ের দোষানুসন্ধান করিতেন। ইহার ফলে ইংরাজি বর্ণিত নবাবী অত্যাচার অপেক্ষা শতগুণে তীব্রতর উৎপীড়ন ও উপদ্রব অযোধ্যাবাসীকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। সেই উৎপীড়নের জন্য

আর্তনাদ লর্ড ক্যানিঙের কর্ণগোচর হয়। তিনি যদি ভারতবিষয়ে অভিজ্ঞ রাজপুরুষ হইতেন, তাহা হইলে সদ্য সদ্য এই দোষের প্রতিবিধান করিতে পারিতেন। আর মনে হয় যে, সদ্য সদ্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা হইলে অযোধ্যা প্রদেশে সিপাহিযুদ্ধের অতটা তীব্রতা অনুভূত হইত না। যাহা হউক, অনেক লেখালেখি বলাবলির পর স্যর হেনরি লরেন্স ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যা শাসনের ভার প্রাপ্ত হন। স্যর হেনরি লরেন্স অযোধ্যার শাসনকর্তা হইবার দুই মাস পরেই সিপাহিযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে তাহাকে পতিত হইতে হয়।

ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার পরে লর্ড ক্যানিঙের দ্বিতীয় চিন্তা হইল পারস্যের ব্যাপার লইয়া। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ইংরাজ রাজনীতিকগণের ইহা দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, পারস্যের শাহকে কোনমতেই হিরাট অধিকার করিতে দিবেন না। কিন্তু পারস্যের শাহ হিরাট দখল করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, ক্রিমিয় যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসি বিপন্ন হইয়া রহিয়াছে, রুশ পরাজিতবৎ হইয়া আছে, তখন একদল সেনা হিরাট অধিকার করিবার জন্য পাঠাইলেন। হিরাটের শাসনকর্তা কতকটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি আসন্ন বিপদ দেখিয়া হিরাটের দুর্গ প্রাচীরের উপর ইংরাজের "ইউনিয়ন জ্যাক" রাজপতাকা উড্ডীন করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হিরাটকে ইংরাজের চক্রবর্তীত্বের অধীন রাখিলে বোধ হয় পারস্যের সেনাগণ সহসা হিরাট অধিকার করিতে পারিবে না। কিন্তু শাহের সেনা হিরাট অধিকার করিল। সেই সময়ের ইংরাজ জাতির প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টন আদেশ করিলেন যে, সেনাপতি স্যর জেমস আউটরামের অধীনতায় গোরা ও সিপাহি সেনার সম্মিলনে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করিয়া পারস্য দেশ আক্রমণ করিবার জন্য জলপথে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাহার এই আদেশ অনুসারে সেনাপতি আউটরাম দলবলসহ পারস্য রাজ্যে সাগর শাখায় উপনীত হইলেন এবং পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ইহার পূর্বেই হিরাট পারস্য রাজের দখলে আসিয়াছিল। এদিকে পাছে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ পারস্যের শাহের সহায়তা করেন, সেই শঙ্কায় পঞ্জাবের শাসনকর্তা জন লরেন্স আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁকে পেশোয়ারে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাকে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিলেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ এই সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এ সন্ধির আমি কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটাইব না।" ওদিকে সেনাপতি আউটরাম পারস্যের শাহের সেনাদলকে দুইটি সম্মুখ সমরে পরাজয় করিয়া পারস্যের রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হন। পারস্যের শাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া হিরাট নগর ও প্রদেশের উপর সকল দাবি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেন। যেদিন পারস্যের শাহ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, সেইদিন ভারত ক্ষেত্রে সিপাহিযুদ্ধের প্রথম বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

লর্ড ক্যানিঙের তৃতীয় চিন্তা সিপাহিদিগকে লইয়া। তিনি দেখিলেন যে, ইংরাজের অধিকার ব্রহ্মদেশ হইতে সিন্ধুদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত সুবিস্তৃত। এই বিশাল ভূভাগের সর্বত্র সুশাসন রাখিতে হইলে সিপাহিদিগকে সর্বত্রই পাঠাইতে হইবে। কিন্তু পূর্ব চুক্তি অনুসারে বহু সিপাহির দল সমুদ্রের পারে ব্রহ্মদেশে যাইতে অস্বীকার করে। কাজেই লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সিপাহিদিগের বিষয় লইয়া একটা নূতন আইন প্রণয়ন করেন। তাহাতে ব্যবস্থা হয় যে, কোম্পানির সেনাদলভুক্ত হইলে কোম্পানির

স্বার্থরক্ষার জন্য সিপাহিদিগকে যে দেশে প্রেরণ করার প্রয়োজন হইবে, তাহাদিগকে সেই দেশেই যাইতে হইবে। এই আইন অনুসারে সিপাহির ছয়টি নূতন দল সৃষ্ট হয়। এই ছয় জলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি উচ্চ জাতীয় হিন্দুগণ সিপাহির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিয়াছি তো, অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণের পর, গবিন্স ও জ্যাকসনের উৎপাতের সময়ে, অযোধ্যাবাসী সিপাহিদিগের মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। তাহারা লর্ড ক্যানিঙের এই নূতন আইনকে তাহাদিগের সর্বনাশের হেতু স্বরূপ মনে করিল।

লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে, বিশেষত হিন্দুস্থানে, অসন্তোষ ও বিদ্বেষ প্রজাগণের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই অসন্তোষের বহ্নিতে যে কযজন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন, আমরা সেই কয়জনের এইবার পরিচয় দিব। প্রথম, ফয়জাবাদের **মৌলবি আজিম উল্লা খাঁ**। ইনি অতিশয় মেধাবী, দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। আজিম উল্লা হিন্দি, ফার্সি, আরবি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনিই ইংরাজি ও ফরাসি ভাষাও জানিতেন। ইনি নানা সাহেবের সহচর ছিলেন এবং নানা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তথায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ক্রিমিয় যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করিয়া ফরাসি রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বিলাসের আস্বাদন পাইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইনিই প্রথম "চাপাটির" প্রচলন করেন। ইনি এ দেশের লোকের রুচিকর ও শ্রুতিমধুর গানও রচনা করিতে পারিতেন। আজিম উল্লা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত উত্তর ভারতের সকল নগরে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহার অধীনে বহু গায়ক ও গায়িকা সম্প্রদায় ছিল। তাহারা নগরে নগরে গান করিয়া নানাভাবে লোকের মন উত্তেজিত করিয়া ইংরাজবিদ্বেষ সৃষ্টি করিত। আজিম উল্লা খাঁর বুদ্ধি অনুসারে পরিচালিত হইয়া নানা ধন্দুপন্থ সিপাহিযুদ্ধের কালসমরে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন।

নানা ধন্দুপন্থ। ইনি দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের পোষ্যপুত্র ছিলেন। আজিম উল্লা খাঁ মুসলমানী ঢঙের যে কার্য করিতেন, নানা সাহেব তাহাতে হিন্দুত্বের রঙ্গ চড়াইয়া তাহা হিন্দুদিগের রুচিকর করিয়া ব্যবহার করিতেন। নানা ধন্দুপন্থ দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন; নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব, মধ্যকায় পুরুষ; স্ফুট গৌর বর্ণ, সুদৃঢ়পেশীবদ্ধ, সুঠাম সুমনোহর তাঁহার রূপ ছিল। তিনি সংযমী, সাধনশীল পুরুষ ছিলেন। তবে একটু উদ্ধত ও উষ্ণ প্রকৃতি ছিলেন। সহসা সামান্য কারণে তিনি রাগিয়া উঠিতেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই ক্রোধবহ্নি সামান্য কারণেই নির্বাপিত হইত। নানা ধন্দুপন্থের বিশেষ পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়াছি।

অযোধ্যার বেগম। ইনি টোমাসন সাহেবের জমি বন্দোবস্তের ফলে ইংরাজিবিদ্বেষিণী হইয়াছিলেন। ইনিই টোটায় চর্বি আছে বলিয়া, আর সে চর্বি অন্য কোন জন্তুর নহে—গরুর ও শূকরের, কেন না লক্ষ লক্ষ টোটায় চর্বি যোগাইতে হইলে মেষের চর্বিতে কুলায় না—ইত্যাদি কথা প্রচার করিয়া সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই বেগম্ মাথার কেশ কাটিয়া তাহারই উপঢৌকন দিয়া ভারতবাসীকে ইংরাজের বিদ্বেষী করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহারই চেষ্টায় ও উদ্‌যোগে অযোধ্যা প্রদেশ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি অতিশয় সুন্দরী ছিলেন, এবং অসামান্যা তেজস্বিনী ছিলেন। ইহার বুদ্ধি অনুসারে কার্য হইলে অযোধ্যা যুদ্ধে ইংরাজ অত অনায়াসে জয়ী হইতে পারিতেন না।

ইহাদের সহিত এক পরামর্শে সম্মিলিত ছিলেন ঝাঁসির তেজোময়ী ও গর্বময়ী রানি লক্ষ্মীবাই। বেরেলির খাঁ বাহাদুর খাঁ এই পরামর্শে প্রথম হইতেই ছিলেন এবং তিনিই বলিয়াছিলেন যে দিল্লির বাদশাহের দোহাই না দিলে সকল দিকে এবং সকল পক্ষে শুভ হইবে না। দিল্লিতেও আর এক তেজস্বিনী নারী সিপাহিযুদ্ধের হোমকুণ্ডে ইন্ধন লাগাইতেছিলেন। ইনিই বেগম জিন্নৎ মহল।

এই বিদ্বেষের ও বিপ্লবের ভাব পূর্ব হইতেই যে বহু ইংরাজ কর্মচারীর গোচর হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড ক্যানিং সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই। তিনি ধীর, শান্ত রাজপুরুষ ছিলেন, ধীরে ধীরে রাজ্যের সকল বিভাগের সকল ব্যবস্থা বুঝিয়া লইতে ছিলেন। এই বুঝাপড়ায় তাহার এক বৎসর কাটিয়াছিল। সেই এক বৎসরের শেষেই সিপাহিযুদ্ধের প্রথম বহ্নি বিকাশ হইল। এই সময়ে ইংরাজের অধীনে দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার সিপাহি সেনা ছিল; গোরা সেনা পঁয়তাল্লিশ হাজার তিন শত বাইশ জন ছিল; গোলন্দাজ সেনা সিপাহি বার হাজার এবং গোরা সাড়ে ছয় হাজার ছিল—সর্বসমেত ইংরাজের অধীনে এই সময়ে ২৯৬৮২২ জন সেনা ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার শিখ সেনা ছিল, পাঁচ হাজার গুর্খা ছিল এবং আরও কুড়ি হাজার মান্দ্রাজি তেলেঙ্গা সিপাহি ছিল। জাঠ, ডোগরা প্রভৃতি অন্য জাতীয় হিন্দু সিপাহি দশ রেজিমেন্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত রামপুরের রোহিলা, রাজপুত-মুসলমান এবং সীমান্ত প্রদেশের পাঠান ও বেলুচি সেনার দল, সর্বসমেত নয় হাজার ছিল। লর্ড ক্যানিং মনে ভাবিয়াছিলেন যে গুর্খা ও পাঠান সেনার দল আরও কিছু বাড়াইলে, জাঠ ও ডোগরা রেজিমেন্ট সংখ্যায় বর্ধিত করিলে, উগ্রবীর্য সিপাহিদিগের সহিত একটা শক্তি সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে। এই চেষ্টায়—গুর্খা রেজিমেন্ট তৈয়ারের আশায়, লর্ড ক্যানিং নেপাল দরবারের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পত্রের শেষ উত্তর পাইবার পূর্বেই সিপাহিযুদ্ধের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। পরে এই পত্রের ফল ভালই হইয়াছিল। নেপাল রাজমন্ত্রী মহাবীর জঙ্গ বাহাদুর সদলবলে আসিয়া ইংরাজের অযোধ্যা অধিকার বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

যদিচ লর্ড ক্যানিং আসন্ন বিপদের কথা বুঝেন নাই, তথাপি তিনি এমন বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ধীর, শান্ত, স্থির, দয়ালু ও তিতিক্ষাপরায়ণ লর্ড ক্যানিং পূর্বাহ্ণেই বুঝিয়াছিলেন যে লর্ড ডালহাউসির পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকেই করিতে হইবে। সেই প্রায়শ্চিত্তের তুষানল জ্বালা সহ্য করিবার সহিষ্ণুতা তাহাতে ছিল এবং সেই সহিষ্ণুতার প্রভাবেই তিনি এমন ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। মনে হয়, লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় শাসন কর্তা না থাকিলে সিপাহিযুদ্ধ দেশ বিপ্লবে পরিণত হইত; হয়ত বা উহার পরিণাম আরও ভীষণতর হইত। কথায় আছে, "যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্", বিধাতার মনে যাহাই আছে, তাহাই ঘটে; বিধির বিধানে ইংরাজ ভারতের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন, বিধির বিধানে তাহার শাসনে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, বিধির বিধানে সিপাহিযুদ্ধ এবং বিধির বিধানে লর্ড ক্যানিং ভারতের শাসনকর্তা হইয়া এই ভীষণ বিপজ্জাল হইতে ইংরাজ জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধারম্ভ

মীরট, দিল্লি ও পঞ্জাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধারম্ভ

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ভারত গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, পুরাতন বন্দুকের স্থানে নূতন "এনফিল্ড রাইফেল" নামক বন্দুক ব্যবহার করিবার জন্য সিপাহিদিগের হস্তে দিবেন। এই নূতন আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার-শিক্ষার জন্য উত্তর ভারতবর্ষের তিন স্থানে তিনটি আড্ডা তৈয়ার করা হইয়াছিল। প্রথম, দমদমা গোরাবারিক; দ্বিতীয়, অম্বালা; তৃতীয় পঞ্জাবের শিয়ালকোট। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে এই নূতন রাইফেল বন্দুকের উপযোগী অসংখ্য টোটা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেই সকল টোটা পূর্বোক্ত তিন স্থানে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হইত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে প্রেসিডেন্সি বিভাগের সেনাপতি মেজর জেনরেল হিয়ার্সে দুইখানি চিঠি ভারত গবর্নমেন্টের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সেই চিঠি দুইখানির উপর লেখা ছিল "অতি প্রয়োজনীয়"। ইহার মধ্যে একখানি চিঠি দমদমার রাইফেল শিক্ষক কাপ্তেন রাইটের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। তিনি সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "এখানকার সিপাহি সৈনিকদিগের মধ্যে টোটার চর্বির বিষয় লইয়া বড়ই বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। দুষ্ট লোকে প্রচার করিয়া দিয়াছে যে, এই টোটাসংলিপ্ত মসৃণ পদার্থ আর কিছুই নহে, গো-শূকরের সংমিশ্রিত চর্বি মাত্র। এই গুজবের একটু হেতুও আছে। এখানকার বারুদখানার একজন খালাসি দেশীয় দ্বিতীয় নম্বরের রেজিমেন্টের একজন সিপাহিকে তাহার লোটায় করিয়া জল দিতে বলে। উত্তরে সিপাহি বলে, 'তোকে আমি আমার লোটা দিব কেন, তোর জাত কি?" খালাসিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করে, 'আর জাতের বড়াই করিতে হইবে না; জাতি আর থাকিতেছে না, কেননা শীঘ্র নূতন বন্দুকের টোটা তো তোমাদিগকে দাঁতে কাটিতে হইবে—সে টোটায় যে গরু আর শূকরের চর্বি আছে।" কাপ্তেন রাইট বলেন যে, "আমি আমার আড্ডার সিপাহিদিগের সহিত কথা কহিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, টোটার এই চর্বির কথা ভারতের সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। সিপাহিরা আমাকে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, হুজুর এবার আমরা দেশে যাইলে আর আত্মীয়স্বজনের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া খাইতে পাইব না, কেননা আমাদের দেশের জাতিকুটুম্বদিগের মনে ধারণা হইয়াছে যে, এই টোটা ব্যবহার করায় আমাদের জাতি গিয়াছে।"

কাপ্তেন রাইট ইহার পর পত্রে আরও লেখেন যে, "আমি সিপাহিদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে, টোটায় চর্বি আছে বটে, কিন্তু গো-শূকরের চর্বি নহে, ভেড়ার চর্বি আর মোম উহাতে মিশ্রিত আছে। আমার এই কথায় সিপাহিরা উত্তর করিল যে, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সবই ঠিক, কিন্তু আমাদের বন্ধু-বান্ধবেরা তো আপনার কথায় বিশ্বাস করিবে না; সুতরাং আমাদিগকে পয়সা দিন, আমরা বাজার হইতে

টোটার সকল উপাদান খরিদ করিয়া আনিব এবং নিজেরাই টোটা তৈয়ার করিব; তাহা হইলে জোর করিয়া আমরা আমাদিগের বন্ধু-বান্ধবকে বলিতে পারিব যে টোটায় এমন কিছু পদার্থ নাই, যাহাতে জাতি যায়।"

দ্বিতীয় পত্রখানি মেজর বন্টিন লিখিয়াছিলেন; তিনি দমদমার ভারপ্রাপ্ত সেনানী ছিলেন। তিনি পত্রে বলেন যে, কাপ্তেন রাইটের পত্র পড়িয়া তিনি সিপাহি সেনাদলকে কুচকাওয়াজের জন্য শ্রেণিবদ্ধ করিয়া ডিপো বা আড্ডার সম্মুখে দাঁড় করান এবং তাহাদিগকে বলেন যে, তোমাদিগের কাহারও কিছু বলিবার থাকে তো এই সময়ে বল। মেজব সাহেবের এই কথা শুনিয়া সেই শ্রেণিবদ্ধ সিপাহির দল হইতে প্রায় বার আনা অংশ সিপাহি দল ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। ইহাদিগের মধ্যে দেশীয় সেনানী পদবীর সকলেই ছিলেন। ইহারা সকলেই বিনীতভাবে টোটার চর্বির বিষয়ে আমাকে তাহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিল। তাহারা বলিল যে, যেভাবে চর্বি মিশ্রিত করিয়া টোটা তৈয়ার হইতেছে তাহাতে সেইসকল টোটা ব্যবহার করিলে তাহাদিগের জাতি যাইতে পারে, সুতরাং তাহারা প্রার্থনা করে যে, মোম ও তৈল অথবা মেষের চর্বি দিয়া তাহারা নিজেরাই টোটা তৈয়ার করিয়া লইবে, এইরূপ অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া হউক।

সেনাপতি হিয়ার্সে এই দুইখানি পত্র দেখিয়া রাইফেল ডিপোর কর্তৃপক্ষকে বলিয়া পাঠান যে, সিপাহিরা যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছে, তদনুসারেই কার্য হউক; সিপাহিদিগকে টোটা মসৃণ করিবার জন্য স্বতন্ত্র পয়সা দেওয়া হউক, তাহারা বাজার হইতে তৈল ও মোম খরিদ করিয়া নিজেরাই নিজেদের টোটা মসৃণ করিয়া লইবে। সেনাপতি হিয়ার্সের এই ব্যবস্থা ভারত গবর্নমেন্ট সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিলেন এবং ভারতের সর্বস্থানেই সিপাহিদিগের জন্য টোটা তৈয়ারির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়া গেল।

ইতোমধ্যে বারাকপুরের সিপাহি সেনানিবাসের মধ্যে বিপ্লবের লক্ষণ পরিস্ফুট হইল। বারাকপুর দক্ষিণ বাংলার প্রধান সেনানিবাস। এইখানে এই সময়ে দুই নম্বরের গ্রিনেডিয়ার সেনা, ৩৪ নম্বরের সিপাহি পদাতি, ৪৩ নম্বরের সিপাহি পদাতি এবং ৭০ নম্বরের সিপাহি পদাতি বিন্যস্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত গোরা সেনাও অনেক ছিল। ইহাদিগের অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার চার্লস গ্রান্ট। আর, প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিভাগীয় সেনাপতি ছিলেন জন হিয়ার্সে। সেনাপতি হিয়ার্সে অশ্বারোহী সেনাদলের দলভুক্ত একজন তেজস্বী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি সিপাহিদিগের সহিত তাহাদিগের দেশীয় ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতির সকল সমাচার অবগত ছিলেন। ২৪শে জানুয়ারি তারিখে (১৮৫৭ খ্রিঃ অঃ) সেনাপতি হিয়ার্সে কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠান যে, সিপাহিদিগের মনে এই দুষ্ট ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল যে, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে জোর করিয়া খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবেন। তিনি অনুমান করেন যে এই দুষ্ট সমাচার কলিকাতার হিন্দু ধর্মসভার পক্ষ হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। কলিকাতার ধর্মসভায় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব, বাবু খেলাৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বাঙালি সমাজের অধিনায়কগণই ছিলেন। গবর্নমেন্ট পরে তদন্ত করিয়া জানিয়াছিলেন যে এই ধর্মসভার সহিত সিপাহিদিগের কোন সংস্রব ছিল না, ইহা কেবল রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদ করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে ইংরাজিশিক্ষিত বাঙালি যাহাতে সহসা খ্রিস্টান

না হয়, সে পক্ষে ধর্মসভার দৃষ্টি ছিল। সেই সময়ে বিধবা-বিবাহের আন্দোলনও খুব চলিতেছিল। ধর্মসভা বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। জেনারেল হিয়ার্সের শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন যে, রানিগঞ্জে একজন সার্জেন্টের বাঙ্‌লা বারাকপুরের গোরাবারিকের মধ্যে তিনটি বাঙ্‌লা এবং টেলিগ্রাফ অফিস সহসা ভস্মসাৎ হইয়াছে—সুতরাং ধর্মসভার লোক এ পক্ষে আছেই।

যেদিন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ব্যবস্থা করিলেন যে সতীদাহ প্রথা ইংরাজ অধিকারে আর প্রচলিত থাকিবে না, সেইদিন হইতেই বিধবা-বিবাহের সম্ভাবনার সূচনা হইয়াছিল। সে সূচনা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্‌যোগে বিধবা-বিবাহের আইনে পরিণত হয়। এই আইন, দেশের সর্বত্র ইংরাজি স্কুলের প্রতিষ্ঠা, রেল, টেলিগ্রাফ, ইংরাজের শাসনপদ্ধতি ও বিচারপদ্ধতি হিন্দু সমাজকে বিচলিত করিয়াছিল। এই বিচলিত অবস্থায় ইংরাজ গবর্নমেন্টের শত্রুগণ টোটার চর্বির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, এই টোটা কাটিলেই জাতি নষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে জাতিনাশ পূর্ণ পাতিত্যের পরিচায়ক, অর্থাৎ দ্বিজাতির পক্ষে জাতিনাশ চণ্ডালতার হেতু। এই চণ্ডালতা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এই উদ্বেগ এবং বিপ্লবের ভাব গবর্নমেন্টকে বুঝাইবার জন্যই বাংলার বহু স্থানেও গোরাবারিকে গৃহদাহ সংঘটিত হইয়াছিল!

লর্ড লরেন্স দিল্লির বাদশাহের বিচার বিষয় লিখিতে লিখিতে ভোজপুরের এক রাজপুত সিপাহির কথা লিখিয়াছেন। এই জমাদার সিপাহিযুদ্ধেব সময়ে ছুটি লইয়া নিজ বাটীতে গাজীপুর জেলায় বাস করিতেছিল। সিপাহিযুদ্ধের সময় তাহার গ্রামের নিকটের নীলের কুঠিতে সে এবং তাহার আর দুইটি ভাই চাকরি করিত এবং যুদ্ধের সাত মাসকাল সাহেবের অশেষবিধ সহায়স্বরূপ হইয়াছিল। সিপাহিযুদ্ধের অবসানের সময়ে সে নিজের রেজিমেন্টে ফিরিয়া আসিতেছিল। পথে লর্ড লরেন্সের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। লর্ড লরেন্সের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি বলেন যে, "সাহেব তোমায় বলিব কি, আমাদের গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস যে, তোমরা আমাদের জাতি মারিতে উদ্যত হইয়াছ। মোগল বাদশাহেরা যেমন জয়পুর, যোধপুর স্থানের রাজপুত বাজাদিগের কন্যা ও ভগিনী কাড়িয়া আনিয়া বিবাহ করিতেন এবং রাজপুতদিগকে স্বদলভুক্ত করিয়া রাখিতেন, তাহারা যেরূপ হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া মুসলমান রাজ্য চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা পাইতেন, তোমরাও তেমনি স্বার্থের জন্য আমাদিগকে খ্রিস্টান করিতে চাও। এ কথা তো সকল বুদ্ধিমানেই বুঝিবে যে, কেবল পয়সা দিয়া, আট দশ টাকা মাসিক বেতন দিয়া তোমরা আমাদিগকে চিরকালের জন্য তোমাদের অনুগত করিয়া রাখিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তোমাদের সিপাহি হইলেও তাহারা যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ কথা তো ভুলিতে পারে না। যাহাতে তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির জাতি ও মর্যাদা রক্ষা হয়, অথচ তোমাদের জন্য কাঁচা মাথা দিতে প্রস্তুত থাকে, এ চেষ্টা তোমাদিগকে করিতে হইবেই সাহেব, এই সকল কথা আমাদের দেশের সকল লোক বলে। এ সকল কথার উত্তর আছে কি? এই সকল কথা গত পাঁচ বৎসরকাল এতদ্দেশীয় সিপাহিদিগেব মুখে মুখে চলিতেছে। তোমরা খবর নাও না জানিতে পার যদি, এই পর্যন্ত।"

এদিকে সেনাপতি হিয়ার্সে সিপাহিদলের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব প্রবল দেখিয়া একটি তদন্ত কমিশন বসাইলেন। এই কমিশন বা বিচার সমিতিতে ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহারা এই টোটার চর্বির কথা নির্ধারণ করিবার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৮৫৭ খ্রিঃ অঃ) এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। অযোধ্যার ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথ পাণ্ডে প্রথমে সাক্ষ্য দেন। তিনি সাহেবদিগের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "হাঁ, আমার বিশ্বাস, এই টোটা ব্যবহার করিলে আমাদের জাতিনাশ ঘটিবে।"

প্রঃ। কেন?—তোমার এমন সন্দেহ হইবার হেতু কি?

উঃ। কাগজ নূতন রকমের। কাগজ যেন ঠিক কাপড়েরর মতো, সহসা ছিড়িতে পারা যায় না। কাগজে যে চর্বি আছে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। পুরাতন টোটা যেভাবে তৈয়ার হইত, এই টোটা সেভাবে তৈয়ারি হয় না। এই যে কোটি কোটি টোটা তৈয়ারি হইবে, ইহার জন্য যথেষ্ট মেষের চর্বি কোথায় পাওয়া যাইবে? অধিকন্তু ইহাতে কি খরচায় কুলাইবে? গো-শূকরাদির চর্বি না হইলে তোমাদের পোষাইবে কেন? বিশেষত যখন জনপ্রবাদ এই যে, টোটায় গো-শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে, তখন সে জনপ্রবাদ আমরা মানিতে বাধ্য। পুরাণে আছে, আমাদের রাজা রামচন্দ্র জনপ্রবাদ হেতুই লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাকে বর্জন করিয়াছিলেন। আর এই জনপ্রবাদ ভারতব্যাপী, সুতরাং ইহার খাতিরে আমাদিগকে টোটার ব্যবহার বর্জন করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম চাঁদ খাঁ। ইনি একজন উচ্চশ্রেণির মুসলমান। ইহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি টোটা ব্যবহার করিতে প্রস্তুত আছেন?"

উঃ। না।

প্রঃ। কেন?

উঃ। আমি টোটার কাগজ পোড়াইয়া দেখিয়াছি যে, পুড়িবার সময় উহা হইতে ঠিক চর্বি পোড়ার গন্ধ বাহির হয়। উহাতে নিশ্চয়ই চর্বি আছে। তোমরা খ্রিস্টান, তোমাদের কাছে তো অপবিত্র কিছু নাই। তোমাদের মধ্যে পবিত্র অপবিত্রের বিচার নাই। তোমরা অনায়াসে উহাতে গরু বা শূকরের চর্বি মিশাইতে পার। বিশেষত, টোটার কারখানায় উচ্চ জাতীয় মুসলমান বা হিন্দু কেহই নিযুক্ত নাই; সুতরাং অনুমান তো হইতে পারে যে, উহাতে গো-শূকরাদির চর্বি মিশ্রিত থাকিতে পারে। যখন সন্দেহ হইয়াছে, তখন উহা ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

তৃতীয় সাক্ষী সুবাদার খোদাবক্স। ইনি উচ্চপদস্থ সিপাহি সেনানী। ইনি বলিলেন, "ব্যক্তিগত হিসাবে আমার নিজের টোটা ব্যবহার পক্ষে কোন আপত্তি নাই। তবে সে টোটা আমি নিজে মসৃণ করিয়া লইব। কেন না, দেশব্যাপী জনরব হইয়াছে যে, টোটায় গো- শূকরাদির চর্বি মিশ্রিত হইয়া থাকে। আমরা সামাজিক মনুষ্য; আত্মীয় জ্ঞাতিকুটুম্ব লইয়া আমাদিগকে বাস করিতে হয়। তাহারা যে কার্যে বিরোধ উপস্থিত করিবেন, সে কার্য আমরা করিতে পারি না। আপনাদিগের চাকরি করি বটে, কিন্তু তা বলিয়া তো সমাজ-শাসন অমান্য করিতে পারিব না।"

চতুর্থ সাক্ষী জমাদার গোলাব খাঁ। ইনি স্পষ্টই বলিলেন, "আমার বিশ্বাস যে, টোটায় চর্বি মিশ্রিত হইয়া থাকে। আমি নিজে টোটা তৈয়ার করা দেখিয়াছি। সেগুলিতে অবশ্য মেষের চর্বি মিশ্রিত হইতেছিল; অন্তত কারিকরেরা আমাকে সেই কথাই বুঝাইয়াছিল।

তবে কারিকরদিগের জাতিবিচার করিয়া আমার মনে হইল যে, নিষিদ্ধ পশুর চর্বিও ইহাতে মিশ্রিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নহে।"

এই সকল সাক্ষীসাবুদ গ্রহণ করিয়া সেনাপতি হিয়ার্সে ভারত গবর্নমেন্টের নিকটে এক রিপোর্ট পাঠাইলেন। তিনি সেই রিপোর্টে লিখিলেন—"ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় সিপাহিগণের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, টোটায় নিষিদ্ধ পশু সকলের চর্বি মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা হইলেও পরিণামে ইহা বিষম দুর্ঘটনার সূচক হইতে পারে। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, সিপাহিদিগকে পুরাতন কাগজে (অর্থাৎ যে কাগজে পুরাতন টোটা তৈয়ার হইত) টোটা তৈয়ার করিবার অনুমতি দেওয়া হউক এবং উহা মসৃণ করিবার জন্য উপাদান খরিদ করিবার উদ্দেশ্যে সিপাহিদিগের হস্তে পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়া হউক।" গবর্নমেন্ট পূর্বেই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। কারণ, যে সকল টোটা তৈয়ার হইয়াছিল, তাহা খরচ করিয়া পরে গবর্নমেন্ট নূতন টোটা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। ফলে সেনাপতি হিয়ার্সের দ্বিতীয় রিপোর্ট অনুযায়ী কার্য করিতেও গবর্নমেন্ট বিলম্ব করিলেন।

সেনাপতি হিয়ার্সে রিপোর্ট পাঠাইবার এক সপ্তাহ পরে আবার গবর্নমেন্টকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন যে, "আমরা বারাকপুরে যেন বারুদের স্তূপের উপর বসিয়া আছি; অভাব কেবল একটি স্ফুলিঙ্গের।" ৩৪ নং রেজিমেন্টের একজন জমাদার সেনাপতি হিয়ার্সকে এই আশু বিপদের সমাচার দিয়াছিল। সে বলে যে, কমিশন বসিবার দুই দিন পূর্বে দুই তিনটি সিপাহি তাহাকে সঙ্গে করিয়া "প্যারেড" ভূমিতে লইয়া যায়। সেখানে সকল রেজিমেন্টের বাছা বাছা সিপাহিগণ মাথায় ফেটা বাঁধিয়া দাড়ির উপর গামছা জড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদিগের কেবল নাক ও চক্ষু দেখা যাইতেছিল। আত্মগোপনের জন্য তাহারা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা জমাদারকে তাহাদিগের দলে মিলিতে বলে। তাহারা বলে যে ধর্মের জন্য আমরা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিব; (১৮৫৭ খ্রিঃ অঃ) আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা বারাকপুর লুঠ করিয়া ইংরাজ মাত্রকেই খুন করিব, ধর্ম ও জাতি রক্ষার জন্য তুমিও আমাদের দলে এস।"

জমাদারের এই সকল কথা বর্ণনা করিয়া সেনাপতি হিয়ার্সে গবর্নমেন্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, দেশীয় সিপাহি সেনানিগণ সিপাহিদিগকে শাসনে রাখিতে পারিতেছে না, শাসনে রাখিবার চেষ্টাও করিতেছে না। তাহারা সিপাহির দল হইতে তফাত থাকিতেছে; ভাবিতেছে যে এইরূপ সংস্রবশূন্য হইয়া থাকিলে তাহারা নিন্দার হাত হইতে এড়াইবে। কথাও তো ঠিক; সিপাহিরাও যে জাতীয়, তাহাদিগের হাবিলদার সুবাদার জমাদারও তো সেই জাতীয়—তাহারা কি জাতি ছাড়িয়া থাকিতে পারে? এই জন্যই স্যর চার্লস মেটকাফ বলিয়াছিলেন, "I expect to awake some fine morning and find that India had been lost to the English Crown." (অর্থাৎ, আমার মনে হয় যে কোনদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হয়তো আমাকে দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে।)

সেনাপতি হিয়ার্সে কেবল পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাহার অধীন সকল সিপাহিদলের সেনাগণকে "প্যারেড" ভূমিতে আনাইয়া হিন্দি ভাষায় একটি বক্তৃতা শুনাইয়া দিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া সিপাহিদিগকে বলিলেন যে, "ধর্মপ্রচার করিবার জন্য আমরা এ দেশে আসি নাই; সুতরাং তোমাদের ধর্মে বা জাতি বিচারে আমরা কখনই হস্তক্ষেপ করিব না। আমাদের ধর্ম পুস্তকের ধর্ম, জোর জবরদস্তির নহে। অর্থাৎ আমাদের বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়া যে আমাদের ধর্মের প্রতি আস্থাবান হইবে, সেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। বিশেষত আমরা "প্রটেস্টান্ট" খ্রিস্টান; যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি সাবালক হইয়া লিখিতে পড়িতে জানিয়া আমাদের ধর্মমত ভাল করিয়া বুঝিয়াছে ও আয়ত্ত করিয়াছে, আমরা কেবল তাহাকেই খ্রিস্টান করিয়া থাকি। তোমাদিগকে খ্রিস্টান করিলে আমাদিগেব কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই যে গুজব উঠিয়াছে যে. গো-শূকরাদির চর্বিমিশ্রিত টোটা দাঁত দিয়া ছিঁড়াইয়া আমরা তোমাদিগকে খ্রিস্টান করিব, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।"

সেনাপতি হিয়ার্সে এই বক্তৃতা করিয়া ভাবিলেন যে তিনি সিপাহিদিগকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন। বাস্তবপক্ষেও সিপাহিদিগের সেনানিগণ তাহার বক্তৃতায় তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, কেবল বারাকপুরের সেনা নিবাসকে শান্ত করিলে চলিবে কেন? একদিকে ভারত গবর্নমেন্ট স্থবির হইয়া আছেন, কোন কার্যই করিতেছেন না; অন্য দিকে ভারতের নানা স্থান হইতে বিপ্লবসূচক সমাচার আসিতে লাগিল। ফলে সেনাপতি হিয়ার্সের তুষ্টিব সঙ্গে সঙ্গেই বহরমপুরে উপদ্রবের সমাচার বারাকপুরে আসিয়া পৌছিল।

বারাকপুর হইতে মুর্শিদাবাদ প্রায় এক শত মাইলের ব্যবধান। মুর্শিদাবাদে বাংলার নবাব নাজিমের রাজধানী ছিল বলিয়াই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহরমপুরে সেনানিবাস তৈয়াব করিতে বাধ্য হন। এই বহরমপুরের সেনাবারিকে ১৯ নম্বরের দেশীয় সেনার রেজিমেন্ট, একদল খুচরা অশ্বারোহী এবং দুইটি কামান ও তদুপযোগী দেশীয় গোলন্দাজ ছিল। টোটায় চর্বি দেওয়ার খবর বহরমপুরেও গিয়াছিল। কর্নেল মিচেল বহরমপুরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ হাবিলদার কর্নেল মিচেলকে জিজ্ঞাসা করে যে; "সাহেব এ সকল খবর কি? তোমরা নাকি আমাদের জাতি মারিবার জন্য টোটায় গো-শূকরাদির চর্বি মিশাইতেছ?" ইহার পাল্টায় কর্নেল মিচেল হাবিলদারকে বলেন, "তুমি কি এ কথায় বিশ্বাস কর?" হাবিলদার নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেল। ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৪নং সিপাহি রেজিমেন্টের একদল বহরমপুরে যাইয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে পাইয়া বহরমপুরের দেশীয় সেনাগণ টোটা ও চর্বির কথা জিজ্ঞাসা করে। চৌত্রিশ নম্বরের সেনাদলের সিপাহিদিগের নিকট হইতে ইহারা যে উত্তর পায়, তাহাতে তাহাদের মনে সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। পরদিন যখন কর্নেল মিচেল হুকুম দিলেন যে তোমরা "প্যারেড" ভূমিতে যাইয়া টোটা-ব্যবহার শিক্ষা কর, তখন সিপাহিরা তাহাতে প্রকাশ্যভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। কেননা, তাহারা স্পষ্টই বলিল যে, টোটা তাহারা স্বয়ং প্রস্তুত না করিলে উহা ব্যবহার করিবে না। এই সমাচার পাইয়া কর্নেল মিচেল এডজুটেন্টসহ লাইনের মাঠে গেলেন এবং দেশীয় সেনানিবর্গকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে এই সকল টোটা এক বৎসব পূর্বে সাত নম্বর দেশীয় পদাতি

সেনার দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল; ইহা ব্যবহার করিলে তাহাদের জাতি যাইবে না; তাহারা যদি ইহা ব্যবহার না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই সময় কর্নেল সাহেবের চারি পার্শ্বে অনেক সিপাহি আসিয়া জমা হইল এবং একটা কলরব করিয়া উঠিল। সাহেব এই গোলমালের উপর নিজের গলা চড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন যে, "তোমরা যদি এই টোটা না ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে ব্রহ্মদেশে বা চীনদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে; সেদেশে যাইলেই তোমাদিগকে মরিতে হইবে; কাল সকালে আমি এই টোটা তোমাদিগকে বিতরণ করিব, যে এই টোটা গ্রহণ না করিবে তাহাকেই হয় জেলে দিব, নয় দেশান্তরিত করিব।"

এই হুকুম প্রচার করিয়া কর্নেল মিচেল নিশ্চিন্ত মনে নিজের বাঙ্‌লায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি দুইটি ভ্রম করিলেন—প্রথম, চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের যে সিপাহির দল বহরমপুরে আসিয়াছিল, তাহারা টোটার চর্বির বিষয়ে কি সংবাদ দিয়াছিল, সে সমাচার তিনি রাখেন নাই। সেনাপতি হিয়ার্সের প্রতিষ্ঠিত তদন্ত কমিশনে উল্টা ফলই ফলিয়াছিল। সাক্ষীদিগের জবানবন্দি সিপাহিগণ বেদবাক্যের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের কথার কোন খণ্ডন হয় নাই বলিয়াই কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর সরকারপক্ষ হইতে দেওয়া হয় নাই বলিয়াই সিপাহিগণ ভাবিয়াছিল যে, উত্তর থাকিলে সরকারপক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হইত—এ সকল কথার যে উত্তর নাই। বিশেষত যখন সেনাপতি হিয়ার্সে হুকুম দিলেন যে, সিপাহিগণ তাহাদের ব্যবহার্য টোটা মসৃণ করিবার জন্য নিজেদের মনোমত পদার্থ ব্যবহার করিবে, তখন সিপাহিগণ ভাবিল যে, তবে বুঝি অন্য টোটায় গো-শূকরাদির চর্বি আছে, নহিলে কোম্পানি বাহাদুর এরূপ হুকুম দিবেন কেন। উপরন্তু, যখন কর্নেল মিচেল বলিলেন যে এ টোটা এক বৎসরের পূর্বেকার তৈয়ারি এবং সাত নম্বরের দেশীয় রেজিমেন্টের দ্বারা তৈয়ারি, তখন সিপাহিরা বুঝিল যে, তবে বুঝি অন্য টোটায় গো-শূকরাদির চর্বি মিশ্রিত আছেই। কর্নেল মিচেল এই সকলের কোন সমাচারই রাখেন নাই। তাহার দ্বিতীয় ভ্রম, সিপাহিদিগের নিকট ব্যর্থ তেজ দেখান: সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়াছিল; ধর্মভয়ে, জাতিনাশ ভয়ে তাহারা জ্ঞান হারাইয়াছিল; এমন অবস্থায় চীন ও ব্রহ্মদেশে তাহাদিগকে পাঠাইবার ভয় দেখান ভাল হয় নাই। ভয় দেখাইয়া বরং তাহাদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এ পক্ষে তিনি হাতে হাতেই ফল পাইয়াছিলেন।

রাত্রিকালে সাহেব নিজের বাঙ্‌লায় শয়ন করিয়া আছেন। ঘোর নিশীথ সময়, দ্বিযামা অতীত; দূরে সেনাবারিকের অগ্নিকোণে সহসা জয়ঢাকের শব্দ হইল। আর সেই সঙ্গে একটা ভীষণ কলরব উত্থিত হইল। এই কলরবে এবং ঢক্কানাদে কর্নেল মিচেলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শব্দ শুনিয়াই ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কর্তৃপক্ষকে পরে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লেখেন—"আমি তৎক্ষণাৎ পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়া আমার এডজুটেন্টের বাসস্থানের দিকে চলিয়া গেলাম। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাকে বলিলাম যে, যত সেনানায়ক আছে, যেন সকলকে তিনি আমার বাসভবনের সম্মুখে চুপে চুপে ডাকিয়া আনেন। আমি তৎপরে সওয়ার বারিকের কর্তা কাপ্তেন আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও তাহাকে বলিলাম যে, তাহার সকল অশ্বারোহী সেনা লইয়া তিনি সেনানিবাসের মাঠের দক্ষিণ দিকে যেন আসিয়া উপস্থিত

হন। তৎপরে আমি গোলন্দাজদিগের বারিকের দিকে যাইয়া তোপ দুইটি ও তাহার উপযোগী গোলা বারুদ সংগ্রহ করিয়া এক দল গোলন্দাজ সেনার সহিত তাহাদিগকে অশ্বারোহী সেনাদলের বামভাগে রাখিয়া আসিলাম। এই সময়ে আমি এডজুটেন্টের বাসার দিকে ঘুরিয়া যাইতেছিলাম, পথে ড্রিল হাবিলদারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; দেখিলাম হাবিলদারও এডজুটেন্টের বাসার দিকে ছুটিতেছে। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপারখানা কি? এত গোলমাল কিসের?" সে বলিল যে রেজিমেন্টের সিপাহিরা অস্ত্রাগার (bells of arms) ভঙ্গ করিয়া জবরদস্তি তাহাদের নিজ নিজ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে এবং বন্দুকে টোটা গাদিয়া লাইনের মাঠে যাইয়া জমায়েত হইয়াছে। আমি এই কথা শুনিয়া আমার অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সেনাদলকে ঠিক করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া সিপাহিদলের সেনানিদিগকে সঙ্গে লইয়া লাইনের মাঠে উপস্থিত হইলাম। আমি সেখানে যাইয়া দেখি যে, সিপাহিরা কেবল ধুতি পরিয়া নগ্নদেহে বন্দুক ধারণ করিয়া শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ও চিৎকার করিতেছে। আমাকে দেখিয়া জনকয়েক লোক সেই সিপাহি শ্রেণি হইতে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এক পদও অগ্রসর হইবেন না, আমাদের সব বন্দুক গাদা; অগ্রসর হইবেন না, অগ্রসর হইলে যদি কেহ বন্দুক ছোড়ে তবে আপনার প্রাণহানি হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া আমি আমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। কামান দুইটিতে ছোট ছিটা গুলি ঠাসিতে বলিলাম এবং সিপাহির দলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাখিতে বলিলাম। পরে জনকয়েক অশ্বারোহীকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সিপাহির দলের দিকে অগ্রসর হইলাম। কতকদূর অগ্রসর হইয়াই সেনানীদিগকে আহ্বান করিবার ভেরি রব করিতে বলিলাম। এই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া জনকয়েক সুবাদার ও জমাদার আমার নিকটে আসিল এবং আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ উৎপাত উপদ্রব কেন?" তাহারা নানারূপ ছল করিয়া নানা কথা কহিল। আমি সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলাম—'তোমার সিপাহির দল যদি অস্ত্রত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পক্ষে মঙ্গল হইবে না। তাহাদিগকে শীঘ্রই অস্ত্রত্যাগ করিতে বল।' আমার কথা শুনিয়া দেশীয় সেনানীগণ বলিলেন, "যতক্ষণ তোপ ও অশ্বারোহী সেনা তাহাদিগের সম্মুখে থাকিবে. ততক্ষণ তাহারা অস্ত্রত্যাগ করিবে না; আপনি গোলন্দাজ সেনা ও অশ্বারোহী সেনাদিগকে নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া যাইতে হুকুম দিন, দেখিবেন সকল সিপাহিই ধীরে ধীরে তাহাদের বারিকে ফিরিয়া যাইবে।

রাত্রি তখন তিনটা। শীতে, কুয়াশায় সকলেই কাঁপিতেছিলেন। কর্নেল মিচেল তাঁহার অধীন সিপাহিদিগকে সাতিশয় ভালবাসিতেন। তাহাদিগের উপর কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা তাহার অভিপ্রেত ছিল না। তাই তিনি দেশীয় সেনানীদিগের কথা অনুসারে তোপ, গোলন্দাজ সেনা ও অশ্বারোহীর দলকে সরাইয়া দিলেন; আর অমনি সিপাহিগণও একটি একটি করিয়া নিজেদের বারিকে চলিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে সিপাহি রেজিমেন্ট সকল শান্তভাবে "প্যারেড" করিতে আসিল এবং সেনানীগণের কথামত কার্য করিতে লাগিল। কর্নেল মিচেল সিপাহিদিগের কুচকাওয়াজ দর্শন করিয়া সামরিক বিধি পদ্ধতির দুই এক স্থান তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন। সিপাহিরা যথারীতি ইংরাজ রাজকীয় ধ্বজার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

কর্নেল মিচেলের এই কার্যে সেই সময়ের সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী দোষ দেখিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন সেই ঘোর নিশাকালে তোপের মুখে সিপাহিদিগকে উড়াইয়া দিলেই ঠিক হইত। কর্নেল মিচেল তাহা না করিয়া দুর্বলতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল অভিযোগের উত্তরে কর্নেল মিচেল বলেন যে, আমার অধীন তখন গোলন্দাজ ও অশ্বারোহীর দল মোট দুই শতের অধিক ছিল না; সিপাহি আট শতের অধিক ছিল। এই গোলন্দাজ ও অশ্বারোহীর দল সিপাহিদিগের একজাতীয় ও একদেশীয় ছিল। জাতিনাশের শঙ্কায় উহারাও সিপাহিদিগের সহিত সমভাবে উত্তেজিত হইয়াছিল। তোপ দাগিবার হুকুম দিলে তাহারা যদি সে হুকুম না শুনিত, তাহা হইলে সেই রাত্রিতেই বহরমপুরের সকল ইংরাজই প্রাণ হারাইত।

ম্যালিসন ও ফরেস্ট উভয়েই তাহাদের ইতিহাস গ্রন্থে কর্নেল মিচেলের কার্যের সমর্থন করিয়াছেন। ম্যালিসন সাহেব বলেন যে, মিচেলের অধীন অশ্বারোহীর দল সর্ব প্রথমে ইংরাজের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লবকারীদিগের সহিত মিলিয়াছিল, সুতরাং অনুমান হয় যে তাহাদিগকে সিপাহির দল আক্রমণ করিতে বলিলে তাহারা হুকুম মানিত না। যাহা হউক, এই কারণেই পরে মিচেল সাহেবকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল, অথবা বড়লাটের হুকুমে পদচ্যুত হইতে হইয়াছিল।

বহরমপুরের এই উপদ্রবের সমাচার ৪ঠা মার্চ (১৮৫৭ খ্রিঃ অঃ) তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিল। গবর্নমেন্ট বুঝিলেন যে, ইহাই বিপ্লবের সূচনা। শীঘ্র শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান না করিলে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সেই সময়ে কলিকাতা হইতে দানাপুর পর্যন্ত তিন শত মাইল ব্যবধানের মধ্যে একদলও গোরা সেনা ছিল না। তাই বড়লাটের আদেশ অনুসারে একখানি ডাকের স্টিমার তৎক্ষণাৎ রেঙ্গুনে প্রেরিত হইল এবং ৮৪নং গোরা রেজিমেন্টকে ফেরত ডাকে কলিকাতায় আনিবার ব্যবস্থা করা হইল।

এদিকে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে সিপাহিদিগের মধ্যে একটা অশান্তির ভাব পরিলক্ষিত হইল। ১০ই মার্চ তারিখে সন্ধ্যার সময়ে ২নং সৈনিক দলের কয়েক জন সিপাহি উইলিয়াম দুর্গে পাহারা দিতেছিল। টাকাশালার পাহারার ভার সেই সময়ে ৩৪নং সিপাহিদিগের উপর অর্পিত ছিল। সন্ধ্যার সময়ে ২নং দলের দুই জন সিপাহি টাকাশালার দ্বারে আসিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। সুবাদার তখন আপনাদিগের কার্যসংক্রান্ত একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন, সিপাহি দুইজন তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল যে, তাহারা কেল্লা হইতে আসিয়াছে। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে কলিকাতার সিপাহিরা কেল্লার সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইবে। সুবাদার যদি আপনার দল লইয়া তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হন, তাহা হইলে গবর্নমেন্টের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করা সহজ হইবে। সুবাদার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বন্দি করিতে আদেশ দেন। আদেশ প্রতিপালিত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সুবাদার এই দুই জন সিপাহিকে বন্দিভাবে দুর্গে পাঠাইয়া দেন। দেশীয় সেনানীগণ সামরিক বিধান অনুসারে তাহাদিগের বিচার করেন। সে বিচারে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাহাদিগের প্রতি চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। এই দণ্ড সমর্থন করিবার ব্যপদেশে প্রধান সেনাপতি লিখিয়াছিলেন যে, "ইহাদের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড যোগ্যদণ্ড হইত; কেননা, ইহারা সামরিক বিধান অনুসারে যে অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র পর্যাপ্ত

দণ্ড; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহারা যোদ্ধা; মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা চৌদ্দ বৎসর কারাবাস ইহাদের পক্ষে ভীষণতর দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর মনে হয়, ইহাদের প্রতি ভারতের কোন যোদ্ধাই অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন না।"

দ্বিতীয় নম্বর রেজিমেন্টের বিচারের জন্য যাহারা সামরিক বিচারপতি বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাহারা বারাকপুর ত্যাগ করিবার পর সেনাপতি হিয়ার্সে বারাকপুরের সকল দেশীয় সিপাহির দলকে প্যারেড ভূমিতে আহ্বান করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :

"তোমরা কলিকাতার সকল সমাচার জানিয়াছ; অপরাধীদের প্রতি যে ভীষণ দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তাহা তো জানিতে পারিয়াছ। আশা হয়, এখন তোমরা সাবধান হইবে। জানিও, যাহারা তোমাদিগকে এমন দুষ্ট পরামর্শ দিয়া থাকে, সে কেবল তাহারা তোমাদের এবং তোমাদের আত্মীয় স্বজনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, এমন নহে—তোমাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে, তোমাদের বীরত্ব-বৈভবে এমন একটা দুরপনেয় গ্লানির ও কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়, যাহাতে চিরকাল তোমরা মনুষ্য সমাজে ঘৃণ্য হইয়া থাক। তোমাদের ন্যায় বীরবর্গের জাতীয় ধর্মের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিতে আমরা কখনই পশ্চাৎপদ হইব না। জানিও টোটার কাগজে চর্বি মিশাইয়া তোমাদের ধর্মহানি করিবার হীনতাটুকু আমরা কখনই অবলম্বন করিব না।"

এই বলিয়া সেনাপতি হিয়ার্সে তাঁহার পকেট হইতে মহারাজ গোলাব সিংহের দত্ত সোণার তবকে মোড়া "খরিতা" বাহির করিয়া তাহার কাগজখানি দেশীয় সেনানীবর্গের হস্তে অর্পণ করিলেন। সে কাগজ অতি চিক্কণ ছিল। এই পত্র দেখাইয়া সেনাপতি হিয়ার্সে বলিলেন—"দেখ দেখি, কেমন কাগজ। এত মসৃণ, এত চিক্কণ কাগজ চর্বি দিয়া না মাড়িলে প্রস্তুত হইতে পারে না। এই কাগজ মহারাজ গোলাব সিংহের মুন্সীগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে তোমার টোটার কাগজের সহিত মিলাইয়া তুলনা করিয়া দেখ দেখি; দেখিবে টোটার কাগজ এত মসৃণ নহে। কেবল তোমরাই কেন দেখিবে, তোমাদিগের সিপাহিদিগকেও দেখাও। যাহার চক্ষু আছে, হাত আছে, তাহারাই এই উভয় কাগজের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। তোমাদের মধ্যে যে সকল ডোগরা ব্রাহ্মণ রাজপুত গোরক্ষার জন্য এতই অধীর হইয়া থাকেন, তাহারা এইরূপ সুমসৃণ কাগজে নিঃসঙ্কোচে লিখিতে পারেন কি? যাহারা এই কাগজ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহারা অনায়াসে টোটার কাগজও ব্যবহার করিতে পারেন।"

আবেগের মুখে সেনাপতি হিয়ার্সে বলিয়া ফেলিলেন যে, এই টোটায় চর্বি থাকায় সন্দেহ করিয়া বহরমপুরে ১৯ নম্বরের দেশীয় পদাতি সেনার দল গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। গবর্নমেন্ট তাহাদের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন এবং ১৯ নম্বর সিপাহির দলকে বারাকপুরে আনিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন, ওই সিপাহির দল বারাকপুরে আসিয়া পৌঁছিলে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে এবং তাহাদিগের নাম সমর বিভাগের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। এই সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার ভার সেনাপতি হিয়ার্সের উপরেই অর্পিত হইয়াছে। আর বোধহয় নিরস্ত্র করিবার পর, ইহাদিগকে দলচ্যুত করিবার সময় বিভাগীর সকল গোরা সেনা—অশ্বারোহী, পদাতি,

গোলন্দাজ, সে দৃশ্য দেখিবার জন্য সমবেত হইবে। পূর্বে মিরাটে পুরাতন ৩৪নং সিপাহির দল যে ভাবে দলচ্যুত হইয়াছিল, ইহারাও সেইভাবে দলচ্যুত হইবে।

সেনাপতি হিয়ার্সে আরও বলিলেন—আমি তোমাদিগকে এই সমাচার পূর্বাহ্ণেই দিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের এবং গবর্নমেন্টের শত্রুগণ সমাচার রটাইয়াছে যে, ইংরাজ গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সেনা তোমাদিগকে সহসা আক্রমণ করিবার জন্য এখানে পাঠান হইবে। বস্তুত ইহা সত্য নহে। আমি যতক্ষণ না হুকুম দিব, ততক্ষণ একটি গোরাও এখানে আসিতে পারে না। আর, আমি এমন হুকুম প্রচার করিবার পরই তোমাদিগকে সে সমাচার দিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; তাই ১৯নং সিপাহি রেজিমেন্টের দলচ্যুতির সমাচার গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রচারিত হইবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিলাম।

এই বলিয়া সেনাপতি হিয়ার্সে অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে সিপাহিশ্রেণির সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সিপাহিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের বক্ষস্থিত পদক ও "ক্রস" প্রভৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "যে বীর এই সকল অর্জন করিতে পারে, সে জানে তাহাদের জাতিধর্ম কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয় এবং তাহাদের জাতিধর্ম রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীর সকল জাতিই উদ্‌যোগী হইতে বাধ্য। তোমরা এমন কোন অপরাধ কর নাই বা করিতে পার না, যাহাতে তোমাদিগকে দণ্ডের আশঙ্কা করিতে হয়।" এই সকল কথা বলিয়া এবং অন্যভাবে মুসলমান সিপাহিদিগকে শান্ত করিয়া সেনাপতি হিয়ার্সে প্রাতঃকালে প্যারেডের কার্য শেষ করিলেন।

ইহার দুই দিন পরে রেঙ্গুন হইতে ৮৪ নম্বরের গোরা রেজিমেন্ট কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। গবর্নমেন্টের আদেশ অনুসারে ইহাদিগকে একেবারে চুঁচুড়ার গোরাবারিকে রাখা হইল। ওদিকে বহরমপুর হইতে ১৯ নম্বরের সিপাহি সেনাদলকে বারাকপুরে আনিবার আদেশ বহরমপুরে পাঠান হইল। কিন্তু ইত্যবসরে বারাকপুরের প্যারেড ভূমিতে সিপাহি যুদ্ধের প্রথম শোণিতপাত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মঙ্গল পাঁড়ে—সেনা-নিরস্ত্রীকরণ

৮৪নং ইউরোপীয় সেনাদল ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে চুঁচুড়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বারাকপুরে সিপাহি সেনাদল শুনিল যে, এই গোরা সেনার দল তখনও জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছে; কলিকাতা হইতে তাহারা বারাকপুরে আগমন করিবে এবং সম্ভবত সিপাহি সেনাদলের দর্প চূর্ণ করিবে গোরা সেনাদলের সাহায্যে ইংরাজ সিপাহিদিগকে দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে বাধ্য করিবে। এই সংবাদ সত্য না হইলেও ইহার ফলে বারাকপুরের সিপাহিরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ২৯শে মার্চ রবিবারে এই সংবাদ সিপাহিদিগের কর্ণগোচর হয়। রবিবারে সিপাহি সেনাদলের ইংরাজ অধিনায়কবর্গ যথারীতি বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং কেহই সিপাহিদিগের উত্তেজনার সমাচার রাখিলেন না। সিপাহিরাও দণ্ডে দণ্ডে অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল।

এই দিবস অপরাহ্নকালে সিপাহি সেনাদলের একজন অধস্তন কর্মচারী ৩৪নং সিপাহি সেনাদলের এডজুটেন্ট লেফটেনান্ট বগের আবাসে গমনপূর্বক তাহাকে জ্ঞাপন করিল যে, মঙ্গল পাঁড়ে নামক জনৈক সিপাহি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে এবং সার্জেন্ট-মেজরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইয়াছে। লেফটেনান্ট বগ এই সংবাদ শুনিবামাত্র রণবেশে সজ্জিত হইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া মঙ্গল পাঁড়ের দমনার্থ অশ্বারোহণে বাহির হইলেন।

মঙ্গল পাঁড়ে এই দিবস অধিক পরিমাণে ভাঙ খাইয়াছিল। মত্তাবস্থায় সে শুনিতে পায় যে গোরা সেনার দল বারাকপুরে আসিতেছে। তখন সে সিপাহিদিগের আশু বিপদাশঙ্কা করিয়া তরবারি ও পিস্তল গ্রহণ করিল। উন্মত্তভাবে ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে সে সিপাহিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তাহাদিগের সম্মুখে ভয়ানক সময় উপস্থিত, ইংরাজ গবর্নমেন্ট তাহাদিগের ধর্মনাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এ সময়ে অস্ত্র গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সে স্বয়ং অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছে, সিপাহি সেনাদলের সকলে যেন সেই সঙ্গে অস্ত্র গ্রহণ করে। সিপাহিরা মঙ্গল পাঁড়ের কথা শুনিল। কেহ মঙ্গল পাঁড়েকে বাধা দিল না, তাহার উপদেশ অনুসারে কার্যও করিল না। যুদ্ধের সময়ে যাহারা ভেরি ধ্বনি করে, মঙ্গল পাঁড়ে তাহাদিগের একজনকে বলিল যে, সিপাহিদিগকে সমবেত হইতে বলিবার জন্য ভেরিধ্বনি কর, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা করিল না। সেই সময়ে সার্জেন্ট-মেজর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল। কিন্তু গুলি সৈনিক কর্মচারীর গাত্র স্পর্শ করিল না।

লেফটেনান্ট বগ এই ঘটনার কথাই শুনিয়াছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মঙ্গল পাঁড়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন। লেফটেনান্ট বগকে সমাগত দেখিয়া মঙ্গল পাঁড়ে নিকটবর্তী একটি কামানের অন্তরালে গমন করিল এবং সেই স্থান

হইতে পিস্তল ছুঁড়িল। গুলি লেফটেনান্ট বগের গাত্রে লাগিল না, কিন্তু তাহার অশ্ব আহত হইল। অশ্ব পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে লেফটটেনান্ট বগও ভূপতিত হইলেন। নিমেষ মধ্যে তিনি ভূমি হইতে উঠিয়া মঙ্গল পাঁড়েকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইলেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। লেফটেনান্ট বগ তখন তরবারি নিষ্কোশিত করিয়া মঙ্গল পাঁড়ের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে সার্জেন্ট মেজর তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন। মঙ্গল পাঁড়ে অসিহস্তে উভয়কে আক্রমণ করিল। মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে উভয় সৈনিক কর্মচারীই ক্ষত বিক্ষত হইলেন। দেখিতে দেখিতে আর একজন সিপাহি বন্দুকের বাঁটের আঘাতে সার্জেন্ট মেজরকে গুরুতরভাবে আঘাত করিল, এদিকে মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে হীনবল হইয়া লেফটেনান্ট বগ পড়িয়া গেলেন। মঙ্গল পাঁড়ে আবার তরবারি উঠাইল; এই সময়ে সেখ পল্টু নামক জনৈক মুসলমান সিপাহি ত্বরিতগতিতে আসিয়া মঙ্গল পাঁড়েকে জড়াইয়া ধরিল। মঙ্গল পাঁড়ের উত্তোলিত অসি এই মুসলমান সিপাহির বাম বাহুর উপর পতিত হইল। সেখ পল্ট আহত হইয়াও মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িল না। ইত্যবসরে লেফটেনান্ট বগ ও সার্জেন্ট মেজর রক্তাক্ত কলেবরে কাঁপিত কাঁপিতে আবাস অভিমুখে পলায়ন করিলেন। যাইবার সময়ে লেফটেনান্ট বগ সিপাহিদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, তাহারা এরূপ ভীরু ও নরাধম যে, তাহাদিগের সম্মুখে দুইজন সৈনিক কর্মচারী ক্ষত বিক্ষত হইলেন—তাহারা এই দৃশ্য দেখিল, কিন্তু কেহই তাহাদিগের সাহায্যার্থ গমন করিল না। সিপাহিরা এই ভৎর্সনায় কর্ণপাত করিল না।

লেফটেনান্ট বগ চলিয়া গেলে সিপাহিরা সেখ পল্টুকে বারংবার বলিতে লাগিল যে মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দাও। সেখ পল্টু যখন মঙ্গল পাঁড়েকে ধরে, সেই সময়ে কোন কোন সিপাহি সেখ পল্টুকে গুলি করিয়া মারিবার ভয়ও দেখাইয়াছিল; কিন্তু পল্টু তাহাতে বিচলিত হয় নাই। সেখ পল্টু যখন বুঝিল যে লেফটেনান্ট বর্গ ও সার্জেন্ট মেজর আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সে মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিল। সিপাহিরা মঙ্গল পাঁড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহারা মঙ্গল পাঁড়ের কার্যে কোন প্রকার বাধা প্রদান করে নাই। একজন সুবাদার ও ২০ জন সিপাহি এই সময়ে গোরাবারিকে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহারাও মঙ্গল পাঁড়ের গতিরোধের অথবা লেফটেনান্ট বগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করে নাই। এদিকে সেখ পল্টুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মঙ্গল পাঁড়ে এই সকল সিপাহিকে ধিক্কার করিতে এবং আরও উত্তেজিত করিতে লাগিল।

একজন সিপাহি দ্রুত পদবিক্ষেপে সেনাপতি হিয়ার্সের আবাসে গমন করিয়া তাহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সেনাপতি অবিলম্বে তাহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি পরে কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "অশ্ব প্রস্তুত হইলে এবং অশ্বের সহিত গুলিভরা দুইটি রিভলভার রক্ষিত হইলে আমি দুইখানি পত্র লিখি। একখানি পত্র চুঁচুড়ায় ৮৪নং পদাতি গোরা সেনাদলের অধিনায়ক কর্নেল রিডের নামে, অপর খানি দমদমায় সেনাধিনায়ক কর্নেল আমসিঙ্কের নামে লিখিত হয়। উভয় পত্রেই এইরূপ লিখিত হয় যে, তাহারা যেন স্ব স্ব সেনাদলসহ বারাকপুরে যাত্রা করেন। এইভাবে পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেনাদল যদি বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে ফ্লাগস্টাফ ঘাটের ৫০ জন ইংরাজ এবং সেনাদলের কর্মচারিদিগকে লইয়া আমি গবর্নর

জেনরেলের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিব; শুধু ইহাই নহে; যাহারা গবর্নমেন্টের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া আমাদিগের সহিত যোগদান করিবে, আমি তাহাদিগকেও সঙ্গে লইব এবং বিদ্রোহীদিগের চেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত অথবা আমাদিগের সাহায্যার্থ সেনাদলের আগমন পর্যন্ত আমরা এইভাবেই থাকিব।"

এইরূপ দুইখানি পত্র লিখিবার পর সেনাপতি হিয়ার্সে অশ্বারোহণ করিয়া ৩৪নং সেনাদলের "প্যারেড" ভূমির অভিমুখে গমন করিলেন। সেনাপতির দুই পুত্র সেনাদলের কর্মচারী ছিলেন। তাহারাও যোদ্ধৃবেশ ধারণপূর্বক পিতার সহিত গমন করিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সেনাপতি হিয়ার্সে সৈনিক কর্মচারিদিগকে ব্যাপার কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেখানে কয়েকজন সেনানী উপস্থিত ছিলেন; তাহারা সেনাপতিকে ঘটনার সম্বন্ধে সকল কথাই বলিলেন। সেনাপতি দেখিলেন ৮০/৯০ পদ দূরে মঙ্গল পাণ্ডে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। তিনি শুনিলেন, মঙ্গল পাণ্ডে তখনও অন্যান্য সিপাহিকে চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "তোমাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশের উপক্রম হইয়াছে; তোমরা জাতি ও ধর্মের নামে আমার সহিত যোগদান কর এবং ইংরাজের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ কর। সেনাপতি হিয়ার্সে ব্যাপার বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে মঙ্গল পাঁড়ের দিকে ধাবমান হইলেন। তাহার দুই পুত্র এবং সহকারী এডজুটেন্ট জেনারেল মেজর রস তাহার সঙ্গে গেলেন। এই সময়ে একজন সেনানী উচ্চৈঃস্বরে সেনাপতিকে বলিলেন যে, মঙ্গল পাঁড়ের হস্তে গুলিভরা বন্দুক রহিয়াছে। সেনাপতি হিয়ার্সে এই কথা শুনিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "চুলায় যাউক তাহার বন্দুক।" তিনি সেনানীদিগকে তাহার অনুগমন করিতে আদেশ দিলেন। একজন দেশীয় সেনানী বলিলেন "তাহার হস্তে গুলিভরা বন্দুক রহিয়াছে, সে এখনই আমাদিগকে লক্ষ্য কবিয়া গুলি চালাইবে।" সেনাপতি হিয়ার্সে তখন ক্রুদ্ধ হইয়া আবার সকলকে তাহার অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন। জমাদার সেনাপতির মুখের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "সিপাহিরা বন্দুকে ক্যাপ লাগাইতেছে।" এই কথা শুনিয়া সেনাপতি হিয়ার্সে আবার দৃঢ়তা সহকারে আদেশ দিলেন "ত্বরিত গতিতে আমার অনুগমন কর।" এইরূপ আদেশ দিয়া তিনি মঙ্গল পাঁড়ের সম্মুখীন হইলেন। এই সময়ে সেনাপতির পুত্র কাপ্তেন জন হিয়ার্সে বলিলেন, "পিতা, সে আপনাকে লক্ষ্য করিতেছে, সাবধান।" সেনাপতি পুত্রের কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জন, আমার যদি পতন ঘটে, তুমি অগ্রসর হইও এবং তাহার প্রাণসংহার করিও।" কথা শেষ হইতে না হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। গুলি সেনাপতি হিয়ার্সের গাত্রে লাগিল না; সেই গুলির আঘাতে মঙ্গল পাঁড়ে নিজেই ভূপতিত হইল। মঙ্গল পাঁড়ে যখন দেখিল যে, সেনাপতি হিয়ার্সে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, যখন সে দেখিল যে সেনাপতির আদেশে সিপাহি সেনানীগণও তাহার সহিত আসিতেছেন, তখন মঙ্গল পাঁড়ে গুলিভরা বন্দুক নামাইল, নিজের পদের দ্বারা বন্দুকের ঘোড়া টিপিল—গুলি তাহারই গাত্রে বিদ্ধ হইল। সেনাপতি হিয়ার্সে তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মঙ্গল পাঁড়ের দেহ রক্তাক্ত হইয়া লুটাইতেছে এবং তাহার পরিচ্ছদ অগ্নিসংযুক্ত হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে পরিচ্ছদের অগ্নি নিবাইয়া ফেলিলেন এবং একজন ডাক্তারকে মঙ্গল পাঁড়ের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। ডাক্তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আঘাত গুরুতর বটে,

তবে বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া যায় নাই। সেনাপতি হিয়ার্সে তখন মঙ্গল পাঁড়েকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অতঃপর সেনাপতি ৪৩নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন যে, তিনি যতক্ষণ তাহাদিগের অধিনায়ক হইয়া থাকিবেন, ততক্ষণ কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের জাতি ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ইহার পর, তিনি ৩৪নং সিপাহি দলের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং তাহারা কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ ছিল বলিয়া তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। লেফটেনান্ট বগ সেনাদলের নিকটে নিজের গুণগরিমায় মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাহারাও তাহার অনুরক্ত ছিল না। সেইজন্যই লেফটেনান্ট বগের কোন কথার উত্তরে সিপাহিবা একটি কথাও কহে নাই। কিন্তু এক্ষণে সিপাহিদিগের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র সেনাপতি হিয়ার্সে যখন বলিলেন যে, তাহাদিগেরই সম্মুখে তাহাদিগের সেনানীরা বিপদগ্রস্ত ও আহত হইলেন অথচ তাহারা সেনানীদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না, সিপাহিদিগের এইরূপ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তখন সিপাহিরা সকলেই একবাক্যে বলিল "মঙ্গল পাঁড়ে উন্মত্ত হইয়াছিল।" সেনাপতি হিয়ার্সে বলিলেন "তোমরা কি তাহাকে ধরিতে পারিতে না? তোমরা তাহাকে ধরিতে গেলে সে যদি বাধা দিত তাহা হইলে কি তোমরা তাহাকে গুলি করিতে পারিতে না, অথবা তাহাকে কোনরূপে বিকলাঙ্গ বা অকর্মণ্য করিতে পারিতে না? যদি একটা উন্মত্ত হস্তী বা কুকুর তোমাদিগকে তাড়া করে, তাহা হইলে তোমরা কি তাহাকে গুলি কর না? উন্মত্ত হস্তী বা কুকুরের সহিত তুলনায় উন্মত্ত মনুষ্য কি কম ভয়ঙ্কর?" কোন কোন সিপাহি এই কথার উত্তরে বলিল "মঙ্গল পাঁড়ের হস্তে গুলিভরা বন্দুক ছিল।" সেনাপতি তখন সিপাহিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি বলিতেছ, তোমরা গুলিভরা বন্দুক দেখিয়া ভয় পাও?" সিপাহিরা নিরুত্তর রহিল। সেনাপতি হিয়ার্সে তাহাদিগকে স্বস্থানে গমন করিতে বলিয়া নিজের আবাস অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ইহার অষ্টাহকাল পরে মঙ্গল পাঁড়ের অপরাধের বিচার হয়। দেশীয় সেনানীগণ বিচার করেন। মঙ্গল পাঁড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও উপরিতন কর্মচারিদিগের প্রতি বলপ্রকাশ করার অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। চোদ্দ জন সেনানীই মঙ্গল পাঁড়েকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং চৌদ্দজনেব মধ্যে এগারজন মঙ্গল পাঁড়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। ইহার দুই দিন পরে, অর্থাৎ ৮ই এপ্রিল তারিখে বারাকপুরে সেনাদলের সম্মুখে মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি হয়। দেশীয় পদাতি সেনাদল ফাঁসিকাঠের নিকটে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিল। সেনাপতি হিয়ার্সে সেই সময়ে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বিদ্রোহীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা তোমরা দেখিতে পাইলে; অতঃপর তোমরা সাবধান হইবে।"

মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসির দুই দিন পরে ১০ই এপ্রিল তারিখে জমাদার ঈশ্বরীপ্রসাদ পাঁড়ের অপরাধের বিচার করা হয়। ইউরোপীয় সেনানায়কদিগকে বিপদের সময়ে সাহায্য না করা এবং অপরকে এই কার্যে নিরস্ত থাকিবার প্রবৃত্তি দেওয়ার জন্য এই জমাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল। ঈশ্বরী প্রসাদের প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। এই

দণ্ডাদেশ প্রধান সেনাপতির দ্বারা সমর্থিত না হওয়ার সত্বর ঈশ্বরীপ্রসাদের ফাঁসি হয় নাই। এক সপ্তাহকাল পরে প্রধান সেনাপতি এই দণ্ডের সমর্থন করিয়া লেখেন, "সামরিক বিধান অনুসারে যে চরম দণ্ড বিহিত হইতে পারে, সেই দণ্ডেরই আদেশ দেওয়া হইয়াছে; ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। জেনরেল এন্সনের বিশ্বাস যে, এবংবিধ পাপের ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রত্যেক দেশীয় সেনানী, অধস্তন কর্মচারী ও সৈন্য শিহরিয়া উঠিবেন। যে কারণে জমাদারের প্রতি দণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, অপর কেহ যদি সেই কারণে দোষী থাকে, অপর কেহ যদি পরোক্ষভাবে বিদ্রোহীকে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই ব্যক্তির (ঈশ্বরীপ্রসাদের) শোচনীয় পরিণাম ও মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি দেখিয়া সেই ব্যক্তির চৈতন্যোদয় হইবে— বিদ্রোহীদিগের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহা সে বুঝিবে। জেনরেল এন্সনের ধারণা এই যে, ইহার ফলে সিপাহিদিগের ভবিষ্যৎ জীবন নিষ্কলঙ্ক হইতে পারিবে।"

২১শে এপ্রিল তাবিখে জেনরেল হিয়ার্সে গবর্নমেন্টকে লিখিলেন—"অদ্য অপরাহ্নকালে ৬টায় সময়ে সকল সেনাদলের সম্মুখে ঈশ্বরীপ্রসাদের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরীপ্রসাদের অপরাধ, বিচারকদিগের সিদ্ধান্ত ও দণ্ডাদেশ এবং প্রধান সেনাপতি কর্তৃক দণ্ডাদেশের সমর্থন কথা প্রথমেই দেশীয় সেনাদলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গবর্নমেন্ট অবশ্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরীপ্রসাদ নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল এবং তাহার প্রতি যে উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে কথাও সে প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিল। শেষে সে তাহার সতীর্থ সিপাহিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহার ভীষণ পরিণাম দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে যেন চৈতন্যের সঞ্চার হয়।"

মঙ্গল পাঁড়ে ও ঈশ্বরীপ্রসাদ পাঁড়ের ফাঁসি ব্যতীত জেনারেল হিয়ার্সেকে আরও দুইটি গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বহরমপুরে যে ১৯নং দেশীয় সেনাদল উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে এবং বারাকপুরের ৩৪নং দেশীয় সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার ভার তাহারই উপর সমর্পিত হইয়াছিল। ১৯নং দেশীয় সেনাদলকে বারাকপুরে লইয়া আসিবার জন্য পূর্বেই আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। কর্নেল মিচেল এই সেনাদলকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ১৯নং দেশীয় সেনাদলকে বারাকপুরে লইয়া আসিবার জন্য পূর্বেই আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। কর্নেল মিচেল এই সেনাদলকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ১৯নং সেনাদলের সিপাহিরা বুঝিয়াছিল যে তাহারা সহসা উত্তেজিত লইয়া অন্যায় কার্যই করিয়াছিল। অনুশোচনায় তাহাদিগেব হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। কর্নেল মিচেল তাহাদিগকে লইয়া বহরমপুর হইতে যাত্রা করিলে তাহারা পথি মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করে নাই। সমস্ত পথ তাহারা শান্তভাবে অতিক্রম করিয়াছিল। তথাপি এই সেনাদলকে একেবারে বারাকপুরে লইয়া আসা হয় নাই; তাহাদিগকে বারাসতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ৩১শে মার্চ মঙ্গলবারে বারাকপুরে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, সেনাপতি হিয়ার্সে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবেন, এইরূপই কথা ছিল।

এদিকে ২৯শে মার্চ তারিখে মঙ্গল পাণ্ডে সেনানীদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় ও ৩৪নং দেশীয় সেনাদল তাহার কার্যে বাধা প্রদান না করায় বারাকপুরের ইংরাজগণ মনে

করিয়াছিলেন যে, ১৯নং সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার পূর্বেই, সোমবারে সকল সিপাহিই ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। অনেক ইংরাজ মহিলা এই আশঙ্কায় বারাকপুর হইতে কলিকাতায় প্রস্থান করিয়াছিলেন; শুনা যায়, সোমবারে বারাকপুরের কোন কোন সিপাহি বারাসতে গমন করে এবং ১৯নং দেশীয় সেনাদলকে বলে, "ধর্মের নামে তোমরা অস্ত্র গ্রহণ কর; তোমাদের দলের ইংরাজ সেনানীদিগকে হত্যা কর; পরে আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হও। আমরা উভয় দল সম্মিলিত হইলে বারাকপুর ও কলিকাতার গোরাদিগকে পরাজিত করিতে ও বিনষ্ট করিতে অবশ্যই পারিব।" ১৯নং দেশীয় সেনাদল তখন কৃতকর্মের জন্য পরিতপ্ত হইয়াছিল, তাহারা এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে স্বীকৃত হইল না। তবে উভয় সেনাদলের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া এ কথা কাহারও কাছে কেহ প্রকাশ করিল না। বারাকপুরের গুপ্তচরগণ নিরাপদে বারাকপুরে ফিরিয়া আসিল।

মঙ্গলবারে ১৯নং দেশীয় সেনাদলকে নিরস্ত্র হইতে হইবে। তাহারা সেনাধিনায়কের সকল আদেশ পালন করিয়া এই শেষবার সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বারাকপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। বারাকপুরের সেনানিবাস হইতে এক মাইল পথ দূরে সেনাপতি হিয়ার্সে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং স্বয়ং পুরোভাগে থাকিয়া "প্যারেড" ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। সে স্থানে ৮৪নং গোরা সেনাদল, ৫৩ নং গোরা সেনাদলের এক অংশ, দুইদল ইংরাজ গোলন্দাজ, বড়লাটের "বডিগার্ড" বা শরীররক্ষী দল এবং দেশীয় সেনাদলকে পূর্বেই প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল।

"প্যারেড" ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সেনাপতি হিয়ার্সে ১৯নং সেনাদলকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা করিলেন, পরে তাহাদিগের সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের আদেশ পাঠ করিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশপত্রে প্রথমেই বহরমপুরের ঘটনা বিবৃত হইয়াছিল। তাহার পর আদেশপত্রে এই রূপ লিখিত হইয়াছিল যে, "সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই যে কোন জাতীয় ও যে কোন শ্রেণির সৈন্যের নিকট হইতেই গবর্নমেন্ট বিশ্বাস ও আনুগত্যের দাবি করিয়া থাকেন। সেনাদল গবর্নমেন্টের বিশ্বাসী ও অনুগত হইবে বলিয়াই প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট এই দাবি বজায় রাখিতে কখনই বিরত হইবেন না। যে ব্যক্তি শস্ত্রপাণি হইয়া অভিযোগ করিবে, তাহার কথায় তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিবেন না। দুষ্ট লোকে সিপাহিদিগের নিকটে যে সকল কপোলকল্পিত গল্পের অবতারণা করিয়াছিল, সিপাহিরা যদি সেই সকল গল্পে বিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে তাহাদিগের ধর্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ণই থাকিত এবং তাহারা পূর্বে গবর্নমেন্টের যেরূপ বিশ্বস্ত ছিল, এখনও সেইরূপ থাকিত; ভবিষ্যতে তাহারা দীর্ঘকাল বীরধর্ম পালনের জন্য সকল প্রকার সম্মান ও পারিতোষিকের অধিকারী হইতে পারিত। কিন্তু এখন আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট এই সেনাদলের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না—এই সেনাদল আপনাদিগের সুনাম নষ্ট করিয়াছে, তাহাদিগের আচরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার বা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার দাবি আর তাহারা করিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট এইরূপ আদেশ দিতেছেন যে, ১৯নং দেশীয় পদাতি সেনাদলকে সেনাশ্রেণি হইতে বিচ্যুত করা হউক।

আদেশ-পত্র পঠিত হইবার পর সেনাপতি হিয়ার্সের আদেশে ১৯নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের সিপাহিরা স্ব স্ব অস্ত্র একস্থানে জমা করিল, কোমর-বন্ধগুলি খুলিয়া সঙ্গীনের মাথায় লটকাইয়া রাখিল। সেনাপতি যেরূপ আদেশ করিলেন, সিপাহিরা তদ্দণ্ডেই সেই আদেশ মতো কার্য করিল। অতঃপর সেনাপতির আদেশে তাহারা এই অস্ত্রের রাশি হইতে কিছুদূরে গমন করিল। সেখানে তাহাদিগের বেতন শোধ করিয়া দেওয়া হইল; তখন সেনাপতি হিয়ার্সে তাহাদিগকে বলিলেন যে, গবর্নমেন্টের আদেশে তাহাদিগকে সৈনিক শ্রেণি হইতে একেবারে বিচ্যুত হইতে হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগের গাত্র হইতে সামরিক পরিচ্ছেদ উন্মোচন করিয়া লইয়া গবর্নমেন্ট তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে চাহেন না। শুধু ইহাই নহে, সেনাপতি তাহাদিগকে বলিলেন যে, তাহারা বহরমপুর হইতে আসিবার পথে যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া গবর্নমেন্ট নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে স্ব স্ব বাটীতে পৌঁছাইয়া দিবেন। সেনাপতি হিয়ার্সে স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই কথা শুনিয়া সিপাহিরা স্বকার্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্নমেন্টের এই সদয় ব্যবহার তাহাদিগের হৃদয়ে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত করিল। তাহারা আপনাদিগের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে ৩৪নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের দ্বারাই তাহারা বিপথগামী হইয়াছিল, তাহারা ৩৪নং সেনাদলকে ইহার জন্য দণ্ড দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল।" একজন সিপাহি সেনাপতির নিকট অগ্রসর হইয়া স্পষ্টই বলিল যে একবার অতি অল্পকালের জন্য যদি তাহাদিগকে অস্ত্র ধারণ করিবার আদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা ৩৪নং সেনাদলের ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে।

অতঃপর ইউরোপীয় রক্ষকের অধীন হইয়া নিরস্ত্র সিপাহিরা বারাকপুর হইতে যাত্রা করিল। যাইবার সময়ে তাহারা সেনাপতি হিয়ার্সের আশীর্বাদ করিল এবং তাহারা দীর্ঘজীবন কামনা করিল। সেনাপতিও তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিলেন; সেনাপতির কথা অনুসারে তাহারা স্বীকার করিল যে বাড়ি যাইবার সময় তাহারা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে কখনই বিরত হইবে না। সেনাপতি হিয়ার্সে সিপাহিদিগের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাই এমন একটা গুরুতর কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। বড়লাট লর্ড ক্যানিং যে এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সেনাপতি হিয়ার্সে আপনার কর্তব্য পালন করিয়া "প্যারেড" ক্ষেত্রে সমবেত সিপাহিদিগকে গবর্নমেন্টের দয়া ও ন্যায়পরতার কথা বুঝাইয়া বলেন, "আমি তোমাদিগকে যথার্থই বলিতেছি যে, তোমাদের ধর্ম ও জাতিগত সংস্কারে কোন স্থানের কেহই হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প করে নাই। সেনাদলের মধ্যে চারি শতাধিক ব্রাহ্মণ এবং দেড়শত রাজপুত ছিল; তাহাদিগের প্রাপ্য বেতন কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহারা এক্ষণে যে কোন তীর্থস্থানে ইচ্ছানুসারে গমন করিতে পারিবে, স্ব স্ব গ্রামের মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করিতে পারিবে, তাহাদিগের পূর্বপুরুষেরা যেখানে বসিয়া দেবপূজা করিয়া গিয়াছেন, তাহারাও সেইখানে বসিয়া দেবপূজা করিতে পারিবে। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিবে যে, দুষ্ট লোকের কথিত কাহিনি সর্বৈব মিথ্যা।" সিপাহিরা ধীরচিত্তে সেনাপতির কথা শ্রবণ করিল। বেলা ৯টার পূর্বে এই কার্য সমাধা হইয়া গেল।

১৯নং দেশীয় সেনাদলকে এই ভাবে নিরস্ত্র করিবার পর গবর্নমেন্ট ৩৪নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের আচরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সেনাদলের মনোভাব কিরূপ এবং ইহাদিগের উত্তেজনাই বা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গবর্নমেন্ট কয়েকজন সৈনিক কর্মচারীর সম্মিলনে একটি তদন্ত সমিতি গঠন করেন। এই বিশেষ আদালতে যথাসম্ভব ধীরতার সহিত সকল বিষয়ের তদন্ত করা হয়। এই আদালত এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ৩৪ নং রেজিমেন্টের শিখ ও মুসলমান সিপাহিরা বিশ্বাসী ও গবর্নমেন্টের অনুগত, সাধারণত হিন্দু সিপাহিরাই অবিশ্বাসের কারণ হইয়াছে। এই রেজিমেন্টের ৮ জন কর্মচারী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কর্নেল, এডজুটেন্ট ও অপর তিন জন কর্মাচারীও এইরূপ কথাই বলেন।

বিশেষ আদালতের সিদ্ধান্ত এবং ৩৪ নং রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রমাণ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া বড়লাট লর্ড ক্যানিং এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যে সকল সেনানী ও সিপাহি মঙ্গল পাঁড়ের উত্তেজনাকালে বারাকপুরে ছিল না এবং যাহারা বড়লাটকে তাহাদিগের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পারিয়াছে, সেই সকল সেনানী ও সিপাহি ব্যতীত রেজিমেন্টের অপর সকল দেশীয় কর্মচারী ও সিপাহিকেই সেনাশ্রেণি হইতে বিচ্যুত করা হইবে। এই রেজিমেন্টের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কোম্পানি চট্টগ্রামে ছিল। এই তিন কোম্পানির সেনাধিনায়ক তাহার অধীন সিপাহি ও দেশীয় কর্মচারিদিগকে বলেন যে, তাহারা যে গবর্নমেন্টের বিশ্বাসী, একথা গবর্নর জেনরেলকে এই সময়ে জানাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তদনুসারে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম হইতে এই সকল সেনানী ও সিপাহি বড়লাটের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। দরখাস্তে এইরূপ লিখিত থাকে—"আদেশ অনুসারে আমরা বারাকপুর হইতে চট্টগ্রামে আসিয়াছি। আমরা এ পর্যন্ত সকল আদেশই মান্য করিয়া আসিযাছি এবং এখনও মান্য করিতেছি। সম্প্রতি যে সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে. সেই সকল কথায় আমাদিগের তিলমাত্র বিশ্বাস নাই। এডজুটেন্ট ও সার্জেন্ট-মেজরের প্রতি গার্ড (প্রহরী) ও সিপাহিরা যেরূপ আচরণ দেখাইয়াছে, তাহা শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। যথাবিধি ও যথোচিত সতর্কতার সহিত কর্তব্য পালন করায় আমরা গবর্নমেন্টের বিশ্বস্ত সৈনিক বলিয়া যশস্বী হইয়াছি। এই সকল লোক আমাদিগের সেই সুনামে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, গবর্নমেন্ট পূর্বের ন্যায় আমাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিবেন।"

বড়লাট লর্ড ক্যানিং চট্টগ্রামের এই তিন কোম্পানির সিপাহির দরখাস্তে প্রীত হইয়াছিলেন। বারাকপুরের সিপাহিদিগের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—'বারাকপুরে এক্ষণে ৩৪নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের যে সাতটি কোম্পানি আছে, তাহাদিগকে সেনাশ্রেণি হইতে বিচ্যুত করা ব্যতীত যদি অন্য কোন প্রকার লঘু দণ্ড তাহাদিগের পক্ষে উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে আমি সন্তোষলাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু গবর্নমেন্টের সম্মুখে এই ব্যাপারের তদন্ত বিষয়ক যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি যে এই সেনাদলের প্রতি, সেনাশ্রেণি হইতে বিচ্যুতি ব্যতীত, অপর কোন দণ্ড দিলে তাহা ঘটনার উপযোগী দণ্ড হইবে না এবং তাহাতে অপরাপর সিপাহির চৈতন্যোদয়ও হইবে না।" যাহা হউক, ৬ই মে তারিখে বারাকপুরের ৩৪নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের সাতটি কোম্পানিকে অন্যান্য

সিপাহিদিগের সম্মুখে নিরস্ত্র করা হইল। প্যারেডের সময় তাহাদিগের সামরিক পরিচ্ছদ উন্মোচনের আদেশ দেওয়া হয়। অবশেষে ৮৪নং গোরা সেনাদলের দুইটি কোম্পানি তাহাদিগকে বারাকপুরের বাহিরে লইয়া যায়।

পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, ৩৪নং রেজিমেন্টের অপরাধ নির্ধারণের পাঁচ সপ্তাহ পরে, ঐ দলের হিন্দু সৈনিকগণকে দণ্ডিত করায় গবর্নমেন্ট দোষ করিয়াছিলেন। কেননা, যাহারা দোষী, তাহারা দীর্ঘকাল সেনাদলে নিযুক্ত থাকায় কোম্পানির অন্যান্য সেনাদলকে বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মনোগত দুষ্ট ভাব প্রকাশ এবং প্রচার করিতে পারিয়াছিল। অনেকে এমনও অনুমান করেন যে, ৩৪নং সেনাদলের প্রতি আদিষ্ট দণ্ড কথিত অপরাধে যোগ্য পর্যাপ্ত হয় নাই। দণ্ড আরও কঠোর ও ভীষণ হইলে, হয়তো সেই ভয়ে অন্য সেনার দল সংযত থাকিত।

পরন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এপ্রিল মাসের শেষেও সেই সময়কার ভারতীয় শাসক সম্প্রদায় এবং সামরিক বিভাগের সেনানায়ক সম্প্রদায়—উভয় সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ই বুঝিতে পারেন নাই যে, অচিরে সিপাহিযুদ্ধের ভীষণ দাবানল ভারতের সর্বত্র জ্বলিয়া উঠিবে। এমন কি স্যর জন লরেন্স শিয়ালকোটের সেনানিবাস দেখিতে যাইয়া সেখানকার ব্যবস্থা ও কার্যপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "এখানে সকলেই নূতন বন্দুক এবং টোটা ব্যবহারে তুষ্টই আছে, অসন্তুষ্টির চিহ্নও কোথায় দেখিতে পাইলাম না। বরং দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যে, সেনানিগণ নূতন বন্দুক এবং টোটা ব্যবহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে নাই, উহা ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।" সিরহিন্দ বিভাগের প্রধান সেনানায়ক বার্নার্ড মহোদয়ও সিপাহিদলের মধ্যে কোন অসন্তোষের লক্ষণ দেখিতে পান নাই। তিনি স্বীয় বিভাগে শান্তির শুভ্র শান্ত প্রতিমাই দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেনাপতি হিয়ার্সে হিন্দি ও উর্দু ভাষাভিজ্ঞ হইয়াও, ৩৪নং সিপাহিদলের বিচ্যুতির পরে লিখিয়াছিলেন যে, "আমার তো মনে হয় না যে আর বারাকপুরে গোরা সেনার উপস্থিতির কোন প্রয়োজন আছে। আমার অধীনে সকলেই শান্ত ও সংযত হইয়াছে।" এই ভাবে সেই সময়কার সকল সেনানীই, সকল শাসনকর্তাই আশু বিপদের বিষয়ে পূর্ণ অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড কানিং তখনও ভারতে নবাগত, তিনি তখনও ভরতবর্ষকে ও ভরতবাসীকে চিনিতে পারেন নাই। ফলে, এই ভাবের শান্তি ও তুষ্টির সমাচার সকল প্রদেশ হইতে পাইয়া তিনিও অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাহার নিশ্চিন্ততার আর একটু হেতু আছে। লর্ড ক্যানিং স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"আমার বিশ্বাস, ৩৪নং সিপাহির রেজিমেন্টের প্রতি লঘুদণ্ডের আদেশ করা হয় নাই। হইতে পারে যে, এই ভাবে দণ্ড দেওয়াতে অনেক নষ্ট দুষ্ট সিপাহি সামান্য দণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে, কিন্তু এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত দণ্ড কঠোর করা সম্ভবপর নহে। অবশ্য সিপাহিদিগের অধিনায়কগণকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিলে কতকটা শাসন হয় বটে, আমিও সে পক্ষে উদাসীন নহি; পরন্তু নিরপেক্ষ বিচার ও সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিযা দণ্ড বিধান করিতে হইলে, উহা অপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড বিধান করা আমার বুদ্ধিতে উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। যাহারা সত্য সত্যই বিশ্বাসী, নিরপরাধ, অথবা অনুতপ্ত, এমন সিপাহি সকল যাহাতে কোন মতে দণ্ডিত বা তিরস্কৃত না হয়, সে দিকে আমাদের তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যে সময়ে বাংলার বিপ্লব প্রশমন করিতে না করিতে অযোধ্যায় এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে

বিপ্লববহ্নি দেখা দেয়, সে সময়ে বুঝিতে হইবে যে দেশব্যাপী বিদ্বেষ উদ্ভূত হইয়াছে, সে সময়ে অতি সাবধানে কার্য করা শ্রেয়—সে সময়ে যাহাতে নিরপরাধ ও ইংরাজের অনুগত সিপাহিসকল দণ্ডিত না হয়, সে দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতেই হইবে।" উচ্চাঙ্গের শাসননীতির হিসাবে লর্ড ক্যানিং দেশের তাৎকালিক প্রকৃত অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই নীতি অনুসরণ করিয়াই তিনি পরে সিপাহিযুদ্ধের উপশম সাধন করিয়াছিলেন। আর এক কথা, সিপাহিসকল যেরূপ সর্বসমর্পণ করিয়া ইংরাজ সেনানীবর্গের অনুগত্য করিত, স্বীয় গ্রাসের অন্ন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারিদিগকে আহার করিতে দিয়া, তাহাদের সেবা করিত, তাহাতে সহসা কাহারও মনে এমন বিশ্বাস হয় না যে, এই সিপাহিসকল আবার তাহাদের শ্বেতাঙ্গ সেনানায়কগণকে বধ করিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইবে। সে সময়ে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, দুষ্ট লোকের পরামর্শে সিপাহিসকল উত্তেজিত হইয়াছিল, গবর্নমেন্টের সুব্যবস্থায় সে উত্তেজনার ভাব দূর হইয়াছে। এই ধারণার জন্যই পরবর্তী ঘটনা সংঘাতে ভারতের ইংরাজ শাসকসম্প্রদায় কিছুকালের জন্য বিস্ময়ে এবং ত্রাসে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মীরট

মীরট দিল্লি হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত। নগরটি সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত; দুইটি বিশাল রাজপথ নগরভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। একটি দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে রুরকি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, অপরটি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তারিত। এই পূর্ব পশ্চিম প্রসারিত রাজপথের নাম "ম্যাল" (Mall)। ইহার দুই পার্শ্বে ছায়াসমন্বিত অত্যুচ্চ বৃক্ষাদি শোভা করিতেছে। শান্ত শীতল বিচরণের স্থান বলিয়া এই পথে সকাল সন্ধ্যা নাগরিকগণ বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। এই ম্যাল পথের উত্তর দিকে গোরা গোলন্দাজগণের, একটা গোরা অশ্বারোহীদলের এবং এক রেজিমেন্ট গোরা পদাতি সেনার বারিক বা আবাস-গৃহসকল অবস্থিত ছিল। মধ্যে পদাতি দলের, দক্ষিণে গোলন্দাজগণের এবং পূর্বে অশ্বারোহী সেনাসকলের আবাস বিন্যস্ত ছিল। এই বারিকের মধ্য দিয়া রুরকি যাইবার রাজপথ উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে; এই পথের অবস্থান হেতু গোরা সেনাবারিক সকল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পথের এক দিকে গোলন্দাজ ও পদাতি সেনার বারিক এবং অন্য দিকে অশ্বারোহীর বারিক অবস্থিত ছিল। এই বারিকের উত্তর দিকে প্রায় দুই বর্গ মাইল ব্যাপী একটি সমতল ক্ষেত্র ছিল; এই ক্ষেত্রেই সেনাগণের প্রাত্যহিক প্যারেড হইত। এই বারিকগুলির দক্ষিণ দিকে গোরা সেনাদলের সেনানীগণের আবাস গৃহসকল শ্রেণিবদ্ধভাবে সরলরেখায় পরে পরে নির্মিত ছিল।

অশ্বারোহী গোরাবারিকের দক্ষিণদিকে প্রায় একমাইল দূরে সিপাহিদলের বারিক ছিল। এই সিপাহির বারিকে যাইতে হইলে ম্যাল হইতে পশ্চিমদিক দিয়া যে একটা পথ গিয়াছিল, তাহা ধরিয়া যাইলেই নির্দিষ্ট স্থানে অনায়াসে উপস্থিত হওয়া যাইত। প্রথমেই সিপাহিদিগের পদাতিকদলের বারিক পাওয়া যাইত; পদাতির পার্শ্বেই অশ্বসাদীদিগের বারিক ছিল। কিন্তু এই দুই সেনানিবাসের মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ ময়দান ছিল। এই ময়দানের পার্শ্বে সিপাহিদিগের আবাস পল্লীর পূর্বে সিপাহি রেজিমেন্ট সকলের শ্বেতাঙ্গ সেনানায়কগণের "বাঙলো" সকল নির্মিত ছিল। ইহারই পিছনে সদর বাজার বা ক্যান্টনমেন্ট বাজার বা সেনানিবাসের বাজার ছিল। এই বাজার প্রায় মীরট নগরের সীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। এই বাজারের পার্শ্বে নগর হইতে এক মাইল দূরে মীরটের বিশাল কারাগার অবস্থিত ছিল। এই কারাগারে একসময়ে চারি হাজার কয়েদি অবস্থিতি করিতে পারিত।

সিপাহিযুদ্ধের সূচনার সময়ে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মীরট নগরের ও সেনানিবাসের অবস্থান পূর্বোক্তরূপেই ছিল। এই সময়ে মীরটের সেনানিবাসে মহারানির ৬০ নম্বরের রেজিমেন্টের (পদাতি) একদল, কাড়াবীনধারী ৬ নম্বরের ড্রেগুন গার্ড, একদল অশ্বারোহী এবং আর একদল পদাতি গোলন্দাজ একপ্রস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের হালকা

তোপের সারির সহিত গোরা সেনা ছিল। এই গোরা সেনার সঙ্গে তিনদল সিপাহি, তৃতীয় লাইট অশ্বারোহী, এবং ২০ নম্বরের সিপাহি রেজিমেন্ট মীরটে বাস করিতেছিল। বলা বাহুল্য, মীরটে গোরার দল অপেক্ষা সিপাহির দল সংখ্যায় অধিক ছিল। মীরট কলিকাতা হইতে সহস্র মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত থাকিলেও দমদমার ও বারাকপুরের সকল ঘটনা মীরটের সিপাহির দলে যাইয়া পৌঁছেছিল। গুজব যত দূরে বিস্তারিত হয়, ততই পল্লবিত হইয়া থাকে। বারাকপুর ও দমদমার ঘটনার গুজব নানা শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া মীরটের সিপাহিদিগের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই সকল কথা শুনিয়া মীরটের সিপাহি সকল অতি মাত্রায় উত্তেজিত হইয়াছিল। তাহারা স্থির জানিয়াছিল যে, কোম্পানির কর্মকর্তৃগণ হিন্দু ও মুসলমানের জাতিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন; ত্বরায় হিন্দু ও মুসলমান জাতিধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে কৃতসঙ্কল্প না হইলে হিন্দু মুসলমানের ইহপরকাল নষ্ট হইবে। মীরটের সিপাহিদিগের এই শঙ্কায় ইন্ধন যোগাইবার লোকাভাব হয় নাই। দিল্লি হইতে কত রকমের মানুষ আসিয়া তাহাদিগকে কত কথা শুনাইত, তাহারাও স্থির দৃষ্টি ও উৎকর্ণ হইয়া এই সকল কথা শুনিত। গোরা বারিক হইতে সিপাহিদিগের বারিক দূরে অবস্থিত থাকায়, সিপাহিদিগের সেনানীগণও একটু স্বতন্ত্র স্থানে বাস করায় মীরটের সিপাহিদিগের উত্তেজনার ভাব কর্তৃপক্ষ একেবারেই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

সহসা পশ্চিমোত্তরের প্রথম নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপের কালে—যখন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় জাতিই অতি গ্রীষ্মে জীর্ণ হইয়া থাকেন--মীরটে ঘোর নিশাকালে গোরা সেনানীদিগের "বাঙলো" সকলে অগ্নিদাহের উপদ্রব হইতে আরম্ভ হইল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নৈশ অগ্নিকাণ্ডের সমাচার ইংরাজ সেনানীবর্গের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। আর সেনানায়কগণকে দেখিলে সিপাহি সকল যথারীতি অভিবাদন করে না, তেমন সাগ্রহে ও ত্বরিতপদে তাহাদের আদেশ মান্য করে না। অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক কর্নেল স্মাইথ সর্বাগ্রে শুনিতে পাইলেন যে, সিপাহিসকল একটি টোটাও স্পর্শ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই সমাচার শুনিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, তাহার ৩ নম্বরের অশ্বারোহী সেনার দলকে প্যারেড ভূমিতে লইয়া যাইয়া টোটার ব্যবহার ও নির্মাণ পদ্ধতি শিখাইয়া দিবেন। ২৩শে এপ্রিল তারিখে তিনি আদেশ দিলেন যে পরদিন প্রাতঃকালে অশ্বারোহী সেনার প্যারেড হইবে, সকলকে সে প্যারেডে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সেই দিন সন্ধ্যার পর ওই অশ্বারোহী সেনার দলের হাবিলদার মেজর কর্নেল স্মাইথকে সমাচার দেন যে, অশ্বাসদী রেজিমেন্টের প্রথমদলের কোন দেশীয় যোদ্ধাই টোটা স্পর্শ করিবে না। এই সওয়ার দলের অন্য রেসালার অধিনায়ক কাপ্তেন ক্রেগি আডজুটান্ট মহোদয়কে লিখিয়া পাঠান যে, "একাএক স্মাইথের নিকট যাইয়া তাহাকে বল যে, আমার রেসালার সওয়ারসকল দল বাঁধিয়া আমাকে বলিযাছে যে, আগামীকল্য কুচকাওয়াজ ও নকল যুদ্ধ যেন বন্ধ থাকে; কেননা সিপাহিদিগের মধ্যে টোটা লইয়া বড়ই গোল বাঁধিয়াছে, তাহারা টোটাকে বিষম অপবিত্র সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। আমার দলের সওয়ার সকল সর্বাগ্রে এই টোটা ব্যবহার করিলে তাহাদিগকে নিন্দার ভাগী হইতে হইবে, তাহাদিগকে বদনাম অর্জন করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস অশ্বারোহী দলের ছয়টা রেসালার ভাবই বেশি সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কোন দলের কেহই টোটা স্পর্শ করিতে চাহে না। ব্যাপার বড়ই বিষম হইয়াছে। সেনানায়কের আদেশ যদি সত্বর প্রত্যাহৃত না হয়, তাহা হইলে

আমার বিশ্বাস সমস্ত রেজিমেন্টই বিদ্রোহী হইবে। অতএব তুমি এই পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই স্মাইথের কাছে যাইয়া সকল ব্যাপার তাহাকে অবগত করিবে। দেখিও, যেন বিলম্ব না ঘটে; ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলে ব্যাপার ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে।" কর্নেল স্মাইথ কিন্তু টলিবার পাত্র ছিলেন না : তিনি স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করিলেন না। বিশেষত তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, সিপাহিসকল টোটার বিষয় লইয়া কতটা উত্তেজিত হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রতি রেসালা হইতে ছয় জন করিয়া নব্বইজন অশ্বারোহী সিপাহি যোদ্ধাকে বাছিয়া আনিয়া প্যারেড ভূমিতে উপস্থিত করা হইল। সকলেই যথারীতি অশ্বারোহণে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কর্নেল স্মাইথ সর্বাগ্রে তাহাদিগকে প্যারেডের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন। পরে হাবিলদার মেজরকে কাড়াবীণে টোটা গাদিয়া আওয়াজ করিতে বলিলেন। হাবিলদার মেজর স্বীয় শিক্ষানুসারে বন্দুকের আওয়াজ করিল। তখন কর্নেল স্মাইথ নব্বইজন সওয়ারকে টোটা বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন। নব্বই জনের মধ্যে পাঁচজন হাত পাতিয়া টোটা লইল, পঁচাশি জন টোটা স্পর্শও করিল না। তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল যে, ঐ টোটা স্পর্শ করিলে আমাদের জাতি যাইবে, আমাদের বদনাম হইবে; আমরা উহা স্পর্শ করিব না। কর্নেল স্মাইথ এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিয়া, প্রমাদ গনিলেন। তিনি সিপাহিদিগকে বলিলেন যে, "এ সকল পুরাতন টোটা, এ টোটা তাহারা নিত্যই ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহা ব্যবহার করিলে কোন দোষই হইবে না। তোমাদের হাবিলদার মেজর তো এই টোটা ব্যবহার করিয়াছেন, তবে তোমরা কেন করিবে না? তাহার জাতি কি জাতি নহে, তিনি যাহা করিতে পারেন, তোমরাও তাহাই করিতে পার।" এই বলিয়া কর্নেল স্মাইথ সিপাহিদিগকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিল না। সেই পাঁচজন ছাড়া আর কোন সওয়ারই টোটা স্পর্শ করিতে চাহিল না। ইহার পর কের্নল স্মাইথ সওয়ারগণকে ক্ষুণ্ণমনে বিদায় দিলেন। তাহারা সংখ্যায় অত্যধিক ছিল বলিয়া তাহাদিগকে গারদে পাঠাইতে পারিলেন না। অবিলম্বে একটি তদন্ত সমিতি নির্ধারিত হইল। তদন্তের ফল ত্বরায় প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের নিকট পাঠান হইল। তিনি বিবরণী পাঠ করিয়া আদেশ করিলেন যে, বিদ্রোহী অশ্বারোহীগণকে দেশীয় সেনানীর দ্বারা পরিপুষ্ট সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের অপরাধের জন্য বিচারিত করা হউক। তাহার আদেশ অনুসারে পনর জন দেশীয় সেনানায়ক সমন্বিত বিচারপতিগণের বিচারালয় স্থির হইল। তাহাদের চৌদ্দজনের মতানুসারে অশ্বারোহীগণ দোষী সাব্যস্ত হইল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি দশ বৎসরের কঠিন ও সশ্রম কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইল। এই পঁচাশি জন অশ্বারোহীর মধ্যে উনপঞ্চাশ জন মুসলমান এবং ছত্রিশজন হিন্দু ছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মে তারিখের প্রত্যূষে মীরটের সেনা সকলকে এই আদেশ জ্ঞাপন করিবার জন্য এক বিশাল প্যারেড হইল। যে প্যারেডে মীরটে অবস্থিত শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সকল সেনার দল উপস্থিত ছিল। সমবেত সেনাদলের সম্মুখে এক এক ব্যক্তি করিয়া এই পঁচাশি জনকে ডাকিয়া তাহাদের সৈনিক-বসন বা উর্দ্দী খুলিয়া লওয়া হইল; ধীরে ধীরে তাহাদের প্রত্যেকের হাতে ও পায়ে হাতকড়ি ও বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইল, আর এক এক করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া প্যারেড ভূমির বাহিরে জেলের দিকে লইয়া

যাওয়া হইল। যাইবার সময়ে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের সঙ্গীদিগকে বলিল,—"ভাই, তোমরা মানুষ যদি হও, বাপের বেটা যদি হও, তাহা হইলে আমাদিগকে উদ্ধার করিও।" সেই বিরাট বাহিনীর একটি যোদ্ধাও এই আহ্বানের উত্তরে একটি কথাও কহিলেন না। সব নিস্তব্ধ, নিষ্কম্পবৎ দাঁড়াইয়াছিল, আর বালারুনের প্রথম জ্যোতি রেখা তাহাদের মাথার উপর দিয়া যেন সজীবতার কনককান্তি ও নিদাঘ-তাপ ঢালিয়া দিয়া যাইতেছিল। সব শেষ হইয়া গেল, সেই সমবেত সিপাহিদলের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যেন একটি প্রবল শ্বাস সশব্দে বাহির হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সিপাহি সকল স্বীয় আবাসভবনের দিকে চলিয়া গেল। প্যারেড শেষ হইল। মীরটের সেনাপতি হিউইট প্রধান সেনাপতিকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "দণ্ডিত সিপাহি সকল তাহাদের দণ্ডের অপমান যেন মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিয়াছে। অন্য সিপাহি শান্ত ও সংযত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এখানে আর কোন প্রকারের গোলযোগ নাই।" মীরটের ভীষণ নাট্যের প্রথম অঙ্ক এই ভাবে পরিসমাপ্ত হইল।

মীরটের এই কীর্তির সমাচার পাইয়া ভারতের প্রধান সেনাপতি এন্সন মহোদয় একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি মীরটের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠান যে, বিদ্রোহীদিগের দণ্ড ঠিক হইয়াছে বটে, পরন্তু প্যারেড ভূমিতে সকল সিপাহির সমক্ষে পঁচাশিজন উত্তেজিত ও উন্মুক্ত সিপাহিকে অমনভাবে হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরান ঠিক হয় নাই। এই ব্যবহারে সিপাহি সকল নিশ্চয়ই মর্মাহত ও অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছে। দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া এমন কার্য না করিলেই ভাল হইত। প্রধান সেনাপতি এন্সন অপেক্ষা বড়লাট ক্যানিং অধিক তীব্রতর ভাষায় স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, দণ্ডিত সিপাহি সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে দেখিয়া নিশ্চয়ই অন্য সিপাহি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিবেই। ইহার উপর পঁচাশিজন সিপাহিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেশীয় রক্ষকগণের অধীনে তাহাদিগকে জেলে পাঠান মূর্খতার পরকাষ্ঠা হইয়াছে। কেননা এই সময়ে মীরটে ১৮৫৩ জন গোরা এবং ২৯২২ জন সিপাহিসেনা উপস্থিত ছিল। মীরটের সেনাধ্যক্ষগণ অনায়াসে গোরার অধীনে দণ্ডিত সিপাহিদিগকে জেলে পাঠাইতে পারিতেন। জেলখানার রক্ষণাবেক্ষণের ভারও গোরার উপর ন্যস্ত করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া, উত্তেজিত সিপাহিদলের উপর সকল ভার রাখিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন। এরূপ নিশ্চিন্ততার ফল তাহাদিগকে হাতে হাতে পাইতে হইল। মীরটেই প্রথমে সিপাহিযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। সে কথা বর্ণনা করিবার পূর্বে, এই সময়ে আর্যাবর্তে সিপাহি ও দেশবাসী হিন্দু মুসলমানের মনে কোন ভাবের বিষম আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহার পরিচয় দিব।

ভারতবর্ষের অনেক স্থলে সাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরাজেরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহারা হিন্দু ও মুসলমানের নিত্য আহার্য সামগ্রীর সহিত অপবিত্র ও অস্পৃশ্য দ্রব্য মিশাইয়া দিতেছে। সাধারণের মধ্যে এক গল্প প্রচারিত হইয়াছিল যে, ইংরাজ মাত্রেই কোম্পানি বাহাদুর ও মহারানির আদেশে বাজারের ময়দা ও লবণের সহিত হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়াছে, যে ঘৃত দোকানে বিক্রিত হয়, তাহা অস্পৃশ্য বসা দ্বারা অপবিত্র করিয়াছে, এবং সাধারণের ব্যবহার্য চিনির সহিত অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। তাহারা এবংবিধ ভাবে সকলের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের জন্য এই সকল কুকার্য করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। অধিকন্তু লোকে যে সকল

কূপের জল পান করে, তৎসমুদয়ে গাভী ও শূকরের মাংস ফেলিয়া দিয়াছে। বাজারে বাজারে এই সকল গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল। বাজারে বাজারে এইসকল নানাভাবে—নানা ছাদে কথিত হইয়া সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক ও বিষাদের ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে আর একটা গল্প প্রচারিত হইল যে, বড় সাহেবেরা, রাজ্যের সমস্ত রাজা, ধনী, সম্ভ্রান্ত লোক, বণিক ও কৃষকদিগকে একত্র করিয়া, ইংরাজের রুটি খাইতে আদেশ দিয়াছেন।

এই সকল গল্পের মধ্যে অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দার কথাতেই জনসাধারণের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। মার্চ মাসে বারাকপুরের সৈনিক নিবাসে এই গল্প প্রচারিত হয়। এপ্রিল মাসের প্রথমে উহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রসারিত হইয়া পড়ে। এই সময়ে কানপুরে আটার মূল্য বড় বেশি হয়। ব্যবসায়ীরা এজন্য মীরট হইতে কানপুরে আটা আমদানি করিবার জন্য গবর্নমেন্টের নৌকা ভাড়া করে। মীরটের আটার প্রথম চালান পঁহুছিলে কানপুরে আটার বাজার অপেক্ষাকৃত নরম হয়, সাধারণ অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে আটা কিনিতে থাকে। কিন্তু অবশিষ্ট চালান আটা মীরটে পঁহুছিবার পূর্বেই কানপুরে এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ইউরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয়দিগের কলে এই আটা ভাঙা হইয়াছে, ইংরাজ ব্যবসায়ী সাধারণের ধর্মনাশের জন্য উহাতে গো শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। সংবাদ বিদ্যুৎবেগে কানপুরের সৈনিক বাজারে ও কানপুরের সৈনিক নিবাসে প্রচারিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে মীরটের ময়দার বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল—কোনও সিপাহি ঐ ময়দা স্পর্শ করিল না, কোনও শ্রেণির কোনও লোক উহা ক্রয় করিতে সাহসী হইল না। উহার মূল্য অল্প ছিল, বাজারের অন্যান্য সামগ্রী অপেক্ষা উহা অল্প মূল্যে পাওয়া যাইত, তথাপি কেহ উহা কিনিতে সম্মত হইল না। নিমেষ মধ্যে এই সংবাদ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে পৌঁছিতে লাগিল; সকলেই ভাবিতে লাগিল, ক্রমে এই অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দা বাজারে আরও অনেক আসিবে। ক্রমে সকলের গৃহেই এই ময়দা যাইবে, ক্রমে সকলেই ইংরাজের রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্ম পরিগ্রহ করিবে। যাহারা মীরটের ময়দা কিনিয়াছিল, তাহারা উহা ফেলিয়া দিল, যাহারা ওই ময়দার রুটি প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা সেই রুটি পরিত্যাগ করিল। সিপাহি, জমাদার, জনসাধারণ সকলেই আপনাদের মুখের গ্রাস ফেলিয়া পবিত্র হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। কানপুরের ময়দা ব্যবসায়ীরা আপনাদের ময়দা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া, লাভবান হইবার জন্য এই গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল, কি বসাযুক্ত টোটার প্রসঙ্গে দুষ্টলোকের দুষ্ট কল্পনায় উহা প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ধারিত হয় নাই।

এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আর একটি ঘটনার আবির্ভাব হয়। সহসা চাপাটি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইতে থাকে; এক ব্যক্তি এক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে একখানি চাপাটি দিয়া, উহা পরবর্তী গ্রামে পাঠাইতে বলে। পরবর্তী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি চাপাটিখানি আবার অন্য এক গ্রামে পাঠাইয়া দেয়। এইভাবে চাপাটি এক গ্রাম হইতে অন্য এক গ্রামে গিয়া পড়ে। কেহই এই চাপাটি লইতে অসম্মত হয় না, কেহই ইহা গ্রামান্তরে পাঠাইয়া দিতে বিলম্ব করে না। লোকের হাতে হাতে রুটিখানি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পল্লীগ্রামবাসীদিগের এই ব্যবহার প্রথমে গবর্নমেন্টের গোচর হয় নাই। গুরগাঁওর কালেক্টর ফোর্ড সাহেব উহা জানিতে পারিয়া, প্রথমে উক্ত

প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্নর কলবিন সাহেবের গোচর করেন। লেফটেনান্ট গবর্নর প্রত্যেক জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ঘটনার অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। আদেশ প্রতিপালিত হয়। কিন্তু ঘটনার কারণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে নানা মত পরিব্যক্ত হইতে থাকে। অধিকাংশ ব্যক্তিই এই মত প্রকাশ করেন যে, এই চাপাটি দেশের জনসাধারণকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতেছে, সকলে একত্র হইয়া, শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। চাপাটি দ্বারা সকলকে এই সমুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করা হইতেছে। একজন প্রধান রাজকর্মচারী গবর্নর জেনারেলকে এ সম্বন্ধে লেখেন, "চাপাটি সাধারণের খাদ্য দ্রব্য। লোকে উহা স্থানে স্থানে পাঠাইয়া সাধারণের মনে এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিতেছে যে, তাহাদের জীবনরক্ষার দ্রব্য শীঘ্র কাড়িয়া লওয়া হইবে। সুতরাং এই খাদ্যসামগ্রী রক্ষার জন্য সাধারণের প্রস্তুত হইয়া উচিত।" কেহ কেহ বলেন যে, কোন স্থানে মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইলে লোকে চাপাটি সেই স্থান হইতে আর এক স্থানে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, চাপাটি পাঠাইলে গ্রামের মড়ক অন্য স্থানে চলিয়া যাইবে, গ্রাম নিরাপদ হইবে। সুতরাং চাপাটি-প্রেরণ কুসংস্কারের একটি চিহ্ন। উহার সহিত কোনরূপ ভয়ঙ্কর বা বিপত্তিকর ঘটনার সংস্রব নাই। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে এইরূপে চাপাটি বিতরিত হইতে থাকে। কাপ্তেন কিটিং সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে নিমারে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুটি উপস্থিত হয়। এই সকল রুটি এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে প্রেরিত হইতে থাকে। ক্রমে উত্তর-ভারতবর্ষের অনেক স্থানে উহার বিতরিত হয়। ইন্দোরের দিক হইতে প্রথমে এই রুটি নিমারে পঁহুছিয়া ছিল। এই সময়ে ইন্দোরে ওলাউঠা রোগের বড় প্রাদুর্ভাব—প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক এই রোগে মরিতেছিল। ইহাতে নিমারের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইন্দোরের রোগ অন্য দেশে সংক্রামিত করিবার জন্য এই সকল রুটি পাঠান হইতেছে।"

এমনই উত্তেজনার সময়ে, দেশব্যাপী বিপ্লব সূচনার সময়ে, মীরটের সামরিক কর্তৃপক্ষগণ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়া সিপাহিযুদ্ধের প্রথম বহ্নিবিকাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে এরূপ ভাবে অভিযুক্ত সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা হইত; কিন্তু ৩ নং অশ্বারোহী দলের পঁচাশিজনকে কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দণ্ডের এই ব্যতিক্রম দেখিয়া সিপাহিমাত্রেই মনে করিল যে, কোম্পানি এইবার সিপাহিদিগকে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। সিপাহি তো প্রাণে মরিবেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুত্র কন্যাগণ অনাহারে মরিবে। এই চিন্তায় সিপাহিমাত্রেই একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। এই অধীরতার সমাচার গোরা সেনানীবর্গের গোচর করা হইয়াছিল। জনকয়েক ইংরাজ সেনানী কারাগৃহে যাইয়া বন্দিদিগের দেনা পাওনা অবগত হইয়া, তাহাদের আর্থিক অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া, তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু এ চেষ্টা আর কার্যে পরিণত করিতে হয় নাই।

শনিবারের সন্ধ্যার পূর্বে এই সকল ঘটিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে গোরা সৈন্য ও শ্বেতা সেনানীবর্গ নিজ বারিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মীরটের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সেনা নিবাসের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান ছিল এবং কালী (কারী নদীও বলে) নদীর একটি শাখা এই দুই সেনানিবাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। ফলে সিপাহিদিগের আবাসস্থান গোরাবারিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। মীরটের কর্তৃপক্ষগণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তাহাদের

আবাসস্থানে চলিয়া গেলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে সেই প্রবল বৈশাখের উত্তপ্ত নিশাকাল সুখে যাপন করিলেন। এদিকে সিপাহিদিগের আবাসস্থানে সমস্ত রাত্রি উদ্বেগ ও উত্তেজনায় সিপাহিরা দল বাঁধিয়া ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য বিনিদ্র হইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল। পরদিন রবিবার ১০ই মে তারিখে মীরটে খ্রিস্টান শ্বেতাঙ্গগণ সান্ধ্য বায়ু সেবন করিতে করিতে গির্জায় ঈশ্বরোপাসনা করিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে পথিমধ্যে সহসা বন্দুকের আওয়াজ শ্রুত হইল, আর দুই তিন দিকে গৃহদাহের ধূমস্তম্ভ যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। তখনও কেহই বুঝিতে পারে নাই যে কি হইয়াছে বা কি হইতেছে। খ্রিস্টানগণ গির্জায় পৌঁছিবার পূর্বেই মীরট নগর হইতে এমন একটা কোলাহল উত্থিত হইল যে, সে রবে দূরস্থিত গির্জাও কম্পিত হইয়া উঠিল। পাদ্রী সভয়ে "পুলপিট" হইতে নামিয়ে আসিলেন, খ্রিস্টান নরনারী সকল অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত বিপদের সম্ভাবনায় সভয়ে যেন একে অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া একস্থানে জড় হইয়া পড়িলেন।

আবার বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কামানের গম্ভীর নাদ মীরটের গগন পথকে কাঁপাইয়া তুলিল। চতুর্দিক হইতে সেই ভয়ঙ্করী কোলাহল ধ্বনি গাঢ়তর হইয়া উঠিল। যেন সেই ধ্বনি চারিদিক হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গির্জার নিস্তব্ধতাকে গ্রাস করিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের লোহিত আভা প্রজ্বলিত গৃহ সমূহের ধূম রাশিতে মিলিত হইল। সহসা নিশাকালের ঘন তমিস্রা মীরটের সেনানিবাসকে আচ্ছাদন করিল। এই সময়ে গির্জার "ঝাড়ু-বরদার" বা মেথর হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া পাদ্রীকে বলি, "হুজুর সিপাহি লোগ গল্‌বা কিয়া" অর্থাৎ মহাশয় সিপাহিরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। অন্ত্যজের মুখে এই প্রথম সিপাহিযুদ্ধের বার্তা ইংরাজ শ্রবণ করিল।

তৃতীয় নম্বর অশ্বারোহী সৈন্যের দল যখন গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন তাহারা বুঝিল যে, এইবার গোরা সেনা নিরস্ত্র হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় যাইতেছে। ইহাই শুভ অবসর। কিন্তু বিধির বিধানে কোন অজ্ঞেয় কারণে মীরটের গোরা সকল সেই ১০ই মে রবিবার অপরাহ্ণকালে নির্দিষ্ট সময়ে অর্ধ ঘণ্টা পরে গির্জায় যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এই অর্ধ ঘণ্টাকাল বিলম্ব হেতুই, মনে হয় সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন আকার ধারণ করিল। একবার যদি মীরটের সেই প্রায় ২০০০ গোরা সৈন্য নিরস্ত্র হইয়া পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে গির্জায় প্রবেশ করিত, তাহা হইলে পরদিন সোমবারের উষাকালে মীরটের একটি শ্বেতাঙ্গও জীবিত থাকিত না। বীর অশ্বারোহী সিপাহি তাহাদিগের উন্মত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাহাদের চন্দ্রকলাকৃতি উন্মুক্ত তরবারি তাহাদিগের মস্তকের উপর ঘুরাইয়া যখন "হর হর মহাদেও" বলিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছিল, যখন পদাতিক রেজিমেন্ট দলের প্রমত্ত পাঠানগণ "দীন দীন" ও "আল্লা হো আকবর" বলিয়া বহুকালের জড়তা ত্যাগ করিয়াছিল, তখন গোরাবারিকের গোরা সেনা সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল মাত্র। কিন্তু তখন প্রতিনিবৃত্ত হইবার, অথবা অস্ত্র সংবরণ করিবার আর উপায় ছিল না। যে প্রতিবিধিৎসার হলাহল প্রবাহ এতদিন সিপাহিদিগের হৃদয় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা সহসা বহির্মুখ হইল। আর কি তাহা চাপিয়া রাখা যায়?

কর্নেল মেকেঞ্জি বলিয়াছেন, "আমি জীবনে এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।" মীরটের গোরাবারিকের স্থির সমতল বিশাল প্রান্তরের উপর অপচীয়মান সূর্য-রশ্মির লোহিত প্রবাহ যেন চারিদিকে শোণিতধারা ঢালিতেছে, পূর্বদিকে চক্রবালের ক্রোড়ে

দহ্যমান গৃহ সকল হইতে উত্থিত অগ্নিশিখা সকল যেন কোটি কোটি সর্পজিহ্বার মতো লহ লহ করিয়া ছুটিতেছে, সন্ধ্যার ধূসরতা নগরের অসংখ্য গৃহের ধূমপুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া নিশার কৃষ্ণ যবনিকায় পরিণত হইতেছে, আর এই দৃশ্যের মধ্যস্থলে ৩ নম্বর অশ্বারোহী সেনাদলের অশ্বশাদিগণ বহ্নিনয়নে তাহাদের অগ্নিরেখা সদৃশ তলওয়ারগুলি কোষমুক্ত করিয়া যখন "হর হর মহাদেব" বলিয়া চলিতেছিল, যখন পাঠানগণ উন্মত্তের ন্যায় নাচিতে নাচিতে "আল্লা হো আকবর" ও "দীন দীন" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিতেছিল, তখন প্রকৃতই মনে হইয়াছিল যে, ভারতের ভাগ্যবিধাতা দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন।"

এদিকে সিপাহি দলের ইংরাজ সেনানায়কগণ সিপাহিদিগকে শান্ত করিবার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অনেকেই পথিমধ্যে সিপাহির গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। কর্নেল ফিনিস সিপাহিদিগের অধিনায়ক ছিলেন। সিপাহিরা তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, তিনি সেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া তাহার সিপাহিদলের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হলেন। তাহাকে দেখিয়া পদাতি সিপাহির দল বন্দুক নামাইয়া হেটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা যেমন পুত্রকে বুঝায়, গুরু যেমন শিষ্যকে প্রবোধ দেয়, ঠিক সেইরূপ ভাবে কর্নেল ফিনিস তাহাদিগকে কত কথাই বলিলেন, কত উপদেশ বাণী শুনাইলেন,—সকলে নীরব নিস্পন্দ হইয়া রহিল। এমন সময়ে পূর্বদিক হইতে ৩ নং অশ্বারোহীদল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল। কড় কড় করিয়া আট শত কাড়াবীণ এক সঙ্গে গর্জিয়া উঠিল, কর্নেল ফিনিস ও তাঁহার সমভিব্যাহারী অধস্তন শ্বেতাঙ্গ সেনানায়কগণ এক সঙ্গে অশ্ব হইতে ধুলায় লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সিপাহিদিগের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, "চল আমরা দিল্লি যাই।" অমনি অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সিপাহি সকল গাজিয়াবাদের পথে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিল।

অন্য দিকে মীরটের গোরাবারিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোরারা তখন নিরস্ত্র, সহসা বিপৎপাতে বিহ্বল। তাহারা বন্দুক পায় তো টোটা পায় না, টোটা পায় তো বন্দুক পায় না। অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে একদল গোরা অশ্বারোহী কেবল কীরীচ হাতে করিয়া গির্জার দিকে ছুটিল। তাহারা গির্জায় গিয়া দেখে যে গির্জা মনুষ্যশূন্য। অনেক ইংরাজ নর নারী প্রাণভয়ে মীরট নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। একদল রোহিলা সৈন্য নগর লুণ্ঠন করিবার সময়ে ইহাদিগের অনেককে সঙ্গীনের খোঁচায় বধ করে। পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে নগর পরিভ্রমণের সময় বহু অর্ধ দগ্ধ, দ্বিখণ্ডিত, শ্বেতাঙ্গের দেহ গোরা সৈন্য টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই ভাবে সিপাহিযুদ্ধে ভীষণ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় ভারতক্ষেত্রে আরম্ভ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মীরটের নানাকথা

মীরটের সকল সিপাহির দল সমবেত হইয়া ধীরে ধীরে দিল্লির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য একটি গোরাও অগ্রসর হইতে পারে নাই। গোরা বারিকে ব্যবস্থার দোষে বিসম গোলমাল বিরাজ কবিতেছিল। কে কাহার খবর লয়, কে কাহার কথা শুনে, তাহার কোনই স্থিরতা ছিল না। অশ্বারোহী অশ্বহীন হইয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, পদাতি ঘোড়ায় চড়িয়া বিভ্রান্তের ন্যায় চারিদিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। গোরা বারিকে এমন একজন ইংরাজ সেনানী তখন উপস্থিত ছিলেন না, যিনি স্বীয় স্কন্ধে সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া গোরার দলকে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। গোরা সৈনিকদল যদিও বহু বিলম্বে ও অতি কষ্টে তাহাদের রাইফেল বন্দুক খুঁজিয়া পাইল, কিন্তু পর্যাপ্ত টোটা সংগ্রহ করিতে পারিল না। অমূল্য সময় বাজে হুড়াহুড়িতে অপব্যয়িত হইয়া গেল। সে দিন মীরটের গোরা বারিকে যদি একজন যোগ্য ইংরাজ সেনানী থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে তাহার অধীন দেড় হাজারের উপর গোরা সেনার দল লইয়া সিপাহিদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে পারিতেন। সে যুদ্ধে যদি সিপাহির দল পরাজিত হইত, তাহা হইলে মীরটেই সিপাহিযুদ্ধের অবসান হইয়া যাইত। অথবা গোরার দল যদি সিপাহির কাছে হারিয়া যাইত, তাহা হইলে, মনে হয়, আর্যাবর্তে চিরদিনের জন্য ইংরাজ প্রাধান্য চূর্ণ হইয়া যাইত। তাহা তো হইবার নহে, তাই এক পক্ষে গোরা বারিকে ভয়ে, ত্রাসে, অব্যবস্থায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, অন্য পক্ষে সিপাহির দল গোরাবারিকের হুড়াহুড়িকে যুদ্ধোদ্যম মনে করিয়া, এবং গোরার দলকে সে সময়ে যুদ্ধদান উপযোগী নহে ভাবিয়া, পূর্বাহ্ণেই দিল্লি দখলের জন্য মীরট ত্যাগ করিয়া গাজিয়াবাদের পথে অগ্রসর হইল। গোরার দলে যেমন যোগ্য ও নির্ভীক সেনানীর অভাব হইয়াছিল, সিপাহির দলেও তেমনি তেজস্বী সেনানায়কের অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছিল। এক পক্ষে একজন সমরবিশারদ সেনানায়ক থাকিলে সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস স্বতন্ত্র ভাবে লিখিতে হইত।

পরন্তু ইংরাজ পক্ষে একটা বাঁধাবাঁধি শাসনপদ্ধতি ছিল, কর্তার উপরে কর্তা থাকিয়া সকলকে পরিচালিত করিতেছিল, স্থিরধী লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় বসিয়া ভারতের অবস্থা শান্তচিত্তে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, শত শত সুযোগ্য ইংরাজ বীর যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাই মীরটের প্রমাদ অল্পদিনের মধ্যে সংশোধিত হইয়াছিল। ইংরাজ পরে বেশ সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সিপাহির দলে কেহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনমান্য বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন না,—এমন কেহ ছিলেন না, যাহার কথা সকল সিপাহি সমভাবে অবনত মস্তকে মান্য ও গ্রাহ্য করে। সিপাহিরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। বহুকাল ইংরাজের সামরিক বিভাগের শাসননিগড়ের অধীন থাকিয়া, এখন

একেবারেই তাহারা স্বাধীনতা পাইয়াছিল। তাই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া সিপাহি সকল নিজ নিজ খেয়াল মতো কার্য করিতে আরম্ভ করিল। ইহার উপর তাহারাও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতালিপ্সু হইয়া ইংরাজের বন্ধন ছেদন করে নাই,—তাহারা তো স্বদেশ ও স্বজাতিকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করিবার মানসেই তরবারি কোষমুক্ত করে নাই—অসন্তোষ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও ঘৃণায়—শেষে প্রতিবিধিৎসার বৃশ্চিকদংশন-জ্বালায় অধীর হইয়া সহসা তাহারা ইংরাজের বিরোধী হইয়াছিল। সে বিরোধের ভাব দুই দশটা ইংরাজ নরনারীকে বধ করিয়া, দুই দশটা সরকারি খাজনাখানা লুঠ করিয়া, দুই দশদিন মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দশদিকে ছুটাছুটি করিয়া এবং স্থানাস্থানে অবিচারে স্বীয় প্রতাপ ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া অবশেষে কর্পূরের ন্যায় উপিয়া গেল। পরিশেষে যখন সিপাহি দেখিল যে, "রামে মারিলেও মরিতে হয়, রাবণে মারিলেও মরিতে হয়" তাহাদের মারীচের দশা ঘটিয়াছে; ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিলেও মহারণ প্রাঙ্গণে প্রাণপাতের সম্ভাবনা আছে, নিরস্ত্র হইয়া দেশে ফিরিলেও ফাঁসিকাষ্ঠের ভয় আছে, তখন সিপাহি দল তাহাদের সহজ বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সমর ব্যাপারে যোগ্য সেনানায়কহীন হইয়া শত মাতঙ্গের বল প্রকাশ করিলেও কোন ফলোদয় হয় না, মরণই নিশ্চয় হয়। তাই সিপাহি মরিলও বটে, শেষে বীরের ন্যায় মরিলও বটে, পরন্তু এক কাঠা জমিও স্বাধীন করিতে পারিল না, দশজনকেও স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ দিতে পারিল না—পরিণামে ইংরাজই জয়ী হইলেন।

পৃথিবীর কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতা লাভের এমন পদ্ধতি কোথায়ও লিখিত হয় নাই। দেশের ও জাতির স্বাধীনতা যাহারা অর্জন করিতে ব্রতী হইবে, তাহাদিগকেই প্রথমে পরাধীন হইতে হইবে। দেহ, মন, প্রাণ, ইহকাল, পরকাল সর্বস্ব একজন যোগ্যতর অধিনায়কের অধীন করিতে হইবে। আর সেই অধিনায়ক তাহার বিশাল হৃদয়ে স্বদেশের ও স্বজাতির আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সর্বস্বকে জড়াইয়া ধরিয়া, তীব্র মেধা ও মনীষার বলে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানের সকল ঘটনার আলোচনা করিয়া যদি মঙ্গলের পথে অধীন জনগণকে পরিচালিত করিতে পারেন, তবেই সে চেষ্টা ক্ষেমঙ্করী হইতে পারে,—তবেই অসাধ্য সাধন হয়, অঘটন ঘটিয়া যায়—চিরদিনের পরাধীন পরাজিত দেশীবাসী আবার স্বাতন্ত্র্যের পীযূষকণার আস্বাদন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। সিপাহিযুদ্ধে এমন অঘটন ঘটে নাই, কাজেই অপার্থিব ফল লাভে সকলেই বঞ্চিত হইয়াছে।

যে সিপাহি কেবল অর্থলোভে-এবং পশুবলের চর্চা রাখিবার—বাসনায় বাগানের আগাছা ও পরগাছা তোলার মতন—ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল, শিখ প্রভাবকে পর্যুদস্ত করিয়াছিল, হিন্দুর হিন্দুত্বের অপহ্নুতি ঘটাইয়াছিল, —যাহারা কেবল ভাঙ খায়, লড়াই বুঝে এবং লুঠ করে—যাহারা ইংরাজের নিকট হইতে আশার মতো ফললাভ করিতে পারে নাই বলিয়া ইংরাজ বিদ্বেষী হইয়াছিল,—তাহাদের মনে স্বাধীনতার হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার নহে। ইংরাজ কোম্পানি সিপাহি পশু শক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভারতজয় করিয়াছিলেন, পরে, কার্যোদ্ধার হইলে, চতুর শিকারির ন্যায় সেই সিপাহি পশুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিলে সিপাহি স্বেচ্ছায় ইংরাজের প্রভাব অনলে ঝম্প প্রদান করিয়া পুড়িয়া মরিল; ইংরাজ ভারতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। ইহাই সিপাহিযুদ্ধের মর্মকথা। এ মর্মের উদ্‌ঘাটন প্রথমে মীরট সেনানিবাসে

হইয়াছিল এবং অযোধ্যা পুনর্জয়ের পর সে মর্মে চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে।

সিপাহিযুদ্ধের বোধ সৌকার্যার্থে সূচনাতেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এ ব্যাপারের প্রথমেও কোন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে নাই, মধ্যেও কোন অপার্থিব শক্তির প্রকাশ পায় নাই, পরিণামেও কোন অতিপ্রাকৃত প্রভাব প্রকট হয় নাই। যে সকল ঘটনার সংযোগ-বিয়োগে যেমন ফলপ্রাপ্তি হয়, সিপাহিযুদ্ধের সময় তেমনি ঘটনার সঙ্গতি হইয়াছিল, তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তিও হইয়াছে। তবে কথা এই, ইংরাজ ভারতের সম্রাট হইয়া থাকিলেও সিপাহিযুদ্ধের কালে যেমন ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে চিনিতে পারে নাই, এখনও তেমনি ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী বিষয়ে অজ্ঞ আছেন। এই অজ্ঞতা নিবন্ধন ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এখনও সিপাহিযুদ্ধের প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারেন নাই। নিজের খেয়ালমতো তাহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতের ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় অনুচিকীর্ষার মোহে আত্মহারা হইয়া সেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে, সিপাহিযুদ্ধের প্রকৃত তথ্য কোন পক্ষই অবগত হইতে পারেন নাই।

যদি স্বাধীনতালিপ্সু হইয়া, প্রকৃত ধর্মভয়ে ত্রস্ত হইয়া সিপাহি ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইত তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান সিপাহি মাত্রেই স্বাধীনতার আহ্বানে একসঙ্গে ইংরাজ শাসন ছিন্ন করিত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। অনেক সিপাহির দল ইংরাজের বশীভূত ছিল, অনেক সিপাহির দল অনিচ্ছায় ইংরাজ শাসন অগ্রাহ্য করিলেও, পরে তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। অনেক সিপাহি ইংরাজের এই দুর্দিনে সর্বস্ব পণ করিয়া ইংরাজের সেবা করিয়াছিল। যদি ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহি সত্যসত্যই ধর্মভয়ে ভীত হইত, তাহা হইলে কেহই ইংরাজের দেওয়া টোটা ব্যবহার করিত না। কিন্তু যাহারা ইংরাজের অনুগত হইয়া স্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে বন্দুক চালাইয়াছিল, তাহারাও টোটা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল—দাঁতে কাটিয়া টোটা বন্দুকে পাদিয়াছিল! তাহাদের জাতি যায় নাই কি? পরে তাহাদিগের আত্মীয়স্বজন গ্রামে তাহাদিগকে কি একঘরে করিয়াছিল? না—এ সব কোন কিছুই ঘটে নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, দুই লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান সেনার মধ্যে এক লক্ষ সিপাহি ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও, বাকি এক লক্ষ তো ইংরাজের স্বপক্ষে ছিল; তাহাদের যখন জাতি যায় নাই, ধর্ম নষ্ট হয় নাই, তাহারা যখন অম্লান মুখে টোটা ব্যবহার করিতে পারিয়াছিল, তখন টোটায় গো-শূকরের বসার কথা একটা কথার কথা মাত্র—সকলকে সম্মিলিত করিবার একটা রব মাত্র। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, সিপাহি যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধও নহে, স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রজা-শক্তির উন্মেষও নহে। উহা যেন সমাজদেহে ধনুষ্টঙ্কার রোগের একটা বিষম আক্ষেপ প্রক্ষেপ—একটা দুঃস্বপ্নের বিকট বিকাশ!

মীরটের পরবর্তী ঘটনা সকলের আলোচনা করিলে আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সকলের সার্থকতা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মীরটে তিন জন প্রধান ইউরোপীয় সেনাপতি ছিলেন। ইহাদের একজন তৃতীয় অশ্বারোহীদলের কর্নেল, একজন মীরটের সৈনিক নিবাসের ব্রিগেডিয়ার এবং আর একজন মীরটের সমস্ত সৈনিকদলের সাধারণ অধ্যক্ষ। তৃতীয় অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষ উপস্থিত সময়ে আপনাকে নিরাপদ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া যখন এই

দলের অপরাপর অফিসরেরা শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে গিয়াছিলেন, তখন কর্নেল স্মাইথ তথায় উপস্থিত হন নাই। এ সম্বন্ধে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "তৃতীয় অশ্বারোহীদলের প্রায় সকল অফিসারই শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈনিকনিবাসের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে এই সৈনিকদলের সেনাপতি তাহার কার্যস্থলে উপস্থিত হন নাই। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও তাহাকে সৈনিকনিবাসে দেখা যায় নাই। কর্নেল স্মাইথ আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তৃতীয় অশ্বারোহীদল যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে, এই সংবাদ যখন কর্নেল স্মাইথের নিকট পঁহুছে, তখন সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হওয়া তাহার প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি কর্তব্যসাধনে মনোযোগী হন নাই। তাহার এই অমনোযোগের ফলে বিপদ গুরুতর হইয়া উঠে। তিনি কমিশনারের গৃহে গিয়াছিলেন, সেনাপতির বাসভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ব্রিগেডিয়ারের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন; এইরূপে সর্বত্রই তাহার গমনাগমন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনার সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হন নাই। উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য কামান সকল একত্র করা হইতেছিল, ইউরোপীয় সৈনিকেরা আসন্ন বিপদ দূর করিবার জন্য অস্ত্রপরিগ্রহ করিতেছিল; কিন্তু কর্নেল স্মাইথ আপনার সৈনিকদলের কার্য-কলাপের দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। এই সময়ে তৃতীয় অশ্বারোহীদলের কাপ্তেন ক্রেগী স্মাইথের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি গোলযোগের সূত্রপাত হইতে দেখিয়াই আপনার সৈনিকগণের সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে যাইতে বলেন। সৈনিকেরা কাপ্তেন ক্রেগীর আদেশ অগ্রাহ্য করে নাই। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ধীরভাবে তাহার আজ্ঞানুবর্তী হয়। তৃতীয় অশ্বারোহী সৈনিকদলে কাপ্তেন ক্রেগীর বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কাপ্তেন ক্রেগী এই সঙ্কটকালে যখন আপনার সৈনিকদিগের সম্মুখে অশ্বচালনা করিয়া তাহাদিগকে তাহার আদেশ পালন করিতে বলিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে তাহার পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইল। তাহারা কহিল যে, অবরুদ্ধ সিপাহিদিগের বিমুক্তির জন্য যুদ্ধ হইবে, ইহা পূর্বেই তাহাদের গোচর হইয়াছিল, এখন তাহারা তাহাদের কাপ্তেনের আদেশ পালনে প্রস্তুত রহিয়াছে। কাপ্তেন ক্রেগী ইহা শুনিয়া, তাহাদিগকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। এই সময়ে একটি ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি, সেনাপতি স্মাইথের নিকট হইতে কোন আদেশ পাওয়া গিয়াছে কি না, এ বিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক উত্তর দিলেন,—"সেনাপতি আপনার প্রাণ লইয়া পলাইয়াছেন—কোন আদেশ দেন নাই।" কেহ কেহ নির্দেশ করেন যে, এই কথা প্রকৃত নহে। যে হেতু কর্নেল স্মাইথ অফিসারদিগকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু এই আদেশ তাহাদের নিকট পৌঁছে নাই। পৌঁছিলেও, তখন উহাতে কোন ফল হয় নাই। কর্নেল স্মাইথ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিরা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াতে ছয়জন সৈনিক কর্মচারী তাহার গৃহে আসিয়া লুকায়িত হন। উহার অব্যবহিত পরেই তিনি সকল বিষয় জানিবার জন্য সেনাপতি হিউইটের নিকট গমন করেন। কাপ্তেন ক্রেগী আর কোন কথা কহিলেন না। উত্তেজিত অশ্বারোহী সৈনিকদলের অভিমুখে সবেগে অশ্বচালনা

কয়েদীদিগকে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উপস্থিতির পূর্বেই, উন্মত্ত সিপাহিরা কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিয়াছিল। যে ৮৫ জন অবরুদ্ধ সিপাহি আপনাদের সহযোগীগণের সাহায্যে শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়াছিল, এখন তাহাদের সহিত ক্রেগীর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত ও দ্রুতগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া দিল্লির অভিমুখে যাইতেছিল। কাপ্তেন ক্রেগী এই সময়ে ইহাদের সম্মুখবর্তী হইলেন। ইহারা আপনাদের কাপ্তেনকে চিনিতে পারিল; কিন্তু তখন কাপ্তেনের কোন অনিষ্টসাধনে ইহাদের প্রবৃত্তি হইল না। ইহারা কাপ্তেনের সদাশয়তার পরিচয় পাইয়াছিল। আপনাদের সৎপরামর্শদাতা বন্ধু ভাবিয়া ইহারা কাপ্তেনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত, এ সময়েও ইহারা শ্রদ্ধা প্রকাশে বিমুখ হইল না। ইহারা কাপ্তেন ক্রেগীকে সম্মুখে দেখিয়া আহ্লাদের সহিত বলিল যে, তাহারা বিমুক্ত হইয়া আপনাদের কাপ্তেনের যথোচিত আশীর্বাদ করিতেছে। কাপ্তেন ক্রেগী আর কাল বিলম্ব না করিয়া, তৃতীয় অশ্বারোহীদলের পতাকা রক্ষার জন্য সৈনিকনিবাসের দিকে যাইতে লাগিলেন। গন্তব্য পথ রণোমত্ত পদাতি সৈনিকদল ও বাজারের লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, সকলেই বন্দুক ছুড়িতেছিল। একটি ইউরোপীয় মহিলা শকটারোহণে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সৈনিকপুরুষ সহসা তাহাকে সঙ্গীনের খোঁচায় বিদ্ধ করিল। কাপ্তেন ক্রেগী উক্ত সৈনিককে হস্তস্থিত তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ড করিলেন। কিন্তু মহিলাটির প্রাণরক্ষা হইল না। ইহার মধ্যে বন্দুকের একটি গুলি কাপ্তেন ক্রেগীর পার্শ্ব দিয়া সন করিয়া চলিয়া গেল। ক্রেগী পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন সামরিক পরিচ্ছদশূন্য সৈনিক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার গুলি ছুড়িতে উদ্যত হইয়াছে। দেখিয়াই কাপ্তেন ক্রেগী কহিলেন, ''আমাকে লক্ষ্য করিয়াই কি পিস্তল ছুড়িতেছ।'' সৈনিক পুরুষ উন্মত্ত হইয়াছিল। উন্মত্ত অবস্থায় বিকট চিৎকার করিয়া সে বলিল, ''হাঁ; আমি তোমার শোণিতপাত করিব।'' কাপ্তেন ক্রেগী তখন সেই সিপাহির প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, একবার গুলি ছুড়িলে নিকটবর্তী অপরাপর সিপাহিরা সকলেই তাহাব বিপক্ষে দাঁড়াইবে। সুতরাং তিনি গুলি না চালাইয়া সমীপবর্তী সিপাহিদিগকে কহিলেন যে, তিনি বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইবেন, ইহাই কি সকলের ইচ্ছা? সমীপবর্তী সিপাহিরা একবাক্যে উত্তর করিল—''না।'' এই কথা বলিয়াই তাহারা সেই উন্মত্ত সিপাহিকে বারংবার পশ্চাদ্দিকে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহাকে বধ বা অবরোধ করিতে চেষ্টা করিল না। কাপ্তেন ক্রেগী মুহূর্ত মধ্যে তড়িৎগতিতে সৈনিক নিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। যখন তিনি আপনার আবাস ভবনের নিকট দিয়া চলিয়া যান, তখন তাহার সঙ্গে যে সকল সিপাহি ছিল তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহ তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে কি না? সিপাহিরা সকলেই তাহার আদেশ পালনে আগ্রহ দেখাইতে থাকে। কাপ্তেন ক্রেগী বলিলেন, ''আমি কেবল চারিজনকে এই কার্যে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করি।'' কাপ্তেন ক্রেগীর কথা শুনিবামাত্র সকলেই এই কার্য গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। কাপ্তেন তাহার স্ত্রীকে এবং গৃহের দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য ক্রেগী প্রথম জনকে আপনার আবাস-গৃহে পাঠাইয়া অবশিষ্ট চারি লোকের সহিত সৈনিকনিবাসের অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে কর্নেল উইলসন মীরটের কামান রক্ষকদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি

সিপাহিদিগের সমুত্থান সমাচার শুনিবামাত্র কামান সজ্জিত করিয়া সৈনিকনিবাসের অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিকে সিপাহিরা উন্মত্তভাবে ভীষণ অনলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের গুলিবৃষ্টিতে ইংরাজগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, অনেকে আত্মীয়স্বজনের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাদিগকে লইয়া নির্জন ও নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করিতেছিলেন। সেনাপতি উইলসন সমস্ত ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান লইয়া উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইতে না হইতেই নরশোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সিপাহিরা এই উত্তেজনার সময়ে, উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য, ঘটনাস্থলে ইউরোপীয় সৈন্যের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। যখন সকল সৈনিকপুরুষ আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শ্রেণিবদ্ধ হইল, অদূরে কামান সকল যখন সিপাহিদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া রাখা গেল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। এই সময় এতদ্দেশীয় সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়া গোরার দল কোন সিপাহির সাক্ষাৎ পাইল না। সকলে কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। পদাতি সৈনিকনিবাস, কাওয়াজের সুপ্রসর ক্ষেত্র, সমস্তই শূন্য বোধ হইল। সেনাপতি হিউইট কোন সশস্ত্র সিপাহিকে সম্মুখে পাইলেন না। সেনাপতি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেন, তাহার সমুদয় চেষ্টা এখন বিফল বলিয়া বোধ হইল। তাহার সৈনিকগণ যুদ্ধসজ্জায় দণ্ডায়মান ছিল, কামান সকল যথারীতি সজ্জিত রহিয়াছিল; কিন্তু যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদের কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। অশ্বারোহী সৈনিকদলের আবাসগৃহের নিকটে কয়েকজন সিপাহির দেখা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইবামাত্র তাহারা অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল। নিকটবর্তী বৃক্ষবাটিকায় অথবা আবাসগৃহের পশ্চাদ্ভাগে তাহারা লুকায়িত আছে ভাবিয়া সেনাপতি সেই দিকে কামান ছুড়িতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল, কিন্তু নির্দিষ্ট সিপাহিদিগের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রাত্রি সমাগমে কাহারও অবস্থিতি জানিতে না পারায় কামানের সন্ধান ব্যর্থ হইল। সিপাহিরা ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে ভাবিয়া কর্নেল উইলসনের পরামর্শে, সেনাপতি সেই দিকে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। সেনাপতির আদেশে গোরা সৈনিক পুরুষগণ আবার আপনাদের গৃহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই সময় চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। চন্দ্রালোক ইউরোপীয় সৈনিকেরা দেখিল যে, দূরে আপনাদের আবাসগৃহ সকল প্রজ্বলিত হইয়াছে। সৈনিকেরা ইহা দেখিয়া ত্বরিতগতিতে ভয়াবহ দৃশ্যের রঙ্গভূমির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কিন্তু সেখানেও সিপাহিদিগের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড হুতাশনে গৃহ সকল দগ্ধ হইতেছিল, করাল অগ্নিশিখায় চারিদিক উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভীষণ শব্দে দিগন্ত পরিপূরিত হইয়াছিল। ইংরাজ সৈনিকেরা এমন সময়ে সেই স্থানে আসিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত হৃদয়ে সেই ভীষণ কাণ্ড চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

এই ভীষণ অগ্নি ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাস হইতে কর্মচারীদিগের গৃহ, তাহাদিগের গৃহ হইতে অন্যান্য ইংরাজদিগের আবাসভবনে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গৃহদাহের বিকট শব্দে, গৃহবাসীদিগের আর্তনাদে, উন্মত্ত সিপাহিদিগের ভৈরব হুঙ্কারে চারিদিক কোলাহলময় হইয়া উঠিল। যে সকল অশ্ব আস্তাবলে আবদ্ধ ছিল, উহারা বিকট

চীৎকার করিতে করিতে প্রজ্বলিত অনলে আত্মবিসর্জন করিতে লাগিল। ইংরাজ মহিলাগণ ও ইংরাজ বালকবালিকারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইল; কেহ অন্ধকারে কোন গোপনীয় স্থানে আশ্রয় লইল, কেহ বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সৈনিকগণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিল, কেহ বা প্রাণের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অগ্নি-রাশিতেই ভস্মীভূত হইল।

এই সঙ্কটকালে যে সকল ভারতবাসী আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও বিপন্ন ইংরাজদিগকে রক্ষা করে, তাহাদিগের কথা এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল। মীরটের কমিশনর গ্রিথেড সাহেব এবং তাহার বনিতা বিশ্বস্ত দেশীয় ভৃত্যদিগের সাহায্যে আত্মরক্ষা করেন। এই সময়ে সর্দার বাহাদুর সৈয়দ মীর খাঁ নামক একজন আফগান সৈনিকপুরুষ মীরটে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আফগানযুদ্ধের সময়ে যে সকল ইংরাজ কাবুলে অবরুদ্ধ ছিলেন, সৈয়দ মীর খাঁ তাহাদের সবিশেষ সাহায্য করাতে, গবর্ণমেন্ট তাঁহার মাসিক ৬০০্ শত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। মীরটে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র এই সৈনিকপুরুষ এবং তৃতীয় অশ্বারোহীদলের একজন আফিসর, কমিশনরকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। কমিশনর তাড়াতাড়ি আপনার স্ত্রী ও আর কয়েকটি শরণাগত ইংরাজ মহিলাকে লইয়া গৃহের ছাদের উপর লুক্কায়িত হন। অবিলম্বে উন্মত্ত সিপাহি সকল সেখানে উপস্থিত হয় এবং অবিলম্বে গৃহের নীচে আগুন জ্বালাইয়া গৃহস্থিত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে গৃহের নিম্নভাগ প্রজ্বলিত অগ্নিতে পরিব্যাপ্ত হয়, গৃহের চাবিদিক ধূমরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মুহূর্ত মধ্যেই অনলশিখা সবেগে গৃহের উপরিভাগে উঠিতে থাকে। কমিশনর কয়েকটি কুলনারীর সহিত ভীতচিত্তে ও নিরাশহৃদয়ে গৃহের ছাদে থাকিয়া আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া আকুল হন। নিম্নভাগে নিদারুণ হুতাশন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, চারিদিকে বিপক্ষ লোক দাঁড়াইয়া কমিশনরের জীবন নষ্ট করিতে আগ্রহ দেখাইতেছিল; এ সময়ে ভৃত্যগণ বিশ্বস্ততা না দেখাইলে, বিপন্নদিগের কখনও উদ্ধার হইত না। বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ আপনাদের সদাশয়তা হইতে বিচ্যুত হইল না, তাহারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও বিপন্ন প্রভুর উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। কমিশনরের একজন প্রধান মালী ছিল। ইহার নাম গোলাপ সিং। যখন আগুন বাড়িয়া উঠিল, সশস্ত্র লোকে যখন গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল, তখন গোলাপ সিং ভাবিল যে, আক্রমণকারিগণ সম্পত্তি লুণ্ঠনের জন্য যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে, তাহাতে ইহাদিগকে অন্য স্থানের কোন সম্পত্তি লুঠ করিবার পরামর্শ দিলে ইহারা সহজেই প্রভুর গৃহ পরিত্যাগ [illegible] যাইবে। গোলাপ সিং উপস্থিত বুদ্ধিবলে এইরূপ স্থির করিয়াই আক্রমণকারীদিগের প্রতি আপনার যথোচিত সমবেদনা দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদিগকে বলিল যে, এখন আক্রান্ত গৃহে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল নাই, যেহেতু তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী পূর্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গির্জার অভিমুখে গিয়াছেন। সুতরাং এই গৃহ ছাড়িয়া, যদি তাহারা উহার সহিত আইসে, তাহা হইলে সে অদূরে একটি প্রকাণ্ড গুদাম দেখাইয়া দিতে পারে; উহা লুঠ করিলে অনেক সম্পত্তি লাভ হইবে। একটি খড়ের গাদার পশ্চাতে ফিরিঙ্গীরা পলাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেও পাওয়া যাইবে। আক্রমণকারীগণ ইহা শুনিয়াই, কমিশনরের গৃহ পরিত্যাগ করিল। সেই স্থানে কমিশনরের যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা সমুদয় জানিলেও বিপক্ষদিগকে কিছু কহিল না।

আক্রমণকারিগণ নিষ্কোষিত তরবারি আস্ফালন করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভীত হইয়া আপনাদের কর্তব্যবুদ্ধিতে বিসর্জন দিল না। সকলেই নির্ভয়ে ও দৃঢ়তাসহকারে গোলাপ সিংহের কথা সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিল। তাহাদের প্রভু যে ছাদের উপরে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তাহারা সে সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। আক্রমণকারিগণ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কমিশনরের গৃহ পরিত্যাগ করিল। ভৃত্যগণ এখন সময় পাইয়া গৃহের প্রাচীরের একদিকে মই ফেলিয়া দিল। কমিশনর ও কয়েকটি মহিলা সেই মই অবলম্বন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই প্রচণ্ড অনলের প্রতাপে গৃহের ছাদ ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত পড়িয়া গেল। নিকটে একটি উদ্যান ছিল; বিপন্নগণ তথায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আক্রমণকারিগণ আর তথায় উপস্থিত হইল না। কমিশনর ও তাহার পত্নী অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলার সহিত সেই নির্জন উদ্যানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গোলাপ সিং একখানি গাড়ি আনিয়া দিলে, ইহারা মীরটের সমর শিক্ষাগৃহে উপনীত হইলেন। এই শিক্ষাগৃহে অপরাপর ইউরোপীয়েরাও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরটের দুর্গ ছিল না, এই শিক্ষাগারই উপস্থিত সময়ে দুর্গস্বরূপ হইয়াছিল।

কমিশনর গ্রিথেড সাহেবের জীবন যেরূপে রক্ষা পাইয়াছিল, মীরটের অন্য সকল ইংরাজের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিয়া উঠে নাই ইংরাজ সৈনিকপুরুষেরা উত্তেজিত সিপাহিদিগের গতিরোধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে যাইলে তাহাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তানগণ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। উন্মত্ত লোকের অস্ত্রাঘাতে এই সকল নিরপরাধ মহিলা ও বালক বালিকার প্রাণ নষ্ট হয়।

কাপ্তেন ক্রেগীর স্ত্রী আপনার আবাসগৃহে থাকিয়া উপস্থিত বুদ্ধিবলে এই দুর্ঘটনায় আত্মরক্ষা করেন। তিনি যে গৃহে ছিলেন, তাহার নিকটবর্তী আর এক গৃহে একটি ইউরোপীয় মহিলা থাকিতেন। যখন বিপদ বাড়িয়া উঠিল, উন্মত্ত সিপাহিরা যখন গৃহে গৃহে অগ্নি দিতে প্রবৃত্ত হইল, প্রজ্বলিত অনলে গৃহের পর গৃহ যখন ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন কাপ্তেন ক্রেগীর স্ত্রী আপনার প্রতিবেশিনীকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত হন। তাহার আদেশে ভৃত্যগণ সেই শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আনিতে গমন করে। ভৃত্যগণের তথায় যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এই বিলম্বেই সমুদয় শেষ হইয়া যায়। ক্রেগীর ভৃত্যেরা নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দেখে যে যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষত বিক্ষত দেহ গৃহের মেজেয় পড়িয়া রহিয়াছে, শোণিত স্রোত অবিরল ধারায় বহির্গত হইয়া সমুদয় স্থান প্লাবিত করিতেছে, অসহায়া রমণী নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। সিপাহিরা এই হতভাগ্য জীবের হত্যা করিয়া উন্মত্তভাবে ক্রেগীর আবাসগৃহের নিকটে আসিল। ক্রেগীর যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা আপনাদের প্রভুপত্নীর প্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহাদের প্রভুভক্তি, কিছুতেই বিচলিত হইল না। তাহারা সকলেই এক বাক্যে সবিশেষ দৃঢ়তার সহিত আক্রমণকারিদিগকে বলিতে লাগিল যে, তাহাদের প্রভু সকলেরই বন্ধু, তিনি সকলের সহিতই সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, সকলের হিতসাধন করিতেই তাহার সবিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ আছে, অতএব তাহার গৃহ দগ্ধ করা কাহারও

উচিত নহে। ভৃত্যেরা এইরূপ বলিয়া আক্রমণকারিদিগকে গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিল। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। যখন অন্য সমস্ত গৃহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইতেছিল, তখন ক্রেগীর গৃহ দগ্ধ হয় নাই।

উন্মত্ত সৈনিক যখন ক্রেগীর অসহায় পত্নীকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলে, তখন চারিজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে তথায় উপস্থিত হয়। কাপ্তেন ক্রেগী এই চারিজন সৈনিককে তাহার গৃহরক্ষা ও তাহার প্রিয়তমা বনিতার উদ্ধারসাধনার্থ পাঠাইয়াছিলেন। অশ্বারোহীচতুষ্টয় বিদ্যুৎবেগে আসিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ করিল এবং অতি দ্রুতবেগে গৃহের উপরতলে চলিয়া গেল। ক্রেগীর স্ত্রী তাহাদের সাদরসম্ভাষণ জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাহার হস্ত ধারণ না করিয়া, অতি বিনয়ের সহিত অভিবাদনপূর্বক কহিল যে, তাহারা আপনাদের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে। অসাধারণ প্রভুভক্তির সহিত তাহাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না, কিছুতেই গুরুতর কর্তব্যপথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল না। এই ঘোর সঙ্কটকালে আপনাদের প্রভুপত্নীর জীবন রক্ষা করাই তাহাদের স্থিরসঙ্কল্প হইল। তাহাদের সহযোগিগণ অদূরে ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহারা উহাতে দৃক্‌পাত করিল না। সহযোগিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল না। তাহারা ভীতা প্রভুপত্নীকে স্থিরভাবে গৃহে থাকিতে কহিল। গৃহের বারান্দায় যাইলে যে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা আছে, বিশ্বস্ত সৈনিক পুরুষেরা ইহা পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল। ক্রেগীর স্ত্রী তাহার স্বামীর জন্য সাতিশয় আকুল হইয়াছিলেন। তখন শত্রুপক্ষের ভৈরব রব ব্যতীত কিছুই শ্রবণ গোচর হইতেছিল না, এই বিপত্তিকালে ক্রেগীর স্ত্রী তাহার স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন ক্রেগী এতক্ষণ আপনার কর্তব্যকার্যে নিবিষ্ট ছিলেন, আবাসগৃহে আসিতে এতক্ষণ তাহার অবকাশ হয় নাই। এখন তাহার গুরুতর কর্তব্য শেষ হইয়াছিল, তিনি অশান্তির মধ্যে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কর্তব্যপ্রিয় সৈনিকগণ শান্তভাবে আপনাদের কার্য সম্পাদন করিতেছিল, কাপ্তেন ক্রেগী এখন আপনার আবাসগৃহে আসিতে সময় পাইলেন।

ক্রেগী কম্পিত হৃদয়ে আপনার আবাসগৃহে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহার বাসভবন অনলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার প্রণয়িনী নিরাপদে অক্ষতশরীরে রহিয়াছেন, তাহার প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সৈনিকপুরুষগণ প্রাণপণ করিয়া, অদমনীয় তেজস্বিতা সহকারে সমস্তই রক্ষা করিতেছে। ক্রেগী আর কাল বিলম্ব না করিয়া, আপনার স্ত্রী ও অপর কয়েকটি মহিলার সহিত গৃহপরিত্যাগপূর্বক কোন নিরাপদ স্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন। পাছে মহিলাদিগের গ্রীষ্মকালোপযোগী তুষার ধবল পরিচ্ছদ উন্মত্ত সিপাহিদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং পাছে বিপক্ষগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় ক্রেগী ঘোড়ায় কৃষ্ণবর্ণ কাপড় দিয়া তাহাদিগকে ঢাকিলেন, এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী একটি ভগ্ন মন্দিরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। তাহাদের আবাসভবন তখন বিপক্ষগণের লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল, কিন্তু এ সময়েও তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সৈনিকপুরুষেরা আপনাদের কর্তব্যপালনে বিমুখ হয় নাই, তাহারা এ সময়েও অতুল সাহসের সহিত প্রভুর গৃহ রক্ষা করিতেছিল। ক্রমে এই ভয়ঙ্কর নিশা শেষ হইল, উন্মত্ত জনগণ ক্রমে এই বীভৎস কাণ্ড হইতে বিরত হইয়া আত্মগোপন করিতে

লাগিল। ক্রেগী বিষণ্নহৃদয়ে আপনার গৃহে প্রত্যাবৃত হইয়া, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার খিদমদগার যথার্থ বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। ক্রেগী ও তাহার স্ত্রী যখন গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন তাহারা ভোজন পাত্র প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পান নাই। বিশ্বস্ত খিদমদগার সিপাহিদিগের আক্রমণের পূর্বেই এই সকল পাত্র মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। যখন বিপদ কাটিয়া গেল, ক্রেগী তখন নিজের আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। তখন প্রভুভক্ত পরিচারক মাটি হইতে সেই সকল বাহির করিয়া বিনীতভাবে প্রভুর নিকট আনিয়া দিল। ক্রেগী আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যে বিশ্বস্ত সৈনিকপুরুষেরা আপনাদের জীবন এইভাবে সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, যাহাদের কার্যকারিতায় তাহাদের অধ্যুষিত গৃহ সর্বগ্রাসী হুতাশনের মুখ হইতেও রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা এখন ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিল। তাহাদের এই দুশ্চিন্তা বা ভয় দূর করিবার জন্য কাপ্তেনকে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

এই রাত্রিতে মীরটের বাজার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের উত্তেজিত লোকে উন্মত্ত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, ইহারা নরহত্যা গৃহদাহ ও গৃহ লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপূর্বক মীরটের সমস্ত ইংবাজ নিবাস শোচনীয় দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি মীরাটে এইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইতে থাকে।

এই সময়ে একজন ইংরাজ সৈনিকপুরুষ প্রদীপ্ত হিংসার তৃপ্তি সাধনে বিমুখ হয় নাই। লেফটেনান্ট লোলার আপনার একজন বন্ধুর স্ত্রীকে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে গতাসু দেখিয়া হত্যাকারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি জানিতে পারেন যে বাজারের একজন কসাই এই নৃশংস কার্য করিয়াছে। লোলার অবিলম্বে বাজারে যাইয়া সেই ব্যক্তিকে সৈনিকনিবাসে ধরিয়া আনেন। মুহূর্ত মধ্যে বিচারের আয়োজন হয়, মুহূর্ত মধ্যে বিচারকার্য শেষ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ হতভাগ্য কসাইকে নিকটবর্তী একটি আম্রবৃক্ষের শাখায় ফাঁসি দেওয়া হয়। সে সময়ে মীরটের ইংরাজগণ প্রতিহিংসায় যে রূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের প্রাণ এইরূপে নষ্ট হইত। যখন সিপাহিরা উন্মত্তভাবে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাস আক্রমণ করে, ইংরাজদিগের গৃহে যখন তাহারা আগুন লাগাইয়া দেয় তখন ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধবেশে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপনে সমর্থ হন নাই। যখন রাত্রি প্রভাত হইল, সিপাহিরা যখন স্থানান্তরে চলিয়া গেল, তখন তাহারা বাহিরে আসিয়া আপনাদের বীরত্ব পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। বাজারের অনেক দোকানদার তাহাদের বিষ নয়নে পতিত হইল। তাহারা অনেককেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া ফাঁসি দিতে অথবা গুলি করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সহসা এই কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই।

ইংরাজ প্রভুর অনুরক্ত ভারতীয় ভৃত্যগণ ও ভারতবাসী প্রজা কর্তৃক ইংরাজ রক্ষার আরও দুই একটি পরিচয় দিব। ১১নং পদাতি দলের দুইজন সিপাহি দুইটি ইংরাজ মহিলাকে তাহাদের সন্তানগণের সহিত সাবধানে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে লইয়া যায়। একজন মুসলমান কয়েকটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে। একটি পরিচারিকা ও একদল ধোপা একটি বিপন্ন শ্বেতাঙ্গ মহিলার সন্তানগুলিকে রক্ষা করে। ইহারা আপনাদের কাপড়ের বস্তায় উক্ত মহিলাকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহাকেও রক্ষা

করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। একজন সিপাহি বস্ত্রাবরণ খুলিবামাত্র মহিলাটিকে চিনিতে পারে এবং নিষ্কোষিত তরবারির আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। তাহার সন্তানগুলি কেবল পরিচারিকা ও রজকের কৃপায় অক্ষত শরীরে থাকে।

উন্মত্ত সিপাহি সকল মীরটে যে কেবল শ্বেতাঙ্গদিগের উপর উপদ্রব করিয়াছিল তাহা নহে। সামরিক বিভাগের কমিশেরিয়টের বাঙালি বাবুদিগের উপর তাহারা অত্যধিক মাত্রায় উৎপীড়ন করিয়াছিল। সিপাহিরা বাবুর কান কাটিয়া দিয়াছিল। কাহারও নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিল এবং সকলেরই সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। "ইংরেজদের গুরু" বলিয়া বাঙালিদিগকে এই নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক বাঙালি সন্ন্যাসী সাজিয়া প্রাণরক্ষা করেন, অনেকে মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে মড়া সাজিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন, বাঙালি মহিলাদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না; তাহাদের দুর্গতির কথা বুঝি বা ইতিহাসে লিখিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। আশ্চর্যের বিষয়, পশ্চিমোত্তরে সকল স্থানে বাঙালি ইংরাজের সহিত সমভাবে নিপীড়িত হইলেও কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকই এ কথা একবার ভুলিয়াও লেখেন নাই—সমবেদনা তো দূরের কথা।

পূর্বোক্ত ঘটনা সকলের আবৃত্তির পরে আবার কি বলিতে হইবে যে, সিপাহিযুদ্ধ জাতীয় অভ্যুত্থানের নিদর্শন নহে। স্বাধীনতা প্রয়াসীর সর্বস্ব পণ নহে—উহা পিশাচ তাণ্ডব মাত্র, পিশাচের অট্টহাস্যে উহার সূচনা, পিশাচের দীর্ঘশ্বাসে উহার পরিসমাপ্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিল্লির পথে

১০ই মে তারিখে ঘোর নিশাকালে মীরটের প্রায় আড়াই হাজার নানাশ্রেণির সিপাহি সেনার দল গাজিয়াবাদের পথ ধরিয়া দিল্লি অভিমুখে অভিযান করিয়াছিল। মীরটের প্রায় দেড় হাজার গোরা সেনার দলকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মীরট নগরকে দখল না করিয়া সিপাহিসেনার দল সহসা দিল্লির অভিমুখে ধাবিত হইল কেন? ইংরাজ ঐতিহাসিক মাত্রই উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াই গোরার তাড়নার ত্রাসে অধীর হইয়াই, সিপাহির দল দিল্লির দিকে পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। উন্মত্তপ্রায় সিপাহির দল যখন তাহাদের শ্বেতাঙ্গ সেনানীবর্গকে বধ করিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্রবৎ হইল, তখন তাহারা দেখিল যে তাহাদের দলে যোগ্য সেনাধিনায়কের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, মীরটের সিপাহি সেনাদলের মধ্যে প্রায় বার আনা অংশ মুসলমান পাঠান ছিল। এই মুসলমান সিপাহিরা ভাবিয়াছিল যে, সোজা দিল্লিতে যাইয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলে তাহারা অনেকটা নিরাপদ হইবে। মীরটে যেদিন তুমুল কাণ্ড হয়, তাহার ৫/৭ দিন পূর্ব হইতে মীরট নগরে দুইজন মুসলমান ফকির আসিয়া বাস করিয়াছিল। এই দুই ফকিরের ঐশ্বর্য অত্যধিক ছিল। হাতি, ঘোড়া, উট, আসাসোটা ছত্র দণ্ড এবং শত শত অনুচর লইয়া ইহারা নগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের পরামর্শ অনুসারেই বিপ্লব ঘটে। ইহারাই মীরটের সিপাহিদলকে দিল্লি যাইতে পরামর্শ দেয়। দিল্লির ষড়যন্ত্রে মূল এই কথাই প্রচারিত হয় যে মীরটের সিপাহির দল বিদ্রোহ করিয়া দিল্লিতে আসিলে দিল্লির বাদশাহী পতাকা আবার উড্ডীন করা হইবে। পরে এই সমাচার ভারতময় প্রচারিত হইলে পশ্চিমোত্তরের প্রধান প্রধান নগরের সিপাহির দল ইংরাজের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বাদশাহী শাসনের ঘোষণা করিবে। পূর্ব হইতে এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই মীরটের সিপাহির দল গোরা সেনানিবাস ও তাহাদের সেনানিবাস অধিকার না করিয়া, মীরট নগরে বাদশাহী প্রাধান্যের ঘোষণা না করিয়া, একেবারেই দিল্লির দিকে ধাবমান হইয়াছিল।

প্রথম বৈশাখের প্রত্যুষে যখন সূর্যের প্রখরকিরণ দিল্লির মসজিদ মীনার সকলকে অবলম্বন করিয়া স্বর্ণ বর্ণে ঝক ঝক করিতেছিল, যখন দিল্লির নাগরিকগণ সুষুপ্তির ক্রোড়ে সুখ শয্যায় শয়ান ছিলেন, প্রথম প্রভাতের শিশিরবিন্দু পত্রে পত্রে পুষ্পে পুষ্পে নানা বর্ণের মুক্তা ফলের ন্যায় ঝলসিতেছিল, সেই সময় দিল্লির "কলিকাতা" তোরণদ্বারের সম্মুখে বজ্র গম্ভীর নাদে "হর হর মহাদেও" আর "আল্লা হো আকবর" এই দুই ভীম বাণী উত্থিত হইল। দিল্লিবাসী এই বিজয় নাদ শুনিয়া বুঝিল যে সিপাহি আসিয়াছে। এক রাত্রিতে ছত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে অশ্বগণের সফেন হ্রেষারবের সহিত মীরটের সেনাদল ভারতের রাজধানী, ভারতের কপালতিলক ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের দ্বারে

আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুকালের বিস্মৃত বিজয়ধ্বনি শুনিয়া দিল্লিবাসি সহসা উল্লাসের ঘোরে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল। কিন্তু তাহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য একটি গোরাও "কলিকাতা" তোরণ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল না। বাহিরে বিজয়ধ্বনি নগরের ভিতরে প্রাচীরের অন্তরালেও বিজয়ধ্বনি—এই সম্মিলিত বিরাট বিজয়রবে ইংরাজের মুষ্টিমেয় গোরার দল যেন সম্মূঢ় হইয়া রহিল।

শাজাহানাবাদ বা নূতন দিল্লি পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তরে যমুনার তীরে অবস্থিত। নগর উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে তোরণদ্বার আছে। প্রত্যেক তোরণের উপর নহবৎখানা ও সিপাহিদিগের গম্বুজ বিরাজ করিতেছে। এই তোরণ সকলেব নাম, লাহোর বা কাশ্মীর দরওয়াজা, কলিকাতা দরওয়াজা, আগ্রা দরওয়াজা, ইত্যাদি। এই প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যে যুমনার তীরে বাদশাহী মঞ্জিল বা বাদশাহের প্রাসাদ নির্মিত আছে। ইহাও প্রাচীর বা সুগভীর পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। এই মঞ্জিলের মধ্যে দেওয়ান খাস, দেওয়ান আম, মতি মসজিদ, রঙ্গমহল, শীশমহল প্রভৃতি শ্বেতমর্মরনির্মিত অতুলনীয় প্রাসাদসকল বিরাজ করিতেছে। দেওয়ান খাসের উপর লিখিত আছে—

"অগর ফরদৌষ বর রুয়ে জমীনস্ত্
হমীনস্ত্ এ হমীনস্ত্ এ হমীনস্ত্।"

অর্থাৎ, যদি পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গের অধিষ্ঠান সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে জানিও এইখানেই হইয়াছে, এইখানেই হইয়াছে, এইখানেই হইয়াছে। এই স্পর্দ্ধার কথা শাজাহান লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দেওয়ান খাসের কারুকার্যের তুল্য কারুকার্য বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশে কোন মর্মরনির্মিত হর্মে লিখিত নাই। এই বাদশাহী মঞ্জিলের পার্শ্বে সলিমগড় দুর্গ অবস্থিত। ইহার ভীমকায় পূর্বে যমুনার নীলজলে প্রতিফলিত হইত। এখন যুমনা প্রবাহ একটু পূর্ব দিকে সরিয়া যাওয়ায় সলিমগড়ের নিম্নে আর জল নাই, বিশাল বালুকা বিস্তার ও উলুবন বিদ্যমান রহিয়াছে। অপর পারে গাজিয়াবাদ, গাজিয়াবাদ হইতে দিল্লি পর্যন্ত যমুনার উপর একটি নৌসেতু বিরাজ করিতেছে। মীরটের সিপাহিদিগের একদল নৌসেতু বাহিয়া যমুন পার হইয়া সলিমগড়ের দুর্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সলিমগড়ের দুর্গের এই দরওয়াজা বন্ধ ছিল। সেই তোরণ দ্বার মুক্ত হইল আর জলস্রোতের ন্যায় সিপাহির দল বাদশাহী মঞ্জিলে প্রবেশ করিয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত কণ্ঠে বাদশাহের জয়গান করিয়া উঠিল। সিপাহিদিগের চন্দ্রকলাকৃতি তলোয়ার সকল এক সঙ্গে কোষমুক্ত হইয়া যেন বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায় প্রভাতের প্রথম কিরণে ঝলসিয়া উঠিল। মতি মসজিদের মিনারের উপর শত বৎসব পরে আবার বাদশাহী সবুজ পতাকা অর্ধচন্দ্র ক্রোড়ে করিয়া পত পত রবে উড্ডীন হইল। ১২ই মে সোমবারের প্রাতঃকালে দিল্লির স্বর্ণখচিত মিনার হইতে বাদশাহী শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হইল।

এই সময় দিল্লির বাহাদুর শাহ মোগল সম্রাটদিগেব বংশধর বলিয়া দিল্লিশ্বর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। স্থবির, শান্ত, চিন্তাশীল, ধর্মপরায়ণ বাদশাহ বাহাদুর শাহ সহসা সিপাহিদিগের ঘোর নাদ শুনিয়া একজন খোজাকে তথ্য জানিবার জন্য বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। খোজা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে "মীরটের সিপাহিদল ইংরাজের শাসন অমান্য করিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আবার বাদশাহী পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিবার

জন্য, ফিরিঙ্গিকে এদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এখন আপনার অনুমতির অপেক্ষায় তাহারা বাহিরে দণ্ডায়মান আছে।" এই সমাচার শুনিয়াই বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ বাদশাহী মঞ্জিলের গোরা রক্ষীদিগের কর্তা কাপ্তেন ডগলাসকে সমাচার দিলেন; ডগলাস সাহেব খবর পাইয়াই দেওয়ানী খাসে আসিয়া বাদশাহের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাদশাহ যেন সভয়ে ডগলাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিতে পার, এই সিপাহি সকল কেমন করিয়া রঙ্গমহলের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? তুমি কি ইহার কোন সমাচার রাখ না?" কাপ্তেন ডগলাস উত্তরে বলিলেন, "আমি নীচে গিয়া দেখি ব্যাপারখানা কি।" এই কথা শুনিয়াই বাদশাহ ডগলাসের হাত ধরিয়া বলিলেন "তুমি ছেলেমানুষ, বালক—যাইও না, তোমাকে ইহারা খুন করিতে পারে।" বাদশাহের চিকিৎসকও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও অনেক অনুরোধ করিলেন। ডগলাস সাহেব নীচে না নামিয়া অলিন্দের উপর হইতেই চাহিয়া দেখিলেন যে ৪০/৫০ জন অশ্বারোহী সিপাহি নিম্নে অপেক্ষা করিতেছে। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "বাদশাহের শয়নাগারের এত সন্নিকটে তোমরা আসিয়াছ কেন? ইহা কি বাদশাহের প্রতি সম্মানের লক্ষণ?" সাহেবের মুখে এই কথা শুনিয়া আর একবার যেন গগন পবন স্তব্ধ করিয়া, বাদশাহী মঞ্জিলের প্রত্যেক মর্মর কক্ষকে প্রতিধ্বনিত করিয়া, শব্দ উঠিল "হর হর মহাদেও—দীন দীন," একে একে অশ্বারোহীগণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, অশ্বের বল্গা ধরিয়া শ্রান্তপদে সলিমগড়ের দিকে পুনঃ প্রবেশ করিল।

এদিকে কাপ্তেন ডগলাস বাদশাহের প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেই দিল্লি বিভাগের কমিশনর ফ্রেজার সাহেবের নিকট হইতে এক আদেশপত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, তিনি যেন সত্বর কলিকাতার দরওয়াজার সম্মুখে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখানে যাইয়া তিনি দেখেন যে, দিল্লির ম্যাজিস্ট্রেটর স্যর থিওফাইলাস মেটকাফ, কমিশনর ফ্রেজার ও কালেক্টর হাচিন্সন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তখন মীরটের সকল সিপাহিই নৌসেতু অতিক্রম করিয়া সলিমগড়ে প্রবেশ করিয়াছিল, আর সলিমগড়ের দরওয়াজা তখন তাহাদেরই অধিকারে ছিল। সম্মুখে নাগরিকগণের একটা বিরাট জনতা হইয়াছিল, সে জনতার মধ্যে বালক যুবক উল্লাসে নৃত্য করিতেছিল,—হিন্দু "হর হর মহাদেব" ধ্বনি করিতেছিল, মুসলমান "আল্লার" নাম করিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতেছিল। কিন্তু কেহই সমবেত এই কয়জন ইংরাজের প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করে নাই। স্যর থিওফাইলাস মেটকাফ সূর্যাস্য হইয়া একবার পূর্বদিকে তাকাইয়া দেখিলেন—দেখিলেন যমুনার চড়ায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছে; পিপীলিকা শ্রেণির ন্যায় নরশ্রেণি যমুনার চরভূমিতে আসিয়া সমবেত হইতেছে। হিন্দুগণ সেই প্রথম প্রভাতের শীতল যমুনা-সলিলে অবগাহন করিয়া বিরূপাক্ষের পূজার উদ্‌যোগ করিতেছে। মুসলমানগণ জলপাত্রে জল লইয়া তীরের মসজিদে গিয়া উঠিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, ব্যাপার বড় বিষম। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চাঁদনি চকের পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুলিশ কনস্টেবলদিগকে নগরের অন্যান্য দরওয়াজা রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এদিকে মীরটের আর একদল পদাতি ও অশ্বারোহী নৌসেতু অতিক্রম করিয়া সলিমগড় দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। কমিশনর ফ্রেজার এই অশ্বসাদিগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন,

কিন্তু তাহারা তাহার আদেশ শুনিল না। একজন অশ্বারোহী সিপাহি ফ্রেজার সাহেবকে বলিল, "সাহেব, কেন প্রাণ হারাইবে, পলাইয়া আত্মরক্ষা কর। যখন আমাদের পূর্ববর্তীগণ সলিমগড় অধিকার করিয়াছে, তখন আমাদের পথ অবরোধ করিও না!" সাহেব এই সাবধানবাণী শুনিলেন না; আরও একটু কড়া ভাষায় সিপাহিদিগকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। সিপাহিরা হাসিয়া উঠিল। এত শ্রান্ত, এত ক্লান্ত, তবু তাহারা হাসি সামলাইতে পারিল না। সহসা ফ্রেজার সাহেব সম্মুখের অশ্বারোহীর হাত হইতে কড়াবীণ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে গুলি করিয়া মারিলেন এবং নিজে ছুটিয়া যাইয়া বগীতে চড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। ডগলাস সাহেব আত্মরক্ষার চেষ্টায় পরিখার ভিতরে ঝম্পপ্রদান করিলেন—নিম্নে জল ছিল না, পতনেই ডগলাস সাহেবের সর্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। এমন সময় একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল—কালেক্টর হাচিন্সন আহত হইলেন। তাহাকে এবং ডগলাস সাহেবকে তুলিয়া বাদশাহী মঞ্জিলের মধ্যে আনয়ন করা হইল। এদিকে ফ্রেজার সাহেব দেওয়ানী আমের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সিপাহিগণকে এবং দিল্লির নাগরিকগণকে মঞ্জিল ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কে সেই জনতার মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, "এই সাহেবই একজন সওয়ারকে খুন করিয়াছে; এই ফিরিঙ্গিই হিন্দুস্থানীর প্রথম শোণিতপাত করিয়াছে"—আর অমনি পিছন হইতে অর্ধ চন্দ্রাকার তরবারির বিদ্যুল্লেখা চমকিয়া উঠিল। কে বলিল, "সাহেব সাবধান"—আর নিমেষের মধ্যে ফ্রেজার সাহেবের দ্বিখণ্ডিত দেহ ধুলায় লুটাইল। উপরে, মঞ্জিলের ভিতরে, আহত হাচিন্সন ও ডগলাস শয়ান ছিলেন; পাদরী জেনিংস, তাঁহার কন্যা ও আর একটি ইংরাজ মহিলা ইহাদের শুশ্রূষা করিতেছিলেন। সিপাহিগণ ও দিল্লির নগরবাসী সকল এই স্থানে প্রবেশ করিয়া এই কয়টি নিঃসহায় ইংরাজ নরনারীকে একরূপ কচুকাটার ন্যায় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

দিল্লিতে ইহাই বিপ্লবের সূচনা। দিল্লিবাসী এখনও বলিয়া থাকেন যে ইংরাজই এই বিপ্লব ঘটাইয়াছিল—ফ্রেজার সাহেব প্রথমে এমন উদ্ধতভাবে একজন অশ্বারোহী সেনাকে হত্যা না করিলে বোধ হয় দিল্লির ব্যাপার এতটা ভীষণ ও শোচনীয় হইত না। সিপাহির দল দিল্লিতে লুঠ করিতে বা নরহত্যা করিতে আসে নাই—তাহারা আসিয়াছিল দিল্লি অধিকার করিয়া বাহাদুর শাহকে ভারতেশ্বরের স্বাধীন আসন পুনরায় অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে; তাহারা আসিয়াছিল ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির আশায়। মীরটের শ্বেতাঙ্গ হত্যার পুনরভিনয় করিবার জন্য কোন সিপাহিই দিল্লিতে পৌঁছবার পূর্বেই তাহাদের একজন সঙ্গী যখন ইংরাজের হস্তে হত হইল, তখন তাহারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া নরশোণিতপাতে দিল্লির পথ প্রান্তর অনুরঞ্জিত করিল।

এইবার আমরা দিল্লির বাদশাহের পূর্বাপর বর্ণনা একটু করিব। খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লর্ড লেক ও ওয়েলেসলি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমকে পরাক্রান্ত মারাঠাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। এই সময়ে শাহ আলম জরাজীর্ণ ও অন্ধ হইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। মারাঠাদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বৃদ্ধ মোগল সম্রাট প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের আশ্রিত হইলেন। তবে. ইংরেজ প্রকাশ্যভাবে বৃদ্ধ শাহ আলমের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু এই অবসরে ইংরাজ কোম্পানি আপনাদের স্বার্থসাধনে উদাসীন থাকেন নাই। তাহারা শাহ আলমকে বিমুক্ত করিয়া, আপনাদিগের অধিকার বৃদ্ধি করেন, শাহ আলমের বিজিত রাজ্য কোম্পানির

অধিকারভুক্ত হয়। দিল্লির যুদ্ধে লর্ড লেক মারাঠাদিগের পরাক্রম খর্ব করিবার পর উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মারাঠাগণ শাহ আলমের ভরণপোষণার্থ যে সম্পত্তি বা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন, লর্ড লেক তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে সমর্থ হন নাই। দিল্লির অধিপতি এখন আপনার ও আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক কিঞ্চিদধিক ১০ লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মোগল সম্রাটগণের অনেকে ভাবুক ছিলেন, অনেকেই কবিতা লিখিয়া সন্তোষলাভ করিতেন। বৃদ্ধ শাহ আলমও এই দুঃখ দারিদ্রের সময়ে আপনার কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি এই অবস্থায় লিখিয়াছেন,—"দুর্দশার প্রবল ঝটিকা আমাকে পর্যুদস্ত করিয়াছে। উহা আমার সমস্ত গৌরব অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছে এবং আমার রত্ন সিংহাসন অপসারিত করিয়া দিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারের গভীর গহ্বরে নিমগ্ন হইলেও, আমি এক সময়ে দুর্দশায় পবিত্র এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়ায় উজ্জ্বলতর হইয়া এই কষ্টময়—এই অন্ধকারময়—স্থান হইতে উঠিতে পারিব।"

শাহ আলম সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি জনসাধারণের সম্মান কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এই সময়ে লর্ড ওয়েলেসলি ভাবিলেন যে, এই অধঃপাতিত ভূপতি যদি আপনার পূর্বপুরুষগণের প্রাসাদেই বাস করেন, তাহার চারি পার্শ্বে যদি তাহার অনুচর সহচরেরা থাকেন, তাহা হইলে, একদিন হয় তো, তাহার কোন উত্তরাধিকারী প্রনষ্ট রাজত্বের কোন অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে চেষ্টা করিবেন। এজন্য তিনি শাহ আলম ও তাহার সহচরবর্গকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব কর্ণগোচর হইলে বৃদ্ধ সম্রাট বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এই ত্রাস ক্রমে তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রসারিত হইল। যুবক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, আত্মীয় স্বজন, সহচর, অনুচর, সকলেই সমভাবে ভীত হইয়া উঠিলেন; কাজেই লর্ড ওয়েলেসলি বৃদ্ধ ভূপতিকে আর অধিকতর ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন না।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শাহ আলমের মৃত্যু হয়। তদীয় পুত্র আকবর শাহ তাহার উত্তরাধিকারী হন। তিনিও ইংরাজ কোম্পানির নিকট হইতে নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিতে থাকেন। ভারতের হিন্দুগণ ও মুসলমান সম্প্রদায় এ সময়েও শাহ আলমের উত্তরাধিকারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, চির-প্রসিদ্ধ মোগল বংশের প্রধান পুরুষ ভাবিয়া তখনও লোকে ভারতের প্রধান সম্রাট বলিয়া তাহার অভিনন্দন করিত। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূপতিগণ এ সময়েও তাহার নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিতেন। এই সকল ভূপতির সিংহাসনে অধিরোহণকালে আকবর শাহ সকলকে খেলাত দিয়া আপনার একাধিপত্যের প্রমাণ দেখাইতেন। যখন কোন নূতন গবর্নর জেনরেল এ দেশে আসিতেন, তখনও দিল্লির অধিপতি সময়ে সময়ে তাহার নিকটেও খেলাত পাঠাইয়া দিতেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজ কোম্পানি তাহার অনুজ্ঞা ও তাহার স্বাক্ষরযুক্ত ফার্মান ব্যতীত কোন নূতন প্রদেশ অধিকার করিতে পারিতেন না। রাজপ্রাসাদের ইংরাজ কাপ্তেন যদি সম্রাট কর্তৃক আহূত হইতেন, তাহা হইলে, তিনি রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে জুতা পায় দিয়া, বা ছাতা লইয়া যাইতে পারিতেন না।

লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের নিকট এইরূপ আনুগত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হন। তিনি বৃদ্ধ আকবর শাহকে আরও ৫ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এইরূপ

প্রস্তাব করেন যে, অতঃপর কোম্পানি যখন কোন স্থান অধিকার করিবেন, তখন তাহাদিগকে আর যেন দিল্লিশ্বরের অনুমতির বা ফার্মানের প্রতীক্ষা করিতে না হয়। বৃদ্ধ আকবর শাহ ইহাতে অগত্যা স্বীকৃত হন। এইরূপে আরও অনেক বিষযে কোম্পানি আপনাদের সুবিধা করিয়া লন। কোম্পানি দিল্লির সম্রাট-পত্নী ও সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে নজর দিতেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি প্রথমে এই প্রথার প্রতিকূলে প্রস্তাব করিয়া আপনাদের স্বাধীনতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির প্রধান সেনাপতির নজর দেওয়া বন্ধ হয়। দিল্লির রেসিডেন্ট কোম্পানির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া যে নজর দিতেন, ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ কর্মচারিগণ নজর দেওয়া বন্ধ করেন। ইহার পর সম্রাটপত্নীকে যে নজর দেওয়া হইত, তাহাও উঠিয়া গেল। এই আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকারের পরিবর্তে কোম্পানি দিল্লির সম্রাটকে বার্ষিক দশ হাজার টাকা দিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বরের অধিকার এইভাবে অপহৃত হইবার পর ক্রমশ তাহার প্রতি অসম্মানও প্রদর্শিত হইতে লাগিল। ভূপতি দিল্লির বাহিরে আসিতে পারিতেন না। দিল্লির রাজকুমারদিগের জন্য সম্মান-সূচক তোপধ্বনিও হইত না। অবশেষে দিল্লির প্রধান রাজলক্ষণ স্খলিত হইল। যে প্রচলিত টাকা সর্বত্র দিল্লিশ্বরের প্রভাব বিকাশ করিতেছিল, শেষে তাহারও রূপান্তর ঘটিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রার পরিবর্তে ভারতবর্ষে কোম্পানির মুদ্রা চলিতে লাগিল। যাহার পূর্বপুরুষগণ এক সময়ে ইংরাজ বণিকদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, যাহার পূর্বপুরুষদিগের সৌজন্যে বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে আপনাদের ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, যাহার পিতা বণিক কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তিনিই এখন সেই বণিক কোম্পানির অপূর্ব কার্যকৌশলে ক্ষমতাশূন্য, প্রভুত্বশূন্য ও রাজলক্ষণশূন্য হইয়া পড়িলেন।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর ৮২ বৎসর বয়সে আকবর শাহ পরলোকগমন করেন। তদীয় পুত্র আবুল মজঃফর সুরাজউদ্দিন মহম্মদ বাহাদুর শাহ পাতশাহ উপাধি ধারণপূর্বক দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন। বাহাদুর শাহ ধীর, শান্ত, কবিতাপ্রিয় এবং কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত কোম্পানিকে সবিশেষ অনুরোধ করেন। ইংরাজ কোম্পানি যে বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পরিবারবর্গের ব্যয় নির্বাহ হইত না বলিয়া আকবর শাহ উক্ত বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য তিনি ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দেব বিলাতে ডিরেক্টরদিগের নিকটে একজন দূত পাঠাইয়া দেন। এই দূত আর কেহই নহেন, রাজা রামমোহন রায়। আকবর শাহ তাহাকে রাজোপাধি প্রদান না করিলেও বিলাতে তাহার সমাদরের হ্রাস হইত না। তিনি ইংল্যান্ডে যাইয়া আপনার অসাধারণ প্রতিভা বলে সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া তুলিলেন, কিন্তু ডিরেক্টর সভা আসল কথা ভুলিলেন না। রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ডিরেক্টরসভা প্রস্তাব করেন যে, তাহাদেব উপর এখন দিল্লির ভূপতির যে কিছু ক্ষমতা, বা যে কিছু অধিকার আছে, তাহা যদি ভূপতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহারা বার্ষিক আরও ৩ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আকবর শাহ ডিরেক্টরসভার এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এখন বাহাদুর শাহ

ডিরেক্টরদিগের নিকটে আবার বৃত্তি বৃদ্ধির আবেদন করেন। আকবর শাহ এ সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তিনিও সেই যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে, কোম্পানি এখন যে বৃত্তি দিতেছেন, তাহাতে তাহার পরিবারের ভরণপোষণ কিছুতেই নির্বাহ হইতেছে না। আকবর শাহকে কোম্পানি যখন অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাহারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, দিল্লির অধিপতিকে যে পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে, তাহা অতি সামান্য। কোম্পানি মুখে যেরূপ সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন, কার্যে সেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বাহাদুর শাহ আপনার বৃত্তি বাড়াইবার যে প্রস্তাব করেন, সাধারণের অর্থের অপব্যয় হইবে, এই অছিলায় লেফটেনান্ট গবর্নর প্রথমে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। এই সময়ে লর্ড অকল্যান্ড ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল ছিলেন। বাহাদুর শাহের প্রস্তাব তাহার নিকট উপস্থিত করা হইল। তিনি পূর্ব প্রস্তাবের কথা তুলিয়া বলিলেন যে, বাহাদুর শাহ যদি সেই প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি বৃত্তি বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ, তাহার পিতার ন্যায় তেজস্বী ছিলেন, সুতরাং তিনি আত্মগৌরবের হানি করিতে সম্মত হইলেন না। যখন গবর্নর জেনরেলের নিকট তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল, তখন তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বিলাতে আবেদন করিবার উদ্দেশ্যে একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি পাঠাইলেন। বাহাদুর শাহ বিলাতে আবেদন করিবার জন্য জর্জ টমসনকে দিল্লিতে আহ্বান করিলেন। জর্জ ট সেন বাগ্মী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন, বাহাদুর শাহ এই জন্য তাহাকেই আবেদন কার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিলেন। জর্জ টমসনকে তিনি সকল অভিযোগের কথাই বলিলেন। পূর্বে কোম্পানির কর্মচারিগণ তাহাকে নজর দিতেন, লর্ড এলেনবরার আদেশে উহা রহিত হয়। ইহার পর গবর্নমেন্ট তাহার বৃত্তি বাড়াইয়া দিতে অসম্মত হন। তিনি আত্মসম্মান ও আত্মগৌরবের হানি করিতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং তিনি আপনার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া গবর্নমেন্টের প্রতিশ্রুত বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা গ্রহণে রাজি হন নাই। এখন আপনার যে কিছু সম্মান ও অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া ডিরেক্টরসভা যাহাতে তাহার বৃত্তি বাড়াইয়া দেন, তাহার জন্য তিনি জর্জ টমসনকে আগ্রহসরকারে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোম্পানি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি দিল্লির ভূপতি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাহার বৃত্তির পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে না। সুতরাং জর্জ টমসন উপস্থিত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। ডিরেক্টরসভা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিলেন, "এই প্রস্তাব (দিল্লির ভূপতির সমুদয় স্বত্ব পরিত্যাগ বিষয়ক) পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মোগল ভূপতি এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা তাহার উপকারের জন্য যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি, তাহা তিনি গ্রহণ করিতে চাহেন না।" পরন্তু ইহা একটা অছিলা মাত্র। দিল্লীশ্বরের যে অর্থাভাব ছিল না, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া বলিতে হইলে এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। মিঃ রাসেল নামক একজন সহৃদয় ইংরাজ দিল্লীশ্বরের অর্থাভাবের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "দিল্লির রাজপ্রাসাদে ৫,০০০ লোক বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে ৩,০০০ ব্যক্তি তৈমুরবংশীয়, সুতরাং দিল্লীশ্বরের আত্মীয়। দিল্লির ভূপতি আপনার বহুসংখ্যক আত্মীয়ের ভরণপোষণের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত ও চিন্তাকুল থাকিতেন। রাজবংশীয়েরা সর্বদাই "আরও

চাই, আরও চাই” বলিতেন। ইহারা এরূপ দরিদ্র হইয়াছিলেন যে, অনেকের আহারের সংস্থান ছিল না। ইহাদের ভরণপোষণ জন্য যাহা নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল।”

বাহাদুর শাহ একটি পরমাসুন্দরী যুবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুবতীর নাম জিন্নৎ মহল। সৌন্দর্য-গরিমার সহিত জিন্নৎ মহলের সাহস, তেজস্বিতা ও আত্মাভিমান ছিল; ইংরাজ ঐতিহাসিকও ইহার কার্যদক্ষতা ও সাহসের প্রশংসাবাদ করিতে বিরত হন নাই। জিন্নৎ মহলের একটি পুত্রসনন্তান হয়। এই রাজকুমারের নাম জোয়ান বখত। বাহাদুর শাহ বৃদ্ধাবস্থায় এই পুত্ররত্ন পাইয়া পরম আদর ও স্নেহের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করেন। জোয়ান বখত ক্রমে বাহাদুর শাহের এমন স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন যে, বাহাদুর শাহ অন্যান্য রাজকুমারের কথা না ভাবিয়া ইহাকেই দিল্লির রত্নসিংহাসন দিতে ইচ্ছা করেন। এদিকে জিন্নৎ মহল আপনার ক্ষমতা, কার্যদক্ষতা, তেজস্বিতা ও সৌন্দর্যগরিমায় বৃদ্ধ ভূপতিকে মুগ্ধ করিয়া তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভূপতি ইহার অভিমতের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতেন না। জিন্নৎ মহল আপনার পুত্ররত্নকে দিল্লির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাহাদুর শাহের নিকট সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই কারণে মোগলবংশের রাজসিংহাসন লইয়া একটা গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারা বখতের মৃত্যু হয়। এই সময়ে বাহাদুর শাহের বয়স ৭০ বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল। এজন্য গবর্নর জেনরেল দিল্লির উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, তাহা এই সময়েই স্থির করিবার ইচ্ছা করেন। এ সময়ে লর্ড ডালহাউসি ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দিল্লির এই রাজবংশের সমুচিত গৌরব রক্ষায় যত্নবান হন নাই। পূর্বে এই বংশের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইত, তাহাতে তিনি বড় বিরক্ত, হইয়া উঠেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল ভূপতির সমস্ত রাজকীয় সম্মান নষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। পূর্বে যখন একবার এই সম্মানের উচ্ছেদসাধনেব প্রস্তাব হয়, তখন বিলাতের ডিরেক্টরসভা সহসা উহার অনুমোদন করেন নাই। কুমার ফকিরউদ্দীন নামক একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক রাজকুমাবের সিংহাসন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই রাজকুমার ইংরাজদিগের প্রিয় ছিলেন, ইংরাজ সমাজে যাইতেও তিনি ভালবাসিতেন; সুতরাং বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ইহাকে রাজসিংহাসন দিলে লর্ড ডালহাউসির বাসনা অনেকাংশ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

যখন বাহাদুর শাহ রাজ্যাধিপতি বলিয়া সম্মানিত হইতেছিলেন, তাহার রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রাধান্যের নিকট যখন সকলেই মস্তক অবনত করিতেছিল, সেই সময়ে দারা বখতেব জন্ম হয়। দারা বখত জীবিত থাকিলে তাহাকে রাজকীয় উপাধিতে বঞ্চিত করা নিতান্ত সহজ হইত না। কারণ তাহার পিতার রাজকীয় সম্মান, রাজকীয় গৌরব, অতুল ক্ষমতা ও দিগন্তবিশ্রুত আধিপত্যের কথা তাহার মনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। সুতরাং তিনি সহজে আত্মসম্মানের আবমাননা করিতে রাজি হইতেন না। কিন্তু ফকিরউদ্দীনের সম্বন্ধে ইহার কিছুই খাটিতে পারে না। যখন ফকিরউদ্দীনের জন্ম হয়, তখন বাহাদুর শাহ কোম্পানির নির্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন।

এদিকে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী কে হইবে, বিলাতেও সেই বিষয় লইয়া মহা

আন্দোলন হইতে লাগিল। লর্ড ডালহাউসির প্রস্তাবে কেহ কেহ সমর্থন করিলেন, অনেক বিজ্ঞ রাজনীতিক করিলেন না। এ সম্বন্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষের মন্তব্যলিপি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে লর্ড ডালহাউসির নিকট পৌঁছে। এ বিষয় লইয়া ডিরেক্টর সভা ও বোর্ডের মধ্যে যে, ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তাহা লর্ড ডালহাউসি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ যদিও তাহাকে, তাহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তথাপি এখন তাহার মনে যেন কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ''বিলাতের কর্তৃপক্ষ আমাকে উপস্থিত বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি যে, দিল্লিব ভূপতির সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা অনেক দূরদর্শী ও ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ রাজপুরুষের অনুমোদিত হয় নাই। এখন যদিও আমার পূর্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর রহিয়াছে, তথাপি যখন এই সকল দূরদর্শী রাজপুরুষ বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমি উপস্থিত বিষয় অতি সত্বর সম্পন্ন করিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

যখন দিল্লির রাজপ্রাসাদ ও রাজসিংহাসন লইয়া তর্কবিতর্ক হইতেছিল, তখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ আপনার প্রিয়তমা পত্নী জিন্নৎ মহলের সবিশেষ অনুরোধে ফকিরউদ্দীনের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেন। জিন্নৎ মহলের পুত্র জোয়ান বখতের বয়স তখন এগার বৎসর হইয়াছিল। জিন্নৎ মহলের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, জোয়ান বখত বাহাদুর শাহের স্থলে দিল্লির রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বাহাদুর শাহ জিন্নৎ মহলের কথামত ফকির উদ্দীনের সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করেন যে, তাহার বংশে নিয়ম আছে, যদি রাজকুমারদিগের মধ্যে কাহারও কোনরূপে অঙ্গচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে তাহার রাজসিংহাসন প্রাপ্তির কোন অধিকার থাকে না। ফকিরউদিনের ত্বক্‌চ্ছেদ হইয়াছে, সুতরাং বাজসিংহাসনে তাহার কোনও অধিকার নাই। বৃদ্ধ বাহাদুরের এই আপত্তি গবর্নর জেনরেল শুনিলেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসি কোনরূপ চূড়ান্ত আদেশ দিলেন না। তিনি কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ফকিরউদ্দীনকেই বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যেহেতু, ফকিরউদ্দীন বয়োজ্যেষ্ঠ, অধিকন্তু, ইংরাজ সমাজের অনুরক্ত। এই ইংরাজপ্রিয় রাজকুমারকে সিংহাসন দিলে লর্ড ডালহাউসি অনায়াসে ইহাকে আপনাদের নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করিয়া, অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিতেন। সুতরাং তিনি বৃদ্ধ বাহাদুরের আপত্তি শুনিয়া সহসা কোন উত্তর দিলেন না।

এদিকে গবর্নর জেনরেলের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্যর ফ্রেডারিক কুরি কহিলেন, বাহাদুর শাহের যেরূপ বয়স হইয়াছে, তাহাতে তাহার মৃত্যুসময় অধিক দূরবর্তী নহে। ভূপতির মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীর সহিত দিল্লির রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করার সম্বন্ধে সুবিধামত বন্দোবস্ত করা যাইবে। সেনাপতি লিটনারের মতে উপস্থিত প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। তাহার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় মোগলরাজবংশকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। এখন এই বংশের কোন রূপ অবমাননা করিলে তাহারা সকলেই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। এজন্য তাহার মতে ভূপতিকে বলপূর্বক স্থানান্তরিত না করিয়া ধীরে ধীরে তাহার মত লইয়া, তাহাকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া কর্তব্য। কিন্তু সিবিল কর্মচারী লুইস,

সেনাপতি লিটলারের এই কথায় উপহাস করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষের মুসলমানগণ যে, দিল্লির ভূপতির অনুরক্ত, ইহাতে তিনি বিশ্বাস করেন না। যদি মুসলমান সম্প্রদায় মোগল ভূপতির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে যত শীঘ্র ভূপতিকে "সম্রাট" উপাধিতে বঞ্চিত ও স্থানান্তরিত করা যায়, ততই ভাল।

মন্ত্রিসভার সভ্যগণ এইরূপে আপনাদের মত প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, দিল্লির বর্তমান ভূপতির মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করা হইবে না; বাহাদুর শাহের মৃত্যুর হইলে ফকিরউদ্দীনকে রাজপদ গ্রহণের যোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে। কিন্তু তাহার আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন, এই সূত্রে তাহার নিকট হইতে কোম্পানির অভীষ্ট বিষয় লাভের সুবিধা দেখিতে হইবে। তাহাকে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কুতবে বাস করার জন্য প্রলোভন দেখাইতে হইবে। প্রয়োজন হলে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা যাইবে। মন্ত্রিসভার এই শেষ মীমাংসা বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানান হইল। কর্তৃপক্ষ উহার অনুমোদন করিয়া গবর্নর জেনরেলকে পত্র লিখিলেন।

লর্ড ডালহাউসি যখন জানিতে পারিলেন যে, তাহার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইয়াছে, তখন তিনি গবর্নমেন্টের অভিপ্রায়, ফকিরউদ্দীনকে গোপনে জানাইবার জন্য দিল্লির এজেন্ট স্যার থিওফাইলাস মেটকাফ সাহেবকে জানাইলেন। অবিলম্বে ফকির উদ্দীনের সহিত এজেন্ট সাক্ষাৎ করিলেন। এজেন্ট গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় তাহাকে জানাইলেন। ফকিরউদ্দীন গবর্নমেন্টের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; তবে এইমাত্র বলিলেন যে, তাহার রাজকীয় উপাধি পূর্ববৎ থাকিলে, তিনি গবর্নমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে দিল্লির রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কুতব নামক স্থানে যাইতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, একখানি অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত হইল। ফকিরউদ্দীন এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। উপস্থিত বিষয় যে, যথানিয়মে সম্পন্ন হইল, তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকজন সাক্ষীর নামও উহাতে স্থান পাইল। এইরূপ গোপনে গোপনে ইংরাজ প্রতিনিধি আপনাদেব অনুকূল অঙ্গীকারপত্রে ফকিরউদ্দীনকে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন, গোপনে গোপনে গবর্নমেন্ট আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির সমস্ত আয়োজন করিলেন। অঙ্গীকারপত্র যথানিয়মে মোহর করা হইল। সুতরাং উহা গবর্নমেন্টের চিরপোষিত কামনা পূর্ণ করার একখানি প্রধান দলিল হইয়া রহিল।

অতি সহজে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারীকে, আপনাদের অভীষ্ট বিষয় সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ করাতে গবর্নমেন্ট বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু যিনি অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন, তাহার বিশেষ সন্তোষ জন্মিল না। পূর্বপুরুষাগত রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করা তিনি নিতান্ত অবমাননা বলিয়া মনে করিলেন। আপনাদের এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তবে নির্বাসিত হইলে যে, আত্মমর্যাদার হানি হইবে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ইংরাজ গবর্নমেন্টেব অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না; রেসিডেন্ট যখন তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি উপায়ান্তব না দেখিয়া অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। পিতার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাহার কিছুমাত্র আহ্লাদ হইল না। অনুশোচনায় তাহাব হৃদয়ে বিষম অশান্তি উপস্থিত হইল।

ইংরাজ রেসিডেন্ট ও ফকিরউদ্দীনের মধ্যে উপস্থিত মীমাংসা গোপনে হইলেও, উহা দীর্ঘকাল বৃদ্ধ ভূপতি ও তাহার পত্নীর অবিদিত রহিল না। জিন্নৎ মহল আপনাদের গৌরবের হানিকর অঙ্গীকারের কথা শুনিয়া বড় বিরক্ত হইলেন। যুগপৎ ক্ষোভ, অভিমান ও বিরাগের তরঙ্গে তাহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি দুঃসহ যাতনায় অধীর হইয়া প্রতি মুহূর্তে অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ অভীষ্ট বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে হতাশ হইলেন না। তিনি তখনও জোয়ান বখতকে সিংহাসন দিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহার আশা ছিল যে, জিন্নৎ মহলের যত্নে ও চেষ্টায় এক সময়ে জোয়ান বখতের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে। তিনি যেরূপ জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সর্বদাই তিনি তাহার শেষ সময় অতি নিকটবর্তী বলিয়া বুঝিলেন। কিন্তু তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে তাহা ঘটিল না। বৃদ্ধ বাহাদুর জীবিত রহিলেন, তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ফকিরউদ্দীন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অসময়ে অতর্কিতভাবে ফকিরউদ্দীনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অনেকে সন্দেহ করেন, বিষপ্রয়োগে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ পত্নীর পরামর্শে ফকিরউদ্দীনের পরিবর্তে জোয়ান বখতকে রাজ্যাধিকারী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফকিরউদ্দীনের প্রতি কখনও স্নেহশূন্য হন নাই। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে তিনি অধীর হইয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। জিন্নৎ মহল তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সবিশেষ চেষ্টা করেন। জিন্নৎ মহলের চেষ্টায় বৃদ্ধ ভূপতি ক্রমে আবার জোয়ান বখতের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হন। ফকিরউদ্দীনের মৃত্যুর পরদিন যখন ইংরাজ প্রতিনিধি রাজপ্রাসাদে আগমন করেন, তখন বাহাদুর শাহ জোয়ান বখতকে আপনার সিংহাসন দিবার প্রস্তাব করিতে বিমুখ হন নাই। ইহার পরদিন জোয়ান বখতের আর একদল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দেন, এই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম মির্জা কোরেস। উপস্থিত সময়ে, ইনিই বাহাদুর শাহের পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মির্জা কোরেস আপনার অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য দিল্লির ইংরাজ রেসিডেন্টের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদনে তিনি লেখেন—"বৃদ্ধ পিতা জোয়ান বখতের পক্ষ প্রবল করিবার জন্য আমার ভ্রাতাদিগকে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতার উপর আমার যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। তাহার যে কোন আদেশ পালনে, আমি সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। কিন্তু জীন্নৎ মহলের পরামর্শে যখন তিনি আমার অধিকার নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আমি বাধ্য হইয়া ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিতেছি। আমার আশা আছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে ন্যায়বিচার করা হইবে। আমি এখন রাজকুমারদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত আমি মক্কাতীর্থে গিয়াছি, সমস্ত কোরাণ আমার অভ্যস্ত রহিয়াছে, সাক্ষাৎ হইলে, আমার অন্যান্য গুণও আপনি জানিতে পারিবেন।

এই সময়ে, লর্ড ক্যানিং গবর্নর জেনরেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্যশাসনের জন্য নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইয়াছিল। এখন এই নবাগত গবর্নর জেনরেল ও নূতন মন্ত্রিসভার নিকট দিল্লির রাজ-বংশের বিষয় উপস্থিত করা হইল। লর্ড ডালহাউসি, দিল্লির

রাজপ্রাসাদ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন উহা কোম্পানির সামরিক কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহাই তাহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। নবাগত গবর্নর জেনরেল এখন লর্ড ডালহাউসির মতেরই অনুমোদন করিলেন।

দিল্লির রাজপ্রাসাদ অধিকার করা উচিত বটে, কিন্তু দিল্লির ভূপতির সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, লর্ড ক্যানিং তাহা ভাবিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্থির করিলেন যে, —"দিল্লির রাজবংশের প্রায় সমস্ত অধিকার একে একে লোপ পাইয়াছে। এখন যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও নষ্ট করা কিছুই কষ্টকর নয়। এখন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর অনায়াসে তাহার উত্তরাধিকারিদিগের 'রাজা' উপাধি লোপ করা যাইতে পারে। গবর্নর জেনরেলও প্রধান সেনাপতি দিল্লির ভূপতিকে যে নজর দিতেন, তাহা বন্ধ করা হইয়াছে, দিল্লিশ্বরের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইত, এখন সে প্রথাও রহিত হইয়া গিয়াছে। গবর্নর জেনরেলের মোহরে এখন আর দিল্লিশ্বরের নিকট অধীনতা প্রকাশের কোন চিহ্ন থাকে না। ভারতের রাজগণকেও এইরূপ মোহর ব্যবহার করিতে হইতেছে না। ইংরাজ গবর্নমেন্ট আপনাদের রাজশক্তির সম্মান রক্ষার জন্য এইরূপ আনুগত্য স্বীকারে নিরস্ত হইয়াছেন। নজর প্রভৃতি রহিত করার সম্বন্ধে যে যুক্তি আছে, রাজা উপাধির উচ্ছেদের সম্বন্ধেও সেই যুক্তি খাটিতে পারে। এখন মির্জা মহম্মদ কোরেস দিল্লিশ্বরের উত্তরাধিকারী; ইংরাজ গবর্নমেন্ট ইহার স্বত্বরক্ষায় প্রস্তুত আছেন। রাজা উপাধির উপর মহম্মদ কোরেসের কোন দাবি নাই। ইনি কখনও আপনার বংশে রাজকীয় ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ দেখেন নাই।" গবর্নর জেনরেলের এই অভিমত তাহার মন্ত্রিগণের অনুমোদিত হইল। অবিলম্বে দিল্লির ব্রিটিশ এজেন্ট মেটকাফ সাহেবকে উপস্থিত বিষয়ে এই ভাবে কার্য করিবার উপদেশ দেওয়া গেল — "যদি দিল্লির সম্রাটের পত্রের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ইংরাজ প্রতিনিধি সম্রাটকে জানাইবেন যে গবর্নর জেনরেল জোয়ান বখতকে রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ফকিরউদ্দীন যে সর্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সর্তে মির্জা মহম্মদ কোরেস দিল্লির রাজ সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবেন না। বাহাদুর শাহ যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সম্রাট বা তাহার বংশের কাহারও সহিত কোনরূপ পত্র ব্যবহার করা হইবে না। সম্রাটের মৃত্যু হইলে, গবর্নমেন্ট মির্জা মহম্মদ কোরেসকে বংশের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে ফকিরউদ্দীনের সহিত যে সকল সর্ত স্থির হইয়াছিল, তাহার প্রায় সমস্তই থাকিবে, কেবল 'রাজা' উপাধির পরিবর্তে মির্জা কোরেস 'শাহজাদা' উপাধি পাইবেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে কোনরূপ লেখাপড়া করিবেন না, কোনরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবেন না, অথবা অতিরিক্ত বৃত্তিও দিবেন না। ভবিষ্যতে যাহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, রাজপ্রাসাদে রাজবংশের এমন কয়জন অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার তালিকা দিতে হইবে। পুত্রই হউক বা পৌত্রই হউক, কত জন এই উত্তরাধিকারের দাবি করিতে পাবেন, তাহারও বিবরণ দিতে হইবে। তবে পূর্ববর্তী ভূপতির কোন দূরতর আত্মীয়ের কথা এই বিবরণে দিতে হইবে না। দিল্লির রাজবংশের এখন যে বৃত্তি নির্ধারিত আছে, শাহজাদাকে তাহা হইতে মাসে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া যাইবে।"

ইংরাজ গবর্নমেন্টের শেষ সিদ্ধান্ত যখন জীন্নৎ মহলের গোচর হয়, তখন তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। জীন্নৎ মহলের আত্মসম্মান বোধ ছিল, কাজেই তিনি যখন

শুনিলেন যে, তাহার বংশের চিরন্তন উপাধি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহারা পুরুষানুক্রমে যে প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন, যে প্রাসাদ তাহাদের পূর্বতন গৌরব ও পূর্বতন মহিমা জনসাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতেছিল, সে প্রাসাদ কোম্পানির অধিকৃত হইবে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুঃখে ও অভিমানে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। জিন্নৎ মহল হৃদয়ে শত বৃশ্চিকদংশনজ্বালা অনুভব করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের চিত্তবল ছিল না, তেজস্বিতা ছিল না, এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য চেষ্টাও ছিল না। তাহার ধারণা ছিল যে, গবর্নমেন্ট তাহার উপাধি বা লুপ্তপ্রায় সম্মানের উপর কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারেন; এ বিষয়ে গবর্নমেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করা তাহার ক্ষমতায়ত্ত নয়। গবর্নমেন্টকে আপনার বংশের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে প্রবর্তিত করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না; সুতরাং তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বর্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু জিন্নৎ মহল বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় বর্তমান স্বল্প সুখেই পরিতুষ্ট থাকেন নাই; যৌবনের পূর্ণাবস্থায় যেরূপ সামর্থ্য, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সঞ্চার হয়, জিন্নৎ মহলে তাহার কোন অভাব ছিল না। তিনি সুসময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাহার আশা ও সঙ্কল্প উভয়ই অটল রহিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের কয়েক মাস অতীত হইবার পর দিল্লির মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গেল। পারস্যযুদ্ধের কথা লইয়া সাধারণে নানা কথা নানা ভাবে রঞ্জিত করিয়া লোকের হৃদয় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অনেকেই ইংরাজদিগের শক্তিনাশের আভাস দিতে লাগিল। অনেকেরই বিশ্বাস হইল যে, ভারতের উত্তরপশ্চিম দিকে হইতে একটি মহাশক্তির আবির্ভাব হইবে এবং ইংরাজ শাসন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বেই প্রচার হইয়াছিল যে, পাঠানের আমল হইতেই দেখা গিয়াছে যে, "৫৬" বা "৫৭" সাল কোন রাজশক্তির পতনের কাল এবং কোন রাজশক্তিই একশত বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই, সুতরাং এই "৫৭" সালে ইংরাজদিগের এই "শতবর্ষ" পূর্ণ হইল, এইবার পতন ঘটিবে। এখন সকলে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল বলিয়া, বোধ করিতে লাগিল।

অনেকে বলেন যে, বাহাদুর শাহ পারস্যপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কি সূত্রে বাহাদুর শাহের উপর এই দোষের আরোপ হয়, পারস্যাধিপতির সহিত বাহাদুর শাহের ষড়যন্ত্রের কারণ নির্দেশকালে কেহ কেহ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন : —মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি এই দুইটি সম্প্রদায় আছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব অত্যন্ত অধিক। দিল্লির অধিপতি সুন্নি কিন্তু অযোধ্যার নবাব ও পারস্যরাজ সিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। যখন বাহাদুর শাহ তাহার প্রিয়তমা পত্নীর বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, ইংরাজ গবর্নমেন্ট যখন জোয়ান বখতকে দিল্লির ভাবী ভূপতি বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না, সেই সময়ে বৃদ্ধ বাহাদুরের সিয়া মত গ্রহণে ইচ্ছা হয়। অযোধ্যায় তাহার বংশের কয়েক ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছিলেন; এই সময়ে ইহাদেরও সিয়া মত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহাদের একজন দিল্লিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তিনি দিল্লি হইতে চলিয়া গেলে এইরূপ একটা কথার প্রচার হয় যে, অযোধ্যার নবাব ও পারস্যাধিপতি, উভয়েই বাহাদুর শাহকে ইংরাজের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার ইচ্ছা

করিয়াছেন। পারস্যসেনা ও রুশসেনা সমবেত হইয়া দিল্লির অধিপতির বিমুক্তির জন্য আসিতেছে। এইবার মোগল সম্রাট সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পূর্বের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ডচালনা করিতে পারিবেন, পূর্বের ন্যায় মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইবে, এই সকল কথাও এই সময়েই সকলের আন্দোলনের বিষয় হইয়া পড়ে। কিন্তু বাহাদুর শাহ যে, এ বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

যাহা হউক, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই উপস্থিত উত্তেজনার বিষয় ইংরাজ জানিতে পারে। মার্চ মাসের মধ্যভাগে দিল্লির জুম্মা মসজিদে কে একখানি ঘোষণা পত্র আঁটিয়া দেয়। এই ঘোষণা-পত্রে লিখিত ছিল যে. ইহা পারস্যের ভূপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে। ঘোষণা পত্রের মর্ম এই,—পারসিক সৈন্য ইংরাজদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধন জন্য অগ্রসর হইতেছে। অতএব এই সময়ে মুসলমানদ্বেষীদিগের সহিত সমস্ত ধর্মানুরক্ত মুসলমানেরই যুদ্ধ করা উচিত। ঘোষণাপত্রে মহম্মদ সাদিকের নাম ছিল; কিন্তু মহম্মদ সাদিক কে, তাহা কেহই জানিত না। জনসাধারণকে যে, ইংরাজ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল, উপস্থিত ঘোষণাপত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, উহা দীর্ঘকাল জুম্মা মসজিদে সংলগ্ন ছিল না; সুতরাং অনেকেই উহা দেখিতে পায় নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু ঘোষণাপত্র দীর্ঘ কালস্থায়ী না হইলেও, এবং উহা সর্বসাধারণের চক্ষে না পড়িলেও, উহার মর্ম প্রকারান্তরে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাহাদুর শাহ সিপাহিযুদ্ধের সময় অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। ফরেস্ট প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহাদুর শাহ সিপাহিযুদ্ধের কোন ষড়যন্ত্রেই সংসৃষ্ট ছিলেন না। তাহার বেগম জিন্নৎ মহল এবং সেই বেগমের পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সিপাহিযুদ্ধের পূর্বের সকল চক্রান্তের সূচনা করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। বাহাদুর শাহ সুফিদিগের মনস্তত্ত্ব পাঠ করিয়া কতকটা সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—যাহা যায়, তাহা আর আসে না, সংসারে নিত্য নূতনেরই আবিভাব হইয়া থাকে; বাদশাহী জলুশ বা চাকচিক্য চিরদিনের জন্য মলিন হইয়াছে, তাহাতে আর নূতন পালিশ চড়িবে না। এমন বিরক্ত, স্থবির, জরাজীর্ণ পুরুষ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সিপাহিযুদ্ধের সহিত সংসৃষ্ট থাকিতে পারেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে সহসা মীরটের সিপাহিদলের আগমনবার্তায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ হত্যায় বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার বিহ্বলতার সময়ে বাদশাহী মঞ্জিলের চক্রান্তকারিগণ দিল্লির উদ্‌ভ্রান্ত নাগরিকগণের সাহায্যে ভীষণ নরহত্যার অভিনয় সংঘটিত করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী পতাকা উড়াইয়া দিল্লিতে বাদশাহী শাসনের ব্যবস্থা প্রচলন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বাহাদুর শাহ এ সকল সমাচার কিছুই রাখেন নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, বাবরের শেষ বংশধর বাহাদুর শাহ সিপাহিযুদ্ধের কোন চক্রান্তের কলঙ্কে কলঙ্কিত ছিলেন না। তিনি মারাঠাদিগের উৎপাত উপদ্রব নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, ভরতপুরের জাঠ সৈনিকগণের পৈশাচ তাণ্ডব সহ্য করিয়াছিলেন, পিণ্ডারীগণের উৎপাত উপদ্রব দেখিয়াছিলেন—

সিপাহিদিগকে দেখিয়া তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ইহাও বুঝি সেইরূপ একটা উৎপাত উপদ্রবই হইবে। তাই তিনি ডগলাস সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "যাইও না, উহারা খুন করিবে।"

বেগম জিন্নৎ মহল কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, দিল্লির রঙ্গমহলের মধ্যে ইংরাজ-শোণিত প্রবাহিত হইবে। তিনি তৈমুরলঙ্গের বিজয়কেতন পুনঃউড্ডীন কবিবার মানসে, স্বীয় পুত্রকে প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ করিবার আকাঙ্ক্ষায় ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ হয় হউক, যুদ্ধক্ষেত্র ইংরাজ-শোণিতে প্লাবিত হয় হউক, কিন্তু রঙ্গমহল যাহাতে পবিত্র থাকে, সে চেষ্টা তাহার ছিল। অমন তেজস্বিনী উন্নতহৃদয়া নারী কাপুরুষতার, গুপ্ত নরহত্যার সহচারিণী হইতেই পারেন না। কিন্তু বহুকালের বিলাসে তৈমুরবংশীয়গণ মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিভাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই সিপাহিগণের প্রথম আগমনে স্বেচ্ছাচারের উদ্‌ভ্রান্ত বিলাসে নানা পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্বাধীনতা লিপ্সা এবং ধর্মভীরু হইলে সিপাহিগণ স্বেচ্ছাচারের প্রথম উল্লাসে নরঘাতকের আচার করিত না। মীরটের উৎপাত উপদ্রব কোনও রকমে ক্ষমা করা চলে, কেননা সিপাহিগণ প্রথম বিপ্লবের উল্লাসে অধিনায়ক শূন্য বলিয়া আত্মহারা হইয়াছিল—জিঘাংসায় বিবেচনাশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লিতে আসিয়া তাহারা একটা উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট সাধনা, একটি শিরোমণি পাইয়াছিল। সিপাহিরা যেভাবে সলিমগড় অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা হুকুম করিলেই দিল্লির সকল শ্বেতাঙ্গ নরনারীকেই দিল্লি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইত। ফ্রেজারের ন্যায় উদ্ধত রাজকর্মচারীকে বধ করা এক কথা, আর শুশ্রূষাকারিণী ইংরাজ মহিলাগণকে রোগীর পার্শ্বে বধ করা আর এক কথা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে মীরটের সিপাহি সেনাদলে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক ছিল। ইহারা নগরের নিচ শ্রেণির মুসলমানের সহিত সম্মিলিত হইয়া যে রোমহর্ষ বীভৎস কাণ্ডের সূচনা করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেও ঘৃণায় লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়, তাহার পুনরাবৃত্তিতে মসীমুখ লেখনীও বুঝি কলঙ্কিত হয়। পাপ পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা তাহার কর্মচারিবর্গ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও যে তাহাদিগের বালক বালিকা ও আত্মীয়স্বজনকে পশুর ন্যায় বধ করিতে হইবে, এ কেমন কথা? পাপের প্রতিশোধ মানুষের আয়ত্তে নহে, ভগবান তাহার বিধান করিয়া থাকেন। পাপের প্রতিশোধক পুণ্য, পুণ্যের প্রভাবে পাপের ভস্মরাশি কোথায় উড়িয়া যায়। পাপের প্রভাবে মোগলের বাদশাহী নষ্ট হইয়াছিল, পাপের প্ররোচনায় সিপাহির দল ইংরাজের পোষা শিকারি চিতাবাঘের দলের মতো একে একে ভারতের সকল নরপতির উচ্চমুণ্ড নত করিয়াছিল, আর সেই পাপের প্রশ্রয়ে ইংরাজ ধীরে ধীরে সিপাহিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। প্রবঞ্চিত হইলে মানুষ চটিয়া উঠে। যে ক্রোধ নিজের উপর হইতে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু আপনাকে মূর্খ না ভাবিয়া যে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে প্রবঞ্চিতকে পুনঃ প্রবঞ্চিত হইতে হয়। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা, বাদশাহী আমল আবার প্রবর্তিত করা যদি সিপাহিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তাহারা দিল্লির ন্যায় দুর্ভেদ্য নগর, সলিমগড়ের ন্যায় মোগল বাদশাহগণের বংশধরগণকে পাইয়া সিপাহিগণ পিশাচ তাণ্ডবে স্বেচ্ছাচারের উল্লাসে অমূল্য সময় অতিবাহিত করিত না। তাহারা তো জানিত যে পশ্চিমে পঞ্জাব অটুটভাবে

ইংরাজের সহকারিতা করিতে উদ্যত হইয়াছে—শিখ সৈনিকগণ গুজরাট মুদ্‌কী সুলতানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রোষেদ্রংষ্ট্রা লেহন করিতেছে—পূর্বদিকে অজ্ঞেয় রোহিলখণ্ড স্থির ধীর ভাবে রহিয়াছে—দক্ষিণে রাজস্থানের চিরপুরাতন রাজন্যবর্গ একবার উষ্ণীষ হেলন করিয়া তাহাদের কার্যের অনুমোদন করেন নাই—উত্তরে ইংরাজ সেনাপতি এন্সম প্রায় চার পাঁচ হাজার গোরা সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন—অম্বালা, শিয়ালকোট, কর্ণাল, রোটক, মীরট, আগ্রা, সাহারানপুর প্রভৃতি নগর সকল ইংরাজের অধিকারে রহিয়াছে—পাতিয়ালা ঝিন্দ, নাভা, প্রভৃতি ফুক্কীয়ান বংশধর শিখ সর্দারগণ ইংরাজের সহায়তা করিবার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন করিতেছেন—এমন সময় কোথায় এই সকল স্থান অধিকার করিয়া সিপাহিগণ দিল্লি নগরকে নিরঙ্কুশ করিবে, দিল্লির অদূরবর্তী ভূমি "রীজে" কামান পাতিয়া দিল্লিকে দুর্ভেদ্য করিবে, তাহা না করিয়া তাহারা দিল্লি নগরের শ্বেতাঙ্গ নরনারী সকলকে, খ্রিস্টানগণকে এবং বাঙালিদিগকে উৎপীড়ন করিতে ব্যস্ত হইল। যাহারা স্বাধীনতা চাহে, প্রবল পরাক্রান্ত চতুর ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহে, তাহারা হেলায় দিল্লি অধিকার করিয়া এমন ক্ষুদ্র কার্যে সময়াতিপাত করে না। দিল্লির সিপাহিগণ কতটা মূর্খতা করিয়াছিল, কেমন করিয়া হেলায় দিল্লির বারুদখানা ও তোপখানা ইংরাজকে উড়াইয়া দিবার অবসর দিয়াছিল, তাহা পরের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। এই সকল বর্ণনা পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সিপাহিগণ মাহেন্দ্রক্ষণ পাইয়াও বুদ্ধির জড়তা বশত কেমন অনায়াসে সে ক্ষণকে অতিবাহিত হইতে দিয়াছিল। যাহারা চিরকাল আদেশ অনুসারে কার্য করিয়াছে, তাহারা সহসা স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিল্লি-কাশ্মীর দরওয়াজা-বারুদখানা

মীরটের সিপাহির দল যে ওই নগরের শ্বেতাঙ্গদিগকে হত্যা করিয়া দিল্লির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, এই সমাচার দিল্লির ইংরাজ রাজপুরুষগণ জানিতে পারেন নাই। সিপাহির দল গাজিয়াবাদের পথে আসিবার সময়ে টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছিল। ফলে মীরটের সমাচার দিল্লির ইংরাজ অধিবাসীমাত্রেই জানিতেন না। ১১ই মে প্রত্যুষে দিল্লির টেলিগ্রাফ অফিসের প্রধান কর্মচারী টড সাহেব যখন বুঝিতে পারিলেন যে, দিল্লি ও মীরটের মধ্যের টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়াছে, তখন তিনি সন্দেহের বশে ব্যাপার বুঝিবার জন্য যমুনার নৌ-সেতুর দিকে গমন করেন, এই সময়ে মীরটের অশ্বারোহী সিপাহির দল আসিতেছিল, তাহাদেরই একজন টড সাহেবকে দেখিতে পাইয়া তলোয়ারের আঘাতে সাহেবকে দ্বিখণ্ডিত করে। উক্ত সাহেবের মৃত্যু সংবাদ বহু পরে দিল্লিবাসী জানিতে পারে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ১১ই মে তারিখে শুভদিন জানিয়া দিল্লি হইতে একদল হিন্দু উত্তরাখণ্ডে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হয়। তাহারা যমুনার নৌসেতু পার হইতে না হইতে মীরটের সিপাহিদিগের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হয়। সিপাহিরা তাহাদিগকে দিল্লিতে ফিরিয়া যাইতে বলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ইঙ্গিত করে যে, সিপাহিদিগের কথামত প্রত্যাবর্তন না করিলে তাহারা সকলেই প্রাণ হারাইবে। অগত্যা এই তীর্থযাত্রীগণ প্রথমে দিল্লিতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাদেরই জনকয়েকের সম্মুখে টড সাহেব হত এবং ইহারাই পরে টড সাহেবের মৃত্যু সমাচার নগরের কোতোয়ালের নিকট পাঠাইয়া দেয়।

ডগলাস হচিন্সন, জেনিংস্ প্রভৃতিকে বধ করিয়া শোনিতে নিজেদের হস্ত অনুরঞ্জিত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সিপাহিরা বাদশাহী মঞ্জিল হইতে বাহির হইয়া আসিল। যাহারা সারা নিশায় ছত্রিশ মাইল পথ অতিবাহন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা কেবল অশ্ব পরিবর্তিত করিয়া এবং এক এক লোটা ভাঙ-পান করিয়া উন্মত্ত অসুরের ন্যায় তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে নগরের দিকে অগ্রসর হইল। ইহাদের সহিত দিল্লি নগরীর যত বদমায়েস, যত অসচ্চরিত্র হীন ব্যক্তি আসিয়া সম্মিলিত হইল। সেই মুষ্টিমেয় মীরটের অশ্বারোহী সেনা পরিচালিত দিল্লির লোকসংঘ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় দিল্লির কাছারী বাড়ি ও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের আবাসস্থানে গিয়া পড়িল। তখন ইহাদের কাহারও মনে হয় নাই যে, এই সময়ে দিল্লির বারুদখানা অধিকার করা অতি প্রয়োজন। সে সময়ে দিল্লির বারুদখানা সিপাহিদিগের অধীন হইলে বোধ হয় সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইত। এই সময়ে দিল্লিতে ৩৮নং, ৫৪নং ও ৭৪নং তিনদল পদাতি সিপাহি রেজিমেন্ট উপস্থিত ছিল। এই তিন দলে মোটের উপর সাড়ে তিন হাজার সৈনিক পুরুষ ছিল। একদল সিপাহি

গোলন্দাজ সৈন্য ছিল, এ দলেও প্রায় ১৬০ জন সিপাহি গোলন্দাজ কাজ করিত। ৫২ জন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ সেনানিবাসের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৩৮নং রেজিমেন্টের কয়েকজন সিপাহি মীরটের সিপাহির দল আসিবামাত্রই তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল।

এদিকে দিল্লির ইংরাজ পল্লীর দরিয়াগঞ্জে ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অভিনয় হইতেছিল। বেলা দুই প্রহরের মধ্যেই দিল্লি নগরী ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় শূন্য হইয়াছিল, অর্থাৎ ইংরাজ কর্মচারী মাত্রেই সিপাহিদিগের তলোয়ারের আগাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। দুই প্রহরের সময় দিল্লির ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হয়। দিল্লির ব্যাঙ্কের কার্যাধ্যক্ষ বেরেসফোর্ড সাহেব আপনার স্ত্রী ও সন্তানাদিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে একটি ঘরের ছাদে আশ্রয় লইয়াছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য সাহেবের হস্তে একখানি উন্মুক্ত তরবারি ছিল এবং তাহার পত্নীর হস্তে একটি সুতীক্ষ্ণ বর্ষা ছিল। এই বীর দম্পতি বহুক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবি বেরেসফোর্ডের বর্ষার আঘাতে একাধিক সিপাহি ধরাশায়ী হইয়াছিল, কিন্তু শেষে ইহারা সকলেই বিনষ্ট হন। "দিল্লি গেজেট" নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের ছাপাখানা লুণ্ঠিত হয়। ছাপাখানার সকল খ্রিস্টাধর্মাবলম্বী কম্পোজিটার নিহত হয়। ছাপাখানার সমস্ত টাইপ বা হরফ লইয়া যাইয়া সিপাহিগণ তাহার দ্বারা গুলি তৈয়ার করিয়াছিল এবং সেই গুলি দিয়া নাকি দিল্লির সকল দেশীয় খ্রিস্টানকে বধ করিয়াছিল। এইভাবে উন্মত্ত সিপাহিগণ নর-নারী বালক-বালিকা হত্যা করিতে করিতে কাশ্মীর দরওয়াজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কাশ্মীর দরওয়াজা দিয়াই ক্যান্টনমেন্ট বা সেনানিবাসের পথ সোজা গিয়াছে। এই দরওয়াজার সম্মুখে ৩৮নং সিপাহি পদাতি রেজিমেন্টের ৫০ জন সৈনিক সশস্ত্র হইয়া সেনানিবাসের পথ রক্ষা করিতেছিল। ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্ দিল্লির সেনানিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি নগরের সকল ঘটনার কথা শুনিতে পাইয়া ৫৪ নম্বরের সিপাহি পদাতি সেনার দলকে দুইটি তোপসহ নগর রক্ষা করিতে যাইবার জন্য হুকুম দিলেন। কিন্তু কামান দুইটি প্রস্তুত করিতে বিলম্ব ঘটায় রেজিমেন্টের কর্তা কর্ণেল রিপ্লে দুই কোম্পানি সিপাহিকে তোপ দুইটি আনিবার জন্য পিছনে রাখিয়া বাকি রেজিমেন্ট লইয়া নগরের দিকে ছুটিলেন। সিপাহিগণ পরিখা পার হইয়া কাশ্মীর দরওয়াজার ভিতর দিয়া নগরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। এইখানেই ৩৮নং রেজিমেন্টের ৫০নং সিপাহি রক্ষীর কার্য করিতেছিল। আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহারা মীরটের বিপ্লবকারী সিপাহি দলকে দেখিতে পাইল। মীরটের অশ্বারোহী সিপাহিগণ ঘোড়ার বেকাবের উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ইংরাজ পরিচালিত আগন্তুক সিপাহিদিগকে দেখিয়া বিকট ভৈরব হুঙ্কার করিয়া উঠিল। এই সময় ৫৪নং সিপাহির দলকে তাহাদের ইংরাজ সেনানীগণ বন্দুকে টোটা ভরিয়া আওয়াজ করিতে বলিলেন। কিন্তু সে হুকুম কেহ মানিল না। এই অবসরে মীরটের ৩ নম্বরের অশ্বারোহী সেনাদল "হব হর মহাদেও—দীন দীন" রব তুলিয়া আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণেই ৫৪নং দেশীয় সিপাহি পদাতি সেনাদলের ইংরাজ সেনানীবর্গ একেবারেই গতাসু হইলেন। যাঁহারা অশ্বারোহণে ছিলেন না, তাহাদিগকে তাহাদের অধীন সিপাহির দলই সঙ্গীনের খোঁচা দিয়া মারিয়া ফেলিল। দিল্লির ৫৪নং সিপাহি রেজিমেন্ট এইভাবে মীরটের দলের সহিত মিলিত হইল। ওদিকে ৩৮নং পদাতি সিপাহিদলের যে ৫০ জন রক্ষীর কার্য করিতেছিল, তাহাদিগকে কর্নেল রিপ্লে বন্দুক

ছুড়িতে হুকুম করিলেন। ৫০ জন সিপাহি এই হুকুম শুনিয়া রিপ্লে সাহেবকে গালি দিল, আর সেই অবসরে মীরটের অশ্বারোহী সিপাহিগণ রিপ্লে সাহেবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। এই সম্মিলিত সিপাহির দল কাশ্মীর দরওয়াজা অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় কর্নেল রিপ্লের সেই দুইটি তোপ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপ্লুত ও উত্তেজিত সিপাহিগণ আর অগ্রসর হইল না সকলেই নগরের দিকে ফিরিয়া গেল। তাহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া একজন ইংরাজ কর্মচারী ঘোড়া ছুটাইয়া দিল্লির সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ৩৪নং সিপাহির দলকে দুইটি তোপসহ নগর রক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন। মেজর এবট এই সিপাহি দলের সেনানী ছিলেন। তিনি তাহার রেজিমেন্টকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে মাথার টুপি খুলিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—"চিরদিন তোমরা আমার কথা শুনিয়া আসিয়াছে, আজ আমি তোমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। আজ্ঞা কর, আমাকে কি করিতে হইবে। আমার মুক্ত শির তোমাদের সম্মুখে অবনত করিয়া রাখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আমাকে গুলি করিয়া মারিতে পার এবং পরে বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইতে পার। তোমরা বেশ জান যে আমি মরণের জন্য ভীত নহি, মরিতেও জানি। কিন্তু মরিবার পূর্বে আমার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়গণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটা চেষ্টা করিয়া মরিব। পাছে তোমরা সেই চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাও তাই তোমাদের কাছে আজ আমি আমার জাতির, ধর্মের, আমার নারীকুলের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভিখারী হইয়া দাঁড়াইলাম। তোমরাই আমার সর্বস্ব, তোমরা আমার এ চেষ্টার সহায় না হইলে একা আমি কি করিতে পারি? তোমাদের ন্যায় বীর আমি আর কখনও দেখি নাই, তোমরা আজ পর্যন্ত কখনও কোন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বধ করিতে উদ্যত হও নাই, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হও নাই। ভারতের হিন্দু মুসলমান এখনও নিমকের মূল্য ভুলে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলিয়া দাও আমার এখন কি কর্তব্য।"

এবট সাহেবের এই বক্তৃতার উত্তরে সকল সিপাহিই তাহার হুকুম মানিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল এবং নিজেদের বন্দুকে টোটা পুরিয়া প্রস্তুত হইল। ইহারা যখন কাশ্মীর দরওয়াজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল,তখন দরওয়াজার সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু দূরে রাইফেল বন্দুকের কড় কড় শব্দ এবং বড় কামানের বজ্রনাদ-পরাজয়ী ভীম গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা বুঝিল যে দূরে একটা বিষম যুদ্ধ চলিয়াছে। সেই প্রথম বৈশাখের প্রাহ্ণকালে যখন সূর্যরশ্মি পৃথিবীর সর্বত্র অগ্নি ঢালিয়া দিতেছিল, তখন সহসা পৃথিবী একবার কাঁপিয়া উঠিল। বিরাট ভূমিকম্পের ন্যায় দিল্লির ভূমিস্তর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর একটা অতি ভয়ানক শব্দ হইল। সে শব্দে ক্ষণেকের জন্য সকলেই যেন সম্মূঢ় হইয়া গেলেন। শত বজ্রনাদ একত্র করিলে সে শব্দের তুলনা হয় না; সহস্র কামান এক সঙ্গে ছুড়িলে তাহার এক অংশেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই ভীম ভৈরব শব্দ দিল্লি নগরীকে কাঁপাইয়া, দিল্লির কানন কান্তারকে কাঁপাইয়া, দিল্লির বাদশাহী প্রাচীরকে কাঁপাইয়া উর্ধ্বে উত্থিত হইল। তাহার শব্দে ও প্রতিশব্দে, ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে আকাশমণ্ডল যেন থরথর কাঁপিয়া উঠিল—আর সেই সঙ্গে একটি অতি বিশাল, অতি বিরাট, অতি ভীমাকার ধূমস্তম্ভ অভ্রভেদ করিয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, দিল্লির বারুদখানা উড়িয়াছে।

বাদশাহী মঞ্জিলের অতি নিকটেই দিল্লির ম্যাগাজিন বা তোপ ও বারুদখানা অবস্থিত ছিল। এই বারুদখানায় একটা বিরাট বাহিনীর এক বৎসরের ব্যয়যোগ্য গোলা, গুলি, বারুদ, টোটা প্রভৃতি সঞ্চিত ছিল। বিপ্লবের প্রথম সমাচার পাইয়া দিল্লির ম্যাজিস্ট্রেট স্যর থিওফাইলাস্ মেটকাফ্ লেফটেনান্ট ফরেস্টকে সঙ্গে লইয়া দুইটি তোপ সংগ্রহ করিবার জন্য এই বারুদখানায় আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন মেটকাফ সাহেব বারুদখানার কর্তা লেফটেনান্ট উইলোবির সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, সে সময় একথা ভীষণ কোলাহল ধ্বনি শুনিয়া উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে বুঝি বা আর তোপের প্রয়োজন হইবে না। এই সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য উভয়েই গম্বুজের উপর উঠিলেন। তাহারা দেখিলেন যে, যমুনার নৌসেতুর উপর মহোরগের গতির ন্যায় আঁকাবাঁকা হইয়া মীরটের সিপাহিগণ দিল্লিতে প্রবেশ করিতেছে। সলিমগড়ের দরওয়াজার ভিতর পর্যন্ত তাহারা আসিয়াছে। অনেকে বাদশাহের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া গোলমাল করিতেছে। আর তোপের প্রয়োজন নাই বুঝিয়া উভয়ে নামিয়া আসিলেন এবং কিসে তোপখানা রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। লেফটেনান্ট উইলোবি ও ফরেস্ট তৎক্ষণাৎ তোপখানার সকল দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তোপখানা রক্ষা করিবার অন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তোপখানায় মোট আটজন শ্বেতাঙ্গ গোলন্দাজ ছিল। এই আটজনের মধ্যে চারিজনকে দুইটি দরওয়াজার সম্মুখে রাখা হইল। এই দুইটি দরওয়াজার সম্মুখে দুইটি করিয়া লম্বা তোপ দ্বিগুণভাবে গাদিয়া রাখা হইল এবং এই চারিজন ইংরাজ শ্বেতাঙ্গকে বলা হইল যে, যখন দেখিবে ফটক ভাঙ্গিয়াছে, আর রক্ষার উপায় নাই, তখন এক সঙ্গে এই দুইটি তোপে পলিতা দিয়া পিছে হটিয়া যাইবে এবং তোপখানার দিকে পলাইয়া আসিবে। খাস তোপখানার প্রধান দরওয়াজার দুইটি তোপ রাখা হইল এবং তিন সের ওজনের গোলা নিক্ষেপকারী আর দুইটি তোপ সম্মুখে সাজাইয়া রাখা হইল। সর্বসমেত এইভাবে আটটি তোপ তোপখানার চারিদিকে দ্বাররক্ষা করিবার জন্য এইভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইল। এই সময়ে তোপখানার গোলন্দাজ সিপাহিদিগকে বিশিষ্ট অস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু তাহারা কোন অস্ত্রই গ্রহণ করিল না। লেফটেনান্ট উইলোবি বুঝিলেন ব্যাপার বড় বিষম। তিনি বারুদ ও টোটাখানা হইতে প্রধান দরওয়াজা পর্যন্ত মাটির নিম্নে একটি পলিতা তৈয়ার করিয়া রাখিলেন। সেই পলিতার মুখাগ্রভাগে তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পার্শ্বে স্কালি নামক একজন ইংরাজ গোলন্দাজ দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে সিপাহিগণ বারুদখানার দরওয়াজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমে বাদশাহের দোহাই দিয়া, বাদশাহের নামে বারুদখানা অধিকার করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। বারুদখানার বাহিরের দরওযাজার সিপাহিগণ কোন কথা না বলিয়া আগন্তুকগণকে পথ ছাড়িয়া দিল। এমন সময় ভিতরের দরওয়াজার সুবাদার লেফটেনান্ট উইলোবি ও ফরেস্টকে খবর দিল যে সিপাহিগণ দড়ির সিঁড়ি আনিয়া ভিতরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিবে। বাদশাহের তোষাখানা হইতে অনেক দড়ি আসিল এবং সেই প্রাচীর গাত্রে দড়ির সিঁড়িগুলি লাগান হইল, অমনি ভিতরের সিপাহিগণ ভিতর দিকের প্রাচীর গাত্রে নির্মিত গৃহ সকলের ছাদ বাহিয়া দেওয়ালের উপর উঠিল এবং একে একে নিম্নে নামিয়া গেল। ক্ষণেকের মধ্যে বারুদখানায় একটি সিপাহিও রহিল না। এইবার সেই সিঁড়ি বাহিয়া বাহিরের সিপাহিগণ আবার ভিতরে আসিতে লাগিল। যেই সিপাহিরা

প্রাচীরের উপর উঠিল, অমনি ভিতর হইতে সেই দশজন ইংরাজ দশটা কামানে আগুন দিল। কামানের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের মাথাটার খানিকটা উড়িয়া গেল, আর কতকগুলি সিপাহি প্রাণ হারাইল। এইবার আবার সিপাহিগণ আক্রমণ করিল। প্রাচীর কতকটা ভগ্ন-হওয়াতে তাহাদের উঠিবার পথ সুগম হইল; তাহাদের গুলিতে ভিতরের দশজন ইংরাজের মধ্যে দুইজন প্রাণ হারাইল। কিন্তু বাকি আটজন প্রাণের প্রতি তিলমাত্র মায়া না করিয়া অনবরত তোপ গাদিতে লাগিল এবং তোপ ছুড়িতে লাগিল। এইভাবে চারিবার তোপ ছোড়া হইবার পর ফরেস্ট ও বাক্‌লি হত হইলেন। আর প্রাচীরের গাত্রসন্নদ্ধ ঢালু ছাদ বাহিয়া দলে দলে সিপাহি আসিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল; একে একে সেই দশজন ইংরাজের মধ্যে সাতজন ধরাশায়ী হইলেন—উল্লাসে সিপাহিগণ গর্জিয়া উঠিল। উইলোবি একবার উদাস নয়নে স্কালির দিকে তাকাইলেন, স্কালি নীরবে আকাশের দিকে তাকাইল। শেষে হেঁটমুণ্ডে ধীরভাবে সে বলিল "তবে তাহাই হউক।" অমনি ধীরে ধীরে একবার সিপাহির দিকে তাকাইয়া, একবার উইলোবির শ্বেত শুষ্ক শুভ্র মুখের দিকে তাকাইয়া স্কালি হেঁট হইল—জুতার নিচে ঢাকা পলিতার মুখ বাহির করিল, থপ করিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল—আবার একবার সিপাহিদিগের দিকে তাকাইল; দেখিল ঝঞ্ঝাবাতের মত ধূলি উড়াইয়া সিপাহির দল অগ্রসর হইতেছে, আর রক্ষা নাই। এমন সময়ে উইলোবি একবার তাকাইযা "quick" বলিয়া হটিয়া বারুদখানার দরওয়াজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। স্কালি পলিতায় আগুন ধরাইয়া দিল। তুবড়ির ফোটার মতো প্রথমে একটু আগুন জ্বলিয়া উঠল। আক্রমণকারী সিপাহিদিগের সুবাদারগণ সে তুবড়ির আলো দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, সিপাহিদিগকে আর অগ্রসব হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন "পালাও, যে যেখানে পার, যেমন আবরণের তলে পাব যাইয়া আত্মরক্ষা কর, এখনই শয়তানের লীলা প্রকট হইবে।" নিমেষের মধ্যে সেই হলহলা, সেই বন্দুকের আওয়াজ, সেই উল্লাস নৃত্য—সবই স্তব্ধ হইয়া গেল—সকলই নীরব হইল। স্কালি এই সময় যুক্ত করে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ভগবানের নাম করিতেছিল। উইলোবি স্থির, ধীর, অটলভাবে মর্মর নির্মিত প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন সিপাহিও ব্যাপার বুঝিয়া পলাইতে লাগল, তখন পশ্চিম গগনের সূর্যকিরণে তাহার মুখখানি যেন জ্বলিয়া উঠিল, উইলোবি একটু হাসিলেন—জীবনের শেষ হাসি হাসিলেন। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে ধরাবক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর—লেখনীতে তাহা লেখা যায় না, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না—সে যে কি হইল, যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। সে বিরাট বিশ্বত্রাস শব্দ, সে অগ্নির কন্দুক্রীড়ার ন্যায় চারিদিকে তপ্তাঙ্গারবৎ গোলাগুলির প্রক্ষেপণ, সে সধূম বারুদ রাশির বিস্ফোরণ, মরণ রাক্ষসীর সে এলায়িত বেণীর লীলা খেলা যেন স্বর্গ মর্তকে ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিল। তাহার পর, তাহার পর সব শেষ—সে বারুদখানা নাই, সে প্যারেড ভূমি নাই, সে বাগিচা নাই, সে দরওরাজা নাই—সব কোথায় যেন নিমেষের মধ্যে উড়িয়া গিয়াছে, শ্মশানক্ষেত্রের দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কয়েকখানি অর্ধদগ্ধ কবাট পুরাতন বারুদখানার স্থান নির্দেশ করিতেছে।

এই শব্দই কাশ্মীর দরওয়াজায় এবট সাহেবের শ্রুতিগোচর হইল। এই শব্দের পরই এবট সাহেব ওই দুইটি তোপ ফিরিয়া পাঠাইবার জন্য সেনানিবাস হইতে হুকুম পাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিদিগকে লইয়া ফিরিয়া যাইবারও হুকুম আসিল। তিনি ফিরিয়া যাইবার

উদ্যম করিতেছিলেন, এমন সময় ৩৮নং সিপাহি রেজিমেন্টের জনকয়েক সিপাহি দুইটি কামান ফিবাইয়া আনিল। তিনি হেতু জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, গোলন্দাজেরা পলাইয়াছে, তাহারা কি করিবে? এই কথা শুনিয়া মেজর এবট কি হুকুম দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাহার আরদালি হাবিলদার আসিয়া বলিল, "আর হুকুম হাকামে কাজ নাই; কুচ করিয়া সেনানিবাসে যাই চল, তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই কাশ্মীর দরওয়াজার ভিতর হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। এবট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" হাবিলদার উত্তর করিল, "ব্যাপার আর কি, সিপাহিরা হাঁস জবাই করিতেছে" অর্থাৎ ৩৮ নম্বরের ও ৭৪ নম্বরের রোজমেন্টের যত ইংরাজ সেনানী ছিলেন, তাহাদিগকে দরওয়াজার মধ্যে আটকাইয়া, বাহিরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিয়া, এক একটি করিয়া ধরিয়া গুলি করিতেছে। এই সেনানীগণের আশ্রয়ে বহু ইংরাজ মহিলা সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। সিপাহিগণ কাহাকেও বাদ দিল না। সেই কাশ্মীর দরওয়াজার তমসাবৃত আশ্রয়ে বাইশজন ইংরাজ নরনারী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। প্রথমে কাপ্তেন স্মিথ্ গুলির আঘাতে প্রাণ হারান; তাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া কাপ্তেন গর্ডন সিপাহির সঙ্গীনের খোঁচায় মারা পড়িলেন। রেভলিব হস্তে একটি গাদা বন্দুক ছিল, তিনি সেই বন্দুক ছুড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন; জনকয়েক সিপাহি তাহাকে আক্রমণ করিল, এই অবসরে জনকয়েক ইংরাজ নিয়ে পরিখার মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিন চারিটি ইংরাজ মহিলাও আত্মরক্ষাব জন্য ৩০ ফিট নিম্নে সেই পরিখার গভীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। ইহারা অতি কষ্টে পরিখা পার হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সেই বৈশাখের রৌদ্রে ঝোপে ঝাপে আত্মগোপন করিয়া ছত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করত মীরটের গোরানিবাসে উপস্থিত হইলেন।

সাহাজাহানাবাদ দিল্লি ও সৈনিকনিবাসের মধ্যে যে রীজ আছে, তাহার সর্বোচ্চভাগে একটি গোল ঘর ছিল, উহাকে ফ্লাগস্টাফ্ টাউয়ার বা পতাকা মন্দির নামে ইংরাজি পুস্তকে অভিহিত করা হইয়াছে। ইউরোপীয়গণ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৃহের পরিধি ১২ হাতের অধিক হইবে না, অনেক পরিচারক পরিচারিকাও এইখানে ছিল। অত্যধিক গ্রীষ্মে অনেক মহিলা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে আপনাদের স্বামী, আপনাদের ভ্রাতা, আপনাদের ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের হত্যার সংবাদে কাতরভাবে রোদন করিতেছিলেন। অনেকের স্বামী তখনও উত্তেজিত সিপাহিদিগের মধ্যে আত্মকার্যে নিবিষ্ট ছিলেন। ইহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে না পারিয়া অপরিসীম উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন। এই গৃহ একটি অন্ধকূপ। সকলেই এই অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়া কষ্টের একশেষ ভুগিয়াছিল। ২৮ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহিরা এই গৃহের নিকট থাকিতে আদিষ্ট হয়। দুইটি কামান এই স্থানে স্থাপিত হয়। সৈনিক কর্মচারী ব্যতীত এই স্থানে ১৯ জন মাত্র ইউরোপীয় বা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক ইংরাজ মহিলা ও বালক-বালিকায় গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই গৃহ হইতে অস্ত্রাগার ধ্বংসেব চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। তখন বেলা প্রায় ৪টা। শ্বেতাঙ্গ নরনারী সকল তখনও এইখানে থাকিয়া মীরটেব ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিকের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তাহাদের দেখা পাওয়া গেল না, মীরট হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আপনা হইতেই তাহাদের

সাহায্যার্থ আসিবে, এ আশায় তখন তাহাদিগকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। একজন ইংরাজ আর উপায় না দেখিয়া সাহসে ভর করিয়া উপস্থিত দুর্গতির সংবাদ মীরটে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ইহার নাম বাট্সন। ইনি ৭৪ নম্বর সৈনিকদলের ডাক্তার। বাটসনকে মীরটে যাইতে ইচ্ছুক দেখিয়া ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্ একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। ডাক্তার আপনার স্ত্রী ও কন্যার নিকট বিদায় লইলেন এবং মুখে, হাতে, পায় রঙ্গ মাখিয়া সন্ন্যাসীর বেশে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় ডাক্তারের অধিকার ছিল। সুতরাং কথাবার্তায় তাহাকে ধরিবার ততটা সুবিধা ছিল না। ডাক্তার বাট্সন্ এইরূপ সন্ন্যাস বেশে সজ্জিত হইয়া নদী পার হইবার জন্য নৌসেতুর নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তখন সেতু ভাঙিয়া গিয়াছিল; সুতরাং তিনি সে স্থান হইতে সৈনিকনিবাসের দিকে আসিয়া, খেয়া নৌকায় নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৩ নম্বর অশ্বারোহীদলের কয়েকজন সৈনিক-পুরুষ তাহার নিকটবর্তী হইল। বাট্সনের ভিন্ন বেশ ছিল বটে, কিন্তু এ বেশও প্রকৃত বিষয় গোপনে রাখিতে পারিল না। তাহার চক্ষুর বর্ণ তাঁহাকে ভিন্ন দেশীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। অশ্বারোহীরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। নিকটবর্তী পল্লীবাসী গুজরেরা তাহার পরিচ্ছদাদি কাড়িয়া লইল। ডাক্তার বাটসনের দুর্দশার একশেষ হইল। হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞতা, সন্ন্যাসীর ভাবে তাহার সাজসজ্জা, কিছুতেই তাহাকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি অনাবৃত গাত্রে কর্নালের দিকে ধাবিত হইয়া কোনরূপে আপনার প্রাণ বাঁচাইলেন।

ক্রমে বেলা শেষ হইল। দিল্লির যেখানে যত সিপাহি ছিল, তাহারা আপনাদের সেনাপতিদিগকে পরিত্যাগ করিতে ক্রমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। চারিদিকেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের অস্ত্রধ্বনিতে, উন্মত্ত জনগণের ভীষণ কোলাহলে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নগরের অভ্যন্তরে, বহির্ভাগে, সর্বত্রই উত্তেজিত লোকে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে, দিল্লির সম্রাট তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাহারা সম্রাটের জন্যই ফিরিঙ্গীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। প্রতাপান্বিত মোগলের সিংহাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আপনাদের চিরন্তন ধর্মের গৌরব রক্ষাই তাহাদের এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সকল কথায় লোকের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সিপাহিরা গৃহ-দাহ ও গৃহবিলুণ্ঠনেই নিযুক্ত থাকে নাই; তাহারা ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিয়া আপনাদের পরাক্রম দেখাইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লিতে সিপাহি ও ইংরাজে একটি খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরাজেরা এই যুদ্ধে সিপাহিদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। অনেকে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, অনেকে আর কোন উপায় না দেখিয়া নানা দিকে পলায়ন করেন।

এই ফ্লাগস্টাফ গৃহ হইতে ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্ উন্মত্ত সিপাহিদিগের গতিবিধি লক্ষ করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকনিবাস রক্ষা করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। এই স্থানে যে সকল সিপাহি ছিল, ক্রমে তাহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইল। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উন্মত্ত সিপাহিদিগের দলে মিশিতে লাগিল।

ইউরোপীয়গণ অধিককাল ফ্লাগস্টাফ গৃহে থাকিতে পারিলেন না। বিপদ পূর্বাপেক্ষা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। উন্মত্ত সিপাহিরা কামান সকল দখল করিয়া

ইউরোপীয়দিগকে সমূলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্ যখন শুনিতে পাইলেন যে মেনগার্ডে সৈনিক কর্মচারীরা নিহত হইয়াছেন, উন্মত্ত সিপাহিরা দলবদ্ধ হইয়া অনেক স্থানে প্রধান্য স্থাপন করিয়াছে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলকে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে কহিলেন। ব্রিগেডিয়ার পূর্বে এইরূপ আদেশ দিলে, অনেকের প্রাণ রক্ষা হইত। যখন মীরটের সিপাহিরা দিল্লিতে উপস্থিত হয়, তখন ইউরোপীয়গণ অনায়াসে কর্নালে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। যখন বেলা শেষ হয়, সূর্য যখন ধীরে ধীরে অস্তগমনোন্মুখ হইতে থাকে, উন্মত্ত সিপাহিদিগের প্রবল আক্রমণে যখন সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তখন ব্রিগেডিয়ার আর কোন উপায় না দেখিয়া সকলকে কর্নালে যাইতে আদেশ দেন। এখন কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। যিনি যে উপায় সম্মুখে দেখিলেন, তিনি সেই উপায়ে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। গৃহের নিম্নে ঘোড়া, গাড়ি প্রভৃতি ছিল। ইউরোপীয়েরা আপনাদের আত্মীয়স্বজনকে এখন ঐ সকল গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া মীরট বা কর্নালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গাড়ি প্রভৃতির অভাবে অনেক পদব্রজেও যাইতে লাগিলেন। যে সকল সিপাহি তাহাদের নিকটে ছিল, তাহারা এখন তাহাদের সঙ্গে যাইতে আদিষ্ট হইল। এই সকল সিপাহি পলাতকদিগের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক হইলেও, বাহিরে তাহাদের আদেশের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিল না। তাহারা সেনানায়কদিগের আদেশে শ্রেণিবদ্ধ হইল, এবং অফিসারদিগের আদেশে কিয়দ্দূর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল, অবশেষে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া সহরের বাজারের দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ৩/৪ জন সেনানী তাহাদিগকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। উত্তেজিত সিপাহির দল এই সময়ে সেনানীদিগকে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে উপদেশ দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিল্লি—পরবর্তী ঘটনা

দিল্লির কাশ্মীর দরওয়াজার ভিতরে যে শ্বেতাঙ্গ নরনারী হত্যার সূচনা হইয়াছিল, দিল্লিবাসী দেশীয় খ্রিস্টানগণেরও পলায়িত শ্বেতাঙ্গ নর-নারীদিগের বধে এবং প্রবাসী বাঙালিদিগের প্রতি অসহ্য উৎপীড়নে তাহার পর্যাবসান সাধিত হইয়াছিল। দিল্লির বাহিরের "রীজ" বা পাহাড়, হুমায়ুনের গোর, ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কুতুব মিনার দখলের জন্য যে সময় ব্যয়িত হইলে ভবিষ্যতে সকল দিক রক্ষা পাইত, যে সময়ে উত্তরে কর্নাল, কুরুক্ষেত্র, পূর্বে গাজিয়াবাদ সাহারানপুর প্রভৃতি স্থান আয়ত্তে রাখিবার চেষ্টা করিলে দিল্লিতে সিপাহির প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, সেই সময় দিল্লির উন্মত্ত সিপাহি সকল নরহত্যায় এবং লুণ্ঠনে অপব্যয়িত করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল।

দিল্লির সিপাহি সকল সারাদিন নরহত্যায় দুই হস্ত রঞ্জিত করিয়া, পরদ্রব্য লুণ্ঠনে উন্মত্ত হইয়া সন্ধ্যার পর বাদশাহী মঞ্জিলের ভিতরে যাইয়া আশ্রয় লইল। নগর রক্ষার জন্য কেহই নগরে রহিল না। সেই কাল রাত্রিতে দিল্লি নগরে যে ভীষণ পৈশাচ কাণ্ড সাধিত হইয়াছিল, তাহা আজও মনে করিলে দিল্লির জরাজীর্ণ অধিবাসীগণ শিহরিয়া উঠেন। নগরের যত নষ্ট দুষ্ট বদমায়েস শাসন-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যথেচ্ছাচারের অতি ভয়ানক অভিনয় করিয়াছিল। ইহাদের আক্রমণ হইতে কাহারও গৃহ দ্বার রক্ষা পায় নাই, কাহারও ধনসম্পত্তি সুরক্ষিত ছিল না, কোন ললনার সতীধর্ম রক্ষা করিবার উপায় ছিল না। প্রতি পল্লী হইতে সর্বস্বান্তের চীৎকার, বলাৎকৃতার আর্তনাদ, গৃহদাহের ভীষণ রোল, লুণ্ঠনের উৎকট শব্দ যেন দিল্লির মহানগরীকে সে দীর্ঘ নিশাকালে সজীব ও মুখর করিয়া রাখিয়াছিল। দুঃখের নিশা কাটিল, প্রভাত সূর্যের উদয় হইলে দিল্লিবাসী ভাবিল এইবার বুঝি সকল দুঃখের উপশান্তি হইবে। কিন্তু তাহা হইল না; রাত্রের পিশাচ নৃত্য বন্ধ হইল বটে; সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলোকে এক নূতন খেলার সূচনা হইল।

সিপাহি সকল নগরের সকল খ্রিস্টানকে—নর, নারী এবং বালক বালিকা লইয়া পঞ্চাশজন হইবে—মাটির নীচে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখে। ১১ই মে তারিখে ইহাদের আটক করিয়া রাখা হয়; পাঁচ ছয় দিন ইহারা এই ভীষণ স্থানে আবদ্ধ থাকে। এই পাঁচ ছয় দিন এই পঞ্চাশজন নরনারী যে কি অসহ্য ও ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল, তাহা অনুমানেরও অতীত। তেমন যন্ত্রণা বুঝি নরকেও মানুষকে ভোগ করিতে হয় না, --তেমন উৎপীড়ন বুঝি পিশাচেও করিতে জানে না। যখন দিল্লি নগরে আর খ্রিস্টান রহিল না, খুঁজিয়া পাতিয়াও আর শ্বেতাঙ্গ পাওয়া গেল না, তখন এই পঞ্চাশ জন হতভাগ্য খ্রিস্টান নরনারী এবং বালক বালিকাকে বাহির করিয়া আনিয়া দেওয়ান-ই-খাসের সম্মুখে ঠিক পাঁঠা বলিদানের মতো করিয়া ইহাদিগকে বলি দেওয়া হইয়াছিল।

সিপাহি সকল প্রথমেই দিল্লিতে প্রবেশ করিয়া জেলখানা খুলিয়া দেয়, জেলের কয়েদী

সকল নগরের গুণ্ডা বদমায়েসের সহিত মিলিত হয়। ইহারাই নগরবাসীদিগের উপর অত্যধিক মাত্রায় উৎপীড়ন করিয়াছিল। ইহারাই প্রবাসী বাঙালিদিগের প্রতি নিগ্রহের একশেষ করিয়াছিল। বাঙালি কুলাঙ্গনার নাক ও কান হইতে অলঙ্কার ছিঁড়িয়া লইয়াছিল, গৃহ দ্বারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিল—অনেককে প্রাণেও মারিয়াছিল। এ কয়দিন দিল্লি নিচে যমুনার জলে শত শত মৃতদেহ ভাসিয়া গিয়াছিল। কোন কোন বাঙালি মড়ার সহিত মড়া হইয়া, মড়া অবলম্বনে যমুনার স্রোতে ভাসিয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

পরন্তু এই পৈশাচ রঙ্গের মধ্যেও দেবতার করুণার বিকাশ হইয়াছিল—কি সিপাহি কি দেশবাসী অনেকেই বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল। মেজর এবটকে তাহার সিপাহি দল দিল্লির মেইন গার্ড পর্যন্ত আনিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিয়াছিল, "হুজুর, আর আপনাকে আমরা রক্ষা করিতে পারি না; আপনি এখন প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে পলায়ন করুন। এখন হইতে অন্তত চারি ঘণ্টা কালের মধ্যে আপনার প্রতি যাহাতে অত্যাচার না হয়, সে ব্যবস্থা আমরা করিব।"

এই সিপাহিদিগের দয়াব প্রভাবেই মেজর এবটের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। কেবল মেজর এবট কেন, বহু ইংরাজই দেশীয়দিগের সহায়তায় প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

৩৮ নম্বর পদাতি দলের একজন সেনানী তাহার কাহিনি এইরূপ লিখিয়াছেন, —"আমরা তাড়াতাড়ি পলায়নের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। সিপাহিরা তাহাদের ইংরাজ কর্মচারিদিগকে সত্বর পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বলিল। এমন কি তাহারা আপনাদের গৃহেও বিপন্ন কর্মচারীদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিল। আমরা সেই কথা শুনিয়া দৌড়িতে লাগিলাম। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে একটি বৃক্ষের তলে বসিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে চন্দ্র উঠিয়াছিল, সৈনিকনিবাস তখন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল। প্রজ্বলিত অগ্নির প্রভাবে রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় আলোক ফুটিয়াছিল। আমরা সমস্ত রাত্রি এই ভাবেই কাটাইয়া দিলাম। কিয়দ্দূরে মাটির একটি ভগ্ন গৃহ ছিল। আমরা সকলে সেইখানে গিয়া লুকাইলাম। এই সময়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আপনাদের কার্যে যাইতেছিলেন। তাহারা আমাদিগকে এইরূপ কদর্য স্থানে লুক্কায়িত থাকিতে দেখিয়া, আমাদের সকলকেই তাহাদের গৃহে হইয়া গেলেন, এবং চাপাটি ও দুগ্ধ দিয়া সকলের তৃপ্তিসাধন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা তাহাদের সাহায্যে পদব্রজে যমুনার একটি শাখা পার হইয়া যাই। পথে একদল গুজর আমাদের দুরবস্থার একশেষ করে। শেষে কয়েকজন পরদুঃখকাতর দয়াপর ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ভিক্কা নামক একটি পল্লীতে লইয়া যান। ইহারা বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে খাটিয়া দেন, এবং আহারের জন্য আমাদের সম্মুখে রুটি ও ডাইল রাখেন। পল্লীবাসীরা নিরক্ষর হইলেও আমাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করে। কিন্তু একদল উত্তেজিত লোক হঠাৎ আসিয়া পড়ায় আমাদের দুরবস্থা হয়। এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগকে তাহার গৃহে লুকাইয়া রাখেন। দিল্লি হইতে প্রস্থানের দুই দিন পরে, একজন ভারতবাসী আমাদের, সাহায্যার্থ মীরটে সংবাদ লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। ফরাসি ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া এই ব্যক্তির হস্তে দেওয়া হয়। দুই দিন পরে আমরা হরচাঁদপুর নামক স্থানে উপনীত হই। ফ্রান্সিস্ কোহেন্ নামক একজন বৃদ্ধ জর্মন এই স্থানের ভূস্বামী ছিলেন।

বৃদ্ধ কোহেন আমাদিগকে তাহার গৃহে আশ্রয় দেন। আমাদের সঙ্গে যে সকল মহিলা পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা কোহেনের দ্বিতল গৃহে থাকিয়া শ্রান্তি দূর করেন। ইহার মধ্যে মীরট হইতে দুইজন সৈনিকপুরুষ ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের সাহায্যার্থ সেই স্থলে উপস্থিত হন। এই সৈনিক দলে কাপ্তেন ক্রেগীর ৬ নম্বর সৈন্যও ছিল। মীরটের বিপ্লবের সময়ে কেবল কাপ্তেন ক্রেগীর সৈনিকগণই আপনাদের অধিনায়কের নিকট অশান্তভাব দেখায় নাই। অন্যান্য দলের অনেক সিপাহিও ইংরেজের অনুগত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রায় ২৫/৩০ জন সিপাহি ক্রেগীর অধীনে সজ্জিত হয়। ২/১ জন ব্যতীত ইহারা কখনও কোন ঘটনায় উন্মত্ত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। মীরটের সিপাহিদিগের মধ্যে কেবল ইহাদিগকেই সৈনিক শ্রেণিতে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয়—ফরাসি ভাষায় যে পত্র মীরটে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই পত্র পঁহুছিলেই ইহারা হরচাঁদপুরে উপনীত হয়। ইহারা বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ ভিক্কো হইতে হরচাঁদপুর পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আইসে। দিল্লি হইতে পলায়নের অষ্টম দিন রাত্রিকালে আমরা ইহাদের সঙ্গে মীরটে উপনীত হই।”

৩৮ নম্বর সিপাহিদলের চিকিৎসক উড্ সাহেব আপনার স্ত্রী ও লেফ্‌টেনান্ট পিলি নামক একজন সৈনিক অফিসারের পত্নীকে লইয়া পলায়ন করেন। ডাক্তার উডের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল। এই আঘাতে তাহার চিবুক ভাঙিয়া যায়। দিল্লির কোম্পানির বাগানে ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের লোকে তাহাদিগকে আপনাদিগের গৃহে লইয়া যায় ও বিশ্রামের জন্য খাটিয়া প্রদান করে। বাগান-রক্ষক তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করে নাই। এক দল দস্যু এই সময়ে এই স্থানে আসিয়া পলাতকদিগের গাড়ি ভাঙিয়া দেয়, এবং ঘোড়া লইয়া যায়। তাহারা সেখানে অধিকক্ষণ না থাকিয়া প্রস্থান করেন। ১১ই মে রাত্রি ৩টার সময়ে ইহারা একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীবাসীগণ ইহাদিগকে দুগ্ধ ও রুটি প্রদান করে এবং শুইবার জন্য খাটিয়া দেয়। চিকিৎসক উড ও মহিলাদ্বয় তখন খেলা জায়গায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভাত হইলে পাছে সিপাহিরা আসিয়া ইহাদের কোনও অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায় গ্রামের মণ্ডল জনৈক বৃদ্ধ ইহাদিগকে গোশালায় লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন এবং গোশালা হইতে গরুগুলি বাহির করিয়া দেন। তাহারা গোশালায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। অবিলম্বে গ্রামের একটি মহিলা আসিয়া ইহাদিগকে বলে যে, কয়েকজন সিপাহি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে নীরব থাকাই ভাল। ইহারা প্রথমে ভাবিলেন, মহিলাটি বুঝি অনর্থক ভয় দেখাইতেছে; কিন্তু শেষে উক্ত মহিলার কথাই ঠিক হইল। সহসা গো-শালায় একজন সিপাহি আসিয়া দাঁড়াইল। এই সিপাহি ইংরাজের সন্ধানে আসে নাই, সে আপনাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গরুর গাড়ি লইতে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ মণ্ডল কালবিলম্ব না করিয়া সিপাহিদিগকে গরু ও গাড়ি দিলেন। সিপাহি তখনই চলিয়া গেল। গ্রামাধ্যক্ষ সিপাহিকে শীঘ্র শীঘ্র গ্রাম হইতে বিদায় দিতে ইচ্ছা করিয়াই, তাড়াতাড়ি গরু ও গাড়ি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার উড্ ও দুইটি মহিলা এইরূপে গ্রামাধ্যক্ষের দয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যাইবার সময়ে গ্রামের লোক আহারের জন্য ইহাদিগকে কয়েকখানি রুটি এবং পানের জন্য জল দিল। ইহারা পথ চিনিতেন না, এজন্য গ্রামের একটি যুবক ইহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়া আসিল। অনেক

বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, ইহারা রাত্রি ৪টার সময়ে আর একখানি গ্রামে পঁহুছিলেন এবং গ্রামের সীমায় একটি বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ আপনাদের কার্যে যাইতে লাগিল। এক জন প্রাচীন হিন্দু ইংরাজদিগকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া গ্রামে লইয়া গেলেন, এবং দুগ্ধ ও রুটি দিয়া ইহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিলেন। ডাক্তারের আহত স্থান পরিষ্কৃত করিবার জন্য এই বৃদ্ধ জল গরম করিয়া আনিয়া দিতেও ক্রটি করেন নাই। নিকটবর্তী আর একটি পল্লীতে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিপন্ন ইংরাজ ও ইংরাজ মহিলারা নিকটবর্তী গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, এই ব্রাহ্মণ স্বগ্রামের অনেক লোক লইয়া ইহাদিগকে দেখিতে গমন করেন। গুলির আঘাতে ডাক্তার উডের মুখের নিম্নভাগ ভাঙিয়া যাওয়ায় ডাক্তার দুগ্ধপান করিতে পারিতেন না। উক্ত ব্রাহ্মণ ডাক্তারকে কাঠের নলদ্বারা দুগ্ধ টানিয়া পান করিতে উপদেশ দেন এবং নিজে একটি কাঠের নল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দেন। ডাক্তার উড নলদ্বারা দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সুস্থ হন। বিপন্ন শ্বেতাঙ্গ সকল এইরূপে প্রাচীন পল্লীবাসীর আশ্রয়ে সমস্ত দিন কাটাইয়া দেন। শেষে আশ্রয়দাতার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে। ইংরাজ সকল তাহাদের গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই, দিল্লির সিপাহিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে। এজন্য উক্ত প্রাচীন ব্যক্তি ডাক্তার উড প্রভৃতিকে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। এই সময়ে প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে সমস্ত দিক যেন দগ্ধপ্রায় হইতেছিল। সুতরাং ইংরাজ মহিলাদ্বয় আহত ডাক্তারকে লইয়া অন্যত্র যাইতে সাহস করিলেন না। গ্রামের আর এক ব্যক্তি এই বিপত্তিকাল ইহাদিগকে একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া যায়, এবং দুইটি বিছানা আনিয়া দিয়া ঘুমাইতে বলে। ক্রমে বেলা শেষ হইল। রাত্রি সমাগত হইয়া দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপের শান্তি করিল। ডাক্তার উড ও দুইটি কুলনারী আপনাদের আশ্রয়স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। পাঁচদিন এইভাবে পথ অতিক্রম করিলেও ইহারা দিল্লি হইতে দশ মাইলের অধিক যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পরদিন বেলা দুইটার সময়ে ইহারা আর একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীর অধিবাসীগণও ইহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করে। ডাক্তার উড ও মহিলাদ্বয় যাহা প্রার্থনা করেন, পল্লীর মহিলারা সরলভাবে তাহাই আনিয়া দেয়। ডাক্তারের মুখ ধৌত করিবার জন্য ইংরাজকুলনারী সকল একটি জলপাত্র চাহেন। পল্লীবাসিনীরা সন্তুষ্টচিত্তে উহা আনিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা ইহাদের আহারের জন্য নানাবিধ শাক সবজিতে ভাল তরকারি রন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে একটি ইংরাজ মহিলা বলিয়াছেন যে, দিল্লি পরিত্যাগ করা অবধি এরূপ সুস্বাদু দ্রব্য তাহারা আর কখনও আহার করেন নাই। এইরূপে পল্লীবাসীগণ বিপন্নদিগকে আহারীয় ও পানীয় দিয়া তৃপ্ত করে। পলাতকগণ পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বলগড় নামক আর এক পল্লীতে উপনীত হন। রাজপুতবংশীয়া একটি রানি এই স্থানে কর্তৃত্ব করিতেন। বলগড়ের রানি বিপন্নদিগের কষ্ট দেখিয়া, ইহাদিগকে আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন, এবং ইহাদিগের আহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলিলেন। ডাক্তার উড ও মহিলাদ্বয় রানির এইরূপ অনুগ্রহে পরিতুষ্ট হইয়া, ওই রাত্রি সেইস্থানে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মেজর পটর্সন অতর্কিতভাবে বলগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লেফটেনান্ট পিলিও আর এক দিক হইতে সেইখানে পৌঁছিলেন। সকলে এখন আশান্বিত হৃদয়ে বলগড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার উডের চলিবার শক্তি ছিল না।

গুরুতর আঘাতে ডাক্তার উড বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে পথের কয়েকজন দরিদ্র মজুর আপনাদের সদাশয়তা ও দয়ার একশেষ দেখায়। ইহারা চলৎশক্তিশূন্য ইংরাজ চিকিৎসককে বহন করিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায়। দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকেও পথে বিপন্নদিগের দুর্গতি দেখিয়া সাহায্য দানে বিমুখ হয় নাই। এইরূপ সাহায্য করিলে যে, উন্মত্ত সিপাহিদিকের কোপে পড়িতে হইবে, তাহা ইহারা জানিত, তথাপি ইহাদের করুণা, ইহাদের সমবেদনা এবং ইহাদের উপকারের ইচ্ছা কিছুতেই অন্তর্হিত হয় নাই। ইংরাজসকল আপনাদের কুলনারীদিগকে লইয়া এইরূপে দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের অসীম অনুগ্রহ ও অনন্ত করুণায় নিরাপদে ও অক্ষত শরীরে কর্নালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ ইহাদিগের দুর্গতির সংবাদ পাইয়া সাহায্যার্থে ৪০ জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। এই সৈনিকপুরুষেরা যেরূপ দ্রুতগামী অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল, সেইরূপ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে পরিশোভিত ছিল। ইহারা ২০শে মে বিপন্নদিগকে কর্নালে পৌঁছাইয়া দেয়।

জনৈক বৃদ্ধ একটি অসহায়া ইংরাজ মহিলা ও তাহার সন্তানকে সিপাহিদিগের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যান, এবং অপরের অগোচরে নানাস্থানে লুকাইয়া রাখেন। লোকে যখনই ইহাদিগের সন্ধান করিয়াছে, তখনই বৃদ্ধ ইহাদিগকে সে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন। মীরটের কমিশনর গ্রিথেড সাহেব এই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"দিল্লি হইতে যাহারা পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তাহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, অনেকেই তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল, এবং তাহাদের প্রতি আশাতীত সৌজন্য দেখাইয়াছিল। একজন সন্ন্যাসী যমুনায় একটি ইংরাজের শিশুসন্তান পায় এবং শিশুটিকে এখানে লইয়া আইসে। সন্ন্যাসীকে পারিতোষিক দিতে চাহিলে সে উহা লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলে যে, যদি কোন পারিতোষিক দেওয়া অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে যেন তাহার এই কার্যের জন্য তাহার নামে একটি কূপ খনন করিয়া দেওয়া হয়, অমনি তাহারই এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হই।" কাপ্তেন হলান্ড নামক এক জন সৈনিক বলিয়াছেন—"আমি যে গ্রামে উপস্থিত হই, সেখানে দুধ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় পল্টু নামক একজন ঝাড়ুদার এবং তাহার পরিবারে কয়েক ব্যক্তি প্রত্যহ নিকটবর্তী গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিত। আমি যমুনা দাস নামক একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ছয় দিন ছিলাম। বাড়ির যে ঘরটি সর্বাপেক্ষা ভাল, ব্রাহ্মণ সেই ঘরটিই আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যে কোন সুখাদ্য তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন, আমাকে তিনি তাহাই প্রদান করিতেন।" একজন ইংরাজ ডেপুটি কলেক্টরের স্ত্রী যখন দিল্লি হইতে পলায়ন করেন, তখন দুই জন বিশ্বস্ত চাপরাশী তাহার সবিশেষ সহায়তা করে। চাপরাশীদ্বয়ের মধ্যে একজন আজমীড় তোরণ অতিক্রমকালে উত্তেজিত সিপাহির হস্তে নিহত হয়। অপর চাপরাশী ডেপুটি কলেক্টরের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। যে সকল ইংরাজ মীরটের পরিবর্তে অম্বালার অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে কর্নালের নবাবের সদাশয়তায় সবিশেষ উপকৃত হন। দিল্লির জজ বস্ সাহেব কর্নালে উপস্থিত হইলে নবাব তাহাকে বলেন, "উপস্থিত গোলযোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। এখন আমি আপনাদের পক্ষ সমর্থনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমার তরবারি, আমার সম্পত্তি এবং আমার অনুচরবর্গ, এখন সমস্তই আপনাদের জন্য সমর্পিত

হইতেছে।" উপস্থিত বিপ্লবে অনেকেই এইভাবে ইংরাজের সাহায্য করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন; অনেকেই অনুকম্পা ও অনুগ্রহ দেখাইয়া বিপন্ন ইংরাজদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকেই আপনাদিগের সম্পত্তি, বাসগৃহ, অধিক কি আপনাদের জীবন পর্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয় ইংরাজকে আশ্রয় দিতে কাতর হন নাই।

এই সময়ে জেনরেল এন্সন ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ ও স্থবির হইয়া পড়িয়াছিলেন। দিল্লি সিপাহিদিগের হস্তগত হইলে তিনি প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। যদিও সিপাহিগণ দিল্লি অধিকার ব্যাপারে সমর চাতুরীর কোন পরিচয় দেয় নাই, তথাপি দিল্লি নগর ও বাদশাহ মঞ্জিল তাহাদিগের অধিকৃত থাকায় তাহারা দিল্লির চতুষ্পার্শ্বের প্রায় দশ ক্রোশ ভূমির উপর আধিপত্য করিতে পারিয়াছিল। ইহার ফলে উত্তরাখণ্ড দক্ষিণ দেশ হইতে বিযুক্ত হইয়াছিল; পঞ্জাবও পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে কতকটা সংস্পর্শচ্যুত হইয়া ছিল। জেনরেল এন্সন মনে করিলেন যে, প্রথমে সিপাহিগণ লুণ্ঠন ব্যাপারে ও ইংরাজ হত্যায় ব্যাপৃত থাকিলেও পরে যে তাহারা প্রকৃষ্ট সমর চাতুরীর পরিচয় দিবে না, তাহাই বা কে বলিল? তিনি সংবাদ পাইলেন যে, প্রতিদিন দিল্লিতে নূতন নূতন সিপাহির দল আসিয়া জুটিতেছে, অচিরে দিল্লি নগরে বিংশ সহস্র সিপাহির সমাবেশ হইবে। এমন অবস্থায় তিন চারি হাজার ইংরাজ সেনা লইয়া দিল্লি আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, অথচ ত্বরায় দিল্লি উদ্ধার করিতে না পারিলে পঞ্জাবও যে ইংরাজের অধীনে চিরকাল থাকিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই ইতিকর্তব্য নির্ধারণ ব্যাপার লইয়া জেনরেল এন্সনেব সহিত স্যর জন লরেন্স প্রমুখ উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদিগের একটু মতান্তর ঘটিয়াছিল। স্যর জন লরেন্সের ধারণা হইয়াছিল যে, দিল্লির দরওয়াজার সম্মুখে ইংরাজ সৈন্য যাইয়া উপস্থিত হইলেই দিল্লি নগরবাসী দিল্লি নগর ইংরাজের হস্তে অর্পণ করিবে। প্রধান সেনাপতি এন্সন এরূপ অন্ধ আশার উপর কার্যে করিতে একটু ইতস্তত করিলেন।

এই সময় হিমালয় পর্বত শিখরে তিনটি গোরা রেজিমেন্ট ছিল। কসৌলীতে ৭৫নং পদাতি রেজিমেন্ট এবং সাবাথু ও দাগশাইতে দ্বিতীয় ও প্রথম নম্বরের ফুসিলিয়ার্স সেনাদল অবস্থিতি করিতেছিল। সিমলার নিকটে জাতোগে একদল গুর্খা রেজিমেন্ট ছিল। দিল্লির পৈশাচ কান্ডের সমাচার সিমলায় পৌঁছিলে প্রধান সেনাপতি এন্সন ফিরোজপুরের অস্ত্রাগার ও বারুদখানায় গোরা রক্ষীর ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন এবং জলন্ধরে একদল গোরা সেনা ছিল, তাহাদিগকে ফিলুরের দুর্গ অধিকার করিতে হুকুম দিলেন। এইভাবে সকল গোরা সেনার সমাবেশ করিবার উদ্‌যোগ করিয়া প্রধান সেনাপতি মহাশয় সিমলা হইতে কর্নাল পর্যন্ত রাজপথ নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে Patrol বা প্রহরার ব্যবস্থা করিলেন।

দিল্লির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ভাবনায় ইংরাজ শাসনকর্তৃগণ একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। প্রথম ভাবনা, শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরবর্তী ফুল্কীয়ান শিখ সম্প্রদায়ের তিনটি রাজা অর্থাৎ নাভা, ঝিন্দ ও পাতিয়ালার রাজা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন। আর পঞ্জাবের খালসা সেনা সকল কত দিনই বা ইংরাজের অনুরাগী হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক ইংরাজই তখন বুঝিয়াছিলেন যে, শিখ প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ জাতির বা কোম্পানির অনুগত নহে, কেবল পূরবীয়া সিপাহিদিগের প্রতি তাহাদিগের পূর্ব বিদ্বেষবশতই তাহারা এখনও ইংরাজেব আনুগত্য স্বীকার করিয়া আছে। কিন্তু সিপাহি যদি যুদ্ধে জয়ী হয়, দিল্লির ন্যায়

প্রধান নগর ও প্রদেশ সকল যদি অধিকার করিয়া রাখে, তাহা হইলে শিখের এই বিদ্বেষ অনুরাগে পরিণত হইতেই বা কতক্ষণ? শিখ বিগড়াইলে, পঞ্জাব বিপ্লুত হইলে যে উত্তর ভারতে ইংরাজের প্রাধান্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে! সিপাহিদিগের প্রতি অনুরাগের লক্ষণও যে পঞ্জাবের স্থানে স্থানে প্রকাশ পায় নাই, তাহা নহে। কাজেই যাহাতে শীঘ্র-দিল্লি পুনরধিকৃত হয়, সে পক্ষে সেনাপতি এন্সনকে প্রাণপণ উদ্‌যোগ করিতে হইল।

পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, মীরটে সিপাহিগণ কোম্পানির শাসন ছিন্ন করিয়া দুইটি ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়াছিল। প্রথম, সকল সিপাহির দলকে তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। দ্বিতীয়, মীরটের গোবা সেনাদলের উপব তাহারা কোনরূপ আক্রমণ করে নাই। পশ্চাতে দুই তিন হাজার গোরা রাখিয়া দিল্লি আক্রমণ করা তাহাদিগের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য হয় নাই। মীরটে যদি সেই সময় একজন সমরচতুর সেনানী থাকিতেন, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে তিনি সিপাহির দলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। অথবা, সিপাহিদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিপাহির সহিত সমসময়ে দিল্লিতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন এবং অন্তত দিল্লির গোরাবারিক ইংরাজের অধিকারে রাখিতে পারিতেন। এ সব কিছুই হয় নাই বটে, কিন্তু পরে দিল্লি অবরোধের কালে মীরট ইংরাজের করতলগত থাকায় অবরোধ-কার্যে ইংরাজের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। সিপাহিগণ দিল্লিতে যাইয়া যদি প্রথমে নগরে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে, তাহা হইলে হয়তো আরও কিছু কাল তাহারা ইংবাজের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত। সিপাহির আক্রমণের পর ইংরাজের শাসন কার্য বিপর্যস্ত হইলে যে পৈশাচ কাণ্ড দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা মনুষ্য কল্পনার অতীত। সেই উপদ্রবের পীড়নে দিল্লিবাসী কতকটা সিপাহি-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিল। নাগরিকগণের এই বিদ্বেষের ফলেই সিপাহি সকল বারংবার ইংরাজের নিকট পরাজিত হইয়াও শেষে নগরে তিষ্ঠিতে পারে নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পঞ্জাব-পেশাবর, অম্বালা-দিল্লিতে অভিযান

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে পেশাবরে মধ্যে মধ্যে সিপাহিদিগের উত্তেজনার সমাচার আসিতেছিল—বহরমপুরে ১৯নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের উত্তেজনার কথা, বারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে কর্তৃক সেনানী হত্যার কথা, ৩৪নং সিপাহি সেনাদলের নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি সকল সমাচারই যথাসময়ে পেশাবরে আসিয়াছিল, কিন্তু তখন কেহই পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন সেনানিবাসের বা ঘাঁটির সিপাহিদিগের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করেন নাই। সকল ইংরাজ সেনানায়কেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের অধীন সিপাহি সেনাদল বিশ্বস্ত ও কোম্পানির গবর্নমেন্টের অনুগত। ভারতের তাৎকালিক প্রধান সেনাপতি জেনারেল এন্সন এই সময়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতের বিভিন্ন কেল্লা, সেনানিবাস ও ঘাঁটি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মীরট ও দিল্লির দুর্ঘটনার পূর্বে তিনি এই দুই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দুই স্থানের সিপাহিরা যে সত্বর ইংরাজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে, তিনি সেরূপ আশঙ্কা করেন নাই। এই কারণেই সহসা সিপাহিরা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ইংরাজ সেনাধিনায়কদিগকে, তথা ইংরাজ গবর্নমেন্টকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল।

১১ই মে তারিখে অপরাহ্নকালে পেশাবরের ইংরাজ সেনাধিনায়কগণ বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত ছিলেন, এমন সময়ে টেলিগ্রাফ অফিসের সিগনালার হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সিগনালার ত্রস্তভাবে টেলিগ্রামখানি তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। এই তড়িৎবার্তা পঞ্জাবের প্রত্যেক সেনানিবাসে প্রেরিত হইবার আদেশ দিল। পূর্ব রাত্রিতে মীরটে যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং দিল্লিতে সিপাহিদিগের হস্তে ইংরাজ সাধারণের দুর্গতির কথা এই টেলিগ্রামে প্রকটিত ছিল। ১১নং ইরেগুলার অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক লেফটেনান্ট কর্নেল ডেভিডসন টেলিগ্রাম পাঠ করিবার পর প্রস্তাব করিলেন যে, অবিলম্বে জেনরেল রীড ও কমিশনার এডওয়ার্ডস্‌কে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হউক এবং মীরট ও দিল্লির সমাচার আপাতত গোপন রাখা হউক। সকলেই এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে ডেভিডসন স্বয়ং কমিশনারের আবাসে গমন করিলেন। সেখানে কমিশনর এডওয়ার্ডস এবং তাহার সহকারী (ডেপুটি কমিশনার) জন নিকল্‌সন উপস্থিত ছিলেন। লেফটেনান্ট কর্নেল ডেভিডসনের মুখে মীরট ও দিল্লির সমাচার অবগত হইবামাত্র এডওয়ার্ডস্ জেনরেলের আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এদিকে নিকলসন, যেখানে অন্যান্য সেনানী বসিয়াছিলেন, সেইখানে আগমন করিলেন এবং সকলকে বলিলেন, "সাবধান, যেন কোন সিপাহি বা কোন দেশীয় ব্যক্তি এই সমাচার না শুনিতে পায়।" সকলেই বুঝিলেন যে, সিপাহিরা যদি শুনিতে পায় যে মীরট ও দিল্লিতে সিপাহিরা তাহাদিগের ইংরাজ সেনানীদিগকে বধ করিয়াছে, তাহা হইলে পেশাবরেও সেই

ভয়ানক কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইবে। এই সময়ে পেশাবরে তিন দল দেশীয় অশ্বারোহী সেনা ও পাঁচ দল দেশীয় পদাতি সেনা ছিল। এই আট দল সেনা সংখ্যায় অন্যূন পাঁচ সহস্র হইবে। এদিকে পেশাবরে যে দুই দল গোরা সেনা ও গোরা গোলন্দাজ ছিল, তাহাদিগের সংখ্যা দুই সহস্রও হইবে না। ইংরাজ সেনাধিনায়কগণ বুঝিলেন যে পেশাবরে সিপাহিরা যদি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহা হইলে এই দুই সহস্র গোরা সেনা লইয়া তাহাদিগকে যে কেবল পাঁচ সহস্র সিপাহিরই শক্তি খর্ব করিতে হইবে, তাহা নহে—সিপাহিরা যদি বিরুদ্ধভাব ধারণ করে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে নগরের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র অধিবাসীও ইংবাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে; পেশাবর উপত্যকার অধিবাসীরা এবং সীমান্ত প্রদেশের দুর্ধর্ষ পাঠানগণ তো নিঃসন্দেহ তাহাদিগের সহিত যোগদান করিবেই। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কমিশনর এডওয়ার্ডস স্থির করিলেন যে, পেশাবরের সিপাাহিরা যাহাতে মীরট ও দিল্লির সমাচার কিছুমাত্র না জানিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। তিনি স্বয়ং ইহার ব্যবস্থাও করিলেন।

কমিশনর এডওয়ার্ডস ও ডেপুটি কমিশনর নিকলসন অবিলম্বে পোস্ট অফিসে উপস্থিত হইয়া সকল পত্রই আটক করিলেন। দেশীয় যে কোন ব্যক্তির নামে যে পত্র আসিয়াছিল, সেই পত্রই তিনি আটক রাখিলেন। কাপ্তেন রবার্টস (পরে ভারতের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) এই সময়ে পেশাবরে ছিলেন। তিনি তাহার "Forty one years in India" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কমিশনার এডওয়ার্ডস্ এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে সেই দিনই পেশাবরেও ইংরাজদিগের সর্বনাশ ঘটিত। সিপাহিদিগকে এবং দেশীয় জনসাধারণের উত্তেজিত করিবার জন্য যে সকল পুস্তিকার প্রচার হইতেছিল, সেই ভাবের বহু খণ্ড পুস্তিকা এবং উত্তেজনামূলক বহু পাত্র এডওয়ার্ডসের হস্তগত হইল। এডওয়ার্ড এই সকল পত্র হইতে বুঝিলেন যে, সেনানিবাসের সিপাহিরা নির্দোষ নহে, তাহারাও সেই দণ্ডেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত ছিল। এডওয়ার্ডস্ কতকগুলি পত্র পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, সিপাহিরা সত্য সত্যই জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়াছে। এডওয়ার্ডস্ চীফ কমিশনার জন লরেন্সকে এই সমাচার এবং পঞ্জাবে আশু বিপদের প্রতিকারকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব তারযোগে জ্ঞাপন করিলেন। ১২ই মে মঙ্গলবার এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

১৩ই প্রাতঃকালে ইংরাজ সেনাধিনায়কগণ অতিশয় সংগোপন একটি সভা করিলেন। জেনারেল রীড, ব্রিগেডিয়ার সিডনি কটন, কমিশনার হার্বার্ট, এডওয়ার্ডস, ডেপুটি কমিশনার নিকলসন, ব্রিগেডিয়ার নেভিলি চেম্বারলেন, কাপ্তেন রাইট, কাপ্তেন রবার্টস্ প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া ইতিকর্তব্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহিগণ যদি পঞ্জাবেও ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহা হইলে কি উপায়ে পঞ্জাব প্রদেশকে রক্ষা করা যাইতে পারে, ইহাই তাহাদিগের মীমাংসার বিষয় হইল। এই সময়ে মীরট, দিল্লি, রুড়কী ও পঞ্জাবে দুই রেজিমেন্ট গোরা অশ্বারোহী (সংখ্যায় ১৪১০ জন), দ্বাদশ রেজিমেন্ট গোরা পদাতি (সংখ্যা ১২৬২৪ জন), নয় দল গোরা "হর্স আর্টিলারী" বা অশ্বারোহী গোলন্দাজ (সংখ্যায় ১০১৭ জন), পাঁচ দল "লাইট ফিল্ড ব্যাটারি" গোলন্দাজ ও দশ কোম্পানি পদাতি গোলন্দাজ ছিল: অর্থাৎ গোরা সেনা সংখ্যায় সর্বসমেত ১৬৩০৩ জন ছিল এবং ইহাদিগের সহিত ৮৪টি কামান ছিল। এদিকে এই সকল স্থানে দেশীয় সেনার

সংখ্যা ইহার চারি গুণেরও অধিক ছিল। দেশীয় সেনাসমূহের মধ্যে সাত রেজিমেন্ট "লাইট ক্যাভালরী" বা অশ্বারোহী (সংখ্যায় ৩৫১৪ জন), চোদ্দ রেজিমেন্ট "ইরেগুলার ক্যাভালরী ও গাইডস্ ক্যাভালরী" অশ্বারোহী (সংখ্যায় ৮৫১৯ জন), একত্রিশ রেজিমেন্ট "রেগুলার" পদাতি ও ১৫ রেজিমেন্ট "ইরেগুলার" পদাতি ও "গাইডস্" পদাতি (সর্বসমেত সংখ্যায় ৫০১৮৮ জন), তিন দল "হর্স আর্টিলারী" গোলন্দাজ (সংখ্যায় ৪১১ জন), ছয়দল অন্যবিধ গোলন্দাজ (সংখ্যায় ৯৩০ জন), দুই দল পার্বত্য গোলন্দাজ (সংখ্যায় ১৯২ জন), তিন কোম্পানি পদাতি গোলন্দাজ (সংখ্যায় ৩৩০ জন) এবং পথিপরিষ্কারক ১২ দল সেনা (সংখ্যায় ১৩৯৪ জন) মীরট, দিল্লি, রুড়কী ও পঞ্জাবে ছিল। ইহাদিগের সংখ্যা সর্বসমেত ৬৫৪৭৮ জন; ইহাদের সহিত ৬২টি কামান ছিল। সকল সেনানিবাসেই সিপাহি সেনার সংখ্যা অধিক ছিল; এমন কি, কোন কোন স্থানে গোরা সৈন্য একেবারেই ছিল না।

হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্ ও জন নিকলসন অবস্থা বুঝিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে জেনরেল রীড অবিলম্বে রাওলপিণ্ডিতে চীফ কমিশনারের সহিত সম্মিলিত হউন এবং ব্রিগেডিয়ার কটন পেশাবরের ভার গ্রহণ করুন। পঞ্জাবের যে কোন স্থানে অশান্তির লক্ষণ পরিস্ফুট হইলে যাহাতে একদল সেনা ত্বরায় সেইস্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার জন্য একটি সেনাবাহিনী সজ্জিত রাখিবার প্রস্তাবও তাহারা করিলেন। এই দুই প্রস্তাব সাদরে পরিগৃহীত হইল। তাহারা আরও কয়েকটি প্রস্তাব করিলেন; সেই সকল প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল যে, হিন্দুস্থানী রেজিমেন্টদিগকে পঞ্জাবের নানা স্থানে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে; আটকে তোপখানা ও বারুদখানা আছে, সুতরাং আটকের হিন্দুস্থানী রেজিমেন্টকে সরাইয়া সেই স্থানে কোহাটের একদল পদাতি সেনা রাখা হইবে এবং একদল পাঠান সেনা কোন বিশ্বস্ত পাঠান অধিনায়কের অধীনে আটকের নদীতীরে রাখা হইবে।

এই সকল প্রস্তাব সম্মিলিত সেনাধিনায়কগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হইলে কথা উঠিল যে, পঞ্জাবে শান্তিরক্ষার জন্য যে সেনাবাহিনী সজ্জিত করা হইবে, তাহার পরিচালন ভার কাহাকে দেওয়া হইবে? সকলেই বলিলেন, যে, এক্ষেত্রে সাহসী ও তেজস্বী সেনাধিনায়কের নির্বাচন করিলে চলিবে না, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে যে কোন সেনাধিনায়কের অভিজ্ঞতা অধিক হইবে, তাহার উপরিতন কর্মচারী বা "সিনিয়রিটি" (অধিক দিনের কার্যের দাবি) উপেক্ষা করিয়াও তাহাকেই এই ভার প্রদান করিতে হইবে। ব্রিগেডিয়ার কটন ও জন নিকলসন উভয়েই লব্ধ প্রতিষ্ঠ ও তেজস্বী যোদ্ধা, কিন্তু সকলে স্থির করিলেন যে, পেশাবরে উপস্থিত থাকিলে তাহাদের দ্বারা অনেক কাজ হইবে সুতরাং তাহাদিগের পেশাবর ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না। তখন সকলে স্থির করিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার নেভিলি চেম্বারলেনের উপর এই বাহিনীর ভার দেওয়া হউক। এই প্রস্তাবই রাওলপিণ্ডিতে চীফ কমিশনরকে জ্ঞাপন করা হইল এবং প্রধান সেনাপতির অনুমতি প্রার্থনা করা হইল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান সেনাপতি তারযোগে আদেশ দিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার নেভিলি চেম্বারলেনই এই বাহিনীর প্রধান সেনাধিনায়ক হইবেন।

পেশাবরের সেনাধিনায়কগণ মীরট ও দিল্লির দুর্ঘটনার সংবাদ পাইবার পর পঞ্জাব প্রদেশে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না সত্য, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের আশঙ্কা দূর হইল না। পেশাবার, নৌসেরা, ঝিলাম, রাওলপিণ্ডি, কোহাট প্রভৃতি

স্থানের সিপাহিরা যাহাতে মীরট ও দিল্লির খবর সহসা না জানিতে পারে, অথবা তাহাদিগের এই সমাচার পাইবার পূর্বেই যাহাতে শান্তিরক্ষার্থ সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা হয়, তাহার জন্য তাহারা অতি গোপনে পরামর্শ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই সকল ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু তাহাদিগের ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই সিপাহিদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল? প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, ঝিলামে এই সেনাবাহিনী সজ্জিত করা হইবে, রাওলপিণ্ডি হইতে ২৪নং গোরা পদাতির দল, নৌসেরা হইতে একদল গোরা পদাতির দল, পেশাবর হইতে একদল অশ্বারোহী গোলন্দাজ, রাওলপিণ্ডি হইতে ১৬নং ইরেগুলার অশ্বারোহী, মুড়ি হইতে কুমায়ুন গোলন্দাজের দল, বন্নু হইতে ১নং পঞ্জাবী পদাতি সেনাদল ও কোহাট হইতে ২নং পঞ্জাবী অশ্বারোহীর দলকে এক করা হইবে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার নেভিলি চেম্বারলেনের পেশাবর পরিত্যাগের পূর্বেই খবর আসিল যে, এই সকল স্থানে পূর্বোক্ত সেনাদল ইতোমধ্যেই নানা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তখন স্থির হইল যে, যে কয়টি সেনাদল পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকেই লইয়া ওয়াজিরিবাদে এই বাহিনী প্রস্তুত করা হইবে! ইতোমধ্যে আর এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। জেনরেল রীড এই ব্যবস্থার কথা রাওলপিণ্ডিতে চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্সকে সিমলার প্রধান সেনাপতিকে এবং পঞ্জাবের বিভিন্ন সেনানিবাসের সেনাধিনায়কদিগকে তারযোগে জ্ঞাপন করিলেন এবং এই কার্যে সকলের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন; যে সিগনালার এই সমাচার তারযোগে পাঠাইল, তাহার বয়স অল্প। তাহার কোন পরিচিত ব্যক্তি ইংরাজ সেনাধিনায়কদিগের ব্যবস্থার কথা জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় সে আসল সমাচার খুলিয়া বলিল। দেখিতে দেখিতে এই গোপনীয় কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল! অবিলম্বে পূর্বোক্ত দুই দল পঞ্জাবী সেনাকে দিল্লিতে পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইল এবং শিয়ালকোট হইতে তিন দল গোরা সেনা একত্র করিয়া শান্তি রক্ষক বাহিনী গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

এই সময়ে স্যর হেনরি বার্নার্ড সিরহিন্দ ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত সেনাধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার পুত্র তাহার এডিকাং বা শরীররক্ষী ছিলেন। স্যর হেনরি বার্নার্ড বুঝিতে পারিলেন যে, অম্বালার সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা একটা গোলযোগ করিবে। তিনি অবিলম্বে তাহার পুত্রকে প্রধান সেনাপতির নিকটে পাঠাইলেন; পুত্রকে বলিয়া দিলেন যে অম্বালায় যে তিনদল দেশীয় সেনা আছে, তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধ অস্ত্রধারণ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে, সুতরাং সিমলার নিকটে পার্বত্য সেনানিবাসে যে তিনদল গোরা সেনা আছে, তাহাদিগকে যেন অবিলম্বে অম্বালায় প্রেরণ করা হয়—এই কথা প্রধান সেনাপতি জেনরেল জর্জ এন্সনকে জ্ঞাপন করিতে হইবে। স্যর হেনরি বার্নার্ড অম্বালার সিপাহিদিগের উপর এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, প্রধান সেনাপতির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তিনি কসৌলীতে অধিষ্ঠিত ৭৫নং ইংরাজ সেনাদলকে প্রস্তুত থাকিতে বলিবার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। স্যর হেনরি বার্নার্ডের পুত্র কসৌলী হইয়া সিমলায় গমন করিলেন এবং প্রধান সেনাপতিতে পিতার আশঙ্কায় কথা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রধান সেনাপতি জেনবেল এন্সন পূর্বেই পেশাবরের সকল সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। এখন আবার অম্বালার বিপ্লবাশঙ্কার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন

হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন যে অতি শীঘ্রই হয়ত তাহাকে ফিরোজপুর, ফিলুর, জলন্ধর হইতেও আশঙ্কার সমাচার শ্রবণ করিতে হইবে। তিনি প্রতিকার ব্যবস্থায় কালবিলম্ব করিলেন না। অবিলম্বে তিনি একজন এডিকংকে কসৌলীতে পাঠাইয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন যে এই দণ্ডেই যেন ৭৫নং ইংরাজ পদাতি সেনাদল অম্বালায় যাত্রা করে এবং দিগশায়ের ১নং বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্স সেনাদল গাড়ি সংগ্রহ করিয়াই যেন এই ৭৫নং সেনাদলের অনুগমন করে। ফিরোজপুর ও ফিলুরে "ম্যাগাজিন" অর্থাৎ তোপখানা ও বারুদখানা ছিল; পাছে সিপাহিরা এই তোপখানা ও বারুদখানা দুইটি দখল করিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তিনি আদেশ দিলেন যে, ফিরোজপুরের "ম্যাগজিন" ইংরাজ সেনাদলের প্রহরায় রাখা হউক এবং জলন্ধর হইতে একদল ইংরাজ পদাতি সেনাকে প্রেরণ করিয়া ফিলুরের "ম্যাগাজিন" রক্ষায় নিযুক্ত রাখা হউক।

পর দিবস অর্থাৎ ১৩ই মে অপরাহ্নকালে মীরট হইতে প্রধান সেনাপতির নিকটে একখানি পত্র আসে। এই পত্রে ১০ই মে তারিখে মীরটে এবং ১১ই মে তারিখে দিল্লিতে যে ভয়ানক কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিত থাকে।

কোন কোন ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে প্রধান সেনাপতির উপর দীর্ঘ-সূত্রতার দোষ আরোপ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, প্রধান সেনাপতি এন্সন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দৃঢ়তা সহকারে কোন কার্যই করিতে পারেন নাই। কিন্তু লর্ড বরার্টস প্রধান সেনাপতি এন্সনের এরূপ দোষ দেখেন নাই। তিনি তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রধান সেনাপতি এন্সন এই সকল সংবাদ পাইয়া স্থির করিলেন যে, অম্বালা হইতে দিল্লিতে সেনাদল প্রেরণ করিতে হইবে, এইজন্য তিনি অনতিবিলম্বে অম্বালা পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এদিকে ২নং বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্সে গোরা সেনাদলকে অম্বালায় প্রেরণ করা হইল। অধিকন্তু তিনি একজন গোলন্দাজ কর্মচারীকে ফিলুরে এই উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন অভিযানোপযোগী তৃতীয় শ্রেণির গাড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখেন; গোলন্দাজ ও পদাতি সেনাদলের গোলা, গুলি, বারুদ প্রভৃতি এই গাড়ির সাহায্যে অম্বালায় প্রেরণ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জুটোগে নাসীরী গোলন্দাজদলকে এবং কাঙাড়া ও নুরপুরের দেশীয় গোলন্দাজদিগকে যুদ্ধোপকরণসহ ফিলুরে যাইয়া পূর্বোক্ত অভিযানের গাড়ি ধরিবার আদেশ দেওয়া হইল।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জেনরেল এন্সন ১৪ই মে তারিখে অম্বালা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে অম্বালায় উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে সিমলায় তিনি একখানি সার্কুলার জারি করিয়া যান। তাহার ধারণা হইয়াছিল যে, এই সার্কুলার দেখিয়াই দেশীয় সেনাদল শান্তভাব অবলম্বন করিবে। কিন্তু তাহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। জেনরেল এন্সন অম্বালায় উপস্থিত হইয়া স্যার হেন্‌রি বার্নার্ডের মুখে যে সকল কথা শুনিলেন, তাহাতে তিনি আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অম্বালায় ৯ নম্বর গোরা ল্যান্সার সেনাদল, দুই দল গোরা হর্স আর্টিলারী (গোলন্দাজ), ৪নং বেঙ্গল লইট্ ক্যাভাল্‌রী (অশ্বারোহী) ও দুই দল দেশীয় পদাতি ছিল। ৭৫নং পদাতি সেনাদল এবং ১নং বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্স সেনাদল অম্বালায় যাত্রা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত যুদ্ধোপকরণ অতি সামান্যই ছিল। ৭৫নং সেনাদলের প্রত্যেকের সহিত ত্রিশ বার ব্যবহারের উপযোগী এবং ১নং বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্স দলের সহিত ৭০ বার ব্যবহারোপযোগী গুলি বারুদ বা টোটা

ছিল। গাড়ির অভাববশত এই দুই সেনাদল তাঁবু বা আপনাদিগের তল্পী লইয়া আসিতে পারে নাই। রসদবিভাগ এবং চিকিৎসাবিভাগ সহসা সেনাদলের সহায়তা করিতে পারে নাই—রোগী অথবা আহত ব্যক্তির জন্য ডুলি ছিল না; বাজারে লোকাভাব হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের উপায় ছিল না, রসদ প্রভৃতি জোগাইবার জন্য কন্ট্রাক্টরদিগেরও অভাব ঘটিয়াছিল। অম্বালা হইতে ফিলুর ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত; এই ফিলুর ব্যতীত অপর কোন স্থান হইতেই রসদ বা গুলি বারুদ সরবরাহের উপায় ছিল না।

কেবল অম্বালার এবংবিধ অবস্থাই জেনরেল এন্সনের পক্ষে চিন্তার কারণ হইল না। দিল্লিতে বহুসংখ্যক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা নিহত হইয়াছিলেন; যাহারা কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কেবল তাহারাই রক্ষা পাইয়াছিলেন। মীরটের উত্তেজিত সিপাহি ও দিল্লির সিপাহিরা দিল্লি দখল করিয়া বসিয়াছিল। মীরটে ইংরাজ সেনাদল গড় প্রস্তুত করিয়া সিপাহিদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মীরটের চতুস্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে অশান্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অম্বালায় ও জলন্ধরে ইংরাজ সেনাদল অবস্থান করায় এ পর্যন্ত সিপাহিরা প্রকাশ্যভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সিপাহিরা যদি বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে এই গোরা সেনাদল যে তাহাদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিবে, এরূপ বিবেচনা কেহই করিতে পারেন নাই। ফিরোজপুরে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল এবং লাহোরে বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া দেশীয় সেনাদলকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। মীরটের দক্ষিণাংশে এবং পূর্বাংশের কোন স্থান হইতে এই সময়ে কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই, তথাপি সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, সিপাহিরা সর্বত্রই উত্তেজিত হইয়াছিল। জুটোগে অবস্থিত নাসীরী ব্যাটালিয়ন দলকে অম্বালায় যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সময়ে সংবাদ আসে যে এই নাসীরী গোলন্দাজ দল ইংরাজ সেনাধিনায়কের আদেশ পালনে ও ফিলুরে যাত্রা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। এই দলেরই কিয়দংশ কসৌলীতে ছিল; তাহারা ট্রেজারি বা ধনাগার লুণ্ঠন করায় ৭৫নং পদাতি সেনাদলের একশত সেনা কসৌলীতে প্রেরিত হয়। এদিকে সিমলায় যে গুর্খা সেনাদল ছিল, তাহাদিগের আচরণেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। লর্ড উইলিয়ম হে এই সময়ে ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। তিনি অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া অধিকাংশ ইংরাজ মহিলা ও তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে সিমলার নিকটবর্তী কিউন্থলের রাজার আশ্রয়গ্রহণে সম্মত করেন। লর্ড উইলিযম হে সিমলায় শান্তিস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করায় নাসীরী গোলন্দাজ সেনাদলও শেষে শান্তভাব অবলম্বন করে।

নানাদিকে এইরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেও জেনরেল এন্সন এ সকলের জন্য বড় বেশি চিন্তিত হন নাই। দিল্লির অবরোধই তাহাকে অত্যধিক মাত্রায় চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, দিল্লি যদি অধিক দিন সিপাহিদিগের করতলগত থাকে, তাহা হইলে সকল দেশীয় সেনাদলই ক্রমে ক্রমে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে; এই সময়ে পঞ্জাবী সেনাদল ইংরাজের অনুগত ছিল সত্য, কিন্তু দিল্লি যদি অবিলম্বে অধিকার করা না হয়, তাহা হইলে সকলেই মনে করিবে যে সিপাহিদিগের হস্ত হইতে দিল্লি উদ্ধার করিবার সামর্থ ইংরাজের নাই; সুতরাং দেশব্যাপী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। জেনারেল এন্সন সহসা কোন কার্য করিতে পারিলেন না। তিনি এ সম্বন্ধে

বিবেচনা করিবার জন্য ১৬ই মে তারিখে স্যর হেনরি বার্নার্ডের ভবনে গোপনে একটি পরামর্শ সভা করিলেন। জেনরেল এন্সন, ব্রিগেডিয়ার হ্যালিফাক্স, কর্নেল মোরাট, কর্নেল চেষ্টার, স্যর হেনরি বার্নার্ড প্রভৃতি সেনাধিনায়কগণ এই সভায় বসিয়া পরামর্শ করিলেন। সকলেই জেনরেল এন্সনের অভিমতের অনুমোদন করিলেন। জেনরেল এন্সন দেখিলেন যে তাহার যেরূপ জনবল, তাহাতে দিল্লি আক্রমণ করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। তথাপি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাও তিনি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই তিনি কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। মীরটের জেনরেল হিউইট অম্বালার এই সেনাদলকে কিরূপ সেনাবল দিয়া সাহায্য করিতে পারেন, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। জেনরেল এন্সন ২৩ শে মে তারিখে যাত্রা করিবেন এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু রসদ ও গোলাগুলি লইয়া যাইবার জন্য গাড়ির অভাব ঘটিল।

১৬ মে তারিখে অপরাহ্নকালে জেনরেল এন্সন স্যর জন লরেন্সের একখানি পত্র পাইলেন। স্যর জন লরেন্স এই পত্রে জেনরেল এন্সনকে দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে এরূপ দুঃসময় বুঝি বা আর কখনও আসে নাই। আমাদের ইউরোপীয় সেনাবল এত অল্প যে, প্রথমাবস্থাতেই শক্তি প্রকাশ ও বিপক্ষ সেনাকে পরাজিত করিতে না পারিলে আসল সংঘর্ষের সময়ে এই সেনাবল বিপক্ষদিগের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। কিন্তু আমার মনে হয় যে অবস্থানুসারে চলিতে পারিলে ও তেজস্বিতা দেখাইতে পারিলে ভগবানের কৃপায় ইহাই দুর্দম হইয়া উঠিবে।"

জেনরেল এন্সন দিল্লিতে অভিযান বাঞ্ছনীয় বলিয়া বুঝিলেন, কিন্তু তাহার সেনাবল যেরূপ অল্প এবং সেনাদলের সমরোপকরণ যেরূপ সামান্য তাহাতে তিনি দিল্লির ন্যায় দুর্ভেদ্য এবং অসংখ্য ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সিপাহি ও নগরবাসীগণ কর্তৃক সুরক্ষিত নগর অবরোধ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি ১৭ই মে তারিখে স্যর জন লরেন্সকে তাহার পত্রের উত্তরে একথা স্পষ্ট করিয়া জানাইলেন। তিনি পত্রে স্পষ্টই লিখিলেন যে, ইংরাজ সেনাদলের সঙ্গে তাঁবু নাই; দিল্লির প্রাচীর ভূমিসাৎ করিতে হইলে যেরূপ কামানের প্রয়োজন, মীরটে বা অম্বালায় সেরূপ কামান নাই, ৪/৫ সের ওজনের গোলা ব্যবহার হইতে পারে, এইরূপ কামানই আছে; অভিযানের জন্য যতগুলি গাড়ির প্রয়োজন, ততগুলি গাড়ি আপাতত পাওয়া যাইতেছে না, ১৬ দিন অথবা ২০ দিনের মধ্যে এই গাড়ি সংগৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয় না; তাহার উপর, অম্বালাব যে তিনদল দেশীয় সেনা আছে, তাহাদিগের উপরও বিশ্বাস নাই। এরূপ অবস্থায়, যে সামান্য ইংরাজ সেনাবল আছে দিল্লি আক্রমণ ব্যপদেশে তাহাও বিপন্ন করা কর্তব্য কিনা, জেনরেল এন্সন পত্রে সে কথা জন লরেন্সকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি পত্রে আরও লিখেন, "আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, যথেষ্ট সাবধানতার সহিত যুদ্ধোপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া, যে সকল অপকৃষ্ট তোপ ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ কার্যকর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না, তাহাদিগের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই যদি আমরা অগ্রসব হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সফলকাম হইব; এখানে আমি যাহার সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তিনিই এই কথা বলিয়াছেন। মেজর জেনরেল ব্রিগেডিয়ার এডজুটান্ট জেনরেল, কোয়াটারমাস্টার জেনরেল ও কমিশনর জেনরেল ইহারা সকলেই এইরূপ

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি এ সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করেন, তাহা আমাকে জানাইবেন; আমি আমার নিজের দূরদর্শিতা ও অভিমত অপেক্ষা আপনার দূরদর্শিতা ও অভিমত অধিকতর গ্রাহ্য বলিয়া মনে করি, সুতরাং আপনার অভিমত কি, তাহা আমার জানা আবশ্যক।"

স্যর জন লরেন্স এই পত্র পাইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, সিপাহিদিগের হস্ত হইতে দিল্লি উদ্ধার করিতে বিলম্ব হইলে সর্বত্রই সিপাহিরা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। তিনি স্থির বুঝিলেন যে, ভারতের সকল স্থানের সিপাহিই এক্ষণে ইংরাজ গবর্নমেন্টের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে। যদি গবর্নমেন্ট শীঘ্রই দিল্লি অধিকার করিতে না পারেন, যদি অধিকদিন মোগলদিগের রাজধানী দিল্লি সিপাহিদিগের করতলগত থাকে, তাহা হইলে সকলেই স্থির করিবে যে ইংরাজের শক্তি অতি সামান্য; সে শক্তি অতি সহজেই চূর্ণ করা যায়। এই জন্য স্যর জন লরেন্স ২০শে মে তারিখে জেনারেল এন্সনকে তারযোগে তাহার অভিমত সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিলেন এবং পরদিন একখানি পত্রও লিখিলেন। পত্রে তিনি লিখিলেন, "আমি দিল্লি নগরী বেশ ভালরূপ জানি, ১৩ বৎসর কাল আমি সেখানে কাটাইয়াছি। ইংরাজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত, উত্তেজিত সিপাহিরা যে এই দিল্লি দখলে রাখিবে ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আমার বিশ্বাস যে, সকল দিকে যদি আমাদের সুব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে আমরা সেনাদল লইয়া দিল্লির দরওয়াজায় উপস্থিত হইলেই দিল্লি আত্মসর্পণ করিবে। অবশ্য সামরিক নীতি অনুসারে এ সময়ে অর্থাৎ মীরটের সেনাদল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইবার পূর্বে দিল্লিতে অভিযান করা ঠিক নহে সত্য, কিন্তু এখন ইংরাজ সেনাদলকে সেনানিবাসে নিশ্চেষ্ট রাখা ও ব্যাপার কত গুরুতর হয় তাহার প্রতীক্ষা করিতে দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে। আমার অনুরোধ একবার ভারতের ইতিহাসের কথা ভাবিয়া দেখুন। আমরা যখন দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত কার্যে ব্রতী হইয়াছি, তখন কোন কার্যে আমরা অকৃতকার্য হইয়াছি? যখন সাহসহীন ও উৎসাহশূন্য লোকের পরামর্শ অনুসারে আমরা কার্য করিয়াছি, তখন কোন্ কার্যে আমরা সফলকাম হইয়াছি? ক্লাইব তাহার উপরিতন কর্মচারীদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল দ্বাদশ শত লোক লইয়া পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে চল্লিশ সহস্র লোককে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কাবুলে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার অভাব না থাকিলে এরূপ দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না। ইংরাজ ব্যতীত অপর যে কোন জাতীয় লোক বেতনভোগী হইয়া আমাদের অধীনে কার্য করে, তাহারা যে আমাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আমরা যে কার্যে প্রবৃত্ত হই, সেই কার্যেই সফলকাম হই,—আমরা জয়ী হইতেই জানি, পরাজিত হইতে জানি না, এইরূপ ধারণা থাকাতেই তাহারা আমাদের পক্ষে আছে। তাহার পর, সকলেই ত আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। পঞ্জাবের ইরেগুলার সেনাদল রেগুলার সেনাদল অপেক্ষা সোৎসাহে যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য দেখাইতে তৎপর। তাহারা ইংরাজ সেনাদলের সহিত শ্রেণিবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা যদি দেখে যে ইংরাজ সেনাদল সমরে বিমুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহারা মনে করিবে, ইংরাজ পরাজিত হইয়াছে। আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখুন। যে কয় দিন আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে, সেই কয় দিনের মধ্যে উত্তেজিত সিপাহিরা ভারতের

ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকনিবাসে যাইতে পারে এবং পত্র লিখিয়াও অন্যান্য সিপাহির দলকে উত্তেজিত করিতে পারে। এখন প্রায় সকল স্থানেই শস্য উৎপন্ন হইয়াছে; অম্বালা হইতে মীরটের পথে আমরা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতে পারিব। আমরা এখন বিনা ক্লেশে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সেনাদল প্রেরণ করিতে পারিতেছি। পাতিয়ালা ও ঝিন্দের মহারাজের প্রতি—সাধারণতঃ পঞ্জাব প্রদেশের প্রতি—এখন বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। তাহারা যে আমাদের পক্ষেই আছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহাদিগকে বিশ্বাস করা কর্তব্য, কিন্তু সিপাহিদিগকে বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। যদি পঞ্জাবের কোন সেনানায়ককে আপনার প্রয়োজন হয়, আমাকে তাহা জানাইবেন।"

একদিকে স্যর জন লরেন্স দিল্লিতে অভিযান করিবার জন্য এইভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিলেন, অন্য দিকে কলিকাতা হইতে বড়লাট লর্ড ক্যানিং বাহাদুরও দিল্লি অধিকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কলিকাতায় এই সময়ে ইংরাজ ও দেশীয় খ্রিস্টান নরনারীগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা বড়লাটকে বারংবার কলিকাতায় ইংরাজ সেনাদল রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। এই সময়ে চুঁচুড়ায় একদল ইংরাজ সেনা ছিল এবং দানাপুরে একদল ইংরাজ সেনা ছিল—কলিকাতা হইতে বারাণসীর মধ্যে আর ইংরাজ সেনাদল ছিল না। লর্ড ক্যানিং স্থির করিলেন যে ইংরাজ সেনাদলকে ভিন্ন ভিন্ন সেনানিবাসে রাখিবার ও দিল্লি অধিকার করিবার জন্য পাঠাইতে হইবে। এ অভিপ্রায় তিনি প্রকাশও করিলেন। কলিকাতার ইংরাজ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় ভলন্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু লর্ড ক্যানিং তাহাতেও সম্মত হন নাই, তিনি ইংরাজ ও খ্রিস্টানকে কনস্টেবল হইতে বলিয়াছিলেন। এই কারণে ইংরাজ সাধারণ লর্ড ক্যানিয়ের উপর অত্যধিক মাত্রায় বিরক্ত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আগে দিল্লি, মীরট প্রভৃতি স্থানের উদ্ধারসাধন করিতে হইবে পরে সাধারণ ইংরাজের শঙ্কা অপনোদনের চেষ্টা করিতে হইবে।

লর্ড ক্যানিয়ের আদেশ পাওয়ায় জেনরেল এন্সন দিল্লিতে অভিযান করাই স্থির করিলেন। তবে যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি অম্বালা রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনাদিগের স্ত্রীপুত্রদিগকে তিনি কসৌলীতে পাঠাইয়া দিলেন; গির্জায় তাহাদিগকে স্থান দেওয়া হইল; গির্জার চারিদিকে গভীর পরিখা প্রস্তুত করাইলেন এবং দেশীয় সেনাদলের অর্ধাংশ স্থানান্তরিত করিলেন, অপর অংশকে দিল্লির পথে সঙ্গে লইলেন। পাতিয়ালার মহারাজ, নাভা ও ঝিন্দের রাজা যদি ইংরাজের সহায়তা না করেন, তাহা হইলে পঞ্জাব ও দিল্লির মধ্যপথ আটক হইয়া পড়ে, এইজন্য জেনরেল এন্সন ইহাদিগের মনোভাব জানিবারও চেষ্টা করিলেন। অম্বালার ডেপুটি কমিশনর ডগ্‌লাস ফর্সিথ এজন্য পাতিয়ালার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে ইংরাজের বিপদের কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পাতিয়ালার মহারাজ কথায় বাধা দিয়া বলিলেন যে, তিনি সকল সমাচারই অবগত আছেন। তখন মি. ডগ্‌লাস ফর্সিথ (পরে স্যর ডগলাস) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিল্লি হইতে পাতিয়ালার দূত আসিয়াছে নাকি?" অদূরে কয়েকজন বসিয়াছিল, মহারাজ তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে তাহারা বসিয়া রহিয়াছে।" মি. ফর্সিথ বলিলেন, "মহারাজ সাহেব আমার একটি কথার উত্তর দিন। আপনি আমাদের স্বপক্ষে না বিপক্ষে?" মহারাজ বলিলেন, "যত দিন আমি বাঁচিব, ততদিন আমি

আপনাদেরই পক্ষে থাকিব। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমার নিজের অধিকারেও আমার অনেক শত্রু আছে। আমার কোন কোন আত্মীয়, যেমন আমার ভ্রাতা, আমার শত্রু। যাহা হউক, আপনারা আমাকে কি করিতে বলেন?" ফর্সিথ সাহেব গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নিরাপদ রাখিবার জন্য কর্নালে একদল সেনা প্রেরণ করিতে বলিলেন। মহরাজ সেনা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তবে ফর্সিথ সাহেবকে বলিলেন যে, শীঘ্রই যেন ইংরাজ সেনাদলকে সেখানে প্রেরণ করা হয়।

১৯শে মে তারিখে স্যর জন্ লরেন্স খবর দিলেন যে, "গাইডস্" দল ও চারিদল বিশ্বস্ত পঞ্জাবী সেনা জেনরেল এন্সনের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে। ২১শে তারিখে গবর্নর জেনরেল সমাচার পাঠাইলেন যে, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও সিংহল হইতে ইংরাজ সেনাদল আসিতেছে। অম্বালায় অভিযানকারী সেনাবাহিনী অগ্রসর হইতেছে, এন্সন এ সংবাদও পাইলেন। জেনরেল এন্সন স্যর জন লরেন্সকে তারযোগে জানাইলেন যে, দিল্লি অভিমুখে প্রথম দল যাত্রা করিল। ২৩শে তারিখে জেনরেল এন্সন হিউইটকে তাহার অভিযানের প্রণালী নির্দেশ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে ৭৫নং পদাতি সেনাদলের ব্রিগেডিয়ার হালিফক্স ও ৬০ নং রাইফেল দলের কর্নেল জোন্স দুই দল সেনা লইয়া অম্বালা হইতে যাত্রা করিয়াছেন; ব্রিগেডিয়ার আকডেল উইলসনের অধীনে মীরট হইতেও এক দল সেনা যাত্রা করিয়াছে সম্ভবত প্রথম দুই দল ৩০শে মে তারিখে কর্নালে সমবেত হইবে, সেই স্থান হইতে জেনরেল এন্সন তাহাদিগের পরিচালনভার গ্রহণ করিবেন ও বাঘপতে যাত্রা করিবেন। সেখানে মীরটের সেনাদল উপস্থিত হইলে তাহারা দিল্লিতে যাত্রা করিবেন।

এইরূপ স্থির হইয়া গেলে জেনরেল এন্সন ২৪শে মে তারিখে অম্বালা হইতে যাত্রা করিলেন এবং পর দিবস প্রাতঃকালে কর্নালে উপস্থিত হইলেন। ২৬শে তারিখে তাহার কলেরা হইল এবং সেই রোগেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। দিল্লির পথে তাহার মৃত্যু হওয়ায় মেজর জেনরেল স্যর হেনরি বার্নার্ড সেনাদলের ভার পাইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দিল্লির অবরোধ—বাদলি-কি-সরাইয়ের যুদ্ধ

সেনাপতি এন্সনের মৃত্যুর পর স্যর হেনরি বার্নার্ড অস্থায়ীরূপে ভারতের প্রধান সেনাপতি হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লি অধিকার করিবার মানসে কর্নাল হইতে সসৈন্যে দিল্লির দিকে অগ্রসর হইলেন। অতিশয় গ্রীষ্মবশত তাহার পদাতি ও অশ্বারোহী সেনার দল দিনের বেলায় কুচ করিতে পারিত না। তাহারা পথের ধারে, আমবাগানের ভিতরে তাঁবু ফেলিয়া সারাদিন নিদ্রা যাইত, সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া কুচ করিত। সর্বাগ্রে গোলন্দাজ ও তোপ, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী সেনা এবং সর্বশেষে পদাতি ও রসদ চলিত। এইভাবে যাত্রা করিয়া ৫ই জুন তারিখে দিল্লির দশ মাইল দূরে আলিপুর গ্রামে সেনাপতি বার্নার্ড সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যদিকে মীরট হইতে যে সেনার দল আসিবার কথা হইয়াছিল, তাহারা ২৭শে মে তারিখে মীরট ত্যাগ করিয়া দিল্লির পথে অগ্রসর হইল। মীরটের সেনার মধ্যে দুই দল কড়াবীণধারী অশ্বারোহী, ৬০নং রাইফেল রেজিমেন্টের একটা পক্ষ, স্কটের তোপের সারি. টুম্বের ঘোড়ার তোপ, নয়সের ওজনের গোলা নিক্ষেপকারী দুইটি তোপ ছিল। সেনাপতি আর্চডেল উইলসন এই দলের সেনানায়কের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরটের কমিশনর গ্রেথেড সাহেব এই দুই দলে সিভিল কর্মচারীরূপে ছিলেন। মীরটের এই সেনার দল ৩০শে মে তারিখে দিল্লি হইতে ১০ মাইল দূরে গাজিউদ্দীন নগরে আসিয়া উপস্থিত হয়। গাজিউদ্দীন নগব হিন্দন নদীর তীরে অবস্থিত। হিন্দন যমুনার একটি শাখা। দিল্লির দশ মাইলের মধ্যে দুই দিকে দুই দল বিরোধী গোরাসেনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অথচ দিল্লির সিপাহিদিগের হুঁশ নাই। আরও বহুপূর্বে এই ইংরাজ সেনাদলকে বাধা দেওয়া সিপাহিদিগের উচিত ছিল। গ্রেথেড সাহেব লিখিয়াছেন যে, "ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, দিল্লি বুঝি আমাদেরই অধীন। অগ্রসর হইলেই হইল।" কিন্তু গাজিউদ্দীন নগবের সেনার দলকে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে হয় নাই।

একজন গুপ্তচর আসিয়া সমাচার দিল যে, সিপাহির দল হিন্দন নদীর অপর পারে উচ্চভূমির উপর আসিয়া তোপ বসাইতেছেন, সেইখান হইতে তাহারা প্রথমে তোপ দাগিবে, পরে দুই ধার দিয়া বাঁকিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে ইংরাজের দলকে আক্রমণ করিবে। এই কথা বলিতে না বলিতে দূরে গগনপ্রান্তে ধূমমালা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় কামানের শব্দ হইল, আর অজস্র ধারায় গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। সিপাহির দল সমরচাতুরীর হিসাবে ঠিক স্থানই অধিকার করিয়াছিল; যথাপদ্ধতি তোপ বিন্যাস করিয়া অরিমর্দনে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু একটি কাজ তাহারা ভুল করিয়াছিল। হিন্দন নদীর উপর একটি ছোট লোহাব পুল ছিল। সিপাহির পক্ষে হয় এই পুলটি সর্বাগ্রে দখল করা উচিত ছিল, নয় উহাকে একেবারে তোপে উড়াইয়া দেওয়া উচিত ছিল। সিপাহি

সেনাপতি এই দুইটির একটি কর্মও করেন নাই। এই ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইয়াছিল। পরন্তু ইংরেজ সেনাপতি কামান ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, এই লোহার পুল ইংরাজের হস্তগত না থাকিলে ইংরাজকে গাজিউদ্দীন নগরের যুদ্ধে পরাজিত হইতেই হইবে। তাই তিনি অন্যদিকের ভাবনা ছাড়িয়া ৭ নম্বরের রেজিমেন্টের একদলকে ওই লোহার পুল দখল করিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন এবং মেজর টুম্বের অধীন চারিটি তোপ, এক রেসালা কড়াবীণধারী অশ্বারোহীকে ক্ষুদ্র হিন্দন নদীর দক্ষিণ বাহিয়া লোহার পুলের দিকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। হিন্দন নদীর গর্ভে অনেক চোরা বালি ছিল; ভারী তোপ লইয়া অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এই পথে অগ্রসর না হইলে সব যায়, এই ভাবিয়া সেনাপতি উইলসন সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। এই এক চালে সেনাপতি উইলসন সিপাহির দলের সেনাপতিকে মাত করিয়াছিলেন। সিপাহিদলের সেনাপতি নিজের ভুল বুঝিয়া তোপের মুখ বাঁকাইলেন এবং অগ্রগামী ইংরাজ সেনার উপর অজস্র গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনাপতি ইহার উত্তরে আরও দুইদল গোরা সেনাকে এবং মেজর স্কটের তোপের দল হইতে চারটি তোপ অগ্রগামী ইংরাজ সেনার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। তিনি হুকুম দিলেন যে, সিপাহির তোপের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, গোলার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—মরিয়া শত্রুকে মারিতে হইবে। সিপাহিদলের সেনাপতি আর একটি ভুল করিলেন। তিনি যদি তাহার উচ্চ পাহাড়ের অবস্থান ত্যাগ করিয়া সদলবলে অগ্রসর হইতেন ও ইংরাজের মুষ্টিমেয় গোরা সেনাকে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে সব শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি ভাবিলেন যে, তাহার অধীনে বড় বড় তোপ রহিয়াছে; গোলন্দাজ সিপাহির দল ভারতের অজেয় বলিয়া পরিচিত, সুতরাং তোপ ছুড়িলেই ইংরাজের গতিরোধ তিনি করিতে পারিবেন। কিন্তু হিন্দন নদী সর্প-গতিতে এইখানে বাঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইয়াছে, সেই নদীর গর্ভ বাহিয়া ইংরাজ সেনা অগ্রসর হইতেছিল—সুতরাং সিপাহি সেনাপতির পক্ষে লক্ষ্য স্থির রাখা কঠিন হইয়া পড়িল। অন্যদিকে সেনাপতি উইলসন তাহার অধীন সেনাপতি মেকেঞ্জি ও টুম্বসকে হিন্দন নদী পার হইয়া শত্রুর বামদিক ঘিরিয়া পশ্চাদ্দিকে যাইতে অনুমতি করিলেন। ইহাদের দুইজনের অধীনেই অনেক তোপ ও গোলন্দাজ ছিল, সঙ্গে অশ্বারোহী সেনাও ছিল। এই সেনাদল ঘুরিয়া সিপাহিদলের বামদিকে যাইতে যাইতে অজস্র গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেনাপতি উইলসন শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সিপাহি সেনাপতি দেখিলেন যে, তাহার পশ্চাতে, বামদিকে, সম্মুখে ইংরাজ তোপ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে; দক্ষিণদিকে লোহার পুল ইংরাজ প্রায় দখল করিয়াছে—সুতরাং তাহার পক্ষে আর সে স্থানে স্থির থাকা সম্ভবপর নহে। সিপাহি সেনাপতি বিচলিত হইলেন, তাহার বড় বড় তোপের গোলা আর তেমন ত্বরিতগতিতে ইংরাজদলকে মথিত করিতে লাগিল না। সময় বুঝিয়া ইংরাজ সেনাপতি গোরা পদাতি ও অশ্বারোহীর দলকে শত্রুর মধ্যস্থান আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহি সেনাপতি প্রমাদ গনিয়া স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে সেই উচ্চ পাহাড়ের গাত্রে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। সিপাহিদিগের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহারা লোকক্ষয় করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিল। দুইটি বড় তোপ কিছু রসদ গোলাগুলি বারুদ এবং পাঁচটি ছোট তোপ ইংরাজ

অধিকার করিলেন। গাজিউদ্দীন নগরের বা গাজিয়াবাদের প্রথম যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল বটে, কিন্তু ইংরাজ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে ইংরাজদলের বহু সেনা ও সেনানী হত হইয়াছিল—কাপ্তেন এন্ডরুজ ও তাহার অধীন চারিজন গোরা একটা বারুদপূর্ণ গাড়ি অধিকার করিতে যাইয়া গোলার আঘাতে একেবারে উড়িয়া গিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৫০ জন হইয়াছিল। একটা বাবলাগাছের তলায়, রাস্তার পার্শ্বে, হত ইংরাজ গোরাদিগকে এক সঙ্গেই গোর দেওয়া হইয়াছিল।

পরদিন রবিবার, কিন্তু রবিবারের প্যারেড ইংরাজের দলে হইল না—কেননা, তাহারা ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, সিপাহির দল আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। ঘটিলও তাহাই। সেই পূর্বেকার পাহাড়ের উপর সিপাহির দল আবার আসিয়া ঘাঁটি বসাইল। আবার পূর্ববৎ সেই উচ্চ স্থান হইতে তোপ দাগিতে লাগিল। এই দুই বারের কোন বারেই সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইতে সিপাহিগণ চেষ্টা করে নাই। তাহারা কেবল তোপ দাগিয়া, গোলাবৃষ্টি করিয়া ইংরাজকে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। দুই বারের কোন বারেই হিন্দনের লৌহ সেতু অধিকার করিবার চেষ্টা সিপাহি সেনাপতি করেন নাই। ইহা সত্য বটে যে, হিন্দন নদী না থাকিলে সিপাহির গোলাতে ইংরাজকে বিধ্বস্ত হইতে হইত, কিন্তু সিপাহি সেনাপতি এই হিন্দনের বক্রগতির হিসাব একেবারেই করেন নাই। যাহা হউক, আবার রবিবারে দুই প্রহরের পূর্বে সিপাহি সেনার দল গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। এবার সিপাহির তোপ মুহুর্মুহুঃ গোলা উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল। ইংরাজ সিপাহির এই গোলাবৃষ্টি সহিতে পারিল না। গ্রামের ভিতরে হটিয়া যাইয়া, গ্রামের গৃহাদির অন্তরালে থাকিয়া ইংরাজ সেনাদল সিপাহিদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং সিপাহির অবস্থানের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া আক্রমণ করিল। সিপাহিগণ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবে না, হইবার মানস করিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই—তাই ইংরাজের আক্রমণ পরিহার করিয়া দিল্লির পথে চলিয়া গেল। এবার কিন্তু ইংরাজ একটিও তোপ বা বন্দুক সিপাহিদিগের নিকট হইতে অধিকার করিতে পারেন নাই। ইংরাজের পক্ষে এবার পঞ্চাশের অধিক সৈনিক এবং চারিজন সেনানায়ক হত হইয়াছিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে বিষম তৃষ্ণায় ইংরাজ চমূ একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। ১লা জুন তারিখে সিরমুর হইতে মেজর চার্লস রিডের অধীন একদল গুর্খা আসিয়া যোগ দিল। এমন সময়ে প্রধান সেনাপতি বার্নার্ড হুকুম পাঠাইয়া দিলেন যে, মীরট সেনার দল একটু বাঁকিয়া ৭ই জুনের মধ্যে যেন আলিপুরে আসিয়া পৌছে। সিপাহিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি তোপ লইয়া যখন মীরটের ইংরাজ সেনাদল আলিপুরে আসিয়া পৌছিল, তখন ইংরাজ সেনাদল আনন্দে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিল।

সেনাপতি বার্নার্ড মীরটের সেনাদলকে সহায়রূপে পাইয়া এবং দিল্লির অবরোধ উপযোগী তোপ সকল হস্তগত করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দিল্লির দিকে অগ্রসর হইতে সঙ্কল্প করিলেন। দিল্লির সিপাহি সেনার দলও নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা বাদলি-কি-সরাই নামক স্থানে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছিল এবং উহার চারিপার্শ্বে পরিখা ইত্যাদি খনন করাইয়া স্থানটিকে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আরও কিছু অগ্রসর হইয়া বামে বা দক্ষিণে হেলিয়া বার্নার্ডের সেনাদলকে আক্রমণ করিবার সাহস কোন সিপাহি সেনাপতিরই হয় নাই। সেনাপতি বার্নার্ড ইচ্ছা করিলে বাদলি-কি- সরাইয়ের সিপাহির

আড্ডা বামে রাখিয়া দিল্লি আক্রমণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, গাজিয়াবাদ বা গাজিউদ্দীন নগরের যুদ্ধে সিপাহি দুইবার হারিয়াছে এবং সে পরাজয়ের বার্তা দিল্লির সিপাহির দলের মধ্যে প্রচারিতও হইয়াছে। আবার বাদলি-কি-সরাইতে যদি সিপাহিগণ পরাজিত হয়, তাহা হইলে দিল্লির সিপাহির দল অনেকটা উৎসাহহীন হইবে।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। সিপাহির দলের মধ্যে একজন স্বাবলম্বনযুক্ত বীর বা সেনাপতি ছিল না। সিপাহিদিগের সুবেদাব মেজর সমরচতুর হইলেও এবং রণবৃদ্ধ হইলেও তিনি চিরকালই যুদ্ধের এক দেশ দর্শন করিয়াছিলেন, আদেশ অনুসারে কার্য করিয়াছিলেন এবং অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়া প্রভুর কার্যে সফলতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেনাপতিকে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদর্শী হইতে হয়, তেমন, সর্বদিক প্রসারিণী দৃষ্টি সিপাহি সেনাপতিদিগের মধ্যে কাহারও ছিল না। যাহারা গোলন্দাজ, তাহারা অব্যর্থসন্ধান ছিল; দেহকে তুচ্ছ করিয়া তোপ দাগিতে পারিত। যাহারা অশ্বসাদী, তাহারা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া যাইতে পারিত। যাহারা পদাতি, তাহারা কেবল আক্রমণ করিতেই জানিত এবং অরাতিদলকে মথন করিতেই পারিত। কিন্তু সকল দলের সকল প্রকারের সেনা লইয়া কেমন করিয়া পরিচালন করিলে শত্রুকে বিধ্বস্ত করা যায়, গুপ্তচরের মুখে শত্রুর গতাগতির সমাচার পাইয়া তাহাকে কোথায় আক্রমণ করিলে তাহার শক্তি চূর্ণ করা সম্ভবপর হয়, সেনাধ্যক্ষে : এ সকল বিদ্যা সিপাহিদলের কাহারও ছিল না; থাকিলে গাজিউদ্দীন নগরের যুদ্ধ এমন ভাবে পরিসমাপ্ত হইত না। ইহার উপর আরও একটি কথা আছে—গোলন্দাজ, পদাতি, অশ্বারোহী এই তিন প্রকার সেনার দলের মধ্যে ঈর্ষা হিংসার ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। কখন গোলন্দাজ দল বলিত, "আমরাই লড়াই জিতিয়া আসিব, এ লড়াই আমরাই করিব", কখন বা অশ্বারোহীর দল বলিত যে, "আমরাই কেবল লড়াই করিব", কখনও কেবল পদাতিই অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিত। পরন্তু অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজ তিন দলে মিশিয়া এক সঙ্গে ও এক ভাবে এবং এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে নাই। তাই পদে পদে সিপাহিকে হারিতে হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় গোরা সেনাদলের ফুৎকারে সিপাহিবাহিনী উড়িয়া গিয়াছিল। এই বাদলি-কি-সরাইয়ের যুদ্ধের বিবরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কতটা মূর্খতাবশত এবং কতটা অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সিপাহি এমন দুর্গম অবস্থানকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আলিপুরের ইংরাজ সেনানিবাসে কথা উঠিল যে, বাদলি-কি-সরাইয়ে সিপাহির অবস্থান কেমন এবং কি ভাবেই বা সিপাহিরা ইংরাজের পথ আগুলিয়া আছে? অনুমানে এ সকল তো স্থির হয় না। গুপ্তচর আসিয়া নানা রকমের সংবাদ দিলে তখন নিজে গমন করিয়া একবার দেখিতে হয়। দেশ সিপাহি শত্রুতে পূর্ণ, দুই দশ জন লোক লইয়া বাদলি-কি-সরাইয়ে সিপাহির অবস্থান দেখিতে যাওয়াও বিপজ্জনক। লেফটেনান্ট হডসন বলিলেন, "আমি যাইব।" তাহার অধীনে ঝিন্দরাজের প্রেরিত ৮।১০টি সওয়ার ছিল। পরদিন অতি প্রত্যূষে ইংরাজ দেখিলেন যে, আলিপুরের দিকে ৭।৮ জন সিপাহি ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা তোপ তৈয়ার করিয়া তোপ দাগিবেন, এমন সময় চিনিতে পারিলেন যে, উহারা লেফটেনান্ট হডসনের দল। সারা রাত্রি ইহারা বাদলি-কি-সরাইয়ের চারিদিকে

ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, প্রত্যেক স্থান পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করিয়াছে এবং কোন দিক দিয়া কেমন ভাবে যাইলে সিপাহিকে পর্যুদস্ত করা যাইতে পারে, তাহাও ঠিক করিয়া আসিয়াছে। সিপাহিব পক্ষ হইতে কিন্তু এমন পর্যবেক্ষণকারীর দল ইংরাজের সেনা-অবস্থান দেখিতে আসে নাই। মিঃ কেবব্রাউন বলেন যে, সিপাহিগণ যদি যুদ্ধ না করিয়া কেবল ইংরাজের রসদ লুণ্ঠিত এবং ফেউয়ের মতো ইংরাজ সেনাদলের পিছনে লাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে সেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের দুর্বিষহ গ্রীষ্মে ইংরাজের দলকে বিনা যুদ্ধে শুকাইয়া মরিতে হইত। কিন্তু সিপাহির দল ইহার কিছুই করে নাই। তাহারা ভাঙ খাইত, সারানিশা মুজরাওয়ালীর গান শুনিত, আর যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরের ন্যায় ব্যর্থ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আত্মদান করিত।

বাদলি-কি-সরাইয়ে সিপাহিদিগের অবস্থান অতি সুদৃঢ় ও দুর্গমই ছিল। সরাই একটি চতুষ্কোণ বিরাট গৃহ; তাহার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ এবং মধ্যস্থানে বিশাল বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সিপাহিগণ এই সকল কক্ষ মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিয়াছিল সরাইয়ের সম্মুখে, রাস্তার উপর, সরাইয়ের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রকারের বালির বস্তা সাজাইয়া দুর্গম প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বালির বস্তার দ্বিতীয় প্রাচীরের উপর তাহারা চারিটি ভীমাকার কামান বসাইয়াছিল। ফলে সরাইয়ের সম্মুখে দিকটা শত্রুগণের আক্রমণের পক্ষে অসম্ভবই করিয়া তুলিয়াছিল। সরাইয়ের বামদিকে যমুনার লহর বহিয়া গিয়াছে; লহরের ছোট ছোট লহর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রসমূহকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। এই সকল মোড়ে মোড়ে "এড়ো" দেওয়াল তুলিয়া সিপাহিগণ এমন স্থান রচিয়াছিল যে, দেওয়ালের অন্তরালে শয়ন করিয়া শত্রুর উপর অনায়াসে গুলিবৃষ্টি করা যায়। ইহাকেই রাইফেল পিট বলে। সরাইয়ের দক্ষিণ দিকে গ্রাম ছিল; গ্রামের পার্শ্বে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এই গ্রামের মধ্যে ও জলার মধ্যে গম্বুজ করিযা সিপাহিগণ অনবরত পাহারা দিতেছিল। কিন্তু সরাইয়ের পশ্চাৎভাগে, দিল্লির দিকে; শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার কোন ব্যবস্থাই করে নাই। আর, জলাভূমির অপর দিকে, উত্তর-পশ্চিম বাহিয়া দূরে যে একটা রাজপথ ছিল, সেই পথ দিয়া ঘুরিয়া আসিলে একেবারে সরাইয়ের পশ্চাদ্দিকে আসা যাইত; এই পথের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সিপাহিগণ উদাসীন ছিল। হডসন এই পথ দেখিয়া এবং সিপাহির অধিষ্ঠানের এই দৌর্বল্য বুঝিয়া গিয়াছিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেনাপতি গ্রান্ট ৯ নম্বরের ল্যান্সার দলের তিনটি রেসালা, একদল ঘোড়ার তোপ ও কিছু এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী লইয়া অগ্রসর হইলেন। হডসন পথ প্রদর্শক হইলেন। পাছে শব্দ অধিক হয়, তাই তোপের গাড়ির চাকায় বিচালি বাঁধিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেক ঘোড়ার ক্ষুরে তুলা ও কাপড় দিযা বাঁধা হইল। পদাতি সেনা ছিল না, সুতরাং সে পক্ষে কোন ব্যবস্থাও করিতে হয় নাই। নিঃসঙ্কোচে ইংরাজবাহিনী সেই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিযামা অতীত হইলে বাদলি-কি-সরাইয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যমুনার লহরের উপর যে পুল ছিল, সে পুলে সিপাহি সান্ত্রী ছিল না; নিরাপদে ইহারা সে পুল অতিক্রম করিল এবং লহরেব দক্ষিণ তীর ধরিয়া ঘুরিয়া যাইয়া শত্রুব পশ্চাতের বাম অংশ অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। এদিকে প্রধান সেনাপতি বার্নার্ড অন্য সেনার দল লইয়া জলার অপর দিক দিয়া শত্রুর পশ্চাতের দক্ষিণ অংশ অধিকার করিতে অগ্রসর

হইলেন। আর, পদাতি সেনার দল এবং মেজর স্কটের ও কাপ্তেন মণির তোপ সম্মুখে সোজা পথে অগ্রসর হইল। সেনাপতি বার্নার্ড ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, ইংরাজের পক্ষের ভারী তোপ চারিটি সম্মুখ হইতে বাদলি-কি-সরাইয়ের বালির বস্তার উপর গোলা ফেলিতে থাকিবে; আর বামে ও দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত হালকা তোপ লইয়া সেনাপতি শাওয়ার্স ও সেনাপতি গ্রেভস আক্রমণ করিবেন। তাহা হইলে শত্রু বুঝিবে যে ইংরাজের আক্রমণ সম্মুখ এবং দুই পার্শ্ব হইতেই হইতেছে। সুতরাং পশ্চাদ্দিকের বা দিল্লির পথের দিকে তাহাদের দৃষ্টি থাকিবে না। ঘটিলও তাহাই। অতি প্রত্যূষে প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সেনা বাদলি-কি-সরাইয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনাপতি বার্নার্ড হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সেনাপতি গ্রান্ট প্রায় বেলা দশটার পূর্বে বাদলি-কি-সরাইয়ের পশ্চাতে দিল্লির পথে যাইয়া উপস্থিত হইবেন; আর সেনাপতি গ্রেভস বামদিক দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সেই সময়েই সেনাপতি গ্রান্টের সহিত সম্মিলিত হইবেন। সুতরাং তিনি প্রথমে কেবল তোপের লড়াই করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাহার তোপ সকল সরাইয়ের সম্মুখে বিন্যস্ত হইবার পূর্বেই যেন সহস্র বজ্রনির্ঘোষে সিপাহিদিগের চারিটি বড় তোপ হইতে অনবরত গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই গোলাবৃষ্টির ভঙ্গি দেখিয়া বার্নার্ড বুঝিলেন যে, সরাইয়েব সিপাহিদিগের মধ্যে গোলন্দাজের সংখ্যাই অধিক। সিপাহিদিগের কামান দাগিবার ভঙ্গি দেখিয়া সেনাপতি বার্নার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই শতমুখে তাহাদিগের প্রশংসা করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, যে ধনুরাকৃতি বস্তাভরা বালির প্রাচীর সিপাহিগণ তৈয়ার করিয়াছে, তাহার সম্মুখ দিকে সোজাসুজিভাবে আক্রমণ করিলে একটিও ইংরাজ গোলন্দাজ প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিবে না; তাই তিনি বামে ও দক্ষিণে তাহার ভারী তোপ সরাইয়া দুই পার্শ্বে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, সিপাহিদিগের অব্যর্থ লক্ষ্যে গোলার মুখে শত শত গোরা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বাদলি-কি-সরাইয়ের সম্মুখের প্রাচীর হইতে এক একবার আকাশ ভেদ করিয়া "হর হর মহদেও" ও "দীন দীন" শব্দ উঠিতে লাগিল, আর চারিটি ভীমাকার হাউইজার তোপ হইতে অগ্নি-জিহ্বাসকল বিস্তীর্ণ হইয়া গোলা উদ্গিরণ করিতে লাগিল। এক এক বার সিপাহির তোপের গোলা বাহির হয়, আর ইংরাজের দলের এক একটা কোম্পানি যেন মুছিয়া যায়। সেনাপতি বার্নার্ড দেখিলেন যে, আর দাঁড়াইয়া মার খাওয়া ও মরা চলে না। বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে, সূর্যকিরণের মুখে যেন অগ্নিমালা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সেনাপতি বার্নার্ড একটু অধীর হইলেন। এমন সময় দূরে বাদলি-কি সরাইয়েব প্রায় পশ্চাদ্দিকে আকাশমার্গ ভেদ করিয়া একটা ধূমরেখা দেখা দিল; দূরাগত তোপের ধ্বনি শুনা গেল। সেনাপতি বার্নার্ড বুঝিলেন যে, সেনাপতি হোপ গ্রান্ট তাহার নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়েই উপস্থিত হইয়াছেন। তখন সেনাপতি মহাশয় তোপের লড়াই বন্ধ রাখিয়া যে সকল অশ্বারোহী পিছু হটিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে বামে ও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে বলিয়া নিজে ৭৫নং রেজিমেন্ট সঙ্গে লইয়া সরাইয়ের সম্মুখভাগ আক্রমণ করিলেন। সিপাহিগণ দেখিল যে, পশ্চাতে দুই দিকে তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে—এক দিকে সেনাপতি গ্রেভস তোপ ও পদাতি সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার গোলার আঘাতে সরাইয়ের প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে; দক্ষিণ দিকে সেনাপতি হোপ গ্রান্ট অশ্বারোহী সেনা লইয়া দিল্লির পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন; সম্মুখে

সেনাপতি বার্নার্ড ভীম পরাক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। এইভাবে চারিদিকে আক্রান্ত হওয়াতে সিপাহিগণ বিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের তোপের খেলা ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হইল; আর এই ক্ষণেকের মধ্যে প্রধান সেনাপতি বার্নার্ড মহোদয় সসৈন্যে সিপাহিদিগের উপর আসিয়া পতিত হইলেন। এক দিকে সিপাহির তলওয়ার, অন্য দিকে ইংরাজের সঙ্গীন। সিপাহির তলওয়ারের এক এক আঘাতে গোরার হস্তের সঙ্গীন ও বন্দুক চ্যুত হইতে লাগিল—দলে দলে গোরা পড়িতে লাগিল। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে সেনাপতি গ্রেভসের তোপের গোলা এই সময়ে তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। সিপাহির দল আর স্থির থাকিতে পারিল না, তলওয়ার ফেলিয়া পলায়ন করিবার উদ্‌যোগ করিল। এই সময়ে সেনাপতি হোপ গ্রান্টের অশ্বারোহী গোরার দল আসিয়া বল্লমের মুখে সিপাহিগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বাদলি-কি-সরাইয়ের সিপাহিগণ বিভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। পথ, ঘাট, গ্রাম সিপাহির মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গেল। সেনাপতি গ্র্যান্ট অদম্য সাহসে পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং দিল্লির পথ সম্পূর্ণরূপে শত্রুশূন্য করিলেন।

এইরূপে বাদলি-কি সরাইয়ের যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের বহু সেনা মরিয়াছিল, আর সিপাহি পক্ষের প্রায় সকল সেনাই ধরাশায়ী হইয়াছিল। বাদলি-কি-সরাইয়ের তোপ, বন্দুক, গোলা, গুলি বারুদ প্রভৃতি সর্বস্বই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজ দিল্লি অবরোধের পথ সুপ্রসর করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিপাহির দল কিছুকালের জন্য মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধের জয়বার্তা ভারতে প্রচারিত হইলে ইংরাজ মাত্রেরই মনে দশ হস্তীর বল সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরিণামে ইংরাজ দিল্লি পুনরধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

দুইটি ভুলের জন্য সিপাহিগণ বাদলি-কি-সরাইয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। প্রথম ভুল, পশ্চাদ্দিকে দিল্লির পথ যথারীতি রক্ষা না করা, পলায়নের পথ পরিষ্কার না রাখা। দ্বিতীয় ভুল, একটা সরাইয়ের মধ্যে এমন ভাবে গড়খাই করিয়া আবদ্ধ থাকা। সিপাহিগণ যদি বাদলি-কি-সরাইয়ের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ইংরাজের পশ্চাদ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে সম্মুখ সমরে ইংরাজকে আহ্বান করিত, তাহা হইলে এমন সর্বনাশ সিপাহির দলে ঘটিত না। পূর্বেই তো বলিয়া রাখিয়াছি যে, সিপাহিদিগের মধ্যে সমরচতুর, সর্বদর্শী যোদ্ধা কেহ ছিলেন না। সিপাহিরা ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে, ইংরাজ কেবল গোলন্দাজিতে তাহাদের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বাদলি-কি-সরাইয়ের যুদ্ধে তাহারা বুঝিল যে, ইংরাজ প্রকৃতই সমরচতুর বটে। এই যুদ্ধে সিপাহিগণ যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, দিল্লির অবরোধের সময়ে তদনুরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিলে অনেক লাভ হইত। কিন্তু এই এক পরাজয়ে দিল্লির সিপাহির দল সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আর, ইংরাজ এই বিজয়ের প্রভাবে হেলায় দিল্লি অবরোধ ও কিছুকালের মধ্যে অধিকার করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

দিল্লির অবরোধের পূর্বের নানাকথা

কিংবদন্তী আছে যে, ৩১শে মে তারিখে রবিবারে উত্তর ভারতের সর্বত্র এক সময়ে সিপাহিগণ বিপ্লব ঘটাইবে, কিন্তু ১০ই ও ১১ই মে তারিখে সিপাহি কর্তৃক দিল্লি অধিকারের কথা শুনিয়া সিপাহির পক্ষের লোকও চমকিত হইয়া উঠিল, বিপক্ষ অর্থাৎ গবর্নমেন্ট পক্ষ ভীত, ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কেননা, এক সঙ্গে, একই সময়ে ভারতময় সমাচার প্রচারিত হইল যে, মীরটে সিপাহির দল বিপ্লব করিয়াছে, ইংরাজ কর্মচারিগণকে খুন করিয়াছে, দিল্লি আক্রমণ করিয়াছে এবং বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে আবার ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই সকল সমাচার পাইয়া গবর্নমেন্ট পক্ষ ভাবিলেন যে, বিপ্লবের পক্ষে যাহা থাকে থাকুক, সিপাহি দমনের চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করায় না জানি ভারতবাসীর মন কেমন ভাবে বিচলিত হইয়াছে। তখনও চারিদিকে দিল্লিপতির নামের অতীত গৌরবের স্মৃতি অতি প্রোজ্জ্বল ছিল, তখনও বাদশাহের নাম করিলে ভারতবাসীর উন্নত মুণ্ড সসম্মানে অবনত হইত, তখনও মোগল রাজ্যের স্মৃতির সঙ্গে কি জানি কেমন একটা মোহ ভারতবাসীর মনকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলেন, এই সমাচার শুনিয়া যদি ভারতের লোকসংঘ সেই পুরাতন মোহে আবার উত্তেজিত হইয়া উঠে, সেই অতীত গৌরবের স্মৃতির উদ্রেকে আবার উন্মত্ত হইয়া উঠে, সেই শঙ্কায় বড়লাট লর্ড ক্যানিং হইতে প্রত্যেক ইংরাজই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। লর্ড ক্যানিং এবং তাহার খাস মজলিসের সদস্যগণ আদৌ মনেই করিতে পারেন নাই যে, এমন ভাবে সিপাহিগণ বিপ্লব ঘটাইবে। এমন কি, বড়লাটের সভার সমর-সচিব সেনাপতি লো ভাবিয়াছিলেন যে, সিপাহিদিগের মনে ইংরাজবিদ্বেষ যত থাকুক আর না থাকুক, জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা অত্যধিক আছে। কিন্তু মীরটের ও দিল্লির সমাচার শুনিয়া লাট কাউন্সিলে বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছিল। তবে লর্ড ক্যানিং সকল সমাচার পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা একটা সামান্য বিদ্রোহ বা বিপ্লব নহে, একটি শ্রেণির অভ্যুত্থান। লর্ড ক্যানিং ১৪ই মে তারিখে দিল্লির স্বাধীনতার সমাচার প্রাপ্ত হইলেন। ১৫ই ও ১৬ই তারিখে দিল্লিতে মোগল সাম্রাজ্যের ঘোষণা ও ইংরাজ-হত্যার সমাচার পাইলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, ব্যাপার বড় বিষম। বুঝিলেন, দেশের লোক যদি সিপাহিদিগের সহিত যোগ দেয়, তাহা হইলে ভারতে ইংরাজের প্রাধান্য রক্ষা করা কোনমতেই সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু তবুও চেষ্টা তো করিতে হয়। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ বোম্বাই লাট লর্ড এলফিনস্টোনকে তারে সমাচার পাঠাইলেন যে, যেমন করিয়া হউক পারস্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী ইংরাজ সেনাদলকে যেন দিল্লির পথে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের চিফ কমিশনার

স্যর জন লরেন্সকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাহাকে দিলেন, অর্থাৎ স্যর জন লরেন্সকে আর বড়লাটের মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য করিতে হইবে না, এই ব্যবস্থা করা হইল। রেঙ্গুনে ৮৪নং গোরা রেজিমেন্ট ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল, তিনি সেই হুকুম রদ করিয়া এই রেজিমেন্টকে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন এবং রেঙ্গুন ও মৌলমীন হইতে আর দুইটি রেজিমেন্ট পাঠাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। লর্ড কানিং মান্দ্রাজ গবর্নর লর্ড হ্যারিসকেও সংবাদ পাঠাইলেন যে, মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে যেন দুইটি গোরা রেজিমেন্টকে যেমন করিয়া হউক উত্তরে আর্যাবর্তে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে চীনদেশে ইংরাজ একটা অভিযান করিয়াছিলেন, লর্ড ক্যানিং সেই অভিযানের কর্তা লর্ড এলগিনকে এবং সেনাপতি এশবারণহামকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাদের অধীনে যত গোরা সেনার দল আছে, সকলকেই ভারত রক্ষার জন্য যেন ভারতের দিকে পাঠান হয়। এই সঙ্গে তিনি বিলাতেও তারযোগে সকল কথা জানাইলেন এবং মন্ত্রিসমাজকে অনুরোধ করিলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভবপর হয়, তত শীঘ্র যত অধিক সংখ্যক গোরা সেনা তাহারা পাঠাইতে পারেন, তত সেনা যেন অব্যাজে ভারতে পাঠান হয়। বিলাত হইতে ইংরাজ সেনার আগমন সময়সাপেক্ষ মনে করিয়া লর্ড ক্যানিং দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে সেনা সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য একজন প্রতিনিধিকে পাঠাইলেন। এই ভাবে লর্ড ক্যানিং ভারতে ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য, শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন।

পাছে সিপাহিদিগের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বর্ণনায় উন্মত্ত হইয়া গোরা সেনার দল এতদ্দেশীয় সেনার উপর অতিমাত্রায় উপদ্রব ও উৎপীড়ন করে, সেই শঙ্কা নিরাকরণের জন্য লর্ড ক্যানিং আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোন গোরা যেন কোন দেশীয়ের উপর উৎপাত উপদ্রব না করে, বিনা বিচারে যেন ভারতবাসীকে দণ্ডিত করা না হয়, কোন গ্রাম বা প্রদেশ যেন লুণ্ঠিত না হয়, স্ত্রীজাতির উপর যেন কেহ হস্তক্ষেপ না করে। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সিপাহিরাই বিদ্রোহী হইয়াছে, দেশবাসিগণ নহে; সুতরাং অস্ত্রপাণি সিপাহিদিগকে দেখিতে পাইলেন তাহাদিগকে সামরিক বিধান অনুসারে দণ্ডিত করা চলিবে, কিন্তু নিরীহ গ্রামবাসীদিগের উপর যেন কোনরূপ উৎপীড়ন না হয়। এই প্রকারের ঘোষণা করিয়া লর্ড ক্যানিং ভাবিলেন যে, এ দেশের লোকে ভারতীয় প্রজা সহসা আব সিপাহির দলভুক্ত করিয়া ইংরাজের সহিত বিরোধ ঘটাইবে না। লর্ড ক্যানিং-এর এই অনুমান ব্যর্থ হয় নাই।

লর্ড ক্যানিং আর একটি চাতুরীর কার্য করিয়াছিলেন। তিনি সর্বাগ্রে নেপালের সহায়তা প্রার্থনা করেন এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী মহারাজ জঙ্গ বাহাদুরকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান। নেপাল, তথা মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর এবং নেপালের দুর্মদ গুর্খা সেনা ইংরাজের সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। উপযুক্ত, মিষ্টভাষী, রাজনীতিচতুর দূত পাঠাইয়া লর্ড ক্যানিং রাজস্থানের রাজন্যবর্গকে হস্তগত করিলেন। রাজোয়াড়ার রাজপুতগণকে মনে করাইয়া দিলেন যে, আমীর খাঁ ও তাহার অধীন মুসলমান পাঠানদিগের এবং মারাঠাগণের ভীষণ উপদ্রব হইতে ইংরাজই রাজস্থানকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; রাজপুতের হৃদয় অকৃতজ্ঞ নহে, সে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার এই

উপযুক্ত সময়; এই সময়ে তাহারা আর কিছু না পারুন, বিদ্রোহীদিগের সহায়তা না করিলেই লর্ড ক্যানিং কৃতকৃতার্থ হইবেন। রাজস্থান এবং রাজোয়াড়ার বীরগণ ইংরাজ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিপত্র লর্ড ক্যানিংকে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে গোয়ালিয়রে জিয়াজি রাও সেঁধিয়া মহারাজ ছিলেন। লর্ড ক্যানিং তাহাকেও বলিয়া পাঠাইলেন যে, "একদিন তুমি ইংরাজের মুষ্টিবদ্ধ মূষিকের ন্যায় হইয়াছিলে, ইংরাজ দয়া করিয়া তোমার পিতৃবাজ্য তোমাকে পুনরর্পণ করেন। আজ সেই ইংরাজ বিপন্ন; এই বিপদের সময় আমাদিগের সহায়তা কর।" জিয়াজি রাও বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমার" তরবারি ও আমার দেহ ইংরাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু আমার সৈনিকবর্গ এখন আর আমার অধীন নহে, তাহারা বিপ্লব ঘটাইয়াছে, কিন্তু তবুও আমি প্রাণপণ করিয়া ইংরাজের সেবা করিব।" এইরূপে দক্ষিণে নিজাম, মধ্যপ্রদেশে ইন্দোরের হোলকার, গুর্জরের ক্রোড়ে বরোদার গায়কোবাড়, ত্রিবাঙ্কুর ও উত্তরে কাশ্মীর কাবুল প্রভৃতি নানা দেশের এবং সামন্ত রাজন্যবর্গের নিকট লর্ড ক্যানিং পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সকল পত্রেই তাঁহার একই কথা—"পার যদি সদলবলে আসিয়া ইংরাজের সহায়তা কর, আর তাহা যদি না পার, তবে কোন পক্ষই অবলম্বন করিও না, নিরপেক্ষভাবে সিপাহি ও গোরার যুদ্ধ অবলোকন কর।" লর্ড ক্যানিঙের এই চেষ্টায় সুফল দেখিয়াছিল। ভারতের সামন্ত রাজন্যবর্গ কেহ বা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, কেহ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুদ্ধ করিয়া ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে হাতুয়ার মহারাজ ছত্রধারী সিং এবং গিধোড়ের মহারাজ জয়মঙ্গল সিং উভয়েই সসৈন্যে ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। শতদ্রুর পূর্ব তীরের ঝিন্দ, নাভা ও পাতিয়ালা এই তিন শিখ রাজ্যের নরপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের পর্যাপ্ত সহায়তা করিয়াছিলেন। নেপাল হইতে স্বয়ং মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর সসৈন্যে অযোধ্যায় অবতরণ করিয়া অযোধ্যা উদ্ধারের পথ সুপ্রসর করিয়াছিলেন।

মিঃ জন পিটার গ্রান্ট প্রমুখ সেই সময়ের মনস্বী রাজনীতিকগণ বলেন যে, রাজস্থানের একটা রাজপুত রাজা অথবা স্বয়ং গোয়ালিয়রের মহারাজ, অথবা মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর যদি ইংরেজ বিপক্ষতাচরণ করিতেন, সিপাহিদিগকে স্বীয়দলভুক্ত করিয়া মহারণ প্রাঙ্গণে পরিচালিত করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত। অথবা যদি সেই সময় কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ ইংরেজের সহিত পুরাতন বান্ধবতার কথা ভুলিয়া যাইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইংরাজকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইত। কিন্তু এত উদ্‌যোগ আয়োজন করিয়াও লর্ড ক্যানিং নৈরাশ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। তিনি ভারতের মানচিত্র সম্মুখে খুলিয়া দেখিলেন যে, কলিকাতা হইতে দানাপুর পর্যন্ত এই বিশাল ভূভাগের মধ্যে একটিও গোরা সৈন্য নাই। দানাপুরে এক রেজিমেন্টের এক অংশ ছিল মাত্র, কাশীতে একটিও গোরা ছিল না, এলাহাবাদে জনকয়েক মাত্র দুর্গরক্ষা করিতেছিল, লখনউতে জনকয়েক মাত্র গোরা ছিল, পরন্তু যেখানে গোরার অত্যধিক সমাবেশ—কানপুর, মীরট ও দিল্লি—সেই তিন স্থানেই বিপ্লবের বহ্নিশিখা লহ লহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সর্বাগ্রেই দিগ্‌দেশকে দাহন করিতেছিল, তাই লর্ড ক্যানিং বুঝিয়াছিলেন যে অন্তত তিন মাস কাল তাহাকে সিপাহিদিগের মার

খাইতে হইবে। আগস্ট মাসের শেষে নানা দিক হইতে গোরা সেনা আসিতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বে যে, জুন ও জুলাই মাসে কেবল ইংরেজকে ঘাঁটি আগলাইয়াই থাকিতে হইবে।

অন্য দিকে নানা ধন্দুপন্থের এবং ঝাঁসির রানির প্রতিনিধিগণ ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাহারাও জনে জনে প্রত্যেক রাজদরবারে যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার দোহাই দিয়া, জানু পাতিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেক দরবার হইতে একই উত্তর পাইয়াছিলেন। সে উত্তর এই :—"তোমাদের গুরু শিষ্যে যুদ্ধ, তোমাদের প্রতাপেই আমাদিগের এত ক্ষমতা-সঙ্কোচ, তোমরাই ইংরাজের হইয়া ভারতের সকল উচ্চ মুণ্ড ধুলায় লুটাইয়াছে. আমাদিগকে হতমান করিয়াছে, তোমরা সমর বিদ্যায় ইংরাজের শিষ্য, ইংরাজ তোমাদের গুরু, আমরা প্রথমে দেখিতে চাই যে গুরু বড়, কি শিষ্য বড়। সুতরাং দুই চারিটি যুদ্ধে ইংরাজকে পরাজিত না করিলে আমরা তোমাদিগের পৃষ্ঠপোষক হইব না।" এই ভাবের উত্তর কেবল বাংলার পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিং এবং সাহাবাদ জেলার জগদীশপুরের বাবু কুমার সিং (কুয়র সিং) দেন নাই। মহাবীর কুমার সিং ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কি বলিব আমার বার্ধক্য আসিয়াছে, যে সময় শস্ত্রপাণি হইলে লোকের নিকটে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, আমার সেই সময় আসিয়াছে. তাই ভয় হয় বুঝি বা সাধ মিটাইয়া তোমাদের সহিত মিলিতে পারিব না। এতদিন, এতকাল কেবল সময়ের ঢেউ গনিয়া আসিয়াছি, কখনও অবসর পাই নাই। মা কালী যদি অবসর দিলেন, তবে এ জরাজীর্ণ অবস্থায় দিলেন কেন? ক্ষত্রিয় আমি আমার এই দুই বাহুতে কত বল ধারণ করে, তাহা তো ভারতবাসীকে দেখাইতে পারিলাম না। কিন্তু আমি মরিতে পারি ও জানি। মানুষের মতো মরিতে পারিব জানিয়া এতদিনে আমি সুখবোধ করিলাম। কিন্তু ক্ষোভ কি জান? "সারা হিন্দুস্থান গিধড় বন গিয়া"!—সমগ্র ভারতবর্ষ ফেরুপালে পূর্ণ হইয়াছে। মানুষ তো নাই, আর সকল দেশের সকল প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, মনুষ্যত্বের সকল জ্যোতি নির্বাপিত হইয়াছে। কি আর করিব, এই শ্মশানেই মায়ের খেলা শেষ করিয়া জীবলীলার পরিসমাপ্তি করিব।"

সিপাহিদলের প্রতিনিধিগণ এইভাবে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন; সমগ্র সিপাহি চমু একজন অতিরথ সেনানায়ক বাছিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। উহাদের দলের মধ্যে পরামর্শের একাগ্রতা ছিল না, কাহারও এ কার্যে একনিষ্ঠা ছিল না, সকলেই যেন উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল। সেনাপতি আউটরাম বলেন যে, সিপাহিগণ যদি কুমারসিংহকেও সেনাপতি করিত, তাহা হইলেও ব্যাপার বড় বিষম হইয়া পড়িত; কেননা, তাহার বিশ্বাস যে, উত্তর ভারতে এক কুমার সিং ব্যতীত আর কেহই রণবিশারদ ছিলেন না। কুমার সিংহের এই রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় আমরা পরে দিব।

এদিকে কলিকাতা রাজধানীতে মীরট ও দিল্লির হাঙ্গামার সমাচার আসিয়া পৌঁছিতেই একটা অতি ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ইংরাজ নরনারী প্রাণভয়ে কেহ বা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে, কেহ বা জাহাজে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। রাত্রিতে কোন ইংরাজ নিজের বাটীতে শয়ন করিতেন না। অপরিচিত কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির হস্তের জল পর্যন্ত তাহারা পান করিতেন না। কেহ দেশীয় লোকের দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন না। "ইংলিশম্যান" প্রমুখ ইংরাজী খবরের কাগজে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের কথা প্রতিদিনই প্রকাশিত

হইত। কেহ কেহ পরামর্শ দিতেন যে, ইংরাজ মাত্রেরই হাতে রিভলবার দেওয়া হউক। কালা আদমি ইংরাজের সহিত অসদ্ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিবার ব্যবস্থা হউক। প্রতিদিনই এইরূপ হুজুগের খবর কলিকাতায় বাহির হইতে লাগিল। শেষে শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে এতই বিরোধ উপস্থিত হইল যে, উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে একটা ফ্যাসাদ না ঘটিয়া আর যাইত না। একদিন গুজব উঠিল যে, বড়বাজারের হিন্দুস্থানী ও কাবুলিওয়ালারা নগর লুঠ করিবে। এমনই ভাবে নিত্য নূতন গুজব উঠিতে লাগিল। আর, সাহেবপাড়ায় প্রত্যহ প্রহরে প্রহরে বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। লর্ড ক্যানিং দেখিলেন যে, ব্যাপার একটু মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিতেছে, তাই তিনি ইংরাজী সংবাদপত্রে লেখা একটু সংযত করিবার জন্য আদেশ করিলেন; ইংরাজদিগের চাঞ্চল্য দেখিয়া একটু তীব্র কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং তাহাদের মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে বিনা বিচারে, কৃষ্ণাঙ্গই হউক বা শ্বেতাঙ্গই হউক, কেহই দণ্ডিত হইবে না। বিশেষত শ্বেতাঙ্গ যদি কৃষ্ণাঙ্গের উপর উৎপাত উপদ্রব করে, তাহা হইলে শ্বেতাঙ্গকে অধিকতর মাত্রায় দণ্ডভোগ করিতে হইবে। লর্ড ক্যানিঙের এই ধমকে ইংরাজ সমাজের উদ্বেগ অনেকটা প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু তাহাকে স্বজাতীয়গণের নিকট হইতে গালি খাইতে হইল। খবরের কাগজে তাহাকে Clemency Canning অর্থাৎ দয়ালু ক্যানিং বলিয়া ঠাট্টা করা হইল। এ সকল তীব্রোক্তিই তিনি সহিয়া রহিলেন এবং কিসে দিল্লির অবরোধ শীঘ্র শেষ হয়, মীরাটের প্রতিশোধ শীঘ্রই লওয়া হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিল্লির অবরোধ—প্রথম স্তর

বাদলি-কি-সরাইয়ের যুদ্ধে জয়ী হইয়া সেনাপতি বার্নার্ড সেই রৌদ্রে, সেই অসহ্য গ্রীষ্মে দিল্লির পথে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রচার করিলেন। রণশ্রান্ত সেনাদিগকে শ্রান্তিদূর করিবার জন্য একটু অবসরও দিলেন না। শ্রান্ত ক্লান্ত, গ্রীষ্মে অবসন্ন ইংরাজ সেনার দল বাদলি-কি-সরাইয়ের শীতল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সবাইকে একরূপ তোপে উড়াইয়া দিয়া অগ্রসর হইল। কতকদূর কুচ করিয়া যাইবার পর তাহারা একটি "তে-মাথা" পথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল, দুই দিকে দুইটি পথ গিয়াছে। একটি পথ সোজা দিল্লি নগরে প্রবেশ করিয়াছে, আর বামের পথটি দিল্লির ক্যান্টনমেন্ট বা পুরাতন সেনানিবাসের দিকে গিয়াছে। সেই তে-মাথা পথ হইতেই সেনাপতি বার্নার্ড দেখিতে পাইলেন যে, দিল্লির বাহিরে রীজ বা পাহাড়ের উপর সিপাহিগণ স্থানে স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে; যেখানে যেভাবে সেনাবিন্যাস করিলে শত্রুর আগমন অনায়াসে রোধ করা যায়, ঠিক সেইখানে সেই ভাবে সেনাবিন্যাস করিয়াছে এবং তোপ সকল সাজাইয়া রাখিয়াছে। কোন স্থানেই কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইল না। তবে সেনাপতি বার্নার্ড বুঝিলেন যে, রীজ বা পাহাড়ের উপর যে সকল সিপাহি আড্ডা লইয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই গোলন্দাজ শ্রেণিভুক্ত, একটিও অশ্বারোহী বা পদাতি নাই। ইহারা তোপ ছুড়িতে জানে, একটা স্থান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার রীতি ইহারা জানে না। তাই তিনি নিজের সেনাদলের মধ্যে দুইটি বাহিনীর সৃষ্টি করিলেন। একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিজে হইলেন; তাঁহার অধীনে ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস পদাতি দলের সেনানীরূপে, কাপ্তেন মণি ঘোড়ার তোপের সেনানীরূপে, এবং নয় নম্বরের ল্যান্সার অশ্বারোহীদল প্রধান সেনাপতির আদেশের অধীনে রহিল। অন্য বাহিনীর অধিনায়ক হইলেন ব্রিগেডিয়ার উইলসন। তাঁহার অধীনে ব্রিগেডিয়ার শাওয়ার্স পদাতি সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন এবং অন্য অশ্বারোহী ও গোলন্দাজের দল সেনাপতি উইলসনের অধীনেই রহিল। প্রধান সেনাপতি বার্নার্ড আদেশ করিলেন যে, সেনানায়ক শাওয়ার্স তাঁহার পদাতি সেনা লইয়া দিল্লি নগরের পথ অবলম্বন করুন, এবং শব্জীমণ্ডী নামক নগরোপকণ্ঠ অধিকার করুন। সিরমুর হইতে যে সেনাদল আসিয়াছিল, সেই সেনাদলকে এই দুই বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক রাখিবার জন্য তিনি ছড়াইয়া পড়িতে বলিলেন। সেনাপতি বার্নার্ড দেখিলেন যে, নগরের দিকে শব্জীমণ্ডী অধিকার করা যেমন প্রয়োজন, সেনানিবাসের দিকে হিন্দুরাওয়ের বাড়ি অধিকার করাও তেমনই প্রয়োজন। হিন্দুরাও একজন মারাঠা সেনানায়ক ছিলেন। বহুকাল পূর্বে ঐ স্থানে নিজের আবাস ভবন তৈয়ার করিয়াছিলেন। বাড়িটি প্রস্তর নির্মিত, একতলা এবং বহুদূর বিস্তৃত।

এই বাড়িটি অধিকার করিতে পারিলে সিপাহিদিগের রীজের উপরের অবস্থানগুলি ইংরাজের গোলার আয়ত্তে (range) মধ্যে আসিয়া পড়ে। ফলে মে মাসের সেই ভীষণ রৌদ্রে প্রাহ্নকালে সেনাপতি বার্নার্ড হিন্দুরাওয়ের বাড়িটি অধিকার করিবার উদ্‌যোগ করিলেন এবং উহাকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থাও করিলেন।

যেখানে রীজের উপর ইংরাজের ধ্বজা তুলিবার পুরাতন গম্বুজ ছিল, সেইখানে সিপাহিদিগের একটা বড় আড্ডা হইয়াছিল। সেই আড্ডার সিপাহি সেনানায়ক সেনাপতি বার্নার্ডের মতলব বুঝিয়া ইংরাজ সেনাদলের উপর অনবরত গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পূর্বে গাজিউদ্দীন নগরের যুদ্ধে সিপাহি যে ভ্রম করিয়াছিল, এখানেও তাহারা সেই ভ্রমে পতিত হইল। রীজ বা পাহাড় হইতে প্রায় ১২০০ গজ পশ্চিমোত্তর দিকে একটা অতি গভীর খাদ বা নালা ছিল। এই নালা যেমন গভীর, তেমনই সুপ্রসর ছিল। ইহার উপর শব্জীমণ্ডীর দিকে একটি ইষ্ট নির্মিত পুল ছিল। সিপাহিগণ এই পুল তাড়াতাড়ি ভাঙিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু সবটা ভাঙিতে পারে নাই। ভাঙা পুলের যেটুকু বাকি ছিল, অনায়াসে তাহার উপর দিয়া অশ্বারোহী, পদাতি এবং ভারী তোপের গাড়ি পর্যন্ত পার হইতে পারিত। এই পুলের উপর সিপাহিগণ অনরবত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু সিপাহির গোলা পুলের ভগ্নাংশের দিকেই আসিয়া পড়িতে লাগিল, যেটুকু অভগ্ন ছিল, সেটুকু ভগ্নাংশের স্তূপীকৃত ইষ্টকাদি দ্বারা রক্ষিত ছিল। ইংরাজ সেনার দল এই সুবিধাটুকু পাইয়া এই পুলের উপর দিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। কাপ্তেন মণি আর বেশি রণচাতুরী দেখাইলেন না, তিনি নিশ্চিন্তমনে তাঁহার ঘোড়ার তোপ ও অন্য ভারী তোপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইবার সময় সিপাহির তোপের কয়েকটি ছুটা গোলায় তাঁহার দলের অনেকে হতাহত হইল। এই নালার অপর পার্শ্বে রীজের দিকে জমি একটু উঁচু ও বন্ধুর ছিল। কাপ্তেন মণি নালা পার হইয়া একটা নিম্ন ভূমির আশ্রয় লইয়া নিজের বড় তোপ সাজাইলেন এবং সেইখান হইতে সিপাহির ঘাঁটির উপর গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ৬০ নম্বরের রাইফেল রেজিমেন্ট এবং ২ নম্বরের বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্স কাপ্তেন মণির তোপ সকলকে বামে রাখিয়া রীজ বা পাহাড়ে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। সিরমুরের সেনাদল সম্মুখ দিক দিয়া আক্রমণ করিল। পক্ষান্তরে সেনাপতি উইলসন শব্জীমণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেই গ্রামের প্রত্যেক গৃহেই বন্দুকধারী পদাতি সিপাহি প্রচ্ছন্ন ছিল—তাহারা সেই সকল গৃহ হইতে সেনাপতি উইলসনের সেনাদলের উপর অজস্র গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাতে সেনাপতি উইলসনের দলের অনেক গোরা হত হইল। কিন্তু সেনাপতি উইলসনের দল অগ্রসর হইতে ছাড়িল না। শব্জীমণ্ডীর এক একটি করিয়া সকল গৃহই তাহারা অধিকার করিল। এই গ্রামেই সিপাহিরা একটি নয় সের ওজনের গোলা প্রক্ষেপকারী তোপ ছাড়িয়া গিয়াছিল। ইংরাজ সেনানায়ক তাহা অধিকার করিলেন। এইভাবে গ্রামকে বিধ্বস্ত করিয়া শব্জীমণ্ডী ভেদ করিয়া সেনাপতি উইলসনের সেনার দল রীজ বা পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যস্থলে হিন্দুরাওয়ের বিশাল ভবন। কিন্তু দুই দিক হইতে সিপাহির গোলা ও গুলি যেন শিলাবৃষ্টির ন্যায় অনবরত পতিত হইতেছিল, একটি মক্ষিকাও যে সে পথে অগ্রসর হইবে, সে সম্ভাবনাও ছিল না। তবে অপর পার্শ্বে সেনাপতি বার্নার্ড যে ভাবে তোপ সাজাইয়া সিপাহিদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহাতে

সিপাহিগণ বহুক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। এই সময়ে যদি সিপাহিদিগের পক্ষ হইতে দুই দল অশ্বারোহী ও পদাতি ইংরাজের দুই দলকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সেইখানেই সেই দিন ইংরাজ সেনাদল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইত। যুদ্ধজয়ের শুভ অবসর বিধাতা সমভাবে ইংরাজ ও সিপাহিকে প্রদান করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সিপাহির সেনাবিন্যাস দুর্গম স্থানেই ছিল। কিন্তু এ অবসর যেরূপে আয়ত্ত করিলে রণজয়ী হওয়া যায়, সিপাহির সেরূপ বিদ্যা ও মেধা ছিল না। সেনাপতি বার্নার্ড অবসর বুঝিয়া সেই ভীষণ গ্রীষ্মের অস্তগমনোন্মুখ সূর্যকে পশ্চাতে রাখিয়া, সারাদিন অনাহারে ও পিপাসায় শ্রান্ত হইয়াও যেন সর্বস্বপণ করিয়া হিন্দুরাওয়ের ভবন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের সেই দুই দিকের দুর্বার আক্রমণের প্রভাবে সিপাহি আর স্থির থাকিতে পারিল না—হিন্দু রাওয়ের ভবন ইংরাজ জয় করিলেন। দিল্লি নগরের সম্মুখে ইংরাজের অবরোধকারী সেনাদলের বিন্যাস হইল। পরন্তু এই রণবিজয়ে ইংরাজ পক্ষেব ৬০ জন বীর ধরাশায়ী হইয়াছিলেন এবং ১৩০ জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছিলেন। মৃতের মধ্যে ছিলেন কর্ণেল চেষ্টার, ইনি ইংরাজ সেনাদলের এডজুটেন্ট জেনারেল ছিলেন এবং ইহারই বুদ্ধি প্রভাবে ইংরাজের দল বড় বড় তোপ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। সেনাপতি বার্নার্ড কর্নেল চেষ্টারের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, একটা বাহিনী নষ্ট হইলে আমাদের যত ক্ষতি না হয়, কর্নেল চেষ্টারের মৃত্যুতে আমাদিগের দলের ততোধিক ক্ষতি হইয়াছে।" এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজ সিপাহিদিগের নিকট হইতে ১৩টি তোপ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি খুব বড় তোপ ছিল। এই দুইটি তোপে ১২ সের ওজনের গোলা ছোড়া যাইত। সিপাহিদিগের দলে প্রায় সহস্র লোক মরিয়াছিল; যাহারা পরাজিত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, তাহারা কেহই দিল্লিতে পুনঃপ্রবেশ করে নাই। এই ভাবে ইংরাজ পক্ষ হিন্দু রাওয়ের গৃহ অধিকার করিয়া দিল্লি প্রবেশের একটি ঘাঁটির স্থান আয়ত্ত করিলেন।

ইংরাজ সেনার নুতন অবস্থান। পূর্বেই হিন্দু রাওয়ের গৃহের একটু পরিচয় দিয়াছি। ইহা প্রস্তরনির্মিত একটি বিশাল ভবন। পুরাকালে ইহা কোন মারাঠা সর্দারের বাসস্থান ছিল। এই ভবনটি রীজের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। হিন্দু রাওয়ের এই বাড়ির পার্শ্ব দিয়াই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। এইবার রীজেব একটু পরিচয় দিব। এই রীজ বা পাহাড় উত্তরে যমুনার তীর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আড়াই মাইল পথ দিল্লির চারিদিকে অর্ধচন্দ্রকারে ঘুরিয়া আসিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার উচ্চতা ৬০ ফিটের অধিক হইবে। এই পাহাড় বা রীজ কতকটা দিল্লির প্রাচীরের কার্য করিত। সিপাহিগণ যুদ্ধ করিতে জানিলে এবং রণপণ্ডিত হইলে এই পাহাড় বা রীজ কিছুতেই ইংরাজের হস্তগত হইতে দিত না। যাহা হউক, সেনাপতি বার্নার্ড এই রীজ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার মানসে মাঝে মাঝে, যেখানে ঢালু ছিল, সেইখানে এক একটা তোপের আড্ডা কবিলেন, অর্থাৎ চারি পাঁচটি তোপ একস্থানে সাজাইয়া তাহার সম্মুখে প্রাচীরাদি তুলিয়া "ব্যাটারি" নির্মাণ করিলেন। সেনাপতি বার্নার্ড তাঁহার দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ ব্যাটারি নামে একটা ব্যাটারি গড়িলেন এবং উত্তরদিকে খুব ভারী, বিরাটকায় মর্টার তোপের আর একটি ব্যাটারি তৈয়ার করিলেন। ইহারই পার্শ্বে হিন্দু রাওয়ের বাড়ি ছিল। হিন্দু রাওয়ের বাটীর সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকারে একটি ব্যাটারি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

হিন্দু রাওয়ের বাড়িতেই ইংরাজ সেনাদলের প্রধান আড্ডা স্থাপিত হয়। এইখান হইতে তিন শত গজ দূরে 'অবজারভেটরি' নামক একটি বাড়ি ছিল। এই গৃহের সম্মুখেই ইংরাজদিগের সর্বাপেক্ষা ভারী ও বড় তোপ সজ্জিত ছিল। অবজারভেটরি হইতে আরও একটু দূরে পাঠানদিগের নির্মিত একটি মসজিদ ছিল। এই মসজিদে ইংরাজ সেনার আরও একটি আড্ডা হয়। এই মসজিদ হইতে প্রায় দুই শত গজ দূরে ''ফ্লাগস্টাফ'' গম্বুজ। এইখানে ইংরাজের একদল পদাতি সেনা ও দুইটি তোপ ছিল। রীজের উপর ইংরাজের অবস্থান সকল দিকে সমানভাবে দুর্গম ছিল; কেবল শব্জীমণ্ডীর দিকটাই লোকাভাববশত দুর্বল ছিল। সিপাহিদিগের মধ্যে যদি কেহ রণচতুর থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি শব্জীমণ্ডীর আশ্রয়ে সৈন্য রাখিয়া ইংরাজের পশ্চাদাবর্তনের পথ রোধ করিতে পারিতেন, অম্বালী ও পঞ্জাবের দিকে যাইবার নির্গম পথ একেবারেই রুদ্ধ করিতে পারিতেন। ইংরাজের সম্মুখেও একটি অসুবিধা ছিল। দক্ষিণ ব্যাটারির পরেই রীজ প্রায় সমতলই হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু একটু দূরেই একটি ছোট পাহাড়ের উপর মুসলমানদিগের ঈদ্‌গাহ বা ঈদের সময় নমাজ পড়িবার মসজিদ ছিল। এই ঈদ্‌গাহের পরেই কিষণগঞ্জ ও পাহাড়ীপুর নাম দিল্লির দুইটি উপকণ্ঠ। রীজ এবং দিল্লির নগরের প্রাচীরের মধ্যে এই ভাবে পুরাতন গৃহ সকল উপকণ্ঠ, গ্রাম ও নানাবিধ অবরোধ ছিল। এক একটা পুরাতন বাড়ি দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় ও গোলার দ্বারা দুর্ভেদ্য ছিল। আর, মাঝে মাঝে বৃক্ষশ্রেণি পুরাতন বৃক্ষবাটিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার বাধা বিদ্যমান ছিল। ইহার পরই নগরের প্রাচীর। প্রাচীরটি বৃত্তাকারে ৭ মাইল দীর্ঘ, এবং ১৬ হাত উচ্চ। মধ্যে মধ্যে একটা গম্বুজ আছে, প্রত্যেক গম্বুজের পার্শ্বে ১২টি হইতে ১৪টি তোপ রাখিবার স্থান আছে। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে প্রাচীর রক্ষার জন্য একটু ঢালু ভাবে কবচ প্রাচীর (Glacis) আছে। কবচ-প্রাচীরের পরেই পরিখা—ইহা প্রায় সর্বত্র সমভাবে ২৪ ফিট গভীর ও ১৮ ফিট চওড়া। উত্তর হইতে পশ্চিম বাহিয়া দক্ষিণ পর্যন্ত এই প্রাচীর ও পরিখা দিল্লিকে রক্ষা করিতেছে। এই প্রাচীরের পার্শ্বে পশ্চিম ও উত্তর দিকে আবার রীজ বা পাহাড়। পাহাড় ও প্রাচীরের মধ্যে নিম্নভূমি। নগরের পূর্বদিকে ধনুকাকারে যমুনা প্রবাহিতা। এই সিপাহিযুদ্ধের সময়ে যমুনাতরঙ্গ নগরের পাদধৌত করিয়াই যাইতেছিল। যমুনার ধারে ধারে দুর্গ ও তোপ রাখিবার স্থান সকল নির্মিত ছিল। সেলিমগড়, বাদশাহী মঞ্জিল প্রভৃতি স্থান যমুনার উপরেই আছে। কাজেই বলিতে হয় যে, এত বড় নগরকে সম্পূর্ণভাবে অবরোধ করা সম্ভবপরও নহে, ইংরাজের সামর্থ্যের আয়ত্তেও ছিল না। ইংরাজ কেবল নগরের পশ্চিম এবং কতকটা উত্তর দিকে পাহাড়ের কতকটা স্থান অধিকার করিয়া নগর আক্রমণের উপক্রম করিতেছিলেন কিন্তু আক্রমণের পূর্বেই, হিন্দু রাওয়ের বাড়ি ও রীজ অধিকার করিবার পরই, ইংরাজ বাহিনী নিজেই অবরুদ্ধ হইয়াছিল। রীজ ও প্রাচীরের মধ্যবর্তী সকল বাড়ি ও বৃক্ষবাটিকা সিপাহিগণ অধিকার করিয়াছিল এবং প্রত্যেক গৃহকক্ষ হইতে অনবরত গুলিবৃষ্টি করিয়া ইংরাজ সেনাদলকে বিধ্বস্ত করিতেছিল।

সেনাপতি উইলসন বলেন যে, সিপাহিগণ যদি যথারীতি আবার ইংরাজের অবস্থান আক্রমণ করিত, দিল্লির প্রাচীরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রীজের উপরে ইংরাজের অবস্থান আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সেনাপতি বার্নার্ড কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাকে দিল্লি ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইত। শ্লাঘ্য সমরনীতির পথ অনুসরণ না করিলেও

সিপাহিগণ ইংরাজের উপর অনবরত গোলা ও গুলিবৃষ্টি করিয়া ইংরাজকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কার্যের কোন শৃঙ্খলা ছিল না—যেন ঝোঁকের উপর; খেয়ালের উপর, এক একবার তাহারা যুদ্ধ করিত; আর যে সময় হয়ত আর একটু চাপিয়া অগ্রসর হইলে বা তেজের সহিত আক্রমণ করিলে বা কিছুকাল স্থিরভাবে অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতে পারিলে ইংরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারা যায়, ঠিক সেই সময়েই তাহারা যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করিত। কিন্তু হইলে কি হয়, ইংরাজকে অনবরত দিবারাত্র সশস্ত্র হইয়া থাকিতে হইত—আহার বিশ্রামেরও সময় হইত না। লর্ড রবার্টস লিখিয়াছেন যে, ইংরাজ সেনার দলকে যুদ্ধ করিতে করিতে আহার করিতে হইত। ইংরাজ পক্ষের প্রায় কাহারও বিশ্রামের অবসর ছিল না।

সিপাহির দল এইবার Sortie বা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন নগর অবরুদ্ধ হইলে অবরুদ্ধ নগরবাসী অবরোধ ভেদ করিয়া অবরোধকারীদিগকে যদি আক্রমণ করে, তবে এই আক্রমণকে Sortie বলে। সিপাহিগণ এই ভাবের বা আক্রমণ প্রতিদিনই করিতে লাগিল।

৯ই জুন। এই দিনেই প্রথম Sortie হয়; অপরাহ্ণে সিপাহির দল দিল্লি হইতে বাহির হইয়া হিন্দু রাওয়ের বাড়ি আক্রমণ করে। তাহারা সারাদিন রৌদ্রতাপে তোপ দাগিয়াছিল এবং ইংরাজের সকল অবস্থানই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। এই দিন সীমান্ত প্রদেশের মর্দন হইতে গাইড নামক গোরা রেজিমেন্ট আসিয়া ইংরাজের সহিত যোগ দিয়াছিল। ইহারাই ৯ই তারিখের আক্রমণের সময় ইংরাজ পক্ষের মান রক্ষা করে। সিপাহিগণ হিন্দু রাওয়ের বাড়ি অধিকার করিতে না পারিলেও ইংরাজের পক্ষে অনেকটা ক্ষতি করিয়াছিল। খুব কম হইলেও ইংরাজের পক্ষে প্রায় এক শত জন যোদ্ধা ধরাশায়ী হইয়াছিল।

১০ই জুন। এই তারিখে সিপাহিগণ দিল্লির আজমীর তোরণদ্বার খুলিয়া ৫০০ অশ্বারোহী ও দুইটি তোপ লইয়া ইংরাজের দক্ষিণ ও পশ্চাদ্দিক আক্রমণ করে। ইংরাজ পক্ষও অমনি পদাতি, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া এবং গুর্খার দলকে দক্ষিণে রাখিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। যখন গুর্খার দল সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন সিপাহিরা নিজ নিজ কড়াবীণ অশ্বের স্কন্ধের উপর রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "আমরা আত্মঘাতী নহি; তোমরা গুর্খা হইলেও ভারতবাসী, হিন্দু—আমরা তোমাদের উপর গুলিবর্ষণ করিব না। তোমরা আমাদিগের ভ্রাতৃসদৃশ। স্বাধীনতার ক্রোড়ে তোমরা প্রতিপালিত। এস, তোমরা আমাদের দলে এস—আমরা তোমাদিগকে মাথায় করিয়া রাখিব, তোমাদিগের কথা অনুসারে পরিচালিত হইব। আর তোমরা যদি আমাদিগকে আক্রমণ কর, তাহা হইলে আমরা বিনা অস্ত্র ব্যবহারে তোমাদের হস্তে প্রাণদান করিব।" এই বলিয়া সিপাহি অশ্বসাদিগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিকে তখন বর্ষার বারিধারার ন্যায় গুলিবৃষ্টি হইতেছিল, সকলেই অচল ও অটল ভাবে ঘোড়ার উপরে বসিয়া রহিল। গুর্খাগণ "জয় গোরক্ষনাথের জয়" বলিয়া অগ্রসর হইল এবং সিপাহিদিগের দলের মধ্যে আসিয়া প্রায় ২০।২৫ জন সিপাহিকে বধ করিল। তখনও সেই অশ্বারোহীর দল ধীর, স্থির, নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় মেজর স্কটের একদল গোরা সিপাহিদলের দক্ষিণ দিক চাপিয়া আক্রমণ করিবার উদযোগ করিল। অমনি বিদ্যুৎগতিতে সিপাহি অশ্বারোহিগণ মুখ ফিরাইয়া সর্পাকারে এমন ভাবে বাহির হইয়া

গেল। এবং মেজর স্কটের দলাকে এতই ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আক্রমণ করিল যে, স্বয়ং সেনাপতি বার্নার্ড দূর হইতে তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "Bravo old troopers of the Bengal Cavalry" প্রধান সেনাপতির প্রশংসা বচনধ্বনি আকাশমার্গে বিলীন হইবার পূর্বেই ক্ষুদ্র গোরা বাহিনীকে ধরাশায়ী করিয়া সিপাহি অশ্বারোহিগণ দিল্লিতে পুনঃপ্রবেশ করিল। সিপাহিদিগের অদ্ভুত কার্য দেখিয়া ইংরাজ মাত্রেই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। সে স্থৈর্য, সে গাম্ভীর্য, মৃত্যুকে তেমন তুচ্ছবোধ, সেই বীরত্ব, ভারতবাসীর প্রতি সেই প্রগাঢ় সৌভ্রাত্র, আর সঙ্গে সঙ্গে রণচাতুরীর অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া ইংরাজ বীরগণ সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। সিপাহির দল আজমীর তোরণে প্রবেশ করিবার পর আবার গোলাবৃষ্টি ও গুলিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেদিন আর হিন্দু রাওয়ের বাড়ি আক্রমণ করা হইল না। ইংরাজ মাত্রেই নিজ শিবিরে যাইয়া সিপাহির বীরত্বের কাহিনি কহিতে কহিতে, সারাদিবসের রণশ্রান্তি দূর করিলেন। সকলে বুঝিলেন যে উপযুক্ত সেনানায়কের অভাবে তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।

১১ই জুন। পরদিন অর্থাৎ ১১ই জুন সিপাহিগণ পদাতি সেনার সাহায্যে আবার হিন্দু রাওয়ের গৃহ আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু রাওয়ের ভবন গ্রহণ করিতে না পারিলে ইংরাজকে স্থানচ্যুত করা সুবিধাজনক হইবে না। হিন্দু রাওয়ের গৃহে মেজর রিড ও তাঁহার গুর্খা সেনাদলই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, পরে ৬০ নম্বরের রাইফেল রেজিমেন্টের একদল এবং গাইড পদাতি সেনাদলের এক অংশ সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দু রাওয়ের গৃহ সিপাহিদিগের তোপের—পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে ছিল। দুই তিন দিনের মধ্যে অনবরত গোলাবৃষ্টিতে উহার সকল কক্ষেরই ছাদ ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দেওয়ালের সকল স্থানেই বড় বড় ছিদ্র হইয়াছিল, তথাপি মেজর রিড সে স্থান ত্যাগ করিয়া যান নাই। ১১ই তারিখের আক্রমণে সিপাহির দল অনেক ইংরাজকে হতাহত করিলেও হিন্দু রাওয়ের গৃহ অধিকার করিতে পারে নাই। বারংবার আক্রমণ করিয়াছে, বারংবার তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শেষে বিফল মনোরথ হইয়া সন্ধ্যার সময়ে সিপাহিগণ প্রত্যাবর্তন করে।

১২ই জুন। ১২ই তারিখের খণ্ডযুদ্ধকে খণ্ডযুদ্ধ না বলিয়া একটা বড় যুদ্ধই বলা চলে। "ফ্লাগস্টাফ টাওয়ার" বা গম্বুজের নিকট যমুনার তীরে স্যর থিওফাইলাস মেটকাফের বৃক্ষবাটিকা অবস্থিত ছিল। এই বৃক্ষবাটিকার মধ্যে বড় বড় গাছ, কুঞ্জ লতাবিতান ছিল। সিপাহিদিগের একদল পদাতি সেনা পূর্ব রাত্রিতে এই বাগানবাড়িটি অধিকার করিয়া রাখে। ১২ই তারিখে প্রাতঃকালে ইহারা সহসা ফ্লাগস্টাফ টাওয়ার আক্রমণ করে। প্রথম আক্রমণেই এই ঘাঁটির সেনানী কাপ্তেন নক্স এবং ৭।৮ জন ইংরাজ গোলন্দাজ হত হয়। ইংরাজের তোপ গুলি প্রায় সিপাহিদিগের হস্তগত হয়, এমন সময়ে ৭৫নং গোরা পদাতি সেনাদল সিপাহিদিগকে আক্রমণ করে এবং অন্যান্য সেনার দলও নানা দিক হইতে আসিয়া সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এই স্থানে এবং রীজ বা পাহাড়ের উভয় গাত্রে সিপাহিতে ও গোরাতে অনবরত যুদ্ধ চলে। শেষে সিপাহিগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। সেনাপতি বার্নার্ড এই ভীষণ যুদ্ধে বহু বীরকে হারাইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মেটকাফ সাহেবের বৃক্ষবাটিকা অধিকার না করিলে

তাঁহার উত্তর দিকটি নিরপদ হইবে না, তাই সিপাহিগণ পরাজিত হইলে তিনি মেটকাফ সাহেবের বাগানবাড়ি অধিকার করিলেন এবং যমুনার তীর পর্যন্ত নিজের ঘাঁটি বিস্তৃত করিলেন। ওদিকে আর একদল সিপাহি শব্জীমণ্ডীর ভিতর দিয়া আসিয়া হিন্দু রাওয়ের বাটী আক্রমণ করিল। অবশ্য এই দলকে পরাজিত করা ইংরাজের পক্ষে কঠিন হয় নাই। সেনাপতি বার্নার্ড বলেন যে, এই দুইদল যদি ঠিক এক সময়ে সমশক্তিসম্পন্ন হইয়া ইংবাজকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সেদিন ইংরাজের দলকে পরাজিত হইতেই হইত। যে সিপাহির দল ফ্লাগস্টাফ টাওয়ার আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা যেভাবে ও যে সময়ে যুদ্ধ করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে ও সেই সময়ে শব্জীমণ্ডীর সিপাহিরা যুদ্ধ করিলে অবশ্য ইংরাজকে পরাজিত হইতে হইত, কিন্তু সিপাহিদিগের মধ্যে তো পরামর্শের স্থিরতা, কার্যে একাগ্রতা এবং সমরচাতুরীর বিন্যাসের সমতা ছিল না, তাই তাহারা বিজয়িনী শক্তিকে করায়ত্ত করিয়াও কখনই বিজয়লক্ষ্মীকে ক্রোড়গত করিতে পারে নাই।

এই কয়দিনের খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজ বুঝিতে পারিলেন যে, এভাবে যুদ্ধ করিলে ইংরাজ শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়ই প্রাপ্ত হইবে। বিশেষত ইংরাজ সেনা দিল্লির ন্যায় বিশাল নগরকে সম্পূর্ণ রূপে অবরোধ করিতে পারে নাই। নগরের উত্তর ও পশ্চিমদিগের কতকটা স্থান ইংরাজ সেনাদল আটকাইয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব দিক এবং দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত সিপাহিদিগের তোপ, গোলা, গুলি ও বারুদের ভাণ্ডার যেন অক্ষয় ছিল। তাহারা অনবরত নিশিদিন ইংরাজের অবস্থানের উপর গোলা ও গুলি বৃষ্টি করিতেছিল, ইংরাজ সেই গোলাগুলি বৃষ্টির উত্তরে স্বপক্ষ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলাগুলি ছুড়িতে অসমর্থ হইয়াছিল। কেননা, ইংরাজের গোলা, গুলি ও বারুদের ভাণ্ডার নিঃশেষিত প্রায় হইয়াছিল। সিপাহিদিগের যে সকল গোলা ইংরাজের অবস্থানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ফাটে নাই, সেই সকল গোলা সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ মাঝে মাঝে তোপ ছুড়িতেছিল। এই সকল ভাবনা ভাবিয়া ইংরাজ সেনানীবর্গ হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, সিপাহির সহিত এইভাবে যুদ্ধ করিলে দুই মাসের মধ্যে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাবা প্রধান সেনাপতি বার্নার্ড মহোদয়ের নিকটে যাইয়া বলিলেন যে, "আসুন আমরা সকলে মিলিয়া দিল্লি আক্রমণ করি, এমনভাবে দিনে দিনে মরিলেও মরিতে হইবে, একদিনে মরিলেও মরিতে হইবে।" সেনাপতি বার্নার্ড হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, "চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয় তো চেষ্টা কর, কিন্তু জানিও যে তোমরা বিজয়ী হইলেও দিল্লি অধিকার কারিতে পারিবে না। ৫।৭ শত সিপাহি বাহিরে আসিয়া যেভাবে লড়াই করিতেছে, তাহাতে ২০ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যপূর্ণ নগরে প্রবেশলাভ করিয়া তোমরা যে কতদূর স্থির থাকিতে পারিবে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। আজ সিপাহিদিগের মধ্যে স্যার চার্লস নেপীয়ারের মতো একজন সুচতুর রণপণ্ডিত থাকিলে তোমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, সেখানেও স্থির থাকিতে পারিতে না। যাহা হউক, যখন তোমাদের সাধ হইয়াছে, তখন চেষ্টা কর।" এই কথা বলিবার পর সেনাপতি বার্নার্ড সারা রাত চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তার ফলে তিনি পরদিন প্রাতঃকালে দিল্লি আক্রমণের চেষ্টা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, যদি মরিতে হয় তবে এমন ভাবেই মরিব; যতদিন পারি, ২০ হাজার সিপাহিকে দিল্লিতে আটকাইয়া রাখিব। ইহাদের দশ হাজারও বাহিরে আসিতে পারিলে আমাদের অবস্থান অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।"

বাস্তবিক, ভাবিলে অবাক হইতে হয় যে, এত সিপাহি দিল্লিতে আটকাইয়া রহিল কেন? তাহারা ইচ্ছা করিলে যমুনা পার হইয়া মীরট, সাহারাণপুর প্রভৃতি স্থান আপনাদিগের অধিকারে রাখিতে পারিত; ইচ্ছা করিলে নগরের দক্ষিণ দিকে ইন্দ্রপ্রস্থ ভেদ করিয়া বাহিরে যাইয়া ইংরাজের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিতে পারিত অথবা ইংরাজের রসদের সকল পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু কেন যে তাহারা এমনটি করিল না, ইহা এখন একটি বিস্ময়াবহ প্রহেলিকা হইয়া রহিয়াছে। সমর-চাতুরীর এই সোজা সিদ্ধান্তটি যে সিপাহিগণ জানিত না, এমন অনুমান করা ঠিক নহে; আর, ইংরাজের পক্ষে যে সৈন্য সংখ্যা অতি অল্পও ছিল, এ সংবাদও সিপাহিদিগের পক্ষে জানা কঠিন হইত না। তবে কেন তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে দিল্লিতে আবদ্ধ রহিল, ইহাই অনেকে বুঝিতে পারেন না। স্যর জন লরেন্স বলেন যে, পাঁচ হাজার সিপাহি যদি এই সময়ে পঞ্জাব আক্রমণ করিত, দিল্লির অবরোধকারী ইংরাজ সেনাদলকে অগ্রাহ্য করিয়া যদি পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে সমগ্র দেশটাই বিপ্লবপ্রমত্ত হইয়া উঠিত। স্যর জন লরেন্সের বিশ্বাস যে, আক্রমণকারী সিপাহির দল দেখিলেই শিখগণ আর স্থির থাকিতে পারিত না। রণকণ্ডুতির প্রভাবে প্রমত্ত হইয়া তাহারাও ইংরাজের বিরুদ্ধেই সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করিত। কিন্তু কি জানি কেন, দিল্লির ২০ হাজার সিপাহি দুই তিন হাজার ইংরাজের আক্রমণ ও অবরোধ ব্যর্থ করিবার জন্য তিন মাস কাল নগরে স্থবিরবৎ অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। কেন যে তাহারা এমনভাবে রহিল, তাহার উত্তর এখন পর্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কুমায়ুন, গাড়ওয়াল, রামপুর প্রভৃতি প্রদেশ হইতে এবং দক্ষিণে আলিগড় আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে দলে দলে সিপাহি দিল্লিতে আসিয়া পৌছিতে লাগিল, কিন্তু কেহই এই সকল সিপাহির দলকে দুইটি বা তিনটি খণ্ড বাহিনীতে (Flying column) পরিণত করিয়া ইংরাজের পশ্চাদ্ভাগ, তথা পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল না। ইংরাজের রসদ মারিতে পারিলে, ইংরাজের সেনাসংখ্যা বর্ধিত করিবার পথ অবরুদ্ধ করিলে যে কতটা সুবিধা হইত, তাহা সিপাহিগণ বোধ হয় বুঝিয়াও বুঝে নাই। যখন তাহারা বুঝিয়াছিল, তখন সু-অবসর প্রায় অতীত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দিল্লির অবরোধ—দ্বিতীয় স্তর

১২ই জুনের পর চারিদিন কাল সিপাহিগণ বড় একটা খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে নাই। কিন্তু ১৭ই জুন তারিখে অতি প্রত্যূষে সিপাহি আবার সদলবলে ইংরাজের অবস্থান আক্রমণ করিল। যে সকল ইংরাজ সেনা প্রহরায় ব্যাপৃত ছিল, তাহারা প্রথম সূর্যকিরণে দেখিতে পাইল যে, জনকয়েক লোক ঈদ্‌গাহ নামক মসজিদের পার্শ্বে কি একটা কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। প্রথমে এই সকল সিপাহির ব্যস্ততার হেতু ইংরাজ বুঝিতে পারে নাই; এমন সময়ে দিল্লির প্রাচীরের উপর হইতে ঘোরতর ভাবে গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। বড় বড় কামানের ঘনঘোর নির্ঘোষ শুনিয়া প্রধান সেনাপতি বার্নার্ড মহোদয় অশ্বারোহণে রীজের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; field glass বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে তিনি দেখিলেন যে সিপাহিগণ ঈদ্‌গাহের পার্শ্বে একটা তোপের আড্ডা তৈয়ার করিতেছে। এই স্থান হইতে সিপাহির তোপ ইংরাজের সেনানিবাসের উপর অজস্র গোলাবর্ষণ করিতে থাকিলে ইংরাজকে হটিয়া যাইতেই হইবে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বাহিনীর সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ মেজর টুম্বসের অধিনায়কত্বে, অন্য ভাগ মেজর রিডের অধীনে সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মেজর টুম্বসের অধীনে গোলন্দাজ সেনার দল ও দুইটি তোপ, চারি শত প্রথম ফুসিলিয়ার্স দলের পদাতি, ৬০ নম্বরের রাইফেল রেজিমেন্টের এক অংশ, ৩০ জন গাইডের অশ্বারোহী সেনা এবং ২০ জন খনক ও ইঞ্জিনিয়ার সেনা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মেজর রিডের অধীনে গুর্খা রেজিমেন্ট, ৬০ নম্বর রাইফেল রেজিমেন্টের এক অংশ এবং দেশীয় শিখ ও পাঠান অশ্বারোহী সেনা ছিল। মেজর টুম্বস সিপাহিদিগের বাম দিক আক্রমণ করিলেন, মেজর রিড দক্ষিণ দিক আক্রমণ করিলেন। উভয় সেনার দলই অনায়াসে ঈদ্‌গাহের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। বিশেষত মেজর টুম্বস সর্বাগ্রে সেইখানে পৌঁছিলেন। কিন্তু পৌঁছিবার সময়েই ঝঞ্ঝাবাতের মুখে যেমন শিলাবৃষ্টি হয়, সিপাহিদিগের দল হইতে সেইরূপ গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। একে একে মেজর টুম্বসের অধীন সকল গোলন্দাজই মারা পড়িল: তাঁহার তোপ কয়েকটি শত্রুর হস্তগত হয়, এমন সময়ে তিনি কাপ্তেন ড্যালিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ড্যালি, তুমি যদি এই সময় শত্রুকে আক্রমণ না কর, তাহা হইলে আমার সর্বস্ব যায়।" ড্যালি এই কথা শুনিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। আর ৫০ জন অশ্বারোহী তাঁহার অপূর্ব বীরত্ব দর্শনে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। সতেজে, সবেগে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া ড্যালির দল শত্রুকে আক্রমণ করিল। এই অবসরে মেজর টুম্বস তাঁহার তোপগুলিকে সরাইয়া লইলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ড্যালি এবং তাঁহার ৫০ জন অশ্বসাদী আর ফিরিল না। কাপ্তেন ড্যাল

আহত হইয়া সমরাঙ্গণে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ৫০ জন সহচর মহাবীরের চিরনিদ্রায় সমরাঙ্গণে শায়িত রহিলেন।"

মেজর রিড অন্য পক্ষে বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে দুইটি সরাই চূর্ণ করিয়া কিষণগঞ্জ উপনগরে আসিয়া উপস্থিত হন। কিষণগঞ্জের প্রত্যেক গৃহেই সিপাহি পূর্ণ ছিল। ইংরাজ সেনা কিষণগঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু সম্মুখ সমরেও তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। কিষণগঞ্জ উপনগরে সিপাহিগণ দুই তিনটি তোপের অধিষ্ঠান নির্মিত করিতেছিল; মেজর রিড সে সকল চূর্ণ করিয়া দেন। এইভাবে ১৭ই জুন তারিখে সিপাহিদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছিল।

১৯শে জুন। ইংরাজের পক্ষে বহু হিন্দু ও মুসলমান, সন্ন্যাসী ও ফকির, গুপ্তচরেব কার্য করিয়াছিল। দিল্লির নিকটের বড় বড় আখড়ার সন্ন্যাসীগণ গুপ্তচরের কার্য করিয়া ইংরাজের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদের অনেকেরই মুখে শুনা যাইত যে, সিপাহিগণ দেশ শাসন করিবার বিদ্যা শিখে নাই, তাহারা জয়ী হইলে দেশে শয়তানের রাজত্ব হইবে, সুতরাং ইংরাজের সহায়তা করাই তাহাদের ধর্ম। এই সন্ন্যাসী গুপ্তচরের মুখে ১৮ই জুন তারিখে গভীর রাত্রি কালে সেনাপতি বার্নার্ড জানিতে পারিলেন যে, ১৯শে তারিখে সিপাহিগণ ইংরাজের সেনাধিষ্ঠান ও পশ্চাদ্ভাগ ঘোরতর ভাবে আক্রমণ করিবে। এই হেতু সেনাপতি বার্নার্ড অশ্বসাদি.নায়ক ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্রান্টের অধীনে ৫০০ অশ্বারোহী সেনা এবং ১২টি তোপ সঞ্চয় করিয়া সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। ১৯শে তারিখের অপরাহ্নকালে লাহোর দরওয়াজা খুলিয়া এক দল সিপাহি বাহিরে আসিল; ইহাদের মধ্যে অশ্বারোহী, পদাতি দুই-ই ছিল এবং ইহারা একত্র এক সময়ে ইংরাজের সকল ঘাঁটি আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করিল। অন্য দিকে সিপাহিদিগের দুই দল পদাতি সেনা বৃক্ষবাটিকাগুলির ভিতর দিয়া নীরবে ইংরাজের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। সেনাপতি বার্নার্ড প্রমাদ গণিলেন। সিপাহিদিগের তোপ হইতে অজস্র ধাবায় গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল; দলে দলে ইংরাজ মারিতে লাগিল; আর অব্যর্থ-সন্ধান সিপাহি পদাতির গুলিতে ইংরাজ দল অধীর হইয়া পড়িল—সন্ধ্যার সময় ইংরাজের দুইটি তোপ সিপাহিদিগের হস্তগত হইল। এমন সময়ে সেনাপতি বার্নার্ড বলিলেন, "মরিব তো সবাই, মারিয়া মরি না কেন?" তাঁহার কথা শুনিয়া ল্যান্সার ও গাইডের দল সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অন্ধকারে, সম্মুখে যে একটা নালা আছে, তাহা দেখিতে না পাইয়া অনেকেই সিপাহির গুলিতে আহত হইয়া অশ্বসহ সেই নালায় পড়িয়া প্রাণ হারাইল। এই অন্ধকারে ইংরাজ পদাতির দল সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিল এবং ইংরাজের অধিকার হইতে লুণ্ঠিত দুইটি তোপ আবার কাড়িয়া আনিল। এই ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে তিনজন বড় সেনানী, ১৭জন অধস্তন সেনানায়ক, ৭জন অশ্বসাদীর সেনানী এবং প্রায় ১০০ জন গোরা পদাতি সেনা হত হইয়াছিল। স্বয়ং সেনাধিনায়ক হোপ গ্রান্ট আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব হত হয়। রূপর খাঁ নামক একজন আরদালী সওয়ার এই সময়ে সেনাপতি গ্রান্টের নিকটে আসিয়া বলে, "সাহেব তুমি আমার ঘোড়া লইয়া পলায়ন কর, নচেৎ তোমার প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইবে।" গ্রান্ট বলিলেন, "তুমি কোথায় থাকিবে? এ যে চারিদিকেই শত্রু। তাহা

হইবে না। তবে এক কাজ কর, আমি উরুতে আহত হইয়াছি, আমার বাহুতে বল আছে। আমি তোমার ঘোড়ার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাকি, তুমি বল্লমের মুখে শত্রুদল নিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হও। পারি যদি এই উপায়ে উভয়েই বাঁচিব।" রূপর খাঁ অসীম সাহসে ভর করিয়া সেনাপতি হোপ গ্রান্টকে রক্ষা করিল। পরদিন সেনাপতি মহাশয় তাঁহাকে বকশিস দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "সাহেব আমি টাকা চাহি না, আমার পদোন্নতি করিয়া দাও।" রূপর খাঁর যথাভীষ্ট পদোন্নতি হইয়াছিল।

১৯শে তারিখের ব্যর্থ যুদ্ধে ইংরাজের লোকক্ষয় ব্যতীত অন্য কোন লাভই হয় নাই। সিপাহির দল পশ্চাদ্দিকে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেস্থান হইতে তাহারা চ্যুত হয় নাই। সেই স্থানে যদি অধিক সংখ্যক সিপাহি আসিয়া যোগ দেয়, তাহা হইলে ইংরাজকে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেই হইবে। ইংরাজ সেনাধিনায়ক ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই সিপাহির দল ইংরাজের অবস্থানের পশ্চাদ্ভাগে অধিক সংখ্যক সৈন্য আনিয়া এখটি নূতন ঘাঁটির সৃষ্টি করিয়াছে। সারা নিশা এই চিন্তায় ইংরাজ সেনানিবাস ব্যাকুল হইয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে ব্যাপার জানিবার জন্য দূর হইতে পশ্চাদ্দিকের সিপাহির ঘাঁটি দেখিবার উদ্দেশ্যে একদল ইংরাজ সেই দিকে অগ্রসর হইল। অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিল যে, সব ভোঁ-ভোঁ, কোথাও কেহ নাই—কেবল রাশি রাশি সিপাহির শব ও মৃত অশ্বের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, একটা ভাঙ্গা তোপ, একগাড়ি বারুদ ও গোলা রহিয়াছে—আর কিছুই নাই। দূরে একটা সিপাহিদিগের ঘাঁটি আছে বটে, কিন্তু তাহারা ইংরাজ দলকে দেখিয়াই অদৃশ্য হইল। যে ইংরাজ সেনানায়ক এই পরিপ্রেক্ষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি সিপাহিদিগের অহম্মুখতার পরিচয় পাইয়া হাসিয়া আকুল হইলেন এই সময়ে আর একদল সিপাহি সেই স্থান পুনরধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু আর পারিল না। পাছে আবার সিপাহিগণ পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে, এই সম্ভাবনার নিরাকরণ আশায় সেনাপতি বার্নার্ড পশ্চাদ্দিকে দুই তিনটি কামান বিন্যাস করিলেন এবং একদল অশ্বারোহী সেনাকে ও ঘোড়ার তোপের গোলন্দাজদিগকে প্রহরায় নিযুক্ত রাখিলেন। ইহাকেই বলে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। সিপাহিগণ যদি পরদিন প্রাতঃকালে ইংরাজের পশ্চাদ্ভাগের ঘাঁটি হইতে ইংরাজদিগকে আবার আক্রমণ করিত, তাহা হইলে হয়ত সেনাপতি বার্নার্ড বিভ্রান্ত হইয়া দিল্লি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে।

২৩শে জুন। এই দিন পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী উৎসব। সিপাহিগণ তিন দিনকাল ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে নাই। তাই পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকী উৎসব করিবার জন্য ইংরাজ সেনাদল উদ্যোগ করিতে লাগিল। এই সময়ে ইংরাজের সেনানিবাসে সমাচার আসিল যে, মেজর অলফার্টস একদল গোরা সেনা লইয়া সেনাপতি বার্নার্ডের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন। তিনি দিল্লির দশ ক্রোশের মধ্যে একটা স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছেন। এদিকে ইংরাজ সেনাধিনায়ক সমাচার পাইলেন যে. জলন্ধর ফিলুর প্রভৃতি স্থানের সিপাহিগণ দিল্লিতে আসিয়াছে। অর্থাৎ পুরাতন বঙ্গীয় পদাতি সেনার তিন রেজিমেন্ট এবং বিখ্যাত ৬ নম্বর অশ্বসাদী রেজিমেন্ট দিল্লিতে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই সময় এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে একটা গুজব রটে যে, ইংরাজ শাসনের শত বর্ষ পূর্ণ হইলে ইংরাজকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই বিধাতার বিধান।

বিশেষত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে অমাবস্যা ছিল। এই অমাবস্যা তিথি হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির পক্ষেই যুদ্ধার্থ শুভকর বলিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই ওই দিন যে একটা ভীষণ আক্রমণ সিপাহিগণ করিবে, এ পক্ষে আর সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া সেনাপতি বার্নার্ড ত্বরায় মেজর অলফার্টসকে সসৈন্যে তাঁহার অবস্থানে আসিয়া উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। মেজর অলফার্টস ২২শে তারিখে এই হুকুম পান, ২৩শে তারিখে তাঁহার সেনাদল সম্পূর্ণভাবে সেনাপতি বার্নার্ডের অবস্থানের ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্বে দিল্লির প্রাচীর হইতে ঘোরতর ভাবে ইংরাজদিগের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইংরাজের পক্ষ হইতে এই গোলাবৃষ্টির উত্তরে গোলাবৃষ্টি করা হয় নাই। ইংরাজের দলকে ইহা দাঁড়াইয়া সহ্য করিতে হইয়াছিল। ওদিকে শব্জীমণ্ডীর ভিতর দিয়া সিপাহিরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নূতন ব্যাটারি ও মেজর রিডের অবস্থান আক্রমণ করে। তাহাদের আক্রমণ, বীরত্ব, তেজস্বিতা দেখিয়া স্বয়ং মেজর রিড বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "জানি না কেমন করিয়া কি হইল; মনে আছে যে, চারিদিক হইতে লাল গোলার বৃষ্টি হইতেছে, বন্দুকের গুলি দেহের সর্বত্র আসিয়া পড়িতেছে। তোপ কামানের ও রাইফেলের আওয়াজে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছে না, মাঝে মাঝে বারুদের ধূমে সব যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, আর সিপাহিগণ অতুল সাহসে অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত আমার সেই ভগ্ন হিন্দু রাওয়ের বাড়িটি আক্রমণ করিতেছে! তেমন বীরত্ব আমি কখনও দেখি নাই। জীবনটাকে লইয়া তেমন "ছিনি-মিনি" খেলা করিতে আর কোন দেশের লোককেই দেখি নাই। একে একে আমার গোরা সৈনিকগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল। যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখিলাম যে, আমাব তোপ বন্দুক আমার হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল। মনে হইল, আর বুঝি রক্ষা হয় না, এই দুর্বার বীরত্বের সম্মুখে বুঝি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সেই দুঃসময়ে কে যেন কানে কানে বলিয়া দিল—তুমি পলাইলে সব যাইবে, মরিতে হয়, এইখানে দাঁড়াইয়া মর, এমন বীর যোদ্ধাদিগের হস্তে মরণ তো আকাঙ্ক্ষনীয় মরণ। এমন সময় আমার সাহায্যার্থে চারিদিক হইতে গোরা সেনা আসিয়া পড়িল এবং তাহারাও প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।"

এই ভাবে গ্রীষ্মের সেই ভীষণ উত্তাপে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন সর্বত্রই অতি ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। সেই মহা আহবে উভয় পক্ষের যোদ্ধাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছিল, দেহের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়াছিল—যেন দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য হইয়া মারিতে ও মরিতে উদ্যত হইয়াছিল। শব্জীমণ্ডীর সেই আঁকা বাঁকা গলির মধ্যে এতই ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল যে এক এক মোড়ে শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে শত যোদ্ধার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার পর ইংরাজ পক্ষ দেখিলেন যে, শব্জীমণ্ডী সিপাহিশূন্য হইয়াছে। কেন যে সিপাহিগণ সহসা শব্জীমণ্ডী ছাড়িয়া গেল তাহা আজ পর্যন্তও কেহ বলিতে পারেন না। সিপাহি শব্জীমণ্ডীতে আড্ডা করিয়া থাকিলে ইংরাজের এমন সাধ্য ছিল না যে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। বলিতে কি, ২৩শে জুনের যুদ্ধে এক হিসাবে ইংরাজেরই পরাজয় হইয়াছিল। সিপাহিগণ যদি শব্জীমণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া না যাইত, তাহা হইলে ইংরাজের পরাজয় সম্পূর্ণ হইত! কিন্তু কেন জানি না, এত শ্রমলব্ধ, এমন অতুল্য বীরত্বে অর্জিত বিজয়লক্ষ্মীকে সিপাহিরা

হেলায় যেন মাঠে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। সেনাপতি বার্নার্ড শব্জীমণ্ডী সিপাহিশূন্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা অধিকার করিলেন এবং গ্রামের এক দিকের এক সরাই হইতে আর এক দিকের একটি হিন্দু মন্দির পর্যন্ত সেনা সমাবেশ করিয়া, মাঝে মাঝে তোপশ্রেণি সাজাইয়া, সমগ্র গ্রামটিকে এমন ভাবে অধিকার করিয়া রাখিলেন যে, ভবিষ্যতে আর একটি সিপাহিও শব্জীমণ্ডীর দিকে না প্রবেশ করিতে পারে। ইংরাজ কর্তৃক এই অপূর্ব ও অদ্ভুত ভাবে শব্জীমণ্ডী অধিকার দিল্লি যুদ্ধের ও অবরোধের দ্বিতীয় স্তরের প্রধান ঘটনা। এই দিন হইতে ৭ই জুলাই পর্যন্ত সকল খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজের কাছে সিপাহিকে হারিতেই হইয়াছিল।

২৩ শে জুনের যুদ্ধের পরদিন সেনাপতি চেম্বার্লেন ইংরাজ সেনার দলে আসিয়া যোগ দিলেন। সেনাপতি চেম্বার্লেন মৃত কর্নেল চেষ্টারের স্থানে ইংরাজ চমুর এডজুটেন্ট-জেনারেল হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কাপ্তেন টেলর নামক ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের একজন সেনানায়ক আসিয়াছিলেন। ইঁহারই বুদ্ধির প্রভাবে পরে ইংরাজ দিল্লি জয় করিতে পারিয়াছিলেন। চেম্বার্লেন ও টেলর সাহেবের আগমনে ইংরাজ দলের মধ্যে একটু আশা ও ভরসার ভাব আবার জাগিয়া উঠিল।

ওদিকে সিপাহির পক্ষে রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহকারী সিপাহির দল আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে চারিটি পদাতি রেজিমেন্ট, একটি অশ্বারোহী রেজিমেন্ট, একটি ঘোড়ার তোপের রেজিমেন্ট এবং দুইটি তোপ ছিল। যখন এই বিশাল বাহিনী যমুনার নৌসেতু পার হইতেছিল, তখন উত্তরদিকের রীজ হইতে ইংরাজ সেনানায়কগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহযোগে সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, প্রায় সাত হাজার যোদ্ধা দিল্লি নগরে প্রবেশ করিল। শেষে যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সুবাদার বাখত খাঁ ইহাদের অধিনায়ক হইয়া দিল্লিতে প্রবেশ করিতেছে, তখন অনেকেই একটু চিন্তিত হইলেন। বাখত খাঁ কোম্পানির অধীনের একজন পুরাতন সেনানায়ক ছিলেন। অশ্বাসাদীর দল পরিচালনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিয়াই লোকে জানিত। বিশালাকায়, স্থূলোদর, শ্বেতাঙ্গের ন্যায় স্ফুট গৌরবর্ণ বাখত খাঁকে হঠাৎ দেখিলেই একজন বিলাসী নবাব বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার নয়নের দিকে তাকাইলে সে ভ্রম তখনই অপনোদিত হইত। তাঁহার নয়ন দুইটি যেন সর্বদা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিত। এমন অক্লান্ত পরিশ্রমী, অদম্য উৎসাহী, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও রণপণ্ডিত সুবাদার সিপাহির দলে আসিয়া যোগ দিলেন দেখিয়া ইংরাজ পক্ষ একটু চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে দিল্লিতে ত্রিশ হাজার সিপাহি সমবেত হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীনে অসংখ্য তোপ কামান ছিল এবং তাঁহাদের গোলা গুলি ও বারুদের ভাণ্ডারও অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংরাজের দলে আবার কথা উঠিল যে, দিল্লি নগরকে সহজে আক্রমণ করা চলে কি না। অল্পবয়স্ক যোদ্ধামাত্রেই আক্রমণের উদ্‌যোগ করিলেন। এই আক্রমণের সমাচার পাইয়া বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথ তাড়াতাড়ি ইংরাজের দলে আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি বার্নার্ড এবারও এই দুঃসাহসের কার্য হইতে তাঁহার অধীন সেনানীনিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতির আদেশ সকলেই মান্য করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই ক্ষোভে দুঃখে যেন কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন।

৩রা জুলাই। বাখত খাঁর আগমনে সিপাহির দলে নূতন ভঙ্গি প্রকাশ পাইল। ৩রা জুলাই তারিখে অপরাহ্নকালে দিল্লি হইতে দলে দলে সিপাহি সেনা বাহির হইতে লাগিল। তাহারা বাহির হইয়া ইংরাজের অবস্থানের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। সেই উপক্রম বুঝিয়া সেনাপতি বার্নার্ড তাঁহার অবস্থানের দক্ষিণ ভাগে অধিকতর সৈন্যের সমাবেশ করিলেন। কিন্তু দক্ষিণ দিক আক্রমণ না করিয়া সিপাহির দল বামে ঘুরিয়া ঈদ্‌গাহ মসজিদের পার্শ্ব দিয়া ইংরাজ অবস্থানের পশ্চাতে আলিপুরের পথে গিয়া পৌঁছিল। সেই পথে উঠিয়াই সিপাহির দল ইংরাজ অবস্থানের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল না। দ্রুতপদে উত্তর পশ্চিমদিকে আরও অগ্রসর হইয়া বাদলি-কি-সরাইয়ের পূর্বের তে-মাথা পথের মোড় আটকাইয়া রহিল। এদিকে দিল্লির অন্যান্য দরওয়াজা হইতে অগণিত সিপাহি বাহির হইয়া ইংরাজের অবস্থানের দুই দিকে মাঠে ছড়াইয়া পড়িল। ইংরাজ পক্ষ হইতে পঞ্জাবী শিখ অশ্বারোহীর দল ইহাদিগকে তাড়াইয়া নগরে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টায় আক্রমণ করিল। কিন্তু সিপাহিগণের চাতুরী প্রভাবে পঞ্জাবী শিখ অশ্বসাদিগণও ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে দিল্লি ও রীজের মধ্যে সব নিস্তব্ধ—তোপের শব্দ নাই, এমন কি একটি অশ্বের হ্রেষারবও শুনিতে পাওয়া গেল না—সব নিস্তব্ধ, সব অন্ধকারে আবৃত। সেনাপতি বার্নার্ড এই অপূর্ব রণচাতুরী দেখিয়া একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বীয় দল হইতে আর সৈন্য বাহিরে পাঠাইতে পারিলেন না, অথচ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে খুব কম হইলেও দশ হাজার সিপাহি এই সময় বাহির হইয়া আসিয়াছে; তাহারা সম্মিলিত হইয়া এই অন্ধকারে ইংরাজের অবস্থানের কোন অংশ আক্রমণ করিলে ইংরাজকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেই হইবে। রাত্রি দুইটার সময়ে দূরে পশ্চিমদিকে আলিপুর গ্রামের নিকটে তোপধ্বনি শুনা গেল। তখন সেনাপতি বার্নার্ড ভাবিলেন যে, এই সময় একদল ইংরাজ সেনাকে পশ্চিমদিকে পাঠাইয়া দিলে হয়ত কোনরূপ সুবিধা হইলেও হইতে পারে। তাই তিনি মেজর কোককে তিনি শত অশ্বারোহী, আট শত পদাতি এবং ১২টি তোপ ও গোলন্দাজ সঙ্গে দিয়া সিপাহির অন্বেষণে পাঠাইয়া দিলেন।

বাখত খাঁ ঠিক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুসারে কার্য করিবার ভার তিনি যাঁহাদিগের উপর ন্যাস্ত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার তুল্য রণপণ্ডিতও ছিলেন না এবং তৎপ্রতি অনুরাগীও ছিলেন না। বাখত খাঁ হুকুম করিয়াছিলেন যে দশ হাজার সিপাহি— অশ্বসাদী ও পদাতি—তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন সেনানায়কের অধীনে ইংরাজের অবস্থানের পশ্চাদ্দিকের পথ অবলম্বন করিয়া তিন দিকে অগ্রসর হইবে। এই তিন দলকে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না, বরং যতদূর সাধ্য যুদ্ধ পরিহার করিয়া, লোকক্ষয় না করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। একদল উত্তরে কর্নাল ও থানেশ্বরের পথে যাইবে, একদল আলিপুর বাদলি-কি-সরাইয়ের দিকে অগ্রসর হইবে, অন্য দল নগরের দক্ষিণ দিক দিয়া বাহির হইয়া ইংরাজ অবস্থানের দক্ষিণে উন্মুক্ত দিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সুবিধাজনক ভূমি পাইলেই এক একটি আড্ডা বা ঘাঁটি গাড়িয়া বসিবে। এই তিন দল সিপাহির অবস্থান ঠিক হইয়া গেলে, ইংরাজের পলায়নের পথ অবরুদ্ধ হইলে, বাখত খাঁ স্বয়ং সসৈন্যে দিল্লি হইতে বাহির হইয়া ইংরাজের অবস্থান আক্রমণ করিবেন। কিন্তু পরামর্শ ও চাতুরী ঠিক হইলে কি হয়, পরমার্শ অনুসারে কার্য না হইলে তো চাতুরীর বিকাশ হয় না। বাখত খাঁ দিল্লিতে আসিয়া উপস্থিত হইবার পরই বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর

শাহের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সম্রাট নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি দিল্লির নিকট হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদান করিব।" উত্তরে নাকি বাখত খাঁ বলিয়াছিলেন "আমি বার্ধক্যের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আমার পক্ষে পদমর্যাদার লোভ আর নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে ধর্মের জন্য দেহত্যাগ করিব বলিয়া পণ করিয়াছি। সে পণ পূর্ণ হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। আর এই সঙ্গে যদি আপনার কোন সুবিধা হয়, সেটা আমার পক্ষে আরও সুখের কথা হইবে। পরন্তু আমাকে কোন লোভ দেখাইবেন না।" সম্রাটের সঙ্গে এই কথাবার্তা নানাভাবে পল্লবিত হইয়া দিল্লিতে প্রচারিত হইল। দিল্লির অন্যান্য মুসলমান সেনানী হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন; এমনকি, বাখত খাঁর তেজোবীর্য দেখিয়া স্বয়ং বেগম জিন্নৎ মহলের দলের অনেক লোক ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। দিল্লিতে এই সময়ে সিপাহিদিগের মধ্যে উচ্চপদস্থ হিন্দু সেনানি ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সিপাহিদলের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সেনানিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। মুসলমান সুবাদার মেজর ও সেনানায়ক সকল দিল্লির দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন, আর হিন্দুর প্রধান যোদ্ধৃগণ হয় লক্ষ্ণৌয়ের দিকে, নয় কানপুর অথবা ঝাঁসির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার ফলে দিল্লিতে সিপাহিদলের মধ্যে মুসলমানেরই প্রাধান্য অধিক হইয়াছিল। সেই মুসলমান নায়কগণ বাখত খাঁর রণ-চাতুরী না বুঝিয়া আপনাদিগের বুদ্ধি খাটাইতে চেষ্টা করিলেন এবং যাহাতে বাখত খাঁ অপদস্থ হন, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৪ঠা জুলাই। মেজর কোক যে সেনার দল লইয়া রাত্রি দুইটার সময়ে আলিপুরের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অতি প্রত্যুষে সেই দল সমভিব্যাহারে মেজর কোক দেখিলেন যে, সিপাহিগণ আলিপুরের পথে অগ্রসর না হইয়া অথবা কর্নালের দিকেও না যাইয়া যমুনার বাদশাহী লহরের পার্শ্বে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। মেজর কোক ইহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইহারা প্রতি আক্রমণ করিল না, বরং ঘুরিয়া রাজপথ ধরিয়া দিল্লির দিকে পলায়ন করিল। এই সময়ে গাইড অশ্বসাদীর দল সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনেক সিপাহিকে বধ করিয়াছিল। রৌদ্রের তাপ অসহ্য হওয়াতে মেজর কোক লহরের ধারে একটি আমবাগানে গিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাঁহার গোলন্দাজদল ভ্রমক্রমে পথ হারাইয়া ইংরাজের অবস্থানে গিয়া পৌছিল। এদিকে দুই প্রহরের উত্তাপ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিলে আবার একদল সিপাহি তোপ বন্দুকসহ দিল্লি হইতে বাহিরে আসিয়া মেজর কোককে আক্রমণ করিল। কোকের তোপ ছিল না, কিন্তু গাইড অশ্বারোহী দলের এবং ৬১ নম্বর গোরা পদাতিদলের আক্রমণের বেগ সিপাহিরা সহ্য করিতে পারিল না। সারাদিন, সন্ধ্যা পর্যন্ত ইংরাজ অশ্বসাদী ও পদাতি ছুটিয়া ছুটিয়া যুদ্ধ করিয়া একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। ৬১ নম্বরের গোরাব দল একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকজন পাঠাইয়া, হাতি ডুলি পাঠাইয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, মেজর কোকের কার্য-প্রভাবে ইংরাজ অবস্থানের পশ্চাদ্দিকে আর সিপাহি রহিল না।

৫ই জুলাই। এই দিন ইংরাজ সেনার পক্ষে বড়ই দুর্দিন। সেনাপতি স্যর হেনরি বার্নার্ড বিষম ওলাউঠা রোগে এই দিন দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রলাপেও তিনি যুদ্ধের কথা বকিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের ভাবনাই ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজ দলের যে ক্ষতি

হইয়াছিল, সে ক্ষতি সহসা পূরণ হইবার নহে। সেনাপতি বার্নার্ডের বুদ্ধি, অদম্য সাহস এবং অসাধারণ তেজস্বিতার প্রভাবেই ইংরাজ সেনা এখন অনায়াসে রীজ অধিকার করিয়া দিল্লির সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে পারিয়াছিল।

সেনাপতি বার্নার্ডের মৃত্যুর পর সেনাপতি রীড প্রধান সেনানায়কের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি হইয়াই যমুনার লহরের উপরের সকল পুল ও সাঁকো ভাঙিয়া দিতে হুকুম করিলেন। কেবল পশ্চাদ্দিকের একটি পুল ভাঙিলেন না। এমনকি ফুলচন্দর নামক জলের উচ্চ লহর নজফগড় নামক ঝিলের পুল প্রভৃতি বহু পুরাতন এবং অপূর্ব রথ্যাশিল্পের পরিচায়ক কীর্তি সকলও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। সেনাপতি রীড এই ভাবে দিল্লির সম্মুখে ইংরাজের অবস্থানকে যতদূর সম্ভব দুর্গম ও দৃঢ় করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তিনি নিজে পীড়িত ছিলেন, সুতরাং স্বয়ং সর্বত্র সকল কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যাহা হউক, এই সময় চারি দিন কাল উভয় পক্ষই যুদ্ধ করেন নাই। সহসা ৯ই জুলাই প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, দিল্লি হইতে দলে দলে সিপাহিগণ বাহির হইতেছে এবং ইংরাজের অবস্থানের কোন দিক আক্রমণ করিবে, তাহা যেন স্থির করিতে না পারিয়া এদিক ওদিক করিতেছে। ইংরাজের অবস্থানের দক্ষিণ দিকটা একটু ঢালু ও পরে সমতলভূমি ছিল। এই সমতল ভূমিতে একটা মৃত্তিকাস্তূপের উপর ইংরাজ একটা ঘাঁটি বসাইয়াছিলেন; সেই ঘাঁটিতে ঘোড়ার তোপের দুইটি তোপ, ড্রেগুণ অশ্বারোহী দলের এক রেসালা অশ্বারোহী, জনকয়েক দেশীয় কড়াবীণধারী অশ্বারোহী এবং কিছু ইংরাজ পদাতি ছিল। লেফটেনান্ট হিলস এবং লেফটেনান্ট স্টিলম্যান এই ঘাঁটির অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এই ঘাঁটির কিছু দূরে ফকিরদিগের আখড়া ছিল, তাহারই পার্শ্বে ঘনবিন্যস্ত বাগান, আর সেই বাগানের পার্শ্বে রাজপথ এই সকল আবরণের জন্য এই ঘাঁটি রীজের সকল স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সহসা সিপাহির দল এই ঘাঁটির দিকে যাইয়া পড়িল। সিপাহি অশ্বারোহীগণ বিদ্যুদ্বেগে গিয়া ঘাঁটি আক্রমণ করিল, ফকিরের আখড়া দখল করিল, আর ইংরাজপক্ষের কড়াবীণধারী অশ্বারোহীদিগকে যেন কচুকাটার মতো নিমেষ মধ্যে কাটিয়া ফেলিল! লেফটেনান্ট হিলস দেখিলেন যে, তাঁহার ঘাঁটি রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পক্ষের ৩২ জন যোদ্ধা ধরাশায়ী হইয়াছে; বুঝি বা তোপগুলিও হস্তান্তরিত হয়। এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার সকল গোরা সেনাকে ডাকিয়া সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করিবেন কাহার সঙ্গে? ভীম জল প্লাবনের প্রবাহের ন্যায় সিপাহি অশ্বারোহীর দল দুর্বার বেগে অগ্রসর হইতেছে এবং যাইতে যাইতে দুই দিকে ইংরাজ সেনা কাটিয়া ফেলিতেছে। লেফটেনান্ট হিলস, মেজর টুম্বস প্রভৃতি ইংরাজ সেনানিগণ আহত হইয়া পড়িল; হিলসের ঘাঁটি সিপাহিদিগের অধিকৃত হইল। কিন্তু সিপাহিগণ সে ঘাঁটি অধিকার করিয়া রাখিল না। তাহারা আরও অগ্রসর হইল এবং মেজর অলফার্টসের অধীন দেশীয় গোলন্দাজদিগের আড্ডায় যাইয়া সেনাদিগকে বলিল, "তোপ তৈয়ার কর এবং আমাদের সঙ্গে দিল্লির দিকে আগমন কর।" উত্তরে ইংরাজ পক্ষের গোলন্দাজ সিপাহিরা বলিল, "কে হে তোমরা, যে তোমাদের কথা শুনিব?" এইরূপ বচসা চলিতেছে, এমন সময় সিপাহি যে ইংরাজ অবস্থানের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া ইংরাজ সেনার দ সম্মিলিত হইয়া সিপাহি অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিল। সিপাহির দল কিন্তু এ

আক্রমণে ভীত না হইয়া সবেগে অগ্রসর হইল এবং রীজের উপর দিয়া ইংরাজ অবস্থান দ্বিধা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এই অপূর্ব বীরত্ব প্রকাশে সিপাহি সওয়ারের দলে ৩৫ জন বীর দেহত্যাগ করিয়াছিল; আর ইংরাজের পক্ষে শত শত যোদ্ধা ধরাশায়ী হইয়াছিল। সওয়ারদিগের এই অপূর্ব বীরত্ব বিকাশের সময় দিল্লির প্রাচীর হইতে অজস্র ধারায় গোলাবৃষ্টি হইতেছিল। ওদিকে শব্জীমণ্ডী গ্রামের ভিতরে একদল পদাতি সিপাহি প্রবেশ করিয়া ইংরাজের নূতন ঘাঁটির উপর অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেনাপতি চেম্বার্লেন ব্যাপার বিষম হইয়া দাঁড়াইতেছে বুঝিয়া একদল গোরা সেনা লইয়া শব্জীমণ্ডীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মেজর বিড়কে কিছু গোরা পদাতি লইয়া ঘুরিয়া শব্জীমণ্ডীর দিকে যাইতে আদেশ দিলেন। শব্জীমণ্ডী গ্রামের ভিতরে আবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, —গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে, বাড়ির ছাদের উপর, প্রাঙ্গণে, গলিতে যুদ্ধ হইতে লাগিল। সূর্যাস্তের পরে আবার শব্জীমণ্ডী সিপাহি শূন্য হইল। শব্জীমণ্ডীর এই ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে একজন উচ্চপদস্থ সেনাধিনায়ক, ৪০ জন গোরা, ৮টি সেনানী হত হইয়াছিল এবং ১৬০ জন আহত হইয়াছিল ও ১১ জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সিপাহির পক্ষেও বহু বীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

শব্জীমণ্ডীর এই যুদ্ধের পর পাঁচ দিন উভয় পক্ষেই আর কোন যুদ্ধ হয় নাই। ১৪ই জুলাই তারিখে প্রাতঃকালে সিপাহির দল আবার হিন্দু রাওয়ের গৃহ এবং শব্জীমণ্ডী আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের মুখে প্রথমে দিল্লির প্রাচীর হইতে অনবরত গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহিগণও সেই অবসরে দলে দলে দিল্লি হইতে বাহির হইল। সেনাপতি রিড ও চেম্বার্লেন বুঝিলেন যে, আজও ব্যাপার বড় সহজ হইবে না। এইজন্য সেনাপতি রিডের আদেশ অনুসারে সেনাপতি শাওয়ার্স ইংরাজ সেনার একটি বাহিনী গড়িয়া অর্ধপথে সিপাহিদিগের আক্রমণ রোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। সেনাপতি শাওয়ার্সের সঙ্গে সেনাপতি চেম্বার্লেন, মেজর রিড, মণি, টার্নার প্রভৃতি ইংরাজ পক্ষের বড় বড যোদ্ধা অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহারা দেখিলেন যে, সম্মুখে একটা ভগ্ন প্রাচীব ও ছাদের ভগ্নাংশের উপর সিপাহিগণ দাঁড়াইয়া অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতেছে, কাহাব সাধ্য এক পদ অগ্রসর হয়? ইংরাজ সেনাব সমগ্র দল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া গেল। সেনাপতি চেম্বার্লেন প্রমাদ গনিলেন; ভাবিলেন এ ভাবে ইংরাজের অভিযান স্থগিত হইলে পরাজয় অনিবার্য হইবে। সেনাপতি শাওয়ার্স বাঁকিয়া ঘুরিয়া সিপাহি দলকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেনাপতি চেম্বার্লেন কাহারও কোন হুকুম না শুনিয়া ঘোড়া সমতে লাফাইয়া শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দেখা-দেখি একজন দুইজন করিয়া বহু ইংরাজ অশ্বসাদী সিপাহিদিগের দলের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেজর কোক, হডসন, মনি ও গুর্খাগণ চারিদিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। হডসন অতি আগ্রহবশত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সিপাহিদিগকে দিল্লির লাহোর দরওয়াজা পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহাকে একটু বিপন্ন হইতে হইল। সহসা সিপাহিগণ তাঁহাকে যেভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে সদলবলেই মরিতে হইত; কিন্তু সিপাহিদিগের সেই অজ্ঞেয় অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই হউক বা অদ্ভুত ঔদাসীন্যের বশেই হউক হডসন আহত হইয়াও ইংরাজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে চেম্বার্লেন আহত হন এবং তাঁহার সঙ্গে আরও ষোলজন সেনানী এবং ১৭০ জন সেনা আহত হইয়াছিলেন।

ইংরাজের পক্ষে হতের সংখ্যার ঠিক ছিল না; তবে ১৫ জন সেনাধিনায়ক হত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র (Little) রবার্টস (পরে লর্ড রবার্টস) আহত হইয়াছিলেন।

১৭ই জুলাই। এই তারিখে সেনাপতি রিড অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি আর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে পারিলেন না এবং আর্চডেল উইলসন মহোদয়কে প্রধান সেনাপতির পদ দিয়া অবসর লইয়া সিমলায় চলিয়া গেলেন। সেনাপতি আর্চডেল উইলসন ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের একজন বিখ্যাত সেনানী ছিলেন; তাঁহার বুদ্ধি প্রভাবে দিল্লি পরিণামে ইংরাজের করতলগত হয়।

১৮ই জুলাই তারিখে দিল্লির সিপাহিগণ আবার সদলবলে শব্জীমণ্ডী ও হিন্দু রাওয়ের গৃহ আক্রমণ করে। ইহাই তাহাদের শাজীমণ্ডীর শেষ আক্রমণ। বলিতে কি, এই যুদ্ধের পর সিপাহিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লিতে একরূপ অবরুদ্ধই হইয়াছিল। গুজব যে, এই যুদ্ধের সময়েই দিল্লিতে বখত খাঁ আহত হইয়া দেহত্যাগ করেন। একটা ছুটা গুলি আসিয়া তাঁহার চোয়াল ভাঙিয়া যায় এবং সেই আঘাতেই তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। অনেকের বিশ্বাস যে কোন ঈর্ষী মুসলমান সেনানী গুপ্তভাবে বখত খাঁকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল। হিন্দুস্থানের হিংসা ও ঈর্ষা যতদিন ভারতে অধিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন ভারতের মঙ্গল সাধনা মনুষ্য সামর্থ্যের অতীত থাকিবেই!

এই সময়ে ইংরাজের দলে অনেক ভা। ভাল ইঞ্জিনিয়ার সেনানী এবং নূতন তোপ গোলা ও বারুদ আসিয়া পৌঁছে। এই সময় হইতে দিল্লিতে আর নূতন সিপাহি প্রবেশ করে নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ইংরাজের পক্ষে সাহায্য লাভের সময় আসিল, আর সিপাহির পক্ষে নিঃসহায় হইবার সময় আসিল। ইহার পর সিপাহিগণ সমানভাবে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজ পক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি ঘটাইতে পারে নাই। কেননা, ইংরাজের পক্ষে অসংখ্য শিখ গোলন্দাজ সেনা ও অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। স্যর জন লরেন্স এতদিন পরে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার অবসর পাইয়াছিলেন। এতদিন পরে ভারতের অন্যান্য স্থান হইতেও নানাবিধ সেনা দিল্লির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এতদিন পরে দিল্লির অবরুদ্ধ সিপাহিদিগের মধ্যে বিষম দলাদলি ও রেষারেষির ভাব প্রকট হইয়া পড়িল। এতদিন পরে ইংরাজের পক্ষে দিল্লি জয় কালসাপেক্ষ হইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দিল্লির পারিপার্শ্বিক ঘটনা

ইংরাজ কর্তৃক দিল্লি পুনরুদ্ধারের ভীষণ কাহিনি পরিসমাপ্ত করিবার পূর্বে এই সময় দিল্লির চারি পার্শ্বের এবং পঞ্জাবের তাৎকালিক অবস্থা ও ইংরাজ কর্তৃক উদ্‌যোগ আয়োজনের কথা বলিয়া রাখিলে দিল্লির ভীষণ পরিণতির কাহিনি অনেকটা বুঝা যাইবে।

পেশাবর—১৮ই মে তারিখে ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন চিফ কমিশনার স্যর জন লরেন্সের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য রাওলপিণ্ডিতে গমন করিলেন। স্যর জন লরেন্স ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনের সহিত পরামর্শ করিয়া পেশোয়ার হইতে এডওয়ার্ডেস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখনও অভিযান বাহিনী গঠিত হয় নাই; এই বাহিনীতে সীমান্ত প্রদেশের পাঠান সেনাদলকে গ্রহণ করা হইবে কিনা, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এদিকে ইনি ইংরাজ নরনারীগণকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও করিলেন। শিয়ালকোটে যে ইংরাজ সেনাদল ছিল, তাহাদিগকে এই অভিযান বাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদিকে তিনি লাহোরে পাঠাইয়া দিবার জন্য হুকুম দিলেন। শিয়ালকোটে এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার ফ্রেডারিক ব্রাইন্ড সৈনিক-নিবাসের ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ক ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার অধীন সিপাহির দল বিশ্বস্ত ও ইংরাজের অনুগত, তাহারা এই সঙ্কট কালেও ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না। সেই জন্য ব্রিগেডিয়ার ব্রাইন্ড স্যর জন লরেন্সকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, শিয়ালকোটের সেনাদল সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহার ফলে সিপাহিদিগের প্রতি অবিশ্বাসই প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু স্যর জন লরেন্স কোন কথাই শুনিলেন না, তিনি ব্রিগেডিয়ার ব্রাইন্ডকে তাঁহার আদেশমতো কার্য করিতে বলিলেন।

এই সময়েই সংবাদ আসিল যে পেশাবরে অশান্তির লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। নৌসেরায় ৫৫ নং দেশীয় সেনাদল ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এবং তোপখানা দখল করিয়াছে। পেশাবর উপত্যকা হইতে ২৭নং গোরা পদাতি দল এবং গাইড সেনাদলকে স্থানান্তরিত করায় এই অঞ্চলে গোরা সেনার প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছিল; সুতরাং এই সমাচার পাইয়া সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। এদিকে সেনাপতি নিকলসন সীমান্ত প্রদেশে সেনা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, কেহই ইংরাজের দলে প্রবেশলাভ করিতে চাহিল না; পরন্তু সীমান্ত প্রদেশেও অশান্তির লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। ২১শে মে তারিখে রাত্রিকালে এইরূপ স্থির হইল যে, পেশাবরের দেশীয় সেনাদলকে অবিলম্বে নিরস্ত্র করিতে হইবে। সেনাপতি এডওয়ার্ডেস্‌ ও সেনাপতি নিকলসন বুঝিলেন যে, পেশাবরে দেশীয় সেনাদল নৌসেরার বিপ্লবের কথা জানিতে পারিলে তখন আর তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা সহজসাধ্য হইবে না। তাঁহারা উভয়েই ব্রিগেডিয়ার সিডনি

কটনকে তাঁহাদের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার অনুমোদনক্রমে আদেশ দিলেন যে, দেশীয় সেনাদলের সেনানীদিগকে প্রত্যুষেই তাঁহাদের অ-বাসে উপস্থিত হইতে হইবে।

যথাসময়ে সেনানীগণ ব্রিগেডিয়ারের আবাসে উপস্থিত হইলে ব্রিগেডিয়ার সিডনি কটন তাঁহাদিগকে আশঙ্কার কথা বুঝাইয়া দিলেন। সেনানীগণ প্রকাশ করিলেন যে, দেশীয় সেনাদল কখনও অবিশ্বাসের কার্য করে নাই, এখনও তাহাদিগের মধ্যে অসন্তোষের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সিডনি কটন সে কথা শুনিলেন না। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, যে দেশীয় সেনাদল বিশ্বস্ত থাকে, সে ত ভাল কথা, কিন্তু তাহারা যদি বিগড়াইয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে সাবধান হইবার এই উপযুক্ত সময়, ইহার পর শত চেষ্টা করিলেও আর কোন ফল হইবে না। কাজেই প্রাতঃকালে ৭টার সময়ে প্যারেড ভূমিতে সেনাদলকে নিরস্ত্র করাই স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে ইংরাজ সেনাদল প্যারেড ভূমিতে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। পাঁচ দল দেশীয় রেজিমেন্টের মধ্যে চারিদলকে নিরস্ত্র করা হইল। একদল অর্থাৎ ২১নং দেশীয় সেনাদলকে (এক্ষণে ১ নং বেঙ্গল পদাতি দল বলিয়া পরিচিত) নিরস্ত্র করা হইল না। ইহার কারণ এই যে, এই দল নিতান্ত নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেছিল, এই দলে উপযুক্ত সেনানীগণ ছিলেন এবং একদল দেশীয় সেনা ব্যতীত পেশাবর অঞ্চলের কার্য সুসম্পন্ন হইবার উপায় ছিল না। যাহা হউক, এই সেনা নিরস্ত্রীকরণের ফল নিতান্ত মন্দ হইল না। এ সম্বন্ধে কমিশনার এডওয়ার্ডেস্ লিখিয়াছিলেন, "আমরা যখন সেনাদলকে নিরস্ত্র করিতে গমন করি, তখন অতি অল্পসংখ্যক সর্দাব ও সীমান্ত প্রদেশের কয়েকজন মাত্র লোক আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল; কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের পর আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমাদের বন্ধুর সংখ্যার আর ইয়ত্তা ছিল না; এমন কি তখনই দলে দলে লোক আসিয়া আমাদের সেনাদলে সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রকাশ করে।"

যে চারিদল দেশীয় সেনাকে নিরস্ত্র করা হইল, ৫১ নং পদাতিদল তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এই দলের সুবাদার-মেজর পূর্বেই চক্রান্ত করিয়াছিলেন। ৬৪নং সেনাদল বিভিন্ন ঘাঁটিতে পাহারা দিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে পত্র লিখিয়া ২২শে মে তারিখে সম্মিলিতভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রের মর্ম এইরূপ :—"যেমন করিয়া পার, ২১শে তারিখে পেশাবার আসিও—আসল কথাটা বেশ করিয়া বুঝিও, যেন ভুল না হয়। ফল কথা, সেখানে আহার করিবে এবং এখানে আসিয়া জল পান করিবে; অর্থাৎ সেইখানেই প্রথম ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ইংরাজবধ করিয়া এখানে আসিবে এবং এখানে ইংরাজের শোণিতে পিপাসা দূর করিব।" কিন্তু অতি সত্বর সেনাদলকে নিরস্ত্র করায় সুবাদার মেজরের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। তথাপি তিনি নিরাশ হইলেন না। ২২ শে তারিখে রাত্রিকালে ২৫০ সেনা সমভিব্যাহারে তিনি সেনানিবাস হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে অস্ত্র না থাকিলেও সীমান্ত প্রদেশে যথেষ্ট অস্ত্র মিলিতে পারিবে; আফ্রিদিরা অবশ্যই তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। আফ্রিদিরা দেখিল যে, কয়েকজন ইংরাজ গোরা চারিদল সিপাহিকে অনায়াসে নিরস্ত্র করিল; তাহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, ইংরাজের

প্রতাপ ও প্রভাব পূর্ববৎ আছে, ইংরাজের ক্ষমতা অদম্য। সেইজন্য তাহারা এই নিরস্ত্র সিপাহিদিগকে খাতির করিল না। ইহাদিগের সহিত অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে খাতির করিলেও করিতে পারিত, কিন্তু ২৫০ নিরস্ত্র লোককে তাহারা খাতির করায় কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে করিল না। তাহারা বরং ইহাদিগকে ধরিয়া ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিল। যথাসময়ে সামরিক বিধান অনুসারে ইহাদিগের বিচার হইয়া গেল। সুবাদার-মেজরকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাইতে হইল।

মর্দন—এদিকে ২২শে মে তারিখে সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার পর অপর কোন গোলযোগের সূত্রপাত না হইলেও পরদিন অর্থাৎ ২৩শে মে তারিখে সমাচার আসিল যে, মর্দনে ৫৫নং দেশীয় পদাতি দল এবং নৌসেরা ও মর্দনে বিভক্ত ১০নং ইরেগুলার অশ্বারোহীর দল ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। অবিলম্বে একদল সেনা সেই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল; জন্ নিকলসন এই সেনাদলের সঙ্গে গমন করিলেন। ২৫শে তারিখে এই সেনাদলকে দূর হইতে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই ইংরাজের বিরোধী সিপাহিরা দুর্গ হইতে বাহির হইল এবং সোয়াত পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। জন নিকলসন ক্ষিপ্রতাসহকারে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং রাত্রি সমাগমের পূর্বেই ১২০ জনকে বধ ও শতাধিক লোককে বন্দি করিলেন। যাহারা পলায়ন করিতে সমর্থ হইল, তাহারা পার্বত্য পাঠানদিগের নিকটে সমাদৃত হইল না; কাজেই তাহারা পথে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহারাও শেষে রোগে অথবা ইংরাজের তরবারির ও গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করে. এত করিয়াও জন্ নিকলসন একজন ইংরাজ সেনানীকে হারাইলেন। তাঁহার সেনাদলের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় উত্তেজিত সিপাহিদিগের কর্নেল স্পটিশউড বেগতিক দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। জন নিকলসন মর্দনে প্রত্যাগত হইয়া যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন আর তাঁহার পরিতাপের সীমা রহিল না।

এই সময়েই পঞ্জাবের অভিযান-বাহিনীর (Moveble Column) গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইল। পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন সেনানিবাস হইতেই অশান্তির সমাচার আসিতে লাগিল। এই বাহিনী কি উপায়ে সকল দিক রক্ষা করিবে,তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। ইতোমধ্যেই স্থির হইয়া গিয়াছিল যে এই বাহিনীর মধ্য হইতে কোন কোন সেনাদলকে দিল্লির পথে পাঠাইতে হইবে। স্যর জন লরেন্স দিল্লি অধিকারের জন্য এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি পঞ্জাবের ভবিষ্যৎ চিন্তাও অনেক সময় বিস্মৃত হইতেছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্কল্প অটল রাখিয়া পূর্বেই আদেশ দিয়াছিলেন যে, গাইড সেনাদল এবং ১নং পঞ্জাবী পদাতিদল যেন অভিযান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত না হয়; তাহারা যেন দিল্লির দিকে গমন করে। কাপ্তেন ড্যালি এই গাইড দলের সেনানায়ক ছিলেন। এই গাইড দল অশ্বারোহী ও পদাতি সেনার সম্মিলত দল এবং প্রভূত ক্ষমতাশালী বলিয়া জ্ঞাত ছিল। এই গাইড দলে তিনটি অশ্বারোহী দল এবং ছয় কোম্পানি পদাতি ছিল। গাইড দল পঞ্জাবের শান্তিরক্ষক অভিয়ান-বাহিনীতে যোগ দিবার জন্য আটক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়েই কাপ্তেন ড্যালি দ্রুতপদে দিল্লির দিকে ধাবমান হইবার আদেশ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন রথনীর অধীনে ৪নং শিখ সেনাদল ও মেজর কোকের অধীনে ১নং পঞ্জাবী পদাতি দল দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহার পরেই

পঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশের সেনাদল হইতে লেফটেনান্ট জন ওয়াটসেনের অধীনতায় ১ নং পঞ্জাব অশ্বারোহী দলের এক অংশ, লেফটেনান্ট চার্লস নিকলসনের অধীনতায় ২নং পঞ্জাব অশ্বারোহী দলের এক অংশ, লেফটেনান্ট ইয়ংহাজব্যান্ডের অধীনতায় ৫নং পঞ্জাব অশ্বারোহী দলের এক অংশ, কাপ্তেন জি, গ্রিনের অধীনতায় ২নং পঞ্জাব পদাতিদল এবং কাপ্তেন এ, উইলডির অধীনে ৪নং পঞ্জাব পদাতি দল দিল্লি অধিকারের জন্য প্রেরিত হইল।

দিল্লি অধিকারের জন্য পঞ্জাবের এতগুলি সেনাদলকে প্রেরণ করিতে হওয়ায় পঞ্জাবের অভিযান-বাহিনীর বল হ্রাস পাইল। পূর্বের কথা অনুসারে ওয়াজিরাবাদেই এই অভিযানবাহিনী সম্মিলিত হইল। এই দলে মেজর ডসের ঘোড়ার তোপের দল (গোরা), কাপ্তেন বুর্শিয়ারের ইংরাজ গোলন্দাজ দল, কর্ণেল জর্জ ক্যামেলের ৫২ নং লাইট পদাতি দল, ৯নং বেঙ্গল লাইট অশ্বারোহীদলের এক অংশ এবং ৩৫নং দেশীয় পদাতি দল রহিল। ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন এই বাহিনীর ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ইংরাজ সেনাদিগের মধ্যে একটা গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হইল। ব্রিগেডিয়ারের পদ সাধারণত সেনাবিভাগের লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেলের পদের সহিত তুলনীয় বলিয়া কর্ণেল ক্যাম্বেল ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনের অধীনে কার্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কর্ণেল ক্যাম্বেল বলিলেন যে, তিনি কর্ণেল আর চেমবারলেন ব্রিগেডিয়ার অর্থাৎ সহকারী কর্নেলের তুল্য, সুতরাং তিনি ব্রিগেডিয়াবের হুকুম মানিয়া কার্য করিতে যাইবেন কেন? এই ব্যাপারে আরও একটু কথা ছিল। এই সময়ে কোম্পানির অধীন সেনানীদিগের ও বিলাতের রানি ভিক্টোরিয়ার সেনানীদিগের মধ্যে ঈর্ষার ভাব বিদ্যমান ছিল। কর্নেল ক্যাম্বেল ছিলেন রানি ভিক্টোরিয়ার অধীন সেনানী, আর ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন। কর্নেল ক্যাম্বেল এই কারণেও ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনের অধীনে কার্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন দেখিলেন যে, এ সময়ে বিরোধের সময় নহে। তিনি কর্নেল ক্যাম্বেলকে জানাইলেন যে, এরূপ অবস্থায় তিনি যেন দলবল সহ লাহোরে গমন করেন, ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এই সেনাবাহিনী ৩১শে মে তারিখে লাহোরে উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলেই ইংরাজ নরনারীর মুখে আশঙ্কার ছায়া দেখিলেন। লাহোরে তখন এক লক্ষ লোকের বাস ছিল। অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ও শিখ। এই সময়ে এক দল ইংরাজ এবং এক দল দেশীয় সেনা লাহোরের দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। লাহোরের ছয় মাইল দূরে মিঞামীর নামক স্থানে একটি সেনানিবাস ছিল। এই সেনানিবাসে তিন দল পদাতি, এক দল অশ্বারোহী এবং এক দল ইংরাজ পদাতি ও কতিপয় কামানরক্ষক সেনা অবস্থান করিত। ইংরাজ সেনার সংখ্যা সিপাহি সংখ্যার এক চতুর্থাংশের অধিক ছিল না।

১১ই মে মীরটের সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হয়। এই দিন রবার্ট মন্টগোমারি মীরটের সিপাহিদিগের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া ইতি-কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না করিতেই পর দিবস দিল্লির ভয়ঙ্কর ঘটনা জানিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। রবার্ট মন্টগোমারি দেখিলেন যে. পঞ্জাবে বহুসংখ্যক সিপাহি অবস্থিতি করিতেছে। পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানগণ

আজন্ম বীর-ধর্মই পালন করিয়াছে। তাহার উপর পঞ্জাবের অনতিদূরে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, জিগীষু আফগানগণ পার্বত্য প্রদেশে বাহুবল প্রকাশের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। রবার্ট মন্টগোমারি স্থির করিলেন, যে যেমন করিয়া হউক ইহাদিগকে ইংরাজের প্রাধান্য ও বলবত্তা দেখাইয়া দিতে হইবে। লাহোরের এক মাইল দূরে আনারকালি নামক স্থানে তিনি অপরাপর সেনানী ও রাজপুরুষের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সিপাহিরা গুলি, বারুদ ও বন্দুকের ক্যাপ রাখিতে পারিবে না এবং লাহোরের দুর্গে অতিরিক্ত ইংরাজ সৈন্য রাখা হইবে। এই প্রস্তাব সকলের অনুমোদিত হইল। রবার্ট মন্টগোমারি একজন সেনানীর সমভিব্যাহারে মিঞামীরের সেনানিবাসে ব্রিগেডিয়ার কর্বেটর নিকটে গমন করিলেন। শুনা যায় যে, এই সময়েই তিনি একটি চক্রান্তের কথা জানিতে পারেন।

লাহোর নগর প্রাচীর বেষ্টিত; এই প্রাচীরের মধ্যেই দুর্গ অবস্থিত ছিল। একদল ইংরাজ সেনা, একদল কামানরক্ষক পদাতি এবং মিঞামীরের সেনানিবাসের ২৬ সংখ্যক সিপাহিদলের কতিপয় সৈন্য এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল; নগরের শান্তিস্থাপন ও ধনাগাররক্ষা করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ২৬ নম্বর দলের যে সকল সিপাহি মে মাসের প্রথমে দুর্গে পাহারা দিতেছিল, ১৫ই মে তাহাদের পালা শেষ হয় এবং তাহাদের স্থলে মিঞামীরের ৪৯ নম্বর সিপাহিরা দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করে। ষড়যন্ত্রকারিগণ নাকি এই সময়সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, যখন ৪৯ নম্বর দলের সিপাহিরা ২৬ নম্বর সিপাহিদিগকে অবসর দিবার জন্য দুর্গে আসিবে, তখন ইহারা উভয় দল সমবেত হইয়া অর্থাৎ প্রায় ১, ১০০ জন সিপাহি অবিলম্বে ইংরাজ সেনানায়কদিকে আক্রমণ ও দুর্গদ্বার অধিকার করিবে। দুর্গে তখন ২৫০ জনের অধিক ইংরাজ সেনা ছিল না, কাজেই সিপাহিরা অনায়াসেই তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। সিপাহিরা নাকি তারও স্থির করিয়াছিল যে, অতঃপর অস্ত্রাগার ও ধনাগার অধিকার করা হইবে এবং নিকটবর্তী শূন্য হাসপাতাল ভবনে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইবে। হাসপাতালে দাহের উদ্দেশ্য এই যে, এই আগুন দেখিয়া মিঞামীরের সিপাহিরা বুঝিতে পারিবে যে, দুর্গস্থিত সিপাহিরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারাও সেই সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের দুই হাজার কয়েদীকে বিমুক্ত করা হইবে। কথিত আছে, লাহোর ব্যতীত ফিরোজপুর, ভেলোর, জলন্ধর এবং অমৃতসরেও এই ষড়যন্ত্রের বিস্তার হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে লাহোর অঞ্চলে সর্বব্যাপী যড়যন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল কি না, তাহা কেহই অবিসংবাদিতরূপে বলিতে পারেন নাই। কাপ্তেন লরেন্স নামক পুলিশ ও ঠগী বিভাগের অধ্যক্ষ আপনার প্রধান মুন্সীকে (অযোধ্যার জনৈক ব্রাহ্মণ) লাহোরের সিপাহিদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য আদেশ দেন। এই মুন্সীই অনুসন্ধান করিয়া সিপাহিদিগের মধ্যে গভীর উত্তেজনার নিদর্শন দেখেন। মুন্সী এই অনুসন্ধানের পর রিচার্ড লরেন্সকে বলেন "সাহেব! মিঞামীরের সিপাহিরা গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই শত্রুতা সাধনের সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছে।" কিন্তু মিঞামীরের সিপাহিরা কিরূপে একতায় আবদ্ধ হইয়াছিল, কিরূপে সকলে ইংরাজের শত্রুতা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই মুন্সীর কথায় কিছুই পরিস্ফুট হয় নাই। যাহা হউক রবার্ট

মন্টগোমারি ব্রিগেডিয়ার কর্বেটের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবশ্যম্ভাবী বিপদ নিবারণের জন্য সদুপায় নির্ধারণ করিতে বলিলেন। ব্রিগেডিয়ার সিপাহিদিগকে একবারে অস্ত্রশূন্য না করিয়া তাহাদিগকে মন্টগোমারির প্রস্তাব অনুসারে গোলা, গুলি, বারুদ প্রভৃতি না দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু সে দিন এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য করা হইল না। এই বিলম্বের ফলে তাঁহার মনের গতি পরিবর্তিত হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করাই শান্তিরক্ষার একমাত্র উপায়। ব্রিগেডিয়ারের এই প্রস্তাব মন্টগোমারির অনুমোদিত হইল। কিন্তু এই প্রস্তাব কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইল না। পাছে সিপাহিরা কোনরূপ সন্দেহ করে, এই জন্য এই দিন (১২ই মে) রাত্রিকালে ইংরাজগণ বল নাচে আপনাদিগের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সিপাহিদিগকে বুঝিতে দিলেন যে, তাঁহারা মনোমধ্যে কোনরূপ শঙ্কাকেই স্থান দেন নাই। কিন্তু ইংরাজ সেনানীদিগকে গোপনে বলিয়া দেওয়া হইল যে, পর দিন ১৩ই মে, প্রাতঃকালে সকলে সুসজ্জিত হইয়া যেন কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করেন। সেইখানেই সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, এইরূপ স্থির হইয়া গেল।

ব্রিগেডিয়ারের আদেশে যথাসময়ে ইংরাজ সেনাদল ও সিপাহিগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। মন্টগোমারি প্রমুখ রাজপুরুষগণ আনারকালি হইতে অশ্বারোহণে ওই স্থানে আগমন করিলেন। দক্ষিণে কামানসহ কামান রক্ষকগণ এবং ৮১ নম্বর দলের প্রায় আড়াই শত ইংরাজ সেনা অবস্থান করিতে লাগিল। বামে দেশীয় অশ্বারোহিগণ দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যভাগে সিপাহিগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর প্রত্যেক সেনাদলের সম্মুখে বারাকপুরের, ৩৪ নম্বর সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণের আদেশলিপি পঠিত হইল।

অতঃপর দেশীয় সেনাদলকে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগে যাইতে এবং ৮১নং গোরা সেনাদলকে অশ্বারোহীদিগের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে আদেশ দেওয়া হইল। কামান রক্ষকগণ সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ভাগেই রহিল। তাহারা এই স্থানে থাকিয়া সিপাহিদিগের অলক্ষ্যে কামান ভরিতে লাগিল। ইহার পর হিন্দুস্থানী ভাষায় সিপাহিদিগকে বলা হইল : —"এক্ষণে অন্যান্য সেনাদলে বিদ্রোহভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার ফলে অনেক সেনার সর্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। মিঞামীরের সেনাদল গবর্নমেন্টের কার্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছে। এই সেনাদল যাহাতে পরের মন্ত্রণায় বিপথে পরিচালিত না হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বঞ্চিত করাই স্থির হইয়াছে। সেইজন্য সমগ্র সেনাদলকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা আপনাদের সমস্ত অস্ত্র এক স্থানে জমা করুক।" এই সময় ৮১ নং ইংরাজ সেনাদল দুই দলে বিভক্ত হইয়া কামানের উভয় পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সিপাহিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র এক স্থানে জমা করিবার আদেশ দেওয়া হইলে তাহারা মুখ ফিরাইয়াই আপনাদের সমক্ষে গোলা ভরা কামান দেখিতে পাইল। কামান রক্ষকগণ তখন বাতি জ্বালিয়া কামানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; এদিকে ৮১নং গোরা সেনাদলও সেনাপতির আদেশে বন্দুক ভরিতে লাগিল। সিপাহিরা ব্যাপার বুঝিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সেনাপতির আদেশ পালন করিল—সকল সিপাহিই ধীরে ধীরে আপনাদের অস্ত্রসমূহ এক স্থানে জমা করিয়া রাখিল। এইরূপে বিনা গোলযোগে ৬০০ গোরা সেনার

সাহায্যে ২৫০০ সিপাহিকে নিরস্ত্র করা হইল। যাহা হউক, ৮১নং সেনাদল অগ্রসর হইয়া সিপাহিদিগের পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ অধিকার করিল। কতকগুলি গো-যানে এই সকল অস্ত্র বোঝাই দিয়া সৈনিকনিবাসে লইয়া যাওয়া হইল। নিরস্ত্র সিপাহিরা অতঃপর শান্ত ভাবে সেনানিবাসে চলিয়া গেল।

মিঞামীরে সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণের কার্য সম্পন্ন হইল, কিন্তু তখনও ২৬নং দলের সিপাহিগণ লাহোরের দুর্গে সশস্ত্র অবস্থায় ছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ১৫ই পর্যন্ত ইহাদের পাহারার দিন ছিল। এদিকে ১৪ই মে প্রাতঃকালে ৮১ নম্বর গোরা সেনাদলের কতিপয় ইংরাজ সেনা সহসা দুর্গে উপস্থিত হইল। এই সেনাদলের অধ্যক্ষ কর্নেল স্মিথ দুর্গে উপস্থিত হইয়াই সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিলেন। অবিলম্বে তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। সহসা নিরস্ত্রীকরণের আদেশ শুনিয়া সিপাহিরা ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু তাহারা এই আদেশ প্রতিপালনকালে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিল না। অনন্তর এই সিপাহি দল ধীরভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মিঞামীরের সেনানিবাসে চলিয়া গেল। এদিকে মন্টগোমারি সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ নরনারীর রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিলেন। পুলিশ বিভগের পঞ্জাবীগণ পাহারায় নিযুক্ত হইল। সিপাহিদিগের নামে ডাকঘরে যে সকল পত্র আসিতে লাগিল, মন্টগোমারির আদেশে তৎসমুদয় আটক করা হইল। মন্টগোমারি কেবল লাহোর রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। অন্যান্য স্থান নিরাপদ করিবার চেষ্টাও তিনি করিলেন। মীরটে বহুসংখ্যক ইংরাজ অশ্বারোহী, পদাতি ও কামান-রক্ষক ছিল, তথাপি মীরটের ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ক তাহাদিগকে স্থানান্তরে অশান্তি নিবারণকল্পে পাঠাইতে পারেন নাই। এই সকল সেনা কেবল মীরট রক্ষার জন্যই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু মিঞামীরে আশু আশঙ্কার পথ দূর করায় মন্টগোমারি মিঞামীরের সামান্য সেনা দলেরই কিয়দংশ লাহোরের দুর্গে পাঠাইয়া দিতে এবং আর এক অংশ অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিতে সমর্থ হন।

লাহোর হইতে ৩০ মাইল দূরে অমৃতসহর নগরে গোবিন্দগড় দুর্গ অবস্থিত। অমৃতসহর শিখ সমাজের পবিত্র তীর্থ স্থান। গুরু গোবিন্দের পবিত্র নামানুসারে এই দুর্গের নাম গোবিন্দগড় রাখা হইয়াছিল। সুতরাং পঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানের শিখদিগের সহসা উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। রবার্ট মন্টেগোমারি এজন্য সর্বপ্রথম গোবিন্দগড় রক্ষার সঙ্কল্প করিলেন। এইজন্য তিনি দিল্লি হইতে তারযোগে দুর্ঘটনার সমাচার পাইয়াই ১২ই মে প্রাতঃকালে অমৃতসহরের ডেপুটি কমিশনার কুপার সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, "উপস্থিত বিষয়ে এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। যাহাতে সিপাহিরা কোনরূপ আশঙ্কা করে, এমন কার্য করা কর্তব্য নহে। গোবিন্দগড় রক্ষার ভার যে সকল সিপাহির প্রতি সমর্পিত আছে, তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জলন্ধরে কি ঘটিতেছে, তাহারও সন্ধান লওয়া উচিত।" গোবিন্দগড়ে সিপাহিদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল, এতদ্ব্যতীত কতিপয় ইংরাজ কামান রক্ষক অবস্থিতি করিতেছিল। সহসা অমৃতসহরে জনরব উঠিল যে, লাহোরের নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিগণ গোবিন্দগড় অধিকারের জন্য আগমন করিতেছে। এই জনরব শুনিয়াই কুপার সাহেব কয়েকজন বিশ্বস্ত শিখ ও অশ্বারোহীর সহিত দুর্গদ্বায়ের অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সহকারী

মাক্‌নাটন সাহেব নিকটবর্তী পল্লীবাসীদিগকে সমবেত করিয়া লাহোরের পথে রাখিলেন। গভীর রাত্রিতে একটা কোলাহল পরিশ্রুত হইল যে, লাহোরের সিপাহিরা আসিতেছে। মাক্‌নাটন সাহেব বহু সংখ্যক গোরুর গাড়ি স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া তৎসমুদয়ের দ্বারা পথ অবরুদ্ধ করিলেন। ইহারা পশ্চাতে সুদৃঢ়কলেবর জাঠ কৃষকগণ কৃষিক্ষেত্রের অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। কিন্তু সিপাহিরা আসিল না। লাহোর হইতে ৮১নং ইংবাজ সেনাদলের একাংশ গোবিন্দগড় রক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহারা এখন দ্রুতগতিতে মাক্‌নাটন সাহেবের সম্মুখীন হইল। ইহাদের আগমনে অমৃতসহরের রাজপুরুষেরা আশ্বস্ত হইলেন। ইহারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে গোবিন্দগড়ে প্রবেশ করিল।

এই সময়ে ফিরোজপুরে ৫১নং ইংরাজ সেনাদল, ১০নং দেশীয় অশ্বারোহী ও ৫৭নং দেশীয় পদাতি সেনা অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি কামান ও কয়েকজন গোলন্দাজ পদাতি ছিল। ব্রিগেডিয়ার ইনেস সৈনিকনিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১২ই মে রাত্রিকালে এক ব্যক্তি মীরট ও দিল্লির ভয়াবহ সংবাদ লইয়া লাহোর হইতে ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়। ব্রিগেডিয়ার ইনেস এই ব্যক্তির মুখে জানিতে পারেন যে ১২ই মে লাহোরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে। ১২ই মে প্রাতঃকালে ফিরোজপুরের সমগ্র সৈনিকদল ব্রিগেডিয়ারের আদেশে প্যারেড ভূমিতে সমবেত হয়। কাওয়াজের সময়ে সিপাহিরা যথারীতি সেনানায়কের আদেশ পালন করে কি না, অথবা তাহারা কোনরূপে অশান্তির পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ করে কি না, ইহাই দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য, তিনি সিপাহিদিগের কার্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই দিবস আর একজন বার্তাবহ মীরটের টেলিগ্রাফ লইয়া উপস্থিত হইল। এই বার্তাবহের মুখে অন্যান্য নানা কথা শুনিয়া ব্রিগেডিয়ার কর্মচারিগণের সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে সমগ্র সিপাহিদলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব সিপাহিদিগেব অধিনায়কগণের মনোনীত না হওয়ায় স্থির হইল যে, অপরাহ্নকালে সিপাহিদিগের উভয় দলকে পৃথক স্থানে পৃথক ভবে রাখা হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে এই উভয় স্থানে উভয় দলকে পৃথক ভাবে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বঞ্চিত করা যাইবে।

ফিরোজপুরে যথেষ্ট বারুদ ও গুলি গোলা ছিল। সর্বাগ্রে অস্ত্রাগার রক্ষার বন্দোবস্ত হইল। ৫৮নং সিপাহি দলের কয়েকজন সেনা অস্ত্রাগার রক্ষাব নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে তাহাদিগের পরিবর্তে ইংরাজ সেনাদলের এক শত জনকে অস্ত্রাগারের সম্মুখে নিযুক্ত করা হইল। বিপদের সময়ে ইংরাজ নরনারীদিগকে ওই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে বা ইংরাজদিগের সেনানিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গোপনে উপদেশ দেওয়া হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন যে, পরদিন সিপাহিদিগকে পৃথক স্থানে পৃথক ভাবে নিরস্ত্র করা হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল না। বেলা পাঁচটার সময় দুই দল সিপাহি, পৃথকরূপে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। ৫৭নং দল অধিনায়কের আদেশে, নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। ৪৫নং দল সদর বাজার দিয়া যাত্রা করিল। তাহারা পূর্বেই কর্তৃপক্ষের আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে বাজারের লোকের মুখে নানা কথা শুনিতে পাওয়ায় তাহাদের সন্দেহ বাড়িয়া উঠিল। বাজার দিয়া যাইবার সময়ে তাহারা

দেখিল যে, ইংরাজ সেনাদল ও গোলন্দাজগণ অস্ত্রাগারের নিকটে সমবেত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে মনে করিল যে, ইংরাজ সেনাদল তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে। তখন অনেকেই চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আপনাদের বন্দুক গুলিপূর্ণ করিয়া অস্ত্রাগারের সম্মুখে ধাবিত হইল। তাহাদের দলের অবশিষ্ট সিপাহিরা নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।

অস্ত্রাগারের বহির্ভাগ রক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল না। উহার পরিখায় জল না থাকায় উত্তেজিত সিপাহিরা সহজেই পরিখা পার হইল, প্রাচীরে উঠিল এবং অস্ত্রাগারের সমীপবর্তী হইল। কিন্তু যে গৃহে অস্ত্রাদি থাকিত, তাহা ছয় ফিট উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ৬১নং ইংরাজ সেনাদল উহার দ্বার রক্ষা করিতেছিল। উত্তেজিত সিপাহিরা এই সেনাদলকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ইংরাজ সেনাদলের অধ্যক্ষ আহত হইলেন। কিন্তু শেষে সিপাহিরা তাড়িত হইল। ৫৭নং দলের যে সকল সিপাহি অস্ত্রাগারে ছিল, তাহারা নিরস্ত্র হইল। এদিকে ৬১নং সেনাদলের আরও কয়েকজন সেনা অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য উপস্থিত হইল।

অস্ত্রাগার রক্ষা করা হইল বটে, কিন্তু সৈনিকনিবাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করা কষ্টকর হইল। অল্পসংখ্যক ইংরাজ সেনার দ্বারা একবারে দুই দিক রক্ষা করিবারও সুবিধা ছিল না। কাজেই অবিলম্বে বাজারে ও সৈনিকনিবাসে মহাঅশান্তি দেখা দিল। উত্তেজিত জনসাধারণ বাজারে লুঠতরাজ করিতে লাগিল। সেনানিবাসে, ইংরাজদিগের বাঙ্‌লা, ভোজন গৃহে, উপাসনামন্দির প্রভৃতি বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে উত্তেজিত লোকের ভয়াবহ কোলাহলে এবং গগনব্যাপী ধূমস্তূপে ও প্রজ্বলিত বহ্নিশিখায় নগর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

এ পর্যন্ত ৫৭নং দলের সিপাহিরা কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করে নাই। তাহাদের কেহ ৪৫নং দলের উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল যে, তাহাদের দলের অতি অল্পসংখ্যক লোকই স্থানান্তরে গিয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ইনেস এই জন্য এই দলের সিপাহিদিগকে বলিলেন যে, যদি তাহারা ইংরাজ সেনানিবাসের সম্মুখে ধীরভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে রাজভক্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন। ব্রিগেডিয়ারের কথা শুনিয়া এই দলের একাংশ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। অপরাংশও তাহাদের অনুগমনে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সময়ে ৬১নং ইংরাজ সেনাদল ৪৫নং দলের কয়েকজন সিপাহির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়াতে ৫৭নং দলের সিপাহিরা ভাবিল যে, তাহারাও অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে। এই আশঙ্কায় তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া ইতস্তত দৌড়াইতে লাগিল। তাহাদের অধিনায়কেরা তাহাদিগকে স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইল। ৫৭নং দলের সিপাহিরা ক্রমে এক স্থানে সমবেত হইল এবং ধীরভাবে ইংরাজ সেনানিবাসে গমন করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এদিকে ৪৫নং দলের সিপাহিরা পূর্বের ন্যায় অধীরভাবে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার এজন্য তাহাদের অস্ত্রাগার বিনষ্ট করিবার আদেশ দিলেন। অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালিত হইল। দুইবার বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, আর মুহূর্ত মধ্যে ৪৫নং সিপাহিদলের

অস্ত্রাগারের গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! ৪৫নং সেনাদল অতঃপর আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লির দিকে ধাবিত হইল। ৬১নং ইংরাজ সেনাদল ও ১০নং অশ্বারোহীর দল কামান লইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এইরূপে বিতাড়িত হইয়া ৪৫নং দলের সিপাহিগণের অনেকে গ্রামের ভিতরে বা জঙ্গলে লুকাইয়া রহিল।

ফিরোজপুরের ন্যায় ফিলুরেও একটি সেনানিবাস ছিল। সুতরাং ফিরোজপুরে ন্যায় এই স্থান রক্ষা কবাও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। জলন্ধব ও লুধিয়ানার মধ্যভাগে এবং দিল্লিতে যাইবার রাজপথের পার্শ্বে ফিলুরের দুর্গ অবস্থিত ছিল। দুর্গের অনতিদূরেই সেনানিবাস; সেখানে ৩নং পদাতি দল অবস্থিতি করিতেছিল। ২৪ মাইল দূরে জলন্ধরের সেনানিবাসে ৮নং ইংরাজ সেনাদল, একদল দেশীয় অশ্বাবোহী এবং ৩৬নং ও ৬১নং দলের সিপাহিগণ ছিল।

১১ই মে তারিখে দিল্লি ও মীরটের ঘটনার সংবাদ তারযোগে জলন্ধর হইতে লাহোর যায়। পরদিন সকালে স্থির কবেন যে, ফিলুরের দুর্গে ইংরাজ সেনাদল রাখিতে হইবে। রাত্রিকালে সিপাহিদিগের অজ্ঞাতসারে একদল ইংরাজ সৈন্য ফিলুরে যাত্রা করে: এদিকে ফিলুরেও ইংরাজ সেনানায়ক আত্মরক্ষার উপায় করিতে থাকেন। তার বিভাগের জনৈক কর্মচারীব উদ্‌যোগে অবিলম্বে দুর্গ মধ্যে টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। ওই কর্মচারী টেলিগ্রাফের সাহায্যে জলন্ধর হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে জলন্ধরে ইংরাজ সেনাদিগের আগমনবার্তা ফিলুরের প্রধান সৈনিক পুরুষের গোচর করা হয়। ফিলুরের ভাবপ্রাপ্ত সেনানায়ক আশ্বস্তহৃদয়ে সাহায্যকারী সেনাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গে যে সকল ইংরাজ সেনা ছিল, তাহাদিগকে রাত্রিকালে সজ্জিত থাকিতে বলা হইল। সৌভাগ্যক্রমে রাত্রিকালে কোন গোলযোগ হইল না; প্রাতঃকালে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইলে জলন্ধরের দেড় শত সেনা দুর্গে প্রবেশপূর্বক উহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। হুশিয়ারপুর, কাঙ্গাড়া, নুরপুর ও ফিলুরের সিপাহিগণ পাছে উত্তেজিত হয়, এইজন্য জলন্ধরের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা হইল না। এই সময়ে জলন্ধর এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী কর্পূরতলা রাজ্যের অধিপতি রণধীর সিংহের সাহায্য না পাইলে ইংরাজদিগকে সাতিশয় বিব্রত হতে হইত। ১৮৪৬ অব্দে জলন্ধরের দোয়াব অধিকার কালে ইংরাজ কোম্পানি কর্পূরতলা রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করেন। রণধীর সিংহ ১৮৫৩ অব্দে কর্পূরতলার অধিপতি হন। এই সময় ইঁহার বয়স ২৬ বৎসরের অধিক হয় নাই। ইংরাজ কোম্পানি ইঁহার রাজ্যের একাংশ গ্রহণ করিলেও ইনি বিপন্ন ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হন নাই।

এই সময়ে মুলতানে দেশীয় সেনাদ্বারা পরিচালিত এক দল ঘোড়ার তোপ, দুইদল দেশীয় পদাতি এবং ১নং ইরেগুলার অশ্বারোহী ছিল। এই ইরেগুলার অশ্বারোহী দলে হিন্দুস্থানী সিপাহি কার্য করিত। এতদ্ভিন্ন পুরাতন শিখ দুর্গে ৫০ জন ইংরাজ গোলন্দাজ ছিল। মুলতানের ভাবপ্রাপ্ত সেনানায়ক রোগজীর্ণ হইয়া পড়ায় মেজর ক্রফোর্ড চেমবারলেনই এই সকল সেনার উপর আধিপত্য করিতেছিলেন। ১নং ইরেগুলার হিন্দুস্থানী সেনাদল মেজর ক্রফোর্ডের নিতান্ত অনুগত ছিল। তথাপি তিনি স্থির করিলেন

যে তিনি যে দেশীয় সেনাদলকে বিশ্বাস করেন, একথা তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া ভাল। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দেশীয় সেনাদলের সেনানীদিগকে তাঁহার বাটীতে আহ্বান করিলেন। দেশীয় সেনাগণ সম্মিলিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে দেশীয় সেনাদলের উপর তাঁহার বিশ্বাস আছে, তথাপি তাঁহারা যদি সেনাদলের বিশ্বস্ততার কথা কাগজে কলমে লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। গোলন্দাজদিগের সুবাদার এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে, তাঁহার দলের গোলন্দাজগণ কোনরূপ বিগড়াই নাই, তাহাদিগকে যেদিকে গোলা ছুড়িতে বলা হইবে, তাহারা সেই দিকেই গোলা ছুড়িবে। দেশীয় পদাতি সেনাদলের দেশীয় সেনানীগণ বলিলেন যে, সেনাদলের উপর তাঁহাদের কোন হাত নেই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কোন কথা বলিতে পারেন না। এই ব্যাপার হইতেই মেজর ক্রফোর্ড চেমবারলেন বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহীর দল ইংরাজের অনুগত আছে, গোলন্দাজদলের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, আর পদাতি দল বিপ্লবের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। এদিকে ইরেগুলার অশ্বারোহীদিগকে বিপথে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতে লাগিল—মেজর চেমবারলেন ইহাও বুঝিতে পারিলেন। দেশীয় সেনাদলের উর্দি মেজর চেমবারলেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আপনি আমার গৃহে লুকাইয়া থাকুন; এখনই বিপ্লবের ও ইংরাজ হত্যার প্রস্তাব স্পষ্টই শুনা যাইবে। এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, এ বিষয়ে কৃতকার্য হইলে আমাকেই মুলতানের গদি প্রদান করা হইবে।" চেমবারলেন কথা শুনিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু উর্দি-মেজরের সাক্ষাতে কোনরূপ আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না।

মেজর ক্রফোর্ড চেমবারলেনকে বধ করিবার জন্যও চক্রান্ত হইতে লাগিল। পদাতি দলের একজন মুসলমান সুবাদার এই চক্রান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা ঠিক সময়েই ধরা পড়ে। ব্যাপার বড় বিষম হইতেছে বুঝিয়া চেমবারলেন স্থির করেন যে পদাতি সেনাদল দুইটিকে অবিলম্বে নিরস্ত্র করিতে হইবে। কিন্তু মুলতানে কয়েকজন কামান-রক্ষক ব্যতীত অন্য কোন ইংরাজ সৈন্য ছিল না। কাজেই তিনি স্যর জন লরেন্সকে এই সমাচার প্রদান করেন। স্যর জন লরেন্স বুঝিলেন যে, অল্পমাত্র বিলম্ব হইলে মুলতানে বিসম কাণ্ডের সূচনা হইবে। তাই তিনি ডেরাগাজি খাঁ হইতে ২নং পঞ্জাব পদাতি দলকে এবং আসনি হইতে ১নং পঞ্জাব অশ্বারোহীর দলকে তাঁহার সাহায্যার্থ যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। মেজর হিউজ মেজর চেমবারলেনের বিপদের কথা শুনিয়া উপরিতন কর্মচারীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ১নং পঞ্জাব অশ্বারোহীর দল লইয়া মুলতানে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে এই দুই সেনাদল মুলতানে উপস্থিত হইলে চেমবারলেন ইংরাজ সেনানীদিগকে বলিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালেই দেশীয় পদাতি দলকে নিরস্ত্র করিতে হইবে।

রাত্রি চারিটার সময়ে ঘোড়ার তোপের গোলন্দাজ দলকে এবং দেশীয় পদাতি সেনাদল দুইটিকে প্যারেড ক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দেওয়া হইল। সিকি মাইল অতিক্রম করিলে তাহাদিগকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল। সেই সময়ে পঞ্জাব সেনাদল তাহাদিগের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে তাহাদিগের আর গুলি বারুদ প্রভৃতি লইবার পথ রহিল না। ইংরাজ গোলন্দজাদিগকে আদেশ দেওয়া হইল

যে, এই দণ্ডে তাহারা দেশীয় গোলন্দাজদিগের তোপগুলি অধিকার করিয়া সেগুলি ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; যদি দেশীয় গোলন্দাজগণ তোপ না ছাড়ে, তবে তাহাদিগকে ইংরাজ গোলন্দাজেরা কাটিয়া ফেলিবে। অনন্তর দেশীয় সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া হইল এবং অস্ত্রগুলি জমা করিবার আদেশ দেওয়া হইল। আদেশ শুনিয়াই ৬২নং দলের একজন সিপাহি চীৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার, কেহ অস্ত্র ছাড়িও না; অস্ত্র বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ কর।" এই রেজিমেন্টের লেফটেনান্ট টম্‌সন্ তদ্দণ্ডেই তাহাকে গলদেশে ধৃত করিয়া সবেগে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল সিপাহিই সেনানায়কের আদেশ পালন করিল। তাহাদিগের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র গাড়িতে বোঝাই দিয়া কেল্লায় লইয়া যাওয়া হইল।

এই সময়ে পঞ্জাবের নবগঠিত অভিযান বাহিনীতে এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বাহিনীতে ৩৫নং দেশীয় পদাতি দল স্থান পাইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে দেশীয় সেনাদল অবসর পাইলেই ইংরাজের বিরুদ্ধ হইবে এবং দিল্লিতে যাইয়া বিপ্লবকারী সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইবে। ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। যে বাগানে এই সেনাদল তাঁবু ফেলিয়াছিল, তাহারই অদূরে ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনের বাসভবন ছিল। কাপ্তেন রবার্টস্ (পরে প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস্) এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনের অধীন কর্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমরা এই দেশীয় সেনাদলের উপর নজর রাখিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলাম। চরদিগের উপর এইরূপ আদেশ দেওয়া ছিল যে, যখনই তাহাদিগের সন্দেহ হইবে, তখনই যেন তাহারা আমাকে সংবাদ দেয়। ৮ই জুন রাত্রিকালে একজন গুপ্তচর সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আমাকে বলিল যে, ৩৫নং সেনাদল প্রাতঃকালে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে বলিয়া স্থির কবিয়াছে; এমন কি, কেহ কেহ ইতোমধ্যেই বন্দুকে গুলি ভরিয়াছে। আমি তদ্দণ্ডেই ব্রিগেডিয়ারের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে এই সমাচার প্রদান করিলাম। তাঁহার অনুমতি অনুসারে আমি অন্যান্য ইংরাজ সেনানীকে গোপনে এই সমাচার জ্ঞাপন করিলাম। অবিলম্বে ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন উপস্থিত হইয়া সেনাদলকে অস্ত্র সমর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা গেল যে, দুইটি বন্দুকে সত্য সত্যই গুলি ভরা হইয়াছিল। এই দুইটি বন্দুকের অধিকারী সিপাহিদ্বয় তৎক্ষণাৎ বন্দি করা হইল। অতঃপর সামরিক আইন অনুসারে ইহাদিগের বিচার হইল। কোকের রেজিমেন্ট অর্থাৎ ১নং পঞ্জাব পদাতি দল উপস্থিত হইলে এই দলের সুবাদার মেজর মীর জাফিরকে সামরিক বিচার সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট বা প্রধান ব্যক্তি করা হইল। দেশীয় সেনানীগণই অপরাধীদিগের বিচার করিলেন। বিচারে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হইল এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন স্থির করিলেন যে, তাহাদিগকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। তৎক্ষণাৎ সেনাসমূহকে কুচ করাইয়া একটি চতুষ্কোণ আকারের তিনটি পার্শ্বরূপে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। একটি দিক খোলা রহিল। মধ্যস্থলে দুইটি কামান প্রস্তুত করা রহিল। অপরাধী দুইজনকে কামানের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইতে আদেশ দেওয়া হইল। একজন অপরাধী এই সময় বলিল যে, তাহার সঙ্গে কয়েকটি টাকা আছে, এই টাকা

কয়টি রাখা হউক; যেন টাকাগুলি তাহার কোন আত্মীয়কে দেওয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেন এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "অসময়ে এই প্রার্থনা করিতেছ, এখন আর সময় নাই।" এই বলিয়াই তিনি তোপ দাগিতে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে ভীষণ শব্দের সহিত দুইটি কামানের মুখ হইতে দুইটি গোলা বাহির হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী সিপাহি দুইজনের দেহও উড়িয়া গেল।

১০ই জুন তারিখে এই অভিযানবাহিনী লাহোর হইতে যাত্রা করিল এবং ১১ই তারিখে অমৃতসহরে উপস্থিত হইল। এই সময়েই বাদলি-কি-সরাইয়ের ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনের নিকটে পৌঁছিল। তিনি যত শীঘ্র সম্ভবপর দিল্লির দিকে অগ্রসর হইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু এই সংকল্প সহসা কার্যে পরিণত হইল না। সকলেই মনে করিলেন যে পঞ্জাবে এখনও অনেক কাজ রহিয়াছে, এ অবস্থায় পঞ্জাবের অভিযান-বাহিনীকে দিল্লির দিকে লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির পথ হইতে আর একটি দুঃসংবাদ আসিল। বাদলি-কি-সরাইয়ের যুদ্ধে কর্নেল চেষ্টার হত হওয়ায় ব্রিগেডিয়ার চেমবারলেনকে এডজুটেন্ট জেনারেলের পদ গ্রহণ করিবার জন্য তারযোগে সমাচার আসিল। চেমবারলেন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ১৩ই জুন তারিখে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জন নিকলসন তাঁহার সঙ্গে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। এদিকে অভিযানবাহিনীকে জলন্ধরে যাইতে হইল।

জলন্ধরে অশান্তি দেখা দিয়াছিল। এই স্থানে একদল দেশীয় লাইট অশ্বারোহী এবং দুই দল দেশীয় পদাতি সেনা ৭ই জুন তারিখে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে এখানে বিলাতের রানির ৮নং গোরা পদাতি দল ও এক দল ঘোড়ার তোপের গোলন্দাজ ছিল। ব্রিগেডিয়ার জনস্টোন বিপ্লবের সময় ছুটি লইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে কার্যভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু স্যার জন লরেন্স তখন সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার কথা বলিলেন, তখন তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কমিশনর লেক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী হইলেন, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জনস্টোন গুরুতর গোলযোগের আশঙ্কায় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ফলে ৭ই জুন তারিখে ইংবাজ সেনানীদিগের গৃহে অগ্নি সংযুক্ত হইল। রাত্রিকালে চারিদিকে ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। ইংরাজ নরনারীগণ আশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন। উত্তেজিত সিপাহিরা একদল ইংরাজ সেনা ও কয়েকজন কামান রক্ষকের সমক্ষে উত্তেজনা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাবা কোন ইংরাজের গাত্রে অস্ত্র স্পর্শ করিল না, ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া শতদ্রু পার হইয়া দিল্লির পথে ধাবিত হইল। ইংরাজ সেনাদল আদেশের অভাবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিল।

পরদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগের সন্ধান করা হইল, কিন্তু তখন তাহারা নৌকার সাহায্যে শতদ্রু পার হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ সেনাদল এইভাবে ফিলুরে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে দিল্লির পথে যাত্রা করিতে আদেশ দেওয়া হইল। কর্পূরতলার মহারাজ সাহায্য করিতে চাহিলে কমিশনার লেক মহারাজের সেনাদলের দ্বারা জলন্ধর রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেনাপতি নিকলসন ও কমিশনার লেক এই সময়ে একটি দরবার করিলেন। কর্পূরতলা মহারাজের সৈনিক কর্মচারী মহতাব সিং ও তাঁহার দলবল দরবারে উপস্থিত ছিলেন। দরবার ভঙ্গ হইলে মহতাব সিং জুতা পায়ে দিয়া কমিশনার লেকের সম্মুখে গমন

করায় নিকলসন কমিশনর লেককে সম্বোধন করিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন, "জেনারেল মহতাব সিংহের পায়ে জুতা রহিয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন কি?" কমিশনর লেক বলিলেন যে, তিনি তাহা দেখিয়াছেন, তবে ইহাতে তিনি মহতাব সিংহের কোন অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। জন নিকলসন এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় আবার বলিলেন, "এরূপ ঔদ্ধত্য কখনই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। মহতাব সিং বেশ বুঝেন যে তিনি তাঁহার পিতার গৃহে জুতা না খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারেন না, তবে আজ যে তিনি এই ভদ্রজনোচিত ব্যবহার পরিহার করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, আমরা এই অবমাননার প্রতিকার করিতে পারিব না বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছে। এক মাস পূর্বে হইলে তিনি কখনই এমন ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না। জন নিকলসনের কথা শুনিয়া মহাতাব সিং বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন নিকলসন মহতাব সিংকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যদি জলন্ধরের সকল ইংরাজ বিনষ্ট হয়, যদি আমি একাকী অবশিষ্ট থাকি, তাহা হইলেও আপনাকে বাহিরে জুতা খুলিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইবে। আমার মনে হয়, আপনাকে স্বহস্তে জুতা খুলিয়া সেই জুতা হস্তে ধারণ করিয়া লইয়া বাহিরে যাইতে আদেশ দিবার জন্য এখন আমাকে কমিশনর মহোদয় অনুমতি দিবেন।" জন নিকলসনের এই তেজোব্যঞ্জক কথায় একটি শুভ ফল হইল। কর্পূরতলার জনগণ প্রকৃত পক্ষেই ইংরাজকে পূর্বে তেমন আমলে আনিতেছিল না, এখন তাহারা ইংরাজের প্রতাপ বুঝিতে পারিল এবং সেই সময় হইতেই ইংরাজের প্রতি ভয় ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহার ফল এই হইল যে, জলন্ধরে ইংরাজ সেনাদল না থাকিলেও সেনানিবাস রক্ষার ভার কর্পূরতলার সেনাদলের উপর সমর্পণ করিয়া কমিশনার লেক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

যাহা হউক, ৩৫নং দেশীয় পদাতি সেনাদলের দুইজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা দূর হয় নাই। লাহোর হইতে যাত্রা করিবার পর এই সেনাদল কোনরূপ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ না করিলেও জন নিকলসন নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ৩৫নং সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সিবিল কর্তৃপক্ষও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, ৩৩ নম্বর সেনাদলকেও নিরস্ত্র করিতে হইবে। ৩৩নং সেনাদল এই সময়ে জলন্ধর হইতে ২৭ মাইল দূরে হোসিয়ারপুরে ছিল; এই সেনাদলকেও অভিযান বাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইতোমধ্যেই এই বাহিনীতে ইংরাজ সেনার অপেক্ষা দেশীয় সেনার সংখ্যা অধিক হইয়াছিল; ইহার উপর আবার একটি দেশীয় সেনাদল যদি বাহিনীতে যোগদান করে, তাহা হইলে ইংরাজ সেনা হীনবল হইয়া পড়িবে, নিকলসনের মনে এইরূপ আশঙ্কাই স্থান পাইয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন যে, ৩৩নং সেনাদল বাহিনীতে যোগদান করিবার পূর্বেই ৩৫নং সেনাদলকে নিরস্ত্র করিতে হইবে।

২৪শে জুন তারিখে সকলে জলন্ধর হইতে যাত্রা করিলেন এবং সেই দিন অপরাহ্ণকালেই ডেপুটি কমিশনার ও রবার্টস্ সেনাদলের নিরস্ত্রীকরণের উপযোগী স্থান নির্বাচন করিবার জন্য ফিলুরে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে নির্বাচিত স্থানে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ সেনাদল যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া রাস্তার দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইল,

দুইটি ব্যাটারি (কামান শ্রেণি) মধ্যস্থানে রাখা হইল এবং ৫২নং সেনাদলের দুইটি অংশ দুই পার্শ্বে স্থান সংগ্রহ করিল। কামানগুলি ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সাজাইয়া রাখা হইল। পরে ৩৫নং সেনাদল কুচ করিয়া আসিয়া ইংরাজ সেনার দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইল। ৩৫নং সেনাদলের কোন সেনানী, এমন কি এই দলের সেনাধ্যক্ষও জানিতেন না যে, সেনাদলকে নিরস্ত্র করিবার জন্য এত উদ্‌যোগ আয়োজন হইয়াছে। যাহা হউক, এই সময়ে রবার্টস এই সেনাদলের অধ্যক্ষকে বলিলেন, ''আপনার সেনাদলকে নিরস্ত্র করা হইবে, সেই জন্যই তাহাদিগকে এখানে লইয়া আসা হইয়াছে। আপনি তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ও কোমরবন্ধ জমা করিতে আদেশ দিন।'' সেনাধ্যক্ষ ইয়ংহাজব্যান্ড হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, ''ভগবান মঙ্গল করুন।'' ৩৩ বৎসর কাল তিনি এই সেনাদলের পরিচালনা করিয়াছেন। এই সেনাদলকে লইয়াই তিনি ভরতপুর অবরোধ করিয়াছিলেন, এই সেনাদলই প্রথম আফগান যুদ্ধে বরাবর যুদ্ধ করিয়াছিল। এই সেনাদলের অধিনায়ক বলিয়া সেনাপতি ইয়ংহাজব্যান্ড আপনাকে পূর্বে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মনোভাব কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল। পাছে এই সেনাদল ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার নামে কলঙ্ক লেপন করে, এই জন্যই তিনি নিরস্ত্রীকরণের কথা শুনিয়া হাঁফ ছাড়িলেন।

সেনাদল যথাপদ্ধতি সেনাপতির আদেশ প্রতিপালন করিল। তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র ও কোমরবন্ধ গাড়িতে বোঝাই দিয়া কেল্লায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পরই ৩৩নং সেনাদল উপস্থিত হইল। এই সেনাদলের ইংরাজ সেনানীগণ, বিশেষত কর্নেল স্যান্ডম্যান সেনাদলকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন। তিনি ৩২ বৎসর এই সেনাদলের অধিনায়কত্ব করিয়া আসিয়াছেন; কাজেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, ''কি, আমার সেনাদলকে নিরস্ত্র করা হইবে? আমার সেনাদল যে বিশ্বাসী, তাহার প্রমাণস্বরূপ, তাহার দায়িত্বগ্রহণের জামিনস্বরূপ আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।'' কিন্তু যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, অভিযানবাহিনীর জেনারেল বা ভারপ্রাপ্ত সেনানায়কের আদেশ এইরূপ, তখন তিনি নতমুখ হইলেন; দুঃখে ও ঘৃণায় তাঁহার হৃদয়ে দারুণ ব্যথার সঞ্চার হইল। যাহা হউক, ৩৩নং সেনাদলও নির্বিঘ্নে নিরস্ত্রীকৃত হইল।

এই সময়েই আবার জানা গেল যে, ৯নং লাইট অশ্বারোহীর একটি পক্ষ দিল্লির বিপ্লবকারীদিগের সহিত সংবাদের আদান প্রদান করিতেছিল। তাহারা বিপ্লবের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, এরূপ আশঙ্কা থাকিলেও এই সময়ে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইল না। এই দলের অপর অংশ শিয়ালকোটে ছিল; এই অংশকে নিরস্ত্র করা হইলে পাছে, অপর অংশ (শিয়ালকোটে অবস্থিত) উত্তেজিত হয়, এই আশঙ্কায় ইহাদিগের নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা কয়েকদিন স্থগিত রহিল। এই সময়েই স্যার হেনরি বার্নার্ড ফিলুরে নিকলসনকে তারযোগে জানাইলেন যে, সে সকল গোলন্দাজ এখন কোন কার্য করিতেছে না, তাহাদিগকে যেন অবিলম্বে দিল্লিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সমাচার প্রাপ্তির পরদিন প্রাতঃকালে রবার্টস্ দিল্লি যাত্রা করিলেন।

দিল্লি যাইবার পথে রবার্টস্ লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার জর্জ রিকেট্সের বাঙ্‌লোতে বিশ্রাম করিলেন। সেখানে তিনি জলন্ধরের উত্তেজিত সিপাহিদিগের দিল্লি যাত্রার কথা

সবিশেষ শুনিতে পাইলেন। ৪নং শিখদলের লেফটেনান্ট উইলিয়মস্ সিপাহিদিগকে শতদ্রুর তীরে বাধা দিতে গিয়া আহত হইয়াছিলেন; জর্জ রিকেট্সের বাঙলোতে তাঁহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন। জলন্ধরের সিপাহিরা প্রথমে ফিলুরে যাত্রা করে। ফিলুরের তোপখানার প্রহরার জন্য তখন ৩নং দেশীয় পদাতি দলকে নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল। ৮ই জুন তারিখের পূর্ব পর্যন্ত এই সেনাদল কোনরূপ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। ৮ই জুন তারিখে জলন্ধরের সিপাহিরা ফিলুরে উপস্থিত হইলে ইহারা সেনানীদিগকে বলিল যে, তাঁহাদিগের অনিষ্ট সাধন করা সেনাদলের অভিপ্রেত নহে, তবে তাহারা আর সরকারের (ইংরাজ কোম্পানির) অধীনে কার্য করিবে না। ১২ জন ইংরাজ সেনানী এ অবস্থায় প্রমাদ গনিলেন এবং নিরুপায় হইয়া কেল্লায় গমন করিলেন। জর্জ রিকেট্সের সহকারী থরণটন এই সময়ে ফিলুরের ধনাগারে টাকাকড়ি জমা রাখিতে গিয়াছিলেন। থরণটন লুধিয়ানায় প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তিনি এই বিষম সংবাদ শুনিলেন। তিনিও কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া, আপনার জীবনকে তুচ্ছ করিয়া, তিনি দ্রুতগতিতে আসিয়া জর্জ রিকেটসকে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ৪নং শিখদল এবটাবাদ হইতে এই দিবস প্রাতঃকালে লুধিয়ানায় আসিয়াছিল। জর্জ রিকেটস্ এই সেনাদলের সাহায্যে শতদ্রুর তীরে জলন্ধরের সিপাহিদিগের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

লুধিয়ানায় এই সময়ে ৩নং দেশীয় পদাতি দলের এক অংশ কেল্লায় বারুদখানায় প্রহরায় ছিল। লেফটেনান্ট ইয়র্ক তাহাদিগের অধিনায়ক ছিলেন। থরণটনের মুখে জলন্ধরের সিপাহিদিগের আগমনের কথা শুনিয়াই তিনি কেল্লায় গমন করিলেন, সেনাদল তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহাদিগের দলেরই অন্যান্য সিপাহি বিপ্লবকারীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছে, এ কথা তাহারা জানে এবং তাহারা নিজেও আর সেনানায়কের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিবে না। জর্জ রিকেটস্ বুঝিলেন যে, ৪নং শিখ দল ও নাভারাজের একদল সেনা ব্যতীত তাঁহার আর কেহই সহায় নাই। এই শিখদলে কাপ্তেন রথনি ও লেফটেনান্ট উইলিয়মস ছিলেন। উইলিয়মসের অধীন তিনটি কোম্পানি শিখ সেনা ও নাভারাজের দুইটি কামান লইয়া রিকেটস্ শতদ্রুর নৌসেতুর দিকে যাত্রা করিলেন। থরণটন প্রত্যাগমনকালে এই সেতুর খানিকটা ভাঙিয়া দিয়াছিলেন; রিকেটস্ দেখিলেন যে, এখনও সেই স্থান মেরামত হয় নাই। তিনি আরও কয়েকখানি নৌকা ভাঙিয়া দিয়া পর পারে গমন করিলেন এবং ফিলুরের অবস্থা জানিবার চেষ্টাও করিলেন। তিনি শুনিলেন যে, জলন্ধরের ইংরাজ সেনাদল-সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে নাই; সিপাহিরা নির্বিঘ্নে অগ্রসর হইয়াছে, তবে থরণটন কর্তৃক সেতু ভগ্ন হওয়ায় তাহারা তিন মাইল দূরে নৌকার সন্ধানে গিয়াছে। রিকেটস্ অবিলম্বে আবার শতদ্রু পার হইয়া আসিলেন এবং উইলিয়মসের সহিত যোগদান করিলেন। তদ্দণ্ডেই তিনি সেনাদল সমভিব্যাহারে খেয়াঘাটের দিকে ধাবমান হইলেন। কিন্তু বিলম্ব হওয়ায় খেয়াঘাটে তাঁহাদের উপস্থিতির পূর্বেই জলন্ধরের সিপাহিরা নদী পার হইয়াছিল; পথিমধ্যেই রিকেটস্ ইহাদিগের সাক্ষাৎ পাইলেন। "উইলিয়মস্ পদাতি দলকে গুলিবৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন, রিকেটস্ স্বয়ং কামানের ভার গ্রহণ করিলেন। উইলিয়মস্ যুদ্ধের প্রারম্ভেই গুলির

আঘাতে আহত হইলেন। রিকেটস্ অক্লান্তভাবে তোপ দাগিতে লাগিলেন; শেষে তাঁহার গোলা ও বারুদ ফুরাইয়া গেল, কাজেই তিনি নিকটবর্তী একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রিকেটস্ লুধিয়ানার গিয়া দেখিলেন যে, জলন্ধরে সিপাহিরা লুধিয়ানার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; যাইবার সময়ে ৫০০ জন কয়েদীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে; তবে তাহারা কেল্লায় প্রবেশ করে নাই।

রবার্টস লুধিয়ানার সকল অবস্থা দেখিয়া লুধিয়ানা হইতে যাত্রা করিলেন এবং ২৭শে তারিখে অম্বালায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আরও অনেক ইংরাজ সেনানী দিল্লি যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু গাড়ির অভাবে কেহই যাইতে পারেন নাই। রবার্টস স্থানীয় পোস্টমাস্টার ও ডেপুটি কমিশনার ফর্সিথের সহিত আলাপ করিয়া সেই রাত্রিতেই দিল্লির দিকে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করিলেন। কাপ্তেন ল এবং লেফটেনান্ট প্যাক তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। ২৮শে তারিখে প্রাতঃকালে ইঁহারা কর্নালে এবং এই দিন অপরাহ্নকালেই ইহারা আলিপুরে উপস্থিত হইলেন। আলিপুরে ইংরাজ সেনাদলে অবস্থানের কথা ও পরে দিল্লিতে যাত্রার কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দিল্লির পতনের হেতু

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে অনেক ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার সেনানী আসায় এবং নূতন তোপ ও কামান আসিয়া পড়ায় রীজের উপরে ইংরাজদিগের অবস্থান একরূপ দুর্ভেদ্য হইয়াছিল। উত্তরে যমুনার তীর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ঈদ্‌গাহ মসজিদ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে রীজের উপরে ব্যাটারি, ঘাঁটি, যুদ্ধ প্রাচীর, কবচপ্রাচীর প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া এমনভাবে ইংরাজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, আর পূর্ববৎ সিপাহিগণ ইংরাজের অবস্থানের কোন ঘাঁটিই সহসা আক্রমণ করিতে পারিত না। এমন কি পশ্চিমে, আলিপুর ও বাদলি-কি-সরাইয়ের দিকেও, তোপের শ্রেণি সাজাইয়া ইংরাজ নিজের ব্যূহ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সিপাহি পক্ষে দিল্লি নগরে অনেক গোলমাল চলিতেছিল। যিনি দিল্লির ফৌজদার সাজিয়াছিলেন, তাঁহার কথা কেহ শুনিত না; তিনি নিজেও কাহাকেও কথা শুনাইতে জানিতেন না। সিপাহিদিগের মধ্যেও অত্যন্ত মতভেদ ছিল। প্রত্যেক সেনানী বা সেনাধিনায়ক অপর সেনাধ্যক্ষের হিংসা বা ঈর্ষা করিত। কেহ কাহারও কথা শুনিতে না, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ অনুসারেও কার্য করিত না। এই সময়ে দিল্লিতে যমুনার অপর পার হইতে বেপারীগণ গম, আটা, ময়দা, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া বেচিতেছিল। এতদিন পর্যন্ত যথারীতি ব্যাপারীদিগকে মূল্য দিয়া খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা হইত; কিন্তু ২২শে জুলাই তারিখে একদল মুসলমান সিপাহি বাজারের এক অংশ লুঠ করে; সেই লুঠের পরই দিল্লির ব্যবসায়িগণ ধীরে ধীরে দিল্লি নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ফলে খাদ্যসামগ্রীও দিনে দিনে দুর্মূল্য হইয়া উঠে।

যিনি সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, যাঁহার নামের দোহাই দিয়া সিপাহিগণ এতদিন যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন, এই সময় তিনি অতি বার্ধক্যবশত জীর্ণ ও স্থবির হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার চিন্তা করিবারও শক্তি ছিল না। তিনি সম্রাট হইয়াও সিপাহিদিগের ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতেন, অথবা প্রকৃত কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, সিপাহিদিগের অধিনায়কগণ সম্রাটের নামই অবলম্বন করিয়াছিলেন, নামের মহিমা প্রভাবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছিলেন, স্বয়ং সম্রাট উপেক্ষিত ও বর্জিত ভাবে বাদশাহী মঞ্জিলের একটি কক্ষে একান্তে দিনাতিপাত করিতেন। বেগম জিন্নৎ মহল সুচতুরা হইলেও ৩০ হাজার সিপাহিকে পরিচালন করিবার বুদ্ধি বা তেজস্বিতা তাঁহাতে ছিল না। তাঁহার গর্ভজাত পুত্রকে সম্রাট পদবী দিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার উচ্চাশা পুত্রস্নেহের পরিখার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যে সকল মৌলবি, যে সকল মুসলমান সেনানী, দিল্লিতে আসিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই নিজের নিজের

স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। আর সিপাহি রেজিমেন্ট সকলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে দিল্লির পথে সময়ে সময়ে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিদিগের মধ্যে মারামারি খুনোখুনিও হইত। যেহেতু বখত খাঁ ঘাড়োয়াল কুমায়ুনের দিকের লোক ছিলেন, ফিলুরের রেজিমেন্ট তাঁহার অধীনে ছিল, সেই হেতুই অনেক পূরবীয়া, অনেক দক্ষিণী তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে না। আর এই শ্রেণিগত জাতিগত ও ধর্মগত বিদ্বেষবশতই বখত খাঁর ন্যায় অনেক রণচতুর সুবাদারকে দিল্লির সম্মুখে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে বা অন্তর্দ্রোহে ব্যর্থ জীবনদান করিতে হইয়াছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, এমন কি বিপক্ষের ইংরাজ সেনানীগণও দুঃখ করিয়াছিলেন যে সিপাহিদিগের মধ্যে দিল্লিতে যদি একজন প্রধান সেনাপতি থাকিতেন, অথবা সম্রাট বাহাদুর শাহ যদি প্রৌঢ়ের শীর্ষে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে এমন উদ্‌যোগ এতটা ব্যর্থ হইত না।

অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, সিপাহিগণ দিল্লিতে অধিবাসীদিগের উপর অত্যন্ত উৎপাত উপদ্রব করিত; এমন কি, দিল্লির ভদ্র মহিলাদিগের ধর্মরক্ষা করাও দায় হইয়া উঠিয়াছিল। এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মাঝে মাঝে দুই একদল সিপাহি ভাঙ খাইয়া একটু আধটু উৎপাত উপদ্রব করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা তেমন দোষের নহে, বরং উপেক্ষণীয়। পক্ষান্তরে দিল্লিতে যদি ত্রিশ হাজার সিপাহি না থাকিয়া ত্রিশ হাজার গোঁয়ার গোরা সেনা ঐভাব থাকিত, তাহা হইলে গোরার পশুত্বের প্রভাবে দিল্লিবাসীকে অতিষ্ঠ হইতে হইত। যে পশুত্ব উচ্ছৃঙ্খল গোরাতে সম্ভব, সে পশুত্ব হিন্দু মুসলমান সিপাহিদিগের মধ্যে সহজ অবস্থায় থাকা সম্ভবপর নহে। দিল্লি জয়ের পর ইংরাজ সেনাদল অধিবাসীদিগের উপর যে উৎপাত উপদ্রব করিয়াছিল, তাহার বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে। তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, ক্রোধোন্মত্ত গোরায় কতটা অত্যাচার করিতে পারে, আর সিপাহিতেই বা কতটা পারে না। প্রজার উপর সিপাহি তেমন অত্যাচার কখনও করে নাই, করিবার সামর্থ্যও তাহাদিগের ছিল না। তাহাদের দোষ যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে একতা সংস্থাপন করিয়া এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যে ব্রতী হইতে পারে নাই। ইহাদিগের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল না. তেজস্বিতার অভাব ছিল না—অভাব ছিল কেবল একতার, একনিষ্ঠার ও সর্বদিক প্রসাবিণী মনীষাসম্পন্ন নেতার।

যমুনার নিকটবর্তী Sammy's house (সামিস হাউস্) নামক একটি মন্দির ও তৎসংলগ্ন বাড়ি ছিল। এই মন্দির ও বাড়ি সিপাহিগণ অধিকার করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইত; কিন্তু তাহারা শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে বড়ই ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিল। ফলে ইংরাজ ইহাকে অধিকাব করিয়া এত সুদৃঢ় করেন যে, ২৩শে জুলাই ও ১লা আগস্টের আক্রমণের সময় সিপাহিরা এদিকে অগ্রসরই হইতে পারে নাই। কাজেই ২৩শে জুলাইয়ের আক্রমণে সিপাহিগণ প্রথমে লাডলো কাস্‌ল্ নামক একটি বাড়ি অধিকার করেন। কিন্তু মেটকাফ সাহেবের বৃক্ষবাটিকা, সামিস হাউস নামক বাড়ি এবং হিন্দু রাওয়ের বাড়ি ইংরাজের অধিকারে থাকায় সিপাহিগণ বহুক্ষণ লাডলো কাস্‌ল হস্তগত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এই সময়ে ইংরাজের দলে পঞ্জাব হইতে বহু শিখ গোলন্দাজ সেনা আসিয়া যোগ দিয়াছিল এবং আরও দুই তিনটি গুর্খা রেজিমেন্ট আসিয়াছিল। ফলে এই সময়ে ইংরাজ বাহিনী খুব প্রবলই হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই সিপাহিদিগের প্রতিদিনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইতেছিল।

১লা আগস্ট তারিখে বকর-ঈদের উৎসব। দিল্লির জুম্মা মসজিদ হইতে ইমামের আজান শুনা যাইতেছিল; দিল্লি উৎসবময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্বে মোগলদিগের সময়ে রীতি ছিল যে, সম্রাট শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লির বাহিরে ঈদ্‌গাহের মসজিদে উপস্থিত হইতেন এবং সেইখানে সম্রাট স্বহস্তে একটি উষ্ট্র বলিদান করিতেন। এবার সেই ঈদ্‌গাহ ইংরাজের অধিকৃত, সুতরাং উষ্ট্র বলিদানে ত আর কুলাইয়া উঠিবে না, কাজেই বৃহত্তর বলিদানের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ১লা আগস্টের অপরাহ্ণকালে সহস্র সহস্র মুসলমান সিপাহি "দীন দীন" শব্দ করিতে কবিতে "আল্লা হো আকবর" রবে চাবিদিক মাতাইয়া তুলিয়া দিল্লির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রায় দশ সহস্র মুসলমান সিপাহি কাশ্মীর দরওয়াজা ও অন্যান্য দরওয়াজা দিয়া বাহিরে আসিল—সঙ্গে সঙ্গে সকল দরওয়াজা বন্ধ হইয়া গেল। পাছে প্রাণ লইয়া কেহ পলায়ন করে, তাই পলায়নের পথটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অদ্ভুত অপূর্ব বীরত্ব সহকারে সেই দশ সহস্র সিপাহি অনবরত ইংরাজের ঘাঁটি সকল আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সকল চেষ্টা, সকল বীরত্বই ব্যর্থ হইল। দুই মাস পূর্বে এমন বীরত্ব, এমন আত্মত্যাগ দেখাইতে পারিলে সিপাহির দল ইংরাজের অবস্থানকে বিধ্বস্ত করিয়া ইংরাজ বাহিনীকে ধূলিসাৎ করিতে পারিত। কিন্তু এখন অগণিত কামান শ্রেণির দ্বারা ইংরাজ অবস্থান সুরক্ষিত, অসংখ্য শিখ গুর্খা রাজপুত ইংরাজের পৃষ্ঠপোষক, আর দিনে দিনে দলে দলে গোরা সেনা আসিয়া ইংরাজ ব্যূহকে অভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিল। এখন এক একটা ঘাঁটির সম্মুখে, এক একটা ব্যাটারির বা তোপ বিন্যাসের কবচ প্রাচীরের নিম্নে দেড় শত, দুই শত করিয়া সিপাহির মৃতদেহ পুঞ্জিত, স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল, পরন্তু ইংরাজের একটি ঘাঁটিও সিপাহিগণ অধিকার করিতে পারিল না। বরং দিল্লির প্রাচীর হইতে বড় বড় তোপ মুখে উদ্‌গীর্ণ, বিশালকায় গোলা আসিয়া পড়িয়া ইংরাজকে একটু ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, কিন্তু সিপাহিদিগের অনৈসর্গিক বীরত্বে ও আত্মত্যাগে কোনই ফল হয় নাই। ২রা আগস্টের উষাকালে দেখা গেল যে রীজের কোল হইতে দিল্লিব প্রাচীরের ক্রোড় পর্যন্ত স্থান সিপাহির শবদেহে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে এই দিনকার যুদ্ধে প্রায় পাঁচ সহস্র সিপাহি দেহত্যাগ করিয়াছে।

৭ই আগস্ট তারিখে সিপাহিদিগের একটা বড় দুর্দিন ছিল। সেই দিন তাহাদের বারুদখানা সহসা উড়িয়া যায়। এই দিন হইতেই দিল্লির অবরুদ্ধ সিপাহিগণ প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ দেখিতে আরম্ভ করে। ৭ই তারিখের ক্ষুদ্র যুদ্ধে সিপাহিদিগের অনেক তোপ ইংরাজ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ পক্ষে অনেক বীর হত ও আহত হইয়াছিল। সেনাপতি শাওয়ার্স, মেজর কোক প্রভৃতি ইংরাজ পক্ষের অনেক বিখ্যাত বীর হতাহত হইয়াছিলেন। ৭ই আগস্টেব পর হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লির অবরোধ ও দিল্লির সম্মুখে যুদ্ধ সমানভাবে চলিয়াছিল, কিন্তু ৭ই আগস্টের পর সিপাহিপক্ষ কোনও রূপে ইংরাজকে পরাজিত বা বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই। পরাজয় এবং সর্বনাশের মুখেই সিপাহিগণ রণচাতুরী দেখাইয়াছিলেন। এই রণচাতুরী ও রণপাণ্ডিত্য দেখিয়া ইংরাজ বীবমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিক বিস্ময়ের কারণ এই ছিল যে, কিছুকাল পূর্বে এই বিক্রম, এই তেজস্বিতা, এই রণচাতুরী দেখাইতে পারিলে ত সকল গোলই মিটিত—তখন যে সিপাহি ছিল, এখনও সেই সিপাহিই লড়াই করিতেছে, তবে কেন এমন

ব্যবহার পার্থক্য? প্রত্যেক ইংরাজই এই প্রশ্ন সিপাহিদিগকেও করিয়াছিলেন, আপনাদিগের মধ্যেও করিয়াছিলেন। সেনাপতি উইলসন বলেন যে, একজন রোমক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, "আমাকে একটি দাণ্ডা দাও, তাহা হইলে আমি পৃথিবীকেও চাড়া দিয়া তুলিতে পারি।" সিপাহিদিগের পক্ষেও তেমনই একটি জিনিসের অভাব ছিল—একজন সেনাপতি। একজন দুর্ধর্ষ অমিততেজা রণচতুর বীর সেনাপতি পাইলে সিপাহিগণ ভারতকে ত মুষ্টিবদ্ধ করিতেই পারিত—ছাড় ভারত, ইউরোপকেও কাঁপাইতে পারিত। সেই সেনাপতিই সিপাহিদিগের ছিল না; তাই তাহাদিগকে পরিণামে ঠকিতে হইয়াছিল।" কথাটা ঠিক—সেনাপতি থাকিলে দিল্লিতে ২০ হাজার, কি ৩০ হাজার সিপাহি আবদ্ধ থাকিত না। সেনাপতি থাকিলে দিল্লির রীজ ও পাহাড় কিছুতেই তাহারা ইংরাজের হস্তগত হইতে দিত না। সেনাপতি থাকিলে ইংরাজের পঞ্জাব গমনাগমনের পথ নিষ্কণ্টক থাকিত না। সেনাপতি ছিল না বলিয়াই সিপাহিদিগের পক্ষে আগাগোড়াই অস্থানবাহুল্য দোষ ঘটিয়াছিল। যখন যেটি করিতে নাই, সিপাহি তখন সেইটিই করিয়াছিল; আর যখন যেটি করিতে হয়, সিপাহি তখন সেইটিই করে নাই। কেভ-ব্রাউন বলেন, "সিপাহি চিরকালই হুকুমের দাস; সিপাহিকে মরিতে বলিলে সে মরিতে পারে। সিপাহি মরিতে ভয় করে না, মারিতেও ভয় করে না—সিপাহি চাহে মুখের কথা—এমন লোকের মুখের কথা, যে সিপাহি হইতে স্বতন্ত্র এবং সিপাহির দ্বারা সম্মিলিত। সুবাদার, জমাদার, হাবিলদার—ইহারাও সিপাহি, সুতরাং ইহাদের কথা শুনিয়া কাজ করিতে সহসা সিপাহিদিগের প্রবৃত্তি হইত না। দিল্লির সিপাহিদিগের উপর কুমার সিংহের ন্যায় একজন অমিততেজা অসাধারণ বীর পুরুষ যদি সেনাপতি হইতেন, তাহা হইলেওকোন গোল থাকিত না। অথবা বখত খাঁ নিজে সুবেদার-মেজর না হইয়া যদি একজন জমিদার পুত্রও হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনেক কাজ গুছাইয়া লইতে পারিতেন। অথবা কানপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা ধন্দুপন্থ বা তাতিয়া টোপি যদি দিল্লিতে যাইতেন, তাহা হইলেও দিল্লির পরিণতি স্বতন্ত্ররূপ হইত। দিল্লির প্রাচীব প্রাকার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার রবার্টস্ নেপীয়ার আরও সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন; দিল্লির যমুনার তীর অধিবাসীদিগের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল; আর দিল্লির সার্ধ বিংশ সহস্র বীর যোদ্ধা সমবেত হইয়াছিলেন। তথাপি যোগ্য নেতার অভাবে দিল্লি মাথা তুলিয়াও সুরারাগপ্রমত্ত লম্পটের ন্যায় আবার ধূলায় লুটাইল।

ইহাকে বিধাতার বিধান না বলিলে আর কি বলিব? অথবা বলিব না কি যে, ইহা নিয়তির বিদ্রূপ? নহিলে এমন পরিণতি ত হইবার নহে। দেশ, কালের প্রভাবে পাত্রেরও উদ্ভব হয়—ফরাসী বিপ্লবের ফলে নেপোলিয়ান উদ্ভূত হইয়াছিলেন। আর, সিপাহি বিপ্লবের ফলে, এই ভীষণ আলোড়ন মন্থনের ফলে কেবল হলাহলই উঠিল! কুমার কার্তিকেয়েব জন্ম হইল না?—কেননা, সিপাহি যুদ্ধে ভারত সমাজ সংক্ষুব্ধ হয় নাই; ভারতবাসী সর্বত্রই উত্তেজিত হয় নাই—কেননা, সিপাহিযুদ্ধ ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের ক্লেদ কর্দমের প্রবাহ বহিয়াছিল, কেননা, যাহা হইবার নহে, তাহা হইতে নাই বলিয়াই হয় নাই। অ[illegible] দিল্লির কাহিনি, সিপাহিদিগের পরাজয়ের কাহিনি, ইংরাজের বিজয়ের কাহিনি।

ঝাঁসির রানি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝাঁসির রানি

আমরা একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্যবহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেদিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে-সকল গুণ নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে এক-একটা বিপ্লবে সেই-সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি-যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এ কথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাতিয়া টোপি ও কুমার সিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতিবর্ষীয় অশ্বারোহী কুমার সিংহ লোল ভ্রূ রজ্জুতে বাঁধিয়া দুই হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলন্ডর সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন—যে তাঁতিয়া টোপি কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া, যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিত প্রায় করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহাদের কার্য লইয়া গৌরব করিবার আমাদিগের অধিকার নাই, তথাপি তাঁহাদের বীর্যের. উদ্যমের, জ্বলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কী দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি-যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্‌স্ পত্রে লিখেন যে 'তাতিয়া টোপি মধ্য-ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বড় বড় থানা ও ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষসৈন্য বলপূর্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপরহণ করিয়া লইয়াছে আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্মদা এ পার হইতে ও পার, ও পার হইতে এ পার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখনো আমাদের সৈন্য-শ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখনো পার্শ্ব দিয়া, কখনো সম্মুখ দিয়া সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায়, জলার মধ্য দিয়া, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে, কখনো পার্শ্বে, কখনো তির্যকভাবে চলিয়াছেন। ডাকগাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম

লুঠিয়া, কখনো বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখনো বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।' এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক-বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'আমি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণদণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয় ও আমার জন্য যেন আমার নির্দোষী বন্দি পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।'

ইংরেজরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দিভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তরমূর্তি এতদিনে ইংলন্ডের চিত্রশালার শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্যের সহিত আলেকজান্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্ধা মার্জনা করিয়াছিলেন সেই ঔদার্যের সহিত তাতিয়া টোপিকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরো গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক, ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহি-যুদ্ধ সময়ের আরো অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণস্তম্ভে, অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের এক প্রান্তে তাঁহাদের জীবনীর দুই-এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শংকরপুরের রানা বেণীমাধু লর্ড ক্লাইভের আগমনে নিজে দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধনসম্পত্তি অনুচরবর্গ কামান ও অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজা সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে কোনোমতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে?

রয়ার রাজপুত অধিপতি নৃপৎসিং খঞ্জ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবিশষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।'

কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গানা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ডালহাউসি ঝাঁসি রাজ্য ইংরাজ-শাসনভুক্ত করিলেন এবং ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকা-স্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রানির সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত স্বামীর যাহা-কিছু ঋণ ছিল তাহা রানির জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রানি ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজরা তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল, কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভি..নিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজ্যপালনের জটিল ব্যাপার সকল অতি সুন্দররূপে বুঝিতেন। ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব-অনুসারে এই হৃতরাজ্য রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।

ঝাঁসি নগরী অতিশয় পরিপাটি পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে সেই-সকল প্রাচীরেব চতুর্দিক সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপরে দৃঢ়দুর্গবদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝাঁসি নগরীর রক্ষাভাব ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝাঁসির শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝাঁসি রাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝাঁসি নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্‌গিরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাঙ্‌লা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, একদল সিপাহি ওই দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোনোমতে

প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইউরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরীদুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপ্টেন ডানলপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী সৈন্যেরা দুর্গের নিম্ন অংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধনকার্যে রাজ্ঞীর কোনো হস্ত ছিল না, এমনকি এ সময়ে রাজ্ঞীর কোনো অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারীদিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে একজন ওই রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্য-কর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এইরূপ ইংরাজেরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হত ও তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাই হৃত সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক স্যর হিউরোজ সৈন্যদল-সমভিব্যাহারে ঝাঁসি নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগরপ্রাচীরে ব্রিটিশ কামান গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরমহিলাগণ দুর্গপ্রাকার হইতে কামান ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১শে মার্চ রানি দেখিলেন, তাতিয়া টোপি ও বানপুরের রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ-শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সংকেত-অগ্নি প্রজ্বলিত করিযা দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝাঁসি-দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পরদিন ইংরাজ সৈন্যদের সহিত তাতিয়া টোপির ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপির ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেতোয়ার পরপারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজ্ঞীর পঞ্চাশ-ষাট জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভাল ভাল গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে নগর-প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখযুদ্ধ বাধিল। রানির শরীর রক্ষকদের মধ্যে চল্লিশ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট একজন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেই সঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে

সক্ষম হইত। লেফটেনান্ট্ বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝাঁসি হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন, অশ্বারোহী লক্ষ্মীবাই চারিজন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন; বহুসৈন্যবেষ্টিত বাউকর এই চারিজন অশ্বারোহীকর্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময় তাতিয়া টোপি কতকগুলি সৈন্য লইয়া রানির রক্ষক হইলেন।

৪ঠা এপ্রিলে ইংরাজেরা সমস্ত ঝাঁসি নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগববাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ সহস্রেরও অধিক লোক ব্রিটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রীকন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেশোয়া-বংশের শেষ বাজিরাওয়ের দ্বিতীয় পোষ্যপুত্র। তিনি, তাতিয়া টোপি ও ঝাঁসি-রানি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারি ক্রোশ রানির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

অবশেষে লক্ষ্মীবাই কাল্পীতে আসিয়া উপাস্থত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিশ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ়দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাতিয়া টোপি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাতিয়া টোপি অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তাবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাঁহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়রের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে দুইশত আহ্বানপত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রানি দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আমরা বোধ হয় নাগরিকদিগের নিকট হইতে কোনো বাধাপ্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয় তো পলাইয়ো, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।'

পয়লা জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীররক্ষকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন, কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারানির মাতা 'গুজ্জারাজা' সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত

করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝাঁসি-রাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার রাজকোষ হস্তগত করিল এবং তাহা হইতে রানি সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার-দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়া টোপি ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদায় বন্দোবস্ত রানি একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া যে রৌদ্রে ইংরাজ সেনাপতি চারিবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

স্যর হিউ রোজ যখন শুনিলেন যে গোয়ালিয়র শত্রুহস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞীসৈন্যের দুর্বল ভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দারুণ বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি-হস্তে ইতস্তত অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যেরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোনোমতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মীবাইয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোনোক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, অবিশ্রান্ত তাঁহারই সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজি ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

* *ভারতী ১২৮৪ অগ্রহায়ণ*

ঝাঁসির মহারানি
শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই

"ঝাঁসি সংস্থানচ্যা মহারানি
লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাঁচে চরিত্র"
—দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস
প্রণীত

'সাধনা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত

এত দিনের পর, প্রখ্যাত বীরাঙ্গনা মহারানি লক্ষ্মীবাইর একটি প্রামাণিক ও আনুপূর্বিক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ায়, আমাদের একটি জাতীয় অভাব মোচন হইল। গ্রন্থটি মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার মহারানির জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে, ইংরাজী গ্রন্থ, দেশীয় গ্রন্থ সরকারি কাগজপত্রাদি যেখানে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বার্তা পাইয়াছেন তৎসমুদয় তন্নতন্নরূপে বিচার করিয়া, স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত রানির অনুচরবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের কথিত বিবরণ হইতে সমস্ত তথ্য স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করিয়া এবং ঘটনাস্থলগুলি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া, অতীব নিরপেক্ষভাবে ও প্রভূত শ্রমসহকারে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশেষত রানির সপত্নী মাতা চিমাবাই ও রানির দত্তক পুত্র দামোদর রাও—ইঁহাদের নিকট হইতে গ্রন্থকার যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এই ইতিহাসের প্রমাণ-বল আরও দৃঢ়ীভূত ও ইহার মূল্য অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। ইহাতে অশ্বারূঢ়া, বীরবেশধারিণী মহারানি--তাঁহার দত্তকপুত্র দামোদর রাও— ইংরাজ সেনাপতি স্যর্ হিউ রোজ ও লর্ড ক্যানিং—ইঁহাদের চিত্রসন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন ও বহিরাবরণও অতি পরিপাটী। আমরা এই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া রানির জীবনের মূল ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবৃন্দের নিকট সাদরে অর্পণ করিতেছি।

ঝাঁসি-সংস্থান।*

রানির জীবনের ঘটনাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ঝাঁসির পূর্ব-বৃত্তান্ত কতকটা জানা আবশ্যক। ঝাঁসি-সংস্থান বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভূত। প্রথমে ইহা বোরচ্ছার রাজা বীর সিংহ দেবের শাসনাধীনে ছিল। দিল্লিপতি আকবর বাদশাহের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী আবুল ফজলকে বীর সিংহদেব নিহত করায়, আকবর তাঁহার শাসনের জন্য স্বীয় পুত্র সেলিমকে বুন্দেলখণ্ডে প্রেরণ করেন। বীর সিংহদেব ভয়ে পলায়ন করায়, বুন্দেলখণ্ড মোগলরাজের হস্তগত হয়। পরে, সেলিম (জাহাঙ্গীর) সিংহাসনারূঢ় হইলে, বীর সিংহের অপরাধ মার্জনা করিয়া, তাঁহাকে বুন্দেলখণ্ড প্রত্যর্পণ করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে, শাজাহান বাদশাহের শাসনকালে, এই দুর্বৃত্ত বীর সিংহদেব, মোগলরাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশে লুটপাট আরম্ভ করায়, তাঁহার জায়গির পুনরায় বাজেয়াপ্ত হয়। সেই সময় হইতে ১৭০৭ পর্যন্ত ঝাঁসি প্রদেশ দিল্লি বাদশাহের শাসনাধীনে ছিল। তদনন্তর, বাহাদুর শা দিল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, তিনি এই ঝাঁসি প্রদেশ হিন্দু রাজা ছত্রশালকে জায়গিরস্বরূপ দান করেন। ছত্রশালের অভ্যুদয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া মালোয়ার মুসলমান সুবেদার ও আলাহাবাদের নবাব তাঁহার রাজ্য বারম্বার আক্রমণ করিতে লাগিল।

* *ইংরাজি শব্দ state অর্থে "সংস্থান" শব্দ মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।*

রাজা ছত্রশাল এই সময়ে বার্ধক্যদশায় উপনীত হওয়ায় প্রবল যবন সরদারদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে স্বকীয় উদ্ধার সাধনের জন্য, মহারাষ্ট্রাধিপতি বাজীরাও পেশোয়ার শরণাপন্ন হইলেন। পেশোয়া করুণা-পরবশ হইয়া ছত্রশালের সাহায্যে যাত্রা করিলেন, এবং মুসলমান সরদারদিগকে পরাভূত করিয়া ছত্রশালকে স্বরাজ্যে প্রতিস্থাপিত করিলেন। ছত্রশাল কৃতজ্ঞ হইয়া, বুন্দেলখণ্ডের কতকগুলি প্রদেশ, পেশোয়াকে নজর-স্বরূপ দান করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, মৃত্যুকালে বাজীরাওকে স্বীয় পুত্র স্বরূপ গণ্য করিয়া তিন কোটি টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি দান করিয়া গেলেন। ইহার অন্তর্ভূত ২০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ঝাঁসি-সংস্থান। পরে, ১৭৫৯ অব্দে ঝাঁসির পূর্বাধিকারী "গোসাওয়ী" রাজারা বিদ্রোহী হইয়া পেশোয়ার সুবেদারকে পরাভূত করিল। পেশোয়া এই সংবাদ শুনিবামাত্র রঘুনাথ হরি নেবালকর নামক একজন পরাক্রান্ত মারাঠি সরদারকে বুন্দেলখণ্ডে পাঠাইলেন। ইনি "গোসাওয়ী" রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া তথায় পুনর্বার পেশোয়ার আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশোয়া ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ঝাঁসির সুবেদারী পদ রঘুনাথ হরি নেবালকরকে বংশপরম্পরাক্রমে প্রদান করিলেন। এই রঘুনাথ রাও হরি নেবালকর—ইনি মহারানি লক্ষ্মীবাইর ভর্তৃবংশের আদিপুরুষ।

রঘুনাথ রাওর বার্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শিবরাও ভাউকে ঝাঁসির সুবেদারী পদে স্থাপন করিলেন। শিবরাও ভাউ ইনিও একজন বীরপুরুষ। এই সময়ে দ্বিতীয় বাজীরাওর শাসনকালে—মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যসূত্র শিথিল হইয়া পড়ায়, পেশোয়ার অধীনস্থ সুবেদারেরা নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে; বুন্দেলখণ্ডে, শিবরাও ভাউও সেই পথ অনুসরণ করেন। এই সময়ে, "বসই" (Bassein) সন্ধির সুযোগে মারাঠি সাম্রাজ্য মধ্যে ইংরাজদিগের চঞ্চুপ্রবেশ হইয়াছিল মাত্র তখনও তাঁহারা প্রবল হইতে পারেন নাই। তখন শিন্দে হোলকার নাগপুরকর ভোঁসলে প্রভৃতি রণশূর মারাঠি সরদারদিগের জোট ভাঙিবার জন্য, ওয়েলেস্‌লি, লেক্‌ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ, বাহ্যাৎকারে পেশোয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় বুন্দেলখণ্ডের সুবেদার শিবরাও ভাউ ইঁহাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। সেই অবধি, ইংরাজ সরকার ঝাঁসি-সংস্থানের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর শিবরাও ভাউ স্বীয় পৌত্র রামচন্দ্র রাওর হস্তে ঝাঁসি রাজ্য ন্যস্ত করিয়া, শ্রীক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তে প্রস্থান করেন। এই সময়ে পুণা নগরস্থ পেশোয়া বিলাসের গভীরতম রসাতলে নিমগ্ন থাকায়, মহারাষ্ট্র রাজ্যের সমস্ত আধিপত্য অল্পে অল্পে ইংরাজের হস্তগত হইতেছিল। রামচন্দ্র রাও যখন ঝাঁসির গদিতে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প ছিল, সুতরাং তাঁহার হইয়া তাঁহার মাতুশ্রী সখুবাই ও সংস্থানের পুরাতন দেওয়ান রাও গোপাল রাউ, ইঁহারাই রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। ১৮১৭ অব্দে সুবেদার রামচন্দ্রের তরফে গোপাল রাও ভাউ এবং ব্রিটিশ সরকারের তরফে পোলিটিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট জন ওয়াকোপ—ইঁহাদের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইল। রাও রামচন্দ্র বংশপরম্পরাক্রমে ঝাঁসি সংস্থানের অধিকারী, এই কথা ব্রিটিশ সরকার এই সন্ধিপত্রে স্বীকার করিলেন এবং উভয় সরকার পরস্পরের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিপদাপদে পরস্পরের সাহায্য করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। এই সন্ধিপত্রের পণানুসারে

রামচন্দ্র রাও বাস্তবিকই ইংরাজদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ ইংরাজ সরকার ১৮৩২ অব্দে একটা দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া, ঝাঁসির সুবেদারকে "মহারাজাধিরাজ" ও "ফিদবী বাদশাহা জানুজা ইংগ্লস্তান" (মহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক) এই উপাধি অর্পণ করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ইঁহাকে ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ধারণের অধিকার প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্রের অনুরোধ অনুসারে ঝাঁসির কেল্লার উপর ব্রিটিশ পতাকা "য়ুনিয়ন জ্যাক্" স্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন। রামচন্দ্র রাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী স্বীয় ভাগিনেয় কৃষ্ণরাও নামক একটি বালককে দত্তক গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অশাস্ত্রীয়তা মূলে ইহার দত্তক বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্রের খুল্লতাতের এক ঔরসপুত্র তৃতীয় রঘুনাথ রাওকে ঝাঁসির গদিতে স্থাপন করিলেন।

তৃতীয় রঘুনাথ রাও অত্যন্ত দুর্ব্যসনী ছিলেন। তিনি ভোগ বিলাসে বিপুল অর্থ অপব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া, ঝাঁসির অধিকাংশ ভূসম্পত্তি গোয়ালিয়র ও বোর্ছার মহাজনদিগের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার, ১৮৩৭ অব্দে, ঝাঁসি সংস্থানের কার্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তৃতীয় রঘুনাথ রাওর মৃত্যু হইলে, ঝাঁসির গদি অধিকার করিবার জন্য তিন চারিজন দাবিদার খাড়া হইল। তন্মধ্যে, ব্রিটিশ সরকার শিবরাও ভাউর পুত্র গঙ্গাধর রাওর দাবি মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকেই গদিতে স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু যে পর্যন্ত ঝাঁসি সংস্থানের ঋণ পরিশোধ না হয় সে পর্যন্ত ইংরাজ সরকারের নিযুক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাজকার্য নির্বাহ করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে ১৮৪২ অব্দ পর্যন্ত সমস্ত ঋণ কর্জের হিসাব নিষ্পত্তি হইল; এবং ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৪২ অব্দের মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল এজেন্ট—উইলিয়াম হেনরি শ্লীম্যান সাহেব, গঙ্গাধর রাওর সহিত একটা লেখাপড়া করিয়া, বুন্দেলখণ্ডস্থ ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ ২,২৭,৪৫৮ টাকা আয়ের একটি প্রদেশ লইয়া, গঙ্গাধর রাওকে ঝাঁসির আধিপত্য প্রদান করিলেন। এই মহারাজ গঙ্গাধর রাও, মহারানি লক্ষ্মীবাই সাহেবের ভাবী পতি।

মহারানি লক্ষ্মীবাই

মহারাষ্ট্র মধ্যে সাতারা নিকটবর্তী কৃষ্ণানদী তীরে 'বাই' নামক একটি গ্রাম আছে। তথায় কৃষ্ণরাও নামক একটি 'কর্হাডে' ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি পেশোয়া-সরকারাধীনে মামলৎদারী কাজ করিতেন। বলবন্ত নামক ইহার একটি বীর্যশালী পুত্র ছিল। মহারাষ্ট্র-প্রভু শ্রীমন্ত পেশোয়া, কৃপা করিয়া ইহাকে আপনার খাস ফৌজের মধ্যে সরদারি পদ প্রদান করেন। বলবন্তের দুই পুত্র মোরোপন্ত ও সদাশিব রাও। ইহাদের মধ্যে, মোরোপন্ত, পিতার সঙ্গে পুণায় বাস করিতেন। ইনি শ্রীমন্ত দ্বিতীয় বাজীরাও সাহেবের সহোদর চিমাজী আপ্পা সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। ১৮১৮ অব্দে, শ্রীমন্ত বাজীরাও ম্যাল্কম সাহেবের নিকট সমস্ত রাজ্যের ত্যাগ-পত্র লিখিয়া দিয়া, ৮ লক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া অবশিষ্ট জীবিত কাল ব্রহ্মাবর্ত (বিঠুর) প্রদেশে অতিবাহিত করিবেন, এইরূপ স্থির করেন। এই সময়ে, আপ্পা সাহেব দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুণার রেসিডেন্ট সাহেব, তাঁহাকে বলিলেন, "দশ বিশলক্ষ টাকার প্রদেশ

তোমাকে দিতেছি, তুমি পুণা-সংস্থানের সংরক্ষণ-ভার গ্রহণ কর।" কিন্তু ইহাতে চিমাজী অপ্পা সাহেব সম্মত হইলেন না; পরে তিনি কাশী বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ইংরাজ-সরকার তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথা অনুসারে পেশোয়া-বাজীরাওর ছয়মাস কাল পরে, ইনিও রাজ্যত্যাগী হইয়া কাশীধামে গিয়া বাস করিলেন। ইহার সমভিব্যাহারে যে সকল লোকজন যায়, তাহার মধ্যে মোরোপন্ত একজন। মোরোপন্তও সপরিবারে কাশীধামে গিয়া বাস করিলেন। ইনি শ্রীমন্ত আপ্পাজীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ৫০টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। মোরোপন্তের পত্নীর নাম ভাগীরথী বাই। ইতি অতি সাধ্বী ও পতিপ্রাণা ছিলেন। ইনি কাশীধামে অবস্থিতি কালে ১৮ নভেম্বর ১৮৩৫ অব্দে একটি কন্যারত্ন প্রসব করেন; এই কন্যার নাম—মনুবাই। বলা বাহুল্য, ইনিই ঝাঁসির ভাবী মহারানি অতুলবীর্যবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই।

মনুবাইর বয়ঃক্রম তিন ও চারি বর্ষ না হইতেই ইহার মাতৃশ্রী পরলোকবাসিনী হইলেন। এই সময়ে শ্রীমন্ত আপ্পা সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় মোরোপন্ত কাশীধাম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাবর্তে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। আপ্পাজীর সহোদর পেশোয়া বাজীরাও সাহেব, স্বীয় ঔদার্যগুণে মোরোপন্তকে আপনার নিকট আশ্রয় দিলেন। ব্রহ্মাবর্তে, মোরোপন্ত ও শ্রীমন্ত পেশোয়ার বাসস্থান প্রায় সংলগ্ন ছিল। মনুবাই পিতার অত্যন্ত আদরিণী ছিলেন। দুর্দৈবক্রমে মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, কন্যার সমস্ত রক্ষণভার পিতার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। পিতৃসন্নিধানে থাকা প্রযুক্ত মনুবাইকে প্রায় অষ্টপ্রহর পুরুষবর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইত। এই দিব্যশ্রী ফুল্ল-কপোল বালিকাটি পেশোয়ার অনুচরবর্গ সকলেরই আদরের সমাগ্রী ছিল। ইহার উজ্জ্বল বিশালনেত্র ও গৌরবর্ণ মুখকান্তি দেখিয়া সকলেরই আনন্দোদয় হইত। বাজীরাও সাহেবের অধীনস্থ রামচন্দ্র পন্ত সুবেদার, বাবাভট্ প্রভৃতি প্রমুখ-মণ্ডলী এই বালিকার সতেজবৃত্তি অবলোকন করিয়া কৌতুক সহকারে ও আদরভরে ইহাকে "চ্ছবেলী" (ময়না) বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীমন্ত বাজীরাও পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেব ও রাওসাহেব এই দুইটি বালক এই সময় অল্পবয়স্ক হওয়ায় নানাপ্রকার খেলাধুলায় প্রবৃত্ত হইত—এই বালিকাটিও তাহাদের খেলায় যোগ দিবার উপক্রম করিত। এই বালবৃন্দের লীলা অবলোকন করিয়া শ্রীমন্ত পেশোয়া অত্যন্ত আনন্দ উপলব্ধি করিতেন। ঝাঁসিরানির সপত্নী মাতৃশ্রী—শ্রীমতী চিমাবাই, রানি সাহেবের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, "বাল্যকালে, বিবাহের পূর্বে, ঘুড়িওড়ানো, চাকা-চালানো, মেয়েদের মধ্যে রানি সাজা, কাহাকে দাসী করা, কাজ না করিলে দণ্ড করা ইত্যাদি বাল্যখেলা বানির পছন্দসই ছিল।" নানাসাহেব ও রাওসাহেব—ইঁহাদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য, তৎকালের পদ্ধতি অনুসারে, একজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। এই শিক্ষক ইহাদিগকে বর্ণপরিচয়ে শিক্ষা দিতেন। এই সময়ে, মনুবাই ইহাদের সান্নিধ্যে থাকাপ্রযুক্ত তাহারও কতকটা বর্ণ-পরিচয় হইয়াছিল। নানা সাহেব ও রাওসাহেব যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইতেন, মনুবাইও তাঁহাদের সঙ্গে যাইত। নানাসাহেবকে তলবার খেলা অভ্যাস করিতে দেখিয়া মনুবাইও তলবার ঘুরাইতে চেষ্টা করিত। নানা সাহেব হস্তী আরোহণ করিলে, মনুবাইও হাতিতে চড়িবার জন্য উৎসুক হইত। শ্রীমন্ত বাজীরাওর নিকট তখন একটি মাত্র হস্তী ছিল। একদিন পেশোয়া বাজীরাও, বালিকাকে লইয়া হাতির উপর বসাইতে নানাসাহেবদিগকে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই কথা শুনে

না, বালিকাও জেদ ছাড়ে না। এই সময়ে, মোরোপন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মনুবাইকে বলিল "তোর অদৃষ্টে হাতি কোথা হইতে আসিবে?" এই কথা শুনিয়া সেই উজ্জ্বল-চেতা বালিকা উত্তর করিল "এক ছেড়ে দশটা হাতি আমার ভাগ্যে আছে।" এইরূপে তেজস্বী রাজকুমারদিগের সংসর্গে থাকিয়া বালিকা মনুবাইর বিবিধ পুরুষোচিত শিক্ষা লাভ হইয়াছিল।

মনুবাইর বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলে, তাহার পিতা মোরোপন্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া যোগ্যপাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কন্যার জন্ম নক্ষত্র ও গ্রহাদির ফলাফল জানিবার জন্য তাহার জন্ম-পত্রিকা কোন উৎকৃষ্ট গ্রহাচার্যকে দেখাইতে মনস্থ করিলেন। দৈবক্রমে সেই সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রপটু বেদশাস্ত্রবিদ্ তাতা-দীক্ষিত নামক এক পণ্ডিত শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মোরোপন্ত স্বীয় কন্যার জন্ম পত্রিকা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া, তাহার ফলাফল গণনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কোষ্ঠী দেখিয়া আচার্য ঠাকুর বলিলেন, কন্যার গ্রহ ফল এতাদৃশ শুভদায়ক যে, সে একদিন রানি পদবী প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মোরোপন্ত ইহাতে বিশেষ হর্য প্রদর্শন না করিয়া ঝাঁসি প্রদেশে কোন যোগ্য বর পাওয়া যাইতে পারে কি না, সেই বিষয়ে দীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী পুনর্বার বলিলেন, "এই বালিকা নিশ্চয়ই রানি হইবে। সম্প্রতি ঝাঁসির মহারাজ শ্রীমন্ত গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেবের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। সেইখানে যদি এই কন্যার বিবাহ ঘটিয়া যায়, তবেই গ্রহের ফলাফল সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে।" এই আশাপ্রদ কথা শুনিয়া মোরোপন্ত শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেবের দ্বারা ঝাঁসির মহারাজ গঙ্গাধর রাওর সমীপে এই বিবাহের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, জ্যোতিষীকে নিযুক্ত করিলেন। তাত্যাদীক্ষিত ঝাঁসির সংস্থানিক গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেবের নিকট গিয়া এই কন্যার সৌন্দর্যমহিমা ও গ্রহানুকূল্যের ব্যাখ্যা করিলে, তিনি "বিবেচনা করিয়া দেখিব" এই মাত্র উত্তর করিলেন। পরে, বাজিরাওর সাগ্রহ মধ্যস্থতা-প্রভাবে তিনি কন্যাকে দেখিবার জন্য সংস্থানের কোন সভাসদমণ্ডলীকে ব্রহ্মাবর্তে পাঠাইলেন। তাহারা প্রত্যাগত হইয়া বাবা সাহেবের নিকট কন্যার গুণানুকীর্তন করায় গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেব কন্যার পাণিগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিবাহের দিনও স্থির হইল।

যে দিন সমারোহ সহকারে নববধূ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে ঝাঁসির সকল লোকই বলিতে লাগিল, ইনি যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই অবধি তিনি লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সামান্য বালিকা মনুবাই ঝাঁসির মহারানি হইবে, ইহা কে জানিত!

"যন্মনোরথশতৈরগোচরং ন স্পৃশন্তি কবয়োঽপি যদিগরা।
স্বপ্নবৃত্তিরপি যত্র দুর্লভা লীলয়ৈব বিদধাতি তদ্বিধিঃ।"

বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় মনুবাইর প্রগলভতার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহের সময় নব পরিণীত বধূ ও বরের পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিবার রীতি আছে। তদনুসারে পুরোহিত-গ্রন্থি বাঁধিবার উদ্যোগ করিলে, মনুবাই পুরোহিতকে বলিল "ভাল করিয়া দৃঢ়রূপে গ্রন্থিবন্ধন কর"—এই কথা শুনিয়া সেই সময়ে সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, কালক্রমে রানির একটি পুত্রসন্তান হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনমাসের মধ্যেই করাল কাল তাহাকে হরণ করিল। এই পুত্রশোকের আঘাতে মহারাজ গঙ্গাধর রাও রোগগ্রস্ত হইয়া, ক্রমে আসন্ন দশায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় তিনি দত্তকগ্রহণেচ্ছু হইয়া স্বীয় বংশের বসুদেব রাও নেবালকরের পুত্র আনন্দরাওকে, যথাবিধি দত্তক বিধানানুসারে মহাসমারোহ সহকারে, দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। পরে ইহার নাম, দামোদর রাও গঙ্গাধর রাও রাখা হইল। মহারাজা, এই দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বুন্দেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল রেসিডেন্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে, বংশপরম্পরাক্রমে ঝাঁসির মালিকী স্বত্ব বজায় থাকিবে বলিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র রাওর সহিত ইংরাজ সরকারের কৃত সন্ধিপত্রে যে উল্লেখ ছিল, সে কথাও এই পত্রের মধ্যে একস্থলে ছিল। এইরূপে মহারাজা, স্বীয় উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। এদিকে, বুন্দেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল এজেন্ট, রাজার গৃহীত দত্তকপুত্র ঝাঁসির প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া হিন্দুস্থান সরকারের নিকট স্বীয় মন্তব্য-লিপি লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার মধ্যে এইরূপ সূচনা ছিল যে, ঝাঁসিসংস্থান খাস করিয়া লইবার অধিকার ব্রিটিশ সরকারের আছে এবং এই অবসর ত্যাগ করা উচিত নহে। তবে, ঝাঁসি খাস করিয়া লইলে, রানিকে ৫০০০, টাকার মাসিক বৃত্তি দিলে ভাল হয় ইত্যাদি। যখন এই রিপোর্ট হিন্দুস্থান সরকারের নিকট প্রেরিত হয়, তখন লাট সাহেব ডালহাউসি অযোধ্যায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; সেই জন্য ছয় মাস কাল এই পত্রের কোন উত্তর আসে নাই। মহারানি লক্ষ্মীবাইর সম্পূর্ণ আশা ও ভরসা ছিল যে, কৃপালু ব্রিটিশ-সরকার শ্রীমন্ত দামোদর রাওর দত্তক-বিধান মঞ্জুর করিয়া তাহাকেই ঝাঁসির গদিতে স্থাপন করিবেন। এই সম্বন্ধে রানি সাহেবও হিন্দুস্থান সরকার সমীপে এক পত্র প্রেরণ করেন। লর্ড ডালহাউসি ১৮৫৪ অব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে পর ইংরাজ সরকারের পররাষ্ট্রীয় সেক্রেটারি জে. পি. গ্র্যান্ট সাহেব ঝাঁসি সংস্থানের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইংরাজ সরকারের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করিলেন। এই রিপোর্টের মুখ্য তাৎপর্য, ঝাঁসি সংস্থান খাস করিয়া লওযা। এই রিপোর্টের উপরেই ভর করিয়া লাট সাহেব স্বীয় আদেশ মন্তব্য প্রচার করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম এই যেহেতু ঝাঁসি স্বাধীন রাজ্য নহে—ইংরাজ সরকারের অধীনস্থ মাণ্ডলিক সংস্থান মাত্র অতএব সার্বভৌম অধিপতি ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত মহারাজার দত্তকগ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এবং যেহেতু গঙ্গাধর রাওর যে সকল পূর্বপুরুষের সহিত ব্রিটিশ সরকারের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ছিল তাহাদের বংশের কোন সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী নাই অতএব এই দত্তক বিধান মঞ্জুর করিয়া ঝাঁসির গদি স্থায়ী রাখিতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য নহেন। এতদ্ব্যতীত ঝাঁসি সংস্থান ব্রিটিশ সবকারের মধ্যে ভুক্ত হইলে সমস্ত বুন্দেলখণ্ডের রাজ্য ব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্বাহ হইবে এবং ব্রিটিশ সুশাসনে সমস্ত প্রজাবর্গেরও কল্যাণ হইবে।

অতএব রানির জীবদ্দশা পর্যন্ত তাঁহার ব্যয় নির্বাহার্থ ৫০০০ টাকার মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া ঝাঁসি সংস্থান খাস করিয়া লওয়া হউক।

প্রকৃত কথা লর্ড ডালহাউসি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থান ও জায়গির তখনও ব্রিটিশ সরকারের অধীন হয় নাই তাহাদিগকে যেন-তেন-প্রকারেণ

ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা হইয়াছিল। এই সর্বগ্রাসী নীতি অবলম্বন করিলে বচন-ভঙ্গরূপ মহাপাতক হইবে ইংরাজের শুভ্র যশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে ড্যুক অফ ওএলিংটন প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিপটু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এইরূপ বারম্বার প্রতিপাদন করা সত্ত্বেও লর্ড ডালহাউসি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি প্রথমে সাতারায় ছত্রপতি শহাজি মহারাজের গৃহীত দত্তক নামঞ্জুর করিয়া সাতারা আত্মগ্রাস করিলেন। পরে নাগপুর ও তাঞ্জোরের এই গতি হইল। অবশেষে ঝাঁসি সংস্থানের উপর তাঁহার উদ্যত বজ্র সবেগে আসিয়া পড়িল।

আজ হইতে ঝাঁসি-সংস্থান খাস হইল এই আদেশ-লিপি ও বিজ্ঞাপন লইয়া মেজর এলিস সাহেব রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। দরবার-মহলে চীক-পর্দার অন্তরালে রানি সাহেবের সহিত তাঁহার ভেট হইল। এলিস সাহেব বিজ্ঞাপন পড়িয়া শুনাইলেন এবং "আপনাকে পূর্ণ পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হইবে ও আপনার যথাযোগ্য মান মর্যাদা পালিত হইবে" এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ঝাঁসি খাস করিয়া লওয়া হইল এই দারুণ বার্তা রানি শুনিবামাত্র একেবারে বজ্রাহত হইলেন। ইহা দেখিয়া এলিস সাহেব তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বিদায় প্রার্থনা করিলে রানি সাহেবের সুমধুর কণ্ঠ হইতে এই করুণোক্তি সবেগে উচ্ছ্বসিত হইল; "মেরা ঝাঁসি দেঙ্গা নেই"!

ঝাঁসি ব্রিটিশ রাজভুক্ত হইয়া গেলে, বুন্দেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল এজেন্ট ম্যালকম সাহেব, হিন্দুস্তান সরকারের পর-রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারিকে ঝাঁসির রানি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া এক মন্তব্য-লিপি লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই প্রস্তাবগুলির স্থূল মর্ম এই : (১) রানির জীবদ্দশা পর্যন্ত রানিকে ৫০০০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। (২) রানি সাহেবের বাসের জন্য ঝাঁসির রাজবাটী তাঁহাকে অর্পণ করা হয়—এবং আরও বলিলেন, সেই রাজবাটী রানির নিজ সম্পত্তি, এইরূপ বুঝিতে হইবে। (৩) মহারাজা গঙ্গাধর রাওর ইচ্ছানুসারে, সংস্থানের জহরৎ ও তহবিলের অবশিষ্ট নগদ টাকা হিসাব করিয়া রানি সাহেবকে দেওয়া হয় এবং রানির যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব আছে তাহাদিগের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই পত্রের উত্তরে লর্ড ডালহাউসি তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং ম্যালকম সাহেবের অন্যান্য প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া কেবল এক বিষয়ে অনভিমত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, সংস্থানের জহরৎ ও নিজস্ব সম্পত্তি দত্তক পুত্রের প্রাপ্য, দত্তকপুত্র যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাহা গচ্ছিত থাকিবে। আইনানুসারে রাজার গৃহীত দত্তকপুত্র রাজ্যাধিকারী না হইলেও, মহারাজের নিজস্ব সম্পত্তির অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্র পাইয়া ম্যালকম সাহেব, কেল্লার অভ্যন্তরস্থ রাজবাটী হইতে জহরৎ ও নগদ তহবিলের টাকা উঠাইয়া আনিয়া সহরের রাজবাটীতে গিয়া রানি সাহেবের জিম্মা করিয়া দিলেন এবং রানিকে সহরে রাজবাটী ছাড়িয়া দিয়া, কেল্লার রাজবাটী ও সমস্ত কেল্লা ইংরাজ সরকারের তরফে অধিকার করিলেন।

এদিকে ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়নিষ্ঠার উপর রানি সাহেবের অগাধ বিশ্বাস থাকায়, তিনি এই সামান্য ৫০০০ টাকার বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন এবং সমস্ত ঝাঁসি-সংস্থান যাহাতে পুনর্বার ফিরিয়া পান তজ্জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বাঙালি ও আর এক জন য়ুরোপীয়কে ৬০০০০

টাকা দিয়া এবং তৎসঙ্গে একটা দরখাস্ত দিয়া, বিলাতের কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই দরখাস্তের মধ্যে, একস্থলে এইরূপ লেখা হয় যে, "ইংরাজ সরকার আমাদিগকে ঝাঁসি সংস্থান দান করেন নাই; পেশোয়ার রাজত্ব কালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক পরাক্রমের কার্য করায়, তাঁহাদের নিজ বাহাদুরী বলেই উহা অর্জন করিয়াছিলেন—অতএব উহাতে ইংরাজ সরকারের কোনো অধিকার নাই।" এই দরখাস্ত লইয়া, ঐ দুই মোক্তার বিলাতে গিয়া যে কি করিলেন, তাহার বার্তা কিছুই জানা যায় না। নানাসাহেবের প্রেরিত মোক্তার আজিমউল্লা খাঁ বিলাতে গিয়া মজা উড়াইয়া ও রুশীয় সৈন্যের সামিল হইয়া সিবাষ্টপুলের লড়াই দেখিয়াছিলেন, এই মাত্র সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু রানিসাহেবের প্রেরিত মোক্তারদিগের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা হউক ইতিমধ্যে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর, হিন্দুস্থান-সরকারের অবধারিত প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি দিয়া, লাটসাহেবকে পত্র লিখিলেন। এদিকে রানি সাহেবের তখনও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার মোক্তারেরা বিলাতে তাঁহার দাবি সম্বন্ধে যথাসাধ্য আন্দোলন করিতেছে। উহা যে বৃথা আশা, অন্তঃপুরচারিণী মহারানি তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ঝাঁসি ইংরাজের অধীন হইলে, শ্রীম্যান সাহেব ঝাঁসির কমিশনর পদে প্রথম নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে, ব্রিটিশ সরকারের মিত্র শিবরাও ভাউর ঝাঁসি-সংস্থান তাঁহার উত্তরাধীকারীদিগের হস্ত হইতে চিরকালের মত বিচ্যুত হইল এবং

"ইদমেব নরেন্দ্রাণাং স্বর্গদ্রারমনর্গলং
যদাত্মনঃ প্রতিজ্ঞা চ প্রজা চ পরিপাল্যতে"

এই নীতি সর্বথা পরিপালিত না হওয়ায় পরিণামে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইল তাহা কে না জানে! ঝাঁসির এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, 'আরাধনা-বলে সর্বফল মেলে" রামদাস স্বামীর এই উক্তিতে রানি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করিয়া স্বীয় অবশিষ্ট জীবিতকাল ঈশ্বরারধনায় অতিবাহিত করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। পতির পরলোক প্রাপ্তির পর কিছু দিন পর্যন্ত তাঁহার নিতান্ত ঔদাস্য উপস্থিত হইয়াছিল! তিনি রাত্রি চারিটার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, স্নানাদি সমাধা করিয়া আট ঘটিকা পর্যন্ত পূজার্চনা করিতেন। তদনন্তর পোশাক পবিয়া রাজবাটীর অঙ্গনে চারিপাঁচটা ঘোড়া দৌড় করাইতেন, এগারটা বাজিলে নিত্যনিয়মিত দানক্রিয়া করিয়া আহার করিতেন। ভোজনের পর তিন ঘটিকা পর্যন্ত এক হাজার এক শত রামনাম কাগজে লিখিয়া মৎস্যদিগের নিকট নিক্ষেপ করিতেন। সায়ংকাল হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্যন্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন এবং কেহ দেখা করিতে আসিলে দেখা করিতেন। পুরাণ শ্রবণ হইলে পুনর্বার স্নান করিয়া দেবপূজা করিতেন। প্রতি শুক্রবার উপবাস করিতেন ও সূর্যাস্তকালে শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর দর্শনে নির্গত হইতেন।

ঝাঁসি খাস করিয়া লইবার পর, সংস্থানের পুরাতন দরবারী লোকদিগকে অবসর দেওয়া হয়, এই জন্য রানি সাহেবের পিতা মোরোপন্ত ও লক্ষ্মণ রাও এই দুই ব্যক্তি কেবল রানি সাহেবের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। এক্ষণে রাজবাটীর সমস্ত বৈভব-মহিমা তিরোহিত হইয়া, রানি সাহেবের দৈন্যদশা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে আর একটি ঘটনা হওয়ায় তাঁহার মর্মান্তিক কষ্ট উপস্থিত হইল। দত্তকপুত্র দামোদর রাওর প্রতি রানি সাহেবের প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। দামোদর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন,

তাঁহার উপনয়নের সূচনা হইল। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার নিকট যথেষ্ট অর্থ না থাকায়, দামোদর রাওর নামীয় জমা টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহার্থ কমিশনারের নিকট প্রার্থনা করিলেন। কমিশনার সাহেব তাঁহার বরিষ্ঠ পদবীর কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানাইলেন। সেইখান হইতে এই উত্তর আসিল. চারি জন প্রতিষ্ঠিত লোকের জামানতিতে যদি এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হয় যে, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন এই টাকা দাবি করিবে তখনই এই টাকা সরকারি তহবিলে পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলে এই টাকা দেওয়া যাইতে পারে। এই কথা অনুসারে রানিসাহেব ৪ জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে জামিন দিয়া এক লক্ষ টাকা লইয়া দামোদর রাওর উপনয়ন অনুষ্ঠান সমাধা করিলেন।

এইরূপে কায়ক্লেশে ও মনঃকষ্টে রানির জীবন অতিবাহিত হইতেছিল এমন সময়ে জগৎপ্রসিদ্ধ ১৮৫৭ অব্দের ভীষণ রক্তপতাকা ভারত-গগনে উড্ডীন হইল। এই সম্বন্ধে স্বয়ং দামোদর রাওর লেখনী হইতে যে খেদাক্তি নির্গত হইয়াছে তাহা এই :—"এইরূপে, রানি লক্ষ্মীবাই সাহেব সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, স্বীয় জীবনের নষ্টচর্যার দিন ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন কিন্তু সেই পূর্ব নষ্টচর্যার লাঘব না হইতে হইতেই অভিনব দুর্ভাগ্য দারুণভাবে তাঁহার পৃষ্ঠানুসরণ করিল। ধ্যানে, মনে বা স্বপ্নেও যাহা অকল্পনীয়, ঘরে বসিয়া এইরূপ সঙ্কটে তিনি পতিত হইলেন এবং নিজের ও সেই সঙ্গে আমাদিগের সুখসর্বস্ব নষ্ট করিয়া ও পরিশেষে স্বীয় জীবন পর্যন্ত আহূতি দিয়া, এই অজ্ঞান-দেশে এই জগতীতলে আমাদের জন্য কোনো আশ্রয় স্থান রাখিয়া গেলেন না।"

মহারানি লক্ষ্মীবাই ঔদাস্যব্রত ত্যাগ করিয়া, কিরূপে অল্পে অল্পে বিপ্লব-তরঙ্গের মধ্যে—ঘোর সমরাবর্তের মধ্যে নীত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পরে দেওযা যাইবে। আপাতত এই বলিয়া উপসংহার করি,

"ভবিতব্যং ভবত্যেব, কর্ম্মণামীদৃশীগতিঃ।"

২

১৮৫৮ অব্দের সিপাহি-বিদ্রোহ বঙ্গদেশে সূত্রপাত হইয়া ক্রমশ সেই বিদ্রোহানল মীরট, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হইল। মীরট ও দিল্লির বিদ্রোহ-সমাচার ঝাঁসিতে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময়ে, ঝাঁসি-স্থিত সিপাহি পল্টনের অধিনায়ক কাপ্তেন ডন্‌লপ্ এবং ঝাঁসির কমিশনার ও সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্তা, কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার স্কীন ছিলেন। তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আর সকল স্থানের সৈন্য বিগড়াইলেও, ঝাঁসির সৈন্য কখনই বিগড়াইবে না। বিশেষত ঝাঁসির রানি অবলা রমণী, কঠোর বৈধব্য ব্রতানুষ্ঠানে দিনপাত করিতেছেন। ঝাঁসি খাস হইবার পরেও, রানি কোন প্রকার দুরাগ্রহ বা জেদ্ প্রদর্শন করেন নাই; তিনি অতি সহিষ্ণু, উদার-বুদ্ধি ও রাজনিষ্ঠ;—অতএব তাঁহার অধিকারের মধ্যে রাজদ্রোহ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, ইহাই স্কীন সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অথচ এই সময়ে তলে তলে, বিদ্রোহের যে গুপ্ত-পরামর্শ চলিতেছিল তাহা তিনি আদৌ জানিতে পারেন নাই। ২ জুন তারিখে ঝাঁসি-সিপাহিদিগের প্রকৃত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই দিন, একটা ঘরে আগুন লাগে; লোকে ভাবিল, উহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। তাহার পর, ৪ তারিখে, কালা-পদাতিক-পল্টনের তৃতীয় দলের মধ্যে বিদ্রোহের প্রকাশ্য

কার্য আরম্ভ হইল। গুরুবক্ষ নামক এই পল্টনের হাওলদার কতকগুলি সিপাহি সঙ্গে লইয়া "স্টার ফোর্টের" মধ্যে প্রবেশ করিল। এই ক্ষুদ্র ইমারতের মধ্যে, বন্দুক বারুদ গোলা, খাজনা-তহবিল সমস্তই রক্ষিত হইত। এই বিদ্রোহী সিপাহিরা তৎসমস্ত দখল করিয়া লইল। ইহা জানিতে পারিয়া, ডনলপ্ সাহেব, দ্বাদশ পল্টনের বাকী লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের কাওয়াৎ (প্যারেড্) করাইলেন, এবং তাহাদিগকে প্রশমিত করিবারও বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ভয়-চিহ্ন দেখিবামাত্র, সমস্ত য়ুরোপীয় লোক ছাউনি ত্যাগ করিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কাপ্তেন স্কীন ও গর্ডন সাহেব কেল্লার মধ্যে যাইবার জন্য সমস্ত য়ুরোপীয়দিগকে গুপ্তভাবে পরামর্শ দিলেন। কাপ্তেন ডনলপ্ সাহেবও তাঁহার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য পাঠাইতে নৌগাঙ্গের সেনা-নায়ককে পত্র লিখিলেন। পরদিন সকালে, কাপ্তেন স্কীন ও গর্ডন, ইহারা সেনা-নায়ক ডনলপ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছাউনি-স্থানে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে গুপ্ত পরামর্শ হইয়া প্রতিবিধানেয় সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইল। ডনলপ এনসাইন্ টেলরকে সঙ্গে করিয়া, কাওয়াৎ-স্থানে কাওয়াৎ করাইবার জন্য আসিলেন। পল্টনের বিদ্রোহী সিপাহিরা দুই জনকে গুলি করিয়া মারিল। ঝাঁসির প্রধান সেনানায়ক নিহত হওয়ায়, বিদ্রোহি দল বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে যম-সদনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই সময়ে, স্ত্রীপত্র সহ স্কীন—কমিশনার সাহেব; গর্ডন—ডেপুটি কমিশনর সাহেব ইত্যাদি প্রায় ৪৫ জন কেল্লার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া দুর্গরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কেল্লার প্রকাণ্ড সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া স্থানে স্থানে প্রস্তর-রাশি স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন। বিদ্রোহীগণ ছাউনি-স্থিত য়ুরোপীয়দিগকে নিহত করিয়া কেল্লার অভিমুখে অগ্রসর হইল। কেল্লার অভ্যন্তরস্থ য়ুরোপীয়রা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে হটাইবার চেষ্টা করিল এবং পর দিবস রানি সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় তিনজন য়ুরোপীয়কে রাজবাটীতে প্রেরণ করিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পথে ধৃত করিয়া নিহত করিল। এবং কতকগুলা পুরাতন তোপ তৈয়ার করিয়া কেল্লার উপর গোলা বর্ষণের উদ্যোগ করিল। কিন্তু সেই তোপগুলা বেমেরামত অবস্থায় থাকায়, কোন ফল হইল না। এদিকে, কেল্লার লোকেরাও বিদ্রোহীদিগের উপর গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বিদ্রোহী পিছু হটিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের লোকসংখ্যা অধিক থাকায় তাহারা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা কেল্লার গুপ্তদ্বারের সন্ধান পাইয়া কেল্লার মধ্যে হল্লা করিয়া প্রবেশ করিল। এবং কেল্লার দরজা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল। য়ুরোপীয়েরা গুলিবর্ষণ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; য়ুরোপীয় মহিলারাও যুদ্ধে সাহায্য করিতে লাগিল। কাপ্তেন স্কীন সাহেব চিতা-বাঘের ন্যায় ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে, বিদ্রোহীদিগের মধ্যে একজন তীরন্দাজ লক্ষ্য সন্ধান করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। ক্রমে য়ুরোপীয়দিগের গোলা-বারুদও নিঃশেষ হওয়ায়, বিদ্রোহীরা কেল্লার অনেক স্থান অধিকার করিল। ইহাতে য়ুরোপীয়েরা হতবীর্য ও হতাশ হইয়া সন্ধির নিশান প্রদর্শন করিল। বিদ্রোহীরা স্কীন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইল, যদি তোমরা অস্ত্রত্যাগ করিয়া, কেল্লার দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্বক বাহিরে আইস তাহা হইল তোমাদিগের একটি কেশও স্পর্শ করিব না। কিন্তু এই কথা অনুসারে য়ুরোপীয়েরা দ্বার

উদ্‌ঘাটনপূর্বক যেমন বাহিরে আসিল, অমনি বিদ্রোহীরা হল্লা করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং তাহাদিগের সকলকে পীঠমোড়া করিয়া ফেলিল এবং এইভাবে তাহাদিগকে শহরের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে, বক্‌শিস আলী নামক এক সোয়ার আসিয়া বলিল, উহাদের প্রাণবধের হুকুম হইয়াছে, এই বলিয়া সে তলোয়ারের এক ঘায়ে স্কীন সাহেবের মস্তক উড়াইয়া দিল এবং তাহার অধীনস্থ লোকেরা স্ত্রী পুত্রসহ বাকী য়ুরোপীয়দিগের প্রাণ নাশ করিল।

ইংরাজদিগের বিশ্বাস, এই সমস্ত নৃশংস কার্যে রানি সাহেবের সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সহায়তা ছিল। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার বলেন, তিনি এ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যে প্রকৃত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টরূপে দেখা যায়, ইহাতে রানি সাহেবের কোন হাত ছিল না।

জুন মাসের প্রারম্ভেই, ঝাঁসির সৈন্য মধ্যে একটু বিদ্রোহভাবের সূচনা দেখিয়াই, ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন গর্ডন সাহেবও ছাউনিস্থিত আর আর য়ুরোপীয়েরা রানিসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে রানি এইরূপ বলেন, তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিলে বিদ্রোহী সিপাহিরা আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবে আমি জানি, তথাপি আমি তোমাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তৎকালে, রানির খাস সৈন্যের মধ্যে দেড় দুই শত জন মাত্র ছিল, ইংরাজদিগের সাহায্য করিবার জন্য আরও বেশি লোক রাখিতে গর্ডন সাহেব রানিকে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর দিবস, গর্ডন সাহেব একক রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রানিসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমাদিগের যাহাই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু আমাদিগের মহিলাদিগের সংরক্ষণভার আপনাকে লইতেই হইবে। তাহাদিগকে আপনার রাজবাটীতে আশ্রয় দিউন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। রানি সাহেব উত্তর করিলেন, আমার যতদূর সাধ্য আমি করিব, তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই। তাহার পর দিবস, য়ুরোপীয় মহিলারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাহাদিগের থাকিবার জন্য একটা প্রশস্ত স্থান নির্দিষ্ট হইল এবং তাহাদিগের রাখার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল। কিন্তু ছাউনি মধ্যে বিদ্রোহীরা যখন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল, তখন তত্রস্থ য়ুরোপীয়েরা ভীত হইয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাদিগের মহিলাদিগকেও রাজবাটী হইতে উঠাইয়া আনিয়া কেল্লার মধ্যে স্থাপন করিল। কেল্লার মধ্যে চলিয়া যাইবার পরেও, রানি সাহেব য়ুরোপীয়দিগকে বারম্বার ভরসা দিলেন এবং দুই তিন দিবস পর্যন্ত গোপনে রাত্রিকালে তিন মন করিয়া গমের রুটি তাহাদের আহারের জন্য পাঠাইতে লাগিলেন। এদিকে, কর্নেল ম্যালিসন সাহেব বলেন, "রানিসাহেব মুখ্য মুখ্য মণ্ডলী সমভিব্যাহারে দুই নিশান উড়াইয়া মহাসমারোহে ছাউনির মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে হাসন-আলী নামক এক মোল্লা, সকল মুসলমানকে নমাজ পড়িতে ডাকিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিল এবং সেই উত্তেজনা-বাক্যে সকল লোকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল।" কিন্তু আমাদের লেখক বলেন, ইহা ম্যালিসন সাহেবের বুঝিবার ভুল। কারণ, রানিসাহেবের সপত্নীমাতা বলেন, সে সময়ে রানি সাহেব রাজবাটী হইতে কখনই বাহির হন নাই। বোধ হয়, বিদ্রোহীরা একটা মিথ্যা ঠাট সাজাইয়া লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যই এইরূপে বাহির হইয়া থাকিবে।

রানিসাহেব, প্রথমে বিদ্রোহীদিগকে যে সাহায্য করেন নাই তাহার বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে, তাঁহার অধীনে সুচতুর বুদ্ধিমান লোক ও সৈন্য সামন্ত অধিক না থাকায় এবং বিদ্রোহীদল প্রবল হইয়া উঠায়, তিনি ইংরাজদিগকে সমুচিত সাহায্য করিতে পারেন নাই। তথাপি, বিদ্রোহীরা দিল্লি অভিমুখে চলিয়া গেলে, নিহত য়ুরোপীয়দিগের শব, তিনি আপনার লোকজনের দ্বারা উঠাইয়া আনিয়া তাহাদিগের রীতিমত সমাধি সৎকার করাইয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে দুই একজন ইংরাজপুরুষ ও স্ত্রীলোক লুকাইয়া আপনাদিগের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, রানিসাহেব তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মার্টিন নামক এক সাহেব আগ্রাতে এখনও জীবিত আছেন। তিনি, রানি সাহেবের দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে ২০ আগস্ট ১৮৯৯ অব্দে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি বলেন :—"আপনার মাতা বেচারার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ও নৃশংস ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাঁহার আসল বৃত্তান্ত আমি যেমন জানি এমন আর কেহই জানে না। ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে ঝাঁসিনিবাসী য়ুরোপীয়দিগের যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাহাতে রানি বেচারা আদৌ যোগ দেন নাই। তদ্বিপরীতে বরং তিনি, য়ুরোপীয়েরা কেল্লার মধ্যে যাইবার পরে, দুই দিবস ধরিয়া তাহাদিগের আহারের যোগান দিয়াছিলেন—এক শত জন বন্দুকধারী লোক "করারা" হইতে আনাইয়া আমাদিগের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কেল্লার মধ্যে রাখিয়া সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে রানিসাহেব, মেজর স্কীন ও কাপ্তেন গর্ডনকে,—"দত্তিয়া" নামক স্থানে পলায়ন করিয়া—তত্রস্থ রাজার আশ্রয়ে থাকিতে পরামর্শ দেন কিন্তু এ কথাতেও তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না এবং অবশেষে তাঁহারা আপনাদিগের নিজের সৈন্যের দ্বারাই নিহত হইলেন"।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার কে-সাহেবও এইরূপ বলেন :—"আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, হত্যাকাণ্ডের সময় রানির কোন ভৃত্যই উপস্থিত ছিল না। ইহা প্রধানত আমাদের নিজের অনুচরবর্গেরই কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়! অনিয়মিত দলের অশ্বারোহী সিপাহিরাই এই রক্তময় ভীষণ আদেশ প্রচার করে এবং দারোগাই এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান সর্দার।"

সে যাহাই হউক, ধারাবাহিক ঘটনার সূত্রটি আবার ধরা যাউক। ঝাঁসির বিদ্রোহীরা য়ুরোপীয়দিগকে নিহত করিয়া রাজবাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল এবং রানিসাহেবকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল;—আমাদিগের দিল্লি যাইতে হইবে, ইহার দরুন তিন লক্ষ টাকা আবশ্যক; এই টাকা যদি আপনি না দেন, তাহা হইলে আপনার রাজবাটী তোপের দ্বারা এখনই উড়াইয়া দিব। রানির পিতা মৌরোপন্ত ও দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও, রানির নিকট আসিলেন এবং এই সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রানি অবলা স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার অপরিসীম সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি ছিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হইয়া রাজ্যরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিদ্রোহের নেতাদিগের নিকট এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন "আমার সমস্ত রাজ্য ইংরাজ সরকার খাস করিয়া লওয়ায় আমি অর্থহীন হইয়াছি—এক্ষণে আমার নিতান্ত দৈনদশা উপস্থিত। এই সময়ে আমার ন্যায় গরিব অবলাকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের উচিত নহে।" বিদ্রোহীরা ইহার প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিয়া পাঠাইল, "তোমার নিকট হইতে যদি খরচার হিসাবে কিছু টাকা না পাওয়া যায়,

তবে তোমার প্রাসাদ দখল করিয়া, আমাদের অধিকৃত ঝাঁসির রাজ্য তোমার স্বসম্পর্কীয় সদাশিবরাও নারায়ণকে দেওয়া যাইবে।" রানি এই কথা শুনিয়া নিরুপায় হইয়া আপনার নিজ সম্পত্তি হইতে এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন; তখন, বিদ্রোহীরা রাজবাটী ছাড়িয়া দিয়া, আপনাদিগের সমস্ত সৈন্য মধ্যে এই দোহাই বাক্য প্রচার করিল "খোদার মুলুক, বাদশার মুলুক, রানি লক্ষ্মীবাইর আমল", এই দোহাই দিয়া বিদ্রোহীরা দিল্লি, নৌগাঙ্গ প্রভৃতি স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে রানি সাহেবের অধীনে, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি কেহই ছিল না। ঝাঁসি খাস হইয়া গেলে, অনেক ভাল ভাল লোক ঝাঁসি হইতে বিদায় হইয়া যায়। এক্ষণে, কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় কাজ উপস্থিত হইলে সুপরামর্শ দিবার কেহই ছিল না। রানি স্বয়ং কুশাগ্রবুদ্ধি ও চতুর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ায় অনেক সময় অনেক কথা তাঁহার গোচর হইত না। তাঁহার অধীনস্থ অযোগ্য কর্মচারীরা তাঁহাকে না জানাইয়াই অনেক কাজের নিষ্পত্তি করিত। ইংরাজ সরকার হইতে কোন পত্রাদি আসিলে তাহারা তাহার রীতিমত জবাব দিত না, সুতরাং রানি সাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মিত্রভাব ইংরাজদিগের গোচর হইত না। ইহা হইতে অনেক অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। একজন ইংরাজী-জানা শিরেস্তাদার পূর্বে ছিল, প্রধান কর্মচারীরা তাহাকে কর্মচ্যুত করায় আরও গণ্ডগোল ও কাজের বেবন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। রানি মনে করিতেন, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে পত্রাদি লিখিত হইয়া ইংরাজ সরকারের নিকট যাইতেছে, অথচ সেরূপ কিছুই হইত না। এই গণ্ডগোলের মধ্যেও, দুই একটা পত্র বোধ হয় ইংরাজ সরকারের নিকট পৌঁছিয়াছিল। কারণ, ঝাঁসির কমিশনার পিনক্‌লে সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন : "খুব বিশ্বস্ত সূত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে, রানি আমাদিগের স্বদেশীয়দিগের হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করিয়া জব্বলপুরের কমিশনারকে পত্র লেখেন এবং এইরূপ পত্রাদি লিখিয়া তিনি ইংরাজ সরকারের সহিত মিত্রভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আরও এইরূপ লেখেন যে, সেই হত্যাকাণ্ডে তাঁহার কোন হাত ছিল না এবং যাবৎ না ইংরাজ সরকার ঝাঁসি পুনরাধিকার করিবার বন্দোবস্ত করিবেন, তাবৎ ঝাঁসি রাজ্য রানি তাঁহার নিজ দখলে রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত, এই পত্র যিনি স্বহস্তে কমিশনার সাহেবের হাতে দিয়াছিলেন, সেই মার্টিন সাহেব এখন জীবিত আছেন। তিনি রানিসাহেবের দত্তক পুত্রকে যে পত্র লেখেন তাহার মধ্যে একস্থলে এইরূপ আছে : তিনি (রানী) এর্কসিন সাহেবের নিকট জব্বলপুরে পত্র পাঠাইয়া দেন, আমি সেই পত্র নিজ হস্তে কমিশনার সাহেবকে দেই---রানির কৈফিয়ত শুনিয়া তিনি কি বলেন, আমি জানিতে উৎসুক হইলাম—কিন্তু না!---ঝাঁসির নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে—কিছু না শুনিয়াই—কোন বিচার না করিয়াই, ঝাঁসি অপরাধী সাব্যস্ত হইল।"

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রথমে রানি ইংরাজের বিরুদ্ধে ছিলেন না, তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ ঝাঁসি-রাজ্য শাসন করিতেছিলেন মাত্র।

এদিকে, ঝাঁসি-রাজ্য ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া আবার রানির হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া, ঝাঁসিরাজ্যের একজন দাবিদার সদাশিব দামোদর এই অবসরে ঝাঁসির গদি অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ঝাঁসির ৩০ মাইল দূরে, করেরা নামক একটি কেল্লা দখল করিয়া সদাশিব রাও "ঝাঁসির মহারাজা" এই উপাধি ধারণ করিলেন। ঝাঁসির রানি এই

কথা শুনিবামাত্র এক সহস্র সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেই সৈন্যমণ্ডলী করেরা অবরোধ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি সিন্ধিয়ার রাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং সেখান হইতে ঝাঁসি আক্রমণের উদ্যোগ করায়, রানি তাঁহার বিরুদ্ধে পুনর্বার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ সদাশিবকে এইবার বন্দি করিয়া আনিল।

একদল শত্রু পরাভূত না হইতে হইতেই ঝাঁসির নিকটস্থ বোর্‌ছা নামক সংস্থানের দেওয়ান নথে খাঁ বিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাঁসির বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। এবং ঝাঁসির নিকটস্থ বেত্রবতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে রানির সৈন্য অতি অল্প ছিল। নথে-খাঁ রানি সাহেবকে বলিয়া পাঠাইল : "ইংরাজ সরকার তোমার ভরণ-পোষণের জন্য যে বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই বৃত্তি আমি দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি ঝাঁসির কেল্লা ও সহর আমাকে ছাড়িয়া দেও।" এই কথা শুনিবামাত্র রানির অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তিনি এই বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য আপনার দেওয়ান ও প্রধান মণ্ডলীকে ডাকাইলেন। তাহারা বলিল, যদি আপনি বোরছার রানি লড়য়্যীবাইর নিকট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তবে আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? এই কথা শুনিয়া রানির অত্যন্ত কষ্ট হইল; এবং এই কাপুরুষোচিত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেই তেজস্বিনী মহিলা নথে খাঁর নিকট এইরূপ উত্তর পাঠাইয়া দিলেন ঃ—"আমি শিবরাঙ ভাউর পুত্রবধূ; তোমাদিগের ন্যায় বুন্দেলখণ্ডের লোকদিগকে স্ত্রীলোক বানাইয়া ছাড়িয়া দিতে পারি, এরূপ সামর্থ্য আমার আছে—অতএব তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" এই উত্তর প্রাপ্ত হইবামাত্র নথে খাঁর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং তিনি সসৈন্যে ঝাঁসি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রানিসাহেব, ঝাঁসি-সংস্থানের অভিজাত ঠাকুরমণ্ডলী ও বুন্দেলখণ্ডের জাগিরদারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দরবার বসাইলেন এবং সেই দরবারে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার অধীনস্থ সরদার—আমার আব্রু ও মান রক্ষা করা তোমাদিগের কর্তব্য। রানি সাহেবের এই কথা শুনিয়া বুন্দেল-সর্দারেরা বলিল "ঝাঁসির উপর ইংরাজদিগেরই সার্বভৌম আধিপত্য। বোর্‌ছা আমাদিগের সমান একটি সংস্থান মাত্র—বোরছার হস্তে সার্বভৌম অধিকার ন্যস্ত করা আমাদিগের কর্তব্য নহে। যে পর্যন্ত আমাদিগের দেহে প্রাণ থাকিবে সে পর্যন্ত এই রাজ্য তাহাদিগকে অধিকার করিতে দিব না।" এই পণ অনুযায়ী পত্র লিখিয়া নথে খাঁর নিকট পাঠান হইল। এবং সেই সঙ্গে পাঁচটা গোলা ও কিঞ্চিৎ বারুদ পাঠাইয়া এইরূপ ইঙ্গিত করা হইল যে "এই সমস্ত উপকরণ আমাদিগের নিকট আছে—অতএব তোমরা যদি মরণের মুখে আসিতে চাও, তো ঝাঁসিতে আসিবে।" যুদ্ধের আমন্ত্রণ পৌঁছিবামাত্র নথে খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এদিকে রানির সৈন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কারণ, ইতিপূর্বে, ইংরাজ সরকার ঝাঁসির সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন এবং কেল্লার উপরিস্থিত তোপ ও তাহার গোলাবারুদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক্ষণে, রানি সাহেব আবার সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—গোলাবারুদ প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিলেন; কেল্লার মধ্যে পূর্বেকার যে তিন তোপ পোঁতা ছিল এবং রাজবাড়ির মধ্যে যে চারিটা তোপ লুকানো ছিল—এই সকল এক্ষণে বাহিরে আনাইয়া কেল্লার প্রকাণ্ড বুরুজের উপর তাহাদিগকে উঠানো হইল; ঝাঁসি-সংস্থানের সর্দাব ও ঠাকুর মণ্ডলীর নিকট গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল। তাহারা স্বীয় অধীনস্থ সশস্ত্র অনুচর লইয়া উপস্থিত হইল। রাতারাতি তোপ চালাইবার সুব্যবস্থা

হইল, উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ নিযুক্ত হইল এবং প্রাতঃকালে দেওয়ান—জওহর সিংহের হস্তে রণকঙ্কণ পরাইয়া তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করা হইল। সেনাপতি জওহর সিংহ দুর্গপ্রাচীরের উপর তোপ ও গোলন্দাজ সৈন্য সজ্জিত রাখিলেন এবং এক সহস্র বাছা-বাছা শস্ত্রধারী পদাতিক, শত্রুর মোহরা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত রাখিলেন। স্বয়ং রানি সাহেব পাঠানী বেশ ধারণ করিয়া কেল্লার মুখ্য বুরুজের উপর উপস্থিত রহিলেন এবং সেইখানে পেশোয়া আমলের পুরাতন নিশান ও ইংরাজদত্ত "য়ুনিয়নজ্যাক" পতাকা স্থাপিত করিলেন। এদিকে, নথে খাঁ, ভাবী বিজয়াশায় উৎফুল্ল হইয়া রাষ্ট্রীয় নিশান-পতাকা উড্ডীন করিয়া মহা সমারোহে ঝাঁসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রানি সাহেব, কেল্লার দক্ষিণ অভিমুখে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন—তাহাতে কোন বাধা দিলেন না; পরে তোপের আন্দাজের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহার চতুর গোলন্দাজ গোলাম-গোশ-খাঁকে গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। নথে খাঁর লোকেরাও তীর ও বন্দুকের গুলি এক সঙ্গে ছুঁড়িতে লাগিল। দুই প্রহর কাল পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কেল্লার উপরিস্থিত তোপের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে অস্থির হইয়া নথে খাঁর সৈন্য পিছু হটিল এবং কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া কেল্লা অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রতিদিন উভয় সৈন্যের এক একবার সাক্ষাৎকার হইতে লাগিল। যুদ্ধের প্রথম আরম্ভেই, নথে খাঁর ধ্বজপতাকা ধরাশায়ী হইল এবং বিস্তর সৈন্য বিনষ্ট হইল। ঝাঁসির অবলা বিধবা রানির সহিত যুদ্ধে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইবে, ইহা অতি লজ্জায় কথা বিবেচনা করিয়া নথে খাঁ, রাত্রিকালে, ঝাঁসি-কেল্লার "বোরছা" দরজার উপর লক্ষ্য সন্ধান করিয়া চারিটা তোপ বসাইলেন এবং সমস্ত সৈন্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঝাঁসি-সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। যদিও রানি সাহেবের সৈন্য সুসজ্জিত ও প্রস্তুত ছিল, তথাপি "বোর্ছা"—দরজার উপর, চারিটা তোপের গোলা বর্ষিত হওয়ায়, দরজা ভগ্নপ্রায় হইল। এই সংবাদ রানি সাহেব জানিবামাত্রই, তাঞ্জামে আরোহণ করিয়া "বোর্ছা" দরজার উপরিস্থিত তোপ-শ্রেণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভূত আবেশভরে তত্রস্থ সৈন্যদিগকে সাবাশি দিয়া তাহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য কিছু কিছু বক্‌শিসও দিলেন। তাহারা উৎসাহিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে, বীরচূড়ামণি সর্দার লালা-ভাউ-বক্‌শিকে হুকুম করিয়া, "কড়ক বিজলী" নামক কেল্লার প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড তোপ বুরুজের উপর আনাইলেন এবং গোলন্দাজকে সুবর্ণ-বলয় বক্‌শিস দিয়া তুমুল যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। এই তোপের বর্ষণ শুরু হইবামাত্র শত্রুপক্ষের সমস্ত গোলন্দাজ ভয়চকিত হইয়া রণবিমুখ হইল এবং উহাদিগের তোপ ঝাঁসি-সৈন্যের হস্তগত হইল। রঘুনাথ সিংহ প্রভৃতি সরদারগণ পলায়োন্মুখ শত্রু সৈন্যের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিল। রানি সাহেব, রঘুনাথ সিংহের শৌর্যবীর্যের স্তুতিবাদ করিয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। এইক্ষণে, বোর্ছার পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব আসিল। বোর্ছা-সংস্থান অতীব প্রাচীন ও ক্ষত্রিয়কুল মধ্যে বোর্ছার রাজবংশ সর্বজনবন্দ্য হওয়ায়, রানি সাহেব অতীব উদার-বুদ্ধি সহকারে যুদ্ধের খরচা প্রভৃতি লইয়া, বোর্ছার রানির সহিত সখ্যমূলক সন্ধিস্থাপন করিলেন। শ্রীমতী চিমাবাই বলেন, "ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই ও বোর্ছার রানি লড়য়্যী বাই—ইঁহাদের মধ্যে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় মিলন হইল।"

এই প্রকারে, ঝাঁসির উপস্থিত বিপদ নিবারণ করিয়া, রানি লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি-প্রদেশের সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন এবং পত্রের দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত হ্যামিল্টন সাহেবের গোচর করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, নথে খাঁ পথিমধ্যে পত্রবাহককে ধৃত করিয়া, সে পত্র পৌঁছিতে দিল না। শুদ্ধ তাহা নহে, সে স্বয়ং হ্যামিল্টন সাহেবকে এই মর্মে একটা পত্র লিখিল যে, রানি লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহীর দলভুক্ত হইয়াছেন—সেই জন্য আমি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সকল কারণে, রানি লক্ষ্মীবাই ইংরাজদিগের হইয়াই যে ঝাঁসির সুশাসন ও সুব্যবস্থা করিতেছিলেন, ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা জানিতে পারিল না।

৯/১০ মাস যাবৎ ঝাঁসি ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া রানির শাসনাধীনে ছিল। এই সময়ে তিনি রাজ্যশাসন কার্যে যেরূপ প্রবীনতা, দক্ষতা, প্রজাবাৎসল্য, ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি কিরূপে সময় অতিবাহিত করিতেন, তৎসাময়িক একজন ব্যক্তি এইরূপ বর্ণনা করেন : প্রাতঃকালে ৫টার সময় উঠিয়া, উত্তম সুরভি-দ্রব্য সহযোগে মঙ্গল স্নান করিতেন। স্নানাদি করিয়া পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনারূঢ় হইতেন। তদনন্তর, পতিবিয়োগের পর কেশ রাখিতে হইলে যে কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক সেই প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়া, রৌপ্যনির্মিত তুলসী-বৃন্দাবনে শ্রীতুলসীর পূজা করিতেন। তাহার পর পার্থিব শিব পূজা আরম্ভ হইত। সেই সময় সরকারি গায়ক গান করিত। ইহার পর, সর্দার ও আশ্রিত লোকের দরবার বসিত। যদি কোন দিবস কোন ব্যক্তিবিশেষ না আসিত অমনি পরদিবস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "কাল আপনি কেন আসেন নাই"? এইরূপে পূজার্চনা সমাপন করিয়া ভোজন করিতেন ও ভোজনান্তে একটু নিদ্রা যাইতেন কিম্বা অপর কোন কার্যে নিযুক্ত হইতেন।

প্রাতঃকালে যে নজরের টাকা জমা হইত তাহা রূপার থালায় রেশমি বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিত। সেই টাকা হইতে ইচ্ছামতো স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিয়া, বাকী টাকা আশ্রিত মণ্ডলীর জন্য কোষাধ্যক্ষের জিম্মা করিয়া দিতেন। তদনন্তর প্রায় তিন ঘটিকার সময়ে কাছারি যাইতেন। সেই সময় প্রায়ই পুরুষ বেশ ধারণ করিতেন। পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুণি রঙের অঙ্গরখা, মাথায় টুপী, তাহার উপর পাঠানী পাগ্‌ড়ি কোমরে জরির দোপাটা ও তাহাতে রত্নখচিত তলোয়ার ঝোলানো; এইরূপ বেশভুষায় সেই গৌরবর্ণ মূর্তি গৌরীর ন্যায় উপলব্ধি হইত। কখন কখন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিতেন। পতি বিয়োগের পর নথ প্রভৃতি অলঙ্কার আদৌ ধারণ করিতেন না। হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা এবং অনামিকায় এক হীরার আংটি—ইহা ব্যতীত তাঁহার অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার দেখা যাইত না। কেশ, প্রায় গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। তিনি শাদা শাড়ি ও সাদা চেলি পরিতেন। এইরূপ কখন পুরুষবেশে ও কখন স্ত্রীবেশে রানি ঠাকুরানি দরবারে আসিতেন। তাঁহার বসিবার ঘব, দরবার-ঘরের সংলগ্ন ছিল। সেই ঘরের দ্বারে সোনালী "মেহেরাপ" তাহার উপর জরির লতা-পাতা-কাটা চিকের পর্দা খাটানো হইত। সেই ঘরের ভিতরে গদির উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিতেন। দ্বারের বাহিরে, দুই জন ভল্লধারী রূপা ও সোনার আসাসোটা লইয়া হাজির থাকিত। সম্মুখে, রাজশ্রী লক্ষণরাও, দেওয়ানজী, কোমর বাঁধিয়া কাগজের তাড়া লইয়া দণ্ডায়মান ও তাহার কিঞ্চিৎ দূরে হজুর

মুন্সি উপবিষ্ট থাকিত। কুশাগ্রবুদ্ধি রানি ঠাকুরানি, উপস্থিতকার্যসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইয়া তাহার হুকুম মুখে মুখে বলিয়া দিতেন কিম্বা কখন কখন নিজ হস্তে লিখিয়া দিতেন। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার অতীব দক্ষতা সহকারে নিষ্পন্ন করিতেন।

শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর উপর রানির প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবারে, স্বীয় দত্তকপুত্র সঙ্গে লইয়া, সন্ধ্যাকালে সরোবর-মধ্যস্থিত মন্দিরে, মহালক্ষ্মী দর্শনে যাত্রা করিতেন। সরোবরে সুন্দর সুন্দর কমল ফুটিয়া থাকিত, তাহাতে সে স্থানের রমণীয় শোভা হইত। তিনি কখন পাল্কীতে চড়িয়া কখন বা অশ্বপৃষ্ঠে দেবীদর্শনে যাত্রা করিতেন। যে সময়ে তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিতেন, কিন্‌খাব কাপড়ের জরির পর্দা দিয়া পাল্কী ঢাকিয়া দেওয়া হইত। রানি ঠাক্‌রণ যখন অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেন, তখন তাঁহার উষ্ণীষ-বিলম্বিত জরির অঞ্চল পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান হইয়া মনোহর শোভা বিকাশ করিত। যখন পাল্কী সোয়ারীতে যাইতেন, তখন পাল্কীর খুর ধরিয়া চার পাঁচজন দাসী, মহা ধূমধামে চলিত। এই দাসীরা পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিয়া সুবর্ণ রত্নের অলঙ্কার ও জরির চোলি অঙ্গে ধারণ করিত এবং সবুজ, লাল ও ছাই রঙের শাড়ি ও পায়ে চর্মপাদুকা পরিধান করিত; এক হস্তে রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণদণ্ডের চামর লইয়া ও আর এক হস্তে পাল্কী ধরিয়া, বাহকদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইত। সেই সময়ে, এই অবিবাহিত সর্বালঙ্কার-ভূষিত দাসীদিগকে অতি চমৎকার দেখিতে হইত। সোয়ারীর সম্মুখভাগে ডঙ্কা নিশান প্রভৃতি থাকায় রণবাদ্য বাজিতে থাকিত। নিশানের পশ্চাতে প্রায় দুই শত আফগান পদাতিক ও সোয়ারীর সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রায় একশত ঘোড়সোয়ার যাইত। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্থানের প্রধান কর্মচারী ও আশ্রিতমণ্ডলী অশ্বপৃষ্ঠে কিম্বা পদব্রজে যাইতেন—তাঁহাদের সঙ্গে অনুচরবর্গও থাকিত। এইরূপ মহাসমারোহে শিঙ্গা প্রভৃতি নিনাদিত হইত—ভল্লদার, চোপদার প্রভৃতি হাঁক দিতে দিতে চলিত। রানি ঠাকুরানির সোয়ারী কেল্লার বাহির হইবামাত্র কেল্লার বুরুজ হইতে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ হইত এবং ফিরিয়া আসা পর্যন্ত বাজিতে থাকিত। মন্দিরের নবহৎখানা হইতেও এই সময়ে নহবৎ বাজিত। যখন রানি অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে দাসীজন ও আশ্রিতবর্গ যাইত না। কেবল, ঘোড়সোয়ার ও পাঠান পদাতিক সঙ্গে থাকিত। শ্রীমহালক্ষ্মী ঝাঁসি সংস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এই হেতু তাঁহার সেবায় অনেক টাকা ব্যয় হইত। মঙ্গলদীপরক্ষণ, পূজার্চনা, মহানৈবেদ্য, নহবৎ বাদ্য গায়ন, নর্তকী ও ধর্মশালা প্রভৃতি বন্দোবস্ত সমস্তই ছিল।

রানি ঠাকুরানির আশ্রিত-মণ্ডলীর উপর অদ্ভূত দয়া ছিল। যাহাতে তাহাদিগের ভাল খাওয়া পরা হয়, তাহারা সর্বপ্রকারে সুখে থাকে, সেই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি সর্বপ্রকার গুণের মর্যাদা বুঝিতেন, এই জন্য তিনি গুণী লোকেরও প্রিয় ছিলেন। বড় বড় শাস্ত্রী, বিদ্বান ব্যক্তি বৈদিক ও যাজ্ঞিক তাঁহার নিকট থাকিত। ঝাঁসির পুস্তক সংগ্রহও অতীব মূল্যবান ছিল। উত্তম পৌরাণিক, গান-বাদন-পটু সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, কুশল কারিগর ইত্যাদি অনেক প্রকারের গুণী লোক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিত। এবং তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া দূর দূরন্ত প্রদেশ হইতে কীর্তনকার, গায়ক, শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

অশ্বপরীক্ষায় রানি ঠাকুরানির বিশেষ দক্ষতা ছিল। সেই সময়ে উত্তর হিন্দুস্থান মধ্যে অশ্বপরীক্ষা সম্বন্ধে তিন জনের খুব খ্যাতি ছিল। এক শ্রীমন্ত নানাসাহেব পেশোয়া; দ্বিতীয়, বাবাসাহেব আপ্‌টে গ্বাল্‌হেরীকর; এবং তৃতীয় ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই; ইনিই অশ্বপরীক্ষায় সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার অশ্বপরীক্ষার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে একটি গল্প এই ঃ—এক দিবস এক সদাগর ভাল দেখিতে ও চটুল এইরূপ দুইটি ঘোড়া সঙ্গে করিয়া রাজবাড়িতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আইসে। রানি সেই দুই অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে চক্রপথে দৌড় করাইতে লাগিল এবং এইরূপ পরীক্ষা করিয়া, একের মূল্য হাজার ও দ্বিতীয়টির মূল পঞ্চাশ টাকা স্থির করিলেন। ইহা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। দুই ঘোড়াই দেখিতে সতেজ ও সুন্দর—তবে, উভয়ের মধ্যে মূল্যের এত প্রভেদ হইল কেন, কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না। তখন, রানি ঠাকুরানি বুঝাইয়া বলিলেন, এই উভয়ের মধ্যে একটি ঘোড়া সুন্দর ও আর একটি ঘোড়া সদ্‌গুণ বিশিষ্ট ও চটুল হইলেও উহার ছাতি ফাটা সেই জন্য একেবারে কাজের বাহির।"

রানি-ঠাকুরানির দাতৃত্ব ও ঔদার্যগুণ অপরিসীম ছিল। তিনি কোন দরিদ্র কিম্বা ভিক্ষুককে কখনই বিমুখ করিতেন না। এক দিবস একজন কাশী নিবাসী বিদ্বান ব্রাহ্মণ রাজবাটীর নিত্যদানের সময় উপস্থিত হন। রানির কোন সভাসদ্ রানির নিকট এই ব্রাহ্মণের কুলশীল ও বিদ্যা সম্বন্ধে স্তুতিবাদ করিয়া বলিলেন, এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে—পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিবার ইঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া উনি মনে মনে কষ্ট পাইতেছেন। এই কথা শুনিয়া রানি প্রশ্ন করিলেন, টাকা দিলে কন্যাদান করিতে কেহ প্রস্তুত আছে কি? তাহাতে, ভট্‌জী নম্রতা সহকারে বলিলেন "আমাদিগের স্বশ্রেণীর দেশস্থ ব্রাহ্মণ কাশীতে একজন আছে। তাঁহার কন্যার বয়ঃক্রম প্রায় ১২ বৎসর হইবে—দেখিতেও সুরূপা, রাশি প্রভৃতিরও মিল আছে। কিন্তু এই কন্যার দরুণ তাঁহাকে চারি শত টাকা দিতে হইবে—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ অত টাকা কোথা হইতে দিব? এতদ্ব্যতীত, বিবাহব্যয়ের দরুন একশত টাকা তো লাগিবেই"। এই কথা শুনিবামাত্র রানি ঠাকুরানি পাঁচ শত টাকা আনিয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন ও বলিলেন, "যখন বিবাহ হইবে, আমাদিগকে কুঙ্কুম-পত্রিকা পাঠাইতে ভুলিবেন না।" ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হইয়া প্রস্থান করিল।

এক দিবস রানি, মহালক্ষ্মীর মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়ে অনেক ভিখারি জমা হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, তাহারা শীতের দরুন কষ্ট পাইতেছে। তিনি হুকুম করিলেন, সমস্ত ভিখারিদিগকে জমা করিয়া প্রত্যেককে এক-একখানি তুলা-ভরা জামা, টুপি ও কম্বল দান করা হয়। রানি ঠাকুরানির দয়ার্দ্রতা ও পরোপকার-বুদ্ধি নথে খাঁর সহিত যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। ঝাঁসি সৈন্যস্থিত আহত লোকদিগের ক্ষতস্থানে যখন মলম-পটি লাগানো হইত, তখন তাহারা রানি ঠাকুরানিকে দেখিয়া নিজ কষ্ট আকার ভঙ্গীতে প্রকাশ করিত--তখন তিনি তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণপ্রযুক্ত প্রজারা তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত।

রানি ঠাকুরানি স্বীয় দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাহার যখন যাহা সাধ হইত তখনই তাহা মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। রানি ১৮৫৭ অব্দের

জুন মাসে ইংরাজদিগকে সাহায্য করেন, বহিঃশত্রু দমন করিয়া ঝাঁসি সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন—এই সমস্ত বৃত্তান্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণকে পত্রের দ্বারা জানাইবার চেষ্টা করেন—নিজ অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করিতে ইংলন্ডে মোক্তিয়ার পাঠান। এই সব কারণে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ-সরকার কখনই অন্যায় করিবেন না—তাঁহার অধিকার তিনি ফিরিয়া পাইবেন—ইংরাজ সরকার ঝাঁসির গদিতে দামোদর রাওকেই পুনঃস্থাপন করিবেন। এই বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন এমন সময়, ঝাঁসির রানি বিদ্রোহী, এইরূপ ভুল বুঝিয়া, ইংরাজ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ প্রবল সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাঁসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং নিম্ন লিখিত শ্লোকের উক্তি অনুসারে নলিনী ও নলিনী-মধুমত্ত দ্বিরেফ উভয়ই একসঙ্গে গজকবলে পতিত হইল।

"রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাত
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোশগতে দ্বিরেফে,
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার।"

৩

ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁসি-অভিমুখে কুচ করিয়া আসিতেছে এই সংবাদ ঝাঁসিতে আসিয়া পৌঁছিল, তথাপি ঝাঁসির প্রধান-বর্গ সে বিষয়ে বড় মনোযোগ দিলেন না। লালাভাউ বক্‌শি, নানা-ভোপট্‌কর প্রভৃতি, ঝাঁসি-দরবারের পুরাতন মুচ্ছুদিগণ (স্টেট্‌সমেন) লক্ষ্মণ-রাও-বাণ্ডে নামক ঝাঁসির নবীন দেওয়ানকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি গর্বভরে তাঁহাদের কথায় ধিক্কার করিলেন; শুদ্ধ তাহার নহে, রানি ঠাকুরানির সহিত যাহাতে তাহাদের সাক্ষাৎ না হয় তাহারও উপায় অবলম্বন করিলেন। তথাপি, নানা-ভোপটকর রানি ঠাকুরানির সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া অবশেষে এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন— "আমি ঝাঁসি-সংস্থানের সেবায় বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছি; অতএব, আমার প্রার্থনা এই, ইংরাজ সরকারের নিকট যেন একজন উকীল অবশ্য-অবশ্য পাঠানো হয়। বিদ্রোহীদিগের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, ইংরাজের হুকুম অনুসারেই আপনি সংস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং ইংরাজের হিতোদ্দেশেই আপনি বোর্‌ছার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন—এই সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য একজন সুচতুর উকীলকে পাঠানো আবশ্যক। আপনি ইংরাজ সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে পত্র নির্বিঘ্নে পৌঁছিবে কি না, পৌঁছিলেও সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট বোঝাপড়া হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।" নানার ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচারক্ষম ব্যক্তির এই কথা শুনিয়া রানি ঠাকুরানি, গোয়ালিয়র ও ইন্দোরে পোলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ একজন সুচতুর ব্যক্তিকে দূতস্বরূপ পাঠাইবার জন্য দেওয়ানজিকে হুকুম করিলেন। দেওয়ান, নবীন কর্মচারীদিগের মধ্য হইতে অকৃতকর্মা, রাষ্ট্রব্যবহারানভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, সে ব্যক্তি এজেন্ট

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, অন্যস্থানে বসিয়া কতকগুলা জাল-পত্র লিখিয়া পাঠাইল এবং ঝাঁসি দরবারের লোকেরাও সেই সকল পত্রের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল। কথায় বলে, "দুর্মন্ত্রী রাজ্যনাশায়;"—এ কথার যাথার্থ্য এইস্থলে বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হইল।

এদিকে, ইংরাজদিগের প্রতিশোধ-তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে,—ঝাঁসির হত্যাকাণ্ডে রানির বিলক্ষণ যোগ ছিল এইরূপ তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। মধ্য-হিন্দুস্থান মধ্যে ঝাঁসি-সংস্থানই বিদ্রোহীদিগের প্রধান সংকেত-স্থল ও ঝাঁসির কেল্লাই সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও দুর্জয়; অতএব ঝাঁসি জয় করা সর্বাগ্রে কর্তব্য—এই বিবেচনা করিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ, নবাগত সেনানী স্যর হিউ রোজকে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। স্যর হিউ রোজ পথিমধ্যে এক একে কতিপয় কেল্লা দখল করিয়া ও তত্রস্থ বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া অবশেষে ২০ মার্চ তারিখে, প্রাতঃকাল ৭ টার সময় ঝাঁসিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র লক্ষ্মণরাও দেওয়ান প্রভৃতি মুচ্ছুদি-মণ্ডলী মধ্যে ভারী গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। তাহাদিগের মধ্যে তেমন সুবিজ্ঞ ও সুচতুর লোক না থাকায়, যে যাহা খুশি বলিতে লাগিল। নানা-ভোপটকর প্রভৃতি পুরাতন মুচ্ছুদি-মণ্ডলী, গোয়ালিয়ারের প্রবীন সুবিজ্ঞলোকদিগের নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, পূর্ব হইতেই এ সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পরামর্শ-অনুসারে, তাঁহারা দরবারে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে, 'ইংরাজ সৈন্যের আগমনে কোন প্রকার বাধা না দিয়া, ইংরাজ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহারা যে ভুল বুঝিয়াছেন, সেই ভুল ঘুচাইয়া দেওয়া হউক এবং পূর্বের ন্যায় ইংরাজ সরকারের সহিত সখ্য স্থাপন করা হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব কাহারও মনোনীত হইল না। নথে খাঁর সহিত যুদ্ধ ও ঝাঁসি প্রদেশের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে সমস্ত লোক সৈন্য মধ্যে রাখা হইয়াছিল, তাহারা ঝাঁসি সংস্থানের পুরাতন ভৃত্য—ঝাঁসি খাস করিবার সময় ইংরাজেরা তাহাদিগকে কর্ম হইতে রহিত করে। এই কারণে, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদিগের দ্বেষবুদ্ধি জাগৃত ছিল। ইংরাজ সৈন্য ঝাঁসি আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছে, এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহারা যুদ্ধের জন্য লালায়িত হইল।

রানি ঠাকুরানি কেল্লার মধ্যে থাকায়, প্রধান মণ্ডলী ব্যতীত আর কাহারও তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি ছিল না—সুতরাং, ইংরাজ পক্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত তিনি জানিতে পারিতেন না, ইংরাজেরাও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিত না। কেহ বলেন, —ইংরাজ-সৈন্যশিবির হইতে এই ভাবে পত্র আইসে, "আপনি, লক্ষ্মণরাও দেওয়ানজী, লালা-ভাউ বক্‌শি প্রভৃতি আট ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া, নিঃশস্ত্র হইয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" কিন্তু এই কথা নাকি স্বাভিমানিনী রানি ঠাকুরানির ভাল লাগে নাই, তাই যুদ্ধের আরম্ভ হইল। কেহ বলেন—রানি ও তাঁহার সর্দার-মণ্ডলী বিদ্রোহীদিগের দলভুক্ত হইয়াছে ইংরাজদিগের বিশ্বাস হওয়ায়, ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে কয়েদ করিবার মতলব করিয়াছিলেন। এবং এই কথা রানি জানিতে পারিয়াই "মরণ রুচে বীরেরে—না রুচে অপযশ কলঙ্কে" মহারাষ্ট্রীয় কবি মোরোপন্তের এই উক্তি অনুসারে, ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কেহ বলেন, ইংরাজ সৈন্য ঝাঁসির অভিমুখে আসিতেছে, এই সংবাদ ঝাঁসিতে পৌঁছিলে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, উহা নথে খাঁর সৈন্য—উহারা

মুখে রং লাগাইয়া পুনর্বার ঝাঁসি আক্রমণ করিবার জন্য আসিয়াছে। এই বিশ্বাসে; রানি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার হুকুম দেন। সেই সময়ে নাকি অধীনস্থ ঠাকুর-মণ্ডলী রানিকে এইরূপ বলেন যে, ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠা যাইবে না—তাহাদের সহিত রণস্পর্ধা করিয়া কোন ইষ্ট নাই—বাণপুরের রাজাও মাল্‌থোনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কথায় কোন ফল হইল না। কেহ বলিল—রানি ঠাকুরানি, মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার একজন সর্দারকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হইয়া, উল্টা সেই সর্দারের ফাঁসি হয় এবং এই কারণেই রানি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। আসল কথা প্রকৃত কারণ ঠিক জানা যায় না—জানিবার কোন উপায়ও নাই। এই পর্যন্ত জানা যায়, রানি ইংরাজের সহিত সদ্ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিলেন, কোন ফল হইল না,—ইংরাজেরা ঝাঁসি আক্রমণ করিল; তখন সেই স্বাভিমানিনী তেজস্বিনী রানি, ঝাঁসি সংরক্ষণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সৈন্য মধ্যে লড়াক্কা ও সাহসী কয়েকজন আফ্‌গান ও বুন্দেলনিবাসী লোক ছিল বটে কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্য মধ্যে তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। এক্ষণে রানি স্বীয় সৈন্য মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি সমস্ত সৈন্য-মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত করিলেন। তিনি স্বয়ং পরিদর্শনাদি করিয়া দুর্গপ্রাকারের জীর্ণসংস্কার করাইলেন, কেল্লার বুরুজের উপর তোপ বসাইলেন এবং তোপ চালাইবার জন্য সুদক্ষ গোলন্দাজ নিযুক্ত করিলেন। সহরস্থ দুর্গপ্রাকারের রন্ধ্র মধ্যে "কারামাইন" বন্দুক প্রবিষ্ট করাইয়া সিপাহি পাহারা বসাইলেন। ঝাঁসির অভিজাত, বিশ্বাসী ও দক্ষ ঠাকুরমণ্ডলী ও বুন্দেল-বাসি সর্দারদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের উপর সৈন্যের কোন কোন অংশের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে, অল্পকালের মধ্যেই কেল্লা ও সহর সংরক্ষণের সুন্দর বন্দোবস্ত হইল।

এদিকে, ইংরাজ-সেনাপতি, স্যর হিউ রোজ, ২১ মার্চ তারিখে, সমস্ত দিন ধরিয়া ঝাঁসির কেল্লা ও সহরের স্থিতি-প্রণালী সূক্ষ্মরূপে পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং সুবিধার জায়গা নির্বাচন করিয়া, সেই সেই স্থানে বাছা বাছা তোপ ও ফৌজ স্থাপন করিলেন। বাহির হইতে যাহাতে কোনরূপ সাহায্য না আসিতে পারে, এই উদ্দেশে সমস্ত পথঘাট রুদ্ধ করিয়া স্থানে স্থানে ঘোড়-সওয়ার ও তোপখানা (আর্টিলরি) রাখাইয়া দিলেন। আবার স্থানে স্থানে পৃথকভাবে তোপ ও পদাতিক সৈন্য স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক সৈন্যবিভাগের সেনানায়কদিগের মধ্যে যাহাতে শত্রুসম্বন্ধীয় বার্তাদির চালাচালি হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে তার-যন্ত্রের যোজনা করিলেন। একটা উচ্চ ভূমির উপর স্তম্ভ উঠাইয়া, তথা হইতে দূরবীনের সাহায্যে, যাহাতে কেল্লার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এইরূপ বেধশালার (অব্‌জরভেটরি) ন্যায় একটা স্থান নির্মাণ করিয়া তথায় তার-আফিস স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে আর একটি সুবিধা ঘটিল;—ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্টের অধীনস্থ সৈন্য চন্দেরী হইতে আসিয়া পৌঁছিল। ২৩ তারিখে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের আরম্ভ হইল। ইংরাজ-সৈন্য, ঝাঁসির নিকটস্থ সকল ময়দান ও উচ্চভূমি অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; এক্ষণে তাহারা কেল্লা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের তোপের ভাল

বন্দোবস্ত থাকায়, তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইংরাজের ফৌজ ও ঘোড়সওয়ার অগ্রসর হইবামাত্র, ঝাঁসির গোলন্দাজেরা তাহাদের উপর প্রচণ্ডরূপে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে ইংরাজদিগের টিকিয়া থাকা দায় হইল। যাহা হোক্ সেই দিবসের রাত্রিতেই অবসর বুঝিয়া তৃতীয় য়ুরোপীয় পল্টনের মোহরা অগ্রসর হইল। সমস্ত রাত্রি সহর মধ্যে রণ-বাদ্যের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল; কেল্লার মধ্য হইতে মশালের আলোক, মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল; প্রহরীরা বন্দুকের আওয়াজ করিতে লাগিল। তাহাতে বুঝা গেল, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া, ঝাঁসির সৈন্য মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। ইংরাজ সৈন্যও সহর-প্রাকারের ৩০০ গজ দূরে তোপ পাতিয়াছিল এবং একটা দেবালয়ের মধ্যে তোপের মঞ্চ (ব্যাটারি) বাঁধিয়াছিল। প্রভাত হইবামাত্র, ঝাঁসি-কেল্লার সুচতুর ও দক্ষ গোলন্দাজেরা আপন আপন তোপে অগ্নি সংযোগ করিল এবং সহরের দুর্গস্থিত দুই তিন তোপমঞ্চ হইতে গোলা বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম, সেই সকল গোলা ইংরাজ-সৈন্যের মাথার উপর দিয়া যাইতেছিল—তাহাতে কোন ফল হইতেছিল না। কিন্তু পরে, যখন কেল্লাস্থিত "ঘন-গর্জ" নামক তোপের বর্ষণ আরম্ভ হইল, তখন ইংরাজদিগের মধ্যে একেবারে হাহাকার পড়িয়া গেল। এই তোপের এই একটি আশ্চর্য গুণ ছিল যে, উহার ধূম-রাশি পূর্ব হইতে দেখা যাইত না। সেই জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ-সতর্ক হইবার অবকাশ পাইত না। "ঘন-গর্জ" হইতে প্রচণ্ড গোলা-সকল ছুটিয়া সোঁ-সোঁ শব্দে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে আসিয়া পড়িত; এই জন্য ইংরাজেরা, এই তোপের নাম দিয়াছিল—"হুইস্‌লিং ডিক্"।

সে যাহা হউক ২৪ তারিখে, ইংরাজ-সৈন্য, চারিটা তোপমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, দক্ষিণ দিকের কেল্লার উপর গোলা বর্ষণের উদ্যোগ করিল। ২৫ তারিখে তোপের রঞ্জুকে আগুন লাগাইল। কতকগুলি তোপ হইতে "কুলুপী-গোলা" (Shell) একসঙ্গে বর্ষিত হইয়া সহরের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সহরভূমির উপর লক্ষ্য করিয়া. "পৌগুর্স"-তোপ হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। ইহাতে করিয়া, ঝাঁসির তোপ-খানার (আর্টিলারি) কতকগুলি গোলন্দাজ নিহত হওয়ায় ঝাঁসির তোপ বন্ধ হইয়া গেল এবং দুর্গ-প্রাকারও কতকটা ভগ্ন হইল। ইংরাজদিগের কুলুপী-গোলা সহরের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, সহর-বাসী লোকদিগের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এই ভয়ঙ্কর গোলা, রাস্তা কিম্বা ঘরের উপর পড়িবামাত্র ফাটিয়া চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, অনেক লোক জখম ও নিহত হইল। সহরের দোকান-হাট বন্ধ হইয়া গেল—অনেক ঘরে আগুন লাগায়, তাহার প্রজ্বলিত শিখায় গগনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। এই দারুণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া রানি ঠাকুরানি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু ইহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া, যাহাতে লোকের কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যে সকল প্রজার গৃহ-দাহ হইয়াছিল, সেই অনাথ লোকদিগের জন্য অন্নদানের ব্যবস্থা করিলেন—দক্ষিণী ব্রাহ্মণদিগের জন্য গণপতির মন্দিরে অন্নসত্র খুলিলেন, এবং অপর সাধারণের জন্য সদাব্রতের উদ্যোগ করিয়া কাঙ্গাল গরিবদিগকে ছোলা-ভাজা বিতরণ করিতে লাগিলেন। রানি-ঠাকুরানির নিকট হইতে সৈন্যগণ উত্তেজনা ও উৎসাহবাক্য প্রাপ্ত হইয়া, ইংরাজের ভীষণ কুলুপী-গোলাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, বন্দুক হইতে এক সঙ্গে অজস্র গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিস্তর লোক জখম ও নিহত হয়। চতুর্থ দিবসে,

অর্থাৎ ২৫ মার্চ তারিখে ইংরাজেরা কেল্লার দক্ষিণভাগ হল্লা করিয়া আক্রমণ করিল; উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; অবশেষে, দ্বিপ্রহরের সময়, কেল্লার দক্ষিণ বুরুজের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে কেল্লার লোকেরা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে, পশ্চিমস্থ বুরুজের গোলন্দাজ, তোপ-মঞ্চ হইতে তোপ উঠাইয়া লইয়া দূরবীনের দ্বারা উত্তম লক্ষ্য সন্ধান করিয়া, কেল্লার দক্ষিণ বুরুজে আবার তোপমঞ্চ বসাইল। এবং তথা হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া, ইংরাজের গোলন্দাজদিগকে নিহত করিয়া, তাহাদিগের তোপ বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে রানি ঠাকুরানি পরিতুষ্ট হইয়া এক-তোড়া টাকা গোলন্দাজকে বক্‌শিস্ করিলেন। এই গোলন্দাজের নাম গুলাম-গোষখান।

যদিও ঝাঁসির সৈন্য, ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত ছিল না, তথাপি তাহারা এই যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে ইংরাজ-সেনানী বিস্ময়োচ্ছ্বাস প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ডাক্তার লো-সাহেব, তাঁহার "মধ্য হিন্দুস্থান" নামক গ্রন্থে ঝাঁসি-যুদ্ধের যে সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঝাঁসির সৈন্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত, রণশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত, সমান ও সমকক্ষভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। একজন দেশীয় ভদ্রলোক, যিনি সেই যুদ্ধের সময়, ঝাঁসিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ডাক্তার সাহেবের বর্ণনার সহিত তাহার বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। দেশীয় ভদ্রলোকটি এইরূপ বলেন :—

"রাত্রিকালে সহর ও কেল্লার উপর গোলা আসিয়া পড়িতে লাগিল; সেই গোলাগুলা দেখিতে ভয়ঙ্কর! (মর্টার) "গহ্বর-নলী" তোপনিঃসৃত গোলাগুলি পঞ্চাশ ষাট সের ওজনের হইলেও, তোপ হইতে যখন সবেগে ছুটিয়া আসিত, তখন যেন ক্রীড়া-কণ্ডুকের ন্যায় ক্ষুদ্র ও খদিরের ন্যায় লাল দেখাইত। দিবসের প্রখর সূর্যালোকে গোলাগুলা স্পষ্ট দেখা যাইত না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহারা যেন কণ্ডুকের ন্যায় ইতস্তত ছুটিতেছে, এইরূপ মনে হইত। প্রত্যেক লোকের মনে হইত, বুঝি এই গোলা আমার উপর আসিয়াই পড়িবে। কিন্তু প্রায়ই সেই সব গোলা সাত আট শো পদ তফাতে আসিয়া পড়িত। এই প্রকার, দিবারাত্রি যুদ্ধ হইয়া সমস্ত সহর একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এইরূপ যুদ্ধ হইল। দেড় প্রহর পর্যন্ত, রানি ঠাকুরানির জয় হইয়া, ইংরাজের সৈন্য নাশ হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের তোপও কিয়ৎকালের জন্য বন্ধ হইল। কিছু পরে, ইংরাজের আবার জয় হইতে লাগিল এবং বিরুদ্ধ পক্ষের তোপ বন্ধ হইয়া গেল; বিশেষত সূর্যাস্তকালে কেল্লার দক্ষিণদিকের তোপচালক গোলন্দাজেরা আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজের গোলাবর্ষণে, দক্ষিণদিকের তোপ-মঞ্চ ভাঙিয়া যাওয়ায়, রাত্রিকালে সুদক্ষ রাজমিস্ত্রি মজুর আনানো হইল। তাহারা অতীব কৌশলসহকারে, কম্বলে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে বুরুজের উপর উঠিল, এবং নিম্নভূমি হইতে, লোকের স্কন্ধে লোক উঠাইয়া, ইষ্টক প্রভৃতি উপকরণ, বুরুজের উপর আনিয়া তুলিল এবং শুইয়া তোপ-মঞ্চ বাঁধিতে লাগিল।

এইরূপে, ইংরাজের অলক্ষিতে, তোপ-মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া ঝাঁসির সৈন্য আবার তোপ চালাইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় ইংরাজদিগের একটু শৈথিল্য হওয়ায়, তাহাদিগের অনেক লোক মারা পড়িল এবং দুইটি তোপ বন্ধ হইয়া গেল। অষ্টম দিবসের প্রভাতে, ইংরাজ ফৌজ "শঙ্কর" কেল্লার উপর আবার গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের

নিকট দুর্গ অবরোধের উপযোগী অতি মূল্যবান দূরবীন ছিল। ... সেই দূরবীনের সাহায্যে কেল্লার অভ্যন্তরস্থ জলের চৌবাচ্চার উপর লক্ষ্য করিয়া তাহারা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। জলের ভারীরা জল তুলিতে তাহাদের মধ্যে ৫/৭ জন নিহত হওয়ায়, বাঁক ফেলিয়া তাহারা পলায়ন করিল। ইহাতে, জলের অভাব হওয়ায়, স্নানাদির অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিল। এই সময়ে, কেল্লার গোলন্দাজেরা ইংরাজ-গোলন্দাজের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের তোপ বন্ধ করিয়াছিল। এখন আবার, চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিবার সুবিধা হওয়ায়, স্নান ভোজনাদির সুব্যবস্থা হইল। আহারাদির কিছুকাল পরে, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া যত্র-তত্র ধূম ও ধুলায় ভরিয়া গেল। তাহাতে, দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া আর কিছুই দেখা যায় না, এইরূপ হইল। না জানি কি হইয়াছে, এই ভয়ে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে, অনুসন্ধানে, জানা গেল, রাজবাটীর সম্মুখস্থ ময়দানের বারুদ-কারখানায়, ৩০ জন পুরুষ ও আট জন স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে এবং ৪০/৫০ জন জখম হইয়াছে। তেঁতুল গাছের ময়দানে, বারুদ কারখানার গোজ আরম্ভ হইয়াছিল। দুই মন বারুদ প্রস্তুত হইবামাত্র, বুরুজের নীচের তল-ঘরে লইয়া রাখা হইতেছিল। সেই কারখানায় ইংরাজের গোলা পড়িবামাত্র, বারুদে আগুন লাগে এবং তাহার সূক্ষ্মকণা সকল ধূলির মধ্যে প্রসারিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, তদোদ্গত ধুম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অষ্টম দিবসে তুমুল যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইল। কামান ও বন্দুকের মুহুর্মুহু ধ্বনি, শিঙ্গা, কর্ণে, ও ব্যুগেলের বাদ্য যেখানে সেখানে শুনা যাইতে লাগিল। ধোঁয়াতে, ধুলাতে ও নানাপ্রকার শব্দে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্যের গোলাবর্ষণে ঝাঁসির অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। রাত্রিতেও সহরের উপর গোলা আসিয়া পড়িতে লাগিল—তাহাতেও অনেক লোক মারা গেল, অনেক প্রাণভয়ে গৃহ মধ্যস্থিত উৎকট স্থানে গিয়া লুকাইয়া রহিল। ভূমিস্থ গোলন্দাজ ও সিপাহি বিস্তর নিহত হইল। এই দিন রানি ঠাকুরানির অত্যন্ত শ্রম হইয়াছিল। চারিদিকে নজর রাখিয়া, যেখানে কিছু অভাব হইতেছিল, অমনি তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিবার হুকুম দিতেছিলেন। তাহাতে, সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া প্রবল ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়িতেছিল। ইংরাজদিগেরও পরাক্রম প্রকাশে ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ঝাঁসি সৈন্যের অপ্রতিম দৃঢ় নিশ্চয় নিবন্ধন, ইংরাজেরা ৩১ তারিখ পর্যন্ত কেল্লার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।"

এই ৩১ তারিখের রাত্রিতে রানি ঠাকুরানি একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। যেন একটি সুবেশিনী মধ্যমবয়স্কা নারী, গৌরবর্ণ, সরল নাসিকা, প্রশস্ত-ললাট, বিশাল কৃষ্ণ নেত্র, অতীব রূপবতী, সর্বাঙ্গে মুক্তার অলঙ্কার, পরিধানে চওড়া পাড়ের লাল শাড়ি, অঙ্গে রেশমী পাড়ের চোলি, মাল-কোঁচা দেওয়া, কোমর বাঁধা,—এইরূপ বেশে কেল্লার বুরুজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, অতীব উগ্র ভাবভঙ্গীসহকারে রক্তবর্ণ গোলা লুফিয়া ধরিতেছেন এবং গোলা ধরিতে ধরিতে হাতে কালিমা পড়ায়, রানি ঠাকুরানিকে তাহা দেখাইয়া যেন এইরূপ বলিলেন, আমি বলিয়াই এইরূপ গোলা লুফিয়া ধরিতে পারিতেছি।

যাহা হউক, উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ ঘনঘোর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়ে আর একটি গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইল। ঝাঁসির রানিকে সাহায্য করিবার জন্য, নানাসাহেবের অদেশানুসারে, তাঁহার সেনাপতি তাতিয়া-টোপি, কাল্পী হইতে বিশ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া কুচ করিতে করিতে ঝাঁসির নিকট আসিয়া পৌছিলেন। ঝাঁসির নিকটস্থ কোন উচ্চ

ভূমির উপর ইংরাজদিগের টেলিগ্রাফ-আফিস স্থাপিত ছিল। আফিসের অধ্যক্ষ দূরবীন-সহযোগে উত্তরদিক হইতে এক বিপুল সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া, ভয়সূচক নিশান খাড়া করিল। তদ্দ্বারা, শত্রুর আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া ইংরাজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন। কেননা বিরুদ্ধ পক্ষের তুলনায়, ইংরাজ-সৈন্য কম থাকায়, ঝাঁসির অবরোধের জন্য, তাহারা স্থানে স্থানে পথ-ঘাট বন্ধ করিয়া অবিস্থিতি করিতেছিল। সেই সকল স্থানে হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া আনিলে, কেল্লার লোকেরা পথ মুক্ত পাইয়া, হল্লা করিয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবে—এইরূপ ইংরাজ সেনাপতির আশঙ্কা হইল।

এদিকে, বেটোয়া নদীতীরস্থ সমভূমি ময়দানে, তাতিয়া-টোপির প্রবল সৈন্য, মহা উৎসাহে, আড্ডা গাড়িয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তন্মধ্যে, গোয়ালিয়ার কন্টিঞ্জেন্ট ফৌজের যে বিদ্রোহী দল, কানপুরে, সেনাপতি উইনড্যামের সৈন্যকে পরাভূত করে, তাহারাও সেই সঙ্গে ছিল। তাহারা বিজয়ানন্দে বিস্ফুরিত হইয়া মনে করিতেছিল, পেশোয়ার সৈন্যের নিকট ইংরাজ সৈন্যের কিসের যোগ্যতা? যাহা হউক, এই সাহায্য যথাসময়ে আসিয়া পড়ায়, ঝাঁসি-রক্ষণের বল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল এবং ইংরাজদিগের বিজয়পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

এদিকে, স্যর্ হিউ-রোজ্ তাতিয়া-টোপির আগমনবার্তা অবগত হইবামাত্র, কোনপ্রকার গোলযোগ না করিয়া, অতি শান্তভাবে, ৩' তারিখে রাত্রে, প্রথম ব্রিগেডের সৈন্যদল হইতে কতকগুলা হাতি আনাইয়া, ২৪ পৌণ্ডের দুই তোপ, বোর্ছার রাস্তার উপর স্থাপন করিলেন, এবং সেখান হইতে সহরে যাইবার রাস্তা একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

তাতিয়া টোপি একজন সুচতুর বীরপুরুষ ছিলেন। বিদ্রোহ সময়কার বিলাতি "ডেলিনিউস" পত্রে, তাঁহার এইরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হয় :—

তাতিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—উচ্চ বংশের নহে। তাহাতে দস্যুবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহার চাতুর্যবুদ্ধি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তিনি লেখা-পড়া জানেন না, কিন্তু সিপাহিগিরি কাজে খুব মজবুত। ইহার জন্য, তাঁহার উপর, তাঁহার অনুচরবর্গের অচলা নিষ্ঠা। তাঁহার দেহের গঠন সুদৃঢ়, হৃষ্ট-পুষ্ট ও সতেজ। নৈতিক প্রভাব অপেক্ষা বাহুবলের প্রতাপে তিনি অন্যের মনে উৎসাহ ও বল সঞ্চার করেন। ইংরাজেরা যে সমর বিদ্যায় কুশল, ইহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই জন্য, সমরক্ষেত্রে ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে অনুধাবন করিয়া ক্লান্ত করিতে তাঁহার ভাল লাগে। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। তিনি অত্যন্ত দুর্দান্ত বেগশালী তেজীয়ান ও সাহসী। তাঁহার শৌর্যযুক্ত সতেজ সুন্দর মুখশ্রী। তাঁহার দৃষ্টি চপল ও উগ্র। ভ্রূ-যুগল ধনুকাকার, কপাল উচ্চ ও সরল, নাসিক গরুড় পক্ষীর ন্যায়, মুখ ছোট, ঠোঁট চাপা, দাঁত ধপ্‌ধপে সাদা, গোঁফ কালো ও দেহ-বর্ণ ঘন-শ্যামল। কেতাদুরস্ত অপেক্ষা দেহরক্ষণোপযোগী কাপড় পরিতে তিনি ভাল বাসেন। তিনি সর্বদা পা-পর্যন্ত লম্বা একটা জোব্বা পরেন ও কাঁধের উপর একটা কাশ্মীরি শাল ফেলিয়া রাখেন। তাঁহার সহিত বারো মাস, প্রায় ২৫/৩০ জন লোক প্রহরী থাকে। ইহাদের সাহায্যে, যুদ্ধের মধ্যে তিনি আপনাকে কোন প্রকারে উদ্ধার করেন। "নানা সাহেবের প্রতিনিধি" এই উপাধিটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।"

শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেব পেশোয়াকে যে পেনশন দেওয়া হইত, সেই পেনশনের টাকা তাঁহার মৃত্যুর পর, ইংরাজেরা বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, তাঁহার উত্তরাধিকারী, প্রসিদ্ধ নানা সাহেব সিপাহিবিদ্রোহে যোগ দেন; এবং তাহার তরফে, তাঁহার স্বামীনিষ্ঠ সেবক তাতিয়া টোপি ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া, স্বীয় প্রভুর আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েন। এই তাতিয়া টোপির পরাক্রমে, বিদ্রোহীদল প্রবল হইয়া কিছুকালের জন্য যেন অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাতিয়ার ষড়যন্ত্রবলেই, সিন্ধিয়া-সরকারের কন্টিঞ্জেন্ট ফৌজ বিদ্রোহীদলভুক্ত হয় এবং তাঁহারই যুদ্ধকৌশলে কানপুরের নিকটস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে জেনরেল উইন্‌ড্যামের অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্য পরাভূত হয়। "এম্‌পায়ার ইন্ ইন্ডিয়া" এই গ্রন্থের লেখক বলেন—"যদি আরও কিছু সাহস প্রকাশ করিতেন এবং কেবল অভাবপক্ষের রণ-কৌশল না দেখাইয়া, কতকগুলি ভাবপক্ষের রণকীর্তি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই "হিন্দু গ্যারিবল্‌ডি" নামে খ্যাত হইতেন সন্দেহ নাই।"

যাহা হউক, তাতিয়া টোপি, কাল্পি হইতে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাঁসির সাহায্যে আসিয়াছেন দেখিয়া, কেল্লার লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহার স্বাগত সম্ভাষণার্থ তাহারা মুহুর্মুহু তোপের সেলামি দিতে লাগিল এবং তাঁহার জয়ঘোষণায় রণবাদ্য আরম্ভ করিয়া দিল। সেই বাদ্যরবে গগনমণ্ডল বিকম্পিত হইল এবং সকলের হৃদয় আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। এই উৎসাহেব দৃশ্য, রানি ঠাকুরানি ও তাঁহার সর্দার মণ্ডলী কেল্লার দুর্গ হইতে দেখিতে লাগিলেন এবং রানি ঠাকুরানি দুর্গের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি, কেল্লার প্রাকারের উপর এবং ইংরাজের ছাউনি মধ্যে মশাল জ্বলিতেছিল—এবং তাহারই আলোকে যুদ্ধ চলিতেছিল।

১ এপ্রিল তারিখে, প্রাতঃকালে, রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্বদিবসে, স্যার হিউ রোজ, ঝাঁসির অবরোধের জন্য যত লোক আবশ্যক তাহা স্থানে স্থানে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য, অতীব দক্ষতা সহকারে, শত্রুদিগকে বিন্দুমাত্র জানিতে না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এদিকে, তাতিয়া টোপি ইংরাজের সৈন্য নিতান্ত অল্প বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র, তিনি ঝাঁসির অবরোধ ভঙ্গ করিবার জন্য, একদল সৈন্য রণস্থলে প্রেরণ করিলেন; তাহারা ইংরাজদিগের আয়ত্ত-সীমার মধ্যে আসিবামাত্র, স্যার হিউ রোজ, শত্রুর দক্ষিণদিক আক্রমণ করিবার জন্য, কতক দল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যকে নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার অব্যবহিত তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বাধীনে তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্য গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে, শত্রুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল এবং তাহাদিগের মধ্যে বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইতিমধ্যে, তাতিয়া টোপির পক্ষ হইতেও তোপের মার শুরু হইল, তাহাতে ইংরাজ-অশ্বারোহী সৈন্য অনেক নিহত হইল। সেই সময়ে তাতিয়া টোপির অধীনস্থ আফগান-সিপাহিরা উচ্চ উচ্চ ভূমির উপর উঠিবার চেষ্টা কবিতেছিল কিন্তু, কাপ্তেন লীড় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। এইক্ষণে, ইংরাজ পক্ষ হইতে গোলাবর্ষণ, ঘোড়সওয়ারের অনুধাবন ও পদাতিকদিগের আক্রমণ একেবারে এক

সঙ্গে আরম্ভ হওয়ায়, পেশোয়ার সৈন্য নিরুপায় হইয়া পড়িল। এই পরাজিত সৈন্যদলের পশ্চাতে, এক ক্রোশ অন্তরে, তাতিয়া টোপির অধীনস্থ মুখ্য সৈন্যদল, বেটোয়া নদীর তীরে, জঙ্গল-প্রদেশ মধ্যে অবস্থিত ছিল। অগ্রগামী সৈন্যদল পলাইয়া আসিতেছে দেখিয়া, তাহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। এদিকে স্যর্ হিউ রোজ, তোপের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া, পদাতিকদিগের পৃষ্ঠানুসরণ করিলেন। তাতিয়ার সৈন্য জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিয়া, যাহাতে ইংরাজেরা আর অগ্রসর হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। তথাপি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ইংরাজ সৈন্য বেটোয়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইল। তাতিয়া টোপির গোলন্দাজেরা তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা উচ্চ ভূমির উপর থাকায়, তাহাদিগের কোন ক্ষতি হইল না। পক্ষান্তরে, ইংরাজেরা যে গোলাবর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে বিরুদ্ধ পক্ষের গোলন্দাজেরা নিহত হইতে লাগিল। তাহার পর, ইংরাজ অশ্বারোহী সৈন্য সজোরে হল্লা করিয়া আক্রমণ করায়, তাহারা বড় বড় ২৪/৩৬ পৌণ্ডের তোপ রণভূমির উপর ফেলিয়া পলায়ন করিল। এই সকল কামান অত্যন্ত ভারী বলিয়া, নদীতীরের বালুকার মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং গোলা বারুদ প্রভৃতি উপকরণের সহিত এই সকল তোপ অনায়াসে ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। শুধু তাহা নহে, ১৬ মাইল পর্যন্ত পলাতক শত্রুদিগকে অনুধাবন করিয়া তাহাদের সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী ইংরাজেরা আপনার করিয়া লইল। এই বিজয়লাভে ইংরাজ সৈন্য মধ্যে মহা উল্লাস পড়িয়া গেল এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে, সেই পরিমাণে, দুঃখ, ভীতি ও নিরাশা এই তাপত্রয় আসিয়া উপস্থিত হইল। সংসারের গতিই এইরূপ!

"নীচৈর্গচ্ছত্যু পরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে;

"ক্রিয়াসিদ্ধি সত্ত্বে ভবতি মহতাং লোপকরণে"

৪

২৩ মার্চ হইতে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ১১ দিবস, ইংরাজেরা, ঝাঁসি ঘেরাও করিয়া, ঝাঁসি সৈন্যের সহিত দিবারাত্র ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল; তথাপি রানি ঠাকুরানির অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়নিশ্চয়তা প্রযুক্ত তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু তাহা নহে, ইংরাজদিগের যুদ্ধসামগ্রী নিঃশেষিত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এই সময়ে দৈব তাহাদিগের অনুকূল হইলেন। তাতিয়া টোপির সৈন্য, ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী রণক্ষেত্রে ফেলিয়া পলায়ন করায়, সেই সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী অনায়াসে ইংরাজের হস্তগত হইল। এইক্ষণে স্যর হিউ রোজ, ঝাঁসি অবরোধ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া না থাকিয়া, একেবারে হল্লা করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য গুপ্তভাবে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সমস্ত সৈন্যকে বিভক্ত করিয়া, এক এক কাজে নিযুক্ত করিলেন। প্রথম বিভাগের সৈন্য দুর্গ-প্রাকারে সিঁড়ি লাগাইয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিবে; দ্বিতীয় বিভাগ,

তলবার ও সঙ্গীন লইয়া শত্রুর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়া সহরের কোন এক দ্বারের মধ্য দিয়া সহরে প্রবেশ করিবে, এইরূপ যুক্তি স্থির হইল এবং এই যুক্তি অনুসারে, প্রভাতকালে, সমস্ত ইংরাজ সৈন্য কেল্লার অভিমুখে চাল আরম্ভ করিল। দুর্গের মুখ্য দরজার দিকে ইংরাজসৈন্য আসিতেছে দেখিবামাত্র তত্রস্থ প্রহরীরা ভয়সূচক শিঙ্গা ও রণবাদ্য বাজাইয়া ঝাঁসির সমস্ত সৈন্যকে এই বার্তা ইঙ্গিতের দ্বারা অবগত করাইল ও তখনই প্রস্তুত হইয়া স্ব স্ব কর্তব্যে নিযুক্ত হইল।

তাতিয়া টোপির পরাভববার্তা শুনিয়া রানি ঠাকুরানি একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; প্রবল ইংরাজ সৈন্যের সহিত আর পারিয়া উঠিবেন না, এইরূপ তাঁর মনে হইতেছিল। তাঁহার সৈন্য মধ্যেও এই কারণে, উদাস ভাব স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রানি ঠাকুরানি তাঁহার সরদারদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন এবং আবেগময় বাক্যে তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন—"আজ পর্যন্ত ঝাঁসি, ইংরাজের সহিত যে লড়িয়াছে সে পেশোয়ার বলের উপর নির্ভর করিয়া লড়ে নাই এবং কখনও তাঁহার সাহায্য আমাদের আবশ্যক নাই। আজ পর্যন্ত তোমরা যেরূপ আপন স্বাভিমান, আপন সাহস, আপন ধৈর্য, আপন শৌর্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া আপন খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার করিয়াছ, সেইরূপ এখনও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ঝাঁসি সংরক্ষণ করা তোমাদের কর্তব্য।" এইরূপে রানি ঠাকুরানি, উৎসাহজনক বাক্য বলিয়া, সৈন্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে সুবর্ণ বলয় ও পরিচ্ছদ বক্‌শিশ করিলেন; ইহাতে সৈন্যগণ পুনর্বার উত্তেজিত হইয়া উঠিল; পুনর্বার রণোৎসাহে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল। ঝাঁসির মুখ্য গোলন্দাজ গুলাম গোষ-খান, তোপের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ববৎ ইংরাজসৈন্যের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। স্বয়ং রানি ঠাকুরানি, কেল্লার বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য, দুর্গের উপর ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে ইংরাজ গোলন্দাজরাও কেল্লা ও সহরের উপর ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গ প্রাকারের স্থানে স্থানে, সছিদ্র ও ভগ্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজের গহ্বর-নলী, তোপ হইতে, ঝাঁসির প্রাসাদের উপর গোলা বৃষ্টি হওয়ায় তাহারও অনেকটা জখম হইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয়তলে গণপতির সিংহাসন ও আয়না-ঘর ছিল। এই আয়না-ঘর, লখনউয়ের উৎকৃষ্ট মূল্যবান আর্শির দ্বারা সজ্জিত ছিল। ইহার উপর গোলা আসিয়া পড়ায় কাচের সামগ্রী সব চুরমার হইয়া গিয়াছিল। এবং "কুপ্পী গোলা" হইতে পেরেক ও ছর্‌রা-গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় রাজবাটীর চারিজন লোক নিহত হয়। ইহাতে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু রানি ঠাকুরানি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোমরে তলবার বাঁধিয়া, দুর্গের উপর উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন এবং সৈন্যগণকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ইংরাজ সৈন্য কেল্লা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সবেগে আসিতেছে দেখিয়া, সহরের ভূমি ও কেল্লার বুরুজ হইতে ঝাঁসির সৈন্য তাহাদিগের উপর তোপ চালাইতে আরম্ভ করিল—তোপের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে ইংরাজ সৈন্য একেবারে ধ্বংসপ্রায় হইল, তথাপি উহারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া সাহসের উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দুর্গ-প্রাকারে সিঁড়ি লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। কিয়ৎকালের জন্য কেল্লার লোকেরা সুচারুরূপে দুর্গ সংরক্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে

ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট সহরের বোর্ছা দরজা হস্তগত করিয়া দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করায় দুর্গোপরিস্থ গোলন্দাজ সৈন্য হতাশ হইয়া পলাইতে লাগিল; স্টুয়ার্টের সৈন্য জয়লাভ করিয়াছে শুনিয়া অন্যান্য বিভাগের ইংরাজ সৈন্য মধ্যেও উৎসাহ বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল; এবং এক্ষণে সকল দিক হইতেই তাহারা সিঁড়ি লাগাইয়া দুর্গের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে এক সহস্র ইংরাজ সৈন্য দুর্গের উপর উঠিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে স্যর হিউ রোজ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া "বোরছা" দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এং তিনিও সহরের দিকে চাল আরম্ভ করিলেন। ঝাঁসি-সহরের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড রাজবাটী ছিল এবং তাহার সংরক্ষণার্থ কতকগুলি লোক তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। স্যর হিউ রোজ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রাজবাটী হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে রানি ঠাকুরানি, কেল্লার সমস্ত তোপ-মঞ্চ সাম্‌লাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন; এমন সময়ে যখন শুনিলেন, সহরের দক্ষিণ প্রাচীর ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিল; তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কেল্লার উপর আসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে সহরের দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন—সহস্র গোরা-সৈন্য সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাহাকার উঠাইয়াছে, ইহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই সময়ে কিছুকালের জন্য নৈরাশ্য ও ভীতির চিহ্ন তাঁহাব মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সামলাইয়া শূরত্বের আবেশে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া শেষপর্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য এইরূপ দেড় হাজার মুসলমান ও আরবী সৈন্য সঙ্গে লইয়া রানিঠাকুরানি সত্বর কেল্লার নীচে অবতরণ করিলেন, এবং কেল্লার বড় দরজা দিয়া বাহির হইয়া, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। সহরের দক্ষিণ প্রাকারের উপর দিয়া যে সহস্র গোরা সৈন্য সহরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ তলবার উত্তোলন করিল। রানি ঠাকুরানি সকলের পশ্চাতে ছিলেন; তিনি এই সময়ে মহা আবেশ সহকারে নগ্ন তলবার উঠাইয়া সকলের মধ্য ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোরা-সৈন্য ও ঝাঁসি সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎকার হওয়ায়, তলবারে তলবারে ঝনাৎকার উঠাইয়া দুই পক্ষের লোকই এক সঙ্গে মিশাইয়া গেল। এই যুদ্ধে অনেক গোরা নিহত হইল—যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা সহরের দিকে পলাইয়া গিয়া, বৃক্ষ ও গৃহের অন্তরাল হইতে বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে একদল গোরা-সৈন্য আসিয়াছিল তাহারাও তলবার না চালাইয়া, দূর হইতে বন্দুকের গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রানির পুরাতন সর্দারেরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল "মহারানি, এই সময়ে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া আপনার কর্তব্য নহে। গোরা-সৈন্য ইমারতের আড়াল হইতে গুলি মারিতেছে--তা ছাড়া শত শত গোরা সহরে প্রবেশ করিয়াছে। সহরের সকল দরজাই খোলা—এক্ষণে সহরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার কোন অর্থ নাই। তদপেক্ষা, কেল্লার ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঈশ্বর যাহা যুক্তি দেন তাহাই আমাদের করা ভাল। ফিরিয়া যাইবার ইহাই সময়।" এই কথা বলিয়া, তাহারা রানি ঠাকুরানির হাত ধরিয়া ফিরাইয়া দিল। তখন তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে আবার কেল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে গোরা-সৈন্য চারিদিকের দরজা দিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে ৮০ বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত পুরুষ দেখিবামাত্র তাহারা গুলি কিম্বা তলবারের দ্বারা নিহত করিতে লাগিল; সহরের একদিকে আগুন লাগাইয়া দিল। সেই সময় সহরের মধ্যে যেরূপ হাহাকার উঠিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। মেষপালেব মধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া পড়িলে যেরূপ দশা হয়, লোকেরা প্রাণভয়ে আকুল হইয়া সেইরূপ পলাইতে লাগিল। কেহ বা গলির মধ্যে প্রবেশ করে, কেহ বা গৃহের নিকট স্থানে গিয়া লুকায়, কেহ বা দাড়ি গোঁপ কামাইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করে, এই প্রকার যে যেরূপে পারিল, প্রাণ বাঁচাইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। গোরারা সহবে প্রবেশ করিয়া সহর একেবারে বিজন করিয়া তুলিল; সহরের মধ্যভাগে "ভিড়্যার বাগ" নামক একটা উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে সহস্র সহস্র লোক আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানেও যখন গোরারা প্রবেশ করিল, তখন সেই সকল লোক অতি দীনভাবে ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিল "আমি নিরপরাধী কৃষক; আমি যুদ্ধের মধ্যে নাই—দয়া করিয়া আমার প্রাণদান করুন।" তাহাদিগের এইরূপ করুণবাক্য শুনিয়া ইংরাজ সেনা-নায়কের দয়া হইল; তিনি সেই প্রণত লোকদিগকে অভয়বচন দিয়া, উদ্যানের চারিদিকে পাহারা বসাইয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিলেন; এবং এইরূপ হুকুম প্রচার করিলেন যে বাহিরের লোককে ভিতরে আসিতে এবং ভিতরের লোককে বাহিরে যাইতে কদাচ দেওয়া না হয়।

কিন্তু অন্য দিকের গোরারা লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সোনা রূপার সামগ্রী লুট করিতে লাগিল। পুরুষ দেখিলেই ধরিতে লাগিল, যতক্ষণ না তাহাদের অর্থ সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইল ততক্ষণ তাহাদের ছাড়িল না—এমন কি অর্থ পাইলেও, শেষে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা বলিতে হইবে স্ত্রীলোকদিগকে উহারা কখনও ইচ্ছাপূর্বক মারে নাই। তবে কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে, গোরারা সম্মুখের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, ঘরের স্ত্রীলোকেরা সতীত্বনাশের ভয়ে পশ্চাতের দ্বারা দিয়া বাহির হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কোথাও বা এরূপও ঘটিয়াছে, ঘরে প্রবেশ করিয়া গোরারা পুরুষকে গুলি করিতেছে, সেই সময় তাহার স্ত্রী আসিযা স্বামীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—সেই অবস্থায় গুলি স্বামীর গায়ে না লাগিয়া স্ত্রীর গায়ে লাগিয়া নিহত হইয়াছে।

যাহা হউক সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত গোরারা এইরূপ লুটপাট করিয়া অবশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

সহর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে, স্যর হিউ রোজ রাজবাটী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর প্রহরীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রাজবাটী সংরক্ষণের প্রযত্ন করিল। এই যুদ্ধে অনেক গোরা নিহত ও আহত হইল। কিন্তু ইংরাজের সংখ্যা অধিক থাকায় এবং রাজবাটীর চতুর্দিকস্থ ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায়, প্রহরীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, অবশেষে গোরাসৈন্য হল্লা করিয়া রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজবাটী হস্তগত হইলে, ইংরাজেরা তত্রস্থ লোকদিগকে নিহত করিল। রাজবাটীর চতুর্দিকে ঝাঁসির একদল অশ্বারোহী প্রহরী ছিল, তাহারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল; অবশেষে তাহারাও নিহত হইল। এইক্ষণে সমস্ত রাজবাটী ইংরাজের হস্তগত হওয়ায়, গোরারা প্রাসাদের মূল্যবান সামগ্রী সকল লুটপাট করিতে লাগিল। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে, ব্রিটিশ রাজচিহ্নাঙ্কিত

ধ্বজা—"ইউনিয়ন জ্যাক্" ইংরাজ সৈন্যের হস্তগত হওয়ায় তাহারা পরমানন্দ লাভ করিল এবং সেই ধ্বজা মহা বিজয়োৎসাহে রাজবাটীর উপরে উঠাইয়া তথায় ব্রিটিশ আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিল।

এদিকে রানি ঠাকুরানি, ঝাঁসি সৈন্যের বিজয় লাভ হইতেছে না দেখিয়া, কেল্লার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং শোকবিহ্বল হইয়া নিশ্চলভাবে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলেন। সেই তেজস্বিনী মহিলার এইরূপ দীন অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার আশ্রিত মণ্ডলীর অত্যন্ত কষ্ট হইল; চিন্তাকুল হইয়া এক্ষণে কি কর্তব্য, মৃদুস্বরে তাহারই বিচার করিতে লাগিল। এক প্রহরের পর, রানি ঠাকুরানি, সহরের কিরূপ দশা হইয়াছে দেখিবার জন্য বারান্দায় আসিলেন। সেই সময়ে যেরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহা দেখিয়া তিনি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "হলবাইপুরা" নামক সহরের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান ভাগে অগ্নি লাগায় সেখানে হাহাকার উঠিয়াছিল। সেই ভরপুর গ্রীষ্মকালের প্রতপ্ত সূর্যকিরণের মধ্যে, এই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ায় সহরের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে ক্রন্দন ও হাহাকার রব—কে কোথায় পলাইবে তাহার ঠিক নাই। শত শত বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে আর শত লোক নিহত হইতেছে। এইরূপ ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া, রানি ঠাকুরানি কিয়ৎকালের জন্য একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই সময়ে আবার শুনিলেন, কেল্লার মুখ্যদ্বার সংরক্ষণকারী সরদার কুম্বর-খুদাবক্স এবং তোপখানার প্রধান গোলন্দাজ—গুলাম-গোষ-খান ইহারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া রানি ঠাকুরানি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনার অধীনস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন, "আমরা আজ পর্যন্ত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া ঝাঁসি সংরক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের জয়লাভ হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। আমাদিগের বীরচূড়ামণি ও গোলন্দাজেরা নিহত হইয়াছে; সুতরাং দুর্গের বন্দোবস্ত যথারীতি না হওয়ায় দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। সহর মধ্যে, ইংরাজ সৈন্য, যত তত্র পথরোধ করিয়া বসিয়া আছে। এক্ষণে, হল্লা করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উহাদিগের সহজ হইয়াছে। কেল্লা উহাদিগের হস্তগত হইলে, আমাদিগকে কয়েদ করিয়া, কিরূপ প্রকারে যে উহারা আমাদিগের প্রাণনাশ করিবে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। এই হেতু, বারুদের দ্বারা রাজবাটী উড়াইয়া দিয়া, সেই সঙ্গে আমার ইহলীলা সাঙ্গ করিব এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। গোরাদিগকে আমার দেহ স্পর্শ করিতে কখনই দিব না। অতএব, যাহাদিগের মরিতে ইচ্ছা আছে, তাহারা এইখানে থাকুক, বাকী সকলে, আজ রাত্রেই কেল্লা ছাড়িয়া সহরের মধ্যে চলিয়া যাউক এবং আপনার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখুক।"

রানি ঠাকুরানির এই কথা শুনিয়া, একজন বৃদ্ধ সর্দারের অত্যন্ত কষ্ট হইল; সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিনয়পূর্বক রানি ঠাকুরানিকে এইরূপ বলিল : "মহরানি, আপনি কিঞ্চিৎ শান্ত হউন। ঈশ্বরই এই দুঃখ এই সহরের উপর আনিয়াছেন। তাহার আর উপায় নাই। সকল বিষয়ই পূর্বসঞ্চিত কর্মানুসারে হইয়া থাকে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। এই জন্মেই পূর্বপাতকের ফলভোগ করিতেছি, তাহার উপর আর এক মহাপাতকের ভার চাপান উচিত নহে। যে দুঃখই আসুক না কেন, তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করা আবশ্যক। তাহা হইলে, পরে আর উহার কোন উপসর্গ থাকিবে না। আপনি বীরাঙ্গনা, আত্মহত্যার কথা মনেই

আনিবেন না। বিপদ আসিয়াছে। তাহা হইতে এখন উদ্ধার হইতে হইবে। এক্ষণে কিল্লার মধ্যে থাকা যদি নিরাপদ না হয়, তবে আসুন আমরা আজ রাত্রেই শত্রুর ঘের ভাঙিয়া সহরের বাহিরে চলিয়া গিয়া পেশোয়ার সৈন্যের সহিত মিলিত হই। ইতিমধ্যে যদি মৃত্যু আসে তো খুবই ভাল। এখানে আত্মহত্যা করিয়া পাতক সঞ্চয় করা অপেক্ষা, সম্মুখযুদ্ধে রক্তধারায় স্নান করিয়া স্বর্গারোহণ করা অতীব প্রার্থনীয়।" এই কথা শুনিয়া, রানি ঠাকুরানি একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয় আবার বীরভাবে পূর্ণ হইল।

"ধর্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ংজিতং।"

এই উপদেশ বাক্য অনুসারে, তিনি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্ত দামোদর রাও বলেন, এই বৃত্তান্ত ঠিক নহে। আসল কথা, "রানি ঠাকুরানির প্রধান কর্মচারিমণ্ডলীই হতাশ হইয়া বারুদে আগুন লাগাইয়া প্রাণত্যাগ করিবার প্রস্তাব করে, এবং রানি ঠাকুরানি এই প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করেন।"

সে যাহাই হউক, সন্ধ্যার পর, রানি ঠাকুরানি আপনার নিকটস্থ পরিজন-মণ্ডলীকে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহাদিগের নিকট অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে যোগ্য পুরস্কারাদি দিয়া, কেল্লার গুপ্তদ্বার দিয়া সহরের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এই চিরবিচ্ছেদপ্রসঙ্গে, রানি ঠাকুরানির অনেকদিনকার পুরাতন ব্রাহ্মণ ভৃত্য ও দাসীগণ এবং অন্যান্য আশ্রিতমণ্ডলীর দারুন কষ্ট উপস্থিত হইল। সকলেই অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রিয় স্বামিনীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। কতক প্রভুভক্ত সেবক, রানিঠাকুরানির সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং তাহাদিগের ইচ্ছা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিল। রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রানি ঠাকুরানি কেল্লা হইতে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার পিতা, মোরোপন্ততাঁবে প্রভৃতি আত্মীয়মণ্ডলী সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; পথ খরচা হিসাবে কিঞ্চিৎ অর্থ থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া, তাঁহারা অশ্বারোহী অনুচরবর্গের জিম্মা করিয়া দিলেন; এবং সংস্থানের কুল পরম্পরাগত রত্নাদি, হস্তিপৃষ্ঠে হাউদায় ভরিয়া, সেই হস্তী আপনাদিগের মধ্যভাগে রাখিলেন। প্রায় দুই শত বাছা বাছা সওয়ার সঙ্গে লইয়া ও কতকগুলি পাঠান প্রভৃতি বিজাতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রধান সর্দারগণ কেল্লা হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত তৎপব হইল। স্বয়ং রানি ঠাকুরানি পুরুষবেশ করিলেন, অঙ্গে তার-জড়িত বর্ম ধারণ করিলেন এবং কোমরে কিরিচ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একটি দিব্য তলোয়ার ঝুলাইয়া আড়াই হাজার টাকা মূল্যের একটি সাদা রঙ্গের তেজাল ঘোড়ার উপর আরোহণ করিলেন। আপনার সঙ্গে তিনি কিছুমাত্র অর্থাদি লইলেন না। কেবল একটি রূপার পেয়ালা বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন এবং একটি অল্পবয়স্ক ক্ষুদ্র বালককে রেশমের কাপড়ে বাঁধিয়া পৃষ্ঠোপরি লইলেন। এই বালকটিই যে রানিঠাকুরানির প্রাণপ্রিয় দত্তকপুত্র দামোদর রাও, তাহা বোধ হয় পাঠককে বলিতে হইবে না।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইলে পর, "জয়শঙ্কর" "হর হব মহাদেব" এইরূপ বাক্য উৎসাহভরে গর্জন করিতে করিতে সর্ব মণ্ডলী কেল্লার নীচে অবতরণ করিলেন। প্রথমত তাঁহারা কেল্লার সুড়ঙ্গ রাস্তা দিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু মধ্য রাত্রি প্রযুক্ত সে রাস্তা খুঁজিয়া না পাওয়ায়, অতীব দক্ষতা সহকারে কেল্লাবুরুজের উপর দিয়া,

ইংরাজ সৈন্যের গতিবিধির উপর নজর রাখিয়া, সহরের মধ্যস্থিত উত্তর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন, এইরূপ মতলব করিলেন। যে সময়ে রানি ঠাকুরানি ঝাঁসিকে শেষ নমস্কার দিয়া, সমস্ত সৈন্য সমক্ষে, আপনার সেই তেজস্বী অশ্বকে পূর্ণবেগে ছুটাইয়া চলিলেন, সেই সময়ে সর্বলোক রানি ঠাকুরানিকে বিদায়-নমস্কার দিবার জন্য, রাস্তার দুই পার্শ্বে, কেল্লার মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। রানি ঠাকুরানি সকলের নিকট সপ্রেম বিদায় গ্রহণ করিয়া, অতি সত্বর, কতকগুলি সওয়ার-সমভিব্যাহারে, উত্তর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সেই দরজার বাহিরে 'তেহরী' সংস্থানের তোপ-মঞ্চ স্থাপিত ছিল। তোপ-মঞ্চের লোকেরা বাধা দেওয়ায়, "ইহা তেহরীর ফৌজ, রোজ সাহেবের সাহায্যে যাইতেছে" এই কথা বলিয়া রানি ঠাকুরানি অতীব কৌশল সহকারে, সেইস্থান পার হইয়া গেলেন। রানি ঠাকুরানির দল চলিয়া গেলে, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার যে সৈন্য আসিতেছিল, ইংরাজ-সৈন্য তাহাদিগের গতিরোধ করিল। এবং উভয় সৈন্যের মধ্যে গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। এদিকে, এক জন দাসী, একজন বন্দুকধারী অশ্বারোহী, আর দশ পনের জন সওয়ার, ইহাদিগের সহিত রানি ঠাকুরানি, শত্রু-ছাউনির মধ্য দিয়া একেবারে কাল্পীর রাস্তায় গিয়া পড়িলেন। সেই সময় ইংরাজ সেনাপতি সর হিউ রোজ রানির পলায়নের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অনুধাবন করিবার জন্য লেফটেনান্ট বৌকরের নেতৃত্বাধীনে কতকগুলি সওয়ার পাঠাইলেন। কিন্তু রানিঠাকুরানির অশ্ব অতীব দ্রুতগামী হওয়ায়, পলকের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রানি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন; ইংরাজ-সওয়ারেরা বরাবর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল; অবশেষে রাত্রি হওয়ায় আর তাঁহার সন্ধান পাইল না।

রানিঠাকুরানি কেল্লা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তাহার পরদিন সকালে, তৃতীয় ইউরোপীয় পল্টনের অধিনায়ক, লেফটেনান্ট বেগ্রি ঝাঁসির কেল্লার উপর আরোহণ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, কেল্লার দরজা একেবারে উদ্‌ঘাটিত; তিনি পরমানন্দে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি মাত্র মনুষ্য নাই। সমস্ত কেল্লা বিনা আয়াসে তাঁহার হস্তগত দেখিয়া, নিশ্চিন্তমনে তথায় তাঁহার বিজয়ধ্বজা স্থাপন করিলেন।

কর্নেল মেডোজ টেলর সাহেব, রানির পলায়ন-ব্যাপার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : "অবশেষে,—তখনও অনেক রাত্রি—কেল্লার যে ভাগটি অত্যন্ত নিরালা, সেই ভাগের একটি দরজা খোলা হইল—তাহার মধ্য দিয়ে বিষণ্ণভাবে, পলাতকদিগের যাত্রার-ঠাট বাহির হইল। রানি এবং তাঁহার ভগিনী বা সহচরী, পুরুষ-বেশ ধারণ করিয়া কতক বাছা-বাছা অনুচর-বর্গ সঙ্গে লইয়া, নীরবে, সিংহদ্বার পার হইয়া, বাহিরের ঘোর অন্ধকারে আসিয়া পড়িলেন...মৃদুস্বরে দুই চারিটি ফুস ফুস কথা ভিন্ন, আর কারও মুখে কথাটি নাই—অবশেষে শেষ লোকটি পর্যন্ত পার হইয়া গেল—অমনি দ্বার রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ হইল। প্রাণ হাতে করিয়া পলায়ন করাই সেই রাত্রির ব্যাপার; কেননা, ১৪ সংখ্যক ড্রেগুন-সৈন্যের ইংরাজ অশ্বারোহী পর্যটক প্রহরীদল এবং হাইদ্রাবাদের কন্টিজেন্ট ফৌজ, সতর্ক ও সজাগভাবে সর্বত্র পাহারা দিতেছিল; মধ্যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সকল লোকের হস্ত হইতে রানি কি করিয়া এড়াইয়া গেলেন, তাহা এ পর্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই; কিন্তু রানির সঙ্গে ভাল ভাল পথ-প্রদর্শক ছিল, এ কথা সত্য। রানি একজন নির্ভীক ঘোড়সওয়ার ছিলেন, তিনি অতি

দ্রুতবেগে, আবড়ো-খাবড়ো পথের মধ্য দিয়া জঙ্গল-প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন। এই জঙ্গলপ্রদেশে প্রবেশ করাই, তাঁহার প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়।"

কর্নেল ম্যালেসন বলেন "স্যর হিউ রোজ, ইতিমধ্যে, কেল্লা আক্রমণ করিবার বিবিধ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু রানি সেই বিষয়ে আর তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে দিলেন না।"

সে যাহা হউক, রানি ঠাকুরানি ঝাঁসি হইতে বাহির হইয়া গেলে, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার যে সৈন্য আসিতেছিল, তাহাদিগের সহিত ইংরাজ সৈন্যের সাক্ষাৎ হওয়ায় তুমুল যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। ঝাঁসি সৈন্যের মধ্যে "মকরানি" অশ্বারোহী দল যদিও বিলক্ষণ শৌর্য প্রকাশ করিয়াছিল—কিন্তু অবশেষে ইংরাজের গোলাগুলি প্রহারে অতিষ্ঠ হইয়া মোরোপন্ত-তাঁবে প্রভৃতি সর্দার কে কোথায় পলাইতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। ইংরাজ সওয়ারেরা তাহাদিগকে অনুধাবন করিয়া প্রায় দুই শত লোক পাকড়াও করিয়া আনিল এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদিগের প্রাণনাশ করিল।

রানি ঠাকুরানির পিতা ও মুখ্য কর্মচারী—মোরোপন্ত তাঁবে, হস্তীপৃষ্ঠে রত্ন-ভার বোঝাই করিয়া সেই হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে, ঘোড়ায় চড়িয়া পলাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, রাত্রির অন্ধকারে, নিজের তলোয়ারের খোঁচা নিজের জঙ্ঘায় লাগিয়া গেল। তাহাতে ভয়ানক রক্তস্রাব হইয়া তাঁহার সমস্ত পায়জামা ভিজিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি তিনি ঘোড়ার রেকাবের উপর ভর দিয়া ছুটিতে লাগিলেন, প্রভাত সময়ে, "দতিয়া" সহরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। দতিয়ার রাজা ইংরাজের মিত্র। মোরোপন্ত সমস্ত রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান হওয়ায় অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে আবার জঙ্ঘাদেশে বিষম আঘাত লাগিয়া রক্তধারায় পরিচ্ছদাদি আপ্লুত হইয়াছিল—সুতরাং নিরুপায় হইয়া সহরের দরজার নিকট আসিয়া তত্রস্থ একজন খিলি-ওয়ালার নিকট, দীনবচনে আশ্রয় চাহিলেন এবং তাহাকে কিছু টাকা দিতেও স্বীকৃত হইলেন। তাম্বুল-বিক্রেতা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া আপনার ঘরে রাখিল। এই কথা, দতিয়া-সংস্থানের দেওয়ান জানিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনাইয়া কয়েদ করিলেন; এবং তাঁহার নিকট যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি ছিল সমস্ত হস্তগত করিয়া, নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ঝাঁসিতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে পৌঁছিবামাত্র ঝাঁসির প্রধান কর্মচারী স্যর রবর্ট হ্যামিল্টন ও স্যর হিউ রোজ, রাজবাটীর সম্মুখে, দিবা দুইটার সময়, তাঁহাকে ফাঁসি দিলেন। এইরূপে রানির পিতা মোরোপন্তের ইহলীলা সাঙ্গ হইল।

"তাদৃশী জায়তে বুদ্ধির্ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ
সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা।"

রানি লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি হইতে বহির্গত হইয়া, ১০।১৫ জন সওয়ার-সঙ্গে, ভাণ্ডের-নামক এক সহরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘোড়া হইতে নামিয়া, সহরকোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় দত্তক-পুত্র দামোদর রাওর জন্য আহারের যোগাড় করিলেন। এবং আহারাদি সমাপন করিয়া কাল্পী সহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে লেফটেনান্ট বৌকর কতক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রানিকে অনুধাবন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, রানি তাঁহাকে তলবারের দ্বারা আঘাত করিয়া, ঘোড়া সবেগে ছুটাইয়া নিমেষের

মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। এবং ১৮৫৮ অব্দের ১২ জুন তারিখে কাল্পীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে, নানা সাহেবের ভ্রাতা রাও-সাহেব স্বসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া, পর দিন প্রাতে শ্রীমন্ত রাও-সাহেব পেশোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং অশ্রু নয়নে নিজ তলবার রাও-সাহেবের হস্তে দিয়া এইরূপ বলিলেন তোমার পূর্বপুরুষেরাই এই তলবার আমাদিগকে দিয়াছেন। তাহাদের পুণ্য-প্রতাপে আজ পর্যন্ত আমি এই তলবারের যোগ্য ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আর সাহায্য করিতেছ না—অতএব এই তলবার আমি তোমাকে ফেরত দিতেছি। এই কথা শুনিয়া রাও-সাহেবের হৃদয় বিগলিত হইল; এবং তাঁহার সৈন্যের দ্বারা রানির যে কোন সাহায্য হয় নাই, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিলেন, "আপনি আজ পর্যন্ত, ঝাঁসির সুবেদার বংশের অনুরূপ যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রবল ইংরাজ সৈন্যের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া যেরূপ রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ন্যায় বীরাঙ্গনা যদি সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের জয়ের সম্ভাবনা। আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের সময়ে, শিন্দিয়া, হোলকার, গায়কবাড়, বুন্দলে প্রভৃতি সরদারগণ রাজ্যরক্ষার্থ আপনাদিগের প্রাণ বিসর্জন করিতে তৎপর হইয়াছিলেন বলিয়াই মহারানির বাজ্যের পতাকা আটক পর্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছিল; এক্ষণে আপনার ন্যায় শৌর্যশালী সর্দারেরা যদি এই সময়ে আমাদিগকে সাহায্য করেন তবেই আমাদিগের সিদ্ধি লাভ হইতে পারে; অতএব আপনার তলবার ফিরিয়া লউন এবং আমাদিগকে উত্তমরূপে সাহায্য করুন।" রাও-সাহেবের এই সবিনয় মিনতি মান্য করিয়া রানি তাঁহার তলবার পুনঃগ্রহণ করিলেন। রাও-সাহেব পেশোয়া, সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া, তাহাদিগের কওয়াৎ করাইয়া, রানি ঠাকুরানিকে ও তাতিয়া টোপিকে সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন।

এদিকে স্যর হিউ রোজ, সসৈন্যে কাল্পী আক্রমণার্থ গমন করিলেন এবং প্রথমে কুঁচ সহর আক্রমণ করিয়া তাতিয়া টোপি ও বান্দে-ওয়ালা নবাবকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধে অনেক বারুদ গোলা ও ধান্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তাতিয়া টোপি, রাও-সাহেব প্রভৃতি মণ্ডলী কাল্পীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বান্দেওয়ালে নবাবের যুক্তি অনুসারে, রাও-সাহেব সমস্ত সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রানি ঠাকুরানির পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন নাই, এই হেতু, রানি এই যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। রানির নিজ সৈন্য না থাকায়, তিনিও রাও সাহেবদিগের সহিত কাল্পীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কাল্পীতে আসিয়া, রানি সৈন্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাও-সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন; তিনি বলিলেন, সুব্যবস্থা না থাকাতেই গত যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়াছে। তাহার পরামর্শ অনুসারে এবার রাও-সাহেব সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রানিকে সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব না দিয়া আপনি সেনাপতি হইলেন। রাও-সাহেবের প্রাধান্য-লালসা ও যশোলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল—তাহার বিপুল সৈন্যের আধিপত্য একজন স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিতে তিনি ইষ্ট মনে করিলেন না। তথাপি বাহ্যাকারে বহুমান প্রদর্শন করিয়া রানির অধীনে ২০০।২৫০ অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে যমুনাভিমুখের দিক সংরক্ষণার্থ বিনতি

করিলেন। রানি তাহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, সুব্যবস্থা সহকারে, তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। স্যর হিউ রোজ, একেবারে কাল্পীতে না গিয়া প্রথমে গলাবলী সহর আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে কাল্পীর বিদ্রোহী-সৈন্যের বীরোৎসাহ চরমে চড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যমুনার শপথ করিয়া বলিতে লাগিল, হয় ইংরাজ সৈন্যদের ধরাশায়ী করিব নয় আমরা যুদ্ধাঙ্গনে প্রাণ দিব। এই বলিয়া তাহারা নিরাপদ স্থান ছাড়িয়া ইংরাজদিগের তোপের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ইংরাজেরা এই সুবিধা পাইয়া প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। কাল্পীর সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল বটে কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইল। কাল্পীর অগ্রগামী দলের পরাভব হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র, পেশোয়ার সমস্ত সৈন্য হতাশ হইয়া পড়িল। রাও-সাহেব পেশোয়া, বান্দেওয়াল নবাব প্রভৃতি মুখ্য যোদ্ধৃগণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পলাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেইসময় রানি তাঁহাদিগকে সাহস দিয়া আপনার ঘোড়া আনিতে বলিলেন এবং তাহাতে সওয়ার হইয়া কতক সৈন্য সমভিব্যাহারে, ইংরাজদিগের দক্ষিণ পার্শ্ব সবেগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার এই ঝড়গতি আকস্মিক আক্রমণে ইংরাজ সৈন্য একেবারে হটিয়া গেল এবং তিনি এরূপ সতেজে যুদ্ধ করিলেন যে ইংরাজ "লাইট ফিলড" তোপের গোলন্দাজেরা কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং তাহাদিগের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। শুধু তাহা নহে, রানি ঠাকুরানি তোপের ২০ ফুট অন্তর-পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া কাল্পীর অন্যান্য ফৌজও আসিয়া পড়িল। দুইপক্ষ একেবারে মুখোমুখি হওয়ায় ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজ গোলন্দাজেরা হতবীর্য হইয়া পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া স্যর হিউ রোজ স্বীয় উষ্ট্রারোহী সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি স্বয়ং সম্মুখবর্তী হইয়া সতেজে কাল্পী-সৈন্যের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। কাল্পীর সৈন্য এতক্ষণ ভাং পান করিয়া নেশার ঘোরে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে যখন গোলা-গুলি অজস্র বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের চেতনা হইল এবং আর রণস্থলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে রানি ঠাকুরানি হতাশ হইয়া রাও সাহেব পেশোয়ার ছাউনি মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ইংরাজেরা কাল্পী অধিকার করিল এবং দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের যুদ্ধ-সামগ্রী তাহাদিগের হস্তগত হইল।

এদিকে, রাও-সাহেব পেশোয়া পরাভূত হইয়া, সসৈন্যে গোয়ালিয়ারের ৪৬ মাইল দূরে, গোপালপুর নামক এক সহরে পলাইয়া গেলেন। রানিও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ক্রমে সেখানে তাতিয়া টোপি ও বান্দেওয়ালা নবাবও আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদিগের সকলকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও পেশোয়াকে চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া রানি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন, "আজ পর্যন্ত মারাঠিরা যে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, দুর্ভেদ্য ও বলাঢ্য কেল্লার আশ্রয়ই তাহার মুখ্য কারণ। শ্রীছত্রপতি শিবাজি মহরাজ যে, যবনদিগকে পরাভূত করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেন সেও সিংহগড়, রায়গড়, তোরনা আদি কেল্লার বলে। তিনি প্রথমে আত্মরক্ষণের জন্য ওই সকল প্রচণ্ড কেল্লা হস্তগত করেন পরে, শৌর্য-পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। অতএব, পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে জানা যাইতেছে যে, কেল্লার সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধ করা ব্যর্থ। আমাদিগের অধীনে ঝাঁসি, কাল্পী প্রভৃতির ন্যায় অনেক কেল্লা থাকা প্রযুক্তই আমরা আজ পর্যন্ত ইংরাজদিগের

সহিত যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সকল কেল্লা আমাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি কেল্লা হস্তগত করা আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। আমরা যেখানেই পলাইতেছি ইংরাজেরা আমাদিগের অনুসরণ করিতেছে। এবং কোন প্রকারে আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এইরূপ স্থির করিয়াছে। যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই। তাহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, এই উপস্থিত বিপদকালে, একটা কোন কেল্লা হস্তগত করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে যাহাতে জয় লাভ হয় তাহার উপায় শীঘ্র অবলম্বন করা আবশ্যক।" রানি ঠাকুরানির এই বাক্য শুনিয়া, শ্রীমন্ত পেশোয়া বড়ই তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কোন কেল্লা হস্তগত করিবার চেষ্টা করা যাইবে। রানি ঠাকুরানি বলিলেন, "উপস্থিত বিপদে ঝাঁসি কিম্বা কাল্পী অধিকার করিবার আশায় শত্রুর সম্মুখ দিয়া যাত্রা করায় ইষ্ট নাই। এই হেতু, গোয়ালিয়ারে যাত্রা করিয়া সিন্ধিয়া সরকার ও তাঁহার ফৌজের সাহায্য লওয়া যাউক এবং সেখানকার পাহাড়ি কেল্লায় আশ্রয় করিয়া আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাউক।" এই কথা রাও সাহেবের বড়ই মনোনীত হইল এবং তিনি ইহার জন্য রানি ঠাকুরানীকে অভিনন্দন করিলেন। তাতিয়া টোপিও এই কথায় অনুমোদন করিলেন। তাতিয়া টোপি ইতিপূর্বে অনেকবার গোপনে গোয়ালিয়রে গিয়াছিলেন তাই তিনি সিন্ধিয়া সৈন্যের মনোভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব, এক্ষণে গোয়ালিয়ারে যাত্রা করাই স্থির হইল। রাও সাহেব ও রানি ঠাকুরানি সসৈন্যে ১৮৫৪ অব্দের ৩০ মে তারিখে গোয়ালিয়ারের নিকটস্থ মুরারের ছাউনিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত মহারাজ জয়াজীরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়ারের অধিপতি ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ২৩ বৎসর ছিল; ইনি প্রায়ই বিলাস সম্ভোগেই নিমগ্ন থাকিতেন; কিন্তু এদিকে, বুদ্ধিমান ও যুদ্ধপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী দিনকর রাওই প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য চালাইতেন। দিনকর রাও প্রথমে একজন সামান্য কেরানি মাত্র ছিলেন, রেসিডেন্ট বুশবি সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিচাতুর্য দেখিয়া তাহার এইরূপ পদোন্নতি করিয়া দেন। সেই অবধি, তিনি অতীব দক্ষতাসহকারে গোয়ালিয়ার সংস্থানের সংস্কার সাধন করিয়া, সুচারুরূপে রাজকার্য নির্বাহ করিতেছিলেন। এই সময়ে ম্যাকফর্সন সাহেব গোয়ালিয়ারের রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁহার সহিত মহারাজের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। মহারাজ একবার কলিকাতায় গিয়া লর্ড ক্যানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দত্তকগ্রহণে তাঁহার আধিপত্য বংশানুক্রমে স্থায়ী করিতে পারিবেন এই অনুমতিও লাট সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হেতু সিন্ধিয়া সরকার ইংরাজের খুব বাধ্য ছিল কিন্তু সিন্ধিয়ার সৈন্য ও প্রধানমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই বিদ্রোহীদিগের সহিত সহানুভূতি ছিল। এই সময়ে রাও সাহেব সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সিন্ধিয়া সরকারের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। সিন্ধিয়া মহারাজ সাহায্য করা দূরে থাক, এই পত্র পাইয়া বলিয়া উঠিলেন "বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সমুচিত শাস্তি দিতে আমি প্রস্তুত আছি।" কিন্তু সুচতুর দেওয়ান দিনকর রাও আপনার মনোগত ভাব শত্রুপক্ষকে জানিতে না দিয়া, গোয়ালিয়ার সহরের সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজদিগের ফৌজ আসিয়া পৌঁছিলে তখন তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। এবং সমস্ত ঘটনা ম্যাকফর্সন

সাহেবকে জানাইয়া তাঁহার সহিত গোপনে পত্রব্যবহার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এ দিকে, সিন্ধিয়া মহারাজ চপল বাল-স্বভাব প্রযুক্ত, তাঁহার নিজ খাস সৈন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১লা জুন তারিখে প্রাতঃকালে সিন্ধিয়া মহারাজ যোদ্ধবেশ ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে, মুরার ছাউনির দুই মাইল দূরে বাহাদুরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের ছাউনির অভিমুখে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই একটা গোলা ছাউনির পার্শ্বে আসিয়া পড়ায়. পেশোয়ার সেনানায়কগণ শিঙ্গা বাজাইয়া সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে ইশারা করিল। কিন্তু পেশোয়ার নিকট যে দুই একজন মুচ্ছুদি-লোক ছিল তাহারা বলিল "পেশোয়া সরকারের সহিত প্রেম সম্বন্ধ সিন্ধিয়া সরকারের মধ্যে এখনও জাগ্রত আছে—সিন্ধিয়া সরকার কখনই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। ওই যে তোপের আওয়াজ শোনা যাইতেছে, বোধ হয় উহা আপনার স্বাগতার্থ সিন্ধিয়া সেলামী দিতেছেন।" রাও সাহেব পেশোয়া ও তাতিয়া টোপির সিন্ধিয়ার সাহায্যের উপর পূর্ণ ভরসা থাকায়, তাঁহারা এই কথায় বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধের হুকুম দিলেন না। এদিকে, শত্রুপক্ষ হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, পেশোয়ার সৈন্য অতিষ্ঠ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল; পেশোয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

রানি ঠাকুরানি এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, মহা আবেশ সহকারে আপনার দুই তিন শত ঘোড়সোয়ার সঙ্গে লইয়া, একেবারে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং সিন্ধিয়ার তোপখানার উপর সবেগে ধাবমান হইলেন। তোপখানা আক্রমণ করিবামাত্র, গোলন্দাজেরা তোপ ফেলিয়া পলায়ন করিল। কেবল, মহারাজ জয়াজীরাও সিন্ধিয়া শৌর্যানলে প্রজ্বলিত হইয়া, আপনার খাস সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রানির সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, দিনকর রাও ও দুই একজন সর্দার সমভিব্যাহারে মহারাজ সিন্ধিয়া আগ্রা অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এদিকে, শ্রীমন্ত রাও সাহেব পেশোয়া, মঙ্গলবাদ্য সহকারে মহা সমারোহে গোয়ালিয়ার প্রাসাদে আগমন করিলেন। মহারানি লক্ষ্মীবাই ঠাকুরানি, সৈন্য ছাউনির নিকট 'নবলখ' নামক এক বাগানবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাতিয়া টোপি গোয়ালিয়ার কেল্লায় কতক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন— তাহারা পৌঁছিবামাত্র কেল্লার সর্দার কেল্লার দ্বার উদঘাটন করিয়া দিল। তাতিয়া টোপির সৈন্যগণ, সমস্ত যুদ্ধ সামগ্রীর সহিত কেল্লা অধিকার করিল। কেল্লা দখল করিয়া বিদ্রোহীরা দেওয়ান দিনকর রাও এবং অন্যান্য মান্যগণ্য লোকদিগের গৃহ ভূমিসাৎ করিল এবং সহরে লুঠপাট আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু রাও সাহেব নগরবাসীদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না হয় এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়া লুঠপাঠ শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দিলেন।

৩ জুন তারিখে দরবার আহ্বান করিয়া রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সমাপন করিয়া, রাও সাহেব পেশোয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গোয়ালিয়ারে, "গঙ্গা দশহরা" উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রথা থাকায়, তিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়া সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপ চারদিন ধরিয়া বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল। এদিকে স্যর হিউ রোজ বিদ্রোহীদলদিগকে পরাভব করিতে করিতে ক্রমশ গোয়ালিয়ারের নিকটবর্তী মুরারের ছাউনিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বে রাও সাহেব

এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংবাদ যখন শুনিলেন, তখন তিনি তাতিয়া টোপিকে সৈন্যের ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন কিন্তু স্বয়ং ব্রাহ্মণভোজন লইয়াই ব্যাপৃত রহিলেন।

তাতিয়া টোপি মুরারের ছাউনি রক্ষণার্থ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, উভয় পক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ হইল, অবশেষে ইংরাজেরা মুরার দখল করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র রাও সাহেব ত্রস্তব্যস্ত হইয়া সৈন্যশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রানি ঠাকুরানির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতি নম্রতাপূর্বক তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই আসন্ন বিপৎকালে কি কর্তব্য তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রানি ঠাকুরানি ইতিপূর্বে সৈন্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাও সাহেবকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি বিজয়োৎসবে মত্ত হইয়া সে দিকে বড় মনোযোগ দেন নাই। এতক্ষণে তাঁহার চেতনা হইল। কিন্তু সুযোগ একবার ছাড়িয়া দিলে আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

"ন কার্য্যকালং মতিমান্নতিক্রমেৎ কথংচন।
কথংচিদেব ভবতি কার্য্যযোগঃ সুদুর্লভঃ।"

রানি ঠাকুরানি তাতিয়া টোপিকে এইরূপ বলিলেন : "আজ পর্যন্ত আমরা যে এত প্রাণপণ পরিশ্রম করিলাম, তাহা সফল হইবার আর আশা রহিল না! শ্রীমন্ত পেশোয়ার দুরাগ্রহী স্বভাব প্রযুক্ত ও তাঁহার বিজয়োন্মত্ততা বশত আমাদের সমস্ত যুক্তি পরামর্শই বৃথা হইল! ইংরাজ সৈন্য আমাদিগের মুখোমুখি হইয়াছে, তথাপি এখনও আমাদের সৈন্য মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবস্থা নাই। অতএব, এখন আমরা ইংরাজের সম্মুখীন হইয়া কতদূর কৃতকার্য হইব, তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তথাপি, উপস্থিত বিপদের সময়ে সাহস ত্যাগ করিলে কোন ফল হয় না। তুমি এক্ষণে ফৌজের পরিদর্শনে এখনি বহির্গত হও এবং যাহাতে বিরুদ্ধপক্ষ আমাদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করো। আমি নিজ কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত আছি। এখন তোমার কর্তব্য তুমি কর।" তাতিয়া টোপি, এই কথা শুনিবামাত্র বীর্য্যোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং রানি ঠাকুরানির প্রতি গোয়ালিয়ারের পূর্বদিক রক্ষণের ভার দিয়া নিজে অন্য সৈন্যবিভাগের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক্ষণে রানি ঠাকুরানি যোদ্ধবেশ পরিধান করিয়া ও অশ্বারূঢ় হইয়া আপনার সৈন্যের মধ্যে কাওয়াৎ করাইতে লাগিলেন।

১৭ তারিখে ব্রিগেডিয়ার স্মিথ যুদ্ধের ব্যুগল বাজাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইংরাজ সৈন্য সম্মুখে অগ্রসর হইবামাত্র রানির গোলান্দাজেরা তোপ হইতে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজেরা হটিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রানির অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাহাদিগের উপর ধাবমান হইল। রানি ঠাকুরানিও মহা আবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—রণাঙ্গন মধ্যে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইয়া শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। অবশেষে ইংরাজেরা শত্রু পক্ষের দুই তিনটি তোপ বলপূর্বক অধিকার করায় পেশোয়ার সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িল—এদিকে আর একদল ইংরাজ সৈন্য রানির সৈন্যকে আক্রমণ করায়, রানির সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। এক্ষণে, রানি, দুই তিনজন দাসী ও দুই এক জন বিশ্বাসী সর্দার

সমভিব্যাহারে শত্রুর হস্ত হইতে কোন প্রকারে পলাইয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন। ইংরাজ সওয়ারেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল—তিনি সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—ইংরাজ সওয়ারেরা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার দাসী মুন্দরা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, 'রানি ঠাকরুন! মলুম মলুম!' এই শব্দ রানির কর্ণগোচর হইবামাত্র রানি ফিরিয়া আসিয়া মুন্দরার হত্যাকারী ইংরাজ-যোদ্ধাকে অসির আঘাতে যমপুরীতে পাঠাইয়া আবার সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র জল-প্রবাহ দেখিয়া ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রানির প্রিয় ঘোড়া যুদ্ধে আহত হওয়ায় তিনি সিন্ধিয়ার অশ্বশালা হইতে এই ঘোড়াটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ঘোড়াকে খালের ওপর দিয়া লইয়া যাইবার বিধিমতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু ঘোড়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ইতিমধ্যে যে ইংরাজ সওয়ার তাঁহার অনুসরণ কবিতেছিল, সে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া তিনি তলবার উত্তোলন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—ঐরূপ কিছু কাল অসিযুদ্ধ চলিতে লাগিল—অবশেষে ইংরাজ সওয়ার রানির মস্তকের উপর তলবারের এক দারুণ কোপ বসাইয়া দিল। তাহাতে মস্তকের দক্ষিণ ভাগ একেবার ছিন্ন হইয়া গেল এবং একটা চক্ষুও বাহির হইয়া পড়িল। ইহার উপরেও দুই এক ছোরার ঘা বসাইয়া ছিল। এই সময়ে রানিও তলবারের এক আঘাতে সেই ইংরাজ অশ্বারোহীকে যমসদনে পাঠাইলেন। এক্ষণে, তাঁহার স্বামীনিষ্ঠ সেবক রামচন্দ্র রাও তাঁহাকে এইরূপ আহত দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেখান হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া নিকটস্থ একটা পর্ণকুটীরে লইয়া গেল। পর্ণকুটীরটির অধিকারী গঙ্গাদাস বাবাজি। রানি অত্যন্ত তৃষিত হওয়ায়, বাবাজি তাঁহাকে গঙ্গাজল পান করিতে দিলেন। রানি ঠাকুরানি রক্তাপ্লুত দেহে, আঘাতের এই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে, তাঁহার প্রিয় পুত্র দামোদর রাওর প্রতি বাৎসল্য ভাবে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

সমকালের
দর্পণে

কার্ল মার্কস

১৮১৮-১৮৮৩

[বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ১৮৫০-এর পুঁজিবাদী দেশগুলির উপনিবেশিক কর্মনীতি ও নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গতিপ্রকৃতির প্রতি ছিলেন আগ্রহশীল। ভারতে সিপাহিদের অভ্যুত্থান যে জাতীয় বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবুনে লেখা তাঁর এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের প্রবন্ধগুলি "প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯" নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থ থেকে দুটি মূল্যবান আলোচনা এখানে সংকলিত হয়েছে।]

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ

প্রায় দেড়শো বছর ধরে গ্রেট ব্রিটেন তার ভারত সাম্রাজ্যের মেয়াদ বজায় রাখার অপচেষ্টা করেছে যে মহাসূত্রে সেটি হল রোমানদের divide et impera।[১] বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্মবিশ্বাস ও সার্বভৌমদের যে যোগফল থেকে গড়ে উঠেছে ভারত নামের ভৌগোলিক ঐক্য তাদের পরস্পর বৈরিতাই ব্রিটিশ প্রাধান্যের মূল নীতি হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য সে প্রাধান্যের পরিস্থিতিতে বদল হয়েছে। সিন্ধু ও পঞ্জাব বিজয়ের পর ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্য শুধু তার স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত পৌঁছল তাই নয়, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের শেষ চিহ্নও পদদলিত হল। যুদ্ধপ্রিয় সমস্ত দেশীয় উপজাতিদের দমন করা হল, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের অবসান হল এবং অযোধ্যার বিগত সাম্রাজ্য-ভুক্তিতে ভাল করেই প্রমাণিত হল যে, তথাকথিত স্বাধীন ভারতীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব নিতান্তই অনুমতি-সাপেক্ষ। সুতরাং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থায় প্রভূত বদল হয়েছে। এখন আর ভারতের এক অংশের সহায়তায় অন্য অংশকে তা আক্রমণ করে না, সে নিজেই এখন সর্বপ্রধান, গোটা ভারত তার পদতলে। আর জয় করার কাজ নেই বলে এ এখন হয়ে উঠেছে দেশের একমাত্র বিজয়ী। তার সৈন্যদলের কাজ এখন আর রাজ্যবিস্তার নয়, রাজ্যটাকেই কেবল বজায় রাখা। সৈন্য থেকে তারা পরিণত হয়েছে পুলিশে; ২০ কোটি দেশীয়রা দমিত হচ্ছে ২ লাখ লোকের এক দেশীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা, যাদের অফিসাররা সব ইংরেজ; আর এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে আবার সংযত করে রাখছে মাত্র ৪০,০০০ লোকের এক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী। প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় জনগণের আনুগত্য নির্ভর করছে এই যে দেশীয় সৈন্যবাহিনীর বিশ্বস্ততার ওপর, তা গড়ে তুলে ব্রিটিশরাজ সেই সঙ্গেই ভারতীয় জনগণের জন্য এই সর্বপ্রথম একটা সাধারণ প্রতিরোধ-কেন্দ্র সংগঠিত করে বসে। এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর কতটা ভরসা করা যায় তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক বিদ্রোহগুলিতে—পারস্যের যুদ্ধের

১. *বিভক্ত করে শাসন করা।*

ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে ইউরোপীয় সৈন্য প্রায় শূন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর আগেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু বর্তমান বিদ্রোহ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যসূচক ও মারাত্মক লক্ষণে চিহ্নিত। এই প্রথম সিপাহি বাহিনী হত্যা করল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের; মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে; "হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লির সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে"; বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এবং পরিশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ মিলে গেছে ইংরেজ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বড় বড় এশীয় জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষের সঙ্গে, বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে পারস্য ও চীন যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।

চার মাস আগে বেঙ্গল আর্মিতে যে অসন্তোষ ছড়াতে শুরু করে তার তথাকথিত কারণ হল দেশীয়দের মনে এই আশঙ্কা যে, সরকার বুঝি তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে। যে কার্তুজ বিলি করা হয় তা নাকি ষাঁড় ও শুয়োরের চর্বি মাখানো কাগজে তৈরি, সুতরাং তা দাঁতে কাটলে ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে বলে দেশীয়রা মনে করে—এই কার্তুজ বিলি থেকে আঞ্চলিক হাঙ্গামার সঙ্কেত। ২২শে জানুয়ারি কলকাতা থেকে কিছু দূরের এক ক্যান্টনমেন্টে অগ্নিপ্রদানের ঘটনা ঘটে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯নং দেশীয় রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বহরমপুরে, কার্তুজ নিতে আপত্তি করে সৈন্যরা। ৩১ মার্চ এ রেজিমেন্টকে ভেঙে দেওয়া হয়। মার্চের শেষে ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪ নং সিপাহি রেজিমেন্ট এইটে হতে দেয় যে, একটি সৈন্য গুলি ভরা মাস্কেট নিয়ে লাইনের সামনে প্যারেডের ময়দানে এগিয়ে গেল ও সাথীদের বিদ্রোহে আহ্বান করে রেজিমেন্টের অ্যাডজুটেন্ট ও সার্জেন্ট-মেজরকে আক্রমণ ও আহত করতে পেল। এতে যে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়, তাতে শত শত সিপাহি নিষ্ক্রিয়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখে আর বাকিরা লড়াইয়ে যোগ দিয়ে বন্দুকের কুঁদা দিয়ে আক্রমণ করে অফিসারদের। পরে এ বাহিনীটিকেও ভেঙে দেওয়া হয়। এপ্রিল মাস চিহ্নিত হল এলাহাবাদ, আগ্রা, আম্বালায় বেঙ্গল আর্মির কতিপয় ক্যান্টনমেন্টে অগ্নিপ্রদানের ঘটনায়, মীরটে হালকা ঘোড়সওয়ারীদের ৩য় রেজিমেন্টের বিদ্রোহে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই আর্মিতে অনুরূপ অসন্তোষের আবির্ভাবে। মে-র গোড়ায় অযোধ্যার রাজধানী লনউতে একটি বিদ্রোহের (*émeute*) তোড়জোড় হয়, কিন্তু স্যর এইচ. লরেন্সের তৎপরতায় তা বন্ধ হয়। বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়ে ৯ মে মীরটের ৩য় হালকা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বিদ্রোহীদের মার্চ করিয়ে ঢোকানো হয় জেলে। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় ৩য় ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সৈন্যরা ১১নং ও ২০নং-এর দেশীয় দুটি রেজিমেন্ট সহ কুচকাওয়াজের মাঠে জমায়েত হয়ে শান্ত করতে আসা অফিসারদের হত্যা করে, ক্যান্টনমেন্টে আগুন লাগিয়ে দেয় ও যাকে পায় তেমন সমস্ত ইংরেজকেই খুন করে। এ বিগ্রেডের ব্রিটিশ অংশটা এক রেজিমেন্ট পদাতিক, এক রেজিমেন্ট ঘোড়সওয়ার এবং ঘোড়াটানা ও পদাতিক গোলন্দাজদের একটা বিপুল শক্তি জড়ো করতে পারলেও রাত হওয়া পর্যন্ত তারা এগোতে পারেনি। বিদ্রোহীদের সামান্যই ক্ষতি করে তারা, খোলা মাঠ ধরে মীরট থেকে গোটা চল্লিশেক মাইল দূরে দিল্লির ওপর চড়াও হতে তাদের দেয়। সেখানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় সৈন্যাবাস, যাতে ছিল ৩৮নং, ৫৪নং ও ৭৪নং পদাতিক রেজিমেন্ট এবং দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একটি কোম্পানি। আক্রান্ত

হয় বৃটিশ অফিসাররা, হাতের কাছের সমস্ত ইংরেজ খুন হয় ও দিল্লির ভূতপূর্ব মোগলের (*দ্বিতীয় আকবর*) উত্তরাধিকারীকে (*দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ*) ঘোষণা করা হয় ভারতের রাজা। মীরটে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে উদ্ধারের জন্য যেসব সৈন্য পাঠান হয় তাদের মধ্যে দেশীয় স্যাপার ও মাইনারদের ছয়টি কোম্পানি ১৫ মে মীরটে পৌঁছে সেনাপতি মেজর ফ্রেজারকে হত্যা করে অবিলম্বে খোলা মাঠের দিকে যাত্রা করে, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ঘোড়াটানা গোলন্দাজ সৈন্যরা এবং ৬নং ড্রাগুন গার্ডস-এর কিছু সৈন্য। বিদ্রোহীদের পঞ্চাশ-ষাট জন গুলিবিদ্ধ হয় কিন্তু বাকিরা দিল্লি পালাতে সক্ষম হয়। পঞ্জাবের ফিরোজপুরে ৫৭নং ও ৪৫নং দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে, কিন্তু সশক্তিতে তাদের দমন করা হয়। লাহোর থেকে আসা ব্যক্তিগত চিঠিতে বলা হচ্ছে যে সেখানকার সমস্ত দেশীয় সৈন্যই প্রকাশ্যে বিদ্রোহের অবস্থায়। ১৯ মে কলকাতায় অবস্থিত সিপাহিরা সেন্ট-উইলিয়ম দুর্গ দখলের অসফল চেষ্টা করে। বুশায়ার থেকে বোম্বাইয়ে ফিরে আসা তিন রেজিমেন্ট সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় পাঠানো হয়।

এই সব ঘটনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে মীরটের ব্রিটিশ কম্যান্ডারের আচরণে অবাক হতে হয়—বিদ্রোহীদের তিনি যে দুর্বলভাবে পশ্চাদ্ধাবন করেন তার চেয়েও কম দুর্বোধ্য রণক্ষেত্রে তাঁর বিলম্বিত উদয়। যমুনার দক্ষিণ তীরে দিল্লি ও বাম তীরে মীরট, দুই তীরের মধ্যে কেবল দিল্লির কাছে এক ব্রিজ মারফতই যোগাযোগ, তাই পলাতকদের পশ্চাদপসরণ বন্ধ করার মতো এত সহজ কাজ আর কিছু ছিল না।

ইতিমধ্যে সমস্ত বিক্ষুব্ধ জেলাতেই সামরিক আইন জারি হয়েছে। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে জমা হচ্ছে যে সৈন্য তা প্রধানত দেশীয়; আশেপাশের রাজন্যরা নাকি ইংরেজ রাজেরই পক্ষ-ঘোষণা করেছে; লর্ড এলগিন ও জেনারেল অ্যাশবার্ণহ্যামের সৈন্যদের চীন যাত্রা স্থগিতের জন্য চিঠি পাঠান হয়েছে সিংহলে; আর পরিশেষে প্রায় পক্ষকালের মধ্যেই ১৪,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য পাঠান হবে ইংলন্ড থেকে ভারতে। বর্তমান ঋতুতে ভারতের আবহাওয়া-জনিত বাধা ও পরিবহন ব্যবস্থার একান্ত অভাবে ব্রিটিশ সৈন্যের চলাচল যতই ব্যাহত হোক, দিল্লির বিদ্রোহীরা খুব সম্ভব কোন দীর্ঘ প্রতিরোধ না দিয়েই ভেঙে পড়বে। তবু, যে ভয়ঙ্করতম ট্র্যাজেডির অনুষ্ঠান হতে চলেছে, এ হল তার প্রস্তাবনা মাত্র।

ভারতে অভ্যুত্থান

লন্ডন, ১৭ জুলাই, ১৮৫৭

দিল্লি বিদ্রোহী সিপাহিদের হস্তগত ও মোগল বাদশাহ (*দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ*) ঘোষিত হবার পর ৮ জুন ঠিক এক মাস হল। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের এই প্রাচীন রাজধানী বিদ্রোহীরা দখলে রাখতে পারবে তেমন কোন ধারণা অবশ্যই অস্বাভাবিক। দিল্লি সুরক্ষিত কেবল একটি দেয়াল ও একটি সাধারণ পরিখা দিয়ে আর দিল্লির চারিপাশের ও দিল্লিকে শাসনে রাখার মত টিলা পাহাড়গুলি ইতিমধ্যেই ইংরেজদের দখলে, তারা দেয়াল না ভেঙেই জল সরবরাহ কেটে দেবার মত সহজ পদ্ধতিতেই স্বল্প সময়ে দিল্লিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারে। তাছাড়া বিদ্রোহী সৈন্যদের যে একটা এলোমেলো দঙ্গল স্বীয় অফিসারদের খুন করে শৃঙ্খলার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সেনাপত্য অর্পণ করার মত কাউকে খুঁজে পায়নি, তারা নিশ্চয় এমন একটা দল, যাদের কাছ থেকে

গুরুতর ও দীর্ঘায়ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আশা সবচেয়ে কম। বিভ্রান্তি আরও পাকিয়ে তোলার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সির সর্বাঞ্চল থেকে নতুন নতুন বিদ্রোহী বাহিনী এসে অবরুদ্ধ দিল্লি সৈন্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়াচ্ছে, যেন একটা স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুসারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই মৃত্যুদণ্ডিত নগরে। দেয়ালের বাইরে ৩০ ও ৩১ মে তারিখের যে দুটি অভিযানের ঝুঁকি নেয় বিদ্রোহীরা এবং গুরুতর ক্ষতিতে যা প্রতিহত হয়, তার উদ্ভব যেন আত্মনির্ভরতা বা শক্তির মনোভাব থেকে নয়, বরং মরিয়াপনা থেকে। একমাত্র অবাক লাগে শুধু ব্রিটিশের আক্রমণগুলির ধীরতায়—কিছুটা পরিমাণে যদিও তা ব্যাখ্যা করা যায় ঋতুর ভয়াবহতা ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব দিয়ে। সর্বাধিনায়ক জেনরেল অ্যানসন ছাড়াও, ফরাসি পত্রে বলা হয়েছে, মারাত্মক তাপের শিকার হয়েছে প্রায় ৪,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য; এবং এমনকি ইংরেজি পত্রিকাতেও স্বীকার করা হচ্ছে যে দিল্লির সম্মুখভাগের যুদ্ধে দুর্ভোগ সইতে হয়েছে শত্রু সৈন্যের গুলি থেকে ততটা নয়, যতটা রোদ্দুরের জন্য। যানবাহনাদির স্বল্পতায় অম্বালাস্থিত প্রধান ব্রিটিশ সৈন্যদলের দিল্লি চড়াও হতে লাগে প্রায় সাতাশ দিন, অর্থাৎ দিনে পথ হেঁটেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা হারে। অম্বালায় ভারী কামান না থাকায় এবং সেই কারণে নিকটতম অস্ত্রাগার যা শতদ্রুর অপর পারে ফিলাউরে অবস্থিত, সেখান থেকে দখলি-কামানবাহিনী নিয়ে আসতে হওয়ায় আরও দেরি হয়।

এই সব সত্ত্বেও দিল্লির পতন সংবাদ যে কোনও দিন আশা করা যায়; কিন্তু তারপর? ভারত সাম্রাজ্যের চিরাচরিত কেন্দ্রের ওপর বিদ্রোহীদের অবাধ দখলের এক মাসেই যদি বেঙ্গল আর্মির একেবারে ভেঙে পড়া, কলকাতা থেকে উত্তরে পঞ্জাব ও পশ্চিমে রাজপুতানা পর্যন্ত বিদ্রোহ ও সৈন্যদলত্যাগের ঘটনা ছড়ানো, ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে টলিয়ে দেওয়ার দিক থেকে বোধ করি প্রবলতম উত্তেজিকার কাজ হয়ে থাকে, তাহলে দিল্লির পতনে সিপাহিদের মধ্যে নৈরাশ্য ছড়ালেও তাতেই বিদ্রোহ প্রশমিত, তার প্রসার রুদ্ধ কিংবা ব্রিটিশ শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, এ কথা ভাবা সবচেয়ে বড় ভুল। ২৮,০০০ রাজপুত, ২৩,০০০ ব্রাহ্মণ, ১৩,০০০ মুসলমান, ৫, ০০০ নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বাকিটা ইউরোপীয় দিয়ে গড়া ৮০,০০০ সৈন্যের গোটা দেশীয় বেঙ্গল আর্মি থেকে বিদ্রোহ, দলত্যাগ বা বরখাস্তের দরুন ৩০,০০০ সৈন্যই অদৃশ্য হয়েছে, আর এ আর্মির বাকিটা থেকে কয়েকটা রেজিমেন্ট খোলাখুলিই ঘোষণা করেছে যে তারা ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ত ও সমর্থক থাকবে শুধু দেশীয় সৈন্যদের যে কাজে লাগানো হচ্ছে সেই কাজটি বাদে : দেশীয় রেজিমেন্টের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে তারা সাহায্য করবে না, বরং সাহায্য করবে তাদের "ভাইয়া"দের। কলকাতা থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকটা স্টেশনেই তার সত্যকার দৃষ্টান্ত মিলেছে। দেশীয় সিপাহিরা কিছুকাল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু যেই ধারণা হয় যে তাদের যথেষ্ট শক্তি আছে, অমনি বিদ্রোহ করে বসে। যেসব রেজিমেন্ট এখনও ঘোষণা করেনি এবং যেসব দেশীয় অধিবাসী এখনও বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলায়নি, তাদের "বিশ্বস্ততা" সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি The London Times-এর একজন ভারতস্থ সংবাদদাতা।

তিনি বলেন, "**সব শান্ত** এ কথা পড়লে বুঝবেন যে তার অর্থ দেশীয় সৈন্যরা এখনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেনি; অধিবাসীদের অসন্তুষ্ট অংশ এখনো খোলাখুলি বিদ্রোহ করেনি; তারা হয় অতি দুর্বল, অথবা ভাবছে যে তারা দুর্বল, নয়ত অপেক্ষা করছে আরও উপযুক্ত

একটা মুহূর্তের জন্য। ঘোড়সওয়ার বা পদাতিক কোনো দেশীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বিশ্বস্ততার পরিচয়'-এর কথা যখন পড়বেন তখন বুঝবেন যে তার অর্থ তথা-প্রশংসিত রেজিমেন্টগুলির শুধু অর্ধেকটাই সত্যিই বিশ্বস্ত, বাকি অর্ধেকটা শুধু অভিনয় করছে যাতে বরং ইউরোপীয়দের অসতর্ক অবস্থায় পায়, নয়ত তাদের ওপর সন্দেহ না থাকায় বিদ্রোহভাবাপন্ন সাথীদের যাতে আরও সহজে সাহায্য করতে পারে।"

পঞ্জাবে প্রকাশ্য বিদ্রোহ নিরোধ করা গেছে শুধু দেশীয় সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়ে। অযোধ্যায় ইংরেজরা কেবল রেসিডেন্সি লখনউ দখলে রাখতে পেরেছে বলা যায়, তাছাড়া সর্বত্রই দেশীয় রেজিমেন্টগুলি বিদ্রোহ করেছে, গুলিগোলা নিয়ে পালিয়েছে, সমস্ত বাঙলো পুড়িয়ে ছাই করেছে, এবং যোগ দিয়েছে হাতিয়ার তুলে ধরা অধিবাসীদের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, ইংরেজ আর্মির আসল অবস্থা সবচেয়ে ভাল প্রকাশ পাচ্ছে এই ঘটনায় যে পঞ্জাব ও রাজপুতানা উভয় ক্ষেত্রেই ভ্রাম্যমাণ কোর স্থাপন করা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। তার অর্থ বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলগুলির মধ্যে যোগাযোগ বহাল রাখতে ইংরেজরা তাদের সিপাহি সৈন্য বা দেশীয় অধিবাসীদের ওপর ভরসা করতে পারছে না। উপদ্বীপীয় যুদ্ধ (পেরিনিজ) কালে ফরাসিদের মতো তারা শুধু স্বীয় সৈন্যাধিকৃত ভূমিটুকু এবং তদধীন পরিপার্শ্বটুকু শাসনে রাখছে। আর তাদের আর্মির বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য তারা নির্ভর করছে ভ্রাম্যমাণ কোর-এর ওপর —এ দলের কাজ এমনিতে অতি সঙ্গীন, তাতে যত বেশি জায়গা জুড়ে তা ছড়াবে, স্বভাবতই তত কমে যাবে তার প্রবলতা। ব্রিটিশ সৈন্যের বাস্তব অপ্রতুলতা আরও প্রমাণ হয় এই ঘটনায় যে, বিক্ষুব্ধ স্টেশনগুলি থেকে ধনসম্পদ সরাবার জন্য তারা বহনে সিপাহিদেরই লাগাতে বাধ্য হয়—সিপাহিরা বিনা ব্যতিক্রমে যাত্রাপথে বিদ্রোহ করে ও ভার-পাওয়া ধনসম্পদ নিয়ে ফেরার হয়। ইংল্যান্ড থেকে পাঠান সৈন্যরা যেহেতু সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও নভেম্বরের আগে পৌঁছবে না এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে ইউরোপীয় সৈন্য টেনে আনা যেহেতু আরও বিপজ্জনক হবে—মাদ্রাজ সিপাহিদের ১০নং রেজিমেন্ট ইতিমধ্যেই বিক্ষোভের লক্ষণ দেখিয়েছে—তাই বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে নিয়মিত কর সংগ্রহের ধারণা ত্যাগ করতে হবে ও ভাঙনের প্রক্রিয়াকে চলতে দিতেই হবে। যদি ধরে নিই যে বর্মীরা এ উপলক্ষে ফয়দা ওঠাবে না, গোয়ালিয়রের মহারাজা (*সিন্ধিয়া*) ইংরেজদের সমর্থন করেই যাবে এবং সর্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় সৈন্য যার হাতে আছে নেপালের সেই অধিপতি (*জঙ্গবাহাদুর*) শান্তই থাকবে, বিক্ষুব্ধ পেশোয়ার অশান্ত পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে যোগ দেবে না এবং পারস্যের শাহ (*নাসিরউদ-দিন*) হেরাত ছেড়ে যাওয়ার মতো মূর্খতা দেখাবে না, এমন কি তাহলেও গোটা বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ফের জয় করতে হবে এবং গোটা ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ফের গড়তে হবে। এই বৃহৎ ব্যাপারের খরচাটা সবই পড়বে ব্রিটিশ জনগণের ওপর। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় ঋণ মারফত প্রয়োজনীয় অর্থ তুলতে পারবে বলে লর্ড গ্রেনভিল লর্ড সভায় যে ধারণা দিয়েছেন তা কত পাকা, তার বিচার হবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির বিক্ষুব্ধ অবস্থায় বোম্বাইয়ের টাকার বাজারের প্রতিক্রিয়া থেকে। তৎক্ষণাৎ দেশীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়, ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নেওয়া হয়, সরকারি সিকিউরিটি বিক্রয়ের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং শুধু বোম্বাইয়ে নয়, তার চারিপাশেও প্রচুর পরিমাণ মজুদের হিড়িক লাগে।

যদুনাথ সর্বাধিকারী

জন্ম : ১৮০৪। মৃত্যু ?

[যদুনাথ সর্বাধিকারীর জন্ম কলকাতায় ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪৮ সালে তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র পর্যটন করেন। সে সময়ে শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ। রোজনামচা আকারে লেখা ভ্রমণ কাহিনিতে বিদ্রোহের কিছু বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে যান। প্রায় মন্তব্যহীন ভাবেই যদুনাথ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর লেখা রোজনামচা গ্রন্থাকারে ১৩২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায়। গ্রন্থটির অনেক স্থানের বিবরণ বাদ দিয়ে ছাপা হয়, এখানেও সেইভাবে মুদ্রিত হল।]

সিপাহি বিদ্রোহের বিবরণ

ইং ১৮৫৭, ১১ মে। সন ১২৬৪ সাল, ৩০ বৈশাখ।

সিপাহি বিদ্রোহারম্ভ : দিল্লির ছাউনিতে যে সৈন্যগণ ছিল, ইহারা মতান্তর হইয়া স্টেশনের রাজপুরুষগণকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরকে সাহায্য জন্য কহে।

১০ মে, ২৯ বৈশাখ, রবিবার

মীরটের ছাউনিতে রাত্রি পাঁচ ছয় ঘড়ির সময়ে ১১নং দেশীয় পদাতিক দলে কলরব হইয়া বন্দুকে গুলি পুরিয়া মহাদম্ফে ঘোররবে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। ২০নং দেশীয় পদাতিকগণ ও ৩নং অশ্বারূঢ় সেনাগণ আসিয়া ১১নং পদাতিকগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মহারণারম্ভ করিয়া কেবল সেনাপতিগণকে হত করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে। কর্নেল ফিনিস প্রভৃতি অন্যান্য সেনাপতিগণ পদাতিকদিগকে স্তুতিবাকে৷ সম্বরণার্থ বহুতর মিনতি করিতেছিলেন। এমতকালে ২০নং পদাতিকদল হইতে গুলি আসিয়া কর্নেল ফিনিসের অশ্বের উপর আঘাত করিল। অশ্বোপরি আঘাত হওয়াতে অন্য সেনাপতিগণ বিগ্রেড মেজরকে সংবাদ করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন, এমত সময়ে কর্নেলের পৃষ্ঠদেশে এক গুলির আঘাত হওয়াতে (তিনি) পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অন্যান্য সেনাপতিগণ প্রস্থান করিয়া বারিক লাইনে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদের রাত্রি, রণধূমেতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদের ন্যায় ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল। তৎসময়ে পদাতিকগণ সাহেব লোকের বাঙলাতে অগ্নি দিল, ভীষণ ঘোর নাদে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। সকল দগ্ধ হইয়া হত হইল। চতুর্দিক ধূমে পরিপূর্ণ হইল। এই সকল কর্ম সম্পূর্ণ করিয়া ১০, ২০, ৩৮, ৫৪ ও ৭৪নং এই কয়েক দল দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিল।

এক্ষণে দিল্লিতে যে তিন দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা দিল্লি নগরে যে সমস্ত সেনাপতিগণ ছিলেন, তাহাদিগকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, দিল্লীশ্বরের পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দিল্লীশ্বর করিয়াছে।

১৯, ও ৩৪নং পদচ্যুত পদাতিকগণ বারাকপুর হইতে বিদায় হইয়া রানিগঞ্জ লুঠ করে।

আলিগড়, কোয়েল, মইনপুরী, বুলন্দসহর, ইটাওয়া প্রভৃতি লুঠ হইয়াছে। কানপুর, আগ্‌রা ইত্যাদি সশঙ্কিত। দিল্লির আশপাশ সিপাহিগণ অধিকার করিয়া লইয়াছে। ডাকের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আগ্‌রার পশ্চিম হইতে চিঠি আইসে নাই।

মথুরা শহরের বাজার ইত্যাদি দুই দিবস বন্ধ ছিল। শহরের সকল ফটক বন্ধ কেবল লাল-দরজা আর আগরা-দরজার খিড়কি খোলা ছিল। ভরতপুর এবং গোয়ালিয়রের রাজধানী হইতে পাঁচদল রাজসৈন্য ও চব্বিশ কামান আসিয়া আগরা এবং মথুরা রক্ষা করিতেছে। লছমিচাঁদ শেঠ পাঁচশত মেওয়াতি পদাতিক সাহায্য জন্য দিয়াছে। চণ্ডালগড়ের বাজার কয়েকদিন বন্ধ। কেল্লার ভিতরে সকলে ছিলেন।

কাশীনগরে অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়া ধনাঢ্যগণ ধন সকল গোপন করিয়াছেন। বণিকগণের দোকান বন্ধ, সাহেবগণ ত্রাসিত হইয়া স্থানে স্থানে লুক্কায়িত, আপন আপন স্ত্রী পুত্রগণকে চণ্ডালগড়ে প্রেরণ করিয়া শহরে যত ফটকবন্দী চৌকিদার ছিল ইহাদের কর্মে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া ওই চৌকিদারদিগকে থানার বরকন্দাজি ভার (দিয়াছে)। থানার বরকন্দাজ সকল শিকরোলে পাহারাতে থাকে এবং কাশীধামের রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুর পাঁচশত বন্দুকধারী লোক লইয়া স্বয়ং শিকরোলে আছেন। শিকরোলে অন্য ব্যক্তিগণের গমনের ক্ষমতা নাই। সিপাহিগণের মতান্তর দেখিয়া সিবিল ও মিলিটারি রাজপুরুষেরা বহুতর স্তুতিবাক্য কহিয়া কহিলেন যে, ''টোটার বিষয়ে যে আমাদিগকে দোষী করিয়া কহিতেছ যে, তোমাদের ধর্মনষ্ট করিতেছি। আমরা ধর্মত কহিতেছি, ইহাতে ধর্মনষ্টের দ্রব্য কিছু নাই। ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে এ টোটা তোমাদের ব্যবহার করিতে হইবে না। আমরা কদাচ কাহারও ধর্মনষ্ট করিব না।'' এই মতো প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে অবাধ্য হইতে দেন নাই। তথাচ বিশ্বাস না করিয়া সুলতানপুর হইতে কেভলরি সেনা আনাইয়া খাজনাখানা বক্‌সীখানা পাহারাতে আছে। দানাপুর হইতে ২০০ শত গোরা আসিয়াছে। প্রতি দিবস গোরা পূর্ব হইতে আসিতেছে। শিখ সৈন্যগণ অবাধ্য হয় নাই। ইহা দেখিয়া স্থির আছে। মীরট ইত্যাদিতে সেনাপতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে ২৬ জন হত (ও) ৮৬ জন আহত হইয়াছে। তাহাদিগের নাম লিখিত আছে। ইতোমধ্যে বাঙালি কাহারও প্রতি আঘাত হয় নাই। কেবল টোটার বিবাদে সাহেবদিগের সহিত ধর্ম বিষয়কে বিবাদ হয়।

অযোধ্যাতে সেনাপতিগণ এবং প্রধান প্রধান সাহেবগণ একত্র হইয়া দেশীয় সেনাদিগকে এবং হাওয়ালদার জমাদার সুবাদার বাহাদুরদিগকে নানামত ভয়—মৈত্র প্রদর্শাইয়া এবং হিন্দু মুসলমানের ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিবার বিষয় ভুয়ো ভূয়ঃ কহিয়া দেশীয় পদাতিকগণকে তিনশত টাকার ন্যূন নহে (ও) হাজার মুদ্রার অধিক নহে (এইরূপ) পারিতোষিক বণ্টন করিয়া তৎক্ষণাৎ তথাকার পদাতিকগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

মীরট, দিল্লি, অম্বালা, কোয়েল, আজমগড়, ইটাওয়া ইত্যাদির ছাউনির সৈন্যগণ, সেনাপতিদিগের সহিত টোটার বিষয়ে মনান্তর হইয়া, সেনাপতিগণকে এবং রাজপুরুষ সাহেবগণকে হত করিয়া, খাজনা লুঠ করিয়া ছাউনি এবং সাহেবদিগের বাঙ্‌লা জ্বালাইয়া দিয়া, জেলখানার বন্দিদিগকে খালাস করিয়া কতক দিল্লিতে কতক স্থানে স্থানে থাকিয়া প্রজাদিগের লুঠ ফসাদ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ইদানীন্তন শুনা যাইতেছে,

কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ সম্পর্কীয় যে দেশে যেখানে দেশীয় পদাতিকগণ আছে, সকলে এক পরামর্শ করিয়া ইহাদিগকে রাজ্য-ভ্রষ্টের বিশেষ উপায় করিতেছে। কেবল আশি দল পদাতিক এক যোগ হইয়াছে। কোন দেশের রাজা কি বাদশাহ কেহ সহযোগী হয় নাই। ইদানীন্তন জনশ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর ৪০০০ হাজার সৈন্য লইয়া পাহাড় হইতে নীচে আসিয়াছেন।

গোয়ালিয়র হুলকার বাহাদুরের স্ত্রী রাজাবাই উজ্জয়িনী হইতে চল্লিশ হাজার সৈন্য সহিত গোয়ালিয়র নিজ রাজধানীতে আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাবাই দুই হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারূঢ় শাস্ত্রপানি এবং বার কামান আগ্রার কেল্লাতে পাঠাইয়া কোম্পানি বাহাদুরের তরফ মদতগিরি করিয়া আগ্রা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপন সৈন্য ও তোপ কেল্লার ভিতর রাখিয়াছেন। গোরাদিগকে ছাউনিতে রাখা হইয়াছে।

ভরতপুরের রাজা আগ্রার ন্যায় মথুরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাজার বয়ঃক্রম অল্প, মন্ত্রী তাদৃশ নাই।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন, বৃহস্পতিবার

কাশীতে বিদ্রোহ : বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পরে বারাণসীর সেনাপতিগণ দেশীয় পদাতিকগণকে অনুমতি করিলেন যে, "গবর্নমেন্ট হইতে কিছু নতুন হুকুম আসিয়াছে, তাহা সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করিব। অতএব তোমরা প্যারেড পর দণ্ডায়মান হও।" এমত বাক্য কহিবার তাৎপর্য এই যে বলন্টরি দলের পদাতিকগণ উত্তম যোদ্ধা, কিন্তু ইহারা আপন আপন দুর্ভাগ্যক্রমে টোটার বিষয়ে বিপরীত বোধ করিয়া যত ন্যূনতা স্বীকার করিয়া সেনাপতিগণ স্তুতিবাক্য কহিয়াছিলেন, সেবাক্য কপট বোধ করিয়া দুরাচার পদাতিকগণের আদেশে সেনাপতিগণ এবং রাজপুরুষগণকে হত করিয়া খাজনা লুঠিয়া গমন চেষ্টায় ছিল। ইহার বিশেষ কারণ বোধ হইল যে, পদাতিকগণের প্রহরীতে তোপ এবং মেগাজিন আর খাজনা ছিল। তাহাতে সর্বত্র গোলযোগ হইলে খাজনা স্থানান্তর করিতে রাজপুরুষগণ চাহিলে পদাতিকগণ কহিলেক, "তোপ মেগাজিন আর খাজনা আমরা কদাচ ছাড়িব না।" এই কথাতে অত্যন্ত সন্দেহ হইয়া শিখ পদাতিক এবং সুলতানপুর, যাহাকে ছোট কলিকাতা কহে, তথা হইতে সওয়ার আনাইয়া তাহাদের পাহারা সর্বত্র হইল। বলন্টরি পদাতিকগণের প্রহরী হইতে তোপ মেগাজিন লইবার তদ্বিরে কাশীর রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুরকে পদাতিকগণকে বুঝাইবার জন্য মধ্যস্থ স্থির করায় রাজার বাক্য দ্বারা পদাতিকগণ তোপ এবং মেগাজিন ছাড়িয়া দেয়। ঐ সকল গোরাদিগের প্রহরীতে দেন। পরে ৪ জুন প্যারেডের হুকুম দেওয়াতে পশ্চিমদিকে শিখ-পদাতিকগণ, দক্ষিণদিকে সওয়ারগণ মধ্যস্থলে বলন্টরি পদাতিক, এক পল্টনের মধ্যে দুই কোম্পানি গাজিপুর ও জৌনপুরে ছিল, তদ্ভিন্ন যত পদাতিক ছাউনিতে ছিল, সকলে বিনাস্ত্র প্যারেডে দণ্ডায়মান হইলে পর, সেনাপতিগণ সুসজ্জীভূত হইয়া গোরা পদাতিকগণকে সঙ্কেত দ্বারা তোপে পদাতিকগণকে হত করিতে অনুমতি করিলেন। পূর্বে আদেশ ছিল সঙ্কেত মাত্রই আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ হইতে আরম্ভ হইল। তাহাতে ভারত যুদ্ধের ন্যায় রণস্থল হইয়া, অভিমন্যু বধের ন্যায় বলন্টরি পদাতিকদলকে বেষ্টন করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গোলারূপ বাণ নিক্ষেপ হইতে লাগিল।

পদাতিকগণ রণপণ্ডিত (ও) সুশিক্ষিত। ইহাদের তুল্য দেশী পদাতিক কোন দল নহে। যৎকালে গোলা নিক্ষেপ হইতে লাগিল, তৎকালে সৈন্যগণ ভূমিতে ভূমির ন্যায় মিশাইয়া বহু সৈন্য প্রাণরক্ষা করিয়া অশ্বারোহীদিগের সহিত সহযোগে রণস্থল হইতে বরনা পার হইল কতক সৈন্য কিঞ্চিৎ অবসরে ধাবমান হইয়া আপন আপন শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রাদি লইতে গিয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ দেখিয়া ঐ শিবির মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দগ্ধ করিল। তাহাতে অনেক হত হইল। তন্মধ্য হইতে যে কেহ অস্ত্রধারী হইয়া নির্গত হইল। তাহারা রণস্থলে আসিয়া কতকগুলি গোরা সেনা এবং সেনাপতিগণকে হত করিয়া কেহ যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ; কেহ কেহ বা পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে দৈবঘটনাতে এমত হইয়া উঠিল যে, তাহা কি কহিব। শিখ সৈন্যগণ সেনাপতিদিগের সম্মতিতে ছিল। কেবল বিপক্ষ মতান্তরী পদাতিকগণের প্রাণদণ্ড জন্য এই চক্রব্যূহ রচনা হইয়াছিল। তাহাতে বিধিকৃত বলন্টরি পদাতিক দুই শত হত হইয়া বক্রী পলায়ন সময় তোপের ধূমে রণস্থল ঘোর কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকার হইয়াছিল। কিন্তু গোরা সকল তোপ নিক্ষেপে নিবৃত্ত ছিল না। ওই তোপের গোলা দ্বারা প্রায় দেড়শত শিখ পদাতিক হত হইল। শিখ-সৈন্যগণ ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিল যে, "কেবল বলন্টরি পদাতিকগণকে তোপে উড়ান নহে—কালা পল্টন মাত্র কিছু রাখিবে না। ইহা না হইলে আমাদের দলের সৈন্য কি জন্য হত হইয়াছে। ইহা কহিয়া রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া রথী, পদাতিক এবং প্রধান সেনাপতি মেজর গাইসকে গুলি দ্বারা হত করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদিগের গমন দেখিয়া অশ্বারোহী অস্ত্রপানি যে এক সহস্র ছিল, তাহার মধ্যে পাঁচশত ঐ সমভ্যারে গমন করিল।

এখানে গোরাগণ রণে উন্মত্ত হইয়া, পদাতিকগণকে অন্বেষণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। যে কোন পদাতিক প্রাণ ভয়ে কাহারও গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, তাহাকে গৃহস্বামী বাহির করিয়া না দিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি দিয়া গৃহ দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

ওখানে পদাতিকগণ যে কেহ পাইতেছে, সাহেবদিগের বাঙ্‌লায় এবং গোরাবারিকে আর মিশনারীদিগের বাঙ্‌লাতে অগ্নি সংযোজন করিতেছে। শিকরোল একেবারে অগ্নিময় হইয়া দুর্জয় অনল প্রজ্বলিত হইল। পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত। রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত এই ব্যাপার ছিল।

এইমত উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে সাহেবদিগের বালক-বালিকা এবং বিবি সকল আর সরকারি খাজনা এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার যাহা মজুত ছিল, তাহা কাশীর রাজার যে কুঠী অর্থাৎ এক বড় বাটী ওই শিকরোল মধ্যে আছে। তাহাতে রাখিলেন। রাজা বাহাদুর আপন হাজার বন্দুকটি লইয়া ঐ পুরী রক্ষা করিলেন। পরে দুই শত গোরা আর তিন শত তোপ পুরী রক্ষার্থ আসিল। রাজা সাহেবকে আপন কেল্লা রামনগব রক্ষার্থ ওই রাত্রে আসিবার অনুমতি হইল। তেঁহ দুই শত অশ্বারোহী আর পাঁচজন সাহেবদিগকে লইয়া রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে গঙ্গা পার হইয়া রামনগরের কেল্লাতে গমন করিলেন।

যে সমস্ত বাঙালি এবং এতদ্দেশী ব্যক্তিগণ চাকুরির জন্য শিকরোলের অফিস সকলে (এবং) আপন আপন কর্ম স্থানে স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহারা রঙ্গভূমির রঙ্গ দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া অনেকেই চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে ভীত

হইয়া পলায়ন করিয়া কে কোথায় গেল, তাহার তৎকালে অন্বেষণ পাওয়া গেল না। কে কোথায় গেল তাহার ঠিকানা ছিল না। কেহ কোন পথে বহু ক্লেশে গোপন পথ হইয়া নানাক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া রাত্রযোগে মৃতপ্রায়, কেহ বা পর দিবস প্রাতে আপন আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে সমস্ত বাঙালি পরিবার লইয়া শিকরোলে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদের পরিবার লইয়া কি পর্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একে স্ত্রীলোক তাহাতে বাঙালি, তাহাদিগের নিকটে অর্ধক্রোশ মধ্যে রণস্থল তৎকালে যে মত ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ত্রাসমুক্ত হইয়া কে কোথায় কিভাবে লুক্কাইত হইল, তাহা বলা যায় না। স্থান বিবেচনা নাই, কেহ সবস্ত্র, কেহ বিবস্ত্রে কেহ অচৈতন্য, কেহ মূর্ছাগত হইয়া ঐ রাত্রি ঐ স্থানে ছিল। পর দিবস প্রাতে সকলে সপরিবার শহর মধ্যে আসিয়া রহিলেন। শুক্রবারাবধি রবিবার পর্যন্ত সকল কাছারি বন্ধ ছিল। সাহেবগণ স্থানে স্থানে গোপনে রহিল।

অশ্বারোহিগণকে পুরস্কার দান : গোরাগণ তিন দিবস পর্যন্ত রণসজ্জাতে ছিল। আহার মিঠাই মদ্য আর কাঁচা মাংস। ইহাতে তিন দিবস গুজরান হইল। যে সমস্ত অশ্বারোহিগণ রণস্থলে ব্যূহ দ্বারের রক্ষক ছিল, তাহারা শস্ত্রপানি হইয়া দুই দিবস পর্যন্ত রণস্থলে ছিল। তাহাদিগকে সাহেবগণ পারিতোষিক দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন যে, "তোমরা সরকারের খয়ের খাঁ। অতএব তোমাদের এক এক ব্যক্তিকে দশ দশ টাকা, আর এক এক সের মেঠাই পারিতোষিক দিতেছি তোমরা কোমর খুলিয়া শ্রম দূর করিয়া আহারাদি কর।" তাহাতে সওয়ারগণ উত্তর করিল, "আমরা কোমর খুলিয়া নিরস্ত্র হইয়া প্যারেডের মাঠে যাইব না এবং চাকুরি করিব না। যেহেতু আমরা কালা সৈন্য ভিন্ন গোরা নহি। যখন বলন্টরি পদাতিকগণের টোটার আপত্তি, তখন সে আপত্তি আমাদের আছে। অতএব যাহা পারিতোষিক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে তাহা গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য করিয়া লইতেছি।" এই কথা কহিয়া টাকা আর মেঠাই লইয়া প্যারেডের বাহির অর্ধ ক্রোশ মাঠের নিকট যাইয়া কোমর খুলিয়া আহারাদি করিয়া, সঅস্ত্র সবাহন স্থানান্তরে গমন করিল। এইমত সৈন্যগণ ভঙ্গিয়ান দিয়া গেল।

যে সকল পদাতিক প্রহরীতে নিযুক্ত ছিল. তাহারা যৎক্ষণাৎ শ্রুত হইল যে, তদ্দলের পদাতিকগণকে তোপে উড়ান হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহারা আপন আপন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শিববাজার লুণ্ঠন : মতান্তরী সৈন্যগণ বিষণ্ণ হইয়া বরনার পশ্চিম............. সকলে একত্রে হইয়া সুবেদার এবং প্রধান প্রধান নায়কগণ একত্র হইয়া যুক্তি করিল যে, এস্থানে আর থাকা ভাল হয় না। এই বিচার করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া শিবপুরের প্রধান প্রধান দোকানদারদিগকে কহিল, "আমাদের রসদ দেও।" তাহাতে তাহারা অস্বীকার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করাতে সৈন্যগণ ওই দোকানদারদিগের দোকান হইতে ডাল, আটা, ইত্যাদি আপনাদিগের আহারের মতো লইয়া আহারাদি করিয়া তথা হইতে জৌনপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

বারাণসীবাসিগণের সাবধানতা : ৪ জুন পদাতিকগণের বিনাশ এবং পলায়ন সময়ে বরনা হইতে অসি পর্যন্ত পঞ্চ ক্রোশের মনুষ্যগণ ধন-প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। সহরে যত ফটক এবং বাটী সকলের দরজা বন্ধ করিয়া সকলে শস্ত্রপানি (হইয়া) এবং গুলি

টোটা বন্দুক কড়াবীন পিস্তল ভরিয়া এবং ছাদের উপর ইট পাথর তুলিয়া সকলে আপন আপন একতলা দোতলা তেতালা, যাহার যে ছাদ আছে, তাহার উপরে দ্বারপালগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ভিতর দিকে যুদ্ধ সজ্জাতে রহিল। হাট বাজার দোকানে মনুষ্যের গমনাগমন নাগাইদ সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। তিন দিবস পর্যন্ত অত্যন্ত গোলযোগ ছিল।

৮ জুন, সোমবার, রাজপুরুষগণ রাজকার্যের কাছারি কবাতে সকলে সাহসযুক্ত হইয়া বাজারে দুই এক করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য লইয়া সামান্য সামান্য দোকান খুলিল। কিন্তু সম্পূর্ণ দ্বার খুলিল না। চারি পাঁচ তক্তাতে দ্বার রুদ্ধ। তাহার এক তক্তা খুলিয়া ঐ দ্বারের বাহিরে সম্মুখে বসিয়া চাউল ডাল ঘৃত আটাদি হালওয়াইদিগের যাহার হাজার বারশত টাকার দোকান, তাহারা এক আধ টাকার লাড্ডু পেড়া লইয়া দোকান করিল। আর কোন দ্রব্যের দোকান খুলিল না। পরে ক্রমে শৈথিল্য হইলে কিছু কিছু দোকান দশ পনের দিবস গতে খুলিতে আরম্ভ করিল। ২৫ জুন পর্যন্ত কুঞ্জগলি জহুরিপট্টির বাজাজ, কুঠীওয়ালা, সরাবগির; মহাজন সকল কেহ দোকান খুলে নাই। বাজার ইত্যাদি সকলই বন্ধ।

আজমগড়ের সরকারি খাজনাখানা লুণ্ঠন : যে সকল পদাতিক জৌনপুরদিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা আজমগড় লুঠ করিয়া তথায় যে সমস্ত সাহেব লোক ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা লুঠ করিয়া কম বেশি দুই লক্ষ মুদ্রা লইয়া বাঙ্‌লা কাছারি জ্বালাইয়া, তথাকার বদমায়েশ লোকদিগকে সমভ্যারে লইয়া জৌনপুর গমন করিল। পথিমধ্যে নীলকর সাহেবদিগের কুঠী আর রাস্তাবন্দী সাহেবের কাছারি ছিল, ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সাহেব লোকজন পলায়ন করিল। পদাতিকগণ কুঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া যে টাকা পয়সা দেখিতে পাইল, তাহা লইয়া এবং কুঠীর যে সমস্ত আসবাব ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া তথা হইতে গমন করিল। পরে দশ বারজন যে বক্রী সৈন্য পশ্চাতে ছিল, তাহাদিগের সহিত ঐ স্থানের জমিদারগণ মিলিত হইয়া কুঠী মধ্যে আসিয়া যে স্থানে লোহার সিন্দুক মাটির মধ্যে পোঁতা ছিল, তাহার সন্ধান দেখাইয়া, ঐ লৌহ-সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের পাঁচ হাজার রাস্তাবন্দীর জন্য কোম্পানি বাহাদুরের পাঁচশত টাকা ছিল। ঐ সকল টাকা লইয়া সাহেবদিগের বাঙ্‌লাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যে সমস্ত বাঙালি কর্মকারকগণ ছিলেন, ইহারা প্রাণভয়ে কেবল এক ধুতি পরিধানমাত্র করিয়া অতি নীচ জাতিদিগের বাটী লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলেন। একজন সাহেব আপন বিবি ও দুইটি বালক-বালিকা লইয়া প্রাণভয়ে অভিভূত হইয়া এক নর্দমার ভিতরে লুকাইয়া ছিল। কোন দুরাচার ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ঐ সাহেবকে কুস্থান হইতে বাহির করিল। তাহার পরে একত্র হইলে, তখন সাহেব ও বিবি দুইজনে প্রাণরক্ষা জন্য অনেক স্তুতি-বাক্য কহিতে লাগিল। তাহা না শুনিয়া সাহেবের প্রাণ নষ্ট জন্য গুলি নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সাহেব ডাকিয়া কহিল, "আমার প্রাণ নষ্ট করিলি, কিন্তু এই কর্ম করিস আমার বিবিকে মারিস না।" এই কহিয়া সাহেব প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে দুরাচারগণ শস্ত্রাঘাতে বিবিকে ধরাতলে শয়ন করাইয়া, ঐ দুইটি বালক-বালিকা লইয়া জৌনপুরের অতি নিকটে এক মুসলমান মান্য ব্যক্তি কাজি সাহেব, তাহার নিকট দিলেন। কাজি সাহেব ঐ দুই বালক-বালিকাকে যত্ন করিয়া রাখিল।

জৌনপুরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড : পদাতিকগণ তথা হইতে জৌনপুরের শহরে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় যে দেশীয় পদাতিকগণ ছিল, তাহাদিগকে আপন দলে মিলাইয়া এবং

তদ্দেশীয় জমিদার ও বদমায়েশদিগকে সমভ্যারে লইয়া প্রথমে বন্দিশালাতে প্রবেশ করিয়া বন্দিগণের বেড়ি ইত্যাদি বন্ধন হইতে সকলকে মুক্ত করিয়া দিল। পরে সাহেবদিগের বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়া সাহেব বিবি বালক বালিকা, অনেকের প্রাণদণ্ড করিয়া বাঙ্‌লার দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া কাছারিতে প্রবেশ করিয়া রাজপুরুষগণকে গুলি এবং তরবারির দ্বারা হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা এবং শহরের... ... ... দিগের কুঠী। দোকান, ধনাঢ্যগণের বাটী লুঠ করিয়া কম বেশি বিশ লক্ষ টাকা লইল। সৈন্যগণ অধিক লইতে পারিল না। তদ্দেশীয় বদমাইশ জমিদারগণ লইলেক। এইরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে পরম্পরায় জৌনপুরস্থ সকল সাহেব সপরিবার ধরাতলে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। কেবল জেলের সার্জন আর কমিশনার চারি পাঁচ বিবি (ও) কয়েকজন বালককে লইয়া পলাইয়া কোন জমিদারের বাটীতে থাকিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বাঙালি তথায় পরিবার সমেত ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় প্রাণভয়ে ত্রাসিত হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া কেহ মালার ঘরে, কেহ বা চাষির ঘরে কেহ কাহারদের ঘরে, কেহ ডোমের ঘরে, এই মত ছোট ছোট জাতির ঘরে যাইয়া জাতি কুলের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া রহিলেন। এই মত সপ্তাহ পর্যন্ত গোপনে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রহিলেন।

সৈন্যগণ খাজনা লুঠ করিয়া সাহেবদিগের বাঙ্‌লা, কাছারি, পোস্টাফিস, ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া দিয়া লখনউ অভিমুখে যাত্রা করিল।

দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া শহর গ্রাম এবং নগরের পথে ভয়ানক ব্যাপার করিয়া রহিল। কাহারও কোথাও গমনাগমনের ক্ষমতা রহিল না। পথিক ব্যক্তি দেখিলেই তাহার সকল দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া এক কৌপীন পরাইয়া বিদায় করিয়া দেয়। স্ত্রীলোক হইলে কৌপীন দেয় না, বিবস্ত্রা করিয়া পাঠায়। তাহাতে জোর জবরদস্তি করিলে প্রাণদণ্ড করে। জৌনপুর হইতে ডাক ইত্যাদি গমনাগমন রহিত হইল। সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিল।

বিদ্রোহিগণ কর্তৃক কমিশনর হত্যা : যে সমস্ত সাহেবগণ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কমিশনর সাহেব যে জমিদারের ঘরে লুকাইয়া ছিলেন, ঐ জমিদার বারাণসীর জজ শ্রীযুক্ত গবিন্স সাহেবের নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। সাহেব এই কথা শ্রুত মাত্র তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পারিতোষিক দিবার অনুমতি করিলেন। আর ঐ ব্যক্তিকে সমভ্যারে করিয়া, তিনশত গোরা সৈন্য (ও) আট হস্তী লইয়া জৌনপুর যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় চারি পাঁচ হাজার দস্যুগণ একত্র হইয়া গবিন্স সাহেবের প্রাণদণ্ড করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টাতে থাকিয়া, তিন চারি গুলি চালাইয়া ছিল। বিধিকৃত দৈববল জন্য ঐ গুলি মাথার উপর দিয়া গেল। তাহার পর গোরা সকল বাড় রনাড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ সকল ব্যক্তি পলায়ন করিল। তাহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ধৃত হইল। তাহাদিগকে বারাণসীতে প্রেরণ করিয়া সসৈন্য গবিন্স সাহেব জৌনপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, কমিশনর সাহেবের মৃতদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত আছে। তাহাকে তথা হইতে উঠাইয়া মৃত্তিকা দিবার জন্য হস্তী পরে তুলিয়া কাশীতে পাঠাইলেন। পরে সাহেব ও বিবিগণ যাহারা জমিদারের ঘরে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সমভ্যারে করিয়া লইয়া আসিলেন। যে জমিদার এই উপকার করিয়াছিলেন তাহাকে তাহার জমিদারির খাজনা চিরদিনের জন্য মাফ হইল এবং সরকারের খয়ের খাঁ হইয়া সুখ্যাতিপত্র পাইলেন।

যে সকল দুরাত্মাগণ মনুষ্যদিগের ধন হরণ এবং প্রাণনষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যে

সাত ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, গবর্নমেন্টের অনুমতিক্রমে তাহাদিগের গলরজ্জু দিয়া প্রাণ হরণ হইল।

গবর্নমেন্টের এই আদেশ আইল, এমত দুরাচার বদমায়েশ এবং কোম্পানি বাহাদুরের অনিষ্টকারী সরকারের মন্দকারী, পদাতিকগণের সাহায্যকারী এবং মন্দকারী সৈন্যগণ যৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইবে, তৎক্ষণাৎ গলরজ্জু, কি শস্ত্রে, কিম্বা তোপের গোলা দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিবে। এজন্য বারংবার অনুমতি লইবার প্রয়োজন করে না।

গবর্নমেন্টের গোয়েন্দা নিয়োগ : এখানে দুষ্টগণের দমন জন্য স্থানে স্থানে অনুসন্ধানকারী লোক নিযুক্ত হইল এবং গোকুল থানাদার নামে এক ব্যক্তি বারাণসীতে পূর্বে থানাদারি করিত তাহাকে জজ সাহেব অতিশয় খাতিরদারি করিয়া প্রধান গোয়েন্দাতে নিযুক্ত করিয়া বদমায়েশ গুণ্ডা এবং পলাতক পদাতিকগণকে ধৃত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্বত্র ঘোষণা দিলেন, যে (ব্যক্তি) সরকারের অনিষ্টকারী পদাতিকগণের কোন রকমে সাহায্য করিবে, কি তাহাদিগকে চাকর রাখিবে তাহাদিগের এবং প্রজাগণের লুঠ ইত্যাদি করিবে, কি যুদ্ধ বিষয়ে মিথ্যা গল্প করিবে, অথবা সরকার বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাঘাতের চেষ্টা অন্তরে থাকুক বা না থাকুক, যদি মুখে বলে, কোম্পানির রাজ্য গেল—তৎক্ষণাৎ তাহার ফাঁসি হইবে। এই সকল হুকুম জারি হওয়াতে সকলে ভরসা পাইয়া কর্মকার্য করিতে লাগিল। যে যেখানে উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত করিতেছে। দারোগা ইত্যাদি পুলিশ আমলাগণ যাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ম্যাজিস্টরের নিকট পাঠাইতেছে তাহাদিগকে দোষী জানিতে পারিলেই প্রাণ নষ্ট করিতে আরম্ভ হইল। এই মত শত শত ব্যক্তির প্রাণ হত্যা হইতেছে। বলন্টারি পল্টনের মধ্যে যাহারা যাহারা লম্পট স্বভাবে উপস্ত্রীর বশ জন্য পলাইতে পারে নাই, তাহারা গোয়েন্দা দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়া ফাঁসি পড়িয়াছে। আর কাশীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকলে দস্যুগণ ... ... হইয়া রাস্তা ঘাটে সকলের লুঠ ফসাদ করিতেছে তাহাদিগের যখন যাহাকে পাইতেছে তাহাকে আনিয়া ফাঁসি দিতেছে। এত শাসনেও (বিদ্রোহ) নিবৃত্ত হয় না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে সমস্ত বাঙালি এবং ফিরিঙ্গি কেরানি ও অন্য অন্য কর্মকারকগণ জৌনপুরে ছদ্মবেশে ছিলেন, তাহারা পথের ভয়ানক ব্যাপার জন্য কেহ আসিতে পারেন না। এখানে অর্থাৎ কাশীতে কাহার পিতা, কাহার ভ্রাতা, কাহার মাতুল, কাহার শ্বশুর, এই মত অনেকের আছে তাহারা ব্যাকুল হইয়া কাশীর জজ গবিন্স সাহেবকে জানাইলে দুই শত গোরা, পাঁচ হস্তী এবং কালেকটর সাহেব জৌনপুর যাইয়া সেখানে যত বাঙালি ছদ্মবেশে ছিলেন এবং ফিরিঙ্গিদিগের ঘর ঘর অন্বেষণ করিয়া সকলকে একত্র করিয়া ১৮ জুন বেনারসে নিরুদ্বেগে পহুছিয়া দিয়াছেন। তথাকার শহর জিলা ভগ্ন হইয়া উৎসন্ন হইয়াছে, তথাকার জমিদার ... ... সকল ভারার্পণ করিয়া আসিয়াছেন।

গোরখপুরের সৈন্যগণ এই মত বেদেল হইয়া খাজনা লুঠিয়া সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া ছাউনি জ্বালাইয়া দিয়া গমন করিয়াছে। অনুমান, দিল্লি যাইয়া পল্টনের সহিত একত্র হইয়া বাদশাহের পানা পোস্তীতে আছে।

পল্টনেরা এই মত ব্যবহার করাতে যে সম ... ... পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। এতাবৎ জেলা সদরের দুরবস্থা দেখিয়া তথাকার জমিদারগণ এবং দস্যুগণ

প্রবল প্রতাপ হইয়া প্রজাদিগের এবং পথিকদিগের ধনপ্রাণ সর্বদা হরণ করিতে লাগিল। তাহাতে অতিশয় অরাজক হওয়া জন্য ভয়ানক ব্যাপার হইল।

এই সংবাদে নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত জঙ্গ বাহাদুর দশ সহস্র সেনা লইয়া পর্বত হইতে নিচে নামিয়া আপন রাজ্য রক্ষার্থ রহিলেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর নিচে ছাউনি করাতে দস্যুগণের প্রবলতা স্বল্প হইয়াছে।

জৌনপুরের কাজি সাহেবের ঘোষণা : জৌনপুরের শহর, বাজার এবং পথিকগণের গতায়াত বন্ধ হওয়াতে সকল প্রজাবর্গের অতিশয় কষ্ট হওয়াতে আহারের দ্রব্যাদি না পাওয়াতে প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন জানিয়া তথাকার ধার্মিক বর্ধিষ্ণু কাজিসাহেব তেঁহ আপন লোক দ্বারা সোহরত দেওয়াইলেন "মুলুকপতি সাহার হুকুম পঞ্চ জনার সকলে হাটবাজার দোকান পূর্ব মত খুলিয়া ক্রয়বিক্রয় করহ কেহ কাহার প্রতি অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যে ইহার বিপরীত করিবে, পঞ্চ বিচারে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হইবে। যিনি রাজ্যাধিপতি হইবেন, তাঁহার নিকটে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ করিয়া বাজারের দোকানাদি খোলাইয়া সকলের হিত করিয়াছেন, আর কেহ কাহার প্রতি হঠাৎ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

অযোধ্যার সিংহাসনের রাজাদিগের মধ্যে মানসিংহ নামে এক রাজপুত্র (ছিলেন) তেঁহ কতকগুলি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং দশ সহস্র সৈন্য লইয়া জৌনপুরের ছাউনি করিয়া আছেন। কেহ প্রজাগণের অনিষ্ট করিতে না পারে। যে সকল অনিষ্টকারী ছিল, তাঁহাদিগকে আপন বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, কি মননে আছেন, তাহা প্রকাশ হয় না. দুই পক্ষেই সম্প্রীতি রাখিতেছেন। এ পর্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সহিত অহিতাচার করেন নাই, কেবল কহিতেছেন—"দেশের কেহ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্য আমি রহিলাম।"

এলাহাবাদের ছাউনিতে গোরা সৈন্যগণ এবং সেনাপতি সাহেবগণ আর শিখ সৈন্য একদল ছিল। কেল্লার মধ্যে ৬ নম্বরের দেশীয় পদাতিক এক দল ছিল, ঐ পদাতিকগণ কেল্লা এবং খাজনা (ও) মেগাজিন রক্ষা করিয়াছিল।

এলাহাবাদের সরকারি খাজনা লুঠ : জুন তারিখে এলাহাবাদের সরকারি খাজনা লুঠিয়া এবং কেল্লা হইতে গুলি গোলা বারুদ লইয়া সেনাপতিদিগকে এবং আর আর অনেক কর্মকারক সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া ছাউনি বাঙ্‌লো সকল এবং পোস্টাফিস ও ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া, রণোন্মত্ত হইয়া (বিদ্রোহীগণ) চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যেমন মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র অন্বেষণে ভ্রমণ করে তদ্রূপ ... ... পদাতিকগণ .. ... দিগের অন্বেষণ করিতেছে। এই অবসরে যে সমস্ত সাহেব ও গোরা এবং বিবি ইত্যাদি পরিবারগণ জীবৎমান ছিল, সকলে কেল্লার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। শিখ পল্টন রক্ষার্থ রহিল। ৬নং পদাতিকগণের এতাদৃশ প্রবল পরাক্রম সেনাপতিদিগের প্রতি দেখিয়া তথাকার বাসিন্দা অষ্টাদশ শত প্রয়াগী একযোগ হইয়া এবং মীর সাহেব নামে এক মুসলমান, দুই হাজার স্বজাতি এবং দুই হাজার মেওয়াতি সমভ্যারে সহযোগী হইয়া পদাতিকগণের সহিত একত্র হইয়া কোম্পানি বাহাদুরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টিত হইল। রাজপুরুষগণ গুপ্তভাবে থাকাতে অরাজক হওয়াতে দস্যুগণ (ও) জমিদারগণ (ছিল) তাহারা জমায়তবস্ত হইয়া স্থানে স্থানে রহিল। এই মত প্রয়াগ হইতে বৈষ্ণবঘাটী

গোপীগঞ্জের পশ্চিমে তিন ক্রোশ পর্যন্ত যে কেহ এই পথে গতায়াত করিতেছে, তাহারই প্রাণদণ্ড কিম্বা যদি ইংরাজের রাজ্য বলিয়া মুখে আনিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার হইয়া ডাকাতি সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। এলাহাবাদ শহর মধ্যে মীর সাহেব আর মৌলবি সাহেবের হুকুম প্রচলিত। নগর মধ্যে এমত ঘোষণা দিলেক যে, মুলুক বাদশাহের হুকুম—মীর ও মৌলবি সাহেবের (এবং) হিন্দু ও মুসলমানদিগের দিল রক্ষা জন্য সকলে শস্ত্রধারী হইয়া ফিরিঙ্গির দলবল বিনাশ কর। এই মত ঢেটরা দিয়া রণোন্মত্ত হইয়া হাট বাজার শহর গোলাগঞ্জ পথ ঘাট সকল লুঠতরাজ করিতে লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা দুই স্থানে যে দুই নৌকার সেতু ছিল তাহাও ছেদন করিয়া দিল; তাহার কারণ কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যাদি না পার হইয়া এলাহাবাদের কেল্লাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উপরোক্ত সকলে রহিল। কেল্লার দ্বার কোন ক্রমে কেহ খুলিয়া কিছু উপায় করিতে না পারে, এই সকল ব্যক্তি কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলকে বিনাশ করিয়া কেল্লা দখলের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ছিল।

যে সমস্ত গোরা সৈন্য কেল্লার মধ্যে ছিল তাহারা যুদ্ধের কিছুই উপায় পায় না। কেল্লার মুরচা হইতে তোপ করিলে বিপক্ষ বিনাশ হয় না, ইহা দেখিয়া নিস্তব্ধে কেল্লা মধ্যে রহিল।

যে সমস্ত সৈন্য পদব্রজে এলাহাবাদ যাইতেছে, তাহারা গোপীগঞ্জ পর্যন্ত গমন করে। তাহার অগ্রে গেলে একেবারে ছয়-সাত হাজার মনুষ্য বন্দুকধারী আসিয়া যে স্বল্প সৈন্য যায়, তাহা নিপাত করিবার সম্ভাবনা হয়। এজন্য সেনাপতিগণ বিবেচনা করিয়া গোপীগঞ্জে গোরা লাইন করিলেন। যখন যত গোরা পদব্রজে কাশী হইতে গমন করে, গোপীগঞ্জে একত্র হয়। এই মত ক্রমে ক্রমে এক হাজার গোরা গোপীগঞ্জে রহিল, তাহাদের প্রতি কিছু দৌরাত্ম্য নাই।

স্টিমারে যে গোরা সৈন্য এলাহাবাদ পাঠানো হইতেছে, তাহাদিগের জাহাজ এলাহাবাদের পারে যাইতে দেয় না। তীরে তীরে সহস্র সহস্র বন্দুকধারী ভ্রমণ করিতেছে। এক এক স্টিমারে দুই শত আড়াই শত গোরা যায়। ইহারা দশ সহস্র সৈন্য মধ্যে কি করিবে? ইহা বিবেচনা করিয়া ঝুশী গঙ্গার পার তথায় রহিল। ক্রমে শত স্টিমারে সৈন্যগণ একত্র হইয়া রহিল।

শিখ সৈন্যের উত্তেজনা : এখানে পদাতিকগণ চার পাঁচ দিবস পর্যন্ত এলাহাবাদ শহরে ছিল, পরে তাহারা গোরা সৈন্যের আমদানি দেখিয়া তথা হইতে লখনউ মুখে যাত্রা করিল। কেবল তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ জমায়েত হইয়া একাদশ দিবস পর্যন্ত অতিশয় প্রবল প্রতাপে ভয়ানক করিয়া হুকুম ইত্যাদি চালাইয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। যখন সরকার বাহাদুরের বারশত গোরা সৈন্য একত্র হইল এবং সেনাপতিগণ সেনাদিগের নিকটস্থ হইয়া বিবেচনা করিলেন, যে এ দুষ্ট দস্যুগণের এত বৃদ্ধি রাখা আর ভাল হয় না, তখন একজন ছদ্মবেশীকে কেল্লাতে সংবাদ জন্য পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি আতুরের বেশ ধারণ করিয়া পদে অনেক ছেঁড়া কাপড় ও চট জড়াইয়া কৌপীন করঙ্গ লইয়া ভস্মভূষণ করিয়া নানা ছলেতে কেল্লার নিকটস্থ হইয়া কৌশলে দ্বারপালকে পত্র দিল। এত দ্বারা সাহেবদিগের নিকট পঁহুছিল। তথা হইতে যে সাঙ্কেতিক পত্র দিলেন, ওই ছদ্মবেশী লইয়া আসিল। ইতোমধ্যে যে শিখ সৈন্যগণ, কেল্লার দ্বারপাল ছিল, তাঁহার একজন বাজারে আসিয়াছিল। তাহাকে একাকী এবং নিরস্ত্র দেখিয়া মীর মৌলবির ব্যক্তিগণ আসিয়া গুলির

দ্বারা হত করিল। এই সংবাদ শিখ পল্টনে হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কেল্লার সেনাপতি সাহেবকে কহিল যে, "কি আশ্চর্য। আমাদের পল্টন জীবিতমান থাকিতে চাষাগণে একজন সেনাকে মারিল। অতএব হুকুম দেন যে, আমরা এ সকল ব্যক্তিকে মারিব।" এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "তোমরা পারিবে?" শিখদল সকলেই কহিল, "কি বিচিত্র কথা! ক্ষণমাত্রে সকল বিনাশ করিব।" এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তোমরা সুসজ্জিত হও। যে গোরা কেল্লাতে আছে, ইহারাও তোপ লইয়া পশ্চাতে যাইতেছে আর কুশী হইতে গোরাগণ শীঘ্র পঁহুছিবে। গোপীগঞ্জের গোরাগণ অগ্রগামী হইয়াছে, পুল ভগ্ন জন্য পারের কষ্ট আছে। তাহাও শোধরান আবশ্যক। যে সকল গোরা সৈন্য সে সব পথ খোলসা করিয়া তীরে পঁহুছিলেই হইবে।"

এই কথা শ্রবণমাত্র শিখ সৈন্যদল রণসজ্জা করিয়া কেল্লার বাহির হইয়া যে মত অজাপালে মৃগেন্দ্র প্রবিষ্ট হইয়া বিনাশ করে, তদ্রূপ শিখগণ গ্রাম্য যোদ্ধাগণের প্রতি আক্রমণ করিল। গ্রাম্য সিপাহিগণ কমবেশি দশ সহস্র একত্র হইয়া যুদ্ধ সজ্জাতে উপস্থিত হইয়া উভয় দলে ঘোরতর রণ আরম্ভ হইল। দুই দলের বন্দুকের শব্দে কত মনুষ্যের কর্ণে তালা লাগিল। গুলির সন্‌সনানি, তলোয়ারের চপচপ সঙ্গীনের আঘাতের শব্দে সকলে স্তব্ধ হইয়া দেহে প্রাণমাত্র অনেকের ছিল। শিখগণ রণোন্মাদ হইয়া দিকবিদিক জ্ঞান না করিয়া কেবল হন হন শব্দে গ্রাম্য যোদ্ধাগণকে নিপাত করিতেছে। যাদৃশ অজাগণকে শার্দূল নষ্ট করে, তদ্রূপ ইহাদের রুধিরে রঙ্গভূমিতে স্রোত বহিয়াছিল। ত্রিবেণী ত্রিধারা ছিল, তাহাতে আকবর সা কাম্য কূপের উপর কেল্লা করায় সরস্বতী-ধারা গুপ্তভাবে আসিতেছে। ঐ স্থলে রুধির ধারা প্রবল হইয়া ঐ দিবস চতুর্ধারা হইয়াছিল। এ ধারাতে ত্রিবিধ প্রকার জল জানা যাইত। রক্তধারা মিশ্রিত হইলে পর সকল ধারা গোপন হইয়া রক্তধারা প্রবল হইয়া বহিতে লাগিল। শিখগণ রাজনীত্যনুসারে ধনুর্বেদে সুশিক্ষিত, রণ পণ্ডিত। ইহাদেব সম্মুখে গ্রাম্য নির্বোধ দুষ্ট দুরাচার যোদ্ধাগণ কি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে? কেবল মনে করিয়াছিল, নবাবী রাজ্য হইলে পূর্বমত লুঠ করিয়া লইয়া যাইব। যাহার লোকবল অধিক থাকিবে, তাহারই রাজপদ। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার করায় এই অনিষ্টকারী দুরাচারী ব্যক্তিগণ অঘটন ঘটন আশাতে প্রাণ-আশা পরিত্যাগ করিয়া শিখহস্তে বহু ব্যক্তি রণভূমিতে রুধির সজ্জায় শয়ন করিয়া মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইল। কতকগুলি সৈন্য এবং মীরসাহেব পলায়ন করিল।

মীরসাহেবের পলায়ন : এখানে শিখগণ এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে, ওখানে গোরাগণ রণসজ্জা করিয়া অস্ত্রধারণপূর্বক আগ্নেয়াস্ত্র তোপ লইয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ ... ... করিতে করিতে চলিল। ইতোমধ্যে বিপক্ষদলের মধ্যে যে কেহ সম্মুখে পড়িতেছে, তাহাকে ছেদন কিম্বা সঙ্গীনের আঘাত দ্বারা নিস্তেজ করিয়া ঐ অগ্নিমধ্যে দিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। গোরাগণ প্রবল অনল প্রদীপ্ত করিয়া খাণ্ডব দাহনের ন্যায় অগ্নি তর্পণ করিয়াছিল। এই মত তোপের দ্বারা কিটগঞ্জ, কর্নেলগঞ্জ, মুঠিগঞ্জ ইত্যাদি শহরের বাজার আর বাসিন্দাদিগের গৃহাদি দাহন করিয়া সমভূমি করিল। যে কিছু অর্থাদি ও দ্রব্যাদি সম্মুখে পাইল তাহা... ...। গোলা নিক্ষেপে বহু প্রাণ নষ্ট হইল। কিন্তু মীরসাহেব আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

পিরুমলের সাহায্য : (গোরাগণ) শহরের অনেক বাজারাদি ... . . দারাগঞ্জ মুখে যাত্রা

করিতেছিল। দারাগঞ্জনিবাসী পিরুমল নামে একজন ধনী ব্যক্তি সেনাপতিদিগের নিকট নানা প্রকার স্তুতিবাক্য কহিবাতে দারাগঞ্জ রক্ষা পাইল। তাহার কারণ ঐ ধনী ব্যক্তি সরকার বাহাদুরের হিতার্থে সৈন্যদিগের রসদ জন্য টাকা এবং গম অনেক দিয়াছে। এ কারণ তাহার বাসস্থান রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহার নিকট যে সমস্ত বদমায়েসের ঘর ছিল, তাহার মূল সমেত উৎপাটন করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ দিবস ঐরূপ মহামার করিয়া রণজয় হইয়া মহানন্দে কেল্লা মধ্যে রহিল।

দারাগঞ্জের পুল ভঙ্গ : এখানে ঝুশী ও গোপীগঞ্জ হইতে গোরাগণ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে ... ... দগ্ধ করিয়া এবং দস্যুগণকে গুলিগোলা অস্ত্র দ্বারা নিপাত করিতে করিতে আসিতেছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন গোরা কেরাচিতে সওয়ার হইয়া শীঘ্র প্রয়াগের কেল্লাতে পঁহুছিবার জন্য আইল। রেতির উপর অর্থাৎ বালুকাময় ভূমিতে কেরাচি না চলাতে ঝুশীর নিকট রাখিয়া গোরাগণ বেলা দুই প্রহরের সময় ঐ বালুকাতে গমন করিয়া পুলের নিকট আসিয়া পঁহুছিবামাত্র দারাগঞ্জের মুনসী পুল কাটিয়া দিলেক। গোরাগণ পার হইতে পারিল না। ঐ পুলের উপর আসিয়া নৌকা জন্য মাঝিগণকে অনেক মত ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কোনও ক্রমে কাহাকেও মিলিল না। পরে তীরে তীরে দেখিতে দেখিতে কতক দূরে এক নৌকা দেখিতে পাইল। ঐ নৌকার নিকট যাইয়া দেখিল তাহাতে নাবিক নাই। তথাচ ঐ নৌকাতে উঠিয়া নাবিকের বহু তল্লাশ করিল। কোনমতে পাইল না। পরে আপনারা ঐ নৌকা বাহিতে লাগিল। কিন্তু জলস্রোতে কেল্লার পারে পহুছিল না—যে তীরে উঠিয়াছিল, ঐ তীরে পুনরায় গেল। তাহা দেখিয়া গোরাগণ নৌকা হইতে তীরে নামিয়া রেতি পরে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লেশযুক্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইল। এজন্য আপন আপন রুটি কেরাচিতে ছিল, তাহা আহার জন্য গাড়ির নিকট গমন করিল। তথা যাইয়া দেখিল, গাড়িতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল সকল ঝুশিবাসী লোকগণ লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া দ্বিগুণ দুঃখিত হইল। একে বালুকাময় ভূমি, ভ্রমণের ক্লেশ, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসাতে ক্লান্ত, পরে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল তাহা লুঠ হইল, ইহাতে সকলেই দুঃখিত। একজন গোরা সর্দিগর্মিতে প্রাণত্যাগ করিল। আর সকলে তথা হইতে ছায়া দেখিয়া পুরানো ঝুশী গ্রামে বৃক্ষতলে রহিল। তথাকার ব্যক্তিগণকে কহিল, "শীতল জল দাও। তাহারা অতি সুশীতল জল এবং রুটি লইয়া সকলে উপস্থিত হইল। গোরাগণ কেবল জল পান করিল। আর কিছু গ্রহণ করিল না। পরে তাহারা স্বল্পকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্বারে কেল্লায় যাইবার জন্য পার হইবার উপায় দেখিতে তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নজর হইল যে, দূরে এক স্টিমার আছে। ওই স্থানে সকলে গমন করিয়া স্টিমারে সওয়ার হইয়া কেল্লাতে পঁহুছিল। এত ক্লেশে কেল্লায় যাইয়া কাপ্তেন সাহেবকে কহিল "পার হইতে (গিয়া) যুদ্ধের চতুর্গুণ ক্লেশ হইল। এত ক্লেশ দিবার মুলাধার দারাগঞ্জের প্রজাগণ। আমাদিগকে পুলের ধারে দেখিবামাত্র পুল ভাঙ্গিয়া দিল। যদি অগ্রে এই দুষ্টগণের আর ঝুশির দস্যুগণের দমন হয়, তবে আমাদের দুঃখ মোচন হইবে, নচেৎ তোমাদের আর রাজ্য শাসন অসম্ভব হইবে।" এই কথা শুনিয়া সকল সাহেবগণে যুক্তি করিয়া প্রয়োজনমতো হুকুম দিলেন ... ... এই হুকুম হওয়াতে গোরাগণ প্রাতে উঠিয়া কেল্লার মুরচা হইতে প্রথমে চারি পাঁচ গোলা নিক্ষেপ করিল, পরে কামান গুলি-গোলা বন্দুক ও কিরিচ ইত্যাদি শস্ত্রধারী হইয়া দারাগঞ্জে প্রবেশ করিয়া ... ..

... ... ইহা দেখিয়া শহরের বহু মনুষ্য অন্যান্য গ্রামে পলায়ন করিল। ইহাতে প্রায় শত শত ব্যক্তির প্রাণত্যাগ হইল। ... ... ইহা দেখিয়া দারাগঞ্জনিবাসী পিরুমল বিবেচনা করিল, কাপ্তেন সাহেবের গোচর ভিন্ন রক্ষার অন্য উপায় নাই। তাহার পর শুনিল যে, কাপ্তেন সাহেব পুল বান্ধাইবার জন্য পুলের নিকট আসিয়াছেন। পিরুমল গলবস্ত্র হইয়া সাহেবদিগকে জানাইল যে, "হে ধর্মাবতার। অগ্রে আমার প্রাণ নষ্ট কর, পরে ... ... পরে প্রজাগণের প্রাণ হরণ কর, নচেৎ আমি তোমাদিগের সম্মুখে আত্মহত্যা হইব।" ইহা শুনিয়া সাহেবগণ তাহাকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন যে, "এক মুনসীকৃত অপরাধে দারাগঞ্জের সকল প্রজার ধন প্রাণ নষ্ট করা ভাল হয় না, যে কেহ অপরাধী থাকিবে পশ্চাৎ দেখা যাইবে।" ইহা ম্যাজিস্টর ও সেনাপতি সাহেবদিগকে কথাতে তৎক্ষণাৎ বিউগলের ধ্বনি করিবামাত্র গোরাগণ যে যেখানে যে কর্মে ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া সেনাপতির নিকট পঁহুছিল। সেনাপতি সাহেব সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া দারাগঞ্জ ভিন্ন অন্য দিক গমন করিতে হুকুম দিলেন। পিরুমল সৈন্যদিগের জন্য তিন লক্ষ মন রসদ দ্রব্যাদি দিল। তাহাতে তাহার প্রতি সাহেবগণ বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

এখানে গোরা ও শিখগণ শহর ... ... সরাইয়ের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, মৌলবি সাহেব কমবেশি পাঁচ হাজার মুসলমান সৈন্য (একত্র করিয়াছে) তাহাদের যুদ্ধসজ্জা ঢাল তরবারি আর বরসি এবং কাহারও বন্দুক আছে। ইহা দেখিয়া সরাইয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল দ্বাররুদ্ধ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ দুই তোপে দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া মৌলবিকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবার উদ্যোগ করাতে মুসলমান সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহারণ করিল। প্রথম দিবস মৌলবির প্রায় দুই শত সৈন্য হত করিয়া গোরাগণ পিছিয়া আইল। পর দিবস যুদ্ধে যাইয়া প্রায় দুই প্রহর পর্যন্ত ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে সাত আট শত ব্যক্তি রণে পতিত হয়। তাহার পর গোরাগণ কেল্লাতে আইসে। পরে তৃতীয় দিবস মুসলমান এবং মেওয়াতি সৈন্যগণ পুনর্বার স্ব স্ব বেশ করিয়া যুদ্ধস্থলে আসিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কেল্লা হইতে শিখ ও গোরাগণ যুদ্ধসজ্জা করিয়া ঐ সরাই বনস্থলে আসিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। প্রথমে মৌলবির সেনাগণ গুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোরাগণ পশ্চাতে থাকিয়া শিখদিগকে অগ্রগামী করিয়া উভয় পক্ষের গুলি এবং তরবারিতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে প্রায় দিবা দ্ই প্রহরগত হইল, শিখগণ মৌলবির বহু সৈন্য নিপাত করিল। ইহা দেখিয়া মেওয়াতি দল একেবারে আক্রমণ করিয়া শিখ সৈন্য নিপাত জন্য বহুমত উপায় করিল। তখন গোরাগণ গোলা নিক্ষেপ দ্বারা মৌলবির সকল সেনা হত করিয়া তাহাকে ধৃত করিতে সন্ধান করিল। মৌলবি তথা হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিল। মৌলবিকে না পাইয়া সাহেবগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ মৌলবিকে ধৃত করিয়া দিবেক, তাহাকে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

বিদ্রোহীগণের শাসন : এই মত যুদ্ধাদি করিয়া প্রয়াগের দুষ্টগণ নিপাত করিয়া প্রয়াগীদিগের মধ্যে যাহারা দুষ্টতা করিয়া সরকারের অনিষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যাহাতে যেখানে পাইতেছে লইয়া....যাইতেছে। এইরূপ শাসন প্রয়াগ হইতে কাশী পর্যন্ত করিয়া পথের কণ্টক ঘুচাইয়া ডাক চালাইতে শুরু করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত চতুর্দিকে যে সমস্ত গ্রাম আছে, তাহা প্রতি দিবস এক দুই করিয়া গ্রাম গোরাগণ ... ... বশে আনিতে লাগিল। ... ... গ্রাম সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া মনুষ্য সকল দেশান্তরী হইয়া গেল।

প্রবাসী বাঙালিগণের দুর্দশা : প্রয়াগে যে সমস্ত বাঙালি ছিলেন, তাহাদিগের প্রাণের আঘাত হয় নাই, বিষয় যাহা যে গোপন করিতে পারিয়াছিল তাহাই আছে, নচেৎ সকল লুঠ হইয়া যায়, ভোজন-পাত্র জল-পাত্র হীন হইয়া আপন আপন স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলে এক বস্ত্র পরিধানে স্থানে স্থানে গোপনে থাকিয়া সকলে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গোলযোগ নিবারণ হইবার পর সকলে আসিয়া দারাগঞ্জে আছেন। প্রয়াগের সব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী যৎকালে দেশীয় পদাতিকগণ দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে তেঁহ ডাক্তারখানাতে ছিলেন। পদাতিকগণ ভীষণ মূর্তিতে ডাক্তারখানার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যে সকল ঔষধ ছিল, তাহা ভাঙিয়া ছড়াইয়া তদরূপ করিয়া চক্রবর্তী ডাক্তারের উপর আঘাত করিতে পাঁচ ছয় জন সিপাহি বন্দুক ও তরবারি লইয়া মার মার শব্দে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘূর্ণিত লোচনে বিকট দর্শনে যমদূতের ন্যায় রহিল। তখন চক্রবর্তী পদাতিকগণের পদানত হইয়া কহিলেন, "দেখ আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রাণদণ্ড করিলে তোমাদের কি লাভ হইবে? বরং ব্রহ্ম হত্যার পাপগ্রস্ত হইবে।" এইমত স্তবস্তুতি করাতে তাহারা প্রাণদণ্ডে ক্ষান্ত হইয়া কহিল, "তোমার যাহা অর্থ এবং বাসায় দ্রব্যাদি আছে, সকল রাখিয়া একবস্ত্র পরিধান করিয়া যাও।" (তিনি) তাহাই করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গুপ্তবেশে ছিলেন ডাক্তারখানা জ্বালাইয়া দিয়া গেল।

ডেপুটি পোস্টমাস্টার বিশ্বনাথ দে দেখিল যে, পদাতিকগণ সাহেবদিগের প্রাণ ধন হরণ (ও) বাঙ্‌লা দাহন করিতে করিতে আসিতেছে ইহা দেখিয়া বাঙ্‌লা হইতে বাহির হইয়া এক বস্ত্র পরিধানে কেল্লা প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিল। এইমত সকলে নানা উপায়ে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। যাহাদিগের পরিবার সমভ্যারে ছিল, তাহাদিগের তৎকালে কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অন্যে কি জানিতে পারিবে। যাহারা এ বিপদে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, সেই জানে। হরি হরি এমত বিপদ কাহারও যেন না হয়।

সরকার বাহাদুরের সেনাপতিগণ সৈন্য দ্বারা পথের কণ্টক ঘুচাইয়া প্রয়াগ হইতে ডাক গমনাগমনের পথ খোলসা করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। পরে গোপীগঞ্জের সরহদ্দ মধ্যে (ও) ভদই পরগণার মধ্যে যে সমস্ত রঘুবংশীয় ক্ষত্রিয় জমিদারগণ আছে, তাহারা যুক্তি করিয়া ২ জুলাই তারিখে প্রয়াগের ডাক মারে এবং পথিকদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করে। এ সংবাদ মির্জাপুরের ম্যাজিস্টর মোর সাহেব শুনিয়া সর্বেজমিনতে স্বল্প গোরা আর দেশীয় পদাতিক থানা হইতে সমভ্যারে লইয়া তৎস্থলে বিশিষ্ট তদারক করিয়া দেখিলেন, রঘুবংশী জমিদারগণ হইতে অনিষ্ট হইতেছে। (তিনি) তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য উপায় কহিতে লাগিলেন। তাহারা পলাতক হইল, তাহাদের প্রধান জমিদার গ্রেপ্তার হইল। গবর্নমেন্ট হাল আইনের ক্ষমতানুসারে তৎক্ষণাৎ অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসি দিলেন, বক্রী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিবার জন্য অনুচরগণ ভ্রমণ করিতে রহিল।

এখানে যে ব্যক্তিকে গলরজ্জু দ্বারা হত করিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রী লখনউর বাসিন্দার কন্যা। সেই স্ত্রী আপন ভ্রাতৃগণকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমি মোর সাহেব কর্তৃক বিধবা হইয়াছি। আমার পতিকে অবিচারে বধ করিয়াছে! যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তবে ইহার উচিত দণ্ড মোর সাহেবকে দিবে। তাহা হইলে আমার মনোদুঃখ যাইবে, নচেৎ আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এ সংবাদ পাইয়া ঐ বিধবার ভ্রাতৃবর্গ আপন রঘুবংশীগণকে একত্র করিয়া প্রায় তিন শত বন্দুকধারী ভদই যাত্রা করিল।

মোর সাহেবের অনুচরগণ অনুসন্ধান করিয়া ৪ জুলাই ম্যাজিস্টর সাহেবকে সংবাদ করে, তাহাতে ম্যাজিস্টর মোর সাহেব আর ডেপুটি ম্যাজিস্টার সাহেব দশ জন গোরা আর থানার পদাতিকদিগকে লইয়া ঐ হত জমিদারের দুই ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙ্‌লাতে আসিয়া থানা যাইবার উদ্যোগে ছিলেন। ধৃত দুই ব্যক্তি দৃঢ় বন্ধনে পদাতিকগণের হস্তে রহিল। এমতকালে লখনউ হইতে রঘুবংশীগণ ঐ মৃত জমিদারের বাটীতে আসিয়া শুনিল যে, তাহার দুই ভ্রাতাকে ফাঁসি দিবার জন্য লইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রে আঠার জন, সকলে বলিষ্ঠ, দুর্বল কেহ ছিল না। ইহারা আপন বঘুবংশী ক্ষত্রিয়গণের নিকট যাইয়া কহিল যে, "আমাদের আর বৃথা জীবন ধারণ, যখন আমাদের পিতা-পিতৃব্যগণকে বধ করিল, তখন তাহাদিগকেও আর রাখিবে না। যাহাকে পাইবে তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিবেক, অতএব আমাদের বিবেচনাতে এমত ফাঁসিতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা ভাল।" এই কথা শুনিয়া প্রায় বার শত রঘুবংশী কহিল যে, "একথা প্রামাণ্য বটে, যখন যাহাকে যেখানে পাইবে তাহাকেই ফাঁসি দিবেক অতএব চল সকলে ফিরিঙ্গির সহিত লড়িব।" এই কথাতে দশ বার গ্রামের সকল মনুষ্য পঞ্চায়েতে ঐক্য হইয়া আপন আপন যুদ্ধের অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইল। লখনউ হইতে যে সকল বন্দুকধারী আসিয়াছিল তাহারা একযোগ হইয়া কোলাহল শব্দে গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙ্‌লার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাহেব ও চারি পাঁচজন গোরা খানা খাইতে বসিয়াছে। ঐ সময় গুলিতে ও তরবারিতে সকলের মস্তক ছেদন দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিয়া বন্দিদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া লইয়া গেল, আপনাদিগকে অতিশয় ধন্যবাদ করিয়া বাহু আস্ফালন করিতে লাগিল। ইহাদের এইমত বীরত্ব দেখিয়া নিকটবর্তী সকল গ্রামের মনুষ্য সকল ইহাদিগের দলে মিশিয়া প্রায় বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া এক স্থানে রহিল। পথিকগণের ধনপ্রাণ হরণ ও ডাক গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিল, দুই দিবস পর্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল, পরে ৬ জুলাই বেনারস হইতে তিন শত গোরা, দুই তোপ, একজন সেনাপতি এবং কাশীর রাজার পাঁচ শত পদাতিক চলিল। ঐ গ্রাম সকল ভদই পরগনায় কাশীর রাজার রাজ্য। সরকার বাহাদুরের পদাতিকগণ বিগড়াতে রাজা সরকারের পক্ষে থাকিয়া বলন্টর পল্টনের সেনাপতিদিগের নিকট হইতে চাতুরিতে মেগাজিন (ও) খাজনা লইয়া সরকার বাহাদুরের হস্তগত করিয়া দেওয়াতে ঐ দিবস সিপাহিগণের উপর তোপ দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করাতে রাজা সাহেবের ভদই পরগণায় কমবেশ লক্ষ টাকা তহশীলের জমিদারির প্রজাগণ বিগড়িয়া বাজার কর ইত্যাদি সকল বন্ধ করিয়া লুট ফসাদ করিতেছিল। তাহাদের শাসন জন্য এক সহস্র অশ্বারোহী বন্দুকধারী পাঠাইয়াছিলেন। প্রজাগণ প্রায় সকল সৈন্য নিপাত করিয়াছিল। যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহারা প্রাণ লইয়া রাজার রামনগরের কেল্লাতে আসিয়াছিল। প্রজাগণ রাজসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহানিষ্টকারী হওয়ায় দৌরাত্ম্যের পথ প্রবল হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রয়াগ শাসন সময়ে প্রধান অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসি দেওয়াতে পূর্বোক্ত উপদ্রব হয়। তজ্জন্য রাজসৈন্যগণ সরকার বাহাদুরের সাহায্য জন্য যাইয়া ভদই পরগণার ... ... দুরাত্মাদিগকে প্রাণদণ্ড করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, আর সে পথে কিছু ভয় নাই।

কাশীধামের উত্তর দশ ক্রোশ হইবে ডুবি নামে এক ক্ষুদ্র শহরের ন্যায় নগরগ্রাম, তাহাতে অনেক চিনির মহাজন এবং ধনাঢ্যগণ আর রঘুবংশী ক্ষত্রিয় জমিদারগণ আছে।

তাহার মধ্যে গুমান সিংহ নামে একজন রঘুবংশী ও প্রদেশের প্রধান জমিদার। তাহার ঘরে আপন ভ্রাতা পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি কুটুম্বতে এক স্থানে দুই তিন শত ঘর আছে। নিজ পরিবার একান্নে পঁচিশ জন বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী উহার বশীভূত প্রায় বিশ পঁচিশ গ্রামের মনুষ্য এবং মহাজনগণ। ইহারা জৌনপুরের দুরবস্থা এবং রাজপুরুষগণের হত হওয়া দেখিয়া সকল গ্রাম্য লোক এক পরামর্শ হইয়া পথিকগণের প্রতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল এবং সরকার বাহাদুরের যে পুলিশ থানা ছিল তাহার অনাদর করিতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে এক বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল, তাহার উপরে এক নিশান এবং নাগারা বান্ধিল। সঙ্কেত রহিল ঐ নাগারা বাজাইলেই যে যেখানে যে কর্মে থাকিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন যুদ্ধ সজ্জা লইয়া এক স্থানে প্রস্তুত হইবে। এইমত নিরূপণ করিয়া দশ বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া রহিল, প্রকাশ করিল কাশী চড়াই করিয়া লুঠ করিবে। এই সংবাদ জজ এবং ম্যাজিস্টর কমিশন টগর সাহেব প্রভৃতি শ্রুত হইয়া তথ্য জানিবার জন্য একজন জাশু পাঠাইলেন। তথা হইতে ইহাদের উপরোক্ত বিবরণের সঠিক তথ্য আনিয়া দেওয়াতে ২৪ জুন (২১ আষাঢ়) পঞ্চাশ জন সওয়ার, পঞ্চাশজন গোরা আর এক কামান লইয়া গবিন্স সাহেব ডুবিতে যাত্রা করিলেন। তথায় দেখিলেন বহু মনুষ্য একত্র হইয়া গোলযোগ করিতেছে, কিন্তু সকলই গ্রাম্য ব্যক্তি, সামান্য যোদ্ধা সেনাপতি কেহ নাই। ইহা দেখিয়া একেবারে তোপ ও বন্দুকের ধ্বনি আরম্ভ হইল, গো ়গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কতকগুলি আহত ও স্বল্প মনুষ্য পতিত হইল। ইহা দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। ক্রমে সৈন্যগণ গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট হইল ... ... সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহারা প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল, তন্মধ্যে কুড়িজনকে গ্রেপ্তার করিলেন। গুমান সিংহকে ধরিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাদের কাহাকেও পাইলেন না। ... ... গোরাদিগের বিকট মূর্তি দেখিয়া চারিজন স্ত্রীলোক কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, দুষ্টগণকে না পাইয়া গুমান সিংহের দুই বধূকে ডুলি করিয়া কাশীতে আনিয়া রাখিল।

গুমান সিংহ এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ স্ত্রীলোকদিগের পিত্রালয় অযোধ্যার রাজধানীর মধ্যে, যথায় মানসিংহের রাজ্য, ঐ রঘুবংশীগণকে সংবাদ করিল। তাহারা শুনিয়া গুমান সিংহকে বহু ধিক্কার দিয়া কহিল, "আপন প্রাণভয়ে পলাইয়া ঘরের বহু বেটিকে বাহির করিয়া দিয়া, এক্ষণে সংবাদ পাঠাইলে, সে অপমানের কি উপায় আছে, তবে যদি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আপন আপন হস্তে প্রাণ বধ কর। যদি এমত বিবেচনা কর যে, যাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিলে ক্লেশ হইবে, এমত স্ত্রীলোক যাহারা আছে, তাহাদিগকে নবাবী রাজ্য মধ্যে পাঠাইয়া দাও, পরে আমরা দুই হাজার বন্দুক সমেত যাইয়া যুদ্ধ করিব।" ডুলিওয়ালা ঐ মত করিয়া স্ত্রী বালক বালিকাগণকে স্থানান্তর করিয়া পূর্বোক্ত সকল গ্রামের মনুষ্য একত্র হইয়া যুদ্ধসজ্জায় রহিল এবং মানসিংহের অধিকারের রঘুবংশীগণের সহিত সংযোগ হইয়া ডুবি হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ আসিয়া রাজেশ্বর নামক স্থানে সকল সৈন্যগণ এক বাগানের আড়ে প্রায় দশ বার হাজার মনুষ্য যুদ্ধসজ্জায় থাকিয়া একজন দূত শিকরোলে সাহেবদিগের নিকট পাঠাইল যে, "আমরা সম্মুখ সংগ্রামের জন্য আসিয়াছে, গবিন্স সাহেবের কর্তব্য আমাদের সহিত আসিয়া যুদ্ধ করে নচেৎ আমরা মঙ্গলবার পর্যন্ত শিকরোল পঁহুছিব। পূর্বাহ্নে সংবাদ করিলাম।"

সাহেবগণ এই সংবাদ পাইয়া সকলে আপন আপন পরিবারগণকে সাবধান করিলেন এবং সকল বাঙালিদিগকে হুকুম দিলেন, 'অদ্যকার কাছারি দপ্তর সকল বন্ধ করিয়া সকলে বাঙালিটোলায় যাও। এই কহিয়া সাঁড়লী সওয়ার এক জনকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঠাইলেন এবং গোরা ও শিখদিগকে যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ হইল। ইহারা সুসজ্জিত হইতে হইতে দূতমুখে সকল জ্ঞাত হইলেন। ইহাতে বিচার হইল যে, গ্রাম্য প্রজাগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিয়াছে। এক তোপ এক শত গোরা (ও) পঞ্চাশ জন শিখ লইয়া গেলেই কর্ম সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু আর তিন শত গোরা (ও) তিন তোপ বরনার পুলে প্রস্তুত থাকে। আর পঞ্চাশ জন গোরা পশ্চাৎ থাকে। এইমত যুক্তি (করিয়া) যুদ্ধে যাত্রা করেন। রণস্থলের নিকটবর্তী হইয়া এক তোপ দাগিল। ওই শব্দে বিপক্ষগণ সতর্ক হইয়া আপন আপন যুদ্ধসজ্জা লইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া বন্দুকের আওয়াজ হইয়া ধূমের দ্বারা অন্ধকার হইয়া কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। সরকার বাহাদুরের শিখ সৈন্যের সেনাপতি রাজা রণজিৎ সিংহের সেনাপতি লহনা সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরতসিংহ ও গোরাদিগের সেনাপতি গবিন্স সাহেব ইহারা অগ্রে ছিলেন, আর সেনাপতিগণ পশ্চাতে ছিলেন। বন্দুকের যুদ্ধ হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে তরবারি চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে দৈবকর্তৃক মেঘারম্ভ হইয়া ঘোরতর বৃষ্টি হইল। ওই বৃষ্টির জলে বিপক্ষ দলের বন্দুকের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ঐ সময় কামানের গোলা দ্বারা বিপক্ষগণকে নিপাতের বাণক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, গাছের আড়ে থাকিয়া গোলরূপ অগ্নিময় বাণ হইতে প্রাণ রক্ষা করিল, পরে গোরাগণ বাগান মধ্যে কামান লইয়া যাইবার এবং ফিরাইয়া চতুর্দিকে তোপ করিবার জন্য কামান চালাইতে মনন করিয়া বয়েল হাঁকাইতে লাগিল, বিধিকৃত এমত বিপদ হইল যে, কামানের গাড়ির চাকা এমত বসিয়া গেল যে, কোনক্রমে বয়েলে টানিতে পারিল না। অনেকমত তদ্বির করিল, কোনক্রমে না চলে না ফিরে। ঐ স্থানে রাখিয়া দুই তিন গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিপক্ষগণ মধ্যে মহাসাহসী এবং মহাবলপরাক্রান্ত কুড়িজন শস্ত্রপানি হইয়া কামানের পার্শ্ববর্তী হইয়া কামানের উপর পড়িয়া রঞ্জক বন্ধ করিয়া কামান ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় ছিল। তাহাতে গোরাগণের সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিয়া বার জন গোরা ও শিখ সৈন্যকে হত করে এবং সুরতসিংহকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ হইতে প্রায় চার পাঁচশত ব্যক্তি শস্ত্রপানি হইয়া মহাবল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। শিখগণকে লইয়া সুরতসিংহ অস্ত্রযুদ্ধে প্রায় ৫০ জনকে হত এবং বহু ব্যক্তিকে আহত করিল। তন্মধ্য হইতে এক বৃদ্ধ এবং এক ষোড়শ বর্ষীয় যুবা শস্ত্রপানি হইয়া ঘোর নাদে বৃদ্ধ গবিন্স সাবেহের প্রতি এবং যুবা সুরতসিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়া বহু যোদ্ধগণের সহিত যুঝিয়া নিকটস্থ হইয়া সাহেবের প্রতি আঘাত করে। এমতকালে বাবু দেবনারায়ণ সাহেবের দক্ষিণ দিক হইতে দেখিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ গবিন্স সাহেবের প্রতি আঘাত করে, সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ শিখ সৈন্যগণ আসিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর সিংহের সহিত অনেক যুঝিয়া তাহাকে রণস্থলে শয়ন করাইল। ষোড়শবর্ষীয় যুবা হেমতসিংহ অনেক সেন্যকে আহত এবং দশ জনকে হত করিয়া সুরতসিংহকে হত করিবার জন্য অস্ত্রক্ষেপ করিয়াছিল। সুরতসিংহ ধনু বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তাহার সওয়ার সাবধান হইয়া প্রাণ রক্ষা করে। অল্প অল্প ছয় স্থানে আঘাত হয়, শেষে যে আঘাত করে, তাহাতে দক্ষিণ পদে অধিক আঘাত হয়।

এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণস্থলে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন গোরাগণ মুহুর্মুহু বন্দুকের বাড় ঝাড়িতেছে। এখানে কামান বিপাকে পড়াতে আর সকল বিপক্ষগণ গোরাদিগের প্রতি আক্রমণের জন্য বাগান হইতে বাহির হইল। ইহা দেখিয়া গবিন্স সাহেব বিবেচনা করিয়া বিউগলে রণশব্দ করিলেন এবং রণবাদ্য বাজিতে লাগিল, পশ্চাতে যে ৫০ জন গোরা ছিল, তাহারা অন্তর অন্তর চারি চারি জনায় থাকবন্দী হইয়া আসিতে লাগিল। দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, বহু সৈন্যের সমাগম হইতেছে। বিপক্ষগণ রণবাদ্য এবং পশ্চাতে রণস্থলে সৈন্য সমাগম ও গোরাদিগের বিক্রম দেখিয়া বাহাদুর সিংহের প্রাণ নষ্ট ও হেমতসিংহ রণমধ্যে ধৃত হওয়াতে সকলে পলায়ন করিল। কমবেশ পাঁচশত মনুষ্য যুদ্ধে হত হইল। বিপক্ষগণের বিপুল আশা নিরাশ করিয়া সকলে আপন আপন শিকরোলের শিবিরে আসিয়া রণশ্রম শান্তি করিলেন। সুরতসিংহ ডাক্তার সাহেবের বাঙলাতে যাইয়া কাটাপদে ঔষধ দিল, তিন দিবস মধ্যে পুনরায় অশ্বারোহণ করিবার ক্ষমতা হইল।

বিপক্ষদলের যাহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দৃঢ়বন্ধনে বন্দিশালে বদ্ধ রাখিলেন।

২২ আষাঢ়, ২৫ জুন

ডুবি নিবাসিগণ পুনর্বার সংবাদ পাঠায় যে 'সাহেবদিগকে কহিবে তাহারা তৈয়ারি থাকেন, আমরা একদিন তাহাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিব। কিন্তু দিনের নির্ধারিত কহে নাই। এই সংবাদে সেনাপতি এবং টগর সাহেব ও গবিন্স সাহেব প্রভৃতি সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়া শিকরোল রক্ষার্থ বরনার পুলের উপর তোপ এবং রাজঘাটে তোপ এবং মাটির যে কেল্লা তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে তোপ এবং গোরাগণের চৌকি রহিল। শহর রক্ষার্থ সরকার বাহাদুরের পুলিশ আর রাজাবাহাদুরের পাঁচশত বন্দুকধারী অশ্বারোহী থানায় রহিল। ইহারা দিবারাত্র নগর ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইমত বন্দোবস্ত বিপক্ষ বিনাশ জন্য করিলেন।

ডুবিতে ধৃত হওয়া কুড়ি জনকে ফাঁসি দিবার জন্য কাছারিতে আনিয়া হেমত সিংহকে কহিলেন যে, "তোমাদিগকে যখন ধরিয়া আনিয়াছি, তখন যে প্রকারে হউক প্রাণ নষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তোমরা সরকার বাহাদুরের তরফ চাকুরি স্বীকার কর তবে তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়।" "আমরা তোমাদের চাকুরিতে স্বীকার নহি, যখন রণস্থলে ধৃত হইয়াছি, তাহাতে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর।"—এই কথা বারংবার উভয় পক্ষের উক্তি হইল। এই মত বাদানুবাদ করিতে করিতে এমত সময়ে কাশীর রাজা সংবাদ পাঠাইলেন যে, "ডুবির রণধৃত ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকিলে ভাল হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছে সকলই রঘুবংশী ক্ষত্রিয়। ইহারা জমিদার এবং আমার অমাত্য।" এই সংবাদে ফাঁসি দেওয়া স্থগিত হইল।

রাজা বাহাদুর ইহাদের ফাঁসি দেওয়া স্থগিত করিয়া উকিলের দ্বারা ডুবিতে গুমানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রঘুবংশী-জমিদারগণকে সংবাদ করিলেন যে, "আমার মানস সকলের সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, রাজার সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কেবল ধনপ্রাণ হানি আর সম্পূর্ণ ক্লেশ ভিন্ন অন্য কিছু মাত্র লাভ নাই। এত ক্লেশ এবং ধন-জন-মান নষ্ট করিয়া ভূপতি হইতে পারিবে না। যে কেহ রাজা হইবে,

তাহার অধীনে থাকিয়া কর দিতে হইবে, স্বাধীন হইবার কদাচ সম্ভাবনা নাই, যদি যুদ্ধে জয়ী হওয়া না যায়, তবে যে কি দুরবস্থা, ঘটিবে, তাহা কহা যায় না। তাহার কারণ রাজা ক্লেশ পাইলে পশ্চাতে সহস্র গুণে ক্লেশদায়ক হয় এবং ক্ষুদ্রাপরাধে প্রাণদণ্ড করে। ইতোমধ্যে কত ... ... ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিয়াছে তাহাও সকলে দেখিতে শুনিতে পাইতেছেন। তথা হইতে হেমত সিংহ প্রভৃতি মহাশূর রঘুবংশী যত ক্ষত্রিয় তাহাদের সহযোগে আছে, তাহার মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত রণপণ্ডিত কুড়িজনকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। ইহাদের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইয়াছিল, এ সংবাদ আমি শুনিয়া বহুযত্নে স্থগিত রাখাইয়াছি। যদি ক্ষান্ত হইয়া উভয়ের মনোমিলন হয়, তাহা হইলে ভাল হয়।" এই কথা তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা কহিয়া পাঠান।

গুমান সিংহ প্রভৃতি প্রত্যুত্তর করিল, "যখন মানহানি হইয়াছে, তখন ধনপ্রাণের ভয় কি আছে? সাহেবদিগের সহিত মিল করিতে হইলে ঘরের বহু বেটি না দিলে হইতে পারে না। আমরা একবার ভাল করিয়া চাক্ষুষ করিব। যাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতেও দুঃখিত নহি। যেহেতু তাহারা ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম তাহা করিয়াছে। রণে ভঙ্গ দেয় নাই, সম্মুখ সংগ্রামে ধৃত হইয়াছে। আর আমাদের ধনসম্পত্তি সকল লুঠ করিয়াছে, আর কি আছে? এক্ষণে জীবৎমান থাকাতে কেবল ক্লেশ ভিন্ন নহে, স্বল্প দোষে লইয়া যাইয়া প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতে ইহলোক পরলোকে দোষ আছে। তদপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ হইলে ক্ষত্রিয় ধর্মমতে মোক্ষপদ পাইব—চিরজীবী কেহ নহে।"

এই মত বহুতর বাদানুবাদ পাঁচ দিবস পর্যন্ত হইয়া শেষে রাজা সাহেবের কথাতে সম্মত হইয়া আপন ক্ষতিপূরণের কথার শেষ হইয়া ২৮ জুন, ২৫ আষাঢ় ডুবিনিবাসী প্রধান প্রধান জমিদারগণ কাশীধামের কামাখ্যা নামক স্থানে, যথায় রাজা ঈশ্বরী নারায়ণের কোষাগার ঐ স্থানে টগর সাহেব এবং গবিন্স সাহেব এবং রাজা বাহাদুর সকলে একত্র হইয়া জমিদারগণকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তোমরা লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না। তোমাদের গৃহাদি দগ্ধ এবং দ্রব্যাদি সৈন্যগণে লুঠ ফেসাদ করিয়াছে, এজন্য তোমাদের মন দুঃখিত হইয়াছে। অতএব তোমাদের তিন বৎসর খাজনা মহকুপ করিয়া দিলাম। কিন্তু তোমরা এই স্বীকার কর যে, কোম্পানি বাহাদুরের বিপক্ষে যে কেহ আসবে তাহাদের সহিত তোমরা যুদ্ধাদি করিবে, তাহাতে সরকার বাহাদুরের সাহায্য হইবে।" এই কথা সকলে স্বীকার করিল।

২৯ জুন রাজা বাহাদুরের কামাখ্যার বাগানবাটীতে উভয় পক্ষে সকলে এক মিল হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। জমিদারদিগকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া পঞ্চাশাবধি এক শত মুদ্রা পর্যন্ত পাগড়ির মূল্য—এমত পঁচিশ পাগড়ি আর দুই শত টাকা প্রতি ব্যক্তিকে পারিতোষিক দেওয়া হইল, জমিদারগণ যথাযোগ্য ব্যক্তি বিশেষে কোলাকুলি, প্রণাম, দণ্ডবৎ ও সেলাম করিয়া শেষে কহিল যে, "যে স্ত্রী লোকদিগকে আনা হইয়াছিল, তাহাদের গতি কি হইল?" তাহাতে সাহেবেরা এবং রাজা কহিলেন, "একথা সকলই মিথ্যা, স্ত্রীগণকে তথায় তল্লাস করগে এখানে আনা হয় নাই।" ইহা শুনিয়া তাহারা গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, দুই জন কূপে পড়িয়া মরিয়াছে, আর দুই জন তাহাদের মাতুলালয়ে লুকাইয়াছিল, তাহার সংবাদ পাইল, এই মাতুলালয়ের সংযোগ রাজা কৌশলে হয়।

১০ জুন ৩০ জ্যৈষ্ঠ,

কানপুরে যে একদল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা বারাণসীর পদাতিকগণের আওহাল শুনিয়া বিবেচনা করিল যে আমাদিগের প্রতিও এইরূপ হইবে, অতএব ইহার বিবেচনা মতে থাকিতে হইবে। এইমত পরামর্শ করিয়া পদাতিকগণ আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া খাজনাখানা (ও) মেগাজিন বেষ্টিত হইয়া রহিল।

নানাসাহেব : বেনারস হইতে যে পদাতিক ও অশ্বারোহীগণ বেদিল হইয়া তোপের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যায় এবং এলাহাবাদের পদাতিকগণ আর এলাহাবাদ হইতে মৌলবি সাহেবের সৈন্য সহিত যাইয়া সকলে একত্র হইয়া বিঠুরে উপস্থিত হইল। পুনানিবাসী বাজিরাও সাহেব পুনা সেতারার রাজা ছিলেন, যাঁহার নব লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, এতদ্ভিন্ন পদাতিকগণ যাঁহার ভ্রাতা রাজা অমৃতরাও। ইহারা পূর্বে দিল্লির সিংহাসনাদি দখল করিয়াছিল, পানিপথ (ও) শোনপথের যুদ্ধে জয়ী হইয়া কুরুক্ষেত্রাদি যে পঞ্জাব সতলজ নদীর পূর্বপার, ইহাও অধিকার করিয়া অনেক রাজধানী লুঠ করিয়া লইয়াছিল। সরকার কোম্পানি বাহাদুর ঐ বাজিরাও সাহেবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহাকে সপরিবারে বিঠুরে বন্দির ন্যায় রাখিয়াছিলেন। ঐ বাজিরাও সাহেবের পোষ্যপুত্র নানাসাহেবের ধনসম্পত্তি লুঠিবার মানসে সৈন্যগণ আইসে। নানাসাহেবের নিজ রক্ষক এক হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী দক্ষিণে ছিল। বিগড়া সৈন্যগণের সহিত এগার তোপ ছিল, নানাসাহেবের দশ বার তোপ ছিল। সিপাহিদিগের আগমন সংবাদ শুনিয়া নানাসাহেব আপন সৈন্য সুসজ্জিভূত করিয়া তোপের মুরচা বান্ধিয়া রহিল।

নানাসাহেব একজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল, "সিপাহিগণের কি মতলবে আসা হইয়াছে? যদি আমার দ্রব্যাদি লুঠ জন্য আসিয়া থাকে, তবে আমি সহজে লুঠিতে দিব না। আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখিব, পশ্চাৎ যাহা হয় হইবে।"

সিপাহিগণ এই কথা শুনিয়া কহিল, "আমাদের রসদ নাই এবং মালিক কেহ নাই। যদি আমাদিগকে রসদ দিয়া সাহায্য করেন, তবে আমরা কোম্পানির সহিত যুদ্ধ করিয়া সকল রাজ্য দখল করাইয়া দিব।" তাহাতে নানাসাহেব কহিলেন, "আমার নিকট অধিক ধন নাই, নগদ চৌদ্দো লক্ষ টাকা আছে। ইহাতে কি প্রকার যুদ্ধ হইতে পারে?" তাহাতে সৈন্যগণ কহিল, "ইহাতেই হইবে, তোমাকে মালিক করিয়া আমরা যুদ্ধ করিয়া লুঠিয়া লইব।" এই কথা হইয়া ১১ জুন রাত্রিতে কানপুর শহরে প্রবেশ করিয়া প্রথমত সাহেবদিগের বাঙ্‌লাতে প্রবিষ্ট হইয়া, সাহেবদিগকে হত করিয়া দ্রব্যাদি লুঠ করিল এবং বাঙ্‌লাতে অগ্নি দিল। এইমত উপদ্রব শুরু করাতে আর স্থানে স্থানে যে, সমস্ত সাহেব-বিবি এবং তাহাদের বালক বালিকাগণ আর যে দুই শত গোরা ছিল, ইহারা পলাইয়া মৃত্তিকানির্মিত এক গড় করিয়া রাখিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বারে তোপ রাখিয়া রহিল। পদাতিকগণ দেখিল, অন্য ব্যক্তি আসিয়া সকল হত করিয়া লুঠ করে, দেশীয় পদাতিকগণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন নানাসাহেব শহরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাজনগণের কুঠি লুঠিতেছে। ইহাতে কম-বেশ দশ লক্ষ টাকা লুঠিয়াছে। শিখ-পদাতিকগণ পুরাদল ছিল না, পাঁচ শত ছিল। ইহারা দেখিল, বিপক্ষগণ দস্যুর ন্যায় আসিয়া লুঠ ফসাদ করিতেছিল। তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষে প্রায় দুই তিন শত হত হইল, শিখ একশত হত হয়। এই অবসরে গোরাগণ মেগাজিন আর খাজনা যে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত

ছিল, তাহা ওই গড় মধ্যে আনিল। জজ মাজিস্টর কালেক্টর প্রভৃতি সাহেবগণকে হত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া সকল দখল করিয়া লইল। শিখগণ ওই মৃত্তিকার গড়ের নিকট আসিয়া দ্বার রক্ষা করিয়া রহিল। দেশীয় পদাতিক যাহারা ছিল, তাহারা নানা সাহেবের সহিত মিলিয়া গেল। কানপুর হইতে বিঠুর পর্যন্ত যত জমিদার ক্ষত্রিয়গণ ও আর আর প্রজাগণ (ছিল) সকলেই নানা সাহেবের পক্ষ হইয়া পথ ঘাট গ্রাম সকল লুঠিতে লাগিল। শহরের থানা ইত্যাদি যত আমলদারি ছিল, সকল উঠাইয়া দিয়া আপনাদের আমল দখল জারি করিল। পূর্বে ফতেপুর পর্যন্ত পশ্চিমে লাগাইদ দিল্লি সকলই বেদখল। ইহার মধ্যে যে যতদূর আমল করিতে পারিয়াছে, কানপুরে সিপাহিগণের আর নানাসাহেবের দোহাই ফিরিতেছে। যদি কেহ কোম্পানি বাহাদুরের দোহাই দেয়. তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ। এই মত প্রবল প্রতাপ করিয়া কেবল মার মার কাট কাট এই শব্দ সর্বত্র, সাহেব ও বাঙালিদিগকে দেখিতে পাইলেই অধিক আক্রমণ। সাহেবেরা সপরিবারে গড়ের মধ্যে ও বাঙালি সকলে নানা স্থানে গুপ্তভাবে আছে। যাহাদের পরিবার সঙ্গে, তাহাদের অতিশয় ক্লেশ। দ্রব্যাদি সকলই লুঠিয়া লইয়াছে জলপাত্র ভোজন পাত্র রহিত, আহার বিনা প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক বাঙালি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী অবধূত খাকির বেশ ধারণ। কেহ বা পাগলের বেশ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। যাহাদের কিছু অর্থ ছিল, তাহা কোন প্রকারে গোপন করিয়া কেহ চোঙার ভিতরে রাখিয়া তাহার দুই মুখ অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহার মধ্যস্থলে টাকা মোহর রাখিয়া তাহার ভিতরে তামাক পুরিয়া নানা ছলা কলা দ্বারা দস্যুদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কাশীতে পৌছে।

কানপুরে গড় মধ্যে যে সমস্ত সাহেব বিবি গোরা শিখ ইত্যাদি ছিল, তাহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য বিপক্ষ পদাতিকগণ ব্যূহের নিকটস্থ হইয়া ব্যূহ বিদীর্ণ করিবার তদ্বির করিতেছিল। এমত কালে একজন শিখ দেখিতে পাইয়া সাহেবদিগকে সংবাদ করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র সকলে, রণসজ্জা করিয়া ব্যূহ দ্বারে আসিয়া দেখিল যে, বিপক্ষের বহু সৈন্য বেষ্টিত করিয়াছে, আর প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই, যাহা হউক ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। এই কহিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের গুলির শব্দে অন্য মনুষ্যের কর্নে তালা লাগিল, ঘোর যুদ্ধে গুলি গোলা তরোয়ালের হন হন সনসনানিতে শহরের দোকান ইত্যাদি হাটবাজার বন্ধ হয়। দুই প্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষের অনেক মনুষ্য হত হইল। এই মত তিন দিবস পর্যন্ত সাহেবগণ যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের পনের ষোল শত ব্যক্তি হত করিল। কিন্তু গোলাগুলি বারুদ এবং আহারাদির দ্রব্য কিছুই রহিল না। রণশ্রম তাহাতে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত, ইহাতে বলবুদ্ধি কিছু রহিল না। অনেকে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, বিপক্ষগণ চতুর্দিকে সাহেবদিগের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। যে যেখানে ইংরাজ সম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষ পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিতেছে। এমতে কত শত বধ করিয়াছে, ... সিপাহিগণ নির্দয় রূপ ধারণ করিয়া বিবি এবং বালক-বালিকাগণের বিকৃত রূপে প্রাণ নাশ করিয়াছে, তাহা দেখিলে অতি পাষণ্ডরও মোহ জন্মে। সকল হত হইয়া ব্যূহ মধ্যে (কেবল) পঞ্চাশ জন স্ত্রী, বালক-বালিকা এবং আহত সাহেব জীবিত ছিল।

একজন কাপ্তেন এই উপদ্রবকালে উপস্থিত হইল, সেই ব্যক্তি আপনার থাকিবার আবাসের সোপান ভগ্ন করিয়া তদুপরি রহিলেন। তাহার নিকট এক উত্তম পিস্তল আর

গুলি বারুদ ছিল। কাপ্তেন সাহেব ঐ ঘরের উপর হইতে একলা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার গুলির আঘাতে প্রতি দিবস দুইশত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইত। এই মত তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া নানা সাহেবের সৈন্য হত করেন। তিন দিবসের পর গুলি বারুদ কিছু ছিল না। চতুর্থ দিবস গৃহ মধ্যে যত বোতল ও শিশি এবং বেলওয়ারি ঝাড় লণ্ঠন গেলাস ইত্যাদি ছিল, তাহা নিক্ষেপ করিয়া শত ব্যক্তির অধিককে আঘাত করেন। এই মত চতুর্থ দিন পর্যন্ত একাকী যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র হইয়া দেখিলেন যে, আর প্রাণের আশা নাই। তখন ঘরের ভিতর হইতে বাহির বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "হে যোদ্ধৃগণ। আমি এক্ষণে নিরস্ত্র হইয়াছি। তোমাদের সহিত কিসে যুদ্ধ করিব? দেখ, আমার গুলি বারুদের তৃণ শূন্য হইয়াছে। চার দিবস অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছি। তাহাতেও রণশ্রম হয় নাই। এখনও গুলি বারুদ পাইলে সপ্তাহ পর্যন্ত দিবারাত্র সমান যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব যদি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা থাকে তবে রাজনীত্যনুসারে অস্ত্রাদি দাও, নচেৎ আমি এই বাহিরে দাঁড়াইলাম, যাহা ইচ্ছা হয় কর।" এই কথা শুনিয়া সিপাহিগণ শত শত গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে প্রাণ বধ করিতে পারিল না। কাপ্তেন সাহেব কহিলেন, "এমত হাজার ব্যক্তি গুলি নিক্ষেপ করিলে কিছু হইবে না। তবে যে কেহ আমার ললাট লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে মরিব।" ওই সময় কানপুরের একজন রঘুবংশী ক্ষত্রিয় জমিদারের গুলিতে কাপ্তেন সাহেবের প্রাণ বিয়োগ হইল। ঐ জমিদার সাহেবের হস্তের পিস্তল পাইল।

এই মত মহাবল পরাক্রান্ত সেনাপতিগণ স্থানে স্থানে হত হইলেন। সিপাহিগণ নানাসাহেবকে রাজা করিয়া কানপুরের নিকটবর্তী সকল দেশে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে এমত শাসন করিল যে, পথিক ব্যক্তির কি প্রজাবর্গের যে কেহ দ্রব্যাদি হরণ কি দৈহিক দুঃখদায়ক হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ হইবে, স্বল্প দোষী হইলে হস্ত পদ ছেদন করা যাইবে। এই মত শাসন করিয়া পথিকগণের পথ কষ্ট দূর করিয়াছিল। যে কেহ দস্যুবৃত্তি করিয়া ক্লেশদায়ক হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি উপরোক্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

এই মত রাজ্যাধিকারী হইয়া মৌলবি সাহেব প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণাতে রাজ্য শাসন করেন। এক মাস গত হইলে পর কানপুরের গড় মধ্যে যে কেহ আহত সাহেব ও বিবি ইত্যাদি ছিল, তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে, "আর আমাদের প্রাণ রক্ষার উপায় নাই, এক্ষণে বিপক্ষের শরণাগত হইয়া প্রাণ লইয়া কলিকাতা গমন করিতে পারিলে ভাল হয়। শরণাগত হইলে কেহ প্রাণ নষ্ট করে না" এই বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে একজন অতি প্রাচীন বিবি ছিলেন, তাহার সহিত দশজন শিখ পদাতিক দিয়া নানাসাহেবের নিকট পাঠাইলেন। ওই বৃদ্ধা স্ত্রী কহিল যে, "আমরা নিরস্ত্র হইয়া যুদ্ধে হার মানিয়া তোমার জয় বলিয়া নিকটস্থ হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা কর। আমরা আহার বিহনে মারা যাইতেছি। আমাদের নিকট তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত আছে। আমাদের যে কেহ এ স্থানে জীবিত আছে, সকলে কলিকাতা পঁহুছিতে পারি, এই আন্দাজ খরচের টাকা দিয়া, বাকি টাকা তুমি লহ। আমরা বালক-বালিকা আর স্ত্রীগণ এবং আহত সাহেবদিগকে লইয়া গমন করি। প্রাণের প্রতি আঘাত না হয়।" বৃদ্ধা বিবি এই মত বহুতর বিনয় বাক্যে স্তবস্তুতি করাতে নানা সাহেব সম্মত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকাদি করিয়া সকলে এদেশ হইতে গমন কর, তোমাদের প্রাণ নষ্ট হইবে না।" এই কথা

শুনিয়া ওই প্রাচীনা ব্যূহ মধ্যে আসিয়া সকলকে কহিয়া তিনখানি নৌকা ভাড়া করিয়া একখানিতে আহত ব্যক্তিগণ, দুই নৌকাতে আর বিবি ও মিস্ বাবা ইত্যাদি যাহারা জীবিত ছিল এবং বারজন সাহেব ইহারা আপন আপন পরিধান বস্ত্র ও ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকারোহণ করিল। অস্ত্রাদি দ্রব্যাদি ও তিন লক্ষ টাকা ব্যূহ মধ্যে রহিল, তাহা নানাসাহেবের লোকে লইয়া গেল। সাহেবদিগের নৌকার মধ্যে আহতদিগের নৌকা অগ্রে খুলিয়া আসিতে ছিল, বাকি দুইখানি পশ্চাতে খুলিয়া কিছু দূর আসাতে সিপাহিগণ শুনিল যে, কানপুরের গড় মধ্যে যে সমস্ত সাহেবগণ ছিল, তাহারা স্ত্রী পুরুষ সহিত নানাসাহেবকে খাজনার বেবাক টাকা ও সকল দ্রব্যাদি দিয়া তাহার অনুমতিক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। এই বাক্য শুনিবামাত্র সিপাহিগণ দ্রুতগতি গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিল, দুইখানা নৌকাতে সাহেবদিগের পরিবার সমেত যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুকের অগ্নি দ্বারা নৌকা জ্বালাইয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তথায় গঙ্গার জল অল্পই ছিল সকলে অগ্নি-দগ্ধ গোলা-গুলির ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নির্দয় নিষ্ঠুর সিপাহিগণের হস্তে কাহারও প্রাণ রহিল না। স্ত্রী ও বালক বালিকাগণ প্রাণভয়ে ডুবিলে গুলি নিক্ষেপ করে, নিকটে আসিলে তরোয়ালে নিধন করে। এই মত দুই নৌকার সকলকে নিধন করিয়া, অগ্রে যে নৌকা গিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া তাহার আহত ব্যক্তিদিগকে নানা সাহেবের সম্মুখে আনিল। তাহাতে নানা হুকুম দিলেন, "যাহাদের যুদ্ধের ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে তোপের সম্মুখে দেহ, যাহারা অক্ষম তাহাদিগকে তরবারিতে বিনাশ কর।" এই হুকুম পাইয়া নির্দয় সিপাহিগণ সাহেবকুল সকল দক্ষিণ মশানে বিনাশ করিল। দেখ কি অবিচার! যাহাদিগকে অভয় দিয়া বিদায় করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিল। এই সকল বধ করিয়া বাঙালিদিগের প্রাণ নষ্টের জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। বাঙালিদিগকে ধরিবার জন্য সর্বত্র দূত প্রেরণ করিল। ইহারা অতি সুচতুর, নানা বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়া রহিল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের কর্মকারক শ্রীযুত করুণাময় ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া নানাসাহেবের সম্মুখে আনিল। নানা বাঙালি দেখিবামাত্র রাগান্বিত হইয়া হুকুম দিলেন যে, "ইহার প্রাণনাশ কর।" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্যের দেহ হইতে প্রাণত্যাগের ন্যায় হইল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া নানাকে নানামত স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। "হে পৃথ্বীনাথ! তোমার পূর্ব পুরুষগণ বহু পুণ্য করিয়া ব্রহ্মস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়াছেন। সকল তীর্থে কীর্তি করিয়াছেন। অদ্যাবধি কীর্তি সকল সজীব আছে অতএব আমি দীন হীন ব্রাহ্মণ, উদর পোষণ (ও) পরিবারের জীবন রক্ষার জন্য সওদাগর সাহেবের কর্ম করিতেছি, রাজ্যাধিকারীর চাকর নহি। তবে আমার প্রাণ বধ করিয়া কি জন্য ব্রহ্মহত্যা জন্য পাতক লইবেন!" এই মত স্তুতিবাদ করাতে এবং মন্ত্রিগণ দয়া প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মবধ নিবারণ করাতে ভট্টাচার্য নির্দয় নিষ্ঠুরের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

কানপুর নানার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ : এখানে এলাহাবাদ জয় করিয়া সেনাপতি হেভলক সাহেব ও নীল সাহেব দুই জন সেনাপতি আপন আপন পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া কানপুর যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া দেখিলেন, পথিমধ্যে দস্যুগণ কণ্টক স্বরূপ হইয়া অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে। ঐ পথ নিষ্কণ্টকেব প্রথমোদ্যোগ। যে সমস্ত জমিদারগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় দস্যুবৃত্তি করিতেছিল তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ফাঁসি দেওয়া, এই

মত করিতে করিতে ফতেপুর পৌঁছিলেন। তথায় বহু বিপক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ছিল। সরকার বাহাদুরের সৈন্য পৌঁছিলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষগণের সঙ্গে দশ তোপ এবং পনের হাজার পদাতিকগণ বন্দুক তরোয়ালের যোজক সরকার বাহাদুরের চারি হাজার গোরাসৈন্য, এক হাজার শিখ সৈন্য—এই পাঁচ হাজার সৈন্য সেনাপতিগণ লইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত আছে। তোপের গোলা মুহর্মুহ ক্ষেপণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপণ, বিপক্ষে আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিছু ত্রুটি করিল না, যে পর্যন্ত তি...গজের বাহিরে সরকার বাহাদুরের ব্রিটিশ সৈন্যগণ ছিল, সে পর্যন্ত কিছু গোলাগুলি নিক্ষেপ করেন না, ভিতর প্রবেশ হইবামাত্র যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ মুহর্মুহ গোলাগুলি নিক্ষেপে রণভূমি ধূমে অন্ধকার করিয়া বিপক্ষের কমবেশি দুই হাজার সৈন্য হত করিল। ইহাদের দুই শত একুশ জন হত হইল। বিপক্ষদল গ্রামে পলায়ন করিবার উপক্রম দেখিয়া গোরাগণ ধাওয়া করিয়া দশ তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণ ফতেপুর হইতে পিছে হটিল। হেভলক সাহেব ফতেপুরের যুদ্ধ ফতে করিয়া তথাকার বদমায়েশদিগকে শাসন করিয়া অগ্রে যাইবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কানপুর হইতে করুণাময় ভট্টাচার্য কাশী আসিতেছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভট্টাচার্য প্রমুখাৎ কানপুরের দুরবস্থা সকল জ্ঞাত হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "যদি ইহার শোধ তুলিয়া নানাকে নানী বানাইতে পারি, তবে আমার সেনাপতি কর্মের সফলতা হইবে।" ভট্টাচার্য কহিলেন, "যদি কানপুর যাত্রা করিতে হয়; তাহার বিলম্ব করিবেন না। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, বিপক্ষগণ ... ... নদীর পুল ভাঙিয়া দিবার উদ্যোগে আছে। প্রায় বিশ হাজার মনুষ্য একত্র হইয়াছে। সেনাপতি হেভলক ভট্টাচার্যের বাচনিক সমস্ত শুনিয়া কানপুর গমনের তদ্বির করিলেন। পথিমধ্যে যে সমস্ত কণ্টক ছিল, তাহা নিষ্কণ্টক করিতে করিতে পুলের পূর্ব পারে সসৈন্য উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ মহাকোলাহলে পশ্চিম পারে মুরচা বান্ধিয়াছে। পুল ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া অবিলম্বে গোলা নিক্ষেপের হুকুম দিলেন ব্রিটিশ সৈন্যগণ শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং রণবাদ্যে রণোন্মত্ত হইয়া দিকবিদিক জ্ঞান রহিল না। ইহা বিপক্ষগণ দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ পুল পার হইয়া ছাউনি করিয়া কানপুর যাত্রা করিল। ব্রিটিশ সৈন্যদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানাসাহেব সসৈন্য কানপুর হইতে পলায়ন করিয়া বিঠুরের নিকটে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে যুদ্ধের মুরচা বান্ধিয়াছিল। ব্রিটিশ্র সৈন্যগণ এগার ক্রোশ ধাওয়া করিয়া কানপুর যাইয়া নানাকে না পাইয়া বিঠুর অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণকে বিপক্ষগণ দেখিয়া, ঘোর নাদে রণভূমিতে বাদ্যধ্বনি করিয়া সুসজ্জিভূত হইয়া রণোন্মাদে মত্ত হইয়া কামান ও বন্দুক দ্বারা গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ত্রাসিত না হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পঙ্কজ দল দলন করিতে রঙ্গভূমে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিল যে, ... গজের মধ্যে সৈন্যগণ এবং বিপক্ষ দল সমূহ আছে, তখন হেভলক ও নীল সাহেব দুই জন সেনাপতি আপন আপন সৈন্যদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষের অগ্নিময় অস্ত্রাঘাতে বহু সৈন্য নিপাত হইল। বিপক্ষগণের অশ্বারোহী অস্ত্রধারী এক সহস্র সৈন্য ছিল, ইহারা ব্যূহ ভঙ্গ জন্য অনেক তদ্বির করিয়া ব্যূহের পার্শ্ববর্তী হইয়া অস্ত্রক্ষেপণ করিয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ রণপণ্ডিত কদাচিৎ বিপক্ষ

অশ্বারোহীদিগকে ব্যূহ প্রবেশ করিতে না দিয়া বহু সৈন্য আহত ও হত করিল। ইহাতে অশ্বারোহীগণ পশ্চাদগামী হইয়া পলায়ন করিল। সেনাপতিগণ দেখিলেন যে, বিপক্ষ নানাসাহেবের সৈন্যগণ মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যগণ তিষ্ঠিতে পারে না। সম্মুখে ধাওয়া করিলে তোপের মুখে বহু সৈন্য হত হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া বিপক্ষ দলের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া হেভলক সাহেবের পদাতিকগণ ধাওয়া করিয়া বিপক্ষের বহু সেনা হত করাতে বিপক্ষগণ পলাইবার পথানুসরণ করাতে নীলসাহেবের দল পদাতিকগণ অগ্রগামী হইয়া গোলাগুলি নিক্ষেপে বিপক্ষ দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া এগারটা তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণের স্বল্প সৈন্য যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা ও নানাসাহেব প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন কবিল। সরকার বাহাদুরের অশ্বারোহী সৈন্য তৎস্থানে ছিল না, এজন্য ধাওয়া করিয়া ধরিতে পারিল না। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের ঐ দিবস কত ক্লেশ হইয়াছে, তাহা করিতে পারা যায় না। আঠার ক্রোশ পথ গমন, তাহাতে অতিশয় জল-কাদা হেতু পথের দুরধিগমতা, মধ্যে মধ্যে কণ্টক বন জঙ্গল দেড়-হাত দুই-হাত ভাঙিতে হইয়াছে। এইরূপে কষ্টকর যুদ্ধ করা হইয়াছিল। এত পরিশ্রমে যুদ্ধে জয়ী হইল, শান্তি হইল। ঐ রাত্র সৈন্যগণ নিরাহারে রণস্থলে রহিল, সদা চমকিত, কি জানি যদি বিপক্ষগণ গোপন পথে আসিয়া আঘাত করে। এজন্য সতর্ক হইয়া রহিল। পর দিবস বিঠুর যাত্রা করিল। তথায় সকল শূন্যাগার, কাহাকেও পাইল না। শহর মধ্যে চারিজন দোকানদার ছিল এই মাত্র। ইহা দেখিয়া নানা সাহেবের বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু অর্থ সম্পত্তি ছিল, সকল কোষাগার ... করিল এবং ... ... লইয়া সরকারের খাজনা খানায় আনিল। নানা সাহেব জলমগ্ন হইয়াছে—এই সংবাদ সর্বত্র প্রচার হইল। বিঠুর শহর শাসন করিয়া ব্রিটিশ সেনাগণ কানপুর যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শুনিলেন। কানপুরে প্রজামাত্র নাই, সকলেই বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিয়াছে। ইহা শুনিয়া সেনাপতি হেভলক সাহেব আপন সৈন্যগণ লইয়া কানপুর শহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শহরের অনেক প্রজা পলায়ন করিয়াছে। মহাজনগণ দোকান বন্ধ করিয়াছে। শহর মধ্যে ছয় জন দোকানদার ছিল, তাহারা সেনাপতি সাহেবকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া আসিয়া কহিল, "এতদিনে আমাদের ধন প্রাণ রক্ষা পাইবে, এমত উপায় পরমেশ্বর করিলেন।" ইহা কহিয়া বারংবার সেলাম দিতে লাগিল।

হেভলক সাহেব তাহাদিগকে ভরসা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বল দেখি কোন স্থানে সাহেব, বিবি, মিস ও বাবাদিগকে দুরাচার বিদ্রোহিগণ হত করিয়াছে? সে স্থান কোন স্থানে আমাকে দেখাইতে পার?" তাহারা কহিল, "এই সে সকল স্থান দেখ আসিয়া।" হেভলক সাহেব মশান-স্থান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে লাগিলেন, "যদি এই দুরাচার গণকে যুদ্ধে ধৃত কিংবা বধ করিয়া যাইতে পারি, তবেই এ মহৎ দুঃখের কিঞ্চিৎ নিবারণ হইবে।" এই কথা কহিয়া তিনি কানপুরে অবস্থিতি করিলেন।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[হুগলি জেলায় ছিল আদিবাড়ি। কর্মজীবনের শুরু থেকেই ইংরেজ কোম্পানির সেনাবিভাগে করণিকের কাজ করে, সেনাকর্তাদের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন। সিপাহি অভ্যুত্থানের সময় একজন সৈনিক হিসাবে তিনি কৃতিত্ব দেখান। প্রাপ্য পুরস্কারও লাভ করেছিলেন এবং শাস্তি ভোগও করেন। শেষ জীবনে ছিলেন এলাহাবাদ প্রবাসী। দুর্গাদাস তার বৈচিত্র্যময় জীবন কথা লেখেন 'জন্মভূমি' পত্রিকায়। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় থেকে। পরবর্তীকালে গ্রন্থটির দুটি সংস্করণও হয়েছে। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ এখানে মুদ্রিত হল।]

সিপাহি বিদ্রোহে কয়েকদিন

কিছুদিন পরে অন্য একজন গুপ্তচর বেরিলী হইতে প্রত্যাগত হইল। তাহার নিকট এইরূপ সংবাদ অবগত হইলাম;—নবাব খাঁ বাহাদুর প্রায় বিশ হাজার সেনা একত্র করিয়াছেন! ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক সৈন্য সুশিক্ষিত। নানাদিক হইতে বিদ্রোহী সিপাহি আসিয়া তাহার দলে যোগদান করিয়াছে। নবাব আরও সৈন্যবৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন; কিন্তু ধনাগার শূন্য বলিয়া, তাহার সৈন্যবৃদ্ধির আশা ফলবতী হইতেছে না। তিনি নাইনিতাল আক্রমণের জন্য প্রায় দশ হাজার সেনা পাঠাইয়াছেন। তিনি প্রকাশ্য রাজদরবারে সর্বসমক্ষে প্রায়ই বলিয়া থাকেন, নাইনিতালস্থ ইংরেজসমূহকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে আমার নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার আশা কিছুমাত্র নাই।

বারওয়েল সাহেব জিজ্ঞাসিলেন,—"হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব কেমন?"

গোয়েন্দা বলিতে আরম্ভ করিল;—"শহরে হিন্দুর দুরবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়। গো-রক্তে হিন্দুর মন্দির রঞ্জিত হইতে দেখিয়াছি। যদি কোন হিন্দু ইহার প্রতিবাদ করিতে যায়, তাহা হইলে মুসলমানের তরবারির প্রহারে সে তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত হয়। সাধারণত তিলক কাটিয়া বা গলায় মালা দিয়া, কোন হিন্দু একাকী পথ চলিতে সাহস করে না! দল বাঁধিয়া হিন্দুগণ রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ইদানীং কোনও হিন্দু স্ত্রী, কি পাল্কীতে, কি গাড়ীতে, বাটীর বাহির আর হন না। বিশেষ, গোঁসাই বলদেব গীরের হত্যাকাণ্ডের পর মুসলমানগণের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। যে মুসলমান বিচারক গোঁসাই বলদেব গীরকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি প্রদান করেন, সেই মুসলমান বিচারকই কেবল এ মুক্তি-প্রদান-হেতু পদচ্যুত হইল দেখিয়া মুসলমান-গুন্ডাগণের মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রম বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভীষণাকার গুন্ডাগণ বুক ফুলাইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে, লইয়া, বিশাল রক্তচক্ষু, বিস্ফারিত করত সদাই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। নিশাকালে অধিকাংশ রাজপথেই আলোক দেওয়া হয় না। ঘোর অন্ধকারে নিশাচর গুন্ডাগণের শয়তানি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তখন ছুরি, ছোরা, তরবারি, লাঠি প্রভৃতির খেলা অনবরত চলিতে থাকে। হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ হাসি,—বিকট হুহুঙ্কার রব,

দ্রুতগমন, পতন, বা অভ্যুত্থানের দুপ্ দুপ্ হুড় হুড় ধুপ্-ধাপ শব্দ—এই সমস্ত ব্যাপারে তিমিরাবৃতা রজনী সদাই পরিপূর্ণা। নারীরূপিণী রাক্ষসীরও অভাব নাই। ইহারা আরও ভীষণ। অতীব উন্মত্তা, এবং লজ্জা-ভূষণ-বিবর্জিতা। বলিলে বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না,—ইহাদের মধ্যে কেহ উলঙ্গিনী, পূর্ণ-দিগম্বরী, মায়াবিনী, কামচারিণী! অন্ধকারে প্রকাশ্য রাজপথে পরপুরুষকে আলিঙ্গনদানে উদ্যতা। শ্রবণ-পথ রুদ্ধ করুন, নয়ন মুদিত করুন! এ পৈশাচিক প্রক্রিয়ার কথা কেহ শুনিবেন না, কেহ দেখিবেন না। গুন্ডাগণের এই সকল রমণী লইয়া রজনীযোগে পথে পথে রঙ্গ-ভঙ্গ হইয়া থাকে।

পূর্বে ইংরেজ-রাজত্বকালে, যে স্থলে কস্মিনকালে গোহত্যা হইত না, এক্ষণে দিবসে সর্বজন-সমীপে, মহা সমারোহে, বাদ্য-বাজনার সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গোহত্যা হইয়া থাকে। কখন জীবন্ত বা অর্ধমৃত গরুর ছাল খুলিয়া, তক্তনামায় বিবাহার্থ বরকে যেরূপভাবে লইয়া যায়, সেইরূপভাবে সেই মুক্ত-ত্বক গোকে লইয়া মুসলমানগণ পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।"

আমি কানে হাত দিয়া বলিলাম,"—আর না,—তোমার অন্য কিছু বলিবার থাকে ত বল।"

বারওয়েল সাহেব কহিলেন,—"আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই, নবাব খাঁ বাহাদুর এ সব অত্যাচার অনুমোদন করিতেছেন কি? দেওয়ান শোভারাম শুনিয়াছি, একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু; এবং তাঁহার ক্ষমতাও অতুল, তিনিই বা কেন নীরব আছেন? কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না কেন? এ সকল বিষয়ের যদি কোন সন্ধান আনিয়া থাক, তবে তাহা আমাদিগকে বল?"

গোয়েন্দা। শুনুন, বলি—"নবাব খাঁ বাহাদুরের অধিকাংশ সৈন্যই মুসলমান। তিনি মুসলমান পাইলে, হিন্দুকে সেনাদলে ভর্তি করিতে চাহেন না। তবে উপযুক্ত শিক্ষিত, বলবান হিন্দু সেনাকেও তিনি উপেক্ষা করেন না; কারণ তিনি জানেন হিন্দুসৈন্য বড়ই বিশ্বাসী এবং কর্তব্যপরায়ণ। এইরূপে এক চতুর্থাংশ হিন্দু সেনা, নবাবের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রথম প্রথম হিন্দু সেনা আসিলে মুসলমান রেজিমেন্টেই ভর্তি করা হইত। কিন্তু হিন্দুগণ মুসলমান দলে থাকিতে ভালবাসিত না: তাহাদের আহারে, রন্ধনের অসুবিধা হইত। পাঁচশত মুসলমানের মধ্যে একশত মাত্র হিন্দু কেমন করিয়া তিষ্ঠিবে? হিন্দু সেনাগণ নবাবের নিকট দরখাস্ত করে যে, আমরা মুসলমানদলে থাকিতে পারিব না; হিন্দুর স্বতন্ত্র রেজিমেন্ট গঠিত হউক। প্রথমে নবাব এ কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। নবাবের ঔদাস্য দেখিয়া, অনেক হিন্দুসেনা চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন নবাবের চৈতন্য হইল। দেওয়ান শোভারামের পরামর্শে হিন্দু সেনার স্বতন্ত্রদল সংগঠিত হইল। একদিন একদল হিন্দুসেনা বেরিলী শহরের মধ্যে দিয়া মাঠে ছাউনি অভিমুখে যাইতেছে; কয়েকজন দুর্বৃত্ত মুসলমান একজন ভদ্রহিন্দুর গৃহে গোমুণ্ড ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে। তখন সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে। একজন বৃদ্ধ হিন্দু দ্বিতল গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে যোড়হাতে তাহাদিগকে এ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন; কিন্তু পাষণ্ডগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না; বরং অট্ট অট্ট হাসিয়া, বৃদ্ধকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে। বৃদ্ধ বলিতেছেন, "তোমাদের কাছে আমি কি দোষ করিয়াছি যে, তোমরা

আমার উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?" বাস্তবিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃদ্ধ উহাদের নিকট কোনও দোষে দোষী নহেন। শেষে জানিতে পারিলাম, বৃদ্ধের পুত্রের সহিত শহরের একব্যক্তির মতান্তর ছিল। ইংরেজের রাজত্বকালে জমি জায়গা লইয়া সেই পুত্রের সহিত মোকদ্দমাও হইয়াছিল। মোকদ্দমায় পুত্র জয়লাভ করে। এক্ষণে সেই মুসলমান—বৃদ্ধকে এবং তাহার পুত্রকে জব্দ করিবার মানসে গুন্ডাদ্বারা গোমুণ্ড বৃদ্ধের বাটীতে ফেলাইতেছে। গুন্ডাগণ সুরাপানে উন্মত্ত এবং অসুর-অবতার। দেখিতে দেখিতে একজন গুন্ডা বৃদ্ধের ছাদে একটা গোমুণ্ড ফেলিল, আর মুখে বলিতে লাগিল, "আর দুইটি যে গোমুণ্ড আছে, তন্মধ্যে একটি তোর জন্য অপরটি তোর ছেলের জন্য।" যখন এইরূপ বাকবিতণ্ডা চলিতেছে, তখন ঐ হিন্দু সেনাদল সেইস্থানে সমুপস্থিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ এই সুযোগ পাইয়া করুণস্বরে, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ হিন্দুর ধর্মকর্ম সমস্তই রহিত হইল। এদেশে হিন্দুর বাঁচিয়া থাকা বৃথা। হিন্দুর মৃত্যুই মঙ্গল। এদেশে কি এমন কোন হিন্দু নাই, বীর্যবান, জ্ঞানবান, স্বধর্মপরায়ণ হিন্দু নাই, যিনি আজ এই ঘোর বিপদে পতিত এই হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করিতে পারিব না?"

নিম্ন হইতে সেই হিন্দু সৈন্যদল উত্তর দিল,—"ভয় নাই, ভয় নাই! আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তোমাকে রক্ষা করিব। হিন্দুর ধর্মনাশ আমরা চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

প্রায় বারজন গুন্ডা তথায় উপস্থিত ছিল। হিন্দু সেনাগণ তাহাদিগকে বলিল,—"যদি মঙ্গল চাও, যদি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও এবং শপথ করিয়া, নাকে খত দিয়া বল, এমন কর্ম আর কখন করিবে না।"

মুসলমান গুন্ডাগণ উন্মত্ত ছিল। তাহাদের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান কিছুই ছিল না। হিন্দুর মুখে এই অবমানসূচক কথা শুনিয়া, তাহারা নিমেষ মধ্যে কটিবন্ধ হইতে শাণিত ছোরা বাহির করিয়া, একেবারে সেই ছোরা হতে লইয়া হঠাৎ হিন্দুসেনাকে আক্রমণ করিল। হিন্দুসেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ সেখানে পথ সঙ্কীর্ণ, অন্ধকারময়! এক এক শ্রেণিতে চারিজন চারিজন হিন্দুসেনা দাঁড়াইয়া কিছুকম অর্ধ পোয়া পথ যুড়িয়া ছিল। সেই গুণ্ডাগণের আক্রমণে প্রথম শ্রেণির চারিজন হিন্দুসেনা বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল। গুন্ডাগণ তাহাদের উদরে, বক্ষে এবং গ্রীবাদেশে এরূপ সতেজে ছোরা বসাইয়াছিল যে, চারজন হিন্দু-সেনা ভূতলে পড়িয়া অল্পক্ষণ মধ্যে পঞ্চত্ব পাইল। দেখিতে দেখিতে আরও চারিজন হিন্দু-সেনা বিষম অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল! এক মহা কল্লোল কোলাহল উত্থিত হইল।

হিন্দুসেনা অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে শত্রু মিত্র চেনা ভার। হিন্দুসেনা দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল; এবং বন্দুকের সঙ্গীন এমনভাবে ঘন ঘন সন্নিবেশ করিল যে, গুন্ডাগণ তাহা ভেদ করিয়া আর অগ্রগামী হইতে পারিল না। যে গুন্ডা অগ্রগামী হয়, সেই গুন্ডাই তৎক্ষণাৎ অমনি, সঙ্গীন-বিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পাঁচজন উন্মত্ত গুন্ডা নিহত হইল। এদিকে গুন্ডার দল কিন্তু ক্রমশ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। অন্যান্য পল্লীর গুন্ডাগণ এ সংবাদ পাইয়া এ দলে যোগদান করিল। শেষে প্রায় পঞ্চাশজন

গুন্ডা দূর হইতে একটা মহা হল্লা করিয়া "মার মার" রবে হিন্দুসেনাকে আক্রমণ করিতে চলিল। হিন্দু সেনাগণ ব্যাপার বিষম বুঝিয়া, সেই গুন্ডাদল লক্ষ্য করিয়া, অজস্রধারে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। গুন্ডাগণ গুলির আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িল। কে কোথায় তখন যে পলাইল, তাহার আর ঠিক রহিল না। শেষে দেখা গেল, ষোলজন গুন্ডা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ গুন্ডাশূন্য হইল! তখন অন্ধকারের সহিত নীরবতার সংযোগ হইল। হিন্দুসেনাদল যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে আপন গন্তব্য পথাভিমুখে ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। আমি যে বাটিতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সে বাটির জানালা রুদ্ধ করিলাম। রাত্রে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জানি না, কারণ আমি সে রাত্রে সেস্থানে ছিলাম না। অন্য গুপ্ত গলি পথ দিয়া আসিয়া নবাববাটির নিকটস্থ কোন গৃহে আশ্রয় লইয়া রহিলাম।

প্রভাত হইল। সূর্যদেব ষোলকলায় সমুদিত হইলেন। আজ নবাব নির্দিষ্ট ক্ষণের পূর্বেই রাজদরবারে সিংহাসনে আসিয়া, উপবেশন করিলেন। আজ দরবারে মহাসমারোহ। সভাতে শহরের প্রধান প্রধান বার জন হিন্দু আসিয়া, যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রায় বিংশতি জন প্রধান মুসলমান আসিয়া সমবেত হইলেন। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে বাঙ্-নিষ্পত্তি নাই। শেষে নবাব খাঁ বাহাদুর আল্লার নাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন;—কেন এমন হয়? হে আল্লা! কেন এমন হয়? হিন্দু-মুসলমানে—ভেয়ে-ভেয়ে,—এত বিবাদ, এত রক্তপাত কেন হয়? হিন্দু আমার দক্ষিণ হস্ত, হিন্দু আমার দক্ষিণ নয়ন, হিন্দু আমার দক্ষিণ কর্ণ;—হিন্দুর বলবীর্যের সাহায্য পাইয়াই আমি এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। শোভারাম পরম ভক্তিমান হিন্দু; তাঁহাকে আমি রাজত্বের প্রধান পদে, স্বীয় প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হীরালাল, গোকুলানন্দ, ব্রজকিশোর প্রভৃতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণকে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছি। আজ রাজদরবারে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, যদি কোন মুসলমান বিনা কারণে কোন হিন্দুর উপর অত্যাচার করে, অথবা নিষিদ্ধ স্থানে গোহত্যা করে, তবে তাহাকে আমি গুরুতর দণ্ড দিব। "হিন্দু-মুসলমান এক" "হিন্দু-মুসলমান এক"—ইহাই অদ্য হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে থাকুক। আজ হইতে ভেদজ্ঞান উঠিয়া যাউক! আজ হইতে হিন্দু-মুসলমান এক-দেহ, এক-প্রাণ হউক!"

নবাবের মুখনিঃসৃত এই বক্তৃতার মর্ম অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। পূর্বদিনের রাত্রে সেই হত্যাকাণ্ডের পর শহরের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত হিন্দু এবং ছয়দল হিন্দু সেনা, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে নবাব-বাটিতে সমাগত হন; এবং মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়নের কথা কাতর-বচনে ব্যক্ত করেন। সেই আবেদনের ফলেই আজ এই বক্তৃতা। আমি গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি ত এক মাসের অধিক বেরিলীতে ছিলে। নবাব, মুখে যেমন হিন্দুদের প্রতি সদয়, অন্তরেও কি সেইরূপ সদয়?"

গোয়েন্দা। "নবাব গোঁড়া মুসলমান। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তিনি প্রকাশ্যে বড়ই সৌজন্য দেখাইয়া থাকেন।

তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টাও করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলে কি হইবে? কার্যত কিছুই দাঁড়ায় না। ফল কথা,—নবাব তাঁহার মুসলমান অনুচরবর্গকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। বাস্তবিকই নবাব বিপদে পড়িয়াছেন। নবাব উভয়ের মন রাখিতে গিয়া এক্ষণে উভয় দলেরই বিরাগভাজন হইয়াছেন। সে দিনের আর একটা মজার ব্যাপার শুনুন। নবাব উভয়দলের বিরাগভাব প্রশমিত করিবার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য একটি বৃহৎ পতাকা বা পবিত্র ধ্বজ এবং মুসলমানদের মহম্মদীয় ঝণ্ডা অর্থাৎ পবিত্র ধ্বজ তুলিয়া তাঁহার তলদেশে প্রধান প্রধান হিন্দু ও মুসলমানকে আহ্বান করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেইদিন বৈকালে শোভারাম, গোকুলানন্দ, নেওয়ালানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং গণেশ রায়, হরসুখ রায় প্রভৃতি কয়েকজন কায়স্থকে সঙ্গে লইয়া নবাব নগর ভ্রমণে চলিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দুগণ আপন ধ্বজের তলদেশের সন্নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন; মুসলমানগণ মহম্মদীয় ঝণ্ডার তলায় অবস্থিতি করত যাত্রা করিলেন। স্বয়ং নবাব মহা সমারোহে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করত শহর প্রদক্ষিণ করিলেন। আর মধ্যে মধ্যে ধ্বনি উঠিতে লাগিল; —"হিন্দু-মুসলমান এক— রাম-রহিম এক,—শ্রীকৃষ্ণ-আল্লা এক" এবং এই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা হইল,—"যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ হিন্দু আছে, তাহারা অস্ত্র-ধারণপূর্বক হিন্দুর ধ্বজের তলদেশে উপস্থিত হউক, অস্ত্রধারী মুসলমানগণ মহম্মদীয় ঝণ্ডার তলদেশে সমবেত হউক এবং ইংরেজের উচ্ছেদ কামনায় সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউক।" অনেক দর্শক একত্র হইল। সে জনতা অতিক্রম করিয়া, পথ চলে সাধ্য কার? মহা হৈ হৈ শব্দে হিন্দুর পবিত্র ধ্বজ রামগঙ্গাতীরে প্রোথিত কবা হইল, এবং সেই দিনই শহরের নিকটস্থ বাগানে মহম্মদীয় ঝণ্ডা পোঁতা হইল। রামগঙ্গাতীরে দেওয়ান শোভারাম, হিন্দু মতানুযায়ী আহারীয় সামগ্রী,—লুচি, সন্দেশ, ক্ষীর বিতরণ করিতে লাগিলেন। বাগানে কালিয়া, কাবাব, কোর্মা প্রভৃতি বণ্টন হইতে লাগিল। নবাব খাঁ-বাহাদুর এই সকল কার্য সমাধাপূর্বক রাত্রি এক প্রহরের পর বাটি ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহাতে ফল যে বিশেষ কিছু ফলিল, তাহা বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব এক কড়াও বৃদ্ধি হইল না।

এইরূপে সেইদিন সেই গুপ্তচরের নিকট হইতে এইরূপ নানা কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। স্মারক-লিপিতে সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিলাম।

এই ভাবেই কালাডুঙ্গিতে কাল কাটিতে লাগিল। সৈন্যগণকে শিক্ষাদান, দূতমুখে গুপ্তসংবাদ শ্রবণ, উদ্ধারের উপায় চিন্তা, এই সমস্ত ব্যাপার লইয়াই সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতাম। এ ছাড়া, আমাদিগকে সর্বদাই রণসাজে সজ্জিত হইয়া থাকিতে হইত। যুদ্ধের পোশাক পরিয়া রাত্রে ঘুমাইতাম। অশ্বশালায় সমুদায় অশ্বের উপর জিন প্রভৃতি সর্বদা লাগানই থাকিত। বল্লম, তরবারি, বন্দুক রাত্রে শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যাইতাম। প্রত্যহ রাত্রে তিনবার করিয়া ঘোড়দৌড় হইত। অর্থাৎ প্রায় একশত অশ্বারোহী রাত্রি ১০টা, ২টা এবং সাড়ে চারিটা এই তিন সময়ে কালাডুঙ্গির চারিধারে দ্রুতবেগে এবং সদম্ভে বেড়াইত। শত্রুপক্ষ কখন হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে, ইহাই আমাদের ভয় ছিল।

সময়ে সময়ে আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইত। ইংরেজের হাতে টাকার সচ্ছলতা নাই; আর, মোরাদাবাদ রামপুর কাশীপুর অঞ্চল হইতে নাইনিতালাভিমুখে রসদের রপ্তানি হইলেও মাঝে মাঝে মধ্য পথে বিদ্রোহীগণ তাহা লুটিয়া লইত। প্রথমত টাকা কম, দ্বিতীয়ত রসদের আমদানি কম। এই উভয় কারণে অনেক সময়ে ঘৃত, আটা ডাল প্রভৃতি আমরা পূর্ণমাত্রায় পাইতাম না। কিন্তু জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিবার অন্য এক প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। আমরা প্রায়ই বড় বড় হরিণ শিকার করিয়া আনিতাম। কালাডুঙ্গিতে পক্ষীরও অভাব ছিল না। আটার অল্পতা দোষ মাংসের আধিক্য গুণে দূর হইত। এইরূপে দেহের পুষ্টিসাধনও বিলক্ষণ হইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে মনে একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইত। আমরা কোথায় আছি? কোথায় আত্মীয়স্বজন পরিবার, আর কোথায় আমরা! আজ বনবাসী, আজ পর্বতের অধিত্যকাবাসী! উদ্ধারের কি উপায় সহজে হইবে না? ইংরেজের পুনরায় রাজত্ব করিতে আর বিলম্ব কত? বিদ্রোহীগণেরই শেষে যদি বল অধিক হয়? সুবিধার মধ্যে এইটুকু যে, বিদ্রোহীদলের কর্তা নাই। কিন্তু শেষে যদি একজন কর্তা আসিয়া জুটেন, তখন উপায়? বিদ্রোহীদের নৌকা আছে, হাল আছে, মাঝি নাই; কিন্তু মাঝি জুটিতে কতক্ষণ! আজ কলিকাতায় কি হইতেছে জানি না, কাশীতে কি হইতেছে জানি না, লখ্‌নউনগরে কি হইতেছে জানি না! তথাকার সমগ্র ইংরেজ কি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছেন? না,—এখনও তাঁহারা বিদ্রোহিগণের সহিত অকাতরে ঝুঝিতেছেন? আজ দিল্লির অবস্থা কিরূপ? দিল্লি হইতে ইংরেজদল বিতাড়িত, দূরীভূত, ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে শতধা খণ্ডীকৃত। আজও কি দিল্লি শহরে মুসলমান বাদশাহের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? রক্ষার বুঝি আর উপায় নাই। বুঝি ডুবিলাম-মরিলাম! আবার মনে হইত,—ভয় কি? বোকা বিদ্রোহীগণ কখনই বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। অল্পদিন মধ্যে আবার বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইবে। এইরূপ আশায় এবং নিরাশায় কাল কাটিতে লাগিল।

আমরা যে সদাই যোদ্ধবেশে সাজিয়া থাকিতাম, তাহা নিরর্থক নহে। আরও পাঁচবার বিদ্রোহী সেনা আমাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল! গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ পাইয়া, পূর্বাহ্ণেই তাহাদের কালাডুঙ্গি আগমনের পূর্বেই আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, মহা হৈ হৈ রবে, তাহাদের প্রতি ধাবিত হইতাম। বিদ্রোহীগণ আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিত না; আমাদিগকে দেখিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া পলাইয়া যাইত। আমরা কিছুক্ষণ মহা লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া, বহু আস্ফালন করিয়া, দুই দশটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতাম।

আবার হঠাৎ একদিন রামপুরের নবাব ১৪৫ জন অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিলেন। ইহার তিন দিন পরেই কাশীপুর-রাজ শিবরাজ সিংহের নিকট হইতে একশত সওয়ার আসিল। এইরূপে আমাদের প্রায় আটশত অশ্বারোহীর অধিক হইল। কিন্তু এত অধিক সৈন্য লইয়া আমরা কি করিব? প্রথমত অর্থাভাব, দ্বিতীয়ত উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাব; তৃতীয়ত তাঁবুর অভাব; চতুর্থত উত্তম বন্দুকের অভাব; পঞ্চমত খাদ্যসামগ্রীর অসচ্ছলতা। সুতরাং অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ায়, আমাদের যেন একটা মহা বিপদ উপস্থিত হইল।

একদিন কালাডুঙ্গির সেই বৃহৎ বাঙ্‌লায় সাহেবদের এক কমিটি বসিল;—আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নানা বাদানুবাদের পর শেষে স্থির হইল, সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করাই কর্তব্য। সেনাদের মধ্যে যাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ ভাল নহে, যাহাদের ঘোড়া ভাল নহে, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যাহারা রুগ্ন, যাহারা ক্ষীণ-শরীর তাহাদিগকে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ১৭০ জন সওয়ারকে বেতন চুকাইয়া দিয়া জবাব দেওয়া হইল। আর জবাব দেওয়া হইল,—সেনাগণের মধ্যে যাহারা মুসলমান ছিল। ইহাতে ৫৫ জন সওয়ার কমিল। এখন কিঞ্চিৎ অধিক ছয়শত বাছাই করা খাঁটি হিন্দু অশ্বারোহী মজুদ রহিল। নবাগত সেনাগণ অল্পদিন মধ্যে ইংরেজী রীতি অনুসারে কাওয়াজ এবং ড্রিলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল।

একদিন একটা লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। পথে কাহাকেও কিছু সে বলে না,—কেবলই সে দৌড়িতেছে। প্রাতঃকাল। আমি সৈন্যদের শিক্ষাকার্য পরিদর্শন করিতেছি। সে লোকটা আমারই দিকে আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমিও তাহার দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইলাম। আমি অশ্বারোহণে সে বেগে দৌড়িয়া আসিয়াই আমার অশ্বের সম্মুখে নিপতিত হইল। একেবারে ভূতলশায়ী হইল। তাহার মুখে আর কথা সরে না; —যেন অচেতন প্রায়। আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম। সেই ব্যক্তিকে চিনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এত দৌড়িয়া আসিতেছ কেন? এত বেগে দৌড়িয়া আসিতে আছে কি? এখনি যে মারা পড়িয়াছিলে।"

শীত ঋতুর প্রাতঃকালে তাহার অঙ্গ দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। পতনকালে তাহার নাকে আঘাত লাগিয়া রুধির নির্গত হইতেছে। এ ব্যক্তি আমাদের গুপ্তচর। আজ প্রায় দুই মাস কাল হলদোয়ানিতে বিদ্রোহী সেনার সহিত বসবাস করিতেছিল।

শীঘ্রই সেই গুপ্তচর সামলাইয়া উঠিল। মুখে কথা ফুটল। আমি জিজ্ঞাসিলাম "কি হইয়াছে? সংবাদ কি? সে কহিতে লাগিল,—"সংবাদ শুভ। বিদ্রোহী-সেনা, হলদোয়ানি ছাড়িয়া পলাইতেছে। গতকল্য রাত্রি দুইটা হইতে তাহারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মোট পুঁটুলি বাঁধিতেছিল। তাঁবুর খোঁটা খুলিতেছিল। ঘোড়া সাজাইতেছিল। কামান লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। আমি ঘোড়ার ঘেসেড়ারূপে তথায় চাকুরি লইয়াছিলাম। রাত্রি যখন সাড়ে তিনটা, তখন হঠাৎ হুকুম হইল, আর বিলম্ব নাই, দশ মিনিটের মধ্যে এস্থান ছাড়িয়া চারপুরা নামক স্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এ আজ্ঞা প্রচার হইবামাত্র সেনাগণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কারণ, অধিকাংশ সেনা, তখনও আপন আপন আসবাব গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাড়াতাড়িতে মহা গোলযোগ বাধিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি। আলোকের ভাল বন্দোবস্ত নাই। শেষ রাত্রির বোঁ বোঁ বাতাসে অধিকাংশ দীপ নিবিয়া গেল। তখন এক কলকল হলহল ধ্বনি উত্থিত হইল। কে কাহার যে পুঁটুলি কাড়িয়া লইতে লাগিল, তাহার কিছু ঠিক হইল না। কেহ দৌড়িতে লাগিল, কেহ হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল, কেহ কাহারও সহিত পুঁটুলি লইয়া মারামারি আরম্ভ করিল, কেহ কাহারও পায়ের চাপানে পড়িয়া "গেলাম গেলাম" করিতে লাগিল। প্রায় ছয় সাত হাজার লোক একত্রে জমাট বাঁধা। সে ঘোর অন্ধকারে মহাভিড়ের কত কথা কহিব। দুই চারিটা তেজস্বী ঘোড়া, এই সময়ে হঠাৎ কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীমবেগে

চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, কার সাধ্য যে, তখন সেই অশ্বগণকে ধরে? অশ্বের বিপুল বিক্রমেও দুই চারিটা লোক খুন হইতে লাগিল। প্রলয়কালের এক মহান্ "বিতিকিচ্ছি" ব্যাপার হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বংশীধ্বনি হইল। মুহূর্ত মধ্যে যাত্রা করিবার আদেশ চারিদিকে প্রচার হইল।

শৃঙ্খলা রহিল না। সর্বত্রই এলোমেলো, ছোড়-ভঙ্গ ভাব। কে যে কোন্ দিকে, কোন্ মুখে যাইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই। কে যে কাহার গায়ে পড়িতেছে, তাহার ঠিক নাই। কে যে কাহার সহিত কোন পথে চলিয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই। এই সময়ে এক লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইল। কয়েকটা তাঁবু একেবারে দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। "দেখ্ দেখ্ গেল গেল", এইরূপ ধ্বনি করিতে করিতে কতকগুলি লোক সেই দিক্ পানে ছুটিল। তখন চারিদিকে মূর্তিমান বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে লাগিল। আমিও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া একদিক দিয়া পলাইলাম। ঘোব অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইয়াছিলাম; নইলে, ইহার বহুপূর্বে আমি এখানে আসিতে পারিতাম। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই,—আপনারা শীঘ্র অগ্রসর হইয়া যদি বিদ্রোহী সেনাকে এখনি আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। কারণ, তাহারা এখন শৃঙ্খলাবিহীন, এবং অধিক দূরও যাইতে পারে নাই।

আমি। তাহারা কোথায় যাইতেছে? তাহাদের হঠাৎ এরূপ পলাইবার কারণ কি?

গোয়েন্দা। হঠাৎ পলায়নের কারণ কিছুই জানি না। তাহারা যাইতেছে,—চারপুরায়। এ স্থান হলদোয়ানি হইতে আট নয় ক্রোশ হইবে। সে যাহা হউক, আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র সজ্জিত হইয়া পলায়মান বিদ্রোহী সেনাকে আক্রমণ করুন।

আমি। আমি স্বয়ং এরূপ ভাবে আক্রমণের অনুমতি দিতে পারি না। বারওয়েল সাহেব, হন্টার সাহেব আছেন; এরূপ গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের সহিত যুক্তি করা আবশ্যক।

তৎক্ষণাৎ সেই গোয়েন্দাকে লইয়া মিঃ বারওয়েল এবং মিঃ হন্টার—সাহেবদ্বয়ের নিকট গেলাম; সকল কথা আমার নিকট শুনিয়া, তাঁহারা আমাকেই এই ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কি বলেন? বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত কিনা?"

আমি। না। বিদ্রোহীদের ছয় সহস্রের অধিক সেনা একত্র মিলিত। ইহার মধ্যে দুই হাজারের অধিক অশ্বারোহী, চারি হাজার পদাতি। পাঁচটি তোপ তাহাদের সঙ্গে আছে। আমাদের এ অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী লইয়া, তাহাদের উপর আক্রমণ করা উচিত নহে। হিতে বিপরীত হইতে পারে। আমাদের এখানে অন্তত যদি তিনশত পদাতি সেনা থাকিত, তাহা হইলেও একদিন আক্রমণ করা চলিত।

সাহেবদ্বয় কহিলেন,—"আমাদেরও অভিপ্রায় তাহাই।"

গোয়েন্দা কিন্তু করযোড়ে কহিতে লাগিল,—"বিদ্রোহী সেনাগণ ভীরু, কাপুরুষ। তাহারা যুদ্ধের নামে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইবে। অতএব আপনারা কাল-বিলম্ব না করিয়া, অতি শীঘ্র আক্রমণ করুন। ইহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে পারিল, অনেক রসদ, অনেক তাঁবু, অনেক ঘোড়া এবং অনেক অস্ত্র আপনাদের হস্তগত হইবে।"

আমি কহিলাম,—"আমাদের সেনাপতি কর্ণেল ক্রশম্যান ব্যতীত এরূপভাবে শত্রুকে

আক্রমণ করিবার জন্য হুকুম দিতে, আর অন্য কেহই সক্ষম নহেন। বিদ্রোহী সেনা যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত, তাহা হইলে আমরা আত্মরক্ষার্থ আত্ম-হুকুমেই সকল কাজ করিতে পারিতাম। কিন্তু ইহা ত তাহা নহে।"

তৎক্ষণাৎ কর্ণেল ক্রশম্যানের নিকট নাইনিতালে আমরা এ সংবাদ পাঠাইলাম।

গোয়েন্দাকে লইয়া আমি আপন বাঙ্‌লায় আসিলাম।

বৈকালে কর্ণেল ক্রশম্যান, কর্নেল টুরুপ এবং কমিশনার আলেকজান্ডার—এই তিনজন প্রধান ব্যক্তি কালাডুঙ্গিতে আগমন করিলেন। আমাদের সহিত রুদ্ধগৃহে গোপনে, তাঁহাদের পরামর্শ হইল। নানা বাক্‌-বিতণ্ডার পর ইহাই স্থির হইল, বিদ্রোহী সেনাকে এ সময় আক্রমণ করিবার আবশ্যকতা নাই; আমরা আপাতত হলদোয়ানি দখল করিয়া লইব। তথায় আমাদের প্রধান সেনা-নিবাস হইবে। কালাডুঙ্গিতে একশত প্রহরী ঘাঁটি রক্ষা করিবে মাত্র।

নাইনিতাল হইতে চারিটি তোপ আসিল, চারিশত গুর্খা পদাতি-সৈন্য আসিল এবং আমাদের সমস্ত অশ্বারোহী-সৈন্য,—সর্বসুদ্ধ এগার শত রণনিপুণ সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া, পরদিন অতি প্রত্যুষে কালাডুঙ্গি হইতে হলদোয়ানি যাত্রা করিলাম।

বীরবর কর্ণেল ক্রশম্যান সর্বাগ্রে অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অশ্বারূঢ় থাকিয়া, তাঁহার আদেশ পালনার্থ কেবল প্রস্তুত হইয়া থাকিলাম। বিজয়-ব্যান্ড বাজিতে লাগিল। যুদ্ধার্থী সেনাদলের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

● ● ●

হলদোয়ানি প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তথায় জনমানব নাই। মানবের কণ্ঠধ্বনি বা পদধ্বনি শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিলাম। কিন্তু কোন ধ্বনিই শ্রুতিগোচর হইল না। সেই দ্বিতল-গৃহের দিকে চাহিলাম। যে গৃহে ভয়ঙ্করমূর্তি মৌলবি ফজল হক্‌ বাস করিত, যে গৃহের মঞ্চোপরি বসিয়া, দুর্বৃত্ত ফজল হক্‌ জলদ গম্ভীর স্বরে আমাকে তোপে উড়াইবার আদেশ দান করে, সেই দ্বিতল গৃহের দিকে আবার তীব্র দৃষ্টিতে কটমট চাহিলাম। মনে মনে কহিলাম, রে নররাক্ষস ফজল হক্‌! আজ তুমি কোথায়? পলাইলে কেন? থাকত, একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও না?

সেই গৃহের সম্মুখে দুইটি বিশাল বৃক্ষ নয়ন-গোচর হইল। সেই বৃক্ষের তলদেশে আমি দুই রাত্রি বন্ধন দশায় যাপন করিয়াছিলাম। যে তক্তাপোশদ্বয়ে আমার হাত-পা বাঁধা ছিল, সে তক্তাপোষ দুইখানি তথায় আর দেখিতে পাইলাম না। আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম। ফজল হকের সেই দ্বিতল গৃহোপরি তীরবেগে উঠিলাম। গৃহের অভ্যন্তরে একখানি ভাঙ্গা খাট; খাটের উপর এক ছেঁড়া গদি দৃষ্ট হইল। গদির নীচে হইতে এক বান্ডিল কাগজ বাহির হইল। খুলিয়া দেখিলাম,—অনেক পত্র উর্দু ভাষায় লিখিত! শত্রুপক্ষীয়ের এই পত্রগুলি ভবিষ্যতে অনেক কার্যে আসিতে পারে ভাবিয়া তাহা সযত্নে লইলাম। গৃহে অনেক অনুসন্ধান করিলাম, আর কিছুই পাইলাম না।

কর্নেল ক্রশম্যান সাহেবের নিকট আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি হঠাৎ ঐ দ্বিতল গৃহের উপর উঠিলে কেন?" আমি কহিলাম,—"উহা মুসলমান সেনাপতি ফজল

হকের গৃহ ছিল। জনশূন্য গৃহে কোন আসবাব আদি পড়িয়া আছে কিনা, তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম।”

ক্রশম্যান। কোন দ্রব্য পাইলে কি?

আমি। কতকগুলি পত্র পাইয়াছি; উর্দুতে লেখা। সম্ভবত ইহা দ্বারা শত্রুপক্ষীয়ের অনেক রহস্য জানা যাইবে।

ক্রশম্যান। আপনি এই উর্দুপত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করুন। এবং অদ্য রাত্রে সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইবেন।

আমি। তথাস্তু।

প্রথম, সেনা-সমাবেশের স্থান নিরূপণ হইল। বিস্তৃত পর্বতীয় ময়দানে সেনাগণকে তাঁবু খাটাইয়া থাকিবার আজ্ঞা দান হইল। অশ্বারোহীদল একদিকে রহিল। পদাতিদল ঠিক তাহার বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করিল। একটি উচ্চস্থানে কামান দুইটিকে রাখা হইল। উপযুক্ত প্রহরীদল কামানদ্বয়ের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকিল।

হলদোয়ানি গ্রাম নহে,—ইহা মণ্ডী বা বাজার নামে তখন খ্যাত ছিল। প্রায় পঁচিশ বিঘা চৌকোণা জমি,—এই জমির চারিদিকেই এক সারি করিয়া ঘর; ঘরগুলি গায়ে গায়ে সংলগ্ন; জমির মধ্যস্থলটা ফাঁকা। অর্থাৎ সেই জমিটা গৃহরূপ প্রাচীর দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত। সেই গৃহগুলি দোকানঘর; বহু সংখ্যক দোকানদার বিদ্রোহের পূর্বে এইখানে বেচা-কেনা করিত। পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র কিনিত। সপ্তাহের মধ্যে একদিন হাট বসিত। সেই চতুষ্কোণ জমির মধ্যস্থলে ফাঁকা জমিটিতে হাট হইত। এই হাটে দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে বহুদূর হইতে লোক আসিত। নানারূপ জিনিসের আমদানি হইত। সে প্রদেশে এইরূপ বচন তখন প্রচলিত ছিল, হলদোয়ানির হাটে যাহা পাওয়া যায় না, তাহা অন্য কোথায়ও মিলে না।

মণ্ডীর দুই দ্বার। বৃহৎ ফটক। এক দ্বার পূর্বে, অন্য দ্বার পশ্চিমে। পূর্বের দ্বার দিয়া সেই খোলা জমিতে প্রবেশলাভ করিতে হয়, পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইতে হয়। প্রত্যেক দ্বারের নিকট সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিত।

আমরা যখন হলদোয়ানিতে উপনীত হইলাম, তখন তথায় জনমানব নাই। দোকান-ঘরগুলি অর্ধ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। ফটক দুইটিতে কবাটের কাঠমাত্রও নাই। দ্বারদ্বয় খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। বাসের জন্য, কয়েকখানি ‘উহারই মধ্যে ভাল’ দোকানঘর বাছিয়া লইলাম। আমার তৎকালের চির সহচর ডাক্তার নন্দকুমার আমার পাশেই দোকনঘরে বাসা লইলেন, এবং তাঁহার হাসপাতালের জন্য আর চারটি ঘর দখল করিলেন।

ভয়ঙ্কর শীত পড়িয়াছে। নাইনিতালের পাহাড়ে শীত, সন্ধ্যার পর হইতে হাড়সুদ্ধ কন্ কন্ আরম্ভ করে। তাঁবু অপেক্ষা দোকানঘরে শীত কম লাগিবে এই ভাবিয়া আমি দোকানঘরে বাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সাহেবগণ কিন্তু দোকানঘর পছন্দ করিলেন না;—তাঁহারা তাঁবু খাটাইয়া রহিলেন।

আমাদের কালাডুঙ্গি অবস্থানকালে, প্রধান সেনাপতি ক্রশম্যান সাহেব নাইনিতালেই থাকিতেন। মাঝে মাঝে এক-আধদিন কালাডুঙ্গিতে আসিয়া সেনাগণের শিক্ষাকার্য

পরিদর্শন করিতেন। হলদোয়ানিতে কিন্তু তিনি আপনার আবাসভূমি নির্দিষ্ট করিলেন। চারিটা বৃহৎ তাঁবুতে তাঁহার গৃহ তৈয়ারি হইল। এত তাঁবুতে আমি।

সেই সকল উর্দু-লেখা পত্র প্রকৃতই প্রণয়-পত্র। মৌলবি ফজল হক অতীব লম্পট। সেই মুসলমান-সৈন্যাধ্যক্ষের প্রকাশ্য উপপত্নীর সংখ্যা আট-নয়টির কম নহে। ইহা ব্যতীত, পরস্ত্রী হরণে ইনি সদাই তৎপর। একখানি পত্র, কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-ঘরের কুলবধূকে বাহির করিয়া আনিবার উপায় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। কুলবধূ, কুলে কালি দিয়া, পুরুষ-বেশে মৌলবী ফজল হকের নিকট হলদোয়ানি আসিতে সম্মত। আমি সে পত্র পড়িয়া মনে মনে বলিলাম,—"ধন্য সৈন্যাধ্যক্ষ! তুমিই ধন্য! তুমিই না বীর-বেশ ধরিয়া বাহুবলে ইংরেজদিগকে নাইনিতাল হইতে তাড়াইতে আসিয়াছিলে?"

আমি সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট সময়ে কর্ণেল ক্রশম্যান সাহেবের নিকট উপনীত হইয়া কহিলাম, "পত্রগুলি প্রণয়পত্র, কেবল স্ত্রীলোক-ঘটিত কথা।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেল।"

মে মাসে সংক্রান্তি দিনে, দুরন্ত গ্রীষ্মের সময়, দিবসে, দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্বে বেরিলী শহরে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়। গ্রীষ্মকাল অতীত হইল, বর্ষাকাল অতীত হইল, শরৎকাল আসিল, আকাশে ষোলকলায় শশধর উদিত হইল,—ধরামণ্ডল হাসিল,—আমি কিন্তু তখনও প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া ঘুরিতেছি,—উৎকণ্ঠিতচিত্তে ইংরেজের কেবল শুভকামনা করিতেছি। শরতের পর হেমন্ত; হেমন্তের পর শীত। কালের ক্ষয় হইয়া, নূতন কালের উদয় হইতেছে;—ঘুরিয়া ফিরিয়া এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসিতেছে,—আমি কিন্তু তাই আছি! পরিবর্তন নাই, পরিবর্ধন নাই, পরিশোধন নাই,—সেই বিদ্রোহীদল-পরিবেষ্টিত হইয়া কেবল উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছি।

প্রথম প্রথম হলদোয়ানিতে আসিয়া স্থানের নূতনত্ব হেতু একটু ছিলাম ভাল। কিন্তু যতদিন যাইতে লাগিল, ততই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। সেই ড্রিল, সেই প্যারেড, সেই গোয়েন্দার গল্প, সেই ডাল রুটি মাংস আহার, সপ্তাহের মধ্যে সেই দুইবার শিকার-সন্ধানে গমন, নন্দকুমারের সহিত সেই মাঝে মাঝে ভাব ও ঝগড়া, কেবল এই উপকরণগুলি লইয়া আর কতদিন তিষ্ঠিব? ঐ বিদ্রোহী সেনা আসিল, ঐ রসদ লুটিয়া লইল, ঐ আমাদের দূরস্থ ঘাঁটি আক্রমণ করিল, কেবল ইহা লইয়া আর কতদিন থাকিব? ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। মরি কি মারি, তখন ইহাই মনে হইতে লাগিল। বিদ্রোহী সেনা ভেদ করিয়া, বেরিলী অভিমুখে ছুটিয়া যাই,—মনোমধ্যে মাঝে মাঝে এমনও অভিলাষ জন্মিতে লাগিল। বাস্তবিকই দিন আর যায় না,—কেবল পথ পানে চাহিয়া থাকি,—আজ চরমুখে কি সংবাদ পাই! ডাকের চিঠি নাই, জননী-ভার্যার সংবাদ নাই,—আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ নাই,—সুতরাং সদাই শুষ্কমুখ, বিষণ্ণবদন। সত্য সত্যই সহ্য আর হয় না।

কিন্তু এই বিরক্তির দিন কি শীঘ্র ফুরাইবে না? শুভদিন কি আর সহজে আসিবে না? ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যে প্রাণ কি আর সুশীতল হবে না? বিদ্রোহীদের সহিত ঘোর সংগ্রামে, সম্মুখ-সমরে প্রাণের পিপাসা কি মিটাইতে পারিব না। বীরদর্পে ভীরু-বিদ্রোহী

সেনাদল-মাঝে পড়িয়া, অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবার কি সুযোগ পাইব না? একবার অন্তরে কালী কালী বলিয়া,—মুখে কালী কালী বলিয়া, হস্তে খড়গ লইয়া, রণভূমে প্রবেশপূর্বক মনের আশা পূর্ণ করিবার কি অবসর ইহজন্মে আর পাইব না? জানিনা, অদৃষ্টে কি আছে? হয় বিদ্রোহীগণ আসিয়া আমাদিগকে হনন করুক, না হয় আমরা গিয়া বিদ্রোহীগণকে সমূলে নির্মূল করি। হয় এদিক, না হয় ওদিক—যা হয় একটা হইয়া যাউক। কিন্তু এমন করিয়া আর বসিয়া থাকিতে পারি না।

● ● ●

হলদোয়ানিতে গোয়েন্দাব সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইল। অনেক লোকই গোয়েন্দা হইতে চায়। কারণ, গোয়েন্দাগিরি কার্যে সফলকাম হইলে, পুরস্কার লাভের বিশেষ সম্ভাবনা। গুপ্তচরের কাজ কিন্তু বড় কঠিন কাজ। যে-সে লোককেও এ কাজে নিযুক্ত করা উচিত নহে। এদিকে আবেদনকারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে, গুপ্তচরের সংখ্যা ক্রমশ আপনা-আপনিই অধিক হইয়া পড়িল। কর্নেল ক্রশম্যান আমাকে তামাসা করিয়া বলিতেন "বাবুজী! আপনি দেখিতেছি, ক্রমশ গোয়েন্দার একটি রেজিমেন্ট তৈয়ারি করিয়া ফেলিবেন।"

কোন কোন গোয়েন্দা ফাঁকি দিত। নির্দিষ্ট স্থানে না গিয়া, অম্লানবদনে বলিত, গিয়াছি। জেরায় ধরাও পড়িত, বেত খাইত অথবা কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা সহ্য করিত!

একদিন একজন গোয়েন্দা আসিয়া হন্টার সাহেবের নিকট মহা গল্প জুড়িয়া দিয়াছে; কতরূপ অঙ্গভঙ্গি করিতেছে; হাত-পা নাড়িতেছে চক্ষু ঘুরাইতেছে। দূর হইতে দেখিয়া আমি নিকটে গেলাম। সে বলিতেছে,—'আমাকে বিদ্রোহীগণ কিছুতেই চিনিতে পারে নাই। আমি এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, বিদ্রোহীগণ আমি যাহা বলিতাম, তাহাই বিশ্বাস করিত।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহাদের বন্দুক কত আছে, তাহার হিসাব লইয়াছ কি?"

গোয়েন্দা। হাঁ। যাহার জন্য গিয়াছি, সে কাজ সমাধা না করিয়া কি আমি অমনি ফিরিয়া আসিয়াছি?

আমি। বন্দুকের সংখ্যা কত?

গোয়েন্দা। নয় হাজার ছাব্বিশ।

আমি। কিরূপে তুমি বন্দুক গণনা করিতে?

গোয়েন্দা। যখন কেহ কোথাও থাকিত না, সে সময়, তাহাদের ঘরে ঢুকিয়া গনিতে বসিতাম।

আমি। তুমি তাহাদের ঘরে ঢুকিলে অন্য কেহ তোমাকে কোন কথা বলিত না কি?

গোয়েন্দা। না,—আমার উপর সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সুতরাং কেহই কিছু বলিত না।

আমি। তুমি কি তখন সঙ্গে করিয়া দোয়াত কলম লইয়া যাইতে?

গোয়েন্দা। দোয়াত কলম লইয়া যাইবার দরকার কি? সেখানে দোয়াত কলম পাইবই বা কোথায়?

আমি। গনিয়া যাহা হইত, তবে তাহা মনে করিয়া রাখিতে?

গোয়েন্দা। আজ্ঞে, হাঁ।

আমি। এরূপ কয়দিন গনিয়াছিলে?

গোয়েন্দা। নয়দিন কাল।

আমি। তোমার ত স্মরণশক্তি খুব প্রখর দেখিতেছি।

গোয়েন্দা। আমরা মূর্খলোক; তাদৃশ লেখাপড়া জানি না; কিন্তু একবার যাহা গনিব, তাহা কস্মিনকালে ভুলিব না।

আমি। বটে, অতি আশ্চর্য ত! পনের দিনের ধারাবাহিক গণনা তোমার মনে আছে! তুমিই উপযুক্ত গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা। (জোড় হাতে) আজ্ঞে, তা আছে বৈ কি? পনের দিন কেন, যদি পনের বছর হইত, তথাচ আমি ভুলিতাম না।

আমি। আচ্ছা, বাপু! বল ত, তুমি প্রথমদিন কত বন্দুক গনিয়াছিলে?

গোয়েন্দা থতমত খাইল। হন্টার সাহেবের মুখ হইতে হাসি বাহির হইল। আমি গুপ্তচরকে কহিলাম,—"বল, বল শীঘ্র বল, বিলম্ব করিতেছ কেন?"

গোয়েন্দা। আজ্ঞে, আজ্ঞে, ৭১২টি বন্দুক।

আমি। দ্বিতীয়দিন কত গনিয়াছিলে?

গোয়েন্দা আবার বিলম্ব করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল গোয়েন্দা বুঝি মনে মনে কি হিসাব করিতেছে। আমি কহিলাম,—"তুমি এত বিলম্ব করিতেছ কেন? এবং মনে মনে হিসাবই বা কি করিতেছ? খবরদার! ফের যদি বিলম্ব করিবে, তবে এই বেত তোমার পৃষ্ঠের উপর পড়িবে। শীঘ্র বল।

গোয়েন্দা। দ্বিতীয় দিন,—৯২০টি।

আমি তৃতীয়দিন কত? বলিতে বিলম্ব করিতে পারিবে না যেমন আমি প্রশ্ন করিব, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে হইবে। তোমার ১৫ বৎসরের পুরান কথা সমস্তই মনে থাকে, আর পনের দিনের টাটকা কথা কি মনে থাকে না? ইহার জন্য ভাবিতে হয় কেন?—

এই কথা বলিয়া আমি বেত ঘুরাইতে লাগিলাম।

গোয়েন্দা। তৃতীয় দিনে ৫০০ শত।

আমি। চতুর্থ দিনে কত?

গোয়েন্দা। ২৫৮।

আমি। পঞ্চম দিনে?

গোয়েন্দা। ৬৯৯।

আমি। ষষ্ঠ দিনে?

গোয়েন্দা। ২০০০ দুই হাজার।

আমি সপ্তম দিনে?

গোয়েন্দা। ৩১৯।

আমি। অষ্টম দিনে?

গোয়েন্দা। ৫১২।

আমি। নবম দিনে?

গোয়েন্দা। ৯০৬।

হন্টার সাহেব মনে মনে টিপি-টিপি হাসিতেছেন। হাসিবেগ সংযত করিয়া আমাকে ইংরেজিতে কহিলেন,—"বাবু সাহেব! বেশ মজা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় আপনি উহাকে প্রথম দিন কত বন্দুক গণিয়াছিলে, দ্বিতীয় দিন কত বন্দুক গণিয়াছিলে,—এইরূপ জিজ্ঞাসা করুন। তাহা হইলে ও ব্যক্তি আপনা-আপনিই ধরা পড়িবে।"

আমি ইংরেজিতে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—"না।"

হন্টার সাহেব। (ইংরেজিতে) ও ব্যক্তি ঐ আট দিন কাল ক্রমান্বয়ে যত বন্দুক গণিয়াছে বলিল, উহাকে একবার তাহা ঠিক দিতে বলুন,—তাহা হইলেই সে আপনার মিথ্যাকথারূপ জালে বদ্ধ হইবে।

আমি হাসিয়া ইংরেজিতে কহিলাম, "না, সে কথা এখন থাক,—আরও একটু মজা করা যাউক।"

ধূর্ত গোয়েন্দা, আমাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়াছে, সে ধরা পড়িয়াছে। সে তখন পলাইবার পথ খুঁজিতেছে।

গোয়েন্দা কহিল,--"রাত্রি জাগিয়া পথ হাঁটিয়া আসায়, আমার জলতৃষ্ণা পাইয়াছে। আমি এখন চলিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসিব।"

আমি। তুমি আর একটু থাক; আর গোটা দুই প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাস্য আছে।

গোয়েন্দা। একবার ছাড়িয়া দিন, আমি একটু জল খাইয়া শীঘ্র আসিতেছি।

আমি। তা হইবে না। একটু বসো। আচ্ছা, বল দেখি, যে স্থানে এক্ষণে বিদ্রোহীগণ আছে, তথায় শীত কেমন?

গোয়েন্দা। ভয়ঙ্কর শীত।

আমি। সমস্ত রাত-ই কি সেনাগণ আগুন পোহাইয়া থাকে?

গোয়েন্দা। হাঁ হুজুর। আগুন ব্যতীত তথায় তিলার্ধকাল তিষ্ঠিবার যো নাই।

আমি। বিদ্রোহীগণ তথায় নূতন যে কূপটি কাটাইয়াছে, তাহার জল সুস্বাদু না বিস্বাদ?

গোয়েন্দা। (একটু স্থিরভাবে থাকিয়া) অতীব সুস্বাদু।

আমি। এইবার তুমি, একবার স্মরণ করিয়া বল ত,—৫ম দিনে কত বন্দুক গণিয়াছিলে?

গুপ্তচরের মুখে আর কথা নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিল।

আমি হস্তে বেত লইলাম। বলিলাম, "কূপের জল অতীব সুস্বাদু নয়?" বেত উত্তোলন করিলাম। সজোরে গোয়েন্দার পশ্চাদ্ভাগে বেত্রাঘাত করিয়া কহিলাম, "বিদ্রোহিগণ সমস্ত রাত্রি আগুন পোহায় নয়? এরূপ নিদারুণ মিথ্যা কথা কহিয়া তোমার লাভ কি? তুমি আদৌ সে স্থলে যাও নাই, অথচ ঘোর মিথ্যা কথা কহিয়া তুমি বলিতেছ, তুমি স্বয়ং তথায় গিয়াছিলে। বাপু! সেখানে কূপ নাই। ঝরনার পবিত্র জলই বিদ্রোহীদের একমাত্র পানীয়। তাঁবুতে আগুন লাগার পর হইতে তথায় কেহ রাত্রি ৯টার পর আর আগুন জ্বালিতে পায় না। অথচ তুমি বলিতেছ, বিদ্রোহী সেনানিবাসে সমস্ত রাত্রিই আগুন জ্বলে। এই বেতই তোমার উপযুক্ত ঔষধ; এই বলিয়া সেই গোয়েন্দার পৃষ্ঠদেশে গণনা করিয়া দশবার বেত্রাঘাত করিলাম। সেই মিত্যাবাদী গুপ্তচর প্রথমত বিপরীত রবে চীৎকার আরম্ভ করিল; অবশেষে নিস্তেজ হইয়া ধরাশায়ী হইল। সেই যৌবনারম্ভ কালের আমার হাতের দশ বেত

বড় কম কথা নহে। আমি নিকটস্থ অনুচরকে কহিলাম, "এ ব্যক্তিকে হাজতঘরে লইয়া যাও এবং শুশ্রূষা কর।"

কোন কোন পাঠক হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর মনে করিতেছেন। প্রকৃতই সঙ্গদোষে আমার প্রকৃতি তখন বড়ই কঠোর হইয়াছিল। তখন তরবারি-বন্দুক-বল্লম লইয়া সদাই কাজ, মুখে সদাই মার্-ধর্-কাট্ বুলি, ব্যাঘ্র-হরিণ পক্ষী শিকারই তখন ধর্ম, ঘোর যুদ্ধে শত্রুমুণ্ডচ্ছেদনই তখন একমাত্র ব্রত ছিল। সুতরাং প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন? আহার ছিল মাংস, মাংসাশী ইংরেজের সহিত ছিল বসবাস, বীরপুরুষ কঠিনদেহ ক্ষত্রিয়গণের সহিত ছিল সদা রহস্যালাপ,—প্রকৃতি কঠিন হইবে না কেন? নিকটে মাতা নাই, ভার্যা নাই, কন্যা নাই,—প্রকতি কঠোর হইবে না কেন? প্রসন্নপূণ্য-সলিলা ভাগীরথী নাই, স্বভাবের শ্যামল সুন্দর শস্যক্ষেত্র নাই, মল্লিকা-মালতী-যূথিকা নাই, তমাল তরু নাই, নিশীথে বংশীধ্বনি নাই,— এ পাথরময় অরণ্য প্রদেশে এতকাল বাস করিয়া প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন?

বেতের চোটে অন্যের পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে দেখিলে, আমার তাদৃশ কষ্ট বোধ হইত না। অন্যের হাত-পা-মুখ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হউক,—আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। মানুষ সাক্ষাতে হস্তী-পদদলিত হইলেও, আমার চাঞ্চল্য নাই। বেদান্ত-ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

● ● ●

নিয়ম হইল, বিশেষ পরীক্ষা এবং বিশেষ নিদর্শন ব্যতীত, গুপ্তচরের কথা গৃহীত হইবে না। যে স্থলে বিদ্রোহীগণ ছাউনি করিয়াছিল তথায় একজাতীয় নূতন বৃক্ষ ছিল। সেরূপ বৃক্ষ এবং সেরূপ পাতা, এ অঞ্চলে আদৌ ছিল না। যে গুপ্তচর সেই বৃক্ষের পাতা ক্ষুদ্র একটু ডাল না আনিতে পারিত, তাহার কথা শ্রুতিযোগ্য নহে বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ ধরাধরি কড়াকড়ি করাতে জুয়াচোর গোয়েন্দার দল কিছু কমিল।

রবিবার। অপরাহ্ণ। শিকার-সন্ধানে বহির্গত হই নাই। চেয়ারে বসিয়া আছি এবং ডাক্তার নন্দকুমারকে জ্বালাতন করিতেছি। একজন আরদালি আসিয়া কহিল, —"অল্পবয়স্কা এক সুন্দরী স্ত্রী, ছাউনিতে আসিয়া সেতার বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিতেছেন। সুন্দরী কাহারও সহিত কথা কন না। তাঁহার সহিত একটি বৃদ্ধ পুরুষ আছে; সে গান গায়, ডুগি বাজায় এবং লোকের সহিত কথাবার্তা কয়। হুজুরের যদি অনুমতি হয়, তবে সেতারওয়ালীকে এইখানে লইয়া আসি।"

আমি। আচ্ছা,—লইয়া আইস।

দূত প্রস্থান করিলে, আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি এক রকম নূতন ঘটনা ঘটিল। আমরা আসিয়া অবধি এ পর্যন্ত কোনও নারীই ত হলদোয়ানিতে আইসে নাই। রমণীর শুভাগমন শুভফলসূচক সন্দেহ নাই। অথবা ইহা কোন মায়াবিনীর মায়া। জানি না, কোন ছলে কোন কামিনী কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সেতারবাদিনী আসিল। রমণী সুন্দরী, আয়তলোচনা। বয়ক্রম বুঝি যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে! করুক। তাহাতেই কিন্তু সৌন্দর্যকে, সেই রূপরাশিকে অধিকতর প্রগাঢ়, মধুর এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কামিনীর প্রকৃতি গম্ভীর, ধীর, স্থির। পুরুষের পানে দৃষ্টি নাই। তাহার নয়নযুগল কেবল সেতারের দিকে নিহিত।

আমি কম্বল আসন পাতিয়া দিয়া, শশিমুখীকে বসিতে বলিলাম। শশিমুখী সেতারহস্তে সম্মুখে উপবিষ্ট; তৎপশ্চাতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে ঘেঁষিয়া, সেই বৃদ্ধ ডুগি লইয়া বসিল। আমি সেদারবাদিনীকে কহিলাম,—"আপনার নিবাস কোথায়? এবং শিক্ষাই বা কোথায়?" তিনি কথা কহিলেন না; কেবল নিম্নে সেতার পানে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ কিন্তু আমার কথার উত্তর দিল, কহিল,—"ইনি কথা কহেন না; গুরুর আজ্ঞা সেরূপ নহে। ই'হাকে সেতার বাজাইতে অনুমতি করুন, বোধ হয় সেতারে আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। যে রাগ, যে সুর, যে গান, আপনি আলাপ করিতে বলিবেন, ইনি তাহাই হৃষ্টচিত্তে করিবেন।"

আমি। আমার কোন ফরমাইস নাই। যাহা উহার ইচ্ছা, তাহাই আলাপ করুন।

রমণী অমনি বাম করে সেতার ধরিয়া, দক্ষিণ পাণির তর্জনীর সাহায্যে, সেতারে ঝঙ্কার দিলেন। কি অপূর্ব মধুর রব! প্রথম একবার 'সা-রে-গ-ম' সাধিয়া লইলেন। হাতের কায়দা দেখিয়া ভাবিলাম, এ রমণী বড় সামান্যা নয়। তৎপরে তিনি অর্ধ ঘণ্টা ধরিয়া মেঘরাগের আলাপ করিলেন। যাঁহারা সঙ্গীত কি, রাগ কি, সেতার কি বুঝেন,—তাঁহাদের মন মোহিত হইল। প্রায় এক হাজার শ্রোতা বা দর্শক রমণীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সকলে সাবাস্ সাবাস্ ধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ কহিল, রমণী মানবী নহে; দেবী। কেহ কেহ মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিল;—এ রমণীর গুরু কে? কোন ওস্তাদ ইঁহাকে এ অলৌকিক রসের অবতারণা করিতে শিখাইয়াছে? সেই ওস্তাদের কি একবার দেখা পাই না?

মেঘরাগ আলাপের পর, রমণী কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইলেন। তারপর আবার সেতার ধরিলেন। কিন্তু সেতার বাজাইবার পূর্বে রমণী দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালনপূর্বক ইঙ্গিতে কহিলেন, এইবার সমগ্র দর্শককে এ স্থান হইতে সরাইয়া দাও। আমার আদেশ অনুসারে, লোকসমূহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে একে, দলে দলে, ধীরে ধীরে, নিতান্ত ভগ্নমনে, তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। রহিলাম আমি, ডাক্তার নন্দকুমার এবং দশ বার জন উচ্চপদস্থ হিন্দুস্থানী সৈনিক কর্মচারী।

এবার খাম্বাজ রাগিণীতে সেতারে আলাপ হইতে লাগিল। গৎ বাজাইয়া, শশিমুখী শেষে সেতারে খাম্বাজের গান ধরিলেন। কি মধুর! কি মধুর! চলুক, চলুক! যেন আজ আর শেষ হয় না! চলুক, চলুক! যেন আজ আর ফুরায় না! দিন ফুরাইয়া যাউক, রাত্রি ফুরাইয়া যাউক,—কিন্তু এ গান যেন ফুরায় না! সংসার চাই না, পৃথিবী চাই না, স্বর্গ চাই না,—কিন্তু এ গান যেন ফুরায় না।

সেতারে গান চলিতেছে, মনুষ্যকণ্ঠে গান যেন গীত হইতেছে, সেতার যেন কথা কহিতেছে; অথচ গানটি কি আমরা বুঝিতেছি না। গানটি কি? জানিবার জন্য আমাদের লালসা বলবতী হইল। যখন আর থাকিতে পারিলাম না, তখন জোড়হাতে কহিলাম, সত্যসত্যই জোড়হাতে কাতরকণ্ঠে কহিলাম,—"হে সুন্দরী! হে গায়িকে! হে মৌনবতি! তুমি সেতারের সঙ্গে সঙ্গে আপন কলকণ্ঠে ঐ গানটি গাহিয়া, আমাদিগকে রক্ষা কর।"

চক্ষু চাহিয়া দেখি, সম্মুখে হন্টার এবং বারওয়েল,—সাহেবদ্বয় উপস্থিত। তাঁহারা গোলযোগ দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি সসম্ভ্রমে তাঁহাদের বসিবার জন্য উপযুক্ত আসন আনাইয়া দিলাম এবং সংক্ষেপে রমণীর বৃত্তান্ত ইংরেজি ভাষায় কহিলাম।

সাহেবদ্বয় উপবিষ্ট হইলে, রমণী মধুরস্বরে আবার সেই গান সেতারে বাজাইতে লাগিলেন। আমি পুনরায় অনুনয় বিনয় করিয়া, রমণীকে ঐ গান সেতারের সহিত তদীয় কণ্ঠে, গাহিতে অনুরোধ করিলাম।

রমণী আকাশপানে চাহিয়া দেবগণকে প্রণাম করিলেন। শেষে তিনি সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির মুখপানে চাহিলেন। বৃদ্ধ কহিল,—"আচ্ছা, গাও; সময় ঠিকই হইয়াছে।"

রমণী তখন সেতারের সহিত স্বীয়কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলেন। সেতারের সুমধুর স্বরের সহিত, কামিনীর সেই কোকিল বিনিন্দিত কলকণ্ঠস্বর মিশাইয়া গেল। সেতার বাজিতেছে, কি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে, তখন আর কিছুই বুঝা গেল না। কেবল এক অনির্বচনীয় সুধারস শ্রোতৃবৃন্দ পান করিতে লাগিলেন।

সে গান হিন্দী ভাষায় বিরচিত। প্রথম ছত্র ব্যতীত সে গানের অন্য কোন অংশ আমার মনে নাই। আমার স্মারক-লিপির যে অংশে এই গান লিখিত ছিল, সে অংশের কতক একেবারে কীটদষ্ট, কতক জল পাইয়া পচিয়া গিয়াছে; কিছুই ভাল পড়িবার যো নাই। তবে গানের ভাব আমার মনে আছে। ভাব লইয়া বাংলা ভাষায় সে গানের কতক অনুবাদ করিয়া দিলাম।

খম্বাজ—একতালা।

শুন হে রাজন, অমিয় বচন,
হয়েছে হে আজু দিল্লীর পতন।
বাদসা বেগমে, ইংরেজ-চরণে,
লুটিয়া প'ড়েছে, লয়েছে শরণ।।
উঠ উঠ উঠ, উঠ ত্বরা করি,
দুঃখময় তৃণশয্যা পরিহরি,
রণসাজে ধাও, জয়গান গাও,
স্মরণ করিয়া শ্রীমধুসূদন!
(ওহে) ভয় নাই আর, ভয় নাই আর,
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার,
প্রভাত হইল, আঁধার ঘুচিল,
কমল ফুটিল, ঐ রবি-কিরণ।।

ছাপায় গানটি সমুদায় একত্র দেখিলেন। কিন্তু রমণী যখন গান-গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথম চারি ছত্র ব্যতীত অর্ধদণ্ডকাল গান আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। রমণীকে শ্রোতৃবৃন্দ কেহই সে গান সহজে সম্পূর্ণরূপে গাহিতে দেন নাই।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে, হিমালয় উড়িয়া চলিলে, সম্মুখে হঠাৎ শত শত বিষম বজ্রাঘাত এককালে হইতে থাকিলে, মানুষ যত না চমকিত, ত্রস্ত, কম্পিত-কলেবর হয়, প্রথম দুই ছত্র গান শুনিয়া আমরা তাহারও অধিক হইলাম। অদ্য "দিল্লির পতন কি?" —তবে কি ইংরেজের জয় হইয়াছে? পুনরায় কি ইংরেজ দ্বারা দিল্লী নগরী অধিকৃত হইয়াছে? এ শুভ সংবাদ এতদিন আমরা জানিতাম না। কিন্তু এই গায়িকা কেমন করিয়া জানিল? দিল্লির পতন! তাও কি কখন সম্ভব হয়? আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি। দেহও গুরুগুরু

কাঁপিতে লাগিল। শুভ সংবাদকে সত্য বিবেচনা করিয়া এক একবার উচ্ছ্বাসে উল্লাসে, আনন্দে চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। কিন্তু যখন শুনিলাম,—"বাদসা-বেগম, ইংরেজ-চরণে, লুটিয়া পড়েছে, লয়েছে শরণ"—তখন বাস্তবিকই আর ধৈর্য ধরিতে পারিলাম না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া সেই গায়িকাকে কহিলাম,—"হে সুন্দরী! বল, তুমি কে? তোমার কথা সত্য কি না? তোমাকে এ গান কে শিখাইল? বল,—বল,—দিল্লির পতন! এ সংবাদ সত্য কি না?"

ধওকল সিংহ প্রমুখ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্মচারী ঠিক আমার ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"কথা সত্য কি না?—কথা সত্য কি না?"

হন্টার সাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবু! ব্যাপার কি? সত্য সত্যই কি দিল্লির পতন হইয়াছে? অথবা এ রমণী আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য শত্রুদল-কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে?"

আমি! (ইংরেজিতে) কিছুই ত বুঝিতেছি না। ভিতরে অবশ্যই গভীর রহস্য আছে। কিন্তু রমণীর মোহিনী মূর্তি দেখিয়া এবং সরস সরল স্বর শুনিয়া, আমার ত এমন মনে হয় না যে, এ রমণী মায়াবিনী, নিশাচরী!

হন্টার। সুন্দর মূর্তিটুকু এবং রসাল কথাটুকু, এই দুটিতে একত্র হইয়াই ত মানুষকে মাটি করে। ভুবন-ভুলানীর ভাব সহজে কে বুঝিতে পারে? বহুরূপীকে, বহুরূপী বলিয়া সহজে যদি চিনিতে পারিবেন, তবে আর "সাজার" সার্থকতা এবং বাহাদুরী কি হইল?

এত অনুনয় বিনয় এবং আগ্রহ প্রদর্শন সত্ত্বেও রমণী কথা কহিলেন না। তবে এবার তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া গান আরম্ভ করিলেন,

উঠ উঠ উঠ, উঠ ত্বরা করি,
দুঃখময় তৃণশয্যা পরিহরি,
রণসাজে ধাও, জয়গান গাও,
স্মরণ করিয়া শ্রীমধুসূদন।।

আবার যুক্তকরে রমণীকে সাধিলাম। আবার ছল্ ছল্ নেত্রে রমণীকে কহিলাম, "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন;—কথা বলুন!"

কঠিনা কামিনী কাহারও কথা শুনিলেন না, একটি কথাও কহিলেন না। কেবল দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালনপূর্বক আমাদিগকে ধৈর্য করিতে (ইঙ্গিতে) বলিলেন।

আমরা নীরব, নিস্পন্দ। রমণী পুনরায় সেতারের সহিত গান আরম্ভ করিলেন,—

(ওহে) ভয় নাই আর, ভয় নাই আর,
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার!
প্রভাত হইল, আঁধার ঘুচিল,
কমল ফুটিল, ঐ রবি-কিরণ।।
(হয়েছে হে আজু দিল্লির পতন!)

আমার অঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অন্যান্য শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধীর, স্থির। কথা কন, এমন শক্তি বুঝি আর কাহারও নাই। গান শেষ হইলে, হন্টার সাহেব হিন্দি ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আপনার গানে আমরা বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্য কবিয়া বলুন. দিল্লির পতন যথার্থ ঘটিয়াছে কি না? ইংরেজের জয় হইয়াছে কি না? বাদশাহ বেগম বন্দি হইয়াছে কি না? আপনি এ

সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? এ গান কাহার তৈয়ারি? এ গান কাহার নিকট আপনি গাহিতে শিখিলেন?"

রমণী সেতার রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া যোড়হাতে উত্তর করিলেন,—"বাবু সাহেব! আমাকে কি আপনি চিনিতে পারিতেছেন না?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। বিস্ময় শতগুণে বৃদ্ধি হইল। ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলাম, "তুমি কি মিশ্র বৈজনাথের লোক! তুমি স্ত্রী নহ, পুরুষ!"

তখন সেই রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীবেশ ফেলিয়া দিল। ভিতরে পুরুষবেশ আঁটা ছিল। মুহূর্ত মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই পুরুষ দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিল, "হুজুর! সত্য সত্যই ইংরেজের জয় হইয়াছে! আমরাও সেই সঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিলাম, "জয়, ইংরেজের জয়! জয়, ইংরেজের জয়!" শত শত সেনাকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "জয় ইংরেজের জয়! জয় জয়—দিল্লীর পতন।" নিয়ম রহিল না, শৃঙ্খলা রহিল না, প্রকরণ রহিল না, পদ্ধতি রহিল না, লঘু-গুরু ভেদ রহিল না,—সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিল,—

জয় ইংরেজের জয়,
জয় ইংরেজের জয়!

● ● ●

আনন্দ-উল্লাসের উৎসব-ভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইলে আমি গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসিলাম,—"মিশ্র বৈজনাথের কোন পত্র আছে কি?"

গুপ্তচর। না। আপনি আমাকে চেনেন বলিয়াই তিনি কোন পত্র দিলেন না। প্রভু মহাশয় এই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাবু সাহেব জিজ্ঞাসিলে কহিও,—"পত্র দিবার আবশ্যকতা নাই। যুক্তিযুক্তও নহে। যদি কোন গতিকে পত্র ধরা পড়ে, তাহা হইলে পত্রপ্রেরক এবং পত্রবাহক উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইবে।"

আমি। তুমি স্ত্রীবেশ ধরিয়া আসিলে কেন?

গুপ্তচর। আপনি বোধ হয় জানেন, "বিশেষ পাশ" ব্যতীত, বেরিলী শহর হইতে কাহারও বাহির হইবার যো নাই। শহরের চারিদিকেই ঘাটির পাহারা আছে। শুনিলাম, পূর্বদিকের ঘাঁটির যিনি অধ্যক্ষ, তিনি বড়ই সেতারপ্রিয়। নারীবেশ ধারণ করিলে, সহজেই অধ্যক্ষের মন মোহিত করিতে সক্ষম হইব, ভাবিয়া আমি নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলাম। একদিন, দুইদিন, তিনদিন,—ক্রমান্বয়ে চারিদিন গিয়া তাঁহার নিকট সেতার বাজাইলাম। দেখিলাম, তাঁহার মন পূর্ণমাত্রায় মোহিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি প্রস্তাব করিলাম, একবার রামপুর যাইবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। পিতা মাতা ভ্রাতার অনেক দিন কোনো সংবাদ পাই নাই। আপনি কৃপা করিয়া, রামপুর গমনের যদি একখানি পাশ বা অনুমতিপত্র দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। অধ্যক্ষ কহিলেন, ইহা কোন্ বিচিত্র কথা? পাশ ত দিবই; ইহা ব্যতীত, দুইজন সওয়ার আমাদের সীমানা পর্যন্ত আপনার পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। আমি কহিলাম, তাহাই হউক। এইরূপ কৌশলে আমি বেরিলী হইতে এই শুভ সংবাদ লইয়া এই বৃদ্ধ ভৃত্যের সমভিব্যাহারে পঞ্চমদিনে পলাইয়া আসিয়াছি।

আমি। তুমি কি সেই অবধি এ পর্যন্ত স্ত্রীবেশই ধরিয়া আছ নাকি?

গুপ্তচর। না। নবাব খাঁ বাহাদুরের সীমা পার করিয়া দিয়া, অশ্বারোহীদ্বয় প্রত্যাবর্তন করিল। আমিও ভাড়া চুকাইয়া দিয়া পাল্কী বেহারাগণকে বিদায় দিলাম। তখন স্ত্রীবেশ ছাড়িয়া পুরুষবেশ ধরিলাম—দীর্ঘ দাড়ি, গেরুয়া বসন, জটা, কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী সাজিলাম। বৃদ্ধ ভৃত্যের নিকট এই ক্ষুদ্র ডুগি এবং সেতার থাকিত। বাল্যকাল হইতেই গানে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমি পথে এক প্রকাণ্ড বন-বৃক্ষের তলায় বসিয়া এই গানটি বাঁধিয়াছিলাম। এই গানটি আপনা-আপনি কতবার গাহিয়াছি, কতবার কাঁদিয়াছি। নির্জন স্থান পাইলেই সেতারে এই গানের আলাপ করিতাম। হলদোয়ানির প্রথম ঘাঁটি যখন এক ক্রোশ দূরে আছে অনুমান হইল, তখন যোগীবেশ ছাড়িয়া আবার নারীবেশ ধরিলাম।

আমি। নারীবেশ হঠাৎ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি?

গুপ্তচর। নারীবেশে গান খুলিবে ভাল,—গানের জমাট হইবে ভাল,—এই জন্যই নারীবেশ ধরিয়াছিলাম।

আমি। ইংরেজের জয়, দিল্লির পতন এবং বাদসা বেগম হওয়া, এ সকল সংবাদ কিরূপে কোথা হইতে পাইলে?

গুপ্তচর। সর্বপ্রথমে প্রভু-মহাশয় দিল্লির নিকটস্থ তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে পত্র দ্বারা এ শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই পত্রখানি হেঁয়ালির ভাবে লিখিত, সহজ অর্থ বোধ হইবার যো ছিল না। তাহার দুইদিন পরে, ইংরেজের বিজয় সংবাদ লইয়া, একজন গুপ্তচর খাস দিল্লি শহর হইতে আগমন করে। যিনি চরপ্রেরক, তিনি একজন ধনাঢ্য জমিদার, এবং আমার প্রভুর বিশেষ বন্ধু। ঐ চরমুখে আমরা দিল্লির যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়াছি।

আমি। আর কোন সূত্রে দিল্লির পতনের সংবাদ পাইয়াছ কি?

গুপ্তচর। এই পতন সংবাদ এক্ষণে বেরিলী সহরময় রাষ্ট্র। মেয়ে ছেলে বুড়ো সকলেই এ সংবাদ লইয়া গোপনে আন্দোলন করিয়া থাকে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহারও বলিবার যো নাই।

আমি। নবাব খাঁ বাহাদুর এ সংবাদ শুনেন নাই কি?

গুপ্তচর। শুনিয়াছিলেন বৈ কি? এ সংবাদ যাহাতে প্রচার না হয়, প্রজাগণ যাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হয়, তাহার জন্য তিনি বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন।

আমি। তিনি কিরূপে এ সংবাদ শুনিলেন? এবং এ কথা ঢাকিবার জন্যই বা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?

গুপ্তচর। যে দিন দিল্লির পতন হয়, তাহার পরদিন প্রাতে উঠিয়াই কানাঘুষা শুনিতে আরম্ভ করিলাম, ইংরেজের জয় হইয়াছে। এমনও আজগুবি সংবাদ প্রচার হইতে লাগিল, ইংরেজের বড়লাট, স্বয়ং বিবাহ করিবেন বলিয়া বেগমকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। দশ-বার ঘণ্টা মধ্যে কিরূপে যে, এ সংবাদ দিল্লি হইতে বেরিলী আসিল, তাহাই এখন ভাবিতেছি। এই সংবাদ প্রথমে কে আনিল? কে প্রথম প্রকাশ করিল? তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। ক্রমশ নবাব বাহাদুরের কানেও এ কথা উঠিল। কিন্তু সহজে তিনি এ সংবাদ বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বিশ্বাস না করুন, সহরবাসীগণ মধ্যে প্রায় সকলেরই ধ্রুব ধারণা জন্মিল যে সত্য সত্যই ইংরেজের জয় হইয়াছে। ক্রমশ আমরা দিল্লি হইতে পত্র

পাইলাম, সংবাদ সত্য। দিল্লি হইতে একজন গুপ্তচর আসিয়াও এ কথার অনুমোদন করিল। এইরূপে বেরিলী শহরবাসী আরও পাঁচ-সাতজনের নিকট দিল্লি হইতে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে, দিল্লির পতন হইয়াছে; দশহাজার মুসলমান-সৈন্য নিহত হইয়াছে; প্রায় বিশ হাজার মুসলমানকে ইংরেজ কর্তৃক ফাঁসিকাঠে ঝুলান হইয়াছে; ইংরেজের জয় হইয়াছে।

আমি। শহরবাসী অন্যান্য লোকে যখন সঠিক সংবাদ পাইল, তখন কেবল নবাব খাঁ বাহাদুর পাইলেন না কেন?

গুপ্তচর। সঠিক সংবাদ তিনি কেন পাইলেন না, কেমন করিয়া বলিব? এ দুঃখ-সংবাদ তাঁহাকে দিতে কেহ সাহস করে নাই। ঘাটে ঘরে-মাঠে কেবল ঐ কথাই জল্পনা হইতে লাগিল, যখন বেরিলী শহরে এক ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, নবাবপক্ষীয় সৈনিক-কর্মচারিগণ যখন কথঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিল,—তখন নবাব প্রকাশ্য দরবারে অতি গম্ভীরভাবে, ঈষৎ ক্রোধের সহিত এইরূপ ঘোষণা করিলেন, কে বলিল, দিল্লীর পতন হইয়াছে? এ সমস্তই মিথ্যা কথা। কুলোকে এ কু-কথা রটাইয়াছে; ইহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। আমি আমার প্রজাবৃন্দকে সত্য করিয়া বলিতেছি, পূজনীয় দিল্লির বাদশাহ সুস্থ স্বচ্ছন্দ শরীরে আছেন; তিনি একবার নহে, সাতবার ইংরেজ-সেনাকে পরাভূত করিয়াছেন। যেমন সিংহের নিকট মেষশাবক, সেইরূপ দিল্লীর সম্রাটের নিকট ইংরেজ-সেনা আজ অবস্থিত। তোমরা ভয় করিও না, উৎসাহ-হীন হইও না। বাদশাহ যে জীবিত আছেন এবং তিনি যে, সম্যক্‌রূপে রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। সম্প্রতি তিনি আমাকে মণিমুক্তা-হীরক-খচিত এক বহুমূল্যের পোশাক পুরস্কারের স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। দিল্লির বাদশাহ-প্রেরিত দূতগণ সেই পরিচ্ছদ এবং খেলাৎ লইয়া আওলা নামক গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কল্যই আমি দ্রুতগামী উটের সওয়ার পাঠাইয়া সেই পরিচ্ছেদ এবং খেলাৎ আনাইতেছি। অতএব দিল্লির পতন-সংবাদ মিথ্যা। নবাবের মুখ-নিঃসৃত কথা শুনিয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিল। দুইদিন পরে নবাব নাগরা বাজাইয়া ঘোষণা দিলেন,—"খেলাৎ এবং পরিচ্ছদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দীপচাঁদ শেঠের বৃহৎ বাগানে খেলাৎ ও পরিচ্ছদ রক্ষিত হইতেছে। তথায় অদ্য নবাব স্বয়ং যাইয়া খেলাৎ গ্রহণ করিবেন। হিন্দু-মুসলমান প্রজা যে যেখানে আছে, দীপচাঁদের বাগানে সকলে গিয়া হাজির হইও।" মহা সমারোহে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করত নবাব খাঁ-বাহাদুর দীপচাঁদের বাগান অভিমুখে চলিলেন। বহুলোকের সমাবেশ হইল। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। খাঁ-বাহাদুর সুবর্ণ-হীরক-মুক্তা-মণ্ডিত পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। সর্বলোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই পোশাক দিল্লির সম্রাটের প্রদত্ত। নবাবের সম্মানে ২১টা তোপধ্বনি হইল। লোক সকল নবাবকে, যাহার যেমন সাধ্য নজর দিতে আরম্ভ করিল। মোহর টাকা, আধুলি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার বসিয়া গেল। কিন্তু দুঃখ এই খাঁ-বাহাদুরের এ সুখ এ আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে সময় নবাব সহচরবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া, পূর্ণমাত্রায় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় একজন ভীমকলেবর অশ্বারোহী, ভীমবেগে দীপচাঁদের বাগানে, সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। সেই অশ্বারোহী, নবাবকে এক নির্জন গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেল। সকলে চমকিত এবং ভীত হইল। এই অশ্বারোহীর নাম আলি ইয়ার খাঁ। এই ব্যক্তি

অশ্বারোহী দলের একজন অধ্যক্ষ। নবাব দিল্লি-পতনের প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য গোপনে ইহাকে দিল্লি পাঠাইয়াছিলেন। অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, তখনও নবাব নির্জন গৃহ হইতে ফিরিয়া সভাস্থলে আর উপনীত হইলেন না। দেওয়ান শোভারাম তখন নবাবকে দেখিতে সে নির্জন গৃহে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, নবাব পীড়িত হইয়াছেন, নবাব এখন আর বাহির হইবেন না,—অদ্য আপনারা সকলে ঘরে যাউন। এই কথা বলিবামাত্র সভা ভঙ্গ হইল।

আমি। আলি ইহার খাঁ কি সংবাদ আনিয়াছিল?

গুপ্তচর। শেষে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আলি ইয়ার খাঁ, যখন নবাবকে বলে যে দিল্লির পতন হইয়াছে, ইংরেজের হস্তে বাদসাহ বন্দি হইয়াছেন, তখন নবাব অমনি থর্ থর্ কাঁপিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্ছা গেলেন।

আমি। আচ্ছা, তবে বহু মূল্যের পোশাকটি নবাবকে কে পাঠাইয়াছিল?

গুপ্তচর। পোশাকটি জাল। নবাব নিজেই উহা তৈয়ারী করাইয়া নিজেই পরিয়াছিলেন। কেবল লোক ভুলাইবার জন্য, তিনি তাহা দিল্লির বাদশার প্রদত্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, দিল্লির পতন হয় নাই। সেই ধারণাবশেই তিনি দিল্লির বাদশাহের নাম দিয়া সেই পোশাক প্রস্তুত করান।

আমি। তারপর কি হইল?

গুপ্তচর। নবাব সেই দিন হইতে রাজকার্য বড় একটা দেখেন না। রাজ্যের সমস্ত কার্যই শোভারাম, সইফউল্লা খাঁ, এবং নিয়াজ মহম্মদ, এই তিন জনের দ্বারা নির্বাহিত হইতেছে।

আমি। ইঁহারা কেমন রাজকার্য করিতেছেন?

গুপ্তচর। নবাব অপেক্ষা অনেক ভাল। ইঁহারাও কিন্তু "দিল্লির পতন" এ কথা সত্য নহে,—সর্বদাই এই সংবাদ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। কোথাও কিছুই নাই, হঠাৎ সেদিন বারজন অশ্বরোহী নবাবগৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমরা দিল্লি হইতে আসিতেছি। দিল্লির বাদসাহ ভাল আছেন। ইংরেজ-সৈন্য বহুবার পরাজিত হইয়াছে। ইংরেজের জয়ের আর কোন আশা নাই। দিল্লীর বাদসাহের মোহরাঙ্কিত এই পত্র লউন।" বলাবাহুল্য, এ সমস্তই শোভারামের কৌশল। তিনিই এই অশ্বারোহীদলকে এইরূপ ভাবে সাজিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।

এইরূপ অনেক কথাবার্তার পর, আমি গুপ্তচরকে কহিলাম, "তুমি বিশ্রাম কর, কিছু আহারাদি কর।"

গুপ্তচর কহিল, "বিশ্রামের সময় নাই,—আহারেরও সময় নাই। বড় গুরুতর সংবাদ আছে। শীঘ্র প্রস্তুত হউন। আমি যে কেবল দিল্লির পতনের সংবাদ দিতে আসিয়াছি, তাহা নহে,—ইহা অপেক্ষাও অধিক বিষম সংবাদ দিবার জন্য আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি।

আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "কি সংবাদ?—কি গুরুতর সংবাদ?"

গুপ্তচর। নির্জনে কহিব। কর্ণেল ক্রশম্যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সম্মুখে আপনাকে এ সংবাদ কহিব। অন্যের নিকট বা অন্যরূপে এ সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে।

● ● ●

কর্ণেল ক্রশম্যান সেদিন হলদোয়ানিতে ছিলেন না। নেপালের রাজা আমাদের সাহায্যার্থ একদল গোরখা সৈন্য নাইনিতালে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরিদর্শনার্থই তিনি নাইনিতালে গিয়াছিলেন।, আমি, গুপ্তচর, লেফটেনান্ট বারওয়েল এবং আটজন রক্ষক সওয়ার—আমরা এই এগারজন তখন অশ্বারোহণে নাইনিতাল যাত্রা করিলাম। নাইনিতালে পৌঁছিয়া দেখি, সাহেবগণ এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে, রুদ্ধদ্বারে, গোপনে কি পরামর্শ করিতেছেন। মানব মাত্রেরই তথায় প্রবেশ নিষেধ। সশস্ত্র প্রহরীগণ দ্বারদেশে পাহারা দিতেছে। আমাদের আগমন বার্তা, সাহেবগণকে জানাইবার জন্য তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারা কহিল, "কেমন করিয়া সংবাদ দিব? কারণ, কোন ব্যক্তিরই ভিতরে যাইবার অধিকার নাই।"

শীতকালের রাত্রে, নাইনিতালে, রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আমরা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। সভা ভাঙিলে সাহেবগণ বাহিরে আসিলেন। যত বড় বড় উচ্চপদস্থ সাহেব নাইনিতালে ছিলেন, সকলেই সেদিন ঘবে একত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে এরূপভাবে দেখিয়াই চমকিত হইলেন। ক্রশম্যান ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সংবাদ কি?" আমি প্রকৃত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলাম। তখন ক্রশম্যান আমাদিগকে লইয়া পুনরায় সেই মন্ত্রণা-গৃহে গেলেন। গুপ্তচরকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, "বল, তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ? যাহা জান, ঠিক তাহাই বলিও, একচুল এদিক ওদিক করিও না।"

চর যোড়হাতে কহিল,—"প্রথম সংবাদ দিল্লির পতন। দ্বিতীয় সংবাদ, নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ ষোলহাজার সৈন্য একত্র করিয়া, হলদোয়ানি এবং নাইনিতাল আক্রমণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। দেওয়ান শোভারামের পরামর্শে এই সকল কাজ হইতেছে। আর বড় অধিক বিলম্ব নাই। সম্ভবত দুই দিন মধ্যে অসংখ্য মুসলমান সৈন্যদ্বারা হলদোয়ানি পরিবেষ্টিত হইবে। হলদোয়ানির ১৪ মাইল দূরে ফজল হক প্রায় সাত হাজার সৈন্য লইয়া সান্ডা নামক স্থানে ছাউনি করিয়া আছে। আর একজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ, তাহার নাম কালে খাঁ, প্রায় দশসহস্র সৈন্য লইয়া বহেড়ি নামক স্থানে আড্ডা করিয়াছেন। বহেড়ি হলদোয়ানি হইতে ষোলমাইল দূরস্থ। অতি গোপনে এরূপ সেনাসমাবেশের কায সংসাধিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে এইরূপে বন্দোবস্ত ছিল, একদল সৈন্য সম্মুখ হইতে এবং অন্যদল সৈন্য পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হলদোয়ানি আক্রমণ করিবে। কিন্তু শত্রুদল, এক্ষণে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, এক নূতন কল্পনা করিয়াছে। কালে খাঁর সৈন্য গতকল্য চারপুরা নামক স্থানে আসিয়া ছাউনি করিয়াছে। ঐ স্থানে, শীঘ্রই তিনি ফজল হকের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবেন। উভয় সৈন্য একত্র হইলে কালে খাঁ প্রায় ষোল হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া হঠাৎ হলদোয়ানি আক্রমণ করিবেন।

● ● ●

কর্ণেল ক্রশম্যান কহিলেন, "তোমার সংবাদ সত্য। গতকল্য আমরাও এই ভাবের সংবাদ পাইয়াছি।"

ক্রশম্যান তখন এক ভীতি-ব্যঞ্জক বংশীধ্বনি করিলেন। আবার নাইনিতালের প্রধান প্রধান সাহেবগণ, রাত্রি ১০টার সময় সেই মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইলেন। আবার রুদ্ধদ্বারে পরামর্শ হইল। রাত্রি ১১টার সময় আবার সভাভঙ্গ হইল। আমরা কর্ণেল ক্রশম্যানের

সহিত সেই রাত্রেই নাইনিতাল হইতে হলদোয়ানি প্রত্যাগত হই। অদ্যকার তারিখ ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ।

পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারি, বেলা দশটার সময় নাইনিতাল হইতে প্রধান প্রধান সাহেবগণ হলদোয়ানিতে আসিলেন। সর্বসুদ্ধ ৮০ জন ইংরেজ একদল হইয়া উপনীত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহরে আবার একশত ইংরেজ হলদোয়ানিতে আগমন করিলেন। নাইনিতাল সাহেবশূন্য হইল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্রশম্যান সাহেবের বৃহৎ তাঁবুর ভিতর সাহেবগণ কি একটা পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহারা অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইলাম। কর্ণেল ম্যাক্সল্যান্ড সাহেব আমাকে বলিলেন,—"অদ্য রাত্রে আমরা এখান হইতে যাত্রা করিয়া বিদ্রোহী সেনাদিগকে আক্রমণ করিব; তুমি চুপে চুপে রেসালাদারগণকে এই সংবাদ জানাও এবং সেনানিবাসে যাইয়া যে সকল সৈন্যকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বল।"

আমি এই আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লাইনে আসিলাম এবং অশ্বারোহী সেনাগণকে যোদ্ধৃবেশে সাজিয়া শ্রেণিবদ্ধ হইতে বলিলাম। এই কথা শুনিয়া ছয় শত সওয়ার শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদের মধ্য হইতে তিন শত কর্মক্ষম, অমিত বলশালী অশ্বারোহীকে মনোনীত করিয়া লইলাম। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং ঘোড়া যুদ্ধের উপযোগী ছিল। তাহাদের ঘোড়াগুলিকে পৃথক স্থানে বাঁধিতে বলিয়া কর্ণেল সাহেবের আদেশ শুনাইয়া বলিলাম, "তোমরা যুদ্ধের জন্য সশস্ত্রে প্রস্তুত থাক। হুকুম পাইবামাত্র ঘোড়ায় জিন আঁটিয়া যাইতে হইবে।" এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া, সাহেবকে আসিয়া সংবাদ দিলাম। সাহেব বলিলেন, যখন আবার প্রয়োজন হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবেন।

এই কথা শুনিয়া আমি বাসায় আসিলাম। কিন্তু তখন আমার অন্য চিন্তা ছিল না, যুদ্ধের চিন্তাতেই আমার মন নিমজ্জিত হইয়াছিল। এ সময়ে কোন কাজ করা উচিত, কি করিলে মঙ্গল হইবে, কি কাজই বা বাকী থাকিল, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটি কথা মনে উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ লাইনে গেলাম এবং সেখানে যে সকল শাণকারক ছিল, তাহাদিগকে ডাকাইয়া অস্ত্র-শস্ত্রে শাণ দিতে বলিলাম। বারুদাগার হইতে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টোটা বাহির করিয়া, প্রত্যেক সিপাহীকে ৩০টা করিয়া দিলাম, অবশিষ্ট কার্ট্রিজ দুইটা বাক্সে বন্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য রাখিলাম। যে সকল খালাসী ভিস্তি আমাদের সঙ্গে যাইবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত লোক আনিবার জন্য হাসপাতালে একখানি মাত্র ডুলি এবং ছয়জন কাহার ছিল; কিন্তু তাহাতে কাজ চলিবে না ভাবিয়া নাইনিতাল হইতে আরও ডুলি এবং ডান্ডি আনাইলাম। ডাক্তার বাবু নন্দকুমার মিত্রকে বলিলেন, যে সকল ঔষধ এবং অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা যেন স্থির করিয়া রাখিয়া দেন। যে সকল বাকী বাক্স পেটরা (Medicine instruments) লইয়া যাইবে তাহা, তাহাদিগকে গোছাইয়া স্থির করিয়া রাখিতে বলিলাম। এই সকল কার্য নির্বাহ করিতে রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল।

সমস্ত দিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া অতিশয় ক্লান্তি বোধ হইল, বিশ্রামলাভার্থ বাসায় আসিলাম। বাসায় আসিয়া বসিতে না-বসিতে একজন আরদালি আসিয়া সংবাদ দিল,

কর্ণেল সাহেব আপনাকে ডাকিতেছে। আমার শ্রান্তি দূর করা আর হইল না; তৎক্ষণাৎ সাহেবসমীপে উপস্থিত হইলাম। সাহেব বলিলেন, "যুদ্ধের জন্য সমস্ত প্রস্তুত আছে কি না?" আমি অতি বিনয়-নম্রভাবে বলিলাম যে, সকলই প্রস্তুত আছে এবং যেরূপ বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল, একে একে তাহাও বলিলাম! কর্ণেল সাহেব তাহা শুনিয়া অপরিসীম আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "অভিযানের আর অধিক বিলম্ব নাই; রাত্রি ১০টার সময় সকলকে যাত্রা করিতে হইবে।" অধিকন্তু তিনিও যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে চলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "নেপালের জঙ্গ বাহাদুর আমাদের সাহায্যের জন্য যে একদল গোরখা পল্টন পাঠাইয়াছেন, তাহারা গতকল্য নাইনিতালে আসিয়াছে; তাহাদের অর্ধেক এবং সরকারি যে গোরখা সৈন্য আছে, তাহারও অর্ধেক লইতে হইবে। নাইনিতালে কি সিবিল, কি সামরিক বিভাগের সাহেব, এমন কি সাহেব কেরানিরাও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের সংখ্যা দুইশতের ন্যূন হইবে না। কাশীপুরের জঙ্গলের দিকে আমাদের যে প্রায় দেড়শত সরকারি হাতি আছে, তাহা পাঠাইয়া দিবার জন্য কাপ্তান ব (Baugh) সাহেবকে লেখা হইয়াছে। হস্তীদল অতি ত্বরায় আসিতেছে। পদাতিক সৈন্যেরা এই সকল হস্তী আরোহণে যাইবে। এক্ষণে তুমি যাও, আর যদি কোন আয়োজনের বাকী থাকে, তাহা হইলে সে কাজ শীঘ্র যাইয়া সম্পন্ন কর। সওয়ারদিগকে অতি সাবধানে নিঃশব্দে প্রস্তুত হইতে বলিবে, বিউগল (বাঁশী) বাজাইতে নিষেধ করিবে। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র যাও।"

ইহা শুনিবামাত্র আমি দ্রুতপদে আবার লাইনে আসিলাম এবং যাহা করণীয় ছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। আরদালির কাজের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ৩০ জন সওয়ারকে সঙ্গে লইলাম। যে সকল সৈন্য অভিযানের জন্য প্রস্তুত ছিল, পরিদর্শনের জন্য তাহাদিগকে প্যারেডভূমিতে লইয়া গিয়া সাহেবদিগকে সংবাদ দিলাম, সাহেবেরা আসিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নাইনিতাল হইতে সৈন্যসামন্ত ও ঘোড়া সকল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের তিনটি (Mountain Trainguns) পর্বতের ব্যবহারোপযোগী কামান ছিল। একটি একটি কামান লইয়া যাইবার জন্য দুই দুইটি হাতি নিয়োজিত হইয়াছিল। পূর্বে হিন্দুস্থানী সিপাহিরাই গোলন্দাজের কার্য করিত, কিন্তু বিদ্রোহের সময় তাহাদের উপর সন্দেহ হওয়াতে সকলকে বিদূরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বিশ্বাস-হন্তারা বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহীদলের গোলন্দাজের কার্যে নিযুক্ত হয়। যাহা হউক, গোরখা পল্টনেরা ইহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। কর্ণেল ম্যাক্‌সল্যান্ড সাহেবের শিক্ষার অধীনে থাকিয়া এই গোরখারাই অতি অল্পকাল মধ্যে গোলন্দাজের কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল।

রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় অভিযানের জন্য সকলই প্রস্তুত, কেবল, হুকুম পাইবার অপেক্ষায় আমরা রহিয়াছি। শীতকাল হইলেও আজ রাত্রি তত হিমানীমণ্ডিত নহে। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশ অতি পরিষ্কার, চন্দ্রমা অতি সুনির্মল। শশধরের সমুজ্জ্বল কিরণে পৃথিবী যেন রজতময়ী হইয়া উঠিয়াছে। যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই সসজ্জ, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র চন্দ্রকরপ্রতিবিম্বিত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌মক্ করিতেছে। এদিকে অমিততেজা অশ্ব, যুদ্ধবাসনায় বড় অধীর হইয়া উঠিয়াছে; সম্মুখের পাদ দ্বারা সরোষে মৃত্তিকা খনন করিতেছে। গ্রীবা বক্র করিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক দেখিতেছে। খলীন চর্বনে মুখ

ফেনাযুক্ত হইয়াছে। মধ্যে হ্রেষারবে প্রান্তর কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। ঘোটকারূঢ় যোদ্ধারা অতিকষ্টে আপন অশ্বের বেগ সংযত করিয়া রাখিয়াছে। হস্তীরাও আজ রণমদে উন্মত্ত। তাহাদের সুবিস্তৃত পৃষ্ঠে সুন্দর আস্তরণ, অস্ত্রপাণি রণোন্মুখ যোদ্ধৃগণ তাহাতে সমারূঢ়। এই সকল সেনাকে পৃষ্ঠে করিয়া মনের আনন্দে হেলিতেছে দুলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে আস্ফালন করিতেছে। যাহা হউক, এখন সকলেই বীরমদে উন্মত্ত, মৃত্যুভয় সকলের হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছে; সকলের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে। তাহারা কেবল অধিনায়কের আদেশের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

এই সময়ে একজন চর শত্রু-শিবির হইতে আসিয়াছিল এবং আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "বিদ্রোহীদের অশ্বারোহী সেনার সামরিক পরিচ্ছদ কিরূপ?" সে বলিল, "ব্রিটিশসেনার পরিচ্ছদের সহিত শত্রুসেনার পোশাকে কোন প্রভেদ নাই। আমাদের সেনার ন্যায় তাহাদেরও নীলবর্ণের কোট, লাল উষ্ণীষ এবং লাল কোমরবন্ধ।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি সাহেবদের নিকট গিয়া বলিলাম, আমাদের সৈন্যের সামরিক পরিচ্ছদের সঙ্গে বিপক্ষ সেনার পোশাকের পার্থক্য নাই; সকলই একপ্রকার। এমন স্থলে রাত্রে ভ্রমবশত আত্মপর বিবেচনা না করিয়া হয়ত আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি হইতে পারে; সুতরাং ইহার কোন সদুপায় করা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল সাহেব বলিলেন, "এখন আর ইহার কি প্রতিকার করা যাইবে? সময় নাই।" আমি বলিলাম, "যদিও আর সময় নাই বটে, কিন্তু যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে এখনও ইহার প্রতিকারের উপায় আছে।" সাহেব বলিলেন "যদি এখনও ইহার প্রতিকারের পথ থাকে, তাহা হইলে এখনই তাহা কর, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

আমি আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে বাজারে গেলাম এবং এক দোকান হইতে দুই থান ধোয়া মারকিন ক্রয় আনিলাম। উক্ত থান হইতে ছয় ইঞ্চি চৌড়া, চার ফুট লম্বা, এইরূপ অনেক টুক্‌রা করিলাম। তাহার দুইখণ্ড করিয়া সওয়ারদের দুই বাহুর উপর বাজুর ন্যায় বাঁধিতে বলিলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া ফেলিল। আমি তখন সওয়ারদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে লইয়া সাহেবসমীপে উপস্থিত হইলাম। সাহেব আমার প্রতি সকরুণ কটাক্ষ করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে. এখন দূর হইতে অনায়াসে আমাদের সৈন্যকে চিনিতে পারা যাইবে।"

যুদ্ধযাত্রার জন্য আমাদের সকলে প্রস্তুত, আর বিলম্ব নাই। কিন্তু হলদোয়ানি ত অরক্ষিত ভাবে রাখা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ নানাস্থানে শত্রুসৈন্য শিবির সংস্থাপন করিয়া আছে, পাছে তাহারা অন্য কোনও পথে আসিয়া বিভ্রাট ঘটায়। এই নিমিত্ত আমরা হলদোয়ানি রক্ষার্থ ২০০ শত গোরখা সৈন্য আর একটি কামান রাখিলাম; অবশিষ্ট সওয়ারগণও রহিল। শত্রুসেনা পূর্বাহ্নে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিবে স্থির করিয়াছিল, তাহা না হইয়া আমরাই তাহাদের বিনাশ সাধনের জন্য অগ্রবর্তী হইলাম। রাত্রি যাই ১০টা বাজিল, অমনি আমাদের যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ হইল এই সেই সঙ্গে এ আজ্ঞাও প্রচারিত হইল যে যাইবার সময় কেহ কোন কথা কহিতে পারিবে না। যতদূর সম্ভব, আমরা অতি সাবধানে এবং নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

● ● ●

এ সময়ে আমিও অশ্বারূঢ় হইয়া যোদ্ধবেশে সাহেবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইতেছিলাম। সর্বাগ্রে আটজন সওয়ার এবং দুইজন দফাদার। তাহার পর জেনারেল টুরূপ, কর্ণেল ক্রশম্যান, কর্ণেল ম্যাক্‌সলেন এবং আমি. তারপর সমস্ত অশ্বারোহীদল। তারপর কামানশ্রেণি। অবশেষে হস্তিপৃষ্ঠে পদাতি সেনা। এইভাবে প্রথমে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম। আমি যখন রেসালার কর্ম করিতাম, তখন আমার বেশভূষা সকলই হিন্দুস্থানীদের ন্যায় ছিল এখনও সেই বেশ, সেই সবই। আমার পোশাক পরিচ্ছদ দেখিয়া হঠাৎ বাঙালি বলিয়া চিনিতে পারিবার যো ছিল না; সুতরাং আমি সহজে হিন্দুস্থানী সওয়ার হইয়া সৈন্য মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার মনে অন্য কোন চিন্তাই স্থান পাইতেছিল না। কেবল যুদ্ধই ধ্যান এবং যুদ্ধই জ্ঞান হইতেছিল। সমরসাজে সাজিয়া যুদ্ধে যাইতেছি, হয়ত শত্রুহস্তে নিহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, হয়ত অঙ্গচ্ছেদ হইয়া চিরদিনের জন্য বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিব, এ সকল কথা তখন মনে একবারও উদয় হয় নাই। তখন কেবল যুদ্ধের উৎসাহে মন একেবারে উৎসাহিত হইয়াছিল। কিসে শত্রুসেনার ধ্বংসসাধন করিব, তাহাই মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম। তখন আরও এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা হৃদয়মধ্যে তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

আমরা যখন নয় মাইল আসিয়াছি, তখন রাত্রি একটা বাজিল। শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমরা অর্ধঘণ্টাকাল একস্থানে বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। সেই নিশীথ সময়ে অন্ধকারময় নির্জন পথ দিয়া আমাদের সৈন্য চলিতে লাগিল।

রাত্রি চারিটা বাজিল, আমরা একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি, শত্রুদের পিকেট বা কতকগুলি প্রহরী, ঘাঁটি আগুলিয়া আছে। আমাদের অশ্বের পদশব্দে তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কোন হ্যায়"? কর্ণেল ক্রশম্যান তখন সকলের অগ্রবর্তী হইয়া যাইতেছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন,—"হামলোক মৌলবি ফজল-হক্ সাহেবকা আদমি হ্যায়, নবাব সাহেবসে মিলনে যাতেহে।" এই কথা শুনিয়া তাহারা নিরুত্তর হইল। আমরা দুইশত পদ অগ্রবর্তী হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিলাম। সেখানে যে সকল লোক প্রহরী ছিল, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশজন হইবে। এই সকল লোককে আমরা তরবারির আঘাতে এবং বর্শাফলকে একেবারে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত করিলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ প্রাণ লইয়া পালাইতে পারিয়াছিল কিনা, তাহা অন্ধকারে ভাল জানা গেল না। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমাদের তিনজন সওয়ার কিছু আহত হইয়াছিল মাত্র। আমরা এখানে এই শত্রুদলকে শমনসদনে পাঠাইয়া আবার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম।

এখানে হইতে চারপুরা প্রায় ৩ মাইল হইবে। কিছুক্ষণ পরে রজনী প্রভাত হইল। বাল-সূর্যের লোহিতোজ্জ্বল কিরণে পূর্বদিকে বিভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা একটি নিম্নস্থানে গিয়া ছাউনি করিলাম। এখানে হইতে শত্রু-শিবির প্রায় এক মাইল হইবে। কিন্তু তাহাদের ধবলাকৃতি শিবির, তাহাদের সৈন্য সামন্ত—অনায়াসে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। যে নিম্নভূমিতে আমরা শিবির স্থাপন করিলাম, তাহা আমাদের বিশেষ সুবিধাকর; ইচ্ছা করিলে আমরা অনায়াসে অলক্ষিতভাবে শত্রু-সেনাদের গতিবিধি দেখিতে পাই; কিন্তু তাহাদের নিকট আমরা অদৃশ্যভাবেই রহিলাম। এ বিগ্রহে কর্নেল ম্যাক্‌সল্যান্ডই অধিনায়ক ছিলেন, তিনিই ইহার সকল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

হস্তিপৃষ্ঠে যে সকল সেনা আসিয়াছিল, তাহারা অবতরণ করিলে, হস্তীগুলি মাহুতেরা জঙ্গল মধ্যে লইয়া গেল। পার্বত্যস্থানে ব্যবহারোপযোগী যে দুইটি কামান আনিয়াছিলাম, তাহা কামানধারে রাখিয়া যথোপযুক্ত স্থানে বসান হইল এবং সকল সৈন্যকে একত্র করা গেল।

তদন্তর কি করা কর্তব্য, তাহা নির্ধারণের জন্য সাহেবদিগের সমিতি বসিল। এখানে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। ম্যাক্সল্যান্ড সাহেব প্রস্তাব করিলেন,—"আমরা যে এখানে আসিয়াছি, এ সংবাদ বিদ্রোহিগণকে জ্ঞাপন করান উচিত।" কেহ বলিলেন, "একেবারে আমরা সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করি।" কেহ বলিলেন, "আমরা অতি অল্পমাত্র সেনা লইয়া আসিয়াছি, যদি আমরা একেবারে বিপক্ষদলের উপর চড়াও হই, তাহা হইলে আমাদের একজন সৈনিকের উপর তাহাদের ২৫ জন লোক পড়িলে নিশ্চয় আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে। এমন স্থলে প্রথমত আমাদের দূর হইতে তাহাদের সঙ্গে কামানের লড়াই করা শ্রেয়।

এই পরামর্শ স্থির করিয়া আমাদের পক্ষ হইতে একটি কামানের ফাঁকা আওয়াজ করা হইল। এই শব্দ হইবামাত্র শত্রুপক্ষ হইতে একেবারে ১০টা তোপধ্বনি হইয়া উঠিল। শত্রুদের গোলা ভীমবেগে আমাদের দিকে ছুটিতে লাগিল। কামানের মুহুর্মুহু গভীর নিনাদে পার্বত্যস্থান একেবারে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, আমরা নিম্নভূমিতে আড্ডা করিয়াছিলাম। বিপক্ষদলের গোলা প্রথমত আমাদের মস্তকের পাঁচহস্ত ঊর্ধ্ব দিয়া যাইতেছিল; কিন্তু ক্রমে গোলা আরও নিচে আসিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমরা ভূপৃষ্ঠে লম্বমান হইয়া শুইয়া পড়িতে আদেশ পাইলাম। এইভাবে আমাদের কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে হইল। এদিকে শত্রুরা অর্ধ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করিয়া করিয়া আপনাদের বারুদাগার অকারণে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের গোলাবৃষ্টি মন্দীভূত হইয়া আসিলে, আমরা আবার পূর্ববৎ দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলাম।

উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া যুদ্ধবিশারদ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ণেল ম্যাক্সল্যান্ড দূরবীক্ষণ দ্বারা শত্রুদের অধিকৃত স্থান বিশিষ্টরূপে পর্যবেক্ষণ করত আমাদের দুইটি কামান যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গোলা চালাইতে আদেশ দিলেন। আমাদের প্রথম দুইটি গোলায় বিপক্ষদের দুইটি কামান বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। আবার কয়টি গোলায় সেইরূপ কয়েকটি তোপ উল্টাইয়া পড়িল। এইরূপ কর্ণেল ম্যাক্সল্যান্ড সাহেবের বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে এবং তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে বিদ্রোহীদের সকল তোপই বিনষ্ট হইয়া গেল।

কামান নষ্ট করিয়া এবার আমাদের গোলা, বজ্রবেগে ঘোররবে শত্রু-সৈন্য মধ্যে পড়িতে লাগিল। কামানের ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিপক্ষ গোলন্দাজদিগের আর তথায় তিষ্ঠান ভার হইল, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল তথাপি নিস্তার নাই, আবার উপর্যুপরি গোলার উপর গোলা, তাহাদের সৈন্যমধ্যে পড়িতে লাগিল। এবার শত্রুসেনা অস্থির হইয়া প্রাণভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক্ষণে গোলা চালান আর উচিত নহে বিবেচনা করিয়া আমাদের কামান ছোঁড়া বন্ধ হইল। শত্রুসৈন্য আমাদের দিকে আসিতে লাগিল আমরা শত্রুসৈন্যের দিকে যাইতে লাগিলাম। এইবার বন্দুকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আমাদের সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্য ১৬০ জন এবং পদাতিক এক সহস্র ছিল। কিন্তু এরূপ সুকৌশলে তাহা শ্রেণিবদ্ধ করা হইয়াছিল যে দূর হইতে অনুমান হইত, আমাদের সঙ্গে ৩ দল অশ্বারোহী এবং ১২ দল পদাতিক সৈন্য রহিয়াছে। আমরা দুইটি কামান লইয়া দ্রুতগতিতে ভীমরবে দুর্দমনীয় পরাক্রমে শত্রুসেনা-তরঙ্গ মধ্যে গিয়া পড়িলাম। এখানে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। আমাদের সৈন্যেরা প্রথমত বর্ষার বারিধারার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ শত্রুদের উপর অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা আমাদের ভীষণ আক্রমণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। আমরা তাহাদের অনুসরণ করিলাম। প্রায় একশত জন বিদ্রোহীর পশ্চাতে আমরা কেবল দশ বার জন ধাবিত হইতেছিলাম; কিন্তু তাহারা প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই। যাহা হউক, যে স্থানে যাহাকে পাইলাম, তাহাকে হয় অসির আঘাতে, না হয় বর্শার ফলকে কিংবা বেয়নেটের খোঁচায় ভূতলশায়ী করিতে লাগিলাম। এরূপে আমরা পলায়নোদ্যত বিপক্ষদের পশ্চাৎ প্রায় দুই তিন মাইল গিয়া শেষে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম।

এ সময়ে সমরক্ষেত্রের ভীষণ ভাব দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে স্থান শত্রুশোণিতে একেবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকার মৃতদেহ, ছিন্নশির ছিন্নগ্রীব ছিন্নদেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বা কতকগুলি অর্ধমৃত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গুলিতে ক।হার বা জানু, কাহার বা হাত, কাহার বা অন্যান্য অবয়ব ভাঙিয়া গিয়াছে। কেহ উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া গভীর আর্তনাদ করিতেছে। কেহ বা আসন্নকালে আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করিয়া যাতনায় আরও অধীর হইতেছে। মুমূর্ষুদের ঈদৃশ হৃদয়ভেদী কাতরোক্তিতে কিয়ৎকালের জন্য মন বড় বিচলিত হইল। কিন্তু রণক্ষেত্রে এভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। যাহা হউক, চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, প্রায় বারশত শত্রুসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া রহিয়াছে।

আমি যখন এই সকল দেখিতেছিলাম তখন কর্নেল সাহেব আসিয়া বলিলেন, "যুদ্ধে আমাদের যে সকল সেনা আহত হইয়াছে, তাহাদিগকে ডুলি করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কিনা? এ সময়ে ডাক্তার নন্দকুমার মিত্রই বা কি করিতেছেন? তাহা একবার দেখা প্রয়োজন হইয়াছে।" আমরা এখানে উপস্থিত হইলে একটি বড় গাছের তলায় তৎসময়োপযোগী হাসপাতাল করিয়াছিলাম। সাহেবের এই কথা শুনিয়া, আমি দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি, আমাদের ষোল জন আহত সিপাহি তথায় রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহার বা তরবারির, কাহার বা গুলির আঘাতে হস্তপদ জখম হইয়াছে; কেহই মরে নাই। ডাক্তার নন্দকুমার বাবু বলিলেন, যে, যদিও সব ভাল বটে, কিন্তু তাঁহার বিষম আশঙ্কা হইতেছে, পাছে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে শত্রুরা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। নন্দকুমারবাবু যে একাকী ছিলেন, এমত নহে। তাঁহার জন্য ১২ জন অস্ত্রধারী রক্ষক অনবরত পাহারা দিতেছিল; তথাপি তাঁহার এরূপ ভয় দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। পরে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় আমি সমরক্ষেত্রাভিমুখে চলিলাম।

পথিপার্শ্বে কত শব পড়িয়া রহিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সময়ে সাধারণত বিশেষ সতর্কিতভাবে ছিলাম, শব্দ

শুনিবামাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, একজন ভগ্নোরু মুসলমান সিপাহি বসিয়া বসিয়া, সেকেলে একটি সুদীর্ঘ হিন্দুস্থানী বন্দুক হস্তে করিয়া, দ্বিতীয় হস্তে পলিতা গ্রহণ করত আমার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র তাহাকে বন্দুকে পলিতা সংযোজিত করিবার অবসর না দিয়া নিষ্কোষিত অসিহস্তে নক্ষত্রবেগে অশ্বসঞ্চালনপূর্বক, একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। আমার এরূপ ক্ষিপ্রকারিতায় লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং আর কোন উপায় না পাইয়া, তাহার দীর্ঘ বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা আমার ঘোড়াকে খোঁচা মারিতে উদ্যত হইল। আমার ঘোটক অত্যন্ত তেজঃশালী; সে আপনাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া, একেবারে ১০ হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল। ইত্যবসরে উক্ত সিপাহি পুনরায় বন্দুকে রঞ্জুক দিয়া আমাকে গুলি করিবার জন্য পলিতা মাটিতে ঘষিয়া পুনরায় বন্দুকে সংলগ্ন করিবার প্রয়াস পাইল। আমিও আর বিলম্ব না করিয়া, তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করিলাম। সেও পূর্বের ন্যায় আমার অশ্বকে খোঁচা মারিতে উদ্যত হইল। সুশিক্ষিত ঘোটক একলম্ফে শত্রুর আক্রমণের সীমা অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে পড়িল। এইরূপে সেও আবার বন্দুকে রঞ্জুক দিয়া পলিতা মাটিতে ঘষিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা বিধিমতে করিতেছে, আমিও তাহার মুণ্ডপাতের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহার কৃতকার্য না হইবার পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায় ছিল যে, তাহার বন্দুকটি দেশী, রঞ্জুক বারুদ দিয়া পলিতা দিতে হইত। বারুদে পলিতা সংযুক্ত করিবার পূর্বেই আমি তাহার সমীপবর্তী হইতাম, সে আত্মরক্ষার্থ বন্দুক দ্বারা আঘাত করিতে আসিত, আর রঞ্জুকের বারুদ পড়িয়া যাইত। পুনরায় বারুদ দিতে বিলম্ব হইত বলিয়া, আমাকে গুলি করিতে পারে নাই। যাহা হউক, আমি তখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এ দুর্বৃত্ত আমার প্রাণ-বিনাশ না করিয়া ছাড়িবে না, আমিও তাহাকে কিন্তু অবসর দিতেছি না। আমারও বিশেষ অসুবিধা, এই আমি অশ্বপৃষ্ঠে রহিয়াছি; সে ভূতলে বসিয়া আছে। তাহার বন্দুক আমার তরওয়াল হইতে বড়, লম্বা; এজন্য তাহাকে আঘাত করিবার সুবিধা হইতেছে না।

আমরা কিয়ৎকাল এইরূপ পরস্পর বিনাশের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, লেফটেনান্ট বারওয়েল সাহেব তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,— "Banerjee! where is your revolver. have you forgotten it ?" অর্থাৎ "তোমার পিস্তল কোথায়? তাহার বিষয় কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?" এই কথা শুনিবামাত্র আমার চেতনা হইল। আমার জিনের সম্মুখে চামড়ায় বাঁধা দুই পার্শ্বে যে দুইটি পিস্তল ছিল, একথা আমার তখন আদৌ স্মরণ ছিল না। পিস্তলের নাম হইবামাত্র আমার তখন তাহার মনে পড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ তরবারি দাঁতে ধরিয়া পিস্তলটি ক্ষিপ্রহস্তে যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া, শত্রুর মস্তক লক্ষ্য করত একেবারে উপর্যুপরি দুইটি আওয়াজ করিলাম। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, দ্বিতীয় গুলি তাহার বক্ষঃস্থলে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের বন্দুক মাটিতে পড়িয়া গেল এবং সেও "লা এলাইললিল্লা মহম্মদ রসুল উল্লা" বলিয়া পঞ্চত্ব পাইল। এই সময়ে বারওয়েল সাহেব আমাব নিকট উপস্থিত হইলেন। আমরা উভয়ে সেই হত সৈনিক পুরুষকে দেখিতে গেলাম। দেখি যে, যুদ্ধের সময় গুলি লাগিয়া তাহার দক্ষিণ জানুর হাড় ভাঙ্গিয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। আমাকে একাকী দেখিয়া আত্মজীবনের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার জিঘাংসাবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু শেষে আমারই হস্তে তাহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইল।

আমরা এখানে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে রণস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমে আমার সঙ্গে চারিজন এবং লেফটেনান্ট বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে পাঁচ জন সওয়ার আসিয়া জুটিল। কর্ণেল টুরুপ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "যুদ্ধস্থানে যদি আমাদের কোন লোক আহত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তাহাকে হাসপাতালে পাঠাও।"

এই আদেশ পাইবামাত্র আমি তখনই সেই চারিজন সওয়ার সঙ্গে করিয়া যুদ্ধস্থানের চতুর্দিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় এক মাইল দূর গিয়াছি, এমন সময়ে বিদ্রোহীদের পাঁচ জন অশ্বারোহী সেনা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। প্রথমে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, পরে অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। আমরাও অতুল সাহসে দ্রুত বেগে বিপক্ষদের সম্মুখীন হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য একজন বিদ্রোহী সেনা কোথা হইতে অতি দ্রুতবেগে হঠাৎ একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার মস্তক লক্ষ্য করত তরবারির আঘাত করিল। সে প্রহার আমি কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। শত্রুর অসি আমার উষ্ণীষে এবং কপালে লাগিল। আমি তখন তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলাম না। আহত হইয়া আমার হস্তে যেন দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইল; আক্রমণকারী আঘাত করিবার সময় আমার দিকে কিছু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আমি এই অবসরে আমার হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার তরবারি দৃঢ়তর মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া আঘাতকারীর কণ্ঠে দারুণ প্রহার করিলাম। আমার তরবারি তাহার কণ্ঠ প্রায় ৩ ইঞ্চি ভেদ করিয়া ফেলিল। সে আর অশ্বের বেগ সংযত করিতে পারিল না, তাহাতেই ঢলিয়া পড়িল; হস্তস্থিত তরবারি, ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভূতলে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ সকল বিষয় লিখিতে যত বিলম্ব হইল, তাহার সিকি বা সিকির সিকি সময়ের মধ্যে এ সকল কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাকে ভূমিশায়ী করিয়া সঙ্গীদেব দিকে চাহিয়া দেখি, তাহারাও শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। আমি পিস্তল লইয়া শত্রুদের উপর গুলি চালাইলাম, একজন জখম হইয়া পড়িয়া গেল; অপর তিনজন প্রস্থান করিল। আমাদের চারিজন সওয়ার তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আমি আর গেলাম না, কারণ আমার কপালে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে উষ্ণীষ ও দক্ষিণ ভ্রুর উপর চারি অঙ্গুলি চর্ম কাটিয়া চক্ষের উপর ঝুলিতেছিল; রক্তস্রোতের গাত্রবস্ত্র প্লাবিত করিতেছিল। আমি উক্ত চর্ম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উষ্ণীষের কাপড় দ্বারা তাহা অতি দৃঢ়রূপে বন্ধন করত আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

অনতিবিলম্বে আমার সঙ্গী তিনজন সওয়ার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বিদ্রোহীরা পলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের একজন সঙ্গী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, এমনকী, সে অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে অক্ষম।" আমি ডুলি আনিয়া উক্ত আহত ব্যক্তিকে শীঘ্র হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম। একজন সওয়ার ডুলির সঙ্গে গেল। আমি দুই সওয়ারকে সমভিব্যাহার করত কর্নেল টুরুপ সাহেব যেখানে ছিলেন, সেই দিকে অশ্ব চালাইলাম। যাইবার সময় দেখি, রণস্থলের একদিকে লেপ্‌টেনান্ট বারওয়েল এবং তাঁহার পাঁচ জন সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীকে, বিপক্ষদের সাত জন সওয়ার আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে; উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। আমরা সেই দিকে অশ্ব ধাবিত কবিলাম এবং

তাহাদের নিকটবর্তী হইলে উপযুক্ত অবসর পাইয়া পিস্তল ছুঁড়িলাম। গুলি একজনের ঘোড়ার মস্তকে লাগিল, আরোহীসুদ্ধ ঘোড়াটি মাটিতে বসিয়া পড়িল। এই সময়ে আমার সঙ্গের একজন সওয়ার দ্রুতগতিতে তথায় গিয়া শত্রুপৃষ্ঠে দারুণ বর্শা দ্বারা আঘাত করিল, সে আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বারওয়েল সাহেবের সাহায্যার্থ আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া বিদ্রোহী সেনা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কিন্তু যাইবার সময় তাহারা মধ্যে একজন আমাকে গুলি করিল। গুলি আমার পায়ের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়া হাঁটুর অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম না। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে শত্রুদের যে সকল কামান ছিল, তাহা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া হাতি দ্বারা টানাইয়া আনিলাম। আমাদের সৈন্যেরা বিপক্ষদের যাহা কিছু পাইল, সকলই লুঠপাট করিতে লাগিল। এই কার্য সম্পন্ন করিতে বেলা দুইটা বাজিল।

এই সময় পার্শ্বস্থ জঙ্গল মধ্যে দামামাধ্বনি হইল। ইহা শুনিয়া আমরা অনুমান করিলাম, বিদ্রোহীরা হয় ত আবার সাজিয়া আসিতেছে। অমনি কর্নেল ম্যাক্সল্যান্ড যে দিক হইতে দামামার শব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে তোপের মুখ ফিরাইয়া উপর্যুপরি সাত আটটা গোলা চালাইলেন। সেই অগ্নিময় লৌহপিণ্ড গভীর গর্জনে বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করত বনস্থলী বিকম্পিত করিয়া তুলিল। শত্রুরা প্রাণভয়ে কোথায় যে পলাইয়া গেল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

যুদ্ধাবসানে দেখা গেল, আমাদের সৈন্যের দুইজন ইংরেজ অফিসার যোদ্ধা হত এবং নয় জন ইংরেজ আহত হইয়াছেন। অশ্বারোহীদের মধ্যে সাতজন হত, বাইশ জন আহত এবং পদাতিকদলের মধ্যে বারজন হত ও উনিশ জন আহত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, শত্রু সেনাদের মধ্যে প্রায় বার শত লোক রণস্থলে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে! আর কতজন যে আহত হইয়াছে, তাহা গণনার অতীত। হতাবশিষ্ট ভয়ত্রস্ত বিদ্রোহীগণ প্রাণ লইয়া একেবারে আঠার উনিশ মাইল দূর বেরিলীতে প্রস্থান করিয়াছিল।

জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া আমরা হলদোয়ানিতে প্রত্যাগত হইলাম। সৈন্যগণের বিজয়-উল্লাসে পথ, প্রান্তর, কানন একেবারে নিনাদিত হইতে লাগিল। কয়েকজন গোরখা-ভাট বিজয়গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি ৯টার সময় আমরা হলদোয়ানিতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসানে, আমরা পুনরায় বেরিলী সহরে আসিলাম। যেদিন বেরিলী প্রথম প্রবেশ করি, সেই দিন দেখিলাম, সহর শূন্যময়। পথে একটিও লোক নাই। দোকান বন্ধ! বড় বড় অট্টালিকা জনমানববিহীন। আমরা যখন বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন আমাদের ঘোড়ার পদশব্দে চারিদিক ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আবার বেরিলীতে ইংরেজের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। কিন্তু আর না। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট জীবনী আর লিখিবার উপযুক্ত নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮১২-১৮৫৯

[বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনপর্বের অসামান্য দিক্‌পাল পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনায়। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সাংবাদিকতায় যুগান্তর সৃষ্টি করেন। কবি ও পাঁচালিকারদের জীবনী সংগ্রহ করেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে, তার বিবরণ প্রকাশ করেন "সংবাদ প্রভাকরে"। এই রক্ষণশীল মানুষটি কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের বিরুদ্ধ-মনোভাব পোষণ করতেন।]

নানাসাহেব

নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ধন?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জন?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে মন?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে পণ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ডাক?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?
প্রকাশিছে পাপপন্থা, হয়ে পন্থী "ঢুঢু?"
'ঢু' মারিতে জানে শুধু ঘটে তার "ঢুঢু?"
নানাপাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা।
ভাল-দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখে ফাঁদ।।

কানপুরের যুদ্ধে জয়

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে।।
ছেড়ে সে নিজ দেশ
ছেড়ে সে নিজ দেশ। রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিশের করে।।
হয়ে সে পুত্র হত
হয়ে সে পুত্র হত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো কপালে তবু হ'ল না সন্তান।।

কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
পুত্র হ'ল 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা।।
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি করে তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন, না করিতে পারে।
নানা কি নানাকেলে,
নানা কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত জারি?
যাহা স্বেচ্ছা, তাহা করে, হয়ে স্বেচ্ছাচারী।।
হ'লে সে পাসার ছেলে,
হ'লে সে পাসার ছেলে, চাষার ছেলে,
কেন তবে চলে?
হয়ে কাল, বামা, বাল নাশে নানা ছলে।।
হ'ল সে হ'লই হিন্দু,
হ'ল সে হ'লই হিন্দু, দোষের সিন্ধু
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে।।
সেটা তো একা নয়,
সেটা ত একা নয়, দুরাশয়,
তাই তার ভোলা।
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে ক'রে খোলা।।
বড় সে ধূর্ত হাদা,
বড় সে ধূত হাদা, ফেরে গাধা
বড় দাদার হিতে।
"একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে"।।
জুটেছে সমান দুটো,
জুটেছে সমান দুটো, দাঁতে কুটো,
কর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ি খেলে ছড়ি, ফির্‌বে দেশে দেশে।।
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো করে দেহ।
বংশে যেন বাতি দিতে, নাহি থাকে কেহ।।
তারা, যে পন্থী ঢুঢু,
তারা যে পন্থী ঢুঢু ঘরে ঢুঢু,

গেলে ছারেখারে।
হাড়ে মাটি, ঘাড়ে দুর্ব হ'ল একেবারে।।
বিঠুরে আর কি আছে?
বিঠুরে আর কি আছে নানার কাছে,
নাইক কাণাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে যাবে গড়াগড়ি।।
ছিল যার বস্তু যত,
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুঠে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে, হাম্বা ব'লে ছুটে।।
হয়েছে হতভোম্বা,
হয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি।।
করেছে যেমন মতি,
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে।।
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে,
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে, টোলে টোলে,
ধরি পদ তলে।
থাবড়া মেরে হাবড়া পথে, চালান দেহ জলে।।
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মারামারি
কর্‌বে গোরা সবে।
বাঘের গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে?
নানা না, পাপী নানা,
নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা,
কয়ো না রে কেহ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ।।
লেখনী থাকো থেমে,
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হ'তে হবে।
কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে।।
সেটা তো কতক ভাল,
সেটাত কতক ভালো, ধর্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারী হত্যা, শিশুহত্যা, করে নিক বটে।।

তবু ত অত্যাচারী,
তবু ত অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোল্‌তে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে।।
হয়ে সে রাজ্য ছাড়া,
হয়ে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে?
কর্মদোষে ধন-দোষে, অধঃপাতে যাবে।
ছোট তার সিংহ অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর?
গুমর করে কিসে?
চামর হয়ে কোমর বেঁধে, সমর করে কিসে?
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে ক'সে।
এক চাপড়ে অস্ত যাবে, দন্ত যাবে খ'সে?
মেতেছে মানসিং,
মেতেছে মান সিং, নেড়ে শিং,
কিং হবে ব'লে।
কুর্ত্ত হয়ে ধূর্ত্ত যান, অভিমানে গোলে।।
হবে শেষ মানসিংহ,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হন্যা হয়ে ম'রে যাবে, ঘেই ঘেই ডেকে।।
থেকে সে অনুগত,
থেকে সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি-দোষে মরে।
খানা কেটে লোনা জল, ঢুকাইল ঘরে।।
এই ভাই বড় মজা,
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিঁপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে।।
হ্যাদে কি শুনি বাণী?
হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,

গোয়ালের দলে।
এতদিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে।।
হয়ে শেষ নানার নানী,
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী
দে'খে বুক ফাটে।
কোম্পানির মুলুকে কি, বর্গিগিরী খাটে?
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে,
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগল দেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চ'ড়ে ঘাড়ে ক'সে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে।।
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা,
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা ব'লে।
কোপে প'ড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ্ব'লে।।
কেবলি মর্জ্জি তেড়া,
কেবলি মর্জ্জি তেড়া, কাজে ভেড়া,
নেড়া মাথা যত।।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত।।
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া,
যেন ঝাললঙ্কা পোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামিতে ভরা।
টেনি প'রে চটে বসে, ধরা দেখে সরা।।
তারা ত হয়ে ঢোঁড়া,
তারা ত হয়ে ঢোঁড়া, যেন বোড়া,
দিতে এলো টক্র।
একরত্তি বিষ নাইক, কুলো পানা চক্র।।
সাজ রে যত গোরা,
সাজ রে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে শক্ত হয়ে রক্ত খাও ফেঁড়ে।।
যত পাও, খেয়ে সেরি,
যত পাও খেয়ে সেরি, হয়ে মেরি,
পাত্র হাতে ধ'রে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ হিপ হুরে"।।
এত শীতে বড় ঠান্ডি,
এ শীতে বড় ঠান্ডি, রম ব্রান্ডী,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেও, ঈশু-গুণ গেয়ে।।

ঘুচিল শক্র-ভয়,
ঘুচিল শক্র-ভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি।।
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড,
কলিন কাম্বেল।
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল।।
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শক্র কুলে, ক'রে দাও গয়া।।

দিল্লির যুদ্ধ

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।।
জয় জয় জগদীশ করুণা-নিধান।
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান।।
কুজনের কদাদেশে কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া।।
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান।
হয়েছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ।।
ঘেরেছিল চারিদিক দিল্লির ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর।।
বিশাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হায়।
কাতব হইযা কত ডেকেছি তোমায়।।
অপার কৃপার নিধি তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে হইলে সদয়।।
তোমার কৃপায় হ'ল শক্র পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর কিছু নাই ভয়।।
পড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিশ-ধ্বজা সমুদয় স্থলে।।
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা যারে যথা পাবে।
ফুড়ুক ফুড়ুক করি সুড়ুক কে খাবে?
ধুড়ুক ধুড়ুক ক'সে তোপ দিলে দেগে।
ভুড়ুক ভুড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে।।
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে স'রে।
ঘেউ ঘেউ ফেউ ফেউ কিঁউ কিঁউ ক'রে।।

শরতের মেঘ সম ডাকডোক সার।
প্রভাকর-প্রভাবেতে কিছু নাই আর।।
ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ।
অত্যাচার-অন্ধকার হইল বিনাশ।।
নিজ নিজ কার্য-তরু করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হ'ল বিপক্ষের বন।।
হোরা মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন।।
পলাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে ক'রে ল্যাজ।।
মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীর সমান।
দিল্লির প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান।।
পূর্ববৎ পুনর্বার নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়।।

প্রতিফল পেলে ভাল হাতে হাতে।
ঠিকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে।।
উড়ে গেল কত সেনা গোলা ঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে।।
ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে।।
করিয়াছে মছলন্দ দূর্বাঘাসে।
পশুসহ পশু হল বসবাসে।।
ওরে তোরা নরাধম যত দুষ্ট।
কার বলে হয়েছিলি এত পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজপদে নহে তুষ্ট
চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট।।

এলাহাবাদের যুদ্ধ

প্রয়াগেতে ছিল যত সিফায়ের দল।
একেবারে সকলেতে হ'ল হতবল।।
অধিকার করেছিল তরণীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু।।
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে।।
এখন গোরার মুখে এই মাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা যাও যথা তথা।।

আগরার যুদ্ধ

আগরার নাগরায় মারিয়াছে কাঠি।
বীরদাগে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটি।।
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোন্‌খানে ভাগিয়াছে তারা।।
হেল্লা ক'রে কেল্লা লুঠে দিল্লির ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত অহঙ্কার ভরে।।
এখন সে কেল্লা কোথা হেল্লা কোথা আর?
জেম্মা মেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহার?
ছেড়ে পাল্লা বলে আল্লা পড়েছি বি[illegible]।
কাছা খোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে।।
সবার প্রধান হয়ে সে তুলেছে খড়ি।
দিল্লির দুর্গেতে থেকে গুনিয়াছে কড়ি।।
হইয়া হুজুর আলি হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হুকুম জারি তাজি ঘোড়া চড়ি।।
নিদয় স্বভাব ধরি ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড় যত ধন কড়ি।।
মনে মনে লঙ্কা ভাগ আঁক দিয়া খড়ি।
তাকায়েছে চারিদিক্ পাকায়েছে দড়ি।।
মনোরাজ্য কারি আগে যে বাজালে দামা।
রণ রঙ্গ দেখছিল ছুড়ে ঢিল ঝামা।।
ধরিয়াছে রাজবেশ পোরে টুপী জামা।
কোথা সেই কালনিমে রাবণের মামা?

যুদ্ধ-শান্তি

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার।।
পুনর্বার হইয়াছে দিল্লি অধিকার।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার।।
অকারণে ক্রিয়াদোষে করে অত্যাচার।
মরিল দুজন তাঁর প্রাণের কুমার।।
ছেলে মেয়ে আদি করি যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে শুধু হাহাকার।।
কোথা সেই আস্ফালন কোথা দরবার?
হাড়ে মাটি বাড়ে দুর্বা হয়ে গেল সার।।
একেবারে ঝাড়ে বংশে হল ছারখার।
শিশু সব মারা যাবে বিহনে আহার।।

দূরে থাক্ সমুদায় সম্পদ সঞ্চার।
পড়িয়া ব্রিটিশ কোপে প্রাণে বাঁচা ভার।।
করেছিল যে প্রকার বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল ফ'লে গেল তার।।
অদ্যাপিও রবি শশী হতেছে প্রচার।
অদ্যাপিও হয় নাই সত্যের সংহার।।
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক করেন বিহার।
তিনি কি কখনো সন এত পাপভার?
কোথা দয়াময় সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা মরি কিবা করুণা তোমার।।
অন্তরীক্ষে থেকে সব করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয়দানে সাধ্য আছে কার।।
সমুচিত শাস্তি পেলে যত দুরাচার।।
অতএব তব পদে করি নমস্কার।।

যমুনার জল আর পূর্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণার সে জল আর কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব শব ঠাঁই ঠাঁই রে।।
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে সকল সিপাই রে।
একূল ও কূলে তার ভস্ম আর ছাই রে।।
কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে।
শকুনি গৃধিনী উড়ে শব্দ সাঁই সাঁই রে।।
শা-জাদার শোণিতেতে মিটে গেল খাঁই রে।
খেয়ে সব পরাভব মেনেছে সবাই রে।।
স্থানে স্থানে মৃতদেহ পর্ব্বতের চাঁই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে কোথা শুয়ে সুখে নিদ্রা যাই রে?
সব দিকে সমদশা কোন দিকে চাই রে?
এ দেশেতে নাহি দেখি হিংসাহীন ঠাঁই রে।।
যুমনার তটে এসে যমুনার ভাই রে।*
বিকট বদনে এক বিস্তারিল হাই রে।।
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ বলিহারি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু আপদ বালাই রে।।
ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগুণ গাই রে।।

*যম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮১৭-১৯০৫

[জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির কৃতী সন্তান দেবেন্দ্রনাথ। পিতা দ্বারকানাথ সেকালের বিখ্যাত জমিদার ও শিল্পপতি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এই দীর্ঘজীবী মানুষটি সনাতন হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করার মানসে যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার অন্যতম ছিল ব্রাহ্মসমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত সমকালীন সমাজ জীবনের অতুলনীয় আলেখ্য। ঐ গ্রন্থ থেকে সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হল।]

সিপাহি বিদ্রোহ*

১লা জ্যৈষ্ঠ দিবসে সিমলাতে সংবাদ আইল যে, সিপাহিদের বিদ্রোহে দিল্লি ও মিরাটে একটা ঘোরতব হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠতে কমাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল আন্সন দাড়ি কামাইয়া একটা বেতো ঘোড়ায় চড়িয়া সিমলা হইতে নীচে চলিয়া গেলেন। সিমলার অতি নিকটবর্তী স্থানে একদল গুর্খা সৈন্য ছিল, তিনি যাইবার সময় সেই গুর্খা সৈন্যদলের কাপ্তানকে হুকুম দিয়া গেলেন যে, 'গুর্খা সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিও।' গুর্খারা নির্দোষ, তাহাদের সঙ্গে সিপাহিদিগের যোগ নাই, কোন সম্বন্ধ নাই। সাহেবেরা জানেন যে, কালা সিপাই সবই এক। বুদ্ধির দোষে গুর্খাদিগকে নিরস্ত্র করিবার হুকুম হইল। কাপ্তান যেই গুর্খাদিগকে বন্দুক রাখিতে হুকুম দিলেন, অমনি তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। তাহারা ভাবিল যে, প্রথমে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পরে তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবে। এই ভাবিয়া তাহারা প্রাণের দায়ে সকলে একমত একজোট হইল। তাহারা কাপ্তানের হুকুম মানিল না, বন্দুক রাখিল না; পরন্তু তাহারা ইংরাজ অফিসারদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ সিমলা আক্রমণ কবিতে আসিতে লাগিল।

এই সংবাদে সিমলার বাঙালিরা তাহাদের পবিবার লইয়া উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। এখানকার মুসলমানেরা মনে করিল যে, তাহাদের রাজ্য আবার তাহারা ফিরিয়া পাইল। একজন দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড দাড়িওয়ালা ইরানি কোথা হইতে বাহির হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিতে লাগিল, 'মুসলমানকো হারাম খিলায়া, হিন্দুকো গৌ খিলায়া, অব্ দেখ লেঙ্গে কৈসে ফিরিঙ্গি হ্যায়!' একজন বাঙালি আসিয়া আমার কাছে বলিল, 'আপনি নিরুপদ্রবে বেশ বাড়িতে ছিলেন, এ উপদ্রবে কেন এখানে এলেন? আমরা এ পর্যন্ত এমন উপদ্রব দেখি নাই।' আমি বলিলাম 'আমি একলা মানুষ, আমার ভাবনা কি? কিন্তু যাঁহারা পরিবার লইয়া এখানে রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই জন্য ভাবিতেছি। তাঁহাদেরই মহা বিপদ।'

তথাকার সাহেবেরা সিমলা রক্ষা করিবার জন্য একত্র হইয়া, কতকগুলা বন্দুক লইয়া একটা উচ্চ পাহাড়ে চতুর্দিক ঘিরিয়া বিবিদের সঙ্গে বসিয়া রহিল। সিমলা রক্ষা করিবেন

* *আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

কি, সেখানে তাহারা মদ্যপানে মত্ত হইয়া আমোদ কোলাহল ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

তথাকার কমিশনার সুধীর ও কার্যকুশল লর্ড হে সাহেবই সিমলা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন গুর্খা সৈন্যের সিমলাতে আগমনসূচক তোপ পড়িল, তখন তিনি নিজের প্রাণের ভয় ত্যাগ করিয়া সেই মাহুত-বিহীন প্রমত্ত হস্তীযূথের ন্যায় সৈন্যদলের সম্মুখে মাথার টুপি খুলিয়া সেলাম করিতে উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়ের সহিত আশ্বাসবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া সিমলাতে আসিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে ট্রেজরি প্রভৃতি রক্ষণের ভার তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন।

ইহাতে সেখানকার সাহেবরা লর্ড হে সাহেবের প্রতি ভারী বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল—'লর্ড হে সাহেব কিছুই বিবেচনা করিলেন না; তিনি আমাদের ধন প্রাণ মান সকলি বিদ্রোহী শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাদিগের নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়া ইংরাজ জাতির কলঙ্ক করিলেন। তিনি আমাদের প্রতি ভার দিলে আমরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিতাম।' আমাকে একজন বাঙালি আসিয়া বলিল, 'মহাশয়! গুর্খারা যদিও সব অধিকার পাইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাদের রাগ পড়ে নাই। তাহারা ইংরাজদিগকে বড়ই গাল দিতেছে।' আমি বলিলাম, 'উহাদের রক্ষক নাই, কাপ্তান-হীন সেনা; এখন বকুক, আবার সব শান্ত হইয়া যাইবে।'

কিন্তু সাহেবেরা একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা নিরাশ হইয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, গুর্খারা যখন সিমলা অধিকার করিয়াছে, তখন পলায়ন ব্যতীত প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় নাই। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা সিমলা হইতে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই প্রহরের সময় দেখি যে, দাণ্ডি নাই, ঝাঁপান নাই, ঘোড়া নাই, সহায় নাই, এমন অনেক বিবি খদ দিয়া ভয়ে দৌড়িতেছে। কে বা কাহাকে দেখে কে বা কাহার তত্ত্ব লয়? সকলে আপনার আপনারই প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। সিমলা একেবারে সন্ধ্যার মধ্যে লোকশূন্য হইয়া পড়িল। যে সিমলা মনুষ্যের কোলাহলে পূর্ণ ছিল তাহা আজ নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। কেবল কাকের কা কা ধ্বনি সিমলার বিশাল আকাশকে পূর্ণ করিতেছে!

সিমলা যখন একেবারে মানবশূন্য হইল, তখন অগত্যা আমাকে আজ সিমলা ছাড়িতে হইবে। যদিও গুর্খারা কোন অত্যাচার না করে, তথাপি খদ হইতে উঠিয়া পাহাড়ীরা সব লুঠ করিয়া লইতে পারে। তবে আজ বেহারা কোথায় পাওয়া যায়? সওয়ারী না পাইলেও সিমলা হইতে যে হাঁটিয়া পলাইতে হইবে, আমার এত ভয় হয় নাই। এই সময়ে একটা রক্ত-চক্ষু দীর্ঘ কৃষ্ণ পুরুষ আসিয়া আমাকে বলিল, 'কুলিকা দরকার হ্যায়? কুলি চাহিয়ে?' আমি বলিলাম 'হাঁ চাহিয়ে।' বলিল, 'কয়ঠো'? বলিলাম 'বিশঠো কুলি চাহিয়ে।' 'আচ্ছা, হম লাকে দেগা, হমকো বক্সিস দেনে হোগা' এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে সওয়ারীর জন্য আমি একটা দোলা সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।

আমি রাত্রিতে আহার করিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে, তখন 'দরজা খোলো' 'দরজা খোলো' শব্দের সহিত দুয়ারে ধাক্কা পড়িতে লাগিল। বড়ই কোলাহল হইতে লাগিল। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, অত্যন্ত ভয় হইল—বুঝি এইবার গুর্খাদের হস্তে মারা পড়িলাম। আমি ভয়ে ভয়ে দুয়ারটা খুলিয়া দিলাম। দেখি যে, দীর্ঘাকার

আত্মজীবনী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃষ্ণবর্ণ লোকটা বিশজন কুলি লইয়া ডাকাডাকি করিতেছে। আমি প্রাণের ত্রাস হইতে রক্ষা পাইলাম। তাহারাই আমার রক্ষক হইয়া ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি শুইয়া রহিল। আমার প্রতি ঈশ্বরের যে করুণা, তাহা একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, আমি সিমলা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলিরা বলিল যে, অগ্রে টাকা না পাইলে তাহারা যাইবে না। আমি টাকা দিবার জন্য 'কিশোরি, কিশোরি' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথায় কিশোরী? তাহার কাছে খরচের টাকা ছিল, আর আমার কাছে একটা বাক্স ভরা এক বাক্স টাকা ছিল। ভাবিয়াছিলাম, এত টাকা কুলিদিগকে দেখাইব না। কিন্তু কিশোরী নাই, কুলিরাও টাকা ব্যতীত উঠে না। আমি তখন তাহাদিগের সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া প্রতিজনকে তিনটা করিয়া টাকা দিলাম, সেই সর্দারটাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলাম; এমন সময়ে কিশোরী উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম 'এমন সঙ্কট সময়ে তুমি এখান হইতে কোথায় গিয়াছিলে?' বলিল যে, 'একটা দরজি আমার কাপড় সেলাইয়ের দর চারি আনা অধিক চায় বলিয়া তাহা চুকাইতে এত বিলম্ব হইয়া গেল!'

আমি এখন সেই দোলায় চড়িয়া ডগশাহী নামক আর একটা পর্বতে চলিলাম। সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় কুলিরা আমাকে একটা প্রস্রবণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে বসিল, এবং তাহারা পরস্পর কথাবার্তা ও হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলাম যে, 'ইহারা হয় তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়া এই সকল টাকা লইবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। ইহারা এখন এই জনশূন্য অরণ্য হইতে আমাকে খদে ফেলিয়া দিলে আর কেহই জানিতে পারিবে না।' এ কেবল আমার মনের বৃথা আতঙ্ক। তাহারা জল পান করিয়া পুনর্বার সবল হইয়া আমাকে একটা বাজারে লইয়া দুই প্রহর রাত্রিতে নামাইল।

সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। আমার পকেটের কতকগুলো টাকা-পয়সা বিছানাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেখি যে, সেই কুলিয়া সেইসব কুড়াইয়া আনিয়া আমাকে দিল। তাহাতে তাহাদের উপরে আমার বড়ই বিশ্বাস জন্মিল। আমি মধ্যাহ্নকালে ডগশাহীতে পঁহুছিলাম।* তাহারা আমাকে একটা খোলার ঘরে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী সন্ধ্যাব সময়ে আমার কাছে পঁহুছিল। খদের ধারে একটা গোয়ালার বাড়ির উপরে একটা ভাঙা ঘর থাকিবার জন্য পাইলাম, এবং শয়নের জন্য একখানা দড়ির খাটিয়া পাইলাম। ইহাতেই সেই রাত্রি যাপন করিলাম।

তাহার পর আমি সকালে উঠিয়া পর্বতের চূড়াতে চলিয়া গেলাম। দেখি, সেই চূড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্যেরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িছে, তাহার নীচে একটা গোরা একটা খোলা তরোয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেই বাক্সের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং অতি ভয়ে ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম এ কী আমার উপরে তাহার তলওয়ার চালায়। কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে আমাকে জিজ্ঞাস করিল, 'গুর্খারা কি এখানে আসিতেছে?' আমি বলিলাম, 'না এখনো এখানে আসে নাই।' আমি সেখান হইতে বাহিরে আসিলাম এবং খুঁজিয়া একটি ক্ষুদ্র গুহা পাইলাম,

---
* ১৮৫৭ খ্রিঃ ১৮মে।

তাহার মধ্যে ছায়াতে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাকালে নীচে পর্বতে আসিয়া সেই গৃহে শয়ন করিলাম। সেই রাত্রিতে অল্প বৃষ্টি হইল; আর সে ঘরের ঘরত্ব থাকিল না। ভাঙা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে আমার সেই বনবাসে দিনরাত্রি কাটিয়া যাইত।

কাবুল লড়াইয়ের ফেরতা ঘোষজা ও বসুজা দুইজন এই ডগশাহীতে এখন ডাকঘরে কর্ম করেন। তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন। বসুজা বলিলেন 'আমি কাবুলের লড়াই হইতে বড় বেঁচে এসেছি। পলাইয়া আসিবার সময় কাবুলের পথে একখানা শূন্যঘর দেখিতে পাইয়া আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং একটা মাচার উপর উঠিয়া লুকাইয়া রহিলাম। সেখানে কাবুলীরা আমাকে দেখিতে পাইয়া মারে আর কি! অনেক কষ্টে বাঁচিয়া আসিয়াছি। আবার এখন এই বিপদ।'

আমি সেখানে যে কয় দিন ছিলাম প্রতিদিন ঘোষজা আমার তত্ত্ব লইতেন। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঘোষজা, আজিকার খবর কি?' তিনি বলিলেন, 'আজিকার খবর বড় ভাল নয়। আজ সব ডাক জ্বালাইয়া দিয়াছে।' তাহার পর দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঘোষজা, আজিকার কি খবর?' বলিলেন, 'আজিকার বড় ভাল খবর নয়। আজ জলন্ধর হইতে বিদ্রোহীরা আসিতেছে। ঘোষজার নিকট হইতে একদিনও ভাল খবর পাওয়া যায় না। তিনি প্রতিদিনই মুখ ভার করিয়া আসেন। আমি এইরূপে অতিকষ্টে এগারো দিন অতিবাহিত করিলাম।

এখন সংবাদ আইল যে, সিমলা নির্বিঘ্ন হইয়াছে, আর কোন ভয় নাই। আমি সিমলা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম। কুলি আনিতে পাঠাইলাম, শুনিলাম কুলি নাই, ওলাউঠার ভয়ে তাহারা পলাইয়াছে। একটা ঘোড়া পাইলাম। সেই ঘোড়াতে বৈকালে সওয়ার হইয়া চলিলাম। খানিক দূর আসিয়া রাত্রিতে একটা আড্ডায় থাকিলাম। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে আমি আবার সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে লাগিলাম। কিশোরীকে আর আমার সঙ্গে পাইলাম না। সেই আবরণহীন পর্বতে তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই প্রখর হইয়াছে, একটু ছায়ার জন্য আমি লালায়িত হইলাম, কিন্তু একটি বৃক্ষ নাই যে আমাকে একটু ছায়া দেয়। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে আর একটি মানুষ নাই যে একবার ঘোড়াটা ধরে। আমি সেই অবস্থায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চলিয়া একটা বাঙ্‌লা পাইলাম। ঘোড়াটিকে এক স্থানে বাঁধিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। একটু জল চাহিতেছি, দৈবক্রমে পলায়িতা একটি বিবি সেখানে ছিলেন, তিনি সমদুঃখে দুঃখী হইয়া আমার জন্য একটু মাখন ও তপ্ত আলু আর একটু জল পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা খাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিলাম। সন্ধ্যার সময় সিমলাতে পঁহুছিলাম। দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছি। কিশোরী, আছো এখানে? এখানে কি আছো? দেখি যে, কিশোরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

আমি ডগশাহী হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে* সিমলায় ফিরিয়া আইলাম।

*১৮৫৭ খ্রিঃ মে ৩০।

রাজনারায়ণ বসু
১৮২৬-১৮৯৯

[সিপাহি বিদ্রোহের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯০৫ সালে বাঙালির যে মানসিক জাগরণ ঘটে, তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের এই কৃতী ছাত্র ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ১৮৫৮ সালে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওযার পর, শ্রমিক-কৃষকদের জন্য বাত্রিকালীন বিদ্যালয় এবং বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি নারী বিদ্যালয স্থাপন করেন। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা সৃষ্টির পিছনে ছিল রাজনারায়ণের পরিকল্পনা। 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সংগঠনেরও ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী ও সভাপতি। বাংলার যুব সমাজকে বিপ্লবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার পিছনে এই সভার অবদান রয়েছে। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যও ছিলেন।]

সিপাহি বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়। সিপাহি বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ মে বিদ্রোহী সিপাহিরা মিরাটনগর ত্যাগ করিয়া দিল্লি গমন করে। সিপাহিদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহির পলটনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহির পল্টন ছিল তাহার নাম শেকাওয়াতী ব্যাটালিয়ন। কর্নেল ফস্টার এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসি দেন। একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষত ফিনিকসন কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙালিদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা একদিন সাহেবরা ক্যান্টনমেন্ট গিয়া সিপাহিদিগের ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান-দূর্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহিকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহি সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে, বৃষ্টি পড়িলে প্রবহমান হয়। সাহেবেরাও কোন কোন বাঙালি ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকাপ্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়া ছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টর সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেদিনীপুরের

** আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু। কলকাতা ১৯৫২ প্রকাশিত সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৯৯-১০১*

জমিদারি কাছারির কোন ভৃত্য শখ করিয়া একটি বোমা ছুঁড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপরাসীর উপর চাপরাসী পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহি আসিবে প্যান্টালুন ও চাপমান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহিদিগের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। বিধবা-বিবাহের উপর তাহাদের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন এক বন্ধুর, বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময় লাল কোর্তাধারী সিপাহির স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম যে সিপাহিরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদের এরূপ আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরি নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে সিপাহিরা হাতির উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে শহরের দিকে আসিতেছিল, আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা মনে করিলাম সিপাহিরা শহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। Ostrich (অসস্ট্রিচ) পাখি যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ তেমনি ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল যে বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যান্টালুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম। এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহিরা তাহাদিগের জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে এইরূপ ধূমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ম্যাজিস্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটরের পদ ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙালিদিগের সভা ডাকিয়া বলিলেন যে-কেহ, আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিবে তাহাকেই জেলে দিব। সাহেব ইহার অব্যবহিত পূর্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, বাঙালির নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিতদিগের সকলে উপস্থিত আছে কিনা জানিবার জন্য যখন সভা আহ্বানকারী পত্রের লেফেফার উপরের লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন তখন জলামুঠার রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া "ড্যামীডর রায়" এবং স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনসপেক্টর উমাচরণ হালদারের নাম" "ওমারচন্দ্র হাবিলদার" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগিগাড়ির শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্রি শহরে এইরূপে চৌকি দিতেন। সংবাদপত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে শেকাওয়াতী ব্যাটলিয়ন মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে মেদিনীপুরে বিদ্রোহ নাই। পরিশেষে ওই পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হইল না তাহার প্রধান কারণ কর্নেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাঁহার কথা সিপাহিরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহিদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়
১৮২৭-১৮৯৪

[সেকালের কৃতবিদ্য মানুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ভূদেব কিছুদিন শিক্ষকতার পর যোগ দেন এডুকেশন সার্ভিসে। 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকার পরিচালক এবং 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৮৫৬ সালে হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যাপক পদের জন্য পরীক্ষায় সহপাঠী মধুসূদনকে পরাস্ত করে ঐ পদ লাভ করেন। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁর অবদান কম ছিল না। বিহারে হিন্দি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক থাকার সময়। বহু হিন্দি বই রচনায় ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। তাছাড়া অনেক বাংলা বইয়ের হিন্দি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। বিহারের আদালতে ফারসির পরিবর্তে হিন্দি প্রচলনের সুপারিশ করেছিলেন। পিতার নামে 'বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেন। এই ফান্ড থেকে চতুষ্পাঠী শিক্ষকদের বৃত্তি দেওয়া হত। ১৮৮২ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'রোমের ইতিহাস', 'ইল্যান্ডের ইতিহাস' প্রভৃতি। সেকালে তাঁর লেখা দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' জনপ্রিয় হয়েছিল।]

সিপাহি বিদ্রোহ*

ইংরাজদিগের সিপাহি সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন হইতেছিল। তাহারা নিরন্তর এই ভয় করিতেছিল যে, কোম্পানি বাহাদুর তাহাদিগের ধর্ম লোপ করিবেন। ভয়ের কারণ এই, তাহারা জানিয়াছিল যে ভারতবর্ষের মধ্যে আর একটিও স্বাধীন রাজ্য নাই, অতএব মনে করিতেছিল যে, ইংরাজেরা এইবারে ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইবেন। কিন্তু ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলেই হিন্দুরা জাতিভ্রষ্ট হন। অতএব হিন্দু সেনাগণের জাতি না মারিলে আর চলিবে না। বিশেষত সিপাহিবা দেখিয়াছিল যে তাহাদিগের মধ্যে এক দল পেগু অধিকার করিবার নিমিত্ত যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর স্থানীয় কার্যের নিমিত্ত সৈনিক নিযুক্ত করিবেন না! সকল সেনাকেই সর্বদেশে যাইতে স্বীকার করাইয়া তবে নিযুক্ত করা হইবে। ইহাতেও সিপাহিগণ বুঝিয়াছিল যে তাহাদিগের জাতি নাশ করাতেই গবর্নমেন্টের ইষ্ট সাধন সম্ভাবনা।

সিপাহিগণ এই প্রকার শঙ্কাকুলিত হইয়া আছে, এবং দেশের ধর্ম বিচারের যথেষ্ট আন্দোলন হইয়া সকলের মন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে এমত সময়ে একটি সামান্য ঘটনা উপস্থিত হইল। দমদমার বারিকে যে সকল সৈনিক থাকে তাহার মধ্যে একজন হিন্দু সিপাহির একটি জলপাত্র একজন মুসলমান খালাসি লইতে যায়। সিপাহি তাঁহাতে ক্রুদ্ধ হয়। খালাসি বলে, "তোদের, আবার জাতের বড়াই কি—তোরা কাওয়াজের সময় দাঁতে

বাঙ্গালার ইতিহাস—৩য় খণ্ড

করিয়া যে টোটার কাগজ কাটিস, তাহাতে গোরুর চর্বি দেওয়া থাকে, তোদের আর কি জাতি আছে, না থাকিবে?" এই সামান্য কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন পড়ে। সিপাহিদিগের মনে পূর্ব হইতেই শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, এখন সেই শঙ্কাটি যে সত্য তাহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। বারুদ জমা হইয়াছিল, তাহাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িল। একেবারে সমুদায় জ্বলিয়া উঠিল। তাদৃশ বিচক্ষণ এবং বিশ্বাস্য সৈন্যপতিও প্রায়, ছিল না যে সে আগুন থামাইবে। দেশ জ্বলিয়া উঠিল। গবর্নমেন্ট বলিলেন যে ঐ টোটার কাগজে চর্বি আছে বটে, আর ওই টোটা ব্যবহার করিতে হইবে না। কিন্তু সিপাহিরা আর নিবৃত্ত হইতে পারিল না। প্রথমে বারাকপুরের সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠে, তাহার পর বহরমপুরে গোলযোগ উপস্থিত হয়; অনন্তর দানাপুরে, শিয়ালকোটে এবং অমৃতসরে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পায়। দুইটি রেজিমেন্টকে বারাকপুর হইতে কার্যচ্যুত করা হইল। যেন একবার আগুন থামিল। কিন্তু আবার দিন কয়েকের মধ্যেই মিরাটের সৈনিকেরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের অধিনায়কগণকে বিনাশ করিল এবং দিল্লির বাদশাহকে সাম্রাজ্য প্রদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিল্লি নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। আর সহজে বিদ্রোহ শান্তির উপায় রহিল না। বিদ্রোহীরা একটি উদ্দেশ্য পাইল, পরস্পর সম্মিলিত হইবার একটি স্থান পাইল। সিমলা পর্বতে যে গুর্খা সিপাহিদল ছিল তাহাদিগেরও জাতি যাইবার বিশেষ ভয় ছিল না। তাহারাও আপনাদিগের সৈন্যপতিকে নষ্ট করিয়া গবর্নমেন্টের ধনাগার লুঠ করিল। হোলকারের সৈনিক দল, সিন্ধিয়ার সৈনিক দল নখনউ নগরস্থ সৈনিক দল সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিল। সমস্ত সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহিরা যেখানে যেখানে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত সেই সেই স্থানেই ধনাগার লুঠ করিত এবং কারাগৃহ উন্মুক্ত করিয়া দিত। দেশের বদমাইশ সকল বাহির হইয়া কত যে অত্যাচার এবং কত যে নিষ্ঠুরাচরণ করিল তাহা বর্ণনা করিবার নহে। আবালবৃদ্ধবনিতা ইউরোপীয় মাত্রের আর রক্ষা ছিল না। সিপাহিরা নিতান্তই বুঝিয়াছিল যে, ইংরাজ রাজত্বের এক শতাব্দীকাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর ইংরাজের অধিকার থাকিবে না। ইংরাজেরাও ভয়ে ক্রোধে অপমানে একান্ত অবসন্নের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহারা সেখানে সাক্ষাৎ বিপদ-মুখে পড়িয়াছিলেন তাহারা বিলক্ষণ সাহসিকতা বুদ্ধিমত্তা এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আরা নগরে, লখনউ নগরে, এবং দিল্লিতে ইংরাজ জাতির অনেক বীরতা প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা নিবাসী ইংরাজেরা কিছুমাত্র ভয়ের হেতু না থাকিলেও এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এত অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য গবর্নমেন্টকেও নিতান্ত উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। ইংরাজি সংবাদপত্র সকলে এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি এত প্রখরতর বিদ্বেষ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল যে, ক্যানিং বাহাদুর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু তাহা করাতে কলিকাতা নিবাসী স্বাধীন ইংরাজদিগের ক্রোধ বড় সাহেবের উপরেই পড়িল। ঠাট্টা করিয়া তাঁহার নাম ক্লেমেন্সি ক্যানিং অর্থাৎ দয়াল ক্যানিং রাখা হইল এবং তাহার প্রধান সভাসদ গ্রান্ট সাহেবকে হোয়াইট পাণ্ডে বা পাঁড়ে সাহেব বলা হইতে লাগিল। ইংরাজদিগের স্বভাবে এবং এতদ্দেশীয় লোকের স্বভাবে একটা বৈচিত্র্য এই যে, এখানকার লোকেরা চুপ করিয়া মার খাইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজেরা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, তাহারা মুখ পুরে গালি দিতে না পাইলে বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা যাওয়াতে গালি দিবার কতক ব্যাঘাত হইল, অতএব ইংরাজদিগের ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

গবর্নমেন্ট এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহারা এদেশীয় সকল লোককেই রাজ বিদ্রোহী বলিয়া মনে করেন না। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত, কেবলমাত্র তাহারাই দোষী এবং দণ্ডার্হ। সকল লোককে নিরস্ত্র করিবার আইন প্রচারের সময় তাহারা দেশীয় বা ইউরোপীয় বলিয়া কোন বিশেষ করিলেন না। কিন্তু তাহা না করাতেই ইংরাজদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। গবর্নমেন্ট ঘোষণা দিতে লাগিলেন যে, যাহারা স্বেচ্ছায় বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই, অন্য কর্তৃক প্রলোভিত অথবা ভয় প্রদর্শিত হইয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছে এমত সকল লোক অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। স্বাধীনবৃত্তি সংসৃষ্ট ইংরাজেরা ক্ষমার নাম মাত্র শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর যেরূপ বীরতা এবং প্রাজ্ঞতা অবলম্বনপূর্বক কার্য করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ পর্যালোচনা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এই সময়ে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষুই লর্ড ক্যানিঙের উপর পড়িয়াছিল এবং ইংল্যান্ড এই সমূহ বিপদসাগর হইতে কিরূপে উদ্ধার হইবেন পৃথিবীর সকল জাতি যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মার্কিনেরা বলিতেছিলেন, যদি ইংলন্ড ভারত রাজ্য হারান, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে যে উচ্চতম আসন পরিগ্রহ করিয়া আছেন তাহাও হারাইবেন। ভারতবর্ষ হস্তবহির্ভূত হইয়া গেলে ইংলন্ড আর আমাদিগের সমকক্ষ হইয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। আমাদিগেরও বাণিজ্য ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইবে। অস্ট্রিয়া এবং রুশিয়া বলেন, ইংল্যান্ডের বড়ই অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই জন্যই তাহার প্রতি এই বিপৎপাত হইয়াছে। জার্মানি ইংলন্ডের সাহসিকতা এবং ধৈর্যের প্রশংসা করিতেছিলেন। ইংল্যান্ডের পরম সুহৃদ ফ্রান্স সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছিলেন ভারত সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের হস্তবহির্ভূত হইবে না। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং সৈনিক প্রেরণ দ্বারা ভারত রাজ্যের পুনরাধিকার বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকার করেন। ঐ সাহায্য গ্রহণে ইংরাজেরা অসম্মত হইলে তৃতীয় নেপোলিয়ন অপর একটি সৎকার্য করিলেন। সিপাহি বিদ্রোহে যত লোক নষ্ট হইয়াছিল তাহাদিগের পরিজনবর্গের সংস্থান করিবার জন্য যে চাঁদার ফর্দ হয় সেই ফর্দে তিনি নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া যথেষ্ট চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বাস্তবিকই ইংলন্ডের পরম বন্ধু ছিলেন।

সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় নিজ ইংলন্ডের মধ্যেও মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পার্লামেন্টের সভ্যেরা বিশেষ বিচক্ষণতা সহকারে একপক্ষে বিদ্রোহ দমনের উপায় বিধান করিতে লাগিলেন, পক্ষান্তরে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক প্রকার নিশ্চিত হইল যে, ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজ্য সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলা এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণাদি ক্ষমতায় রাজাদিগকে বঞ্চিত করা আর প্রজাদিগের ধর্মের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ প্রকাশপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার করিবার চেষ্টা করা—এই সকল কারণে এই বিপৎপাত হইয়াছে। ডালহাউসি বাহাদুর যে অনেক অকার্য করিয়াই গিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইল। ইংরাজ জাতির মন যেভাবে দাঁড়াইয়াছিল তাহা আবার ফিরিল তাহারা মনে করিতে লাগিলেন যে, রাজ্যের বিস্তার এত সত্বর বর্ধিত করিয়া সৎ পরামর্শের কার্য হয় নাই। কোন কোন মহাপুরুষ ভাবিলেন যে,

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ইংলন্ডের বলবত্তার পক্ষে সহায় না হইয়া প্রত্যুত ইহার দৌর্বল্যেরই কারণ হইয়া আছে। কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন রাজ্যের বিস্তার পুনর্বার সঙ্কুচিত করাই বিধেয়।

কিন্তু সুবোধ এবং বহুদর্শীদিগের মধ্যেই ঐ মতি পরিবর্ত প্রথম হইতে লক্ষিত। সাধারণ ইংরেজ—কি ইংলন্ডের কি এখানকার—সকলেরই মুখে ক্রোধ বই আর কিছুই ছিল না। কোন কোন ইংলন্ডীয় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত উপদেশ সমস্ত প্রদত্ত হয়। "মার—মহাপাতকী মহানারকী ভারতবর্ষনিবাসী মাত্রকে সমূলে নিপাত কর।" "মহম্মদের এবং বিষ্ণুর সেবকদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা যেমন পশু আমরা তাহাদিগকে পশুর ন্যায় বধ করিব।" "ভারতবর্ষীয়রা যতগুলি ইউরোপীয় মারিয়াছে সেই ইউরোপীয়দিগের মাথায় এবং গাত্রে যতগুলি করিয়া লোম ততগুলিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে হইবে।"

সে সকল সৈন্য ইংলন্ড হইতে আসিতেছিল তাহারা ঐরূপ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া আসিল; এখানে আসিয়া তাহারা যে যথাসাধ্য ঐ সকল উপদেশের অনুসারেই চলিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। সৈনিক কর্তৃপক্ষীয়েরা যেখানে যাইতেন আপনারাই দোষাদোষের বিচার করিয়া লোকের ফাঁসি দিতেন। ক্যানিং বাহাদুর ঐরূপ প্রজা বিনাশের অনেক নিবারণ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং পরিশেষে কতকদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

অব্যবস্থিতচিত্ত এবং অধিনায়ক বিহীন সিপাহিদল ক্রমে ক্রমে পরাভূত হইয়া গেল। দিল্লি পুনর্বার ইংরাজের অধিকৃত হইল। আগ্রার এবং লখনউ-এর অবরোধ মোচন হইল। এবং শিখ, গুর্খা, মাদ্রাজি এবং ইংলন্ডের নবাগত সৈন্য সমস্ত আসিয়া পড়াতে বিদ্রোহের যে ভয়ঙ্কর ঘণ্টা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কাটিয়া গেল।

সমস্ত বাংলা বিভাগের সৈনিকগণের বিদ্রোহ ব্যাপার সংক্ষেপে লিখিত হইল। নিজ বাংলা প্রদেশের মধ্যে ঐরূপ ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা ঘটে নাই বটে, কিন্তু এখানকার সৈনিকেরাও প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। প্রথমে গয়া নগরে একটু ভয় উপস্থিত হয়, অনন্তর পাটনার একজন পাদ্রি সাহেবের বাটীতে আক্রমণ হয়। তাহার পর ঢাকায় কিঞ্চিৎ গোলযোগ ওঠে, পরে সাঁওতাল পরগনার মধ্যে রোহিণী নগরে সিপাহিরা স্পষ্ট বিদ্রোহ করে। এইরূপ নানা স্থানে শঙ্কার উদ্রেক হইতেছে, এমত সময়ে দানাপুরের তিনটি রেজিমেন্ট একধারে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সাহাবাদ পরগণার প্রসিদ্ধ জমিদার কুমার সিংহের নিকটে গিয়া তাহাকে আপনাদিগের অধিনায়কতায় নিযুক্ত করে, এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত হইয়া আরা নগর আক্রমণ করিতে আইসে। আরার অবরোধের মধ্যে একদল ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদিগের দ্বারা পরাভূত হয়। অনন্তর অপর একদল ইউরোপীয় সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করে। ইহার পর সিগৌলির সৈন্যদল বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। ওই দল বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে শুনিয়াই পাটনা বিভাগের কমিশনার ভীত হন এবং বিভাগের সব স্থান হইতে ইউরোপীয় কর্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া সকলকেই পাটনার মধ্যে রাখেন। এরূপ করাতে গয়া, চম্পারন, মতিহারি, নওদা, মজঃফরপুর প্রভৃতি সকল স্থানে নিতান্ত অরাজকতা হইয়া পড়ে।

এই দোষে টেলার সাহেবের কর্ম যায় এবং তাহার স্থানে সামুয়েল সাহেব কমিশনার এবং মুনসি আমির আলি ডেপুটি কমিশনার হইয়া যান। ইহার পর হাজারিবাগে, অনন্তর

পুরুলিয়াতে এবং পরিশেষে ভগলপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল বিদ্রোহ ব্যাপার তত্তৎ স্থানে স্থায়ী হয় নাই। সিপাহিরা স্ব স্ব স্থান ত্যাগপূর্বক কিছু লুঠপাট করিয়া আপনাদের কোন বৃহত্তর দলের অন্বেষণেই প্রস্থান করিত। তাহারা পথের মধ্যেও বড় অধিক দৌরাত্ম্য করিত না। কোনরূপে একটি বৃহত্তর দলের সঙ্গে যাইয়া মিশিতে পারিলেই যেন নির্ভয় হয়, এই ভাবেই চলিত।

বাংলার গবর্নমেন্ট ওই সকল কাণ্ডের মধ্যে যে প্রণালীতে কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণ সময়োচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। প্রকাশ্যে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহার প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শন করা হয় নাই। এমন কি একজন মুসলমানকে ঐ সময়ে ডেপুটি কমিশনারের কর্ম পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু গোপনে গোপনে পুলিশের কর্মে দেশীয় খ্রিস্টানদিগকেই অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বিদেশীয় লোক এবং বিশেষত বিদেশীয় ছোট লোক আনিয়া তাহাদিগের দ্বারা অশ্বারোহী পুলিশ দল সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কোথাও মগ, কোথাও সাঁওতাল, কোথাও কোল অধিক পরিমাণে লইয়া নতুন পুলিশের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বিহার প্রদেশে যে কুড়িটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাদিগের বেতন ২০০ শত হইতে ৭০০ শত পর্যন্ত করিয়া দিয়া ইউরোপীয়দিগকেই ঐ সকল কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বঙ্গবাসীরা স্বজাতির মায়া যতই ছাড়ুন ইংরাজরা কখনই মনে করিতে পারেন না যে, বাঙালিরা মনে মনে স্বদেশীয়দিগের পক্ষতা একান্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। খ্রিস্টান না হইলে অমন সকল সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হওয়া বড় কঠিন।

যাহা হউক, গবর্নমেন্ট বিদ্রোহ দমনার্থ ক্রমে ক্রমে[১] পাঁচটি আইন প্রচলিত করিয়া মার্সিয়াল আইন অপেক্ষাও অধিকতর কঠিনরূপে দেশের শাসন করিতে লাগিলেন। একটি আইনের দ্বারা[২] বিদ্রোহী মাত্রেই প্রাণদণ্ডই বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডযোগ্য হইল এবং একটি কমিশন বসাইয়া বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবার পূর্ণ ভার তৎপ্রতি অর্পিত হইল। আর একটি আইনের দ্বারা[৩] বিদ্রোহের প্রশ্রয়দাতা মাত্রে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইল। তৃতীয় আইনের দ্বারা[৪] সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাহারা বিদ্রোহের কোন ছন্দাংশে থাকিবে অথবা যে কোন প্রকার গুরুতর অপরাধ করিবে তাহারাও এক প্রকার বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইল। চতুর্থ আইনের[৫] অনুসারে বিদ্রোহীগণ উল্লিখিত কমিশনের বিচারাধীন হইল, এবং হুকুমের পরক্ষণেই অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইয়া যাইতে পারিবে এরূপ ব্যবস্থা হইল।[৬] পঞ্চম আইনের দ্বারা বিদ্রোহীর সম্পত্তি রাজকোষ সম্ভুক্ত হইতে পারিবে এই বিধি হইয়া গেল।

লখনউ অধিকৃত হইয়া গেলে গবর্নর জেনারেল বাহাদুর একটি ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা অযোধ্যা প্রদেশীয় যাবৎ ভূম্যধিকারীর ভূমি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এরূপ কাণ্ড

১। ১৮৫৭ সালের ৩০ মে হইতে ৮ আগস্টের মধ্যে।
২। ১৮৫৭ সালের ১১ আইন।
৩। ১৮৫৭ সালের ৪ আইন।
৪। ১৮৫৭ সালের ১৬ আইন।
৫। ১৮৫৭ সালের ১৭ আইন।
৬। ১৮৫৭ সালের ২৫ আইন।

পৃথিবীর ইতিহাসের অপর কোন স্থলে দৃষ্ট হয় নাই। এই ঘোষণাপত্র লইয়া ইংল্যান্ডেও সমূহ বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। অনন্তর উহা রহিত করা হয়।

ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট সভায় ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহ ব্যাপার লইয়া যৎপরোনাস্তি গোলযোগ পড়ে। পার্লামেন্ট ভারতবর্ষকে ইংরাজদিগের আয়ত্তে রাখিবার জন্য বিধিমতেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক টাকা এবং অনেক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহা দিয়া অবধি ভারতবর্ষীয় শাসন কার্যের প্রতি বিশেষরূপেই দৃষ্টিপাত হইল, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ছাড়াইয়া মহারাজ্ঞী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্রী হইলেন।

১৮৫৮ অব্দের ১ নভেম্বর উল্লিখিত ঘোষণা কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে প্রচারিত হইল। ঘোষণাপত্রের তাৎপর্যার্থ অনুবাদ এই—

> "ঈশ্বরকৃপায় আমি (শ্রী ভিক্টোরিয়া) গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যান্ড রাজ্যের ও তদধীন ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ ও অপরাপর প্রদেশ সমূহের রাজ্ঞী ও খ্রিস্ট ধর্মের রক্ষয়িত্রী।
>
> গুরুতর বিভিন্ন কতিপয় কারণবশে আমি পার্লামেন্ট মহাসভার যাজক, জমিদার ও সাধারণ সভ্যমণ্ডলীর পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিব মনে করিয়াছি।
>
> অতএব এক্ষণে আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে আমি ঐ শাসনভার গ্রহণ করিলাম। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ যেন আমার ও আমার পরবর্তীগণের প্রতি প্রকৃত রাজভক্তি প্রদর্শন করেন এবং আমার স্বার্থরক্ষার জন্য আমার প্রতিনিধি স্বরূপে সময়ে সময়ে আমি যে সকল শাসনকর্তাকে উক্ত রাজ্য শাসনের জন্য নিযুক্ত করিব তাহাদিগেব ক্ষমতাও মান্য করিয়া চলেন।
>
> সুবিশ্বস্ত প্রিয়সচিব শ্রদ্ধাভাজন ক্যানিং মহোদয়ের রাজভক্তি কার্যকুশলতা ও সুবিবেচনায় আমার বিলক্ষণ আস্থা আছে। এই জন্য ভারতের রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাহাকেই উক্ত রাজ্যের সর্বপ্রথম রাজ প্রতিনিধি ও গভর্নর জেনরেলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমারই জনৈক প্রধান সচিব দ্বারা সময়ে সময়ে আমি যেরূপ উপদেশ দিব তদনুসারে ক্যানিং বাহাদুর সাধারণত আমারই স্বার্থ রক্ষার জন্য আমারই প্রতিনিধিরূপ হইয়া কার্য করিবেন। মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে সকল সৈনিক ও শাসন সংক্রান্ত কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদেই নিযুক্ত রাখিলাম। অতঃপর যে সকল ব্যবস্থাদি প্রণীত হইবে তদনুসারে এবং আমার ভাবী ইচ্ছার উপর তাহাদিগের এই মর্যাদা নির্ভর করিবে।
>
> ভারতের দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে, মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অথবা তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে যে সকল সন্ধিপত্রাদি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেই সকল আমার গ্রাহ্য হইল এবং আমি ঐ সমস্ত অব্যাহত রাখিয়া তদনুসারে কার্য করিব। আশা করি উক্ত দেশীয় রাজগণও তদ্রূপ করিবেন।
>
> বর্তমান রাজ্যাধিকার বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। অপরে আমার স্বার্থে হস্তক্ষেপ যাহাতে না করিতে পারে তাহা আমাকে দেখিতে হইবে এবং অপরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে আমার কর্মচারিগণকে কোনরূপ ক্ষমতা দেওয়াও আমার অনুমোদিত হইবে না। দেশীয় রাজগণের স্বত্বাধিকার, পদমর্যাদা ও সম্ভ্রম আমাদের নিজেদের স্বত্বাধিকার পদমর্যাদা ও সম্ভ্রমের তুল্য জ্ঞান করিব। আভ্যন্তরিক শান্তি এবং সুশাসনগুণেই রাজ্যের সমৃদ্ধি ও

সামাজিক উন্নতি হয়। আমার ইচ্ছা উক্ত দেশীয় রাজগণ এবং আমার অপরাপর প্রজাবর্গ ও যেন সেই উন্নতি এবং সমৃদ্ধি উপভোগের পথ সুপরিষ্কৃত রাখেন।

অপরাপর রাজ্যের প্রজাবর্গের সম্বন্ধে আমার যে সকল কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, ভারতের প্রজার সম্বন্ধেও আমি সেই সকল কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য বলিয়া আপনাকে মনে করি এবং জগদীশ্বরের কৃপায় এই সকল কর্তব্য আমি বিশ্বস্তভাবে এবং বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিতা হইয়া পালন করিব।

খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ ধর্মে মনে যে শান্তি সুখ উপভোগ করি তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার কোন প্রজাকে বলপূর্বক ঐ ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করাইতে আমার কোন রূপ অধিকার বা ইচ্ছা নাই। আমি এই রাজকীয় অভিপ্রায় প্রচার করিতেছি যে কোন নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাস অথবা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম কার্যের নিমিত্ত কাহাকেও অনুগ্রহ বা নিগ্রহভাজন হইতে হইবে না। সকলেই সমান এবং নিরপেক্ষভাবে আইনের আশ্রয় লাভ করিবেন। আমার কর্মচারিগণ মধ্যে কেহ যেন আমার কোন প্রজার ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্ম কার্যে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে তাহাকে আমার বিশেষ অসন্তোষের ভাজন হইতে হইবে।

আমার আরও ইচ্ছা যে, যে ধর্মের বা যে জাতির হউক, আমার সকল প্রজাই অবাধে এবং বিনা পক্ষপাতে আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্যকুশলতা ও সৌজন্য অনুসারে আমার কর্মচারীপদে নিযুক্ত হইতে পাইবেন।

পৈতৃক ভূমি সম্পত্তির উপর ভারতীয় প্রজাগণের যে কতদূর মমতা তাহা আমি জানি এবং ঐরূপ অনুরাগের আমি সম্মানও করি। সুতরাং সাম্রাজ্যের স্বার্থে কোন রূপ বিঘ্ন যাহাতে না জন্মে সে দিকে লক্ষ রাখিয়া এতৎসংক্রান্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখাই আমার ইচ্ছা। সাধারণত ভূমি সংক্রান্ত কোনরূপ আইন কানুনের সংগঠনস্থলে ভারতের প্রাচীন রীতিনীতি ও উত্তরাধিকার প্রথার দিকে যাহাতে বিশিষ্টরূপ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করা হয়, সে পক্ষে আমি আদেশ দিতেছি।

কতকগুলো স্বার্থপর লোকে মিথ্যা কথা রটনা করিয়া স্বদেশীয়গণকে বিদ্রোহী করত ভারতের যে অনর্থ ঘটাইয়াছে তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। সম্মুখ যুদ্ধে সেই বিদ্রোহের প্রশমনে আমার প্রতাপের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমস্ত স্বার্থপর লোকদিগের প্ররোচনায় ভুলিয়া যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে যাহারা পুনর্বার কর্তব্য পথে প্রত্যাবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগের অপরাধের ক্ষমা করিয়া তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে আমি ইচ্ছা করি।

পুনরপি রক্তপাত আর যাহাতে না হইতে পায় এবং ভারত সাম্রাজ্যের শান্তি যাহাতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র সম্পাদিত হয় তজ্জন্য ইতিমধ্যেই একটি প্রদেশে আমার প্রতিনিধি ভারতের গবর্নর জেনরেল বাহাদুর অধিকাংশ রাজবিদ্রোহীকে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন এবং অপরাধের গুরুত্ব নিবন্ধন যাহারা ক্ষমার পাত্র নহে তাহাদিগের প্রতি নিরূপিত দণ্ডের ঘোষণা করিয়াছেন। আমি উক্ত গবর্নর জেনরেল বাহাদুরের এই কার্যের অনুমোদন করি এবং আরও বলি—

যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজ হত্যায় যোগ দিয়াছিল তাহারা ব্যতীত আর সকল বিদ্রোহীকেই ক্ষমা করা হইবে। ঐরূপ হত্যাকারীদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন যুক্তি বিরুদ্ধ।

"এই সকল লোক হত্যাকারী"—ইহা পূর্বে বুঝিতে পারিয়াও ইচ্ছাপূর্বক যাহারা উহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল অথবা যাহারা এই বিদ্রোহ ব্যাপারে দলপতি ও উৎসাহদাতা হইয়াছিল,

তাহাদিগকে প্রাণে মারা হইবে না, তবে তাহাদিগের দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার সময়, কি অবস্থায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে এবং স্বার্থপর লোকের মিথ্যা প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া যাহারা অপরাধী হইয়াছে তাহাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

আর যে সকল লোক গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শান্তিমূলক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকুক, তাহাদিগের সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।

আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে যাহারা আপন আপন শর্ত অনুসারে কার্য করিবে, উক্তরূপ ক্ষমা ও দয়া কেবল তাহাদিগের প্রতিই প্রদর্শিত হইবে, ইহাই রাজকীয় অভিপ্রায়।

আমার ইচ্ছা, জগদীশ্বরের কৃপায় যখন দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃস্থাপিত হইবে, তখন আমি ভারতের শিল্পের উন্নতিসাধন এবং সাধারণের হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিব। ভারতের প্রজার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইলেই আমার বল বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের সন্তোষেই আমি নিরাপদ হইব, তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেই আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত বলিয়া মনে করিব। প্রার্থনা করি সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর এই সকল প্রজাহিতকর অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিবার পক্ষে আমাকে ও আমার অধীনস্থ কর্মচারিগণকে উপযুক্ত রূপে শক্তি প্রদান করিবেন।"

ভারতবর্ষ মহারাজ্ঞীর খাসে আসিলে ইহার রাজকার্য নির্বাহের প্রণালী পরিবর্তিত হইল। পূর্বে যেরূপ বোর্ড অব কন্ট্রোল এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। তৎপরিবর্তে একজন মন্ত্রী স্টেট সেক্রেটারি অব ইন্ডিয়া উপাধি গ্রহণপূর্বক ভারতবর্ষের সব কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার পরামর্শীস্বরূপ বারজন কৌন্সিলর বা মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। লর্ড স্টানলি সাহেব ভারতবর্ষের প্রথম স্টেট সেক্রেটারি হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল এবং অনেকানেক স্থলে রাজস্ব আদায়ের যে সমূহ বিঘ্ন হইয়া গিয়াছিল তজ্জন্য রাজ্যের ঋণ প্রায় ৩০ কোটি টাকা বর্ধিত হয়। সৈনিক ব্যয়ও বার্ষিক ৫ কোটি টাকা বাড়ে। ফলকথা রাজ্যের আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় প্রতি মাসে এক কোটি টাকা অধিক হয়। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা হইতে থাকে। দেশীয় সৈনিক সংখ্যা কমাইয়া ব্যয় লাঘবের চেষ্টা হয়, সিবিলিয়ানদিগের বেতন কিছু কিছু ন্যূন করিবারও প্রস্তাব হয়, পাবলিক ওয়ার্কের কার্য একেবারে স্থগিত হইয়া থাকে এবং নতুন নতুন করদানের নিমিত্তও চেষ্টা আরম্ভ হয়। বিদেশীয় আমদানির প্রতি মাশুল বৃদ্ধি করা হয়। এখানকার চাউল প্রভৃতি রপ্তানির উপরেও মাসুল বাড়ে। স্ট্যাম্পের দাম বাড়ান হয়। সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের উপরেও কর নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়। এদিকে বিদ্রোহানল সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় নাই। অযোধ্যার উত্তর ভাগে নানা সাহেব এবং অযোধ্যার বেগম, মধ্য ভারতবর্ষে তাঁতিয়া তোপী, এবং স্থানে স্থানে বিদ্রোহী সিপাহিদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদিগের বিনাশসাধনের নিমিত্ত চতুর্দিকে সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্যও ব্যয়ের আধিক্য হইতেছিল। চমৎকারের বিষয় এই যে, এই সময়ে দেশীয় সৈনিকের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৫৭ অব্দে ইউরোপীয় সৈনিক ৪৫ হাজার এবং দেশীয় সৈনিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার ছিল। ৫৯ অব্দে ইউরোপীয়

৯০ হাজারের অধিক এবং দেশীয় ২ লক্ষ ৪০ হাজারের অধিক হয়। অথচ ৬০ সহস্রের অধিক সিপাহি বিদ্রোহে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব দেশীয় সৈনিক যেমন এক পক্ষে ৬০ হাজার কমে, তেমনি পক্ষান্তরে ৭০ হাজার বাড়িয়াছিল। ভারত সাম্রাজ্যের এরূপ বিশৃঙ্খলা ইংরাজদিগের আমলের মধ্যে আর কখনও হয় নাই। ইংল্যান্ড অনেকেরই মত হইতে লাগিল যে রাজ্যের বিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া আনা নিতান্ত আবশ্যক। কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষও বলিলেন যে, ভারতবর্ষের অধিকার ইংল্যান্ডের দৌর্বল্যের হেতু। অতএব ঐ রাজ্য একেবারে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। পার্লিয়ামেন্ট ভারতবর্ষের ঋণ দায়ে ইংল্যান্ডকে দায়ী করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং ইংল্যান্ডেও আর অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যাইতে লাগিল না। আর এখানেও টাকা পাওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়াই উঠিল। ৫৫ অব্দে যে ৪৷৷০ টাকা সুদের কাগজ খোলা হইয়াছিল তাহা বন্ধ করিয়া ৫৭ অব্দে ৫ টাকার কাগজ খোলা হয়। অনন্তর ৫৷৷০ টাকার খোলা হইয়াছিল। ঐ কাগজের ও অর্ধেক ৫ টাকার কাগজে এবং অর্ধেক নগদে লইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি টাকা পাওয়া যাইতেছিল না। গভর্নমেন্ট ঐ সময়ে বার্ষিক হুন্ডি বাহির করিলেন, তাহাও লোকে লইল না।

পতিত ভূমি বিক্রয়ের প্রস্তাব হইল। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি কুড়ি সনের খাজনায় বিক্রীত করিয়া একেবারে নিষ্কর করিয়া দিবার কথার উত্থাপন হইল। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না।

রাজ্যের এই অবস্থায় হালিডে সাহেব বাংলা পরিত্যাগ করিয়া যান। হালিডে সাহেব যে একজন অতি বিচক্ষণ কার্যদক্ষ এবং তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তিনি পুলিশ ডাকাইত সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু হালিডে সাহেব প্রজারঞ্জনে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তিনি পার্লিয়ামেন্ট সভায় এতদ্দেশীয়গণের স্বজাতি বিদ্বেষ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেন তজ্জন্য এখানকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন এদেশীয়দিগের প্রতি তাহার তাদৃশ শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাসের কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই। তিনি শেষাবস্থায় নীলকর সাহেবদিগের প্রতি অধিকতর প্রীতি এবং বিশ্বাস স্থাপন করাতে প্রজাবর্গের অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাস্তবিক সিপাহি বিদ্রোহের সমকালে ইংরাজ রাজকর্মচারীদিগের ওই প্রকার স্বজাতি পক্ষপাতিতা প্রকাশিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(১৮৪০—১৮৭০)

[কলকাতার জোড়াসাঁকোর দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র কালীপ্রসন্ন সিংহকে জমিদার হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল না সেকালেও। বয়সকাল মাত্র ৩০। এই স্বল্পকালে ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। সমাজ-জীবনে তাঁর অনন্য অবদান আজও বাঙালি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার তার অসামান্য কীর্তি। রেভারেন্ড লঙ্‌কে আদালতের শাস্তি মুক্ত করা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারবর্গকে দুর্দশামুক্ত করা, শিক্ষক রিচার্ডসন ও লঙ সাহেবকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিভিন্নপণ্ডিতের সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ। কালীপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কথ্যভাষায় "হুতোমপ্যাঁচার নকসা" রচনা। তিনি কলকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস অফ পিস ছিলেন।]

মিউটিনি*

পাঠাকগণ! একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্চি এমন সময় শুনলেম, পশ্চিমের সিপাইরে ক্ষেপে উঠেছে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লির ন্যেড়ে চীফ আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিপদ! সহরে ক্রমে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো, চনোগলি ও কসাইটোলার মেটে ইদরুস্, পিদ্‌রুস, গমিস্, ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিন্টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্‌লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগ্‌লো—আজ দিল্লি গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খ্যালার হারকেতের মত ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড়ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোটছেলের ঘাড় ভাঙবার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙালির উপর ঝাড়্‌তে লাগলেন। লার্ড ক্যানিংকে বাঙালি অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙালিরা বড় বড় রাজকর্ম না পায় তারও তদ্বির হতে লাগ্‌লো, ডাকঘরের কতকগুলি ন্যেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী মেজেস্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগ্‌লেন। শ্যামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাই তো কোন্ ছার! লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু চার বড় বড় ঘরে লুট্‌তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল লা জারি হলো, যে ছাপাযন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এতকথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপাযন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি

* হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

খোলার ঘর, সকলকে এক রকম দ্যাখে, ব্রিটিশ কুলের সেই চিরপরিচিত ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছুকাল শিক্‌লি পরলেন। বাঙালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন, যে, "যদিও একশ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙালিই আচেন—বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি। (পারবেন কি না তারও বড় সন্দেহ!) তাদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠ্‌তে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরানীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই করবেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। বল্‌তে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েচেন। যদি গবর্নমেন্টের হুকুম হয়, তাহলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতিবাবুরা ফিরতি ফলারে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যান্টুলন ও বিলিতি বদমাইশি থেকে স্বতন্ত্র হন।"

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিঙের রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গ্যালো। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগ্‌লো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠলো।

গান

"বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথায় পর কুরতি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যান্ড নিবাসী তারা।
টানটিয়াটোপির মান,
হবে এবে খর্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়্‌বে ধরা।।"

বাঙালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে বড়পটু, খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, "বিধবা-বিবাহের আইন পাস ও বিধবা বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে ক্ষেপেচে। গবর্নমেন্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যেসাগরের কর্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবা বিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে!"

কোথাও হুজুক উঠ্‌লো, "দলিপ সিংকে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রানিদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো!"

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন, সাহেবরা হিন্দুর ধর্মে হাত দ্যান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঁড়—কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ির গিন্নিরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না! দুই একজন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন!

ক্রমে সেপাইয়ের হজুকের বাড়তি কমে গ্যালো—আজ দিল্লি দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্ণৌ পাওয়া হলো! মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিঙের পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন!

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরোনো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন, বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার আর দুঃখ রবে না" বাড়ি বাড়ি গেয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন, গর্ভবতীর যতদিন একটা না হয়ে যায়, ততদিন যেমন "ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেশনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙালিরা ফাঁসি ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গির পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠ্‌লো, "যখন যার কপাল ধরে—" ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্নমেন্টও বাঙালি শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" আশা ও মানভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলিতেছেন এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙালিদের দেখতে লাগ্‌লেন—আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(১৮৪২—১৯১৬)

[‘লন্ডনরহস্যে’র বিখ্যাত লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “সিপাহি বিদ্রোহ বা মিউটিনি” একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করতেন। পরে সাময়িক পত্র সম্পাদনা শুরু করেন। ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘পরিদর্শক’ প্রভৃতি পত্রিকায় জড়িত ছিলেন। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সম্পাদক ভুবনচন্দ্র বেশ কয়েকখানি বই লেখেন।]

অসন্তোষের হেতু

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদাবাদের আম্রকুঞ্জের পরামর্শে মোগল-সাম্রাজ্যের সিংহাসন টলটলায়মান, নবাব সিরাজদৌলার পতন, পলাশীক্ষেত্রে বিজয় লাভে কর্নেল ক্লাইবের লর্ড উপাধি প্রাপ্তি; তাহার পর ক্রমে ক্রমে ভারতে ইংরাজের আধিপত্য বিস্তার, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দুরন্ত কর্মচারিগণের অসাধুতায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলেও কোম্পানির সদাশয় কর্মচারীরা ভারতের মঙ্গলকামনায় শতবর্ষ কাল যথাসাধ্য যত্নে শান্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের এক প্রান্তে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল।

ইংরাজ বন্ধুগণ লড ডালহাউসি বাহাদুরকে “ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গবর্নর জেনরেল” বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কূটনীতিজ্ঞ, সুবিদ্বান, আত্মবিশ্বাসী মার্কুইস বাহাদুরের শরীরে অনেক গুণ ছিল; প্রকৃত পক্ষে ভারত মঙ্গলার্থে তিনি অনেকগুলি সৎকর্ম করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পররাজ্য গ্রহণের পিপাসা তাহাকে ও তাহার নীতিকে কলঙ্কিত করিয়াছে। নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, লর্ড ডালহাউসি যাহাদিগকে শাসন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তোষ অসন্তোষ অথবা হৃদয়গত ভাবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিতেন না, হৃদয়বান মন্ত্রিগণের সৎপরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না, আত্মবিশ্বাসেই আপন প্রভুগণের মনোরঞ্জনার্থ বন্য শূকরের ন্যায় গোঁভরে কার্য করিতেন। ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৬ অব্দের দুই মাস তাহার শাসনকাল; ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ভারতের রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া—কতক লোককে হাসাইয়া, কতক লোককে কাঁদাইয়া, কতক লোকের অন্তরে দারুণ বেদনা দিয়া তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। চার্লস জন ভাইকাউন্ট ক্যানিং ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন।

ভারতের “সর্বপ্রধান গবর্নর জেনরেলের” পররাজ্য গ্রাস অনেক ভারতবাসীর মনে বেদনা প্রদান করে, পঞ্জাব অধিকার, অযোধ্যা অধিকার এবং সেতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, আরকট, কর্নাট, ও বেরার রাজ্যের প্রতি লর্ড ডালহাউসির ব্যবহারে অনেকের অন্তরে গুপ্ত অনল সঞ্চিত হইয়াছিল; বিশেষত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে বন্দি

“সিপাহি বিদ্রোহ বা মিউটিনি” গ্রন্থ থেকে।

করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করা হয়, তাঁহার বড় সাধের অযোধ্যারাজ্য ব্রিটিশাধিকারভুক্ত হয়, এই ঘটনায় তৎপ্রদেশীয় সাধারণ মুসলমান প্রজাবর্গের চিত্ত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়াছিল, সাধারণ অসন্তোষের এই এক প্রধান কারণ। সেনাদল হইতে সুযোগ্য অফিসারগণকে স্থানান্তর করিয়া অপরাপর সরকারি কার্যে নিযুক্ত করা, তদ্দ্বারা সৈনিকবিভাগের বলক্ষয় করা দ্বিতীয় কারণ। তাহার পর যাহা ঘটে, সেইটিই অধিক ভয়ঙ্কর। সিপাহি বিদ্রোহের তাহাই তৃতীয় কারণ। "ব্রাউন-ব্রেস" বন্দুকের ব্যবহার, পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল, তাহা নিন্দনীয় বোধ হওয়াতে তৎপরিবর্তে নূতন "এনফিলড রাইফাল" বন্দুকের ব্যবহার বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। গো-চর্বি ও শূকর-চর্বি মিশ্রণে সেই বন্দুকের টোটা প্রস্তুত করা হইতেছে; হিন্দু মুসলমান সিপাহিরা দন্তদ্বারা সেই টোটা কটিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিবে, এই কথা প্রচার হয় যে রাজ্যে অবাধ শান্তি বিরাজ করিতেছিল অকস্মাৎ সেই রাজ্যে অশান্তির সূত্রপাত। ১৮৫৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে দমদমা ক্যান্টনমেন্টের বারুদখানার একজন নীচজাতীয় লস্কর একদিন তথাকার একজন ব্রাহ্মণ সিপাহির লোটাতে জল খাইতে চাহে; আপত্তি করিয়া ব্রাহ্মণ বলে, "আমি উচ্চ-জাতীয়, তুমি নীচ-জাতি, আমার লোটায় তুমি জল পান করিবে, উহা আমাদের ধর্ম ও জাতি ব্যবহারের বিরুদ্ধ।" লস্কর সেই কথায় উপহাস করিয়া বলে, "ইংরাজের রাজ্যে এখন আর জাতি ধর্মের ভেদাভেদ থাকিবে না; গোরুর চর্বিতে ও শূকরের চর্বিতে টোটা প্রস্তুত হইয়াছে, হিন্দুরা জাতিনির্বিশেষে গোরুর চর্বি ও মুসলমানেরা শূকরের চর্বির টোটা দন্তদ্বারা কাটিবে, এইরূপ হুকুম।"

ভয়ার্ত ব্রাহ্মণ সেই লস্করের মুখে ঐ ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া সেনাদলের সকলের কাছে ভয়ে ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিল, তাহারাও মহা ভয় পাইয়া চমকিত হইয়া গেল। "এনফিল্‌ড" বন্দুকের গুলিবর্ষণ অমোঘ. বিশেষত সে সকল গুলি বহুদূরে যায়, পূর্বে এই সংবাদ পাইয়া সিপাহিরা আনন্দিত হইয়াছিল, এক্ষণে চর্বির টোটার কথা শুনিয়া সেই আনন্দ মহাবিষাদে, আতঙ্কে ও ঘৃণাতে পরিণত হইল। জনপ্রবাদ এক স্থানে আবদ্ধ থাকে না, মুখে মুখে দশদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই টোটা কাটার জনশ্রুতিটাও ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল; যাহারা শুনিল, তাহারাই জাতিভয়ে ধর্মভয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, যে সময়ের কথা, সে সময়ে দমদমাতে চর্বিটোটার ব্যবহার হয় নাই, তথাপি মানুষের ভয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বহু দিবসাবধি দমদমা ক্যান্টনমেন্ট বঙ্গদেশীয় অস্ত্রধারী সেনাদলের হেড কোয়ার্টর ছিল। অতঃপর কর্তৃপক্ষীয়েরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যে অভিপ্রায়ে উহা স্থাপন করা হইয়াছিল, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, অতএব অস্ত্রধারীদলের হেড কোয়ার্টার মিরাটে স্থানান্তরিত করা হইল, লাল কোর্তার বদলে নীল কোর্তার ব্যবহার আরম্ভ হইল, সেনাবারিক, তাহাদের ভোজনাগার ও অফিসারগণের বাঙলাগুলি অপরাপর লোকের বাসার্থ প্রদান করা হইল এবং প্রথমাবধি যে সকল বাড়িতে কেবল অস্ত্রাদির নির্মাণ ও অস্ত্রাদি রক্ষা করা হইত, সে সকল বাড়ি এখন কেবল সামান্য সামান্য কারখানা ও সামান্য অস্ত্রের ভাণ্ডার হইয়া রহিল। পূর্বের দমদমায় ও এখনকার দমদমায় অনেক প্রভেদ।

দমদমার সিপাহিদলের আতঙ্ক-বৃত্তান্ত ও আতঙ্কের হেতু নানাস্থানে প্রচারিত হইল, কলিকাতার ধর্মসভা তাহা শ্রবণ করিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইলেন। সনাতন হিন্দুধর্মের

মহিমাপ্রচারে ও স্বধর্মরক্ষণে সেই ধর্মসভার সদস্যগণ সর্বক্ষণ যত্নবান ছিলেন, ঐ বিসদৃশ সংবাদ শ্রবণে অলক্ষণ বিবেচনা করিয়া তাহাদের চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মিল। দাবানলে বন দগ্ধ হয়, তাহা সকলেই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরানলে অন্তর দগ্ধ হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ সে অনল শীঘ্র নির্বাপিত হওয়া সহজ নহে।

দমদমায় মহা গোলযোগ। শান্তির সময়ে কোন অপ্রিয় কথা শুনিলে সিপাহিরা তাহাদের সেনাপতির নিকটে গিয়া জানাইত, ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা কেন উঠে, তাহা জানিবার জন্য প্রার্থনা করিত, বর্তমান ঘটনায় তাহা আর হইল না; সেনাপতিতে ও সিপাহিতে পূর্বে যে বিশ্বাস ছিল; সে বিশ্বাস এখন তিরোহিত। দমদমার বাতাস বারাকপুরে পৌঁছিল। বারাকপুরে সিপাহিদলেও অসন্তোষের লক্ষণ।

কলিকাতা হইতে প্রায় আটক্রোশ দূরে ভাগীরথী তীরে শোভাময় বারাকপুর। এই স্থানটি বঙ্গ প্রেসিডেন্সি বিভাগের সেনাদলের প্রধান ক্যান্টনমেন্ট। সামরিক বিভাগের এমন কোন অফিসার নাই; বারাকপুরের নাম যিনি না জানেন। সময়ে সময়ে সিভিল মিলিটারি বহুতর ভদ্রলোক বারাকপুরে বিহার করিতে আইসেন। সুন্দর সুন্দর বৃক্ষরাজি পরিশোভিত, সন্দুর সুন্দর সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম্য-ভূষিত, সুন্দর সুন্দর সৌধ মণ্ডিত বারাকপুর দর্শন করিলে সর্বশ্রেণীর দর্শকের নয়নরঞ্জন হয়। এই স্থানে ভারতের গবর্নর জেনরেলের প্রাদেশিক বিরাম প্রাসাদ বিদ্যমান। রাজধানীর জল-বায়ু অপেক্ষা বারাকপুরের জল-বায়ু শরীরের পক্ষে অধিক উপকারী, এই কারণে নগরবাসী অনেক লোক—এমন কি, অতি নিকটবর্তী টিটাগড়ের অধিবাসী ইংরাজ লোকেরাও তথায় বায়ু সেবন করিতে যান। রাজধানীর নব-বিবাহিত শুভ্রদম্পতি এই মনোরঞ্জন বারাকপুরে ফুলশয্যার মধুবিহারে সুখানুভব করিয়া থাকেন। ইতিহাস পাঠকেরা অবগত আছেন, প্রসিদ্ধ জব চার্নকের নামানুসারে বারাকপুরের দ্বিতীয় নাম চার্নক।

১৮৫৭ অব্দের প্রথমে বারাকপুরে চারিদল পদাতিক সিপাহি ছিল। দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার এবং তেতাল্লিশ-গণিত সিপাহিদল এই দুটি "পরম সুন্দর রেজিমেন্ট"। ইহারা কান্দাহারের যুদ্ধে সেনাপতি নটের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল; তাহার পর ভয়ঙ্কর মহারাষ্ট্র ও শিখযুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া যশঃ পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়াছিল; তদ্ব্যতীত কলঙ্কিত চৌত্রিশ-গণিত সেনাদল সেখানে ছিল, কয়েক বৎসর পূর্বে বিদ্রোহী হওয়াতে সেনাদলের তালিকা হইতে তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের স্থলে এক দল নতুন সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শিখ-সংগ্রামে যাহারা জয়ী হইয়াছিল, সেই সত্তর-গণিত সেনাদলও তখন বারাকপুরে অবস্থিত। এই সকল পল্টনের মধ্যে তিন পল্টন সম্প্রতি পঞ্জাবে অথবা পঞ্জাবের সীমাভাগে প্রেরিত হইয়াছে, এবং চৌত্রিশ-গণিত পলটন্ লখ্‌নউ হইতে বারাকপুরে আসিয়াছে। কর্নেল এস. জি. হুইলার অধুনা অন্য দলের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়া এই শেষোক্ত পল্টনের অধিনায়ক হইয়াছেন; তেতাল্লিশ-গণিত পল্টনের নায়ক জে. ডি. কেনিডি, তিনি অল্পদিন মাত্র নায়কত্ব করিতেছেন। যে সকল অফিসার ৭০-গণিত পল্টন ও ২ গণিত পল্টনের একাংশে নেতৃত্ব করিতেছেন, তাহারা অনেকদিন আছেন বলিয়া সৈন্যগণের বিশেষ পরিচিত। এই স্টেশনের সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার চার্লস গ্রান্ট এবং বিভাগীয় সেনাপতি সুযোগ্য সাহসী সৈনিক ও প্রতিষ্ঠিত অফিসার জন হিয়াসে।

২৮ জানুয়ারি তারিখে জেনারেল হিয়ার্সে লক্ষণ বুঝিয়া আজুটান্ট জেনরেলের নিকটে এই মর্মে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে—

"বারাকপুরে সিপাহি সিপাহি পল্টনে বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কতিপয় কুচক্রী লোক (সম্ভবত ব্রাহ্মণ) এবং কলিকাতার হিন্দু পক্ষীয় প্রতিনিধিগণ (আমার বিশ্বাসে ধর্মসভা) এই রূপ এক জনরব তুলিয়া দিয়াছে যে, সেনাদলের সিপাহিগণকে বলপূর্বক খ্রিস্টান করা হইবে। যে সকল হিন্দু কলিকাতায় বিধবা-বিবাহের বিপক্ষ, বোধহয় তাহারাই অন্যবিধ উপায়ে বিধবাবিবাহ প্রতিষেধের ব্যবহার বজায় রাখিবার জন্য, বিধবাবিবাহের অনুকূল আইন রদ করাইবার জন্য গভর্নমেন্টকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কল্পনা করিয়াছে, যে মূর্খ সিপাহিগণকে বিপরীত পথে লওয়াইলে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে; সেই কল্পনা প্রভাবেই এই বলিয়া তাহারা সিপাহিগণকে ক্ষেপাইয়া দিতেছে, ইংরাজ গবর্নমেন্ট তোমাদিগকে বলপূর্বক খ্রিস্টান করিবেন, বলপূর্বক তোমাদিগের জাতি-ধর্ম বিনাশ করিবেন. অতএব তোমরা পূর্ব হইতেই উপদ্রব (গৃহদাহাদি) করিতে আরম্ভ কর এক্ষণে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিলে (নিরস্ত করা কঠিন বোধ হইতেছে) সম্ভবত তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

সকলের মুখেই চর্বি টোটার কথা। বারাকপুরের সকল সিপাহির মুখে ঐ কথার আন্দোলন। ইংরাজ গবর্নমেন্ট বলপূর্বক সিপাহিগণের জাতি-ধর্ম নষ্ট করিবেন, অতি অল্প লোক কেবল এ কথায় বিশ্বাস করিতেছে না। অধিকাংশের বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, গোখাদক ও শূকরখাদক ফিরিঙ্গিরা আমাদের দেশবাসিগণকে জাতিচ্যুত ও ধর্মচ্যুত করিতে সংকল্প করিয়াছে।

ফল কথা এই যে, বারাকপুরের সেনাদলে অসন্তোষ অত্যন্ত প্রবল। তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া রাত্রি যোগে ঘর জ্বালাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে; বাস্তবিক ইহা ছেলেখেলা কিনা, কিংবা অপরকে সাবধান করিবার সঙ্কেত কিনা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। চর্বি টোটার গল্প উঠিবার কয়েকদিন পরেই বারাকপুরের সিপাহিরা স্থির করিল, দমদমা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সত্য, কলিকাতাতেও সেই সংবাদের পোষকতা হইতেছে, ইতিমধ্যে বারাকপুরের টেলিগ্রাফ আফিসে অগ্নি দিয়া ভস্মসাৎ করা হইয়াছে; তদবধি প্রতি রজনীতেই অগ্নিকাণ্ড হইতেছে; অফিসারগণের বাঙ্‌লার খড়ের চালে চালে অগ্নি জ্বলিতেছে, কতকগুলি সরকারি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে, কেবল বারাকপুরেই এইরূপ কাণ্ড, তাহা নহে, একশত মাইলের অধিক দূরবর্তী রানিগঞ্জেও ঘন ঘন গৃহদাহ হইতেছে। অনুমান এইরূপ—যে, ২য় গ্রিনেডিয়ার দল ইতিপূর্বে সাঁওতাল পরগনায় কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিল, সাঁওতালেরা কুপিত হইলে বিপক্ষপক্ষের ঘর জ্বালাইয়া দেয় সেই রঙ্গ দেখিয়াই সিপাহিরা সাঁওতালের অনুকরণে অগ্নিকাণ্ড করিতে শিখিয়াছে।

প্রতি রজনীতেই দুষ্ট লোকেরা কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া ঘরে ঘরে আগুন দিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা সকলেই যে সিপাহি এমন স্থির করা যায় না; তাহাদের দলে অপরাপর দুষ্ট লোকেরা যোগ দিয়াছে, এইরূপ সম্ভব। স্থানে স্থানে সভা হইতেছে; পত্র লেখা হইতেছে, বারাকপুরের ডাকঘর হইতে ও কলিকাতার ডাকঘর হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনে, ভিন্ন ভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে সেই সকল পত্র রওনা হইতেছে; পত্রে লেখা থাকিতেছে, "ইংরাজ গবর্নমেন্ট আমাদের জাতি-ধর্ম নষ্ট করিতে অগ্রসর, এ ক্ষেত্রে তোমরা যাহা কর্তব্য বিবেচনা কর, তাহার উপায় দেখ।"

বহরমপুরে বিদ্রোহ

বারাকপুর হইতে একশত মাইল উত্তরে ভাগীরথী-তীরে বহরমপুরের সেনানিবাস। এই স্থান সিপাহিদের দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণের যোগ্য স্থান বলিয়া বিবেচিত। কেননা, বহরমপুরের অদূরেই মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের বাসস্থান। মোগল সম্রাটের অধীনস্থ সুবাদারেরা এক সময়ে বাহুবলে এতৎপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন, নবাব নাজিম তাহাদেরই বংশধর। সকলেই জানেন, এই নবাব যদিও পূর্বপুরুষের সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি এখনও বহুধনের ঈশ্বর আংশিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং বহু অমাত্য পরিবেষ্টিত। তিনি জানেন, ইংরাজেরা তাহাকে অপদস্থ করিয়া রাখিয়াছে। যদিও এখন তিনি দুর্বল, তথাপি বংশমর্যাদার নাম আছে; তাহার অনুমাত্র ইঙ্গিতে নগরের সহস্র সহস্র লোক কার্যক্ষেত্রে উত্থান করিতে পারিবে, এইরূপ অনুমান।

বহরমপুরে তখন একদলও গোরা-সৈন্য ছিল না, নিকটেও গোরা-সৈন্যের শিবির ছিল না; ১৯ গণিত একদল পদাতিক সিপাহি আর একদল অচিহ্নিত অশ্বারোহী মাত্র তথায় ছিল; কতকগুলি কামান সেখানে থাকিত, দেশীয় গোলন্দাজেরাই সেই সকল কামান দাগিত। এই সকল সৈন্য যদি তাহাদের উপরওয়ালা ইংরাজ অফিসারগণের বিপক্ষ হইয়া উঠে এবং নবাব নাজিমের নামে মুরশিদাবাদের লোকেরা যদি তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহা হইলে এককালে সমগ্র বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। আমাদের প্রজারা এরূপ ব্যবহারে চঞ্চল হইবে না, কিন্তু বিপক্ষেরা স্থির বিশ্বাসে উৎসাহ সম্পন্ন।

গবর্নমেন্টের নিয়মবদ্ধ কার্যপ্রণালীতে এ সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে সঙ্কট বৃদ্ধি হইয়াছিল। বারাকপুরে যখন অধিকাংশ সিপাহি ক্ষিপ্তপ্রায় তৎকালে অসন্তুষ্ট সিপাহিরাও কার্যানুরোধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইতেছিল, ভিন্ন স্থানে গিয়া তাহারা সংক্রামক ভয় বিস্তার করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। প্রথমত ৩৪ গণিত পল্টনের একজন গার্ড একপাল সুশিক্ষিত অশ্বসহ উত্তরাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিল; এক সপ্তাহ পরে আর এক দল সিপাহি জনকতক ইউরোপীয় রোগী সমভিব্যাহারে সেই দিকে যাত্রা করিয়াছিল। বহরমপুবে তাহারা পৌঁছিলে সেখানকার সিপাহিরা তাহাদের কার্যভার গ্রহণ করিল তাহারা বারাকপুরে ফিরিয়া আসিল। এই সুযোগে বারাকপুরের সিপাহিরা বহরমপুরের সিপাহিগণকে উপস্থিত ঘটনা ও আপনাদের সংকল্প উত্তমরূপে জানাইয়া দিল; পত্র লিখিয়া সে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া জানাইতে পারিত না। তাহারা বলিয়া আসিল, "ইংরাজেরা আমাদিগকে চর্বি দেওয়া টোটা কাটাইবে, কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করা হয়, তোমরা বিবেচনা কর।"

৩৪ গণিত পল্টন যখন বহরমপুরে পৌঁছিল, তথাকার ১৯ গণিত দলের সিপাহিরা তখন তাহাদিগকে বাহু প্রসারণ করিয়া মধুর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিল। উভয়দলে অনেক দিনের বন্ধুত্ব; কিছুদিন পূর্বে ঐ দুই দল একসঙ্গে লখনউ নগরে ছিল। ১৯ গণিত দলের সিপাহিরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "বারাকপুর হইতে টোটা-কাটা-সম্বন্ধে যে আশ্চর্য গল্প শুনা গিয়াছে, সত্য সত্য সে ব্যাপারটা কি?" ঘটনাটা বহরমপুরের সেনাদলের পক্ষে নতুন ছিল না, দুই হপ্তা পূর্বে তাহারা তাহার আভাস শুনিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই, তাহাদের সর্দার অফিসার তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, চর্বি-টোটা ব্যবহারের কথা উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু দূষিত টোটার বদলে সিপাহিদের ইচ্ছামত টোটার ব্যবহার চলিবে, এই সিদ্ধান্ত হওয়াতে দমদমা ও বারাকপুরে

গোলমাল থামিয়া গিয়াছে। ১৯ গণিত পল্টন এই পর্যন্ত জানিয়াই চুপ করিয়াছিল, এক্ষণে ৩৪ গণিত দল তাহাদিগকে বলিল, সে কথা নহে। গবর্নমেন্টের একান্ত ইচ্ছা, চর্বি টোটা-কাটাইয়া তাহাদিগের জাতি-ধর্ম নষ্ট করা। প্রেসিডেন্সি বিভাগের সিপাহিদের সংকল্প যেরূপ; তাহাও তাহারা বলিয়া দিল। শ্রবণ করিয়া ১৯ গণিত দলের আতঙ্ক ও বিরাগ বাড়িয়া উঠিল; পূর্বে অফিসারের মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিল; যাহারা বারাকপুর হইতে আসিয়াছে, তাহারা অবশ্যই ঠিক কথা জানে, সুতরাং তাহাদের কথাই সত্য বলিয়া মানিল। এক্ষেত্রে যেরূপ ফল হয়, সাধারণ বিদ্রোহের উত্তেজনায় তাহারই সূত্রপাত হইল।

বারাকপুরের সিপাহি আসিবার পরদিন বহরমপুরের ১৯ গণিত দলের কর্তারা হুকুম দিলেন, আগামীকল্য প্রাতঃকালে তাহাদের প্যাবেড হইবে। সচরাচর যেমন প্যারেড হইয়া থাকে, সেইরূপ প্যারেড—"হঠাৎ প্রয়োজন," নিগূঢ় তাৎপর্য কিছুই নয়। কিন্তু "শূন্য বন্দুক" লইয়া কাওয়াজ তাৎপর্য পরিস্ফুট। প্রাতঃকালে প্যারেড হইল; তখন কোনরূপ অসন্তোষের লক্ষণ লক্ষিত হইল না; কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আজুটান্ট এম আনদ্রুসাহেব স্বয়ং কর্নেল মিচেল কে জানাইলেন; ছাউনির মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়াছে। প্রাতঃকালে প্যারেডের সময় সিপাহিগণকে যে "পার্কসন ক্যাপ" দেওয়া হয়; তাহা তাহারা স্পর্শ করে নাই; আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, "উহা আমরা লইব না, কারণ, টোটাতে দূষিত পদার্থ আছে।"

প্যারেডের পূর্বে সেনাগণের হস্তে টোটা প্রদান করিবার পদ্ধতি নাই, কিন্তু যে দিন প্রাতঃকালে প্যারেড, তাহার পূর্বে রজনীতে কতিপয় সিপাহি অস্ত্র ভাণ্ডারে কোন সূত্রে টোটাগুলি দেখিয়াছিল। টোটা দেখিয়াই সিপাহিরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল, কলিকাতা হইতে এবারে যে সকল নতুন টোটা আসিয়াছে, পুরাতন টোটার সহিত সেই ভয়ঙ্কর টোটা মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন এই সিদ্ধান্ত তেমনি তৎক্ষণাৎ মহাতঙ্কের প্রাদুর্ভাব।

আজুটান্টের মুখে এই কথা শুনিয়াই মিচেল তৎক্ষণাৎ ছাউনিতে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহার অধীনস্থ দেশীয় অফিসারগণকে "কোয়ার্টার গার্ডে"র সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ পাঠাইলেন।

দেশীয় অফিসারেরা আদেশ পালন করিলেন। এতাদৃশ সঙ্কটসময়ে সাদর মিষ্ট-বাক্যে অফিসারগণকে প্রবোধ দিয়া তাহাদের দ্বারা সিপাহিগণকে শান্ত করাই সৎ পরামর্শ। কর্ণেল মিচেল অফিসারগণকে যদি বলিতেন, পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অন্যায় কার্য করিয়াছেন, এরূপ ধারণা হওয়া সিপাহিগণের বিষম ভ্রম, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে উত্তম কার্য হইত; তাহা না করিয়া তিনি ক্রোধবশে অফিসারগণকে বলিলেন, "সিপাহিরা টোটা-গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকে বল, তাহারা যদি টোটা গ্রহণে অসম্মত থাকে, তবে তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশে অথবা চীনদেশে চালান করা যাইবে, সেখানে গেলেই মানুষ মরে।" এইরূপ উক্তি করিয়া কর্নেল মিচেল শেষে বলিলেন, "এক বৎসর পূর্বে ঐ সকল টোটা প্রস্তুত হইয়াছে, সমস্ত ক্যান্টনমেন্টের সিপাহিরা তাহা অগ্রে ব্যবহার করিয়াছে। এক্ষণে যাহারা জিদ করিয়া গবর্নমেন্টের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছে, তাহাদের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা যাইবে।"

অফিসারেরা বিদায় হইলেন, কিন্তু কর্ণেলের শাসনবাক্যে কোন ফল হইল না। সিপাহিদের পূর্বধারণা নতুন হইয়া উঠিল, তাহারা ঠিক বিশ্বাস করিয়া লইল, তাহাদের

জাতি ও ধর্ম মহাসঙ্কটাপন্ন। তাহারা আরও ভাবিল, ইংরাজের যদি মন্দ উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে কর্নেল মিচেল কদাচ তত ক্রোধভরে গর্জন করিতেন না; তাহার কুমতলব আমরা বুঝিয়া লইয়াছি, ইহা জানিতে পারিয়াই তাহার ক্রোধ।

রাত্রি অন্ধকার; আজুটান্টের সহিত কর্নেল মিচেল শকটারোহণে গৃহে চলিলেন, মনে মনে আতঙ্ক বিপদ অনিবার্য। বহরমপুরে একজনও গোরা সৈন্য নাই, পদাতিক কালা সিপাহি বিলক্ষণ দলপুষ্ট অশ্বারোহী ও গোলন্দাজের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় অতি অল্প। তাহারাও কালা লোক; তাহারাও যদি পদাতি দলের ন্যায় বিরাগ লক্ষণ দেখায়, তাহাদের সঙ্গে যদি যোগ দেয়, তাহা হইলে আরও বিপদ। এখন কি করা কর্তব্য? বিশেষ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, সেই রাত্রেই তিনি হুকুম জারী করিলেন, "কল্য প্রাতঃকালে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ দলের প্যারেড হইবে।"

ভারতবর্ষে সকল লোকেই রাত্রিকালে সকাল সকাল নিদ্রা যায়, ভোরে জাগরিত হয়, কেহই বেলা পর্যন্ত ঘুমায় না; কর্ণেল মিচেল রাত্রি ১০টার পরেই শয্যায় শয়ন করিলেন, শয়ন করিয়াই নানা ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, কল্য প্রাতঃকালে কি করা হইবে, এমন সময় হঠাৎ একটা মহা কলরব শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ডঙ্কাধ্বনি, বহুকণ্ঠমিশ্রিত উচ্চরব, বহু লোকের গর্জন। সে সকল গণ্ডগোলের অর্থ বুঝা গেল না। মোট কথা, পল্টনের লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। দেশীয় অফিসারগণের সহিত কর্নেল মিচেলের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর অবধি গোলযোগ বাড়িয়া উঠিয়াছে। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ দলেও অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে; প্রত্যেকের মনেই সন্দেহ, ভয়ঙ্কর প্রতারণা; সকলেই স্থির করিতেছে; বলপূর্বক আমাদের বন্দুকে চর্বির টোটা লাগাইতে বাধ্য করা হইবে। সকলের মনেই আতঙ্ক। সকলের মনেই বিশ্বাস, এইরূপ অত্যাচার করা হইবে, ইহা পূর্ব হইতেই সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। কি প্রকারে প্রথম সঙ্কেত হইল, তাহা নিরূপণ করাও দুঃসাধ্য—এতাদৃশ ঘটনায় তাহা নিরূপণ করাও দুরূহ। সামান্য সঙ্কেতেও এইরূপ উত্তেজনা ঘটিতে পারিত। এই রজনীর অন্ধকারে কোন বিপদ সংঘটিত হইবে, এইরূপ প্রত্যয় জন্মিল। কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিতেছে "আগুন লাগাও!" কেহ কেহ বলিতেছে অশ্বারোহী সেনাদল আমাদিগের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে; কেহ কেহ অনুমান করিতেছে, দূরে দূরে গোলন্দাজগণের কামানের চক্রের ঘর ঘর শব্দ শুনা যাইতেছে। সেনাগণ প্রাতঃকালের প্যারেডের নিমিত্ত যে সকল বন্দুক সাজাইয়া রাখিয়াছিল ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহারা সেই সময়ে সেই সকল বন্দুকে গুলি বারুদ পূর্ণ করিতে লাগিল।

কর্নেল মিচেল নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, সেনাগণ ক্ষিপ্তপ্রায়, ভয়ে নহে, রাজ বিদ্রোহের উত্তেজনায়। ইহা স্থির করিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সৈনিক ছাউনিতে উপস্থিত হইলেন। ইউরোপীয় অথবা এতদ্দেশীয় কোন অফিসারের রিপোর্ট না পাইয়াও অশ্বারোহীদলের সেনাপতির নিকটে গিয়া তিনি হুকুম দিলেন, 'অবিলম্বে তোমার সেনাগণকে অশ্বে আরোহণ করিতে বল। গোলন্দাজগণের পক্ষেও হুকুম হইল, যুদ্ধের কামান ও ব্যবহারযোগ্য অপরাপর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা যেন পদাতি দলের ছাউনির সম্মুখে উপস্থিত হয়। রাত্রি অন্ধকার, সে অন্ধকারে অনেকদূর যাইতে হইবে, ইহা আপাতত বড় কঠিন বোধ হইল ঊনবিংশ গণিত পদাতিক দল উল্লিখিত অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহা বিপদ গনিয়া বিবেচনা করিল, তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ঐ

প্রকার আয়োজন হইয়াছে। যাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়; তাহারা যেমন প্রাণভয়ে সময়-প্রতীক্ষায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, পদাতিক দলের সৈন্যগণ সে সময় মহা শঙ্কিত চিত্তে সেইভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যুদ্ধ করিবার লক্ষণ দেখাইল না। তাহাদের হস্তে গুলিভরা বন্দুক ছিল, কিন্তু একটা বন্দুকেও তাহারা আওয়াজ করিল না।

রাত্র দুই প্রহর অতীত। কর্নেল মিচেল সেই সময় তথাকার ইউরোপীয় অফিসারগণকে জাগাইয়া শয্যা হইতে তুলিয়া, কামানাদি লইয়া প্যারেড ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহারা উপস্থিত হইবার পূর্বেই অশ্বারোহীদলের কমান্ডার আলেকজান্ডার সাহেব তাহার অধীনস্থ তুরুকসওয়ার সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পদাতিদলের ইউনিফরম পরা ছিল না; কোমরবন্ধ ছিল, হস্তে বন্দুক ছিল, সেই অবস্থায় তাহারা ছাউনির সম্মুখে খাড়া হইল, প্রতিকূল ঘটনা হইবে, তাহা তাহারা বুঝিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বাধাইবার ভাব দেখাইল না। ইউরোপীয় অফিসারেরা যদি অগ্রে তাহাদিগের রাগ বাড়াইতেন, অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির হইত না, অফিসারদের সঙ্গে যে সমস্ত মশাল ছিল, তাহার আলোও তত উজ্জ্বল ছিল না, হুলস্থূল পড়িয়া যাইত, তাহা হইলেও আত্মরক্ষার জন্য পদাতি সিপাহিরা বিপক্ষের উপর গুলি বর্ষণ করিত।

সে দুঃসময়ে মিচেল যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই সুবিবেচনার কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি তখন কামানে গোলা-বারুদ পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, সওয়ারদলকে সিপাহিদলের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন এবং দেশীয় অফিসারগণকে তলব করিবার জন্য আজুটান্ট সাহেবকে আদেশ দিলেন। আহ্বানমাত্র অফিসারেরা উপস্থিত হইলেন।

পুনর্বার কর্ণেল সাহেবের সহিত পদাতি সিপাহিরা মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইল, পুনর্বার কর্নেল সাহেবের বাক্যগুলি সিপাহিদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, পুনর্বার সিপাহিরা বুঝিয়া লইল, কর্নেল সাহেব রাগিয়া রাগিয়া কথা কহিতেছেন।

কর্নেল মিচেল কি কি কথা বলিয়াছিলেন, নিঃসন্দেহে তাহার সত্যতা নির্ণয় করা অসাধ্য ভাবিয়া সে সকল কথা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব বোধ হইল।

দেশীয় অফিসারেরা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কর্ণেল মিচেল বলিয়াছেন, "এ ক্ষেত্রে যদিও তাহার নিজের প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি তিনি বিদ্রোহী সিপাহিগণকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবেন।" মিনতি করিয়া কর্নেলকে তাহারা বলিয়াছিলেন, "আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, অকস্মাৎ বল প্রয়োগ করিবেন না, গোলন্দাজ ও সওয়ারগণকে সম্মুখে দেখিয়া সিপাহিরা প্রাণভয়ে ভীত হইয়াছে; তাহারা মূর্খ, তাহাদের মনে সন্দেহ প্রবল, সেই জন্যই তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছে; গোলন্দাজেরা যদি কামান লইয়া ফিরিয়া যায় অশ্বারোহীরা যদি নিঃশব্দে এ স্থান পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সিপাহিরা নিশ্চয়ই বন্দুক পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিবে।"

এই সময়ে বড় বিভ্রাট ঘটিল। ফেব্রুয়ারি মাসের অন্ধকার রজনী, সে সময়ে কর্নেল মিচেল অপেক্ষা সুস্থ-মস্তিষ্ক লোকেরও চিত্তভ্রম জন্মিতে পারিত। উগ্রপ্রকৃতি মিচেল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

কথা এই যে, উনবিংশ গণিত সিপাহিদল তৎকালে মহাআতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী হওয়া তখন তাহাদের মতলব ছিল না। এ অবস্থায় তাহাদিগকে আরও অধিক ভয় দেখাইবার জন্য কামান, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সেনা আনয়ন করা কর্নেল

মিচেলের পক্ষে বিষম ভ্রমের কার্য হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় কেবল শান্তি ও আত্মরক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করা উচিত ছিল, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অগত্যা গোলাগুলির ব্যবস্থা করিলেই সুবুদ্ধির কার্য হইত।

এখন কি হয়?—গোলন্দাজ ও অশ্বারোহিগণকে যখন আনয়ন করা হইয়াছে, তখন যদবধি ঊনবিংশ গণিত সিপাহিরা আশানুরূপ বশীভূত না হয় তদবধি সেই গোলন্দাজ ও অশ্বারোহীদিগকে সিপাহি-ছাউনির সম্মুখে উপস্থিত রাখা প্রায়োজন।

দেশীয় অফিসারেরা কর্নেল মিচেলকে অনেক বুঝাইলেন। কর্ণেল মিচেল শেষকালে বলিলেন, ''সিপাহিরা অস্ত্রত্যাগ করুক, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহীরা ফিরিয়া যাউক, কিন্তু কল্য প্রাতঃকালে প্যারেড হইবে।" অফিসারেরা তাহাতেও আপত্তি করিলেন, তাহারা বলিলেন, ''প্যারেডের হুকুম যদি বাহাল থাকে, তাহা হইলে সন্দিগ্ধ সিপাহিরা ভাবিল, কেবল খানিকক্ষণের জন্য তাহাদিগকে প্রবোধ দেওয়া হইল, রজনী প্রভাত হইলেই তাহাদের বিপদ ঘটিবে অতএব প্যারেড স্থগিত করা সুপরামর্শ।"

কর্ণেল মিচেল এই সুপরামর্শের মর্ম বুঝিলেন, গোলন্দাজ অশ্বারোহীরা ফিরিয়া গেল, রহিল কেবল প্রজ্বলিত মশালগুলি। মিচেলের আদেশে মশালচীরাও প্রস্থান করিতে লাগিল। মশালের আলো যখন ক্রমে ক্রমে চক্ষের অগোচর হইয়া গেল, সিপাহিরা তখন ভাবিল নিরাপদ।

রজনী প্রভাতে প্যারেড ক্ষেত্রে প্যারেড হইল, সিপাহিরা কোন প্রকার অবাধ্যতা দেখাইল না। অফিসারগণের বিপক্ষে তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল তজ্জন্য বড় অনুতাপ করিল। অনুতাপে সরলতা আছে, এইরূপ বিশ্বাসে অফিসারেরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু গবর্নমেন্ট ক্ষমা করিবেন কিনা সংশয় স্থল। কারণ, অনুসন্ধানের জন্য সমিতি বসিল, ইউরোপীয় ও দেশীয় অফিসারগণের জবানবন্দি লওয়া হইল, সংক্রামক আতঙ্ক ব্যতীত প্রকৃত বিদ্রোহভাব সপ্রমাণ হইল না। সিপাহিরা শান্তভাব ধারণ করিল। মুরশিদাবাদের নবাব নাজিম শান্তি ও নিরাপদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, মুরশিদাবাদবাসী মুসলমান প্রজারা মৌখিক ব্যবহারে শান্তিপ্রিয়তা দেখাইল; কিন্তু তাহাদের মনের ভিতব কোন ভাব প্রচ্ছন্ন রহিল, তাহা আমাদের অগোচর।

মঙ্গল পাঁড়ে

পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্বপ্রকার শাসন প্রণালীর অন্তরে এইরূপ সিদ্ধান্ত বাক্য আছে যে, অন্ধকারে অন্ধকারে যখন কোন বিপদ—ঘটনার সূত্রপাত হয়, রাজ্য বিপর্যস্ত হইবার ভয় হয়, দেশের রাজা তাহা জানিতে পারিবার অগ্রেই সে বিপদ আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। কিন্তু ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের প্রাণলী স্বতন্ত্র প্রকার। এ প্রণালীতে বিলক্ষণ বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। এ রাজ্যে যেটা সম্ভাবিত ঘটনা বলিয়া গণ্য, তাহা এককালে নিশ্চিত অবধারিত বিবেচিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন আচার, এই সকল একত্র হওয়াতে রাজা-প্রজার মধ্যে সহানুভূতির বৈপরীত্য, শুভাশুভে উপেক্ষা দৃষ্ট হয়, সম্বন্ধটা অনভিজ্ঞতা ও মলিনতার অবগুণ্ঠনে আবৃত। এই অবগুণ্ঠন সর্বথা রাজা প্রজার মধ্যে পার্থক্য বিধান করিতেছে। রাজ্য মধ্যে কোথায় কি হইতেছে, রাজা তাহার কিছুই স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন না, স্বকর্ণে কিছুই শুনিতেছেন না; প্রকৃত ঘটনা শুনায়, এমন লোকও বিরল। ঘটনাসূত্রে যখন কোন বিষয়ের সত্যতা প্রকাশ

হইয়া পড়ে সৈনিক বিভাগের সামান্য কর্মচারী হইতে সরকারি কার্যনির্বাহক প্রধান প্রধান পদস্থ লোক পর্যন্ত তখনকার কর্তব্যবিধানে ব্যস্ত থাকেন; পূর্বক্ষণে যাহা নিবারণ অন্তত দমনের উপায় বিধেয়, তাহা ঠিক হয় না, সময় অতীত হইয়া গেলে, সেই বিষয় রাজার কর্ণগোচর হয়। রাজদ্রোহ নিবারণের প্রকৃত উপায় যাহা, বিভাগীয় চিঠি পত্রাদির তুফানে, বিশেষত অত্যধিক কেন্দ্রস্থানীয় ব্যবস্থায় সেই উপায়ে প্রায় যথাসময়ে উপেক্ষিত হইয়া যায়। শীঘ্রই যাহার উপায় করা কর্তব্য, বাঁধা নিয়মের অনুরোধে একস্থান হইতে অন্যস্থানে, একজনের নিকট হইতে অন্যজনের নিকটে চিঠি লেখালিখি কবিতে করিতে তৎসাধনে অসম্ভব বিলম্ব হইয়া পড়ে। সৈনিক বিভাগের একটি প্রয়োজনীয় কার্য আশু কর্তব্য হইলে নিম্নপদস্থ সৈনিকের বাঙ্‌লা হইতে ক্রমান্বয়ে উপরে উঠিয়া গবর্নমেন্ট প্রাসাদে সংবাদ পৌঁছিতে বিস্তর সময় নষ্ট হইয়া যায়।

সামরিক বিভাগের সমস্ত ভার বোধ হয় প্রধান সেনাপতির হস্তে বিন্যস্ত। পক্ষান্তরে সর্ববিষয়ের পর্যবেক্ষণভার গবর্নর জেনরেলের হস্তে, অথচ সামরিক ব্যাপারে গবর্নর জেনরেলের কর্তৃত্ব কেবল নামমাত্র বলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে গবর্নর জেনরেলের সহিত প্রধান সেনাপতির বিরোধ ঘটে, এক এক স্থলে সেই বিরোধে বিলক্ষণ ঢলাঢলি হইয়া যায়। বিরোধীপক্ষের মধ্যে কাহারও মেজাজ যদি ঠান্ডা থাকে, বিস্তর বাদানুবাদের পর তবে সে বিরোধের শান্তি হয়, জেদাজেদি থাকিলে আদৌ মীমাংসা হয় না।

কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন প্রাজ্ঞ গবর্নর জেনরেলেরা "নিরবচ্ছিন্ন সামরিক ব্যাপারসমূহ প্রধান সেনাপতির হস্তেই অর্পণ করেন, কিন্তু ভারতের রাজ্যশাসন-প্রণালীর সবিশেষ নির্ঘণ্ট যখন আলোচিত হয়, তখন সামরিক কার্যের মধ্যে কোনটি যে নিরবচ্ছিন্ন সামরিক ব্যাপার, তাহা-নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। কার্যপ্রণালী সুগম করিবার নিমিত্ত প্রধান সেনাপতিকে কাউন্সিলের সদস্যপদে উন্নত করিবার নিয়ম হইয়াছে। গবর্নর জেনরেল ও প্রধান সেনাপতি সর্বদা যদি এক স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে কার্যক্ষেত্রে সিভিল মিলিটারি উভয় বিভাগের কার্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিত না; কিন্তু গবর্নর জেনরেল বাহাদুর দেশের এক প্রান্তে মিলিটারি, সেক্রেটারি আফিস লইয়া স্বতন্ত্র থাকেন; পক্ষান্তরে আজুটান্ট জেনরেলের আফিস লইয়া প্রধান সেনাপতি দেশের অপর প্রান্তে অবস্থান করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে ঠিক এইরূপ সংস্থান হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং বাহাদুর কলিকাতায় ছিলেন, প্রধান সেনাপতি জেনরেল আনসন্ নিজের আফিস লইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে থাকিতেন; মধ্যে মধ্যে নিজে এক একবার কলিকাতায় আসিতেন। তৎকালে আজুটান্ট আফিস কলিকাতায় ছিল, কিন্তু আজুটান্ট জেনরেল স্বয়ং মীরটে ছিলেন। অস্ত্রাগার সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরেল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে অবস্থান করিতেন। চর্বি টোটা প্রসঙ্গের মীমাংসা করনার্থ এই সকল ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর একত্র সমাবেশ নিতান্ত আবশ্যক ছিল, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করাতে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসায় অসম্ভব বিলম্ব হইয়াছিল।

পরস্পরের আবাসস্থানের দূরত্ব হেতু যত অসুবিধা না ঘটুক মিলিটারি এজেন্টগণের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন সেই সম্ভাবিত বিলম্ব দ্বিগুণতর হইয়াছিল, অবস্থা ধরিয়া বিচার করিলে সে বিলম্ব অনিবার্য্য। দমদমার ৭০ গণিত সিপাহিদলের কমান্ডার কাপ্তেন রাইট সাহেব ২২ জানুয়ারি তারিখে বন্দুক-ভাণ্ডারের অধ্যক্ষের নিকটে চর্বি-টোটা সংক্রান্ত গোলযোগ ও সিপাহিগণের অসন্তোষ বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। সেই অধ্যক্ষের নাম মেজর বন্টেন, তিনি

তৎপরিদিবসে দমদমার কমান্ডিং অফিসারের নিকট ঐ বৃত্তান্ত রিপোর্ট করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রিপোর্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেনরেল কমান্ডিং অফিসারের নিকট পাঠাইয়া দেন। জেনরেল হিয়ার্সে সেই দিনেই ঐ রিপোর্ট কলিকাতার ডেপুটি আজুটান্ট জেনরেলের নিকটে প্রেরণ করেন; আজুটান্ট জেনরেল কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকাতে তাহার ডেপুটি ঐ আফিসের কর্তা ছিলেন। মিলিটারি দস্তুর আমলের বাধ্য হইয়া জেনরেল হিয়ার্সে দমদমার রিপোর্টখানি ডেপুটি আজুটান্টের নিকট পাঠাইলেন বটে, কিন্তু লিখিয়া দিলেন, ইহা যেন অবিলম্বে গবর্নর জেনরেলের মিলিটারি সেক্রেটারির আফিসে প্রেরণ করা হয়। সেই পত্রে আরও তিনি প্রস্তাব করিলেন, রাইফাল ডিপোর সিপাইগণকে তাহাদের ইচ্ছামত আপন আপন ব্যবহার্য টোটাতে অন্য পশুর চর্বি অথবা অন্য পদার্থ মিশ্রিত করিবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। জেনরেল হিয়ার্সের পত্রখানি অবশ্যই ২৪ জানুয়ারি তারিখে আজুটান্ট জেনরেলের আফিসে পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু বোধ হয়, আফিসের ছুটি হইবার পর পৌঁছানতে সেদিন আর কোন কার্য হয় নাই; পরদিন রবিবার, সুতরাং ২৬ তারিখে সেই পত্র মিলিটারি সেক্রেটারির আফিসে যায়। পরদিন অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট মিলিটারি সেক্রেটারি দ্বারা আজুটান্ট জেনরেলের আফিসে এই আদেশপত্র পাঠাইলেন যে, জেনরেল হিয়ার্সের প্রস্তাব অনুসারে যেন কার্য করা হয়। ২৮ জানুয়ারি তারিখে ডেপুটি আজুটান্টের পত্র পাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, "সিপাহিরা আপন আপন ইচ্ছামত টোটা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে, গবর্নমেন্ট সদয় হইয়া ইহা মঞ্জুর করিয়াছেন।"

কাঙ্ক্ষিত সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল। কেন না তৎপূর্বদিবসে প্যারেডের সময় একজন দেশীয় অফিসার, সৈন্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কোনরূপ নতুন হুকুম আসিয়াছে কিনা?" সিপাহিরা উত্তর করিয়াছিল, "না, কোন হুকুম আইসে নাই।"

দেখুন, জেনরেল হিয়ার্সে যদি আজুটান্ট জেনরেল আফিসের মারফতে ঐ পত্র না পাঠাইতেন, তাহা হইলে চারিদিন পূর্বে তাহার প্রত্যুত্তর নিশ্চয়ই তাহার হস্তগত হইত। নায়কেরা পর্যায়ক্রমে চিঠি লেখালেখি করিয়া সময় কাটাইলেন, বিপক্ষেরা আপনাদের কার্য করিতে লাগিল, সুতরাং প্রবোধের অগ্রে অগ্রে দ্রুতবেগে মিথ্যা কথাটাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইল।

কার্যের গতিরোধ কে করে?—দিন দিন অসন্তোষানল চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, গবর্নমেন্ট জানিয়া রাখিলেন, অসন্তোষের হেতুটা বাস্তবিকই মিথ্যা; কিন্তু জানিয়া রাখিলে কি হয়, সিপাহিরা জনরবে অধিক বিশ্বাস করিল, গবর্নমেন্টের বিশ্বাসে কোন ফল হইল না। প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্মচারীরা মঙ্গল উদ্দেশ্যেই কার্য করিতেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে সিপাহিগণের ভ্রম সংশোধনে তাচ্ছিল্য করাতেই অনর্থ উৎপাদিত হইল। প্রতিকার করা না যায়, এমন বিপদ কিছুই ছিল না; তাহারা যদি মনোযোগী হইয়া চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে অক্লেশেই ভয়াকুল সিপাহিগণের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিতে পারিতেন। নতুন গবর্নর জেনরেল সবেমাত্র এক বৎসর কাল এ দেশে আসিয়াছেন, আসিয়াই যে এমন বিপদসঙ্কুল ক্ষেত্র দর্শন করিবেন, কেহই এমন ভাবেন নাই; কিন্তু লর্ড ক্যানিং বাহাদুর বৈষয়িক জগতের নানা বিষয়ে বহুদর্শী, তাহার কার্যতৎপরতা গুণে সকলেরই অখণ্ড বিশ্বাস। অকস্মাৎ যে সঙ্কট উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় গবর্নর জেনরেলকে জ্ঞাত করা ও সৎপরামর্শ দান করা

মিলিটারি সেক্রেটারির প্রধান কর্তব্য ছিল, তখনকার মিলিটারি সেক্রেটারি ছিলেন কর্নেল রিচার্ড বার্চ। তিনি বহুদিন কোম্পানির সৈনিক বিভাগের অফিসারের কার্য করিয়াছেন, জজ, এড্‌ভোকেটের অফিস-বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহাকে বুদ্ধিমান কার্যদক্ষ বিষয়ীলোক বলিয়া সকলের ধারণা, সকলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, সকল বিষয়ে তাহার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক। মানব চরিত্র পরিজ্ঞানে লর্ড ডালহাউসির বিশেষ ক্ষমতা ছিল; সুযোগ্য বিবেচনা করিয়াই তিনি এই কর্নেল বার্চকে মিলিটারি সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; লর্ড ক্যানিং বাহাদুরও এই নির্বাচনে প্রীতচিত্তে অনুমোদন করিয়াছেন। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মিলিটারি সেক্রেটারির কার্যে পূর্ণ-স্বাধীনতা নাই; কিন্তু এতাদৃশ সঙ্কট সময়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, বৃথা চিন্তায় কাল হরণ না করিয়া শেষফল দর্শনের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া, তিনি যদি গবর্নর জেনরেলকে উপস্থিত মত কার্যকরণকল্পে সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে পদচ্যুতির কোন আশঙ্কা থাকিত না। যখন তিনি শুনিলেন, দমদমার সিপাহিরা ভয় পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তখন তাহার প্রথম চেষ্টা সিপাহিদের আতঙ্কের কারণটা সত্য কি মিথ্যা, অগ্রে তাহা নিরূপণ করা; নিরূপণের বাসনায় প্রথমেই তিনি সেলাখানার অধ্যক্ষের নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; কি কার্য করা হইয়াছিল?"

সে সময় সেলাখানায় ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ছিলেন কর্ণেল আগস্টস্‌ আবট্‌। তিনি একজন সুনাম-লব্ধ গোলন্দাজদ ের অফিসার; জেলালাবাদের অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষতা করিয়া তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন; বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ইতিহাসে তাহার নাম কীর্তিত হইয়াছে। প্রথমে তাহার ধারণা হইয়াছিল, দমদমার তোপখানায় চর্বি-টোটা বিলি করা হইয়াছে, কিন্তু সে টোটাতে কোন দূষিত পদার্থ আছে তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। যেদিন মেজর বনটেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন সেইদিন তদ্বিষয়ে তাহার উদ্বেগ দূর হয়; মেজর—একটা চর্বি-টোটা প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দমদমায় অথবা প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোন স্টেশনে সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য একটাও প্রেরিত হয় নাই। দমদমায় টোটা প্রস্তুত হয় না; কেল্লার সেলাখানায় প্রস্তুত হয়,তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সৈন্যগণকে বণ্টন করা হইয়া থাকে। দমদমায় গোলযোগ হইবার পূর্বক্ষণে ঠিক উপযুক্ত সময়েই কথাটা প্রকাশ হওয়াতে ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করা হইয়াছিল। টোটাতে কোনপ্রকার দূষিত পদার্থ নাই, সিপাহিগণকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া সহজ কথা, সিপাহিরা আপনাদের ইচ্ছামত টোটা ব্যবহার করিতে পারিবে, এ কথা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়াও সহজ, প্রবোধবাক্যের শক্তি প্রভাবে উপস্থিত চাঞ্চল্য প্রশমিত হইতে পারিত; এইরূপ বিশ্বাস। যাহা হউক, স্পষ্টতই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যেখানে যেখানে বন্দুক শিক্ষার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে, যেখানে যেখানে নতুন রাইফেল বন্দুক ব্যবহৃত হইতেছে, দমদমার ন্যায় সেইরূপ সর্বস্থানেই সিপাহিগণের অসন্তোষ প্রকাশ পাইতেছে, অন্যান্য স্থানের পল্টনেরা বঙ্গদেশের সূত্র হইতেই আতঙ্কে সংবাদ পাইতেছে, যদিও অনেকটা সময় নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সিপাহিদিগের প্রেরিত লোক অথবা পত্রাদি অম্বালা ও শিয়ালকোটে পৌঁছিবার আগে টেলিগ্রাফের তারযোগে আমরা তথাকার সিপাহিগণকে সত্য কথা জানাইয়া দিয়া শান্ত রাখিতে পারিব।

কর্ণেল বার্চ চর্বি-টোটা-সম্বন্ধে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সরাসরি গবর্নর জেনরেলের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল কথা তাঁহাকে জানাইলেন এবং বিভাগীয়

বন্দুকাগার সমূহের সিপাহিদলকে প্রবুদ্ধ করিবার উপায় অবলম্বনের অনুমতি চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদত্ত হইল এবং মিরাটে আজুটান্ট জেনরেলের নিকটে টেলিগ্রাম করিবার আদেশ হইল। টেলিগ্রামের মর্ম এই যে, সিপাহিরা যে যে বস্তু মিশাইয়া টোটা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে তাহাই তাহারা পারিবে, ইহাই গবর্নমেন্টের অভিপ্রেত। মিরাটে প্রচুর পরিমাণে চর্বি-টোটা প্রস্তুত হইতেছিল, কোন ভয় অথবা বিপরীত ফল পরিলক্ষিত হয় নাই। কর্নেল বার্চ সেই সময় অম্বালা ও শিয়ালকোটের রাইফেল বন্দুককে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যদি চর্বি-টোটা প্রেরণ করা হইয়া থাকে, তাহা যেন ব্যবহার করা না হয়। কর্নেল বার্চ ও কর্নেল আবট উভয়েই অনুরোধ করিলেন, প্রধান সেনাপতি বাহাদুর এক সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সকলকে জ্ঞাত করান যে, এতদ্দেশীয় সিপাহিরা আপন আপন নির্বাচিত পদার্থে টোটা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না।

ইহা অবধারিত হইল, মীরটে। সিপাহিরা এখন যে আপত্তি করিতেছে তাহার কোন কারণ নাই। আজুটান্ট জেনরেল যখন কর্ণেল বার্চের টেলিগ্রাম পাইবেন তখন তিনি সিপাহিগণকে বুঝাইয়া দিবেন, তাহারা কয়েক বৎসরাবিধি যে চর্বি-টোটা ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে কোন দূষিত পদার্থ নাই, সে সকল টোটা মেষের চর্বিতে প্রস্তুত।

সিপাহিরা এতদিন যাহাতে আপত্তি করে নাই, এখন তাহাতে আপত্তি করিতেছে, এখন সন্দেহ করিতেছে, ইহা কি কর্মচারিগণের শিক্ষার ফল নহে?

২৯ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা হইতে মীরটের হেড কোয়ার্টারে সংবাদ প্রেরিত হইল, যে সকল টোটা এখন ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা যদি ভেড়ার চর্বিও মোমের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে তাহার ব্যবহার এখন যেমন চলিতেছে; অতঃপর সেইরূপ চলিতে থাকিবে।

এদিকে ত এই পর্যন্ত, ওদিকে গবর্নমেন্টের ভাবনা হইল, যেখানে এতদিন অবাধ শান্তি বিরাজ করিতেছিল, সেখানে অকস্মাৎ এরূপ অশান্তির লক্ষণ কেন দেখা দিল? সোপানে সোপানে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে অবশেষে প্রকাশ পাইল, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কতকগুলি চর্বি টোটা ইংলন্ড হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হয়, সাধারণ ব্যবহারের নিমিত্ত নহে, পরীক্ষার নিমিত্ত। ভারতে ঐ টোটার ব্যবহার কিরূপ ফল হয়, তাহা নিরূপণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞ বিজ্ঞ মিলিটারি পুরুষেরা মন্তব্য দিয়াছিলেন, এই টোটাতে যদি কোনপ্রকার আপত্তিজনক পশুচর্বি মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে দেশীয় সিপাহিগণকে উহা ব্যবহার করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে, যদি দেওয়া হয়, পরিণামে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কর্নেল হেনেরি টকার তৎকালে বন্দুকের সেনা-দলের আজুটান্ট জেনরেল ছিলেন, প্রধান সেনাপতি তাহাকে আদেশ করিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে সতর্কতাসূচক একখানি ঘোষণা প্রচার করুন। লর্ড ক্যানিং বাহাদুর ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান আসনারূঢ় হইবার পূর্বে এতদ্দেশীয় সৈনিক বিভাগের প্রধান প্রধান কর্মচারিগণের নানা প্রকার মতভেদ ছিল। সে সময়ে মিলিটারি বোর্ড নামে একটি আফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল, পূর্বে যাহারা সৈনিক-বিভাগের পদস্থ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সেই বোর্ডের মেম্বর, তদ্ব্যতীত একজন বেতনভোগী সভ্য ছিলেন। একজন বেতনভোগী সেক্রেটারি অধিকাংশ কার্যনির্বাহ করিতেন। আজুটান্ট জেনরেল সেই মিলিটারি বোর্ডের সেক্রেটারিকে এইভাবে পত্র লিখিলেন "প্রধান সেনাপতি বাহাদুরের আদেশানুসারে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে,

ইংলন্ড হইতে যে সকল টোটা আসিয়াছে, তাহাতে এতদ্দেশীয় সিপাহিগণের জাতিনাশক কোন পদার্থ নাই, যদবধি নিঃসন্দেহে সেই বিষয় সপ্রমাণ না হয়, তদবধি সিপাহিগণকে সেই সকল চর্বি-টোটা ব্যবহার করিতে না দিয়া কেবল ইউরোপীয় সেনাগণের দ্বারা পরীক্ষা করাই উচিত হইতেছে।"

মিলিটারি বোর্ড সেই চিঠি প্রাপ্ত হইয়া ভাল মন্দ কিছুই করিলেন না। ঐ সকল টোটা পরীক্ষার্থ ফোর্ট উইলিয়ম-দুর্গের, কানপুরের ও রানীগঞ্জের এতদ্দেশীয় গার্ডগণের নিকটে প্রেরণ করা হইল; গার্ডেরা তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল; যখন কোন গার্ড বদলি হয়, তখন তৎস্থানীয় নতুন গার্ডের হস্তে সেই সকল টোটা অর্পিত হইতে থাকে; এইরূপে হাতে হাতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কয়েক মাস পরীক্ষিত হইবার পর দেশীয় সিপাহিদলের ইউরোপীয় অফিসারগণ এক কমিটি করেন, তাহারা সেই পরীক্ষা ফলের রিপোর্ট দেন, অনন্তর সেই রিপোর্টের সঙ্গে সকল টোটা ইংলন্ডে পুনঃপ্রেরিত হইল।

সিপাহিরা চর্বি-টোটা ব্যবহার করিতে কোন আপত্তি করে নাই, সৈনিক অফিসারেরা অথবা কমিটির মেম্বরেরাও তাহাদিগকে কোন বিস্ময়কর কথা বলিয়া বিচলিত করেন নাই।

মহারানির যষ্টিগণিত রাইফেল পলটন তৎকালে ভারতবর্ষে কার্য করিতেছিল, যে বন্দুক তাহারা ব্যবহার করিত, তাহার নাম দুনলী রাইফেল; টোটাতে কেবল বারুদমাত্র থাকিত; তদ্ভিন্ন এক প্রকার গোলা ব্যবহৃত হইত,তাহা মোম ও তৈল-লিপ্ত এক প্রকার পরিষ্কার সূক্ষ্মবস্ত্র নির্মিত। কোন সিপাহিদলে যখন রাইফেল কোম্পানির যোগ হইত; তখন সিপাহিগণকে দুনলী বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া যাইত, তাহাতে পূর্ব-বর্ণিত টোটার সংযোগ থাকিত; সেই টোটা ব্যবহারে কেউ কোনরূপ আপত্তি করিত না। সেই টোটা সম্পূর্ণ নির্দোষ, ইহাই সকলে জানিত, টোটার কাগজগুলির প্রতিও কেউ কোনরূপ সন্দেহ করিত না। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঐ দুনলী বন্দুকের ব্যবহার বন্ধ হয়, তৎপরিবর্তে নতুন এনফিল্ড রাইফেল বন্দুক চলিতে থাকে; সেই বন্দুক যষ্টিগণিত সেনাদলের ও কোম্পানির কতিপয় ইউরোপীয় সেনাদলেও অর্পণ করা হইয়াছিল। ইংলন্ড হইতে পূর্বপ্রেরিত টোটার অবশিষ্টাংশ সেই সকল বন্দুকে ব্যবহার করা হইত এবং কলিকাতা, দমদমা ও মীরাটে। সেই প্রকারের টোটা প্রস্তুত করা হইত। মোম ও তৈলমিশ্রিত পদার্থ যদিও কার্যকালে ফলপ্রদ ছিল, কিন্তু বহু টোটা একসঙ্গে রাখিলে সেরূপ কার্যোপযোগী থাকিত না, কারণ, তাহার তৈলাক্ত অংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইত, অতএব এনফিল্ড রাইফেলের জন্য যে টোটা আবশ্যক তাহা পশুচর্বি দ্বারা প্রস্তুত করাই যুক্তিসিদ্ধ। অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষেরা চর্বি-সংযোগে-সংকল্প করিলেন, কিন্তু কোন কোন পশুর চর্বি থাকিবে না, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে গো-চর্বি থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজিতে যাহাকে (tallow) ট্যালো বলে। তাহা কিসে কিসে প্রস্তুত হয়, ইহাই বিবেচনা সাপেক্ষ।

বসা-ব্যবহার নিঃসন্দেহ অপরিণামদর্শিতা; কেন না, দুর্গে মেষের চর্বি অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য, অনায়াসেই তাহা সংগ্রহ করা যায়, অধিকন্তু গো-শূকরের চর্বির ন্যায় তাহা কোন জাতির আপত্তিজনক হইতে পারে না; কিন্তু অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষেরা ইংলন্ড হইতে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছেন, তদনুসারে যষ্টিগণিত সেনাদলের ব্যবহারার্থ পূর্বকথিত চর্বি টোটা প্রস্তুত করিতে বাধ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে এবং মীরটের হেড কোয়াটারে গো-শূকরের চর্বি-মিশ্রণে টোটা

প্রস্তুত হইতেছিল, ইহা সত্য, ১৮৫৬ অব্দের অক্টোবর মাসে বাষ্পীয় তরণীতে গোলা ও টোটা বোঝাই করিয়া অম্বালা ও শিয়ালকোটের বন্দুক ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, ইহাও সত্য; কিন্তু সিপাহিদিগের ব্যবহারার্থ ঐরূপ টোটা প্রদান করা হইয়াছিল, ইহা সত্য নহে। সিপাহিদিগকে এনফিল্ড বন্দুক দেওয়া হইয়াছে বটে। তাহা কেবল শিক্ষার নিমিত্ত কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, কেবল তাহাই তাহারা শিক্ষা করিতেছে; নতুন অস্ত্রের নির্মাণ প্রণালী কিরূপ ও তাহাতে কি কি উপকরণ আছে, তাহাই তাহারা শিক্ষা করিতেছে; কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়, কিরূপে পুনঃসংযোগ করিতে হয়, তাহাই তাহারা শিক্ষা করিতেছে; কোথায় দাঁড়াইয়া কতদূরে কিভাবে লক্ষ্য করিতে হয়, তাহাই তাহারা শিক্ষা করিতেছে। এই সকল প্রক্রিয়ায় কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, টোটা ব্যবহারের সময় এখনও আইসে নাই। এই সময়ের মধ্যে রাইফেল কোম্পানির সৈন্যগণ পুরাতন দু-নলী বন্দুক ব্যবহার করিতেছিল, কাওয়াজের সময় তাহারা মোম ও তৈলাক্ত টোটা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। প্রধান সেনাপতি বাহাদুর যখন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করেন তখন লিখিয়াছিলেন, এরূপ চর্বি-টোটার ব্যবহার অনেকদিন অবধি চলিতেছে, তাহাতে ভয়ের লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। বিবেচনা করা হইয়াছিল, সিপাহিরা কিরূপ টোটা ব্যবহার করিতেছে, ইহা যদি তাহারা জানিতে পারিত, তাহা হইলে প্রত্যেকের মনেই মহাভীতির সঞ্চার হইত।

অনুমানটা সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক, ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে, ক্রমান্বয়ে এক ছাউনি হইতে অন্য ছাউনিতে বিরুদ্ধ জনরব প্রচার হওয়াতে সিপাহিরা সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। সত্যকে অতিক্রম করিয়া মিথ্যাটাই প্রবল হইয়াছে। এক ক্যান্টনমেন্ট হইতে অপর ক্যান্টনমেন্টে, তথা হইতে অন্য ক্যান্টনমেন্টে যে সংবাদটা বিদ্যুদ্বেগে প্রধাবিত হইতেছে, যে সংবাদে সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, কোন প্রকার আদেশে অথবা ঘোষণা প্রচারে তাহার লাঘব অথবা দমন সম্ভব কিনা, তাহা বিষম সংশয়স্থল। সিপাহিরা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, হিতাহিত-বিবেচনা-পরিশূন্য হইয়াছে, ভ্রমবশে কোন সদ্যুক্তি গ্রাহ্য করিতেছে না, ইহা নিশ্চয়; তাহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার পক্ষে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। চর্বি কেবল পশু চর্বিই তাহাদের চিত্ত বিচলিত করিয়াছে, এমন বিবেচনা করা যায় না। কেননা, বহুবৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা কামানের গাড়ির চাকায় ও মালগাড়ির চাকায় তাহাদের ধর্ম নিষিদ্ধ অপবিত্র চর্বি লাগাইয়া আসিতেছে, সে কার্যে এক দিনের জন্যও কাহারও কোন অসন্তোষের লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, অসন্তোষজনক কোন কথাও তাহারা বলাবলি করে নাই। কলিকাতায় ও মীরটে এতদ্দেশীয় লোকেরাই চর্বি-টোটা প্রস্তুত করিতেছে। অধিক কথা কি, মীরটে ব্রাহ্মণ বালকেরাও ঐরূপ চর্বি-টোটা প্রস্তুতকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে; দন্ত দ্বারা টোটা কাটিতে হইবে; এই জন্যই সিপাহিদলের আপত্তি। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত মেজর বনটেন প্রস্তাব করিয়াছেন, দন্ত দ্বারা ছেদন না করিয়া সিপাহিরা হস্তদ্বারা টোটা ছিন্ন করিতে পারিবে, এই নিয়ম করিলেই তাহাদের আপত্তি ঘুচিয়া যাইবে। এ প্রস্তাবেও সিপাহিরা সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা বলে, দন্তদ্বারা টোটা ছেদন করাই তাহাদের অভ্যাস, সে অভ্যাসবশে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের আশুকর্তব্যতার উৎসাহে এখনও তাহারা তাহাই করিবে, ওষ্ঠে চর্বি লাগিবে, দন্তে চর্বি লাগিবে; অতএব কিছুতেই তাহারা চর্বি টোটা ব্যবহার করিতে পারিবে না। সময়ে সময়ে

হিন্দু-মুসলমানের একই প্রকার প্রবৃত্তি হয়; এক এক সময়ে একই বিষয়ে উভয় জাতিই সমভাবে আপত্তি উত্থাপন করে। গবর্নমেন্টের সাধুপ্রস্তাবে সিপাহিরা আপনাদের ইচ্ছামত টোটা প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে পারিবে, এই বলিয়া প্রবোধ দেওয়া সহজ, কিন্তু ইত্যগ্রে যে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এখন আর তাহারা ইংরাজের প্রবোধে হিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে সম্মত হইবে কিনা সন্দেহ।

বারাকপুর, ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭

১৮৫৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনরেল হিয়ার্সে লিখিয়াছেন, বারুদের সুড়ঙ্গের উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করিলে কখন অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেই আশঙ্কায় সর্বদা যেমন ব্যস্ত থাকিতে হয়, বারাকপুরে আমরা এখন সেইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি, অগ্নিগর্ভ সুড়ঙ্গের উপর আমাদিগকে বাস করিতে হইতেছে। কয়েক দিবসাবধি আমি এখানকার সিপাহিগণের চালচলনের উপর বিশেষ নজর রাখিতেছি। জনকতক কুচক্রী বদমাস লোক এখানকার সিপাহিগণকে বলিয়াছে, "ইংরাজ গবর্নমেন্ট তোমাদের জাতিনাশ করিবেন, ধর্মনাশ করিবেন, বলপ্রকাশ করিয়া তোমাদিগকে খ্রিস্টান করিবেন", নির্বোধ সিপাহিরা সেই কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে।

দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল। যদিও সিপাহিদলের চিত্তচাঞ্চল্যের বিশেষত ২য় ও ৩য় গণিত দলের চিত্তচাঞ্চল্যের লক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল, এ পর্যন্ত কার্যে তাহারা কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করে নাই। তাহাদের অধিনায়কেরা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, "তোমাদের কোন আশঙ্কা নাই, চর্বির টোটা ব্যবহার করিতে হইবে না, তোমরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে মোম ও তৈলে টোটা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার কর।" অধিনায়কগণের এইরূপ প্রবোধবাক্যেও উদ্‌ভ্রান্ত সিপাহিগণের বিচলিতচিত্ত শান্তভাব ধারণ করিল না; ফন্দিবাজ দুষ্টলোকের উত্তেজনায় তাহাদের মনে দারুণ কুসংস্কার এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাহারা ভাবিল—স্পষ্টই বলিল, "ইংরাজেরা একটা ছল পরিত্যাগ করিয়া আর একটা ছলের সৃষ্টি করিয়াছেন; টোটার কাগজে দূষিত চর্বি মিশ্রিত হইতেছে।" টোটার কাগজ চিক্কণ; তাহা দেখিয়াই তাহাদের প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, উহাতে চর্বি আছে; তাহাতেই সংশয়ের বৃদ্ধি; সেই কাগজ দগ্ধ করিবার সময় চিড় চিড় করিয়া শব্দ হয় এবং দগ্ধ চর্বির ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। এই প্রমাণ পাইয়া সিপাহিদের পূর্ব সন্দেহ এক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে; শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় তাহাদের আতঙ্কও দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে।

দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার দলেই এই আতঙ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রকৃত বৃত্তান্ত কি, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুসন্ধানী আদালত সংস্থাপিত হইল; টোটার কাগজ সেই আদালতে পরীক্ষিত হইল এবং কি কি আপত্তি আছে তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সিপাহিগণ আহূত হইল। সিপাহিরা আদালতে উপস্থিত হইয়া একবাক্যে বলিল, "নিশ্চয়ই এ কাগজে চর্বি সংলিপ্ত আছে।" আদালত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসে তাহাদের এ সন্দেহ দূর হয়?' তাহারা উত্তর করিল, "এই কাগজের পরিবর্তে যদি অন্য প্রকার কাগজ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সন্দেহ দূর হইতে পারে, নতুবা কিছুতেই দূর হইবার নহে।"

তদন্তের ঐরূপ ফল শ্রবণ করিয়া গবর্নমেন্ট রাসায়নিক পণ্ডিতগণের নিকটে সেই সকল কাগজ পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন, পণ্ডিত ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "উহাতে চর্বি নাই; সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গেল, বহু লোকের হস্ত ঘর্ষণে উহা এক প্রকার তৈলাক্ত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র।

ইহাতেও সিপাহিগণের সন্তোষ জন্মিল না। ইংরাজেরা তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত; এই সংস্কার তাহাদের মনে এত গাঢ়তর হইয়াছিল যে, কোন যুক্তি না শুনিয়াই তাহারা বলিল, "নিশ্চয় এ কাগজ অপবিত্র।"

টোটাতে গো ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে, মোম-তৈলের ব্যবস্থা করিয়া সে ধারণার খণ্ডন করা যাইতে পারে। কিন্তু কাগজের কথাটা বড় শক্ত। অফিসারেরা সত্য বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

সেনাদলের মধ্যে জেনরেল হিয়ার্সের তুল্য সুযোগ্য, কার্যদক্ষ, সুবিবেচক লোক অতি অল্পই ছিলেন। সিপাহিগণের সংস্কারগত মনোবেদনায় তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, তিনি তাহাদের মনোভাব উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি বুঝিলেন, সিপাহিরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। যাহারা বলেন, শ্বেতপ্রভুগণের কার্যে অসন্তোষ প্রকাশ কবিবার কালা সিপাহিগণের কোনও অধিকার নাই, জেনরল হিয়ার্সে সে দলের লোক ছিলেন না: তিনি বুঝিতেন, চর্বি-টোটার নামে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণির আতঙ্ক ও ক্রোধ অস্বাভাবিক নহে। অতএব তিনি স্থির করিলেন, সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া গবর্নমেন্টের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই কর্তব্য হইতেছে। এই সকল চিন্তা করিয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার বৈকালে প্যারেড ক্ষেত্রে সমস্ত সমবেত সিপাহিগণের সমক্ষে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় তিনি এইরূপ সদুপদেশ পালন করিলেন,—

> "হে সিপাহিগণ। তোমরা দুর্জয় ভ্রমের কুহকে নিপতিত হইয়াছ। তোমাদের নিশ্চয় জানা উচিত যে, গবর্নমেন্টের অধীনে তোমরা কার্য করিতেছ এবং যে সকল অফিসারের বৈধ আজ্ঞা পালন করিতেছ, তোমাদের জাতিনাশ ও ধর্ম নাশ কখনও তাহাদিগের অভিপ্রেত নহে; তোমাদের জাতি ধর্মে হস্তক্ষেপ তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিরুদ্ধ, তাহারা কোন সূত্রে কোন প্রকার বলপ্রকাশ করিয়া তোমাদিগকে খ্রিস্টান করিবেন, ইহাতে বিশ্বাস করা নিতান্ত অবোধের কার্য"। তিনি আরও বলিলেন, "ইংরাজেরা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী—প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টীয়—ধর্ম পুস্তকের বিধানানুসারে তাহারা ধর্ম পালন করেন। যদি কোন ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রিস্টান হইতে চাহে, 'আমাকে খ্রিস্টান কর' বলিযা যদি কেহ আমাদের পদতলে পতিত হয়, আমরা তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করি না। ধর্ম পুস্তকে জ্ঞানলাভ করিয়া আন্তরিক ভক্তিতে আমাদের ধর্মে বিশ্বাস করিয়া, যদি কেহ আমাদের ধর্মে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হইতে অভিলাষী হয়, আমরা তাহাকে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া, ধর্মপরায়ণ ভক্ত জানিয়া তাহার পর খ্রিস্টধর্মে অভিষিক্ত ও দীক্ষিত করিয়া থাকি।"

এইরূপ বক্তৃতা করিয়া সদাশয় জেনরেল হিয়ার্সে সমবেত সিপাহিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমরা আমার বাক্যের ভাবার্থ বুঝিয়াছ?" মস্তক সঞ্চালনপূর্বক সিপাহিরা আপনাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অফিসারেরা সমভাবে বুঝিয়া লইলেন, জেনরল সাহেবের মুখে সিপাহিরা যাহা শ্রবণ করিল, তাহাতে তাহারা আনন্দিত হইল এবং তাহাদের অন্তরের গুরুভার নামিয়া গেল। অফিসারেরা এইরূপ বুঝিলেন, কিন্তু সিপাহিদের সে আনন্দ

ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেননা, বারাকপুরের সিপাহিরা যখন শুনিল; বহরমপুরের ১৯ গণিত সিপাহি পল্টন কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন তাহারা আবার মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বহরমপুরের ফলাফল জানিবার জন্য সাগ্রহে উন্মুখ হইয়া রহিল। তাহারা স্পষ্টই বুঝিল, কাণ্ডটা কেবল বাহ্যিক নহে, আন্তরিক: সুতরাং তাহাদিগকেও অবশ্য সেই দলের অনুকরণে কার্য করিতে হইবে; কিন্তু গবর্নমেন্ট কি বলেন, বহরমপুরের বিদ্রোহী সিপাহিগণের প্রতি কিরূপ দণ্ডবিধান হয়, তাহা জানিবার জন্য তাহারা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল; মাস অতীত হইয়া গেল: গবর্নমেন্ট নীরব হইয়া রহিলেন। যেন কিছুই ঘটে নাই: এইরূপ ভাব দেখাইয়া ১৯ গণিত সিপাহিদল স্থির হইয়া কর্তব্যকার্যে মনোনিবেশ করিল। বাহিরে স্থিরভাব দেখাইল বটে, কিন্তু মানসিক উগ্র কল্পনায় বহরমপুরের বিদ্রোহীদলে এক প্রকার অমঙ্গল লক্ষণ অঙ্কুরিত হইল। গবর্নমেন্টের প্রকৃত অভিপ্রায় কি; তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না; সুতরাং কল্পনাবলে সত্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিল। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, অবিলম্বে অধিক সংখ্যক সওয়ার ও গোলন্দাজ উপস্থিত হইয়া তাহাদের ধ্বংসসাধন করিবে।

সিপাহিদের আশঙ্কা অতিরঞ্জিত, কিন্তু এককালে অমূলক নহে। বহরমপুরের বিদ্রোহ-সংবাদ যখন কলিকাতায় পৌঁছিল গবর্নর জেনরেল তখন মনে করিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা মহাবিপদাশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে। আশু শান্তির সংবাদে তাহার মন একটু সুস্থ হইল বটে কিন্তু সঙ্কট একেবারে বিদূরিত হয় নাই, এইরূপ এক সন্দেহ সমুদিত হইল। কণামাত্র মেঘ ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছে, ক্রমশ অন্ধকার বাড়িতেছে—দিগন্ত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতেছে ইহাই তাহার মনে হইল। তিনি অনুমান করিলেন, বহরমপুরের বিদ্রোহ-সূত্রে বারাকপুরের সিপাহিদলের সঙ্কটজনক উৎসাহ বর্ধিত হইতেছে। প্রাজ্ঞ গবর্নর জেনরেল তখন ইচ্ছা করিলেন, ক্ষমতা পরিচালন করিয়া দেশীয় সৈন্যগণকে ভয় দেখাইতে হইবে। কিন্তু কি করা কর্তব্য? ১৯ গণিত সেনাদলকে পদচ্যুত করিবার হুকুম দেওয়া সহজ; কিন্তু কার্যে পরিণত করা কঠিন। কলিকাতা হইতে দানাপুর পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে কেবলমাত্র একদল ইউরোপীয় সেনা ছিল। দানাপুরে আর এক দল; এই দুই দল বহুবিস্তৃত রাজ্য রক্ষা করিবার একমাত্র ভরসা। এক পল্টন ইংরাজ সৈন্যকে এক সহস্র অস্ত্রধারী সিপাহির সম্মুখীন করিলে বালচাপল্য প্রকাশ এবং অপমানজনক কার্য হইবে; বিশেষত ইংরাজ পলটনকে বহরমপুরে প্রেরণ করিলে নিম্নবঙ্গ প্রদেশের অপরাপর স্থান সঙ্কটপন্ন হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে গবর্নমেন্টের দৃঢ় সঙ্কল্প কিছুদিন অপরাধী সেনাদলের গোচর হয় নাই। দণ্ড হইবে, শীঘ্র হইতেছে না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইবে, ইহা স্থির, কিন্তু অপরাধী সিপাহিরা তাহা জানিতে পারে নাই।

বহরমপুরে বিদ্রোহ ঘটনার এক সপ্তাহ পরে কর্নেল মিচেলের নিকটে হুকুম গেল, ১৯ গণিত সিপাহিদলকে পদচ্যুত করিবার জন্য অবিলম্বে বারাকপুরে লইয়া আসা হউক; ওদিকে রেঙ্গুন হইতে ৮৪ গণিত পল্টনকে বেন্টিঙ্ক নামক বৃহৎ তরণীযোগে বঙ্গোপসাগর পার করিয়া অচিরে কলিকাতায় আনিবার বন্দোবস্ত হউক। এই যে বন্দোবস্তের কথা, বারাকপুরের ইউরোপীয় অফিসারেরা ইহার কিছুই জানিতেন না; এমন কি, জেনরেল হিয়ার্সে পর্যন্ত ইহা অজ্ঞাত ছিলেন। তথাকার সিপাহিরা তাহাদের নিজের লোকের মুখে

কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইয়াছিল, গবর্নমেন্ট ঐ প্রকার বন্দোবস্ত করিতেছেন; সেনাদলের মধ্যে তাহারা সেই কথা প্রকাশ করাতে অফিসারেরা তাহাদিগকে আশু প্রত্যয়ী বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। ঘটনা কার্যে পরিণত হইবার পর স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, বারাকপুরের অফিসারদল অপেক্ষা তথাকার সিপাহিদল নিশ্চিত সংবাদ রাখিয়াছিল। ২৯ মার্চ তারিখে কলিকাতা ও সন্নিকটবর্তী ইংরাজ অধিবাসীগণের অন্তরে মহা আনন্দ প্রবাহ, তাহারা শুনিয়াছিলেন, বেন্টিঙ্ক জাহাজ রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইতিমধ্যে বারাকপুর শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; বাহিরে শান্ত; কিন্তু সিপাহিদের মনের ভিতর সন্দেহের ছায়া। মনে মনে তাহাদের বিশ্বাস, নতুন রাইফেল বন্দুকে গো-শূকরের চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহারের ব্যবস্থা, টোটার কাগজেও সেই দূষিত চর্বি মিশ্রিত করা হইতেছে, এই বিশ্বাসে মহা বিপদাশঙ্কায় সিপাহিদের মন চঞ্চল, অথচ তাহারা বাহিরে শান্তভাব দেখাইয়া কার্য করিতেছিল। তাহাদের অসন্তোষ অপেক্ষা আশঙ্কা অধিক, ইহাই অবধারিত। তাহারা ভাবিল; তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন; জীবন অপেক্ষা যাহা যাহা প্রিয়তর, তাহাও সঙ্কটাপন্ন; যাহারা এই সঙ্কটের উপাদান করিয়াছে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে পরিত্রাণের অন্য পন্থা নাই। ইংরাজের উপর যাহারা বৈরভাব দেখাইতেছে, ধর্ম ও রাজকীয় ব্যাপারে শত্রুতাসাধন করিবার ইচ্ছা করিতেছে, তাহাদের প্রকৃত মতলব কি এবং প্রতিশোধের কি কি উপায় তাহারা অবলম্বন করিতে চাহে, অনুমান করিয়া তাহা অতি অল্পই অবধারণা করা যায়।

কলিকাতায় ইংরাজগণের বিশ্বাস; সিপাহিরা মার্চ মাসের এক রজনীতে রাজধানী আক্রমণ করিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। এই অবসরে গোয়ালিয়ারের মহারাজ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণের মধ্যে তিনিই তখন প্রধান, ইংরাজের প্রতি তাহার কোনরূপ বৈরভাব আছে কিংবা সিপাহি বিদ্রোহের উপক্রম তাহার কোনরূপ সংস্রব আছে, এমন কথা কেহই বলে নাই, তাহার সুযোগ্য মন্ত্রী দিনকর রাও তাহার প্রতিও কেহ কোনরূপ দোষারোপ করে নাই। গবর্নর জেনরেল এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকেরা সপারিষদ মহারাজ সিন্ধিয়াকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; মহারাজ এই রাজধানীতে বিশেষত অভ্যর্থনাস্থলে যাহা যাহা দর্শন করেন, তাহাতে তাহার বিশেষ আনন্দ জন্মিয়াছিল, সকলের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ ইচ্ছা করিলেন, রাজধানীর ইংরাজ ভদ্রলোক ও মহিলাগণকে একরাত্রে প্রমোদ ভোজ প্রদান করিবেন। নিমন্ত্রণ করা হইল দিন স্থির হইল ১০ মার্চ, স্থান স্থির হইল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ শিবপুরেব উদ্ভিজ্জ-উদ্যান (বোটানিক্যাল গার্ডেন)। ইংরাজেরা যখন উপস্থিত আমোদ-প্রমোদে নিরত, প্রধান প্রধান রাজ কর্মচারিগণ যখন আপাতত কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত, সেই সময়ে এক জনরব উঠিল অযোধ্যার পদচ্যুত নবাবের প্রতিনিধিগণের উত্তেজনায় বিদ্রোহী সিপাহিরা কলিকাতার দুর্গ ও প্রধান প্রধান অট্টালিকা লুঠ করিয়া ফিরিঙ্গির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। সত্য সত্যই এই রটনা হইয়াছিল কিনা, তাহার বিশেষ প্রমাণাভাব। এই কারণে ব্রিটিশ পক্ষ হইতে বিপক্ষের কল্পিত ষড়যন্ত্র বিফল করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

গ্রীষ্মকাল, নিদাঘ-সূর্য প্রতিদিন প্রখর করজাল বর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল জলদাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; উপর্যুপরি

কয়েকদিবসব্যাপী মহাদুর্যোগে নগরবাসী লোকের ঘরের বাহির হওয়া ও বাহিরে আমোদ-প্রমোদ করা রহিত হইয়া গেল; মহারাজ সিন্ধিয়ার প্রস্তাবিত প্রমোদভোজের উৎসব সেই কারণে স্থগিত হইল। ১০ মার্চের রজনী পূর্বে পূর্বে অন্য অন্য রজনীর ন্যায় নিরুপদ্রবে অতিবাহিত হইয়া গেল।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের সিপাহিগণের মনোমালিন্যের কোন স্পষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। বাহিরে কেবল ইহাই প্রকাশ পাইল যে, দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার পল্টন রাজবিদ্রোহ সূচনা করিতেছে। এই সময়ে গবর্নর জেনরেল বাহাদুর প্রধান সেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন,

> "দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার দলের সিপাহিরা সমস্ত সিপাহিগণকে একটা ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, ৪৩ গণিত পল্টন সে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছে; দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার দলের একজন জমাদার ৭০ গণিত সেনাদলের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দলের কতকগুলি লোককে সেই জমাদার বলিয়াছিল, চর্বি-টোটা ব্যবহারের সময় উপস্থিত হইলে কদাচ তাহা তোমরা দন্ত দ্বারা ছেদন করিতে রাজি হইও না। সিপাহিদের মনে বিদ্বেষানল জ্বালিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সেই জমাদার আরও বলিয়াছিল, 'বারাকপুরে অচিরাৎ এক প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইবে, সেই ঘটনায় তাহাদের হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইবে; জমাদারের এইরূপ উত্তেজনায় ৭০ গণিত দলের সিপাহিরা সকলে বিশ্বাস করে নাই।"

এই উপলক্ষে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে একখানি পত্র সমাগত হয়; তাহার মর্ম এই যে, দ্বিতীয় ও ত্রিচত্বারিংশ পল্টন একসঙ্গে কন্দাহারে কার্য করিয়াছিল, পূর্বাবধি উভয়দলে বন্ধুত্ব আছে, দ্বিতীয় দলের নিমন্ত্রণে বন্ধুলোকেরা কেন উপস্থিত হইবে না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; হোলি পর্ব উপলক্ষে (দোলযাত্রা উৎসবে) ভোজের আয়োজন। ঐ উভয় দলের অফিসারেরা বলিয়াছিলেন, সিপাহিগণের একসঙ্গে ভোজন করাতে কোন দোষ ঘটিতে পারে না; ৪৩ গণিত পলটন কি জন্য সেই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিলেন না।

কলিকাতার আর একটা ঘটনা—যদ্দ্বারা দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়াব দলের ধৃষ্টতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কেল্লা ও সহরের সরকারি অট্টালিকা সমূহে যে সকল সিপাহি পাহারা দিত, বারাকপুরের পলটন হইতে তাহাদিগকে আনয়ন করা হইয়াছিল; ১০ মার্চ রজনীতে দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার দলের কতকাংশ দুর্গ মধ্যে ছিল এবং ৩৪ গণিত সেনাদলের সুবাদারী গার্ড কলিকাতার টাকশালে পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। রাত্রিকালের দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ারের দুই জন সিপাহি গারদঘরে প্রবেশ করিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করে, সুবাদার তখন লণ্ঠনের আলোতে একখানা হুকুমনামা পাঠ করিতেছিল; ঐ দুই জনের মধ্যে একজন সিপাহি তাহাকে বলিল,

> "রাত্রি দুই প্রহরের সময় কলিকাতার সান্ত্রীরা দুর্গের প্রহরিতায় যোগ দিবে; গবর্নর জেনরেল বাহাদুর দমদমার সমস্ত গোলন্দাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে বারাকপুরে যাইতেছেন; সুবাদার যদি কেল্লায় উপস্থিত হইয়া সেখানকার সঙ্গীগণের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে গবর্নমেন্টের বিপক্ষে উত্থান করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।"

উদ্ধত সিপাহির শেষ কথাগুলি বিশেষরূপে পরিষ্কার না হইলেও, সুবাদার নিঃসন্দেহে তাহাদের মতলব বুঝিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিল, পরদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে বন্দি করিয়া কেল্লায় চালান করিল। কয়েকদিন পরে সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের বিচার হয়, অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে প্রত্যেকের চতুর্দশ বর্ষ করিয়া কারাবাসের হুকুম হইয়াছিল।

এই ঘটনা অবশ্যই অন্যপ্রকার প্রতিকূল ঘটনাকে আহ্বান করিবে, জেনরেল হিয়ার্সে তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন, আর কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। ইতিপূর্বে সিপাহিগণকে, প্রবোধ দিবার জন্য তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণ ফলোদয় হয় নাই, কতক কতক সিদ্ধ হইয়াছিল; এখন তিনি বিবেচনা করিলেন, ব্রিগেড দলকে পুনরায় কতকগুলি উপদেশ দান করিবেন। গবর্নর জেনরেলের নিকটে এই সঙ্কল্প বিজ্ঞাপন করিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন, ব্যাপার গুরুতর, অবিলম্বে প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। ১৪ মার্চ তারিখে গবর্নমেন্ট-প্রাসাদে এই বিষয় আলোচিত হইল, লর্ড ক্যানিং বাহাদুর সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

জেনরেল হিয়ার্সের প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াও বিচক্ষণ গবর্নর জেনরেল তৎপরে চিন্তা করিলেন, যদিও হিয়ার্সের মানসিক বল অধিক, বক্তৃতা করিবার শক্তিও যথেষ্ট, উপদেশ দিবার ক্ষমতাও বিলক্ষণ, তথাপি উৎসাহবেগে তিনি হয়ত বেশি কথা বলিতে পারেন। জেনরেল হিয়ার্সে কলিকাতা হইতে বারাকপুরে প্রতিগমন করিলে গবর্নর জেনরেল তাহার নামে একখানি পত্র পাঠাইলেন: প্রাতঃকালের যাহা পরামর্শ, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম না ঘটে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই সেই পত্রের নির্ঘণ্ট। পরদিন সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই গবর্নর জেনরেলের চিঠিখানি জেনরেল হিয়ার্সের হস্তগত হয়; সে দিন রবিবার। জেনরেল হিয়ার্সে তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, "বক্তৃতায় যাহাতে অত্যুক্তি না থাকে, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য করিব।" যে সকল এতদ্দেশীয় অফিসার সামরিক বিচারালয়ে সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় গ্রিনেডিয়ার দলের সিপাহিদ্বয়ের বিচারের সময় তাহাদিগকে উপস্থিত থাকিতে হইবে; অতএব বারাকপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার জন্য তাহাদের প্রতি হুকুম হইল। জেনরেল হিয়ার্সে বিবেচনা করিলেন, অফিসারেরা কলিকাতা রওনা হইবার পর তিনি সঙ্কল্পিত বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তদনুসারে ১৭ মার্চ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ব্রিগেডদলের প্যারেড হইবে, এইরূপ আদেশ প্রচার হইল।

১৭ মার্চ সমাগত। জেনরেল হিয়ার্সে অশ্বারোহণে বারাকপুরের প্যারেড ক্ষেত্রে উপনীত। তিনি দেখিলেন, ব্রিগেড সেনাদল তাহার সম্মুখে সমবেত। শিষ্টাচারে মিষ্টবাক্যে তিনি আরম্ভ করিলেন,--

> "যে সকল ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টলোক তোমাদের মুখের গ্রাস নষ্ট করিবার উদ্দেশে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বন্ধুত্বপাশ ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে কুপরামর্শ দিয়া তোমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে, রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে, তাহাদের কথায় তোমরা বিশ্বাস করিও না, তাহারা তোমাদের মিত্র নহে, তাহারা তোমাদের শত্রু। তাহাদের পরামর্শ শুনিয়া অবোধের ন্যায় কার্য করিলে, তোমাদের নিজেরই অনিষ্ট হইবে। বার বার আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, গবর্নমেন্ট অথবা গবর্নমেন্টের কোন কর্মচারী তোমাদের জাতি ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। বিপক্ষতা করিয়া যাহারা তোমাদিগের প্রাণে আঘাত করিবার চেষ্টা করিবে, প্রমাণ পাইলে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। আরও গবর্নমেন্ট তোমাদিগের বিনাশ সাধনার্থ বিলাত হইতে বহু সংখ্যক গোলন্দাজ পল্টন আনাইতেছেন, এই মিথ্যা কথা যাহারা তোমাদিগকে শুনাইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বন্ধু মনে করিতে পার, কিন্তু বাস্তবিক সেই সকল মিথ্যাবাদী দুষ্টলোক তোমাদের পরম শত্রু। সমস্তই মিথ্যাকথা। বহরমপুরের ১৯ সংখ্যক সিপাহিদল মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করিয়া রাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উন্মত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত

বারাকপুরে আনয়ন করা হইতেছে; কার্যক্ষেত্রে তাহাদের দণ্ড বিধান দর্শন করিবার জন্য তোমরা সকলেই সেইখানে উপস্থিত থাকিবে, সাক্ষাতে সেই মানহানিকর ব্যাপার--পাপের প্রায়শ্চিত্ত দর্শন করিয়া তোমরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে, ভবিষ্যতের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে সাবধান হইয়া চলিবে রাজ বিপক্ষে উত্থান করিলে কিরূপ পরিণাম হয মীরটের ৩৪ গণিত বিদ্রোহী সিপাহিরা তাহার দৃষ্টান্তস্থল।"

এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়া সুবিজ্ঞ সদ্‌বক্তা জেনরেল হিয়ার্সে প্রসন্নবদনে আবার বলিতে লাগিলেন, "টোটার কাগজের প্রতি তোমাদের সন্দেহ; কাগজের চাকচিক্য দর্শনে তোমরা মনে করিতেছ, তাহাতে চর্বি মিশ্রিত আছে; বাস্তবিক কোন প্রকার চর্বি তাহাতে নাই। কাগজগুলি মসৃণ ও সুদৃশ্য করিবার অভিপ্রায়ে এক প্রকার মণ্ড মাখাইয়া চারু-চিক্কণশালী করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা ও রাজপুত্রেবা সেইরূপ কাগজে চিঠিপত্রাদি লিখিয়া থাকেন।" এই পর্যন্ত বলিয়া পকেট হইতে তিনি একখানি পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া সগৌরবে বলিলেন, "দেখ, কাশ্মীরের মহারাজ গোলাব সিংহ এই পত্র আমাকে লিখিয়াছিলেন। তোমরা সকলেই দেখ, তোমাদের টোটার কাগজ অপেক্ষা এই কাগজ আরও অধিক চাকচিক্যশালী, ইহাতেও যদি তোমাদের প্রত্যয় না জন্মে, তবে তোমরা শ্রীরামপুরে গিয়া দেখিয়া আইস, সেখানে তোমাদের ব্যবহারার্থ যে সকল কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে চর্বির লেশমাত্র নাই।" উপসংহারে জেনরেল হিয়ার্সে বলিলেন, "তোমাদের বিপক্ষে কোন অপরাধ সপ্রমাণ হয় নাই, কিছুতেই তোমরা ভয় পাইও না, তোমাদের অফিসারেরা তোমাদের জাতিধর্মের রক্ষণ-সম্বন্ধে যত্নবান থাকিবেন, আমিও তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান থাকিব"।

বক্তৃতা সমাপন করিয়া জেনরল হিয়ার্সে উপস্থিত সৈন্যশ্রেণির মধ্য দিয়া কদমে কদমে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন, বামে দক্ষিণে সিপাহিগণের বদন নিরীক্ষণ;—যে সকল সৈনিকের বক্ষদেশে রজত কাঞ্চনের পদক শোভিত, ফুল্ল নয়নে সহাস্য-বদনে তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্মরণ কর দেখি কোন কোন বিশেষ কার্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া তোমরা এই সকল পদক পুরস্কার পাইয়াছ?"

সৈন্যগণ ছুটি পাইল, জেনরেলের মুখে যাহা তাহারা শুনিল, তাহাতে তাহাদের পূর্বাতঙ্ক অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল, আতঙ্কের পরিবর্তে আনন্দ জন্মিল।

বহরমপুরের বিদ্রোহী সিপাহিদলের পদচ্যুতি সাধনের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন হইতে ইংরাজ পল্টন আনয়ন করা হইয়াছে; কালাপানি অতিক্রম করিয়া পল্টন বোঝাই বাষ্পতরী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, মূলতত্ত্ব না জানিয়া অপরাপর সিপাহিদলে ভয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; অবসর বুঝিয়া কুচক্রী লোকের আরও ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিল, "গোরালোগ আয়া"। জেনরেল হিয়ার্সের বক্তৃতা শুনিয়া বারাকপুর ব্রিগেড সে ভয়টা ভুলিল। জেনরল আশা করিয়াছিলেন, জেনরল হিয়ার্সে হিতকর বাক্য প্রয়োগে সিপাহিগণকে শান্ত করিবেন, কার্যক্ষেত্রে জেনরেল হিয়ার্সে গবর্নর জেনরেলের আশার অতিরিক্ত সন্তোষ প্রদান করিয়াছেন।

বহরমপুরের বিদ্রোহিগণের দণ্ড হইবে, লর্ড ক্যানিং বাহাদুর তাহাতে মনে মনে ক্ষুব্ধ আছেন, দণ্ডাজ্ঞা দান করিয়া তিনি পরিতুষ্ট হন নাই, কেবল কর্তব্যতার অনুরোধেই সেইরূপ [illegible]বিধান করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। ঐ দণ্ডবিধানে নানা লোকের নানা মত। মেজর [illegible]টন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, "বহরমপুরের বিদ্রোহিগণকে বারাকপুরে না পাঠাইয়া

কলিকাতার কেল্লায় আনিয়া তোপে উড়াইয়া দেওয়া হউক। সেখানে তাহাদের দুঃখে দুঃখী কেহই থাকিবে না, স্বচ্ছন্দে কার্যসিদ্ধি হইবে।" আরও কেহ কেহ অন্য প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। গবর্নর জেনরেল বাহাদুর তাহাদের প্রস্তাবে অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "একবার যাহা আমি বলিয়াছি, তাহাই ঠিক, বিশেষত জেনরেল হিয়ার্সে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কর্তা তাহার প্রতিই সেই কার্য সাধনের আদেশ; স্থান পরিবর্তন বিষয়ে তিনি যদি সম্মত হন, হইতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি তাহাতে সম্মত হইবেন না।" এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা।—একটা কিছু সূত্র পাইলেই অনেক লোকে অনেক কথা বলে। ইছাপুরের কারখানার কর্নেল এবট এই হুজুগে সুর তুলিয়াছিলেন, "দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা উচিত"। বলাবাহুল্য, লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের তুল্য ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই।

২০ মার্চ তারিখে কর্নেল মিচেল অপরাধী সেনাদলের সহিত বহরমপুর হইতে যাত্রা করেন, ৩১ মার্চ তারিখে বারাকপুরে পৌঁছিবার কথা। ৩০ তারিখে তাহারা বারাসতে আসিয়া উপস্থিত হন, গবর্নমেন্টের কি হুকুম হয়, তাহা জানিবার অপেক্ষায় সে দিন তাহারা বারাসতেই থাকেন। সেই দিন বারাকপুর হইতে কর্নেল মিচেল সংবাদ পান, তথাকার সিপাহিরা আবার ক্ষেপিয়াছে, ২৯ তারিখে তথায় 'একজন অফিসার কাটা পড়িয়াছেন।'

কথাটা সত্য। ২৯ মার্চ রবিবার, সেদিন অপরাহ্নে ৩৪ গণিত সিপাহি পল্টনে মহা গণ্ডগোল। তাহারা শুনিয়াছিল, গোরা সেনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৫৩ গণিত পলটনের পঞ্চাশজন গোরা জলপথে আসিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভয়ার্ত সিপাহিদিগের ধারণা হইল, বহুতর গোরাসৈন্য আসিয়াছে অবিলম্বে বারাকুপর ছাইয়া ফেলিবে। একজন সিপাহি অধিক পরিমাণে ভাঙ খাইয়া মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, সেই ব্যক্তি বয়সে যুবা, স্বভাবত শান্তপ্রকৃতি, স্বধর্মে গাঢ় অনুরাগ, চর্বি-টোটার নামে তাহার অধিকতর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। তাহার নাম মঙ্গল পাঁড়ে। সে যখন শুনিল অনেক গোরা সেনা আসিয়া উপস্থিত, এইবার চর্বি-টোটা কাটাইয়া সিপাহিদের জাতি মারিবে, তখন আর তাহার কাণ্ডকাণ্ড বিবেচনা থাকিল না; পোশাক পরিয়া, বন্দুক ধারণ করিয়া আপন ছাউনি হইতে বাহির হইল. সঙ্গিগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, "চর্বি-টোটা কাটিয়া জাতি হারাইয়া কাফের হইতে যদি তোমাদের ইচ্ছা না থাকে, তবে এখনই আমার সঙ্গে আইস, এখনি তুরী ধ্বনি কর!" কেহই তাহার কথা শুনিল না, সে ব্যক্তি মরিয়া হইয়া ছাউনির সম্মুখে ঘন ঘন পাদচারণ করিতে লাগিল; ইউরোপীয় সার্জন মেজর যখন বাহির হইলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তখন হঠাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল।

যে সকল সিপাহি ঐ কাণ্ড দেখিতেছিল, তাহারা ভয় পাইল বটে, কিন্তু উন্মত্তপ্রায় মঙ্গল পাঁড়েকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইল না। একজন অশ্বারোহী সিপাহি দ্রুতগতি আজুটান্টের গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ সংবাদ দিল, লেফটেনান্ট বফ্ কালবিলম্ব না করিয়া মুক্ত অসি ও গুলিভরা পিস্তল গ্রহণপূর্বক অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মঙ্গল পাঁড়ে তখন একটা কামানের পশ্চাতে লুকাইয়া ছিল, লেফটেনান্ট বফ্ নিকটবর্তী হইবামাত্র তথা হইতে সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। লেফটেনান্টের গাত্রে গুলি লাগিল না, তাহার অশ্বের গাত্রে লাগিল, অশ্ব আহত হইয়া সওয়ার সহ ভূশায়ী

হইল। ভূতল হইতে গা ছাড়া দিয়া উঠিয়া লেফটেনান্ট বফ্ মঙ্গল পাঁড়েকে মারিবার জন্য পিস্তল ছুড়িলেন, লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; তিনি তখন তলোয়ার ধারণ করিয়া বৈরীর সম্মুখীন হইলেন; মঙ্গল পাঁড়েও তলোয়ার ধরিল, দুইজনে যুদ্ধ বাধিল। কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, এমন সময় সার্জন মেজর মধ্যবর্তী হইলেন, যুদ্ধে যোগ দিলেন। মঙ্গল পাঁড়ে মরিয়া হইয়া তলোয়ার চালাইল, সাহেবেরা আহত হইলেন, তদ্দণ্ডেই ঐ দুইজন সাহেবকে নিকাশ করিয়া ফেলিত, সেখ পলটু নামক গ্রিনেডিয়া দলের একজন মুসলমান সিপাহি দ্রুত আসিয়া বিদ্রোহীকে ধরিয়া ফেলিল, সাহেবরা বাঁচিয়া গেলেন।

অদূরে কোয়ার্টার গার্ডের একজন জমাদার আর ২০ জন সিপাহি পাহারায় ছিল; বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আরও অনেক লোক সেইখানে আসিয়া জমা হইল; কাহারও কাহারও ইউনিফরম পরা, কেহ কেহ ইউনিফরমশূন্য। লোক অনেক জুটিল বটে, কিন্তু সেখ পলটু ব্যতীত কেহই অফিসারদ্বয়ের সহায়তা করিতে অথবা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিল না। তাহারা যে কর্তব্যকার্যে নিশ্চেষ্ট থাকিল; এইমাত্র অপরাধ নয়, জনতার মধ্যে কয়েকজন সিপাহি বন্দুকের বাঁট দিয়া সেই দুইজন আহত অফিসারকে প্রহার করিয়া ভূমিশায়ী করিয়া ফেলিল একজন সিপাহি সেই ভূশায়ী সাহেবদিগের উপর গুলি করিল; মঙ্গল পাঁড়েকে ধরিবার জন্য সেখ পলটু যখন তাহাদিগকে আহ্বান করিল, তখন তাহারা পলটুকে গালাগালি দিয়া বলিল, "তুই যদি মঙ্গল পাঁড়েকে না ছাড়িস তাহা হইলে আমরা তোকেও গুলি করিয়া মারিব।" যতক্ষণ পর্যন্ত বফ্ ও সার্জন মেজর নিরাপদ না হইলেন, সেখ পলটু একেশ্বর ততক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল পাঁড়েকে কায়দা করিয়া ধরিয়া রাখিল। বাস্তবিক তাহারই প্রভুভক্তি গুণে সাহেব দুটির জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

একজন আরদালি ছুটিয়া গিয়া জেনারল হিয়ার্সের গাড়ি বারাণ্ডায় দাঁড়াইল যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ জানাইল। হিয়ার্সের দুটি পুত্র (সিপাহিদলের অফিসার) তৎকালে তাহার নিকটে ছিলেন। তাঁহারা তিনজনেই ত্বরান্বিত হইয়া অশ্বারোহণপূর্বক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইখানে বলা আবশ্যক অশ্বপৃষ্ঠে যখন জিন দেওয়া হয়, জেনারেল হিয়ার্সে সেই অবকাশে চুঁচুড়া ও দমদমায় ইউরোপীয় সেনা নায়কদ্বয়ের নামে ক্ষিপ্রহস্তে দুইখানি চিঠি লিখিয়া রাখিলেন; নিতান্ত আবশ্যক হইলে দুইখানি চিঠি উক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করা হইবে। চিঠিতে লেখা থাকিল "চিঠি পাইবামাত্র তাহারা তাহার সাহায্যার্থ বারাকপুরে, উপস্থিত হইবেন।" চিঠি দুইখানি যখন তিনি শীল করেন, সেই সময় আহত অফিসারদ্বয়ের অঙ্গের রক্তমাখা ৪৩ গণিত পল্‌টনের আজুটান্ট; তৎপরে সেই পল্‌টনের সেনাপতি তথায় উপস্থিত হইয়া উপস্থিত ঘটনার বিশেষ বিবরণ বর্ণন করিলেন।

বৃত্তান্তটা-জেনারেল হিয়ার্সের কর্ণে আশ্চর্য বোধ হইল; একজন মাত্র সিপাহি এতদূর অনর্থ বাধাইয়াছে, ইহা অবশ্যই আশ্চর্য। বোধ হইল আশ্চর্য অথচ ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাগলটাকে বন্ধন করিতে অথবা গুলি করিতে পারে, এমন লোক কি সেখানে আর একজনও ছিল না?"

তর্কবিতর্কে সময় নষ্ট করা অপরামর্শ ভাবিয়া হিয়ার্সে এবং তাহার পুত্রদ্বয় অশ্বারোহণপূর্বক দ্রুতবেগে প্যারেড-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, সেখানে যাহা হইতেছিল, তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। দেখিলেন, বহু সিপাহির জনতা;—কাহারও কাহারও পোশাকপরা, হস্তে অস্ত্র, কেহ কেহ ইউনিফরমবিহীন, নিরস্ত্র; কয়েকজন অফিসার

আছেন; কেহ কেহ অশ্বারোহণে, কেহ কেহ পদব্রজে আছেন তাহারা, কিন্তু কেহই কোন কার্য করিতেছেন না।

মঙ্গল পাঁড়ে তৎকালে পলটুর হস্তমুক্ত হইয়া ছাউনির সম্মুখে দ্রুত পাইচারি করিতেছে, উচ্চকণ্ঠে সঙ্গিগণকে আহ্বান করিতেছে; বারম্বার বলিতেছে, "আইস, আইস, আমার অনুবর্তী হও, আমি যাহা করিতেছি, তাহাই কর; গোরা সেনা আসিয়া পড়িল; ধর্মরক্ষার জন্য যদি মরিতে হয়, মরিব; আইস একসঙ্গে মরিব।"

সমবেত সিপাহিগণ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যে কোম্পানির চাকর, সে কথা তখন কাহারও স্মরণ ছিল না; তথাপি প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইতে কেহই অগ্রসর হইল না; কেহই মঙ্গল পাঁড়ের আহ্বানে কোন উত্তর দিল না, মঙ্গল পাঁড়ে আপন মনে বলিতে লাগিল, "কাপুরুষের দল, অগ্রে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া শেষকালে পশ্চাৎপদ হইল। গড্ডালিকাপ্রবাহ—অগ্রগামী ভেড়া যেদিকে যায়, পালের সকল ভেড়াই সেই দিকে ছুটে; ইহারাও সেইরূপ রঙ্গ দেখাইতেছে; ভবিষ্যতে কি হইবে। হতভম্ব হইয়া তাহাই চিন্তা করিতেছে।"

জেনরেল হিয়ার্সের আগমনে সমস্যার পূরণ হইল। যখন তিনি দেখিলেন কোয়ার্টার গার্ডের সম্মুখে মঙ্গল পাঁড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখন তিনি সদলে দুই পুত্র ও মেজর রসের সহিত সেইদিকে চলিলেন। একজন অফিসার ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাকে বলিলেন, "সাবধান! বিদ্রোহীর বন্দুক গুলিভরা!" জেনরেল উত্তর করিলেন, "বিদ্রোহীর বন্দুক আমি গ্রাহ্য করি না!" এই উত্তর দিয়াই সেই দিকে তিনি অশ্বচালনা করিলেন।

জমাদার ও গার্ড সেইখানে উপস্থিত, জেনরেলের আদেশ পালনে তাহাদের অল্পই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল; জেনরেল ও তাঁহার দুই পুত্র; তিনজনই পিস্তলধারী, তখন তাহারা ভাবিল, অবাধ্য হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু। অতএব সভয় অন্তরে তাহারা সপুত্র হিয়ার্সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মঙ্গল পাঁড়ে তখন একস্থানে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গুলি করিবার জন্য বন্দুক ঘুরাইতেছিল। পুত্রদ্বয়সহ হিয়ার্সে যখন মঙ্গল পাঁড়ের সম্মুখীন হইলেন, তখন জন হিয়ার্সে (জেনারেলের এক পুত্র) পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পিতা! বিদ্রোহীটা তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছে।" পিতা উত্তর করিলেন, "যদি আমি মরি,তখন তোমরা উহার প্রতি ধাবিত হইয়া উহাকে নিপাত করিও।"

মঙ্গল পাঁড়ে তৎকালে জেনরেল হিয়ার্সকে লক্ষ্য করিল না নিজের বুকের দিকেই বন্দুকের মুখ ফিরাইল। সে তখন বুঝিল, খেলা ফুরাইল, বন্দুকের গোড়াটা মাটিতে রাখিয়া নলিটা আপন বক্ষে সংস্থাপন করিল, পদপেষণে আওয়াজ কবিল, তৎক্ষণাৎ দগ্ধাঙ্গ হইয়া আহত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

ভূতলে পতিত হইয়া আহত মঙ্গল পাঁড়ে ছটফট করিতে লাগিল। রক্তধারা বহিতে লাগিল। অফিসারেরা স্থির করিলেন, লোকটা এখনই মরিবে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল, পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আঘাত সামান্য, বুকের ভিতর গুলি প্রবেশ করে নাই।" ডাক্তারের বাক্যানুসারে মঙ্গল পাঁড়েকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল।

জেনরেল হিয়ার্সে তখন অশ্বের মুখ ফিরাইয়া সিপাহিদলের সম্মুখে গিয়া পূর্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের আতঙ্কের হেতু অমূলক; গবর্নমেন্ট তোমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবার কোন কল্পনা করেন নাই। তোমরা এইভাবে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ, যে

লোকটা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া নরহত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে গুলি করিতে পার নাই, ইহা দেখিয়া আমার অন্তরে বড় ক্ষোভ জন্মিল; তোমরা কর্তব্যকার্যে অবহেলা করিয়াছ।"

সিপাহিরা উত্তর করিল "লোকটা পাগল, অধিক মাত্রায় ভাঙ খাইয়া আরও অধিক, উন্মত্ত হইয়াছিল।"

হিয়ার্সে বলিলেন, "পাগলা হাতি ও পাগলা কুকুরকে যেমন তোমরা গুলি করিয়া মার, ঐ লোকটা বাস্তবিক পাগল, এমন যদি তোমরা ঠিক বুঝিয়াছিলে, তবে কেন সেইরূপে ঐ পাগলটাকে গুলি করিয়া মার নাই?"

কেহ কেহ উত্তর করিল, "তাহার হস্তে গুলিভরা বন্দুক ছিল।" জেনরেল বলিয়া উঠিলেন, "কি? গুলিভরা বন্দুককে, তোমরা ভয় কর?" সিপাহিরা নীরব হইল। জেনরেল ঘৃণাপূর্বক তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। সাব্যস্ত হইল, এখন তাহারা সৈনিক হইবার অযোগ্য হইয়াছে।

জেনবেল হিয়ার্সে আপন আবাসে গমন করিলেন। সেদিন রবিবার, অন্য কোন প্রকার সরকারি কার্য ছিল না, তাহার সহচরী কেবল চিন্তা। উনবিংশ পল্টনের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তিনিই সে হুকুম তামিল করিবার ভারপ্রাপ্ত। সেই দণ্ডাজ্ঞা এক্ষণে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা সৈনিক-বিভাগের সমস্ত সৈন্যগণকে অবগত করা হইয়াছে। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে প্রেসিডেন্সি-বিভাগের যাবতীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যগণের সাক্ষাতে বহবমপুরের বিদ্রোহী সিপাহিগণকে পদচ্যুত করিয়া, সম্বলশূন্য করিয়া, অবমানিত করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাদের দুর্দশা দর্শনে তাহাদের অপরাপর সঙ্গিগণ নিশ্চয়ই সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পদচ্যুত সিপাহি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিদ্রোহ জাগরণে অপরাপর লোকদিগকে উত্তেজনা করিবে, ইহাও নিশ্চয়; তাহাতেও বিপদাশঙ্কা আছে; সে বিপদ অপেক্ষাও এক গুরুতর বিপদ সম্মুখে। ১৯ সংখ্যক পল্টন প্রকাশ্যভাবে অবমানিত হইবার সময় অবশ্য সাধ্যমতে প্রতিবন্ধকতা করিবে, অন্য দলস্থ সিপাহিরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে, গণ্ডগোল বাধাইবে, প্রকৃতপক্ষে তাহারও সম্ভাবনা। কেহ কেহ বিবেচনা করিল, বারাকপুরের ব্রিগেড দল পূর্ব হইতেই সেই সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহারা কল্পনা করিয়াছে, সোমবার বারাকপুরস্থ শ্বেতাঙ্গ পুরুষও শ্বেতাঙ্গনাগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। প্রথমেই রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। মঙ্গল পাঁড়ে একজন দুর্বল লোক মাত্র। বিপদ-আসন্ন বুঝিয়া বারাকপুরস্থ অধিকাংশ ইংরাজ মহিলা কিছুদিনেব জন্য বারাকপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লন, কিন্তু যে স্থান তাহারা পরিত্যাগ কবিলেন, তৎকালে দেশের অন্য কোন স্থান তদপেক্ষা অল্প বিপদসঙ্কুল ছিল না। কলিকাতা আসিয়া বিবিরা দেখিলেন, কলিকাতাবাসিনী শ্বেতাঙ্গনাগনও তাহাদের ন্যায় ভয়াভিভূতা।

বারাসতে অবস্থানকালে ৩০ মার্চ তারিখে ১৯ গণিত বিদ্রোহী সিপাহি দল জানিতে পারিল, পূর্ব রজনীতে বারাকপুরে ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। পুরস্থ ৩৪ গণিত পল্টন বারাসতে গুপ্তচর প্রেরণ করিল, জানাইয়া দিল দণ্ডপ্রাপ্তির অগ্রে তাহারা (১৯ গণিত পল্টন) যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ৩৪ ও ১৯ গণিত দুই পল্টন লখনউ নগরে একত্রে বন্ধুভাবে কার্য করিয়াছিল, সেই কারণেই এইরূপ অবৈধ সহানুভূতি প্রকাশ, গুপ্তচরের দ্বারা ৩৪ গণিত পল্টনের সিপাহিরা আরও বলিয়া পাঠাইল যে, তাহারাও ঐ দলের সঙ্গে

মিলিত হইবে, প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, ধর্মরক্ষার জন্য সকলেই একসঙ্গে মরিবে। এই মন্ত্রপাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল, সমস্ত শ্বেতপুরুষগণকে সংহার করাই যেন তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা। গুপ্তমন্ত্রণা এইরূপ, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহারা বিনীত বাক্যে অফিসারগণকে জানাইল, যে ঘটনা হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা আন্তরিক দুঃখিত ও অনুতপ্ত, বস্তুত রাজভক্তি দেখাইবার জন্য দেশের যে কোন স্থানে যাইতে হয় সে স্থানেই যাইবে; যাইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত। তাহারা আরও বলিল, তাহাদের অন্তরে বিদ্রোহ ভাবের লেশমাত্র নাই; যে গবর্নমেন্টের নিমক খাইয়াছে, যে গবর্নমেন্টের পোশাক পরিয়াছে, সে গবর্নমেন্টের বিপক্ষে কদাচ তাহারা অস্ত্রধারণ করিবে না। দুশ্ছেদ্য সখ্যবন্ধনের খাতিরে স্বজাতির সঙ্গিগণকে গোপনে বন্ধুভাব জানাইল, কিন্তু নিঃশব্দে কষ্ট সহ্য করিয়া আপাতত প্রকাশ্যরূপে তাহারা আপনাপন শিবিরে কার্য করিতে লাগিল।

৩১ মার্চ, ১৮৫৭, উনবিংশ পল্টনের পদচ্যুতি

৩০ মার্চের রজনী প্রভাত, ৩১ মার্চের প্রাতঃকাল সমাগত, উনবিংশ সংখ্যক পল্টন এতদিন গবর্নমেন্টের সৈনিকরূপে যেভাবে কুচ করিত, এই দিন সেইভাবে তাহাদের শেষ কুচ্ যাত্রা। অন্তরে গুরুভার, অন্তরে অনুতাপ, অন্তরে সাঙ্ঘাতিক আতঙ্ক, এই অবস্থায় তাহারা দণ্ডগ্রহণ করিতে চলিল। বারাকপুরের এক মাইল দূরে বিদ্রোহীগণ যখন পৌঁছিল, জেনরেল হিয়ার্সে তখন অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, চূড়ান্ত আদেশ বিজ্ঞাপন করিলেন, তৎপরে তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে বারাকপুরের প্যারেড ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন; সেই প্যারেড ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত আদেশ পালনের নির্দিষ্ট স্থান। প্রেসিডেন্সি বিভাগে দেশীয়, ইউরোপীয় যত সৈন্য তৎকালে সন্নিবেশিত ছিল, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পল্টনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, তাহারা সকলেই সেই প্যারেড-ক্ষেত্রে সমবেত হইল। বিদ্রোহী সেনাদল অবিলম্বে প্যারেড-ক্ষেত্রের চিহ্ন নির্দিষ্ট স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল, আগ্নেয় অস্ত্রধারী সৈন্যগণের সহিত মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইল। বিদ্রোহীরা যদি কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতার লক্ষণ দেখাইত, তাহা হইলে গোলন্দাজদলের অস্ত্র প্রভাবে তাহাদের বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইত; কিন্তু তাহারা বাধ্যতা স্বীকার ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ বিরুদ্ধভাব দেখাইল না। নীরবে তাহারা জেনরেলের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও গবর্নমেন্টের আদেশ শ্রবণ করিল। বাধ্য হইয়া একে একে বন্দুকগুলি পরিত্যাগ করিল, প্রত্যেক বন্দুকের সঙ্গীনে আপনাদের কটিবন্ধগুলি ঝুলাইয়া রাখিল, ব্রিটিশ সেনাদলে তাহাদের সামরিক জীবনের এই শেষ অভিনয়। অতঃপর রণপতাকা সমূহ সমানীত হইল, এবং রাশিকৃত বন্দুকের উপরে তাহা সংস্থাপিত হইল। এই সময়ে অনেকের মনেই এক প্রকার উদ্বেগ জন্মিল। ১৯ গণিত সিপাহিদল যদিও বশীভূত ও অনুতপ্ত, কিন্তু অপরাপর সেনাদল বিশেষত ৩৪ গণিত পল্টনে কতক পরিমাণে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইল,তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অফিসারগণের মনে সন্দেহ হইল: কেহ কেহ অনুমান করিলেন, দুইদিন পূর্বে যাহারা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, এখন তাহারা যেন অন্য মূর্তিতে অফিসারগণকে গুলি করিতে প্রস্তুত। জনরব এইরূপ যে, অপরাধীদলের অনেক সিপাহি গুলিভরা বন্দুক লইয়া প্যারেড করিতেছিল, তদ্দর্শনে কেহ কেহ জেনরেল হিয়ার্সকে পরামর্শ দিলেন, সঙ্কেতের চাবুক আস্ফালন করিয়া ভয় প্রদর্শন করা কর্তব্য, সুবিবেচক জেনরেল হিয়ার্সে সে পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না।

১৯ গণিত পলটনে যে বেতন পাওনা ছিল, বণ্টন করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহা সেই

স্থানে আনয়ন করা হইল, বেতন শোধ করিয়া দেওয়া হইল; এখন আর তাহারা ব্রিটিশ সেনাদলের সিপাহি বলিয়া গণনীয় রহিল না। জেনরেল হিয়ার্সে এই সময় সদয়ভাবে একটিই বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, "গবরমেন্ট যদিও তোমাদিগকে সরাসরি মতে ডিসমিস্ করিলেন কিন্তু বহরমপুর হইতে তোমরা যে প্রকার শান্তভাব ধারণ করিয়া বারাকপুরে আসিয়া, অতীত দুষ্কর্মের নিমিত্ত যেরূপ অনুতাপ করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের প্রতি আর কোনরূপ লাঘবের আদেশ হইবে না। তোমাদের ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, গবর্নর জেনরেলের আদেশে তোমাদের ব্যবহৃত ইউনিফরম তোমাদের অঙ্গেই থাকিবে, তাহা খুলিয়া লওয়া হইবে না, এবং তোমাদের দেশে পৌঁছিবার গাড়ি ভাড়া ও রাহা খরচ সরকারি তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে।"

জেনরেলের এই সদয় ব্যবহার সিপাহিদলের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিল, তাহারা পরমসন্তুষ্ট হইল। তাহাদের অনেকেই উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়া গেল"। বিষাদে আরও উচ্চ গম্ভীর স্বরে তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, "৩৪ গণিত পল্টন আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, আমরা তাহার প্রতিফল দিবই দিব।"

পদচ্যুতদলের পক্ষ হইতে একজন সিপাহি দলস্থ লোকের মুখপাত্র হইয়া জেনরেলকে বলিল, "আমরা প্রস্থান করিবার পূর্বে দশ মিনিটের নিমিত্ত আমাদের হস্তে অস্ত্র প্রদান করুন, আমরা আর কাহারও সহায়তা চাহিব না, আপনারাই ৩৪ গণিত পল্টনের সিপাহিদলকে একবার বুঝিয়া লইব।"

১৯ গণিত পল্টনের প্রাপ্য বেতন শোধ করিয়া দিবার পর অপরাপর সিপাহিগণকে সম্বোধন করিয়া জেনরেল হিয়ার্সে একটি সাধারণ বক্তৃতা করিলেন। পূর্ব পূর্ব অবসরে যাহা যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি পুনরুক্তি করিয়া পরিশেষে তিনি বলিলেন, "১৯ গণিত পলটনের মধ্যে চারিশত ব্রাহ্মণ এবং একশত পঞ্চাশজন রাজপুত্র, ইহারা এখন স্বদেশে চলিল, ইহারা এখন স্বাধীন। যে যে পুর্ণতীর্থে ইহারা এখন যাইতে অভিলাষ করে, স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবে, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল দেবতার অর্চনা করিয়াছেন, ইহারাও এখন সেই সকল দেবতার পূজা করিতে পারিবে, সকলেরই ধারণা হওয়া উচিত যে, গবর্নমেন্ট সিপাহিগণের ধর্ম নষ্ট করিবেন, এইরূপ যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহা নীচলোকের কল্পিত—সম্পূর্ণ অমূলক—সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

সিপাহিরা বিশেষ মনোযোগপূর্বক ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিল, যখন ছুটি হইবার সময় আসিল; তখন তাহারা স্থিরভাবে নিঃশব্দে আপনাপন ছাউনিতে ফিরিয়া গেল।

বেলা প্রায় নবম ঘটিকার সময় পূর্ব পদস্থ ১৯ গণিত সিপাহি পল্টনের বেতন শোধ করিয়া দেওয়া হইল। কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্যের মোতায়নে তাহাদিগকে বারাকপুরে সীমা পার করিয়া দেওয়া হইল। বিদায় হইয়া যাত্রা করিবার সময় সেই পদচ্যুত সিপাহিরা মুক্ত কণ্ঠে সহৃদয় প্রবীণ সৈনিক জেনরেল হিয়ার্সের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া গেল; তিনি তাহাদিগকে পদচ্যুত করিবার ভার পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহারা তাহাকে আশীর্বাদ করিল। ওদিকে সিপাহিগণের ঐরূপ মঙ্গল কামনা, এদিকে দয়াপরবশ জেনরেল হিয়ার্সে দুঃখিতান্তঃকরণে আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কার্যভার গ্রহণ করিয়া অবধি এমন কার্য তিনি আর কখনও করেন নাই; কার্যানুরোধে এমন দিন কখনও উপস্থিত হয় নাই, ইহা চিন্তা করিয়াই তাহার ক্ষোভের উদয়, পক্ষান্তরে নিরুপদ্রবে, নির্বিঘ্নে এই কঠিন কার্য সুসিদ্ধ হইল, তন্নিমিত্ত তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

লর্ড ক্যানিং বাহাদুর উনবিংশ পল্টনের দণ্ডাজ্ঞা দান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ৩১ মার্চ প্রাতঃকালে দণ্ডাজ্ঞা পালনের সময় বারাকপুরে কিরূপ ঘটনা হয়, তাহা দর্শন করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য তিনি তাঁহার একজন এডিকংকে বারাকপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, নির্বিঘ্নে কার্য সমাধা হইবার পর সেই এডিকং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গবর্নর জেনরেল বাহাদুরকে শুভ সমাচার দিলেন, গবর্নর জেনরেল বাহাদুর সন্তুষ্ট হইলেন। বিদ্রোহী সিপাহিরা কলিকাতা লুট করিবে, কেল্লা মারিয়া লইবে, ইংরাজ জাতিকে সমূলে নির্মূল করিবে, এই ভীষণ জনরবে যাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, গবর্নর জেনরেল বাহাদুর তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন, বিদ্রোহীগণের উপযুক্ত শাস্তিবিধানের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। পূর্ব আতঙ্কের কারণ দূর হইল, অতঃপর রাজ্য মধ্যে শান্তি বিস্তার করিবে। এইবার ৩৪ গণিত পল্টনের ব্যবহারের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িবে, সেই দলের উন্মত্ত সিপাহি মঙ্গল পাঁড়ে তলোয়ারের চোটে দুইজন অফিসারকে আহত করিয়াছিল, তাহার দলস্থ সিপাহিরা তাহার পৃষ্ঠপোষক হইল না, সেই দুঃখে সে নিজেও আপন বক্ষে গুলি মারিয়া আহত হইয়াছিল। হাসপাতালের চিকিৎসায় আরাম হইলে তাহাকে সামরিক বিচারালয়ে বিচারার্থ অর্পণ করা হয়, ৬ এপ্রিল তারিখে কোর্ট মার্শেল বসে,— বিচারে মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসির হুকুম; ৮ এপ্রিল তারিখে বারাকপুরে তাহার ফাঁসি হইয়াছিল; তথাকার সমস্ত সৈন্য তাহার ফাঁসি দেখিবার জন্য বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিল। মঙ্গল পাঁড়ে যখন অফিসারদের উপর তলোয়ার চালায় তখন ৩৪ গণিত পল্টনের একজন জমাদার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া সেই ব্যাপার দর্শন করিয়াছিল; অত্যাচার নিবারণের কোন চেষ্টা করে নাই; প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট ছিল; সেই অপরাধে তাহাকেও কোর্ট মার্শেলের বিচারে সমর্পণ করা হয়। ১০, ১১ এপ্রিল, দুইদিন বিচার, অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহারও ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, সর্বজন সমক্ষে তাহারও ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৮৪৭—১৯১৯)

[অসাধারণ মানুষ ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ শিবনাথ ১৮৭৭ সালে যে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলেন, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সমাজ সংস্কার, জাতীয়তাবোধের এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উন্মেষ। এক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের দুজনের সহযোগিতায় ১৮৭৯ সালে 'সিটিস্কুল' স্থাপন করেন। ভারতবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোহিত ছিলেন শিবনাথ। তিনি ছিলেন নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে। শিবনাথের 'যুগান্তর' উপন্যাসের অনুসরণে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর' পত্রিকা। তাঁর 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয়সমাজ' আজও উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের অন্যতম আকরগ্রন্থ।]

মিউটিনি

লাহিড়ি মহাশয় যখন বারাসতে প্রতিষ্ঠিত তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনির হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে গবর্নমেন্ট স্থির করেন যে, সৈন্যবিভাগে একপ্রকার নতুন বন্দুক প্রচলিত করিবেন। ঐ বন্দুকের গুলিপূর্ণ টোটার উপরকার কাগজ দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। সেই সকল টোটা দমদমের কারখানাতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। দমদম হইতে এই কথা উঠিল যে, দুই প্রকার টোটা প্রস্তুত হইতেছে, এক প্রকার টোটার সরকার কাগজ গো-বসার দ্বার, অপর প্রকার টোটার কাগজ শূকর-বসার দ্বারা লিপ্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে; গো-বসা-লিপ্ত টোটা হিন্দুদিগকে ও শূকর-বসা নির্মিত টোটা মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে। প্রজাগণকে স্বধর্মচ্যুত করা ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য। এই জনরবের কিছুমাত্র মূল ছিল না; এবং নূতন টোটা তখনও হয় নাই। অথচ এই জনরবে সিপাহিদিগের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সিপাহিদিগের মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসী অনেকে ছিল। তাহাদের মন লখ্নউয়ের নবাবের পদচ্যুতি অগ্রেই উত্তেজিত ছিল। লর্ড ডালহাউসি যেভাবে অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎপ্রদেশের প্রজাকুল জবরদস্তী ও বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। অযোধ্যা প্রদেশবাসী সৈন্যদলের মনে সেই অসন্তোষ প্রধূমিত বহ্নির ন্যায় রহিয়াছিল। তাহার উপরে টোটা কাটার জনরব বাতাসের ন্যায় আসিল। ১৮৫৭ ফেব্রুয়ারি মাসে বারাকপুরের সিপাহিদিগের মধ্যে গভীর অসন্তোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; কিন্তু সে অসন্তোষের গভীরতা কত, কর্তৃপক্ষ তখন তাহা ধরিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরে বারাকপুর হইতে একদল সৈন্য কোনও বিশেষ কারণে বহরমপুরে প্রেরিত হয়। তখন বহরমপুরে একদল সিপাহি সৈন্য ছিল। বারাকপুর হইতে নবাগত

* *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৯৮৩ সংস্করণ। পৃ. ১৫৭-১৬১*

সিপাহিগণ তাহাদের কানে কানে নূতন টোটার কি বিবরণ বলিল তাহাতে সিপাহিরা একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেখানে একদিন ইংরাজ-সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সহিত সিপাহিদিগের মারামারি হইল। এই সংবাদ কলিকাতার পৌঁছিলে লর্ড ক্যানিং ঐ সকল সিপাহিকে বারাকপুরে আনিয়া সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহাদিগকে বারাকপুরে আনিয়া সমুদয় সিপাহি সৈন্যদলের সমক্ষে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সৈন্যদল হইতে বিদায় দেওয়া হইল। অন্য সময় হইলে এই শাস্তি দ্বারা অনিষ্টকর ফল না ফলিয়া ইষ্ট ফলই হইত। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল। কর্মচ্যুত সিপাহিদিগের মধ্যে অনেকে অযোধ্য প্রভৃতি প্রদেশের লোক ছিল। তাহারা কর্মচ্যুত হইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে ফিরিবার সময় নূতন টোটার কথা লইয়া গেল। বিশেষত তৎ তৎ স্থানের সিপাহিদিগের কর্ণে সেই কথা তুলিল; এবং কিরূপে তাহারা স্বধর্ম রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং সেজন্য নিগৃহীত হইয়াছে তাহাও গৌরব ও স্পর্ধার সহিত প্রচার করিয়া দিল। চারিদিকে প্রধূমিত অগ্নির ন্যায় অসন্তোষ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

অবশেষে সেই প্রধূমিত অসন্তোষ ১০ মে দিবসে মীরট নগরে বিদ্রোহাগ্নির আকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেখানে ৬ মে দিবসে ৮৫ জন দেশীয় সৈনিক কুচকাওয়াজির সময় টোটা লইতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহাদিগকে কোর্ট মার্শালের বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে অপরাপর সিপাহিগণ তাহাদিগকে ধর্মের জন্য নিপীড়িত বলিয়া, সদলে বিদ্রোহী হইয়া ১০ মে দিবসে জেলের কয়েদিগণকে ছাড়িয়া দেয়; রাজকোষ লুণ্ঠন করে; অস্ত্রাগার হস্তগত করে; অনেক ইংরাজকে হত্যা করে, এবং অবশেষে দিল্লির নামমাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর শাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার মানসে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করে। তাহারা ১১ মে দিল্লি অধিকার করে। এই সংবাদ দেশে প্রচার হইলে, যে যে স্থানে দেশীয় সিপাহি সৈন্য ছিল, সর্বত্রই বিশেষ উত্তেজনা দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাজপুরুষগণ সতর্ক হইয়া বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; ভয় ও মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় কিছুই করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। যেমন গ্রীষ্মের দিনে ঘরে আগুন লাগিল দেখিতে দেখিতে একঘর হইতে অপর এক ঘরে লাগিয়া যায়, সেই প্রকার দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহাগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এই সুযোগ পাইয়া যাহাদের কোন না কোনও কারণে পূর্বাবধি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, এমন কতকগুলি লোক এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের সারাথ্যকার্যে অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে ফৈজাবাদের মৌলবি, বিঠুরের নানাসাহেব, ঝাঁসির রানি ও নানার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ফৈজাবাদের মৌলবি একজন মুসলমান ধর্মাচার্য, লখ্‌নউয়ের নবাবকে পদচ্যুত করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। নবাবের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহার আলাপ ও আত্মীয়তা ছিল। তাহাদের অবনতিকে তিনি নিজধর্মের অধঃকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহীদলের একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অযোধ্যার সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

নানাসাহেব মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বাজীরাওর পোষ্যপুত্র। তিনি পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার বন্দিদশাতে কানপুরের সন্নিকটবর্তী বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্নমেন্ট তাঁহার কোনও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও এই সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহের অপর একজন সারথি হইলেন।

ঝাঁসির রানিও ঐ প্রকার কোনও কারণে ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তাঁহার স্বদেশ হিতৈষণা ও বীরত্ব দেখিয়া ইংরাজগণও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কোন স্থানে কবে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিল তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্রোহাগ্নি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন কি বক্সারে, আরা প্রভৃতির ন্যায় বেহারের অন্তর্গত স্থান সকলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে কানপুরেই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। নানাসাহেবের প্ররোচনাতে বিদ্রোহী সিপাহিগণ উৎসাহিত হইয়া সেখানকার ইংরাজগণকে কয়েকদিন একটা বাড়িতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তৎপরে তাহাদিগকে নৌকাযোগে অন্যস্থানে প্রেরণ করিবার আশা ও অভয় দিয়া তাহাদিগকে বাহিবে আনিয়া নৌকাতে আরোহণ করাইয়া, তাহাদের অধিকাংশকে গুলি করিয়া হত্যা করে। অবশেষে যে সকল ইংরাজ রমণী ও বালক বালিকা থাকে তাহাদিগকে কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখা হয়; কিন্তু প্রতিশোধের দিন নিকটে আসিতেছে দেখিয়া তাহাদিগকেও সদলে হত্যা করিয়া একটি কূপের মধ্যে তাহাদের মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। এতদ্ব্যতীত ১২৬ জন ইংরাজ (যাহাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা ছিল) ফতেগড় হইতে নৌকাযোগে পলাইয়া আসিতেছিল, নানার আদেশে তাহাদিগকে নৌকা হইতে নামাইয়া হত্যা করা হয়। এই নিদারুণ হত্যা বিবরণ নানাসাহেবের নামের উপর অবিনশ্বর কলঙ্কের রেখার ন্যায় চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। কারণ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকার হত্যা সকল দেশের সামরিক নীতির বিরুদ্ধ-কার্য।

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহিগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও দেশীয় খ্রিস্টানগণ সর্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গভর্নর জেনরেল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন—কালাদের অস্ত্রশস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি, ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজেরা তাহার নাম Clemency Canning "দয়াময়ী ক্যানিং" রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলি করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের

সন্নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, "হকুমদার" অর্থাৎ (who comes there?) তাহা হইলেই বলিতে হইত "রাইয়ত হ্যায়" অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।

যাহা হউক ইংরাজগণ সত্বর বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত করিলেন। দিল্লি ও লখ্‌নউ পুনরায় তাহাদের হস্তগত হইল। প্রতিশোধনের দিন যখন আসিল তখন তাহারাও নৃশংসতাচরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। ইংরাজ সৈন্যগণ যতদূর অগ্রসর হইত, তাহাদের গমনপথের উভয়পার্শ্বে দোষী নির্দোষী, হতাহত দেশীয় প্রজার মৃতদেহে আকীর্ণ হইতে লাগিল। এক এলাহাবাদে ৮০০শত দেশীয় প্রজাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

ক্রমে সমগ্রদেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৮ সালে মহারানি প্রজাদিগকে অভয়দান করিয়া ভারত সাম্রাজ্য নিজ হস্তে লইলেন; স্টেট-সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল; কলিকাতা সহর আলাকমালাতে মণ্ডিত হইল; চারিদিকে আনন্দ ধ্বনি উঠিল। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল। সে জন্যই ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দিলাম।

বিদ্রোহজনিত উত্তেজনাকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামক সাপ্তাহিক ইংরাজি কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল। পেট্রিয়ট সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহি-বিদ্রোহ কেবল কুসংস্কারপন্ন সিপাহিগণের-কার্যমাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরাজ গবর্নমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে। পেট্রিয়টের চেষ্টাতে লর্ড ক্যানিং-এর মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল; সেজন্য এদেশীয়দিগের প্রতি কঠিন শাসন বিস্তার করিবার জন্য ইংরাজগণ যে কিছু পরামর্শ দিতে লাগিলেন, ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। পূর্বেই বলিয়াছি সেই কারণে তাহার স্বদেশীয়গণ তাহার Clemency Canning বা "দয়াময়ী ক্যানিং" নাম দিল। এমন কি তাহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্য ইংলণ্ডের প্রভুদিগকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেন্টেও সেকথা উঠিয়াছিল; কিন্তু ক্যানিং-এর বন্ধুগণ পেট্রিয়টের উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, এদেশবাসীগণ ক্যানিং-এর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত এবং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ। পেট্রিয়ট এই সময়ে এদেশীয়দিগের অদ্বিতীয় মুখপাত্র হইয়া উঠিল। হরিশচন্দ্র একদিকে যেমন গবর্নমেন্টের সর্বপ্রকার বৈধ-শাসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজগণের সর্বপ্রকার অবৈধ আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সকলে উত্তেজনাতে পড়িয়া স্থির বুদ্ধি হারাইয়াছিল। কেবল পেট্রিয়ট হারায় নাই, এইজন্য রাজপুরুষদিগের নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এইরূপ শুনিয়াছি পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিং-এর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট আফিসে বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত। হিন্দু পেট্রিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন

সংবাদ প্রভাকর

সম্পাদক : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সংবাদ : ১৪.২.১২৬৪ । ২৬.৫.১৮৫৭

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় সিপাহি সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত গবর্নমেন্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশ জন্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মিট্রোপলিটন কালেজে যে সভা করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুক্ত রাজা বাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল আগামিতে প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব হইল।

১। এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতদ্দেশীয় কয়েক দল পদাতিক সৈন্য গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়।

২। এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোন রূপ সহায়তা না করাতে গবর্নমেন্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্বারা তাহা আরো সম্পূর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু ঐ ভ্রমের কোন কারণ নাই।

৪। এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্নমেন্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য করিতেছেন যে মহারানির এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য বোধ করিবেন।

৫। এই সভার বিবরণ সর্ব সাধারণের বিদিতার্থ এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র প্রেরণ করা হয়।

৬। এই সভার বিবরণের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর পূর্বক ভারতবর্ষের শ্রীযুত অনরবিল গবরনর জেনরেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করা হয়।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত : ৭.৩.১২৬৪ । ২০.৬.১৮৫৭

কয়েকদল অধার্মিক—অবাধ্য—অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা-বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশপূর্বক রাজাবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্তস্বভাব অধন সধন প্রজা মাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, "এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্ন

হর,—সকল উপদ্রব নিবারণ কর—প্রজাবৎসল সুধার্মিক সুবিচারক ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের জয়-পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর।—অত্যাচারী—অপকারী বিদ্রোহীকারি দুর্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর।—যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহারদিগ্যে দণ্ড দান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ-বৃক্ষের ফলভোগ করুক।"

লোকের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারি না, আমারদিগের সহিত যখন যাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি প্রসঙ্গ মাত্রেই এই প্রকার উক্তি করিয়া থাকেন, বিশেষত বঙ্গদেশস্থ সমস্ত বাঙ্গালি প্রজা নিতান্ত প্রভুভক্ত, ইহারা নিরন্তর কেবল শ্রীশ্রীমতী রাজ্যেশ্বরীর প্রতুল প্রত্যাশা করে, যাহাতে রাজপুরুষদিগের রাজলক্ষ্মী ভারতবর্ষে চিরস্থায়িনী হয়েন, একাগ্র চিত্তে তাহারি অভিলাষ করে, স্বপ্নেও কখনো অমঙ্গল চিন্তা করে না, কারণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধীনতায় অধুনা দুর্বল ভীরু বাঙ্গালি ব্যূহ যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ পূর্বক সানন্দে বাস করিতেছে, কস্মিন্‌কালে তদ্রূপ হয় নাই, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? এই রাজ্যই তো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা, এবং ধর্ম, কর্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখী হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলন্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি। ভারতবর্ষের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যথার্থ নীতিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন পূর্বক রাজ্য রক্ষা করিতেছেন। সকল দিগেই সমান দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন, ইংলন্ডীয় ভাষা সহকারে প্রজাপুঞ্জের স্ব স্ব জাতীয় ভাষার উপদেশ দিতেছেন। চিকিৎসা-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, কৃষি-বিদ্যা, পদার্থ নির্ণয়-বিদ্যা, নানারূপ ধাতু, খনিঘটিত ভূতত্ত্ব-নির্ণায়ক-বিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার শিক্ষা দিয়া জীবিকা সাধনের জন্য প্রকৃষ্টরূপ প্রচুর পথ প্রস্তুত করিতেছেন,—সকল বিষয়েব অভাব হরিতেছেন,—পরীক্ষা দ্বারা পাত্র বিবেচনাপূর্বক সম্মান সহকারে পদ প্রদান করিতেছেন। গমনাগমনের জন্য উত্তম পথ, সেতু, বাষ্পীয় নৌকা. বাষ্পীয় রথ, প্রভৃতি কি চমৎকার সকল সৃষ্টি হইয়াছে, যেখানে সেখানে গমন করি কুত্রাপিই আশঙ্কা নাই, রাজপথে তরুতলে পর্বত উপরে, নদী বিশেষে, বিরল বনে নিশাভাগে স্বচ্ছন্দ সুখে নিদ্রা যাইতেছি, রাজপুরুষেরা স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া আশ্রিত প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, স্থানে স্থানে চিকিৎসালয়ে লক্ষ লক্ষ অনাথ রোগী ঔষধ পথ্য প্রাপ্ত হইয়া গুরুতর রোগ হইতে অনায়াসে নিস্তার পাইতেছে।—এই প্রকার শত শত দয়ার ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে থাকে। যবনাধিকারে আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই, সর্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত। মহরমের সময়ে সকল হিন্দুকে গলায় "বদি" অর্থাৎ যাবনিক ধর্মসূচক একটা সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া "হাঁসন" "হোঁসেনের" মৃত্যু জন্য শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্নিস করিয়া "মোর্চ্চে" নামক গান করিতে হইত। তাহা না করিলে শোণিতের সমুদ্র প্রবাহিত হইত। এইক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্তাপ একেকালেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই "চর্চ্চ" নামক খ্রিস্টীয় ভজনামন্দিরের সম্মুখেই গভীরস্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী, বাদ্য করিতেছি "ছ্যাড্যাং" শব্দে বলিদান করিতেছি,

নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্তমাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই কল্পে ছোট বড় সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। লার্ডসাহেবের বাটীর সম্মুখ দিয়া কোন কোন পল্লীর হিন্দুরা ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টার বাদ্য করিয়া প্রতিমা বিসর্জন করিতে যাইতেছেন, তাহাতে রাজপক্ষীয় প্রহরী প্রভৃতি কেহই "চু" শব্দটি করে না। নবাবী সময়ে "আদব" "কায়দা" করিতে করিতে কর্মচারিদিগের প্রাণান্ত হইত, গাড়ি, পাল্কি, চড়া দূরে থাকুক হুজুরদিগের চক্ষে পড়িলে জুজুর মত সং সাজিয়া প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত। বর্তমানে রাজ মহাত্মারা সে বিষয়ে একেকালেই অভিমানশূন্য, সমস্ত কর্মচারী যথোচিত মর্যাদার সহিত সুখে স্ব স্ব কর্ম নির্বাহ করিতেছেন, পথিকেরা কি মহারানি, কি গবর্নর জেনরেল সকলের পাশ ঘেঁষিয়া নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে গমনাগমন কবিতেছে। কেহ যদি "সেলাম" না করে তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই। এবং সেলাম করে এমত ইচ্ছাও নাই, যে ব্যক্তি প্রভুভক্তি প্রচারার্থে স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্বক বিনিত হইয়া নমস্কার করে, অতিশয় আহলাদপূর্বক তাহার সেই নমস্কার গ্রহণ করত তদ্বিনিময়ে নমস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। যবনাধিকাবে এই বঙ্গদেশের লোকেরা সময়ে সময়ে দস্যু, তস্কর বিশেযত বর্গির হেঙ্গামায় হৃতসর্বস্ব হইয়া কি পর্যন্ত আন্তরিক যাতনা সম্ভোগ না করিয়াছেন? এইক্ষণে সে যাতনাই জাত নাই।

এই স্থলে সকলে প্রণিধান করুন, ব্রিটিশ অধিকার আমারদিগের পক্ষে কি প্রকার সুখের আঁধার হইয়াছে, অনায়াসেই অতি সহজে নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যার উপার্জন, সুপথে থাকিয়া সুরীতিক্রমে বিবিধ সদুপায় অর্থ উপার্জন, বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা ধনাহরণ, নির্ভয়ে অর্জিত ধনরক্ষণ, অর্জিত ধনের বৃদ্ধি, অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের সুদের দ্বারা ধন বৃদ্ধিকরণ। স্বচ্ছন্দে শঙ্কা-শূন্য হইয়া নানাদেশ পর্যটন ও তীর্থাদি দর্শন, স্বাধীনরূপে ধর্ম যাজন, রাজকীয় ব্যাপারে নানা কথার আন্দোলন এবং রাজ নিয়মের দোষাল্লেখপূর্বক সংশোধনের অনুরোধকরণ ইত্যাদি অশেষবিধ বিষয়েই আমরা অশেষরূপে উপকৃত হইতেছি, অতএব সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রশংসা ঘোষণা করিয়া মনের সহিত জয় প্রার্থনা কর।

হে বঙ্গদেশীয় মহাশয়গণ! আমরা আর অধিক কি নিবেদন করিব? সুযোগ্য পরমবিজ্ঞ অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বিচারদক্ষ সর্বাধ্যক্ষ গবর্নর জেনারেল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর তোমারদিগের অকপট প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা, মনের অখিলতা, নির্মলতা, এবং সচ্চরিত্রতার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত হইয়াছেন, কারণ বাঙালি জাতি কাঙালি অপেক্ষাও দুর্বল, অত্যন্ত ভীত, সাহসহীন, ভাত মাছ খাইয়া শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনিলেই কাঁপিতে থাকে, যাহারা আপনারা আপনারদিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে না তাহারা কি আবার কস্মিন্‌কালে অরির-ভাব ধারণ করিয়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে? যে পর্যন্ত এদেশে ইংরাজের প্রভুত্ব হইয়াছে সেই পর্যন্ত তোমরা প্রভুভক্তরূপে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছ, এই মহদগুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ করিতেছ, এই কৃতজ্ঞতা ধর্ম জন্য ধর্ম তোমারদিগের ক্রমেই মঙ্গল করিবেন, এবং লার্ড বাহাদুর অপ্রসন্ন হইয়া যথাযোগ্য কৃপাবিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন না, তিনি প্রসন্ন হইয়া ভবিষ্যতে অধিক দয়া বিতরণ করিবেন।

সংপ্রতি অবোধ সেনারা বুদ্ধির বিকার বশত যে কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে, আমরা সেই কাণ্ডকে প্রকাণ্ড কাণ্ড বলি না, কেননা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের নিকট ভাণ্ড, সেইরূপ বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশ জাতির নিকট এই কাণ্ড অতি ক্ষুদ্র।

পিপিড়া আপনার মৃত্যুর নিমিত্তই পক্ষ ধারণ করে। অশ্বতরী আপনার নাশের নিমিত্তই গর্ভ ধারণ করে, কেশেঘাস নিজে সংহার পাইবার জন্যই পুষ্প-ধারণ করে। অধুনা সিপাহিদিগের সমর সজ্জা আপনারদিগের নিপাতের নিমিত্ত সেইরূপ হইয়াছে তাহাতে সংশয় কি? যে অবোধ পর্বতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তি সেই লোষ্ট্রাঘাতে আপনিই নিহত হয়। যদি তৃণের বাতাসে পর্বতকে চঞ্চল করিতে পারিত, যদি চটক পক্ষী চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে শোষণ করিতে পারিত, যদি মেষশাবক শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবীকে রসাতল দিতে পারিত, তবে একদিন সিপাহিদিগের যুদ্ধানুষ্ঠানে আমরা ভয় করিতে পারিতাম, ইহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে? তবে দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা এত দীর্ঘকাল অধীনে থাকিয়া বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার পূর্বক সমুদয় সংগ্রামে অক্ষোভে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে, অতি সাহসে সম্মুখ সমরে জয়লাভ করত বিশ্বময় ব্রিটিস বিক্রম বিস্তার করিয়াছে, সংপ্রতি হঠাৎ তাহারদিগের সে ভাবের অন্যথা কেন হইল? এমন কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? অবশ্যই তাহাতে কোন কারণ আছে, কোন কোন দুষ্ট লোকের দুষ্টাদেশেই এরূপ হইয়াছে, যাহা হউক, এইক্ষণে কাজে কাজেই তাহারদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিতে হইল, যদিও তাহারা অঙ্গস্বরূপ, কিন্তু বিশেষ রোগে রুগ্ন ভঙ্গ অঙ্গ ছেদন না করিলে দেহ রক্ষা হয় না। কোন কোন রোগে হাতখানা কাটিতে হয়, অতি পীড়াকর নড়াদন্ত ফেলিতে হয়, সুতরাং ইহারদিগের বিষয়েও সেইরূপ বিধি বিধেয় হইতেছে।

হে বাঙালি মহাশয়েরা! এ বিষয়ে আপনারদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না, আপনারা সকলে একান্তচিত্তে কেবল রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন করুন।—পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারানির জয় হউক, শুভ হউক, লার্ড বাহাদুরের অভিলাষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া সর্বতোভাবে সুখী হউন!—বিদ্রোহানল এখনি নির্বাণ হউক।—জগদীশ্বর আপন ইচ্ছায় বিদ্রোহিদিগে্যে শাসন করুন, যাহারা বিদ্রোহী হয় নাই, তাহারদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহারদিগের মনে রাজভক্তির ব্যতিক্রম না হয়। হে ভাই, আমারদিগের শরীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না, অতএব প্রার্থনাই আমারদিগের দুর্গ, ভক্তি আমারদিগের অস্ত্র এবং নাম জপ আমারদিগের বল, এতদ্দ্বারাই আমরা রাজ সাহায্য করিয়া কৃতকার্য হইব।

আমারদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই, ব্রিটিশ অধীনে যেমন সুখে আছি চিরকাল সেইরূপ সুখেই থাকিব। সর্বশেষ এই প্রার্থনা করি গবর্নর বাহাদুর নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইয়া রাজ্যের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হউন, তণ্ডুলাদি অগ্নিমূল্য হওয়াতে প্রজারা আর রক্ষা পায় না, রপ্তানি বন্ধ না করিলে দেশ বাঁচে না।

হে বাঙালি সম্পাদকগণ! তোমারদিগের লেখনী যেন সুধা বর্ষণ করে, যেন বিষ-বৃষ্টি করিয়া প্রলয়োৎপাদন না করে, সকলে রাজ্যেশ্বরের কুশল প্রার্থনায় লেখনী চালনা কর।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত : ৭.৩.১২৬৪ । ২০.৬.১৮৫৭

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
লহ লহ লহ নাথ, প্রণাম আমার।।
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর, হয়ে বাঞ্ছাময়।।

চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিসের জয়।
ব্রিটিসের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়।।
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়।
শাস্ত্র মতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়।।
স্বাধীনতা-স্বর্গভোগ, সকল সময়।
কিছুমাত্র নাহি সুখ, সদা সুখময়।।
সমভাবে সুখে আছে, প্রজা সমুদয়।
দোষী বিনা কেহ আর, দুখি কভু নয়।।
নীতিশাস্ত্র মত যত, রাজার লক্ষণ।
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন।।
প্রজার সন্তান প্রায়, মূর্খ নাই আর।
যেখানে সেখানে দেখি, বিদ্যার আগার।।
বহুবিধ বিদ্যাদানে, বিত্ত বিতরণ।
অজ্ঞান তিমির তায়, হতেছে মোচন।।
শিক্ষা পেয়ে করে সবে, পরীক্ষা প্রদান।
যে, যেমন পাত্র, তার সেইরূপ মান।।
প্রতিষ্ঠা পত্রের যোগে, পুরস্কার দান।
যোগ্য-জনে, যোগ্য-পদ, করেন প্রদান।
গুণভেদে পদভেদ, অসম্ভব নয়।
সঞ্চিত আশায় কেহ, বঞ্চিত না হয়।।
কল, যন্ত্র, আদি যত, বিজ্ঞান প্রধান।
নানারূপে হইতেছে, জীবিকা বিধান।।
"ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাপ" কিবা ভাস ভাসে।
ছ মাসের সমাচার, ছয়দণ্ডে আসে।।
বাষ্পতরি, বাষ্পরথ, অপূর্ব গঠন।
বণিকের বাণিজ্যের, মঙ্গলসাধন।
সহজেই পূর্ণ করে, নিজ মনোরথ।
ছয় দিনে আসে যায়, ছ মাসের পথ।।
নিজ নিজ ধর্ম প্রজা, করিছে পালন।
হৃষ্ট মনে পূজে সবে, তোমার চরণ।
প্রতিক্ষণ সুনিয়মে, শান্তির স্থাপন।
জোর করে চোর নাহি, হোরে লয় ধন।।
নিরপেক্ষ নীতিদক্ষ, অতি দয়াবান।
পালন করেন প্রজা, পিতার সমান।।
যেখানে সেখানে যাই, কিছু নাই ভয়।
তাই বলি, জয় জয়, ব্রিটিসের জয়।
বিশেষত বর্তমান, গবর্নর যিনি।
শাসনের আসনের যোগ্য জন তিনি।।

অতিশয় অনুরাগ, বিদ্যা বিতরণে।
প্রজা যাহে সুখে রয়, সদা তাই মনে।।
সুখেতে পালুক সবে, ধর্ম আপনার।
করেছেন শুভকর ঘোষণা প্রচার।।
হে নাথ করুণাময়, নিবেদন তাই।
তব পদে ইংরাজের, জয় ভিক্ষা চাই।।
এইভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার।
ভারতে বিভ্রাট যেন, নাহি ঘটে আর।।
ভারতের পুত্রগণ, নিবেদন ধর।
ঈশ্বরের কাছে সবে, জয় ভিক্ষা কর।।
একভাবে, একমনে, এক ধ্যানে থাকো।
কৃতজ্ঞতা সার-ধর্ম, অন্তরেতে রাখো।।
এখনি হইবে জয়, ভয় পেয়োনাকো।
ভক্তি-ভরে নিত্যনিধি, নিরঞ্জনে ডাকো।।
হোক্ হোক্ সমুদয়, শত্রু হোক ক্ষয়।
মুক্ত মুখে বল সবে, জয় জয় জয়।।
বিদ্রোহী সেফাইগণ, করি নিবেদন।
ছাড় দ্বেষ রণবেশ, কর সম্বরণ।।
এতদিন অধীনতা, করিয়া স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম, করেছ প্রচার।।
ব্রিটিস সমর-শিক্ষা, শিখে সমুদয়।
বাহুবলে কত দেশ, করিয়াছ জয়।।
কতবার পুরস্কার, পাইয়াছ তার।
গলেতে পদক আছে, চিহ্ন সবাকার।।
এখন তোমরা কার, কুচক্রেতে ভুলে।
করিতেছ অত্যাচার, রাজপ্রতিকূলে?।।
আজি ঘোর তাপরূপ, কূপ জলে উলে।
নিজ নিজ সংহারের, ধ্বজা দিলে তুলে।।
কার কথা শুনে সবে, সেজেছ সমরে?।
পিপীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে।।
এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলেখেলা।
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা।।
একবার দেখ দেখি, ধর্মপানে চেয়ে।
এতকাল বেঁচে আছো, কার অন্ন-খেয়ে।।
তোমাদের প্রতি লোক, মিছে করে রোষ।
লেখাপড়া শেখ নাই, সেই দোষ দোষ।।
না শিখিলে, লেখাপড়া, মানুষতো বটে।
অকারণে এত পাপ, ঘটে কেন ঘটে?।।

পাখি দেখ, পশু দেখ, যারা হয় পোষা।
পালকের প্রতি কভু নাহি করে গোঁসা।।
তোমরা হইলে খল, সাপের অধিক।
অধিক কি কব আর, ধিক্ ধিক্ ধিক্।।
যা করেছ, করিয়াছে, চারা নাই তার।
এখন ধর্ম্মের পানে, চাহ একবার।।
এদেশের সর্ব্বময় কর্তা হন যিনি।
তোমাদের মন্দকারী কভু নন তিনি।।
কর কর, কর সবে. অস্ত্র পরিহার।
কর কর, কর মুখে, স্ব দোষ স্বীকার।।
ধর, ধর, ধর এসে, চরণে তাঁহার।
পূর্ব্ববৎ অনুগত, হও পুনর্বার।।
অপার কৃপার নিধি, "লার্ড" দয়াময়।
করিবেন বিবেচনা উচিত যা হয়।

যে সব "সেফাই" আছে ব্রিটিশের বশ।
একমখে কি কহিব, তোমাদের যশ।।
ভূপতির প্রিয় হোয়ে, প্রিয় ব্যবহারে।
পুরস্কার পাবে তার, গুণ অনুসারে।
এই গুণে, একা কিছু, রাজ বলে নয়।
সদয় হবেন প্রভু, দীন দয়াময়।।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত : ৯.৩.১২৬৪ । ২২.৬.১৮৫৭

অবোধ অবাধ্য সিপাহি সেনা সম্প্রতি স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে তজ্জন্য প্রজাপুঞ্জের ভীত-চিত্ত হওয়া উচিত নহে, সাহসিকরূপে তাহারদিগের দমনার্থ সদুপায় করাই উচিত, এবং উপস্থিত সময়ে রাজার শুভ স্বস্ত্যয়ন করাই কর্তব্য। পতঙ্গপুঞ্জ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক যে প্রকার প্রজ্বলিত অনল শিখায় পতিত হইয়া নিধন হয়, দুরাচারী সিপাহিরাও সেইরূপ আপনারদিগের বিনাশকেই আপনারাই আহ্বান করিয়াছে। বামন যে প্রকার গগন রাজিত সুধাকরকে করতলস্থ করিবার অভিলাষ করে, মূর্খেরাও সেইরূপে রাজ্যলাভের প্রত্যাশায় অস্ত্রাঘাতে গ্রামে গ্রামে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা যখন বাহুবলে এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রবল পরাক্রম যখন সর্বত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, এদেশের নৃপতিগণ যখন পদানত হইয়া বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন তখন সামান্য অবোধ অকৃতজ্ঞ সিপাহি সেনারা সেই প্রবল পরাক্রমের অপহ্নব করিবে? একথা যে বিশ্বাস করে তাহাকে নির্বোধ পশু বলিলেই হয়। শৃগালে কি কেশরীকে পরাজয় করিবে? না ভেক অহি শিরে নৃত্য করিবে? এতদুভয় যদিও সম্ভব হয় তথাচ সিপাহিদিগের দ্বারা ব্রিটিস জাতির রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট যাহারদিগকে রণবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, বেতন দিয়া সন্তোষ রাখিয়াছেন, পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, অধুনা

তাহারাই গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে নরাধমেরা রাজকৃত উপকার সকল কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে? কি পরিতাপ! যাহা হউক, এই অসদাচরণের প্রতিফল পাইবার আর বড় কাল বিলম্ব নাই। সিংহ সম্মুখে মেষ দর্শনে যেরূপ নৃত্য করে, ভুজঙ্গ ভেক দর্শনে যেরূপ আপন ফণা উত্তোলন করে, গৌরাঙ্গ সেনারা সিপাহি দৃষ্টে সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছে। রণবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিয়া অবোধ অবাধ্যদিগকে চারিদিগে বেষ্টন করিয়াছে, তোপের শব্দে চতুর্দিগ স্তব্ধ হইতেছে, গোলার আঘাতে অবোধেরা শূন্যে শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, শাণিতাস্ত্রে অনেকের মণ্ডু ও দেহ খণ্ড খণ্ড হইতেছে, রণবিৎ সেনাপতিরা সিপাহি বিনাশের সংপূর্ণ আয়োজন করিয়াছেন, সেনাপতি জেনরেল বোনার্ড সাহেব অম্বলায় কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া যে সকল ভয়ঙ্কর কামান লইয়া দিল্লিতে আগমন করিয়াছেন তাহার আঘাতে পর্বত চূর্ণ হইয়া যায়, দিল্লির প্রাচীর ও দুর্গ কি সামান্য এতদিনে উড়িয়া গিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, যে সকল অবোধেরা দুর্গে আশ্রয় করিয়া বিক্রম করিতেছিল তাহারাও বোধ হয় নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, কামানের মুখ হইতে বারুদ সংযোগে হুতাশন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গবনমেন্টের সাহায্যার্থ দিল্লির চতুর্দিগে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং সিপাহি দেহ আহূতি পাইয়া ক্রমে ভয়ানকরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া শিখাচ্ছলে রসনা বিস্তার করিতেছেন, গৌরাঙ্গদিগের বিক্রমের কথা বর্ণনা করা যায় না, একেবারে বিপক্ষ বিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যমদণ্ড ধারণ করিয়াছে। দুরাত্মাদিগের আর পলায়ন করিবাব উপায় নাই, চারিদিগ রুদ্ধ হইয়াছে, সিংহগণ মেষপালে প্রবিষ্ট হইয়া মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে।

অযোধ্যা রাজ্যের রাজকার্যের প্রধানচার্য বহুদর্শী রণবিৎ স্যর জন লরেন্স সাহেব বিশাল বিক্রম ধারণপূর্বক অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহকারী সিপাহিদিগকে ভয়ঙ্কর গোলা ঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, শিকারির ভয়ে কুরঙ্গগণ যেমন নিভৃতারণ্য মধ্যে গোপন হয়, নরাধমেরা সেই প্রকার ইতস্তত গোপন হইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং শিকারিরা যে প্রকার অব্যর্থ অস্ত্র দ্বারা শাখাবদ্ধ হরিণ শিশুকে অনায়াসে বধ করে, পশ্চাদ্বর্তী গোরা সৈন্যেরা সেইরূপে তাহারদিগকে সংহার করিতেছে, স্যর লরেন্স সাহেব অনেক অবোধ সিপাহিকে বন্ধন করিয়া প্রতিদিবস তাহারদিগের দুই চারি ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়া অযোধ্যা রাজ্য মধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রবল পরাক্রম বিস্তার করিতেছেন। রাজধানীর আর কোন ভয় নাই, প্রজাকুল উদ্বেগশূন্য হইয়া আপনাপন ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রবল পরাক্রম যখন প্রচণ্ড মার্তণ্ড কিরণবৎ সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন তখন কোন স্থানেই দুরাচারীদিগের নিস্তার নাই, যে স্থানে তাহারা রাজ বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক সেই স্থানেই অহিতাচরণের সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক, গবর্মমেন্ট যখন ভুজবলে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন তখন ভুজবলেই তাহা রক্ষা করিবেন, তেজপূর্ণ ইংরাজ রাজপুরুষগণের সৈন্যসামন্ত যুদ্ধাস্ত্র কিছুরই অভাব নাই, তাহারা বুদ্ধিবলে বাষ্পীয়রথ এবং বাষ্পীয়তরী চালনা করিয়া দূরস্থ দেশকেও অতি নিকটস্থ করিয়াছেন, সমুদ্র পথ দিয়া গোরা সেনারা জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছে, দুরাত্মাদিগকে বিশেষরূপে দমনপূর্বক সমুচিত দণ্ড বিধান নিমিত্ত মাদ্রাজের সমরদক্ষ প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্রান্ট সাহেব "ফায়ার কুইন" নামক জাহাজারোহণে স্বয়ং রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বন্যপশু শিকার নিমিত্ত শিকারিগণ যেমন পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া গমন করে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেইরূপ পুলকিত চিত্তে সিপাহি শিকারে গমন

করিতেছে, নরাধম অকৃতজ্ঞদিগের আর রক্ষা নাই, ভুজঙ্গ সমক্ষে মহিলতা কতক্ষণ আলোড়িত হইবেক? খগেন্দ্র সমক্ষে ছিন্ন চঞ্চু বায়স কতক্ষণ আর্তনাদ করিবে? ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রভাকর তুল্য পরাক্রম সমক্ষে কি খদ্যোতের জ্যোতি উদ্দীপ্ত হইতে পারিবেক? অবোধেরা কি সাহসে রাজবিরুদ্ধাচরণে সাহসিক হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না, তাহারা কি পরক্রান্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অসীম পরাক্রম এবং ব্রিটিশ সেনা ও সেনানিগণের রণনৈপুণ্য চক্ষে সন্দর্শন করে নাই? অতএব জানিয়া শুনিয়া কেন অনলে ঝম্প প্রদান করিয়াছে। কুলোক কুচক্রিগণ কুহকমন্ত্রে অনেক পশুতুল্য সিপাহিকে রাজবিরুদ্ধাচরণের কুপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছে, ঐ দুষ্টান্তকরণগণ গবর্নমেন্টের প্রধান শত্রু, তন্মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক, সিপাহিরা অবোধ মূর্খ, সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনাশূন্য, সুতরাং তাহারা মিথ্যা প্রলোভে মুগ্ধ হইয়া বিপদজালে জড়িত হইবেক তাহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, অতএব ঐ কুপ্রবৃত্তি প্রদায়ক দুরাত্মারাই বর্তমান অনিষ্ট ঘটনার মূল কারণ হইয়াছে, গবর্নমেন্ট অনুসন্ধান দ্বারা স্থানে স্থানে ঐ দুষ্টদলের কয়েক ব্যক্তিকে ধৃত করত কারারুদ্ধ করিয়াছেন, যাহারা এ পর্যন্ত ধৃত হয় নাই, গোপনভাবে আপনারদিগের গর্হিত ব্যবসায় নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদিগের ধরা পড়িবার আর বড় কাল বিলম্ব নাই, কুচক্রীরা আপনাপন গুরুতর দোষের অবশ্য বিশেষ দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক, গবর্নমেন্ট তাহারদিগের হস্ত পদ বন্ধনপূর্বক তোপের সমক্ষে বসাইয়া গোলার আঘাতে উড়াইয়া দিবেন, তাহারদিগের দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় পড়িবেক তাহার কোন নিরূপণ থাকিবেক না, তাহারা রাজবিরুদ্ধাচরণ জন্য পরমেশ্বরেরও কোপে পড়িয়া নরকগামী হইবেক, যেহেতু তাহারদিগের কুমন্ত্রণা দোষেই বিদ্রোহ ব্যাপার ক্রমে এত বিস্তার হইয়াছে, তাহারাই অবোধ সেফাইদিগের প্রাণ বিনাশের মূল হইয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে অনেক যবন থাকাতে যবন প্রজাদিগের প্রতি গবর্নমেন্টের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহারা গোপনভাবে চরের কার্যে নিযুক্ত হইয়া স্বজাতীয় সকল লোকের বিপদকে আহ্বান করিয়াছে, দুরাত্মারা সামান্য লৌহশলাকা দ্বারা অনড় মেরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ করিবার বাসনা করিয়াছে, মূষিক দ্বারা সিংহ গর্ব খর্ব করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে, নষ্টদিগের যদ্যপি কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি থাকিত তবে এই অসংসাহসিক ব্যাপারে কেন প্রবৃত্ত হইবেক? যাহা হউক তাহারদিগকে ধৃত করণার্থ ষড়জাল বিস্তৃত হইয়াছে, গবর্নমেন্টের চরেরাও চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে, আর ধরা পড়িবার বড় বিলম্ব নাই।

...কাহার সাধ্য ব্রিটিশ রাজ্যেশ্বরদিগের সুবিস্তার অধিকারের প্রধান রাজধানী এই মহানগর মধ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিতে পারে। সিংহের গৃহ সমক্ষে কুক্কুরে গর্জন করিবে, মূষিকের দ্বারা পর্বত আলোড়িত হইবেক, ভেকে সমুদ্র শোষণ করিবেক, পঙ্গুব্যক্তি প্রবল জলধি উল্লঙ্ঘন করিবেক, এই সমস্ত অসম্ভাবিত কার্য যদ্যপি সম্ভবপর হয় তথাচ অবাধ্য সিপাহিদিগের দ্বারা এতদ্রাজধানী গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, নগরবাসিরা উপস্থিত সময়ে সতর্কভাবে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন করুন, আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, যদ্যপি কোন লোকে বুদ্ধির হীনতা প্রযুক্ত অনলে হস্ত নিক্ষেপপূর্বক মৃত্যু প্রার্থনা করে তবে তাহার অবশ্য প্রাণ বিনষ্ট হইবেক।

পরন্তু উপস্থিত বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্ত যাহা করা কর্তব্য আমারদিগের বর্তমান সুবিবেচক গবর্নর জেনরেল বাহাদুর তাহা করিতেছে, প্রথমত বারাকপুরে অবাধ্য সিপাহি সেনাদিগকে পদচ্যুত করিয়া দয়ার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা একেবারে সংহারমূর্তি

ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, অতএব এবার আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে লার্ড বাহাদুর দুরাত্মাদিগকে দমন করিয়া রাজ্যরক্ষা করত যশোভাজন হউন।

রাজ্যের বর্তমান অবস্থা (সম্পাদকীয়)। ১.১.১২৬৫

আমরা যে পর্যন্ত সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়াছি তদবধি এ কাল পর্যন্ত বাঙ্গলা ১২৬৪ সালের ন্যায় দুর্বৎসরের ব্যাপার কখনই বর্ণনা করি না। আমারদিগের বহুকাল পূর্বে যাঁহারা সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারাও কস্মিনকালে এতদ্রূপ ভীষণ ঘটনা রটনা করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি কোন দেশীয় কোন ইতিহাস লেখকের লেখনী হইতেও এবম্প্রকার মহা-অমঙ্গলময় বিষয় লিখিত হয় নাই। কেবল এই ভারত রাজ্য বলিয়া নহে, অবণী মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যত রাজ্য আছে তাহার কোন রাজ্যে এরূপ অনিষ্ট ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কেহই দর্শাইতে পারিবেন না। যখন যে দিকে যে বিষয়ে দৃষ্টি করা যায় তখন সেই দিকে সেই বিষয়েই অমঙ্গল দেখিতে পাই। কুত্রাপি কাহারো নিকট কোন বিষয়েরই সুখের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না।

আমরা কিছুর মধ্যে কিছু নহি, অথচ সংবাদপত্রের "সম্পাদক" নাম ধারণ করিয়া সকল বিষয়েরি সকল হইয়াছি,—আমরা রাজা নহি, অথচ রাজ্যের অমঙ্গলে যেন অগ্রেই আমাদিগের সর্বনাশ হয়, এবং রাজ্যের মঙ্গলে যেন আগেভাগেই আমরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া থাকি।...কোন কোন বিষয়ে আমরা প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতে আমরা ক্রটি করি না। স্বজাতীয় ধর্মের উন্নতি ও হানিতে, স্বদেশীয় লোকের সুখ সৌভাগ্যে এবং দুঃখে আমরা উভয় পক্ষেই...সমান অংশ সম্ভোগ করিয়া থাকি। আমাদিগ্যে রাজাপ্রজা উভয় পক্ষের সহিত সমান সংযোগ রাখিতে হয়, বরং প্রজাপক্ষে অধিকতর সুদৃষ্টি রাখাই সম্পাদকীয় ধর্মের প্রধান অভিপ্রায় হইয়াছে।

যতপ্রকার বিদ্রোহ আছে তাহার মধ্যে রাজ বিদ্রোহই অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষত সৈন্য বিদ্রোহ যাহারা রক্ষক তাহারাই নাশক হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি আছে?

কি পরিতাপ! জগদীশ্বর কেন এমন করিলেন? যে সকল সিপাহি সৈন্য চিরকাল বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহারা হঠাৎ কেনই দুর্বুদ্ধি দোষে এতদ্রূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল? তাহারদিগের পূর্বেকার কৃতজ্ঞতা-সূচক প্রভুভক্তি সাধারণ ব্যাপার নহে। ঐ সৈন্যরা ব্রিটিশ শক্তির অধীন হইয়া এই ভারতভূমিতে অস্ত্রধারণপূর্বক বিপক্ষ বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজাজ্ঞায় অনায়াসেই তৎক্ষণাৎ কেহ আপন ভ্রাতার, কেহ আপন পিতার, কেহ আপন পুত্রের, কেহ কেহ আপন জ্ঞাতির মস্তক ছেদন করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র দয়ামায়া প্রকাশ করে নাই...সেই প্রভুভক্ত সেনারাই আবার প্রভু-বিনাশে অস্ত্র ধরিয়াছে। ইহা তাহারদিগের মতিচ্ছন্ন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পরন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তি এতদিন কল্পতরুতুল্য ব্রিটিশরাজের কৃপাছায়ার আশ্রিত হইয়া স্বচ্ছন্দে সমূহ সম্মান সহযোগে সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারাই আবার বিপক্ষ হইয়া বিষমতর বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছেন, লোক কথায় কহে, "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়", ইহারদিগের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে।....শৃগালের শব্দে সিংহকে ভীত করা.... যেমন কখনই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ হীনবল অবোধ বিদ্রোহীদলের বলের দ্বারা বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশ বিক্রমকে খর্ব করা কোনমতেই বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে না।

হে দেশস্থ সমস্ত সাধুগণ! আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন, ঐ দুর্জন জনগণকে তর্জন গর্জন বিসর্জন করিয়া, নির্জন নিকেতন গমন করিতে হইবেই হইবে। যিনি মাথায় উপরে অতি উচ্চে বিরাজ করিতেছেন, তিনি স্ত্রী হত্যা, শিশু হত্যা, প্রভু হত্যা, নির্দোষী জন হত্যা ঐ সকল হত্যার পাপ কস্মিনকালেও সহ্য করিবেন না, উচিত প্রতিফল দিবেনই দিবেন, কিন্তু ঐ সমুদয় প্রতিকূল শত্রুকুল সমূলে নির্মূল করিয়া জয়লাভে যে পরিমাণে সুখলাভ হইবে তাহা দুঃখ পরিমাণের অপেক্ষা অত্যন্ততই লঘু, কেননা যে সকল ইংরেজের বালক, বালিকা, গুণবতী স্ত্রীলোক, যোদ্ধা, বোদ্ধা বীরবর রণপণ্ডিত শিল্পনিপুণ সেনাপতি ও সর্বগুণান্বিত সুবিচারক সিবিল সাহেব হত হইয়াছেন তাঁহারদিগ্যে আর প্রাপ্ত হইবে না।...

কতকগুলিন ইংরাজ ও ইংরাজ সম্পাদক অকারণে রাগান্ধ হইয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের প্রতি গবর্নমেন্টের পূর্ববৎ স্নেহভাব প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন, তাঁহারদিগের মতে এতদ্দেশীয় যাবতীয় লোক একেবারে সমান দোষী হইয়াছেন, তাবতেই সম্মানসূচক রাজকার্যে নিয়োজিত হইবার অযোগ্য হইয়াছেন, তাবতের প্রতি সমভাবে খড়্গহস্ত হইয়া না থাকিলে ভারতবর্ষে আর ব্রিটিশ রাজ্য যেন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। হা, কি বিষম আক্রোশ! কি বিপুল দ্বেষ! কি স্বার্থপরতা! সাদা সম্পাদক দাদাভায়ারা সাদা মনে কাদা মাখিয়া যেরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ যুক্তিহীন উক্তি উক্ত করিতেছেন, করুন, কিন্তু আমারদিগের সদ্বিবেচক দয়ালু গবর্নমেন্ট কোন কার্যেই পূর্বভাবের অভাব করিয়া এতদ্রূপ ভাব ব্যক্ত করেন না।...ইহাতেই আমরা গবর্নমেন্ট সমীপে কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার প্রদান করিতেছি, অনুকম্পাপূর্বক এই উপহার গ্রহণ করিবেন। কি এখানকার গবর্নমেন্ট কি বিলাতেব মহারানি ও মন্ত্রিগণ সকলেই আমারদিগ্যে যথার্থ রাজভক্ত প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন...শ্বেত সম্পাদকেরা অতি বিবেচনাপূর্বক কার্য সম্পাদন করুন সাবধান হইয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করুন ইহাই প্রার্থনা।

সম্পাদকীয়। ২৪.৮.১২৬৫

এমত জনরব হইয়াছে, সিবিল-আডিটর মেং পামর সাহেব অতি শীঘ্রই স্বীয় কর্ম পরিত্যাগপূর্বক বিশ্রাম-করণার্থ বিলাতে গমন করিবেন, তিনি অবসৃত হইলে তাঁহার সহকারী কর্মচারী বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া মাসিক ১৫০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

জগদীশ্বরের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, এই সংবাদটি সম্পূর্ণরূপেই সত্য হউক, আমারদিগের নবীন গবর্নমেন্ট এতদ্রূপ অপক্ষপাতী নিয়োগ দ্বারা যথার্থরূপে রাজধর্ম প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়। রাজার নিকট সর্বসাধারণ প্রজামাত্রেই সমান, ইহাতে দেশ, বর্ণ, ধর্ম ও জাতি প্রভৃতির প্রভেদ রাখা কখনই উচিত হয় না, রাজা সকলের প্রতি সমান প্রীতি রাখিয়া সমান-নেত্রে দৃষ্টি কবিবেন, সাদা ও কালো বলিয়া কিছুমাত্রই ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবেন না, রাজা জগদীশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ ভাণ্ডারী, দয়াময় ঈশ্বর যেমন সর্বজীবে সমান দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূপালকে সমস্ত প্রজার প্রতি সমান স্নেহ বিতরণ করিতে হইবেক, ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনাধিক্য হইলেই রাজধর্মে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আমরা ভারতবর্ষবাসী রাজহিতাভিলাষী নিতান্ত রাজানুগত প্রজা, নিরন্তর কেবল রাজার মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়া থাকি, অস্মদাদির ন্যায় রাজভক্ত অনুরক্ত নির্বিরোধী প্রজা আর কুত্রাপিই নাই, আমরা

ভিন্নধর্মাবলম্বী একদেশীয় ভিন্নজাতীয় প্রজা হইয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিন্নজাতীয় ভিন্নদেশীয় রাজপুরুষদিগের সহিত আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা সহকারে যদ্রূপ আনুগত্য ও সকল সাধুব্যবহার করি, কোনো স্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্মাবলম্বী প্রজারা, বোধ করি, স্বজাতীয় স্বদেশীয় স্বধর্মাবলম্বী রাজার সহিত কখনই তদ্রূপ সদ্ব্যবহার করেন না। একশতবর্ষ গত হইল, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষে প্রচুর প্রভুত্ব প্রচার করিয়া ক্রমশই উন্নত হইয়া আসিতেছেন। এই শতবর্ষের মধ্যে কত বর্ষে কত প্রকার ব্যাপার হইয়াছে তাহার বিস্তার বর্ণনা কি করিব? কিন্তু ঐ শতবর্ষের ভিতরে এই প্রকাণ্ড বর্ষে গত বর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভয়ানক কাণ্ড আর কখনই সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, যে, এতদ্রূপ বিষমতর বিদ্রোহ বিধায়ক বিলাপ-বিঘটিত বিষাদ-বিশিষ্ট বিপদের ব্যাপারে এক ব্যক্তিও বাঙালি বিযুক্ত হয় নাই এবং বিদ্রোহী দলভুক্ত হিন্দুর সংখ্যাও অতি অল্প। নানাসাহেবের বিষয়ে নানালোকেই নানা প্রকার কথা কহেন। চোরাগেয়ের সহিত "কপিলা" বন্ধনের ন্যায় পাকে প্রকারে কাহারো কাহারো দারুণ-দশা ঘটিয়াছে। যবনজাতির কথা আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু পবনপ্রতাপী যবনের মধ্যে অনেককেও লবণের প্রিয় দেখা যাইতেছে। লক্ষ্ণৌরাজ্যের প্রধানেরা কেহ কেহ রাজবিরোধী হইয়াছেন, কিন্তু তাহার উপযুক্তরূপ প্রতিফলও পাইয়াছেন, এবং পাইতেছেন, যিনি যিনি পাপ করিয়াছেন, তিনি তিনিই তাপভোগ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে পক্ষে পাপ, সেই পক্ষেই তাপ। সকলের মস্তকের উপর সর্বোপরি যে মহাশয় বিচারের "নিক্তি" ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন, তিনি "তন্ন তন্ন" করিয়া পাপ পুণ্য ওজন করিতে ক্রটি করেন না, তাঁহার শাসনের আসন নিরপেক্ষ, তিনি স্বয়ং সর্বসাক্ষী, সাক্ষীর অপেক্ষা মাত্র না করিয়া প্রতিনিয়তই পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিতেছেন। যাহা হউক, প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না. হিন্দু, বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাঙালি জাতিরা একান্ত প্রভুভক্ত, এ বিষয়টি সপ্রমাণ করণের কিছুমাত্রই অপেক্ষা করে না, সর্বসাধারণ দূরে থাকুক রাজপুরুষদিগ্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হবেই হবে। শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিশ্বমাতা ভিক্টোরিয়া, বিলাতের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ, ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরেল লর্ড কেনিং বাহাদুর এবং অপরাপর রাজপুরুষ মহোদয়েরা একথা বারম্বার শ্লাঘাপূর্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব, প্রকৃত রাজভক্ত কৃতজ্ঞ, নাম ধারণ-করণের অপেক্ষা আমারদিগের অধিক সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে?

আমরা প্রজা হইয়া প্রজাবৎসল গবর্নমেন্টের সহিত যদ্রূপ বিশিষ্ট ব্যবহার করি, এ পর্যন্ত তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই নাই, এজন্য অন্তঃকরণে আক্ষেপ আছেই আছে, এইক্ষণে শ্রীশ্রীমতি ইংলন্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণপূর্বক এই রাজ্যের রাজকার্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করাতে আমরা সুখ সম্পদ সম্ভোগ বিষয়ে ভরসার উপর ভর করিতেছি, কারণ শ্রীশ্রীমতি শ্রীমুখে অঙ্গীকারপূর্বক শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন, যে, "রাজকর্মে নিয়োগ বিষয়ে পাত্র ভেদ রাখা যাইবে না, অর্থাৎ সর্বধর্মাবলম্বী সর্বজাতীয় ব্যক্তিকে সমভাবে দৃষ্টি করিয়া সমান পদ প্রদান করা যাইবেক" যখন জননী স্বয়ং এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমরা আর কিছুমাত্রই ভাবনা করি না, অবশ্যই অচিরাৎ আশানুরূপ ফল পাইয়া কৃতকার্য হইব, তবে না হয়, নিতান্তই অদৃষ্টের দোষ কহিতে হইবে, এবং চিরকাল সমানরূপেই ক্ষোভের অনলে দগ্ধ হইতে থাকিব।

এই স্থলে পাঠকগণ, এক আশ্চর্য দর্শন করুন। যাহার যে স্বভাব, তাহার অভাব কখনই হয় না। দ্বেষপরবশ জনের মনের গতি অতি কুটিল, কখনই সকল সুপথে গমন করে না, অহিংসা-পরমধর্ম এবং সমদর্শিতা নামক পরমগুণ কখনই তাহার মনকে স্পর্শ করিতে পারে না, বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভবিষ্যতে মেং পামর সাহেবের পদ প্রাপ্ত হইবেন, এই সংবাদে হরকরা সম্পাদকের মনের ভিতরটা চড় চড় করিয়া উঠিয়াছে, বিজাতীয় হিংসাপরবশ হইয়া লিখিয়াছেন, ''এতদ্দেশীয় বাঙালিকে উচ্চপদ প্রদান করা উচিত হয় না, তাহারা তৎপদের যোগ্য পাত্র নহে ইত্যাদি।"

কি গো! সাদারঙের হরকরা দাদা। বড়, যে, রঙের কথা কহিয়া সঙের মত সাদা মনে কাদা মাখিয়াছ? আমারদিগের বাহিরে কালো মিশ মিশ বটে, কিন্তু ভিতরে রাঙা টুক টুক আছে, তুমি হরকরার মত নেকরা ফাঁদিয়া ঠুক্ ঠুক্ শব্দ যত করিতে পার, কর, তাহাতে আমারদিগের মনে ধুক পুক নাই। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি বিশ্বকর্তার বিশ্বরাজ্যের প্রজা নই? তাঁহার সন্তানই নই? তিনি কি অস্মদাদিকে মনুষ্যত্ব ও মানসিক ক্ষমতা কিছু মাত্রই প্রদান করেন নাই? দেশ, ধর্ম, বর্ণ ও পাত্র ভেদ পূর্বক কেবল তোমাদিগ্যেই ঐ সমস্ত গুণ ''একচেটিয়া" করিয়া দিয়াছেন? আমরা ''নেটিব" মনুষ্যই নই? আমাদের ক্ষমতাই নাই? আহা! ধর্মস্বরূপ সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়া এই প্রাচীনাবস্থায় এইরূপ অন্যায় উক্তি উক্ত করিতে একবারো কি মনের মধ্যে লজ্জার উদয় হয় না? পক্ষের লেখনী ধারণ করিয়া শুদ্ধ এপক্ষে পক্ষপাত করিতেই শিখিয়াছ? সত্য, ধর্ম ও ন্যায় প্রচার করা এ পর্যন্তই শিক্ষা করা হইল না? চমৎকার, চমৎকার! যাহা হউক, সেলাম, সাইব, সেলাম, তুমিই কেবল একাকী ধার্মিক খ্রিস্টানের ন্যায় ধর্মাচরণ করিতেছ। ধন্য ধন্য! তোমার অভিপ্রায় সাধু অভিপ্রায় বটে, আমরা এই ভারতবর্ষরূপা ''কাম-ধেনুব" বৎস স্বরূপ, আমারদিগকে দুগ্ধ দানে বঞ্চিত করিয়া তদ্দ্বারা হস্তীর মস্তি বৃদ্ধি করা তোমার মতেই সুযুক্তি বটে। নাম ''হরকরা" ব্যবহার ও কার্য তাহার মতই বটে। ও মহাশয়! আপনি এদেশের মানুষ সকলকে মানুষ বলিয়াই লক্ষ করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশীয় উচ্চপদস্থ জনেরা যদ্রূপ সুপ্রণালীক্রমে সুরাগ সহকারে আপনাপন ভারার্পিত রাজকার্য সকল সুনির্বাহ করিতেছেন, আপনারদিগের ''কটা বর্ণের" কটা মানুষ সেরূপ কৃতকার্য হইয়া থাকেন। তুমি সকলের অপেক্ষায় বৃদ্ধ, অতএব সকল সম্পাদকেরি বড় ভাই. অতএব বড়র মত কর্ম করিয়া বড় হও। সাদা কালো প্রভেদ নাই, উভয়েরি মধ্যে ভাল মন্দ মধ্যম আছে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ১৫.১১.১২৬৫/২৬.২.১৮৫৯

যে বিদ্রোহ বহ্নি এই রাজধানীর অতি নিকটস্থ বারাকপুরে প্রথমত উদ্দীপ্ত হইয়া একেবারে উত্তর পশ্চিম রাজ্যের বহুদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যাহার ভীষণ গর্জনে অবনীস্থ সমস্ত লোকে একেবারে তটস্থ হইয়াছিল, যাহার হৃদয় বিদীর্ণকর ঘটনার তুল্য ঘটনা কোনো কালে কোনো দেশে হয় নাই, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এতদিনের পর সেই বিদ্রোহানল শীতল হইল, যেমন পঙ্গপাল মরণ সময়ে উড্ডীয়মান হইয়া দিবাকরের নির্মল রশ্মিকে আচ্ছন্ন করে সেই প্রকার অবোধ অবাধ্য সিপাহিগণ এবং তাহারদিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিম রাজ্যের বহু মূর্খ লোকে একেবারে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া প্রভাকর তুল্য তেজপুর ব্রিটিশ পরাক্রমকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ফলত ঐ পতঙ্গরাশি সেই সূর্যকরে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক যেমন ভূমিতলে পতিত হয়, অবোধেরা সেই প্রকার ব্রিটিশ পরাক্রমের ভয়ঙ্কর প্রতাপে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, দুরাত্মারা দুর্লঙ্ঘ্য ব্রিটিশশক্তি

অপহ্নব করিয়া এই রাজ্যমধ্যে প্রভুত্ব স্থাপনের যে দুরাশাগ্রস্ত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহার উচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইল, মণ্ডুকের কি সাধ্য যে শোষণ দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারে, বামনের কি সাধ্য যে হস্ত প্রসারণ পূর্বক গগনস্থ চন্দ্রকে ধারণ করে, আমরা যে সকল অসম্ভাবিত অভূতপূর্বক উদাহরণ উত্থাপন করিলাম যদিও কোনোকালে ইহা সম্ভাবিত হয়, তথাচ সিপাহিরা নানার তুল্য অজ্ঞান ও মূর্খ লোকদিগের ষড়যন্ত্র দ্বারা কোনোক্রমেই ব্রিটিশ-পরাক্রমের হানি সম্ভাবনা হইতে পারে না।

পরন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ বিদ্রোহিতাচরণের ভয়ানক সংকল্পে তাহারা এককালে যে প্রকার বহুলোকের একাগ্রতা নিবন্ধন করিয়াছিল, তাহারদিগের ঐ অভিসন্ধি কিরূপ হইয়াছিল এ পর্যন্ত যখন তাহা প্রকাশ নাই; তখন তাহারদিগের নিপুণতা ও চতুরতার আধিক্য স্বীকার করিতে হইবেক, সেনাদিগের মনে মনে বিদ্রোহাচরণের প্রতিজ্ঞা পরিবর্ধিত হইয়া তৃণ সংলগ্ন অনলের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তাহা প্রবল হইতেছে, অথচ তদধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহা জানিতে পারেন নাই, সেই বহ্নি উজ্জ্বল হইয়া যখন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন জানিয়াছেন এবং তাহার ভয়ানক গ্রাসে পতিত হইয়া অনেকেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতএব এই ব্যাপারে কোনোমতেই সামান্যরূপে গণ্য হইতে পারে না ইহার তুলনা স্থল এই অবনীমণ্ডলে অতি বিরল।

আমরা এই...বলিয়া স্বীকার করি, ভৃত্যগণ...মধ্যে প্রভুর বিনাশ জন্য পরামর্শ করে তাহাতে তাহারা অনায়াসেই কৃতকার্য হইতে পারে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসপূর্বক অস্ত্র দিয়া যাহারদিগকে ধনাগার অস্ত্রাগার প্রভৃতি সকল সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহারা যদ্যপি অবাধ্য হইয়া তাহা অহরণ করে ও তাহার রক্ষকের প্রাণ নাশ করে, তবে কে রক্ষা করিতে পারে? বিশেষত সিপাহি সেনারা যে ভয়ানক অভিসন্ধি করিয়াছিল তাহা একদিনে হয় নাই, এবং তাহারদিগের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস জন্য সেনাপতি সাহেবেরাও তদ্বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই, অতএব তাহাতে যদিও তাহারদিগের কিঞ্চিৎ চতুরতা প্রচার হইয়া থাকে তাহা সামান্য বলিতে হইবেক।

নানা প্রভৃতি দুরাচারীদিগের নির্দয়াদেশে কানপুর, দিল্লি, ফতেগড়, ঝাঁসি প্রভৃতি স্থানে যে সকল চিত্তভেদকর নিষ্ঠুর কাণ্ড হইয়াছে, তাহা কোনমতে মনুষ্যের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে না, তাহার বিবরণ সমাচার পত্রে পাঠ করিতে আমারদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, তখন দুরাত্মারা হস্তেয় দ্বারা তাহা সম্পাদন এবং চক্ষের দ্বারা তাহা কি প্রকারে দর্শন করিয়াছে, অতএব ঐ নিষ্ঠুর নরাধমদিগের আবার সাহায্যের প্রশংসা কি? বিশেষত তাহারা অসংখ্য লোকে একত্র হইয়া কোনো অংশে কৃতকার্য হইতেছে? কোন স্থানেই তাহারা ব্রিটিশ সেনাদলের সম্মুখে অধিককাল দণ্ডায়মান হইতে পারে, যদিও বহুদল একত্র কোনো কোনো স্থানে সামান্য দল ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছে বটে কিন্তু তাহারও দৃষ্টান্ত অধিক নাই।

আমরা এইস্থলে এই বিষয় আর অধিক আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি না, এইক্ষণে ইতিহাস লেখকেরা পূর্ব বিবরণ সকল বাহুল্যরূপে লিখিবেন এবং যে যে বিষয় সকল এপর্যন্ত অপ্রকাশ্য আছে, তাঁহারা বিশেষানুসন্ধান পূর্বক তাহা প্রকাশ করিয়া অনেকের অনেক সন্দেহ নিবারণ করিবেন, সিপাহিদিগের এই বিদ্রোহাচরণের মূল কারণই এ পর্যন্ত অব্যক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা যত ব্যক্ত হইবে ততই ব্রিটিশ পরাক্রমের নির্মল-জ্যোতি প্রকাশ হইতে থাকিবেক।

সম্বাদ ভাস্কর

সম্পাদক : শ্রীনাথ রায়, প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

নিম্নলিখিত সম্বাদসকল গবর্নমেন্ট দিয়াছেন

রেওয়ার মহারাজ ব্রিটিশ সাহায্যার্থে দুই তোপ ও দুইশত বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন ঐ সৈন্যেরা মেজাপুর ও রেওয়ার মধ্যবর্ত্তী বিদ্রোহিদিগের দণ্ড করিবে।

বিদ্রোহি ভয়ে যে সকল প্রজা কাশী ত্যাগ করিয়া জৈনপুরে গিয়াছিল ব্রিটিশ সৈন্যেরা পুনরায় তাহাদিগকে যথাস্থানে আনয়ন করিয়াছে।

অযোধ্যার অন্তঃপাতি সুলতানপুর স্থানে যে সকল রেজিমেন্ট সৈন্য ছিল তাহারা দিল্লি পথে কুচ করিয়াছে।

ফতেপুরীয় যে সকল রাজকীয় লোক পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে বান্দায় পঁহুছিয়াছেন।

আজিমগড়ের ইউরোপি মনুষ্যদিগকে আনয়নার্থ একদল রাজ সৈন্য তথায় গিযাছে। মেজাপুর নিস্তব্ধে আছে কোন গোলযোগ নাই।

নয়াগ্রামে যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহা রাজ্যেশ্বর ঘটিত নয়, হিন্দু সিপাহিদিগের সহিত জবনবাহিনীদিগের বিবাদে ঐ গোল হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা নিবৃত্তি হইয়াছে, নাগোডের পোলিটিকেল আসিস্টান্ট সাহেব উক্ত সৈন্যদিগকে সমর সজ্জার আদেশ কবিয়াছেন।

ঝাঁসিতে আর কোন গোলযোগ নাই, স্থানীয় ইংরাজেরা নির্ব্বিঘ্নে দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, আক্ষেপের বিষয় এই যে বিদ্রোহিতাকালে কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৮ জুন পর্যন্ত আগ্রা ও হেত্রাস নগর নির্ভয়ে ছিল, আলীগড়ে ৬ জুন পর্যন্ত কোন গোলযোগ হয় নাই।

যে সকল প্রজা ইচ্ছাপূর্বক আগ্রা নগরীয় সৈন্যশ্রেণীতে নাম লেখাইয়াছে তাহারা ক্রমে ২ আলীগড়ের রাজসৈন্যেদিগের সহিত মিলিতেছে ত্বরায় বিদ্রোহি মর্দনে অগ্রসর হইবে।

দানাপুর ও পাটনার যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে বিদিত হইল উক্তস্থানদ্বয় নির্ব্বিঘ্নে আছে।

১৬ জুন দিবসে কলিকাতা পোলিস ও মেডিকেল কালেজের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা গিয়াছে, তাহারা এইক্ষণে বিনা অস্ত্রে পাহারা দিতেছে, দ্বিতীয় অনুজ্ঞা পর্যন্ত এইভাবেই থাকিবে।

সেচ্ছুক স্বৈন্য

আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা ও তদিতস্তত স্থানবাসী তিন শত মনুষ্য স্বেচ্ছাপূর্বক সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়াছেন, টোন মেজর সাহেবের পুস্তকে তাঁহারদিগের নাম লেখা হইয়াছে, এই তিন শত ব্যক্তি রীতিমত যুদ্ধশিক্ষা করিতেছেন।

অযোধ্যা রাজের তিনজন মন্ত্রীও আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারদিগের নিকট বিদ্রোহিতাঘটিত পত্র ছিল।

গাজীপুর

উক্ত স্থলে জনরব হইয়াছে স্থানস্থিত ৬৫ সংখ্যক সৈন্যদলকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে কিন্তু এ সম্বাদ অলীক, উক্ত সিপাহিরা বিশেষ বিশ্বাসিত্ব রূপে রাজকার্য্য করিতেছে। গাজীপুরের চতুস্পার্শবর্তী বিদ্রোহি হইয়াছে।

চুণার

উক্ত স্থানীয় পত্রে জ্ঞাতা করে ন্যূনাধিক সহস্র ইংরাজ দুর্গ মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছেন, মেজাপুরেব সিবিল ও মিলেটরিরা জাহাজযোগে চুণারে পঁহুছিয়াছেন।

গবর্নমেন্টের মনোযোগ যোগ্য

কলিকাতা নগরে এইক্ষণে অস্ত্র বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রতিদিন অসংখ্য অস্ত্র বিক্রয় হইতেছে, সিপাহিরাও সে সকল কিনিতে পারে অতএব এ বিষয়ে রাজপক্ষের বিবেচনা আবশ্যক, এইক্ষণে অস্ত্র বিক্রয়ের যে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ইহাতে আমরা সন্দিগ্ধ হইয়াছি গবর্নমেন্ট ইহা বিবেচনা করিবেন, শুদ্ধ আমরাই সন্দিগ্ধ হইয়াছি এমত নহে। বিজ্ঞবর হরকরা সম্পাদক মহাশয়ও ১৮ জুন দিবসীয় পত্রে সংশয় জানাইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম দেশীয় কোন পত্রে জ্ঞাতা করে বিদ্রোহি সিপাহিরা খোট্টা জাতির প্রতি কোন অত্যাচার করে না, বাঙালি প্রভৃতি অপর জাতি দেখিতে পাইলেই তাহাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করে, কয়েকজন বাঙ্গালি কোন গতিকে বিদ্রোহি হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, দুষ্টেরা দর্শনমাত্রই দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইল এবং প্রত্যেকের গলায় এক ২ কাষ্ঠ চাকতী (অর্থাৎ পাশ) বান্ধিয়া দিল ঐ কাষ্ঠ মধ্যে "কর দিয়া" এই কথাটি লিখিত আছে, তাহারা হিন্দুদিগকে আঘাত করে না, শুদ্ধ দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়, খোট্টা দেখিলে কিছুই বলে না।—*১৮৫৭ জুন ২০*

সম্পাদকীয়

আমরা সর্বসাধারণ লোক সকলকে নিঃসন্দেহে বলিতেছি তাঁহারা ব্যস্ত হইবেন না সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া অগ্রে ঝাঁপ দিলেই মৃত্যু হয়, সুস্থিরভাবে নৌকায় থাকিলে প্রায় রক্ষা পায়, এই স্থলে একটা দৃষ্টান্ত বলিয়া যাই, গত শনিবার শালিকার ঘাটের বাষ্পীয় নৌকায় বহু লোক আরোহণ করিয়াছিল তাহাতে ঐ নৌকার প্রায় কানায় ২ সমান হইয়া উঠিল ইহা দেখিয়া কতকগুলিন আরোহী মনে করিল বাষ্পীয় তরী ডুবিয়া যাইবে, এই ভয়ে কয়েকজন পুরুষ এবং দুই স্ত্রীলোক গঙ্গামধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, যেমন পতন অমনি মরণ, তাহারা একেবারে ডুবিয়া গেল কিন্তু বাষ্পীয় তরী এপারে আসিয়া অন্যান্য আরোহিগণকে উঠাইয়া দিল ঐ সকল নির্বুদ্ধি লোকেরা যদি ঝাঁপ দিয়া না পড়িত তবে বাঁচিত, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট যে প্রকার অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তদুপযুক্ত রক্ষক রাখেন নাই যাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস করিয়া রক্ষাভার সমর্পণ করেন তাহারাই বিশ্বাসঘাতক হইয়া বিদ্রোহারম্ভ করিয়াছে, ইহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আপাতত ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বিদ্রোহিগণকে নিপাত করিয়া সুস্থির হইবেন, কলিকাতা রক্ষার্থ চতুর্দিগে গোরা স্থাপন করিয়াছেন, অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া চানকীয় সিপাহিগণকে গোরা ঘেরায় রাখিয়াছেন তাহারা আর মস্তক উঠাইতে পারিবেক না, হিন্দু মোসলমানাদি ভৃত্যগণের কোন পরাক্রম

রাখেন নাই, থানায় ২ গোরা নিযুক্ত করিয়াছেন প্রতি রাত্রে গৌর সৈন্যেরা যুদ্ধবাদ্য সহিত নগর ভ্রমণ করে এবং নগরবাসী প্রধানেরাও রণসজ্জায় রহিয়াছেন, কলিকাতাবাসীদিগের শঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, বাহিরে নানা স্থানে সিপাহিরা প্রথম ২ যেমন সাহসিক হইয়া উঠিয়াছিল এইক্ষণে তেমনি পদানত হইয়া আসিতেছে, সিপাহিদিগের উৎপাতারম্ভাবধি এ পর্যন্ত ব্রিটিশ জাতিরা অসংখ্য সিপাহিকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ফাঁসি দিয়াছেন, অযোধ্যা রাজ্যে অনেক সিপাহির ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, এইক্ষণে অযোধ্যা সুস্থির হইয়াছে আর কোন গোল নাই, কানপুর, আগ্রা ইত্যাদি স্থানে সিপাহিরা ঘোর সমর দেখাইয়াছিল তাহারদিগের অনেকের মস্তক উড়িয়া গিয়াছে আর সে ভাব নাই, কাশী চুণার ইত্যাদি স্থানেও গোরা সৈন্যেরা সমস্ত রক্ষা করিতেছে, বিশেষত কাশীস্থ শিক সৈন্যগণ অত্যন্ত বিশ্বাসিত্ব রূপে রাজভক্তি দেখাইতেছে, তাহারাই আজ ধনাগার হইতে কয়েক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া ইউরোপীয় বারিকে রাখিয়া গিয়াছিল তাহাতে সেনাপতি সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে দশ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন, গবর্নমেন্ট দুই সপ্তাহের মধ্যেই বিদ্রোহস্থানে ন্যূনাধিক দশ সহস্র গোরা প্রেরণ করিয়াছেন, সিন্ধিয়া, পাতিয়ালা ইত্যাদি স্থানীয় মহারাজেরা ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য পাঠাইয়াছেন, তাহারা ভিন্ন ২ রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকল বিদ্রোহীস্থলে গমন করিয়াছে, লাহোরে কোন উৎপাত নাই, অম্বলা, ফিরোজপুরাদি প্রধান ২ স্থান সকল গোরা সৈন্যেরা রক্ষা করিতেছে এই সকল স্থান মধ্যে সর্বত্র বিদ্রোহিদিগের শিরঃকর্তন হইতেছে, গবর্নমেন্ট প্রায় সকল হিন্দু, মোসলমান সিপাহিদিগের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রিটিশাধিকৃত প্রায় সর্বস্থল সুস্থির হইয়াছে, যে সকল সিপাহিরা দিল্লি দুর্গ লইয়াছিল এবং দিল্লির বাহিরে নানাস্থলে মোর্চা করিয়াছে আর গড়খাই কাটাইয়াছে, এইক্ষণে তাহারদিগের সাপে ছুঁচা ধরা হইয়াছে, সর্পের ছুচন্দরী ধরিলে যেমন ছাড়িতে বা রাখিতে পারে না তাহারদিগের সেইরূপ হইয়াছে, বৃদ্ধ বাদশাহ সিপাহিদিগের পরামর্শে ছিলেন কি না আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না কিন্তু সংসর্গ দোষে চিন্তাবশ হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমারদিগের নবীন প্রধান সেনাপতি মহাশয় দিন ২ সৈন্যবলে পুষ্ট হইতেছেন এবং এমত আয়োজনে করিতেছেন একেবারে দিল্লি বেষ্টন করিয়া বিদ্রোহিদিগের মধ্যস্থলে ফেলিবেন, তৎপরে তাহারদিগের মস্তক লইয়া দেহ সকল শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষণে দিবেন, শৃগাল কুক্কুরাদি মাংসাশী পশুগণ ও শকুনাদি পক্ষী সকল বহুকাল নরমাংস ভোজন করে নাই, মুদকী ও সোবরণাদি সমরে লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব অসংখ্য নরহত্যা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে সকল নরশরীর শতদ্রু নদে ডুবিয়া গিয়াছিল, রক্তমাংস প্রত্যাশী পশুপক্ষীরা একখণ্ড মাংস কি এক বিন্দু রক্তও পায় নাই, এই সময়ে একটা প্রস্তাব স্মরণ হইল পাঠকবর্গের আমোদ জন্য তাহাও লিখিয়া যাই।

মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব মহাশয় বন ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন আগমনকালে এক বৃক্ষমূলে অবস্থান করিলেন শকুনেরা চঞ্চু দ্বারা সেই বৃক্ষমূলে আঘাত করিতেছিল, ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি কারণ বৃক্ষমূলে চঞ্চুক্ষেপ করিতেছ?" তাহারা কহিল "আর আমারদিগের বংশবৃদ্ধি হয় না, আমরা রক্তপানে প্রাণ ধারণ করি সন্তানাদি জন্মিয়া রক্তপান করিতে পায় না, আহারাভাবেই মরিয়া যায়, দেবী যুদ্ধ সময়ে আমরা এই বৃক্ষের উপরিভাগে ছিলাম, আকাশদৃষ্টে চঞ্চু ব্যাদান অর্থাৎ 'হাঁ' করিয়া থাকিতাম, আকাশ হইতে এত রক্ত আসিয়া মুখে পড়িত তাহা উদরে ধরিত না, সে সময়ে আমারদিগের বংশ বিস্তার

হইয়াছিল রামরাবণীয় সমরকালে এই বৃক্ষের মধ্যস্থলে বসিয়াছিলাম তাহাতেও আহারযোগ্য রক্ত মাংস পাইতাম, কুরুপাণ্ডবীয় সমর সময় উপস্থিত হইয়াছে উপরে থাকিয়ে রক্তমাংস দেখিতে পাই না এই কারণ মহাবৃক্ষের মূলস্থলে আসিয়া চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিতেছি, রক্ত মাংসের গন্ধও পাইতেছি না", ইহাতে ভীম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইংরাজেরা যখন ভারতবর্ষ প্রবেশ করেন তখন ঘোর সমর হয় নাই, মৈত্রী ভাবেই দিল্লি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপরে প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছেন ইহার মধ্যে রক্ত মাংস ভোজী পশু পক্ষিগণকে তৃপ্তিভোজ দেন নাই তবে তাহারা কি খায়, কি আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে? মোসলমান রাজারা মৃতদেহ সকল মৃত্তিকার নিচে পুঁতিয়া রাখিতেন পশুপক্ষীরা দেখিতেও পাইত না, হিন্দুগণ মৃতদেহ দ্বারা অগ্নিকে তৃপ্ত করেন, ইংরেজরাও মৃত শরীর কবরে রাখিয়া দেন তবে পরমেশ্বরসৃষ্ট রক্ত মাংসাশী পক্ষীগণ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? এই কারণ পরমেশ্বর সিপাহিগণকে রাজবিদ্রোহে উঠাইয়া দিয়াছেন তাহারা মরিবে, পশুপক্ষীরা তাহারদিগের রক্ত মাংসে তৃপ্ত হইবে পশুপক্ষী সকল ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে আশীর্বাদ করিতেছে, 'অযোধ্যা রাজ্যে রক্ত মাংস পাইয়াছে দিল্লি, মিরাট, আলীগড়, এটোয়া,মৈনপুর, কাশী, আলাহাবাদ ইত্যাদি' স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, ইহার মধ্যে ২ কোন ২ স্থলে রক্ত মাংস পাইতেছে, কোন ২ স্থল হইতে নিরাশায় পিপাসায় পীড়িত হইয়া ফিরিতেছে, পশুপক্ষীরা কি পরমেশ্বরের প্রজা নয়? পরমেশ্বর কি তাহারদিগকে আহার দিবেন না? বহুকাল পরে এই আহার পাইল ইহাতে শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কেনিং বাহাদুরকে কত আশীর্বাদ করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই, শ্রীযুত লার্ড ঐ সকল অনাথ প্রজাদিগের আশীর্বাদেই জয়যুক্ত হইবেন?

আমরা উপরে লিখিয়াছি নির্বুদ্ধি লোকেরা শঙ্কাক্রমে অগ্রেই মরিয়া যায় সিপাহিদিগের বিদ্রোহিতাকালে বহু লোকের তাহাই ঘটিতেছে, ব্রিটিস গবর্নমেন্ট রাজ্য রক্ষা জন্য চতুর্দিগে অগণ্য সৈন্য পাঠাইতেছেন, এ সময়ে সৈন্যদিগের খাদ্যাদি না পাঠাইলে তাহারা কি রূপে যুদ্ধ করিবে এই কারণ কলিকাতা ইত্যাদি প্রধান ২ নগর হইতে সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্যাদি পাঠাইতেছেন ইহাতেই নগরবাসিরাও খাদ্য-দ্রব্যাদি দুর্মূল্য করিয়া দিলেন, ধনীলোকেরা মনে করিয়াছেন ইহার পরে খাদ্য-দ্রব্যাদি পাইবেন না এই কারণ কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়াও ছয় মাসের আহারোপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন, ধনীলোকেরাও যদ্যপি ভীত হইয়া বাজার হইতে ছয় মাসের দ্রব্যাদি আগামী ক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন তবে দরিদ্র লোকেরা কি রূপে রক্ষা পাইবে? কলিকাতা ইত্যাদি প্রধান ২ সকল নগরে নাই ২ শব্দ উঠিয়াছে, দাইল, তণ্ডুল, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি বস্তু সকল যাহা অধিক সময়ে গৃহে রাখা যায় ধনীলোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন দরিদ্র লোকেরা পাঁচ পয়সাতেও এক পয়সার বস্তু পায় না, কলিকাতা নগরে কয়েক দিবস আম্র, কাঁঠাল, সস্তা হইয়াছিল, দরিদ্রেরা তাহাই খাইয়া বাঁচিয়াছে, আম্র কাঁঠাল গেল ইহার পরে তাহারদিগের প্রাণ রক্ষার কি হইবে? শ্রীযুত লর্ড এ সকল বিবেচনা করেন কি না? প্রজারা এই সকল কুকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন, এ সময়ে ইহা উচিত নয়, রাজপুরুষেরা ইহা স্মরণ রাখিবেন এবং যাঁহারা এই সকল কাণ্ড করিতেছেন তাঁহারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, ধনীলোকেরা নগরে হাহাকার উঠাইলেন দরিদ্র প্রজাসকল বাজারে আহারীয় দ্রব্য পাইবেক না ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দলবদ্ধ হইয়া এবং ধনীদিগের বাড়ি ২ পড়িয়া সর্বস্ব লুঠ

করিয়া লইবে, আহার না পাইলে কি করে, ঘরে ঘরেই কাটাকাটি ঘটাইয়া দিবে অতএব ধনিগণ এ সময়ে দরিদ্র প্রজা সকলকে প্রতিপালন করুন ইহা না করিলে আহার বিরহে তাঁহারদিগের ভৃত্যবর্গও উপসর্গ ঘটাইতে পারিবে, সিপাহিরা যেমন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিকূল হইয়া সকলকে ব্যাকুল করিয়াছে প্রত্যেক ধনীর দৌবারিকাদি ভৃত্যেরা কি এরূপ করিতে পারে না, মরিয়া হইয়া উঠিলে মানুষেরা জ্ঞান যোগ থাকে না, অজ্ঞানাবস্থায় কি না সম্ভব।—*১৮৫৭ জুন ১*

কারণের কি অসাধারণ গুণ

এইক্ষণে রৌদ্রের অধিক উত্তাপ হইয়াছে, অনুমান করি ইহাতেই হরকরা সম্পাদক মহাশয় পানীর বস্তু অধিক ব্যবহার করিতেছেন, অষ্টাদশ জুন বাসরীয় হরকরা পত্রে লিখিয়াছেন গবর্নমেন্ট ভাস্কর সম্পাদকের নামে পোলিসে অভিযোগ করিয়াছেন ঐ বিষয় সুপ্রিম কোর্টে সমর্পণ হইয়াছে, উক্ত সম্পাদক প্রতিভূ দিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, হে পাঠকগণ, আপনারা পূর্বাপর আমারদিগের লেখা দেখিতেছেন আমরা রাজভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না তথাচ হরকরা সম্পাদক মহাশয় অলীক সম্বাদ লিখিয়া আমারদিগের মনস্তাপ দিলেন, আমরা পরমেশ্বর সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি পুরুষানুক্রমে ইংরাজাধিকারে থাকিতে পারি, ভারতভূমি কত পুণ্য করিয়াছিলেন এই কারণ ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্তও যেন ইংরেজ ভূপালদিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন, হে পাঠক মহাশয়গণ, হরকরা সম্পাদক মহাশয় যে চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছেন আপনারা তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না তাঁহার স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ ফিনিকস সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বিষয়ে কি সাধু স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দর্শন করুন, আমরা তাঁহাকে নমস্কার দিয়া ১৮ জুন দিবসীয় ফিনিকস হইতে এই অংশ গ্রহণ করিলাম।

ফিনিকস সম্পাদক মহাশয় লেখেন।

কোন ২ পারসিক সম্বাদপত্র সম্পাদক গবর্নমেন্টের যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে এক প্রকার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে তন্নিমিত্ত গবর্নমেন্ট তাঁহারদিগের বিপক্ষে পোলিসে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু উপরোক্ত সম্পাদকগণ রাজবিরুদ্ধে যেমত অন্যায় লিখিয়াছে ভাস্কর সম্পাদক তেমনি রাজপক্ষের সদাচার প্রচার করিয়াছেন এবং যে দিবসাবধি তাহারদিগের অকৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতার বিষয় বিস্তারপূর্বক লিখিয়াছেন ইহাতে শ্রীশ্রীযুক্ত গবর্নর জেনারেল বাহাদুর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন, এ বিষয়ে ভাস্কর সম্পাদক অশেষ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।—*১৮৫৭ জুন ২০*

সম্পাদকীয়। ২০ জুন ১৮৫৭। ৩০ সংখ্যা

আগ্রা, দিল্লি, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোরাদি প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহিদিগের আড্ডায় ২ ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহিরা জানুক ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সিপাহি ধর অধ্বরারম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহী সিপাহি সকল, শোন ২, তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও ব্রিটিশ পদানত হইয়া প্রার্থনা কর ক্ষমা করুন।

গত বুধবার বেলা দুই প্রহর দুই ঘন্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ উত্তরদিগ হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল সে সময়ে উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যেরা পাঁচশত সিপাহিকে হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গবর্নমেন্ট সিপাহিদিগের প্রতি যে প্রকার ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন তাহাতে ইহারদিগের বলিদান দিবেন ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে, কালীঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই আমারদিগের রাজ্যেশ্বর যদি হিন্দু হইতেন তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন, অরে বিদ্রোহী সকল, তোরা ব্রিটিশ রাজেশ্বরের কি করিতে পারিবি? তোদের যে নিষ্ঠুরতার শক্তি ছিল তাহা করিয়া সারিয়াছিস অর্থাৎ সাহেব জাতীয় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে হত্যা করিয়া বসিয়াছিস, আরে দারুণান্তঃকরণ বিদ্রোহিগণ, ঐ সকল স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা তোদের কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন? কি নিষ্ঠুরান্তঃকরণে তাঁহারদিগের প্রাণ সংহার করিলি? এইক্ষণে সেই অভিশাপে মনস্তাপ সহ্য কর, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন সৈন্যেরা এবং বীজানুগত প্রজারা বিদ্রোহিগণকে যেমন দেখিবেন অমনি হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী দিয়া ধরিয়া আনিবেন, যদি আনয়নের সুযোগ না পান তবে যেস্থানে দেখিবেন সেই স্থানেই কারাবন্ধন দিবেন, ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষবাসী প্রজাসকল নির্ভয় হও, 'ছেল্যেধরা' একটা কথা মাত্র শুনিয়াছিলে, সিপাহি ধরা প্রত্যক্ষ কর, গত বুধবারে গঙ্গাতীরে বহুলোক দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত সিপাহি ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতাবাসিদিগের আর ভয় নাই, সকলে বিষয়কর্ম সকলকে নিঃশঙ্কে অঙ্কে করুন।

যে সকল বিদ্রোহী দিল্লি প্রদেশ শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাহারা দুইবার বাহির হইয়া গাজীউদ্দীন স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, রাজসৈন্যেরা তাহারদিগকে কচু কাটা করিয়াছে, অবশিষ্টেরা রণে হারিয়া পলায়ন-পর হইয়াছে, ব্রিটিশ পক্ষীয়েরা তাহারদিগের তোপ বন্দুকাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, মহারাজ্ঞীর যুদ্ধবিজ্ঞ সৈন্যেরা আলাহাবাদ গমনীয় রাজপথ সকল নির্বিঘ্ন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বড়লার্ড সাহেবের অধীন মহাবল সৈন্য সকল বোধহয় এতদিনে দিল্লি নগরে গিয়াছে, সে সকল বিদ্রোহিরা দিল্লি দুর্গ আশ্রয় করিয়া বাহিরে শিবির ফেলিয়াছিল এবং মধ্যে ২ যুদ্ধ করিতে বাহিরে আসিত তাহারা আর বাহিরে আইসে না অতএব রঙ্গ বিষয়ে সাহস ভঙ্গ হইয়াছে সন্দেহ নাই, আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় অস্ত্রবল সৈন্যবলে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছেন, সম্পূর্ণ সজ্জায় দিল্লি যাইয়া বিদ্রোহিগণকে আবাহন করিতেছেন, তোরা আয়, তোদের মুণ্ড লইয়া কুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করি, সমাচারপত্রে লেখে বোম্বাই, পাতিয়ালা, জয়পুর ইত্যাদি স্থান হইতে বড় ২ তোপ, মেগজিনাদি সহিত মহাদল সৈন্য সকল দিল্লি গমন করিয়াছেন, আমরা ভরসা করি আর দুই চারি দিবস মধ্যেই পাঠকগণকে জানাইতে পারিব ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট জয়ধ্বনি দিয়াছেন অতএব প্রজাসকল সুস্থির হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের জয় ২ বল।

কলিকাতা নগরে কেমন পাগলা বাতাস আসিয়াছে, তাহাতে কতকগুলিন সামান্য লোক, যাহারা পিত্তল, কাঁসাদি তৈজস বাসন ব্যবহার করে এবং স্ত্রী পুত্রাদিকে সোনা রুপার যৎসামান্য অলঙ্কার দিয়াছে তাহারা ঐ বাতাসে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, বাসনাদি মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিয়াছে, স্ত্রী পুত্রাদিকে পিত্তলালঙ্কার দিয়াছে, সোনা রুপার অলঙ্কারাদি দেওয়ালে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে এইক্ষণে তাহারা নির্ভয় হউক, সে সকল সিপাহি গাঞ্জা মলিতে ২ বলিয়াছিল কলিকাতায় আসিয়া লুঠপাট করিবে তাহারা ফাঁসির নিকট

আসিয়াছে, আর কেহ শঙ্কাকুল হইয়া পরিবারাদিগকে ব্যাকুল করিবা না, এইস্থলে লাহোর ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করি, তিনি মজুরাদি বহু মনুষ্যকে সৈন্যসজ্জায় সজ্জীভূত করাইয়া হাট ঘাট রক্ষা করিয়াছেন, বিদ্রোহীরা ঐ ঘাট আয়ত্ত করিতে পারিলে আমারদিগের বিস্তর অনিষ্ট করিতে পারিত, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অধার্মিক নহেন, ধর্ম দৃষ্টে প্রজা প্রতিপালন করেন এতএব পরমেশ্বর সর্বদিগে তাঁহারদিগের আনুকূল্য করিতেছেন, কেমন এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা কি বলিবেন? আমরা যে লিখিয়াছিলাম দুই সপ্তাহ মধ্যেই ব্রিটিশ পক্ষের মঙ্গল ধ্বনি শুনিতে পাইবেন তাহা শুনিলেন কিনা, এইক্ষণে আমারদিগের লেখনীকে আশীর্বাদ করুন।—*১৮৫৭ জুন ২০*

দরিদ্র লোক সকল বাঁচিল

শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কেনিং বাহাদুর দীর্ঘজীবী হউন, দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি রাজেশ্বরের যাহা করিতে হয় তাহাই করিলেন, হে পাঠক সকল, স্মরণ কর, আমরা বারবার লিখিয়াছি রাজ্যেশ্বর মহাজনি কাঁটা সকল বন্ধ করুন, মহাজনেরা লাভ লোভে নগরীয় তণ্ডুলাদি বাহিরে পাঠাইয়া দেন এদিকে প্রজারা হাহাকার করে, আহারীয় দ্রব্যাদি পায়, পিতা মাতার নিকট সন্তানাদি যেমন আবদার করে মহাজনদিগেব কাঁটা বারণ জন্য আমরা শ্রীশ্রীযুতের নিকট সেইরূপ আবদার করিয়াছি, নগরীয় ধনিগণ যাঁহারা ছয় ২ মাসের আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া গোলায় পুরিয়াছেন এবং প্রতি দিন লইয়া যাইতেছেন তাঁহারদিগকে বলিয়াছি যুদ্ধ ঘটনা কালে এরূপ করিবেন না, তাঁহারা আমারদিগের কথায় মনোযোগ করেন নাই, কয়েক দিবস পরেই বুঝিতে পারিবেন, বহুমূল্যে দ্রব্যাদি লইয়া দণ্ড দিলেন, শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কেনিং বাহাদুর ভাস্কর পত্র যেমন লইয়াছেন অমনি ভাস্করের প্রার্থনাও শুনিয়াছেন, শ্রীযুক্ত লর্ড শ্রীমুখে আজ্ঞা দিবেন মহাজনি কাঁটাসকল এইক্ষণে বন্ধ করিতে হইবেক, মহাজনেরা এ সময়ে বাজারে কাঁটা তুলিয়া আর দরিদ্র লোকদিগের গলদেশে কাঁটা ফুটাইতে পারিবেন না, যে পর্যন্ত যুদ্ধের ধূমধাম থাকিবে ইহার মধ্যে যদি কেহ বাজারে কাঁটা বাহির করেন তবে ঐ কাঁটায় তাঁহারাই কাটাই পড়িবেন, হে দরিদ্র প্রজাসকল, তোমরা শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কেনিং বাহাদুরকে আশীর্বাদ ও নমস্কার কর, দীননাথ রাজ্যনাথ গবর্নর বাহাদুর মহাজনি কাঁটাসকল বন্ধ করিয়া দিবেন এইক্ষণে নগরে দ্রব্যাদি সকল সস্তা হইয়া উঠিবে তোমারদিগের দুরবস্থা দূরগতা হইল, যাঁহারা এই দুঃসময়ে বাজার মহার্ঘ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা মনস্তাপ করুন, এ বিষয়ে আমারদিগের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়াকোপ সাহেবকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়, আমরাও যেমন ভাস্করে লিখিয়াছি তিনিও দরিদ্র লোকদিগের দুঃখ দেখিয়া গবর্নমেন্টকে তেমনি অনুরোধ করিয়াছেন, যাহাতেই হউক, মহাজনি কাঁটাসকল বন্ধ হইল, দরিদ্র প্রজাসকল রক্ষা পাইল, আমারা এ বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলাম ইহাতেই আমারদিগের লক্ষ লাভ হইল, ভাস্কর হইতে যে সাধারণের উপকার দর্শিল এই পরম লাভ অতএব পরমেশ্বরকে কোটি ২ নমস্কার করিলাম।—*১৮৫৭ জুন ২০*

HINDOO PATRIOT

সম্পাদক : হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

THE MUTINES

Months before a single cartridge was greased with beefswet or hog's lard. We endeavoured to draw public attention to the unsatisfactory state of feeling in the Sepoy army. We are now in the midst of an epidemic mutiny. The spirit of disaffection has worked its way into the heads of the sepoys until not a regiment in the service can be trusted. At the present stage of its progress, any conjectures concerning the trun affairs are likely to take can no longer be deemed premature and mischievous. The worst or nearly the worst has come out, and there is no want of distinctness or prominence in the symptoms which have already appeared to warn us against the existence of a powder mine in the ranks of the native soldiery that wants but the slightest spark to set in motion gigantic elements of destruction.

The facility with which the murderers...in the whole regiment was a significant prelude to the more open manifestation of the spirit of insubordination among the sepoys that occurred at Barrackpore. The regiments cantoned at the latter station by previous concert refused point blank to have any thing to do with the new cartridges supplied from the ordnance stores. An impression prevailed that an objectionable ingredient was used in the preparation of these cartridges. Factious men contrived to render this impression subservient to a mischievous end. The sepoys were successfully worked upon and Barrackpore had well nigh become the scene of general mutiny. The timely and spirited interference of the General commanding the division served to dispel the cloud that had gathered, and a luminous and telling address to the troops for a time undid the evil that had been slowly and silently making head. The sepoys ceased to hold nocturnal meetings, passed votes of censure on their officers, set fire to bungalows and perpetrate other acts of crime. The disease seemed to have disappeared, when its symptoms broke out afresh, and in their indication showed that it was neither the fat of oxen nor the dread of proselytism, but a deep-rooted cause of estrangement that led to these mutinous outbreaks. A dangerous shock to the discipline and soldierly feelings of the entire army was imparted by the events, and the 19th N. I. caught the infection in all its virulence. They committed themselves even

more hopelessly than the troops at Barrackpore, and a signal punishment has marked the displeasure of the government. The blind obedince to command which forms the basis of military discipline seems universally to have given place to an obstinate and rancorous spirit of debate. Mutiny must be the natural result of the working of such a spirit.

The Indian army has a discipline peculiarly its own. It has been kept together as much by the usual modes of military organization as by the peculiar composition of its elements and the absence of those exciting causes of military violence which exist abundantly in armies where alcohol is set up as a god and worshipped. The men who constitute the armed strength of the British Indian empire, are sprung from a race endowed with a traditional repute for chivalry. It is not here as in European countreis that the very dregs of the population only are enlisted into the ranks. The strictest rules on the contrary are enforced for preventing the admission of recruits from inferior orders of caste. To the chamar or the dome the rolls of the army as those of genteel society are never accessible. The Sepoys are therefore more amenable to the moral influence of their Commander than any other body of soldiers in the world. Nothing short of grievous oppression or the most flagrant disrespect of substantial prejudices can drive the native soldiery to conduct foreign to their obligations and their duty. Without the utmost provocations to insubordination the sepoy scarcely every raises his hand against his superior. It is not in his constitution to do so. The precepts of his religion forbid his perpetrating such a deed. Soldiering is a respectable profession, and to forfeit one's footing in it is a misfortune visited by the condemnation of society. The censure of his relatives and friends waits a wanton infringement by him of the respect due to his officer. Every circumstance, moral, social and religious, helps to maintain the harmoney for which the native regiments in India are preeminent. When nearly a century ago the European troops of the Company refused to do their dutry, and headed by a seditious corporal turned their backs upon an expedition the failure of which would have involved the British power in utter ruin—the sepoy corps bravely and zealously supplied the places of their European comrades and would have readily chastised their traitorous behaviour if a lenient policy had not been adopted by the Council at Calcutta. The remembrance of such noble and heroic conduct on the part of the native troops does not give us ground to suppose that the present excited state of the sepoy mind is the result of the spontaneous evolution of seditious sentiments. What then has loosened the ties that hitherto held them in cordial military union with their European leaders? The answer is easy to give. Those whose province it is to look to their interest and give heed to their complaints are singularly neglectful of their high and important trust. The practice of removing every experienced or promising

officer to the civil department of Government, in manifest violation of good policy, has denuded the native regiments of their best officers. Those available for regimental duty are either unfit or unwilling to exercise that vigilant and zealous supervision over the men under their control without which the finest body of soldiers must degenerate into a loose and imbecile rabble. The espirit de corps which is at once the soul and the glory of veteran regiments must descend to the men from the officers who had them. But the espirit de corps of the officers of the Bengal native infantry is a perpetual hankering after staff-employ—in default furlo'—! Need we wonder then that the discontent of the officers should be caught up by reflection with which the entire native army seems to the tainted. Where open mutiny has occurred rigorous measures for the punishment of the mutineers have followed. But the aspect of affairs is by no means encouraging, and the wisdom of the government will not be wasted in devising prompt and efficient measures for arresting the progress of the evil whilst yet the disease may be cut out. If it should ascend to the vitals, fusillades and connonades will hardly succeed in re-establishing order in the ranks and restoring the army to its lost position.
2 April 1857

THE MUTINIES (Selection)

From various sources.

On the 31st of July, a peremptory order was received at Gya from the Commisioner of Patna, calling on the officials and the troops then at Gya, consisting of 116 Seikhs and 40 of H. M. 84th for concentration at Dinapore; (80 men of H. M. 64th having previously left Gya for Benares on the 25th July.)

The road from Gya to Patna being impassable, even for bullock hackeries it was impossible to send the treasure with the troops to Patna. On the evening of the 31st July, the troops, and every European and Christian in Gya, left for Patna, but Mr. A. Money, the Collector and Acting Magistrate of Behar, refused to desert his post, and took upon himself to disobey the express orders of the Commissioner, and to remain in charge at Gya. In this he was most gallantly and bravely aided by Mr. Hollings, the head opium Agent, who voluntered to remain with Mr. Money alone. Those two gentlemen called a meeting of the inhabitants, and offered to take command of any native body to be furnished for the protection of the town, and in that case to hold Gya against all and sundry.

The rich natives, however, after consultation, decided that their city and person were too sacred for injury to be done them by any native mutineers, and so preferred retiring into the sacred part of the town, and

failed to supply any force as required. Messrs. Money and Hollings therefore unaided, except by the Nujeebs, kept charge of Gya alone till the 2nd August when the company of H. M. 64th, which had been recalled by Mr. Money, arrived. On the 3rd instant the state of the country and approach of a large body of mutineers rendered it unadvisable to remain longer at Gya with so small a force, when the inhabitants refused to assist in its protection; and the treasure being loaded in the carriages in which the 64th had returned to Gya, the small party deserted the town marching by Dobay to the Grand Trunk Road.

About 5 miles from Gya they were attacked by the Nujeeb Guard, and the released prisoners from jail and others, whom they repulsed after shooting five of them. On arriving at Dobay, 18 miles from Gya, Mr. Money dispatched a runner to Raneegunge, informing Government of his movements and asking for help. Government is said to have forwarded orders, along the Trunk Road for the Seikh police to form and march to the relief of the small party with the treasure and it is to be hoped that the measures of relief, proposed in the HARKARU of Friday, have also been adopted.

The following is from Bundlecund, dated the 29th ultimo :— "A letter from Mirzapore mantioned a report that Mr. Calvin had released all the prisoners, four thousand, at Agra, whom he was unable to guard, and that they had sallied out and attacked the rebels twice and driven them away to Maltuna. A capital business if correct; the man I conclude were promised pardon conditionally upon their conduct, and which would given him four thousand additional fighting men.

"The news here is that our troops have taken fifty-four lakhs of Rupees at Bhittor, and that Ram Lall Deputy Collecter in the Service of the Nana, had been hanged."

The followings is an extract from Julpigoree, dated 31st July :—

"You were very nearly losing some of your friends here at few days ago. We discovered at villainous plot arranged by a few men of murder the officers and cross over the Bhootan; but the main body of the Regiment be haved well, seiged and confined in their own guards their rascally comrades, saw them fettered, and escorted them off without a word of sympathy. We fear nothing like a general rise or mutiny here now, though we have had an anxious time of it."

Mount Aboo 15th July, 1857. "Capital news has just come in from Bhurtpore in a letter from Bholanath Doss, the Sub-Assistant Surgeon of the dispensary there. He says, writing on the 7th, there was a hard fight yesterday; the rebels were entirely defeated and about one thousand of them slain. They have fled in the direction of Muttra almost without ammunition. They will most likely make for Delhi. They were the Neemuch mutineers who had burnt. Agra Cantonment, and must have

been attacked by the Europeans from Agra Fort with the result above mentioned. May this be turning point which leads on from victory to victory. Lots of themselves knocking about."

Mr. Samuells, who was for many years at Patna in different official capacites, is well acquainted with the nature and disposition of the people of Patna who had represented to him the grievances they are now subjected to by the proclamation of the Martial Law there, and hanging in numbers of the residents there. The letter which was written in Persian characters was read out in the Court at the direction of Mr. Samuells by a Mookter of the Court, and it requested Mr. Samuells, that, knowing as he does of the character and disposition of the inhabitants as loyal subjects of Government, the law in question has been found to operate prejudicially to their reputation, he should exert on their behalf to suspend the enforcement of the law, and Mr. Samuells, we hear, intimited his desire of acceding to their proposition as requested, and hence, I suppose, Government has appointed him as Commissioner of Patna, vice Mr. Tayler, who has got the notoriety of being known, as the hanging Commissioner.

The Dinapore Artillery are reported to have destroyed upwards of five hundred of the Sepoys who were passing down the Gonges in boats. Five large boats were entirely destroyed. The Artillery was on the river bank masked.

13 August 1857

DISCIPLINE AND REVENGE

The acting commander-in-chief of the Bengal army has found it necessary to issue the following General Order :

30th July—The Commander-in-chief calls upon officers commanding forces or detachments employed on field service to repress with the utmost severity all plundering and other excesses on the part of the troops and camp followers.

All such irregularities are destructive of discipline and order, and where they are suffered to exist, the worst consequences must ensure :—the labouring and working classes and the inhabitants of the country generally will be deterred from rendering important assistance in many ways—supplies of carriage, and other essentials will not be provided—and the public services will be injured, and the trooops inconvenienced and impeded in their operations.

Such serious evils cannot exist in a well regulated camp or military station, where discipline and strict order are maintained with firmness and judgment.

The powers of the Provost Marshal, under the orders of officers-in-chief command, are ample—extending even to the punishement of death in extreme cases—and they must be strongly exercised and enforced to the full extent if less stringent measures fail.

This order is to be carefully explained to everybody, to troops employed on field service, or wherever martial law has been proclaimed.

This order is principally directed to the offence of plundering which in all well-disciplined armies is not permitted in the line of march even through an enemy's country. Whether that degree of discipline exists in the army now proceeding up the country, clearing it of rebels, is a question which we have been tempted of late to ask seriously of our military authorities. The pillage of the town of Allahabad, to which a contemporary has traced, with some show of reason, the subsequent catastrophe at Cawnpore, was committed both by European and Seikh soldiers. The 6th Mutineers contented themselves with killing their officers and the Europeans they caught. The Pragwallahs and the Mussulman fananties continued the work of murder and incendiarism; but it was reserved to the troops entrusted with the protection of life and property in the locality to destroy the stores of provisions which were to supply the remaining inhabitants and the forces destined to advance to the relief of the upper stations.

General Grant's order speaks specially of the offence of plundering. Its spirit is applicable to outrages of other characters. The troops which marched from Benares to Allahabad under the command of General Neill are said to have left traces of exploits similar to those which marked the movement of Marmont's foraging parties and retreating divisions in Spain. We were not surprised at all at the desperate attack of three thousand Rajpoots upon Benares after the mutiny was over in that city Revenge is sweet, and often just; but public authority, and military authority especially, ought not to permit it to be executed by irresponsible persons. A Seikh is murdered at Allahabad, the whole regiment of Seikhs is let loose on the town to avenge their comrade. How can discipline resist such tampering with it or survive such licence?

Our military commanders ought to remember that after the rebellion is over, the country will have to be reoccupied and regoverned. It will not add to the facility or efficiency of the work of administration to have among the people thousands of men brooding over the murder (as they will continue to think it) of innocent relatives or the dishonor of their mothers, sisters and wives. It will not do, in these times, for our generals to combine in their persons the accomplishments of a General Knox and a Judge Jeffries.

13 August 1857

THE REBELLION

The week has been one of continued panic in the metropolies. Rumours of the rebels having approached Raneegunge on the one side, boating down the Bhaugeerutee on another, insidiously threading their way through the numerous creeks in the Sunderbuns in a third direction, and assembling in force in the heart of Calcutta, have kept alive the fears of some and the amusement of others during the last few days. No one, however, confesses to having seen a living rebel within three hundred miles of Calcutta. The fact is, the insurgents have not yet soiled with their presence the territory of Bengal proper. The province of Behar is still infested with them, although repeated chastisement has been inflicted on them in their very strongholds. They have been defeated at Arrah. On Patna they have failed to make any impression; the public treasure at Gya has been rescued by a single company of European soldiers; Sherghatty has been reoccupied; and there is strong reason to believe that Jugdeespore, the head quarters of the infatuated man who has put himself at the head of the revolt in the lower country, is now in ruins. The weakness which allowed the three regiments of mutiniers to escape unhurt from Dinapore has been retrieved by the energy of Major Eyre who, with a force numerically not a tenth of his enemies, is scouring the province, and the dashing tactics of a civilian, Mr. A Money, who has cut his way through the very heart of Behar with seven lacs of public money

The insurrection in Behar has rendered the public roads from the upper country insecure for the transit of the mails, and intelligence, therefore from that reason reaches the capital with extreme irregularity. Nevertheless, we have a general knowledge of the progress of affairs with several forces which are now operating against the rebels in the Central Provinces. General Havelock is reported to be within five miles of Lucknow. The incidents of his passage thither, and they must have been numerous, are unknown to us, but we can conceive of the difficulties of his path to the capital of Oude. Lucknow is now probably occupied by fifteen thousands well-armed rebels under the guidance of a chief whose crimes forbid his entertaining a hope of reprieve. Nana Sahib, we believe, heads the rebels of Oude, and to rescue the garrison of the Lucknow residencey out of his desperate hands will demand a larger sacrifice than the force under General Havelock can afford. But his proximity to Lucknow affords one hope, namely, that the beleaguered garrison may yet, in the last resort, have spirits to resist such a temptation as drew out Wheeler from the grave of honor dug by himself to be thrown into the foulest well that treachery ever laid in the path of confiding herosim.

The intelligence from Agra dates to the 29th ultimo. Up to that day,

the Fort was holding it. It is believed in the Upper Provinces that the Baiza Baie, with the remnant of the Gwalior (....) that still obey authority, was aiding the (....) Another report is that Baie has been (....) by her troops. The garrison surely (....) succours. The accounts transmitted by (....) do leave a hope that mey yet live to benefit by them.

From Dehli, the intelligence is on the whole cheering. The besieging force has been joined by Gourkhas and Sikhs, but the Commander does not feel himself strong enough to attempt an assault. The mutiniers are represented to be in a very bad plight. Dissention, as mights be expected, has broken out between the Hindoos and the Mahomedans, and disease and the want of a guiding hand are making their effects perceptible upon the garrision. A moderate reinforcement of European troops is all that is requisite to ensure the fall of the city.

No fresh accounts have been received from the Deccan or from Central India. The Punjab is quiet, and vigorous measures are in progress to enrol Sikh troops for service against the rebels. We have detailed in another column the prospects of reinforcement from Europe. In the meanwhile, we trust, that the naval armament proceeding up the country under Captain Peel, a Crimean hero, and the other troops recently arrived will soon avail to relieve the anxieties and troubles of the garrisons in the Upper Provinces.

20 August 1857

2

The general aspect of affairs has imporved during the week. The road between Calcutta and Benares is clear of those impediments which the mutiny at Dinapore has created. The electric telegraph between the metropolies and Cawnpore regularly conveys messages except when accidental causes interrupt the communication. Jugdeespore, the stronghold of the Behar rebels, has been captured by Major Eyre, and their chief is a fugitive—no one know where. The principal official startions have been reoccupied, and authority has resumed its sway almost throughout the province of Behar.

Higher up, the district around Goruckpore has been abandoned; and it is stated also that Dinapore will be given up for the present as a military station. This course it has been determined to adopt in pursuance of a plan which has many recommendations in the present state of affairs. It is necessary, above all things, to rescue the garrison of Lucknow. The repeated efforts made by General Havelock to reach that city have been frustrated by the comparative smallness of the force under his command. To strengthen him for a march to Lucknow is, and ought to be, the first

object of the military authorities. The troops now steaming up the Ganges will reach Cawnpore immediately; and the desired movement will be effected without delay. It is just possible that the concentration of all strenth at Cawnpore at the present time will endanger the safety of Benares; but the strong fortifications which have been raised there will baffle the attacks of such enemies as are likely to approach that city. The country on the north of Benares and of Allahabad will be laid open to ravages in case the Gurkhah contingent supplied by Nepal turn unfaithful to its trust, but a stern necessity for the present compels the sacrifice of all meaner interests than the empire and its re-establishment, and they will be advanced by the rescue of the Lucknow garrison and of Agra.

For twenty miles around the latter city, it is said, not an enemy is to be seen. Perhaps, after the repulse of the first attack, the mutiniers thought it best to join the rebels at Delhi. Indeed, the frequent and large reinforcements received by the insurgents in that city can be accounted for by supposing only that the Neemuch mutiniers as well as a portion of the Gwalior troops have drawn themselves off to the head quarters of the rebellion. the rescue of the Lucknow garrison will be the first signal of the relief of Agra and the re-establishment of authority in whole provinces around it. Delhi, we have ample reason to believe, will not wait the final issue of these operations, but will bow its head to its conquers ere many days have gone by.

An unfortunate occurrence at Dinapore points to a danger which has yet exhibited, we fear, but its earliest symptoms. A year ago, as our readers are aware, a soldier of H. M.'s 10th Foot was murdered on the parade ground of the 40th N. L. at Dinapore and two were severely assaulted. The crime was brought home to the native regiment but the individual perpetrators could not be identified. Since that, the feeling between the two regiments has been far from amiable. a state of relations not very much improved by recent events. The disastrous fate of the detachment which went to the relief of Arrah wound up the feelings of the 10th Foot to the highest pitch of excitement, and the men declared they would take the first opportunity of revenging the death of their comrades. About a hundred men of the 40th N. I. had remained behind after the mutiny of the regiment. Some evenings ago, a number of soldiers attacked the lines in which these native soldiers resided, took them by surprise, shot some of them and bayoneted others, including two women. The assailants escaped, but four, it is said. were detected wiping their bloody bayonets. The consequences of this unprovoked attack will, it is needless to say, not end here. Whether an enquiry establish the guilt of the perpetrators of this foul deed or not, its remembrance will rankle in the minds of the Sepoys for year. There are still thirty thousand native soldiers drawing British pay. They will hear it—not with calm resignation.

The event is to be the more lamented as it will confirm in the minds of the Sepoys the impression which we know has been created in them that it is the intention of Government to destroy their lives whether they be mutiniers or not. Absured as this belief is, it has taken possession of the Sepoy mind since the affair at Benares, and it is not conducive to the re-establishment of tranquility.
27 Augutst 1857

3

Lucknow is yet unrelieved. The latest intelligence from that city is dated 2nd of the month. The garrison was in good health. They had driven mines under houses occupied by the enemy, and in one instance blown up a house with a number of their sharpshooters who were causing considerable annoyance. There is a report of the garrison having commenced treating with the besiegers, but we can scarcely believe that such a course should have been adopted by persons not unacquainted with the facts of the massacre at Cawnpore and with the character of the archfiend who, we believe, directs the operations of the enemy both at Lucknow and at Bithour. The garrison, however, has made more than one sortie recently with much success. Relief, we trust, is not very far distant. The 5th and 90th Foot have been delayed in their progress from some cause yet unexplained. General Outram arrived at Allahabad on the 2nd instant, and a portion of troops proceeding up has also arrived there. They will march or stream up to Cawnpore immediately. Reinforced by two such regiments as the 90th Foot and 5th Fusiliers and by Major Eyre's battery, General Havelock's saving mission cannot possibly fail.

The mutiniers of the Ramgurh Battalion are at Chota Nagpore. They have, we believe, been joined by a portion of the 5th Irregular Cavalry which broke away from Bhaugulpore. At Chota Nagpore, a chieftain, Juggernath Sah, has placed himself at the head of the rebels. But he already finds his affairs desperate. A brigade consisting of 500 European infantry, 800 Madras infantry and some guns left Raneegunge the other day, and is already close to Nagpore. The Sah, we believe, would readily betray the mutiniers into the hands of the authorities if he were assured of his own safety. There is not apprehension of a rising of the population in that part of the country. The chiefs and zemindars who possess the most absolute control over their people have come in with hardly an exception, and offered to furnish contingents of men, according to their respective circumstances, in aid of the local officers. Government can we believe, at any moment raise a force of five thousand of the hill and jungle tribes of this part of the country, and we trust that the attempt will yet be made to secure the services of these people, whose (...) may be depended upon

while they are under the control of a few zemindars easily impressionable by Government influences.

The province of Behar is cleared of insurgents except those who sitll linger with Cooar Sing in his place of refuge. The authorities have returned to their respective places, except the Collector of Arrah who remains with the public treasure at Buxar. It is apprehended from the temper of the population that disturbances might again take place. The remnant of the Dinapore mutiniers, after attempting possession of the Grand Trunk Road, have, under the pressure of attacks from detachments of the Benares and Mirzapore forces, fled to the hills west of Behar The constant passage of European troops upon the Grand Trunk Road must have a great effect upon the spirit of the population; and the measures adopted by Mr. Samuells, which are just such as might be expected from him and those acting under his control have tended at restore tranquility. The peace of the province, however, is not safe until Cooar Sing is captured. His influence, which is great upon the Arrah population, will continue to be exerted to frustrate the designs of the authorities and to keep the district turmoil.

Agra continues exempt from the immediate presence of its besiegers. The garrison not only is not molested, but has actually detached a force against the insurgents at Allygurh, who, however, are too strong for the small force sent against them. These troops, therefore, have taken up a position at Hattrass, whence, opportunity offering, they may operate with considerable effect upon bodies of rebels that may attempt another siege of Agra, as well as hold in check, pending reinforcement, the insurgents at Allygurh. The communications between Agra and Cawnpore are still closed, but the post reaches the first-named city regularly by way of Bhurtpore and Joypore. The mutiniers at Gwalior have made no further attempt upon the place, and it is believed that none will be made by them.

Intelligence has been received from Delhi down to the 26th ultimo. The Pubjab troops under Brigadier Nicholson had joined the besieging force; but no assault and been made upon the city. A heavy siege train was expected from Ferozepore. The besiegers are well supplied with stores, and the camp is pretty healthy. The rebels continue to practise the tactics they seem to have copied from the defenders of Sevastopol, and make frequent attacks upon the rear of the camp, never, however, with success. One of these attacks was anticipated by Brigadier Nicholson, who routed the enemy with the loss of twelve of their field pieces, and the ammunition, equipage and baggage they had brought out. Public anxiety is on the stretch to learn that the final assault has been made and the city retaken. The Punjab is represented to be quiet.

Symptoms of mutiny have manifested themselves both in the Madras and Bombay armies. The 8th Madras Cavalry on being ordered to embark

for Bengal, presumed to dictate terms to the Government. They were instantly dismounted, and their horses were sent to Calcutta. The men of the Transport Train attached to the China force have been mounted upon their horses and forming two capital troops of cavalry will shorty proceed to the Upper Provinces. In the Presidency of Bombay the 12th, 27th and 29th N. I. have disobeyed orders and been disarmed. The character of the mutinies in both the Madras and Bombay armies is, however, very different from that of the outbreak in Bengal, being ascribable to causes neither of national nor of political interest.
10 September 1857

4

The ecstatic feelings with which the public received the intelligence of the relief of Lucknow have been partially replaced by grave apprehensions about the safety of the relieving force. The rumour for some time was that General Havelock's force had been attacked by an immense body of the rebels, routed and slaughtered, and that its annihilation was followed by a general massacre of the women and children. It was said that the force was allowed to enter Lucknow merely that its destruction may be surer and more complete. Even in quarters where more moderate ways of thinking prevailed it was believed that the city was surrounded by about thirty thousand rebels, the greater portion of whom were cavalry, and that the troops under General Havelock were in want of provision. Every one is apprehensive at least of the danger of cutting a retreat through a rebel country, swarming with armed and warlike enemies, possessing every advantage of local knowledge and the command of important positions. Except of the last mentioned danger we take leave to doubt the reality of every one which has been mentioned. Two thousand five hundred Europeans and five hundred Seikhs, furnished with every appliance of war and under efficient leadership, are not likely to be annihilated by a rabble of twenty or thirty thousand ill-armed soldiers and peasantry. We doubt even whether the rebels actually in arms about Lucknow amount to the smaller of these numbers. But for the presence of the women and children, whose safety it is a paramount duty to consult, the troops could have cut their way down to Cawnpore with little more or less than ordinary active service involves. It may therefore have been found necessary to wait for further reinforcements before the march back is attempted. The road should be partially cleared and those villages skirting it which may give shelter to guerillas rased to the ground before the lives of the women and children are hazarded on it. This task cannot be accomplished until two or three thousand more troops are poured into Oude, which will not be the case until five or six weeks

hence. It may happen in the meanwhile that the rebels themselves may for want of provisions and ammunition be compelled to disperse themselves, for their resources cannot be very large; and the approach of the cultivating season will also tend to draw away many from the rebel ranks. We do not know what credit to attach to the statement made by a contemporary that provisions sufficient for the subsistence of four thousand men for a month have been thrown into Lucknow, but if that be a fact the city cannot be very strongly besieged by the rebels. Maun Singh is said to command them the statement recently put forth to the effect that he had joined General Havelock with nine thousand men being contradicted. On the whole the aspect of affairs in Lucknow is far from cheering.

Detailed accounts of the assault made upon Delhi on the 14th ultimo which terminated in the dislodgment of the enemy from the outer defences have been received in official despatches from the Major General commanding the force and the Adjutant General. The fight seems to have been a most obstinate one, and the loss consequently has been severe on the side of the victors. Out of 2,000 Europeans engaged 170 were killed and 562 wounded, and out of 3,000 natives 103 were killed and 310 wounded. The mutiniers who escaped have fled towards Allygurh whither they were pursued by a flying column of cavalry and horse artillery. An action was fought which ended in their defeat. Many of them have gone towards Muttra, and some, we suppose, towards Barreilly. Colonel Greathead had arrived half way between Allygurh and Agra on the 12th instant. The presence of the fugitives near Allygurh and at Muttra adds to the dangers of Agra. That city is now threatened on the one side by the Gwalior troops and on the other from Allygurh by the escaped rebels of Delhi. Muttra too swarms with mutinied sepoy who will join any attack upon the capital of the North-Western Provinces. Colonel Greathead's column will be a valuable addition to the garrison of Agra, but further reinforcements are necessary to ensure its safety. For these reinforcements both Meerut and Delhi must now contribute their quotas. Khan Behadoor Khan still reigns at Berreilly. He sent a force to attack Nynetal about the beginning of September, but the men were repulsed.

The defeat of the Ramgurh mutiniers at Chuttra, a place midway between Dorundah and Hazareebaugh, seems to have been most complete and led to their through dispersion. As anticipated, the brigade which was proceeding up from Raneegunge has been divided into two columns. One of them will chase the rebels undey Coower Singh and Ummur Singh, and the other proceed to Chota Nagpore to punish the insurgents there. The Rewah territory is for the present entirely in the possession of the rebels. the Rajah being utterly unable to restrain his men. It is, we believe, the rebels from this quarter who threaten Allahabad. Not fears, however, are

entertained for the latter place, which is now garrisoned by the Naval Brigade besides some infantry and gunners, and can, at any moment, command the services of a flotilla of steam boats.

Upon the fall of Dehli, we had ventured to express a hope that mutinies would thenceforth cease. We miscalculated the depth of the infatuation under which the sepoys are labouring. Two companies of the 32d N. I. stationed at one of the outposts in the Senthal district have mutinied within the last week, murdered their officers and one or two Christian residents, and proceeded to join the other rebel bodies up the country. Even if the entire regiment mutiny they will be able to do but little mischief. The tranquility of Behar is safe. The rebels are nowhere in force in the province, and the admirable management of Mr. Sammuells and his subordinates has infused a general feeling of cofidence and security to the inhabitants.
15 October 1857

5

Public anxiety still centres on Lucknow. There can be little doubt that the situation of the garrison was, at least to a very late date, extremely critical. Divided and without the means of mutual communication, the troops which occupied the Baleeguard and the Alumbaugh were hemmed in on all sides by bodies of rebels which, whatever they may want, do not seem to have been deficient in determination. An attempt made by the force under General Havelock to cut its way to Cawnpore appears to have been repulsed. But the day of triumph is near. Colonel Greathead's column, strengthened by reinforcements from Cawnpore, which seem to have raised its strength to about three thousand and a half, left that city for Lucknow on the 28th ultimo. Whatever the impediments it may have met on the march, its progress could not have been much delayed, and it is but reasonable to suppose that the much needed relief reached the people at Lucknow on the 31st.

The other source of anxiety is the state of the garrison of Saugor. There, a few Europeans encumbered with women and children, have been holding out for months against a country scarcely less hostile than Oude. They have suffered immense hardships and been tantalized with hopes of succour. The Madras column has reached Jubbulpore, but it has made no sign of relief to the distressed people at Saugor. The whole of central India has yet to feel the influence of British arms, and the troops that have marched from Bengal towards Chota Nagpore seem destined to exercise it. At the latter place, affairs seem to have taken a favorable turn.

Agra has not been since the date of the last battle threatened by any

enemy. The country between it and Cawnpore seems to have been humbled. Bithour has again been chastsied. A force has left Jaunpore to rescue the district of Goruckpore. Cooar Sing and his brother are nowhere. At all events, they appear to be without means to make ahead against the advancing columns of British troops which now offer a ubiquitous presence throughout the country between Raneegunge and Benares. Sir Colin Campbell has arrived at Allahabad, having met unmolested on the way some of the mutiniers of the 32nd N. I. Troops continue to arrive from England. The number already landed may be reckoned at more than four thousand.
5 November 1957

6

The capture of Lucknow seems to have induced a full in the operations of the war in Upper India. The Commander-in-Chief, we understand, after garrisoning the city, and detaching brigades towards the succour of the districts east of Oude, has himself returned to Allahabad. The force left to occupy Lucknow consists of two troops of horse artillery, four companies of foot artillery, two field battaries and a number of heavy guns, some sappers and pioneers, four regiments of cavalry, including the 2nd Dragoon Guards. and five regiments of European infantry and one of Seikhs. The whole, comprehending about eight thousand men, are placed under the command of Brigadier General Sir Hope Grant. Another division of greater strength has been formed into a field force for service under Brigadier General Walpole The city is being fast repeopled under the invitation of the Chief Commissioner, who, however, demands a ransom of his property from every one returning to occupy a house.

The despatches connected with the capture of Lucknow have been published. The loss on the side of the British, as we ventured to guess some time ago, is smaller than was to have been expected in operations of such extent. 19 officers were killed or died of wounds between the 2nd and 21st of the last month, 48 were wounded. 108 non-commissioned officers were killed, 540 wounded and 13 were missing. We have no-intelligence of the relief of Azimgurh and Goruckpore, but there is little doubt of Sir Edward Lugard having cleared that part of the country, and driven Mahomed Hoosain again into Fyzabad.

The fort of Jhansie has been taken. It was stormed on the morning of the 5th Instant by H. M.'s 86th foot and a Company of royal sappers. The fort was obstinately defended, and the first storming party was nearly cut up. The Ranee it is said, tried to make terms with Sir Hugh Rose, but as they could have none she fled towards Jaloun. Another account is that

when she saw the fort was taken she blew herself up with the room she occupied. No quarter was given, and ruthless as the "massacre of Jhansie" was the storming of Jhansie was scarcely a less terrible event. A correspondent from up the country writes : "No regard was shown to age or sex, for nothing could restrain the infuriated soldiery. An awful retribution has come down upon the people of Jhansie." Before the fort was stormed a battle had to be fought with a body of rebels detached from Calpee and Chirkeree towards the aid of the garrison. In this battle the enemy are said to have lost 1500 men and 13 guns.

The rebels of Kotah, after being dislodged from that fort crossed the Parbutty river into Subbulgurh in the Gwalior territories. They were attacked on the way by Scindia's officers, and again defeated. In attempting to cross the river they lost their lost guns and waggons. They have managed to escape towards Nimour. It is said that they are accompanied by women and children some thousands in number, a sure sign of despair.

Near Futtygurh skirmishes occasionally take place. On the 8th Instant, a small force under Brigadier Seaton marched out and inflicted some loss upon a body of insurgents who had made their appearance in the vicinity. Nana Saheb is said to be at Bareilly with his family....

15 April 1858

7

The quiescence of the force before Dehli, has disarmed even curiosity. The public feels an interest in the progress of siege trains and reinforcements, musters patience, and sullenly awaits the final result— whenever that may come. We feel but little elated to learn that "they have commenced the siege in right earnest and on regular siege principles." For the present, our hopes must rest on the movements of Brigadier General Havelock. The latest intelligence from his camp is dated the 17th instant when he was preparing to cross again the Ganges. He must doubtless have been joined by the reinforcements proceeding up under the command of General Outram. Up to that date Lucknow is reported to have been safe. If so their rescue occurs this week. Of General Outram statements have been in circulation for some days to the effect that he has at last succumbed to the mortal disease contracted by him in Persia, and which was exasperated by the anxieties of his position, rendered all the greater by the conduct of the European troops under him. While at Benares, it is said his medical advisers strongly urged him to remain there, but he rejected their counsel in obedience to the call of honor and duty. That these statements may prove unfounded we have little reason to hope. His loss as a military commander will not be much felt but the

moral effect which death, by being so busy in our high places, is likely to create is one to be deplored.

The news from Agra is, as respects the garrison, cheering. The fort is well supplied, and the inmates come out into town whenever they choose. Not an enemy is to be seen within many miles. The Gwalior troops yet refrain from marching upon Agra. Hattras is occupied by a garrison who threaten the rebels near Allygurh. The latter town is held by a loyal Zemindar, who would scarcely have ventured to show so bold a front unless he had felt himself the superior of the rebels in strength. The cheering nature of the intelligence from this part of the country is, however, neutralized by the announcement of one event, the death of Mr. Colvin, the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces. Since the commencement of these disturbancs he marked the magnitude of the evil, and he measures accordingly. These measures have been successful to a certain extent. In fact, the safety of Agra is, in a great measure, due to the prompt and vigorous precautions adopted under his direction. The slightest acquaintance with native feeling will convince one of the fact that, had Agra been captured, the moral effect would have been only less bad than what would be produced by the capture of Calcutta. Every inhabitant of the North-Western Provinces would have considered his allegiance to the British Government to have ceased. Mr. Colvin's Government of those provinces was but of short duration; what he might have done had he been spared is now an useless speculation. That he had the capacity to do much no one who has marked his distinguished official career will doubt.

The country between Delhi and Umballa has settled down so far as to allow travellers without an escort to pass without molestation. Below, the Jhansi districts have been quieted. In Rajpootanah the efforts of the Rajpoot princes have almost succeeded in re-establishing British authority in those places whence it had been driven away. The Saugor and Nerbudda territories enjoy comparative repose. The Mahratta country is still agitated, but a combination of tact and force has hitherto suppressed every preliminary symptom of an outbreak.

The province of Behar has again been thrown into disquiet by the entrance into it of the mutiniers of the 5th Irregular Cavalry and the defection of the Rewah people. The district of Sarun is infested by the mutiniers. Shahabad is Kept agitated by Ummer Singh, the brother of Cooar Singh. The authorities are said to have again left Arrah. Cooar Singh has succeeded in gaining over the people of Rewah to his side, and they have defied the authority of their legitimate chief. Should all these rebels join in an attack upon either Dinapore or Patna, neither place could be maintained without much more aid than is immediately available. It is

a fortunate circumstance that the mutiniers of the 5th Irregular Cavalry are actuated, as it seems, by other purposes than to seat Cooar Singh on the throne of Behar. They are already crossing the Soane, and will most probably endeavour to join the forces of the Nanah above Allahabad. The Commander in Chief, it is stated, has resolved to send a regular force of five thousand men to clear the province of the rebels.

The Hindoostanee warriors of the 1st Assam Light Infantary still continue to be objects of suspicion to the European residents. Their commandant has taken the very judicious step of separating them from the rest of the corps, and sending them away on outpost duty to a place where there are no Europeans. A number of European sailors have been sent towards Debrugurh, but from their insubordinate habits much less is expected than is necessary to reassure the minds of the residents.

Some European troops have arrived during the week from the Mauritius and the Cape of Good Hope. The Land Transport Train have ben mounted and are on their way to the Upper Provinces.
24 September 1857.

8

Public attention has again been drawn to the head quarters of the rebellion at Dehli. The arrival of the heavy siege train with the reinforcements which formed its escort from Ferozepore seems to have been the signal for the resumption of active operations against the besieged walls. The force advanced towards the walls on the 7th ultimo, and on the morning following opened a fire from two batteries. The batteries were then advanced further as buildings beyond the walls came into the possession of the besiegers. The loss in these operations is stated at 18 killed,including two officers, and 80 wounded. The narrative from this time forward to the 16th is incomplete. On the latter date, the magazine was carried with a very slight loss, the enemy being seized with a panic at the charge.One hundred and twenty-five pieces of ordnance with large quantities of shot and shell were found in it. Every place on the outer side of the canal which runs through the city was occupied. Batteries were thence opened upon the Palace. The loss in the course of these operations was, as might be expected, somewhat heavy. The complete occupation of the city in a couple of days was then reckoned a certainty.

The troops at Cawnpore having been joined by the reinforcements under General Outram, (who,we are sincerely happy to find, still attends the force as a volunteer) crossed the Ganges into Oude on the 19th ultimo. The works erected by the rebels to oppose the passage do not appear after all to have been so formidable in their character as was supposed. Two

companies of H. M.'s 78th Highlanders and the Seikh Regiment of Ferozepore with some heavy guns occupied an island and thence opened a fire on the enemy's position from which they were speedily dislodged. The whole group then crossed over the Ganges with little loss beyond that caused by a few accidents and some little confusion. The force was composed as follows :

INFANTRY.

1st Brigade.

Units	Command
H. M.'s 5th Fusiliers " " 84 Foot " " 64 Foot, detachment	Brigadier General Neill commanding.

2nd. Brigade.

Units	Command
H. M's 78th Highlanders " " 90th Foot Regiment of Ferozepore	Brigadier Hamilton commanding.

ARTILLERY

Units	Command
Captain Maude's battery Captain Olphert's battery Major Eyre's battery	Major Cooner commanding.

CAVALRY.

Units	Command
Volunteer Cavalry 12th Irregular Cavalry	Captain Barrow commanding..

ENGINEER DEPARTMENT.

Officers	Role
Captain Crommelia	Chief Engineer.
Lieutenants Limond and Judge and Captain Oakes	Assistant Field Engineers.

Brigadier General Havelock, C. B.. to command the force.

The progress of this force does not appear to have been further interrupted for miles after it had crossed over. The rebels are described as flying before it. The latest advices are dated Camp Babugunge, thirty four miles from Cawnpore, 22nd September. Thence firing was distinctly heard from Lucknow. It is stated that the rebels seeing the near approach of the relieving force made a last desperate attack upon the intrenchments, in which they would have nearly succeeded, but for the still more desperate character the defence. The soldiers finding that nothing would

prevent the assilants from making up to the intrenchments, and their mortars failing, they fired the fuses of shells and hurled them with their hands among the masses below. intelligence of the rescue of the garrison will doubtless reach us in the course of today.

The province of Behar has for the present been abandoned by the rebels. The capture of Cooar Singh's stronghold by Major Eyre and the flight of that chief seems to have deprived the mutineers and the rebels of all lead, there, and they accordingly crossed the Soane and entered into the northern districts. Cooar Singh too seems to have transferred his activity to the same regions. The province, however, is not safe. Umur Singh is hovering about Sasseram. Cooar Singh, reinforced by the people of Rewas, purposes to return of Behar. The population of the locality is still in a stage of excitement. A battle has been fought with the insurgents of Azimgurh in which they were defeated with severe loss.

The Santhals are still giving trouble. In the district of Maunbhoom, they have got for their leader one Koonkur Coomar, a notorious dacoit who was released from the jail of Hazareebagh by the mutineers, and other people of a similar character. They have commenced to plunder, but are held in check by the Seikhs.

The province of Assam has not yet been disturbed by any actual outbreak. The local troops are still obedient. The ex-Rajah of Assam as well as the ex-Rajah of Jynteeah have been placed in custody, and the tranquility of that part of the country may be considered safe.

The mutinies are not yet at an end. The 50th N. I. at Nagode and the 52nd at Jubulpore have mutinied. At the later place, the mutineers were met by Madras troops who inflicted severe loss upon them. No officers have been killed.

1 October 1857

LIST OF NATIVES OF BENGAL ESCAPED AFTER THE MUTINIES

3rd June At Neemuch	1st July At Indore	1st July 10 P.M. Mhow	6th July 2nd line Mehidpore	4th July Augur	7th July Shajehanpore in Malua.

NAMES	PLACE OF RESIDENCE	SITUATIONS HELD BY	REMARKS
Hurrochunder Dutt & family	Chundernagore	Head Assistant Indore Ageny office.	The mutiny broke out at 9 in the morning; escaped by concealing into the city, remained there five days shifting the place of concealment every day; on the 6th removec to Mhow; every thing plundered save the cloths on their back; for further particulars see the Bombay Times.
Gungachurn Dass & family	Hooghly	Assistant Accountant Ditto.	
Baikont Nath Chatterjee & family	Kanaiepore near Serampore	Head Assistant Indore Opium Ageny.	
Nobinchunder Gangooly	Ditto	Assistant Ditto.	
Kedarnauth Chunder	Chundernagore	Deputy Post Master Indore.	Were fired at and pursued while escaping; now safe; they were at office when mutiny took place and saw the family of the inspecting Post Master murdered.
Gopal Chunder Dass	Hooghly	Assistant Writer Ditto	
Romes Chunder Goopto	Gorepay or Noyehatty	Sub. Assistant Surgeon Neemuch Jawud	Safe at Neemuch.
Lukhinarain Dass	Dhuneykhally	Deputy post Master Neemuch	Escaped to Mundipore by jumping over the window of the Post Office as 3 troopers of the 1st Cavalry with swords drawn entered the Post Office Bungalow which they set fire to and entered; returned to Neemuch after 3 days and resumed his duties.

NAMES	PLACE OF RESIDENCE	SITUATIONS HELD BY	REMARKS
Gourmohun Ghosal	Buddeebatty near Serampore	Deputy Post Master Augur	Safe at Indore with the Deputy Post Master of that place.
Rajchunder Dass & family	Not known	Writer of the 5th Cavalry Gwalior contingent at Augur	Life saved but were severely maltreated and every thing plundered; the women and children were dragged out of the house and stripped of every thing, clothes and ornaments—whereabouts still unknown.
Chundee Churn Mitter	Bhowanipore	Living with the above Baboo at Augur.	Saved, but not known where he has escaped.
Kailas Chunder Gangolee	Kanaiepore	Writer in the Mundipore Assistant Opium Agency office.	Safe at Mhow.
Ramkomul Roy	Near Gorepay	Deputy Post Master of Mundipore.	Escaped to Neemuch but returned to Mundipore and resumed his duties.
Hurodass Banerjee	Benares	Writter Indore Agency office	Concealed in his servant's house but the traitor expelled him in the night stripping him every thing; disguised as a Fukeer remained 5 of 6 days in a village; thence removed to Mhow.
Kailaschunder Bose & family	Bamonmoora near Baraset	Writer in the Assistant General Superintendent's office at Mhow.	
Beneemadhub Ghosh & family	Amradanga	Adjutant's Writer of the 23rd N.L.	

NAMES	PLACE OF RESIDENCE	SITUATIONS HELD BY	REMARKS
Kedernauth Dutt & family		Quater master's ditto of ditto.	Safe at Mhow. Mutiny occurred but the bazar and other people were left unmolested; 6 Bunglows burnt and 3 officers killed; further particulars see in the Bombay Times.
Sreenath Mitter	Conenuggur	Brigade major's ditto.	
Denonauth Mitter	Rajpoor	Comt Gomashta at Mhow.	
Rammohun Banerjee	Satgachey near Calnath	Living with do; held the situation of Cattle Gomashta.	
Mudhosoodun Banerje	Rungpore near Barrackpore	Living with ditto.	
Taraknauth Banerjee	Seebpore opposite Calcutta	Write 1st Lt. cavalry.	Escaped to Indore, every thing lost.
Woomahchurn Dass	Hooghly	Deputy Post Master Shajehanpore.	
Bhugovan Chunder Dutt	Chundernagore	Head writer Nimar Agency office.	Safe : nothing occurred at Mundlaisir.
Kissoreemohun Sain	Hooghly	Writer in the Sehore Agency office	Safe at Hossungabad where they accompanied the Political Agent, Major Rickards.

NAMES	PLACE OF RESIDENCE	SITUATIONS HELD BY	REMARKS
Bhoobun Mohun Mitter	Conenuggur		
Huronauth Bose & family	Bamoonmoora	Deputy Post Master Schore.	Still at Sehore (Town). The post office, Contingent and Tresury have all been made over of the Begum of Bhopal.
Bissessur Sain & family	Baraset	Head Writer of the Bhopal contingent.	Twice escaped; once in June and again on the 6th
Bissessur Dutt & father	Bamoonmoora	Assistant ditto.	July to Oojein but retuned to Mehidpore on the 17th July on the return of the officers who also
Jadub Chunder Seal	Hooghly	Writer of the Mehidpore contingent.	escaped on both occasions with their families.
Dwarknath Seal	Ditto		
Mohes Chunder Roy	Bamoonmoora	Writer in the Sillana Superintendent's office	Safe at Indore.
Bhugoban Chunder Roy brother of the above.	Ditto	Deputy Post Master Mehidpore.	Safe at Mehidpore.

9

Dehli has fallen and the garrison of Lucknow has been relieved. The first is a glorious act, the latter a noble one.

It is impossible to overrate the impartance of the event which has re-established British authority in the ancient capital of India. Its moral effect will be more than what would be achieved by the arrival of all the European troops on their way out. There can be no more mutinies—rebellion can no longer make head against the returning tide of loyalty and good sense. The insurrection has received its death-blow; and the country at large will at once feel the salutary effect of the stroke that has felled the monster. Never since the commencement of the revolt has the national feeling been better or the prospects of the disaffected worse. The final operation against the city appears to have been attended with great loss; but the result has reconciled the public to it. A walled town of an mean strength, surrounded by defences formidable though irregular in character could scarcely be taken without a heavy sacrifice of life. We wait with anxiety for the particulars the thrilling interest of which is foreshadowed by the single fact that two of the king's sons have already been executed. Unfortunately, large bodies of the rebels had deserted the city before the final assault. Had all those regiments which foreswore themselves and with eyes turned to the imperial city overlooked all obligations of duty, good faith. loyalty, friendship and self interest, been congregated for its final defence, the act of retribution would have been as complete as it has been signal. At the time of the capture but a few thousand men were present. What their fate has been it is not difficult to conjecture. The city is represented as desolate. This desolation cannot have been the effect of the bombardment only, for that was neither long nor extend over a large line of the defences. Fearful must have been the slaughter of the rebels. The destiny of the king and the survivors among his family is now the subject of debate. That nothing appeartaining to the royal estate should be left of that firebrand of India is a settled point. His life it were well to spare, and probably will be spared. His person should be brought down to Calcutta, where in the metropolis of a new civilization be should be left to represent the reliques of an effete one. His pension will, of course, be reduced to the measure of a captive's wants. The country will thus be at once relieved of an incubus and an incendiary.

The Governor General justly prides himself upon the fact that

recapture of Dehli has been effected by the aid of the ordinary resources of British India. Not a single soldier brought from beyond the confines of the presidency has had a hand in the operation. Those who believed that India was ill defended have this fact pointed out to them as a proof of the illusion they laboured under. The suddenness of the revolt precluded the possiblity of greater preparation on the part of those charged with its suppression. Yet, ere four weeks were gone, the rebels were put to fight for their lives. The delay in the realization of the final result disappointed many; but the obstinate character of the defence, and (as it must be admitted) the skill with which it was conducted showed the earlier success was impossible. The Governor General further acknowledges the value of the services and aid rendered during the entire period of the siege by the native chiefs of the north west. To the energy and influence which maintained in tranquility the territories between Delhi and Ferozepore is mainly due the protection from embarsssing attacks on the rear of the besieging force; and that energy and influence were chiefly native. How complicated, for instance, would the couduct of operations have become had the Rajah of Pattialah failed to keep his territories quiet. We are not aware of the number of troops contributed by these chiefs of General Wilson's force; but they must have formed valuable aids to an army whose principal defficiency was in numbers. Sir John Lawrence receives high praise for the tact and judgment displayed by him since the out break took place, and which have resulted in the comparative exemption of the Punjab from the consequences of the sepoy mutinies His position, to be sure, was one in which medioerity or embecility alone could fail to gain applause, but it must be admitted that he has well used his advantages.

One shudders as he thinks what would have been the fate of the garrison of Lucknow if relief had been delayed but twenty four hours longer. Two mines had been laid and advanced to a considerable distance below the walls. They were ready to be sprung, and we even now wonder that the insurgents did not at the last moment think of bringing on that catastrophe. Perhaps, their fears overpowered their malice, and the hurry of flight was not favorable to the execution of a desperate enterprise. However, if ever relief was felt, it was that brought by General Havelock's column to the despairing captives of Lucknow. Their relief is one of those exploits in the successful performance of which a soldier finds a reward greater even than glory. The history of chivalrous times does not present deeps upon which the mind can rest with greater pleasure. there is not a soul with a spark of manliness that does not envy the lowest private of General Havelock's force. It would appear that the rebels offered little opposition to the progress of the column after it crossed the Ganges and that but one battle of any importance was fought under the very walls of Lucknow. The city has been shelled; and most of

its inhabitants have fled. The troops were to retire with the relieved people to Cawnpore, and the movements has probably been already made. The passage however was not to be made without constant fighting: as even if the rebel troops be anxious to get rid of their unwelcome visitors with the least possible delay and interruption, the archrebel, Nana Sahib, will goad them on to fight. There are indications, however, of a return of reason to the minds of the people of Oude. The principal zemindars among them are making overtures for a reprieve, and Rajah Maun Singh, whom perhaps it would be doing an injustice to it we reckon him among the disloyal and temporizing, has, it is stated, actually joined General Havelock's force with nine thousand men. Yet Oude, we believe it has been settled, is for the present to be left to its fate.

The next points to which attention is to be turned are Agra and Saugor. The relief of the first named city or rather the strengthening of its garrison is, we believe, to be effected by General Havelock's force, and partly too by a detachment of the troops who have lately captured Delhi. The rebels from the last named place have probably taken refuge at Gwalior, whence in attack upon Agra is not to be considered an improbability. The detachment in pursuit cannot have done much execution; but joining the garrison of Agra it will materially contribute to its security. Gwalior must wait to be reduced by the regiments now on the Indian seas. The column of Madras troops marching from southward will probably suffice for the clearing of the Saugor and Bundlekund districts and the suppression of Boondelah violence.

Cooar Singh still infests the country west of Behar. The junction of the Rewah Rajah's men with his force has given rise to cinsiderable apprehensions of his returning to that province. The Ramgurh mutiniers in their progress upwards have been met and defeated with severe loss. The brigade of European and Madras troops which left Raneegunge some days ago has advanced a great way It will have to be divided into two sections; one marching towards Chota Nagpore and other operating above Hazareebaugh, Jaunpore and Azimgurh are still held by the outhorities; but a Mahomedan, a selfeleced Governor for the emperor of Dehli, rules Goruckpore, Much is said of the Goorkhah troops employed there, and it is stated that Junge Behadoor has offered the aid of several organized bettalions from Nepal.

8 October 1857

FRIEND OF INDIA

THE MUTINIES

The temper of the Native Army is becoming the question of the day. There mutinies in as many weeks might try the nerve even of a government which, unlike ours, could rely on the national spirit of its soldiery. The last affair at Vizianagram appears to us even more important than the similar occurrences in Bengal. The Bengal sepoy is a high caste man. His caste is his point of honour. The blunder about the pigs-fat affected him as an order introducing the lash would affect an army of Frenchmen. It was easy therefore to believe that discontent arose from temporary and exceptional causes, that the storm once faced would speedily pass away. The mutiny at Vizianagram will give a shock to many of these pleasant theories. The Madrassees have no caste. They have appearently no dread of being turned into Christians, no undercurrent of religious fanaticism to impel them. Yet the conduct of the 1st M. N. I. was at least as much opposed to the first principles of Military discipline as that of the Nineteenth. The 1s' M. N. I. were ordered to relieve another Regiment at Kurnool. Sufficient carriage for their wives and families was not forthcoming, and it was proposed to leave them behind. The men distinctly refused to march without their families. The Colonel's harangue was met with shouts of derision, and a sepoy placed under arrest was released to avoid a rescue. The Brigadier immediately proceeded to the parade, and the man with much difficulty were persuaded to march for a mile beyond the station. There they wait till carriage can be obtained.

In other words, the men of the 1st Regiment M. N. I. have succeeded in dictating at what hour, and in what manner, and with what amount of impediments they shall march on service. A more distinct and overt act of mutiny was never committed. The Madras Athenaeum, admitting the magnitude of the offence still attempts to extenuate it by saying the sepoys would have marched cheerfully against a foe. They knew the order was not emergent. We refuse absolutely to recognize a distinction which would turn every regiment in the Army into a debating club. Every order is an order on service, whether the command be to charge an enemy or to pipeclay trousers, and the one is as little open to remonstrance as the other. " To compel them to march without their baggage and families was an arbitary stretch of power, as oppressive as uncalled for." That statement deserves only a flat denial. The women and children were not left unguarded. They were not left to starve, like the wives of our own countrymen at Hydrabad. They were not even left for any length of time. The hardship was no greater than that to which every European officer submits over and over again without a murmur. Even if it had been, it is

not necessary to remonstrate, even in civil life, with "shouts of derision." The act was one of simple mutiny, and should have been punished as such on the spot. The Athenaeum says there were only six officers present and no force at hand sufficient to compel obedience. There is force in the Presidency, we presume, and the clear duty of the officers was to apply for that force, desist from their orders without withdrawing them. and on the arrival of assistance employ it unrelentingly. We do not blame them individually. We have pointed out below a cause for their hesitation other than ignorance of their duty, but we do blame those who even in philanthropy attempt to spread false ideas of their responsibility among our officers. Immediate obedience or instant death is the only rule by which armies of aliens are or can be held together. The Athenaeum says, "It will now be pretty well known in the Native ranks, that they have only to refuse en masses to go where or when they are ordered, to ensure their wishes being complied with." Not so, if one trance of the nerve which built the Empire remains in its Government. The time for concession to soldiers is nearly passed away, and regiments in mutiny en masses must find instead of "compliance", cannon. We are no advocates for a brutal violence which is more frequently produced by panic than by that calm severity by which alone armies can be ruled. We have approved the delay which has occurred in terminating the Berhampore affair. But none the less do we recognise the fact that the implicit obedience of sepoys is our necessity, that it must be secured even though we are compelled to resort to a more than Roman discipline. We do not believe our present Government, cautious and even slow as it has been, will shrink from that sad necessity, or that it will permit disobedience to assume the character of an epidemic. There is no measure however terrible in which they will not now be supported by the opinion of the public.

We alluded last week to the effect of our system of staff employ so strongly manifested in these emeutes. The disturbance at Vizianagram furnishes another illustration. The complement of officers, nominally twenty-two, was in reality only six. Of these only four were in the ranks, and of them one was a lad who had not passed his drill. The regiment was in fact a regiment of irregulars with these important differences. The commandant was not a young man. He possessed no power in the Regiment. He was not supported by his native officers. And this, too, in a Presidency where the discipline of a native corps approaches in strictness to that of an European Regiment.

The occurrence, like that at Berhampore, has brought out one more fact, which ought to be recognized and removed at once. Our officers do not know how far their responsibility extends. They cannot be certain whether in ensuring obedience by force they will receive an earnest support. They are afraid of responsibility, of stepping even for an instant over the routine. They know perfectly well that discipline is to be maintained. Col. Mitchell knew it when he ordered out the artillery at

Berhampore. They shrink from no personal danger, but they dread the civil risk, the disfavour of Government, the possible loss of promotion or command. This doubt ought at once to be removed by a formal order to the troops. Such an order, announcing distinctly the duty as well as the right of every officer to compel obedience, would not be without its effect on the sepoys. They have no especial grievances. There is no trace in all these movements of a leader, or a cause, or a combined plan. They are simply obeying one of those capricious impulses which spring up among idle men, consicious that the control over them has relaxed, and carving for excitement of any kind. It is only weakness which can make that impulse dangerous, and an order such as we have suggested would be accepted as evidence of strength. No measure of this kind, we are well aware, will remove the true source of the difficulty. But it will at least enable us to make full use of the strength we have, and relieve our officers of an indecision which is almost as injurious as actual weakness. For the rest, if we would retain our Army as a body of men competent for other then police duties, the staff system must be reformed.

The best officers are selected for staff employ. They are selected from interest, one because he once lived next door to a Governor-General's aunt, another because he killed quail by the dozen for a Commander-in-Chief's third course. But the best men are all left. They merely shew that the best men in the Army are the most discontented. It will not venture to deny that every officer hungers for staff employ, thinks he ought to obtain it, regards his residence with his regiment as a grievance rather than a privilege. That is the effect of which we complain, not an imaginary paucity of intellect in the ranks. While the highest object of a soldier's ambition is to cease to be a soldier, there can be no true soldiership.

26 March 1857

2

The 19th N. I. have been disbanded. With a cold confidence which of itself indicated strength, the Government of India had resolved that the sentence should be inflicted in the presence of the very men suspected of disaffection. The Regiment was accordingly ordered to Barrackpore, where it arrived on the 31st March. Meanwhile every precaution that prudence could suggest to strengthen the hands of the General in command had been adopted. H. M.'s 84th had been brought up from Burmah. A wing of H. M.'s 53rd had been marched up from Calcutta. A troop of Madras Artillery on its way to its own Presidency was detained at the station. A second troop had been ordered from Dum Dum. The bodyguard was also on the spot, and in fact every soldier in the Presidency who could be spared from actual duty was present on the parade. The Europeans and native artillery were drawn upon one side, the four native regiments opposite, and the 19th marched into the centre, and

General Hearsey was given an order which read at the head of every Regiment, Troop and Company in the Service.

The arms were piled, and the colours were deposited with them, but the uniforms were not stripped off. Government while punishing mutiny with sternness refrained even from the appearance of vindictive feeling. Their pay was then delivered, while the Major General addressed the men of the Brigade. The 19th were then enveloped by Cavalry and marched to Chinsurah, where they will remain until the arrival of their wives and families. The regiment was most submissive, and the lesson is believed to have been severely felt by the remainder of the troops.

We cannot believe that the warning so public and so impressive will be disregarded by the Native Army. Throughout, the policy of Government has been clear, temperate, and decided. There has been no panic, no haste to punish, no descent from severity to bloodthirstiness. The men were fairly heard, fairly tried, fairly condemned. They were marched at once into the only station where they could hope for active sympathy, and there subjected to the highest secondary punishment known to our military law. Those who talk lightly of disbandment forget what it implies to native soldiers. To the native officers and the older sepoys it means immediate and total ruin. The labours of a life are thrown away. From a position which gives them among their own countrymen sufficient wealth and high social status, they sink into tillers of the soil. The younger sepoys may possibly re-enlist,but even they have lost years of service, all the position they had previously earned. Even they must cross India without means, enter an army in which caste is lightly regarded, and in which men achieve commissions not by seniority, but success. It is however the manner rather than the extent of the sentence which lends it its peculiar force. The men were punished in the centre of their comrades. The Government with a wise forbearance spared their lives. But every sepoy there knew that a movement, a shout, any one overt sign of sympathy, would call down a terrible retribution, that General Hearsey had his orders in his pocket, and that General Hearsey is accustomed to carry out his instructions. They were taught that the Government which passed over their offences could crush as well as spare, that even in physical force, the last resort of mutiniers, they were not matched by the defenders of the law. The order read at the head of every regiment will convince the sepoys, that it "their obedience is our necessity" it is also theirs.

The whole action of Government, the trial at Berhampore, the three weeks' delay, the calm preparation, the abstinence from blood, indicates their determined policy. It is not one of mere violence. Their officers are openly and decisively supported. Every Colonel is enabled to secure from his soldiers that obedience which is his due, and which they have sworn is afford. No mercy will be shewn to those who on Sunday last refused to

assist their officers in the arrest of an assassin. But he is nonetheless forbidden to mistake hurry for vigour, to consider that bloodshed is the first corrective for discontent, to believe that physical force can compensate in the eyes of his superiors for the absence of force of character. He must secure obedience, but he is not to forget that to employ one are against another, Europeans against natives, is a course only to be justified when the circumstances are extreme. There is perhaps at this moment in the Army too great a tendency to distrust, to believe that there is a "bad spirit" in the men only to be exercised with blood. That is not the policy of the Government of India. But commanding officers must remember that the fact which averts a mutiny is as commendable as the energy which crushes it, that their first duty is to enforce, not coerce obedience, that premature menaces may produce out breaks which spring not out of mutiny, but despair. In all cases a clam well-weighed severity will be more efficacious, as it will be better received, than a hasty impulsive "vigour".

We hope that some extra precautions will be adopted to compel the disbanded to return Northward.

2 April 1857

THE PUNISHMENT FOR MUTINY

The position of the Governor-General is however with regard to military affairs, a very anomalous one. On the first report of disaffection in Bengal it was the duty of the Commander-in-Chief to hasten to Calcutta, and initiate the measures to be takes to make easy and no one grudges such enjoyment to the seniors of the service, but emergency sometimes calls on the old as well as the young, and the present head of the Indian army is not entitled to claim exemption from the common lot of soldiers. We hope we are not doing him injustice in imputing the delay that has occurred in dealing out what is called 'severe punishment' to mutiniers, to his personal inactivity. We should indeed be sorry to hear that it was owing to his deliberate counsels. Clearly enough the native army requires better guidance, and it will be wise to provide at once the indispensable material.

14 May 1857

AMERICAN VIEW OF THE SEPOY MUTINIES

The English public have entirely misunderstood the nature of the crisis, the Americans have, with their usual aptitude, at once seized the idea of the rebellion. They foresaw from the receipt of the intelligence, not of the massacre at Meerut, but simply of the spirit which animated the 19th and 34th regiments, that it was no common movement which was

about to take place in India. They divested the matter from the semi-religious cloak which it wore, and ignoring greased cartridges and missionary subscriptions perceived that the denouement of a conspirary planned with consummate skill perhaps for many years past was at hand. That the English empire in India was founded upon military prestige rather than upon the goodwill of the governed, they assumed as an axiom; and foresaw that anything which tended to shake the foundation would cause the super-structure to totter. One would have thought that the matter was simple enough, and that any man of ordinary experience would have at once seen through the flimsy pretext of the cartridge, which including both Mussulman and Hindoo was too evidently the work of design rather than the spontaneous growth of earnest men anxious for the religion in which their forefathers had been brought up, and which was interwoven with their very existence as a nation. If the movement had its foundation in religious bigotry the Hindoo could not under any circumstances have coalesced with the Mussulman whom he has ever regarded as his natural foe. But the truth is, that for many years past the religious perjudice of the natives have been a perfect bugbear to the English. It has been instilled into the minds of Englishmen by every class of men; by statesmen and warriors, by Civil Servants and Adventurers that the races of Asia were so rigidly attached to the chains of their superstitions, that any nation which attempted to interfere would infallibly lose, and deservedly so, any power which they might possess over the millions of Hindoostan. The fate of the Portuguese and the failure of the proselytising institutions at Goa were held up as a warning, until it became part of our creed, that the absolute maintenance of caste and of all its concurrent evils was essential to the duration of our power. It is then hardly to be wondered at, if on the first outbreak of rebellion we considered it solely in its religious aspect and thought that the goodwill of those under our rule would return by the removal of all possible ground of complaint, and the reiterated assurance that the religion of the natives was not to be interfered with, either by cartridges or by missionaries, or in any other way. But in process of time we began to feel that the natives were well aware of our erroneous supposition of their religious earnestness, and intended to take advantage of our mistaken notion. The stalking horse however soon played its part, and was thrown aside as worthless; though not until the armed men which it had concealed were let loose on the country. Self-created Rajas... and unpatented Bahadoors quickly made their appearance, and the dream was dispelled. It was found that these men were the master spirits of the rebellion, and that the mass of the people had discovered murder and plunder too congenial to their tastes to be given up, even when the sham under which they had been commenced was seen through. The Americans on the other hand had no such notions; they had no Court of Directors to play upon their credulity, and using that

they had neither surrendered to the keeping of another or swathed up in swaddling bands until it could not even look forth, predicted that a strike was to be made for the empire, and that the Centenary of Plassey, the era of the occasion when the British supremacy had been decided, was to witness another struggle, not with undisciplined hordes but with men who had been trained to fight in our wars and had been equipped from our treasury. We do not give the Americans any credit for extraordinary acuteness, but we say that approaching the subject without any of that diffidence which is too common amongst the people of England, they were the first to discover the reality, and the cause of the danger. But we do not agree, neither we think do the American people at large either will the ill-concealed tone of exultation which it breathes. America has quite sufficient to occupy all its attention for many years to come without meddling in Asiatic politics or endeavouring to open out impossible routes to traffic with China, and on the eve of a struggle between the pro and anti slavery parties can but too ill afford to provoke the indignation of Great Britain by causing her any embarrassment at the present crisis.
23 July 1857

LORD ELLENBOROUGH AND THE CAUSE OF THE MUTINIES

In February 1842 Lord Ellenborough, was greeted in Madras roads by the disastrous tidings from Afghanistan, he observed that bad as the news was, he expected something still worse. The something still worse was a mutiny of the army, and that which overshadowed the termination of his career has again directed the eyes of all England upon him. It never could be supposed that the man who fifteen years ago had dreaded a spirit of insubordination in the army as the worst evil that could be fall India should, when the time had arrived for such forebodings to be realised, have ignored the danger.

The administration of Lord Canning has been attacked at point where it is the least vulnerable and the Governor-General has been accused of folly for treading in the footsteps of Bentinck, Hastings and Dalhousie. Though the House if they had reflected for a moment would have discovered the fallacy of the assertion, known but to few even of the Europeans, should have in a moment called forth a mutiny in places so widely separate as Barrackpore, Berhampore and Meerut; yet led away by the genius of Lord Ellenborough, most agreed with the Marquis of Lansdowne when he asserted that it "Lord Canning had so acted as to given countenance to such a belief as the Noble Earl inferred, he would no longer deserve to be continued in his office as Governor-General of India." Though with all candour we acknowledge the abilities of Lord Ellenborough yet the antitheses of his character are as startling as the

antitheses of his speeches, and in the very discreetness which he was advocating, he shewed that indiscreetness which he would have avoided. A mischievous tendency they have had and the policy which dictated them if put in practice the result would be most lamentable.
23 July 1857

LORD DALHOUSIE AND THE MUTINIES

Men to whom Lord Dalhousie's smile was sunshine for the day are decrying motives too high for their appreciation. Others who base reputations on the relics of his plans doubt "if his policy were absolutely sound." We are not concerned to defend Lord Dalhousie personally. Impatience is the attribute of weakness, and he and we can wait till the lampoodors find it time once more to change their tone. Nor do we greatly care to defend his policy, albeit identical with our own. That policy has survived alike the weak and the strong, Vansittart and Lord W. Bentinck, Lord Auckland and Lord Dalhousie. It will survive Lord Canning. God is not dead, because the Press is in irons, and the ultimate triumph of those broad ideas is as inevitable as the victory of good over evil, of truth oever falshood, of Great Britain over Young Bengal. And when his power to help or hurt is over, and the men he made are shrinking from his side, we repeat as unhesitatingly as of old our confidence in his wisdom.
29 October 1857

প র্য বে ক্ষ ণ ১

১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল
পর্যন্ত লিখিত বিবরণ

রামগোপাল সান্যাল
১৮৫০-১৯২১

সিপাহি যুদ্ধ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়*

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তিপূর্ণ কুশলময় আকাশে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ উঠিল। ঐ মেঘ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া যে ঘোর অনিষ্ট উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ জানেন। ১০ মে রবিবার অপরাহ্নে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মীরট নামক স্থানে সিপাহিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল। মীরট হইতে দিল্লি, দিল্লি হইতে লখনউ এবং পরে অন্যান্য স্থানে যুদ্ধানল প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইল। সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিগণ ইহাতে যোগ দিল। ইহারা পূর্বেই নানা কারণে ইংরাজ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়াছিল। লর্ড ডালহাউসির রাজ্যশাসন কালে অযোধ্যা, সেতারা, ঝাঁসি, নাগপুর প্রভৃতির দেশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত স্থানসকল খাস করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে এই অসন্তোষ অন্যান্য কারণে দৃঢ়ীভূত হইল।

সৈনিক দলে প্রবেশ করিয়া পূর্বের ন্যায় আর সম্মানের পদ লোকের পাওয়া অসম্ভব হইল। অন্যান্য চাকরিও পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। এই সিপাহিগণের বলে ব্রিটিশ সিংহ পঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের এই অভিমান থাকিলেও পূর্বের ন্যায় আর সম্মান পাইত না। অযোধ্যার সিপাহি অনেকেই নিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। এমন সময়ে এক জনরব উঠিল যে, চর্বিবিশিষ্ট টোটা তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবেক। সে চর্বি, যে সে চর্বি নহে, ইহা গোরু ও শূকরের চর্বি। সুতরাং মুসলমান ও হিন্দু উভয় দলেই ভাবিল যে, ইংরাজেরা প্রকারান্তরে তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মূর্খতা নানা অনিষ্টের প্রসূতি। কাজে কাজেই তাহারা না বুঝিয়া পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখায় লম্ফ প্রদান করে, সেইরূপ ইংরাজ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যেখানে ইংরাজ দেখিল, সেই স্থানে তাহার প্রাণ হত্যা করিল, ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল শ্মশানতুল্য হইল। ইংরাজরা বৈরনির্যাতনে ক্রুটি করিলেন না। পরস্পরের অত্যাচারে দেশ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। গৃহদাহ, স্ত্রীহত্যা, অসহায় বালক বালিকা হত্যা, নগরলুণ্ঠন প্রতিদিন ঘটিতে লাগিল। অত্যাচার করিলে অত্যাচার করিতে হয়, ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এ স্বভাব সভ্যতা ও অসভ্যতার তারতম্য ভেদে বেশি কম হইতে পারে বটে কিন্তু সিপাহি যুদ্ধে সভ্য ইংরাজ যে অসভ্য হিন্দুস্থানীয় অপেক্ষা কম অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রমাণ হয় না।

এইরূপে দেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা এ স্থানে অসম্ভব। এই সঙ্কটপরিপূর্ণ অবস্থায় হরিশচন্দ্র যে এ দেশীয়দিগের কি উপকার করিয়াছিলেন, তাহা

** হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী—রামগোপাল সান্যাল ১৮৮৭ খ্রিঃ। কলকাতা*

নিম্নে বর্ণনা করিব। এ দেশের সাহেবেরা যে, কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া নামক খবরের কাগজে লিখিত আছে যে, যখন সিপাহি যুদ্ধের সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিল, তখন অনেক সাহেবের মেমেরা ভয়ে গঙ্গার উপরে জাহাজে গিয়া রহিলেন। সকল সাহেবের পকেট কিংবা হাতে সর্বদা পিস্তল ও বন্দুক থাকিত। বন্দুক না লইয়া কেহ ঘরের বাহির হইত না। সকলেই ভয়ে অস্থির। শঙ্কা উপস্থিত হইলে শঙ্কার কারণ নিবারণে মনুষ্য ব্যস্ত হয়। সুতরাং ইংরাজেরা এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের দেশীয় লোকদিগের নিকট অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হউক। মুসলমানগণের মহরম পর্ব সন্নিকট হইলে ইংরাজদিগের আতঙ্ক অধিকতর বৃদ্ধি হইল। কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের সেসনের কার্য শেষ হইলে কলিকাতার গ্রান্ড জুরির প্রধান সাহেব (Foreman) জে, এইচ, ফর্গুসন সাহেব আদালতকে অনুরোধ করিলেন যে তাহাদের একটি প্রস্তাব বড়লাট সাহেবের কাছে পাঠাইতে হইবে। সুপ্রিম কোর্টে যে সকল অপরাধের বিচার হইত, যদি জুরি দেখিতেন যে, সেই অপরাধে সমাজের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে. তাহা হইলে উহার প্রতিবিধান জন্য গবর্নর জেনরেলের নিকটে কোনরূপ প্রস্তাব করিবার উক্ত জুরির অধিকার ছিল। ইহাকেই ইংরাজিতে Power of presentment বলে। এই ক্ষমতানুসারে তাহারা প্রস্তাব করিলেন যে আগামী মহরমে তাহাদের জীবনের আশঙ্কা অধিক বোধে তাহারা লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কলিকাতার সমস্ত দেশীয় লোকের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হউক এবং অস্ত্র রাখিবার বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ করা হউক। মহাত্মা হরিশ এ সম্বন্ধে এই আপত্তি করিলেন যে, গ্রান্ড জুরির উক্ত রূপ ক্ষমতা থাকিলেও তাহারা ঐ ক্ষমতানুসারে এতদ্দেশীয়দিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইবার ও অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিবার সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারেন না। গ্রান্ড জুরি উপস্থিত স্থলে আপনাদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনধিকার চর্চা করিয়াছেন। লাট সাহেব ও তাহার সদস্যগণ গ্রান্ড জুরির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। এই সময়ে লাট সাহেবের সভায় জে, ডোরিন, বার্নিজ পীকক (যিনি পরে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস হইয়াছিলেন,) এবং জে, লো সাহেব সদস্য ছিলেন। ইহাতে সাহেবরা লাট সাহেবের উপর অনেক অসন্তুষ্ট হইলেন।

খবরের কাগজ ইংরাজদিগের বড় আদরের বস্তু। ইহার আদর ও ক্ষমতা বিলাতে এত বেশি যে ইহাকে রাজ্যের চতুর্থাঙ্গ বলে। কোন সাধারণ হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কিংবা কোন আইন বিধিবদ্ধ বা রদ করিতে হইলে, দেশের রুচির পরিবর্তন করিতে হইলে, দেশের আচার ব্যবহার ধর্মপ্রণালী পরিবর্তন বা উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সংবাদপত্রে জনসাধারণের মত প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তদ্দ্বারা শাসনকর্তাদিগের মত পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের অবস্থা শাসনকর্তারা অনেক সময়ে জানিতে পারেন না। এমন অবস্থায় আমাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার ও অবিচার করা হইয়াছিল, তাহা শাসনকর্তাদিগকে না জানাইলে হয়তো দেশের বহুপ্রকারে ক্ষতি হইত। সাহেবেরা এই ঘোর বিপত্তির সময়ে দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের কাগজে বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত করিতে লাগিল, এবং বৈরনির্যাতনের বিবিধ উপায় অবলম্বন মানসে গবর্নমেন্টকে দয়াধর্মশূন্য হইতে বলিল। এই সময়ে হরিশ একাকী এই সকল লোকের

কল্পিত মিথ্যা বাক্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এখনকার মতো সে সময়ে ইংরাজি ও বাঙালি কাগজের ছড়াছড়ি ছিল না, তখন কৃষ্ণদাস ও শম্ভু শিক্ষানবিশি করিতেছিলেন, নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ও শিশির বালক, কাজে কাজেই দেশের পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলে এমন লোক অধিক ছিল না। এমন অবস্থায় হরিশ যে এদেশের কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ হরিশের লিখিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন। কাগজে বেশি চিৎকার না করিতে পারিলে কোন বিষয়েই জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সাহেব ও ফিরিঙ্গিগণ দলবদ্ধ হইয়া—দিন দিন নূতন বিষয়ে দেশীয়দিগের স্বত্বাধিকার লোপ করিবার মানসে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের পক্ষ হইয়া বড় বড় খবরের কাগজ সকল হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ইংলিশম্যান, ফিনিক্স, হরকরা এক বাক্যে ইংরাজ পক্ষ হইয়া এতদ্দেশীয়দিগের উপর কোন সৎবিচার ও ক্ষমা প্রদর্শন না করা হয়, এতদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইল। সে সময়ে এদেশের পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলে, এমন লোক ছিল না। হরিশ একাকী হিন্দুপেট্রিয়টে স্বদেশের অহিতকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোর কলমে লিখিতে লাগিলেন। যখন ইংরাজেরা কলিকাতার অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিতে পরামর্শ দিলেন তখন হরিশচন্দ্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার অমূলকতা দেখাইয়া দেন। লর্ড ক্যানিং তখন আমাদের দেশের বড়লাট, ও সেসিল বিডন ইন্ডিয়া গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি ছিলেন। ইহারা হরিশকে শ্রদ্ধা করিতেন। হরিশ লর্ড ক্যানিঙের কার্যপ্রণালীর পোষকতা করিতে লাগিলেন।

লর্ড ক্যানিং নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া এদেশীয়দিগের ধর্মে গবর্নমেন্ট কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না ইহা বলিয়া লোকদিগকে আশ্বস্ত করেন।

নং ৯৫২

হোম ডিপার্টমেন্ট ১৬ মে ১৮৫৭

লাট সাহেবের ঘোষণাপত্র

লাট সাহেব মন্ত্রিসভার সদস্যগণসহ দেশীয় সৈন্যগণকে সতর্ক করিতেছেন যে কোন কোন রেজিমেন্টের লোকেরা এইরূপ রটাইয়া দিয়া লোকের মনে সন্দেহ উৎপন্ন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট তাহাদের ধর্ম ও জাতি নষ্ট করিতে মানস করিয়াছেন। ইহা অলীক ও মিথ্যা কথা।

লাট সাহেব ও সদস্যগণ জানিয়াছেন যে, এই সন্দেহ, কুঅভিসন্ধিবিশিষ্ট দুষ্ট লোকেরা কেবল সৈন্যমধ্যে নহে জনসাধারণ মধ্যেও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

লাট সাহেব ইহা জানিয়াছেন যে, এই বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ ও অন্যান্য প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, গবর্নমেন্ট প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাহাদিগের ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য কার্য করিতেছেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাহাদিগকে নানা উপায়ে জাতিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এই সকল মিথ্যা দ্বারা অনেকে প্রতারিত হইয়াছে। পুনর্বার লাট সাহেব সকল শ্রেণির প্রজাগণকে সাবধান করিতেছেন যে, তাহারা যেন এইরূপ অলীক বাক্যে প্রতারিত না হন। লাট সাহেব সকল শ্রেণির প্রজাগণের ধর্মপ্রবৃত্তি ও ধর্মভাব বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন।

লাট সাহেব ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না, তিনি পুনর্বার স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করিতেছেন, যে গবর্নমেন্ট কখনই কোন ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না; এবং সকল শ্রেণির প্রজাগণের ধর্মরক্ষা ও জাতীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না।

লাট সাহেব ও তাহার সদস্যগণ কখন প্রজাবর্গকে প্রতারণা করেন নাই, এবং তজ্জন্য তিনি প্রজাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাহারা এই সকল বিদ্রোহসূচক মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস না করেন। যাহারা এ পর্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ রাজভক্তি ও সদাচরণে গবর্নমেন্টের অনুরক্ত রহিয়াছে এবং গবর্নমেন্ট সকলকে রক্ষা করেন, ও সকলের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উপস্থিত ঘোষণাপত্র তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রচারিত হইল।

লাট সাহেব এই সকল প্রজাকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাহারা দুষ্ট বিশ্বাসঘাতকের কথা শুনিয়া বিপদে ও লজ্জায় পড়িবার পূর্বে যেন সাবধান হইয়া বিবেচনা করেন।

সিসিল বিডন
সেক্রেটারি
মে ২১, ১৮৫৭

হরিশ এই ঘোষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লাট সাহেব ক্যানিংয়ের পক্ষ সমর্থন করেন। ইংরাজ সম্পাদকগণ ইহাকে ভীরুতার পরিচায়ক বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিন দিন বিদ্রোহানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইল। সমস্ত অযোধ্যা, রহিলখণ্ড, মধ্য ভারতবর্ষ ও বেহারের কতিপয় স্থান উচ্ছৃঙ্খল হইল। কাজে কাজেই দিন দিন সাহেবদিগের ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা গবর্নমেন্টের ও দেশীয়লোকদিগের বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ করিতে লাগিলেন। অগত্যা গবর্নমেন্ট ১৮৫৭ সালে ১৩ জুন এক বৎসরের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ১৫ আইন পাশ করিলেন। এই আইনে ইংরাজ ও দেশীয় সম্বাদপত্রের সমভাবে স্বাধীনতা খর্ব করা হইল। ইংরাজেরা এই কারণে লাট ক্যানিংয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পরেই ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া নামক পত্রিকায় "পলাসি যুদ্ধের শত বার্ষিক সমাপ্তি" নামক এক প্রবন্ধ বাহির হইল। ইহাতে দেশীয়দিগের উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল। গবর্নমেন্ট ঐ কাগজের স্বত্বাধিকারীকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া পুনর্বার এরূপ মনান্তরসূচক প্রবন্ধ না লেখা হয়, তাহার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। লিখিত আছে যে, এই প্রবন্ধের লেখক মিঃ হেনরি মিড ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিলেন। হেনরি মিড ইতিপূর্বে দিল্লি গেজেট নামক বিখ্যাত সম্বাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইনি কলিকাতার গঙ্গায় পার হইবার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়ে কলিকাতার সাহেবেরা সমস্ত বঙ্গে মার্সিয়াল আইন জারি করিবার জন্য গবর্নমেন্টে আবেদন করেন। মার্সিয়াল আইন জারি হইলে বিদ্রোহকারীদিগের বিচার সাহেবেরা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। হরিশ এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই যে কলিকাতার ইংরাজদিগের কথায় গবর্নমেন্ট ঘোষণা করিবেন, যে বঙ্গের শাসনকর্তৃত্ব বলশূন্য হইয়াছে, এবং বঙ্গে অদ্য অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। বঙ্গের লোকেরা এই বিদ্রোহ বশত অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছে, বাণিজ্য বন্ধ হইয়া দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, রাজনৈতিক উন্নতির আশার পথে কণ্টক পড়িয়াছে, সামাজিক উন্নতি কিয়ৎদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে—অদ্য বঙ্গবাসী পরের দোষে এই সকল কষ্ট ভোগ করিতেছে—এবং এই ক্লেশের পিণ্ডান্তে পিণ্ড শেষ করিবার জন্য সাহেবেরা আমাদিগকে আইনবহির্ভূত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন।"

এই সময়ে এ দেশীয়দিগের প্রতি সাহেবদিগের কিরূপ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা সেই সময়ের সংবাদপত্র পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। মনুষ্য রাগে উন্মত্ত হইলে যে জ্ঞানশূন্য হয় তাহার প্রমাণ এই স্থলে পাওয়া যায়।

ইংলিশম্যান কাগজ বলিতে লাগিলেন যে এই সময় হইতে দেশের সকল প্রকার ক্ষমতা ইংরাজদিগের হস্তে বিন্যস্ত হউক। হরকরা পত্রিকা বলিলেন যে নিম্নতর কর্ম সকল ইংরাজদিগকে দেওয়া হউক এবং ফিনিক্স ফিরিঙ্গিদিগের পক্ষ হইয়া সকল চাকরিই তাহাদিগকে দিতে বলিলেন।

লর্ড ক্যানিং তাহাদের আত্মারাম সরকার হইলেন। তিনি যাহা করিতে লাগিলেন, তাহাতেই দোষারোপ করিতে লাগিল। সাহেবেরা এক সভা করিয়া তাহার নাম ইন্ডিয়ান রিফরম লিগ রাখিলেন। এই লিগ অর্থাৎ সভা হইতে লর্ড ক্যানিংকে অপমানের সহিত ভাবতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহারা বিলাতে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু সে দরখাস্তও লর্ড এলেনবরো না-মঞ্জুর করিলেন। ইহাতে তাহাদের আর ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না।

হরিশ এই সঙ্কট সময়ে লর্ড ক্যানিংয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া দেশের যে কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা এক মুখে বলা যায় না। লর্ড ক্যানিং হরিশের সহায়তা পাইয়া যে এই ভীষণ সময়ে ধর্মভাবে দয়া দাক্ষিণ্যের সহিত বিদ্রোহ দমন করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রাতঃকালে উঠিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেন। কাগজ আসিতে দেরি হইলে সময়ে সময়ে নিজ লোক প্রেরণ করিয়া উহা আনাইয়া লইতেন। পার্লামেন্ট সভায় যখন এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয় তখন লর্ড গ্রানবিল হরিশের লিখিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের রাজনীতি সমর্থন করেন।

এই বিবাদের সময়ে ইংরাজদিগের হুহুঙ্কার নাদে ক্যানিংকে সময়ে সময়ে ইংরাজ অনুকূল আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এ দেশীয়গণ বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখিতে পারিবেন না ইহা জারি হইল, রাজদ্রোহী সংলিপ্ত অবৈধ কার্যের প্রতিকার অভিপ্রায়ে ১৬ আইন পাশ হইল। এই আইন বঙ্গে যাহাতে জারি না হয় তাহার জন্য হরিশ বৃথা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৬ আইন যে কেবল রাজবিদ্রোহসূচক গর্হিত কার্যের প্রতিবিধান জন্য বিধিবদ্ধ হয় এমন নহে। ইহাতে ঘর জ্বালানি, ডাকাইতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি অবৈধ কার্যের শাস্তি দিবার জন্য বিশেষ নিয়ম করা হয়। হরিশ এই সকল নিয়মের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন সাধারণ ফৌজদারী আদালতে এই সকল দোষের বিচার হওয়া উচিত, অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে এ ভার অর্পণ করা উচিত নহে।

বিদ্রোহ শেষ হওয়া পর্যন্ত হরিশ গবর্নমেন্টের পক্ষে লিখিতে থাকেন। রাজকর্মচারীরা যখন যে আইনবহির্ভূত কার্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়া ক্যানিংয়ের গোচর করিতেন। এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে সকল বিষয়েই বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। রাজকর্মচারিদিগের মধ্যে মন মিল ছিল না। গ্রান্ট সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সেই সময়ে ছোটলাট ছিলেন। তিনি একদা ঘোষণা করেন যে, বিদ্রোহীদিগের প্রাণদণ্ড বড়লাটের বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। জেনারেল নীল সাহেব ইহা অবজ্ঞা করিয়া বিদ্রোহী ও অন্যান্য লোকদিগকে যথেচ্ছা হত্যা করিতে আজ্ঞা দেন। হরিশ এই সম্বন্ধে পেট্রিয়টে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে অনুবাদ কবা গেল।

> "গ্রান্ট সাহেবের হুকুম যদি বড়লাট বজায় না রাখেন তবে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া স্থানান্তরিত করা ভাল। আর যদি জেনারেল নীল সাহেবের বৈর নির্যাতন প্রণালী ও এদেশীয়দিগের সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে কার্য করা হয় তবে লাট ক্যানিং ও তাহার সদস্যগণ কতিপয় কসাইদারের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া এদেশ হইতে ত্বরায় চলিযা যান। কিন্তু যদি তাহারা ভারতকে এখন ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণিস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে করুণাদেবতা (Themesis) যুদ্ধদেবের স্থান অধিকার করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগকে অশেষ ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন।"

পঁচেতের রাজা ও হরিশচন্দ্র

এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে উক্ত রাজার নামে পাটনার কমিশনার রাজবিদ্রোহী বলিয়া অপবাদ দেন। তাহার বিচার সময়ে তাহার কর্মচারিগণকে হরিশকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিব এই লোভ দেখাইয়া তাহাকে রাজার পক্ষ হইয়া পেট্রিয়টে লিখিতে বলেন। হরিশ অর্থ লোভে লোভী হইবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ টাকা ফেরত দিয়া তাহাদিগকে বলেন যে তিনি রাজার পক্ষ হইয়া যথাসাধ্য পেট্রিয়টে লিখিবেন। পাঠকগণ বোধ হয় হলওয়ে সাহেবের নাম জানেন। ডাক্তার হলওয়ে সাহেবের পিল্ সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই ডাক্তার মহাশয় একদা প্রসিদ্ধ ইংরাজী নাটক লেখক চার্লস ডিকেন্স সাহেবকে ১০০০০ টাকার নোট পাঠাইয়া দিয়া বলেন যে তিনি তাহার প্রসিদ্ধ নাটক মধ্যে হলওয়ে সাহেবের নাম সন্নিবেশিত করিবেন। ডিকেন্স হলওয়ে সাহেবের পত্রের উত্তর না দিয়া কিম্বা তৎসম্বন্ধে কিছু গোলযোগ না করিয়া, উক্ত টাকা ফেরত দেন। ইংরাজমণ্ডলী মধ্যে ডিকেন্স সাহেবের এই শুভ দৃষ্টান্ত যেরূপ প্রীতিকর বঙ্গসমাজে হরিশের দৃষ্টান্তও সেইরূপ। বঙ্গে এই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হউক ইহাই আমাদিগের আশা।

১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই গবর্নর জেনবেল আব একখানি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী ও অন্যান্য লোকদিগের প্রতি অযথা কঠোর নিয়ম প্রয়োগ না করা হয় তাহার জন্য রাজকর্মচারীদিগকে অনুরোধ করেন। এই ঘোষণাপত্র বাহির হইলে ইংরাজগণ লাট ক্যানিংকে (Clemency) অর্থাৎ "দয়াশীল" ক্যানিং বলিয়া বিদ্রূপ করেন। এদেশীয় অপরাধী ও নিরপরাধী ব্যক্তি মাত্রের প্রতি ইংরাজগণ খড়গহস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই ঘোষণাপত্রে তাহারা মর্মাহত হইয়াছিলেন। হরিশ এই সঙ্কট সময়ে উক্ত ঘোষণাপত্রের সমর্থন করেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে কিয়দংশ অনুবাদ করা গেল।

"বিদ্রোহ দমন অভিপ্রায়ে প্রতিহিংসার কার্য যে অযথা রূপে নির্বাহ হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সভ্য গবর্নমেন্টের রাজকর্মচারীগণেরা যে এইরূপ অবৈধ উপায়ে

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবেন ইহা আমরা মনে করি নাই। কেবল আলাহাবাদ নগরে ৬ই জুন হইতে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত ৮০০ লোকের ফাঁসি হইয়াছে। একজন শিক সৈন্য হত হওয়াতে ওই নগরের লোকদিগের উপর অত্যাচার মানসে শিক সৈন্যদিগকে আলি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। কাশী হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত যতদূর ব্রিগেডিয়ার নীল সাহেব গমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই রাশি রাশি শবদেহ বিশিষ্ট গ্রাম সকল লক্ষিত হইয়াছিল। ওই সকল গ্রামের লোকেরা তাহাকে কিছুমাত্র বাধা দেয় নাই। সৈন্যদল যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সৈন্যদিগকে রীতিমতো বশে ও শাসনে রাখিলে এইরূপ হইতে পারিত না। গঙ্গায় উভয়পার্শ্বে কেবল ভগ্ন গৃহশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।"

এই সকল অত্যাচার নিবারণ এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার স্থূল স্থূল মর্ম নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

রাজবিদ্রোহ কিয়ৎ পরিমাণে দমন হইয়া শান্তি পুনঃ সংস্থাপনের পব রাজদ্রোহীদিগের প্রতি কঠোর নিয়মে দণ্ডবিধির আইন সকল চালনা করিলে লোক সকল হয়তো নিরুপায় হইয়া দলবদ্ধ এবং রাগান্বিত হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এরূপ ফল উৎপন্ন হইলে রাজ্যের কুশল সংস্থাপন করা অতীব কঠিন হইবে। রাজবিদ্বেষও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব এইরূপ যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য রাজকর্মচারীদিগকে লাট সাহেব অনুরোধ করেন যে তাহারা ক্ষমা ও ঘৃণার সহিত সাবধানে যেন আইন চালনা করেন। গ্রাম ও নগর সকল দগ্ধ করা নিষেধ করা হইয়াছিল। সিপাহি সৈন্য ইংরাজ রেজিমেন্ট পরিত্যাগ অপরাধে দণ্ডিত হওয়াও নিষেধ করা হইয়াছিল।

হরিশ এই ঘোষণা পত্রের যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন এমন নহে। অযোধ্যা ও রহিলখণ্ডে শান্তি পুনঃ সংস্থাপনের জন্য যে সকল ঘোষণা পত্র বাহির হয় তাহারও পক্ষ সমর্থন করেন।

ক্রমে ভগবানের কৃপায়, ও লর্ড ক্যানিং-এর দয়া দাক্ষিণ্য গুণে বিদ্রোহ দমন হইল। সুখময়ী শান্তির কোমল মুখচ্ছবির প্রভা ভারতে পুনঃ প্রকাশ পাইল। পার্লামেন্ট সভায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত রাজ্য শাসনভার মহারানির হস্তে ন্যস্ত হইবার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবের পোষকতায় ইন্ডিয়া বিল পার্লামেন্ট সভায় আলোচিত হইল। হরিশ এই সময়ে ১৮৫৮ সালে এই বিলের পক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বড় বড় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। পরে রাণি স্বয়ং ভরত রাজ্য গ্রহণ করেন। ...এই ঘোষণাপত্র আমাদের ম্যাগনাচার্টা স্বরূপ।... *(ঘোষণাপত্র অন্যত্র আছে)*

এই ঘোষণাপত্রে ভারত রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে সকল উদার, পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মত ও নিয়মাবলী সন্নিবেশিত হয় তাহার জন্য হরিশচন্দ্র বহুদিন হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। হরিশচন্দ্র একজন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। দূরদর্শন রাজনীতিজ্ঞের একটি প্রধান লক্ষণ। সেই লক্ষণ হরিশে লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি বহুদিন হইতে লর্ড ডালহাউসির বলপূর্বক পরের রাজ্য ইংরাজাধিকৃত সাম্রাজ্য মধ্যে সংভুক্ত করিয়া লওয়ার যে কি গৌণ অশুভ ফল ফলিবে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিয়া দেশবাসীর হস্ত হইতে সমস্ত সম্ভ্রমসূচক উচ্চপদ ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইলে তাহার যে কি

বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহাও অনুধাবন করিয়া ইংরাজরাজকে সতর্ক করিয়াছিলেন। এই সকল স্বার্থ শাসনপ্রণালীর ফলে বিষম অনিষ্টকারী সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহ দমনান্তে বুদ্ধিমান ও সভ্য ইংরাজগণ বুঝিতে পারিলেন যে স্বার্থ শাসনপ্রণালী অনিষ্টকারী ও ভ্রান্তিমূলক। কাজে কাজেই এই ঘোষণাপত্রে নূতন উদার মতের উপর ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। হরিশের বহুকালের আশা ও যত্ন ইহাতে সফল হইল দেখিয়া তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সিপাহি বিদ্রোহে যে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হয় তাহার ন্যায় মানবসমাজের অনিষ্টকারী ঘটনা ইতিহাস মধ্যে দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি দেশে যে রাজ্য-বিপ্লব ঘটে তাহার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য এই স্থানে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ফ্রান্সে যেমন এই বিপ্লবে অসংখ্য নরনারীর রক্তে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, সমাজ কিয়দ্দিনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সামাজিক, নৈতিক, ও রাজনৈতিক উন্নতির পথে কণ্টক প্রদান করিয়াছিল, ভারতবর্ষেও সিপাহিবিদ্রোহ বশত তদনুরূপ বিষময় ফল ফলিয়াছিল। হরিশ এই সময়ে রাজভক্তি গুণে ইংরাজ শাসনের উপকারিতা বুঝিয়া ইংরাজ রাজ্যের পক্ষে দণ্ডায়মান হন। তিনি বিদ্রোহীদিগের গর্হিত কার্যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ইংরাজি শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘৃণা সত্ত্বেও রাজকর্মচারীগণ যখন বিদ্রোহীদিগের প্রতি যে গর্হিত আচরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবিধানের জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ধৈর্য, সাম্য, সাহস, ক্ষমা, দাক্ষিণ্য, দূরদর্শন এই সকল গুণে তিনি গুণী হইয়া এই লোমহর্ষণ সময়ে তিনি যোদ্ধার ন্যায় কার্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধের কামান তাহার সুলেখনী, মসী কামানের বারুদ। "রাজদ্বারে শ্মশানেচ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব।" এই প্রাচীন উৎকৃষ্ট মন্ত্র হরিশের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। ভারতের কোটি কোটি নিঃসহায় লোকের পক্ষ হইয়া একাকী রাজদ্বারে অযাচিত প্রতিভূস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারীর অকালমৃত্যু হইতে শ্মশান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এইজন্যই তাহাকে ভারতহিতৈষী বলে।

১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ষ সমালোচনার উপলক্ষে হরিশচন্দ্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে সারবান সুদীর্ঘ বিশদ প্রবন্ধ ইংরাজীতে লেখেন তাহার কিয়দংশের মর্ম নিম্নে প্রদান করিলাম। এরূপ সুন্দর ইংরাজিতে লিখিত প্রবন্ধ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই ১৮৫৭ সাল মানব ইতিহাসের একটি ভীষণ সন্ধিস্থল স্বরূপ। আমাদের পরবর্তী মানবগণ যে কিরূপভাবে ইহার গৌরব উপলব্ধি করিবেন আমরা তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে অক্ষম। আমরা এই সিপাহি বিদ্রোহঘটিত এখানকার অবরোধ, ওখানকার হত্যাকাণ্ড, সেখানকার সংগ্রাম, এই সকলেরই ভাবনা ভাবিতেছি। সমগ্র বিদ্রোহের পূর্ণমূর্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই বিদ্রোহ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ আসিয়া মহাবেগে মস্তকে পতিত হইল, আমরা সকলেই ভীত ও চমকিত হইয়াছি, এমন কি বিদ্রোহী সেনা সকলও চমকিত হইয়াছে। গত ৮ মাস যাবৎ এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ওতপ্রোত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। সর্বপ্রকার পাপ এবং দুঃখ সর্বত্র ছড়াইয়াছে। এখন ইহা তেজহীন হইয়াছে, ইহার পরিণাম বুঝিতে

পারা যাইতেছে, দীর্ঘকাল স্থায়ী কতকগুলি দুঃখ ভারতবাসীকে উত্তরাধিকারী ভাবে দান করিয়া অন্তর্হিত হইবে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

(১) প্রথম এই বিদ্রোহের জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে। অন্যদিকে যে যাহা নিন্দা করুক হিন্দুর জাতীয় চরিত্র জগৎবাসীর চক্ষে বড় উচ্চ বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া নিন্দা করিলেও তাহাদিগকেই বলিতে হইত যে আমরা বুদ্ধিজীবী। আমাদের স্বজাতিবাৎসল্য বা সমর নিপুণতা না থাকিলেও অন্যদিকে আর শত সহস্রগুণ আছে বলিয়া সকলে স্বীকার করিতেন। চিরকাল আমরাই কষ্টভোগ করিয়াছি কিন্তু কেহ বলিতে পারেন না যে আমরা কাহাকেও কষ্ট দিয়াছি। আমাদের পুরাণে, ইতিহাসে, সংহিতায়, সাহিত্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে কি পণ্ডিত কি বিষয়ীলোক উভয়েরই অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। এইজন্য আমাদের জাতির প্রতি বিদেশীয় বিদ্বান লোক সসম্মান প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। অন্তত কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি বিদেশীয় এই সম্মান, এই প্রীতি একেবারে ধ্বংস হইল। বিদ্রোহের আনুষঙ্গিক যে সকল অত্যাচার হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই অভাবনীয়। অন্যায়রূপে অসঙ্গতরূপে এই সকল অত্যাচারের অপরাধ আমাদের জাতির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। বিদ্রোহ হইলে যে অরাজকতা হয়, সেই অরাজকতার জন্য যে সকল অত্যাচার হয়, সেই সকলের জন্য যে বিদ্রোহীরা দায়ী তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু একথা স্বীকার করি না যে একটি সমাজের কতকগুলি অপদার্থ নরাধম লোকের কৃতকার্যের জন্য সেই সমগ্র সমাজ দায়ী হইবে।

আমরা যে কেবল সভ্য জাতির সম্মাননা হারাইয়াছি, এমন নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদিগের অন্যদিকেও ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবাসীর সহিত সমগ্র ইংরাজ জাতির সম্পূর্ণ পার্থক্য সংঘটন হইয়াছে। এখন তাহারা যে কেবল আমাদিগকে সন্দেহ করেন এমন নহে, আমরা তাহাদের দারুণ শত্রুতার স্থল হইয়াছি। ভারতবাসী ইংরাজরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে তাহাদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি এবং সেই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র।

এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইলেও ইহার ফল অতি ভয়ঙ্কর, কাজে কাজেই আমরা এই বিশ্বাসে উপহাস করিতে পারি না।

আমাদের দ্বিতীয় মহাক্ষতি সভ্যতা সম্বন্ধে। কিছুকালের জন্য এমন আশঙ্কা হয় যে, অনেকদিনের জন্য আমাদের সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল। যদি আইনবলে কোন বর্বর, নিষ্ঠুর, অসঙ্গত সামাজিক প্রথার সংশোধন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা আইনের সাহায্য চাহিলেও এখন আর পাইব না। সেই সকল কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের আশা একেবারে চূর্ণ হইল। ব্যবস্থাপকগণ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে একবারেই হস্তার্পণ করিবেন না, এই নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এখন হয়তো আমরা উত্তম বিচারালয় পাইব, ন্যায়ানুগত ব্যবস্থা সকল পাইব, কর নির্ধারণের সুনিয়ম সকল পাইব, কিন্তু আমাদের অন্তরে অন্তরে যে সকল কুপ্রথা কীট প্রবেশ করিয়া অস্থির মাংস ভক্ষণ করিতেছে, সে সকল নিষ্কাষিত করিব, এই বিদ্রোহের জন্য সে ভরসা আর আমাদের নাই।

দেশের বৈষয়িক উন্নতি কিছুকালের জন্য স্থগিত হইল। আমাদের রেলওয়ের আর বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক কতকটা নষ্টই হইয়াছে। আর বৎসর এমন দিনে বৈদ্যুতিক

তারযোগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সম্বাদ বাহিত হইয়াছে, এখন সেই সকল তার ছিন্নভিন্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়া রহিয়াছে। শাসনকর্তৃগণ আত্মরক্ষার দায়ে খাল খনন পথ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ধনেপ্রাণে লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে—এখনও যে কত ক্ষতি হইবে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? ভারতবাসীদিগকে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে, এই বিদ্রোহের ফলভোগ করিতে হইবে। এই সকল দুশ্চিন্তা হইতে জগদীশ্বরের অচিন্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মে বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। ইতিহাসে বিশ্বাসবান ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনাতেই উন্নতির সোপান দেখিতে পান; ভারতের এই বিদ্রোহ ঘটনা, যত কেন ভয়াবহ হউক না, ঐতিহাসিক নিয়মের বহির্ভূত নহে; এবং ১৮৫৭ সাল যদিও রক্তময় এবং অগ্নিময় অক্ষরে চিহ্নিত, তথাপি বোধ হয়, পৃথিবীর জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ—এই ভারতবাসী এই সাল হইতেই অশ্রুতপূর্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

Bengal Celebrities গ্রন্থে হরিশচন্দ্র প্রসঙ্গের আলোচনায়, রামগোপাল যে মন্তব্য করেছেন তার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

HIS CAREER AS A JOURNALIST DURING THE MUTINY OF 1857-58

Hurish Chunder Mookherjee immortalized himself by his noble defence of the policy of "Clemency" Canning during this horrible crisis. It was in May 1857, that the hurricane of the Sepoy Mutiny swept over the land. Discontent and disaffection engendered by the Imperial policy of distrust of the people in general and dispossession of the hereditary rights of some Princes were among the chief causes that brought about this revolt, bringing in its train untold miseries to the nation. Hurish Chunder first wrote on the subject in the *Hindoo Patriot* of the 21st May 1857.

"The horrible details of the Mutiny and massacre of which rumours and reports have reached town during the last few days have fallen upon a state of public feeling utterly unprepared to receive them even after the seditous misconduct and disbandment of two regiments of the line. It was certainly known that a spirit of disaffection pervaded the entire native army; but there were specious reasons for supposing that it could rise to the culminating point and manifest itself by deeds only in the distant and disliked cantonments of Bengal. The favourite stations of Meerut and Delhi have, however, been the scene of mutineering violence such as has no parallel in the military history of British India. Full particulars have not yet reached Government."

In this very opening article Hurish Chunder took the side of the Government and vindicated its policy thus :

"Government has been censured for dealing to leniently with the Mutineers in Bengal. We can scarcely conceive what other punishment

than dismissal from a most desirable service could be awarded to men who at worst were misbehaving under a delusion, and were guilty of passive Mutiny only. It would have hardly been consistent with the principles and the dignity, not to mention the policy of the Indian Government, to have made every soldier of the 19th and 34th Regiments of Bengal Infantry martyrs in the eyes of their countrymen, and such they would have been, if the forfeit of their lives or liberties were exacted from them for persisting in a course of passive insubordination in obedience to what every one believes to be the dictates of his conscience."

The article was concluded thus : "The Government may now act with a rigour proportioned to the urgency of the case. If every native soldier who has had a hand in that appaling outrage and who was not compelled to join it by the intimidation of his comrades, were to pay with his life the forfeit of violated duty, offence would be done neither to justice nor to sound policy."

Thus it would appear that from the very beginning of this national calamity, he took a sober, statesman-like view of the whole affair, counselled sobriety and patience to the Government, and played the part of a peace-maker between the enraged native soldiers and the Government. The hurricane of the Mutiny increased in velocity and strength among the ignorant up-country men, partly drawn to the rank and file of the Mutineers by temptation of plunder, and partly by religious and other consideration. The official and non-official Anglo-Indians, the Eurasians, and the native Christians naturally took alarm and confounded the Mutiny to be a general rebellion assisted by the entire native population and Princes of India. With the gradual swell of the surging tide of the Mutiny, a deep panic arose in their mind. Hurish Chunder in his serio-comic and slashing style thus described it :

"Never since the day on which Serajodowlah sent his Pathans into Calcutta to wrest the factory from the East India Company and put every white man to the sword or in cords, was Calcutta so beside itself with terror as the present moment. The English have always been noted for looking danger steadily in the face. But at times an excess of caution assumes a rather ridiculous turn. The state of feeling now exhibited by the notabilities of Chowringhee and their number of satellites in Casitolah is very much akin to that which drew the laughter of the world on the aldermen of London and their militia when Boney was a stalking horse in the imagination of the British people. Within the last fortnight, the gun-smiths have been deluged with custom, and their fortunes have been as effectually made as if the dreaded loot of Calcutta had been poured into their laps. Indeed guns, pistols, and rifles have turned up to famine prices, and many a portly citizen who never beore in all his life as guilty of the least insight into the mechanism of these murderous weapons, may now be daily observed to look as fierce as a hussar, screw up his mouth, twings

his eyes, and pull away at the trigger till he grew red in the face, and the smart crack upon the cap "warranted not to miss fire, nor fly" told the flattering tale of his invincibility (Vide Hindoo Patriot, May 20th, 1857.)

They therefore urged upon Government the advisability of adopting the policy of an indiscriminate massacre of every native, be he innocent or guilty. And, moreover, they wanted to take the law into their own hands, and to deal summarily with the malcontents.

In the pages of the *Friend of India*, it was described at the time that European ladies of Calcutta fled from their houses and took refuge in the ships lying on the Ganges. The entire European and Eurasian communities were armed to the teeth, and not a man was found to go out without a pistol in his pocket. At the approach of the *Mohurrum* festival, the Angle-Indians seriously suggested the disarmament of the entire native population of Calcutta as will be apparent from the following letter addressed by the Foreman of the Grand Jury to the Judges of the Supreme Court of Calcutta :

"At the sessions of the peace of our Lady, The Queen, held at Calcutta on the 18th day of July, in the year 1857, the Grand Jury presents as follows : That as a measure to allay apprehensions of danger on the part of the public, and for the preservation of peace and the prevention of crime, (speacially as the Mahomedan Holidays, which are approaching, are usually a period of excitement) it is desirable that the Native population of Calcutta and of the suburbs should be disarmed, and that the sale of arms and ammunition should be prohibited except under such restrictions as Government may deem desirable. Therefore, the Grand Jury do hereby request Her Majesty's Justices to lay this their presentment and to take the same into its favourable consideration." (*Vide Hindoo Patriot*, July 30th, 1857)

J. H. Fergusson,
Foreman.

Even The sober Judges of the Supreme Court did not hesitate to recommend the measure to the Government. But Hurish Chunder contemptuously treated the idea and advised the Government not to run mad with this insane cry of its own countrymen. The safety of the empire was in danger however, and the Government was obliged to gag the press, pass martial law, and adopt other stringent and precuationary measures. To the gagging act Hurish Chunder did not demur, as it made no invidious distinction between the native and the Anglo-Indian press. Every student of history knows how Mr. Henry Mead, the Editor of the *Friend of India* who was the first transgressor of this law was rebuked, and at last deported from the country for his famous article on the "Centenary of Plassey."

THE ATROCITIES OF THE MUTINY

If the enraged Mutineers from their bitter race-hatred massacred innocent ladies and helpless children, and committed all sorts of brutal deeds and cruelties, the military authorities in India at the time were no less relentless in their vengeance. We quote what Hurish Chunder wrote on the subject :—

"It is impossible to deny that immediately after the first successes over the rebels, the work of retribution was carried a little too far, and that too in a manner not to be expected from the agents of a civilized Government. At the town of Allahabad only, nearly eight hundred men were hanged between the 6th June and 16th July. The Sikhs were let loose upon the towns people to wreak summary vengeance for the murder of a comrade. Bridgadier Neill's course from Benares to Allahabad was marked by corpses of villagers all of whom did not approach this force with hostile intentions. We will not speak of other atrocities committed by soldiers over whom, if discipline had been exercised, it would have had its sway. The river-sides for miles presented an array of demolished homes. That the population thus punished harboured many who deserved the severest punishment that could be inflicted, we will not deny. But the result proved that the principle of English law–that it were better that ten guilty should escape than that one innocent should suffer–errs less in respect to sound policy than the converse maxim of the blood-hunters. A renewed attack upon Benares was the consequence of the severities of Brigadier Neill's course. That chronic disaffection of the villgers and the readiness with which they have again joined the rebels on both sides of the river attest the ill effects of similar proceedings on the part of our authorities. Well may, therefore, the Governor-General caution the local authorities." (*Vide Hindoo Patrriot*, September 10th, 1857.)

The native press then in its infancy was not strong enough, as it is now, to resist the evil influence of the combined agitation on the part of the Angle-Indian press and the non-official Equropean community. Under such circumstances Hurish Chunder acted the part of a saviour of his country by rightly interpreting the views of the natives towards the Government and *vice versa*. He not only faithfully represented the native feeling on this subject, but disproved, with a masterly pen, the fallacious nature of the serious allegations made against the loyalty of the natives and Princes of India. He was host in himself, and proved himself a foreman worthy of the steel of the entire Anglo-Indian press headed by the Serampore *Friend of India*, the Englishman, the *Hurkaru*, and the bloody Buist of the *Bombay Gazette*. The Government of Lord Canning got a truer insight of the exact state of native feeling towards it from his writings than from the rabid vapourings of the Anglo-Indian press. Week after week, he wrote in the *Hindoo Patriot* masterly and clever articles on the Mutiny, with the sole object of removing misapprehensions from

the mind of the Government, and sometimes with a bitter, sarcastic spirit, and at other times with sober, sound judgement and array of arguments, he convinced the Government of the arrant nonsense and maievolence the invariably disfigured the columns of the hostile press. The consequence was that the Government saw the state of affairs in its true light, and avoided extremes. In short, Hurish Chunder stood as a mediator between the people and the Government and saved both of them from headlong ruin. We therefore call him the saviour of his country during the horrible days of the Sepoy Mutiny, and he will be known to posterity as such. The poor *Keranee* in the Military auditor General's office placed himself, unsolicited, as a mediator between his countrymen and the alien Government, and his mediation was accepted. What tribulations, what mental agonies and anxieties, what sacrifices this poor Brahmin publicist had to make to represent the dumb millions of his countrymen, in this crisis, it is now impossible for us adequately to delineate.

The history of the Sepoy Mutiny remains yet to be written from the national point of view, and the important part played by men like Hurish Chunder in assuaging the rancorous feeling of hostility displayed by an infuriated body of the ruling race, partly from fear, and partly from selfish motives is now almost forgotten. Hurish Chunder had early discerned in the first outbreak of the Mutiny what Burke has magniloquently said "That in all disputes between the people and their rulers the presumption is at least upon a par in favour of the peple." That the general body of the people of India had nothing to do with these insurgents' revolutionary actions which arose from their impatience of "suffering", was a most palpable fact which he sought to impress upon the rulers with all the force and vehemence of language he could command to save the Government from a catastrophe. And, after such a lapse of time, the verdict of history is that he did succed in his noble attempt. The Anglo-Indians covulsed with rage lost their sense completely, and deliberately advised the Government to dispossess all the landholding classes in India of their lands and make them over to Europeans and Eurasians; and the chimerical proposal of making extensive English colonization was sedately put forth. And what was greatly to be deplord was that the maddened Anglo-Indians shewed every disrespect and even menace to Lord Canning, and thought of deporting him from India when he firmly refused to listen to their wicked advice. It was at such a time of general horror, uncertainty, and trepidaiton when the fate of the E. I. Company's Government in India was tremblimg in the balance, that Hurish Chunder was the steersman of the destinity of his own countrymen. His words were half-battles fought on the side of the dumb millions of India, and be it recorded to the glory of the great British nation that, with the moral support given by this Brahmin publicist, and by such honest journalist as Mr. Robert Knight then Editor of the *Bambay Times*, with the active and loyal co-operation of Her Majesty's subjects and Princes of all classes, British statemanship and

British valour triumphed at last, and the Mutiny was suppressed. The narrow limits of our book prevent us from noticing with minuteness, all the writings of Hurish Chunder and to criticize them at an elaborate length. That requires a separate volume which we hope and trust better writers would undertake hereafter. But this much we must say that in trying to suppress the Mutiny, Hurish Chunder did not only a duty to the great British Government to which he in common with the rest of his fellow countrymen owed allegiance and a debt of deep gratitude but rendered valuable service to India, his mother-country. The Mutiny may have inflicted upon this country a thousand losses but it has done some good to it as well. The proclamation of 1858 which stands as an imperishable monument of the large-heartedness of a conquering nation towards the conquered would not have been promulgated so soon but for this execrable rising. It moreover opened the eyes of Great Britain that in order to make Britannia's rule permanent in India, the policy of distrust, of exclution of people from offices of great trust and responsiblity, and from all share in the Government of their country was a mistake. The illustrious subject of our memoir wrote an excellent article in the *Hindoo Patriot* of December 31st, 1858, summarizing the evil effects of this political event, from which we extract the following.

"The year 1857 will form the date of an era, unsurpassed in importance by any in the history of mankind. For us who are living in the midst of those scenes which have stamped this epochal character on the year, it is impossible to realize in its fullest measure the interest that will attach to it in the eyes of posterity. Our minds are too full of the incidents of the rebellion–of this siege and that massacre, the battle, the retreat, the ambuscade, mutinies, treacheris and treasons–they are far too agitated to receive a fair image of the present. The rebellion came upon us with a shock for which no class of the community was prepared. It has taken by surprise the country–not excepting the vast body of the rebels themselves. For eight long months it has ravaged the land in its length and breadth, spreading crime and misery of every hue and form. And when now its strength has been broken and its end has made itself visible, it bids fair to leave the nation a legacy of prolonged and yet unknown troubles." *(Vide Life of K. D. Pal, p. 187.)*

আবদুল হলীম 'শরর্'
(১৮৬০—১৯২৬)

ইংরেজরা অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে। নবাবের কোন অপরাধ ছিল না। তবু তার রাজ্য গেল। ভারতের প্রাচীনতম শহরকে দখলে নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুললো। ওয়াজিদ আলি শাহ লখনউ-এর রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেও সুফল পেলেন না। সপরিবারে চললেন কলকাতায়। গভর্নর জেনরেলের কাছে তদ্বির করে কোন ফলোদয় হল না। পার্লামেন্ট ও মহারানির কাছে আবেদন জানাতে মা-ভাইয়ের সঙ্গে যুবরাজকে পাঠালেন ইংল্যান্ডে। নিজে কোম্পানির দেওয়া বৃত্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নবাব থেকে গেলেন কলকাতায়। এই সময়ই ঘটল সিপাহি বিদ্রোহ।

মেটিয়াবুরুজে ছিল নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের বাসস্থান। নিজের মতো করে সেখানে তাকে থাকবার সুযোগ দিয়েছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। এখানে ছিল আসাদ মঞ্জিল ও মুরস্‌লা মঞ্জিল। নবাবের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন আবদুল হলীম 'শরর্'-পরবর্তীকালের বিখ্যাত উর্দু লেখক। তাঁর বিবরণ এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। তিনি এসব কাহিনি শুনেছিলেন তাঁর নানা মুনসী কমরউদ্দিনের কাছে। তিনি ছিলেন নবাব পরিবারের ঘনিষ্ঠ।

১৮৫৭

কারতুজ নিয়ে বাধল ঝগড়া আর সরকারের জিদ-পরিণতিতে হল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। মীরট থেকে বাংলা পর্যন্ত ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আগুন। হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভিত কেঁপে উঠল। মীরট ও অন্যান্য স্থানের সিপাহিরা এসে হাজির হল দিল্লিতে। তারা বাহাদুরশাহ জাফরকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঘোষণা করল। এলাহাবাদ ও ফয়জাবাদের বিদ্রোহী সিপাহিরা ১৮৫৭ সালের মে মাসে এসে জড়ো হল লখনউ-এ। স্থানীয় অনেকেই তাদের সঙ্গে হাত মেলাল। ওরা নবাব পরিবারের কাউকে না পেয়ে ওয়াজিদ আলি শাহ-র এক দশ বছরের নাবালক পুত্র মিরজা বীরজীস কদ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। বীরজীসের মা হযরত মহল হলেন নতুন নবাবের প্রতিনিধি।

লখনউ-এর অবস্থা তখন জটিল। ইংরেজ সৈন্য আর সমস্ত য়ুরোপীয় কর্মীরা গিয়ে আশ্রয় নিল বেলি গারদে। সেটাকে কেল্লা বানিয়ে আগেই সুরক্ষিত করা হল। ভাগ্যি ভালো যে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তখন এখানে ছিলেন না। থাকলে তাকেই নবাব বানানো হত। আর তার ফল হত বাহাদুর শাহের থেকেও জঘন্য।

লখনউ-এ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় জমিদার, তালুকদার এবং নবাবের কর্মচ্যুত সেনারা। ওদের সঙ্গে আবার যোগ দেয় স্থানীয় দুর্জন মানুষজন। ফলে তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়। ইংরেজ সৈন্য ছিল সীমিত। বিদ্রোহীরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। কিন্তু ওদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ছিল না। আর ইংরেজরা জানত যুদ্ধের কলা কৌশল।

এদিকে অযোধ্যার নতুন নবাবের নামে মুদ্রা চালু হল। রাজস্ব আদায় শুরু হয়ে গেল। অনেক কর্মচারী নিয়োগ করা হল। কিন্তু তারা ছিল নিষ্কর্মা, অপদার্থ আর স্বার্থপর। এর মাঝে চলল শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া।

বছর শেষ না হতেই, লখনউ-এ এসে হাজির হল ইংরেজ সৈন্য। তাদের সঙ্গে ছিল শিখ আর পাহাড়ী সেনাদল। গুলি বর্ষণে নতুন রাজ্য ভেঙে পড়ল। হাজারে হাজারে মানুষ প্রাণ নিয়ে পালাতে থাকল। এহমদউল্লাহ নামে যে ব্যক্তি এই কয়েক মাস কর্তৃত্ব করে আসছিল, সেও পালিয়ে গেল "পও আঈ"। সেখানে তাকে গুলি করে মারার পর, তার কাটামুণ্ড পাঠান হল ইংরেজদের কাছে। পও আঈ-এর রাজা পেলেন ইনাম আর জায়গির।

ইংরেজ সৈন্যরা শহরের ওপর ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ শুরু করল। সাধারণ মানুষজন সেই প্রলয়ের মধ্যে ঘর ছেড়ে পালাতে থাকে। চারদিকে চরম বিশৃঙ্খলা। সৈন্যরা শহর লুঠ করতে থাকে। ধীরে ধীরে শহরে শান্তি ফিরে এল। বেকার হয়ে গেল নবাব পরিবারের কর্মচারী আর আত্মীয়-স্বজন। তারা শেষ হয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বড় বড় ধনী পরিবার। বহু পল্লী, জনপদ ধ্বংস হল।

এদিকে নবাব তখন কলকাতায়। এখানকার ইংরেজ বাহিনীর বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন সেনারা নবাবকে দিয়ে বিদ্রোহ শুরু করতে চাইলেও, নবাব তাতে ছিলেন অসম্মত। নবাবী চলে গেলেও তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যাননি, এখনও গেলেন না। গভর্নর জেনরেল উৎপাতের আশঙ্কা করে নবাবকে কয়েকদিন ফোর্ট উইলিয়মে বন্দি করে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। নবাব যখন বন্দি তখন শান্ত লখনউ। তিনি আশা করে ছিলেন, লন্ডনে তার দৌত্য সফল হবে এবং তিনি হারানো রাজ্য ফিরে পাবেন।

এই সময়ে নবাবকে ভুল বোঝালো তার ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা। তারা জানত, নবাব মোকদ্দমায় জিতলে, তারা প্রতিপত্তিহীন হয়ে পড়বে। নবাবকে বোঝাল তারা : "রাজ্য দখল নিয়ে কেউ ফেরত দেয় না। মসীহউদ্দীন খাঁর কথা ঠিক নয়। এত কষ্টভোগের কোন মানে নেই। দেড় দু বছর সরকারি ভাতা নেননি। আমরাও দুটো পয়সার জন্য বসে থাকি। ইংরেজ সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে নিরুপদ্রবে সময় কাটানোই উচিত।" নবাবেরও তখন আর্থিক অনটন চরম পর্যায়ে। সভাসদদের পরামর্শ এ সময়ে তার গ্রহণযোগ্য মনে হল।

অবশেষে ভাইসরয়কে লিখে পাঠালেন, ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবে আমি সম্মত। আমার এ যাবৎ পাওনা ভাতা আমাকে দিয়ে দেওয়া হোক। এবং বিলেতের মামলাও খারিজ হয়ে যাক।

উত্তরে সরকার তাকে জানিয়ে দিল, বকেয়া কিছুই দেওয়া হবে না। এখন থেকে ভাতা পাবেন। আর কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হবে না। কারণ, তার আর প্রয়োজন নেই।

লন্ডনে এ সংবাদ পৌঁছাতে বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল।

বন্দি ওয়াজিদ খাঁ ফিরে এলেন মেটিয়াবুরুজের মুক্ত জগতে। সরকারি ভাতায় আনন্দ ফুর্তিতে দিন রাত কেটে গেল।

সর্বেশ্বর মিত্র

সিপাহি বিদ্রোহে ভুক্তভোগী

মীরট

১৮৫৭ সালের ১০ মে মীরটে সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহিরা বৈর-নির্যাতন স্পৃহায় অধীর হইয়া নরশোণিত প্রবাহে ধরাতল কিরূপ সিক্ত করিয়াছিল, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে এবং হৃদয় বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই অকল্পিতপূর্ব আকস্মিক বিপ্লবের ভীষণ স্রোতে পড়িয়া মিরাটবাসীরা চারিদিক বিভীষিকাময় দেখিতে লাগিলেন। তাহারা সকলে ধন-প্রাণ, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্রকন্যা, স্নেহময় ভ্রাতা-ভগিনী, প্রাণসম বনিতা লইয়া কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অত্যাচারপ্রিয় শোণিত-পিপাসু বিদ্রোহীদের হস্তে কত কত নিরপরাধীকে যে প্রাণ দিতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া কে সংখ্যা করিবে? সুকুমার মতি বালক-বালিকাদের মর্মস্পর্শী কাতর-ধ্বনিতে উন্মত্ত সিপাহিদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় নাই। কত লোক-ললাম-ভূতা, সৌন্দর্য-সমন্বিতা মহিলাও এই সকল দুর্বৃত্তদের হস্তে নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। এই দুরাচারেরা কত লোকের প্রমোদ কানন সুখসেবিত আনন্দময় বিশ্রাম ভবনকে যে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে, তাহা আর বলা যায় না। যাহা হউক, এই সকল লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর ঘটনা যাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদেরই বর্ণিত বিষয় এস্থলে প্রকাশিত হইবে।

১

শ্রীযুক্ত মোহর সিং মীরটে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—১৮৫৭ সালে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামে গ্রামে "চাপাটি" বা রুটি—চৌকিদারেরা লইয়া যাইত। কেন যে, এরূপ চাপাটি বিতরিত হইত, তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা উল্লেখ করিয়াছে। কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা বলিত,—দেশে 'মারি ভয়' হইলে এই চাপাটি এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পাঠাইলে, সেই গ্রামের "রোগ বালাই" অন্য গ্রামে যাইয়া থাকে। কেহ বলিত,—এই চাপাটি পাঠাইয়া দেশের লোককে একতাসূত্রে বদ্ধ করিতেছে; তাহার পর সকলে একেবারে ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবে। এইরূপে যাহার কল্পনায় যে প্রকার ভাবের উদয় হইত, সে তাহাই রাষ্ট্র করিত। ফল কথা—এই চাপাটি পূর্বাঞ্চল হইতে আসিত, আর যে, ইহা বিতরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহাকে অতি গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইত। এই প্রকারে এই চাপাটি লইয়া কয়েক মাস নানা গোলযোগ চলিতে লাগিল।

বিদ্রোহের এক সপ্তাহ পূর্বে ডেপুটি কালেক্টর বাবু মোহর সিং স্থানান্তর হইতে মীরটে আসিয়া শুনিলেন—"গবর্নমেন্ট, সিপাহিদের নতুন টোটা ব্যবহার করিতে আদেশ

করিয়াছেন, কিন্তু টোটাতে চর্বি মিশ্রিত আছে বলিয়া সিপাহিরা তাহা ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।" এই কথা লইয়া হাটে বাজারে, লোকেদের বাড়ি এবং বৈঠকখানায় সর্বত্রই আন্দোলন হইতে লাগিল; কিন্তু বিদ্রোহের কোন আশঙ্কা তখন পর্যন্ত কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ৮ মে কয়েকজন সওয়ার অবাধ্যতাপরাধের জন্য কারারুদ্ধ হইল। তথাপি তখন পর্যন্ত মীরটবাসীগণ ভাবে নাই যে, তাহাদের কি ভয়ঙ্কর বিপদ ভবিষ্যতের উদর কন্দরে নিহিত রহিয়াছে; এবং অচিরাৎ তাহারা যে সর্বস্বান্ত হইবে, তাহার জন্য তাহারা তখন প্রস্তুত হইতে পারে নাই।

১০ মে বেলা ৬টা বাজিয়া গিয়াছে। দারুন গ্রীষ্মের উত্তাপে লোকজন ছটফট করিতেছে। "লু" তখন পর্যন্ত চলিতেছে,—তাহার আর বিরাম নাই। এই সময়ে বাবু মোহর সিং আপনার ঘরে বসিয়া আছেন, মীরটের সদর বাজার হইতে আমিন শম্ভুনাথ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিলেন যে, "ইংরেজদের সঙ্গে সিপাহিরা যুদ্ধ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া মীরটবাসীরা আপন-আপন ঘরবাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছে।" এ সংবাদ বাবু মোহর সিং প্রথমত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইংরেজদের সঙ্গে সিপাহিরা যুদ্ধ করিবে—এ কথা তাহার যেন স্বপ্নের অগোচর ছিল। যাহা হউক, সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য তিনি বাড়ির বাহিরে আসিয়া দেখেন, লোকজন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া তাড়াতাড়ি আপনাদের বাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছে; কেহ বা ছুটাছুটি করিয়া আপনাদের আশ্রয়-স্থান অনুসন্ধান করিতেছে। সকলেই ভীত, ত্রস্ত এবং ভয়চকিত। ইহা দেখিয়া তখন তাহার বিশ্বাস হইল,—অবশ্যই কোন প্রকার বিভ্রাট ঘটিয়া থাকিবে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে লোকের বাসভবন আগুন লাগিয়া ধু ধু শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। যে দিকে চাও, সেই দিকেই অগ্নি-কাণ্ড। প্রচণ্ড হুতাশন, বিশ্ব সংহারকারিণী মূর্তি ধারণ করিয়া দেশ রসাতলে দিবার জন্য যেন উদ্যত হইয়াছেন। চারিদিকে গৃহদাহের ভয়ঙ্কর শব্দ। সেই সঙ্গে গৃহবাসীদের গভীর আর্তনাদ মিশ্রিত হওয়াতে যেন মহাপ্রলয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল! বাবু মোহর সিং দেখিলেন তিনজন সওয়ার নিষ্কাষিত অসি হস্তে, কষ্টম-গৃহে অগ্নিপ্রদান করত তাহার কম্পাউন্ড হইতে বহির্গত হইল। সঙ্গে বহু সংখ্যক ইতর লোক; তাহারা উন্মত্তভাবে "এ আলি আলি! একনারা হাইদারি" করিয়া চীৎকার করিতেছিল। এই সকল লোকদের মধ্যে অনেক কয়েদিও ছিল। তাহাদের কাহারও কাহারও পায়ের বেড়ীর ঝন্-ঝন্ শব্দ হইতেছিল—তখন পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া ফেলিতে পারে নাই। সওয়ারেরা গর্বিত ভাবে বলিতেছিল, তাহারা ক্যান্টনমেন্টে অগ্নি-প্রদান করিতেছে, ইংরেজদের হত্যা করিয়াছে, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে এবং ইংরাজ শাসনের পর্যাবসান করিতে বসিয়াছে। ইংরেজেরা তাহাদের যে ধর্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য এই সকল কাজ করিয়াছি। যাহা হউক, রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বিদ্রোহীদের বিকট শব্দে এবং তাহাদের অত্যাচারে সহর মোহিত হইতেছিল। তাহার পর গভীর রাত্রে আর কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল, বিদ্রোহী সিপাহিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

১১ মে মীরটের মাজিস্ট্রেট এবং কমিশনার সাহেবের আদেশে, ডেপুটি কালেক্টর উজির আলি খাঁ, তহসিলদার গঙ্গাপ্রসাদ এবং বাবু মোহর সিং সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকদের একস্থানে সমবেত করত, তাহাদের নানাপ্রকার সৎপরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের কথায় এবং তাহাদের ভাবে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইল,—তাহারা কেহই ইংরেজ রাজের বিপক্ষে নহেন। তদন্তর তাহারা দেকানি-পসারিদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহাদের কোনরূপ আশঙ্কা নাই; তাহারা নির্ভয়ে আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হউক। তদনুসারে তাহারা ১২ মে আপনাদের দোকান পাট খুলিয়া পূর্বের ন্যায় কাজ আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু এই গোলযোগের জন্য তিনদিন কাল সহরের মধ্যে জিনিস-পত্রের আমদানি একেবারে বন্ধ ছিল। পল্লি গ্রামবাসীরা অনেক দিন পর্যন্ত সহরময় বিচরণ করিয়া বেড়াইত। এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত সহরের নিকটবর্তী স্থানে গোলযোগ চলিয়াছিল। তাহার পর ব্রিটিশদের সুকৌশলে সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা তিরোহিত হইয়া ক্রমশ শান্তি সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

২

উজীর আলি খাঁ, একজন ডেপুটি কালেক্টর। তিনি অনেকদিন পর্যন্ত মীরটের ক্যান্টনমেন্টে বাস করিতেন। ১০ মে যখন সূর্যদেব সমস্ত দিন অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়া অস্তমিত হইলেন, তাহার পর গোধূলি উপস্থিত হইল। এই সময়ে চারিদিকে গভীর কোলাহল শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। উজীর আলি খাঁ তাহা শুনিয়া সত্রাসে আপনার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাত্রে বিদ্রোহী-সেনাদের ভৈরবনাদে তিনি থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন। মনে দারুণ ভয়,—পাছে বিদ্রোহীরা তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ উৎপাত করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। সে ভয়ঙ্কর রাত্রি অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইলে প্রতিদিনের ন্যায় তরুণ অরুণ আপনার কিরণজাল বিস্তার করিয়া চারিদিক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। উজীর আলি খাঁ প্রভাত হইবামাত্র আপনার বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদ আলি খাঁর গৃহে আশ্রয় লইলেন। দিল্লির পতন পর্যন্ত তিনি সেই স্থানেই অবস্থান করেন।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে, সওয়ার এবং শহরের বদমায়েস দল একত্র মিলিত হইয়া সহর তোলপাড় করিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে সহিস ও 'পুরবিয়ারা' যোগ দিয়াছিল। রাত্রি ঘোর অন্ধকারময় এবং বিদ্রোহীরা অনেক দূরে ছিল বলিয়া তিনি কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই। তাহার যে সকল লোকজন ছিল, তাহারা কেহই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহারা সকলে তাহাকে লইয়া বসিয়াছিল। রাত্রে কেবল এ আলি আলি! এই শব্দে শহর প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি যখন পরদিন প্রাতঃকালে নিজ বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া শহরে যান, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সওয়ারদের সঙ্গে কসাই, পাল্লাদার (মুটে) এবং কারামুক্ত কয়েদিরাই মিলিত হইয়া শহর মধ্যে খুন-জখম এবং লুঠ-পাট করিয়াছিল।

সওয়ারেরা এই রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, ইংরেজেরা আর শহর-মধ্যে নাই। এই কথা শুনিয়া দুর্বৃত্তেরা নির্ভয়ে শহরের মধ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা রাত্রে কেবল সাহেবদের বাঙ্লায় আগুন দিয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিল এবং সুযোগ পাইলে

সাহেবদিগকে হত্যা করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই; কিন্তু তাহারা কাহারও কোন দ্রব্য সামগ্রীতে হস্তক্ষেপ করে নাই। বদমায়েসেরা এবং কয়েদিরাই সমস্ত রাত্রি পরস্বপহরণ করিতে তৎপর ছিল।

১১ মে যখন উজির আলি খাঁ শহর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান, তখন তিনি দেখেন যে, সম্ভ্রান্ত ও শান্তিপ্রিয় লোকেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং এই আকস্মিক বিপৎপাতের জন্য সবিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। যে সকল দুরাচারদের অত্যাচারে মীরটবাসীরা উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের তিন কাহাকেও জানিতেন না বটে, কিন্তু তিনি শুনিয়াছিলেন—তাহারা সকলেই যে সমান ভাবে দুর্বৃত্ত, তাহা নহে, অনেকে কেবল বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিল এবং একত্রে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল।

তিনি শুনিয়াছিলেন—১০ মে পুলিশের লোকেরা শান্তি স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই প্রস্থান করিয়াছিল। ১১ মে আবার সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে, আবার সকলে একে একে কার্যক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দেয় এবং সরকারি কাজ-কর্ম পূর্বমত চলিতে আরম্ভ করে।

মীরটে টোটা লইয়া অনেক আন্দোলন হইতেছিল, কিন্তু সেজন্য যে সিপাহিরা বিদ্রোহী হইবে—এ কথা কেহ ভাবে নাই এবং তাহার পূর্ব আভাসও কেহ পায় নাই। হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়া সকলকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল।

মীরটে 'গুজার' বলিয়া এক প্রকার জাতি আছে। চুরি ডাকাইতি তাহাদের একমাত্র ব্যবসায়। কোন একটা হুজুগ পাইলে তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তাহারা অন্যান্য লোকের সাহায্যে অনেক নিরাপরাধী ব্যক্তির শোণিতে রসাতল অভিষিক্ত করিয়াছিল। তাহারা বিশেষ জানিত যে, ইংরেজ রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদের ঈদৃশ পাপাচরণের জন্য সমুচিত ফল মিলিবে; সুতরাং তাহারা ইংরেজ শাসন লোপ পাইয়া যাহাতে কোন বিদ্রোহী রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রাণপণে তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিল।

উজীর আলি খাঁ ইহাও শুনিয়াছিলেন, বিদ্রোহের দিন সন্ধ্যা হইবামাত্র নিকটস্থ গ্রামবাসীরা ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করত অনেকে লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীর অংশ লইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনেকদিন পর্যন্ত শহরবাসী ও ব্যবসাদারদের টাকাকড়ি লুঠ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তাহারা কেবল কালেক্টরি হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল মাত্র।

১১ মের পর শহরে আর কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। নিকটবর্তী গ্রামের জমিদারেরা প্রায় তিন চারি দিন শহর লুঠ-পাট করিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু পুলিশের তত্ত্বাবধানে, শহরবাসীদের সতর্কতায় এবং ইংরেজের শাসন-কৌশলে, তাহারা আর কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। যাহা হউক, লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল কোন স্থানে যে রাখিয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পল্লিগ্রামবাসীরা যাহা হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, তাহা লইয়া তাহারা আপন-আপন গ্রামে চলিয়া গিয়াছিল। কসাই এবং পাল্লাদারেরা যাহা ইতিপূর্বে লুঠ করিয়াছিল, তাহা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির সম্মুখে, গলিতে কিংবা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর তাহা স্থানান্তরিত করা হয়।

সেবিস্তাদার মহম্মদ মহিজুদ্দিন বিদ্রোহের সময় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার

বর্ণনা। তাহার স্বকৃত বর্ণনাই আমাদের অবলম্বন। "তৃতীয় সংখ্যক লাইট অশ্বারোহী সৈন্যেরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করার জন্য অভিযুক্ত হইল। কিন্তু সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের বিচার শেষ হইবার পূর্বেই অফিস অঞ্চলে এই জনরব উঠিল যে, সেশন আদালতের হেডক্লার্ক তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছন।—তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, সিপাহিরা, অচিরে, বিদ্রোহী হইবে। প্রথমত, একথা তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিলেন, কোথাও কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল না, তখন তাহার সে ধারণা ক্রমশ অপনীত হইল। তাহার পর সামরিক বিচারালয়ে ৮৫ জন সওয়ারের দোষ সপ্রমাণিত হইলে তাহারা কারারুদ্ধ হইল; তখন তাহার মনে এই বিশ্বাস হইল, যখন দুষ্ট লোকেরা দণ্ড পাইয়াছে, তখন আর কেহ বিদ্রোহী হইবে না। ১০ মে রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আফিসের নায়েব-নাজির আমেদবক্সের সঙ্গে মহিজুদ্দিনের সাক্ষাৎ হয়। আমেদবক্স বলেন, "যে সকল সওয়ার বন্দি হইয়া জেলে গিয়াছে, তাহাদিগকে অন্য কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া আনিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে তথায় পাঠাইয়া দেন। আমি তথায় গিয়া দেখি যে, সেখানে কোন গোলযোগ নাই, এবং বিদ্রোহের কোনরূপ পুর্ব-সূচনাই দেখিতে পাই নাই।" এ সংবাদ পাইয়া মহম্মদ মহিজুদ্দিনের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি যে ইতিপূর্বে বিদ্রোহের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাহার তখন সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

উক্ত দিবস বেলা ছয়টার সময় শহরময় এই লইয়া হুলস্থূল বাধিয়া গেল যে, রাইফেলধারী সৈন্যেরা ২০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সৈন্যদের অস্ত্রাধ্যক্ষতা হইতে বঞ্চিত করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই বাধা দিবে, কেননা ২০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিরা মনে ভাবিয়াছিল, হয়তো তাহারাও সওয়ারদের ন্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। এই অমূলক আশঙ্কায় উক্ত দেশীয় পদাতিক সৈন্যগণ, বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদের হত্যা করিতে লাগিল। অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১১ সংখ্যক রেজিমেন্টও তাহাদের ন্যায় বিদ্রোহী হইয়া ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল; সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রহরীরাও যোগ দিল। সূর্য অস্তমিত হইলে তৃতীয় সংখ্যক লাইট অশ্বাবোহী সৈন্যেরা জেল আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে কতক সওয়ার নিষ্কাষিত তরবারি হস্তে কাম্বা ফটক দ্বারা শহরে প্রবেশ করত জেলখানার দিকে চলিয়া গেল। তাহাদের করালমূর্তি দেখিয়া শহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকেরা জীবন, অর্থ এবং সম্ভ্রমহানির ভয়ে আপন আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সন্ধ্যা মসীবর্ণ আবরণে পৃথিবী আবৃত করিলে চারিদিকেই গৃহদাহের অগ্নি শিখা দেখা যাইতে লাগিল। বিদ্রোহীদের গগনস্পর্শী বিকট চীৎকার ধ্বনিতে শহর বিকম্পিত হইয়া উঠিল। শহর এবং ক্যান্টনমেন্টের বদমায়েসেরা নিকটস্থ পল্লিগ্রামবাসী এবং ১৫০০ কারামুক্ত কয়েদি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। সেরিস্তাদার মহাশয় রাত্রি দশটা পর্যন্ত আপনার গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি ছাদে গিয়া দেখিলেন, কতকগুলি বৃষ এদিক-ওদিক বিচরণ করিতেছে। অনুসন্ধানে তাহা গবর্নমেন্টের বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আবার শুনিলেন. বিদ্রোহীবা ইঞ্জিনিয়ার আফিসের উট এবং হাতি-শালা সব লুট-পাট কবিয়াছে। নায়েব-নাজির আমেদবক্স, তাহার বাড়ির নিকটে বাস করিতেন। সেই সকল কথা শুনিতে পাইয়া, তিনি আমেদবক্সকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং বিশেষ

নির্বন্ধ সহকারে তাহাকে বলিলেন যে, এই সকল গরু গবর্নমেন্টের; তিনি যদি চাপরাশিদের সাহায্যে এই গরুগুলি একস্থানে ধরিয়া রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু তিনি ইহাতে কোন প্রকার উৎসাহ দেখাইলেন না বলিয়া তাহাকে সাহস দিয়া বলা হইল যে, "আপনার কোন ভয় নাই, শহরে অনেক ইংরাজ-সৈন্য আছে, তাহারা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করত—অচিরে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে, অচিরে বিদ্রোহীদের নাম পর্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এখন যদ্যপি আপনি গবর্নমেন্টের প্রতি অনুরাগ এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি সুনাম কিনিবেন।" ইহারা উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহার নিকট এখন একজনও চাপরাশি নাই, এবং এ বিষয়ে তিনি কোন সাহায্যও করিতে পারিবেন না।

যখন তাহারা এই সকল কথাবার্তা কহিতে ছিলেন, তখন প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকজন লোক তথায় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই একজন বদমায়েস অতি উৎকৃষ্ট দুইটি ঘোড়া তথায় আনিয়া উপস্থিত করিল; কিন্তু নিঃসন্দেহ চোরাইমাল বিবেচনা করিয়া পাড়ার কেহই তাহাকে সে ঘোড়া বাঁধিতে দিল না। ঘোড়া দুইটি ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই একজন লোক এই সংবাদ আনিল যে "শহরে যত বদমায়েস আছে, তাহারা আজ অবাধে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিবে, তাহাদের যত শত্রু আছে; আজ তাহাদের সমুচিত শাস্তি দিবে, এবং যত ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন তাহাদের আজ যথাসর্বস্ব লুঠ করিবে। মেজর উইলিয়মস যে সকল তজমাবাজীদের (জুয়ারি) দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহারা ডাকাইতি বিভাগের সেরিস্তাদার তফজ্জুল হোসেনকে অনুসন্ধান করিতেছিল। তাহাকে পাইলে যে কি দুর্দশা করিত তাহা বলা যায় না। ইহার অনতিবিলম্বে আমেদবক্সের নিকট একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে এই সংবাদ দিল যে, তহসিলদারের আদেশ অনুসারে বিদ্রোহীরা যে সরকারি খাজনাখানা লুঠ করিয়াছে, এই কথা ডেপুটি কলেক্টরকে জানাইতে যায়। তথায় গিয়া দেখে যে, তাহার বাড়ি ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে আর একজন সিপাহি তথায় দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করাতে সিপাহি বলিল, তিনি এখানে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সে আরও বলিল যে, একদল সৈন্য দুইটি কামান লইয়া সরকারি খাজানাখানা রক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে।" এই লোকটি এই কয়েকটি সংবাদ আনিয়া দিল; তাহার পর আবার কয়েকজন লোক আসিয়া এই সংবাদ দিল যে, "বেগমের পুলের নিকট কয়েকটি কামান রাখা হইয়াছে, বদমায়েসেরা লুণ্ঠিত-দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া পলাইয়া যাইতেছে; এবং কয়েদিরা এদেশীয় কর্মচারীদের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আবার ওদিকে বিদ্রোহী সিপাহিরা রেয়ানী গ্রামের নিকট যে খাল আছে, তাহার ধারে কি গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।" যে সকল লোক সেই সময়ে সেরিস্তাদার মহিজুদ্দিনের বাড়িতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আমেদবক্সকে বলিতে লাগিল যে, "শহরের দুর্নিবার বিপ্লবকারীদের দমন করিবার কোন উপায়ই নাই। কারণ স্বয়ং কোতওয়ালই যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্ধান নাই, তিনি থাকিলেও বা কোন প্রকার উপায় হইত। সে যাহা হউক, ইংরাজেরা যে শীঘ্রই এই বদমায়েসদের প্রতিফল দিবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; এবং তাহাদিগকে ধৃত করত অপহৃত দ্রব্য সামগ্রী যে, তাহাদের নিকট হইতে লইবেন, তাহাও সুনিশ্চিত।" এই সকল নানা প্রকার সংবাদাদি দিয়া

তাহারা সেরিস্তাদার মহাশয়কে অতি সাবধানে বাড়িতে চৌকি দিতে বলিয়া চলিয়া গেল। তিনিও রাত্রি ১১টার সময় বাড়ির দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্ত রাত্রি সত্রাসে বাড়ি চৌকি দেওয়াইয়া ছিলেন।

তিনি পরদিন শুনিলেন জেলখানার প্রহরীরা দেওয়ানি আদালতের খাজাঞ্চী বাহাদুর সিংহের বাড়ি আক্রমণ করে। বাহাদুর সিং তাহাদের ২৫ টাকা দিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পান। তাহা হইতে তাহারা কালেক্টরি খাজাঞ্চীর বাড়িতে গিয়া সেইরূপ উৎপাত করে, তিনিও কিছু দিয়া সেই সকল দুর্বৃত্তদের হাত হইতে নিস্তার পান। এই সকল সংবাদ শেষে কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছিলেন। সেরিস্তাদার মহিজুদ্দিন বলেন যে, "তাহার সামান্য ক্ষমতায় যতদূর হইয়া ছিল, তদনুসারে তিনি গবর্নমেন্টের হিতসাধনে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। শহরের লোকেরা বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল কিনা এবং মান্য-গণ্য লোকেরা এই বিদ্রোহের বিষয় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, সওয়ার এবং সিপাহিরা আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এই সকল বিভ্রাট বাধাইয়াছে। যদি ভদ্রলোকেরা এ বিষয়ে পূর্ব হইতে কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিদ্রোহের পূর্বেই এ সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িত। শহরের এবং ক্যান্টনমেন্টের সকল বদমায়েসেরা লুটপাট এবং হত্যাকাণ্ডে যে, বিশিষ্টরূপে লিপ্ত ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানা গিয়াছে। শেষে তাহারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রস্থান করে, আর যাহারা ছিল, তাহারা যথোপযুক্ত দণ্ড পায়।"

মীরটের তহসিলদার বাবু গঙ্গাপ্রসাদের কথা অনুসারে লিখিত হইতেছে—"১৮৫৬ সালের শেষে কি ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে মীরট অঞ্চলে "চাপাটি" আসিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহা সমস্ত দেশময় বিতরণ হইতে লাগিল। উক্ত "চাপাটি" প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব হইতে আইসে। গ্রাম্য চৌকিদারেরা তাহা বিতরণ করিত এবং তাহারা আবার নিকটস্থ গ্রামের চৌকিদারদিগকে বলিয়া দিত, তাহারা যেন উক্ত চাপাটি এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে চাপাটি বিতরণ কার্য আরম্ভ হইল। তদনন্তর শহর এবং সদরের লোকেরা বশা-টোটার কথা লইয়া ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে, এই টোটা গরু এবং শূকরের চর্বিতে প্রস্তুত হইয়াছে, আর তাহাই এ দেশীয় সৈন্যদের ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে সংবাদ আসিল যে, বারাকপুরের সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল এবং তাহারা মনে মনে ভাবিল, অবশ্যই এই টোটা লইয়াই বারাকপুরের সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়াছে। আবার গুজব উঠিল, অস্থি-মিশ্রিত আটা কানপুরে আসিয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই মীরটে পাঠান হইবে। এই সংবাদ পাইয়া সিপাহিরা আটা খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভাত খাইতে লাগিল। এপ্রিল মাসের শেষে একজন ফকির মীরটের সূর্যকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। সিপাহিদের সঙ্গে তাহার বড়ই সদ্ভাব হইল, তাহারা তাহাকে আপনাদের লাইনে লইয়া গিয়া আহারাদি করাইত। এই কথা শুনিয়া ম্যাজিস্ট্রেট জনস্টন সাহেব সেই ফকিরকে সে স্থান পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেন। এপ্রিলের শেষে তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহী সেনার ব্যারাকের কতক অংশ আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। ৯

মে যখন তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহী সেনাদের মধ্যে কতক সওয়ার কারারুদ্ধ করা হয়, তখন সর্বত্র রাষ্ট্র হইল, সিপাহিরা বিদ্রোহী হইবে। ২০ মে শনিবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় যখন তিনি তসিলীতে ছিলেন, তখন তাহার প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, সদরের বেনেরা অতি দ্রুতপদে আসিতেছে, এবং তাহারা সকলেই বলিতেছে,সিপাহিরা শীঘ্রই বিদ্রোহী হইবে। তাহার মুখে এইকথা শুনিয়া তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, শত শত লোক সভয়ে সদর হইতে শহরে যাইতেছে, আর বন্দুকেরও আওয়াজ হইতেছে। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আর ঘরের ভিতর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আফিসের দরজা বন্ধ করত বন্দুক তরবারি এবং কয়েকজন চাপরাশি লইয়া ফটকের ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের একজন সওয়ার তরবারি হস্তে এই কথা বলিতে বলিতে জেলঅভিমুখে ধাবিত হইল,—"হিন্দু এবং মুসলমান ভ্রাতারা শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দেও, আমরা ধর্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা নিশ্চয় জানিও, আমাদের সঙ্গে যাহারা যোগ দিবে, তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, আমরা কেবল গবর্নমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" সে চলিয়া গেল, তাহার পরক্ষণেই প্রায় ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং আর কতক পদাতিক সৈন্য জেলখানার দিকে যাইতে লাগিল। সূর্যদেব সমস্ত দিন অগ্নিকণা বর্ষণ করত হীনকান্তি হইয়া অস্তাচলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শুনা গেল, বিদ্রোহীরা জেল ভাঙিয়া কয়েদিদের ছাড়িয়া দিয়াছে। কিয়ৎকাল পরেই বাবু গঙ্গাপ্রসাদ দেখিলেন, শত শত উন্মত্ত বিপ্লবকারী "আলি আলি" শব্দে সদর হইতে আসিতেছে। তাহারা দেওয়ানি আদালতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। মেজর উইলিয়মস যে বাঙলায় ছিলেন, তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে, জিনিসপত্র যাহা ছিল, তাহা সকলই লুটিয়া লইয়াছে। সরকারের যে সকল নথিপত্র দলিল দস্তাবেজ ছিল, তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল বিদ্রোহী সিপাহি, কয়েদি, জেলখানার নজির (প্রহরী) এবং আরও বহুসংখ্যক লোক হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ করিতে করিতে এবং বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে তসিলির দিকে "ধাওয়া" করিল। তাহাদের নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া বাবু গঙ্গাপ্রসাদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তাহার হাতে বন্দুক ছিল, তিনি তৃতীয় অশ্বারোহী সৈন্যের একজন সওয়ারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন,—সে অমনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। পুনরায় আর একজনের উপর গুলি চালাইলেন, —সেও আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মাটিতে পড়িল। তিনি অন্তরাল হইতে গুলি চালাইতে ছিলেন বলিয়া, প্রথমে তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বারে তিনি ধরা পড়িলেন। তাহাকে দেখিয়াই কয়েকজন সিপাহি অসি-হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার দিকে ধাবিত হইল। একটু হইলেই সেখানে তাহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইত, কিন্তু তিনি সাহসে নির্ভর করত এক লাফে একজনের বাড়ির প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে পড়িলেন, সেখান হইতে আর একজনের বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া তৃতীয় ব্যক্তির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীরা, তখন পর্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল তাহার পর তিনি পেশকারের বাড়ির ভিতর দিয়া আর এক জনের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আর তাহার সন্ধান না পাইয়া বিদ্রোহীরা চলিয়া গেল। এইস্থানে তিনি আপনার পরিবারবর্গকে আনিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সমস্ত রাত্রি কেবল বিদ্রোহীসেনার "আলি আলি" শব্দে মীরট ভূমি বিকম্পিত ও আকাশ অনুনাদিত

হইয়াছিল। তৎপরে যখন তিনি শুনিলেন, বিদ্রোহীরা মীরট ত্যাগ করত দিল্লি চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি আপনার গুপ্তস্থান পরিত্যাগ করিয়া তহসিলের অবস্থা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। সেখানকার সে দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে যুগপৎ বিস্ময় এবং দুঃখ উপস্থিত হইল। সেখানে সে সুন্দর ঘর-দরজা, বাগান-বাড়ির চিহ্নমাত্র নাই, তাহার পরিবর্তে কেবল ভস্মের স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি শুনিলেন, কসাই, মুটে, খটিক (একপ্রকার জাতি), তাঁতি, সতরঞ্চ বিক্রেতা, খানসামা, খিস্‌মদগার, সইস, ঘেসেড়া, প্রভৃতি অনেকেই লুণ্ঠনকার্যে বড়ই ব্যাপৃত ছিল। তাহারা আবার নিকটস্থ গ্রামবাসীদের সাহায্য পাইয়া অনেক সাহেব এবং মেমকে হত্যা করে; কিন্তু তাহাদের কাহারও নাম জানিতে পারা যায় নাই। বিদ্রোহের প্রারম্ভে তিনি কেবল কয়েকজন সতরঞ্চ বিক্রেতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দুই জনের ফাঁসি হইয়াছে, আর সকলেই দিল্লি প্রস্থান করিয়াছে। ইহারা সকলেই মুসলমান। বিদ্রোহের রাত্রে এইরূপ রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগারের গুলি বারুদ এবং বন্দুক লইয়া দিল্লি যাত্রা করিয়াছে, এবং ব্রিটিশ শাসনেও একেবারে পর্যবসান হইয়া গিয়াছে।

১১ মে হইতে শহর এবং সদরে যদিও তাদৃশ কোনরূপ গোলমাল ছিল না বটে তথাপি চারি পাঁচ রাত্রি বদমায়েসেরা লুণ্ঠনাভিপ্রায়ে শহর বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। বিদ্রোহের রাত্রে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, বাবু গঙ্গাপ্রসাদ তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন; এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য কাহারও গৃহে আছে কিনা, তাহারও তল্লাসি লইতে আরম্ভ করেন। প্রতি রাত্রেই দেখিতেন, পাড়ার স্থানে স্থানে এবং সিবিল লাইনস্থ শূন্য-গৃহের হাতায় সাহেবদের অপহৃত দ্রব্যসামগ্রী পড়িয়া রহিয়াছে। এই দ্রব্য ফেলিয়া দিবার সময় কেহ কেহ ধরাও পড়ে এবং তাহাদিগকে কর্তৃপক্ষদের নিকট চালান দেওয়া হয়; তাহারা তথায় সমুচিত শাস্তি পায়। যখন রাত্রে তিনি পরিভ্রমণের জন্য বাহির হইতেন, তখন তিনি প্রায়ই দেখিতেন, নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী এবং পশম-বস্ত্রাদি স্থানে স্থানে গর্ত মধ্যে দগ্ধ হইতেছে। বিদ্রোহের পর তিনি এবং মঙ্গলসেন শূন্য গৃহে টিকিট মারিতে যান। তখন দেখেন, অধিকাংশ মুসলমানদের গৃহ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তথায় তাঁতি এবং সতরঞ্চ বিক্রেতারা বাস করিত। তিনি এ কথাও শুনিয়াছিলেন, যে ১১ মে হাফিজ রহিম মৌলবী কতকগুলি জিহাদের (ধর্মযোদ্ধা) লইয়া দিল্লি যাত্রা করিয়াছেন।

—জন্মভূমি ১২৯৯ আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ

অশ্বিনীকুমার সেন

সিপাহি বিদ্রোহে ভেতো বাঙালি

স্বনামখ্যাত বাঙালি বিদ্বেষী মেকলে সাহেবের মতে গোটা নিম্ন বাঙ্‌লাটা কাপুরুষের দেশ। অবস্থা বিবেচনায় বর্তমানে বাস্তবিক একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। সহানুভূতি বিবর্জিত, বিধর্মী, বিদেশী রাজার নীতি বিগর্হিত শাসন গুণে এখন বাঙালি—শুধু বাঙালি কেন—ভারতবাসী মাত্রেই দুর্বল হীনবীর্য, নির্বিষ ঢোঁড়ায় পরিণত। ইংরাজের বিচারে এখন গুপ্তি ব্যবহারেও কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়—তাহারা বংশ যষ্টিতেও বিদ্রোহের ভীষণ বিভীষিকা দেখিয়া আইনবলে তাহারও খর্বতা সাধন করিতে ব্যতিব্যস্ত। বর্তমান সময়ে নরমের যম ব্রিটিশ-সিংহের সাহসের মাত্রা দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে দা, কুড়ুল, খন্তা, কোদালী ত দূরের কথা দু'চারি বৎসরের মধ্যে ক্ষৌরকারের নরুন, দরজির ছুঁচ, রাখালের পাচন বাড়ি, ঝাড়ুদারের ঝাঁটা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিরীহ প্রজার নখদন্ত পর্যন্তও যে অস্ত্র আইনের আমলে পড়িয়া ক্রমে এদেশবাসী জনগণকে কিম্ভুতকিমাকার অকর্মণ্য জীব করিয়া তুলিবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এখন আমরা ইংরাজের চক্ষে কাপুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হইব না ত কি? কিন্তু চিরদিনই কি আমরা এমনি ছিলাম? না, কখনই না। প্রাগৈতিহাসিক দিনের আমাদের পূর্বপুরুষগণের সেই শৌর্য বীর্য, যশ গৌরবের দিনের কথা না হয় নাই বলিলাম, কিন্তু স্মরণীয় যুগেও কি আমাদের গৌরবের দিন ছিল না? ছিল; নিশ্চয়ই ছিল—দিন ছিল যখন নিম্ন বাঙ্‌লার বীর সেন, বিজয় সেন; লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি বৈদ্যজাতীয় স্বাধীন নৃপতি বৈজয়ন্তী দোলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন—দিন ছিল যখন বাঙালার প্রসিদ্ধ "বার ভুঁইয়া"গণের দোর্দণ্ডপ্রতাপে পর্তুগিজ, আরাকান, মগ প্রভৃতি জলদস্যুগণকেও বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল—দিন ছিল যখন এই নিম্ন বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের শৌর্যে বীর্যে দিল্লির সিংহাসন পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল—সে দিন আর নাই।

স্বার্থপর, বাঙালি বিদ্বেষী ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের কৃপায় এবং কতকটা বা মুখসর্বস্ব, আলস্য ও ঔদাস্যপরায়ণ বাঙালি জাতির অনুসন্ধান তৎপরতার অভাবে বাঙালির সে শূরত্ব, সে বীরত্ব কাহিনিও আজ সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে—আর দু'দশ বৎসর পরে হয়তো সে কাহিনিও শুধু কিম্বদন্তীর অঙ্গীভূত উপকথায় পরিণত হইবে। সুখের বিষয় কতিপয় স্বদেশ হিতৈষী, কৃতবিদ্য বাঙালি ঐতিহাসিকের যত্নে ও দৃষ্টান্তে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্তমান সময়ে স্বদেশের ইতিহাস আলোচনায় সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন—তাই আজ আমরা ঐতিহাসিকচিত্রের পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে একজন মসীজীবী ভেতো বাঙালির বীরচিত্র স্থাপন করিতে সাহসী হইলাম।

প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বাঙালিবীরের নাম প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথম ভাগে হুগলি জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। প্যারীমোহনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য স্কুলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল—তৎপরে তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজে

অধ্যয়ন করেন। কি স্কুলে, কি কলেজে সর্বত্রই ভাল ছেলে বলিয়া ইহার সুনাম ছিল। কলেজের পাঠ সমাপন করিয়াই প্যারীমোহন গভর্নমেন্টের অধীনে মুনসেফী কার্য লইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমানে যুক্ত প্রদেশ) রাজধানী এলাহাবাদে চলিয়া যান।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি গভর্নর জেনারেল রূপে সংহার মূর্তিতে ভারতের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইয়া কুটিল রাজনীতির আবরণে, ছলে, বলে, কৌশলে একে একে অযোধ্যা, সেতারা, ঝাসি, পুনা ও বেরার প্রভৃতি রাজ্য বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত করিয়া লওয়ায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজা সাধারণ ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। উৎপীড়িত ও অসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গ অনন্যোপায় হইয়া প্রতিকার জন্য সুযোগ ও উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—আবার অন্য দিকে ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিগণ শূকর চর্বি চর্বিত টোটা ব্যবহারের স্ব স্ব ধর্ম নাশাশঙ্কায় কোম্পানির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া অসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইল—এই মিলনে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যে এক ভয়াবহ বিদ্রোহের অনল জ্বালিয়া উঠিয়াছিল, ভারতেতিহাসে তাহাই 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

সিপাহি বিদ্রোহ সময়ে বীরদর্শী ব্রিটিশ সিংহকে কিরূপ বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠক মাত্রই তাহা জ্ঞাত আছেন।

এই সময়ে প্যারীমোহন এলাহাবাদের অন্তর্গত মুঞ্জানপুরের মুনসেফ ছিলেন। বিদ্রোহের প্রারম্ভ হইতেই কিরূপে এই মসীজীবী ভেতো বাঙালি নিজ শৌর্য, বীর্য ও সাহস প্রদর্শনে দুর্দান্ত বিদ্রোহগণের হস্ত হইতে তৎস্থানীয় ব্রিটিশ বীরগণের জাতি, ধন, মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়া বিশ্বনিন্দুক মেকলে সাহেবের কৃতজ্ঞতাপ্লুত জাতভায়াদের দ্বারাই "রণবীর মুনসেফ" (Fighting Munsiff) বলিয়া অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি উচ্চ রাজপুরুষগণের লিখিত বার্ষিক রিপোর্ট এবং ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সমূহ হইতে আমরা তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

এলাহাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টমসন লিখিত সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ :— "গত নভেম্বর মাসে প্যারীমোহন এই জেলার মুঞ্জানপুরে মুনসেফ নিযুক্ত হয়েন। এই সময় হইতেই তৎপ্রদেশ সমূহ হইতে বিদ্রোহীদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্মচারী হইলেও প্যারীমোহন মিঃ কোর্টের সহিত যোগ দিয়া লোক সংগ্রহপূর্বক এক সৈন্যদল গঠন করত বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়েন। তাহার গঠিত সৈন্যদল এরূপ সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহার সাহায্যে অতি অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিদ্রোহী অধ্যুষিত দেশসমূহে পুলিশ শাসন ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একবার বিদ্রোহীদিগের সহিত এই সৈন্যদলের এক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতে প্যারীমোহনই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন।"

এই সময় গভর্নমেন্ট হইতে প্যারীমোহনকে স্থানান্তরে বদলি করিবার প্রস্তাব করায় কমিশনার মিঃ থর্নহিল (Thornhill) তাহাতে আপত্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন :— "প্যারীমোহনের শৌর্য, বীর্য ও সাহস দেখিয়া বিদ্রোহীদিগের হৃদয়ে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহার উপস্থিতি সময়ে বিদ্রোহীগণ যমুনার দক্ষিণ তীরবর্তী দেশসমূহে

প্রবেশ করিতেও সাহসী হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন এ সময়ে প্যারীমোহনকে এ জেলা হইতে স্থানান্তরিত করিলে তাহার পক্ষে এ জেলা শাসনে রাখা অসাধ্য হইবে।"

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্র "কলিকাতা রিভিউ" বলেন :—"দেওয়ানী আদালতের একজন বাঙালি বিচারপতি বিদ্রোহ সময়ে স্বীয় বীরত্ব ও কার্যকুশলতা প্রদর্শনে এরূপ যশস্বী হইয়াছেন যে, লোকের নিকট বর্তমান সময়ে তিনি সাধারণত "রণকুশল মুনসেফ" Fighting Munsiff নামে পরিচিত। প্যারীমোহন যে শুধু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে নিজ এলাকাধীন দেশরক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে—তিনি বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ, তাহাদের অধ্যুষিত স্থানগুলিকে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত এবং চিঠি পত্র লিখিয়া অধঃস্তন কর্মচারীবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান প্রভৃতি বহুবিধ কার্য সমাধাকরত অদ্ভুত কার্যকুশলতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও শাসনক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া নিজ জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

প্যারীমোহনের পত্রোত্তরে মিঃ কোর্ট লিখিয়াছিলেন :— আপনার কার্যদক্ষতা ও বীরত্ব দেখিয়া আমি আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি আরও কিছুদিন এদেশে থাকিতে পারিতাম তবে আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে লইয়া লর্ড ক্যানিং এর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতাম। সময়, সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইলে এদেশের লোকেও কিরূপে নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারে ইংলন্ডবাসীদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্য আমি আপনার চিঠির এক প্রস্ত নকল দেশে লইয়া যাইতেছি। এ প্রদেশে শান্তি স্থাপন হইলে সে সংবাদ আমাকে লিখিবেন। বিদ্রোহের সময় যাহারা গভর্নমেন্টকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ ধন, মান, প্রাণ বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহারা কে কিরূপ পুরস্কার লাভ করে আমাকে তাহা জানাইলে সুখী হইব।"

সিপাহি বিদ্রোহের সময় প্যারীমোহন যে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন লেফটেনান্ট গবর্নর তাহাকে সহস্রমুদ্রা খিলাত ও বার্ষিক পাঁচশত টাকা আয়ের এক জায়গির প্রদান করত সরকারি গেজেটে তাহা ঘোষণা করিয়া গবর্নমেন্টের কৃতজ্ঞতা স্থাপন করিয়াছিলেন।* এই পুরস্কারে শুধু প্যারীমোহন নহেন—তাহার স্বজাতিমাত্রই গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একজন বাঙালি যে শূরত্ব, যে বীরত্ব দেখাইয়া রাজা, প্রজা উভয়েব নিকট হইতেই বীর পূজা ও বীর সম্মান পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন, ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে আজ শত শত সহস্র সহস্র বাঙালি যে সেই সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে—মেকলের জাতভায়াগণ মুখে না হউক—অন্তত মনে এ কথা স্বীকার করেন, ইহা আমরা স্পর্ধা সহকারে বলিতে পারি।

—ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৪ ভাদ্র ও আশ্বিন

* বিদ্রোহের পরে গভর্নমেন্ট প্যারীমোহনকে বান্দার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নিখিলনাথ রায়

১৮৬৫-১৯৩২

ধর্মনাশে সিপাহি বিদ্রোহ

খ্রিষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দে বঙ্গভূমি হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রলয়ঙ্করী কাহিনি অদ্যাপি ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিঘোষিত হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমানগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিরূপে এই বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল ও স্ব স্ব জাতীয় সিপাহিগণের সাহায্যে কিরূপে ব্রিটিশ সিংহকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল, যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাহারা সকলেই সে বিষয়ের অল্পবিস্তর অবগত আছেন। কিন্তু কি নিমিত্ত এই মহাপ্রলয়াগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল, সে বিষয়ের নানা কারণ কল্পিত হইয়া থাকে। লর্ড ডালহাউসির রাজ্যগ্রাস-পিপাসা যে ইহার মূল কারণ, ইহাই সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন। অযোধ্য পুণা প্রভৃতি রাজ্য বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত অঙ্গীভূত করিয়া তিনি ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে এক ভীষণ বিদ্বেষের সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবৃন্দ ইহার প্রতিকারের জন্য সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। সেই সময়ে ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিগণ গব্য ও শৌকর চর্বিমিশ্রিত টোটা কাটায় স্ব স্ব ধর্মনাশের আশঙ্কায় কোম্পানির বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গের সহিত তাহাদের মিলন সংঘটিত হয়। এই মিলনে তাহারা এই ভয়াবহ বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল। ইহাই সাধারণ কারণ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে।

কিন্তু কাবুল ও ট্রান্সভাল বিজয়ী 'সিপাহি' জেনরেল লর্ড রবার্টসও ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান পর ফরেস্ট প্রভৃতি অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঐ সমস্ত কারণ ব্যতীত কোম্পানির শাসন কর্তৃগণের কঠোর নীতিবলে হিন্দুদিগের ধর্মসম্মত অনেক প্রথার রোধ হওয়ায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় ব্রাহ্মণদিগের অপরিসীম ক্ষমতার হ্রাস হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে এক মহা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অশান্তি ক্রমে হিন্দু বিশেষত ব্রাহ্মণ সিপাহিদিগের হৃদয়েও স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর পুরাতন বন্দুকের পরিবর্তে এনফিল্ড রাইফেল প্রচলিত হওয়ায় তাহার টোটার জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় সিপাহিগণের পক্ষে অপবিত্র হওয়ায় তাহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। ঐ সমস্ত কঠোরনীতি মুসলমানদিগের কোন প্রথার প্রতি তাদৃশ হস্তক্ষেপ না করায় তাহাদের উত্তেজিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ ছিল না কিন্তু লর্ড রবার্টস বলিতে চাহেন যে, রাজস্ব বিষয়ের নতুন বন্দোবস্ত হওয়ায় হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। এই বন্দোবস্তে কোম্পানিই প্রকৃত প্রস্তাবে জমির অধিকারী হওয়ায় জমিদারবর্গ অসন্তুষ্ট হন। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব যে, লর্ড রবার্টসন এ যুক্তি অকিঞ্চিৎকব। মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা ব্রিটিশ রাজত্বে জমিদারেরা যে জমি সম্বন্ধে উত্তমরূপ অধিকার পাইয়াছিলেন,

ইহাই আমাদের ধারণা। বিশেষত বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ায় জমিদারদিগের অধিকার সুদৃঢ় হয়। যাহা হউক, লর্ড রবার্টস উক্ত মতের পোষণ করিয়া থাকেন। তাহার পর ডালহাউসির রাজ্য বিস্তার প্রথা দেশীয় রাজন্যগণের মনে অশান্তির উদয় করায় এই বিদ্রোহের অবতারণা হয়। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লর্ড রবার্টসের এই সমস্ত যুক্তির আলোচনা করিব। বর্তমান প্রবন্ধে ধর্মনাশ-আশঙ্কায় কিরূপে সিপাহি বিদ্রোহের অবতারণা হইয়াছিল আমরা তাহারই বিষয় আলোচনা করিতেছি।

যে সময়ে সিপাহিগণের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে কোম্পানির সৈনিক বিভাগের কর্মচারিগণ কেবল টোটা কাটাকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। তাহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সিপাহিদিগের মধ্যে এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোম্পানি তাহাদিগকে খ্রিস্টান করিবে। কেবল সিপাহিদিগের মধ্যে বলিয়া নহে, সাধারণের মধ্যে কোম্পানির রাজত্বের বিরুদ্ধে যেন অশান্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। রানিগঞ্জ, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানের কর্মচারিগণের গৃহদাহ প্রভৃতি তাহার কারণ বলিয়া তাহারা নির্দেশ করিয়াছিলেন। আইনবলে বিধবা-বিবাহ প্রথার অবতারণা হইতে হিন্দুদিগের মনে ধর্মনাশের আশঙ্কা প্রবল হওয়ায় তাহারাই এই অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। অবশ্য টোটা কাটার কথাও, ইহার সঙ্গে আছে। কিন্তু তাহা মূল কারণ নহে। মেজর জেনরেল হিয়ার্সের লিখিত ১৮৫৭ সালের ২৮ জানুয়ারি তারিখের একখানি পত্র হইতে আমরা এ বিষয় প্রথমে জানিতে পাই।[১] হিয়ার্সে বলেন যে, টোটা কাটার কারণ কর্তৃপক্ষ

১ ("From Major-General J B. Hearsey, C. B. Commanding the Presedency Division, to Major W.A.J. May hew Deputy Adjutant General of the army,—dated Barrackpore 28th January 1857.)

I beg leave to report for the information of Government that, an ill-filling is set to subsist in the minds of the sepoys of the regiments at Barrackpore A report has been spread by some designing persons, most likely Brahmins or agents of the religious Hindu party in Calcutta, (I beleive it is called the Dhurma Subha) that they (the sepoys) are to be forced to embrace the Christian faith.

On this report was grafted as an overt act to cause them to lose caste, the destributing amongst them of ball cartridges for the new Enfield rifle, that had the paper forming them greased with the fat of cows and pigs.

2. I should not have allowed these idle and groundless rumours to have had any weight on my mind, knowing that the latter circumstance (regarding the cartridges) would be remedied as soon as reported to higher authority, and trusting to the well-known repugnance of all officers with native regiments to act or do anything that could be construed into a wish or desire to interfere with the religious prejudices of the men under their command.

3. But the circumstance of a Surgents Bangalow being burnt down at Raneegunj. Supposed to have been caused by an incendiary. [a wing of the second Regiment native (Grenadier) infantry, from this station being now there], and also three incendiary fires having occoured at this station within the last four days; one, the electric telegraph Bangalow, and since then two Bangalows that were unoccupied, the second occouring only last night; as also Ensign F.E.A. Chamier, thirty-fourth Regiment, Native Infantry having taken a lighted arrow from the thatch of his own Bangalow,—has confirmed in my mind that these incendearism is caused by ill-affected men, and induced the sepoys to believe they are all labouring under some grievance, which they

শীঘ্রই দূরীভূত করিবেন, ও তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু যে অশান্তি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই সিপাহিদিগের ভাব পরিবর্তন হইতেছে। তিনি বিধবা-বিবাহের বিরোধীদিগকে ইহার স্রষ্টা অনুমান করিয়াছিলেন ও কলিকাতার ধর্মসভার লোকদিগের দ্বারা সিপাহিদিগের মধ্যে ধর্মনাশের বিশেষত তাহাদিগের খ্রিস্টান হওয়ার কথা প্রচারিত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। ধর্মসভার সহিত সিপাহি বিদ্রোহের বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কিনা আমরা বলিতে পারি না। সৈনিক কর্মচারীগণের এরূপ অনুমানের মূল কি তাহা অবগত হওয়ার উপায় নাই। যাহা হউক, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া তৎকালীন সৈনিক কর্মচারীগণ সিপাহিদিগের পরিবর্তে হিন্দু জনসাধারণের স্কন্ধে এই বিদ্রোহ সূচনার ভার অর্পিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া লর্ড রবার্টস স্থির করেন যে, ধর্মনাশের আশঙ্কায় লোকের মনে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায় সিপাহিদিগের মধ্যেও তাহা প্রচারিত হইয়া পড়ে,

have not the manliness to make known to their officers.
4. Perhaps those Hindus who are opposed to the marriage of widows in Calcutta are using underhard means to thowart Government in abolishing the restranits lately removed by law for the marriage of widows, and conceive if they can make a party of the ignorant classes in the ranks of the army believe their religion or religious prejudices, are eventually to be abolished by force. and by force they are all to be to made Christians and thus by shaking their faith in Government lose the confidence of their officers by inducing sepoys to commit offences (Such as incendearism) so difficult to stop to or prove. they will gain their object.
5 Brigadier Grant directed commanding officers of Regiments at this station the day before yesterday to parade their corps, and asked them if then had any grievance to complain of. Three of the officers have reported their man to be perfectly satisfied, and *colonel* S. G. Wheler, Commanding the thirty-forth Regiment, Native Infantry, assared the rumour so industriousty circulated was false, and the Native officers and men said they were satisfied, that it was so. but one Native officer respectfully asked it any orders had been received regarding the Enfield rifle cartridges. This he could not answer, as the letter permitting Ghee or other material to be used for that purpose by the men only arrived this morning. I have, however, directing its contents to be made known to every Regiment in the Cantonment, and a copy to be sent to Colonel C S.Ried, commanding Dum Dum, for Major Bontein's information.
6 It is my purpose, should this uneasy filling not adate, to parade the brigade, and myself explain the aboürdity of the notion that, any ; the most distant, intention to interfere with their religion is contemplated by Government.
7. I am sorry to add that I this morning heard that the officer, commanding her majesty's fifty-third Regiment in Fort William wrote to the officer in command of the wing of that Regiment at Dum-Dum to warn a campany to be ready to turn out at any moments and had distributed to the men of the company ten rounds of balled ammunitions informing that officer that a mutiny had broken out at Barrackpore amongst the Sepoys !! No copy of this letter or note was sent to Leiutenant Colonel C. S. Ried Commanding at Dum-Dum, nor to Brigadier Grant, or to myself. I need not-enlarge on the great impropriety of such a proceeding as it becomes known to the sepoys, it will undoubtedly create an ill-filling amongst them." (Selections from State papers preserved in the Military Dpt. 1857-58 Vol.-I pp 4-6 W. Forrest)

পরে টোটা কাটার উপলক্ষে এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তিনি কেবল বিধবা বিবাহকে একমাত্র কারণ বলেন নাই। কিন্তু অনেকদিন হইতে হিন্দু সাধারণের মধ্যে যে এই অশান্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি ধর্মনাশের আশঙ্কা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ স্থির করেন। সতীদাহ প্রচার রোধ, শিশুকন্যাবধ নিবারণ, ব্রাহ্মণদিগের প্রাণদণ্ড, খ্রিস্টান মিশনারিদিগের ধর্মপ্রচারের চেষ্টা ও তাহাদের কর্তৃক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের রক্ষা, বিধবা-বিবাহ, পাশ্চত্য শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের বিস্তার, এবং জেল কয়েদিদিগের মধ্যে প্রত্যেকের রন্ধন করা রহিত করিয়া প্রত্যেক জাতির জন্য একজন বা ততোধিক ব্যক্তির রন্ধনে জাতিনাশের আশঙ্কায় জনসাধারণের মধ্যে এই অশান্তির অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতে আরম্ভ হয়।[২] তাহার পর লর্ড ডালহাউসি দেশীয় রাজাদিগের ঔরসজাত উত্তরাধিকারীর অভাবে দত্তক পুত্রকে উত্তরাধিকারী স্বীকার না করিয়া সেই সেই রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করায় তাহাও ধর্মবিষয়ে হস্তক্ষেপের মধ্যে গণ্য হয়।[৩] অবশ্য এই সমস্ত ধর্মনাশের আশঙ্কা ব্যতীত

"The prohibition of Sati (burning widows on the funeral pyres of their husbands); the putting a stop to female infanticide, the execution of Brahmins for capital offences; the efforts of Missionaries and the protection of their converts; the removal of all legal obstacles to the remarriage of widows, the spread of western and secul... education generally; and more particularly the attempt to introduce female education, were causes of alarm and disgust to the Brahmins, and to those Hindus, of high caste whose social privileges were connected with the Brahmanieal religion "*** Railways and telegraphs were specially distasteful to the Brahmins; these evidences of ability and strength were too tangible to be poohpoohed or explained away. Moreover railways struck a direct blow as the system of caste, for on them people of every caste, high and low, were bound of travel together *** nor was oppertunity wanting to confirm apparently, the truth of their assertions. In the goal a system of messing had been established which interferred with the time, honour, custom of every man being allowed to provide and cook his own food. This innovation was most properly introduce as a matter of goal discipline, and due care was taken that the food of the Hindu prisoners should be prepared by cooks of the same or superior caste. Nevertheless, false reports were dissiminated, and the eredulous Hindu population was led to believe that the prisoners food were in future to be prepared by men of inferior caste, with the object of defiling and degrading those for when it was prepared. The news of what was supposed to have happened in the goals spread to town to town and from village to village, the belief gradually gaining ground that the people were about to be forced to embrace christianity (Robert's Forty one years in India Vol. I)

"Another weighty cause of discontent, Chiefly affecting the wealthy and influencial dasses and giving colour that the Brahmin's accusations that we intended to upset the religion, and violate the most cherished custom of the Hindus, was Lord Dalhousies strict enforcement of the doctrine of the lapse of property in the absence of direct or collateral heirs and the consequent appropriation of certain native States and the resumption of certain political pensions by the Government of India. This was condemned by the people of India as grasping and as an unjustfiable interference with the institutions of the country, and undoubtedly made us many enemies." (Fortyone years in India Vol. I).

অন্যান্য কারণ ও লর্ড রবার্টস নির্দেশ করিয়াছেন। ফরেস্ট সাহেবও উহাদিগের কয়েকটিকে এই বিদ্রোহসূচনার মূল বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি ক্যানিং ও ডালহাউসির সময়ের ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহেন যে, বিধবা-বিবাহ, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি হইতে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং তৎসঙ্গে টোটাকাটা মিলিত হইয়া এই বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল।[৪]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তাৎকালিক সৈনিক কর্মচারিগণ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এই ধর্মনাশের আশঙ্কা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং তাহারা কলিকাতার ধর্মসভার সভ্যদিগকে সন্দেহ করেন। লর্ড রবার্টস ধর্মসভার প্রতি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ব্রাহ্মণ-সাধারণ কর্তৃক যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই স্থির করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক ঐ সমস্ত নীতি ও শিক্ষা প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনায় তাহারা এই অশান্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করে।[৫] ফরেস্ট ও উক্ত মতের অনুসরণ করেন। কিন্তু বাস্তবিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা এই মতের প্রচার হইয়াছিল কিনা, এবং তাহারাই সিপাহি বিদ্রোহরূপ প্রচণ্ড দাবানলের সূচনা করিয়াছিলেন কিনা, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেহই নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম বা শাস্ত্র লইয়া সময় অতিবাহিত করেন, এবং যাহারা ধর্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করেন, তাহারা ঐ সমস্ত ব্যাপারে দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন সত্য কিন্তু তাহারা যেরূপ নিরীহ প্রকৃতি

৪ "An ancient and widely-spread custom has prohibited the Hindu widow from second marriage During the administration of Lord Dalhousie, an Act which permitted her to marry again had been proposed and discussed, and it was passed by his successor. The permission for widows to marry again trenched upon to confirm the suspicion which had entered his mind that the Government weshed to tamper with his creed. The establishment of telegraphs and railways and opening of schools had created a filling of unrest in the land, and appeared to the orthodox to threaten the destruction of the social and religions fabric of Hindu society. The propagator of sedition and the fanatic,the two great enemies of our rule took advantage of the feeling of unrest and suspicion to raise the cry that a systematic attack was to be made on the ancient faith and customs of the people, and they pointed to the introduction of the grased cartidge as a proof of what they saw sedulously preached (Forrest's History of the Indian Mutiny Vol. I).

৫ Those arbiters of fate, who are untie then all powerful to control every act of their co-religionists social, religious or political, were quick to perceive that their influence was meanest, and that their sway would in time to be wrested from them, unless they could devise some means for overthrowing our Government. They knew full well that the ground work of this influence was ignorance and superstition and they stood-aghast at what they foresaw would be the inevitable result of enlightenment and progress.

The fears and antagonism of the Brahmins being thus aroused, it was natural that they wish to see our rule upset and they proceeded to poison the minds of the people with tales of the Government's determination to force Christianity upon them and to make them believe that the continuance of our power meant the destruction of all they held most sacred (Forty-one year's in India vol. I)

তাহাতে তাহারা যে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার বীজ অঙ্কুরিত করিবেন ইহা আমরা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না। দুঃখের বিষয়, লর্ড রবার্টস্ ব্রাহ্মণ সাধারণকে তজ্জন্য দোষী স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যে, ব্রাহ্মণ সাধারণ ঐ সমস্ত বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইলেও, যাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে ঐরূপ নীতি ও শিক্ষা প্রচলনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল তাহারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের যত্নে সতীদাহ রহিত হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের ক্ষমতার হ্রাস হইবে বিবেচনায় যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিবাদী ছিলেন তাহারা উত্তেজনার প্রচারে দূরে থাকুক, তাহার নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিতেন। কারণ, তাহারা শান্তভাবেই আপনাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই শ্রেয় মনে করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পেশওয়াদিগের বংশধরের কথা স্মরণ করিয়া যদি লর্ড রবার্টস এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাতে কেবল ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ ছিল না, কিন্তু তাহার সহিত গূঢ় রাজনৈতিক সম্বন্ধও বিজড়িত ছিল।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ও এক্ষণেও বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এই অশান্তি প্রচারের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। ইহা তাৎকালিক সৈনিক কর্মচারিগণের অনুমান মাত্র লর্ড রবার্টস প্রভৃতিও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন। তাহারাও এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট প্রাচীন প্রথাসমূহের প্রতি হস্তক্ষেপ কবায় হিন্দু সাধারণের মধ্যে যে অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু তজ্জন্য যে সিপাহি বিদ্রোহের অবতারণা হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কারণ, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। তবে হিন্দু সিপাহিগণ ও হিন্দু সাধারণের মধ্যে হওয়ায় আমরা যে ধর্ম ও জাতিনাশ আশঙ্কায় কিছু উত্তেজিত হইয়াছিলাম, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। লর্ড রবার্টস বলেন যে, হিন্দুস্থানী সিপাহিদিগের মধ্যে এই জাতিনাশের আশঙ্কা প্রবল হইয়াছিল।[৬] এই জাতিনাশের বা ধর্মনাশের আশঙ্কায় হিন্দু সিপাহিগণ উত্তেজিত হইলেও মুসলমান সিপাহিগণের পক্ষে বলিবার কিছুই নাই। লর্ড রবার্টস রাজস্ব বন্দোবস্তের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে অকিঞ্চিৎকর ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে যে কেবল ধর্মনাশের আশঙ্কায় এই অগ্নি জ্বলিয়াছিল তাহা নহে; ইহার অন্য গূঢ় কারণও ছিল। সে কারণ, কোম্পানির ব্যবসাদারী ও অত্যাচার পূর্ণ রাজত্ব। রাজস্ব ও সামান্য কথা নানা প্রকার ট্যাক্সে ও অন্যান্য কারণে প্রজাসাধারণ উৎপীড়িত হওয়ায় এই অশান্তির সৃষ্টি হয়। আমরা, প্রবন্ধান্তরে ইহার আলোচনা করিব। অবশ্য ইহার সঙ্গে ধর্মনাশের আশঙ্কাও বিজড়িত ছিল।

আমরা যতদূর জানিতে পারি তাহাতে যে কারণে এই ভয়াবহ বিদ্রোহ সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, টোটাকাটাই তাহার প্রকাশ্য কারণ। পূর্ব হইতে যে অশান্তির অগ্নি

৬ "It has been made quite clear that a general belief existed amongst the Hindustani Sepoys that the destruction of their caste and religion had been finally resolved upon by the English as a means of forcing them to become christians" (Forty-one years in India Vol. I)

জনসাধারণের সহিত সিপাহিগণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহাতে টোটাকাটার সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে টোটাকাটাই এই অগ্নির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার গুপ্ত কারণ যে, অনেক ছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ধর্মনাশের যে আশঙ্কা লইয়া এই বিদ্রোহের সূচনা হয়, প্রকাশ্যভাবে টোটাকাটাই তাহার কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার অন্যান্য কারণ থাকিলেও তাহা আজিও প্রকাশিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে সমস্ত সরকারি কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, দমদমার একজন খালাসী জনৈক সিপাহির নিকট জলপানার্থে তাহার লোটা প্রার্থনা করায় সিপাহি সে কি জাতি না জানাতে তাহাকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। তাহার পর খালাসী উত্তর করে যে, শীঘ্রই তোমাদের জাতি যাইবে। কারণ, গব্য ও শৌকর চর্বি মিশ্রিত টোটা তোমাদিগকে কাটিতে হইবে।[৭] ইহার পর হইতে সিপাহিরা জানিতে পারে টোটার উপকরণে গব্য ও শৌকর চর্বি মিশ্রিত আছে। তাহারা তাহাদের কর্মচারিগণের নিকট ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহারা অম্লানবদনে উহা অস্বীকার করেন পরে তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। পুরাতন বন্দুক প্রচলন রহিত করিয়া এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সচেষ্ট হন। তজ্জন্য টোটা নির্মাণের প্রয়োজন হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ামে তাহার কারখানা স্থাপিত হয়, ও দমদমা, অম্বলা ও শিয়ালকোটে এক একটি গুদাম স্থাপিত হইয়া কলিকাতা হইতে

৭ "(From Lieutenant and Brenet Captain J A Wright Commanding the rifle instruction Depot, to the Adjutant of the rifle Instruction Depot—Dated Dum-Dum, 22ed. January 1857).

"I have the honour to report for the information of Major Bontein, Commanding the Depot, that there appears to be a very unpleasant feeling existing among the native soldiers who are here for instruction, regarding the grease used in preparing the Cartriages, same evil disposed persons having spread a report that it consists of a mixture of the fat of pigs and cows.

2. The belief in this report has been strengthened by the behaviour of a khalası attached to the magazine who I am told, asked a sepoy of the second regiment Native (Grenadier) Infantry to supply him, with water from his lota: the sepoy refused observing he was not aware of what caste the man was Khalası immediately rejoined—'you will soon lose your caste, as are long you will have to bite cartridges covered with the fat of pigs and cows—or words to that effect '

3. Some of the Depot men, in conversing with me on the subject last night, said that the report has spread throughout India and when they go to their homes their friends will refuse to eat with them. I assured them (believing it to be the case) that the grease used is composed of mutton fat and wax; to which they replied—'It may be so, but our friends will not believe it; let us obtain the ingrideints from the bazar and make it up ourselves; we shall then know what is used, and be able to assure our fellow soldiers and others that there is nothing in it prohibited by our caste.'

In conclusion I most respectfully beg to represent that the adopting the measure suggested by the men the possibility of any misundrstanding regarding the religious prejudices of the natives in general will be prevented (Selection from State papers Vol. 2.)

সেই সেই স্থানে টোটার চালান যাইতে আরম্ভ হয়। দমদমা ও বারাকপুরের সিপাহিরা কলিকাতার কারখানার লোকদিগের নিকট হইতে টোটার প্রকৃত উপকরণের বিষয় অবগত হইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে ও এই বিদ্রোহের সূচনা করে। সুতরাং ধর্মনাশের জন্য যদি বিদ্রোহের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে টোটাকাটাই যে তাহার প্রধান কারণ তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। তবে সিপাহিদিগের মনে জনসাধারণের ন্যায় যে অন্যান্য কারণও অন্তর্নিহিত ছিল তাহাও বিবেচিত হয়। কারণ, তাহারা জনসাধারণের অন্তর্ভূত ব্যতীত বহির্ভূত নহে কিন্তু সাধারণ লোকে যে, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। তবে পরিশেষে অনেকে ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ অবস্থার কথা, সূচনার কালে নহে। ধর্মনাশই হউক, বা কঠোর শাসননীতিই হউক, কোম্পানির রাজত্ব যে জনসাধারণের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অশান্তির ফলেই সিপাহি বিদ্রোহের অবতারণা হইয়াছিল। তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তিময়ী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। এই শান্তিময় রাজ্য যে আর কখনও কোন বিদ্রোহের অবতারণা হইবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে আমাদিগের প্রতি রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ দৃষ্টি আরও বিশদ হইলে ভাল হয়।

ধর্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ হইলে যে লোকে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়; ইহা জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। সকল জাতিই স্বধর্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া আসিয়াছেন। মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ইউরোপের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতে ধর্মের জন্য রাজপুতের যুদ্ধ ও ধর্মের জন্যই মহারাষ্ট্রীয় ও শিখজাতির উৎপত্তি। সেই হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্মহানির সম্ভাবনা ঘটিলে তাহারা যে উত্তেজিত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু লর্ড রবার্টস প্রভৃতি সিপাহি-বিদ্রোহের উত্তেজনার জন্য যে ব্রাহ্মণদিগকে দোষী স্থির করিয়াছেন ইহা আমরা স্বীকার করি না। ধর্মের জন্য হিন্দু সাধারণ যে, বিচলিত হয়, সিপাহি বিদ্রোহের পর সহবাস সম্মতির আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। জানি না, লর্ড রবার্টস প্রভৃতির ন্যায় আমাদের রাজপ্রতিনিধিবর্গ সেই বিশ্বাসের বশবর্তী কিনা। তাহা হইলে সহবাসসম্মতি আইনের সময় যে পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ও পূজনীয় বাল গঙ্গাধর তিলক প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রতিবাদের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি গবর্নমেন্টের দৃষ্টি কিরূপ তাহাও বিবেচনার বিষয়। চূড়ামণি মহাশয় একরূপ সাধারণ আন্দোলন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষত রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাহার কোনই যোগ নাই। তিনি ধর্মহানির আশঙ্কায় সাময়িক আন্দোলনেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল গঙ্গাধর তিলক উত্তরোত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁহাকে যে নানারূপে নির্যাতিত হইতে হইয়াছে তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জানি না, রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কিরূপ ভাব পোষিত হইতেছে। সহবাসসম্মতির অন্দোলনের জন্য অন্যের বিশেষ কিছু হউক বা না হউক হিন্দুসমাজের মুখপত্র বঙ্গবাসীকে কিন্তু নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। লর্ড রবার্টস প্রভৃতি সৈনিক কর্মচারিগণ ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, শাসন-বিভাগের কর্মচারিগণ তাহাদিগকে অন্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহারা তাহাদিগকে শান্তপ্রকৃতিই বলিয়াই জানেন। তাহারা ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাকে শারীর বলের

ফল না বলিয়া—বংশানুগত জ্ঞানালোচনা ও আত্মসংযমের ফল বলিয়া নির্দেশ করেন। ভারতে কত জাতির অভ্যুদয় ও বিলোপ সাধিত হইল, কত রাজবংশের উত্থান পতন হইল। কত ধর্ম প্রচারিত ও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু পুরাকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণ যে হিন্দু সমাজের নেতা হইয়া আসিতেছেন, ইহা তাহাদের বংশগত জ্ঞানালোচনা ও আত্মসংযমেরই ফল।[৮] যাহারা জ্ঞানে গরীয়ান ও আত্মসংযমে অটল তাহারা যে সিপাহি বিদ্রোহের ন্যায় গরলের সৃষ্টি করিবেন ইহা আমরা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না। বৌদ্ধ পাঠান ও মোগলের ধর্মের প্রবল আঘাত সহ্য করিয়া যাহারা অটলভাবে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাহারা যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সামান্য নীতিতে বিচলিত হইবেন ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। *ঐতিহাসিক চিত্র* ১৩১১

"He is an example of a class becoming a ruling power in a country, not by force of arms but by vigour of heridatory culture and temperance. One race has swept across India after another, dynasties have risen and fallen, religions have spread themselves over the land and disappeared. But since the down of history, the Brahman has calmly ruled, swaing the minds and receiving the homage of the people and accepted by foreign nations as the highest type of Indian mankind." (Hunter).

নিখিলনাথ রায়

সিপাহি যুদ্ধের দুইটি চিত্র

খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইয়া যে লোক-বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, তাহারই শত বৎসর পরে আবার সেই পতাকাকে রুধিররঞ্জিত করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত করিবার জন্য আর একটি ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়। ইতিহাসে তাহা সিপাহি যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যে ইংরেজের মস্তকে চির কল্যাণ বর্ষণ করিবার জন্য আপনার কর পল্লব সর্বদা উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তাহার অঞ্চল বাতাসে ব্রিটিশ নিশান সে যুদ্ধেও হেলিয়া দুলিয়া নীলাকাশে নৃত্য করিয়াছিল। সিপাহিগণ ও তাহাদের অধীনেতাদিগের বহু চেষ্টা তাহাকে ভূতলশায়ী করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাতে যে রুধির নদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে রঙ্গভূমি হইতে সুদূর দিল্লি প্রদেশ পর্যন্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। কামানের গভীর গর্জন, বন্দুকের অবিরাম শব্দ, শাণিত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, উভয় পক্ষের সৈন্যের কোলাহল, এবং শ্বেত কৃষ্ণ উভয় জাতির নরনারী ও বালক-বালিকাগণের আর্তনাদে দিঙ্‌মণ্ডলী প্রতিধ্বনিত হইয়া চারিদিকে প্রলয়ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। বাংলার শ্যামল প্রান্তর হইতে এই প্রলয়াগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া শেষে দিল্লি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে পলাশি প্রান্তরে প্রথমে ইংরেজের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, তাহারই নিকটে বহরমপুরের শ্যামল প্রান্তরে সিপাহি বিদ্বেষ-বহ্নির প্রথম স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। যদিও বঙ্গের জলসিক্ত ভূমিভাগে তাহা প্রদীপ্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বিহারের শুষ্ক ভূমি স্পর্শ করিবামাত্র তাহা প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়, ও ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এই প্রদীপ্ত অগ্নির আলোকে ভারতে অনেক চিত্র উজ্জ্বলভাবে লোক-লোচনের সম্মুখবর্তী হইয়াছিল। ইতিহাস সেই সেই চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া সেই প্রলয়াগ্নির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, আমরা তন্মধ্য হইতে দুইটি চিত্রের ছায়া মাত্র পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিবার ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির অবতারণা করিলাম।

প্রায় শত বৎসর হইল, কোম্পানির রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। রাজত্বে ও বাণিজ্যে কোম্পানি দেশমধ্যে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়া তুলিয়াছে। কোম্পানির শাসনকর্তৃগণ ছিদ্র পাইলেই দেশীয় রাজগণের রাজ্য ও জামিদারগণের জমিদারি খাস করিয়া লইতে তৎপর হইয়াছেন। নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়া সাধারণের মনে অশান্তির বীজ উপ্ত করিতে লাগিলেন। বিশেষত লর্ড ডালহাউসির বিশ্বগ্রাসিনী নীতির বলে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যেন একটা অসন্তোষের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। আবার গো-শূকরের চর্বি-মিশ্রিত টোটাকাটায় অসম্মত হইয়া সিপাহিগণও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে বিহার প্রদেশে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়-সন্তান ইংরেজ শাসন কর্তৃগণের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া শাণিত তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া বসিলেন। সাহাবাদ জেলায় জগদীশপুর যাহার নামে চিরবিখ্যাত হইয়া আছে, আমরা সেই কুমার সিংহেরই কথা বলিতেছি। বাল্যকালে দুর্ভেদ্য রোটাস দুর্গের পার্বত্য প্রদেশে মৃগয়া করিয়া যিনি চিরজীবন তেজস্বিতাকে আপনার প্রিয়সঙ্গিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার প্রতিকার্যে বীরোচিত কর্তব্য পালন ও উদারতা প্রকাশ পাইত, যিনি দীন দরিদ্রের কষ্ট নিবারণের জন্য অনেক ভূমি নিষ্কর প্রদান করিয়া শেষে নিজেই দরিদ্র প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজিও বিহার প্রদেশে যাহার উদারতা কাহিনি গৃহে গৃহে কথিত হইয়া থাকে, এবং যিনি বরাবর ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুরক্ত ছিলেন। ভারতের সেই অসন্তোষের স্রোত তাহাকেও ভাসাইয়া লইয়া যায়।

অত্যধিক উদারতার জন্য কুমার সিংহ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। সাহাবাদের কালেক্টরের নিকট তজ্জন্য অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। শেষে রেভিনিউ বোর্ড সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া কুমার সিংহকে বিপন্ন করিয়া তুলেন। কুমার সিংহ ঋণ পরিশোধের জন্য সময় প্রার্থনা করিলে রেভিনিউ বোর্ড তাহা অগ্রাহ্য করেন, এবং এক মাসের মধ্যে টাকা না দিলে তাহার জমিদারির সহিত গবর্নমেন্টের কোনই সংস্রব থাকিবে না, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কুমার সিংহ মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি গবর্নমেন্টের একজন অনুরক্ত প্রজা হওয়ায়, গবর্নমেন্ট তাহার জমিদারি রক্ষা করিবেন। কিন্তু বোর্ডের উক্ত রূপ আদেশে তাহার মস্তকে অশনি সম্পাত হইল। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করিতে না পারায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং গবর্নমেন্টের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত হন।

কুমার সিংহের অসন্তোষের কথা লইয়া লোকে নানারূপ প্রচার করিয়া তুলিল। সিপাহি যুদ্ধের প্রাক্কালে তাহাকে রাজনৈতিক অসন্তোষ বলিয়া গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক তখনও পর্যন্ত কুমার সিংহ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ার কল্পনাও হৃদয়ে আনয়ন করেন নাই। পাটনার কমিশনার এবং সাহাবাদ ও গয়ার ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে তাহাকে গবর্নমেন্টের অনুরক্ত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায় এবং ক্রমে নানা লোক তাহার সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করায় পাটনার কমিশনার টেনার সাহেবকেও শেষে কুমার সিংহের প্রতি সন্দিহান হইতে হয়। তিনি কুমার সিংহকে পাটনায় আনয়ন করিবার জন্য কুমার সিংহের আবাসস্থান জগদীশপুরে একজন মুসলমান চর প্রেরণ করিলেন। চর কুমার সিংহকে পাটনায় উপস্থিত হইবার জন্য কমিশনারের আদেশ জ্ঞাপন করাইয়া তাহার জমিদারির মধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহের চিহ্ন আছে কিনা তাহা পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহার কোনই চিহ্ন তাহার জ্ঞানগোচর হয় নাই, কুমার সিংহ অসুস্থতা প্রযুক্ত পাটনায় যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। চর পাটনায় ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপ অহেতুক সন্দেহের জন্য তাহার জমিদারি মধ্যে একটি চর পাঠাইয়া প্রজাবর্গের মনে অভক্তি উৎপাদিত হওয়ায় কুমার সিংহ আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করিলেন।

ক্রমে তাহার সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। একটি ঘটনায় তাহা সীমা অতিক্রম করিয়া কুমার সিংহকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তাহার কোন আত্মীয়ের বিবাহে কিছু অধিক সংখ্যক বরযাত্রী লইয়া যাওয়ার প্রার্থনা করিলে রাজকর্মচারীরা ভীত হইয়া তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। রাজপুরুষেরা হয়ত শিবাজী, সায়েস্তা খাঁর ব্যাপার স্মরণ করিয়া কুমার সিংহের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক ইহাতে কুমার সিংহ যারপর নাই অবমানিত মনে করিয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, এবং গবর্নমেন্টের প্রতি তাহার যে শেষ ভক্তিটুকু ছিল, তাহা একেবারে অসন্তোষের স্রোতে ভাসাইয়া দেন। এই সময়ে পদচ্যুত সিপাহিরা আসিয়া তাহাকে তাহাদের নেতৃপদে বরণ করিল। তিনি তাহাদের নিকট হিন্দু-মুসলমানের ধর্মনাশের কথা শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের সহিত সেই অশীতিপর বৃদ্ধ নবযুবকের ন্যায় তেজস্বিতা সহকারে ইংরেজ দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহিগণের সঙ্গে তিনি আরায় উপস্থিত হইলেন, অমনি দানাপুর হইতে সিপাহিরা আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ তাহার ভ্রাতা অমরসিংহ সর্বপ্রকার আয়োজনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। আরার সাহেব মহলে ভীতির সঞ্চার হইল। কুমার সিংহের আদেশে আবার ধনাগার লুণ্ঠিত হইল। কয়েদিগণ নিষ্কৃতি পাইল। কালেক্টরির জমি জমা কাগজ ব্যতীত আদালতের অনেক কাগজ নষ্ট করা হইল। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার বিকাম বয়েনের একটি ক্ষুদ্র দোতালা বাটী সাহেবদিগের দুর্গের স্থানীয় হইল। পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্য তাহার রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইল। কুমার সিংহ তাহা অবরোধ করিয়া অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমত তাহাতে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা হইল। পরে সুড়ঙ্গে বারুদ পূর্ণ করিয়া তাহা উড়াইবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু ইংরেজেরা আবার প্রতিকূল কার্যের দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কুমার সিংহ দুইটি কামান আনিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ইংরেজেরা কয়েকটি গরু আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে দিয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন। কুমার সিংহ দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম না হইলেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। সমস্ত আরা অধিকার করিয়া তিনি ইংরেজদিগের খাদ্য দ্রব্য বন্ধ করিয়া দিলেন। অনাহারে ইংরেজদিগের মধ্যে ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হইল। আরার অবরোধ শুনিয়া দানাপুরের সেনাপতি লয়েড একদল ইউরোপীয় ও শিখ সৈন্য আরায় পাঠাইয়া দেন। কাপ্তেন ডানবার তাহাদিগকে লইয়া আরার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নিশীথ রাত্রিতে তাহারা আরার নিকটে উপস্থিত হইলে একটি আম্রকুঞ্জ হইতে ধূমাগ্নি উদ্‌গীরণ করিয়া শ্রাবণের ধারায় ন্যায় গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সৈন্য সহ ডানবার ভূতলশায়ী হইলেন। একজন শিখ কোন ক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া দুর্গস্থ ইংরেজদিগকে সংবাদ প্রদান করিল। তাহাদের সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু ভগবান, অচিরে তাহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

ভিনসেন্ট আয়ার নামে একজন সেনাপতি জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাইতেছিলেন। তিনি আরার ঘটনা ও কুমার সিংহের ব্যাপার শুনিয়া নিজের গতি ফিরাইলেন। তিনি গুজরাজগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে কুমার সিংহের সৈন্যের সহিত

তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আরায় গোলা ও গুলি বর্ষণে কুমার সিংহের সৈন্যগণকে হটাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র নদীর সেতু ভাঙিয়া দিয়া আয়ারের গমন পথ রোধ করিল। আয়ার গোলা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু কুমার সিংহের সৈন্যেরা না হটিয়া ইংরেজ সৈন্যের সম্মুখীন হইল। নদীর পরপারে বিবিগঞ্জ নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ইংরেজ সৈন্য আরার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে কুমার সিংহের সৈন্যেরা বন মধ্য হইতে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরেজ সৈন্য তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়িল। কুমার সিংহ প্রবল বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কামানরক্ষী ইংরেজ পদাতিকগণ কামান ছাড়িয়া পলায়ন করিল। আয়ার সঙ্গীন চালাইবার আদেশ দিলেন। উভয়পক্ষে অনেকক্ষণ নিকট যুদ্ধ হইল। পরে ইংরেজেরা আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া আরার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা আরায় উপস্থিত হইয়া দুর্গমধ্যস্থ সাহেবদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন।

কুমার সিংহ বাসস্থান জগদীশপুরের দিকে গমন করেন। আয়ার তথায় গমন করিলে প্রথমে কুমার সিংহের সৈন্য কর্তৃক উত্ত্যক্ত হয়। পরে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কুমার সিংহের আবাস বাটী ও দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করেন। কুমার সিংহ এই সংবাদ পাইয়া জগদীশপুরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ইংরাজ সৈনিক পুরুষকে নিহত করেন। তাহার সঙ্গে অনেক মহিলা ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু জায়গা না থাকায় প্রায় দেড়শত রমণী আপনাদের কামানের মুখে মাথা রাখিয়া জীবন বিসর্জন দেন।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত হওয়ার পর কুমার সিংহের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে যে, তিনি হস্তী পৃষ্ঠে গঙ্গা পার হইবার সময় ইংরেজের গুলির দ্বারা বাম হস্তে আহত হন। কুমার সিংহ সেই হস্ত কাটিয়া গঙ্গা মাতাকে উপহার প্রদান করেন। তাহার পর পবিত্র সলিলা জাহ্নবী তাহাকে নিজবক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথবা বসুন্ধরা তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।

উপরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, নিম্নে তদপেক্ষা আর একটি বিস্ময়কর চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। এই রুধিরাপ্লুত চিত্রও কোম্পানির শাসন কর্তাদিগের ব্যবহারজনিত অসন্তোষের ফল। বুন্দেলখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশে ঝাঁসি নামক ক্ষুদ্র রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিপতি পেশওয়ার আশ্রিত ও অনুগত এক ব্রাহ্মণ বংশের অধিকারে ছিল। লর্ড ডালহাউসির রাজ্যগ্রাসিনী নীতিবলে পেশওয়া বাজীরাও এর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে বাজীরাও লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া কানপুরের নিকট বিঠুরে আসিয়া বাস করেন। তাহার সহোদর কিমাজি আপ্পার প্রিয় পাত্র মোরোপন্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের কাশীবাস কালে মনুবাই নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মোরোপন্ত কাশী হইতে বিঠুরে উপস্থিত হইলে বাজীরাও-এর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নানা সাহেবের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে মনুবাই-এর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। মনুবাই পরে ঝাঁসির অধীশ্বর গঙ্গাধর রাও-এর সহিত পরিণীতা হইয়া তথায় গমন করিলে তাহার রূপলাবণ্য ও পবিত্র ভাব দর্শনে সকলে তাঁহাকে "মা লক্ষ্মী" বলিয়া সম্বোধন করায় মনুবাই তদবধি লক্ষ্মীবাঈ নামে অভিহিত হন, এবং সেই নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

গঙ্গাধর রাওএর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণের জন্য রাজকর্মচারিদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন। লর্ড ডালহাউসি অমত প্রকাশ করেন, এবং ঝাঁসিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করার জন্য আদেশ দেন। ইতিমধ্যে গঙ্গাধর রাও পরলোক গত হইলে লক্ষ্মীবাঈ পুনর্বার দত্তক গ্রহণের জন্য গবর্নমেন্টের নিকট অনুমতি চাহেন। কিন্তু রাজ কর্মচারীরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ব্রিটিশ এজেন্ট তাহাকে ঝাঁসি ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীবাঈ উত্তর দিলেন, "মেরা ঝাঁসি নেহি দেঙ্গে।" কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট শেষে ঝাঁসি ব্রিটিশ সাম্রজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন। লক্ষ্মীবাঈ অবমানিত হইয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে গর্জন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রণোন্মত্ত সিপাহিগণ বঙ্গভূমি হইতে দিল্লি পর্যন্ত ধাবিত হইতে লাগিল। তাহাদের রণ হুঙ্কার বুন্দেলখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশেও প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ অনুহুঙ্কার করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া ছিলেন, এবং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নামে ঝাঁসি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট তাহাকে সন্দেহ করিয়া লক্ষ্মীবাঈকে আপনাদের বিপক্ষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করিয়া বসিলেন। লক্ষ্মীবাঈ তাহাতে আরও অবমানিত মনে করিলেন, এবং সহজে ঝাঁসি পরিত্যাগ করিব না বলিয়া কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাহার হস্ত হইতে ঝাঁসি লওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মীবাঈ সৈন্য সংগ্রহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দলে দলে সিপাহিগণ তাঁহার পতাকা মূলে আসিয়া সমবেত হইল। লক্ষ্মীবাঈ রমণীজনোচিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া বীর পুরুষের ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি বর্ম পরিহিতা হইয়া অশ্বারোহণে সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যর হিউরোজ লক্ষ্মীবাঈ-এর সম্মুখীন হইয়া তাহার অসীম সাহস ও রণকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কয়েক মাস ব্যাপিয়া লক্ষ্মীবাঈ-এর সৈন্যের সহিত ব্রিটিশ সৈন্যের অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রথম সংঘর্ষে ব্রিটিশ সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। পরে তাহাদের অগ্নিবর্ষণে লক্ষ্মীবাঈ-এর সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইলে, লক্ষ্মীবাঈ কলপি নগরে আবার ব্রিটিশ সৈন্য মথিত করিবার চেষ্টা করেন। কলপি অবশেষে ইংরাজদিগেরই অধিকৃত হয়। কিন্তু লক্ষ্মীবাইয়ের যুদ্ধনীতি ব্রিটিশ সৈন্যের হৃদয়ে ত্রাস ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

ইহার পর গোয়ালিয়রের নিকটে শেষ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের ফলে লক্ষ্মীবাঈ আত্ম বিসর্জন দিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। গোয়ালিয়রের নিকট উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ব্রিটিশ সৈন্যগণ বিচলিত হইয়া পড়ে কিন্তু ব্রিটিশ সেনাপতি কৌশল সহকারে লক্ষ্মীবাঈ এর সৈন্যগণকে মথিত করিলে, লক্ষ্মীবাঈ বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হন। সেই সময়ে তাহার সহচরী জনৈক ইংরেজ সৈনিক কর্তৃক আহত হইলে লক্ষ্মীবাঈ তরবারির আঘাতে তাহার মস্তক ছেদ করেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি খাল পথিমধ্যে পড়ায় লক্ষ্মীবাঈ-এর গতিরোধ হয়। তাঁহার অশ্ব খাল পার হইতে অশক্ত হওয়ায় লক্ষ্মীবাঈ তাহাকে চালিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। এই সময়ে একজন ইংরেজ সৈনিক তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীবাঈকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে, লক্ষ্মীবাই তাহার সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈনিকের আক্রমণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্যর্থ করিলেও তাহার

শেষ আঘাত লক্ষ্মীবাঈ এর মস্তকে পতিত হয়। বীর রমণী তাহাতে উত্তেজিত হইয়া স্বীয় অসির আঘাতে সৈনিককে ভূতলশায়ী করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রুধির ক্ষরণে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর নিকটবর্তী কোন পর্ণকুটীরে তাহাকে লইয়া গেলে কুটীর স্বামী তাহার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পবিত্র গঙ্গোদক প্রদান করেন। তাহাই পান করিয়া লক্ষ্মীবাঈ ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন ও এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইলেন। এই মহারাষ্ট্রীয় মহিলা যেরূপ তেজস্বিতা ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া ব্রিটিশ সেনাপতিকে চমৎকৃত করিয়া ছিলেন ইতিহাসে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। গুণগ্রাহী ব্রিটিশ সেনাপতি লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রশংসা করিতে বিস্মৃত হন নাই। আমরা উপরে যে দুইটি চিত্র প্রদর্শন করিলাম তাহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, অসন্তোষের ফলেই সিপাহি যুদ্ধ ঘোরতর আকাব ধারণ করিয়াছিল। এই অসন্তাষের চিত্র সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে অনেক স্থলে অঙ্কিত আছে। *ঐতিহাসিক চিত্র* ১৩১৬

প র্য বে ক্ষ ণ ২

১৯০০ সালের পরবর্তী সময়ে
লিখিত বিবরণ

প্রমথনাথ মল্লিক

১৮৭৮—১৯৪৩

লর্ড ক্যানিং ও ভিক্টোরিয়া যুগ (১৮৫৮—১৮৬২)*

লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাহার পীড়িত বাল্যবন্ধু ডালহাউসির হস্ত হইতে গভর্নর জেনরেলির কর্মভার ও পদ গ্রহণ করেন। যে মহাত্মার রাজত্ব শাসনকালে ভারতবর্ষের কেন, ইংলন্ডের সর্বপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা হয়, তিনিই এদেশে ইংরাজ জাতির গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য দৃঢ় ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ ও ইংলন্ডের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রথম প্রতিনিধি হন। তিনিই সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেষ গভর্নর জেনরেল ও রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা প্রতিনিধি ও গভর্নর জেনরেল পদ গ্রহণ করেন। সেই অপূর্ব সন্ধিক্ষণেই ভিক্টোরিয়া যুগারম্ভ হয়। তিনি তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দান করিয়া "দয়াল ক্যানিং" বলিয়া যেমন আদৃত, তেমনি তাহার কতকগুলি স্বদেশী ও ইউরোপীয় হঠকারি অবিবেকী ব্যবসাদার ও কর্মচারী কলিকাতাবাসীগণ তাহাকে উপহাস করিয়াছিল। শেষে উহাই, তাহার যথার্থ মহত্ত্বের উপাধি বলিয়া পরিগণিত হয়। ডালহাউসি তাহার বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন, ভাই! এস আমরা স্থান বিনিময় করি। অর্থাৎ তুমি আমার মত কাজ করিয়া অস্থিচর্মসার রুগ্ন হইও না। তিনিই ইহাই বলিয়াছিলেন ও আর ঐ কার্য করিতে চান নাই। এই কথার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে লরেন্স সাহেব উহা বলেন। উহাতে তাহার জীবনী লেখক বলেন যে, ক্যানিং ডালহাউসির কথায় মনে কবিয়াছিলেন যে, তাহার কার্য সময়ানুযায়ী অগ্রসর হইলেই ভাল ছিল। লর্ড ক্যানিং এখানে আসিবার পূর্বে বিলাতের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাহার পিতা তাহার সময়ের একজনই বিখ্যাত রাজনৈতিক পুরুষ বলিয়া সুখ্যাতি ছিল। তিনি ঐ পথ গ্রহণকালেই বলিয়াছিলেন যে, এই কার্যভার গ্রহণ করিতেছি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে যে ঘনঘটার সহিত মেঘ উঠিয়াছে উহাতে হয়ত আমাদের সর্বনাশ হইবে। ইহাতেই মনে হয় যে, তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ জানিতেন, উহা না হইলে তিনি কি বিলাত হইতে বিদায় ভোজকালীন সম্পূর্ণ অপ্রিয় সম্ভাষণ করিতে পারিতেন? লাট ক্যানিং কলিকাতায় আসিবার পথে মাদ্রাজে নামিয়া তাহার বাল্যবন্ধু সহাধ্যায়ী সেখানকার গভর্নর লর্ড হারিসের সহিত দেখাশুনা ও কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। তিনি বোম্বায়েও নামিয়াছিলেন ও সেখানকার লাটের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় পরম বন্ধু লাট ডালহৌসির সহিত ৫/৬ দিন সদালাপে তাহার কার্যের সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সভার সভ্যগণের নাম স্যার বারনস পিকক, মিঃ জন পিটার গ্রান্ট ও জেনরেল জন লো। ক্যানিং

* কলিকাতাব কথা

লাটগিরি কোন বাহ্যারম্ভের সহিত আরম্ভ করেন নাই, তিনি ধীরে ধীরে কার্য করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সপ্তাহ কয়েক না যাইতেই তাহাকে পারস্য দেশের অধিপতির সহিত দ্বন্দ্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। সেই সময় তিনি কলিকাতায় টেলিগ্রাফের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি আফগানের আমীরকে মিত্র করিয়া পারস্যাধিপতিকে শিক্ষাদান করেন। তিনি আর যেন কখনও আফগানিস্থান আক্রমণ করিবেন না বলিয়া হিরাট পরিত্যাগ করিয়া যান। ইংরাজেরা চীন দেশের সহিত যুদ্ধ ও সেখানে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। এই দুই যুদ্ধেই এদেশী সিপাহিরা যুদ্ধ করে। তাহার সময় কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরে এক একটি পাশ্চাত্য আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন ক্রিয়া হয়। উহাতে রীতিমত পরীক্ষাদি দ্বারা উপাধিদানের ব্যবস্থা হয়। উহাই তখন বিদ্রোহ দমন করিবার পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন হইতে এদেশে প্রকাশ্যভাবে* ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার রাজত্বকালে যে সকল ঘটনা হয় তন্মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহই সর্বাপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। উহা দমন করিতে গিয়া কোম্পানিকে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হয় ও উহার নিমিত্ত সামরিক বিভাগে সে সমস্ত অবশ্য কর্তব্য পরিবর্তন করিতে হয় উহার জন্য বার্ষিক দশ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়া যায়। সেই অর্থ আদায়ের উপায় নির্ধারণের জন্য বিলাত হইতে রাজার অর্থনীতি সচিব জেমস উইলসন সাহেব আসিয়া যাবতীয় আমদানি রপ্তানি মালের উপর শুল্ক ও ইনকাম ট্যাক্স ধার্য করেন। তিনিই এদেশে কারেন্সি নোট প্রচলন করেন। তিনি সোনা ও রুপার মুদ্রার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। উহাতে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সোনারুপার দামের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত নোটের দামের হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। উহাতে বিলাতের ও ইউরোপবাসীর মঙ্গল হয়; কিন্তু ভারতের সমূহ সর্বনাশ হয়।

ভয় :

লর্ড ক্যানিং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতায় সেই সময়ে এদেশী প্রহরী সৈন্যগণকে অতি কৌশলে নিরস্ত্র করেন। তিনি কলিকাতার দুর্গে এদেশী সিপাহিগণের কুচকাওয়াজ ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে গিয়া উহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইউরোপীয় ভলান্টিয়ারগণ তখন লাট প্রাসাদে প্রহরীর কার্য করিত ও ছোটলাট এবং বড়লাট একত্রে কলিকাতার রাজপ্রাসাদে থাকিতেন ও বেলভেডিয়ার খালি পড়িয়াছিল। ভলান্টিয়ার অশ্বারোহীরা কলিকাতার রাস্তায় রাত্রে প্রহরীর কার্য করিত ও রাত্রি নয়টার সময় নগরবাসীরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিত। কলিকাতার অধিবাসীরা সিপাহি বিদ্রোহের অকস্মাৎ আক্রমণ ভয়ে সর্বদাই অধিক অশান্তি ভোগ করিয়াছিল। তখন কলিকাতার লোক সর্বদাই চিন্তিত কখন কি হয়, কোথায় কি হইতেছে, কোথা হইতে হঠাৎ শত্রু আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। উহাতে কলিকাতাবাসীর আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল। মৃত্যু অপেক্ষা উহার ভয় অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক। সেই ভয় কলিকাতাবাসিগণকে তখন সর্বদাই বিহ্বল করিয়াছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদমায় ও বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি ও সাত দল সিপাহিগণকে নিরস্ত্র

* ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২ নং আইন দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৫/৫৬ খ্রিস্টাব্দের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয়। হিন্দু কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়। উহা আর হিন্দু বালকগণের জন্য রহিল না, তজ্জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ আপত্তি করেন।

করা হয়। ১৪ জুন রবিবার প্রাতে গির্জায় প্রার্থনা করিবার পর গুজব হয় যে, বারাকপুর হইতে বিদ্রোহী সিপাহিরা কলিকাতায় আসিতেছে ও তাহাদের সহিত মেটিয়াবুরুজের অযোধ্যার নবাবের লোকেরা যোগদান করিয়া কলিকাতাকে ধ্বংস করিবে। সেই নবাবকে তাহার মন্ত্রী আদির সহিত কলিকাতার দুর্গে বন্ধ রাখা হয়, কিন্তু সেই সকল সিপাহি কলিকাতা আসিবার পূর্বেই গূঢ় সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় চুঁচুড়ার ৭৮নং হাইলাণ্ডার সৈন্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলে। কলিকাতায় তখন ইংরাজ সৈন্যের দল ছিল না। কলিকাতায় উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীগণ পিস্তল হাতে করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিত। আর লাট সভার সভ্যেরা আপনাদের পুত্র পরিবাব লইয়া বাড়ি ঘর ত্যাগ করিয়া নদীর উপর জাহাজে গিয়া বাস করিত। কলিকাতার গঙ্গার ঘাট লোকে পরিপূর্ণ, তাহারা জাহাজে স্থান পায় নাই, কত লোক গাড়িতে সাজিয়া আসবাবপত্র লইয়া পলাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে ও সেইখানেই রাত্রি যাপন করে। কতক অধিবাসী বাড়ির ছাদের উপর দরজাটি বন্ধ করিয়া পিস্তল ও বন্দুক লইয়া আততায়ী শত্রুকে প্রহার ও নষ্ট করিবার জন্য সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকিত। তাহারা গরম জল ও গলা শিশা দিয়া শত্রুকে নষ্ট করিবার যুক্তি সিদ্ধান্ত করে। অনেকে ডালহাউসি স্কোয়ারের ধারের বাড়িতে দরজায় বেড়া দিয়া ভেরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সিঁড়ির মুখে পিস্তল হাতে করিয়া বসিয়া থাকিত। আর ফিরিঙ্গির দল ফাঁকা আওয়াজ করিতেছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল সেই ভয়েই তাহাদের দিকে সিপাহিরা যাইবে না। উহাতে লোকে শত্রুর আগমন ও তাহাদের দ্বারাই গোলাগুলি ছোঁড়া ভ্রম করিতেছিল। উহা বন্ধ করিবার জন্য বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। এইরূপ কাণ্ডকারখানা কলিকাতায় যে কেবল একদিন হইয়াছিল উহা নয়। লাট ক্যানিং-এর কর্তব্যজ্ঞানের জন্য কলিকাতায় ইউরোপবাসীগণ এইরূপ জ্বালাতন হইয়া এদেশবাসীর উপর কোনরূপ ভয় দেখাইতে বা অত্যাচার করিতে না পারায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতায় এক প্রকাশ্য সভা করিয়া লর্ড ক্যানিংকে লাট সাহেবের কর্ম হইতে বরতরফ করিবার জন্য ইংলন্ডশ্বরীর নিকট এক আবেদন প্রেরণ করে। অনেকের ধারণা যে লাট সাহেব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ধারা আইনে করিয়াছিলেন বলিয়াই যেন এইরূপ দরখাস্ত করা হয়। যাহাই হউক, কলিকাতায় সেই সময় কলিকাতার ইউরোপবাসিগণ লাট ক্যানিং-এর সততা ও ধর্মভীরুতার উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়াও তাহাকে কোনরূপে বিচলিত করিতে পারে নাই। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ৩ মার্চ রবিবার ব্যারাকপুর হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখান হইতে সিপাহিরা কলিকাতা লুঠ করিবে, এই গুজব হয় ও পুনরায় পূর্ববর্তী অভিনয় আরম্ভ হয়। কলিকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ফিরিঙ্গি ইউরোপীয়রা একত্রিত হইয়া বসিয়া থাকে ও গাড়িওয়ালার ভিড়ে উহার মধ্যে লোকের প্রবেশ করিবার রাস্তা ছিল না। সকলে এক হইয়া সিপাহিদের শিক্ষাদান করিবে। ক্যানিং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ১ জুন কলিকাতার অবৈতনিক সৈন্য দল (Volunteer Regiment) ধন্যবাদের সহিত বরতরফ করেন ও কেহ বিনা অনুমতিতে বন্দুক রাখিতে পারিবে না আইন হয়।

সিপাহি বিদ্রোহ দমন করিবার পর ইংলন্ডের পার্লিয়ামেন্ট সভা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইজারা সত্বর প্রত্যাহার করেন ও শাসন ইংলন্ডেশ্বরীর নামে তাহার প্রতিনিধি

স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ভারতবর্ষের শাসনকর্তা রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ গভর্নর জেনরেল হইলেন বটে, কিন্তু তিনি বিলাতের একজন সেক্রেটারি অফ স্টেট ১৫ জন সভ্য লইয়া তত্ত্বাবধায়ক ও সভার অধীনে কার্য করিবেন স্থির হইল। সেই সভাব সভ্যেরা ভূতপূর্ব এ স্থানের অবসরপ্রাপ্ত গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল বা উচ্চপদ বিশিষ্ট কোম্পানির কর্মচারীরা মনোনীত হইতেন। উহাতেই বিলাতের ডিরেক্টর সভা ও বোর্ড অফ কন্ট্রোল সভার শেষ হইয়া গেল। এই পরিবর্তনে এদেশের কর্মচারিগণের প্রভাব পূর্বাপেক্ষা অধিক ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর ভারতের যেখানে লর্ড ক্লাইভ সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ইজারা লইয়াছিলেন, সেই এলাহাবাদে এক বৃহৎ দরবার করিয়া লর্ড ক্যানিং স্বয়ং গিয়া মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। সেই সময় হইতেই সর্বপ্রথম কলিকাতা রাজধানী হইলেও ঐ সকল কার্যের জন্য উপযুক্ত নয় বলিয়া বিবেচিত হয। তজ্জন্য ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী স্থল সমীচীন মনে হয়। এলাহাবাদের ন্যায় সৌভাগ্যদায়ক জায়গায় এ কর্ম করা উচিত বলিয়া স্থির হয়। কোম্পানির আমলে যেমন কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তেমনি মহারানির ঘোষণাপত্রে এদেশের রাজা মহারাজারা হইতে দীন দরিদ্র সকলেই যেন মুগ্ধ হইয়াছিল। কারণ বেন্টিঙ্কের আমল হইতে যে হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ হইতেছিল উহা যেন গভর্নমেন্ট আর করিবেন না, উক্ত ঘোষণায় লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। ঐ এস্তাহারে উক্ত হইয়াছে যে, আর কোন প্রজার ধর্ম বিশ্বাস বা তাহাদের ধর্মানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের উপর আমার কর্মচারীগণ হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং সেজন্য কেহ তাহাদের অনুগ্রহভাজন বা তৎকর্তৃক নিগৃহীত হইবেন না। রাজ্যে কর্মনিয়োগ সম্বন্ধেও সেই কথা, কোনরূপ ধর্ম বা জাতিনির্বিশেষে পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না, কেবল যোগ্যতানুসারেই উহা করা হইবে। পূর্ব প্রচলিত প্রথানুসারে পৈতৃক ভূসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব অব্যাহত থাকিবে। রাজ্ঞী তাহার নিজের স্বত্বের ন্যায় ভারতের রাজন্যবর্গের পদগৌরব, মর্যাদা ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন, উহাতে রাজ্য বিস্তার করিবার কল্পনা ত্যাগ করা হইল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত রাজাদিগের যে সকল সন্ধি হইয়াছিল তদনুসারে কার্য করা হইবে। আত্মীয়বর পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় ক্যানিং ইংলন্ডের রাজ্ঞীর নামেই রাজ্য শাসন করিবেন। কতিপয় বিশেষ কারণে মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্মতিক্রমে পার্লিয়ামেন্ট সভার অভিমতানুসারে তাহাদের হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্যের রাজ্যশাসনভার রাজ্ঞী স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাহাদের অধীন কি সৈন্য বিভাগ, কি রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কর্মচারীরা যেমন কার্য করিতেছিল তেমনি কার্য করিবে। এই বিদ্রোহের শান্তি সম্মুখ যুদ্ধে করায় ইংলন্ডের রাজ্ঞীর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে এক্ষণে কতক স্বার্থপর লোকের মিথ্যা রটনায় মুগ্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজদ্রোহী নয় ও তাহার সংহার কার্যে ব্রতী হয় নাই তাহাদিগকে রাজ্ঞীর দয়ার পরিচয় ক্ষমা দান করিয়া করিলেন। লাটসাহেব কলিকাতায় ১৭ অক্টোবর এই মহারানির ঘোষণাপত্র প্রাপ্ত হন এবং উহার বিষয়গুলি লইয়া বিলক্ষণ লেখালেখি হয়, উহা মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। লর্ড ক্যানিং ঐ ঘোষণাপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার ১৯ অক্টোবর করেন, উহা রাজ্ঞীর নিকট ২৯ নভেম্বর পৌঁছে। তিনি উহাতে বলিতেছেন যে, যেন অতীতের রক্তারক্তি শোচনীয়

ব্যাপারের উপর তাহার ঘোষণাপত্র আবরণ করিয়া এক নূতন যুগের সৃষ্টি করে, উহাই ভিক্টোরিয়া যুগ। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাহার ঘোষণাপত্রে অনেক স্থলে আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তদ্রূপ লর্ড ক্যানিং অপরাধীগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সাজা দিতে গিয়া আর এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অকুতোভয়ে বলিয়াছিলেন যে, আশি হাজার বিলাতি সৈন্য দিয়া তিন কোটি লোককে সাজা দেওয়া বা বশীভূত করা যায় না। এই ঘোষণাপত্র ও অযোধ্যার তালুকদারদের প্রতি লক্ষ্ণৌ অধিকার কবিবার পূর্বে যে ঘোষণাপত্র লর্ড ক্যানিং প্রচার করিতে চান, উহা লইয়া মতভেদ হওয়ায় বিলাতে লর্ড এলেনবরা তাহার বোর্ড অফ কন্ট্রোলের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।*

Letters of Queen Victoria V III P 281-3

রাজেন্দ্রলাল আচার্য

সিপাহি বিদ্রোহ : প্রবাসী বাঙালি*

সিপাহি বিদ্রোহ : ভারতের সুদূর গগনে যে এক হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছিল, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ তাহা গগনমণ্ডল সমাবৃত করিয়া ফেলিল, অকস্মাৎ তাহা অশনিসম্পাতে সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিল—অকস্মাৎ তাহার অগ্নিগর্ভ হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে ভীষণ অনল প্রজ্বলিত করিল। সে অনল-শিখা ভারতের ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহ নামে পরিচিত। উহা যখন প্রবলভাবে উত্তর-ভারতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তখন উহা প্রবাসী-বাঙালির সুপ্ত বীর্যকে জাগ্রত করিয়া বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিল। তাহারা তখন নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রবাসী বঙ্গসন্তানের বীরত্ব-খ্যাতি বাঙালি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। নিম্নে তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও কাহিনি সঙ্কলিত হইল। (১)

বাবু গুরুদাস মিত্র : অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে যে বংশের বীর বাঙালি নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া কারাবন্দী হইয়াছিলেন, সেই মিত্র বংশোদ্ভব গুরুদাস মিত্র উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে সিপাহি বিদ্রোহের কালে বারাণসীর বিপন্ন ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়া স্বতন্ত্র 'খেলাৎ' লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীর কমিশনার এবং প্রতিভূ ভারত গভর্নমেন্টকে জানাইয়াছিলেন—আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মিত্রের পুত্র গুরুদাস মিত্র সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে গভর্নমেন্টকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্রোহের রজনীতে তিনি টঙ্কশালার প্রহরীকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে সৈন্যদিগের রসদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (২)

সিপাহি যুদ্ধের কালে বাঙালির সৈন্য সংগঠন : "উত্তেজিত লোকে কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙালি শান্তভাবে কালাতিপাত করিতেছিল,....উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোনরূপ সমবেদনা ছিল না। কোম্পানির রাজ্যবিনাশার্থেও ইহারা কাহারও পরামর্শে পরিচালিত হইতেন না। নগরের দুর্বৃত্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসিদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া বাঙালিরা চারিদিকে বিধ্বংসের বিকট ভাব দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের ধন সম্পত্তি অধিকৃত হইল, তাহাদেব জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের আবাসগৃহ মুহুর্মুহু ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণ্ঠনিঃসৃত করুণ রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা দুর্গস্থিত ইংরাজদিগের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন এবং

---

(১) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রবাসী—পৌষ, ১৩২৩।

(২) *Hindu Tribes and castes as represented in Benares*. Rev. M A. Sherring M A. L L. B. P 313

* *'বাঙালির বল' গ্রন্থ থেকে*

আপনাদের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, সুতরাং তাহারা কোনরূপ সাহায্যদানে সমর্থ হইলেন না। বাঙালিরা অতঃপর একজন সমৃদ্ধিশালী হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিক দল সংগঠিত করিলেন।"*

যোদ্ধা মুন্সেফ : সিপাহি-বিদ্রোহের তিন চারি বর্ষ পূর্বে উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রয়াগের নিকটবর্তী মঞ্জনপুর নামক স্থানে মুন্সেফী করিতেন। যখন তথায় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল—বিদ্রোহিদিগের অত্যাচারে গ্রামগুলি ভস্মীভূত হইতে লাগিল, প্যারীবাবু তখন স্বয়ং একদল সৈন্য গঠন করিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যুদ্ধে তাহারা এই বঙ্গবীরের নিকট পরাজয় মানিতে বাধ্য হইল। লর্ড ক্যানিং তাহার ডেস্‌প্যাচে প্যারীবাবুকে "যোদ্ধা মুন্সেফ" নামে সুপরিচিত করিয়াছেন। এই সময়ে একবার বিদ্রোহী দলপতি দুর্দান্ত বিমল সিং ও বহু সর্দার তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল। অনেক বিদ্রোহী তাহার ভয়ে যমুনা নদী অতিক্রম করিতেই সাহসী হইল না! দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক মসীজীবী প্রবাসী বাঙালি যে অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বাঙালির বীরত্বের ইতিহাসে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকিবে। গুণগ্রাহী বড়লাট বাহাদুর যোদ্ধা-মুন্সেফের কীর্তিকাহিনি স্মরণ করিয়া কানপুর-দরবারে তাহাকে বহুমূল্য খেলাৎ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন

বাবু রাসবিহারী ঘোষ : সিপাহি-বিদ্রোহকালে লখনউ প্রবাসী কালীচরণবাবু, দুর্গাদাসবাবু প্রভৃতির ন্যায় যাহারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আনরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী ঘোষ তাহাদিগের অন্যতম। তাহার অসাধারণ শক্তি ছিল, অশ্বচালনায় নিপুণতা ছিল, ব্যায়াম-কৌশলে তিনি সুপটু ছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়া তিনি কালেক্টরি অফিসে কর্ম গ্রহণ করেন এবং পবে পল্টনের কার্য লইয়া ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৬০ নং পূর্বীয়া পল্টনের সহিত বাঁদা যাত্রা করেন। পল্টন বাঁদা হইতে অম্বালা আসিল—রাসবিহারীবাবুও আসিলেন। কর্ণালে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, রোহিতকে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, তিনিও পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। রোহতক তখন লুণ্ঠনে, হত্যায়, পীড়নে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে! কি ইংরাজ, কি বাঙালি তখন সকলেই অত্যন্ত বিপন্ন। তিনি যে রোহতকে কত ভদ্র কন্যার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, কত নিরীহ লোককে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কতবার পরের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

একটি বিদ্রোহী দলকে নিরস্ত করিতে যাইয়া তিনি একবার বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন, তবুও কর্তব্যে কর্মে অবহেলা করেন নাই। তাহাকে হত্যা করিবার জন্য বিদ্রোহীরা নানা চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তাহার গুণপনায় পল্টনের উচ্চ কর্মচারিগণ এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একবার তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাপ্তান সেবিয়র একশত অশ্বারোহী সহ কাপ্তান হডসন্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বাবু যদুনাথ ঘোষ : আগ্রা নগরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখন নগর অগ্নিময় হইয়া উঠিল। প্রজ্বলিত গৃহাদির আলোকে সমস্ত নৈশগগন আলোকিত হইয়া রহিল, বিদ্রোহিদিগের কোলাহল দূরশ্রুত জলকল্লোলের ন্যায় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

* সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৯৭

নিরীহ নরনারীর রুধিরে আগ্রার রাজপথ সিক্ত হইয়া উঠিল। সামরিক বিভাগের কর্মচারী এড্‌জুটান্টের কেরানিবাবু যদুনাথ ঘোষ রেজিমেন্টের কর্মচারীদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন।

বিদ্রোহীরা সরকারি দপ্তরে অগ্নি সংযোগ করিল। বহুমূল্য কাগজপত্র পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। যদুবাবু আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কতকগুলি মূল্যবান কাগজ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিলেন এবং সামরিক কর্মচারিগণ কর্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত হইলেন। ৬৭ সংখ্যক রেজিমেন্টের লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল স্টুয়ার্ট লিখিয়াছিলেন—যদুবাবুর মত প্রত্যুৎপন্নমতি বাঙালি আমি কমই দেখিয়াছি।

যদুবাবু দ্বিতীয়-ব্রহ্ম যুদ্ধের সময়েও সৈনিক বিভাগের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। দিনাপুরে (Dinapur) যুদ্ধকালে নানা বিপদ ও অসুবিধার মধ্যেও তিনি যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া লেফ্‌টেনান্ট-জেনারেল মেসি যদুবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র দেব : ইতিহাস-বিশ্রুত ভরতপুরের যুদ্ধে যে বীর বাঙালি উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব। স্যর চার্লস্ নেপীয়ার যখন ফরাক্কাবাদের গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তখনও অন্যান্য কয়েক জনের ন্যায় ঈশানবাবুও তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

ফতেগড়ে যখন সিপাহি-বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন বিদ্রোহীরা ঈশানবাবুর গৃহ লুণ্ঠন করিল। তিনি নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া মেজর রবার্টসন সাহেবকে যেরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে যশোমাল্যে ভূষিত করিয়াছে। ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য বিদ্রোহীরা তাহাকে কয়েকবার ধরিয়া কামানোর মুখে স্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাদের নিষ্ঠুর সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই।

বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) জেনরেল ট্রপ যেরূপে প্রবাসী বাঙালি শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরবের কথা। জেনরেল কহিয়াছিলেন—"দুর্গাদাসবাবু যে সৈন্যদলে কর্ম করিতেন, তাহা ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন বেরিলিতে অবস্থান করিতেছিল সেই সময় হইতেই (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে) আমি তাহাকে জানি। সকল সামরিক কর্মচারীই তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা তাহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছিল। দুর্গাদাসবাবু যখন বেরিলি হইতে নৈনীতালে পলায়ন করিলেন, তখন একদিন বিদ্রোহী—ফজল্ উল্‌হক্ কর্তৃক বন্দীকৃত হইলেন; বিদ্রোহীর বিচারে তাহাকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিবার আদেশ হইল। তিনি কোনক্রমে সেবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। পর্বতপাদমূলে নূতন একদল অশ্বারোহী সেনা গঠনের আবশ্যক হওয়ায়, দুর্গাদাসবাবু কর্ণেল ক্রস্‌ম্যানের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। কর্ণেলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চূড়পুর, সিওরগঞ্জ, বহেড়ী এবং রসুলপুরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া, শেষে নিজে আহত হইয়াছিলেন। এমন একজন বীর বাঙালির কথা আমি ইতিপূর্বে আর শুনি নাই।" রসদ বিভাগের 'বড়বাবু' হইয়া দুর্গাদাসবাবু কাবুল-অভিযানে যাইয়াও নানা বিপদের মধ্যে যেভাবে কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহা বাঙালিরই গৌরবের কাহিনি।

বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু রামকুমার রায় : আলিগড়ের বিদ্রোহ-দমনের ইতিহাসের সহিত বাঙালি ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ওয়ার্কশপের সেরেস্তাদার বাবু রামকুমার রায়ের নাম বিজড়িত রহিয়াছে। কোয়েলের বিদ্রোহী মুসলমানগণ যখন ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার মন্ত্রণা করিল, তখন সে সংবাদ অবগত হইয়া ঈশানবাবু সাহেবদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া বিদ্রোহিদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং পত্রাদি দ্বারা সকল সংবাদ কর্তৃপক্ষদিগের গোচর করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিদ্রোহি ঘৌস্ খাঁ একবার তাহার একখানি গুপ্ত পত্রের সন্ধান পাইয়া তাহাকে বন্দী করিলেন ও তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। পলায়নে আত্মরক্ষা করিয়া ঈশানবাবু অদম্য উৎসাহে পুনরায় কর্তব্য কার্যে নিযুক্ত হইলেন। ঘৌস্ খাঁ এবার তাহার সন্ধান করিতে না পারিয়া তাহার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

অর্থের লোভে অনেকেই ঈশানবাবুর সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। তিনি মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সর্বদা বিদ্রোহদিগের সংবাদ কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইতে লাগিলেন। আলিগড়ে মানসিংহের বিদ্রোহিদিগের সহিত ইংরাজের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, ঈশানবাবু সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

এই যুদ্ধের পূর্বে রামকুমার বাবু যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই যুদ্ধজয়ের অন্যতম কারণ রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মথুরায় বিদ্রোহের সময়েও রামকুমারবাবু যেরূপে ইংরাজ কর্মচাবীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কর্তৃপক্ষদিগের পত্রাবলীতেই পরিস্ফুট রহিয়াছে।

ডাক্তার সূর্যকুমার : ডাক্তার শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের নাম বাঙালিদের নিকট সুপরিচিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের 'ফায়ার কুইন' রণপোত ব্রহ্ম-যুদ্ধে প্রেরিত হয় তখন তিনি 'নেভাল সার্জন' ছিলেন। লখনউ রেসিডেন্সি উদ্ধার করিবার জন্য যখন সেনাপতি হ্যাভলক রণ-যাত্রা করেন তখন ডাক্তার সর্বাধিকারী হ্যাভলকের ব্রিগেডের সার্জনস্বরূপ যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।

গাজীপুরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখন তিনি নৌকা হইতে চিনি ও ময়দার বস্তা লইয়া দুর্গ-প্রাকার গঠন করিলেন। সরকারি চিকিৎসালয় এইরূপে সুরক্ষিত হইল। অযোধ্যার উনাও প্রদেশে কয়েকটি ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তবে স্যর হেনরি হ্যাভলকের সেনাদল লখনউ অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ডাক্তার সর্বাধিকারী ব্রিগেড-সার্জন স্বরূপ সেই সকল যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া অসীম সাহস ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বঙ্গের ছোটলাট স্যর রিভার্স টম্‌সন এই বীর বাঙালি চিকিৎসককে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিবার সময় কহিয়াছিলেন—কে জানিত যে, এই মৃদুমধুর সৌম্য মূর্তির মধ্যে—রুধিরসিক্ত সমরাঙ্গণে সমুপস্থিত, বিদ্রোহকালের সকল ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। ইনি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন লোকের বেদনা বৃদ্ধির জন্য নহে—বিজ্ঞান, কর্মে নৈপুণ্য ও একনিষ্ঠার সাহচর্যে মনুষ্যের বেদনা দূর করিবার জন্য।

সিপাহি-বিদ্রোহের কিছুকাল পর কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার ক্রম্বি ইন্ডিয়া আফিসে বসিয়া বিদ্রোহ সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠকালে দেখিয়াছিলেন যে, সেই বিপদের দিনে

যাহারা আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অসীম নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে "গাজিপুরের বাঙালি ডাক্তার" ছিলেন একজন। পরে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, সেই বাঙালি ডাক্তার আর কেহ নহেন—স্বয়ং সূর্যকুমার।

ডাক্তার রাজেন্দ্র চন্দ্র : সিপাহি যুদ্ধের কালে যমুনাতীরে ফিরোজশাহের সহিত যুদ্ধের সময় (১৮৫৮ খৃ:), ১৮৬১ সালে কুকী-অভিযানে এবং পর বৎসর আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া শৈলাঞ্চলে অভিযানকালে যে বাঙালি সার্জন ব্যক্তিত্বের সহিত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেকালের অন্যতম সুদক্ষ সার্জন সেই রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র আজ বিস্মৃত; কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আজ পর্যন্ত তিনিই একমাত্র চিকিৎসক যিনি সুদুর্লভ ব্রিগেড সার্জনের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কি স্বদেশে, কি বিদেশে অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। (১)

বাবু মহিমচন্দ্র গুহ জোয়ারদার : পাবনা জেলার খলিলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ জোয়ারদারের কাহিনি, সেকালের বীর-বাঙালির বীরত্বের কাহিনি। লালাবাবুর সদর কাছারিতে মসীজীবী থাকিয়া তিনি তান্তিয়া টোপীর সেনাদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং কতক সিপাহি ও অন্যান্য লোকজন সংগ্রহ করিয়া, বিদ্রোহিদিগকে বাধা দিবার জন্য একদল সৈন্য সংগঠন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে পর, যাহাতে শ্রীমন্দির লুন্ঠিত না হয় তজ্জন্য তিনি নানা উপায়ে মথুরার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কাবুল-যুদ্ধে বাঙালি : যে বাঙালি একদিন চিন্তামণি মিশ্র নাম গ্রহণ করিয়া কানপুরে পরিচিত হইয়াছিলেন, কাবুলযুদ্ধে তিনি রসদ বিভাগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহি যুদ্ধের সময় নানাস্থানে বাঙালির বাহুবলের ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তিনিও কাবুল-যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত উপস্থিত থাকিয়া বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য কর্নেল টুকারর নিকট হইতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় সিপাহি বিদ্রোহ : সিপাহি-বিদ্রোহের অগ্নিশিখা বাংলারও কোন কোন স্থান স্পর্শ করিয়াছিল। ঢাকায় যখন বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন ঢাকার ফৌজদারি আদালত ও কলেজ দুর্গারূপে সুরক্ষিত করিয়া রাজকর্মচারিগণ বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহীরা বাজার লুণ্ঠন করিল, কারাগার হইতে বন্দিদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। ঢাকা কালেক্টরির মসীজীবী নাজির শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু ও মুসলমানদিগের মধ্যে খাজা আব্দুলগনি (পরে নবাব স্যর খাজা আব্দুলগণি) ও আব্দুল আহাম্মদ খাঁ মিস্টার কর্ণেলকে দুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্গের ছোটলাট স্যর ফ্রেডেরিক হ্যালিডে স্বয়ং তাহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন। (১)

(১) Bengal under Licatenant-Governors . C. L. Backland c/E, Vol. I, P 152

অশোক মেহতা

স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ

লোকের মুখে মুখে একটা কথা রটিয়া গিয়াছিল যে, পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসর পর ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিবে। কি যেন এক রহস্যময় সঙ্কেত লইয়া লোকের হাতে হাতে ফুল ঘুরিতে লাগিল—রক্তপদ্ম। পাঞ্জাবাধিপতি রঞ্জিৎ সিং একদিন বোধ হয় পরাজিতের মনোভাব লইয়াই বলিয়াছিলেন—"সব লাল হো যায়েগা।" রঞ্জিৎ সিং-এর সেই শঙ্কা লোকের মুখে মুখে এক নূতন অর্থ লইয়া ফিরিতে লাগিল—"সব লাল হো যায়েগা।" সিপাহি ও চাষী সকলেরই মুখে এক কথা, চোখে তাদের এক রহস্যময় চাহনি। হিসাবনিকাশের দিন আগাইয়া আসিতেছে, তারপর অনেকের মুণ্ড মাটিতে লুটাইবে, অনেকের রক্তে মৃত্তিকা ভিজিবে। পুরানো দেনা-পাওনা বুঝাপড়া করিতে হইবে। সব লাল হো যায়েগা।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই ভারতে সংকট ঘনাইয়া আসার একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়াছিল। ১৮২৪ সাল হইতেই উত্তর ভারতে ধ্বনি উঠিয়াছিল—'ইংরাজ রাজ খতম হইয়া আসিয়াছে, ইংরাজকে সাবাড় কর।' ১৮২৬ সালে উমাজি নায়কের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৮৩১ সালে বিহারে কোলরা যে বিদ্রোহ করে, তাহা দমনে একদিকে যেমন ভয়াবহ লোকক্ষয় হয়, তেমনই পাঁচ হাজার বর্গ-মাইল পরিমিত ভূমি উজাড় হইয়া যায়। ১৮৪৪ সালে সবন্তবাদী অভ্যুত্থান এরূপ ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, উট্রামকে দশ হাজার সৈন্য লইয়া উহা দমন করিতে হয়। ১৮৪৩ সালে গুরু নানকের বংশধর, শিখ সম্প্রদায়ের তৎকালীন ধর্মনায়ক বেদী বিক্রম সিং-এর সহায়তায় কাংরা যশোয়ার ও দাতারপুরের রাজারা এবং নুরপুরের উজীর বিদ্রোহ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দৃশ্যই কেবল লোকের মানসচক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ১৮৫৭ সাল যত আগাইয়া আসিতে লাগিল, মেঘ যেন ততই কৃষ্ণ, ততই গাঢ় হইয়া ভারতের আকাশে জমিতে লাগিল।

ইহার আগের একশ বছরের ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠী ধীরে ধীরে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারত হইতে উত্তর দিকে আগাইয়াছে। বহু রাজ্য তাহারা দখল করিয়াছে। বহু জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছে। ব্রিটিশের এই আত্মসাৎ নীতির পরিণতিতে নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি, অযোধ্যার বেগম প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক ও নায়িকারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। শোষণক্লিষ্ট ভারতের ক্ষোভ ইহাদের মধ্যে দিয়াই বিস্ফোরণের পথ খুঁজিয়া লইল। তারপর যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে ব্রিটিশের অধীনস্থ সিপাহিরাও তাহাদের সহিত হাত মিলাইবে, তখন তাহাদের সঙ্গে বল আরও বাড়িয়া গেল।

সৈন্যবাহিনীতে বর্ণবৈষম্য ও পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করায়, সিপাহিদের মন-ভাঙারও কোনও দোষ ছিল না। ওয়াজির খাঁ নামক একজন রিসালদার স্যর জর্জ ক্যাম্ববেলকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "রিসালদার হইয়া চাকুরিতে ঢুকিয়া ছিলাম। রিসালদার পদেই আজীবন আমাকে থাকিয়া যাইতে হইবে। কালা আদমির পদোন্নতির কোনও আশা নাই।"

ইহার উপর আবার দিনের পর দিন ব্রিটিশের আইন কানুনের আঁটুনি জোরালো হইতেছে দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা তাহাদের বাড়িয়াই চলিল। ১৮৫৬ সালে হঠাৎ এক আইন জারি করা হইল যে, বিদেশ যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হইলে সিপাহিরা অসম্মত হইতে পারিবে না। ভারতীয় বাহিনী কলমের এক খোঁচায় সাম্রাজ্যিক বাহিনীতে রূপান্তরিত হইল। সিপাহিদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য তলে তলে চেষ্টা চলিতে থাকায় তাহাদের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পাইল। চর্বির সাহায্যে তৈয়ারি কার্তুজ প্রচলনের গুজব প্রভৃতি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি যোগাইল মাত্র।

অযোধ্যা রাজ্যকে ব্রিটিশ এলাকার অঙ্গীভূত করার ফলেও সিপাহিদের অসন্তোষের মাত্রা বাড়িল। বেঙ্গল আর্মিতে সেকালে যে সৈন্য ছিল, তাহার তিন পঞ্চমাংশই আসিত অযোধ্যা হইতে। ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হওয়ার পর অযোধ্যার বাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ষাট হাজার সৈন্য বেকার হইয়া পড়িল। বেঙ্গল আর্মিতে অযোধ্যার যে সকল সৈন্য ছিল, নিজেদের আত্মীয়স্বজনের দুর্গতি তাহারা ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না।

জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা ও সঙ্কট বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছিল। জমি-জায়গা সম্পর্কেই তাহাদের দুশ্চিন্তা দেখা দিল সর্বাপেক্ষা বেশি। সরকারি কর্মচারীরা অনেক সময়েই জমি-জায়গার ব্যক্তিগত হস্তান্তর নাকচ করিয়া দিত, এমনকি আদালতের রায়েও হস্তক্ষেপ করিত।

যে সকল জমিদার দত্তকপুত্র নিয়াছিল, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে জমি বিলির অব্যবস্থার দরুন বহু পুরানো জমিদার সর্বস্বান্ত হইয়া গেল এবং অনেক জমি কুশীদজীবী মহাজনদের হাতে চলিয়া গেল। অযোধ্যার তালুকদারদেরই ক্ষতি হইল সবচেয়ে বেশি। অযোধ্যা অধিকারের কালে তালুকদারদের তালুকভুক্ত মোট ২৩৫৪৩টা গ্রামের মধ্যে ১৩৬৪০টা গ্রাম অন্য লোকদের বিলি করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে কিন্তু চাষীদের দুর্দশারও কিছুমাত্র লাঘব হইল না। বরং নূতনভাবে তাহাদের উপর করভার চাপিল। রুপোর অভাব এবং মুদ্রার স্বল্পতার দরুন ১৮২৫ সাল হইতে ১৮৫৪ সালের মধ্যে জিনিসপত্রের দামও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়া জনসাধারণের দুর্দশা বাড়াইয়া তুলিল।

পলাশীর পরাজয়ের একশত বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখ ছিল ১৮৫৭ সালের ২২ জুন। অভ্যুত্থানের পক্ষে সময়টাও ছিল বেশ অনুকূল। ভারতে যে সকল ইংরাজ সৈন্য আসে, জুন মাসের গরম তাদের বেশ কাবু করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া এই সময় রবি ফসল উঠিবে বলিয়া সরকারি কোষাগারও বেশ পূর্ণ থাকিবে। বিদ্রোহীরা যখন দিল্লির বাশাহের কাছে গেল, তখন বাদশাহ বলিয়াছিলেন, "আমার কোষাগার নাই তোমাদের আমি বেতন দিতে পারিব না।" বিদ্রোহীরা মুহূর্ত চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিয়াছিল, "কুছ পরোয়া নেই। ইংরাজের কোষাগার হইতে টাকা লুঠিয়া আমরা আপনার পায়ের তলায় আনিয়া রাখিব।"

অভ্যুত্থান পরিকল্পনার বিশেষ জটিলতা ছিল না। সিপাহিরা একদিনে বিদ্রোহ করিয়া সমস্ত ইয়োরোপীয় সেনানীদের হত্যা করিবে। কারাগৃহের দ্বার ভাঙিয়া বন্দিদের মুক্ত করিয়া দিবে। সরকারি কোষাগার দখল করিবে। টেলিগ্রামের তার ও রেল লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। তোষাখানা ও দুর্গ অধিকার করিবে। ইহার পর গণ-অভ্যুত্থানের জন্য জনসাধারণকে ডাক দেওয়া হইবে।

ব্রিটিশ ইতিহাসকারেরা ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিছক সিপাহি বিদ্রোহ রূপে অভিহিত করিয়া খাটো করিবার প্রয়াস পাইলেও এই অভ্যুত্থান যে কতখানি ব্যাপক হইয়াছিল তাহা বিদ্রোহের পরিসর এবং বিদ্রোহ দমনের ইতিহাস হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। এক লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক ভূমি এই সময়ে বিদ্রোহীরা দখল করে এবং চার কোটি ভারতীয় কিছুদিনের জন্য বিদেশি শাসকের শাসন শৃঙ্খল হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হয়। এই বিদ্রোহ প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো জ্বলিতে থাকে এবং দুই লক্ষ ভারতীয় মৃত্যু বরণ করে। বিদ্রোহ দমন করিতে ব্রিটিশের খরচ লাগিয়াছিল চার কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড।

সিপাহিদের বিদ্রোহই ছিল আসলে অভ্যুত্থানের আসল ভিত্তি। সৈন্যরা যেখানে অনুগত ছিল সেখানে সামন্ত নৃপতি বা জনগণের অভ্যুত্থান বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মাদ্রাজ বাহিনী সমগ্রভাবে এবং হিন্দুস্থানী সৈন্যবাদে বোম্বাই বাহিনী অনুগতই ছিল। বেঙ্গল আর্মিই বিদ্রোহে সর্বাপেক্ষা সাড়া দেয় এবং ঘাঁটির পর ঘাঁটিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতে থাকে। এই বাহিনীর মধ্যে মাত্র এগারটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশের প্রতি অনুগত ছিল।

বিদ্রোহ যে কতখানি ব্যাপক হইয়াছিল তাহার আর একটা প্রমাণ পাওয়া যাইবে সামরিক আইন জারির বহরে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে দিল্লি, মীরাট, রোহিলখণ্ড, আগ্রা, কাশী ও এলাহাবাদ বিভাগে, বাংলায় পাটনা ও ছোটনাগপুর বিভাগে। মধ্যভারতে নিমুচ ও আজমিরে সামরিক আইন জারি করা হইয়াছিল। পঞ্জাব ও অযোধ্যার কাগজে কলমে সামরিক আইন জারি না হইলেও কার্যত কর্তৃপক্ষ সেইরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালের জুন পর্যন্ত অযোধ্যায় অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্রোহীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল পঁচিশ হাজার, দিল্লিতে ত্রিশ হাজার, মধ্যভারতে পঞ্চাশ হাজার। দিল্লি অযোধ্যা রোহিলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ড বিদেশি শাসকদের কর্তৃত্ব মুছিয়া ফেলিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমান যুক্ত প্রদেশ), মধ্যভারত, মধ্য ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং পশ্চিম বিহারে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

কতকগুলি প্রদেশে বিদ্রোহ ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিল। "আমাদের সাম্রাজ্যের চারিটা বড় বড় প্রদেশ—অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড বুন্দেলখণ্ড এবং সগর ও নর্মদা এলাকায় জনসাধারণের অধিকাংশ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিম বিহার, পাটনা বিভাগের বহু জেলা ও মীরাট বিভাগের কতকাংশে জনসাধারণ ও সিপাহিরা প্রায় একই সময়ে বিদ্রোহ করে।" (জি. বি. ম্যালেন : হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি)। রোহিলখণ্ড একদিনে ক্ষেপিয়া উঠিল। বেরিলি, সাহজাহানপুর, মোরাদাবাদ ও বদাউনে সৈন্য পুলিশ ও জনসাধারণ এক যোগে ঘোষণা প্রচার করিয়া ব্রিটিশ শাসনকে বিদায় করিয়া দিল। ৪ হইতে ১৪ জুন—মাত্র দশ দিনের মধ্যে অযোধ্যায় ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া

গেল। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, কলিকাতায় বসিয়া গবর্নমেন্ট দিল্লির নিকটে অবস্থিত তাহাদের সেনানায়কবৃন্দ বা আগ্রাস্থিত ইংরাজ গবর্নরের সহিত কোনরূপে সংযোগ স্থাপন করিতে পারিত না, খোঁজ খবরের লেনদেন যা কিছু চলিত তাহা হইত লাহোর ও বোম্বাই ঘুরিয়া।

দিল্লি অধিকারেই হইল বিদ্রোহীদের সর্বাধিক কৃতিত্ব। ইহার ফলেই উহা জাতীয় অভ্যুত্থানের মর্যাদা লাভ করিল। দিল্লি আয়ত্তে আনিতে পারার ফলে বিদ্রোহীরা একজন সর্বজনমান্য নেতা পাইল। সকলের গ্রহণযোগ্য পতাকা পাইল, অভ্যুত্থান বিপ্লবে রূপান্তরিত হইল। দিল্লির তোষাখানায় তখন নয় লক্ষ কার্তুজ, বহু কামান, আট হইতে দশ হাজার গাদাবন্দুক ও দশ হাজার ব্যারেল বারুদ ছিল। এগুলি হাতে পাওয়াই হইল বিদ্রোহীদের সর্বাপেক্ষা বড় লাভ।

হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ১৮৫৭ সালে কোষাগার বে-দখল, খাজনা অনাদায় এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য গবর্নমেন্টের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল দেড় কোটি পাউন্ড। বিদ্রোহ দমনের দরুন ভারত গবর্নমেন্টের ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল চার কোটি ষাট লক্ষ পাউন্ড।

ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যে শুধু 'সিপাহি বিদ্রোহ' নয় উহাকে যে জাতীয় অভ্যুত্থান—এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার সপক্ষে অনেক কিছু বলা যাইবে। নানা সাহেব, অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসির রানি, বেরিলির খাঁ বাহাদুর খাঁ সকলেই বিদ্রোহের মহানায়ক হিসাবে শেষ মোঘল বাহাদুর শাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শুধু আনুগত্য নয়, যুদ্ধের অবস্থা ও গতি সম্পর্কে সম্রাটের নিকট নিয়মিত ভাবে বিবরণ পাঠানো হইত। প্রত্যেক বিদ্রোহী বাহিনীর মুখেই ধ্বনি উঠিয়াছিল 'দিল্লি চলো'। সম্রাটই ছিলেন অভ্যুত্থানের মধ্যমণি।

ইংরাজের আশা ছিল যে, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য আসিয়া বিদ্রোহ ব্যর্থ করিয়া দিবে। স্যার হেনরি লরেন্স ৫৭ সালের ১ মে তারিখে লর্ড ক্যানিং-এর নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। অভ্যুত্থানের খবর যখন আগ্রার লেফটেনান্ট গভর্নর রাসেল কলভিনের কাছে পৌঁছিল তখন তিনি প্রথমেই গোয়ালিয়রের মারাঠা ও ভরতপুরের জাঠদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরাজের চেষ্টা সফল হয় নাই, আইচিসন দুঃখের সহিতই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "এই বারে আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপাইয়া তুলিতে সমর্থ হই নাই। তাহার কারণ উভয় সম্প্রদায়ই তখন পারস্পরিক মৈত্রীর জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বেরিলির নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ ঘোষণা করিলেন, "মুসলমান সমর নায়করা বলিয়াছেন যে হিন্দুরা যদি ভারত হইতে ইংরাজ বিতাড়নের সংগ্রামে তাহাদের সহিত যোগ দেয় তাহা হইলে তাহারা গো-হনন বন্ধ করিবে। হিন্দুরা সহযোগিতা করিলে মুসলমানরা গো-মাংসকে শূকরের মাংসের ন্যায় অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে।" কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ হিন্দুদের সহযোগিতার জন্যও অপেক্ষা করেন নাই, তিনি হিন্দুদের সন্তোষের জন্য অবিলম্বেই গো-হনন নিষিদ্ধ করেন। দিল্লি হইতে অযোধ্যার সিপাহিরা উল্লাসের সহিত বারাকপুরের সৈন্যদের কাছে লিখিল, "সম্রাট নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে আর গো-হনন হইতে পারিবে না।"

ফৈজাবাদের মৌলবি আহম্মদ শাহও বিদ্রোহ সংগঠনের কম কৃতিত্ব দেখান নাই। তিনি ছিলেন একাধারে বক্তা ও সৈনিক। তাহার অগ্নিময় বাণীই অযোধ্যাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্রোহের নায়ক আহম্মদ শাহ, কুমার সিংহ, তাঁতিয়া টোপি, রানি লক্ষ্মীবাই ইহাদের পক্ষে ব্রিটিশের ঝুনা সেনাপতিগুলির বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালানো সম্ভব হইত না। সেইজন্য গেরিলা রণকৌশলের উপর তাহারা বেশি মাত্রায় নির্ভর করিয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁর সেনানি ও সৈন্যদের উপর সোজা নির্দেশই ছিল এই : কাফেরগণের সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করিও না। কারণ শৃঙ্খলা ও তোড়জোড়ের দিক দিয়া তাহারা তোমাদের অপেক্ষা উন্নত, তাহা ছাড়া, তাহাদের বড় বড় কামান আছে। উহার পরিবর্তে তাহাদের গতির প্রতি লক্ষ রাখিও, নদীর সমস্ত ঘাটগুলি পাহারা দিও, তাহাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিও, সরবরাহে বাধা দিও, ডাক চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিও এবং সব সময়ে তাহাদের শিবিরে হানা দিও। শত্রুকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে দিও না।'

সমর-বিশেষজ্ঞরা সকলেই প্রায় এক যোগে নানা সাহেবের আবাল্য-বন্ধু তাঁতিয়া টোপীকে বিদ্রোহ নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভারূপে স্বীকার করিয়াছেন, যদিও জাতির চক্ষে ঝাঁসির তরুণী রানি লক্ষ্মীবাই সর্বাধিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। পুরুষের বেশে, অশ্বপৃষ্ঠে তরবারি হস্তে একাধিক রণাঙ্গনে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বৈদেশিক ইতিহাসকারেরা বিদ্রোহীদিগকে নিষ্ঠুরতার দিক দিয়া পশুবৎ চিত্রিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। যে জাতিগত বর্ণ-বৈষম্য ও নির্মম শোষণের পটভূমিতে এখানে কোম্পানির রাজত্ব চলিয়াছিল, তাহা যে কোন দেশের যে কোন মানব গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী ও নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে বাধা করিত। কিন্তু ইংরাজও যে নিষ্ঠুরতার দিক হইতে বিন্দুমাত্র পিছনে ছিল না, ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ঝাঁসিতে পঁচাত্তর জন ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধ পাঁচ হাজার ভারতীয়কে হত্যা করা হইয়াছিল। দিল্লিতে জনকয়েক ইউরোপীয়কে হত্যার খেসারৎ দিতে হইয়াছিল ছাব্বিশ হাজার ভারতীয়দের তাহাদের প্রাণ দিয়া। নীলের সৈন্যরা এলাহাবাদের প্রায় ছয় হাজার ভারতীয়কে হত্যা করিয়াছিল।

অভ্যুত্থান কেন ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার কারণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সমুদ্রপথ এবং ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী ঘাঁটিগুলির উপর কর্তৃত্ব ও আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তাই ইংরাজরা বিদ্রোহীদের প্রচেষ্টা পঙ্গু করিয়া ফেলিযাছিল। সৈন্য দলে নূতন প্রবর্তিত এনফিল্ড রাইফেল সে যুগের সমর কৌশলে একটি বিপ্লব আনিয়াছিল। নানাসাহেব বলিয়াছিলেন যে নীল টুপিওয়ালেরা বন্দুক ছুঁড়িবার আগেই মানুষকে মারিয়া ফেলে। যুদ্ধের সংবাদ ও নির্দেশ আদান প্রদানে টেলিগ্রাফেরও গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। অপরপক্ষে, বিদ্রোহীরা অস্ত্রবলের দিক দিয়া ছিল খুব দুর্বল। একমাত্র আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াই তাহারা জয় লাভের আশা করিতে পারিত। তাহা ছাড়া, বিদ্রোহীদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থাও ছিল একান্ত অপূর্ণাঙ্গ, যাহার ফলে ২২ জুন (পলাশীর শতবার্ষিক দিবস) অভ্যুত্থানের তারিখরূপে নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও ১০মে

মীরটে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। ইহার ফলে বিদ্রোহ পরিকল্পনায় গুরুতর রকম ওলটপালট দেখা দেয়।

ক্যানিং বলিয়াছিলেন যে, সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ দিলে, কালই আমাদের এখান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু সিন্ধিয়া যোগ দেন নাই, অধিকাংশ রাজন্যই বিদ্রোহে যোগদান নিজেদের স্বার্থের সহায়ক বলিয়া মনে করেন নাই। শিখরা বিদ্রোহ হইতে দূরে সরিয়া রহিল, নেপালের নিকট হইতে ব্রিটিশ সাহায্য পাইল। বারাকপুরের 'বেঙ্গল আর্মি' ছাড়া, বাংলার আর একটি মানুষও ইংরাজের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন করে নাই। মাদ্রাজ ও বোম্বাই এর সৈন্যরা বিদ্রোহীদেব ডাকে সাড়া দিল না। ক্ষমতা ও গদী হইতে চ্যুত সমস্ত নৃপতি, ভূস্বামীবৃন্দ ও সৈন্যবাহিনীর অংশ বিশেষ এই অভ্যুত্থানের খোরাক জোগাইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ তখন যেভাবে গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহাতে ওই শক্তি-সমন্বয় দ্বারা তাহাদের উৎখাত করা সম্ভব ছিল না।

অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় উহার প্রতিক্রিয়া ভারতের পক্ষে খুব খারাপ হইয়া দেখা দিল। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এই অভিজ্ঞতা হইতে অনেকখানি সতর্ক হইল। মুসলমানেরা হিন্দুদের নিকট হইতে আরও অনেক বেশি সহযোগিতা পাওয়ার আশা করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা না পাওয়ায় সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দেখা দিল। অপর পক্ষে ব্রিটিশও ভেদ সৃষ্টির এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের দাবাইয়া রাখার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং হিন্দুদের প্রতি দেখাইতে লাগিল সেই অনুপাতে আনুকূল্য।

রাজন্য ও ভূস্বামীদের প্রতি কোম্পানির গবর্নমেন্ট এ যাবৎ যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান তাহাতেও আমূল পরিবর্তন ঘটাইল। ক্যানিং বলিয়াছিলেন যে, যে প্রবল জলোচ্ছ্বাস আমাদের অনিবার্যভাবে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল, রাজন্যদের আনুগত্যই তাহার গতি রোধ করিয়াছে। কাজেই, ইংরাজ বুঝিল যে, রাজন্যদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরূপে জিয়াইয়া রাখাই তাহাদের স্বার্থের অনুকূল। চাষির স্বার্থের ক্ষতি করিয়া ভূস্বামীদের তোষণও হইল ব্রিটিশের আর এক নীতি। এইভাবেই সম্ভাব্য গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে এমন একটা প্রতিক্রিয়াশীল স্বত্বভোগীদের সৃষ্টি করা হইল। যাহারা কোনক্রমেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচরণ নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করিবে না। এককথায় বলা যায় যে, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল, উভয় পক্ষই নূতনভাবে ঘর গুছাইবার কাজে মন দিল। বিদ্রোহ সমাপ্তির সঙ্গে পুরনো ভারত বিদায় নিল। তাহার সমাধির উপরে নূতন এক ভারতের সৌধ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি সমন্বয়েই ভারতে নূতন যে বুদ্ধিজীবীর দল উঠিতেছিল, তাহারাই এবার নূতন করিয়া ইংরাজের সহিত বোঝাপড়ার জন্য তৈয়ারি হইতে লাগিল।

যুগান্তর ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

কমল চৌধুরী

সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী কবি মির্জা গালিব

কবি গালিব ১৮৫৭ সালে ছিলেন দিল্লিতে। সমকালীন ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের ১১ মে থেকে ১৮৫৮ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত তাঁর গদ্যপদ্য রচনা এবং চিঠিপত্র ভারত ইতিহাসের এক মূল্যবান উপকরণ। ফারসিতে লেখা গ্রন্থ দাস্তাম্বু উজ্জ্বল নিদর্শন না হলেও. সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে গালিবের চিন্তাধারার স্বাক্ষর রয়েছে। বিদ্রোহকালীন চিন্তা ও অনুভূতির প্রত্যক্ষ পরিচয় গালিবের চিঠিপত্র। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন তিনি এসব চিঠিতে। বাদশাহের সঙ্গে গুরু শিষ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চারদিকে শোনা যাচ্ছিল বিদ্রোহের চাপা গুঞ্জন। এই সময়ে গালিব বন্ধুবান্ধবের কাছে লেখা চিঠিতে দিল্লির অস্থির অবস্থার কথা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই নির্দেশে কিছু কিছু নষ্ট ক'রে ফেলা হয়। এগুলি নষ্ট করার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না।

কারণ, ভারতীয় এবং ইংরেজদের মধ্যে প্রথম বৃহত্তর সংঘর্ষ এই সিপাহি বিদ্রোহ।

বিদ্রোহকালে দিল্লির অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়। সে এক অন্য জীবন। এক ভিন্ন ছবি। লুঠতরাজ খুন জখম চলতে থাকে চোখের সামনে। দাস্তাম্বুতে লিখেছেন :

> 'এই বেদনাদায়ক মুহূর্তে আমার চক্ষুকোটর যদি ধূলিপূর্ণ হত, তবে কাঁদা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকত না। ...আমার দুঃখ দূর হওয়ার নয়, আমার ক্ষত কখনও সারবে না; মনে হয় যেন আমি মরেই গেছি।'

গালিব অতি সতর্ক। সাবধানে প্রকাশ করেছেন মনের কথা। চারদিকে অসন্তোষ। উত্থান পতন। কে থাকে, কে যায়? বোঝা দুষ্কর! তাই উর্দু-ই-মু-অল্লাতে হরগোপাল তফতাকে একটি চিঠিতে বলেছেন :

> 'আমি বিস্তৃত লিখতে সাহস পাই না। দরবারের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তারা নিষ্ঠুরতম শাস্তি পাচ্ছে।'.

ব্রিটিশ শক্তির দমনমূলক নিপীড়নে জনজীবন বিপর্যস্ত, সামরিক শাসনের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা সাবধানী মানুষের মতো চিত্রিত করেছেন গালিব। নিদর্শন স্বরূপ তফতাকে লেখা দুটি চিঠি উদ্ধৃত করছি :

> মুন্সিসাহেব,
>
> বুঝতেই পারছ কি ঘটছে, আর কি ঘটেছে। সে এক ভিন্ন জন্মের কথা। তখন তোমার আর আমার ছিল নিকট সান্নিধ্য আর অটুট বন্ধুত্ব। প্রীতি ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের বৈচিত্র্য ছিল আমাদের মধ্যে। কবিতা বলেছি, দিওয়ান সংকলন করেছি। ওই সময় এক গুরু ছিলেন। তিনি আমাদের দুজনের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর নাম মুন্সি নবীবখ্‌ল্ এবং তাঁর তখললুস হকীর। হঠাৎ বদলে গেল সে জমানা। সে সব মানুষ গেল হারিয়ে। ঘটনার চাকা ঘুরল। বিনষ্ট হল আনন্দ আর পারস্পরিক সংযোগ। সামরিক বিরতির পর ঘটল যেন

দ্বিতীয় জন্ম। দুই জন্মেই রয়েছে সাদৃশ্য। মুন্সি নবী বখন সাহেবকে লেখা চিঠিব উত্তর পেলাম, আর তুমি মুন্সিপুর গোপাল, যার তখললুস হল তাফতা তারও একটা চিঠি পেলাম আজ। যে শহরে আমি আছি, সেটি এখনও দিল্লি নামে পরিচিত। মহল্লাটি হল, 'বিল্লি মারোঁ কা মহল্লা।' কিন্তু আগের জমানার একজন বন্ধুরও দেখা মিলবে না। হে ঈশ্বর, শহরে শিল্পকাজে নিযুক্ত একজন শ্রমিকও নেই। ধনী দরিদ্র তো দূরের কথা, যারা বেঁচে আছে, তারা সবাই বাইরে কোথাও। অবশ্য এখন কিছু কিছু নতুন আবাদীর সন্ধান মেলে। তুমি হয়ত জানতে চাইবে, তুমি কি করে পুরোন আবাসেই রয়েছ?' আমার অকৃত্রিম সুহৃদ, পরলোকগত হাকিম মোহম্মদ হাসান খান সাহেবের বাড়িতে নয় দশ বছর ভাড়া আছি। এখানে পর পর সব হাকিমদের বাড়ি। পাতিয়ালার শাসক রাজা নরেশ সিং বাহাদুরের তাঁরা কর্মচারী। রাজা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন। যে, দিল্লি পুনর্দখলের সময় এদের কোন ক্ষতি করা হবে না। সেজন্য রাজার সৈন্য দিল্লি জয়ের পর এই মহল্লায় আসে। ফলে রাস্তাটি নিরাপদ হয়। তা না হলে শহরের চিহ্ন থাকত না। আমি যে কোথায় যেতাম, তা কল্পনারও বাহিরে। ধনী, দরিদ্র কেউ নেই। যারা থেকে গেল, অবশেষে তারাও বিতাড়িত হল। জায়গিরদার, বৃত্তিভোগী, ধনী কিংবা শ্রমিক কেউ নেই। বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে সাহসে কুলোয় না। কেল্লাব কর্মচারীদের জন্য কঠোর শাসন চালু হয়েছে। অবিরত তদন্ত আর হুমকির ওপর টিকে আছে ওরা। কিন্তু ওরা কর্মচারী মাত্র। সাম্প্রতিক গোলযোগ কালে তারা কর্মচাবীই ছিলেন এবং তার শরিকও হয়েছিলেন। আমি একজন দরিদ্র কবি। বাদশাহের ইতিহাস ও কাব্যবিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত আছি দশ বছর। এই কাজকে যা ভাবো না কেন, আর যাই বল না কেন—কর্মচারী বা মজুর যা খুশি। হাঙ্গামা সৃষ্টিতে আমি কোন পরামর্শ দিই নি, আব আমার কোন স্থানও ছিল না। কাব্য সাধনাই আমার কাজ। শহরবাসী শাসকদের আমি চিনি। কিন্তু বাদশাহী দপ্তরে বা আদ্যন্ত সাক্ষ্য বিবৃতিগুলিতে আমার উল্লেখ না থাকায়, তলব পড়েনি। যেখানে বড় বড় জায়গিরদারকে ডাকা হয়েছে কিংবা ধরে আনা হয়েছে সেখানে আমার অবস্থা আর কি হতে পারে। আমি যেন গৃহবন্দি। ঘরের বাইরে যাওয়াব উপায় নেই। সওয়ার হওয়াই দুষ্কর—কোথাও যাওয়া তো দূরের কথা। এক কেউ যদি আসে আমার এখানে। কিন্তু শহরে এমন কেউ নেই যে আমার কাছে আসবে? আলো নেই, শহরেব ঘরবাড়ি সব অন্ধকার। সবকারি উচ্চপদ পেয়েছে দাগী অপরাধীরা। গত ১১ মে থেকে আজ শনিবার ৫ ডিসেম্বর ১৮৫৭ পর্যন্ত সামরিক শাসন জারি আছে। ভালমন্দ আমার অজানা। শাসকরা এসব ব্যাপারে উদাসীন। দেখ, এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য বিনা পারমিটে কেউ শহরের ভিতরে বাইরে যাতায়াত করতে পারে না। প্রাণ বাঁচাতে এই শহরে আসার খেয়াল যেন তোমার না হয়। মুসলমানরা শহরে বাস করতে পারবে কিনা, সেটা জানতে হবে এখন। মুন্সি সাহেবকে আমার চিঠি দেখাবে। সালাম জানাবে। তোমার চিঠি পেয়েই, উত্তর লিখে ডাক হরকরাকে দিলাম।

ইতি আশীর্বাদক
গালিব

শুক্রবার ৫ মার্চ ১৮৫৮ সালে লেখা আর একখানি চিঠি

মুন্সিসাহেব,

তুমি জানিয়েছিলে শীঘ্রই আগ্রা যাবে। তোমার সে চিঠির জবাব দিতে পাবিনি। জবাব অবশ্য দিতে পারতাম। কিন্তু কল্যাণের পা ফুলে উঠেছিল। চলবার ক্ষমতা ছিল না তার।

বিনা অনুমতিপত্রে কোন মুসলমান শহরে ঘোরাফেরা করতে পারে না। তাই তোমাকে চিঠি দিতে পারিনি। কয়েকদিন পর ও যখন সুস্থ হয়ে উঠল, তখন তুমি আগ্রায় আছ ভেবে সিকান্দারাবাদে চিঠি দিই নি। মৌলবী কমরুদ্দীনকে লেখা চিঠিতে তোমাকে সালাম জানাই। তাঁর চিঠি আসে গতকাল। চিঠিতে জানলাম, মির্জা তফতা এখনও এখানে আসেননি। এই কারণে আজ এই রোকা পাঠাচ্ছি। আমার অবস্থা একই রকম। খোদার খিসমত দেখা যাক। হাকিম আকবর এখনও কোন নতুন বন্দোবস্ত জারি করেননি। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। কিন্তু আমার দেখা করা হয়ে ওঠেনি। চিঠি দিয়েছি। উত্তর আসেনি। তুমি অবশ্যই জানাবে কবে নাগাদ আকবরাবাদ যাচ্ছ।

ইতি আশীর্বাদক

গালিব

বিদ্রোহকালে গালিব সপরিবারে দিল্লিতেই ছিলেন। তার প্রমাণ রয়েছে। একটি চিঠিতে লিখছেন :

"স্ত্রী এবং পুত্রদের নিয়ে এই শহরে আমি যেন এক রক্তসমুদ্রে পড়েছি। আমার বাড়ির চৌকাঠের বাইরে বেরোতে পারিনি। আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, বিতাড়িত হইনি। অবরুদ্ধ করেনি, হত্যাও করেনি।"

ইংরেজ দিল্লি পুনরধিকারের পর, গালিব নানান সঙ্কটের সম্মুখীন হন। তিনি তখন ছিলেন বালিমরণ অঞ্চলে হাকিম মহম্মদ হাসান খানের বাড়িতে। শহর পুনরধিকারের পরে দুদিন খাবার তো দূরের কথা, এক বিন্দু জল পাওয়াও ছিল দুষ্কর। তৃতীয় দিনে হাকিম মহম্মদ খানের সম্পত্তি রক্ষার জন একদল সৈন্য পাঠান পাতিয়ালার মহারাজা। এদের সাহায্যে গালিব লুণ্ঠিত হওয়া হাত থেকে নিজের বাড়িটি মাত্র রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বিজয়ী সৈন্যরা তাঁর মূল্যবান সব কিছুই লুঠ করে নিয়ে যায়। এমন কি, তাঁর স্ত্রীর যে অলঙ্কার মিঞাকালে সাহাবের ভূগর্ভস্থ কক্ষে রক্ষিত ছিল, তাও লুণ্ঠিত হয়। এরপর গালিবকে কয়েকজন ব্রিটিশ সৈন্য বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কর্নেল বার্নের সামনে গালিবকে হাজির করা হল। হাজি কুতব-উদ-দিন-এর বাড়ির কাছে ছিল বার্নের আস্তানা। গালিব প্রশ্নবানের সম্মুখীন হলেও অবশেষে মুক্তি পান।

জন ম্যাকলিয়ডকে উৎসর্গীত গদ্য ও পদ্য সংগ্রহে গালিব ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন। হঠাৎ একদিন অতর্কিতে শত আটজন ব্রিটিশ সৈন্য পাঁচিল টপকে প্রবেশ করে তাঁর বাড়ির মধ্যে। তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে থাকে রাস্তা দিয়ে। এমন সময় একজন সার্জেন্ট এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। গালিবের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে সার্জেন্টটি বিস্মিত। সে গালিবকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি মুসলমান?'

গালিব উত্তর দিলেন, 'অর্ধেক মুসলমান।'

বিস্মিত সার্জেন্ট বলল, 'তার মানে? অর্ধেক মুসলমান বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ?'

গালিব বললেন, 'আমি মদ খাই, কিন্তু শূকরের মাংস খাই না।

গালিবকে কর্নেল বার্নের সামনে হাজির করা হল। গালিব মহারানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের নিদর্শন দেখিয়ে রাজভক্তি প্রমাণের চেষ্টা করলেন।

বার্ন ছিলেন ধুরন্ধর সেনানায়ক। তিনি বললেন, 'যুদ্ধকালে তুমি নিজে আসো নি কেন। এখানে ব্রিটিশ সৈন্য এবং তাদের মিত্ররা জমায়েত হয়েছিল? (দিল্লির কাশ্মীর গেটের বাইরে ছিল রিজ)।

গালিব উত্তর দিলেন :

> বিদ্রোহীরা কাউকে বাইরে আসতে দেয়নি। কি ভাবে আমি আসব? কোনোভাবে যদি আমি একবার পালিয়ে আসবার চেষ্টা করতাম রিজে, তাহলে ব্রিটিশ সৈন্যরা নিশ্চয় আমাকে গুলি করত। যদিও বা আমি রক্ষা পেতাম আর সৈন্যরা আমাকে গুলি যদি নাও করত, তবে আমি তোমার কি কাজে আসতাম···আমি বৃদ্ধ, অশক্ত এবং বধির। যুদ্ধ বা পরামর্শ দান—দুয়েরই আমি অনুপযুক্ত। এ অবস্থায় আমার পক্ষে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি থাকতে পারে—যা আমি এখনও শহরে বসে করছি।

এ সব শুনে কর্নেল বার্ন স্মিত হেসে গালিবকে মুক্তি দিলেন।

ইয়েদগার গালিবে হালিও ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন এই ভাবেই। নবাব গোলাম হোসেনের বর্ণনা একটু অন্যরকম। তিনি বলেছেন, গালিব একজন বন্ধুর সহায়তায় মুক্তি পান। নবাব গোলাম হলেন আরিফের বাবা এবং গালিবের শ্যালক। বিদ্রোহের সময় তিনি ফারসিতে নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। পরে এই ডায়েরি 'গদর কা নাতিজা' নামে প্রকাশিত হয়। তিনি গালিবের গ্রেপ্তার সম্পর্কে লিখছেন : কয়েকজন ব্রিটিশ সৈন্য গালিবের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে। তাকে কর্নেল বার্নের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে সেখানে গালিবের একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সুপারিশে গালিব মুক্তি পান।

গালিবের ভাই মির্জা ইউসুফ-এর বাড়িটি ব্রিটিশ সৈন্যরা ৩১ অক্টোবর অথবা কাছাকাছি কোন তারিখে লুঠ করে। ১৯ অক্টোবর মির্জা ইউসুফের একজন পুরনো চাকর এসে গালিবকে এ খবর দেয় যে, তাঁর ভাই পাঁচদিন জ্বরে ভুগে মারা গেছেন। গালিব অশ্রু ভারাক্রান্ত। কিন্তু অশ্রুপাতের অবকাশ নেই। শবদেহ ধুয়েও দেবে কে? মাটি খুঁড়বেই বা কে? গালিবের প্রতিবেশী স্বজনরা একজন পাতিয়ালা সৈন্যের সহায়তায় ইউসুফের কবর দানের ব্যবস্থা করেন।

গালিবের বিবরণ থেকে জানা যায় বিদ্রোহকালে বা পরবর্তী সময়ে বহু বাড়িতে জ্বালাবার মতো সামান্য তেলটুকু পর্যন্ত ছিল না। রাত্রির নিরেট আঁধারে বিদ্যুৎ চমকানির আশায় বসে থাকত মানুষ, সেই আলোয় যদি সন্ধান মেলে একবিন্দু জলের। যারা ছিল সমাজের ওপর তলার মানুষ, যাদের অফুরন্ত অর্থে, নৃত্য, গীত আর স্ফূর্তিতে কেটেছে দিন রাত, তারা এখন কারারুদ্ধ দুঃখ কষ্টের বিষ-জ্বালায় জর্জরিত। এক দিনের খ্যাতনামা পুরুষ নেমে এল পথের ধুলায়। আর নামগোত্র পরিচয়হীন কোন মানুষ, অকস্মাৎ যেন আশাতীত খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করল। যার পিতা ঘুরে বেড়াতেন পথের হাওয়ায়, আজ তারই করায়ত্ত হাওয়া। যার মাতা প্রতিবেশীর ঘর থেকে তেল ধার করে, আলো জ্বালাতেন আজ তার ঘরে আলোর মহোৎসব। গালিব বলেছেন :

> 'সাধারণ মানুষ আগুন আর বাতাসের ওপর প্রভুত্বের দাবিদার! আমরা অপূর্ণতার দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। আর ন্যায় বিচারের জন্য চিৎকার করে চলেছি অবিরত।'

গালিবের বহু বন্ধু, আত্মীয় এবং শিষ্য ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে নিহত বা বন্দি হন। অনেকে আত্মীয়-স্বজনদের হারিয়ে চিরদিনের মতো দিল্লি ত্যাগ করেন। ইমামবক্স সাহবাই এবং মহম্মদ হুসেন আজাদের পিতা মহম্মদ বকরের ছিল গালিবের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা। এদের দুজনকেই গুলি করে মারা হয়। মৌলবি ফজল-ই-হক খড়িয়াবাড়ি আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হন। আর সহিফতাকে পাঠান হল সাত বছরের জন্যে।

ব্রিটিশরা দিল্লি পুনরধিকারের পর নবাব জিয়া-উদ-দিন এবং নবাব আমিন-উদ-দিন লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু মাহরোলি পৌঁছলে তাদের সর্বস্ব লুন্ঠিত হয়। এর মধ্যেই লুঠেরারা দিল্লিতে তাদের বাড়িটির নিদারুণ ক্ষতি করে। কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের লাইব্রেরিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এদের সংগ্রহে ছিল গালিবের বহু উর্দু ও ফারসি রচনা। সে সব পরে আর খুঁজে যাওয়া যায়নি। মজফর উদ-দিন হায়দার খান এবং জুলফিকার উদ-দিন হায়দার খানের (হাসান মির্জা) ক্ষতি হয়েছিল আরও বেশি। বাড়ির দরজা জানালা ভেঙে, পর্দা ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গোটা বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ইউসুফ মির্জাকে একটি চিঠিতে গালিব লেখেন :

> আমার ওপর দিয়ে যে কি চলছে, তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর। মর্মান্তিক দুঃখে মানুষ পাগল হয়ে গেছে। এই যন্ত্রণাপ্রবাহে আমার মানসিক ভারসাম্য হারান নিশ্চয়ই কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কত যন্ত্রণাই না আমি ভোগ করছি। মৃত্যু আর বিচ্ছেদ। আয় কমে গেছে। সম্মান নেই। লালকেল্লার বেদনাদায়ক ঘটনার পর নিশ্চিত জেনেছি আমার বহু বন্ধু দিল্লিতে নিহত : মুজাফর উদ-দৌল্লা, মির নাসর উদ-দিন, আমার নাতি মির্জা আসুর বেগ, তার কুড়ি বছরের ছেলে আহমদ মির্জা, মুস্তাফা খান ইবন-ই-আজম-উদ-দৌল্লা, তার দুই পুত্র ইরতিজা খান ও মুরতিজা খান, কাজী ফৈজ উল্লা। এরা ছিল যেন আমার পরিবারেরই মানুষ। আমি কি করে ভুলতে পারি হাকিম রাজি উদ-দিন খান এবং মির আহমদ হুসেন মআইখানের কথা? আল্লা! আমি ওদের কি ফিরে পাব!

আর একটি চিঠিতে গালিব লিখেছেন :

> মনে করো না যে এ দুঃখ শুধু আমাকে ঘিরে। ভারতীয়রা যে সব ইংরেজকে হত্যা করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমার গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক, অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও শিষ্য। এমনকি ভারতীয়দের মধ্যে আমি আমার আত্মীয়, বন্ধু, শিষ্য ও গুণগ্রাহীদের হারিয়েছি। এখন তারা সবাই চলে গেছে। কোন একজন আত্মীয় বা বন্ধুর জন্যে শোক নয়। এতগুলি মানুষের জন্য আমার শোক। হা ঈশ্বর! আমার এত বন্ধু আর আত্মীয় মারা গেছে যে, যদি আমি মারা যেতাম, তবে আমার জন্য শোক করার কেউ থাকত না।

ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশ নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী গালিব। পরিচিত সমাজ ও শহরের ধ্বংস প্রাপ্তিতে তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল অন্তহীন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে সব বিবরণ গালিব রেখে গেছেন সিপাহি বিদ্রোহ গবেষকের পক্ষে তার মূল্য অসীম। দিল্লি পুনরধিকারের পর ব্রিটিশের পক্ষে কথা বলার সাহস ছিল না কারও। বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতে গালিব নির্যাতিত দিল্লিবাসীদের বিবরণ দিয়েছেন নির্ভয়ে। অবশ্য তাঁকে বেশ সতর্কতার সঙ্গেই কলম ধরতে হয়েছিল। গালিব লিখেছেন :

> "তুমি নিশ্চয় এখানকার সব শুনেছ। যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে। গল্প করা যাবে। এখানেই থাক। আমি লিখতে সাহস পাচ্ছি না।"

হাকিম গুলাম নাজফ খানকে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭ সালে লিখছেন :

> "আমার অবস্থা ভেবে দেখ। আমি লিখছি, কিন্তু আমি কি লিখতে পারি? সত্যি কি আমি কিছু লিখতে পারি, না কি লিখে যাওয়াটাও ঠিক হচ্ছে? এই পর্যন্ত সত্য যে, তুমি আর আমি এখনও বেঁচে আছি। আমরা দুজনেই এর বেশি কিছু বলতে পারি না।"

মীর মেদি মজরুহকে লিখছেন :

> "যদি আমরা জীবিত থাকি, তাহলে আমরা আবার মিলিত হব। তখন সব কথা হবে।"

তিনি আরও লেখেন :

"এখনও আমি যে শহরে আছি, তার নাম দিল্লি। এই বিশেষ অঞ্চলটি বালিমরণ নামে পরিচিত। আমার একজন পুরোন বন্ধুকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধনী দরিদ্র সকলেই চলে গেছে শহর ছেড়ে। এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। যারা শহরে ছিল, তারা বিতাড়িত। অধিকাংশ বাড়িতে আলো জ্বলে না।"

আর একটি চিঠিতে গালিব দিল্লিবাসীদের নীরবে অত্যাচার সহ্য করার কথা বলেছেন। কী অসহ্য যন্ত্রণাই না তারা ভোগ করেছে। ব্রিটিশ সৈন্যদের নির্মমতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। এখানে ফুটে উঠেছে গালিবের বলিষ্ঠ ও তীব্র আবেগময় সহানুভূতি। তিনি বলেছেন :

"এই শহব পাঁচটি আক্রমণ সহ্য করেছে। দেশীয় সিপাহিরা প্রথম আক্রমণ চালায়। তারা শহরবাসীদের বিশ্বাস হারায়। তারপর আক্রমণ করে ব্রিটিশসৈন্যরা। তারা জীবন, সম্পদ, সম্মান, সম্পত্তি, এমনকি জীবনের সামগ্রিক রূপকে বিনষ্ট কবে।"

মীর মেদি মজরুকে গালিব লেখেন :

"ভাই, তুমি কি জানতে চাইছ? আমি কি লিখব? দিল্লির জীবনে আছে চারটি নিদর্শন . লালকেল্লা, চাঁদনিচক, জুম্মা মসজিদে প্রাত্যহিক সমাবেশ, যমুনা সেতুতে সাপ্তাহিক ভ্রমণ। ফুল বিক্রেতাদের বাৎসরিক সমাবেশ। দিল্লিতে আব কখনও এসব জিনিস দেখা যাবে না। ...এসব বাদ দিয়ে দিল্লির কথা কি, আমাকে কিছু বলতে পার. .হ্যাঁ, একসময় ভারতে দিল্লি নামে একটি শহর ছিল, একথা বলা হবে।"

আল্লা উদ-দিন আহমদ খানকে গালিব লেখেন :

"ও ঈশ্বর! যে দিল্লিতে আমার জন্ম এ তা নয়. .এটা একটা ক্যাম্প মাত্র...রাজ পরিবারের যেসব মানুষ তরোয়ালের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তারা মাসিক পাঁচ টাকা পেনসিয়ন পাচ্ছেন। মেয়েদের মধ্যে বয়স্করা রয়েছেন, আর যুবতীরা বেশ্যা।"

বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সৈন্য বহু ধনীর বাড়ি ধ্বংস করে। গালিব তাদের এসব কুকীর্তি দেখে তাদের মর্কটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাতির শরীর ও সিংহহৃদয়বিশিষ্ট মর্কটের কুকীর্তি এসব। গালিব বলছেন ;

"ওহে মর্কট! চমৎকার কাজ তোমার! শহবে একি বিশৃঙ্খল অনাসৃষ্টি।"

বিদ্রোহের পর দিল্লিবাসি মুসলমানদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সম্ভবত ব্রিটিশের হিন্দু মুসলমান বিভেদনীতির চল শুরু হয় এ সময় থেকেই। ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি থেকেই হিন্দুরা দিল্লি বসবাসের অনুমতি পায়। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ ছিল না। যেসব মুসলমান সরকারি অনুমতি পাবে, তারাই একমাত্র বাস করবে শহরে, অন্যরা নয়। এই সিদ্ধান্তকে উপহাস করে গালিব বলছেন :

কত প্রণামী দিয়েছে—তার ওপরই নির্ভর করছে একজন মুসলমানের শহরবাসের অধিকার নিয়ে। তোমাকে কত দিতে হবে, তা অবশ্য ঠিক করে দেবে কর্তৃপক্ষ। তারা তোমাকে নিঃশেষ করে তবেই বাস করতে দেবে শহরে।

নবাব আলা উদ-দিন আহমদ খানকে লেখা চিঠিতে গালিবের বর্ণনা আরও জীবন্ত। ধ্বংসপ্রাপ্ত দিল্লিতে অসহায় মুসলমানদের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে গালিব লিখেছেন :

এখন যে কোন একজন ব্রিটিশ সৈন্য সর্বশক্তিময় ঈশ্বর।
এখন ঘর থেকে বাজারের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি মানুষই আতঙ্কগ্রস্ত।
প্রতিটি বাজার যেন কসাইখানা, আর প্রতিটি বাড়ি বন্দিশালা।
দিল্লির প্রতিটি ধূলিকণা মুসলমান রক্ত-তৃষ্ণার্ত।

ব্যক্তিগত অসুবিধা এবং নানা কারণে গালিব বিদ্রোহ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন দাস্তাম্বুতে। সিপাহিদের এই বিদ্রোহকে তিনি বলেছেন অপরিণত পুনরুজ্জীবন। দাস্তাম্বু থেকে জানা যায় যেসব ভারতবাসী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন, তাদের তিনি বিশ্বাসঘাতক, 'অসৎ ভবঘুরে,' 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' 'অন্ধহৃদয় ও হৃদয়হীন,' খুনী 'বিপথু বিদ্রোহী,' 'কালোমুখো তস্কর,' কালোমুখো যোদ্ধা বিশেষণে বিদ্রূপ করেছেন। মীরটের সৈন্যদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> কতকগুলি জঘন্য, উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য শহরে (দিল্লি) প্রবেশ করে, তারা ছিল ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক এবং নিষ্ঠুর। এই সব বিশ্বাসঘাতকরা ছিল ব্রিটিশরক্ত পিপাসু।

তিনি আরও বলেছেন :

> আমি আশা করি ঈশ্বর একসময় ওদের হৃদয় চূর্ণ করবেন এবং হাত হবে কর্মহীন।

দাস্তাম্বুতে গালিব অবশ্য বিদ্রোহকে উপহাস বা বিদ্রোহীদের নিন্দা করেই নীরব হননি। ইংরেজদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন। তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ন্যায়পরায়ণ শাসক', 'নেতৃত্বের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র', 'সিংহহৃদয় বিজয়ী', 'জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অবতার', 'নির্মল চরিত্র ও নৈতিক গুণের জন্য প্রখ্যাত।' দাস্তাম্বুতে গালিব লিখেছেন :

> ন্যায়পরায়ণ শাসকদের (ব্রিটিশ) নিরাপত্তা বিচ্যুত হয়ে, ভারতীয়রা পড়েছে পশু সদৃশ মানুষের কবলে।
>
> সত্যিকথা বলতে গেলে, ব্রিটিশদের বাদ দিয়ে অন্য কোন সরকারের কাছ থেকে আমরা সুবিচার আশা করতে পারি না।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহের পর দিল্লি জুড়ে ফাঁসিকাঠ তৈরি করে। সন্দেহজনক ব্যক্তিরা একের পর এক তার শিকার হতে থাকে। চারিদিকের অস্বাভাবিক দুঃসহ জীবনযাত্রা দর্শনে গালিব বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় গালিবের বিদ্রোহীদের পক্ষে এবং ব্রিটিশের বিপক্ষে যাওয়ার কথা অকল্পনীয়। তাই গালিব অভাবনীয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব্রিটিশ প্রশস্তি গেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক গালিব কি এই প্রশংসাসূচক উক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে এক আশ্চর্য কাহিনীর সন্ধান মেলে!

সে হল ১৮৫৫ সালের ঘটনা। মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে গালিব ফারসিতে একটা কশিদা রচনা করেন। এই প্রশংসাসূচক রচনাটি লর্ড ক্যানিং-এর হাতে দিলেন মহারানির কাছে পৌছে দেওয়ার অনুরোধে। সঙ্গে বাইজনেটিয়াম এবং ইরানের রাজদরবার প্রদত্ত কবিস্বীকৃতির নিদর্শনও পাঠালেন গালিব। যদি ইংল্যান্ডের মহারানি কবিকে অনুরূপ স্বীকৃতি জানান অথবা বৃত্তিদান করেন, তাহলে কবি কৃতজ্ঞ থাকবেন। ১৮৫৬ খ্রিঃ লন্ডন থেকে উত্তর পেলেন গালিব। তাঁর অনুরোধ বিবেচিত হচ্ছে। পরে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। গালিবের মনে রাজকবি হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু দ্রুত এগিয়ে এল সিপাহি বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ সময়ে, ১৮৫৭ খ্রিঃ ১৮ জুলাই বাহাদুর শাহের দরবারে গালিব উপস্থিত ছিলেন। গৌরীশংকর নামে এক গুপ্তচর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এই কথা জানায়। আরও খবর গেল, গালিব ওই দিন দরবারে একটি শিক্কাও আবৃত্তি করেছিলেন। চারদিকের পরিস্থিতি

অনুকূল হলে গালিব বৃত্তি ও সম্মানের জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার তাকে জানালেন বিদ্রোহীদের সংযোগের জন্য সরকারি সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁকে দেওয়া হবে না।

আব্দুল গহফরকে একটি চিঠিতে গালিব লিখলেন :

> "একটি শিককা রচনার অভিযোগে আমাকে বন্দুক বা কামানের গোলার মতো বিঁধেছে। কাকে আমি বলব আমার কথা? কে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে?"

যে শিক্কাটি রচনার অভিযোগ ওঠে, সেটি নাকি জৌকের রচনা। এই শিক্কাটি বাহাদুর সাহেব অভিষেক উপলক্ষে পঠিত হয় ১৮৩৭ সালে। মৌলবি মহম্মদ বকিরের সংবাদপত্র 'উর্দু আকবর' শিক্কাটি প্রকাশ করেছিল সে সময়। বকির আর জৌকের মধ্যে ছিল গভীর অন্তরঙ্গতা। বন্ধুদের গালিব জানালেন পত্রিকার একটি কপি যদি সংগ্রহ করা যায়। ইউসুফ মির্জাকে গালিব লিখলেন

> "যদি দিল্লির উর্দু আকবরেব একটি কপি পাওয়া যায়, তবেই বড়ই উপকার হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এটাকে মারাত্মক কিছু বিবেচনা করবেন না। শিক্কাটি আমার রচনা নয়। আর যদি আমার হয়েও থাকে ত তবে তা আমার নাম ও সম্মান বাঁচাতেই কবেছিলাম। নিশ্চয়, এ কোন পাপকর্ম নয়। যদি তা হয়েও থাকে, তবে এমন কিছু গুরুতর নয় যে, সরকার তা তুচ্ছ ব্যাপাব বলে ঘোষণা কবতে পারবেন না। হা ঈশ্বর! গোলাবারুদ নির্মাতা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি বা খুনী ক্ষমার যোগ্য? কিন্তু একজন কবি দু'লাইন পদ্য রচনার জন্য ক্ষমা পেতে পারে না?"

দুর্ভাগ্যের বিষয় উর্দু আকবরের নির্দিষ্ট তারিখের সংখ্যাটি পাওয়া যায়নি। নিজেকে অভিযোগমুক্ত করতে না পারায়, লালকেল্লা থেকে গালিবের বেতন পাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ভাতা এবং দরবারও নষ্ট হল। রাজকবি হওয়ার সমস্ত প্রয়াস বিফলে গেল। গালিবের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হতে থাকে। দাস্তাম্বুতে গালিবের সমকালীন দুরবস্থার বর্ণনা :

> "এখন আর ব্রিটিশের কাছ থেকে ভাতা ফিরে পাওয়ার কোন আশা নেই। বিছানাপত্তর এবং জামাকাপড় বিক্রি করে চলছে আমার দিনগুলো। অসৎ মানুষে খাচ্ছে রুটি, আর আমি জামাকাপড়।"

গালিব যে তীব্র আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন, তা বিবরণে স্পষ্ট। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের তার ওপর কোন আস্থা নেই। ব্রিটিশ দিল্লি পুনরাধিকারের পর গালিব একটি ফারসি কশিদায় মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি রচনা করেন। তাদের জয় লাভে অভিনন্দন জানান। কর্তৃপক্ষ গালিবকে জানান, চিফ কমিশনারের মাধ্যমে এটি লন্ডন পাঠানো হবে। তারা আরও জানান, এই সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত চিঠি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। গালিব তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়েন। কশিদার অর্জিত চিন্তা দাস্তাম্বুতে লিখলেন। দাস্তাম্বুতে প্রকাশের দায়িত্ব ছিল হরগোপাল তফতার। গালিব তাঁকে জানান :

> "এই পাণ্ডুলিপি (দাস্তাম্বু) দেখে তুমি বুঝতে পারবে। ...এর এক কপি আমি ভারতের বড়লাটকে দেব। তার হাত দিয়ে আর এক কপি ইংল্যান্ডের মহারানিকে পাঠাব। নিশ্চয় বুঝতে পারবে, কি রীতিতে লেখা বইটি।"

এ থেকে স্পষ্ট, আত্মরক্ষার্থে গালিব দাস্তাম্বু প্রকাশ করেছিলেন। মাত্র ছ'শত পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন বিদ্রোহীদের দিল্লি অধিকারের কথা। যদিও দিল্লি তাদের

অধিকারে ছিল চার মাসেরও বেশি। দিল্লিকে পরিবেষ্টিত সাতটি রাজ্যের যোদ্ধাদের কাহিনীর সঙ্গে লখনউ, বেরিলি, মোরাদাবাদ, গোয়ালিয়ার এবং ফারুকাবাদেরও বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ লেখা হলেও, মূল পাণ্ডুলিপি প্রকাশ অসম্ভব ছিল গালিবের পক্ষে। কারণ, দাস্তাম্বু প্রকাশ করেছিলেন তিনি ব্রিটিশের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। গালিব বলছেন :

> "আবেদনকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান, সরকার তার অধিকার ও আকাঙ্ক্ষা মেনে নেবেন।"

দাস্তাম্বুতে গালিব মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে রচিত কশিদাটি প্রকাশ করেছিলেন। গালিব স্পষ্ট করেই বলেছেন :

> আমার তিনটি উদ্দেশ্য—উপাধি, সম্মান ও ভাতা দয়াময়ী সাম্রাজ্ঞী প্রদান করবেন...আমার চোখ ও হৃদয় তার জন্য উন্মুখ।

গালিব বাহাদুর শাহের বেতনভোগী সভাসদ ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দাস্তাম্বুর কোথাও তার স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। বাদশাহের পতনের উল্লেখ আছে মাত্র। দুই অন্তরঙ্গ সুহৃদ ফজল-ই-হক খড়িবাড়ি এবং সদর উদ-দিন আজরদাহর নাম নেই কোথাও। এঁরা দুজনেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। শাস্তিস্বরূপ ফজল-ই-হক আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হন। আজরদাহর চাকুরি যায় এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। একমাত্র হাকিম আহসান উল্লাহ খানের নামই উল্লেখ করেছেন দাস্তাম্বুতে। এই ব্যক্তি ছিল ব্রিটিশের আস্থাভাজন। অবশ্য এঁর নাম ছিল দেশদ্রোহীদের তালিকার প্রথমেই।

দাস্তাম্বুতে গালিব বিদ্রোহের যাবতীয় দায়িত্ব অবিশ্বাসী সিপাহি এবং অসৎ ও আইনভঙ্গকারী সৈন্যদের ওপর চাপিয়েছিলেন। কিন্তু গালিব স্পষ্ট জানতেন, এই বিদ্রোহের নায়ক ছিল ভারতীয় অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী। তারা বিচ্ছিন্নপ্রায় রাজ্যকে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন, নিজেদের শোষণকালকে প্রলম্বিত করার উদ্দেশ্যে। করণীয় সবকিছুই তারা করেছিলেন। এই সমাজটির সঙ্গে ছিল গালিবের অন্তরঙ্গতা। তিনি ছিলেন এই সমাজেরই মানুষ। সেই কারণে তিনি বিদ্রোহের দায়িত্ব এই অভিজাত সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে ছিলেন অনিচ্ছুক।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিদ্রোহের প্রতি গালিবের কোন সমর্থন ছিল কি না? অথবা ব্রিটিশ শাসনকে তিনি আশীর্বাদকে মনে করেছিলেন? না, যেসব ভারতীয় মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন. তিনি ছিলেন তাদের পক্ষে?

এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য গালিবের ব্যক্তিগত জীবনে সামান্য অনুসন্ধান প্রয়োজন। জীবনে সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বসময়ে গালিব ছিলেন বাস্তববাদী। তাঁর বংশমর্যাদা, পরিবেশ, জীবনচর্যা এবং উর্দু ও ফারসি রচনাবলী থেকে এ সত্য স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাঁর শিরায় ছিল মোগল রক্ত।

ছেলেবেলা থেকেই আভিজাত্য, পদমর্যাদা, ঐশ্বর্য, বংশগৌরব সচেতন ছিলেন গালিব। অর্থের প্রাচুর্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেমন উপভোগ করেছেন, দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে তেমনি পীড়িতও হয়েছেন। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। বৈষয়িক বিষয়ে মামলা মোকদ্দমাও করেছেন। মৃত্যুদিন পর্যন্ত ঐশ্বর্যময় জীবনযাত্রাকেই কামনা করেছিলেন।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতি সচেতন ছিলেন গালিব। ব্রিটিশ সভ্যতা ও প্রশাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাদের কাছ থেকে সামান্য জায়গিরও পেয়েছিলেন। যে বাহাদুর শাহের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা, যে লালকেল্লায় এত প্রতিপত্তি সেই সাম্রাজ্য পতনের মুহূর্তে তার সঙ্গে গালিব কোন সম্পর্ক রাখলেন না। যে সভায় ছিল কবি গুণগ্রাহীর সমাবেশ, গালিবের নিজের কথায়, কাজী আবদুল জামিল জুননকে লেখা একটি চিঠিতে আছে :

> 'মোগল রাজপুত্রেরা এসে মিলিত হয় লালকেল্লায়। তারা আবৃত্তি করে গজল। ...ওই সমাবেশ মাত্র কয়েক দিনের জন্য। স্থায়ী হবে কিভাবে? কে জানে আবার আগামী কাল মিলিত হতে পারবে কিনা? যদি তাও পারে বা না পারে—পবে কি হবে তা অজানা।'

অন্যদিকে স্টার্লিং, মেজর জন কোবে, স্যর জন ম্যাকলিয়ড, মেটকাফ এবং টমাস—এসব ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে গড়ে ওঠে গালিবের অন্তরঙ্গতা। মোগল প্রশাসনিক ব্যবস্থার জায়গায় ব্রিটিশ আইন কানুনই পছন্দ করতেন। স্যর সৈয়দ আহমদ খান আইন-ই-আকবরি সম্পাদনা করেন। গালিবের অভিমত চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গালিব একটি মসনবি রচনা করে পুরনো প্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। গ্রন্থের সঙ্গে সেটি অবশ্য ছাপা হয়নি। বিদ্রোহের আগে থেকেই গালিব ব্রিটিশের বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। বিদেশী শাসকদের স্বার্থের সঙ্গে জড়াতে চেয়েছিলেন নিজেকে। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল দরবার ভেঙে দেওয়া হয়। গালিবের আর কোন সংযোগ রইল না দেশীয় শাসকদের সঙ্গে।

বিদ্রোহের আগেই গালিব জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী অসন্তোষের খবর পেয়েছিলেন। চারদিকে অসন্তোষ আগুন হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খানকে লেখা গালিবের চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। গালিবের অনুরোধে সে চিঠি নষ্ট করে ফেলা হয়। ১৮৫৭ খ্রিঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠির সন্ধান মেলে মুকাতিব-ই গালিব-এ। কিন্তু ৮ মার্চ, ১৮৫৭ খ্রিঃ তারিখের চিঠি সম্পর্কে ইমতিয়াজ আলি আরসি বলেছেন : 'এই চিঠির খাম আছে শুধু ফাইলে। তার পেছনে লেখা : চিঠিটি নির্দেশমতো (নবাবের) নষ্ট করা হয়েছে। আরসি আরও লিখেছেন : গালির ১৮৫৭ খ্রিঃ ১ এপ্রিল আর একখানি চিঠি লেখেন। ...ফাইলে এই চিঠিটির খামই কেবল আছে। খামের পিছনে লেখা : স্বহস্তে (নবাবের) চিঠিটি নষ্ট করা হয়েছে।' মকাতিব-ই গালিবের তথ্যভঙ্গীতে আরসি ১৮৫৭ খ্রিঃ ২৩ মার্চ রামপুরের নবাবের লেখা একখানি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। চিঠিতে নবাব গালিবকে জানিয়েছেন, তার ইচ্ছামতই চিঠি নষ্ট করা হয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে এই পত্রালাপ ছিল গোপনীয় পর্যায়ের আর গালিবের অনুরোধেই চিঠিগুলি নষ্ট করা হয়। এই ধরনের অনুরোধের কারণ কি? আরসি বলেছেন : 'সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে লেখা চিঠিগুলি—তাছাড়া এই অনুরোধের আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।'

বিদ্রোহ চলাকালে রামপুরের নবাবের সঙ্গে গালিবের পত্রালাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে লালকেল্লায় গালিবের যাতায়াত ছিল—ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু গালিবের বক্তব্য থেকে জানা যায় বিদ্রোহ চালাকালে তিনি কখনই দরবারে যাননি। এমনকি তিনি বাড়ির বাইরে যেতে পারেননি। বিবরণটি অসত্য হতে পারে। কারণ, আগ্রার সংবাদপত্র আফতাব-ই-আলমাতাব-এ আছে বিদ্রোহের সময় গালিবের সঙ্গে

বাহাদুর শাহের যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া জীবনলালের ডায়েরি থেকে জানা যায়, ১৮৫৭ খ্রিঃ ১৩ জুলাই তারিখের দরবারে গালিব এবং মুকারথ আলি খান ব্রিটিশের প্রাথমিক জয় কেন্দ্র করে লেখা কশিদা আবৃত্তি করেন। জীবনলালের ডায়েরিতে সমকালীন রাজনৈতিক সংকটের আকর্ষণীয় বিবরণ আছে। গালিব একটি শিক্কা রচনার জন্য অভিযুক্ত—যেটি তার রচনা নয়। কিন্তু জীবনলালের তথ্যানুযায়ী গালিব একটি শিককা যে রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে। ডাঃ খাজা আহম্মদ ফারুকি শিক্কাটি জীবনলালের ডায়েরি থেকে উদ্ধার করেছেন। সুতরাং গালিব যে কেবলমাত্র শিক্কাই রচনা করেননি, লাল কেল্লার দরবারে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, তারও প্রমাণ রয়েছে। শিক্কাটি জীবনলালের ডায়েরি থেকে যেভাবে উদ্ধার করা হয়েছে বরজার-ই-আফতাব-ব নুগরাহ-ই-মাহ শিক্কা জাদ দর জাহান বাহাদুর শাহ। আবার গৌরীশঙ্কর যে শিক্কাটি গালিবের বলে উল্লেখ করেছিলেন।

ব-জার জাদ শিক্কা-ই-কিসওয়ার-সতানই সিরাজ উদ-দিন বাহাদুর শাহ শানি।

মালিকরাম শিক্কাটি জৌকের শিষ্য হাফিজ গুলাম রসুল বিরণ-এর নামে ছাপা হতে দেখেছিলেন। 'সাদিকউল-আকবরের' ১৮৫৭ খ্রিঃ ৬ জুলাই তারিখের সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। এ থেকে অবশ্য সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিক্কাটি গৌরীশঙ্কর গালিবের রচনা হিসাবে উদ্ধৃত করেছিলেন, সেটি গালিবের রচনা নয়। এটাই সব থেকে আশ্চর্যের 'সাদিক উল-আকবর' দিল্লির লাল কেল্লা থেকে প্রকাশিত হত; কিন্তু শিক্কাটি প্রকাশ সম্পর্কে গালিব বিন্দু বিসর্গও জানতেন না।

দিল্লি পুনরধিকারের পর পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকে। গালিব ব্রিটিশের বন্ধুত্ব লাভে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। রচনাটা বিস্ময়কর নিঃসন্দেহে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, বিদ্রোহের কয়েকমাস আগে থেকেই রামপুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গালিবের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। বিদ্রোহীদের দমন করতে রামপুরের কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ থাকলে রামপুরের নবাব এবং গালিবের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরতই। আর গালিব বিদ্রোহের পর বললেন, যেহেতু ব্রিটিশের মঙ্গলই তাঁর কাম্য সেজন্য বিদ্রোহকালে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ।

জীবন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গালিবের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই সৃষ্টি করেছে এই জটিলতা! স্বদেশবাসীর নির্যাতন তিনি ভুলে থাকতে পারেননি। গালিব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেছেন দাস্তাম্বুর পাতায় :

> "হৃদয় তো এক টুকরো লোহা বা পাথর নয়, এ কেন অপূর্ণ থাকবে? চোখ দুটো পাথরের দেয়ালে গর্ত নয়, যে অশ্রু ঝরবে না : শাসকের মৃত্যুতে নিশ্চয় দুঃখ করবে। ভারতের ধ্বংসে নিশ্চয় কাঁদবে।"

বিদ্রোহের কয়েক মাস আগে অযোধ্যার সম্পর্কে একটি চিঠিতে গালির লেখেন :

> "যে দুঃসময়ের মুখোমুখি আমরা বাস করছি তার কথা ভাবো...এটি অবশ্য সত্যি, আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অযোধ্যার ধ্বংসে আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত। যে ভারতীয়ের মনে এর প্রতিক্রিয়া হবে না, বুঝতে হবে সে পুরোপুরি নীতিজ্ঞানহীন।"

** সম্ভবত ১৯৭০ সাল নাগাদ 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত*

কমল চৌধুরী

সিপাহি বিদ্রোহে কলকাতার দিনগুলি*

পলাশী যুদ্ধের পরের একশ বছরে ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও ভয়াবহ শোষণের ফলেই ভারতব্যাপী দেখা দেয় এক ব্যাপক অভ্যুত্থান। ইংরেজ বণিকের নিপীড়ন ও অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছিল। একশত বছরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ উপলব্ধি করেছিল বিদেশী শাসনের জ্বালা। লর্ড ডালহাউসির রাজ্য গ্রাসনীতি, অযোধ্যার নবাবকে অপসারণ, ঝাঁসির রাজ্য অপহরণ, সিপাহিদের খ্রিস্টান করার অসাধু প্রচেষ্টা, ব্রিটিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহার ভারতব্যাপী প্রচণ্ড অসন্তোষ রাষ্ট্র বিপ্লবের সম্ভাবনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রাম। স্থির হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীযুদ্ধের শতবর্ষে শুরু হবে বিদ্রোহ। অনুকূল সময়ের অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল না। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালাবার নির্দেশ এসেছিল বেরেলির খাঁ বাহাদুর খাঁর কাছ থেকে : বিধর্মীদের নিয়মিত সৈন্যের মুখোমুখি হতে চেষ্টা করো না। তারা তোমাদের থেকে অধিক সুশৃঙ্খল ও তাদের বন্দোবস্ত পাকা। তাছাড়া তাদের বড় বড় কামান আছে। বরং তাদের সেনা-পরিচালনা পর্যবেক্ষণ কর; নদীর ঘাটগুলি চৌকী দাও, তাদের চিঠিপত্র হস্তগত কর, খাদ্যাদি সরবরাহ বন্ধ কর। তাদের চিঠির থলি কাট এবং সর্বক্ষণ তাদের শিবিরের কাছাকাছি অবস্থান কর। তাদের বিশ্রাম করতে দিও না।

সংগ্রাম শুরুর অনেক আগে থেকেই গোপন চিঠিপত্রে ব্যবস্থা ছিল পাকা। ভাবতে তখন ইংরেজ সৈন্য ছিল চল্লিশ হাজার এবং ভারতীয় সৈন্য ছিল দুই লক্ষ পনের হাজার। তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রিঃ জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে ভারতে ছত্রিশ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। বিদ্রোহী সিপাহিদের দ্বারা একলক্ষ বর্গ মাইলেরও বেশি এলাকা মুক্ত হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। আড়াই বছরের এই সংগ্রামে দুইলক্ষ ভারতীয় প্রাণ হারায়।

বিদ্রোহ দমনে খরচ হয়েছিল চারকোটি চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড। সিপাহিরাই ছিল বিদ্রোহের মূলশক্তি। সুতরাং যেসব এলাকায় রাজ্য ও জনগণ ছিল ব্রিটিশ অনুগত সেখানে অভ্যুত্থানের কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনী বিদ্রোহে একেবারেই অংশ নেয়নি। বেঙ্গল আর্মির ভূমিকাই ছিল প্রধান, তারাই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আগুন জ্বালিয়েছিল। দিল্লি, মীরট, আগ্রা, রোহিলখণ্ড, কাশী, এলাহাবাদ, বাংলা, পাটনা, ছোটনাগপুর, মধ্য ভারত, নিমুচ ও আজমীরে জারি করা হয়েছিল সামরিক আইন। পঞ্জাব ও অযোধ্যায় সামরিক আইন জারি না হলেও, সামরিক আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। অযোধ্যায় বিদ্রোহীর সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার, দিল্লিতে ত্রিশ হাজার, মধ্য ভারতে পঞ্চাশ হাজার। কোষাগার বেদখল, খাজনা অনাদায় ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের পরিমাণ ছিল

বাংলার মহাবিদ্রোহ, দেখুন। পৃঃ ৬৮৭

দেড় কোটি পাউন্ড। বিদ্রোহ দমনে সহকারি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় চার কোটি ষাট লক্ষ টাকা।

এদেশে কোম্পানির ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার পরে ধীরে ধীরে সেনাবাহিনী গড়ে উঠতে থাকে। প্রথম দিকে কোম্পানির পেয়াদা ও পিয়নেরাই নিজেদের কাজ ছাড়াও কোম্পানির সম্পত্তি রক্ষা করত। ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভের পর সৈন্য সংগ্রহ শুরু হয়ে যায়। দেশীয়দের সামরিক শিক্ষা দিতে থাকে উভয় পক্ষ। ক্লাইভ বাংলাদেশে সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীতে স্থানীয় লোক ছাড়াও ছিল রোহিল্লা, রাজপুত প্রভৃতি প্রদেশের লোকজন। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলায় স্বতন্ত্র ইংরেজ সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে। এরা বেশ কিছু স্বাধীনতাও ভোগ করত। দেশীয় সৈন্যদের ওপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নির্ভরতা ছিল যথেষ্ট। ১৭৮৭ খ্রিঃ লর্ড কর্নওয়ালিস লিখেছিলেন : "আমাদের একদল সিপাহি যে কোন ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানের সম্রাট করতে পারে। এদেশীয় সৈনিকদের মুখশ্রী দেখে আমার আনন্দ হয়। কতক সৈন্য আশ্চর্যরূপে সুশিক্ষিত হয়েছে। অফিসারদের মধ্যে নিজ নিজ উন্নতি করবার চেষ্টাও যথেষ্ট। সৈন্যরা বেশ মনোযোগীও। এরা যে এককালে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী চল্লিশ বছরে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয়নি। ১৭৯৬ খ্রিঃ সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের পর য়ুরোপীয় সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৩,০০০ এবং দেশীয় সৈন্য ছিল ৫৭.০০০। লর্ড ওয়েলেসলি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হওয়ায়, তাকে সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করতে হয়। ১৮০৫ খ্রিঃ সেনাবাহিনীতে ছিল ২৫,০০০ য়ুরোপীয় এবং ১,৩০,০০০ দেশীয়।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২,২৯,০০০। এর মধ্যে বেঙ্গল আর্মিতে ছিল ২১,০০০ য়ুরোপীয় এবং ১,৩৭,০০০ দেশীয়, মাদ্রাজ আর্মিতে ছিল ৮,০০০ য়ুরোপীয় এবং ৪৯,০০০ দেশীয়, বোম্বাই আর্মিতে ছিল ৯,০০০ ব্রিটিশ এবং ৪৫,০০০ দেশীয়।

সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা ঘটে সর্বপ্রথম বাংলায়। সেনাবাহিনীতে ভারতীয় নিয়োগের সময় সর্ত ছিল, তাদের ভারতের বাইরে পাঠানো হবে না। বারাকপুরের এক বাহিনীকে ব্রহ্মদেশে পাঠাবার চেষ্টা হলে, তারা অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তাদের প্রাণদণ্ড হয়। ঘটনাটি ঘটে ১৮২৪ খ্রিঃ। সেই থেকে বেঙ্গল আর্মিতে অসন্তোষ প্রকাশ পেতে থাকে নানাভাবে।

১৮২৪ খ্রিঃ ৪ নভেম্বর প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় : "বারাকপুরে সম্প্রতি যে ঘটনা হয়ে গেল তার জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন বোধ করছি। নেটিভ ইনফেনট্রির ৪৭তম সেনাদলের মধ্যেই অবাধ্যতার সূচনা গত কয়েকদিন আগেই দেখা যায়। এই সৈন্যদলকে চট্টগ্রাম যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সোমবার সকালে সৈন্যদলের বেশ একটা অংশ আদেশ অমান্য করে এবং চরম আপত্তিকর ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তবুও এই সৈন্যদলকে চিন্তা করে দেখার জন্য সময় দেওয়া হয়। তাদের কাজে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। মঙ্গলবার সকাল থেকে তারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং শক্তি প্রয়োগ করে এই বিদ্রোহকে দমন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ওইদিন সকালবেলা তাই বিদ্রোহী সৈন্যদলের তাঁবুর পিছনে রয়েল রেজিমেন্টের একটি বাহিনী এবং দমদমের গোলন্দাজ বাহিনীকে

স্থাপন করা হয় এবং তাঁবুর বাঁদিকে থাকে ৪৭তম বাহিনী, দেহরক্ষী বাহিনী এবং নেটিভ ইনফেনট্রির ৬২তম বাহিনী। সেনাপতির আদেশানুসারে কর্নেল নিকন, কর্নেল স্টিভেনসন ও ক্যাপ্টেন মেকলে বিদ্রোহী বাহিনীকে অস্ত্রসমর্পণ করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্রোহীরা অসম্মত হওয়াতে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুটি সংকেতসূচক গুলি ছোড়ার পরই গোলন্দাজ বাহিনী পিছন থেকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে এবং তারা পালিয়ে যায়। দেহরক্ষী বাহিনী তাদের অনুসরণ করে। বহু সংখ্যক বিদ্রোহী নিহত হয়। অনেকে ধরাও পড়ে। তখনই কোর্ট মার্শালে তাদের বিচার হয়। নেটিভ ইনফেনট্রির ২৬ ও ৬২তম আজ্ঞা পালন করে। এখন পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে, বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয়েছে। বিদ্রোহীদের এই কঠোর শাস্তি হওয়া খুবই দরকার ছিল। বিদ্রোহকালে দুজন মাত্র দেহরক্ষী মারা যায়। তাছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি।

বারাকপুর ১৮৫৭ খ্রিঃ ছিল চার দল ভারতীয় সৈন্য। ২, ১৭, ৩৪ ও ৮৩ সংখ্যক বাহিনী সেখানে মোতায়েন থাকত। সৈন্যাবাসের কর্তৃত্ব ছিল চার্লস গ্রান্টের ওপর। সমস্ত বিভাগের সেনাপতি ছিলেন জন হিয়ার্সে। তিনি ২৮ জানুয়ারি অ্যাডজুটান্ট জেনরেলের কার্যালয়ে সংবাদ পাঠান বারাকপুরের সিপাহিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে পুড়ে গেল বারাকপুর স্টেশন। ইংরেজ অফিসারদের ঘরের চালে রাতের অন্ধকারে আগুন লাগানো হয়। তীর পড়ে প্রতিদিন দাবানল সৃষ্টি করতে থাকে। রানিগঞ্জে ২ রেজিমেন্টের শাখা কেন্দ্রে একই ঘটনা ঘটতে থাকে। রাতের অন্ধকারে সিপাহিরা মিলে বৈঠকে বসে। বিভিন্ন সেনানিবাসে গোপনে খবর পাঠানো হতে থাকে কলকাতা ও বারাকপুর থেকে। ২৯ মার্চ বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের গুলিতে ইংরেজ অ্যাডজুটান্টের প্রাণ গেল। মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডের প্রাণদণ্ড হল। ভেঙে দেওয়া হল রেজিমেন্ট। মার্চ ও এপ্রিল মাসে পঞ্জাবের সিপাহিদের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা গেল। ১০ মে মীরাটে বন্দি সিপাহিদের জেলখানা ভেঙে বের করে আনার সময় থেকেই প্রকৃত বিদ্রোহের সূচনা। 'দিল্লি চলো' আওয়াজ তুলে মীরিটের বিদ্রোহীরা পৌছাল দিল্লি ১১ মে। বাহাদুর শাহকে ঘোষণা করা হল হিন্দুস্থানের বাদশাহ। ফিরোজপুর, মুজফ্ফরনগর, লখ্নউ, বেরিলি, শাহজাহানপুর, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, এটাওয়া, হথ্রস, ঝড়কি, মথুরা, ফতেগড়, ফৈজাবাদে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল। পশ্চিম বিহার থেকে পঞ্জাবের পূর্ব সীমান্তে বিদ্রোহের ব্যাপক আকার দেখা গেলেও বাংলা, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজে চাঞ্চল্যের অভাব ছিল না। ভারতব্যাপী হিন্দু মুসলমানের এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলায় ব্রিটিশ শক্তিকে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলার উত্তেজনা কম ছিল না। বর্ধমানের মহারাজা থেকে শুরু করে অসংখ্য জমিদার ইংরেজের রক্ষাকর্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেদিন। তবুও জুন মাসের আগে ইংরেজ শক্তি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটায়। অমানুষিক বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে সেদিনের শ্বেতাঙ্গ শাসকরা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। দোষী নির্দোষী নারী পুরুষ, বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে ভাবতীয়দের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। চাবুক মেরে ভারতীয়দের জিভ দিয়ে রক্ত চাটতে বাধ্য করে, গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কামানে পুরে তোপের মুখে। আরও বহু নৃশংসতম ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একখানি গ্রন্থে উল্লেখ আছে : "তিনমাস ধরে প্রতিদিন মৃতদেহ বোঝাই আটখানি গাড়ি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শবদেহ স্থানান্তরিত

করত। ওই সব শব চৌমাথা ও বাজারে ঝুলানো থাকত। এইভাবে ছয় হাজার লোককে খুন করা হয়েছিল।"

গভর্নর জেনরেল ক্যানিং-এর অবস্থা তখন শোচনীয়। ব্রিটিশদের চাপে তার পক্ষে স্থির থাকা ছিল অসম্ভব। ১৮৫৭ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বলেছিলেন, কেবলমাত্র ত্রাস সঞ্চার ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লোককে গুলি করে বা ফাঁসি দিয়ে হত্যার জন্য চাপ দিতে থাকে ব্রিটিশরা। তার মতে এ হল "আমার দেশবাসীর পক্ষে ভয়ানক কলঙ্ক।" ক্যানিং যে নির্মমতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজরা আরও বেশি কিছু চেয়েছিল। তাই তারা বিদ্রূপ করে ক্যানিংকে বলেছিল "দয়াময়"।

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী তখন কলকাতা। আর সাহেব মেমদের আমদানিও তাই এই শহরে বেশি। দেশীয় সিপাহিদের আক্রমণ আশঙ্কায় কলকাতায় তখন তাদের অবর্ণনীয় কাহিল অবস্থা। মে মাসে শহরের ব্যবসায়ী দোকানদার, সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য ইংরেজ আতঙ্কে শহর ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত। জনরব ওঠে, অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অনুচররা শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে আসছে দেশীয় সিপাহিরা। এরা সব ইংরেজকে কেটে ফেলবে। ভয়ে তারা জিনিসপত্র ফেলে পরিবার পরিজন নিয়ে পাল্কী করে ঘোড়ায় চেপে দুর্গে অথবা গঙ্গার বুকে জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নেয়। জাহাজগুলি রাতে ভরে থাকত মানুষে। ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া ...৮মে (১৮৫৭ খ্রিঃ) লেখে : "অনেকে নিজেদের গাড়িতে পিস্তল নিয়ে বেরোত। বেহারাদের পিস্তলে তাড়াতাড়ি গুলি ভরা ও ছুড়তে শেখাত। ভাগীরথীর বুকে যেসব জাহাজ ছিল তা রাতে ভরে উঠত য়ুরোপীয় অধিবাসীতে। রাতে শত্রুপক্ষের আক্রমণ সম্ভাবনায় য়ুরোপীয়রা ওই সব জাহাজে আশ্রয় নিত। তারা সব সময়ে সমস্ত জায়গায় নিজেদের বিপদাপন্ন মনে করত।"

যারা যেতে পারত না, তারা বন্দুকে গুলি ভরে বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাত কাটাত। অনেকে জাহাজ ভাড়া করে পালাতে থাকে দেশে।

কলকাতায় তখন মাত্র দুদল পদাতিক য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল। ৫৩ সংখ্যক পদাতিক বাহিনী ছিল কলকাতা দুর্গে এবং ৮৪ সংখ্যক পদাতিক বাহিনী ছিল চুঁচুড়ায়। কলকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত। ফোর্ট উইলিয়ামে মজুত অস্ত্রশস্ত্র, কাশীপুরে বন্দুক ও কামান তৈরি হচ্ছে, ইছাপুরে বারুদ বানানো হচ্ছে। দমদমের সৈন্য স্কুলেও অস্ত্রপূর্ণ, সরকারি গুদামে সৈন্যদের প্রচুর পোশাক মজুত, টাকশাল, ট্রেজারি, ব্যাঙ্ক—সব মিলিয়ে কলকাতার চেহারা তখন আমূল পরিবর্তিত।

গভর্নর জেনরেল ক্যানিং-এর বিরুদ্ধে তখন ইংরেজদের প্রচণ্ড রাগ। তিনি নাকি শহর রক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা নেননি। তারা আরও বলত, শহরে আমদানি করা অস্ত্রশস্ত্র কিনে নিচ্ছে দেশীয়রা। গভর্নর জেনরেল অবিলম্বে এই কেনাকাটা বন্ধ করুন। উত্তরে গভর্নর জেনারেল জানান, "শহর রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাউকে নিরস্ত্র করার দরকার নেই। ফলাফল দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

কলকাতা বণিক সমিতির উদ্যোগ ছিল সব থেকে বেশি। তারা স্বেচ্ছা সৈন্য সংগ্রহের আবেদন জানালে গভর্নর জেনরেল তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইংরেজদের চোখে ক্যানিং হয়ে উঠলেন সমালোচনার বস্তু। কলকাতার পথে ঘাটে গুজবের ছড়াছড়ি। গুজব য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সকল শ্রেণির মধ্যে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি করে। স্বয়ং ক্যানিং ২০ মে লেখেন :

"বাজারে গুজব রটেছে হিন্দুরা যেসব পুকুরে স্নান করে, সেইসব পুকুরে গোমাংস ফেলে দিয়েছি তাদের ধর্মনাশের জন্য এবং জনসাধারণকে অপবিত্র খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করার জন্যই মহারানির জন্মদিনে সমস্ত মুদী দোকান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছি। এই সময়ে ধীর ভাবে বুঝে চলা উচিত যাদের, তারাও উৎসাহের সঙ্গে বলছেন যে, এইসব গুজব যেমন বাজারে ছড়াবে, অমনি প্রকাশ্য দোষ পায় তাদের অলীক বলে জানানো উচিত। করা হচ্ছে না বলেই এইসব লোক পিস্তল সজ্জিত হচ্ছে। এইসব জনরব আজগুবি প্রমাণের জন্য, আমার বিবেচনায় যা যুক্তিসঙ্গত তাই করেছি। আমার আশা আছে ধীরতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে চললে, সাধারণ মানুষ শান্ত হবে।"

'মহারানির' জন্মদিন ২৫ সাড়ম্বরে উদযাপিত হল। কিন্তু রাতের বেলা লাটভবনে বলনাচে আমন্ত্রিত য়ুরোপীয়রা উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুপস্থিত ছিল। তাদের ভয় ছিল একত্রিত ইংরেজদের সিপাহিরা আক্রমণ করতে পারে। ইদের সময় মুসলমানরা শহর আক্রমণ করতে পারে, এমন গুজবও ছড়িয়েছিল। আতঙ্ক যে কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সে সময়ে এক মহিলার বিবরণে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, প্রায় রাত দুটোয় তোপধ্বনিতে তারা সকলে জেগে ওঠেন, অনেকেই ভাবলেন। আলিপুর জেল ভেঙে পালিয়েছে কয়েদি। পিস্তল নিয়ে তৈরি হল সকলে। গাড়ি করে মেয়েদের দুর্গে পাঠাতে ব্যস্ত সবাই। কিন্তু আসল ঘটনা হল, দূরে বাজী পোড়ানো হচ্ছিল মহীশূর রাজ পরিবারের বিবাহ উৎসবে।

জুন মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ কেটে যায় বিনা গোলযোগে। কলকাতাবাসী য়ুরোপীয়রা তখন অনেকটা শান্ত। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা আপাতত নিরাপদ মনে হতে থাকে। সরকারের সমালোচনা বন্ধ হল। কিন্তু কলকাতায় প্রশান্ত চিত্র দীর্ঘস্থায়ী হল না। আতঙ্কিত কলকাতাবাসী য়ুরোপীয়রা সশস্ত্র সিপাহিদের অস্ত্রহীন করার জন্য দাবি জানাতে থাকে।

বাইরের থেকে কলকাতায় য়ুরোপীয় সৈন্য আসছিল অনেক আগে থেকেই। এই সময়ে বারাকপুরের সিপাহিরা কোম্পানির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ২৫ মে ৭০ সংখ্যক রেজিমেন্ট দিল্লির সিপাহিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ জানায়। লর্ড ক্যানিং বারাকপুরে গিয়ে সিপাহিদের উৎসাহিত করেন। ৭০ সংখ্যক রেজিমেন্টের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ৪৩ সংখ্যক রেজিমেন্টের সিপাহিরাও দিল্লির উত্তেজিত সিপাহিদের বিরুদ্ধে অভিযানে এগিয়ে যেতে চায়।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বারাকপুরের সিপাহিরা গভর্নমেন্টের কাছে এনফিল্ড রাইফেল প্রার্থনা করে। ৭০ সংখ্যক রেজিমেন্টের একজন দেশীয় অফিসার, "আমরা এই বিষয় বিবেচনা করে দেখেছি। এখন আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যেতে উদ্যত হয়েছি। যে অভিনব রাইফেল বন্দুক সম্বন্ধে এতদিন সমগ্র জনপদে নানান কথা হয়েছে, সেই বন্দুক পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি। এই বন্দুক ব্যবহার করে, আমরা নিঃসন্দেহে সরকারের নিকট আমাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারব এবং যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, তাদের বোঝাতে পারব যে, এই বন্দুকের ব্যবহারে আপত্তির কারণ কিছুই নেই। তা না হলে আমরা এটি ব্যবহার করব কেন? আমরা কি আমাদের জাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে সাবধান নই?"—কিন্তু বন্দুক এত বিপুল সংখ্যক ছিল না যে, সমস্ত সিপাহিদের মধ্যে তা বিতরণ করা সম্ভব।

কিন্তু ঘটনার স্রোত অন্যদিকে চলে গেল। কর্তৃপক্ষ সিপাহিদের অভিনব বন্দুক সজ্জিত করার পরিবর্তে, পুরনো বন্দুক ব্রাউনবেস তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছিল। ৮ জুন সেনাপতি হিয়ার্সে এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহারের অনুমতি দান সম্বন্ধে ৪৩ এবং ৭০ সংখ্যক রেজিমেন্টের আবেদনপত্র কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। ১৩ জুন তিনি গভর্নর জেনরেলকে জানান ওইদিন রাতে বারাকপুরের সিপাহিরা সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছে। সুতরাং অবিলম্বে তাদের নিরস্ত্র করা দরকার। সেই রাতে বারাকপুরের সিপাহিদের নিরস্ত্র করতে কলকাতা থেকে একদল য়ুরোপীয় সৈন্য এগিয়ে এল। চুঁচুড়া থেকেও একদল য়ুরোপীয় সৈন্য এগিয়ে আসতে থাকে।

১৩ জুন রাত কেটে গেল নিরুপদ্রবে। বারাকপুরের উদ্বিগ্ন য়ুরোপীয়দের মনে ফিরে এল শান্তি। পরদিন সকালে য়ুরোপীয় সৈন্যরা হাজির হল বারাকপুরে। তারা তখন ক্লান্ত—দুর্গতির সীমা ছিল না। অনেকেরই পায়ে ছিল না জুতো মোজা। কারো বা ছিল রাতের পোশাক মাত্র পরা। পা কেটে রক্ত পড়ে ফুলে উঠেছে। এই বিধ্বস্ত অবস্থায় বারাকপুরে হাজির হয়ে তারা দেখতে পেল না অশান্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন। দিনের বেলা নিরুপদ্রবে কেটে গেল। সন্ধ্যায় সিপাহিদের আদেশ দেওয়া হল জমায়েত হতে। একত্রিত হতে গিয়ে তারা দেখে, তাদের সামনে সাজান কামান। য়ুরোপীয় সৈন্যরা সেনাপতির নির্দেশের অপেক্ষায়।

সিপাহিরা এই দৃশ্যে হতভম্ব। সেনাপতি হিয়ার্সে আদেশ দিলেন অস্ত্র ত্যাগ করতে। বিন্দুমাত্র দ্বিধাপ্রকাশ না করেই সিপাহিরা আদেশ পালন করল। তাদের য়ুরোপীয় অফিসাররা মনে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তাদের কেউ কেউ সিপাহিদের অস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালেও, তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিদের মনে ভয় হল, তাদের বুঝি গোরা সৈন্যরা আক্রমণ করে বসে। ভয়ে ভয়ে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে পড়ল এদিকে ওদিকে।

কলকাতায় গভর্নর জেনরেলের কাছে সংবাদ গেল নিরস্ত্রীকরণ বিনা গোলযোগে শেষ হয়েছে।

তখনও কিন্তু কলকাতা ও দমদমার প্রহরী হিসাবে কাজ করত দেশীয় সিপাহিরা। বিনা বাধায় তারাও অস্ত্রত্যাগ করল। "গভর্নমেন্ট তাহারদিগকে কর্মচ্যুত করেন নাই, মাসে মাসে যেরূপ বেতন দিতেন সেইরূপ দিবেন। কলিকাতার সকল সিপাহিরা অস্ত্রশস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়াছেন এইক্ষণে সিপাহীরা ঘটি, কম্বল সম্বল সকল বিক্রয় করিয়া পলায়ন করিতেছে।"

১৪ জুন ছিল রবিবার। বারাকপুর শান্ত ছিল। কিন্তু রাজধানী কলকাতার চিত্র তখন ভিন্ন। গভর্নর জেনরেলের বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য। সবাই য়ুরোপীয়। অলীক আতঙ্কে তারা আত্মগোপনে ব্যস্ত। উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের ছুটোছুটিতে কলকাতার রূপ গেল বদলে। কারণ, কলকাতায় খবর ছড়িয়ে পড়েছিল বারাকপুরের সিপাহিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। দল বেঁধে এগিয়ে আসছে শহরে দিকে। জনরব ওঠে, নির্বাসিত অযোধ্যার নবাবের অনুচররাও সিপাহিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্যোগ করছে।

সুতরাং সন্ত্রস্ত য়ুরোপীয়রা নিরাপদ স্থানের সন্ধানে বেরিয়ে গড়ল। বিদেশী ব্যবসায়ীরা জনরব উপেক্ষা করে সাহসের সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা করলেও, তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। মন্ত্রীসভার সদস্যরাও বিদ্রোহী সিপাহিদের

উপেক্ষা করে আসছিলেন, কিন্তু এবার তারাও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। বাস গৃহে সুরক্ষার ব্যবস্থা যারা করতে ব্যর্থ তারা আত্মগোপনের চেষ্টা করতে থাকে।

স্বল্প আয়ের য়ুরোপীয় কর্মচারীরা চৌরঙ্গী থেকে গড়ের মাঠের দিকে ছুটতে শুরু করে। দুর্গের সামনে সমবেত হয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুরোধ জানায় বারবার।

সকাল হল। দেখা গেল কলিকাতা জুড়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। বড় বড় রাস্তা গাড়ি ঘোড়ায় পূর্ণ।

গাড়ি ভর্তি য়ুরোপীয় নারী পুরুষ, বালক বালিকা। পলায়ন ছাড়া কোন চিন্তা নেই তাদের। তাদের মনের অবস্থা এমন বিপর্যস্ত যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার অবকাশও ছিল না। বিছানা-পত্র বেঁধেই ফেলতে থাকে গাড়ির ওপর। জনতা আর গাড়ির মিছিল চলেছে গড়ের মাঠের দিকে। ভাগীরথীর তীরে অসংখ্য জনতার কোলাহল। তাদের ইচ্ছা, হয় দুর্গে অথবা ভাগীরথীতে অপেক্ষারত জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। কোলাহলে চারিদিক ফেটে পড়ছে। দুর্গের দিকে অগ্রসরমান মিছিলে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কে আগে দুর্গের মধ্যে ঢুকতে পারবে। জাহাজঘাটে মাঝিদের উদ্দেশ্যে সকলেই চেঁচাতে থাকে আগে জাহাজে উঠিয়ে দাও। কিন্তু জাহাজ বা দুর্গ অতি অল্প সময়েই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

ফিরিঙ্গীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সে সময়ে তাদের অধিকাংশই বাস করত ইন্টালী ও সার্কুলার রোড এলাকায়। অধিকাংশই পালিয়ে গেছে। তাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত বন্ধ করে যাওয়ার অবসর ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাদের কোন জিনিসপত্র শহরেব চোররা অপহরণ পর্যন্ত করেনি এই সুযোগে। শহরে কুকুর বেড়ালের পর্যন্ত দেখা পাওয়া যায়নি। আতঙ্কিত মানুষদের অসহায় অবস্থা দেখে তারাও নিরাপদে সরে পড়ে।

এই সময়ে খবর ছড়ায় দিল্লির উত্তেজিত সিপাহিরা এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। আগুনে ঘৃতাহুতি হল। চৌরঙ্গী আর খিদিরপুর একেবারে জনশূন্য। দুর্গে, জাহাজে যাদের জায়গা হল না, তারা গিয়ে আশ্রয় নিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ গৃহে। সেখানেও ছিল শত শত লোক। সুরক্ষিত হোটেলগুলিতেও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। আতঙ্কে পিতল কাঁসার বাসন পুঁতে ফেলে মাটির নীচে। পিতল বা সোনার অলঙ্কার দেওয়ালে গেঁথে ফেলেছিল। এক পাগলা হাওয়ায় সেদিনের কলকাতা তোলপাড়।

জাহাজের নাবিকরা ঘোরাঘুরি করছিল সশস্ত্র হয়ে। সম্ভাবিত যুদ্ধের মোকাবিলা এবং বড় কোন সুবিধা লাভের আশায় তারা ছিল উৎফুল্ল। সন্দেহজনক দেশীয়দের পরীক্ষা করা হচ্ছিল। কখনও কখনও অকারণে তাদের ওপর অত্যাচার করা হত। শহরবাসীদের ওপর গোরা সৈন্যদের অত্যাচার বেড়ে যায়। জোর করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে লুটপাট চালাত। পথচারীও ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালাইয়া যথাসর্বস্ব অপরহণ করে নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেত। রানি রাসমণির বাড়িতে ঢুকে গোরা সৈন্যরা প্রকাশ্যে অত্যাচার চালিয়েছিল।

কিন্তু কলকাতায় কোন হামলাই ঘটল না। আতঙ্কও দূর হল কিছুটা। অনেকেই ফিরে গেল পরিত্যক্ত ঘর বাড়িতে। কলকাতা অনেকটা স্বাভাবিক হল।

অশান্ত কলকাতার সেই সব দিন সত্যিই ছিল ভয়াবহ। একটি আকর্ষণীয় বিবরণে আছে : "...কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহিগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা শহবের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা শহর লুট

করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিন যাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও দেশীয় খ্রিস্টানগণ সর্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভব রূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—কালাদের অস্ত্রশস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজেরা তাহার নাম দয়াময়ী ক্যানিং রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলি করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিসের প্রায়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজে বাসাতে দুই চারিজন বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইতে প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে। কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, 'হুকুমদার' অর্থাৎ (হু কামস দেয়ার?) তাহা হইলেই বলিতে হইত, 'রাইয়ত হ্যায়' অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।" লিখেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কালীপ্রসন্ন লিখেছেন : "শহরে ক্রমে হুলস্থূল পড়ে গেল, চুনোগলি ও কসাইটোলার জেটে ইদরুস্ পিদ্রুস্, গমিস ডিস প্রভৃতি ফিরিঙ্গিদের খাবার লোভে ভলিন্‌টিয়ার হলেন...'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সাহেবেরা (হিন্দুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কর্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙালিদের উপর ঝাড়তে লাগলেন! লর্ড ক্যানিংকে বাঙালিদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারি যন্ত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙালিরা বড় বড় রাজকর্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগলো,...বাঙালিরা ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে। সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু—তারা আজও সেই হতভাগা ন্যাড়া বাঙালিই আছেন—বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি। (পারবেন কি না তারও বড় সন্দেহ)।..

"ইংরাজেরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠান্ডা হলেন না—লর্ড ক্যানিংয়ের রিকলের জন্য পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত কল্লেন, শহরে হুজুকের এক শেষ হয়ে গেল। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগল। সেই সময়ে বাজারে এই গান উঠল—

বিলেত থেকে এলো গোরা,
মাথার পর কুরাত পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা, হাইল্যান্ড নিবাসী তারা।
টামটিয়া টোপীর মান
হবে এবে খর্বমান,
মুখে দিল্লি দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে সমবেত হয়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানান ২৪ মে। সভায় রাজা রাধাকান্তদেব, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাধাকান্ত দেব। সিপাহিদের বিদ্রোহের নিন্দা করে এবং বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় :

১। "এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতদ্দেশীয় কয়েকদল পদাতিক সৈন্য গভর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহারের জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়।

২। এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোনরূপ সহায়তা না করাতে গভর্নমেন্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্দারা তাহা আরো সম্পূর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জনগণের সুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষয় ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু ঐ ভ্রমের কোন কারণ নাই।

৪। এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গভর্নমেন্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য করিতেছেন যে মহারানির এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যবোধ করিবেন।"

সভায় গৃহীত প্রস্তাব এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারের জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া প্রস্তাবের অনুলিপি পাঠান হয় গভর্নর জেনরেলকে।

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের সভায় ব্রিটিশ ভক্তির এবং জাতীয় স্বার্থ বিবোধী তৎপরতার যে পরিচয় তাব বিস্তৃত বিবরণ এখনও অজানা। তবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ত্রাণকেন্দ্র এখনকার মত তখনও ছিল কলকাতা। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এক নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তাদের নব উদ্ভূত জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সিপাহি বিদ্রোহের উদ্দেশ্যের ছিল দুস্তর ব্যবধান। তারা চেয়েছিল ইংরেজের আশ্রয় এবং বিদেশী সুরক্ষা। গণবিপ্লবের ধারণা তাদের মনে স্থান পায়নি। বিদ্রোহ বিমুখ এবং আপোসকামী মনোভাব নিয়ে সেকালের অধিকাংশ শিক্ষিত ও ধনী বাঙালি সিপাহি বিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজের জয়গান করেছিল। অবশ্য সমকালীন পত্র পত্রিকা সেই সাক্ষ্যই দেয়। সংবাদ প্রভাকর লিখেছিল :

"ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যাহারদিগকে রণ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, বেতন দিয়া সন্তোষ রাখিয়াছেন, পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, অধুনা তাহারাই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে নরাধমেরা রাজকৃত উপকার সকল কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে?"

বাঙালিদের সভার পর পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ সিংহ বাহাদুর এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বাড়ির সামনে কমপক্ষে দুই হাজার সশস্ত্র ব্যক্তি মোতায়েন করা

হয়েছিল। তাদের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছিল গুলি ভরা বন্দুকসহ গোরা। বাদ বাকি সব ঢাল তলোয়ার ও বন্দুক নিয়ে এদেশীয় লোক। শোভাবাজারের উভয় রাজবাড়ির সামনে ছিল একই দৃশ্য। মলঙ্গার দত্তদের বাড়ি এবং জানবাজারের রানি রাসমণির বাড়িতেও বন্দুকসহ গোরা সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। কলুটোলা থেকে বাগবাজার পর্যন্ত সেন, শীল, দত্ত, মল্লিক, ঠাকুর, সিংহ, ঘোষ, মিত্র, বসু, দেব প্রতিটি ধনী গৃহে গোরা ও দেশীয় সৈন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, যে কোন রকম হামলা মোকাবিলার জন্য। যার যে রকম অবস্থা সে সেইভাবে নিজেকে সশস্ত্র করে তুলেছিল। ঢাল তলোয়ার, শড়কী, বল্লম ত ছিলই, আর অধিকাংশ বাড়ির ছাদে 'ঝামা, ইঁট রাশিরাশি জমা করা হয়েছিল। ঘোড়া, ঘোড়ায় টানা গাড়ি বা পায়ে হেঁটে সারা রাত ধরে শহর পাহারার কাজ চলত। যাতে বিদ্রোহী সিপাহিদের শহর প্রবেশ রোধ করা যায়। স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিন শতাধিক ব্যক্তি যুদ্ধবিদ্যা শেখা শুরু করে।

আগ্রা, দিল্লি, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দমনে অসংখ্য সৈন্য পাঠাতে থাকে ব্রিটিশ সরকার। সেই সৈন্যদের জন্য আহারাদি পাঠাতে হত কলকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শহর থেকে। ফলে এইসব অঞ্চলে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব। ব্যবসায়ীরাও অতিরিক্ত লাভেব আশায় আহার দ্রব্য বাইরে পাঠাতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। ধনী লোকেরাও খাদ্য সংকটের আশংকায় কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করে ছয় মাসের আহাবোপযুক্ত দ্রব্যাদি মজুত করে। ফলে দরিদ্র মানুষ নিদারুণ সংকট সম্মুখীন হয়। চারদিকে কেবল 'নাই নাই' রব। ডাল, চাউল, তেল-ঘি সবই বিত্তবানদের ঘরে চলে গেছে। দরিদ্র মানুষ পাঁচ পয়সায় এক পয়সার জিনিসও সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। এই সময় আম, কাঁঠাল সস্তা হওয়ায়, কিছুদিন গরিবদের প্রাণ বেঁচে ছিল এসব খেয়ে। কিন্তু তাও শেষ হল! সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছিল : "...ধনীলোকেরা নগরে হাহাকার উঠাইলেন দরিদ্র প্রজা সকল বাজারে আহারীয় দ্রব্য পাইবেক না ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দলবদ্ধ হইবে এবং ধনীদিগের বাড়ি বাড়ি পড়িয়া সর্বস্ব লুঠ করিয়া লইবে, আহার না পাইলে কি করে, ঘরে ঘরেই কাটাকাটি ঘটাইয়া দিবে অতএব ধনীগণ এই সময়ে দরিদ্র প্রজা সকলকে প্রতিপালন করুন ইহা না করিলে আহার বিরহে তাহারদিগের ভৃত্যবর্গও উপসর্গ ঘটাইতে পারিবে। সিপাহিরা যেমন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিকূল হইয়া সকলকে ব্যাকুল করিয়াছে প্রত্যেক ধনীর দৌবারিকাদি ভৃত্যেরা কি এরূপ করিতে পারে না, মরিয়া হইয়া উঠিলে মানুষেরা জ্ঞান যোগ থাকে না, অজ্ঞানাবস্থায় কি না সম্ভব।"

অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলি তখন মুচিখোলায় নির্বাসিত। জনরব উঠল, তার অনুচররা কলকাতা দুর্গের মুসলমান প্রহরীদের উত্তেজিত করছে। তারা বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমন অভিযোগ তুলতে থাকে য়ুরোপীয়রা। দুর্গের প্রহরীদের সঙ্গে নবাবের লোকজনদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটছে প্রায়ই। এমনকি অযোধ্যার প্রধান তালুকদার রাজা মানসিংহ নাকি কলকাতায় এসে নবাব এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন।

গভর্নর জেনরেল অবস্থার জটিলতায় উদ্বিগ্ন হলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল নবাব ওয়াজেদ আলি, তাঁর প্রধানমন্ত্রী আলি নকি খাঁ এবং আরো তিনজন কর্মচারীকে অবরুদ্ধ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার ভার দেওয়া হয় পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি এড্‌মনস্টোনকে।

এড্‌মনস্টোন গভর্নর জেনরেলের কয়েকজন কর্মচারী, কিছু য়ুরোপীয় সৈন্য এবং পুলিশ নিয়ে ভোরবেলায় নবাবের বাসভবনে গিয়ে হাজির। বাড়িটি ঘিরে ফেলা হল। নবাবের লোকজনকে বাধা দিল না কেউ। নবাবের অনুচরেরা এত সকালে এই সব লোকজন দেখে বিস্মিত ও আশঙ্কিত হল দুর্যোগের সম্ভাবনায়। প্রথমে আলি নকি খাঁ এবং আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সৈন্য পাহারায় পাঠানো হল, জাহাজে। জাহাজটি কলকাতা থেকে এসেছিল বন্দিদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

এড্‌মনস্টোন এবার হাজির হলেন নবাব প্রাসাদে। ঘুম থেকে উঠে নবাব স্নান ও উপাসনা সারলেন। তারপর সপারিষদ দেখা দিলেন সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এড্‌মনস্টোনকে সাদরে গ্রহণ করা হল। নবাবকে তিনি জানালেন : "গভর্নর জেনরেল সংবাদ পেয়েছেন, গুপ্তচররা আপনার নাম করে, ব্রিটিশ রাজ্যের সর্বত্র সিপাহিদের উত্তেজিত করছে সরকারের বিরুদ্ধে। সেজন্য গভর্নর জেনরেলের ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবেন।'

নবাব নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেও রেহাই পেলেন না। এড্‌মনস্টোনের সঙ্গে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে কলকাতা অভিমুখে চললেন গাড়িতে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় কোন উদ্বেগ প্রকাশ না পেলেও, কিছুদূর যাওয়ার পর এই অপমানকর পরিস্থিতির জন্য তার দুচোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে। নবাব কলকাতার দুর্গে উপনীত হলেন ১৫ জুন সকাল আটটায়। তিন জন পারিষদ সহ তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দি হলেন। যদিও বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে তার যোগাযোগের কোন প্রমাণ ছিল না।

সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচারের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। ওদিকে কলকাতায় ভয়াবহ সংবাদ আসছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে। স্বদেশবাসীর মৃত্যুতে কলকাতার ইংরেজরা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে পলাতক য়ুরোপীয়রা কলকাতায় এসে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে নানান খবর ছড়িয়ে। ইংরেজরা একদিকে শোকাভিভূত এবং অপর দিকে হিংসায় নৃশংস হয়ে উঠছে তখন। সমগ্র ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ফেটে পড়ছিল তাদের আক্রোশ। গভর্নর জেনারেলের কার্যক্রম তাদের দাবি অনুযায়ী হিংস্ররূপ না হওয়ায়, তারা ক্রোধ প্রকাশেও দ্বিধা করেনি। এই উত্তেজিত সশস্ত্র য়ুরোপীয়দের হাত থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল।

৩১ জুলাই সরকারি নির্দেশ ঘোষিত হল : ১। যেসব রেজিমেন্টের সিপাহিরা সরকারের বিরুদ্ধে যায়নি, তাদের হাতে অস্ত্র না থাকে। ২। যেসব সিপাহি অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল অথচ তাদের অফিসারদের হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল না এবং তারা নিরস্ত্র থাকে। তাহলে তাদের পাঠাতে হবে সামরিক বিচারের জন্য। ৩। সরকারে বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, অফিসার বা অন্য য়ুরোপীয়দের হত্যায় লিপ্ত ছিল অথবা গুরুতর অত্যাচারের প্রশ্রয়দানকারীদেব বিচার হবে আদালতে। কিন্তু বিচারকের দণ্ডাদেশ কার্যকরী করার আগে প্রয়োজন হবে সরকারি অনুমোদনেব। এই আদেশে অপরাধীদের মুক্তিদানের কোন উল্লেখ ছিল না।

এই সময় জাহাজ বোঝাই বন্দি সিপাহিদের গোরা সৈন্য পাহারায় নিয়ে আসা হতে থাকে কলকাতায়। হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে আনা বন্দিদের লক্ষ্য করে সেদিনের সম্বাদ ভাস্কর লিখেছিল : "...গভর্নমেন্ট সিপাহিদিগের প্রতি যে প্রকার ক্রোধ করিয়া

রহিয়াছেন তাহাতে ইহারদিগের বলিদান দিবেন ইহাই জনোগ্রাহ্য হইতেছে। কালীঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই আমারদিগের রাজেশ্বর যদি হিন্দু হইতেন তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন...”

সে সময় কলকাতার অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিক্রি বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে। উন্মত্ত হিংস্র য়ুরোপীয়রা অস্ত্র সংগ্রহ করছিল। হিন্দু ও মুসলমানেরা এজন্য শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। সরকার সিপাহিদের নিরস্ত্র করলেও, য়ুরোপীয়দের হাতে অস্ত্র-সঞ্চয় ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। দেশীয় লোকজনের এই বিশ্বাস জন্মায়, য়ুরোপীয়রা আত্মরক্ষা ছাড়াও, অন্য কাজে ব্যবহার করবে এই অস্ত্র। অস্ত্র-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার অস্ত্রসংক্রান্ত আইন প্রচারে বাধ্য হয়। রাজকর্মচারীরা নিজেদের বিভাগের লোকজনদের সংগৃহীত অস্ত্রের তালিকা সংগ্রহের নির্দেশ পান। অস্ত্র রাখবার লাইসেন্স ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। কলকাতাবাসী য়ুরোপীয়রা গভর্নর জেনরেল ক্যানিং-এর ওপর এই ব্যবস্থা বিবর্তনে সন্তুষ্ট হয়নি। ভারতীয় রাজা ও জমিদার এবং বিভিন্ন শ্রেণির কিছু মানুষ যারা ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল, তাদের রক্ষা করাও তখন ছিল সরকারের কর্তব্য। এই ব্যবস্থায় তার পরিচয় মেলে।

কলকাতা প্রবাসী য়ুরোপীয়দের অশ্রদ্ধার পাত্র গভর্নর জেনারেল ক্যানিং কিন্তু নিজের প্রাসাদ ও দেহরক্ষী হিসাবে সিপাহিদেরই মোতায়েন রেখেছিলেন। বহু অনুরোধেও তাদের নিরস্ত্রীকরণে অথবা অন্যত্র সরিয়ে দিত তিনি অসম্মত হন। পরে লেফটেনান্ট গভর্নরের নির্দেশে এদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন কলকাতার স্যর জেমস আউটরাম, ক্যাপ্টেন পীল, স্যর কোলিন ক্যাম্পবেল, লর্ড এলগিন প্রভৃতি বিখ্যাত সেননায়করা এসেছিলেন। এলগিনের চিঠি থেকে জানা যায় : “গভর্নর জেনরেল ছাড়া কলকাতার প্রায় কেউই ভয়শূন্য ছিলেন না। তিনি সকাল পাঁচটা বা ছয়টা থেকে সারাদিন কাজ করতেন। কোনো মানসিক বা শারীরিক কষ্ট অনুভব করতেন না। এই গোলযোগের মধ্যেও তিনি এবং তার স্ত্রী সব সময় প্রসন্নভাবেই থাকতেন।”

সেকালের বাঙালি ধনীরা কৃপা লাভ করেছিল কোম্পানির। তাদেরই দৌলতে ওদের বিলাস বৈভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে এরাই বাংলার প্রতিনিধি নয়। বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে ছিল ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব। কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে সিপাহি ও কৃষকরা সেদিন সম্মিলিত হতে পারেনি। যার ফলে বিদ্রোহের সূচনাখণ্ডে আরম্ভই ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কালের।

বিদ্রোহের পর দেশব্যাপী শান্তি স্থাপিত হল। কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার চলে গেল ব্রিটিশরাজের হাতে। সেনাবাহিনীর ব্যাপক পুনর্গঠনে দেশীয় সৈন্যদের সম্মান ও সংখ্যা হ্রাস পেল। দেশীয় সৈন্য হ্রাস করা হল শতকরা চল্লিশ ভাগ এবং য়ুরোপীয় সৈন্য বাড়ানো হল শতকরা ষাট ভাগ। সিদ্ধান্ত হয় কোন ভারতীয়কে গোলন্দাজ বাহিনীতে নেওয়া হবে না। কিন্তু পার্বত্য গোলন্দাজ বাহিনী এবং হায়দ্রাবাদের দেশীয় গোলন্দাজবাহিনী পূর্বাবস্থায়ই থাকল।

CALCUTTA AND ITS SAFETY

Smething must be done for the Christian inhabitants of Calcutta. They can not rid themselves of the idea that one of these mornings they will find themselves dead men and dead women and dead children. They are in awful dread of their domestic servants and of the sepoys banded and disbanded. A few crackers fired in a wedding in one of the suburbs kept them awake one whole night. The morning of the zenobia a little high up the river destroyed their rest for a couple of days and night. But the placing of European sentries over the Mint and the Treasury has quite convinced them that Calcutta is destined to be the victim of mutiny.

The inhabitants themselves have wanted a Militia. Well, if that will give them sleep and appetite, we are clearly of opinion that Government should yield to their request—only stipulating that they should subscribe to defray the expenses. But these is another plan which is less openly talking of, and which may better deserve consideration. If the Governor General but gives a hint, five thousand men armed in the fashion of the mofussil, would be placed at his disposal in a weekly the landholders in and about Calcutta. These men are all trained to street fighting, and defending houses is their vocation. A Bengallee paik, it is well known never sleeps. They are superior, man for man, to the Calcutta police, and would be equal to an equal number of sepoys armed with anything less than muskets. They are no more likely to fraternise with mutinous sepoys or a rebellious Khansamry than the judges of the Supreme Court. If these men are distributed among the houses in Calcutta in batches of five to ten, they would undoubtedly succeed in abating the fears of the inhabitants. The Zeminders who furnish them will to course have the honour of maintaining them at their own expense. We really think the experiment ought to be tried.

Hindoo Patriot—11June 1857

THE METROPOLIS AND ITS SAFETY

Yielding to a necessity more imperious than that of rescuing Delhi, or tranquilizing Upper India, the Governor General has allowed Clive Street, Cossitolah and Colingah to protect themselves. The martial ardour of the christian inhabitants of Calcutta which was night bursting—the colums of our daily contemporaries—has been given a vent by the orders for forming the Calcutta Volunteer Guards. The act has given Lord Canning, if not the town or the country peace. And if his Lordship does not carry out his threat of giving that gallant corps a very "plain uniform", he may yet have time allowed him to look to the government of the country.

Badinage aside, we believe the Governor General has does not the

least politic of his acts in sanctioning the formation of the corps of Calcutta volunteers. No argument that he could have used would have convinced, of their perfect safety, men who in their turn, were convinced that they would infallibly be shot "clean through the head," by the Khanshamaha and Khidmetgas of Calcutta. But he intentions of the supreme government are likely to be nullified by the Town Major, who has allowed the crisis to pass without putting the fort in the hands of the gallant volunteers, and has after the danger has passed, only promised to "Parade" the guards—before the eyes of Dr. Cantor and the curious. But the culpable negligence of an incompetent official was not to compromise the safety of Cassitolah, Clive Street and Colingah. Mr. Kilburn and the merchants of Calcutta are "practical men". They wait not for Town Majors or the like of them. They have improvised Cavalry and Infantry, and they scour Calcutta under the sanction of its greeat Deputy Commissioner. Fortunately there are no mills in their way, and their limbs are safe,–unless colonels of volunteer cavalry ride down colonels of volunteer infantry as has unfortunately been done in one case.

Lets try again to be serious. We wish Colonel Cavenagh will see the young people who manage to get clear of their governors after 10 in the evening under color of the G.C. do not decisively discard beer for brandy—don't get sick—and do travellers less harm. We wish gentlemen of Mr. Kilburn's education and position will think twice before they given vent to such language as he has thought proper to utter in conspicuous italics in the daily newspapers, language which can do no good, which adds nothing to the strength of the cause of orders but which percolating through many channels may do an immense deal of harm.

Let us not be misunderstood us a contemporary used to say. We have some personal friends among the volunteer defenders of Calcutta whom—however, we may differ from them in opinion–we could see without the slightest anxiety invested with any amount of irresponsible power. But what is there to assure us that in times when the "antagonism of races"—has produced a heartful of woes, the wildness of excited folly will not more than nutralize the efforts of thoughtful vigilance?

Calcutta may be in danger, as we don't believe it was or is. But will Mr. Kilburn say that he is better informed than the government or the town authorities? If he be so, we surrender, as the government has done, our judgment to his hands, but we have a right to ask in return that the town be not overrun with drunken European anarchy. Is he prepared to give us the guarantee?

The conduct of the 6th N.I. justifies every measure of distrust that can be manifested to wards the sepoy army. The native troops in and about Calcutta have accordingly been disarmed—to the heartfelt grief, as all must allow, of many a loyal soldier. With that act the last vestige of serious danger has passed. As far as the metropolis is concerned. As for revenge. we proclaim the call to be just. But where is the equity of

avenging the murdered and out raged of Meerut, Delhi and Allahabad in Calcutta?

We hope our remarks will be taken in good part as they are offered with the best of intentions.

The suburbs have been entrusted to the Howrah Vigilance Committee, Mr. Galliffe and 250 Police Burkundanzes. We cannot have a better proof of the insignificance of the danger threating us.

Hindoo Patriot—18 June 1857.

THE METROPOLIS AND ITS SAFETY

The dreaded 23rd day of June has passed, and it is a satisfaction to feel, as we for our part undoubtedly feel, that we are alive. Not a groan was heard, not a drop of blood in anger shed, on that day—the last to be, according to Hindoo and Mahomedan prophecy, of British dominion in Bengal, on the contrary, the streets of the city were filled in the afternoon with gay throngs clad in holiday attire to witness or to draw the car of the Hindoo deity who has always been the chief object of Moslem iconoclasm. If possible, the crowd and the merriment were greater this year then ever since. Calcutta was placed under its reformed police. To whomsoever owe this narrow escape from destruction,— whether to the all knowing Calcutta police, to Mr. Galliffe's invincibles, to Mr. Bourke's free companions, or to the Calcutta volunteers,—we tender our warmest acknowledgements, leaving these last to be appropriated.... according to their several merits.

With the native regiments disarmed and the centenary of the battle of Plassey passed, we trust our Christian fellow-subjects will allow themselves that peace of which on insufficient reasons they have so long deprived themselves. For the native portion of our fellow-townsmen we but crave that the system of terrorism under which they have been kept for the last two weeks may be mitigated to an endurable form. For two weeks, the town had been in a state of siege. Not a soul allowed to enter it from the suburbs a little after evening till daylight, not one to traverse the streets without giveing a full account of himself and his purposes. The Mahomedans have been frightened with stories of soldiers being let loose against them, and they are sending away their families to where they conceive saftey is to be found. The regular police was paralyzed by volunteer guards and extensive arrests were made on the least sustainable and sometimes unascertainable grounds.

Our remarks about the Volunteer Guards have been misunderstood. We did not indeed, see any urgent necessity for it; but we did not object to the formation of a body of militia craposed of the local residents Calcutta might have become, and possibly yet may be, the scene of an outbreak and then it were a duty unsusceptible of evasion for every inhabitant to fight in the cause of order. Combination and discipline

would do much to enhance the efficiency of these fighters and both would be secured by the enrolment of the citizens into a militia corps. All this is true, and upto this point we have no objection to take. Such things have precedents in the historises of civilized cities; and the inhabitants of Calcutta have done well to endeavour to follow those precedents. A militia regiment so raised would, if hosted judiciously, form a valuable aid to the regular troops in case of any out break But what have we had instead of a militian? Volunteer Guards. A body of private men arrogating to themselves of power above the law, the right of breaking it daily and nightly by going about with arms in hand to the terror of Her Majesty's liege subjects, and breathing fierce hatred against the native inhabitants—the majority of their fellow-citizens. It had become positively unsafe for a native, whatever be his rank or his character, to stir out in the nights after the guards sallied forth from their dinners. Carriages were stopped, persons searched, insulting epithets applied, and occasionally a shove or a stroke added to prove that the sepoys shall not conquer India. We are glad that this nuisance had, in a great measure, been abated. The Town Major has directed that the infantry of the Guard shall not patrol the streets, but remain at home; or mount piquet guards at convenient localities. The mounted volunters still patrol, but as they are generally composed of persons of character and position nothing in the shape of unnecessary violence is expected of them. So far from wishing ill to the corps, we hope it will survive the present occasion and turn into an established civic institution. With an occasional parade and drills at stated periods, it may be kept up in a state of considerable efficiency, and while its existence may prove a fact often doubted, namely, that the christian inhabitants of Calcutta have some public spirit in them, it may do the city, if not the state, much service in times of commotion and trouble.

Hindoo Patriot —25 June 1857

* *সম্ভবতঃ ১৯৭০ সাল নাগাদ 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৫৭ এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের জাতীয় চেতনাকে আজ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে তুলছে তার স্মৃতি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর গুরুত্বকে খর্ব করার জন্য, বলতে গেলে তাকে প্রায় অস্বীকার করার জন্য একটি গুরুতর প্রচেষ্টা চলেছে এবং যাদের অনেক ভাল ভাবে সব কিছু জানার কথা, এমনকি তাদেরও অনেকে এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা।

এমনকি এই শতবার্ষিকী পালন করার বিরুদ্ধেও কিছু কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কারণ, তাদের মতে, যা' ভুলে যাওয়া উচিত, এই অনুষ্ঠান তাকেই পুনর্জাগ্রত করে তোলে। মোট কথায় তাদের যুক্তি হল এই যে, ১৮৫৭-৫৮ সালের ঘটনাবলী কী ব্রিটিশ, কী ভারতীয়, কারো পক্ষেই গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক নয়—যদিও মানুষের অমানুষিকতার সাধারণ ধারণার উলটোদিক হিসেবে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে বীরত্ব ও দয়ার!—আর, এখন যখন দুই দেশ মিত্র হিসেবেই পৃথক হয়ে রয়েছে, তখন ১৮৫৭ সাল স্মরণ করার না আছে প্রয়োজন, না আছে তার কোনো অভিনন্দনযোগ্য প্রভাব।

এই ধারণা ভাঙার জন্য অতিরিক্ত যুক্তিজাল বিস্তারের প্রয়োজন নেই। ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না, যদি না আমরা ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে চাই। সঙ্গত কারণেই আমরা ১৮৫৭ সালের মহান ঘটনাবলী সম্পর্কে চক্ষু বুজে থাকতে পারি না, কারণ, আমাদের বিবর্তনের সেগুলি অংশ বিশেষ এবং এক গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। শুধু অপ্রিয় ঘটনাবলীই ১৮৫৭ সালের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, এখনও পর্যন্ত যা থেকে সম্ভাব্য সর্ব-সভ্যতাধ্বংসী যুদ্ধের শঙ্কা-কে জয় করতে পারিনি—এবং যে কোনো অবস্থাতেই যথার্থ ইতিহাস তো শুধু অতীত ত্রুটি ও অপরাধের গ্রন্থন নয়, বরং তা' হল সামাজিক ধারা উপলব্ধির নির্দেশক স্বরূপ।

আরও প্রণিধানযোগ্য ধারণা হল এই যে, ব্রিটিশরা অগত্যা যাকে 'বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছিল, ১৮৫৭ তার বেশি কিছু নয়, দেশের অধিকাংশ এবং তার অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশ এ ব্যাপারে একেবারে অ-প্রভাবিত এবং অসংস্রব ছিল, জাতীয় অনুভূতি সম্পর্কে অচেতন সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ক্ষুব্ধ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, ভারতীয় সমাজের সৎ অংশ ছিল ব্রিটিশের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আঠার শ' সাতান্ন সালে যারা ইতিহাসের রথচক্রকে পিছনে টেনে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে জুয়া খেলেছিল, তাদের কথা যদি একান্তই মনে রাখতে হয়, তবে 'তা' অনভিনন্দিত এবং অ-গীতই থাক।

ধারণাই ভুল ও বিকৃত এবং আমাদের জনসাধারণের উপর তাদের অপ্রাপ্য কলঙ্ক আরোপ। পরিসংখ্যান যেমন প্রায়শ মিথ্যা ধারণা সৃষ্টিতে সক্ষম অনুরূপ ভাবে যা' মূলতঃ মিথ্যা তাকেই জড়ো করার জন্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এমন ঐতিহাসিকের অভাব নেই, বা কোনোদিন হয়ওনি, যারা যোগ্য এবং সুবিবেচক অনুসন্ধানী হওয়া সত্ত্বেও গাছের জন্যই অরণ্যকে দেখতে পান না। অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে তারা তাদের অধীত বিষয় সম্পর্কে সামান্যতম পূর্ব-সংস্কারকেও সযত্নে বাতিল করে তারা যাকে মনে করেন "ঘটনা", তার প্রতি সাড়ম্বর আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন—এমনকি যখন ঐ সমস্ত ঘটনা বস্তুগত সত্যের সঙ্গে খাপ খায় না, তখনও। বর্তমান প্রসঙ্গে, ভেদজ্ঞান অন্তর্দৃষ্টির তুল্য এবং তা একটি গুণ বিশেষ; এবং স্বল্প তথ্যের ভারে ন্যুব্জ ঐতিহাসিকদের তা'র অভাব থাকা উচিত নয়।

১৮৫৭ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য পাওয়া যায়, তেমন তথ্য বোধ হয় ভারতীয় ইতিহাসের অন্য কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে পাওয়া সম্ভব নয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মূল্যবান পর্যালোচনা-[১]টির সঙ্গে যে গ্রন্থপঞ্জী (স্বতন্ত্রভাবে তা'ও সুখপাঠ) দিয়েছেন, তা' পূর্ণাঙ্গ বলে স্বীকৃত হবার দাবি রাখে না। সমসাময়িক কালের কোন ভারতীয় অবশ্য ভারতীয় দৃষ্টিকোণে কোনো যথার্থ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে যান নি। ডাঃ সেনের বই-র ভূমিকায় সেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ :

"উত্তর ভারতে এমন অঞ্চল খুব কমই ছিল যেখানে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলন্ত শব জনসাধারণকে সরকারের প্রতিহিংসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়নি। ১৮৫৭-র ঘটনাবলী সম্পর্কে সে সময়ে কোনও ভারতীয় স্বচ্ছন্দে কিছু বলতে বা লিখতে সাহসী হয়নি। সরকারের সমর্থক বা চাকুরে কয়েকজন ভারতীয় কিছু বিবরণী রেখে গেছেন, কিন্তু যারা স্বচ্ছন্দে, খোলাখুলিভাবে কিছু লিখতে চাইতেন তাদের কারো সে সাহস ছিল না।" (পৃঃ vii)

কে এম ম্যালেসন এবং আর সবাই নিজেদের ধারায় এই মহা-ঘটনা সম্পর্কে লিখে গেছেন এবং প্রায়শই তার স্বকীয় মূল্যও রয়েছে। কিন্তু অনিবার্য ভাবেই মূলগত সাম্রাজ্যবাদী একদেশদর্শিতা তাদের ছিল। তার ফলে ঐতিহাসিক ভারসাম্য এমনভাবে বিকৃত হয়েছিল যে, উদারনৈতিক প্রকাশকরা, যেমন এডওয়ার্ড-টমসন তার "আদার সাইড অব দি মেডাল" (১৯৩০)-এ সে ত্রুটি সংশোধন করতে চাইলেন। ১৮৫৭ ভারতবাসীদের যে হৃদয় বেদনার প্রতীক ছিল, তাতে অবশ্যই এর ঘটনাবলী ভিন্নতররূপে বর্ণিত হোক, এ' তারা চেয়েছিলেন। সুতরাং প্রথম সুন্দর, প্রায় অতীন্দ্রীয় দেশাত্মবোধের বে-পরোয়া উল্লাসে ১৯০৯ সালে ভি.ডি সাভারকর "দি ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স, ১৮৫৭" প্রকাশ করলেন লন্ডন থেকে।

যে জাত্যাভিমান সাভারকরকে তার স্বকপোলকল্পিত ধারায় ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল, সুগভীর পণ্ডিতরা তার নিন্দা করেছেন; কিন্তু তিনি লিখে ভালই করেছিলেন—অন্ততঃ আমরা যে সম্পূর্ণ রক্তশূন্য মানুষ নই, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে ১৮৫৭-র চিন্তা যখন বিমথিত করে তোলে, তখনও যে আমরা অবিচলিত থাকি না, অন্তত তা' মনে করিয়ে দেবার জন্য লিখিত হয়ে থাকলেও, তা ভাল হয়েছে। একথা সত্য বলে ঘোষণা করা যায় না যে সাভারকরের বই (এবং অনুরূপ অপর কতকগুলি বই) একটি ভাল ইতিহাস, কারণ এ'বই তা' নয়। কিন্তু ভাল ইতিহাসকে আবেগবর্জিত কিংবা কোনো দৃষ্টিভঙ্গীহীন হতে হবে অথবা যা অজ্ঞাতসারেই ভ্রান্তিকর হতে পারে তেমনি, শুধু দলিলের গ্রন্থনই যথার্থ ঘটনাকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে বলা বাড়াবাড়ি।

এর ফলে ১৯৫৭ সালে আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে। এই 'বিদ্রোহ' ১৯শ শতকের অন্য যে কোনো ঘটনার চাইতে অনেক বেশি নাড়া দিয়েছিল জনসাধারণের হৃদয়-মনকে, এবং তার সত্য কাহিনি কেবল আমরাই বলতে পারি। আমাদের জনগণের হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে সুর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, যে সুর কখনো বা অশ্রুত সুমধুরতর গভীরতর হয়ে উঠেছে সেই ঘটনার আঘাতে, সে সুর বিদেশীর কানে তেমন করে বাজতে পারে না —তা' তারা আমাদের প্রতি যতোই বন্ধুভাবাপন্ন হোন না কেন। এ 'বিদ্রোহ' টেবিলের নির্জীব তথ্য-বৈচিত্র্যের গবেষণাপ্রত্যাশী নয়; গভীর অধ্যয়ন এবং সংজ্ঞানই এই 'বিদ্রোহ' দাবি করবে, যে সংজ্ঞান আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব, সহযাত্রীর মনোভাবের (যা'র আর প্রয়োজন নেই) মেঘমুক্ত হবে।

২

চিনে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার প্রায় পিছনে পিছনে যে বক্সার বিদ্রোহ (১৯০০) হয়েছিল, কিংবা তারও পূর্বে যে তাই পিং বিদ্রোহে (১৮৬৪) পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে চিনের বিক্ষোভ অধিকতর সংহতরূপ প্রকাশ লাভ করেছিল, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ প্রায় তারই মতো, কিন্তু অনেক ব্যাপকতর পর্যায়ে, ছিল একটি অতি বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য ভারতের শেষ মরিয়া লড়াই। এই বিদ্রোহে ভারতের যত বিভিন্নমুখী শক্তির একত্র সমাবেশ হয়েছিল, আর কোনো বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে তেমন হয়নি। ব্রিটিশ শক্তির নিজেকে সংহত করার আগে এ' ঐক্য প্রচণ্ড অত্যাচারের সাহায্যে দমন করতে হয়েছিল। এ অভ্যুত্থান শুধু ব্রিটিশের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা ভারতের যে সমস্ত নূতন ব্যবস্থার আমদানি করছিল, সামগ্রিকভাবে এ' অভ্যুত্থান ছিল তারই বিরুদ্ধে। বাইরে থেকে একে একটি সামরিক এবং বহুলাংশে মুসলিম বিদ্রোহ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ' ছিল তার চাইতে অনেক বেশি কিছু।

ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ ছিল প্রথম যথার্থ ব্যাপক ও জনপ্রিয় বিক্ষোভ, ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রথম স্থূল কিন্তু অর্থবহ বহিঃপ্রকাশ। সাভারকর-এর বই-এর নামটাকেই তুচ্ছ করা কিংবা "বিদ্রোহ"কে "সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া"-র চাইতে সামান্যই অতিরিক্ত বলে উড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল ঐতিহাসিক অপযুক্তি।

১৭৫৭ সালে স্মৃতি-তিক্ত পলাশীর প্রান্তরে ভারতীয় অর্থগৃধ্নুতা ও ব্রিটিশ শাঠ্য মিলিত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতের যথার্থ শাসক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তারপরে এক শতাব্দী কেটেছে চরম নৈরাশ্যে; এই সময় বোধ হয় ভারতের ইতিহাসের তীব্রতর হৃদয়হীন শোষণের লাঞ্ছনা সহ্য করেছে ভারতবর্ষ। "তাঁদের যে পুরনো পৃথিবী হারিয়ে গেল, কিন্তু যার বদলে নতুন কিছু তারা লাভ করলেন না," কার্ল মার্কস তাঁর সুবিখ্যাত পত্রাবলীর একটিতে (১০ই জুন, ১৮৫৩) লিখলেন, "হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশায় তা' এক অদ্ভুত বিষাদের সৃষ্টি করল এবং ব্রিটেন শাসিত হিন্দুস্থানকে তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিল।"

মুষ্টিমেয় মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া, আমাদের জনসাধারণের ব্যাপক অংশ কখনও পরাধীনতায় প্রকৃত তুষ্টি লাভ করেননি, কখনও ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত

হয়ে ওঠেননি, কিংবা শাসকদের গুণাবলীর সমকক্ষ হওয়ার জন্য এমন নিরাবেগ ঔদার্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেননি যাতে স্বাধীনতার লক্ষ্যই তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে উপরতলার দশজন যখন বিজয়ীদের সঙ্গে কদম মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত শেষোক্তদের পারিতোষিকে মুগ্ধ হয়ে পরাধীনতার দংশন জ্বালা ভুলে গেলেন, তখনও, সাধারণ মানুষ কিন্তু একবারও অধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারেননি এবং সংগ্রামে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

ভারতকে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করাতে দরকার হয়েছিল দীর্ঘ একশ বছর ব্যাপী সামরিক অভিযানের। বাংলাদেশে, উত্তর ভারতের সমতলভূমিতে, পঞ্জাবে, কর্ণাটকে ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে একাধিক রক্তক্ষয়ী, বর্বর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-এর জন্য লড়তে হয়েছে।

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এমন একটা সময় যায়নি যখন ভারতের কোনও না কোনও অঞ্চল দৃঢ়ভাবে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিল না। সরাসরি যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়লাভ করেনি। কিন্তু তারা জয়ী হয়েছে প্রচারে। মোগল শক্তির পতন ভারতে এমন এক নৈরাজ্যের ও নীতিভ্রষ্টতায় ঠেলে দিয়েছিল যে, নবজাগ্রত বুর্জোয়া-র শক্তি ও দক্ষতার প্রতিভূ ব্রিটিশরা অপরিহার্যরূপেই শীর্ষে স্থান গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু আসল কথা হল, আমাদের জনসাধারণ কখনও জড়বৎ আত্মসমর্পণ করেননি। সরকারি ইতিহাসের ফেরিওয়ালাদের ভাষায় ডাকাতরাই (যেমন, চিনের "দস্যু") হোক, বা ঠগ ও পিণ্ডারীরাই হোক, যাদের মধ্যে পেশাদারী লুণ্ঠনকারীদের চাইতে ভূমি-চ্যুত কৃষক ছিল বেশি এবং টিপু সুলতান ও মারাঠা দমনে যে সৈন্য প্রয়োজন হয়েছিল, তার চাইতে অনেক বেশি সৈন্য লেগেছিল যাদের দমন করতে, কিংবা ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাষায় "ভারতের সব চাইতে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম মানুষ" বলে বর্ণিত এবং যাদের ঘিরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যবন ভীতির উপন্যাস ও স্বাদেশিকতার মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' রচনা করেছিলেন, সেই সন্ন্যাসীরাই হোক অথবা ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার যাদের সম্পর্কে বলেছেন, "বিশ্বাসের ক্ষেত্রে... চূড়ান্ত-ভিন্নমতাবলম্বী কিন্তু রাজনীতিতে কমিউনিস্ট ও রেড রিপাবলিকান" সেই ওয়াহাবি বা ফরাজিরাই হোক—যাদের কোনও কোনও নেতার ৮০, ০০০ অনুচর পর্যন্ত ছিল এবং যা যে চোনও ভূ-স্বামী সম্প্রদায়কে সরোষ অস্বস্তিতে ফেলতে পারত; কিম্বা সাহারানপুর, দাক্ষিণাত্য, মালাবার ও মহীশূরের নিকটবর্তী স্থান সমূহ এবং অন্যত্র শত শত স্থানে যে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তারা, অথবা আমাদের দেশের সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আদিবাসীরাই হোক, তারা সকলে যে কোনো উপায়ে সম্ভব এই বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলতে যা বোঝায়, এই সমস্ত সংগ্রাম সম্পূর্ণত তা না হলেও এ ছিল তারই সূচনা।

মোগল রাজশক্তি এবং প্রায়শ অদৃশ্য এই বিরাট বিস্ময়কর অভ্যুত্থানের পরিণতি ঐ বিদ্রোহ ছিল প্রতিভূস্বরূপ। তাই, খুব অস্পষ্ট অথচ প্ররোচনাকর ভবিষ্যৎবাণীতে এই ইঙ্গিত করা হল যে, পলাশীর একশ বছর পরে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটবে। '৫৭ সাল আসার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক ভারতবর্ষ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল একটি অশুভ লক্ষণের প্রত্যাশায় আর সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে সকলের অজ্ঞাতে কখন যেন চাপাটির আজও অব্যাখ্যাত রহস্যাবৃত-ইঙ্গিত দেখা দিল—এবং সারা ভারতে তা ছড়িয়ে পড়ল। ইতিহাস পরম্পরায় এই চাপাটি বিতরণ ছিল আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত এবং যে পদ্ধতিতে এই বিতরণ হয়েছিল,

তা একটি অজ্ঞাত অথচ নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সংগঠিত ব্যবস্থাকেই সূচিত করে। এর গুরুত্ব সম্বন্ধে সাম্প্রতিক গবেষণা অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করেছে; কিন্তু সমসাময়িককালে এই ঘটনা নিশ্চিয়ই কোনো প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মন্ত্রমুখরতার সঙ্কেতবাহী ছিল।

একথা নিশ্চিত যে, পলাশীর শতবার্ষিকী ছিল বহু প্রতীক্ষিত। মেটকাফ ১৮২৪ সালে লিখলেন, ''সারা ভারতবর্ষ সর্বক্ষণ আমাদের পতনের প্রতীক্ষায় আছে। জনসাধারণ আমাদের বিনাশে সর্বত্র আনন্দ করত, অথবা, উৎসব করার কল্পনা করত।'' পূর্বে আর একটি রাষ্ট্রীয় দলিলে (১৮১৪) তিনি বলেছিলেন, ''ভারতে আমাদের অবস্থা সবসময়েই সঙ্গীন ... একটি মাত্র ঘূর্ণিবাত্যায় এখন ভেসে যেতে পারি। এখানে আমাদের কোনও শিকড় নেই।'' মারাঠা ও পিণ্ডারীদের উপর পূর্ণ জয়লাভের পর ১৮২০ সালে তিনি সখেদে প্রশ্ন তুললেন : ''আমরা কি কোনও দিনই দেশীয় জনসাধারণকে আমাদের সরকারের অনুরক্ত করে তুলতে সমর্থ হব? এবং উপরের স্তরের স্বার্থকে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে কি তা করা যায়? তাদের এবং আমাদের স্বার্থকে এক করা কি কোনও ক্রমেই সম্ভব? আমার কাছে যদি এই সমস্ত প্রশ্ন রাখা হয়, তার জবাবে তবে আমি বলব, না।'' ১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরো বিশেষ করে মুসলিমদের সম্পর্কে লন্ডনকে সতর্ক করে বললেন, ''ঐ জাত হল মূলগতভাবে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং আমাদের যথার্থ নীতি হল হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপন করা।'' এখানেই বিভেদ ও শাসনের বীজ নিহিত রয়েছে কিন্তু বহুপরবর্তী কালে ছাড়া এ নীতি কার্যকরী হয়নি, কারণ ১৮৫৭ সম্পর্কে স্যর জেমস্ আউটরাম কি বলেন নি যে, তা ছিল ''হিন্দুদের বিক্ষোভের ভিত্তিতে একটি মুসলমানী ষড়যন্ত্র?''

ভারতের অস্থৈর্য সম্পর্কে ব্রিটিশ ভীতির পরিচয় পাওয়া যাবে ডালহৌসির কাছে ঠগ-বিজয়ী শ্লীম্যানের সতর্কবাণী থেকে : ''অযোধ্যা অধিকারের জন্য অমন দশটা রাজ্যের সমান ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ব্রিটিশ শক্তিকে এবং অনিবার্যভাবে তা পরিণতি লাভ করবে সিপাহি বিদ্রোহে।

এর এক পুরুষ আগে টমাস মনরো-র দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল : ''জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে পড়ার বহু আগেই তা সেনাবাহিনীর মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে।'' এবং অনুরূপ ভাবে মেটকাফ আরও স্পষ্ট করে বললেন : ''আমি আশা করছি, হঠাৎ এক সকালে জেগে উঠে দেখবো ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে গেছে।'' ভারত অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালে ক্যানিং, অকারণে একথা চিন্তা করেন নি : ''ভারতের নির্মল আকাশে এক খণ্ড ছোট মেঘ দেখা দিতে পারে—যা হয়তো একটি মানুষের হাতের চাইতে বড় নয়—কিন্তু যা ক্রমশ বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে।'' তাঁর এ'কথা বলার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মেঘ দেখা দিল এবং ফেটে পড়ল।

১৮৫৭-র আগে কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে একাধিক বিদ্রোহ হয়েছে—মহা-বিস্ফোরণের তেরো বছর আগে চারটি এবং তারও অনেক আগে ১৭৬৪ সালে একবার বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছে। তাতে, কোম্পানির বিধানে বিদ্রোহের জন্য ''স্বাভাবিক'' দণ্ড দেওয়া হয়েছিল তেরোজন সিপাহিকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে। ১৮৫৭-র ঘটনা

অবশ্য তা থেকে ভিন্নতর—তা ছিল সেনাবাহিনী ও অন্যত্র গণবিক্ষোভের সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ। দু' একজন সিপাহিদের বলেছেন "য়ুনিফর্ম পরিহিত কৃষক"। কিন্তু তারা যখন জেগে উঠলেন, সারা দেশও ব্যাপকভাবে জেগে উঠল। তাদের শক্তির উৎসই ছিল সেখানে কিন্তু তাদের ছিল "সুষ্ঠু পূর্ব-পরিকল্পনা" ও সুসংগঠিত প্রস্তুতির অভাব; আর সেখানেই তাদের দুর্বলতা নিহিত ছিল। আউটরাম তার অভিমত লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, "বিদ্রোহকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার আগে এবং গণ-বিপ্লবের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিদ্রোহকে ব্যবহার করার যথাযথ ব্যবস্থা করার আগেই" চর্বি মাখানো কার্তুজের ব্যাপারটি অবলম্বন করে সহসা বিদ্রোহ ঘটে গেল। পি, ই, রবার্টস সাধারণত সংযমশীল পণ্ডিত বলে স্বীকৃত। তার মতে বিদ্রোহীরা "এইভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তমিত গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং মারাঠা পোশোয়া-র শক্তিকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল; কিন্তু তা পূর্ব-প্রস্তুতির অভাবে এবং মৃত অতীতকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।"

কিন্তু একটা ঘটনা খুব পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক কারণই সৈন্যদের এই বিদ্রোহকে উত্তর ও মধ্য ভারতের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। উত্তর ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে বারাণসী ও তার আশেপাশের অঞ্চলের কৃষকদের সুদূরপ্রসারী বিক্ষোভ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল।

১৮৫৮ সালের প্রথমার্ধ প্রায় শেষ হওয়ার আগে মধ্য ভারতের চূড়ান্ত অভিযান না করা পর্যন্ত ব্রিটেন এই অভ্যুত্থানের মেরুদণ্ডটি ভেঙে দিতে পারেনি। একমাত্র তখনই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু প্যাট্রিয়টে (জুন, ১৮৫৮) "বর্তমানে অবদমিত ভারতের মহাবিপ্লব" সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল (বড় হরফ আমার)।

কিন্তু এ জয়ের জন্য সামান্য মূল্য দিতে হয়নি! ক্যানিং এক সময়ে লিখলেন, "সিন্ধিয়া যদি বিদ্রোহে যোগদান করেন, তবে আগামী কালই আমাকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।" ব্রিটেনের ভারতীয় সাহায্যকারীদের প্রায় সকলেই এসেছিল স্বার্থন্বেষী অভিজাত শ্রেণি ও তাহাদের অনুচরদের মধ্য থেকে। তারা ছাড়াও এই বিদ্রোহ ধ্বংস করার জন্য সৈন্যবাহিনী এল ইংল্যান্ড থেকে, পারস্য থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে। স্বভাবতই এই সংগঠিত শক্তি ফলপ্রসূ হল এবং ভারতের বুকে গুরুভার সামন্ততন্ত্রের অভিশাপ বিদেশীদের জয়ের পথ সুগম করল।

বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ শক্তিকে যথার্থ শঙ্কিত করে তুলেছিল। সেই সময়ে বিদ্রোহীদের অধিকারে ছিল ১,০০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা—যেখানে ছিল ৩ কোটি ৮ লক্ষ মানুষের বাস।

১৮৫৭ সালের ২৫ আগস্ট সম্রাট বাহাদুর শাহ যখন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তার সনদ ঘোষণা করলেন, সেইদিন বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায় ভারতবর্ষ দেখেছিল। বাহাদুর শাহের এই ঘোষণা সম্পর্কে হিন্দু প্যাট্রিয়ট মন্তব্য করেছিল, "এটি হল একটি এশীয় রাষ্ট্রীয় সনদ হিসাবে অত্যন্ত উচ্চস্তরের গুণসম্পন্ন।" হিন্দু প্যাট্রিয়ট আরও লিখেছিল, "সারা দেশ এর ফলে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং একটি বিপ্লবের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল।" বাহাদুর শাহের ঘোষণা-র আবেদন জনসাধারণের সর্বস্তরে সাড়া জাগিয়েছিল এবং

শরিয়ত ও শাস্ত্র আবাহন করার সঙ্গে সঙ্গে "রাজনৈতিক বিক্ষোভকেও" রূপদান করেছিল। বাহাদুর শাহের ভূমিকা, এমনকি ঝাঁসির রানির ভূমিকাকেও খর্ব করার জন্য কিছু আপাতযৌক্তিক গবেষণায় যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে অবশ্যই তাদের গুরুত্ব খর্ব হয় না। একথা কিন্তু কেউ-ই বলেন নি যে, বাহাদুর শাহ, বা ঝাঁসির রানি নিজেদের উদ্যোগে পূর্বপরিকল্পিতভাবে, "সিপাহিদের" সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্রোহকে সংগঠিত করেছিলেন তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তা যদি হত তবে ইংলন্ড জয়লাভ করতে পারত না। যদিও তারা ব্রিটিশ ক্রূরতায় নিয়ত হতমান হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের ছিল নিজস্ব ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তা এবং আশা—এবং স্বকীয়ভাবে সে দুশ্চিন্তা ও আশা তাদের বিদ্রোহীদের মান উন্নত করতে এগিয়ে দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার গতি তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরদেশীদের প্রতি তাদের জাতীয় বিদ্বেষ থাকায় তারা মনস্থির করতে দেরী করেন নি। আর, একবার মনস্থির করার পর, দুর্বল জরাগ্রস্ত বাহাদুর শাহ খামখেয়ালীভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু ঝাঁসির রানি সম্পূর্ণ অটল ছিলেন। তাই, খুব সঙ্গতভাবেই ভারতের স্মৃতিতে তারা ভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

সমস্ত মহাঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে থাকে, ভারতের ১৮৫৭-৫৮ সালের অভ্যুত্থানের ভাল ও মন্দ মানুষ এসে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু কোনও অবস্থায়ই যারা যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন—যেমন অনেকের মধ্যে মাত্র দুজনার নামই উল্লেখ করা যাক : আহমদুল্লাহ ও তাঁতিয়া তোপী—তাঁদের কোনও দিন এই মানুষরা পরিত্যাগ করেননি। ব্রিটিশরা এই আন্দোলন অথবা মানুষ কোনটিকেই অবহেলা করেনি, তারা ঘটনাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল এবং সম্রাটের প্রতি দুর্ব্যবহারের পথ তারা নিপুণভাবে প্রস্তুত করল। আর কিছু নয়, শুধু রাজনৈতিক কারণেই তারা সম্রাটের দুই পুত্র এবং পৌত্রকে গুলি করে হত্যা করল ও মুঘলদের অপর এক বংশধর ফিরোজ শাহকে খুঁজে বার করে হত্যা করল। এ সমস্ত কিছুই ঘটত না যদি ব্রিটিশরা শুধু বিদ্রোহীদেরই দমন করতে চাইত। বাহাদুর শাহ বস্তুত ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন না, বিদ্রোহীরাই তাকে মাত্র কিছুকালের জন্য তাদের আওতায় রেখে দিয়েছিল।

জনৈক প্রখ্যাত পণ্ডিত ক্ষেত্রবিদ্যার বিকৃত অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হয়ে "বিদ্রোহের" সর্বভারতীয় চরিত্র অস্বীকার করেছেন। তার যুক্তি হল এই যে, এই ঘটনায় দেশের এক চতুর্থাংশের বেশি অঞ্চল জড়িত ছিল না এবং জনসংখ্যার সামান্য অংশই এতে সামিল হয়েছে। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এই ধরনের পরিমাপ প্রায়শই অপ্রাসঙ্গিক। সুরেন্দ্রনাথ সেনের সুগভীর প্রশান্ত গবেষণায় আমরা জেনেছি যে যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র মোটামুটি পশ্চিম বিহার থেকে পঞ্জাবের পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু বাংলা, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও আদৌ "অশান্ত অবস্থা" বিহীন ছিল না।

শ্রীযুক্ত সেন-এর উদ্ধৃতি আরও কিছুটা দেওয়া দরকার :

"পৃথিবীর কোথাও বিদ্রোহের প্রতি সার্বজনীন সমর্থন পাওয়া যায়নি। আমেরিকা যুক্তরাষ্টে সরকারের অনুগত (লয়ালিস্ট)-দের একটি শক্তিশালী দল ছিল... ফরাসি বিপ্লবের সময়ে রাজতন্ত্রবাদীদের অভাব হয়নি। '১৫ ও '৪৫ সালে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে স্টুয়ার্টের পক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট লোক ছিল। যখন বেশ বড় একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ

কোনো আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে, তখনই সেই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন বলে দাবি করা যেতে পারে। তাতে হয়তো সার্বজনীন সক্রিয় সমর্থন থাকে না, তবু তা সার্বজনীন আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হয়। ...মীরটের বিদ্রোহীরা যখন তাদের দিল্লির শাহের অধীন বলে ঘোষণা করলেন এবং ভূস্বামীদের একাংশ এবং নগরবাসীরা শাহর সপক্ষে বলে নিজেদের ঘোষণা করলেন, তখনই এই বিদ্রোহ বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করল। ধর্মের জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তা পর্যবসিত হল স্বাধীনতার যুদ্ধে।"

কিন্তু শ্রীযুক্ত সেন সামগ্রিক ছবিটি দেখতে পাননি। যদিও মনে হয় যে, তিনি এ সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল। ক্যানিং স্বয়ং যেমন তার সরকারি বিবরণে অযোধ্যার সংগ্রামকে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় অভ্যুত্থান বলে বর্ণনা করেছিলেন, শ্রীযুক্ত সেনও অযোধ্যা সম্পর্কে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং একথা যোগ করতেও দ্বিধা করেননি যে, জনসাধারণের প্রত্যেক অংশ থেকেই মানুষ বিদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে যোগদান করেছিল, এমনকি কয়েকজন ইংরেজ ও অজ্ঞাত পরিচয় বিদেশী পর্যন্ত ছিলেন। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন পার্শীরা। তারা অবশ্য জনসাধারণের খুবই সামান্য অংশ এবং বিদ্রোহের অকুস্থান থেকে বহু দূরে বাস করতেন। তিনি লিখেছেন, "বিদ্রোহের প্রত্যেক স্তরে বিদ্রোহীদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানরা যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন।" মৌলনা আজাদ বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বোধ ছিল অভ্যুত্থানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং "ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা বলে কিছু ছিল না।"

ডাঃ সেন বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, বাংলা ছিল "একটি অবিঘ্নিত প্রদেশ"—যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে, সেখানে, এমনকি মাদ্রাজ পর্যন্ত একটি অক্ষম অসন্তোষের ভাব ছিল এবং ব্রিটিশদের পরাজয়ের প্রত্যেকটি সংবাদেই সেখানকার মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠত।" কিন্তু যাই হোক, বাংলাদেশকে "অবিঘ্নিত" প্রদেশ বলা যায় না; এবং ১৮৫৭ সালের পর থেকে শিক্ষিত শ্রেণি যদিও ব্রিটিশ শাসনের গুণকীর্তন করে এসেছেন, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনতাকে স্বাগত করেছিলেন মনে করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। **বস্তুত, ১৮৫৭-৫৮ সাল-এর অবস্থা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বিপ্লবের পক্ষে অপরিণত ছিল।** ভারতের বুর্জোয়া শক্তির তখন অস্ফুট শৈশব কাল এবং ব্রিটেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতির সাহায্যে ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ফলে ভূস্বামীদের সপক্ষে পেয়েছিল এবং তাদের মধ্য থেকেই এল এবং পরিপুষ্ট হল নূতন বিদ্বৎ সমাজ। শেষে তারা নিঃসন্দেহে ১৮৫৭ সালের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যেহেতু নির্বিচার দমন অভিযানই ছিল তখনকার শাসনের অবস্থা, তাই তারা সাধারণভাবে বীরত্ব প্রদর্শনে বিরত রইলেন। শিক্ষিত ভারতীয়দের গভীর শ্রদ্ধাভাজন রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি দেখেছিলেন, বাংলাদেশে "লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে বিক্ষোভ প্রচ্ছন্ন রয়েছে" এবং সেই সঙ্গে একথাও নিঃসন্দেহ যে অনেকে আমাদের শাসনের প্রতি যথেষ্ট অনুগতও বটে। কিন্তু তাকে যদি আমাদের শাসনের প্রতি অনুরক্তি বলে ধরা হয় তবে খুব ভুল করা হবে।"

মীরটে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার কয়েক মাস আগেই বাংলাদেশের মাটিতেই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। এমনকি বাংলাদেশের মধ্যেই বারাকপুরে সংগ্রামের প্রথম শহিদ মঙ্গল পাণ্ডের আত্মোৎসর্গেরও আগে বহরমপুরে, ২৬ ফেব্রুয়ারি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রথম বিপুল আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। বিজিত নবাবদের বাসস্থান মুর্শিদাবাদ খুব কাছেই ছিল এবং 'কে' লিখলেন, "সে শহরে এমন সহস্র সহস্র মানুষ ছিল যারা একটি মানুষের ইঙ্গিতেই মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াত, সে মানুষটি নিজে যদিও দুর্বল, কিন্তু এক বিরাট নামের মহিমায় সে ছিল প্রচণ্ড শক্তিধর।" কে আরও বলেছেন : "সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠতে পারত।"—কিন্তু নবাব মনসুর আলী খাঁ শঙ্কিতভাবে কাপুরুষের মতো বসে রইলেন এবং সুযোগের মুহূর্ত অলক্ষে চলে গেল। তারপরে, ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে, মঙ্গল পাণ্ডে শুধু বারাকপুর সেনানিবাস-ই নয়, সারা প্রদেশকে আলোড়িত করে তুলেছিলেন। কলকাতায় যে ইংরেজ এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা প্রবল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, নিশ্চয়ই তা মনগড়া কারণে নয়।

১৮৫৭ সালের ২১ মার্চ নির্ভীক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর হিন্দু প্যাট্রিয়টে লিখেছিলেন :

"গত কয়েক সপ্তাহের বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে দেখা গিয়েছে, ভারতীয় প্রজাদের হৃদয়ে ব্রিটিশ-রাজের স্থান কী অকিঞ্চিৎকর!... এ এখন আর বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব।...

"বাংলার সৈন্যবাহিনীর সাম্প্রতিক বিদ্রোহের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা প্রথম থেকেই দেশের সহানুভূতি লাভ করেছে...ভারতে এমন একজনও ভারতীয় নেই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্বই কী প্রচণ্ড বিক্ষোভের বোঝা তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে, তা' অনুভব না করে। এ' বিক্ষোভ বিদেশি শাসনের অধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।"

এই উদ্ধৃতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এ' কথা লেখা হয়েছে এমন একটি কাগজে, যা কঠোর সংবাদপত্র আইনের সীমানায় আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছিল (হিন্দু ইন্টেলিজেন্স প্রমুখ সন্ত্রস্ত পত্রিকা উঠে গিয়েছিল) এবং একথাও বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, "ব্রিটিশদের কোনও মহা সর্বনাশ হলে তা' জাতির বিকাশকেই প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত করবে।" স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কাগজ প্রকাশ করতে হ'লে ব্রিটিশের স্বার্থের প্রতি সমর্থন জানানো ছিল বাধ্যকর। কিন্তু এর ঘটনা বিশ্লেষণের ধারা থেকেই বাংলদেশের মানসিক অবস্থাটা বোঝা যায়। একজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট ১৮৫৭ সালের ঘটনাবহুল দিন গুলিতে বাংলাদেশে এমন একটি জেলাও খুঁজে পাননি, যেখানে শাসন ব্যবস্থা সরাসরি বিপন্ন হয়ে পড়েনি কিংবা যেখানে তা' গভীরভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়নি।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম অথবা বর্ধমান—যেখানেই হোক না কেন, শ্বেতাঙ্গ এবং অফিসারদের মধ্যে প্রচণ্ড ত্রাস সে সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

জেলা গেজেটিয়ারসমূহ এবং "দি ইংলিশম্যান" প্রভৃতি কাগজের মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ধমানের মহারাজা তার একাধিক সমগোত্রীয়ের মতো ইংরেজদের যদি বিপুলভাবে সাহায্য না করতেন (যেমন তিনি ১৮৫৫ সালে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে

সাহায্য করেছিলেন) বাংলাদেশের অবস্থা তাহলে হয়ত সম্পূর্ণ অন্য রকম হত।

প্রকৃতপক্ষে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটেনের আঁতাতই ১৮৫৭-৫৮ সালে ব্রিটিশ শক্তিকে রক্ষা করেছিল। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতের তৎকালীন বড়লাট বেন্টিঙ্ক গভীর পূর্ব-দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন :

"ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের বিরুদ্ধে যদি নিরাপত্তার প্রয়োজন থাকে, তবে আমি বলব যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে...এই বিরাট সুবিধা রয়েছে। এর ফলে ধনী ভূস্বামীদের একটা মস্ত শ্রেণি গড়ে উঠবে, ব্যাপক জনসাধারণের উপর যাদের সম্পূর্ণ কব্জা থাকবে এবং সেই সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখায় যাদের গভীর স্বার্থও জড়িত থাকবে।"

অযোধ্যা ও বিহারের কিছু কিছু অঞ্চলের দু'একজন জমিদার (উদাহরণস্বরূপ কুনোয়ার সিং ও অমর সিং-এর বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে) বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে জড়িত করেছিলেন বটে, কিন্তু তার তুলনায় বহুগুণ বেশি জমিদার ও তাদেরই বৃহত্তর সংস্করণ দেশীয় নৃপতিরা ব্রিটিশদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়েছিলেন। তা যদি না হত, তবে পাঞ্জাবেও বিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠত, এবং ব্রিটিশ উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হত। আর তা হলে, দক্ষিণ ভারতও বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের শেষ আঘাত হানত।

ক্যানিং একথা স্বীকার করতে দ্বিধ. করেননি যে, "দেশীয় সরকারের এই সমস্ত ছোট ছোট অঞ্চল (যেমন, রেওয়া, চিরকরী, রামপুর, পাতিয়ালা, কাশ্মীর প্রভৃতি) ঝড়ের মুখে খাড়ী-র কাজ করেছে। এ' না থাকলে ঝড়ের একটি তরঙ্গেই আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত।" কাশ্মীরের মহারাজ গুলাব সিং ও তার বংশধর যে সাহায্য ব্রিটিশদের করেছিল, তার গুণকীর্তন করে লরেন্স লিখেছেন : "একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ১৮৫৭ সালে পঞ্জাবে **আমাদের অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণ মহারাজার দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল।** ...মহারাজা যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, তবে তার ক্ষমতা, তার সম্মান, তার অভিজ্ঞতা আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারত। তার হাতে যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছিল তার কথা না হয় বাদই দিলাম" (বড় হরফ আমার)।

খুব স্বাভাবিক কারণেই ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস লিখলেন, "বর্তমান ঘৃণ্য ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি এবং ভারতের অগ্রগতির পথে সব চাইতে বড় বাধা হল দেশীয় নৃপতিরা।

এই সমস্ত কিছু যখন আমরা স্মরণ করব, তখন **একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে, সঠিক অর্থে গৃহীত জাতীয়তাবাদ যদিও তখন জনমানসে দানা বাঁধেনি, তবু, তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যতটা সম্ভব, এই "বিদ্রোহ" ছিল অধীনতার বিরুদ্ধে প্রায় একটি জাতীয় বিপ্লব। হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের শৃঙ্খল মোচনের জন্য এক প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।** তাই তার পরে দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে ইংরেজদের নবসংস্কার সম্পর্কে ভারতবাসীর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করার প্রবল প্রচার সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের স্মৃতি আমাদের জনসাধারণের কাছে আজও সজীব হয়ে রয়েছে।

সংগ্রামের সময়ে কোনও পক্ষই আশ্রয় চায় নি, দেয়ও নি। অত্যাচারের আতিশয্য দু'পক্ষ থেকেই ঘটেছে। তাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই। সুরেন্দ্রনাথ সেন খুব সুন্দরভাবে এ সম্পর্কে বলেছেন যে, ইতিহাসের দায়িত্ব হল, "যুদ্ধ কীভাবে মানব চরিত্রকে কলুষিত করে তোলে, আমাদের সভ্যতার আবরণ কত অকিঞ্চিৎকর, কত সহজে

মানবমনের সুপ্তক্রোধ জ্বলে ওঠে, হিন্দু, মুসলমান আর খ্রিস্টান সবাই কেমন একই ভাবে আদিম বর্বরতার স্তরে ফিরে যায়, তারই বিবরণী নথিবদ্ধ করা। তা ছাড়াও আমাদের মনে রাখা দরকার, বিদ্রোহীদের "অত্যাচারের" চাইতে বহুগুণে বেশি ছিল 'সাম্রাজ্যবাদীদের' প্রতিশোধমূলক অত্যাচারের আতিশয্য। ১৮৫৮ সালের ৬ মে তারিখের "হিন্দু প্যাট্রিয়টে" অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সে কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি, ১৮৫৭ সালের পরে এরই ফলে ভারতবাসীর হৃদয়ে যে শলাকাবিদ্ধ হল তার যন্ত্রণা এবং পরাধীনতার তীব্রতর বেদনা প্রায়শ অনুভূত হয়েছে। সে যন্ত্রণা যদি তারা অসহায়ভাবেও ভোগ করে থাকেন, তবু তা অনেক তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসতত্ত্বের একদেশদর্শিতা বর্তমান ক্ষেত্রের মতো আর কোথাও এমন সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতেই হবে যে, তার স্বদেশবাসীদের বর্বর উন্মত্ততা তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। ১৮৫৭-র সেপ্টেম্বর তিনি মহারানি ভিক্টোরিয়ার কাছে লিখেছিলেন, "একটা প্রচণ্ড নির্বিচার প্রতিহিংসার মনোভাব বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে।... প্রতি দশজনে এমন একটি লোককেও পাওয়া যাবে না যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মানুষকে গুলি করে বা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করাকে অত্যন্ত সঠিক এবং সম্ভব বলে মনে না করে।" একবার যখন তার বিরুদ্ধে তীব্র ও প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছিল, সেই সময়ে তিনি বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নরকে কয়েকটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নথিপত্র দেখিয়েছিলেন বর্বরতার প্রমাণস্বরূপ। সে সমস্ত যখন জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি উঠল, তখন তিনি নাকি বলেছিলেন, "না আমি বরং নিন্দিত হতে রাজী আছি। কিন্তু বিশ্বের দরবারে তা প্রকাশ করলে আমার স্বদেশবাসীর উপর যে কলঙ্ক লেপন করা হবে, তা'কে সহ্য করতে প্রস্তুত নই।"

এ কলঙ্ক অবশ্য রুশীয় শিল্পী ভেশ্চাগিনসহ সকলের কাছেই স্বপ্রকাশ ছিল। শিল্পী ভেশ্চাগিন "ভারতে ইংরেজদের মৃত্যুদণ্ডদান পদ্ধতি" সম্পর্কে বিখ্যাত ছবিটি এঁকেছিলেন এবং বলেছিলেন, ইংরেজদের দম্ভ এবং ইংরেজরা তাদের সহজীবীদের সঙ্গে যে প্রবল অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করে, তা একজন রুশীয়ের কাছে ভয়ঙ্কর মনে হবে। তারা তাদের সহজীবীদের যেন মনে করে পায়ে তলার ধূলির সমান। এ সমস্তই "বিদ্রোহের" ইতিহাসগুলি থেকে সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্রিটেনের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে কানপুর হত্যাকাণ্ডের কথা পড়ে (নেল-এর "প্রতিশোধ"-এর কাহিনি কিন্তু নয়) এবং প্রাচ্যের জনসাধারণের চরিত্র-বৈগুণ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে শিক্ষা পায়।

চিতাবাঘ যেমন তার গায়ের ফোঁটাগুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী দীর্ঘকালে সাম্রাজ্যবাদও ভারতে অনুরূপ ব্যবহার চালিয়ে যেতে ত্রুটি করেনি।

১৯১৯ সালের হত্যাকাণ্ডের সময়ে পঞ্জাবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্বদেশে অভিনন্দিত ও' ডায়ার ছাড়াও হত্যাকাণ্ডের যিনি প্রধান নায়ক, যাকে সরকারি হান্টার কমিশনও তথাকথিত বিচারে দোষমুক্ত করতে সমর্থ হয়নি, সেই ডায়ারের জন্য ভাবতে এবং ইংলন্ডে ইংরেজরা জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা তুলেছিল এবং হাউস অফ লর্ডস তার এই ঘৃণ্য অপরাধের জন্য বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছিল। আবার ১৯২১ সালের নভেম্বরে, জনৈক ইংরেজ অফিসারের তত্ত্বাবধানে একশজন মোপলা রাজবন্দিকে

কালিকট থেকে মাদ্রাজ নিয়ে যাওয়ার জন্য বোঝাই করা হয়েছিল একটি ওয়াগনে। একটি জংশন স্টেশনে যখন দরজা খোলা হল দেখা গেল ছেষট্টিজন মারা গেছেন তৃষ্ণায় আর শ্বাসকষ্টে। তথাকথিত ১৭৫৬ সালের "কলিকাতা অন্ধকূপ হত্যার" (যার সত্যতা সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিক জ. এফ. ডটেন-সহ অন্যান্য ইতিহাসবিদ অত্যন্ত দৃঢ় সাক্ষ্যের জোরেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন) এ ছিল অনেক জঘন্যতর কাজ, কিন্তু তাতে, যে অফিসারের হৃদয়হীন ঔদাসীন্যের ফলে অতগুলি ভারতীয়ের প্রাণহানি ঘটেছিল, সেই অফিসারটির পক্ষ সমর্থনের জন্য ভারতের ইংরেজদের টাকা তোলায় বাধা হয়নি।

৪

একটা বিষয় নিয়ে এমনকি "প্রগতিশীল" বলে বিদিত মহলেও যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক চলেছে : তা হল, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ করে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা যেখানে তাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক, যারা রামমোহন রায় ডিরোজিও-র সময় থেকে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও তার ফলস্বরূপ "রেনেসাঁসের" মাধ্যমে জাতীয়তাবাদকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তারা এই 'বিদ্রোহ'-কে অনুমোদন করেননি; তারা একে একটি সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনা মনে করতেন বলেই স্বেচ্ছাকৃত ভাবে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন বিদ্রোহ থেকে এবং ১৮৫৭ তারা লেখায় ও কর্মে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৫৯-৬০ সালে নীল-চাষিদের ধর্মঘটের প্রতি বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সার্বজনীন সমর্থনে তার প্রমাণ মেলে এবং দ্রুত জাতীয়তাবাদের পথে অগ্রসর হলেন।

বাংলা দেশের তথাকথিত 'রেনেসাঁস'-এর ভূমিকাকে যেমন তুচ্ছ করা উচিত নয়, তেমনি সে সম্পর্কে এ মূল্যায়নও কিন্তু সঠিক বলে মনে হয় না। তাছাড়া, সঠিক মূল্যায়নের জন্য কতক প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা দরকার।

উনিশ শতকের মধ্যকালে যদি ভারতে স্বীকৃতিযোগ্য বুর্জোয়া আমাদের থাকত, তবে, ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের যে বিস্তৃতি ছিল, তাতে এর মধ্যে বহুলাংশে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা থাকা সত্ত্বেও, তা' নিঃসন্দেহে জাতীয় স্বাধীনতার এক অজেয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হত। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যখন কোনো জাতীয় আন্দোলনে যথেষ্ট সংখ্যক বুর্জোয়ার আবির্ভাব ঘটবে বলে পূর্ব-ধারণা করা যায়, তখন সেই একই কালে শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক অস্তিত্ব পারিপার্শ্বিকের যে সব সময়ে ঐ ধরনের আন্দোলনকে ব্যাহত করে, তা নয়।

য়ুরোপে জাতীয়তাবাদের চ্যালেঞ্জ ১৮শ শতকের শেষ দিকে এবং লর্ড অ্যাকটন-এর মতে, সম্ভবত সর্বপ্রথম পোল্যান্ডেই তা' একটি স্বীকারযোগ্য শক্তি হয়ে উঠতে শুরু করে। অথচ সে দেশ বহু পরে, বিংশ শতাব্দীতেও বহুলাংশে সামন্ততান্ত্রিক ছিল।

যে স্পেনে আজও সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী রয়েছে, সেই দেশই যখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ১৯ শতকের প্রথম দিকে, তারাই নেপোলিয়নকে প্রথম পরাজয়ের কটু আস্বাদ জানিয়ে দিয়েছিল। মাজিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভুর-এর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ ভূমি ইতালি তার অস্ট্রীয় শাসকদের কাছে একটি "ভৌগোলিক নাম" ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এবং ১৯শ শতকে সামন্ততন্ত্রের যে প্রভাব সেখানে ছিল, সে প্রভাব আজও সামান্যই খর্ব হয়েছে। ১৮৪৮-৪৯ সালে হাঙ্গেরিতে যে বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থান

হয়েছিল, এবং যার স্মৃতি আজও হাঙ্গেরির জনমনে সযত্নে লালিত, সে সময়ে সেখানে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য ছিল প্রায় পুরোপুরি, মাত্র বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাকে যথার্থরূপে অপসারিত করা গেছে। উদাহরণ আরো বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। যাই হোক, এ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত যে, ভারতীয় বুর্জোয়া-দের গোষ্ঠী যদি সে সময়ে উল্লেখযোগ্যরূপে থাকত, তা'হলে ১৮৫৭ সালের গণ-অভ্যুত্থান স্বাধীনতার শুধু ঘোষক না হয়ে যথার্থই ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারত।

মোটামুটিভাবে, ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতি পশ্চিম থেকে খুব পেছিয়ে ছিল না। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ যে মুর্শিদাবাদ নগরীকে দেখেছিলেন "লন্ডনের মতোই জনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী নগরীরূপে", সে মুর্শিদাবাদ ভারতের অন্যান্য নগরীর তুলনায় অনেক পরে গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় শিল্প কমিশন (১৯১৬-১৮) তাদের বিবরণীতে বলেছেন যে, "পশ্চিম থেকে বণিক অভিযাত্রীরা যখন প্রথম ভারতে এসেছিলেন, সে সময়ে ভারতের শিল্প বিকাশ য়ুরোপের অধিকতর অগ্রসর দেশসমূহ অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ছিল না।" ১৯শ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত জাহাজ নির্মাণ ছিল ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প।

উন্নয়ন-বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার বেড়াজাল ভারতকে এক কানাগলিতে পৌঁছে দিয়েছিল, এর পরে অনিবার্যভাবে এক বন্ধুর পথ পরিক্রমার শেষে সে কানাগলি থেকে ভারত বেরিয়ে আসতে পারত, কিন্তু ব্রিটিশ-শাসন তা'র সে পথকে অস্বাভাবিকভাবে রুদ্ধ করে দিল, ভারতের সম্পদকে তারা লুণ্ঠন করল, এবং ব্রিটেনের একচেটিয়া পুঁজিবাদের অনুকূল করে সচেতনভাবে ভারতকে "কৃষিজীবী দেশ" হিসাবে গড়ে তুলল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা যে সমস্ত শিল্প গড়ে তুলেছিল, তা তারা করেছিল বাধ্য হয়ে (প্রধানত সামরিক কারণে ১৮৫৪ সালে তারা রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল), 'দেশী' লোকদের এমনই শিক্ষার অধিকার দিল, যাতে শুধু বিশাল কেরানি বাহিনী ও স্বল্প কয়েকজন ব্যবহারজীবী-র সৃষ্টি হয়। আর তারই সাহায্যে ভারতে তাদের শোষণ ব্যবস্থার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলল। স্বভাবতই, এ ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়নি। এমন যে উপরতলার দশজন,—যাদের সম্পর্কে গান্ধীজি তাঁর ১৯২২ সালের বিচারকালে বলেছিলেন, "বিদেশী শোষকদের স্বার্থে তারা যে দালালী করে, তার পুরস্কার হল তাদের অতি নগণ্য শোচনীয় রকমের সুযোগ সুবিধা," সেই দশজনও ওই ব্যবস্থায় খুব সন্তুষ্ট ছিল না।

যে বাংলাদেশকে বলা হয় "রেনেসাঁসের" জন্মভূমি, সে বাংলারও বুর্জোয়া বিকাশের সম্ভাবনাকে এক পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার সাহায্যে বিকৃত ও ধ্বংস করে দেওয়া হল। এক সময়ে সে প্রদেশ তার অর্থনৈতিক সক্রিয়তার জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল, বের্নিয়ার প্রমুখ বহু পর্যটক যে দেশকে দুগ্ধমধুর স্রোতে প্লাবিত শিল্পের মধুচক্ররূপে আখ্যাত করেছিলেন, সেই দেশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য উপায়ে তৎকালে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান দেশ করে তোলা হল।

তাই কবিগুরুর পিতামহ, বাণিজ্যসূত্রে আহৃত তাঁর বিপুল সম্পদের জন্য 'প্রিন্স' বলে কথিত দ্বারকানাথ ঠাকুর শুধু বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। তৎকালীন ক্ষমতাসম্পন্ন বণিক রামদুলাল দে কিংবা মোতিলাল শীলের আসন

পাইকপাড়ার সিংহ বা শোভাবাজারের দেবদের তুলনায় অনেক পিছনে ছিল। সে সময়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বড়জোর দালালীর জন্য প্রাপ্য মুনাফার অধিকারী ছিলেন, শিল্পের চতুঃসীমা তাদের নিষিদ্ধ ছিল বললেই চলে। আজও পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্পের (যা কলিকাতা বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য কারণে অনিবার্যরূপে গড়ে উঠেছে) মালিকানার ক্ষেত্রে প্রধানত আবাঙালি ও বহুলাংশে ব্রিটিশ স্বার্থেরই আধিপত্য রয়েছে। আজও পর্যন্ত বুর্জোয়া বলতে যা বোঝায়, তেমন একটি বাঙালিও বোধহয় বাংলাদেশে নেই। এ শুধু বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য নয়, জাতীয়তাবাদের অপর এক উর্বর ভূমি মহারাষ্ট্রের অবস্থাও একই। প্রকৃতপক্ষে, এখনও আমাদের সামগ্রিক জাতীয় আন্দোলনের যে দুর্বলতা রয়েছে, তার কারণ বহুলাংশে এইখানে নিহিত এবং ভারতের বৃহৎ পুঁজি-যদিও সম্প্রতি কতক দর্শনীয় পদক্ষেপ করেছে, তবু আমাদের বুর্জোয়াদের সঙ্গে যেন এক অন্তঃসারশূন্যতা রয়েছে।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মুঘল শক্তির ভাঙনের ফলে যে অনিশ্চয়তার দিন চলেছিল, কোম্পানির শাসন বাংলা-র মতো কতক অঞ্চলে তা' দূর করে স্থায়িত্ব ফিরিয়ে এনেছিল। সুতরাং যাদের আর্থিক স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তারা যদি ১৮৫৭ সাল সম্পর্কে সন্দেহ প্রবল হয় এবং ১৮৫৭-র বিশৃঙ্খলায় বিরক্ত হয়, তবে তারা যে শাসক পক্ষের হয়ে দাঁড়াবে, এ ঘটনা স্বাভাবিক। তেমন ধরনের স্বার্থবিশিষ্ট শক্তি বিদেশী শাসনের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেনি এবং তাদের বুর্জোয়া-চরিত্র প্রাপ্তির অবস্থা থেকে বহুদূরে পিছিয়ে থাকার ফলে তারা স্বাধীনতার জন্য কোনও জাতীয় প্রচেষ্টায় জড়িত হয়নি। এই অবস্থায়, অন্য কোনো জায়গায়, অনুরূপ ঘটনাই ঘটত।

বাংলাদেশ ও অন্যান্য স্থানের সাধারণ মানুষ অবশ্য বিদ্রোহীদের সমর্থন করতেই ইচ্ছুক ছিল। অর্থনৈতিকভাবে ভূ-স্বামীদের সঙ্গে জড়িত এবং সেই শ্রেণি থেকেই প্রায়শ আগত "শিক্ষিত সমাজ" পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি সংবেদনশীল সাড়া দিতে নিশ্চয়ই ব্যর্থকাম হননি; আর তা যদি হয়, যখন বিদ্রোহ শুরু হল, তখনও নিশ্চয়ই তাদের মনে এক উদ্দীপনাময় অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল এবং ব্রিটিশ শক্তিকে যারা প্রচণ্ড স্পর্ধার দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছিল, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনিচ্ছাকৃত হলেও তাদের শৌর্য ও ঐকান্তিকতাকে নিশ্চয়ই তারা সপ্রশংস স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। একথা মোটেই সত্য হতে পারে না যে তারা ১৮৫৭ সম্পর্কে আদৌ উৎসাহ দেখাননি এবং তাকে অনুমোদনও করেনি; 'বিদ্রোহ' দমিত হওয়ায় এবং "সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া" নমিত হওয়ায় তারা আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং তারপরে তারা বহুলাংশে সুসংস্কৃত জাতীয় সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

আমাদের উনিশ শতকের পূর্বসূরীরা যে মানবিক মৌলিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, তা যেন আমরা অস্বীকার না করি।

হিন্দু প্যাট্রিয়টে, সেন্সরের হাত এড়াবার জন্য সতর্কতার সঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যা লিখেছিলেন, তার ছত্রে ছত্রে তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের মনোভাব প্রায়শ প্রতিফলিত হয়েছে। কে না জানে যে, তৎকালীন মহত্তম বাঙালি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতহীন সমগ্র জীবন স্বকীয়রূপেই ছিল জাতীয় আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিরতিহীন সংগ্রাম? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কতক ব্যঙ্গ রচনায় ও কলিকাতার অবস্থা সম্পর্কে

কালীপ্রসন্ন সিংহের কতক নকশায়-সেন্সারের প্রতাপ যতটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অনুমোদন করেছে, ততটা স্পষ্টভাবে ১৮৫৭-৫৮ সালের বাঙালি মানসের সংকেত পাওয়া যায়। রামগোপাল ঘোষ হয়তো কলিকাতার সাড়ম্বর সভায় বিদ্রোহীদের উপর ইঙ্গ বিজয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভাগ্যকে সাধুবাদ দিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তার প্রকৃত সহমর্মিতা যে পক্ষের প্রতিই থাক না কেন, তিনি এর বিপরীত কিছু করতে পারতেন না। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যদি বিদ্রোহকে স্বাগত করতে চাইতেনও তার হিন্দু প্যাট্রিয়ট কিন্তু তাকে স্বাগত জানাতে পারেনি। তাকে বহুলাংশে অভিমত খর্ব করতে হয়েছিল এবং এমন কি "ইংল্যান্ডের শুভ উদ্দেশ্যের" কথাও বলতে হয়েছিল। সুতরাং সেদিক থেকে রামমোহন রায় থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত আমাদের নেতৃবৃন্দ ইঙ্গ শাসনের যে প্রশংসাবাদ করেছেন, তাকে যদি একত্র করে বলা হয় যে, তাবা পরাধীনতার শৃঙ্খলকেই পরমানন্দে আলিঙ্গন করেছিলেন, তবে তা হবে নেহাত ছেলেমানুষি।

১৮৫৭ সাল প্রত্যেকটি মানুষকে যে তীব্র আলোড়নে আলোড়িত করেছিল, তার ফলে তার পরবর্তীকালে বহু গুণে স্বীকারযোগ্য জাতীয়তার দিকে ঘটনাবলী প্রবাহিত হতে শুরু করল। ১৮৫৮ সালে প্রখ্যাত বাঙালি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বাধীনতার মন্ত্র রচনা করলেন :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

সেন্সর-এর হাত এড়াবার জন্য একথা বলতে হয়েছিল ১৪শ শতকের এক রাজপুতের মুখ দিয়ে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এ ছিল সমসাময়িককালের ভারতের মর্মবাণী। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপূর্ব কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে যখন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রামায়ণের ঘরভেদী-বিভীষণকে তার দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভর্ৎসনা করছেন, সে সময়ে সহজেই নব-লব্ধ জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ সুর শুনতে পাওয়া যায়।

"জাতি" এবং "জাতীয়" কথা দুটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যে হিন্দু মেলা (১৮৬৭ ও পরবর্তীকালে) তাও গড়ে উঠেছিল, সেই মতাদর্শাশ্রয়ী গোষ্ঠীতে : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যে রবীন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৬১) তাঁর কৈশোরের তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে কৃপাপ্রার্থীর সুর ফুটে ওঠায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর এবং আরও অনেকের রচনায়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুপূর্বে যে সমস্ত বাংলা জাতীয় সংগীত সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল— যেমন গোবিন্দচন্দ্র রায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে; 'সত্তরের দশকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত নাটক সেন্সরকে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার বাণী বহন করে মঞ্চস্থ হয়েছিল, সেই সমস্ত নাটকে; এমনকি ধর্মীয়, পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনেও ১৮৫৭-পরবর্তীকালে জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকৃত বেদনাবোধের আলেখ্য পাওয়া যায়!

আর এই মর্মবেদনাকে রূপায়িত করার জন্য প্রায় দাঁতে-নখে লড়াই-এর অভাবও হয়নি। ১৮৫০ সাল থেকে দাক্ষিণাত্যে গভীর কৃষক বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে এবং তা'

রূপ পরিগ্রহ করে ১৮৭৪-৭৫ সালের ব্যাপক কৃষক-অভ্যুত্থানে। নীল চাষিদের বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) বাংলার বিভিন্ন জেলায় কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকারে বাধ্য করেছিল।—১৮৬০ সালে ক্যানিং লিখলেন, "দিল্লির দুর্বিপাকের দিনগুলির থেকে আজ পর্যন্ত যত দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে, এই এক সপ্তাহ আমাকে তার চাইতে অনেক বেশি দুর্ভাবনায় ফেলেছিল।"

"১৮৬৩ সালের প্রতিহিংসা অভিযান" এবং ১৮৬৪ সালের রাষ্ট্রীয় বিচার সত্ত্বেও ওয়াহাবি (এবং ফরাজীদেব) আন্দোলন চলেছিল কমপক্ষে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত এবং সে আন্দোলন শুধু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেই এক সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য রেখে যায়নি, হিন্দুরাও —যেমন, পরবর্তীকালের জাতীয় নেতা বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ—ওয়াহাবি বিচাবেব বিবরণী পাঠে প্রথম স্বাধীনতা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতেন। পাবনা ও বগুড়া জেলায় যে কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল, বাংলার ১৮৭২-৭৩ সালেব প্রশাসনিক বিবরণীতে তাকে এক "হিংসাত্মক ও আশঙ্কাজনক বিদ্রোহ" বলে আখ্যাত করা হয়েছে, এবং তাতে বলা হয়েছে, কৃষকরা নিজেদের 'বিদ্রোহী' বলতেন এবং যে 'সমিতি'-র মধ্যে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন সরকারি বিবরণী অনুসারে এ বিদ্রোহ "সমস্ত বাংলা দেশকে প্রকম্পিত করেছিল।" অনুরূপ আরও উদাহরণ রয়েছে, কিন্তু তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"বিদ্রোহ" দমিত হওয়ার পর স্বভাব ই ভারতের আত্ম-মর্যাদার যে ক্ষতি হয়েছে, সে সম্পর্কে ভারতীয়দের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। লন্ডন 'টাইমস'-এর প্রতিনিধি জি, ডব্লিউ, রাসেল বিদ্রোহ দমিত হওয়ার স্বল্পকাল পরেই লিখলেন, ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে অত্যন্ত "তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষেব মনোভাব" রয়েছে এবং আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, "সম্ভবত কোনদিনই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মনোভাব ফিরে আসবে না।" তার পর থেকে গোলন্দাজ বাহিনীকে শুধু ইংরেজদের হাতেই রাখতে হল এবং "সামরিক জাতি"-র এক কল্পিত তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় বাহিনীকে দেশের প্রতি আনুগত্যহীন এক বেতনভুক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করা হল। সেনাবাহিনীতে ভারতীয়রা বড়জোর রসিলদার বা সুবেদারের পদে উন্নীত হতে পারতেন এবং অতি নিম্নপদস্থ ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে তাদের থাকতে হত। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবহারেও যে অমার্জিত বর্বরতা প্রকাশ পেয়েছে, তা' আমাদের অনন্যোপায় হীনতাকেই তুলে ধরেছে।

এর বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন আগ্রার ফুলার মামলা (১৮৭৬)-তে জনৈক দুষ্ট ইংরেজের পদাঘাতে তার ভারতীয় নোকরের ঘটনাস্থলেই গৌরবহীন মৃত্যু হলে, আদালতে অপরাধীকে নামমাত্র—যদি হয়ে থাকে—শাস্তি দিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হল। যুক্তি এই যে, অধিকাংশ ভারতীয়দের মতো মৃতের একটি স্ফীত প্লীহা ছিল এবং প্রভুর মৃদুমন্দ ঝাঁকুনীর চাইতে, সেই প্লীহাই ছিল মৃত্যুর প্রধান কারণ!

"জুতা প্রসঙ্গে" ভারত সরকার যে গুরুগম্ভীর প্রস্তাব রেখেছিলেন, তা দেখে কৌতুক রোধ করাও কঠিন। এই প্রস্তাবে বলা হল যে, "যে সমস্ত দেশীয় ভদ্রলোক যুরোপীয় ফ্যাশানের জুতো পরেন" তারা "ঐ ধরনের জুতো পরায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায়" দরবারে রাজ পুরুষদের সামনে কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে জুতো পরেই উপস্থিত হতে পারবেন।

কিন্তু যারা ভারতীয় ধরনের জুতো পরেন তাদের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অবশ্যই সে জুতো খুলে ফেলতে হবে। ১৮৭৩ এবং ১৮৭৮ সালে যখন সংবাদপত্র আইন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করল, আমাদের মেরুদণ্ডকে ন্যুব্জ করবার জন্য অস্ত্র আইন যখন ১৮৭৯ সালে বিধিপুস্তকে লিপিবদ্ধ হল, এবং ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে যখন ইংরেজদের আন্দোলন শুরু হল—যাতে উচ্চ আদালতের বিচারকরা পর্যন্ত যোগদান করেছিলেন এবং লর্ড রিপনকে স্টিমার যোগে কলকাতার বাইরে পাচার করার ষড়যন্ত্র শ্বেতাঙ্গরা করেছিলেন—যারা সপ্রশংস স্বীকৃতিতে জেনেছিলেন যে, ইঙ্গবিধানে কালপরম্পরায় স্বাধীনতার বিস্তৃতিই ঘটেছে, এই সমস্ত ঘটনা তাদেরও গভীর আঘাত দিয়েছিল। ১৮৫৭-৫৮ সালে যে ব্রিটিশ দাম্ভিকতা ও ঘৃণার পরিচয় ভারত পেয়েছিল, পরবর্তীকালে তারই আরো একটি উদাহরণ তাদের সামনে প্রকাশিত হল।

ইতিমধ্যে একটি ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি খুব দুর্বলভাবে হলেও, অগ্রসর হতে শুরু করেছে। এবং তাদের পক্ষে ভারতের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য ভারতের বুকের গভীর ক্ষত কিংবা তার অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার ঘটনাই যথেষ্ট ছিল না। এর জন্য তাদের আর্থিক স্বার্থে আঘাত লাগারও প্রয়োজন ছিল।

শেষোক্ত ঘটনাটি এইবার অত্যন্ত নগ্ন আকারে ঘটতে শুরু করল। এই বণিক সম্প্রদায়ের নিজেদের উদ্যোগে বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু ধীরে ধীরে মিল ও কারখানাসমূহ স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া গোষ্ঠী জন্মলাভ করল তারা দেখল, যতই অসম পর্যায়ের হোক না কেন, ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে তাদের সংঘাতের সময় ঘনিয়ে আসছে। ১৮৫৩ সালে বোম্বাইতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হল। ১৮৮০ সালের মধ্যে মিলের সংখ্যা দাড়ল ১৫৬; সে সমস্ত মিলে তখন প্রায় ৪৪,০০০ শ্রমিক কাজ করেন। এই সমস্ত শিল্পে নিয়োজিত ভারতীয় পুঁজিকে সেদিন প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের চাপে ১৮৮২ সালে যখন ভারতে আমদানিকৃত সুতিবস্ত্রের ওপর থেকে সমস্ত রকমের শুল্ক তুলে নেওয়া হল, ভারতের অধীনতা সেদিন আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা গেল। ক্রেতাদের সাহায্য করার চমকপ্রদ অজুহাতে (আজ আবার ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকে খর্ব করার জন্য প্রতিক্রিয়া চক্র যে অজুহাতের পুনরাবৃত্তি করছে) ব্রিটেন ভারতীয় শিল্পকে নিষ্পিষ্ট করতে চাইল।

ঘটনার এই দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ক্রমশ এটা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতের আত্ম-মর্যাদা ও স্বার্থে সমভাবেই আঘাত হানছে। সত্তরের দশকে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির জাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সে আর এক কাহিনি। ব্রিটিশ শাসনকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলে যাদের মনে হয়, সেই সমস্ত রাজনৈতিক ও প্রচারবিদরাও যাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই ঘটনাটিই বিরোধীদের গুরুত্বের উপর নূতন করে জোর দেওয়া তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করে। তাই, অন্যতম বিশিষ্ট পুরুষ—যিনি আদৌ জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ছিলেন না—দাদাভাই নৌরজী এক তীব্র আবেগময় অভিযোগ রাখলেন তাঁর "দারিদ্র্য ও ভারতে অ-ইঙ্গ শাসন"—এ (পভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশরুল ইন্ ইন্ডিয়া)। উইলিয়ম ডিগবী-র উল্লেখযোগ্য গবেষণা "সমৃদ্ধশালী ইঙ্গ ভারত" (প্রসপেক্টাস ব্রিটিশ ইন্ডিয়া) এবং তাঁর অপর যে সমস্ত তথ্যে বলা হয়েছিল যে ১৮৫০ সালে একজন ভারতীয়ের গড়ে দৈনিক আয় ছিল ২ পেনি

১৮৮০ সালে দৈনিক দেড় পেনি এবং ১৯০০ সালে দৈনিকমাত্র ১ পেনি তা ভারতে সুবিদিত হয়ে পড়েছিল।

এম. জি. রানাডে'র মতো মনীষী নেতৃত্ব দিলেন ভারতীয় অর্থনীতিক তাঁর গবেষণায়। আর পাণ্ডিত্যে সর্বশাস্ত্রকুশলী দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট ও রাজনীতিতে সুগভীর জ্ঞানী রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতে ইঙ্গ অর্থনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করছেন তার বিপুলায়তন নিবন্ধাবলীতে। বহু পরবর্তীকালে ১৯৩১ সালে কংগ্রেস নিয়োজিত একটি কমিটির বিবরণীতে জানা গেল, "জনগণের ঋণ"—এর নামে ভারতের কাঁধে অন্যায়ভাবে ৭২৮.৭ কোটি টাকার ঋণ চাপানো হয়েছে। সেই রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র "বিদ্রোহে"র জন্য ব্যয় হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। যে টাকা অন্যান্য খাতের টাকার মতই আমাদেব শোধ করতে হয়েছে! ব্রিটিশ শাসন, যথার্থই, আমাদের পক্ষে অত্যধিক ব্যয়বহুল ছিল, এবং বুর্জোয়াদের হিসাব নিকাশেও যখন এই ব্যয়ভার অত্যধিক বলে মনে হল তখন, ১৮৫৭ সালের বিক্ষুব্ধ অভ্যুত্থানের চাইতে উন্নততর এবং অনেক বেশি বাস্তব-মুখীন জাতীয় আন্দোলনের কারণেরও উদ্ভব হল।

"এই আন্দোলন শুধু কালানুক্রমিক ভাবেই নয়, আত্মিক ভাবেও ১৮৫৭ সালের উত্তর সাধক ছিল।" "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক" রূপে পরিচিত এ.ও. হিউম সিমলায় বসে ১৮৭০-৮০ সালের ঘটনাবলী স' পর্কে সরকারি নথিপত্রে সুগভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে, এর গতিপ্রকৃতি দেখে ভয় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত যতটা তিনি বলেছিলেন, ততটা আঘাত তিনি হয়তো প্রকৃতপক্ষে পাননি। কারণ, তিনি তো ১৮৫৭-৫৮ সালে অযোধ্যায় সরকারি কাজ করেননি!

তিনি লিখেছেন :

"৩০,০০০-এরও বেশি সংবাদদাতার সংবাদে বোঝাই সাতটি বিরাট খণ্ড আমাকে দেখানো হয়েছিল। সেই সমস্ত সংবাদেই দেখানো হচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দরিদ্র জনসাধারণকে এক ব্যাপক অসহায় মনোভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে; তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ধারণা করে নিয়েছে যে, তাদের উপবাসী থাকতে হবে ও মরতে হবে; এবং **তারা একটা কিছু করতে চায়**। তারা কিছু একটা করতে যাচ্ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে যাচ্ছিল আর **সেই একটা কিছু-র অর্থ ছিল হিংসাত্মক কার্যকলাপ**...

এ পরিকল্পনাও করা হচ্ছিল যে, পাতার উপরের জল বিন্দুর মতো সর্বত্র ছোট ছোট দলগুলি সম্মিলিত হয়ে বড় দল গড়ে তুলবে... এবং যখন এই সমস্ত দল সংখ্যায় যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে, তার অনতিকাল পরেই, তৎকালে, প্রচণ্ড ভাবে—এবং সম্ভবত অযৌক্তিক ভাবে সরকারের প্রতি বিদ্বিষ্ট **শিক্ষিত সমাজের এক অংশ** আন্দোলনে যোগদান করবে, ইতস্তত নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, বিদ্রোহকে আরো উস্কে দেবে এবং তাকে **জাতীয় বিপ্লবের পথে পরিচালিত করবে**" (বড় হরফ আমার)।

হিউমের পরামর্শদাতা ও পৃষ্ঠপোষক বড়লাট লর্ড ডাফরিন বিপদ উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু "যোগ্য ও সুবিবেচক দেশীয়দের উল্লেখযোগ্য সংখ্যার" প্রতি বিশ্বাস রেখে তিনি তার সংবিধানসম্মত প্রশাসনিক ভিয়ান-ঘর থেকে কিছু মনোহারী মিষ্টান্ন ছুঁড়ে

দিলেন এবং তার প্রভাবিত কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রারম্ভিক জনপ্রিয় আন্দোলনকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন।

হিউমের আতঙ্কে আতিশয্য ছিল ধরে নিলেও এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই যে, দুর্দশার ভার লাঘব করার জন্য আমাদের সাধারণ মানুষ যেমন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তেমনি তাদের সাহায্য করাতে একটু বিত্তশালী শ্রেণিও গররাজী ছিলেন না। হিউম-কে যে সমস্ত নথিপত্র দেখানো হয়েছিল, সেগুলি অবশ্য ইতিমধ্যেই যদি তা আমাদের দপ্তরখানায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে না থাকে—যতক্ষণ পর্যন্ত না স্থানান্তরিত করে পরীক্ষা করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ সম্পর্কে পূর্ব বিবরণী জানতে পারব না। কিন্তু কতক অর্থবহ ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি। যখন ভারতীয় শিল্পকে নিরুৎসাহ করা হচ্ছিল, কৃষকদের খাজনা যখন উচ্চহারে বেঁধে দেওয়া হচ্ছিল, ১৮৭৭ সালে যখন ষাট লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষে মারা গেলেন, এবং সেই সময়েই অপর্যাপ্ত ব্যয়ের মধ্য দিয়ে মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্ঞী বলে ঘোষিত হলেন, যখন বর্মায় ও তিব্বতে, আফগানিস্তানে ও চিনে এমনকি বহু দূরবর্তী আফ্রিকায় ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পুষ্টির জন্য ভারতকে তার ঐশ্বর্য আর শোণিত ঢেলে দিতে হয়েছে, তখন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈঙ্গপ্রীতি পোষণ করার কারণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

সুতরাং বাংলাদেশে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,. বোম্বাইতে সোরাবজী সেপুরজী বেঙ্গলি ও এন, এম, লোখান্ডে প্রমুখ চিন্তাশীল ভারতীয় যে মেহনতী মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করবেন, কিংবা চা বাগানের মালিকদের কর্তৃত্বে সম্পূর্ণ সমর্পিত শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যে চেষ্টা করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাজনারায়ণ বসু এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতালির ধাঁচে গুপ্ত সমিতি গড়ে স্বাধীনতার জন্য স্বাত্মোৎসর্গের শপথ নিয়ে দেহের শোণিতে স্বাক্ষর করার চিন্তা শুধু অলস কল্পনাই ছিল না। আরও তাৎপর্য পূর্ণ হল, ১৮৭৪ সালে "মুখার্জীস ম্যাগাজিনে" প্রখ্যাত লেখক ভোলানাথ চন্দ্র-র ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ও একটা মোটামুটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রস্তাব ("নৈতিক বিরোধিতা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল)।

এই ঘটনার ফলে—যার যথার্থ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক—হিউম লিখলেন, "এ সম্পর্কে আমার সেদিনও কোনও সন্দেহ ছিল না এবং আজও নেই যে, আমরা সেদিন **এক প্রচণ্ড বিপ্লবের চূড়ান্ত বিপদের** মধ্যে বাস করছিলাম। তার জীবন চরিতকার এবং এক সময়ে কংগ্রেস সভাপতি, স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্নও লিখেছিলেন :

"রুশ কায়দায় পুলিশী সন্ত্রাসের সঙ্গে এই অশুভ প্রতিক্রিয়া মিলিত হয়ে লর্ড লিটনের অধীনে **ভারত এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিপজ্জনক** স্তরের নিকটবর্তী হয়েছিল এবং খুব সঠিক সময়েই মিঃ হিউম এবং তার ভারতীয় উপদেষ্টাগণ উদ্যোগী হয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন" (বড় হরফ আমার)। ইঙ্গ স্যাক্সনীয় ঔদাসীন্য পর্যন্ত যখন এমন সুস্পষ্ট ভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছে, তখন আমাদের এ সম্পর্কে অত্যধিক সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

সুতরাং ১৮৫৭ ও আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তী স্তর সমূহের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। ব্রিটিশ চার্টিস্ট নেতা আর্নেস্ট জোন্স যাকে "রিভোল্ট অব হিন্দুস্তান"—হিন্দুস্তানের বিদ্রোহ—বলে আখ্যাত করেছিলেন, সেই ১৮৫৭ সাল (আর্নেস্ট জোন্স-এর

'রিভোল্ট অব হিন্দুস্তান' ১৮৪৯ সালে লিখিত হয়, যদিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় অনেক পরে।—অনুবাদক।) ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঞ্চজন্য। তার আহ্বান স্থান-কালের সীমানা অতিক্রম করে, বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে জনমানসে—যখনই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন কোনও সংগ্রামে—তা ১৯শ শতকের শেষ দিকেই হোক, বা ১৯২০-২২-এর স্বদেশী ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের কালেই কিংবা ১৯৪৬ সালের সেই সমস্ত আন্দোলনের সম্মিলিত চূড়ান্ত পর্যায়েই হোক। সুভাষচন্দ্র বসু যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহীদের রণধ্বনি : "চল দিল্লি" কে গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁর প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ই পাওয়া যায়। পাঠ্য-বই আর বিবর্ণ-মুখ পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন, তার মধ্যেই ইতিহাসের গভীর পরিচয় নিহিত রয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতাকে জনজীবনের কাছে বাস্তবরূপে অনুভূত করানোর জন্য এখনও দীর্ঘ পথ পরিক্রমার প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু ১৮৫৭ সালের নিখাদ স্মৃতি আজও এক "বিপুল সম্পদ" হয়ে রয়েছে আমাদের কাছে।

যদিও ভিন্নতর পটভূমিতে বলা, তবু প্রখ্যাত ইংরেজ লেখকের উক্তি ১৮৫৭-র অমলিন স্মৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : "কীট বা মণ্ডুর একে ধ্বংস করতে পারে না, এবং এমনকি যদি আমরা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হই—আমাদের সে বিশ্বাসঘাতকতাও একে কলুষিত করতে পারবে না।

অনুবাদ : পরিচয় গুপ্ত

গিরীণ চক্রবর্তী ও অরুণ রায় সম্পাদিত 'সংকলন' চতুর্থ বর্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে।

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
কালিদাস মুখোপাধ্যায়

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ*

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আজও বাদানুবাদের অন্ত নেই। আর এই বাদানুবাদে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি নিয়ে কম-বেশি অংশ নিয়েছেন নানা বর্ণের, নানা শ্রেণির লোকই। পণ্ডিত, পণ্ডিতম্মন্য ও অপণ্ডিত, রাষ্ট্রিক ও অ-রাষ্ট্রিক নানা বর্ণের লোকই এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। অজস্র রচনা আর প্রবন্ধও এই উপলক্ষ্যে পত্রিকাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। গবেষণামূলক গ্রন্থাবলীও কয়েকখানা রচিত হয়েছে। বাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্যে এই বাদানুবাদ এক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে গেল।

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে বিপুল সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা চলে—বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাহিত্য ও মনগড়া প্রচার সাহিত্য। জাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাসে হয়তো দুয়েরই আপেক্ষিক মূল্য আছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চা আর ঐতিহাসিক প্রচার সাহিত্য যে এক বস্তু নয়, সেকথাও সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার অর্থ নিছক ঘটনাপঞ্জীর প্রাণহীন সমাবেশ নয়। এখানেও বিশ্লেষণ শক্তি ও সুনিয়ন্ত্রিত কল্পনাশক্তির স্থান আছে যথেষ্ট এবং তা প্রায় অপরিহার্য। ইতিহাস যখন প্রত্নতত্ত্ব নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক মালমশলাগুলিকে জীবন-দর্শন বা জীবন-ব্যাখ্যার দ্বারা আলোকিত করেই যখন রচিত হয় ইতিহাস, তখন একেবারে ষোল-আনা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস কারো কাছ থেকে আশা করা দুরাশা মাত্র। বহুদিন পূর্বে বিনয় সরকার লিখেছিলেন : "It must never be forgotten that history is a sciene altogether different from archaeology. In order to be lifted up to history archaeology must have to be impregnated with a bias, an interpretation, a standpoint, a philosophy, a 'criticism of life'" (**The Futurism of Young Asia,** Leipzig, 1922, pp., 328-329)। কাজেই প্রত্নতত্ত্বের বিবরণে যে পরিমাণ বস্তুনিষ্ঠা সম্ভব, ইতিহাস পর্যালোচনায় ততটা বস্তুনিষ্ঠা সম্ভব নয়। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যবশত ঐতিহাসিকেরা একই ঘটনা সম্বন্ধে রকমারি মতামত ব্যক্ত করে থাকেন, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চা বলে গবেষণার এক বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হয়ে থাকে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার মানে হল প্রত্নতত্ত্বের মালমশলা সংগ্রহের সময় পূর্ব-স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অগ্রসর না হয়ে উদার মনোভাবে ও খোলা চোখে (অর্থাৎ মানবীয় অর্থে, দার্শনিক অর্থে নয়) অগ্রসর হওয়া, সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সমগ্রভাবে বিচার করা ও তার উপর যথাসম্ভব যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং পরিশেষে নিজ সিদ্ধান্ত বা মতামত ব্যক্ত করা, প্রয়োজন

ডাঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বিরুদ্ধপন্থীদের আলোচনার পর্যালোচনা।

হলে সে-অবস্থায় নিজের পূর্বেকার মতো সংস্কার বশে বা অহমিকা বশত আঁকড়ে ধরে না থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ বর্জন করা। সাময়িক ও সাংসারিক সুবিধা-অসুবিধার হিসাব থেকে নয়, পদের মোহে, পদবীর সম্মোহনে নয়, সত্য আবিষ্কারের এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই অগ্রসর হওয়া ইতিহাস-গবেষকের স্বধর্ম—বাস্তব ঘটনাগুলিকে বিকৃত করে বা একতরফা ভাবে সাজিয়ে কোন নির্দিষ্ট মত-পথের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি করা তার সাজে না। স্বভাবতই এ ধরনের জ্ঞানযোগের সাধক কোনো দেশেই কোনো কালে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে মেলে না।

২

মহাবিদ্রোহ নিয়ে মূল উৎসের সাহায্যে সম্প্রতি যে সকল পণ্ডিত গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ডাঃ মজুমদারের The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (April 15,1957) ও ডাঃ সেনের Eighteen Fifty-Seven (May, 1957) গ্রন্থদ্বয়। প্রায় একই সময় বই দুখানি আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রন্থে মতামত ব্যক্ত করেননি। সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মৌলিকভাবেই ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বিদ্রোহ বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। একথা বলার অর্থ এই যে, দুই রীতিতে দুই ভিন্ন পরিবেশে দুই ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত উভয়েরই মূল সিদ্ধান্ত প্রায় অনুরূপ। ডাঃ মজুমদারের বই ব্যক্তিগত চেষ্টার পরিণতি, ডাঃ সেনের বই ভারত সরকারের আগ্রহে ও অর্থে রচিত এবং প্রকাশিত। ডাঃ মজুমদার গ্রন্থের "পরিচিতি"-তে লিখেছেন যে মূলত তাঁরই উৎসাহে ১৯৫২ সনের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য এক বোর্ড গঠন করেন ও কিছুদিন পর তাঁকেই ঐ বোর্ডের অধ্যক্ষ বা পরিচালকের (Director) পদে নিযুক্ত করা হয়। ঐ বোর্ডের সদস্যদের মধ্য আধা-আধি ছিলেন ঐতিহাসিক গবেষক, আর বাকি লোকেরা ছিলেন কংগ্রেস-পন্থী রাজনীতিক। দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা ছিলেন ওই বোর্ডের সভাপতি (Chirman) ও সম্পাদক (Secretary)। শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন যে, ডাঃ মজুমদার কর্তৃক উল্লিখিত দুই ব্যক্তি যথাক্রমে হলেন ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। এই ঐতিহাসিক বোর্ডের তথ্য সংগ্রহের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হবার পর সংবাদপত্র মারফত জানা গেল যে, কোনো অজ্ঞাত কারণে সরকার পক্ষ ঐ বোর্ড ভেঙে দিয়েছেন। ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এই অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন, যে, ১৯৫৩ সনের মে মাসে তিনি অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার অল্পদিন পর থেকেই লক্ষ্য করলেন যে উক্ত বোর্ডের সম্পাদক ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্বন্ধে সকল তথ্যাবলী সংগৃহীত হবার পূর্বেই মনে মনে ওই ঘটনা সম্বন্ধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ধারণা স্থির করে ফেলেছেন আর প্রস্তাবিত স্বাধীনতা- আন্দোলনের ইতিহাসে সেই মতগুলি অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য তিনি ব্রতবদ্ধ। উক্ত সম্পাদকের মতে নাকি : "In 1857 an organised attempt was made by the natural leaders of India to combine themselves into a single command with the sole object of driving out the British power from India in order that a single, unified, politically free and soverign State may be established. The attempt was conscious and deliberate" (p.vi.) অর্থাৎ ১৮৫৭ সনে ভারতের স্বাভাবিক নেতৃবৃন্দ ইংরেজকে

বিতাড়িত করে এক ঐক্যগ্রথিত, স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য এক সজ্ঞান ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ এই দৃষ্টিতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ হল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্ব।

ডাঃ মজুমদার দুঃখ করে আরও লিখেছেন যে পূর্বোক্ত মত সম্পাদকের ব্যক্তিগত অভিমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ঐ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্রোহসংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগৃহীত করবার জন্য জনৈক ঐতিহাসিক পণ্ডিতও শীঘ্রই নিযুক্ত হলেন বোর্ডের অধ্যক্ষের অজ্ঞাতসারেই অর্থাৎ ডাঃ মজুমদারকে না জানিয়েই। ঐ ঐতিহাসিক পণ্ডিত তারপর প্রায় দুবছর ধরে ভারতের "ন্যাশান্যাল আর্কাইভ্‌সে" মালমশলা সংগ্রহ করে ১৮৫৭র বিদ্রোহের উপর একটি অধ্যায় রচনা করেন। ওই রচনা পড়ে ডাঃ মজুমদার বিস্মিত হন, লক্ষ্য করেন যে ঐ রচনায় বিদ্রোহসংক্রান্ত বহু অত্যাবশ্যক দলিলপত্রাদি অগ্রাহ্য হয়েছে, আর এটাও লক্ষ্য করেন যে উক্ত রচনায় বোর্ডের সম্পাদকের পূর্ব-স্থিরীকৃত মতামতই ঘোষিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক গবেষণার প্রকৃত আদর্শ লঙ্ঘিত ও খণ্ডিত হয়েছে। ডাঃ মজুমদারের ভাষায়, "On going through it I found that while it faithfully echoed the sentiments of the Secretary, it was hopelessly at variance with what I conceive to be the true principles of historical writing" (pp. vi-vii). ফলে স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিকল্পিত ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের খসড়া তৈরি করে বোর্ডের সম্পাদককে দেবার সময় ডাঃ মজুমদার ঐ বিশিষ্ট রচনাটি নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনা করায় বাতিল করে দেন। এর পরবর্তী ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। ১৯৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে সরকারি নির্দেশানুসারে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে গঠিত ঐতিহাসিক বোর্ডের ঐতিহাসিক অপমৃত্যু ঘটল। গোটা ভারতবর্ষের কাহিনি অবলম্বন করে প্রস্তাবিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এ পর্যন্তও আর প্রকাশিত হল না। সরকারি আবহাওয়ায় থেকে এ বিষয়ে যথার্থ ইতিহাস রচনা প্রায় দুঃসাধ্য মনে করাতেই ডাঃ মজুমদার স্বাধীনভাবে স্বকীয় মতামত, বিশেষ করে ঐ বিদ্রোহ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে এগিয়ে এলেন। "১৮৫৭ র মিউটিনি ও বিদ্রোহ" গ্রন্থ এই তিক্ত আবহাওয়ায় রচিত। গ্রন্থখানি ডাঃ মজুমদারের সুচিন্তিত ও পরিপক্ক গবেষণার পরিণতি। সরকার পক্ষের উপর আর প্রায় সার্বজনিকভাবে বর্তমানে স্বীকৃত ও দীর্ঘকাল ধরে মানসলোকে পুষ্ট জনপ্রিয় মতবাদের উপর তীব্র কষাঘাত ঐ গ্রন্থে আছে সত্য, কিন্তু তথ্য, চিন্তা ও যুক্তির এমন দৃঢ় ভিক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ঐ গ্রন্থ যে, ঐ বইকে উষ্মাজড়িত সুরে লেখা মনে করে কম মূল্য দিলে তা হাস্যকর ছেলেমানুষি হবে। সরকার পক্ষের সঙ্গে ডাঃ মজুমদারের বিদ্রোহ বিষয় নিয়ে যত বিরোধই থাকুক আর সরকারের উপর তাঁর যত ব্যক্তিগত অভিযোগই থাকুক না কেন, গ্রন্থকার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার মানদণ্ড থেকে প্রায় কোথাও বিচ্যুত হননি। বিরুদ্ধপন্থী বিদ্রোহ-বিষয়ক গবেষণাকারী ইতিহাসলেখক ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীও ডাঃ মজুমদারের বইকে "monumental work" ও তাঁর বিশ্লেষণী শক্তিকে "very penetrating" বলে সম্বর্ধনা না করে পারেন নি (ডাঃ চৌধুরীর নবপ্রকাশিত Civil Rebellion in the Indian Mutinies, pp. xx and 288 দ্রষ্টব্য)।

৩

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের বই কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়ায় লেখা—সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে। ভারত সরকারই তাঁর বিদ্রোহ বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশক। ডাঃ সেন ভূমিকায় বলেছেন যে, পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উপর একখানা প্রামান্য ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসে ১৯৫৫ সনের গোড়ার দিকে। সেই অনুরোধেই রচিত হয় তাঁর Eighteen Fifty-Seven গ্রন্থ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, গ্রন্থে যে-সকল অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব—একে সরকারি ভাষ্য ("authorised version") বিবেচনা করা ভুল হবে। তিনি আরও বলেছেন যে সরকার পক্ষ থেকে নিজ মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ("complete liberty to state his conclusions fully and freely without any fear of official interference," p. xxiii) তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রন্থের 'মুখবন্ধে'-ও স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন : "The only directive I issued was that he should write the book from the standpoint of a true historian. Beyond this general instruction, there was no attempt to interfere with his work or influence his conclusions...I am glad to find that Dr. Sen has treated the subject objectively and dispassionately" (pp. xx-xxi). অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতের দুই প্রধান ঐতিহাসিকের লেখা গ্রন্থদ্বয়ের মতামতের মধ্যে শেষ পর্যন্ত গভীর সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে, তাঁদের মূল বক্তব্যের মধ্যে গরমিলের বদলে মিলই বেশি করে লক্ষণীয় হয়েছে। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল ডাঃ সেন বুঝি সরকারের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে রচিত গ্রন্থে ১৮৫৭র বিদ্রোহ সম্বন্ধে সরকারি মতেই সায় দেবেন, আবার অনেকে এও আশা করেছিল যে সরকারি মতের তীব্র সমালোচক ডাঃ মজুমদারের বিদ্রোহ বিষয়ক বইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও পাওয়া যাবে ডাঃ সেনের রচনায়। কিন্তু কোনো পক্ষেরই আশা বা আশংকা শেষ পর্যন্ত সত্য হল না। বরং দেখা গেল বিদ্রোহ বিষয়ক সরকারি গ্রন্থেও ডাঃ সেন সরকারি মতের বিরুদ্ধেই রায় দিলেন আর সেই সঙ্গে এটাও ক্রমশ বুঝা গেল যে, বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে বই লিখলেও ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা প্রায় কোথাও বিসর্জন দেননি। দুই ভিন্ন পরিবেশে দুই বই লেখা হয়েও মতের সাদৃশ্য স্বভাবতই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪

ডাঃ মজুমদারের মতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে ("assumed different aspects in different areas")। কোথাও এই বিদ্রোহ ছিল খাঁটি সিপাহিদের অভ্যুত্থান ("purely a mutiny of the Sepoys"), কোথাও ছিল সিপাহি বিদ্রোহের পেছন-পেছন স্থানীয় অভিজাত শ্রেণির লোক, তালুকদার ও প্রজাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ, আবার কোথাও বা ছিল বিদ্রোহী সিপাহিদের জন্য জনসাধারণের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি বা সমর্থন, যদিও এই সমর্থন শেষ পর্যন্ত শেষোক্ত এলাকায় প্রকাশ্য জনবিদ্রোহের রূপ নেয়নি। পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের এক বৃহৎ অংশকে পথম শ্রেণিভুক্ত করা চলে; দ্বিতীয় শ্রেণির উপদ্রুত এলাকা হল ইউ, পি, বা যুক্ত প্রদেশের বেশির ভাগ

অংশ, মধ্যপ্রদেশের অল্প এক অংশ আর বিহারের পশ্চিমাংশ; আর তৃতীয় শ্রেণিতে ফেলা চলে প্রায় গোটা রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রকে (পৃঃ ২২৩-২২৪)। তবে মোটের উপর ১৮৫৭-র প্রলয়কাণ্ডকে ডাঃ মজুমদার বলেছেন "primarily a mutiny gradually developing into a general revolt in certain areas" (পৃঃ ২২১) অর্থাৎ মূলত সামরিক বিদ্রোহ, যদিও কোনো কোনো এলাকায় ঐ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে জনবিদ্রোহে পরিণত হয়। ঐ বিষয়ে সমসাময়িক বিদ্রোহের ইতিহাস-লেখক ইংরেজ পণ্ডিত চার্লস্ রেক্সের মতামত ডাঃ মজুমদার সম্পূর্ণ স্বীকার্য বলে গ্রহণ করেছেন।

আবার ভারত সরকার প্রকাশিত ডাঃ সেনের গ্রন্থেও প্রায় অনুরূপ কথাই লেখা দেখতে পাই। ডাঃ সেনের মতে : "The movement began as a military mutiny but it was not everywhere confined to the army.. Outside Oudh and Sahabad, there is no evidence of that general sympathy which would invest the Mutiny with the dignity of a national war. At the same time it would be wrong to dismiss it as a mere military rising. The Mutiny became a revolt and assumed a political character when the mutineers of Meerut placed themselves under the King of Delhi and a section of the landed aristocracy and civil population declared in its favour" (পৃঃ ৪১১) অর্থাৎ ১৮৫৭-র আন্দোলন প্রথমে সিপাহিদের বিদ্রোহরূপেই শুরু হয়, কিন্তু সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সামরিক বাহিনীতে সীমাবদ্ধ ছিল না।...অযোধ্যা ও সাহাবাদ ছাড়া অন্যত্র বিদ্রোহীদের প্রতি জন সমর্থন এমন কিছু ছিল না যার জোরে ওই মহাবিদ্রোকে জাতীয় যুদ্ধের স্তরে তুলে ধরা চলে। কিন্তু তাই বলে আবার এই বিদ্রোহকে নিছক সামরিক বিদ্রোহ মনে করলেও ভুল হবে। মীরটে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবার পর বিদ্রোহীরা যখন দিল্লিশ্বরের অর্থাৎ নামে-মাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহের পতাকাতলে সমবেত হল আর সেই সঙ্গে যখন অভিজাত শ্রেণির ও জনসাধারণের একাংশ দিল্লিশ্বরের স্বপক্ষে সমর্থন জানাল, তখন সেই বিদ্রোহ রাষ্ট্রিক লড়াইয়ের রূপ গ্রহণ করে। এর অল্প পরেই আবার ডাঃ সেন নিজ গ্রন্থে লিখেছেন যে, জনতার সমর্থন কোন কোন এলাকায় থাকলেও সেই সব অঞ্চলেও সাধারণ অভ্যুত্থানের স্বরূপ ছিল কিন্তু প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া। এমন কি অযোধ্যাতেও অর্থাৎ যেখানে বিদ্রোহ খানিকটা ব্যাপক জনযুদ্ধে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানেও আন্দোলনের নেতা বা অংশীদারেরা স্বাধীনতার প্রতিনিধি বা সৈনিক ছিল না। তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার ("individual liberty"-র) কোন ধারণাই ছিল না। তারা চেয়েছিল প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের পুরাতন ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাকে কায়েম করতে, ইংরেজ শাসনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে যে সমাজ-বিপ্লবের পটভূমি গড়ে উঠছিল তার ধ্বংস করতে। ইংরেজ সরকার ভারতীয় নারীর অনেক আইনগত ও সামাজিক দুর্ভোগ দূর করেছিল, "আইনের চোখে সকলে সমান" এই নীতি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিল আর চাষী ও অর্ধদাস জাতীয় লোকদের ভাগ্যোন্নতিতে খেয়াল রেখেছিল। বিদ্রোহীরা চেয়েছিল এই সকল প্রগতিমূলক সমাজ-ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে। তাই ডাঃ সেনের সুস্পষ্ট মত হচ্ছে যে, বিদ্রোহীরা সফল হলে প্রগতিশীল সমাজ বিবর্তনের ধারায় বিঘ্ন ঘটত, ঘড়ির চাকা পেছনের দিকে ঘুরে যেত। এই সব কথা লেখার পর ডাঃ সেন তাই মন্তব্য করেছেন : "In short, they wanted a counter-revolution" অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিদ্রোহীরা চেয়েছিল প্রতি-বিপ্লব (পৃঃ ৪১২-১৩)--যে প্রগতি ও বিপ্লবের ধারা একবার

দেশে এসে পড়েছে তার গতিকে তরান্বিত বা জয়যুক্ত করা নয়। ডাঃ মজুমদারও নিজ গবেষণা-গ্রন্থে এই একই সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে "The miseries and bloodshed of 1857-58 were not the birth-pang of a freedom movement in India, but the dying groans of an obsolete aristocracy and centrifugal feudalism of the medieval age" (পৃঃ ২৪১) অর্থাৎ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম-ব্যথার সন্ধান পাননি, তিনি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খল ফিউডাল ব্যবস্থা ও ধ্বংসোন্মুখ সামন্ত শ্রেণির মৃত্যু-যন্ত্রণা। উভয় ঐতিহাসিকই এই বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম লড়াই বলতে অস্বীকার করেছেন, দুজনের মতেই এই বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান ("pre-concerted plan") অনুসারে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয় নি। ডাঃ সেনের মতামত তাঁর গ্রন্থের ৩৯৮-৪১৮ পৃষ্ঠায় ও ডাঃ মজুমদারের অভিমত তাঁর গ্রন্থের ২১৭-২৩৪, ২৭৫-২৭৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য নজরে পড়ে তা প্রধানত প্রকাশভঙ্গির, মতামত সংক্রান্ত নয়।

৫

ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হবার পর থেকে তাঁদের সিদ্ধান্ত ও মতামত নিয়ে কোনো কোনো মহলে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। "পরিচয়" পত্রে (শ্রাবণ, ১৩৬৪ বা আগস্ট, ১৯৫৭) ও "New Age" পত্রে (August, 1957) এই বিরুদ্ধ সমালোচনার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য মেলে। কিন্তু ঐ সকল সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার বদলে হয়ে পড়েছে মনগড়া প্রচারসাহিত্য। ঐ দুটি পত্রিকায় অধিকাংশ লেখকই সমালোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন, তাতে তথ্য, চিন্তা ও যুক্তি থেকে অবান্তর কথা স্থান জুড়েছে বেশি।

ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের বিদ্রোহ বিষয়ক মতামত নিয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীর Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-59 (Sept. 1957) গ্রন্থখানি। পুস্তক প্রকাশের সন তারিখের দিকে খেয়াল রাখলেই দেখা যায় যে, ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হলে দেশের মধ্যে যে তীব্র বাদানুবাদ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-ঘেঁষা পণ্ডিতদের বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে, সেই আবহাওয়াতেই ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীর পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি যে তারস্বরে প্রচার করে চলেছে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ হল জনপ্রিয় স্বাধীনতার লড়াই, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়, সেই অভিমতই ডাঃ চৌধুরীর গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই গ্রন্থকে মামুলি প্রচার-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা চলে না। ডাঃ মজুমদারের অনেক প্রধান প্রধান বক্তব্যের বিরুদ্ধেই ডাঃ চৌধুরী কলম ধরেছেন। রকমারি সরকারি ও বে-সরকারি সাক্ষ্য ও দলিলের সাহায্যে বইখানি রচিত। ডাঃ মজুমদারের বইয়েরও প্রচুর তথ্য এতে ব্যবহৃত হয়েছে, আর কিছু পরিমাণে ডাঃ সেনেরও। লেখক পরিশ্রমী ও ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে পণ্ডিত। তাঁর বই লেখার উদ্দেশ্য হল ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আকর উৎসের সাহায্যে খতিয়ে দেখা, সিপাহি বিদ্রোহের সময় অ-সামরিক জনসমষ্টি কি

পরিমাণ বা কতটা ইংরেজ-বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিল ("to provide a compendious and systematic account of the civil rebellion which accompanied the military insurrection of 1857"—*Vide* Preface)। ১৮৫৭-র আন্দোলনকে তিনি প্রথমেই দুই স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করে নিয়েছেন--এর একটা হল সামরিক বিদ্রোহ (mutiny) আর একটা হল অ-সামরিক অভ্যুত্থান (rebellion)। তাঁর বিচারে এই দুই অংশের মধ্যে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে দ্বিতীয় অংশটা নিজেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন যে, এ-পর্যন্ত বিদ্রোহ-বিষয়ক পণ্ডিতেরা বেশির ভাগই উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ civil rebellion-এর দিকে নজর দিয়েছেন বড় কম, প্রায় দেননি বললেই হয়তো ঠিক বলা হয়। কাজেই গ্রন্থকার এই সীমাবদ্ধ অংশটির উপরই তাঁর বইয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছেন। বইখানি ডিমাই সাইজের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক মিউটিনি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ ("Theories on the Indian Mutiny," pp. 258-299) আলোচনা করেছেন ও সেখানেই নিজ বক্তব্য পাঠকদের জানিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্। ইংরেজির গুণে স্যার রাধাকৃষ্ণানের ভূমিকা যে কোনো পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আর তাঁর রচনার ঐ প্রসাদগুণ সর্বজনবিদিত। স্যার রাধাকৃষ্ণান লিখেছেন : "Not being a student of history I am not competent to judge the merits or demerits of Dr. Chaudhuri's book...His conclusion that the movement expressed a profound desire for freedom on the part of the people of India and that it was not merely a feudal movement but had within it the germs of progress, seems to be fully sustainable...It may be true to say that the year 1857 marked the beginning of a new era which ended in the transfer of power in 1947" (p. XII) অর্থাৎ আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। তাই ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিচার করবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে তাঁর যে বক্তব্য—১৮৫৭ সনের আন্দোলনে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতার গভীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল আর সে-আন্দোলন শুধুমাত্র সামন্ত্রতান্ত্রিক বিদ্রোহ ছিল না, তার মধ্যে উন্নতির বীজও উপ্ত ছিল এই অভিমত—সম্পূর্ণ স্বীকার্য বলে মনে হয়। হয়তো একথাও সত্য যে, ১৮৫৭ সন এক নতুন যুগের সূচনা করে—যে যুগের পরিণতি হচ্ছে ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতায়। গ্রন্থের মূল বক্তব্য হিসাবে স্যার রাধাকৃষ্ণান যা বলেছেন, সমগ্র বইখানি পড়ার পর পাঠকদেরও অনুরূপ ধারণাই জন্মায়। ভূমিকা-লেখক গ্রন্থকারের মতকে সঠিকভাবেই তাঁর লেখায় রূপ দিয়েছেন। গ্রন্থকারেব নিজ বক্তব্য তাঁর বইয়ের ২৫৯-৬০, ২৬৩, ২৭৫ ও ২৯৯ পৃষ্ঠায় যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

৬

গ্রন্থকার ও প্রকাশকের মতে Civil Rebellion in the Indian Mutinies বইখানি হল "a pioneer work on a neglected aspect of the great revolt of 1857...The book demonstrates the untenability of the theory of those who looked upon the event of 1857 as a mere military insurrection " ১৮৫৭-র বিদ্রোহধারার মধ্যে অ-সামরিক অভ্যুত্থানও স্পষ্ট অথচ এ বিষয়টা উপেক্ষিত। আর সেই

উপেক্ষিত বিষয়েই ডাঃ চৌধুরীর সুবিস্তৃত গবেষণা। কাজেই তাঁর গ্রন্থকে এই বিষয়ে পথিকৃৎ ("pioneer work") বলে দাবি করা হয়েছে। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন (pp.XIX-XX) যে Kaye, Malleson প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বহুদিন পূর্বেই তাঁদের রচনায় এই অ-সামরিক বিদ্রোহধারা—যাকে revolt, rebellion বা civil rebellion বলা হয়— তার উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৭র প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে অ-সামরিক বিদ্রোহের ধারা কত বড় ছিল সে বিষয়ে তো ঘটনার সমসাময়িক কালেই নর্টন তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছিলেন। এমনকি ১৮৫৯ সনে বে-নামীতে প্রকাশিত Native Fidelity গ্রন্থে দেখি গ্রন্থকারের ঐ বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ১৮৫৭-৫৮ এর "Mutinies and Rebellion"-এ জনসাধারণের অংশ খতিয়ে দেখা। হালে ডাঃ মজুমদার এ বিষয়ের উপর অর্থাৎ মিউটিনির দিনে civil revolt এর উপর সুদীর্ঘ তথ্যবহুল আলোচনাও করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তাঁর রয়েল সাইজ বইয়েব দুই শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে (পৃঃ ৪৩-২৪২ ও ২৫৭-২৭৮) ওই আলোচনা লিপিবদ্ধ দেখতে পাই। ডাঃ চৌধুরীও নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় একথা স্বীকাব করেছেন আর বলেছেন যে ডাঃ মজুমদার civil revol সম্বন্ধে যে সচেতন তা তাঁর The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 বইয়ের নামকরণ থেকেই বুঝা যায়। এই অবস্থায় ডাঃ মজুমদারের বই প্রকাশিত হবার পরও ডাঃ চৌধুরীর পুস্তকে civil rebellion জাতীয় উপেক্ষিত বিষয়ের উপর প্রথম আলোচনা বলে ঘোষণা করা সুবিবেচনার কাজ নয়। একথা অবশ্য ডাঃ চৌধুরীর সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে ডাঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক, কিন্তু মতামতের পার্থক্য হেতু কি একথা বলা চলে যে ডাঃ চৌধুরির আগে ঐ উপেক্ষিত বিষয়ে আর কেউ উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেননি? ডাঃ মজুমদারের রয়েল সাইজ বইয়ের ২২২ পৃষ্ঠা এই আলোচনায় স্থান জুড়েছে, আর ডাঃ চৌধুরীর ডিমাই সাইজ বইয়ের ২৩৯ পৃষ্ঠা (পৃঃ ৬১-২৯৯), অথচ তাঁর বইকে পথিকৃৎ বলে দাবি করা হয়েছে। ঐ উপেক্ষিত বিষয়ের ব্যাপক আলোচনায় পথিকৃতের বা অগ্রণী লেখকের গৌবব যদি একালে কারো প্রাপ্য হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে ডাঃ মজুমদারের। ডাঃ চৌধুরী এ ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বগামীর অনুগামী বা উত্তর-সাধক।

ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের গোড়াতেই আবার বলা হয়েছে যে, তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হল যাঁরা ১৮৫৭ সনের ঘটনাকে "নিছক সামরিক বিদ্রোহ" ("mere military insurrection") বলে জ্ঞান করেন তাঁদের মতের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করা। হয়তো পূর্বে কেউ কেউ ঐ ঘটনাকে শুধুমাত্র সামরিক বিদ্রোহ মনে করে ভুল করেছিলেন। কিন্তু হালে যে দুইজন প্রধান ঐতিহাসিক ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উপর গ্রন্থ লিখেছেন, তাঁরা কিন্তু ঐ ঘটনাকে মোটেই "নিছক সামরিক বিদ্রোহ" বলেননি, বলেছেন "primarily a mutiny"—প্রধানত এক সামরিক বিদ্রোহ। সিপাহি বিদ্রোহ শুধু সামরিক বিদ্রোহ নয় কেবল এই কথাটুকু বলার জন্য ডাঃ চৌধুরীর নতুন বই লেখার কোন সার্থকতা আছে কি? সে কথা তো তাঁর পূর্বগামীরাই যথেষ্ট জোরের সঙ্গে বলে রেখেছেন। বস্তুত, ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের আসল বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম। যাঁরা ১৮৫৭র বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই বলেন না বা যাঁরা ওই বিদ্রোহকে "primarily a revolt" না বলে "primarily a mutiny" বলেন, তাঁদের মতামতের বিরুদ্ধেই আসলে গ্রন্থকারের লড়াই। অর্থাৎ ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের যেটা প্রধান সিদ্ধান্ত তারই ভুল দেখানো ঐ বইয়ের লক্ষ্য।

কাজেই ডাঃ চৌধুরীর নতুন বই লিখবার সার্থকতাও আছে যথেষ্ট। তাই তাঁর বইয়ের মূল বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বইয়ের প্রথমেই গ্রন্থকার ও প্রকাশকের এমন বিভ্রান্তিকর উক্তি পাঠকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু লাগে। ডাঃ চৌধুরী "mere primarily a military insurrection" শব্দের পরিবর্তে শুধুমাত্র যদি "primarily a military insurrection" শব্দ ব্যবহার করতেন, তাহলেও তাঁর মূল বক্তব্য অনেক বেশি সঠিক রূপ পেত। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে ভারতের দুই প্রধান ঐতিহাসিকের বিদ্রোহ গ্রন্থদ্বয় পড়ার সময় জিজ্ঞাসু পাঠককে এর পর থেকে ডাঃ চৌধুরীর গ্রন্থখানাকেও পড়ে দেখতে হবে—আর কিছু না হোক, অন্ততঃ বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যও। শ্রীপ্রমোদ সেনের ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ-বিষয়ক গ্রন্থখানিও সেইসঙ্গে পঠিতব্য।

৭

ডাঃ চৌধুরীর Civil Rebellion পুস্তকে প্রচুর তথ্য ও ঐতিহাসিক মালমশলার সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের মধ্যে লেখকের বহু অসতর্ক উক্তি ও স্ববিরোধী কথা, বস্তুনিষ্ঠার অভাব ও যুক্তির দারিদ্র্য পাঠকের নজরে পড়ে। এবার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া মন্দ নয়।

(ক) গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠায় ডাঃ চৌধুরী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকাকে নরমপন্থী মতবাদের ("moderate views"-এর) সমর্থক বলে বিশেষিত করবার পর ঐ পত্রিকার ২১ মে ১৮৫৭ সনে প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule" অর্থাৎ ভারতবাসীদের মধ্যে এমন একজন লোকও এখন নেই যে ভারতে বৈদেশিক ব্রিটিশ শাসন-জনিত অভিযোগের নিষ্পেষণ সমগ্রভাবে অনুভব করে না। এই উদ্ধৃতি তুলে ডাঃ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন : "If it was so, it was not unlikely that the British had to face a really national and revolutionary situation growing out of the mutinise" (p. 259) অর্থাৎ এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তাহলে মনে করা অন্যায় নয় যে বিদ্রোহের দিনে ইংরেজকে এদেশে এক যথার্থ জাতীয় ও বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। "হিন্দু পেট্রিয়টের" ঐ উদ্ধৃতি তুলে ডাঃ চৌধুরীর পূর্বেও কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা পণ্ডিত অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসার প্রয়াস পেয়েছেন (দিল্লি থেকে প্রকাশিত New Age, August, 1957 পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ :

প্রথমত, "হিন্দু পেট্রিয়ট" তৎকালীন নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাষ্ট্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার দর্পণস্বরূপ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকা তৎকালেও প্রয়োজনমতো ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করেনি। জি. পি. পিল্লাই তাঁর Representative Indians গ্রন্থে (লন্ডন, ১৮৯৭, পৃঃ ৪৫) মন্তব্য করেছিলেন যে হরিশচন্দ্র যথেষ্ট যোগ্যতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে ("with considerable ability and independence") ঐ পত্রিকা সম্পাদন করতেন। লর্ড ডালহাউসির

স্বত্ব-বিলোপ নীতি ও রাজ্য জয়ের নীতির তিনি কড়া সমালোচকও ছিলেন। নীলকর আন্দোলনের সময় (১৮৬০) তিনি সর্বতোভাবে শোষিত, নিষ্পেষিত ও বিক্ষুব্ধ রায়তদের স্বপক্ষে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন—

"মনে যাদের বেদনা-সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা
আকাশের রঙ যাদের আফিঙের মত কালো
বুকে হেঁটে চলতে চলতে যারা আগ্নেয়গিরির মত
দাঁড়িয়ে উঠবে শিখায়িত পরাক্রমে"— (বিমলচন্দ্র ঘোষ)--

তাদের মূঢ় ম্লান মুখে তিনি সেদিন জ্বলন্ত ভাষা দিয়েছিলেন। অত্যাচারী, শোষণকারী বিদেশী নীলকর মালিকদের পর্বতপ্রমাণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি সেদিন সর্বস্ব খোয়াতেও কুণ্ঠিত হননি। এহেন ব্যক্তি পরিচালিত "হিন্দু পেট্রিয়কটকে" "নরমপন্থী মতবাদের" প্রচারক বলা নেহাত ভুল। নরমপন্থী ব্যক্তির চরমপন্থী উক্তির তাৎপর্য যতখানি, চরমপন্থী উক্তির মূল্য তুলনায় অনেক কম। কাজেই "হিন্দু পেট্রিয়ট" ১৮৫৭ সনে যে লিখেছিল ভারতবর্ষে একটি লোকও নেই ("not a single native of India") যে ইংরেজ শাসনের নির্মম নিষ্পেষণে অসন্তুষ্ট নয় তো ইতিহাসের কথা নয়, সংবাদপত্রের প্রচার মাত্র। "হিন্দু পেট্রিয়টের" ওই উক্তি ডাঃ চৌধুরী যতখানি দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, সাধারণ পাঠকেরা তা পারবে না। কাজেই "হিন্দু পেট্রিয়টের" একটিমাত্র উদ্ধৃতির ভিত্তিতে তাঁর যে মন্তব্য ("the British had to face a really national and revolutionary situation" ইত্যাদি) তাও অনেকটা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। সমসাময়িক কোন ঘটনা সম্বন্ধে চরমপন্থী কোন সমালোচকের প্রসঙ্গ-বিচ্যুত একটিমাত্র উক্তি থেকে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা কি যুক্তিরও ফাঁক থেকে যায় নি? একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে "হিন্দু পেট্রিয়টের" এরূপ উক্তি কতটা বিভ্রান্তিকর। "হিন্দু পেট্রিয়টে" ২১ মে ১৮৫৭ সনে বের হল যে ভারতে একটি লোকও নেই যে ইংরেজ শাসন ও শোষণে ক্ষুব্ধ নয়, অথচ ঠিক এক দিন পরেই (অর্থাৎ ২২ মে, ১৮৫৭ সনে) আমরা দেখি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় বিদ্রোহকে "disgraceful and mutinous conduct of the native soldiery" বলে ধিকৃত করে এবং ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাবও গ্রহণ করে (Native Fidelity, ১৯০৫ এর সংস্করণ, পৃঃ ২২০-২২২ দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) মারা যান সিপাহি যুদ্ধের ঠিক পরেই। যে-কবি "বিদেশের ঠাকুর" দূরে ফেলেও "দেশের কুকুরকে" স্নেহ করতে স্বদেশবাসীকে বলেছিলেন, সেই স্বদেশপ্রাণ বাঙালি কবি সিপাহি বিদ্রোহকে ধিকৃত করেছেন, বিদ্রোহের নেতা নানা সাহেব ও ঝান্সির রানিকে মসীবর্ণে চিত্রিত করেছেন এবং "জয় ব্রিটিশের জয়" বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন (অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনের "উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য," ১৩৬০, পৃঃ ৫১-৫৪ দ্রষ্টব্য)। ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনীর উপাখ্যান" কাব্য। এই গ্রন্থেও সিপাহি বিদ্রোহের সমর্থন নেই। বিদ্রোহ সম্বন্ধে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়" স্বাধীনতার এই মন্ত্র-প্রচারক' কবি রঙ্গলালের এ বিষয়ে যা সুস্পষ্ট অভিমত ছিল তা তিনি তাঁর "পদ্মিনীর উপাখ্যান" কাব্যেই প্রচার করেছেন। তিনিও এই বিদ্রোহের মধ্যে জাতির

কল্যাণ দেখতে পাননি। "পদ্মিনীর উপাখ্যান" কাব্যের শেষ দিকে ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তন করে মন্তব্য করেছেন :

"ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ বিভাবরী ভোর,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরাজের কৃপা বলে মানস উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার।।
শান্তির সরসী মাঝে সুখ-সরোরুহ বাজে,
মনভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে।"

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, যাঁকে অরবিন্দ ঘোষ "One of the mightiest prophets of Nationalism" বলেছিলেন, তাঁর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর "My Life and Times" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন : "The Mutiny did not touch our people at all in Bengal, but the suppression of it and the returning prospect of settled Government was hailed with universal delight by them" (p. iv)। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা যে এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি, এ কথা তো সুবিদিত। ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের গ্রন্থেও এর স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। এর পরও বলা চলে কি যে "হিন্দু পেট্রিয়টের" উক্তি স্বীকার্য? সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কোন ঘটনা সম্বন্ধে যে মন্তব্য বের হয়, তাকে ডাঃ চৌধুরীর মতো ইতিহাস পণ্ডিতও যে প্রায় বিনা জিজ্ঞাসায় সত্য বলে মেনে নিতে উদ্যত হয়েছেন, তাতে পাঠকের মনে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, লেখক নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে ঘটনাকে কিছুটা বিকৃত করেছেন।

অথচ ডাঃ চৌধুরীর নিজ গ্রন্থেই এমন অনেক তথ্য ও উক্তি দেওয়া আছে যা কিন্তু তাঁর ২৫৯ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত মন্তব্যের ঠিক বিরুদ্ধে যায়। ২৬১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন "That some of the Indians gave shelter to the Europeans or harboured good feelings towards them cannot be urged as conclusive against numerous proofs to the contrary" ১৮৫৭ সানের বিদ্রোহ শেষ পর্যায়ে ভারতীয়দের তরফ থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে রীতিমতো একটা "war of extermination"-এ পরিণত হয়, এই হল ডাঃ চৌধুরীর অন্যতম মত। এই মতের বিরুদ্ধপন্থীরা বলবেন যে, তৎকালেও বহু ভারতবাসী ইংরেজের প্রতি বা ইয়োরোপীয়ানদের প্রতি সহৃদয়ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু ডাঃ চৌধুরীর মতে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন লোকই ছিল বেশি। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য সত্য কিনা সেকথা অন্যত্র বিচার্য, কিন্তু তিনিও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে বিদ্রোহের দিনেও অন্তত কিছুসংখ্যক ভারতবাসী ইয়োরোপীয়ানদের আশ্রয় দিয়েছিল ও তাদের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করত। এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে তাঁর ২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ঘটনার সঙ্গতি কোথায় আর কতটুকু? ২৬৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন "the whole country seething with opposition," আবার ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "commercial and industrial classes," "bankers and traders," "big native princes and chiefs" অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণিরা, দেশী রাজন্যবর্গ ও স্থানীয় অভিজাতেরা বিদ্রোহে তো যোগ দেয়-ই নি

বরং ইংরাজপক্ষকে শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, আর যারা সেদিন ইংরেজদের প্রতি সহৃদয়ভাবাপন্ন ছিল তারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় ("targets of attack in almost every place", p. 279)। শুধু তাই নয় গ্রন্থকার আবার ২৮৫ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন যে, এমন কি অনেক স্থলে উপদ্রুত এলাকায়ও বহুলোক ইংরেজের প্রতি অনুগত ছিল। অথচ আবাব ২৬১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন "the universal hatred of the English aliens gave the revolt of 1857 a national colouring" ২৬১ ও ২৬৪ পৃষ্ঠায় লেখকের উক্তির সঙ্গে ২৭৯ ও ২৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত তাঁর কথাগুলি কি স্ব-বিরোধী উক্তি নয়? এত কথা, সাক্ষ্য ও নথিপত্রের উপর ভর করে যিনি গবেষণায় অগ্রসর হয়েছেন, কেন তাঁর পদে পদে এই দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ?

(খ) ২৫৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ চৌধুরী লিখেছেন যে, মীরটে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হবার পরই বিদ্রোহী সিপাহিরা দিল্লি অভিমুখে ধাওয়া করে, কারণ দিল্লিতে তখন সমাসীন ছিলেন বাহাদুর শা—"the emperor according to the Indian legitimists, which gave the movement a traditional countrywide base." ১৮৫৭ সনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতের রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যপন্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বাহাদুর শাকে বিধিসংগত সম্রাট ("emperor") বলাতে এখানে আপত্তি তুলবেন অনেকেই। আউরংজেব মারা যান ১৭০৭ সনে। তারপর থেকে মো'-ল সাম্রাজ্য দ্রুতবেগে ধসে পড়তে থাকে। এই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের দিকে দিকে,—যেমন বাংলা অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে,—স্থানীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতার ঝান্ডা খাড়া করেন। ১৭৩৯ সনে নাদির শা'র ভারত আক্রমণ এই পতনের গতিকে ত্বরান্বিত করে তোলে। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠে দুর্ধর্ষ মারাঠা জাতির সাম্রাজ্য। সমগ্র মহারাষ্ট্রে, দাক্ষিণাত্যের কতক অঞ্চলে ও উত্তর ভারতের কোন কোন এলাকায় উড়তে থাকে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিজয় নিশান। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল যে, মারাঠারা বুঝি হবে রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে মোগল সম্রাটদের উত্তর-সাধক, কিন্তু সে আশা শীঘ্রই চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর ভারতের রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে দেখা দিল নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ—এককথায় "মাৎস্যন্যায়ের" অবস্থা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় "state of nature"। এই হল প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের রাষ্ট্রিক ভারতের রূপ। তারপর এই পটভূমিতে শতধা বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ও অরাজক ভারতে গড়ে উঠল ইংরেজ-সাম্রাজ্য নানা যুদ্ধ, কূটনীতি, অত্যাচার ও দিগ্বিজয়ের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এসে দেখা গেল ইংরেজ শক্তি এদেশে সর্বেসর্বা, প্রায় গোটা ভারত রাষ্ট্রিকভাবে ইংরেজ-শাসনে ঐক্যগ্রথিত বা কবলিত। ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহ শুরু হবার সময় মোগল রাজবংশের সর্বশেষ প্রতিনিধি, বাবর থেকে হিসাব করলে দ্বা-বিংশতিতম বংশধর, বাহাদুর শা নামেমাত্র দিল্লিতে সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তার প্রকৃত শাসন ও এলাকা লালকেল্লার বাইরে বেশিদূরে ছিল না। মীরটে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে ওঠার পরই সিপাহিরা দিল্লির অভিমুখে অগ্রসর হয় ও বাহাদুর শাকে দিল্লিশ্বর বলে ঘোষণা করে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সকলেই কি বাহাদুর শাকে legitimate emperor of India বা ভারতের বিধিসংগত সম্রাট বলে স্বীকার করেছিল? কানপুরে বিদ্রোহ শুরু হলে বিদ্রোহীরা যখন দিল্লির অভিমুখে মীরট-বিদ্রোহীদের পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হতে চাইল, তখন নানা

সাহেব তাদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন, বিদ্রোহীদের অগ্রগামী দলকে কানপুরে ফিরিয়ে আনলেন, আর সেখানে নিজেই জাঁক-জমকের মধ্যে "পেশোয়া" উপাধি গ্রহণ করেন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন, কানপুরের বিদ্রোহী দলকে দিল্লি অভিমুখে গমন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আজিমুল্লা খানের অংশই বেশি ছিল। প্রথমে হয়তো নানা সাহেবও দিল্লির দিকে বিদ্রোহীদের পরিচালনা করে নিতে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজিমুল্লা খানের প্ররোচনাতেই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হন (Eighteen Fifty-Seven, p. 138 দ্রষ্টব্য)। এ যদি সত্য হয়, তবে বুঝা যায় মুসলমান বিদ্রোহীদেরও সকলে ১৮৫৭ সনে বাহাদুর শাকে legitimate emperor of India বলে মনে করত না—আর হিন্দু বিদ্রোহীদের বেশির ভাগ লোক তো নয়ই। বিদ্রোহীদের সকলেই যদি বাহাদুর শাকে ১৮৫৭ সনে ভারতের বিধিসংগত সম্রাট বলে স্বীকার করত, তবে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান অধিনায়ক এমন আচরণ করলেন কেন? নানা সাহেবের আচরণ থেকে পরিষ্কারভাবে এই সত্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ দিনে যারা ভারতের রাষ্ট্রিক মঞ্চে "legitimists"-এর বা পুরানো ঐতিহ্যপন্থীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে মতের ও আদর্শের মিল ছিল না, অন্তত বাহাদুর শাকে ভারতের সম্রাট করার বিষয় নিয়ে। বিদ্রোহীদের একদল চেয়েছিল বাহাদুর শাকে কেন্দ্র করে মোগল সাম্রজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, আর বিদ্রোহীদের অন্যদল চেয়েছিল নানা সাহেবকে কেন্দ্র করে লুপ্ত মারাঠা সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে। কাজেই ডাঃ চৌধুরী বাহাদুর শাকে যে "the emperor according to the Indian legitimists" বলেছেন, তা মোটেই বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের কথা নয়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ মজুমদারের গ্রন্থের ১-২, ১২৭, ১৮৭-১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(গ) ডাঃ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, সিপাহি বিদ্রোহের জনবিদ্রোহে রূপান্তরের বিষয়ে সমসাময়িককালে এবং পরবর্তীকালে অনেক দেশি ও বিদেশী পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। "The greatest protagonist of the theory that the revolt of 1857 was only a mutiny of the troops was William Muir...His thesis was that it was essentially a military mutiny, a struggle between the government and its soldiers" (p.284)। বিদ্রোহের স্বরূপ নিয়ে উইলিয়াম ম্যুরের অভিমত কি ছিল, সে প্রসঙ্গে ডাঃ চৌধুরী একবার বললেন যে ম্যুরের মতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ হল নিছক সামরিক বিদ্রোহ ("only a mutiny of the troops"), আবার তার পরেই বললেন এ বিষয়ে ম্যুরের মত হল, মূলত সামরিক বিদ্রোহ ("essentially a military mutiny")। এ দুই বস্তু কিন্তু এক নয়। ডাঃ চৌধুরীর ওই উদ্ধৃতি পাঠকদের পক্ষে স্পষ্টত বিভ্রান্তিকর—বিদ্রোহ বিষযে ম্যুরের কোন মতটি তা হলে সত্য তা কিন্তু বোঝা গেল না।

(ঘ) বিদ্রোহের স্বরূপ নির্ণয়ে ডাঃ মজুমদারের কোনো কোনো মতামত সৈয়দ আমেদ খান ও চার্লস রেকসের সমসাময়িক সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমেদের মূল বই লেখা হয় ১৮৫৮ সনে এবং এর ইংরেজি অনুবাদ কলকাতা থেকে বের হয় ১৮৬০ সনে (যদিও ডাঃ চৌধুরী তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ১৮৭০ সন লিখেছেন)। ইংরেজি অনুবাদকের নাম ক্যাপ্টেন লিজ (Captain Lees)। রেক্সের বই বের হয় বিলাত থেকে ১৮৫৮ সনে। উভয় গ্রন্থই স্পষ্টত সিপাহি বিদ্রোহের একেবারে সমসাময়িক রচনা। ডাঃ মজুমদারের কোন কোন মত এই দুই সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রসঙ্গে ডাঃ চৌধুরী

নিজ গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয় ব্যাপারে যদিও ডাঃ মজুমদারের বিশ্লেষণ খুবই তীক্ষ্ণ ("very penetrating"), তথাপি তাঁর মতামত আমেদ খান ও রেকসের দ্বারা রঞ্জিত ("coloured"), অর্থাৎ ডাঃ চৌধুরী ঐ দুই সমসাময়িক ব্যক্তিদের লেখার ঐতিহাসিকতায় সন্দিহান। যেহেতু আমেদ বলেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন অংশের জনতা বিদ্রোহী নেতাদের সাহায্যার্থে এগোয় নি (ডাঃ চৌধুরী মনে করেন এ ধারণা ঠিক নয়), অতএব ডাঃ চৌধুরীর যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে আমেদ খানের বই নির্ভরযোগ নয় ("he cannot be regarded as a reliable authority", p. 288)। যেহেতু কোন লেখকের কোন রচনার বিশেষ একটা উক্তি বা অংশকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না, অতএবং তার সমগ্র রচনাটাই নির্ভরযোগ্য নয় বলে ঘোষণা রাজনীতিকের সিদ্ধান্ত হলেও ঐতিহাসিকের তা সিদ্ধান্ত হতে পারে না। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব বিচারকের দায়িত্বের মতো সুমহান। একতরফাভাবে সাজানো আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে কোনো পক্ষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি করা তার ধর্ম নয়। রেকসর বই সম্বন্ধেও ডাঃ চৌধুরীর আপত্তি কারণ হচ্ছে ঐ বই নাকি সুপরিচিত রাজকর্মচারীর (রেক্স্ তৎকালে আগ্রাতে জজিয়তি করতেন) সুরে লেখা। ডাঃ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের দেখাতে চেয়েছেন জনপ্রিয় বা জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই বলে, অথচ আমেদ ও রেকসের তথ্য ও সাক্ষ্য অনেকাংশেই বিপরীত। নিজ মত প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁদের দেওয়া সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রতিকূল মনে হওয়াতেই ডাঃ চৌধুরী তাঁদের তথ্যবহুল ও মূল্যবান গ্রন্থদ্বয়ের ঐতিহাসিকতায় সন্দিগ্ধ হয়েছেন কিনা স্বতই এ প্রশ্ন পাঠকের মনে ওঠা স্বাভাবিক। আর এই আশঙ্কা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি ডাঃ চৌধুরীও নিজ গ্রন্থে মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত আমেদ ও রেকসের মতামত সত্য বলে গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি—যেমন ৪ পৃষ্ঠায়, ১০ পৃষ্ঠা, ৮২ পৃষ্ঠায়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, আমেদ ও রেকসের বইয়ের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেও, ভারতের দুই প্রধান ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেন কিন্তু এ ধরনের কোন সন্দেহের যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলে মনে করেননি।

(ঙ) ডাঃ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে সিপাহি বিদ্রোহের দিনে "Civil rebellion" বা অ-সামরিক জনগণের বিদ্রোহ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু এত বড় বইয়ে এই ধরনের আলোচনায় তৎকালীন অবস্থার বিপরীত দিকটারও বেশ কিছু আলোচনা থাকা যুক্তিযুক্ত ছিল অর্থাৎ বিদ্রোহের যুগে যে সকল ভারতবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিবর্তে ইংরেজ শাসনের সপক্ষে সহায়তা ও শক্তি প্রয়োগ করেছিল তাদের কথা। তাহলেই পাঠকেরা বুঝতে পারত ভারতীয় জনসাধারণের তৎকালে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ও কর্ম-প্রচেষ্টা তুলনায় কিরূপ ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের পেছন-পেছন অ-সামরিক লোকেরাও অনেক স্থানে বিদ্রোহ করেছিল। এটা একটা জ্ঞাতব্য তথ্য আর সেই তথ্য তো বহুপূর্বে-লেখা নর্টনের The Rebellion in India (1857) ও Topics for Indian Statesmen (1858) বই থেকেও কম-বেশি পেয়েছি, এবং যার আরও বেশি পরিচয় ডাফ (Duff), কায়ে (Kaye), ম্যালিসন (Malleson) প্রভৃতির রচনায়ও পেয়েছি। ডাঃ চৌধুরী সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন ও সেই আলোচনা থেকে নিজে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। কিন্তু ১৮৫৭ সনের ঘটনার প্রকৃতি ও বহরকে সঠিকভাবে বুঝাবার জন তাঁর উচিত ছিল উক্ত ঘটনার অনুকূলে যে

সকল শক্তি, অবস্থা ও ব্যক্তি ক্রিয়া করেনি বা বিরোধিতা করেছিল, সে সকল উপাদানেরও তুলনায় সমালোচনা করা। আর তাতেই সত্যে পৌঁছাবার পথও সুগম হত আর লেখকের মতামতের মধ্যেও নিঃসক্তুতা বা নির্লিপ্ততা প্রকাশ পেত। ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে এবিষয়ে যতটুকু খেয়াল রেখেছেন (নর্টন ও রেকসের বিরুদ্ধ মতামত সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ২১৪-২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য), ডাঃ চৌধুরী তা পারেননি। যে সকল সমসাময়িক সাক্ষ্য-দলিল তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেন নি, সেগুলির সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের পরই ডাঃ মজুমদার ঐরূপ বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করেছেন—কিন্তু বিচারের আগে নয়। কিন্তু ডাঃ চৌধুরী এতটা যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় অনেকক্ষেত্রেই দিতে অপারগ হয়েছেন। যে সকল সমসাময়িক সাক্ষ্য তাঁর নিজ বক্তব্যের অনুকূল বলে মনে হয়নি বা প্রতিকূল বলে মনে হয়েছে, সেগুলিকেও তিনি যে যথাযথ যুক্তি ও বিচারের পর বাতিল করেছেন তা কিন্তু মনে হয় না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর সৈয়দ আমেদ ও চার্লস রেকস সম্বন্ধে তথ্যহীন উক্তি ও "Native Fidelity" বইয়ের প্রতি তাঁর সজ্ঞান উপেক্ষা।

ডাঃ চৌধুরীর বৃহদাকার বইয়ের মধ্যে মাত্র একটি বারের জন্য Native Fidelity বইয়ের নামোল্লেখ পাদটীকায় দেখা যায়, যদিও এ বইয়ের তথ্য তাঁর গ্রন্থে প্রায় ব্যবহৃত হয়নি বললেই ঠিক বলা হয়। ২৮৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ডাঃ চৌধুরী Native Fidelity during the Mutiny : The Mutinies and the People (1859) গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যদিও গ্রন্থের প্রকৃত নাম হল The Mutinies and the People or Statements of Native Fidelity Exhibited during the Outbreak of 1857-58। জনৈক হিন্দু কর্তৃক লিখিত বলে শুধু বইয়ের গোড়ায় উল্লেখ আছে অর্থাৎ বইখানি বেনামীতে প্রকাশিত হয়। এর পুনর্মুদ্রণ বের হয় ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে কলকাতা থেকে—"By a Hindu"—এই নামে। ৩৩২ পৃষ্ঠায় বইখানি সমাপ্ত। এই বইয়ের লেখক হিসাবে ডাঃ চৌধুরী ২৮৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়ের ("চরণের" বদলে "চন্দ্র" হবে) নামোল্লেখ করেছেন। তথ্য ভুল। ডাঃ সেনের গ্রন্থেও (পৃঃ ৪২৮) অনুরূপ ভুল লক্ষণীয়। মনে হয় ডাঃ সেনের তথ্যের উপর নির্ভর করাতেই এক্ষেত্রে ডাঃ চৌধুরীও ভুল খবর পরিবেষণ করেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন "আমি এবিষয়ে একেবারে definite যে ওই বইয়ের আসল লেখক হলেন কৃষ্ণদাস পাল। যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪) হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর মাত্র কিছুদিনের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদকতা করেন, তিনি ও বইয়ের লেখক নন। হরিশচন্দ্রের সম্পাদনাকালে মিউটিনির সময়েই কৃষ্ণদাস বাবুর বহু লেখা 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয়। ওই লেখাগুলিই অনেকটা একত্র করে পরে Native Fidelity বই তৈরি হয়।" এই প্রসঙ্গে ১৮৯৭ সনে বিলাত থেকে প্রকাশিত Representative Indians গ্রন্থে জি. পি. পিল্লাইয়ের মন্তব্যও (পৃঃ ৫০-৫১) প্রণিধানযোগ্য। কৃষ্ণদাস পালের সম্বন্ধে পিল্লাই লিখেছেন যে, "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রকাশিত তাঁর মিউটিনি সংক্রান্ত ধারাবাহিক লেখাগুলি পড়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাকি বলেছিলেন যে কৃষ্ণদাসবাবু "would be able to do much for his country, if God spared him" অর্থাৎ ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলে তিনি দেশের অনেক কাজে লাগবেন। পিল্লাই আরও লিখেছেন যে, তৎকালেই কৃষ্ণদাস পালের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানা পুস্তকও বের হয়েছিল, তার মধ্য একখানার নাম ছিল

The Mutinies and the People অর্থাৎ ১৮৫৯ সনে বেনামীতে প্রকাশিত বইয়ের আসল নামকরণ যা তাই, যদিও সংক্ষেপে এই বই Native Fidelity বলে পরিচিত। ১৯০৫ সনে এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ কালে প্রকাশক ভূমিকায় লিখেছিলেন যে এই বইয়ের অজ্ঞাতনামা হিন্দু লেখক হলেন একজন ভারতীয় সাংবাদিক ("an Indian Journalist")। শ্রদ্ধেয় হেমেনবাবুর মতে, এই ভারতীয় সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল ছাড়া আর কেউ নন। সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধানে (সপ্তম সংস্করণ, ১৯৩৬, পৃঃ ১১৭৩) শম্ভুচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওযা আছে, তাতেও তাঁর নামে Native Fidelity গ্রন্থের কোন উল্লেখ নেই—উল্লেখ আছে On the causes of the Mutiny (১৮৫৭) নামক গ্রন্থের। উক্ত অভিধানের সপ্তম সংস্করণ যিনি সম্পাদনা করেন, সেই প্রকাশচন্দ্র দত্ত ছিলেন শম্ভুচন্দ্রের দীর্ঘদিনের পুরানো বন্ধু। হেমেনবাবু বলেন, অন্য বিষয়ে ভুল হলেও শম্ভুচন্দ্র সম্বন্ধে প্রকাশবাবুর কোন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। এই সকল তথ্য থেকে স্পষ্ট সূচিত হয় Native Fidelity গ্রন্থের প্রকৃত লেখক কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন ও দীর্ঘকাল ধরে ঐ পত্রিকা বিশেষ যোগ্যতাব সঙ্গে পরিচালনা করেন ও মিঃ ইলবার্টের মতে তিনি ওই সংবাদপত্রকে দেশী পত্রিকাগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় করে তোলেন ("raised it from a ne: ly moribund condition to the first place among native Indian journals")। পিল্লাই বলেন যে কৃষ্ণদাস পাল তাঁর "moderation of hi^ views and the sobriety of his criticism"-এব জন্য তৎকালে বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সরকারের সঙ্গে তাঁর মতের সংঘর্ষ ("conflict") উপস্থিত হত। এই কৃষ্ণদাস পালই ১৮৭৪ সনে "হিন্দু পেট্রিয়টের" মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "Home Rule for India" বা ভারতবর্ষের জন্য স্বায়ত্ত শাসনেব দাবি উত্থাপন করে লিখেছিলেন : "Our attention should be directed to Home Rule for India, to the introduction of constitutional government for India in India...If taxation and representation go hand in hand in all British Colonies, why should this principle be ignored in British India?"

এহেন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা Native Fidelity গ্রন্থ ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের স্বরূপ বিশ্লেষণের পক্ষে যাবপরনাই মূল্যবান। এতে আছে বিদ্রোহের দিনেও এদেশবাসীর ইংরেজ-আনুগত্যেব ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হল যে ১৮৫৭ এর বিদ্রোহে সাধাবণ লোকেরা বিদ্রোহ ও বৈরীতার ভাবে ও কর্মে অংশগ্রহণ করেনি ("the feeling of revolt and disloyalty was not shared in by the masses of the people." p. 4)। এই মত লেখক লন্ডন টাইমস, এডিনবার্গ রিভিয়ু, ইংলিশম্যান পত্র ও সরকাবি গেজেট থেকে ইয়োরোপীয়ানদের ভারতবাসী সম্বন্ধে নানা স্বীকারোক্তি তুলে তুলে প্রচুর তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের যেটা তাঁর প্রধান বক্তব্য তারই বিরুদ্ধ যায় এই বইয়ের সাক্ষ্য আগাগোড়া। অথচ এমন একখানা তথ্যবহুল গ্রন্থের সন্ধান পাবার পরও কেন যে ডাঃ চৌধুরী এমনভাবে এর গুরুত্ব উপেক্ষা করলেন, তা বুঝা গেল না। ১৮৫৮ সনে নর্টনের লেখা Topics for Indian Statesmen গ্রন্থে বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে সকল মতামত ব্যক্ত হয়েছিল, তার অনেককিছুর বিরুদ্ধেই কৃষ্ণদাস পালের Native Fidelity গ্রন্থ এক বিরাট সমসাময়িক প্রতিবাদ বিশেষ।

আতঙ্কগ্রস্ত ইউরোপীয়ানদের মনোভাব নিয়ে যে নর্টনের ঐ বই লেখা, তা তৎকালেই কৃষ্ণদাস বাবু উল্লেখ করেছিলেন।

ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেন উভয়েই দেখিয়েছেন যে, ১৮৫৭ এর বিদ্রোহ নিছক সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ ছিল না, সে-আবহাওয়ায় কোনো কোনো অঞ্চলে অসামরিক অভ্যুত্থানও লক্ষণীয়। কিন্তু তাঁরা বলেন, এই বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ ব্যর্থ প্রচেষ্টা—ডাঃ মজুমদারের ভাষায় "the dying groans of an obsolete aristocracy" (p. 241). ডা. চৌধুরীর বইয়ে ২৯৫ পৃষ্ঠায় "obsolete aristocracy"-র বদলে "obsolete autocracy" উদ্ধৃত করা হয়েছে। খুব সম্ভব এটা মুদ্রণ-প্রমাদ। ডাঃ চৌধুরীর মত ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ তাঁর মতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ হল প্রগতিশীল আন্দোলন, অনেকাংশে জাতীয় আন্দোলন, জনগণের স্বাধীনতার লড়াই। ডাঃ চৌধুরী এই আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন "rising of the people" (p. 260), "national colouring" (p. 261), "the people in general were in sympathy with the rebels" (p. 262), "a vague feeling of patriotism" (p. 263), "co-operation of the general mass of the people, the country people, the villagers of different social status" (p. 275), হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা "to shake off the fetters of British rule" (p. 281)। এই ধরনের নানা কথা লেখার পর তিনি ঐ বিদ্রোহ সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য লিখেছেন : "The revolt of that year appears to have been the first combined attempt of many Classes of people to challenge a foreign power. This is a real, if remote, approach to the freedom movement of India of a later age...Who knows that the inception of the nationalist movement was not contained in the rising of 1857 after the fashion of the oak in the acorn? Because the revolt of 1857 was not merely anti-British but a movement expressing profound desires for freedom" (pp. 297-299)।

এবার বিচার করে দেখা যাক, সত্যই ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ প্রগতিমূলক ছিল, না প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। এই প্রশ্নের সদুত্তর বহুলাংশে নির্ভর করে প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল এই দুই পরিভাষা কি অর্থে ব্যবহার করা হয় তার উপর। অর্থাৎ এ আলোচনা খানিকটা দার্শনিক গবেষণার বিষয়। সমাজ স্থানু নয়—চিরচঞ্চল তার গতি ও প্রবাহ। প্রগতি বা উন্নতি বললেই সূচিত হয় পরিবর্তন বা অবস্থান্তর, কিন্তু যে কোন পরিবর্তনই প্রগতি বা উন্নতির লক্ষণ নয়। উন্নতির জন্য বা জীবনবিকাশের জন্য অনেক সময়ই প্রচলিত বিধি ও আইন ভাঙার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যদিও যে-কোন আইন লঙ্ঘনকারীই বা সমাজ-বিদ্রোহীই উন্নতির সহায়ক বা প্রগতির ধারক ও বাহক নয়। স্বভাবতই তা হলে প্রশ্ন উঠবে, প্রগতি বা উন্নতি বলে কাকে? কিসের দ্বারা সূচিত হয় কোন ঐতিহাসিক আন্দোলন প্রগতিমূলক অথবা প্রতিক্রিয়াশীল কিনা? ইতিহাসে কোন আন্দোলনের স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝা যায় ঐ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিশ্লেষণ থেকে, নেতৃত্ব কোন উপাদানে গঠিত ছিল তার পরিচয় থেকে, এবং ভবিষ্য ফলাফল থেকে এবং আন্দোলন ব্যর্থ হলে সম্ভাব্য ফলাফল থেকে। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রবল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। নানা কারণে বিভিন্ন শ্রেণির

লোকদের মনে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, ইংরেজ-বিরোধী অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে ইংরেজ-শাসনে অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ডালহাউসির স্বত্ব বিলোপ নীতি ও রাজ্যদখলের নীতি অনুসরণের ফলে। অভিজাতশ্রেণির লোকেরা ও স্থানীয় প্রধানেরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাদের সম্পত্তি ও জমিদারি হস্তচ্যুত হওয়ার দরুন। ইংরেজশাসনের নানা উদারনৈতিক সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায় রক্ষণশীল, ঐতিহ্যপন্থী জনসাধারণও ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীতে সিপাহিদের ধূমায়িত অসন্তোষের মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদন থেকেও ("grievances of the ordinary type regarding pay and conditions of service") ধর্মগত কারণ ছিল প্রবলতর। সিপাহিদের প্রতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দুর্ব্যবহার, নিম্নপদস্থ অফিসারদের নৈতিক মানদণ্ডের অবনতি, সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার ক্রমবর্ধমান অভাব, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ, উচ্চ সরকারি পদ থেকে দেশীয় লোকদের অবাঞ্ছিত বর্জননীতি, ব্রিটিশ আইন-কানুনের বা বিচার পদ্ধতির জটিলতা, ভূমি-বিক্রয়ের নতুন নতুন আইন, পল্লী অর্থ-নীতিতে ভাঙন এবং সর্বোপরি ধর্মচ্যুতি ও জাতিচ্যুতির আশঙ্কা—এই সকল রকমারি কারণে ১৮৫৭ সনে আমরা দেখি ভারতবর্ষের নানা শ্রেণির বহুসংখ্যক লোকই ইংরাজ শাসনে অসন্তুষ্ট, বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে উঠেছে। তাই ১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থানে বিভিন্ন শ্রেণির লোকই বিভিন্ন কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এর মধ্যে রাজন্যবর্গ, অভিজাত শ্রেণি, তালুকদার সিপাই ও জনসাধারণ—সকল শ্রেণির লোকই অংশগ্রহণ করে, সর্বত্র না হলেও অন্তত কোন কোন অঞ্চলে—যেমন অযোধ্যা ও শাহাবাদ এলাকায়। কিন্তু এই সকল সীমাবদ্ধ অঞ্চলেও বিদ্রোহের অংশীদারীদের চিন্তা ও কর্ম ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা অর্জন ও সংরক্ষণের চেষ্টা থেকে কোন মহত্তর বা বৃহত্তর লক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। এক সাধারণ ইংরেজ-বিদ্বেষ (common anti-British hatred) সকল বিদ্রোহীদের মধ্যে এক ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করলেও, গভীর স্বার্থের অমিল, আদর্শ ও লক্ষ্যের ভয়ঙ্কর বিভিন্নতা স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠে। যে ধর্মভয় ও জাতিচ্যুতির ভয় সামরিক ও অসামরিক বিদ্রোহীদের সকলের মনেই কমবেশি অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, যে ধর্মগত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী নেতারা ফতোয়ার পর ফতোয়া জারি করেছিলেন হিন্দু-মুসলমানকে একতাবদ্ধ করে বিধর্মী খ্রিস্টান, বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, তাতেও দুর্বলতা দেখা দিল মারাত্মকভাবে। ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থের ২২৭-২৩৪ পৃষ্ঠায় নানা সমসাময়িক সাক্ষ্য ও প্রমাণযোগে দেখিয়েছেন যে মহাবিদ্রোহের দিনে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরাই ছিল বেশি বিদ্রোহীভাবাপন্ন ("comparatively more rebellious") এবং বিদ্রোহের অগ্নিযুগেও হিন্দু-মাসলমান শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালনা করতে পারেনি। অন্যত্র তো দূরের কথা দিল্লি নগরীতেও—যে দিল্লি ইংরেজদের দ্বারা অবরুদ্ধ হতে চলেছে এবং যে দিল্লির নিরাপত্তার উপর সংগ্রামের ভবিষ্যৎও বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল সেখানেও—দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলিত হতে পারেনি। দিল্লিতে হিন্দু-মুসলমানের যে বিরুদ্ধ পারস্পরিক মনোভাব লক্ষ করা যায়, বারাণসীতেও তাই। যুক্ত প্রদেশের বহুস্থানে--বেরিলি, বিজনোর, মোরাদাবাদ অঞ্চলে—হিন্দু মুসলিম অনৈক্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে কুৎসিত রূপ গ্রহণ করে। এমন কি অযোধ্যাতেও এই হিন্দু-মুসলিম

সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ প্রবল ছিল। অথচ সকলের স্বাধীনতা হরণকারীই হল সেদিন বিধর্মী, বিদেশী ইংরেজ শাসক। কিন্তু তবু ঐতিহাসিক নানা কারণে হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বিদ্বেষ তখনও ভয়াবহরূপে বর্তমান ছিল—এমন কি ১৮৫৭ সনেও। তাই রাজপুত শিখ ও মারাঠারা বাহাদুর শাহের নামে মুসলমান বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারল না। বরং শিখরাই (গুর্খাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে) সেদিন ইংরাজকে সাহায্য করেছিল বিদ্রোহ দমন করতে। ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা দলগত স্বার্থের তাগিদ ছাড়া বা তার অতিরিক্ত কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য বা আদর্শ সেদিন বিদ্রোহীদের উদ্বুদ্ধ করেনি। যে স্বদেশ-বাৎসল্য বা দেশপ্রেমের কথা রামমোহনের পর রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রচার করেন, সেই দেশাত্মবোধ, ভারতবর্ষকে জননী জন্মভূমি জ্ঞানে সেবার যে আদর্শ, তা বিদ্রোহ দিনে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বা সমর্থকদের মনে তখনও স্থানলাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্রোহের বহুদিন পরে লিখেছিলেন : "এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাংলাদেশে ছিল না, কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত। ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট" (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস ও বাঙ্গালা", ১৯৩৬, পৃঃ ৯-১০ ও ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এবার বিবেচ্য মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল কোন ধরনের? বিদ্রোহ যেখানে—যেমন অযোধ্যা ইত্যাদি অঞ্চলে—উল্লেখযোগ্য ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করে সেখানে বিদ্রোহে সিপাহিদের ছাড়া অংশ নেয় রাজন্যবর্গ, তালুকদার ও জনসাধারণ। জনসাধারণ তো বিপ্লবের হাতিয়ার। তারা ভাঙে, তারা গড়ে। সিপাহিরা লড়াইয়ে নেমেছিল, সাময়িক কারণে, ব্যক্তিগত বিক্ষোভে, তালুকদারেরাও তাই, রাজন্যবর্গেরাও তাই। জনসাধারণ নানা কারণে, বিশেষ করে ইংরাজ সরকারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিবাদে, বিক্ষুব্ধ, বিচলিত হয়েছিল। তার উপর ছিল ব্রিটিশ শাসনের আওতায় এদেশে অর্থনীতির রূপান্তর ও তজ্জনিত তাদের দুর্ভোগ ও দুর্দশা। তাই তারাও ইংরেজ-বিরোধিতায় সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে, কখনো প্ররোচনায়, কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু এই বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হল বিদ্রোহী সিপাহিরা। আর রাষ্ট্রিকভাবে তাদের নেতৃত্বভার শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিল রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণির লোকেরা। একদল বিদ্রোহী চাইল বাহাদুর শাকে "সম্রাট" করে মোগল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার, আবার আর একদল চাইল নানা সহেবকে "পেশোয়া" করে মারাঠা-সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু মহৎ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করার মতো যোগ্যতা না ছিল বাহাদুর শাহের, না ছিল নানা সাহেবের। তারা চেয়েছিল ও সেই সঙ্গে সামন্ত শ্রেণির লোকেরাও চেয়েছিল অষ্টাদশ শতকের স্বাধীনতা ফিরে পেতে অর্থাৎ বিশৃঙ্খল, অরাজকতাপূর্ণ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের রাষ্ট্রিক অবস্থার প্রত্যাবর্তন করতে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পটভূমিতে ঐক্যবদ্ধ, সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠাকে যদি প্রগতি বলে স্বীকার করি (ইয়োরোপের ইতিহাসে ঐতিহাসিকগণ এই বিবর্তনকে প্রগতিশীল অভিব্যক্তি বলেই স্বীকার করে থাকেন), তাহলে একথা মানতেই হবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার বা মাৎস্যন্যায়ের পটভূমিতে ভারতবর্ষে প্রাক্-১৮৫৭-র যুগে ইংরেজ শাসন ও সাম্রাজ্যের

দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে প্রগতিশীল অভিব্যক্তি। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের নায়কগণ ভাঙতে চেয়েছিল ইংরেজ শাসনের ঐ কাঠামো। কাজেই রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে ঐ প্রচেষ্টাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা ছাড়া উপায় নেই।

মধ্যযুগের অরাজকতার পটভূমিতে দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠাই প্রগতির বাহন। কিন্তু একবার যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, সেখানে সেই রাজশক্তিকে স্বৈরাচারের পথ থেকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে পরিচালিত করাই আবার প্রগতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের তুলনায় ভারতে রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে ইংরেজ নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত যে বিবর্তনের ধারা তা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না, ছিল প্রগতিমূলক। কিন্তু বিদ্রোহোত্তর যুগে (১৮৫৭-১৯০৫) দেশের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়, নিয়মতান্ত্রিক শাসনের আদর্শ বহু লোকের চেতনায় ধাক্কা দেয়, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার ও স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। একবার এই মনোভাব ও আদর্শ দেশের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে গেলে, ঐ পথ ধরে নব আদর্শের সন্ধানে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাই প্রগতি—অভাব বা বিরোধিতাই প্রতিক্রিয়া। রামমোহন থেকে সুরেন ব্যানার্জী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় জননায়ক এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতি কমবেশি সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন। জে. কে. মজুমদার সম্পাদিত Indian Speeches and Documents on British Rule, 18?‌.-1918 (কলিকাতা, ১৯৩৭) গ্রন্থে এর বহু সাক্ষ্য ধরে রাখা আছে। তারা মোটের উপর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক বৈধতায় বিশ্বাসী ছিলেন, অথচ যুগের মাপকাঠিতে সমাজচেতনা বা রাষ্ট্রিক অধিকারের বোধ তৎকালে এদের মনে কারো থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। ১৯০২ সনের আমেদাবাদ কংগ্রেসেও সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজের বিরুদ্ধ নানা অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সনে অরবিন্দ ঘোষ ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "A nation politically disorganised, a nation morally corrupted, intellectually pauperised, physically broken and stunted is the result of a hundred years of British rule, the account which England can give before god of the trust which He placed in her hands." এ হল ১৯০৫-০৬ সনের বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী—ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নয়, —আর প্রাক ১৮৫৭ সনের দৃষ্টিভঙ্গী তো কোনমতেই নয়। অথচ পটভূমি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকার ফলেই আর একালের চোখ দিয়ে সেকালের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দেখার ফলেই বহু পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব আজ গোলে পড়েছেন। প্রাক্-১৮৫৭ সনের ভারতে ইংরেজ শাসন কেবল শোষণ আর যথেচ্ছারিতা, অতএব প্রতিক্রিয়াশীল, এই ভ্রান্ত ধারণার মোহে সমাচ্ছন্ন থাকার দরুনই আজও বহু পণ্ডিত ও গবেষক মনে না করে পারেন না যে ইংরেজ-বিরোধী, ইংরেজ সাম্রাজ্য বিরোধী ভারতীয় বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানই বুঝি প্রগতির বাহক। ১৮৫৭ সনের ইংরেজ শাসন প্রাক্-ইংরেজ যুগের তুলনায় মোটেই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না, বরং ছিল অনেক বেশি প্রগতির সহায়ক। কাজেই সেদিনের ইংরেজ-বিরোধী মহাবিদ্রোহকে, এমনকি অযোধ্যার অভ্যুত্থানকেও, প্রগতিমূলক আন্দোলন বলতে পারি না। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের স্বাধীনতায় অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা ইতিহাসের বিচারে প্রতি-বিপ্লব। যে কারণে সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে Fronde-এর মতো ব্যাপক অভ্যুত্থানও প্রতিক্রিয়াশীল,

ঠিক সে-কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রিক পরিবেশে ১৮৫৭-র ইংরেজ-বিরোধী অভ্যুত্থানও প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া।

আর একটা কথা। ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণটাই একমাত্র সত্য নয়, ইংরাজশাসনে আমরা পেয়েছিলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার নতুন আলোক—পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য সমাজ দর্শন, পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্প, এক কথায় বলা যেতে পারে আধুনিকতার ধারা ও প্রবাহ। ইংরেজ শাসনে এদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে উদারনৈতিক পরিবর্তন বা বিপ্লব হতে শুরু করে, তার গতিকে ত্বরান্বিত করা নয়, ব্যর্থ করাই ছিল বিদ্রোহীদের তৎকালে প্রধান লক্ষ্য। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ততটা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নয়, যতটা তার আমদানি-করা বা প্রবর্তিত আধুনিক উদারনৈতিক, নূতন সমাজ-দর্শন, নূতন শিক্ষা, নূতন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ-প্রবর্তিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারাকে যদি প্রগতিশীল বলে স্বীকার করি—তৎকালের যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল, হরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই একথা স্বীকার করেছিলেন—তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হয়। ডাঃ চৌধুরী নিজ গ্রন্থে ২৭৪ পৃষ্ঠায় যে লিখেছন : "The movement was a challenge to the British system of law, revenue, production and property relations." তা কিন্তু সত্য বলে মনে হয় না। ইংরেজ-বিরোধী তৎকালীন যে অভ্যুত্থান তা আসলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণির নানারূপ ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ দূরে করবার জন্য প্রচেষ্টা, কিন্তু মূলত ব্রিটিশ সরকার বা সেই সরকার প্রবর্তিত আইন-ব্যবস্থা, রাজস্ব-ব্যবস্থা, উৎপাদন-ব্যবস্থা, সম্পত্তিগত অধিকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়। অর্থাৎ বিদ্রোহীগণ নির্দিষ্ট কতকগুলি অভাব-অভিযোগ দূর করতে চেয়েছিল এক মরিয়া অবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে, কিন্তু গোটা ইংরাজ শাসনকে উৎখাত করে সমাজ-বিপ্লবের পথে পা বের করেনি। অর্থাৎ যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আজ ১৯৫৭ সনেও আমরা জাতি হিসাবে দাঁড়াতে পারলুম না, সেটা ১৮৫৭ সনেই ঘটে যাবার উপক্রম হয়েছিল মনে করলে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করা হবে। আর যদি সত্য সত্যই ১৮৫৭-র বিদ্রোহ "British system of law revenue, production and property relations"-এর বিরুদ্ধে চালিত হয়ে থাকে, তবে তো তা স্পষ্টত প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া। ডাঃ চৌধুরীও এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার থেকে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হয়। তাঁর গ্রন্থের ২৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "Ideas of a free and independent government meant nothing further than the restoration of the power of the local chiefs and were not conceivale in the context of the repudiation of the monarchical principle. India in the mid-nineteenth century did not possess the material requisites for advanced political ideas and the insufficiency of her economic life rendered impossible any real extension of the revolution."

তৎকালে রাষ্ট্রিক চেতনা-সম্পন্ন ও ভবিষ্য উন্নতি বা প্রগতির দৃষ্টি-সম্পন্ন যে একটিমাত্র বিশিষ্ট শ্রেণি এদেশে দেখতে পাই তা হল ইংরেজি-শিক্ষিত নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ইংরেজ শাসনে এই শ্রেণির বিবর্তনকে রাজা রামমোহন রায় উনিশ শতকের প্রারম্ভেও সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এই মনে করে যে জাতীয় উন্নতির ধারক ও বাহক হবে এই শ্রেণির লোকেরাই। কাজেই ইংরেজ শাসনে এই শ্রেণির অভ্যুদয়ে তাঁর খুশি হবার

কারণ ছিল যথেষ্ট। রামমোহন ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তন করলেও, তিনি চিরদিনের জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেন নি। ভবিষ্য ভারতের স্বাধীন মূর্তিও তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠেছিল। বিলাতে থাকাকালীন রামমোহন রায় নাকি তাঁর সেক্রেটারি আর্নটকে বলেছিলেন যে, আগামী চল্লিশ বৎসরের জন্য ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রয়োজন আছে (Commemoration Volume of the Rammohun Ray Centenary Celebrations, Calcutta, 1935, Part II, pp. 95-96-এ বিপিন পালের প্রবন্ধ পঠিতব্য)। রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রীতি শুধু ধর্মক্ষেত্রেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল না, রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন : "অন্যান্য কথা ত্যাগ করিলে আমরা তাহার প্রবল অভিব্যক্তি দেখিতে পাই--১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচক ব্যবস্থার প্রতিবাদে" (কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, পৃঃ ৩৭)। এদেশে সংবাদপত্র প্রথম ইয়োরোপীয়ানদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয় এবং প্রথম যুগের পত্রগুলিতেও অনেক সময় সরকারের উপর এমন তীব্র আক্রমণ থাকত যে সমালোচনায় অসহিষ্ণু রাজপুরুষেরা সংবাদপত্র দলনের চেষ্টায় ব্রতী হন। ১৮২৩ সনের ১৫ মার্চ সরকারপক্ষ তৎকালীন নিয়মানুসারে এক কঠোর আইনের খসড়া প্রস্তুত করে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থাপিত করে। ইহারই ঠিক দুই দিন পরে উক্ত আইনের খসড়ার প্রতিবাদে আদালতে এদেশবাসীর পক্ষ থেকে এক দরখাস্ত পেশ করা হয়। দরখাস্তকারীদের মধ্যে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন। "দেখা যাইতেছে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ চেষ্টার প্রতিবাদে রামমোহন একক ছিলেন না, পরন্তু আরও ৫ জন বাঙ্গালি তাঁহার সহকর্মী হইয়াছিলেন। ইঁহারা যে দরখাস্ত পেশ করেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা স্বাধীনতার কিরূপ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন" (কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, পৃঃ ৩৭-৩৯)। আবার এই ঘটনারও প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সরকার যখন সভা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেছিল তখনও ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে কেহ কেহ—যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁর দুই আত্মীয় ও তাঁর বন্ধু রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তি একযোগে এই সরকারি আদেশের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করেছিলেন।

১৮২৩ সনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক দেশবাসীর চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ১৮৩৫ সনে চার্লস মেটকাফ বড়লাট হয়ে ভারতে এসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। তার এই আচরণে বিলাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারেরা তার উপর বিরক্ত হলে তিনি পদত্যাগ করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এদেশের লোকেরা মেটকাফকে শুধু অভিনন্দিত করেই ক্ষান্ত থাকেনি, অর্থ সংগ্রহ করে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ সৌধও নির্মাণ করে।

এদিকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধের উন্মেষও দেশবাসীর মনে জাগ্রত হতে থাকে। "প্রথমে তাহা অধিকার লাভের ও প্রাপ্ত অধিকার রক্ষার চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে।" ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকে যে আন্দোলন ব্যতীত অধিকার লাভ বা রক্ষা করা যায় না। তাই তারা দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার শুরু করে। তারা যে সকল সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করল, তাতেও রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হতে থাকে।

১৮৩৮ সনে তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে প্রমুখ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় Society for the Acquisition of General Knowledge বা জ্ঞানার্জন সভা স্থাপিত হয়। এই সভায় নানা বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতিরও চর্চা হত। হেমেনবাবু লিখেছেন : "একদিন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে রামগোপাল ঘোষ তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলে সেই সভায় উপস্থিত ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন ইংরাজিভাষী বাঙালি যুবকদিগের এইরূপ মত প্রকাশে এমনই বিচলিত হয়েন যে, ঐ গৃহে সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন। তিনি বলেন, তিনি বিদ্যামন্দিরকে কিছুতেই রাজদ্রোহের আড্ডা হইতে দিবেন না। তারাচাঁদ চক্রবর্তী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় রিচার্ডসনের কথার উত্তর দেন। তদবধি এই রাজনীতিপ্রিয় যুবকদলকে 'তাঁরাচাঁদের দল' (Chakrabarty Faction) বলা হইত ("কংগ্রেস ও বাঙ্গালা", পৃঃ ৪১-৪৩)।

যখন এভাবে বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত যুবকগণ রাজনীতি চর্চা করছিল, সেই সময় আবার বিলেতেও জর্জ টমসন নামক এক সহৃদয় ইংরেজ ব্যক্তি ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে বক্তৃতা ও অলোচনায় উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৯ সনে তাঁরই চেষ্টায় বিলাতে British India Society স্থাপিত হয় ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত-শাসনপদ্ধতি তীব্র সমালোচনার বস্তু হয়। এই সময়ই বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে টমসনের পরিচয় হয় ও দ্বারকানাথের আমন্ত্রণেই "টমসন ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে দ্বারকানাথের সহিত ভারতে আগমন করেন।" টমসনের বক্তৃতাবলী কলকাতায় যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। যে সকল যুবক পূর্ব থেকেই রাজনীতিচর্চায় উদ্যোগী ছিল, তারা এখন টমসনের সঙ্গে মিলিত হল। যারা টমসনের নিকট তৎকালে এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করে তাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও চন্দ্রশেখর দেব প্রধান (হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়ের নবপ্রকাশিত **The Growth of Nationalism in India, 1857-1905** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।)

এর পরবর্তী ঘটনা ১৮৪৯ সনের "Black Acts" নামক বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন। টাউনহলে সভা করে রামগোপাল সরকারি নীতির তীব্র সমালোচনা করেন ও এক পুস্তিকা লিখে ১৮৪৯ সনের আইনগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই স্বাধীন আচরণ ও মনোভাবের জন্য রামগোপাল শীঘ্রই সরকারি চাকুরি থেকে বিতাড়িত হন। এর পরবর্তী ঘটনা ১৮৫১ সনে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। এই সমিতির সদস্যরা সকলেই ভারতীয় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সেক্রেটারি হিসাবে ভারতের অন্যান্য শহরের জননায়কদের নিকট তৎকালে পত্র প্রেরণ করেন ও তাদের অনুরোধ জানান ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সুসংহত আন্দোলন গড়ে তুলতে। এর পরবর্তী ধাপ হল ১৮৫৩ সনে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকা প্রতিষ্ঠা। নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার দর্পণস্বরূপ ছিল এই পত্রিকা। ডালহাউসির স্বত্ববিলোপ নীতির তীব্র সমালোচনা এই পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্র প্রকাশিত করেন। সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি লর্ড ক্যানিং-এর নীতি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং সিপাহি ও সরকারের মধ্যে শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে বড়লাটকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বিদ্রোহ দমিত হলে

সরকাব পক্ষ যাতে বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, সে জন্য তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। কিন্তু রামগোপাল বা হরিশ্চন্দ্র কেউই সিপাহিদের পক্ষ সমর্থন করে বিশেষ কিছুই বলেননি বা লেখেননি। অথচ ১৮৬০ সনের নীলকর আন্দোলনে হরিশ্চন্দ্র প্রজাদেব পক্ষে কিভাবে লড়াই করতে করতে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন তা সকলেই জানেন। হতভাগ্য প্রজাদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা পূর্ণ সমর্থন জানাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেনি। অথচ এহেন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা সিপাহি বিদ্রোহ সমর্থন করল না, কারণ এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেদিন তারা জাতির কল্যাণ বা দেশের কল্যাণ দেখতে পায়নি। সিপাহি বিদ্রোহের স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া বলে মনে হওয়াতেই তারা এর সমর্থনের পবিবর্তে বরং বিরোধিতাই করেছিল। তাদের বিরোধিতার কারণ তাদের রাজনৈতিক চেতনার বা স্বদেশ-বাৎসল্যের অভাব নয়—১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের প্রকৃতিতে প্রগতিবাদের অভাব। বিদ্রোহ দমিত হবার পর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে (১৮৫৮-১৯০৫) এদেশে ধীরে ধীরে যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই নেতৃত্ব করেছিল—যে নেতৃত্বের পরিণতি দেখতে পাই ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও আধুনিক কালের সামাজিক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের ধারায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বই সর্বপ্রধান উপাদান। ইয়োরোপের যে সকল দেশে এই শ্রেণি আগে বিকাশ লাভ করেছে, সেখানেই সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিপ্লবের শঙ্খধ্বনি বেজেছে আগে আগে; আর যেখানে এই শ্রেণির অভ্যুদয় দেরীতে ঘটেছে, সেখানে বিপ্লবের আগমনও বিলম্বিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে ইতালীর রেনেসাঁস থেকে বর্তমান শতকের বলশেভিক বিপ্লব পর্যন্ত ইয়োরোপীয় ইতিহাস এ সত্য বার বার ঘোষণা করেছে। ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গোটা ভাবতবর্ষকে জননী জন্মভূমি জ্ঞানে পূজা করার আদর্শ এ দেশে নতুন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ও বিকাশ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরবর্তী ঘটনা—রাষ্ট্রিক-স্বাধিকার ও স্বরাজের আন্দোলন আরও পরবর্তী কালের অভিব্যক্তি। এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ পূর্বোল্লিখিত —Growth of Nationlism in India গ্রন্থে পাওয়া যাবে।*

* [এই প্রসঙ্গে হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যাযেব সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সনের Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত মহাবিদ্রোহ বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিতব্য। ১৮৫৭-ব বিদ্রোহ বিংশ শতকের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর সত্যই বেশি প্রভাববিস্তাব কবেছিল কিনা এই বিষয়ে ডক্টব মজুমদারের মতামতের সমালোচনা উক্ত প্রবন্ধে সন্নিবেশিত আছে।]

বর্তমান রচনাটি "ইতিহাস" পত্রিকায় অষ্টম খণ্ডেব প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

উমা মুখোপাধ্যায়

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও অ-সামরিক জনতা

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের বহর ও ব্যাপ্তি নিয়ে অনেকেই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে চলেছেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতক জুড়ে ইংরেজকে এদেশে এর থেকে কোন বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি—একথা সত্য; কিন্তু তাই বলে একথা মনে করলে নিতান্ত ভুল হবে যে, ১৮৫৭ সনে সারা ব্রিটিশ ভারতই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহ মূলত পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যা, নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী এলাকা এবং বাংলা ও বিহারের পশ্চিমাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে, উত্তর-পশ্চিম কোণে দোস্ত মহম্মদ পরিচালিত আফগানিস্তান ছিল ইংরেজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, সিন্ধুপ্রদেশ ছিল শান্ত, রাজপুতনা ছিল অনুগত, মধ্য ও পূর্ব বাংলা ছিল অবিচলিত। বিদ্রোহ-দমনে নেপালও ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। গুর্খা আর শিখ্‌রাই প্রধানত সিপাহি-বিদ্রোহ দমনে ইংরেজকে বিশ্বস্তভাবে সাহায্য করে। তাছাড়া, ভারতীয় সেনাবাহিনীর চার ভাগের এক ভাগ মাত্র বিদ্রোহী হয়েছিল, আর গোটা ভারতের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বা তারও কম বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর "Eighteen Fifty-Seven" (মে, ১৯৫৭) নামক তথ্যবহুল গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, অযোধ্যা ও সাহাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও ১৮৫৭-র বিদ্রোহ জনতার আলোড়নে রূপান্তরিত হয়নি। কাজেই ঐ সময়ে এদেশে ইংরেজকে সর্বত্রই ব্যাপক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এরূপ মনে করা হবে অযৌক্তিক। ইংরেজের সম্মুখে বিপদ উপস্থিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেই বিপদের ক্ষেত্র ও বহর আঞ্চলিকভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐক্যগ্রথিত, ঐক্যবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত ও পূর্বপরিকল্পিত প্ল্যান অনুসারে এ বিদ্রোহের গতি অগ্রসর হয়নি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেন এবিষয়ে উভয়েই একমত। ঐক্যবদ্ধ, পূর্বপরিকল্পিত বিদ্রোহ ইংরেজের পক্ষে যে পরিমাণ ভীতি ও বিপদের কারণ হত, ঐক্যহীন, পূর্বপরিকল্পনাবিহীন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক অভ্যুত্থান—সিপাহিদেরই হোক বা অন্য শ্রেণির লোকদেরই হোক—ইংরেজের পক্ষে ততটা মারাত্মক ছিল না। বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত যে সকল কারণে ব্যর্থ হয়েছিল সে প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই ব্যর্থতার আরও একটি বড় কারণ হল এই যে, যে সকল অঞ্চলে বিদ্রোহ বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে সেখানেও ইংরেজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ ছিল বহুসংখ্যক। ইংরেজ শাসনে সাধারণ ভারতীয়েরা ধর্মচ্যুতি, জাতি-চ্যুতি ইত্যাদির ভয়ে ভীত ও অসন্তুষ্ট ছিল সেকথা সুবিদিত; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগদান না করে নীরব দর্শকমাত্র থাকাটাই বিপ্লবের আবহাওয়ায় তাদের পক্ষে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের সামিল। শুধু তারা নীরব দর্শকমাত্র থাকেনি, ইংরেজের জীবন ও মান বাঁচাতে প্রচুর সাহায্যও করেছিল। কৃষ্ণদাস পালের "Native Fidelity" গ্রন্থে (১৮৫৯; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৫) এ সম্বন্ধে অজস্র সাক্ষ্য ধরা আছে।

ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর অধুনা প্রকাশিত Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-59 (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) গ্রন্থে ১৮৫৭-র আন্দোলনের মধ্যে স্বদেশ-প্রেম ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমা অবলোকন করেছেন। বিদ্রোহ-দিনে বিদ্রোহীদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রসঙ্গে ডাঃ চৌধুরীর বক্তব্য নিম্নরূপ : "Very few rebels craved for life or seemed to care to purchase it. They often courted death defiantly, like the Spartans. What again was very remarkable was that the villagers did not betray their rebel leaders and very rarely, if ever, they earned 'blood money', even though habitually poor. Military communications bear out the fact that the British punitive forces were constantly misled and misinformed as they went out to elicit information for military reconnaissance." অর্থাৎ "খুব কম বিদ্রোহীরাই সেদিন জীবনের তোয়াক্কা রেখেছিল। তারা মৃত্যুকে সাহসের সঙ্গে বরণ করে। আর একটা খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে গ্রামবাসীরা বিদ্রোহী নেতাদের প্রতি কদাচিৎ বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং প্রায় সর্বদাই ব্রিটিশ সৈনিকদের বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে ভুল খবর দিয়ে বিভ্রান্ত করত।" কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে মাথায় যখন খুন চাপে, তখন মরিয়া ভাবটাই স্বাভাবিক। আত্মহত্যা করবার আগেও মানুষের মরিয়া ভাব-ই কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না? মৃত্যুবরণ মাত্রেই সর্বথা বক্তিগত মহত্ত্ব ও নৈতিক শৌর্যের অনিবার্য প্রকাশ বা প্রমাণ নয়।

ডাঃ চৌধুরী আরও লিখেছেন, "জনতা যে সাধারণভাবে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল, এটা তাদের স্বার্থত্যাগেরই ("self-less spirit") ফল।" গ্রামবাসীরা প্রায় সর্বদাই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, তর্কের ছলে একথা সত্য বলে মেনে নিলেও শুধু এটুকু তথ্যের জোরে কি বিদ্রোহীদের, কি জনসাধারণের self-less spirit প্রমাণ হয় না। গ্রামবাসীরা বিদ্রোহেব দিনে ইংরেজের নিদারুণ দুরবস্থা বুঝতে পেরে বিদ্রোহীদের যেখানে যেখানে সাহায্য বা সমর্থন করেছিল, সেখানে কতটা তাদের প্রতি যথার্থ সহানুভূতিবশত, আর কতটা সিপাহিদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে, তার উত্তর শশিবাবু দিতে পারেননি। অথচ এর থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছেন . "All these are proofs of the fact that a vague feeling of patriotism lay behind the mutiny and rebellion of 1857 (পৃঃ ২৬৩) অর্থাৎ অস্পষ্টভাবে হলেও বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা ছিল।

এখন, বিদ্রোহে জন-সমর্থনের অংশ ছিল কতখানি, সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক। বিদ্রোহ যে পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান অনুসারে দেখা দেয়নি, ডাঃ মজুমদারের এই উক্তি বিরুদ্ধপন্থী শশিবাবুও "দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত" বলে স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণদাস পাল তাঁর ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত "নেটিভ ফাইডেলিটি" গ্রন্থেও ওই একই কথা বলেছেন যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হলে তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কি দেশী জনসাধারণ, কি ইউরোপীয়ানগণ সকলেই সমভাবে চমকে উঠেছিল "to find themselves in the midst of a bloody rebellion". অপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হলে সংখ্যায় অত্যল্প, প্রস্তুতিবিহীন ইংরেজেরা বিদ্রোহীদের হাতে প্রথম দিকে শোচনীয়ভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। আন্দোলনের প্রথম স্তরে সিপাহিরাই আক্রমণাত্মক ভূমিকা এই সংগ্রামে গ্রহণ করে আর ইংরেজেরা করে আত্মরক্ষার। বিদ্রোহীদের অভিযান সাময়িকভাবে থাকে অপ্রতিহত এবং তাদের ধ্বংসমূলক আক্রমণের ফলে বহু এলাকাতেই শাসন ব্যবস্থায়ও

নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা দেয়। এই অবস্থায় জনসাধারণের মনে বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে ভয়ের ভাব (কৃষ্ণদাস পালের ভাষায় "absolute dread of the mutineers") পোষণ করাটাই খুব স্বাভাবিক—বিপদগ্রস্ত, বিপর্যস্ত ইংরেজের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়াটা অনেকটা অস্বাভাবিক, বিশেষ করে তাদের মনে যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অসন্তোষ ছিল বহু রকমের। একদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের অপ্রতিহত অভিযান ও সাফল্যের দৃশ্য, অন্যদিকে ইংরেজের নিদারুণ দুরবস্থা ও বিপর্যয়ের দৃশ্য—এই দুইয়ে মিলে যে অখণ্ড পটভূমি সেদিন রচিত হয়েছিল, তাতে বিদ্রোহীদের স্বপক্ষে জনসাধারণের যোগদানের যথেষ্ট হেতুই বর্তমান ছিল। বিদ্রোহীদের প্রাথমিক সাফল্যের দৃশ্য দেখে জনসাধারণের অনেকে যে তাদের দলে যোগও দিয়েছিল, তার বহু নজির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। যারা আমেরিকান সমাজশাস্ত্রী পিটিরিম সোরোকিন (Pitirim A Sorokin) প্রণীত "The Sociology of Revolution" (১৯২৫) বইখানা পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে বিপ্লবের আবহাওয়ায় প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে জনতার আচরণ সহসা কিভাবে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ অবস্থায় জনতার crowd instinct অনেকটা সুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু বিপ্লবের পরিবেশে এই প্রবৃত্তি সহসা কলরবমুখর ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পূর্বক্ষণে জনসাধারণের মনে ধর্মগত ও জাতিগত কারণে (আর সেই সঙ্গে আর্থিক কারণেও বটে) যে গভীর অসন্তোষ ছিল সেকথা তো সকল ঐতিহাসিকই লিখেছেন। এই অবস্থায় জনসাধারণের একাংশের কোন কোন এলাকায়—সর্বত্র নয়—কিছুটা মারমুখী বিদ্রোহীদের ভয়ে, কিছুটা তাদের ইংরেজ-বিরোধী অসন্তোষে, কিছুটা বিদ্রোহীদের প্রাথমিক সফলতায় আর কিছুটা ইংরেজের নিরুপায়, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বিদ্রোহী সিপাহিদের দলে যোগদান অতি-স্বাভাবিক কাণ্ড। একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই অবস্থায়ও জনসাধারণের বেশিরভাগ অংশই বিদ্রোহীদের সপক্ষে ১৮৫৭ সনে যোগ দিল না—তারা হয় নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল অথবা গুপ্তভাবে ইংরেজের সহায়তা করেছিল। জনসাধারণের এইরূপ আচরণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কৃষ্ণদাস পালের Native Fidelity গ্রন্থের ৭ থেকে ২৫৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আর এ সাক্ষ্য বিদ্রোহের একেবারে সমসাময়িক কালের ঘটনা। তৎকালে প্রকাশিত Chambers' Historical Narrative of the Sepoy Revolt পুস্তকেও এর বহু উদাহরণ নজরে পড়ে। দিল্লি থেকে চারজন ইউরোপীয়ান বিদ্রোহের জ্বলন্ত দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আর সে-অবস্থায়ও দেখা গেল তারা নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জল ও খাদ্য সাহায্য পেলেও গ্রামবাসীরা মারমুখী সিপাহিদের ভয়ে তাদের আশ্রয় দিতে পারল না। আবার একবার দেখা গেল পলাতক ইয়োরোপীয়ানদের চব্বিশ ঘণ্টা আশ্রয় দেবার পর গ্রামবাসীরা সিপাহিদের ভয়ে আগন্তুকদের আর বেশি সময় আশ্রয় দিতে চাইল না। নিজ বাড়িতে আশ্রয় না দিয়ে ওই বিপদের দিনে বাড়ির বাইরে একটা গোয়ালে ("Out-house containing twenty cows, the only roof that the owner dared to offer them") নিরাশ্রয় ইউরোপীয়ানদের আশ্রয় দিয়েছিল এরকম ঘটনাও তৎকালে ঘটেছিল। আবার, নিরাশ্রয় ইউরোপিয়ানরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় জীবন ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়িয়ে আসছে, আর পেছন-পেছন ছুটে আসছে বিদ্রোহী সিপাহিরা—সেই অবস্থায়ও হিন্দু চাষীরা পলাতকদের নিকটবর্তী গাছের ঝাড়ে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেয় ("to hide in a cope of trees")

আর তাদের দুধ-রুটি খেতে দেয়; কিন্তু মারমুখী সিপাহিদের ভয়ে নিজেদের গৃহে তাদের আশ্রয় দিতে সাহস পায়নি।

এ ধরণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত তৎকালীন খবরের কাগজে,—এমন কি মে-জুন, ১৮৫৭ সন থেকে ঐ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে,—Times, Englishman, Phoenix, Friend of India পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া, সরকারি গেজেটেও অনেক কিছু বাহির হয়। এইরূপ শয়ে শয়ে দৃষ্টান্ত ওই সকল সমসাময়িক পত্রিকা ও সরকারি গেজেট থেকে একত্র করে রচিত হয়েছে "Native Fidelity" গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এদেশবাসীর ইংরেজ-আনুগত্যের যে সকল দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে তার একটিও কৃষ্ণদাস পালের স্বকল্পিত নয়—যে সকল ইয়োরোপিয়ান ওই দুর্দিনে জনসাধারণের আশ্রয় বা সাহায্য লাভ করেছিল তাদেরই স্বীকারোক্তি। কাজেই এই বইয়ের মূল্য বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার মানদণ্ডে অত্যন্ত বেশি। সাধারণ অবস্থায় জনসাধারণের ইংরেজের প্রতি এই করুণা মানবিকতার নিদর্শন হলেও বিপ্লবের আবহাওয়ায় ইংরেজের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও, বিদ্রোহের চরম সুযোগ হাতে পেয়েও বিজাতীয়, ভিন্নধর্মী শাসকজাতির লোকদের প্রতি জনসাধারণের এই যে সহানুভূতিশীল আচরণ তা আনুগত্য ("Fidelity") ছাড়া আর কি! ১৮৫৭ সনেও সাধারণ লোকের মনে এই ইংরেজ আনুগত্য কত ব্যাপক ছিল তার সুস্পষ্ট পরিচয় কৃষ্ণদাস বাবুর গ্রন্থে ধরা হয়েছে। যে নর্টনের (Norton) সমসাময়িক বিদ্রোহ বিষয়ক মতামতকে (নর্টন তাঁর "Topics for Indian Statesman" গ্রন্থে—প্রকাশিত ১৮৫৮ সনে—বিদ্রোহকে বড়গোছের civil rebellion বলেছিলেন) সম্প্রতি একশ্রেণির লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন, সেই জন ব্রুস নর্টন তাঁর "The Rebellion in India : How to Prevent Another" গ্রন্থে (লন্ডন, ১৮৫৭) বিদ্রোহের যে চিত্র এঁকেছেন, তা কিন্তু তাঁর ঠিক পরবর্তী বইয়ে অঙ্কিত চিত্র থেকে অনেকখানি আলাদা। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, শুরু হবার প্রায় এক মাস পরে (১৩ই জুন) লর্ড ক্যানিং ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ দলনের নিমিত্ত এক বিশেষ আইন (Act xv of 1857) বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের তীব্র সমালোচক ছিলেন নর্টন সাহেব। তিনি বলেন বিদ্রোহের অজুহাত দেখিয়ে এইরূপ দমনমূলক আইন ("Gagging Act") পাশ করার কোন যথার্থ কারণ ছিল না। তিনি স্বজাতীয় ইংরেজ শাসককে সতর্ক করে তাঁর "The Rebellion in India" গ্রন্থে লেখেন : "Let them depend upon it, that this attack upon the press is in reality intended to screen the cowardice and incapacity of the real authors of the revolution. Lord Canning's arm may have dealt the blow, but there is a power behind which directed the arm. It is not that the crisis necessitated the measure but that the crisis has been seized as the fittest moment for striking a long meditated blow at the Press, and gratifying a grudge of ancient standing. Political capital has been made out of the bloodshed in the North-West."

"The Rebellion in India" গ্রন্থে নর্টন ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবির প্রতি যে সহৃদয় মনোভাবের পরিচয় দেন, তাঁর "Topics for Indian Statesman" গ্রন্থে (১৮৫৮) তিনি সে উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি। সমসাময়িককালেই তাঁর মনোভাবের এই পরিবর্তন কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্যক্তি লক্ষ করেছিলেন ও তাঁর "Topics for Indian Statesman" গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনারও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। নর্টনের ১৮৫৮

সনের বইয়ে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা হল কৃষ্ণদাসবাবুর মতে বিদ্রোহ-দৃশ্যে আতঙ্কগ্রস্ত ইউরোপীয়ানের সুর—"echoes of the same cry—senseless cry raised at the height of the panic days". কৃষ্ণদাসবাবুর Native Fidelity বইখানাই হল নর্টনের "Topics for Indian Statesman" গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার প্রতিবাদ বিশেষ। নর্টনের মতে এদেশবাসী বিদ্রোহের দিনে বিপদগ্রস্ত ইংরেজের প্রতি বিশেষ কোন সহানুভূতি বা আনুগত্য প্রদর্শন করেনি, আব যেটুকুও বা করেছিল তা হল একান্তভাবেই কৃত্রিম। নর্টনের এই অভিযোগপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন কৃষ্ণদাসবাবু তাঁর Native Fidelity গ্রন্থে ও ঐ পুস্তকের শেষাংশে লেখেন : "Mr Norton, in his recent work entitled 'Topics for Indian Stateman' takes a most unjust view of the part which the people of Bengal played in that momentous drama He denies that they were sincere in their expressions of loyalty and that they rendered any services to the Government in its difficulty. We hope these pages will convince Mr. Norton that neither of his statements regarding the Bengalees is correct" নর্টন-কৃষ্ণদাস পালের এই বিতর্ক প্রসঙ্গে জর্জ হ্যামিলটন ও উইলিয়ম ডিগবীর কথা সহজেই মনে পড়ে। ১৯০১ সনে বিলাতের হাউস অব কমন্সে বক্তৃতাকালে তৎকালীন ভারত-সচিব হ্যামিলটন মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে এই অভিযোগ অনেকে উত্থাপন করলেও বাস্তব তথ্য কিন্তু এই মর্মে পাওয়া যায় না। উইলিয়াম ডিগ্‌বী এর উত্তরে ভারতসচিবকে লেখেন যে, তথ্য পাওয়া যায় না বলে আর তাঁর দুঃখ করবার প্রয়োজন নেই—"Prosperous British India" (1901) বইখানি পড়লেই আপাতত যথেষ্ট হবে আর পরিশেষে ভারত সচিবকে এই বলে পত্রে লেখেন, "I challenge your lordship to the disproof". ডিগ্‌বীব যত কৃষ্ণদাস পালও অসংখ্য সাক্ষ্য, দলিল ও প্রমাণের উপর ভর করেই বিরুদ্ধপন্থীর ভুল মন্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীর মত পণ্ডিত ব্যক্তি Native Fidelity গ্রন্থের সন্ধান পেয়েও ঐ বইয়ের তথ্য ও অকাট্য সাক্ষ্য তাঁর Civil Rebellion গ্রন্থে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। শশিবাবু মহাবিদ্রোহকে "war of extermination" আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবুর Native Fidelity গ্রন্থের সাক্ষ্য ওই মন্তব্যকে খণ্ডিত ও ধিকৃত করে।

তাছাড়া, ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত "The Mutinies, the Government and the People" পুস্তকও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। জর্জ টমসন-শিষ্য, রাজনীতিপ্রিয় কিশোরী চাঁদ মিত্রই ('চন্দ্র' নয়) খুব সম্ভবত এর রচয়িতা ছিলেন। লেখকের বিচারে মহাবিদ্রোহ ছিল মূলত সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান, আর এই অভ্যুত্থানে জনতার অংশ ছিল তুলনায় নেহাৎ গৌণ আর বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী জনতার ভিতরও "মুক্তি-পাওয়া কয়েদী ও বদমায়েস লোকদের" সংখ্যাই ছিল বেশি। গ্রন্থকারের ভাষায় : "The insurrection is essentially a Military Insurrection. ...It has nothing of the popular element in it....The proportion of those who have joined the rebels sinks into nothingness when compared with those whose sympathies are enlisted with the Government. While the former may be counted by thousands, the latter may be counted by millions ...The ranks of the rebels have been

swelled not by the people at large but by liberated *Kaidies Budmashes* who infest every large town" (p.p. 4-5).

তৎকালে জনসাধারণের মনে ইংরেজের প্রতি অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহের দিনে ভারতীয় জনসমষ্টির বেশির ভাগ লোকই ইংরেজ-বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করে নি। প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণদাস পাল লিখেছেন : "The time was certainly most troublous and tempting, and how admirable must be the moral courage of those, who, while the mutiny of a whole army was becoming partially successful, and the vestiges of authority and order were being swept away from most of the provinces of Northern India, did not only observe a peaceful neutrality of standing unmoved amidst the tide of insurrection any feeling which then overflooded Hindoostan proper, but also, at the risk of their property, lives and family-safety, proved such ready and effectual instruments of salvation to many utterly helpless European fugitives, and acted as protectors and conservators of order at so unruly and perilous an occasion. The struggle was a sore trial of the nation's fidelity." আর এই অ-সামরিক জনতার ইংরেজের সঙ্গে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সহযোগিতাই ছিল বিদ্রোহেব অগ্নিগর্ভ থেকে ইংরেজের উত্তীর্ণ হতে পারার এক মস্ত বড় কারণ। বিদ্রোহের অবসান হলে *Edinburg Review* (April, 1858) লিখেছিল "Now it is this circumstance which has saved India to England." ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিদ্রোহের ব্যর্থতাব কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাস্তব অবস্থার এই দিকটার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ২৭০ পৃষ্ঠায় তিনি যেখানে লিখেছেন "large elements of civil population" বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়নি, তাতে বাস্তব অবস্থার যথার্থ প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। কিন্তু তিনিই আবার উক্ত পৃষ্ঠায় অন্যত্র যে লিখেছেন বিদ্রোহীদের পেছনে "had in full measure the sympathy of the people" তা কিন্তু ঠিক নয় – এমন কি বিদ্রোহের প্রাথমিক সফলতাব স্তরেও নয়। ডাঃ মজুমদারের উদ্ধৃত কথাগুলি এইখানে যেন স্ব-বিরোধী কথার মতন কানে ঠেকে।

পূর্ব-বর্ণিত তথ্য ও ঘটনাবলী থেকে এই সিদ্ধান্তই মনে আসা স্বাভাবিক যে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কোন কোন এলাকায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করলেও, গোটা ব্রিটিশ ভারতের রূপ স্মরণ রাখলে বলতে হয় যে, এই বিদ্রোহ এক জাতীয় আলোড়নে পরিণত হয়নি। বাহিরের দিক থেকেই একথা প্রথমত সত্য। দ্বিতীয়ত, এই বিদ্রোহের প্রকৃতিগত স্বরূপ ও গড়নের দিক থেকেও এই কথাই সত্য। বিদ্রোহে বহু শ্রেণিব লোক যোগ দিলেও এর ধ্বংসাত্মক কার্যে সিপাহিদের অংশই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রধান। নিজ ধর্ম, নিজ প্রদেশ,নিজ সম্প্রদায় বা নিজ গোষ্ঠীর থেকে বৃহত্তর কোন কল্পনা তাদের চেতনায় তখনো ঠাঁই পায়নি—না পাবারই হেতু ছিল যথেষ্ট। জাতীয়তার স্ফুরণ তখনও তাদের চেতনায় দেখা দেয়নি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বা কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিপাহিরা ও তাদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণির লোকেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল একথা বলা গা-জুরী। ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরী এই বিদ্রোহকে খানিকটা "জনবিদ্রোহ" (পৃঃ ২৫৯-২৬০) বলে আর বিদ্রোহীদের মনে "স্বদেশপ্রেমে"র অস্পষ্ট প্রেরণার প্রকাশ (পৃঃ ২৬৩) বলে বিশেষিত করলেও, বাস্তব ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ থেকে অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা

কঠিন। অযোধ্যা ও শাহাবাদে বিদ্রোহ জনতার লড়াইয়ে কিছুটা রূপ নিলেও তাকে জাতীয়তার লড়াই বা প্রগতিমূলক লড়াই বলা চলে না। ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে শশিবাবু যে বলেছেন "This is a real, if remote, approach to the freedom movement of India of a later age" (p. 297) তা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের কথা নয়—কল্পনামিশ্রিত রঙীন চিত্র মাত্র। ডাঃ মজুমদারও তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে অনুরূপ ভুল মন্তব্য লিখেছেন যে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ নিজে প্রগতিশীল আন্দোলন না হলেও "it inspired the genuine national movement for the freedom of India from British yoke which started half a century later" (p. 278) অর্থাৎ অর্ধ শতাব্দী পর ভারতবর্ষে যে সত্যকার জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু হয় তাকে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন বা গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের সময়ে যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কিভাবে ও কতটুকু অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রমাণ শশিবাবুও দেননি, রমেশবাবুও নয়। ১৯০৫-এর স্বাধীনতা আন্দোলন কোন্ কোন্ শক্তি, চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত হয়েছিল সে বিশ্লেষণ আমাদের "স্বদেশী আন্দোলন" (অক্টোবর, ১৯৫৩) পুস্তকে ও "মডার্ন রিভিয়ু" পত্রে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সনে) প্রকাশিত প্রবন্ধে পাওয়া যায়। তাতে রমেশবাবু ও শশিবাবুর পূর্বোদ্ধৃত উক্তি ভ্রমাত্মক বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের নবপ্রকাশিত **The Growth of Nationalism in India** গ্রন্থখানি পঠিতব্য।

মহাশ্বেতা দেবী

'১৮৫৭'-র লোকগীতি ও সাহিত্য

১৮৫৭/৫৮ সালের সাহিত্য ও লোকগীতি সম্পর্কে লেখবার আগেই স্বীকার করি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা। ভাষার সঙ্গে বিশদ পরিচয় ব্যতীত সাহিত্যের পবিচয় দেওয়া অসম্ভব। কিছু লোকগীতি ও রায়সোর পরিচয় পেয়েছি, সে-ও প্রধানত লক্ষ্মীবাই সম্পর্কীয়।

ছড়া ও গান গেয়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই আছে। লোকগীতির মধ্যে যে জিনিসটি বোঝা যায় তা হচ্ছে, জনমানসের ওপর এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া। '১৮৫৭'-র ইতিহাসের তথ্যসন্ধানীদের কাছে তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করবার যুগ এসে গিয়েছে। লোকগীতিরও একটি বিশেষ স্থান আছে ইতিহাসের তথ্যের মধ্যে। এতে তথ্যবিচারের সাহায্য হয়তো হয় না কিন্তু বোঝা যায় যারা প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী তারা কিভাবে নিয়েছিল এই সংগ্রামকে।

১৮৫৭ নিয়ে বিভিন্ন ইতিহাস রচিত হয়েছে। তাতে পাঠকের মন ভরেনি। উপরন্তু এই মহান সংগ্রামের সম্বন্ধে সবিশেষ জানবার জন্য একটা আগ্রহ জেগে উঠেছে। ১৮৫৭ সাল সম্পর্কে একখানা নতুন ইতিহাসের প্রয়োজন ভারতীয় পাঠক বিশেষভাবে অনুভব করছেন আজ এবং যতদিন সে ইতিহাস রচিত না হবে, ততদিন ১৮৫৭-তে সাধারণ মানুষের ভূমিকা প্রাপ্য স্বীকৃতি পাবে না।

ইংরেজের প্রতিশোধের প্রত্যক্ষ পাত্রপাত্রী যে জনসাধারণ, তারা তাদের মনোভাব জানিয়ে গিয়েছে এই সব ছড়া, রায়সো ও গানে। কী ভয়াবহ অত্যাচার উপেক্ষা করে তারা নির্ভীকভাবে এই সংগ্রামকে যথার্থ মূল্য দিয়েছে তা বোঝা যায়, যখন দেখি লক্ষ্মীবাইকে সাহায্য করবার অপরাধে বিধ্বস্ত জনপদ ও গ্রাম থেকেই তাঁকে কেন্দ্র করে কত গান ও ছড়া রচিত হয়েছে। লক্ষ্মীবাইয়ের সম্পর্কে বুন্দেলখণ্ড আগ্রা ও গোয়ালিয়রের মানুষ আজও বলে, রানির মৃত্যু হয়নি—তিনি আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় খুঁজছেন মাত্র। উত্তর বিহারে জগদীশপুরের বীর যোদ্ধা বাবু কুনওয়ার সিংকে নিয়ে অনুরূপ কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। তবে এগুলি কাহিনি ও কিস্‌সারূপে মুখে মুখে ফেরে।

ঝাঁসির রানি সম্পর্কে ঝাঁসি ও বুন্দেলখণ্ডের অন্যত্র যেসব ছড়া প্রচলিত আছে, তা প্রধানত 'রায়সো' এবং তা সেইভাবেই গাওয়া হয়। গীতকার নানারকম অভিব্যক্তি ও ভঙ্গি সহকারে প্রধান রায়সোটি গেয়ে চলেন। ধূয়াধারীরা সমবেত হয়ে ধূয়াটি আবৃত্তি করেন। এ গানও খানিকটা আবৃত্তিরই মতো। সুর সহকারে আবৃত্তি বলতে যা বোঝায় তাই। ঝাঁসি ও অরছার ফৌজের যুদ্ধ, অরছার নথে খাঁর পরাজয়, ইংরেজের সঙ্গে রানির লড়াই এবং

রানির বীরত্ব প্রশস্তিতে এই রায়সো শেষ হয়। রানির সমসাময়িক এবং নথে খাঁর পরাজয়ের প্রত্যক্ষ দর্শক ভগ্‌গী দাউজু রচিত।

ঝাঁসি কী জো লটো তকৈ ডিহি খায় কালকা মাঈ—এই ধূয়াসম্বলিত রায়সোটি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই ছড়াগুলির প্রথমে ঝাঁসিতে ইংরেজ হত্যার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়—

'জে পায়ে অংগ্রেজ জহঁ তে তাঁ ডারে মার।।
ছলবল সৌ ঝাঁসি লই গঙ্গাধর কী নার।
তাকৌ অব আগৈ কহত, ভাঁলী ভাঁৎ ব্যোথার।।
শহর উরছে কী হতী, কহি লড়ই (রানী) সিরকার।
নথে খাঁ মুখতিয়ার সৌ, বাৎ কহী নিরধার।।'

যে যেখানে ইংরেজকে পেল হত্যা করল। ছলেবলে ঝাঁসি অধিকার করলেন গঙ্গাধরের রমণী। তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য নথে খাঁকে মুখপাত্র করে পাঠালেন অরছার রানি লড়ই দুলৈয়াঁ।'

ভূপত কবি বলেছেন--রাজপুত সামন্তরা, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অরছার রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও রানির প্রতি আনুগত্য দেখাবার সঙ্কল্প করলেন। কেননা তাঁরা ঝাঁসিরাজের নিমক খেয়েছেন—

'জৌ নিমক খায়ো ঝাঁসিরাজকো
তৌ মান লয়ি বাই কী রাজি
অব কৈসে ছোড়ী নিমক কী বাত্—
ঔর মান ভরি লাজ?'

ভূপতের 'বীরাঙ্গনা রায়সো'টিতে অনেক বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় যা অন্যত্র বিরল। এতে রানির নারী সহকর্মীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'কোরিয়াঁ কুন্‌ভীন সুনার বখসিন বুন্দেলা কী নার—
হুয়ে ঘোড়েঁ পর সভার—
বুরজন চঢ়ি তোপ উঠাঈ বাড় কহি নিরধার
বাঈ কী শূরী অপার।'

যুদ্ধের ঘটনাবলী অনুসরণ না করেও বলা চলে এর মধ্যে রানির কার্যাবলীর অনেক পরিচয় পাওয়া যায়—

'পেঁড় গিরবাও কহত রানি ঝাঁসি
ন তেলেঙ্গা দেব হামৈ সিপাহিক ফাঁসি।।'

ইংরেজের সঙ্গে লড়াই-এর বিষয়ে ভূপত বলেছেন—

'........অংরেজ রাজ নে হাঁসি
মাহ বল বিক্রম কী লেওঁ ঝটপট ঝাঁসি
ঝাঁসি গলে মেঁ ফাঁসি দেউঁ অরছে গলে মে হার....

তারপরেই কবি বলেছেন—

'কহত ভূপতলাল যবতক বুন্দেলা শূর রহে জীউ,
তবতক অংরেজ ক্যায়সে লেবৎ ঝাঁসি হামে দেখ লৌ।'

সিপাহিদের প্রতি রানির অসাধারণ ভালবাসার পরিচয় যে ছড়াগুলিতে বেঁচে আছে, তাতে রচনার পারিপট্য না থাকলেও সহজ আবেগের সৌন্দর্যে মধুর হয়েছে সেগুলি। যথা :

যিলনে সিপাইকো সেবায় পেঁড়াজলেবী
অপনে খায়ে গোলি—
যবতক অজর ভারত কা পানি
তবতক অমর ঝাঁসি কি রানি।।

সবচেয়ে পরিচিত ছড়াটি শুধু মধ্যভারতে নয়, উত্তর ভারতেও শোনা যায়—

'খুব লড়ী মরদানী য়ো তো ঝাঁসিবালী রানি থি—
বুরজন বুরজন তোপিয়ন্ লগাই দইন,
গোলা চলাই আশমানোঁ।।
সগরে সিপাহিনকো পেঁড়াজলেবী
অপনে চবায়ে গুরধানো।।
ছোড় মোরচা, লশকরকো ভাগী,
ধূপ উহয়ে মিলই নহি পানী।।
আবর বঢ়ি লড়তি হুয়ে মরদানী
য়ো তো ঝাঁসিবালী রানি থী।

—'বুরুজে বুরুজে তোপ লাগিয়ে রানি আশমানে গোলা চালালেন। সিপাহিদের পেঁড়া জিলাপি খাইযে নিজে গুড় ও খই খেয়ে থাকলেন। মোরচা ছেড়ে রানি চললেন লশকর। কিন্তু প্রখর রোদে পানীয় জল পেলেন না।' এখানে লশকর হচ্ছে গোয়ালিয়রের একটি অংশ।

পরে, হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত মহিলাকবি সুভদ্রা কুমারী চৌহান ঝাঁসীর রানি বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করবার সময়ে 'খুব লড়ী মবদানী' এই পংক্তিটি দিয়ে কবিতা শুরু করেছেন। হিন্দীভাষী অঞ্চলে যারাই বাস করেন, তারা এই ছড়াটি শুনেছেন মুখে মুখে। শ্যামরঙ্গ মিশ্র রচিত 'বুন্দেলা কা শূর কহানী'তে দুটি লোকগীতি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, এগুলির রচনার স্থান দিল্লি এবং এই শতকের সংগ্রহকারীদের হাতে পড়ে এই গুলি খানিকটা মার্জিত রূপ পরিগ্রহ করেছে—

।। ১ ।। 'দরিয়া মে তুফান বঢ়ি দূর ইংলিস্তান
জলদি যাও জলদি যাও ফিরিঙ্গী বেইমান।।'

।। ২ ।। 'কালেপানিসে আয়ে গোরে কুরান কুরবান কে লিয়েঁ
তোপ চলায়েঁ দাগাবাজি সেঁ বাচ্চোঁ-বুড়্ঢ়া মার ডালেঁ
ধুয়াসে আশমান খাক্ পড়ে কেয়া ঐসন হাল কিঁয়ে।

লোকগীতির পর্যায়ে না পড়লেও বাহাদুর শাহ্ রচিত নিম্নোক্ত কবিতাটির বিশেষ মূল্য আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাহাদুর শাহের ভূমিকা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এই অশীতিপর বৃদ্ধ নিজে কবি ছিলেন এবং উর্দু কবিতার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁর নাম আছে। 'জাফর' ছিল তাঁর ছদ্মনাম। এই নামেই তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। 'মতাবন' সম্পর্কে কবিতাটিতে তাঁর মর্মের বিভ্রান্তি ও বেদনা ফুটে উঠেছে :

।। ১ ।। 'ইয়া কায়াক্ হো গয়া হর্ সীমৎ শোর এ আল্ আমন ক্যা
ইয়েহ্ শোলা আহে শোজান্ কাহি, ইয়ে ধুয়াঁ ক্যা?

।। ২ ।। গয়ে ইয়াখ্ বয়াখ্ কেয়া হাওয়া পলট্‌কে ন দিলকো
অপনে করার্ হ্যায়?
করুঁ গম্-য়ে-সীতম্ কা ম্যাঁয় ক্যা বয়ান,
মেরা সীনাহ্ খম্‌সে ফিগর্ হ্যায়ঁ?

।। ৩ ।। ইয়েহ্ রিয়াইয়া হিন্দ্ হ্যায়ঁ তবাহ্ কহো ক্যা
ন উনপেঁ হুই জাফা
জিসে দেখা হাকিমে ওয়াখ্‌তনে কহা
ইয়ে তো কবিলে দর্ হ্যায়ঁ?

।। ৪ ।। কাঁহি এ্যায়সা ভি সীতম্ সুনা ক্যা দি ফাঁসি
লাখোঁ কো বেগুণাহ্
ওয়ালী কল্‌মা গয়ুঁকে তরাফমে আভি
দিল মেঁ উনকে খবর হ্যায়ঁ?

।। ৫ ।। ন দাবায়া জের য়ে চম্মন উন্‌হেঁ
ন দি' গোর্ য়ো কাফন্ উনহেঁ
কিয়া কিস্‌নে জের দাফন্ উনহেঁ
য়ে ঠিকানা উন্‌কো মজরি হ্যায়ঁ?

।। ৬ ।। শব্ য়ো রোজ্ ফুলোঁ মে জো তন্‌লে কহো
খ্বার খম্‌সে অর উয়োহ্ ঘুলেঁ
উন্‌হেঁ তন্‌ক্ কয়েদ মো জো মিলে কহা
বদলে গুল্‌কে ইয়েহ্ হর্ হ্যায়ঁ?

এই কবিতার অর্থ হচ্ছে :

।। ১ ।। সহসা চারিদিক থেকে দয়া ও প্রাণভিক্ষার এ কোন্ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি? এই মর্মবেদনার দীর্ঘশ্বাস উঠছে; চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে গেল, এই বা কেন?

।। ২ ।। সহসা বাতাস এমন করে উল্টো দিকে বইছে কেন? আমার হৃদয় হয়ে উঠল অশান্ত। এই অত্যাচারের কী বর্ণনা দেব আমি? আমার হৃদয় দীর্ণ হয়ে গেছে নিষ্পেষণে।

।। ৩ ।। হিন্দুস্থানের মানুষের চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। বলো কোন্ অত্যচার তারা সহ্য করেনি? শাসকেরা যাকেই দেখছে, বলছে, একে ফাঁসিতে চড়াও।

।। ৪ ।। কখনো এমন অত্যাচারের কথা শুনেছ তুমি? লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষকে ওরা ফাঁসি দিয়েছে। তবু ওরা বলছে, এখনো সম্পূর্ণ হয়নি শাস্তি, দোষের স্খালন হয়নি।

।। ৫ ।। নিহতদের কপালে জুটল না কুসুমের আস্তরণ। না মিলল গোর, না এল কোনো কাফ্‌ন, কে ওদের কবর দিলে শুধু মৃত্তিকায়? সেই মাটিই, দেখ, হয়ে উঠেছে এক পবিত্র সমাধি—ওদের আসল ঠিকানা।

।। ৬ ।। আজকে এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে সর্বশক্তিমানের পরিহাস ছাড়া আর কি বলতে পারি? এখানে বসন্তের ফুলসম্ভার শুকিয়ে গেল। যেখানে রুক্ষ

শীত ছিল, সেখানেই ফুলফল সেজে উঠল। একে পরিহাসই বলব।

এই কবিতা ছাড়াও বাহাদুর শাহ রচিত আর একটি 'শায়ের' সুবিখ্যাত। রেঙ্গুনে নির্বাসিত জীবন কাটাবার সময় ইংরাজ অফিসার তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন : কামানে আর দম নেই, প্রাণের জন্য ভিক্ষা করছ জাফর—হিন্দুস্থানেব তরবারির নেশা খতম—

'দম্‌দমে মেঁ দম নেহি হ্যায়্ খ্বার মাঙ্গো জান কী
বাস্ জাফর বান, চল্ চুকি অর তৈর হিন্দুস্তাঁ কি।।'

বাহাদুর শাহ প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন—

'গাজিয়োঁ মেঁ জল তলক্ বাকি হ্যায় লৌ ইমানকি।
তখ্‌ত-ই লন্ডন তক্ চলেগী তৈর হিন্দুস্তাঁ কি।।'

—'যতদিন শহীদদের মধ্যে প্রাণদানের আদর্শ অটুট থাকবে ততদিন জেনো, লন্ডনের তখ্‌ত অবধি চলবে হিন্দুস্থানের তরবারি।'

ছড়া-রায়সো ও লোকগীতি মুখে মুখে রচিত হয়েছে। কিন্তু সেভাবে বই লেখা সম্ভব ছিল না। এই সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বহুজন ছিলেন যাদের পক্ষে নিজ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞাত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৮৫৭ সম্পর্কীয় সাহিত্যের স্বল্পতা দেখে এ-ই মনে হয়, বিদ্রোহ দমনের নামে যে বিভীষিকা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাকে উপেক্ষা করে কলম ধরবার সাহস সকলের হয়নি। তবু দুখানি বইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতিক কালে বই দুখানির নাম নানা প্রসঙ্গে পাঠক সমাজের গোচর হয়েছে। ১৮৫৭/৫৮ সালে সমসাময়িক সমাজ দেশকালের অবস্থা ও যুদ্ধের বর্ণনা জানবার পক্ষে বই দুখানি বিশেষ মূল্যবান। প্রথম খানি বাংলায়। নাম : 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী', রচয়িতা : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রিসালদার বাবু ছিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি বেরিলিতে ছিলেন। দুর্গাদাসবাবু ইংরেজের পক্ষে ছিলেন, এবং শেষ অবধি ইংরেজের হয়ে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁর বই-এর মধ্যে দেশের অবস্থা খাদ্যদ্রব্য ও জীবনযাত্রার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, বাঙালি-হিন্দুস্থানী অভিজাত মুসলমান পরিবারের আচার ব্যবহার ফৌজের বিস্তৃত বিবরণ, বিদ্রোহের প্রতি সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রতিক্রিয়া—বিশেষ করে বাঙালিদের এই সময়কার অবস্থা এইগুলি পাওয়া যায়।

দুর্গাদাসবাবুর লেখাতে আমরা দেখি, সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। মহারাষ্ট্রীয় পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভট্ট গড্‌সে রচিত ১৮৫৭-র স্মৃতিলিপি 'মাঝাপ্রবাস'-এ অন্য কথা পড়ি। বিষ্ণুভট্ট ৩০ মার্চ ১৮৫৭ সালে পুনা ত্যাগ করে প্রবাস যাত্রা করেন। ১লা জুলাই তিনি মৌ পৌছান। পরে উজ্জয়িনী ও বীর হয়ে গোয়ালিয়র পৌছান। ২৩ অক্টোবর গোয়ালিয়র ত্যাগ করে ২১ নভেম্বর পৌছান ঝাঁসি ২১ নভেম্বর থেকে এপ্রিল অবধি তিনি ঝাঁসিতে ছিলেন। তারপর কাল্পী, বিঠুর, চিত্রকুট, কানপুর, লখনউ, অযোধ্যা, পুনর্বার গোয়ালিয়র ঝাঁসি সাগর হুমদাবাদ, ইন্দোর ও নাসিক হয়ে ১৮৬০ সালে তিনি স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ত্রিশ বছর বাদে তিনি এই পুস্তক রচনা করেন। এই স্মৃতিলিপিকে উদ্ধার করে চিন্তামণি বৈদ্য ১৯০৭ সালে সন আঠার শ সত্যবন্‌চ্যা বগুচী হকিকড়, নামে প্রকাশ করেন। বিষ্ণুভট্টের লেখাতে আমরা এই সংগ্রামের যে ভাষণ পাই, তাতে দেখি সাধারণ মানুষের প্রবল ইংরাজ-বিরোধিতা ও ইংরেজের প্রচণ্ড অত্যাচারের বর্ণনা। এই বইয়ে উল্লিখিত স্থানগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়। ঝাঁসির রানির সঙ্গে

তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এবং ঝাঁসি সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক, বহুস্থান, বহু মানুষ, বহু ঘটনা এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। সংগ্রামের কতক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মধ্যে তিনি ছিলেন। তাই তাঁর বইখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

একখানি ইংরেজি বইয়ের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সীতারাম নামক জনৈক ভারতীয় সুবেদারের উর্দুতে লেখা আত্মজীবনীকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন নরগেট। 'From Sepoy to Subehdar' নামক বইটি প্রকশিত হয়। এতে যুদ্ধের বিবরণ, ইংরেজের বিচার এবং সমসাময়িক অনেক ঘটনাবলী জানা যায়।

১৮৫৭ সম্পর্কীয় লোকগীতি ও সাহিত্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ এই অভ্যুত্থানকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের বিচারে অনেক কথাই ওঠে। কিন্তু এইগুলিতে আমরা তাদের ভাষণ পাই, যারা "খম্‌সে ফিগর লুই সিনাসে খরিদ কী য়ো সতাবন্‌"—যাদের কলিজার রক্তের দামে ১৮৫৭ কে খরিদ করা হয়েছে। আমরা দেখি কঠোর অত্যাচার, নির্বিচারে নিরপরাধ হত্যা এই সব উপেক্ষা করেই গানে গানে তারা শ্রদ্ধা জানিয়েছে সতাবনের (সাতান্নর) নেতাদের এলাহাবাদ, অযোধ্যা, জগদীশপুর, শাহাবাদ, ঝাঁসি ও অন্যত্র। আজও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সব লোকগীতির খোঁজ পাওয়া যায়। স্থানীয় মানুষ যদি উৎসাহ দেখিয়ে এগুলি সংগ্রহ করেন। তবে এসব বাঁচানো যেতে পারে। ১৮৫৭ সালের তথ্যের মধ্যে এগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান সংযোজন হবে।

পরিচয় ১৩৬৪ শ্রাবণ

কো আন্তোনভা, গ্রি. বোন্‌গার্দ-লেভিন, গ্রি. কতোভ্‌স্কি

১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মহান গণ-অভ্যুত্থান

সারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে জনগণের নির্দিষ্ট স্তরগুলির বিক্ষিপ্ত ও পুরোপুরি স্থানীয় কার্যকলাপের মধ্যে প্রকটিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে ঘৃণাশ্রিত বিক্ষোভ শেষে দীর্ঘকাল সংগঠিত কার্যকলাপে অভ্যস্ত সিপাহিদের দ্বারা জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের পরেই অনেকটা সংহত হয়েছিল। ব্রিটিশ সিপাহিরা বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার (এদের মধ্যে ভারতীয় ১ লক্ষ ৪০ হাজার) সৈন্য নিয়ে গঠিত, সামাজিকভাবে সর্বাধিক সমসত্ত্ব বাংলার সৈন্যদল ছিল বৃহত্তম। প্রায় এককভাবে অযোধ্যা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি থেকে সংগৃহীত বাংলার এই সৈন্যদলটি ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাট ও মুসলমান (সৈয়দ ও পাঠান) সিপাহিদের নিয়ে গঠিত ছিল। এইসব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ছিল গ্রাম-সমাজের উচ্চস্তরের ('পাট্টিদার') মানুষ বা ছোটখাটো সামন্ত ভূস্বামী—গ্রামীণ জমিদারের সন্তান। এরা সকলেই হিন্দুস্থানি ভাষা ব্যবহার করত এবং নিজ গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত।

দীর্ঘকাল কোন যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটায় পুলিশের কর্তব্যরত এইসব সিপাহিদের সারা উত্তর ভারতে ছড়ানো সব ক্যান্টনমেন্টে, বিশেষত দোয়াবে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় মান অনুসারে এরা ভাল বেতন পেলেও সাধারণ সিপাহিদের মধ্যে ইতিমধ্যেই অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল : কখনই সার্জেন্টের উপরে ভারতীয়দের কোন পদোন্নতি হত না এবং ব্রিটেনের যে কোন নবাগতই সরাসরি তাদের উপরের পদে বহাল হতে পারত। সামরিক ক্যান্টনমেন্টে ব্রিটিশদের নিজস্ব মেস ছিল, তারা আরামপ্রদ বাঙ্‌লোয় থাকত, আর সিপাহিরা সপরিবারে বসবাসের জন্য পেত আদিম কুঁড়েঘর।

পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ জয়ন্তী এগিয়ে এলে ওয়াহাবীদের প্রচার সিপাহিদের মধ্যে খুবই সাড়া জাগিয়েছিল এবং ঠিক সেইদিন ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য সিপাহিরা প্রস্তুত হচ্ছিল। বহুকাল থেকেই অভ্যুত্থানের ধারণাটি দানা বেঁধেছিল। কিন্তু ব্যাপারটি সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত ছিল না। বস্তুত, এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটেছিল। সামন্তযুগ থেকে প্রচলিত এবং বিদ্রোহের পূর্বক্ষণে অনুষ্ঠিত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নীরবে চাপাটি চালানোর ব্যাপারটিও অভ্যুত্থানের স্বতঃস্ফূর্ততার যুক্তি খণ্ডন করে না।

এনফিল্ড রাইফেলের জন্য এক ধরনের নতুন টোটা প্রবর্তনকেই বিদ্রোহের আশু কারণ হিসাবে ধরা হয়। এই টোটা মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্য শূকর ও গোরুর চর্বিমিশ্রিত এমন একটি ধারণা সিপাহিদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল। নতুন টোটা ব্যবহারে গররাজি সিপাহিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক দপ্তর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে মীরটে এজন্য একদল সৈন্য ও সার্জেন্টকে প্রকাশ্যে হীনপদস্থ করার

পর দীর্ঘ নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়। ঘটনাটি শহুরে গরিব ও নিকটস্থ গ্রামের কৃষকদের সমর্থনপুষ্ট সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিসংযোগ করে। ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা করার পর তারা ১১ মে দিল্লি রওয়ানা হয় এবং সেখানে দিল্লি গ্যারিসন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। দিল্লি দখল ও ব্রিটিশ অফিসারদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের পর সিপাহিরা লালকেল্লায় যায় এবং ব্রিটিশের পেন্সনভোগী ও ক্ষমতাচ্যুত বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে (১৮৩৭-১৮৫৭) ভারতের শাসক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করতে ও বিদ্রোহীদের নির্দেশেমতো একটি আবেদনে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। মুসলিম 'উলেমারা' ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধের ফতোয়া দেন। দিল্লিতে অভিজাতদের নিয়ে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীদের কাছে বাহাদুর শাহ্ ভারতের পুনরুদ্ধারকৃত স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠেন।

সারা দেশ থেকে দলে দলে সিপাহিরা দিল্লিতে একত্রিত হওয়ায় সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সিপাহিরা কেবল নিজ নিজ সেনাপতিরই আদেশ মানত এবং দিল্লির দরবার-সরকারকে বিশ্বাস করত না। জমিদাররা দেয় ভূমিরাজস্বের অর্থ দিল্লিতে না পৌঁছানোর ফলে শহরে খাদ্য ও সহায়-সম্পদের অভাব দেখা দেয়। অচিরেই সাধারণ সিপাহিদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে সিপাহিদের ৬ জন এবং নাগরিকদের ৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে সিপাহিরা 'জলসা' নামক একটি নিজস্ব প্রশাসন সংস্থা গঠন করে। কিন্তু দিল্লিতে বিদ্যমান জটিল পরিস্থিতি মুকাবিলার ক্ষমতা জলসার ছিল না। এ সময় কার্ল মার্কস লিখেছিলেন '....নিজে সেনাপতিদের হত্যাকারী, শৃঙ্খলাবর্জিত এবং সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব বহনক্ষম কোন ব্যক্তিসন্ধানে ব্যর্থ এইসব বহুধাবিভক্ত বিদ্রোহী সিপাহিদের পক্ষে কোন সংগঠিত দীঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা খুবই সামান্য আছে।'*

কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ কিন্তু যুদ্ধকৌশলে বা ক্ষুদ্র সৈন্যদলের বেশি কিছু পরিচালনায় অনভ্যস্ত সিপাহিরা কলাকৌশলের সমস্যা মুকাবিলায় সমর্থ হলেও রণকৌশলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। দিল্লির লালকেল্লার মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখলের পর তারা তখনো শান্ত এলাকাগুলিতে বিপ্লব ছড়ানোর বদলে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছিল। ফলত, ব্রিটিশদের পক্ষে নিজেদের সামর্থ্য পুনরুদ্ধার, অবশিষ্ট অনুগত সৈন্যদেব পুনর্গঠন ও দিল্লি অবরোধ সম্ভবপর হয়েছিল।

সার্বিক চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ দোয়াব ও মধ্যভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করেনি। বাংলার তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) ব্রিটিশ বেসামরিক লোকজন সহ সকল ইউরোপীয়দের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন এবং পূর্বানুমানের ভিত্তিতে সিপাহিদের পরবর্তী উদ্যোগ ব্যর্থকরণে সফল হন। এদের নিরস্ত্রীকরণ সহ কোন কোন দলে সংগঠিত আনুষঙ্গিক বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ দমন করা হয়। পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সৈন্যরা একটি সাধারণ সিপাহি বিদ্রোহও দমন করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত ধরনের। তদুপরি কয়েকটি সৈন্যদলই কেবল দিল্লির সিপাহিদের সঙ্গে যোগদানে সমর্থ হয়েছিল। শিখরা হিন্দুস্তানের এই সিপাহিদের দখলদার বাহিনী মনে করে কোনই সমর্থন দেয়নি।

* K. Marx and F. Engels *The First Indian War of Independence 1857-1859*, p. 44

পক্ষান্তরে অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডের কৃষকরা তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। তারা 'বহিরাগত' নতুন জমিদারদের অচিরেই বিতাড়িত করে, স্থানীয় সরকারি ভবনগুলির উপর আক্রমণ চালায় এবং এমন কি তাদের পুরনো জমিদার ও তালুকদারদেরও খাজনা দেয়া বন্ধ রাখে। ঔপনিবেশিক সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিতাড়নের পর কৃষকরা আত্মরক্ষার জন্য নিজ সম্প্রদায় থেকে সশস্ত্র দল গঠন করে এবং বিজয়ী ব্রিটিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত তাদের গ্রামের সাম্প্রদায়িক জমিগুলি রক্ষার প্রয়াস পায়।

দোয়াব অঞ্চলের শহরগুলির ভারতীয় জনগণ বিদ্রোহের সক্রিয় শরিক ছিল। আলিগড় (২১ মে), বেরিলী ও লখনউ (৩১ মে), কানপুর (৪ জুন) ও এলাহাবাদ (৬ জুন) ইত্যাদি অনেক বড় বড় শহর দখলের পর এগুলির প্রত্যেকটিতে তারা এক একটি সরকার গঠন করে। বেরিলির নতুন প্রশাসনের প্রধান ছিলেন ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধে নিহত হাফিজ রহমান খাঁ রোহিলার বংশধর খাঁ বাহাদুর খাঁ। কানপুরের শাসনভার ছিল ডালহাউসি কর্তৃক রাজ্যাধিকারবঞ্চিত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবের উপর। এলাহাবাদের দায়িত্বে ছিলেন জনৈক স্কুলশিক্ষক ও ওয়াহাবী সম্প্রদায়েব অনুগামী মৌলবি লিয়াকত আলী। পাটনার বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন জনৈক ওয়াহাবী পুস্তকবিক্রেতা পীর আলী।

ইতিমধ্যে দিল্লির সিপাহিরা কয়েকটি অভিযান সত্ত্বেও কোন বড় ধরনের আক্রমণ চালায়নি। এমন কি বেরিলির সেনাপতি, অন্যতম প্রতিভাবান সিপাহি নেতা বখত খাঁ'র মতো উদ্যমী ব্যক্তি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। সিপাহিদের দিক থেকে এই নিষ্ক্রিয়তার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশরাই আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। তারা মাদ্রাজ এবং ইরানের সৈন্য দিয়ে ও চিনযাত্রী ইউনিটগুলি ফিরিয়ে এনে এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করে। প্রায় ৬৫ হাজার সিপাহি দিল্লি আক্রমণকারী ৬ হাজার ব্রিটিশ সৈন্যকে হাটিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। সামরিক পরিস্থিতির অবনতি ও অর্থাভাবের জন্য কোন কোন সিপাহি স্বেচ্ছায় দিল্লি ত্যাগ করে। নাজাফগড়ে ব্রিটিশের হাতে বখত খাঁ'র পরাজয় সিপাহিদের মনোবলের উপর গুরুতর আঘাত হানে। তদুপরি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহীদের ঘোষণাপত্রে বিজয়ের পর বণিক এবং মুসলমান ধর্মনেতাদের জন্য বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি থাকলেও ভূমিরাজস্ব কমানোর কোন উল্লেখ ছিল না। এতে সিপাহিদের, বিশেষত গ্রামীণ সিপাহিদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশরা বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ দিল্লির উপর আক্রমণ চালায় এবং পাঁচ দিন পর শহর ও দুর্গগুলি দখল করে। তারপরই শুরু হয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাশব প্রতিহিংসা গ্রহণ। এমন কি বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোনও দিল্লি দখলের পর ব্রিটিশ সৈন্যদের অনুষ্ঠিত অপরাধকে অবর্ণনীয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। এদের প্রতিহিংসা থেকে শত্রু-মিত্র কেহই নিরাপদ ছিল না। এই অত্যাচার এমন কি নাদীর শাহকেও হার মানিয়েছিল।

দিল্লি দখলের পর ব্রিটিশরা শুধু তাদের ১৭ হাজার সৈন্যদেরই মুক্ত করেনি, বিদ্রোহীদের মনোবলও ভেঙে দিয়েছিল। কারণ, দিল্লি সিপাহিদের কাছে স্বাধীন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। দিল্লির শহরতলীতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধে আত্মগোপনকারী বাহাদুর শাহকে বন্দি করা হয়। বিচারের পর রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন। যুদ্ধবন্দি হিসাবে বাহাদুর শাহের পুত্রদের জনৈক ব্রিটিশ

অফিসর হডসন হত্যা করে। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর দিল্লি বহু বৎসর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়েছিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যের জন্য কলিকাতা থেকে দিল্লি অভিযাত্রী জেনারেল নেইল বারাণসী ও এলাহাবাদের বিদ্রোহী শহরগুলির সিপাহি ও বাসিন্দাদের নির্বিচারে হত্যা করেন। তার নিষ্ঠুরতায় এমন কি লর্ড ক্যানিংও বিরক্ত হন এবং জেনারেল হ্যাভলককে তার স্থলবর্তী করেন। তিনিও চলার পথে গ্রাম-গঞ্জ পুড়িয়ে শত শত মানুষকে ফঁসিতে ঝুলিয়ে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালান। দিল্লি ও লখনউ বরাবর পথে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কানপুর শহরটিও তিনি অতিক্রম করেছিলেন। এই শহরের বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন নানা সাহেব আর তার দেহরক্ষী তাঁতিয়া তোপী এবং সচিব সুপণ্ডিত, দু'বার ইউরোপ ভ্রমণকারী আজিমুল্লাহ খাঁ। ব্রিটিশ গ্যারিসনের সৈন্য ও তাদের পরিবারবর্গ সামরিক ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষিত এলাকায় আশ্রয় নেয় এবং কামানে সাহায্যে সিপাহিদের কাছ থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে গ্যারিসনটি আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে শহরে বিদ্রোহী সৈন্য ও সিপাহিদের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারে পৌঁছয়। ফলত এখানেও খাদ্যাভাব ও দিল্লির অনুরূপ সমস্যাদির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এখানকার সিপাহিরা দু'বার হ্যাভলকের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও প্রতিবারই তারা পরাজিত হয়। জুন মাসের মাঝামাঝি কানপুরে প্রবেশ করার পর হ্যাভলকের সৈন্যরা শহরে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংস চালায়। অতঃপর হ্যাভলক বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র লখনউ যাবার জন্য দু'বার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সেই শহরের ঘটনাবলীর ধারা ছিল নিম্নরূপ। বিদ্রোহের পর প্রাক্তন নবাব বংশকে (অযোধ্যার নবাব) ক্ষমতায় পুনর্বাসিত করা হয় এবং অযোধ্যার রাজসভার প্রাক্তন সভাসদরা শহরের শাসনভার গ্রহণ করে। সেখানকার বিদ্রোহের মূল নেতা ছিলেন মাদ্রাজের এক অভিজাত সন্তান আহ্‌মদ উল্লাহ্। এক সময় তিনি ব্রিটেনে যান এবং দেশে ফিরে ওয়াহাবী আন্দোলনে যোগ দেন ও ভ্রাম্যমাণ ওয়াহাবী প্রচারকের কাজ করেন।

ব্রিটিশ গ্যারিসনের সৈন্যরা সপরিবারে শহরের শাসনকর্তার বাসভবনে আশ্রয় নিয়েছিল। সিপাহিরা সর্বক্ষণ গুলি চালিয়ে দীর্ঘকাল বাসভবনটি অবরোধ করে রাখে। কিন্তু সিপাহিরা উত্তম সন্ধানী না হওয়ায় তাদের উল্লেখ্য কোন ক্ষয়ক্ষতি ঘটেনি। তারপর বিদ্রোহীরা ভূগর্ভে একটি পথ খোঁড়া শুরু করে। ২১ সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত হ্যাভলক লক্ষ্ণৌয় প্রবেশ করতে পারেননি। কিন্তু সিপাহিরা তার সৈন্যদের ঘিরে ফেলে এবং তিনি নিজেও অবরুদ্ধ হন।

ইতিমধ্যে লখনউ-এ কেবল সিপাহি ও দোয়াবের বিভিন্ন অঞ্চলের অস্ত্রধারী কৃষকরাই নয়, চলার পথে ব্রিটিশ সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত গ্রাম-গঞ্জ থেকে বহু নরনারীও এখানে সমবেত হয়েছিল। শহরে ৫০ হাজারের মত মানুষ থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ব্রিটিশ সেনাপতি কলিন ক্যাম্বেল মাত্র সাড়ে চার হাজার সৈন্য ও গোলন্দাজ নিয়ে কানপুর থেকে লখনউ এসে সেখানকার অবরোধ ভেঙে ফেলেন। লখনউ দখলে ব্যর্থ হলেও তিনি শাসকের বাসভবনে বন্দি ইউরোপীয়দের উদ্ধারে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে তাঁতিয়া তোপী গোয়ালিয়র থেকে একদল সৈন্য (ব্রিটিশের প্রতি অনুগত রাজার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহী) নিয়ে দ্রুত কানপুরে পৌছান এবং উইন্ডহ্যাম কর্তৃক সেখান রক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যদলটিকে উৎখাত করেন। এর পরবর্তী যুদ্ধে ক্যাম্বেল শেষাবধি তাঁতিয়া তোপীকে পরাজিত করে কানপুরে পুনর্দখলে সমর্থ হন। এর তিনমাস পরে সংগৃহীত ৪৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ক্যাম্বেল লখনউ-র উপর শেষ আক্রমণ চালান। ইতিমধ্যে শহরে একত্রিত প্রায় ২ লক্ষ মানুষ এই সংগ্রামে যোগ দেয়। তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দক্ষ সেনাপতি ছিল না। লখনউ-র যুদ্ধ এক মাস স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ শহরটির পতন ঘটে। তারপর প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ সৈন্যরা শহরে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং প্রভূত যুদ্ধ-ভেট সংগ্রহ করে।

সিপাহিদের অন্যতম প্রধান প্রতিরোধকেন্দ্র লখনউ-র পতনের পর সিপাহিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সত্যিকার অর্থে গেরিলা যুদ্ধ চালায়, ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর অতর্কিত হামলা ইত্যাদি অব্যাহত রাখে। অযোধ্যার তালুকদাররা নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে গভর্নর-জেনরেল ক্যানিং তাদের তালুকদারি লোপ করেন। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য তালুকদাররা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং বেরিলিতে খাঁ বাহাদুর খাঁ'র সঙ্গে যোগ দেয়। প্রবল প্রতিরোধের জন্য ক্যাম্বেলের পক্ষে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চের আগে বেরিলি দখল সম্ভবপর হয়নি। তারপর নানা সাহেব এবং অযোধ্যার সভাসদরা কিছু সিপাহি সহ নেপালের সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। আহমদ উল্লাহ্ এবং আরও কয়েক জন নেতা সহ এদের অন্য একটি দল অযোধ্যার ফিরে এলে সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতায় আহমদ উল্লাহ্ নিহত হন।

বুন্দেলখণ্ডে তাঁতিয়া তোপী তখনো যুদ্ধরত ছিলেন এবং একজন সুদক্ষ সিপাহিনেতা হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জেনরেল রোজ তখন বোম্বাই থেকে সসৈন্যে বুন্দেলখণ্ডে রওয়ানা হন। সেখানে ঝাঁসি দুর্গ সহ এই নামের একটি ছোট রাজ্য ছিল। লক্ষ্মীবাই নামে জনৈক যুবতী রানী তার দত্তকপুত্রের পক্ষ থেকে রাজ্যটি শাসন করতেন। ঝাঁসির জনগণও একটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে এবং তাদের হাতে জনকয়েক ব্রিটিশ নিহত হয়। কিন্তু লক্ষ্মীবাই প্রজাদের চরমপন্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। ব্রিটিশ হত্যার অজুহাতে রোজ ঝাঁসি আক্রমণ করেন। লক্ষ্মীবাঈ রোজকে এই হত্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কহীনতার কথা বুঝানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হলে ব্রিটিশরা ঝাঁসি অবরোধ করে এবং রানী নিজে দুর্গ রক্ষার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

ব্রিটিশদের হাতে ঝাঁসির পতন ঘটলে লক্ষ্মীবাঈ পলায়ন করেন ও তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা গোয়ালিয়র দখল সমর্থ হন। কিন্তু শেষে রোজের প্রেরিত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালনা করেছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মীবাঈ। তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁতিয়া তোপী বিধ্বস্ত সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্টাংশ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। অনুসরণকারীদের এড়ানোর জন্য তিনি বার বার পথ বদলাতে থাকেন। প্রথমে তিনি যান খান্দেশে, শেষে আবার গোয়ালিয়রে ফিরেন। ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তাঁতিয়া তোপী ফাঁসিকাঠে আত্মদান করেন।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়ার এক প্রকাশ্য ঘোষণা মোতাবেক ভারত শাসনের দায়িত্ব ব্রিটিশ রাজ গ্রহণ করে ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভেঙে দেয়া হয়।

ব্রিটিশ হত্যায় প্রত্যক্ষ শরিক নন এমন সকল বিদ্রোহী সামন্তদের সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শনের আশ্বাস সহ তিনি ভারতীয় সামন্তদের সম্পত্তি অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা দেন।

এই ঘোষণার ফলে প্রধান সামন্তরা নিজেদের বিদ্রোহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। ক্যানিংয়ের মার্চ-ঘোষণার ফলে বিদ্রোহী অযোধ্যার তালুকদার, রাজা ও জমিদাররা অস্ত্রত্যাগ করে। যেসব সামন্তদের ক্ষমালাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেবল তারাই তখনো লড়াই অব্যাহত রেখেছিল।

ইতিমধ্যে তাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছিল। নানা সাহেব ও আজিমুল্লাহ জঙ্গলে প্রাণ হারান এবং বাহাদুর খাঁকে ব্রিটিশরা হত্যা করে। এভাবেই অভ্যুত্থানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হওয়ার মূলে অনেক কারণ ছিল। এর মূলে সৈন্যদল কৃষক ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত হলেও এর নেতৃত্ব ছিল অভিজাত সামন্তদের হাতে। এইসব নেতারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালনায় নিজেদের অযোগ্যতার প্রমাণ দেন। তারা কোন সাধারণ রণকৌশল বা সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হননি। প্রায়ই তারা নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করতেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত বিদ্রোহের তিনটি কেন্দ্রের প্রত্যেকটিই স্বাধীনভাবে কার্যকলাপ চালাত। তদুপরি সামন্তরা কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় এদের কোন কোন অংশ অভ্যুত্থানের সঙ্গে একাত্মতা হারিয়ে ফেলেছিল। ব্রিটিশরা সামন্তদের সুবিধাদানের সঙ্গে সঙ্গে তারা এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল। এমন জটিল একটি যুদ্ধ চালনার পক্ষে এসব সিপাহি নেতাদের যোগ্যতা ছিল সামান্যই। তার কৌশলগত সমস্যার মুকাবিলা করতে পারলেও রণনীতি চিন্তার মতো, পুরো সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ বিচারের মতো শিক্ষা তাদের ছিল না। পরিশেষে, বিদ্রোহীদের সামনে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্যও তুলে ধরা হয়নি। তারা আহ্বান জানাতেন অতীত প্রত্যাবর্তনের, মোগল সাম্রাজ্যের অধীন স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার, যদিও উনিশ মধ্যভাগে সামন্ত সমাজে প্রত্যাবর্তন অনেকটা অবাস্তবই ছিল।

গণবিদ্রোহ দমনে সমর্থ হলেও ব্রিটিশরা ভারতে তাদের নীতিবদলে বাধ্য হয়েছিল : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তুলে দেয়া হয় ও ভারতবর্ষ ব্রিটিশের উপনিবেশ হয়ে ওঠে এবং এখানে কর্মচারী নিয়োগের সকল দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর বর্তায়। ব্রিটিশরা সামন্তদের অসন্তুষ্ট করতে আর ইচ্ছুক ছিল না এবং তারা সর্বাধিক প্রভাবশালী সামন্তদের সুবিধাদানের মাধ্যমে সতর্কতামূলক নীতি অনুসরণ করত। এই বিদ্রোহের পর সাধারণভাবে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির এক নবপর্যায় শুরু হয়েছিল।

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

বাংলায় মহাবিদ্রোহ : আঠারোশো সাতান্নর প্রথমার্ধ

মহাবিদ্রোহের ইতিহাসচর্চায় পূর্বভারত বরাবরই কিছুটা ব্রাত্য। জগদীশপুরের কুঁঅর সিং ও অমর সিং-এর কল্যাণে পশ্চিমে বিহারের সাহাবাদ অঞ্চল বিদ্রোহের মানচিত্রে একটা প্রান্তিক পরিসর হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও, বাংলা, উড়িষ্যা বা আসামের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। মূল আখ্যানে এইসব অঞ্চল প্রায় পাদটীকাতে স্থান পেয়েছে। পুরানো অভ্যাসবশত যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে যে রাজনীতির পালাবদলের সেই নির্ণায়ক মুহূর্তে বাংলার রাজভক্তি ছিল অচঞ্চল। উত্তর ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে কোম্পানির শাসন যখন অপসৃত, খোদ দিল্লি যখন বিদ্রোহীদের দখলে, ঝাঁসিতে যখন মরণপণ লড়াই চলেছে, বাংলার জমিদাররা তখনও শাসকদের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে পিটিশন করছেন, বাংলার কলমচিরা পত্র-পত্রিকায় অকৃতজ্ঞতার দায়ে সিপাহিদের দুষছেন। আখ্যানের এহেন নিটোল বিন্যাসে ৩৪ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির বিদ্রোহী সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে নেহাত বেমানান। সুতরাং ২৯ মার্চ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বারাকপুরের সেনাছাউনিতে যে ঘটনা ঘটেছিল, তাকে ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করাই নিরাপদ। তাতে ঘটনার গুরুত্বকেও স্বীকার করা যায়, আবার মূল আখ্যানের বিন্যাসেও বিশেষ রদবদল করতে হয় না। আর দশজন উচ্চবর্ণের সিপাহির মতো মঙ্গল পাণ্ডের ধর্মবোধে কোম্পানি আঘাত করেছিল। কিন্তু অন্যদের প্রতিক্রিয়া সাবধানী হলেও ভাঙের ঘোরে তিনি ছিলেন বেহিসেবি। তাই তার ডাকে তেমন সাড়া মেলেনি, বরং শেখ পল্টু তাকে নিরস্ত্র করতে সাহায্য করেছিলেন এবং এজন্য তার পদোন্নতিও হয়েছিল[১]। ছাউনির বাইরে সমাজে এই ঘটনার কোনো অনুরণন ঘটেনি। ঘটার কথাও নয়, কারণ এটি পূর্বাপর ঘটনাক্রমের সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন। এটা যেন একটা আকস্মিক স্ফূলিঙ্গ, যা উত্তরভারতের অন্যত্র দাবানলে পরিণত হয়েছিল। বাংলা ফিরে গিয়েছিল আনুগত্যের নিরাপদ আশ্রয়ে।

প্রথমেই স্বীকার করা প্রয়োজন যে বাংলা এবং পূর্বভারতের অন্যান্য অঞ্চল মহাবিদ্রোহের ভরকেন্দ্র ছিল না। সেই কারণেই মূল আখ্যানের এই বক্তব্যে গলদ নেই। তাছাড়া কার্য-কারণের যে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকায় সিপাহির ক্ষোভের সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের প্রবহমান অসন্তোষের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পেরেছিল, বাংলায় তা আশা করা যায় না। সমস্যা অন্যত্র। মহাবিদ্রোহের ভরকেন্দ্র না হলেও বাংলা বিদ্রোহের প্রভাব থেকে আদপেই মুক্ত ছিল না। একথা প্রথম জোরের সঙ্গে বলেছিলেন স্যর ফ্রেডরিক জেমস্ হ্যালিডে। হ্যালিডে ছিলেন বাংলার প্রথম ছোটোলাট। সেই সুবাদে ১৮৫৭-৫৮ সালে বাংলায় যা ঘটেছিল সবই ছিল তার নখদর্পণে। মহাবিদ্রোহের শেষ পর্বে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ সালে তিনি একটা দীর্ঘ প্রতিবেদনে বিগত প্রায় দেড় বছরের ঘটনাক্রমের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন।[২] বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে

বিদ্রোহের গভীরতা এবং ব্যাপ্তির পর্যালোচনা করে তিনি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে বাংলা-সরকারের অধীনে এমন একটা জেলাও ছিল না যেখানে প্রকৃত বিপদ ঘটেনি বা নিদেনপক্ষে বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়নি। মহাবিদ্রোহের অবসানের অল্প কয়েকবছর পরে জন উইলিয়াম কে তিন খণ্ডে রচনা করেছিলেন তার মহাগ্রন্থ 'হিস্ট্রি অফ দি সিপয় ওয়ার'। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস-চেতনায় জারিত হলেও বিদ্রোহের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসেবে এটি এখনও সমাদৃত। কে বাংলার সেনাছাউনিতে জমে থাকা অসন্তোষের বাতাবরণকে তাঁর বিশ্লেষণের প্রস্থানবিন্দু হিসেবে বেছে নিলেও বাংলার ঘটনায় বিশেষ কালাতিপাত করেননি। বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোম্পানির সংঘাতের আরও নাটকীয় পরিসরের দিকেই ছিল তার আগ্রহ, কারণ সেখানেই নির্ধারিত হয়েছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য। বস্তুত এই সময়ে আরও অনেকেই বিদ্রোহের চটজলদি ইতিহাস বা সাংবাদিকসুলভ প্রতিবেদন লিখেছিলেন। সকলের যোগ্যতা পর্যাপ্ত ছিল না, উদ্দেশ্যও তুলনীয় ছিল না। এর মধ্যে আলেকজাণ্ডার ডাফকে[৩] বাদ দিলে বাকি অনেকের কাছেই বাংলা যেন অনেকটা আলোচনার কথামুখ। লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সাংবাদিক রাসেলও এর ঊর্ধ্বে নন।[৪] ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন সরু সুতোয় ঝুলছে, তাদের নজর তখন ছিল রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলে।

তাদের না হয় নানা ধরনের সাম্রাজ্যবাদী তাগিদ ছিল। কেউ চেয়েছিলেন ইংরাজদের শৌর্য এবং দেশপ্রেমকে তুলে ধরতে, কেউ নেটিভদের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করতে, কেউ বা আবার সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশনারীদের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করতে। এছাড়াও আরও নানা ধরনের অভিপ্রায় থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে মহাবিদ্রোহের তথ্য-ভিত্তিক ইতিহাসচর্চায় যখন প্রকৃতই জোয়ার এল, তখনও তার অভিঘাত পূর্বভাবতে এসে পৌঁছোয়নি। এটা কিছুটা বিস্ময়কর, কারণ পূর্বভারত সম্পর্কে সরকারি তথ্যের কোনো অপ্রতুলতা নেই। কোম্পানির সরকার ১৮৫৭ সালের প্রায় গোড়া থেকেই ঘটনাপ্রবাহের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। দিল্লি বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাবার অব্যবহিত পরে ২৩ মে তারিখে সরকার একটা নির্দেশনামা জারি করে। প্রজাদের আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাব এবং জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে জানানোর জন্য সব কমিশনারদের এবং তাদের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের ফলে জেলাগুলো থেকে ফি-হপ্তায় যে রিপোর্ট আসতে থাকে সেগুলোকে জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টের 'স্পেশাল ন্যারেটিভের' সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে পূর্ব ভারতে বিদ্রোহের এবং তার প্রভাবে তৈরি হওয়া নানা গুজবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। এছাড়াও কলকাতা থেকে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের যে সাধারণ চিঠি পাঠানো হত সেগুলোও ঘটনাক্রমের সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্যবান প্রতিবেদন। সর্বোপরি জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিংস এবং ওরিজিনাল কনসাল্টেশনস তো আছেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে এই সব নথি সংরক্ষিত আছে। ঐতিহাসিকরা এখনও এগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারেননি। সামগ্রিকভাবে এইসব নথিপত্র থেকে বিদ্রোহকালীন পূর্ব ভারত সম্পর্কে একটা বিকল্প ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। শুধুমাত্র সরকারি প্রতিবেদন থেকেই দেখা যায় বাংলা তথা পূর্ব ভারতের অন্যত্র ঐ সময়ে ঘটনার কোনা অভাব ছিল না। দমদম, বহরমপুর, বারাকপুর, জলপাইগুড়ি, ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো সেনা-শিবিরে

সরাসরি বিদ্রোহ তো হয়েছিলই। প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য অবশ্যই ছিল। বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সিপাহিরা কোথাও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছেন, কোথাও বা বিক্ষোভের আগুন বুকের মধ্যে চেপে রেখে সমর্থনের ভিত্তিভূমিকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ বহরমপুর এবং বারাকপুরের বাগী সিপাহির সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের যোগাযোগ, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির ক্ষুব্ধ সিপাহিদের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্ক, চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের সঙ্গে কুকি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যনির্ভর বিবরণ সহজলভ্য। ঘটনার বিবরণ তো আছেই, রটনার গঠনশৈলী এবং প্রসারও কম আকর্ষণীয় নয়। যেখানে কোনো ঘটনাই ঘটেনি সেখানেও গুজবের ডানায় ভর দিয়ে এসে পৌঁছোচ্ছিল নানা রটনা। উত্তর ভারতের নানা জায়গায় রটনার বিস্তারে চাপাটির ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিকরা আলোচনা করেছেন। সরকার-বিরোধী প্রচারে এই ধরনের দেশজ মাধ্যমের ব্যবহার শুধু ঔপনিবেশিক ভারবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিগত শতকের গোড়ায় জর্মান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে টাঙ্গানিয়াকায় সংঘটিত মাজি মাজি অভ্যুত্থানের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে প্রচারের মাধ্যম ছিল মন্ত্রপূত জল, যার স্থানীয় প্রতিশব্দ ছিল মাজি। বাংলায় অনুরূপ কোনো দেশীয় মাধ্যমের সন্ধান না পাওয়া গেলেও কে তার গ্রন্থে বাজারের নির্ণায়ক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫] কথাটা অবহেলা করার মতো নয়। মূলত বিনিময়ের পরিসর হিসেবে বাজারে মিলিত হতেন দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষজন, যারা অনেকেই সাক্ষরতার গণ্ডি ডিঙোতে পারেননি। লেখ্যভাষা অধিগম্য ছিল না বলেই কথ্যভাষার মাধ্যমে তারা সংগ্রহ করতেন নানা খবর, যার মধ্যে মিশে থাকতো রটনা। তাদের সাহায্যে এইসব রটনা বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়তো। শুধু নেটিভরাই নয়, ইউরোপীয়রাও এইসব রটনাকে কম গুরুত্ব দিতেন না, তফাৎটা ছিল শুধু রটনার বিষয়বস্তুতে। নেটিভরা ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করতেন, অন্যদিকে ইউরোপীয়রা আশঙ্কা করতেন বরখাস্ত হওয়া বাগী সিপাহিরা যে কোনো সময়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। বিশেষ করে দিল্লি বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাবার পর এই আশঙ্কা আরও পল্লবিত হয়ে কলকাতা এবং অন্যান্য জেলা শহরের ইউরোপীয় অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। এই প্রক্রিয়া গোটা ১৮৫৭ সাল জুড়েই লক্ষ করা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন এই সমস্ত ঘটনা এবং রটনাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় মহাবিদ্রোহের সময়ে বাংলার সামাজিক জীবনচর্যা মোটেই নিস্তরঙ্গ ছিল না। তবু যে দৃষ্টিভ্রম, সম্ভবত তার কারণ মহাবিদ্রোহের দিল্লি-কেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চা, যেমনটা অতি সম্প্রতি উইলিয়াম ডালরিম্পল তাঁর 'দি লাস্টা মুঘল' গ্রন্থে করেছেন।[৬] সুলিখিত এই গ্রন্থটি পড়লে মনে হবে দিল্লিই বোধকরি ভারতবর্ষের অনুচিত্র। সেখানে যা ঘটছে সেটাই মহাবিদ্রোহের মূল উপজীব্য। আদতে দিল্লির চোখে দেখার এই এক বিপদ। যে বৈচিত্র্য এই উপমহাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা স্বভাবতই ধূসর এবং বিবর্ণ মনে হয়। প্রান্তসীমার স্বকীয়তা সেখানে ধরা দেয় না। এতাবৎ অবহেলিত প্রান্তিক অঞ্চলগুলির ঘটনাপ্রবাহকে ফিরে দেখা সেই কারণেই মহাবিদ্রোহের ইতিহাসচর্চার একটা জরুরি কাজ। ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের উদ্যোগে এই কাজ শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যেই অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল, পশ্চিম ভারত প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন করে খুঁজে পাওয়া তথ্যের সাহায্যে মহাবিদ্রোহের অভিঘাত লক্ষ করা যাচ্ছে। আশা করা যায় এর ফলে উপমহাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে ইতিহাসের এই নির্ণায়ক ঘটনাকে পুনর্বিচার করা সহজ হবে।

দুই

জানুয়ারি মাসের গোড়া থেকেই বাংলার বিভিন্ন সেনাছাউনিতে, বিশেষ করে দমদম, বারাকপুরে এবং বহরমপুরে, সিপাহিদের মধ্যে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। এর প্রথম লক্ষণ দেখা গিয়েছিল দমদমে। দমদম কোম্পানির পুরানো ছাউনি। অনেককাল এটাই ছিল গোলান্দাজ বাহিনীর সদর। পরে অবশ্য এই সদর মীরটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন দমদমে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (স্কুল অফ মাস্কেট্রি) স্থাপিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে কোম্পানি ব্রাউন বেস নামে পরিচিত সাবেক বন্দুকের বদলে এনফিল্ড রাইফেল নামে আরও উন্নতমানের রাইফেল প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্থির হয়, দমদমে সিপাহিদের এই নতুন বন্দুকের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপরেই সেই বিখ্যাত ঘটনা, যা জন উইলিয়াম কে-র কল্যাণে সুবিদিত। জানুয়ারির গোড়ায় এক নিম্নবর্ণের লস্কর নাকি এক ব্রাহ্মণ সিপাহির কাছ থেকে তার লোটটা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন। ছুঁৎমার্গী সিপাহি তার লোটা লস্করকে দিতে রাজি না হওয়ায় লস্কর ব্রাহ্মণের জাত্যভিমানকে ঠেস দিয়ে কিছু কথা বলেন। ইঙ্গিত ছিল, চর্বি মাখানো টোটা একবার চালু হয়ে গেলে জাতধর্ম সব উঠে যাবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে আর কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। দমদমের এই ঘটনার বিবরণ নানা বিভঙ্গে অন্যত্রও পরিবেশিত হতে দেখা যায়। তারপর এই বার্তা এসে পৌঁছোয় বারাকপুরে। বারাকপুর সেনানিবাস হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ, সেনাবাহিনীর প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের সদর। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় চারটি নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট বারাকপুরে মোতায়েন ছিল, পরে আরও বাহিনী সেখানে নিয়ে আসা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের দফতর থেকে প্রকাশিত ঐ বছরের 'লিস্ট অফ দি বেঙ্গল আর্মি'-তে পাওয়া যাবে।[৮] ব্যারাকপুরের এই সেনানিবাসের মুখ আধিকারিক ছিলেন মেজর জেনারেল জন হিয়ার্সে। জানুয়ারির গোড়া থেকেই বারাকপুরের সিপাহিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্তি তার নজর এড়ায়নি। সিপাহিদের মধ্যে বিশেষ করে রাত্রের দিকে গোপন আলোচনা, পারস্পরিক শলাপরামর্শ তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন সিপাহিদের আশঙ্কা, কোম্পানির সরকার তাদের ধর্মনাশ করবে বদ্ধপরিকর। তিনি লিখছেন, কিছু কুচক্রী সিপাহিদের মধ্যে সুচতুরভাবে প্রচার চালাচ্ছেন যে কোম্পানি তাদের সকলকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। এই প্রচারকরা সম্ভবত ব্রাহ্মণ এবং কলকাতার ধর্মসভার মতো হিন্দু সংঘটনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি আরও লিখছেন, "এই প্রচারের সঙ্গে সেই সব হিন্দুরাই যুক্ত আছেন যারা কলকাতায় বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের বিরোধী। তাঁরাই তলে তলে সিপাহিদের উস্কানি দিচ্ছেন যে অচিরেই তাদের জাতধর্ম সব রসাতলে যাবে। টোটা নিয়ে বিতর্ক তাদের এই প্রচারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। এই সময় চর্বি মাখানো টোটার কথা বারাকপুরের সকলেরই মুখে মুখে।"[৯]

ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষদর্শী বলেই হিয়ার্সের প্রতিবেদনের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেরই বিবরণ সতত গ্রহণযোগ্য হয় না। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে একই ঘটনা নানাজনের চোখে ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। তাই বিবৃত ঘটনার সত্যতা নির্ধারণ করার জন্য না হলেও অন্য নানা কারণে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উপেক্ষা করা যায় না। মনে রাখতে হবে হিসার্সে যখন তার প্রতিবেদন লিখছেন তখনও মীরট থেকে দিল্লিতে বাগী সিপাহির ঢল নামেনি, বাহাদুর শাহ বিকল্প আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হননি। এককথায় আলেকজান্ডার ডাফ যাকে মহাবিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র বলেছিলেন,[১০] সেটা তখনও পরিস্ফুট হয়নি। তখনও বারাকপুরের সেনাপ্রধানের মতো আরও অনেকেরই ধারণা ছিল, আহত ধর্মবোধই সিপাহিদের ক্ষোভের কারণ। টোটা নিয়ে অসন্তোষ এই জমে থাকা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সিপাহিদের যদি বোঝানো যায় যে তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা কোম্পানির উদ্দেশ্য নয়, তাহলে এই ক্ষোভ প্রশমিত হবে। এককথায় সিপাহিদের রাজনৈতিক আনুগত্য স্থানচ্যুত হচ্ছে, এমন কোনো আশঙ্কা তখনও কোম্পানির মনে দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়ত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিক্রিয়াই তাদের কাছে বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল অংশ সমাজ-সংস্কারের প্রশ্নে সরকারের পাশে থাকলেও ধর্মসভার মতো তথাকথিত কট্টরপন্থীরা কোম্পানির উপর খড়্গহস্ত। তাদের আশঙ্কা সংস্কারের অছিলায় ধর্মান্তকরণই সরকারের গোপন কর্মসূচী। সিপাহিদের অসন্তোষে এরাই উস্কানি দিচ্ছেন। হিয়ার্সে বা তার সতীর্থদের এই সন্দেহের কোনো ভিত্তি ছিল কি না সেটা আপাতত বিচার্য নয়। সেটা লক্ষ্যণীয়, তা হল সন্দেহের বর্ষামুখ তখনও হিন্দুদের দিকে। অচিরেই অবশ্য তাদের এই ধারণা পরিবর্তিত হবে। আলেকজান্ডার ডাফের মতো অনেকেই কট্টর পন্থী মুসলমানদের কথিত ধর্মান্ধতা এবং হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নকেই বিদ্রোহের প্রসারের জন্য দায়ী করবেন। তখন অনেকেরই মনে হল ওয়াহাবী এবং অন্যান্য জেহাদী গোষ্ঠীরাই বিদ্রোহের নিয়ন্তা। গোটা মহাবিদ্রোহকে মুসলিম চক্রান্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করার এই ভ্রান্ত ঐতিহাসিক প্রবণতা এবং সেইসঙ্গে বিদ্রোহের জেহাদী চরিত্রের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার এই ঔপনিবেশিক অভ্যাস যে এখনও খুব একটা বদলায়নি তার প্রমাণ উইলিয়াম ডালরিম্পলের 'দি লাস্ট মুঘল'। ডালরিম্পল তো জেহাদীদের ধর্মযুদ্ধের ডাকের সঙ্গে ইদানীংকালের ইসলামিক সন্ত্রাসের ঘরোয়া সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। মহাবিদ্রোহের জেহাদীরা অনেকটা যেন ৯/১১-র অগ্রপথিক।[১১]

ডালরিম্পলের বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়ে সম্প্রতি মননঋদ্ধ আলোচনা করেছেন ইকতিদার আলম খান এবং সীমা আলাভি।[১২] যেটা উল্লেখ্য তা হল নতুন মোড়কে সেই পুরানো মুসলিম চক্রান্ত তত্ত্বের জাবর কাটার ট্রাডিশন এখনও চলেছে। অথচ জানুয়ারি মাসে কোম্পানির সামরিক ও অসামরিক আধিকারিকরা রক্ষণশীল হিন্দু প্রতিক্রিয়াকেই অশান্তির জন্য দায়ী করছিলেন। শুধু অশান্তিই নয়, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হিয়ার্সে তো আগের থেকে আরও স্পষ্টভাবেই জানালেন যে বারাকপুরে ইংরাজরা এমন একটা মাইন-এর উপর বাস করছেন যা যে কোনো সময়ে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করতে পারে। সেই সময়ের সরকারি নথিপত্র দেখলে মনে হবে কর্তৃপক্ষ তখনও সমস্যার জটিলতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে

উঠতে পারেননি। হয়তো ভেবেছিলেন এ সবই সাময়িক উত্তেজনা, স্থানীয় ভাবেই একে প্রশমিত করা সম্ভব।

অচিরেই তাদের ভুল ভাঙল। বারাকপুরে যা ছিল কেবলই আশঙ্কা, বহরমপুরে সেটাই বল বাস্তব সত্য। বহরমপুরের সেনাছাউনি বারাকপুরের তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ। এখানে তখন ১৯নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির একটা রেজিমেন্ট ও অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর কিছু সিপাহি নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বহরমপুরের দুটি বিষয় কোম্পানির উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। প্রথমত বহরমপুরের অবস্থান ছিল মুর্শিদাবাদের পাশেই, আর মুর্শিদাবাদেই ছিল নবাব নাজিমের বাস। নাজিমের নিজামতকে তো কোম্পানি আগেই অবান্তর করে দিয়েছিল। আর্থিক দিক থেকে তিনি কোম্পানির অনুদানের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। তবে তার সামাজিক প্রভাব যে তখনও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল সেকথা ইংরাজরা বিলক্ষণ জানতেন। কে সাহেব লিখছেন "It was not difficult to see that if these troops were to rise against their English officers, and the people of Moorshedabad were to fratenrize with them, in the name of the Newab, all Bengal would soon be in a blaze."[১৩] দ্বিতীয় যে বিষয়টি কোম্পানির শিরপীড়া ঘটিয়েছিল সেটা হল বহরমপুর ছাউনিতে কোনো ইংরাজ সেনার অনুপস্থিতি। শহরে বা আশপাশে ইংরাজ সৈনিক না থাকায় বহরমপুরে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা সত্যিই উদ্বিগ্ন ছিলেন। উপরন্তু আবার এই ফেব্রুয়ারি মাসেই ৩৪নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির কিছু সিপাহিকে রুটিন-মাফিক ব্যারাকপুর থেকে বহরমপুরে পাঠানো হয়েছিল। ফল হল হিতে বিপরীত। এইসব সিপাহির মাধ্যমে বারাকপুর সেনানিবাসের সিপাহিদের ক্ষোভ সঞ্চারিত হল বহরমপুরে। বহরমপুরে দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল মিচেল। ২৭ ফেব্রুয়ারি ছাউনিতে সিপাহিদের উত্তেজনা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু তিনি এমন কিছু হটকারী পদক্ষেপ নিলেন যা সিপাহিদের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দিল। সর্বোপরি তিনি অবাধ্য সিপাহিদের বর্মায় পাঠাবার হুমকিও দিলেন। বিষয়টি এমনিতেই স্পর্শকাতর, তাছাড়া বর্মায় পাঠানো নিয়ে ইতিপূর্বে বারাকপুরে বিদ্রোহও হয়েছিল। এবারে বহরমপুরেও তার ব্যতিক্রম হল না। বহরমপুরের ১৬ নং রেজিমেন্ট বিদ্রাহ করল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সিপাহিদের এটাই প্রথম বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহের অনুপুঙ্খ আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়। এই বিদ্রোহ দমন করায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকার ১৯নং রেজিমেন্টকে ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ, কার্যকর করা কঠিন। বহরমপুরে ইউরোপীয় বাহিনী তো নেই, সুতরাং হাজার খানেক সিপাহিকে বরখাস্ত করার ঝুঁকি কে নেবে? অথচ শাস্তি না দিলে অন্যান্য ছাউনিতে এর ছোঁয়াচ লাগতে পারে। অতএব সরকার এক্ষেত্রে আটঘাট বেঁধে এগোতে চাইল। প্রথমত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আগাম ইঙ্গিত না দিয়ে ১৯ নং রেজিমেন্টকে বারাকপুরে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদের পরিবর্তে সিউড়ি থেকে ৬৩নং রেজিমেন্টকে বহরমপুরে পাঠান হয়। তবে পাছে ১৯নং-এর বাগী সিপাহিরা সন্দেহ করে বসেন তাই বলা হল, বহরমপুর ছেড়ে এরা বেরিয়ে যাবার দু-একদিন পরে যেন সিউড়ির রেজিমেন্ট বহরমপুরে পৌঁছান। অন্য-একটি নির্দেশে সরকারের অভিসন্ধি আরও স্পষ্ট। "It is the intention of government to disbond the 19th Regi-

ment Native Infantry, where the corps may be expected on, or about, the 3st instant."[১৪] কিন্তু একই সঙ্গে এই নির্দেশও দেওয়া হল যে এই বরখাস্ত হবার খবর যেন ফাঁস না হয়, অন্তত এদের বারাকপুর পৌঁছাবার আগে তো নয়ই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই আগাম খবর দেবার উদ্দেশ্য হল যাতে পুলিশ এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। কিসের বিরুদ্ধে সতর্কতা? সরকারি নির্দেশ সেটাও স্পষ্ট : "to obviate the possible evil effect of so many discharged men being for a time at large in the neighbourhood of the presidency."[১৫]

মার্চ মাসে অকুস্থল আবার বারাকপুর। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতেই সেনানিবাস-প্রধান হিয়ার্সে অস্থিরতা লক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন বিক্ষিপ্তভাবে তারঘরে আগুন লাগানো হচ্ছে। এই তারঘরগুলি সেই বিখ্যাত তার ব্যবস্থার প্রতীক যা মধ্যশতকে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়ুধ। যাকে লর্ড ডালহাউসি জাঁক করে বলেছিলেন 'গ্রান্ড ভিক্টোরিয়ান টেকনোলজি'। একথা সুবিদিত যে শুধু বারাকপুরেই নয়, তার ব্যবস্থা এবং তারঘরগুলি বিদ্রোহ-প্রভাবিত অন্যান্য অঞ্চলেও ক্ষুব্ধ সিপাহিদের আক্রমণের নিশানা হয়েছিল। যাই হোক, বারাকপুরে এই ডাকঘর এবং তার অফিসের উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ ছাড়াও অন্য একটি বিষয়ের কথা জন কে উল্লেখ করেছেন। সাঁওতালদের অনুকরণে রাতের দিকে সিপাহিরা অফসারদের খড়ের চালের বাঙ্‌লোর দিকে তাক করে আগুনজ্বলা তীর ছুঁড়তেন। তাছাড়া নিয়মিত গোপন মন্ত্রণা-সভা তো ছিলই। যেহেতু সরকার তখনও এইসব ঘটনাগুলোকে ধর্মীয় ক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত করে দেখছিল তাই এদের সম্ভাব্য রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা তার নজরে পড়েনি।

সম্ভবত সেই কারণেই ২৯ মার্চ বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে কিছুটা হতচকিত করেছিল। ক্ষোভ থাকতেই পারে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি যে এতটা বিস্ফোরক হতে পারে তা অনেকেই হয়তো আগাম অনুমান করতে পারেনি। ইতিহাসে এবং কল্পকথায় মঙ্গল পাণ্ডের উত্থানকে নানা বিভঙ্গে এতবার পরিবেশন করা হয়েছে যে তথ্য এবং কল্পনার মধ্যে ভেদাভেদ করা আজ কঠিন। সেটা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নয়। একই ভাবে ৩৪নং বাহিনীর আরও কতজন সিপাহির নিরুচ্চার কিন্তু নৈতিক সমর্থন পাণ্ডের দিকে ছিল সে হিসেব করা দুঃসাধ্য। মনের রসায়ন চিরকালই দুর্জ্ঞেয়। অনেকেই হয়তো তার ক্ষুব্ধ চেতনার শরিফ হয়েও তার সমর্থনে অস্ত্রধারণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। হয়তো সেই কারণেই হিয়ার্সে যখন জানতে চেয়েছিলেন এতজন সশস্ত্র সিপাহি অকুস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মঙ্গল পাণ্ডেকে কেন নিরস্ত্র করা গেল না, কেনই বা তাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি চালাল না, তখন সেই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি। তাদের নৈঃশব্দের ভাষায় হয়ত উত্তর নিহিত ছিল। তার ঔদ্ধত্যের আগুন থেকে অনেকেই তাদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে পেরেছিলেন। তারপর সে আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল অন্যখানে।

ইতিমধ্যে বহরমপুর থেকে ১৯নং বাহিনীর সিপাহিরা বারাকপুরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছোলে ছাউনির বিশাল বাহিনীর উপস্থিতিতে তাদের বরখাস্ত করা হয়। সামরিক কর্তাদের চোখে বারাকপুরের ৩৪নং বাহিনীর অপরাধের গুরুত্ব ছিল বেশি। কে-সাহেব লিখছেন, এরা সিপাহি হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্যতা হারিয়েছিলেন। তবু এই

বাহিনীকে বরখাস্ত করার আগে কর্তারা মাসাধিক কাল সময় নিয়েছিলেন। সম্ভবত এবার তারা আরও সতর্ক হয়ে এগোতে চাইলেন। অনুসন্ধান কবে ক্ষোভের ব্যাপ্তি এবং গভীরতাও এই সুযোগে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। তারপর এঁদের বরখাস্ত করা হল ৬ মে। এই দুই ঘটনার অভিঘাতে প্রশাসন যেন কিছুটা নড়ে চড়ে বসল। ধর্মবোধে আঘাত লাগার ফলেই সিপাহিরা এত ক্ষুব্ধ—বিশ্বাসের এই জায়গা থেকে সরে না এলেও প্রশাসন কোন বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের গোঁড়ামিকে এককভাবে এর জন্য আর দায়ী করছিল না। বরং দু-দুটি রেজিমেন্টের সিপাহিদের এইভাবে বরখাস্ত করার প্রভাব যাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অন্যান্য সিপাহিদের উপর না পড়ে সেই উদ্দেশ্য প্রশাসন ১৬ মে তারিখে একটা হুকুমনামা জারি করে। সিসিল বিডনের নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই ঘোষণায় প্রথমেই বাংলার সিপাহিদের আশ্বস্ত করে বলা হয় যে হিন্দু অথবা মুসলমান—কারও ধর্মবোধে আঘাত করার কোন অভিপ্রায়ই সরকারের নেই। বরং সকলের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ইংরাজ প্রশাসন শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবু কিছু স্বার্থপর এবং কুচক্রী বিশ্বাসঘাতকেরা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে প্রজাদের স্বাভাবিক আনুগত্যে চিড় ধরাবার নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। এদের সম্পর্কে সাবধান। এদের পাতা ফাঁদে পা দিলে সমূহ বিপদ।

তিনটি কারণে সরকারের এই 'মে হুকুমনামা'[১৬] মনোযোগ দাবি করে। প্রথমত সেনাশিবিরের অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ প্রশাসনের স্নায়ুবিকার না ঘটালেও প্রগাঢ় উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। প্রশাসকরা উপলব্ধি করছিলেন, সিপাহিদের ক্ষোভ কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধও নয়। সমাজের বৃহত্তর অসন্তোষের সঙ্গে সিপাহির ক্ষোভের একটা অদৃশ্য মেলবন্ধন ঘটে গিয়েছে। 'মে হুকুমনামা'র তৃতীয় পংক্তিতে তাই "হিন্দু এবং মুসলমান, সিপাহি এবং বেসামরিক প্রজা" সকলের উদ্বেগকে প্রশমিত করার বিলম্বিত প্রয়াস লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে অতিক্রম করে সরকারের বিরুদ্ধে একটা যৌথ প্রতিরোধ গড়ে ওঠার আশঙ্কা প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করছে। জন উইলিয়াম কে লিখছেন "এতদিন এশিয়াটিক জাতিগুলির আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য এবং সংঘাতই ছিল আমাদের শক্তির উৎস এবং নিরাপত্তার চাবিকাঠি।" এপ্রিল মাস থেকে পরিস্থিতিটা একেবারে বদলে গেল। "Mahommedans and Hindoos were plainly united against us". সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান যে সরকারের পক্ষে আশঙ্কাজনক তার ইঙ্গিত উপরোক্ত ইশতেহারে পাওয়া যায়। তৃতীয়ত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকার "ষড়যন্ত্র তত্ত্বের" পুরানো মানসিক ঘেরাটোপে ফিরে গিয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসে এই প্রবণতা বারে বারে দেখা গিয়েছে। যখনই ঔপনিবেশিক শাসন কোন বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, তখনই আত্মানুসন্ধানের পরিবর্তে সে "ষড়যন্ত্র তত্ত্বের" সহজ পথ বেছে নিয়েছে। বাংলায় সেই সূচনাপর্বের সন্ন্যাসী-ফকির বা রঙপুর বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সর্বশেষ সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত এই একই প্রবণতার রকমফের লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কুচক্রী বিশ্বাসঘাতকের দলই সিপাহিদের উত্তেজনার জন্য দায়ী। কোম্পানির শাসন সমদর্শী এবং শুভঙ্কর। সিপাহিরাও মোটের উপর সরল। তবু যে এই অশান্তি, তার জন্য

যারা আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছেন, যারা সিপাহি এবং সাধারণ নাগরিকদের বিশ্বাসের সারল্যকে নষ্ট করে দিচ্ছেন, তারাই দায়ী।

প্রশাসন এইভাবে আস্থা ফিরে পাবার চেষ্টা করছিল ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছিল না। হবার কথাও নয়। চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ছিল যে বরখাস্ত হওয়া সিপাহিরা পশ্চিম বিহার, অযোধ্যা বা উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তাদের দেশ গাঁ-এ ফিরে না গিয়ে বারাকপুরের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। এই রটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে দেখা যায় ব্যারাকপুরের কাছাকাছি নবাবগঞ্জ, বারাসত, এমনকী কিছুটা দূরে গঙ্গার অন্যপারে চুঁচুড়া প্রভৃতি জায়গা থেকেও কর্মচ্যুত সিপাহিদের আনাগোনা ঘটেছে। এ সম্পর্কে আঞ্চলিক প্রশাসকরাও তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করছেন। যেহেতু বাংলায় ইউরোপীয় অধিবাসীদের চোখে কলকাতা ছিল তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ, তাই মফঃস্বল থেকে অনেকেই তখন স্বস্তির খোঁজে কলকাতায় ভিড় জমাচ্ছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ হাজার হোক কলকাতা তো রাজধানী। এখানে বড়োলাট থাকেন, তাছাড়া ফোর্ট উইলিয়ামের নিরাপত্তা তো আছেই। তাই কলকাতায় শ্বেতাঙ্গ শরণার্থীদের এত ঢল। এমনকী ব্যারাকপুর সেনাশিবিরের নিরাপত্তা ছেড়ে শ্বেতাঙ্গ মহিলারা কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

তা তাদের কতটা আশ্বস্ত করেছিল, জানা নেই। তবে কলকাতা নিজেই তখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ইতিমধ্যে তার-যোগাযোগের কল্যাণে মীরট বা দিল্লিতে বিদ্রোহী সিপাহিদের অগ্রগতির খবর কলকাতায় নিয়মিতভাবেই এসে পৌঁছোচ্ছিল। এইসব খবর ইংরাজদের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তোলে। শুধু কলকাতাতেই নয়, আশপাশের মফস্বল শহর থেকেও ইউরোপীয় বাসিন্দারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ইউরোপীয় সৈন্য মোতায়েন করার আর্জি জানাতে থাকেন। সেনাবাহিনীর পক্ষে এইসব আবেদনে সাড়া দেবার সাধ্য ছিল না। কারণ, নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইউরোপীয় সৈন্যদের তখন উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর তাগিদ ছিল জরুরি। তার উপরে আবার পাটনায় ওয়াহাবিদের গতিবিধি এবং দানাপুরের সেনানিবাসে অশান্তির ছায়া তাদের পক্ষে অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সব মিলিয়ে কলকাতা এবং শহরতলি উদ্বিগ্ন ইউরোপীয় নাগরিকদের ভিড়ে ছয়লাপ। দেশীয় পুলিশের উপর তাদের আস্থা নেই অথচ ইউরোপীয় সৈনিকদের অপ্রতুলতা— এই পরিস্থিতিতে তারা তখন প্রায় দিশাহারা।

অন্য একটি বিষয়ও তাদের দুশ্চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে গদিচ্যুত করার পর তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার জন্য গার্ডেনরিচে একটি বাড়িও নির্দিষ্ট করা হয়। প্রাক্তন নবাবের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর পরিবার-পরিজনের একটা অংশ এবং বেশ কিছু অনুচর। উত্তর-ভারতে বিদ্রোহ প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নবাব ও তার পরিবার পরিজনদের নিয়ে প্রশাসন দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। দুশ্চিন্তাটা স্বাভাবিক, কারণ ওয়াজেদ আলির অযোধ্যা ছিল বড়োলাট ক্যানিং-এর ভাষায় "Sepoy Country"। ক্যানিং ভুল বলেননি। বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রির সিপাহিদের একটা বড়ো

অংশই নিযুক্ত হতেন অযোধ্যা থেকে। স্বাভাবিক কারণেই গতিচ্যুত নবাবের প্রতি এদের সহানুভূতি ছিল প্রত্যাশিত। নবাব কলকাতার উপকণ্ঠে তাঁর প্রাসাদ থেকে বিশেষ বাইরে বেরোতেন না বটে, কিন্তু তার দর্শনপ্রত্যাশীর সংখ্যা কম ছিল না। বিদ্রোহের আশঙ্কা যত তীব্র হতে থাকে ততই নবাব-পরিবার ও তাদের দর্শনার্থীদের উপর সরকারি নজরদারি বাড়িয়ে তোলা হয়। এর ফলে শহরে নানা রকমের গুজব ছড়াতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ামের টাউন মেজর কর্নেল কাভানাগ গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলেন যে অযোধ্যার তালুকদার মান সিং ইমিধ্যেই কলকাতায় এসে নবাবের সঙ্গে দেখা এবং একপ্রস্থ আলোচনা করে গিয়েছেন। তিনি নাকি নবাবের সমর্থনে একটা উত্থানের পরিকল্পনা করছেন এবং নবাবকে তার পক্ষে পেতে চান।

অযোধ্যার নবাবকে নিয়ে এই আশঙ্কা শুধু প্রশাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কলকাতার শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের অনেকেই এর শরিক ছিলেন। একটা উদাহরণই যথেষ্ট হবে। মহাবিদ্রোহের সময়ে আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতাতেই ছিলেন। আগের প্রায় পঁচিশ বছর ধরেই তিনি এই শহরের বাসিন্দা। যাজকের পরিচিতি সত্ত্বেও শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষেও জোরালো সওয়াল করেছেন। বিদ্রোহ চলাকালীন ডাফ ইংল্যান্ডে তাঁর সতীর্থ ড. টুইডকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন, যেগুলি একত্রে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৬ জুন তারিখের চিঠিতে ডাফের উদ্বেগ স্পষ্ট। তিনি লিখছেন, "ব্যারাকপুর আমাদের পদাতিক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। কলকাতার প্রায় বারো মাইল উত্তরে। দমদমে আমাদের আর্টিলারি স্টেশন, কলকাতায় চার-পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে। দক্ষিণ দিকে ফোর্ট উইলিয়াম, আরও দক্ষিণে আলিপুর জেল। এই জেলে হাজার হাজার দুঃসাহসী বন্দি রয়েছেন, পাহারায় আছেন নেটিভ মিলিশিয়ার এক রেজিমেন্ট সিপাহি। গার্ডেনরিচ আলিপুর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এখানেই অযোধ্যার প্রাক্তন রাজার নিবাস। তার সঙ্গে আছেন হাজার খানেক সশস্ত্র প্রহরী। এখানকার মুসলমান অধিবাসীরাও সশস্ত্র। এদের সকলের চোখে মুখেই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার প্রত্যয়। এরা সকলেই তাদের মসজিদে দিল্লির বিদ্রোহীদের সাফল্য কামনা করে প্রার্থনায় রত।"[১৭] ডাফের পত্রাবলীতে অযোধ্যার নবাবের প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। যথাস্থানে আবার তার উল্লেখ করা হবে।

জন পিটার গ্রান্ট ছিলেন সেই সময়ে বড়োলাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য। বাংলার প্রশাসনের নানা দফতরে কাজ করার সূত্রে বাংলার হাল-হকিকত সম্পর্কে বিলক্ষণ অবহিত। হ্যালিডের পর গ্রান্ট বাংলার দ্বিতীয় ছোটোলাটও হয়েছিলেন। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি বুঝেছিলেন সব রটনাকেই নিছক গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না। বিশেষ করে পরিস্থিতি যখন এতটাই গোলমেলে। তার মতে বাংলার স্থিতি তখন আপৎকালীন। ১০ জুন তারিখে তিনি বড়োলাট লর্ড ক্যানিংকে লেখা একটা চিঠিতে ইউরোপীয়দের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন "সাড়ে তিনটে নেটিভ রেজিমেন্ট আমাদের শত্রু। এর মধ্যে দেড়টা রেজিমেন্ট তো আমাদের অভিজ্ঞতো অনুযায়ী সবচেয়ে বিপজ্জনক। গার্ডেনরিচে এক, দুই, তিনি, হাজার সশস্ত্র লোক মজুত (এদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না) মুহূর্তের নোটিসে এরা জড়ো হতে পারেন। Scinde Ameer দের কয়েকশো সশস্ত্র

লোক দমদমে রয়েছেন।"[১৮] এঁরা যদি একত্রে সরকারের বিরুদ্ধে উত্থানে সামিল হন তাহলে সমূহ বিপদ।

গ্রান্টের চিঠিতে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ মনোযোগ্য আকর্ষণ করে। প্রথমত তার মতে বাংলার পরিস্থিতি সত্যিই অগ্নিগর্ভ, যে কোন সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। ইংরাজ শাসনের প্রতি বিদ্বিষ্ট এত সশস্ত্র লোক কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে রয়েছেন যে দ্রুত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত ওয়াজেদ আলি এবং তার বিপুল সংখ্যক অনুগামীদের মানসিক অবস্থান সম্পর্কে তিনিও সন্দিগ্ধ। তিনিও মনে করছেন এদের উপর নজরদারি বাড়ানো দরকার। Scinde Ameer এর অনুগামীদের উল্লেখ কৌতুকপ্রদ। হয়তো দমদমে এই ধরনের কিছু অধিবাসী এই সময়ে ছিলেন। তবে ডাফ তার ১৬ মে তারিখের চিঠিতে অন্য একটি বিপদের কথা উল্লেখ করেছিলেন যেটি ভাগ্যক্রমে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মতে এটা ছিল একটা গভীর ষড়যন্ত্র। গোয়ালিয়রের মহারাজা এই সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন। এই উপলক্ষে বোটানিকাল গার্ডেন্স এ একটা বাজির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কলকাতার ইউরোপীয় অধিবাসীদের এই প্রদর্শনী দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা পরিকল্পনা করেছিলেন যে ফোর্ট উইলিয়াম এবং অন্যান্য জায়গা থেকে সব শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা যখন বোটানিকাল গার্ডেন্স-এ জড়ো হবেন, সেই সুযোগে তারা ফোর্ট দখল করে ইউরোপীয় নাগরিকদের কচুকাটা করবেন। ভাগ্যক্রমে সেদিন ঝড়বৃষ্টি শুরু হবার ফলে মহারাজার এই অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়। কেল্লা ছেড়ে আধিকারিকরা শিবপুরে যাননি। ফলে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

এইসব ঘটনা এবং রটনা একত্রে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। প্রায় সকলেই তখন শক্ত হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। দমন-পীড়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই—এটাই ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোপীয় নাগরিকদের অভিমত। তাদের একটা অংশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সমস্ত দেশীয় সৈনিকদের সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের পরামর্শ দেন। এক কথায় তাদের সামুহিক অভিজ্ঞতায় কোম্পানির শাসনের প্রতি সিপাহিদের অনুগত্য আর প্রশ্নাতীত ছিল না।

বড়োলাট লর্ড ক্যানিং প্রথমেই এতদূর যেতে রাজি ছিলেন না। সাধারণ নাগরিকরা যদি মনে করেন যে বিদ্রোহের আশঙ্কায় প্রশাসন প্রায় বিকল তাহলে হিতে বিপরীত হবে—এই ছিল তার অভিমত। বাক্‌ল্যান্ড তার 'বেঙ্গল আন্ডার দি লেফটেনান্ট গভরনরস্' (১ম খণ্ড)-গ্রন্থে লিখছেন, বিদ্রোহের গোড়ার দিকে সব দেশীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নেবার প্রস্তাব উঠেছিল। সব দেশীয় সৈনিকই তখন সরকারের চোখে সন্দেহভাজন। তখনও ক্যানিং তার নিজের অঙ্গরক্ষককে নিরস্ত্র করেননি, বা গভর্নমেন্ট হাউস থেকে সিপাহি প্রহরী তুলে নিয়ে তার জায়গায় ইউরোপীয় প্রহরী নিযুক্ত করেননি। জুন মাসের পরে ছোটোলাট হ্যালিডের চাপে তিনি নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। ইউরোপীয় রাজপুরুষদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়োজনে এই ধরনের অনেক মিথ-ই বিভিন্ন সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলির সত্যমিথ্যা নির্ধারণে কালক্ষেপ করা অপ্রয়োজনীয়। এটা ঠিক, যে এইসময়ে ক্যানিং শহরে শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের নয়নের মণি ছিলেন না। তার সাবধানী পদক্ষেপকে অনেকেই দুর্বলতার নামান্তর মনে করতেন। কিছুটা ঠেস দিয়েই তারা বড়োলাটের নাম দিয়েছিলেন ক্লিমেন্সি ক্যানিং। তারা যাই মনে করুন,

প্রকৃতপক্ষে ক্যানিং ততটা দয়ালু ছিলেন না। বরং ৩০ মে এবং ৬ জুন তিনি এমন দুটি আইন করলেন যা এককথায় আইনের শাসনকে প্রহসনে পরিণত করল। এদিকে শহরের ইউরোপীয় নাগরিকরা বেসামরিক প্রতিরক্ষাকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য ক্যানিং-এর উপর চাপ দিচ্ছিলেন। প্রথমদিকে এ বিষয়ে বড়োলাটের কিছুটা দ্বিধা থাকলেও পরিস্থিতির অনিবার্যতাকে তিনি মেনে নিলেন। ১৩ জুন তারিখে ক্যানিং-এর উদ্যোগে দুটো আপৎকালীন আইন পাস করা হল। প্রথমটি প্রেস আইন, যাকে পরিহাস করে 'গ্যাগিং অ্যাক্ট'* বলে অভিহিত করা হল। এই আইন প্রবর্তন করার উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, কারণ প্রশাসনের মতে সংবাদ ও সাময়িকপত্রের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বিদ্রোহের প্রসারে সহায়তা করছে। এই আইন ইংরাজ এবং দেশীয় মালিকানাধীন প্রকাশনার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। স্বভাবতঃই শ্বেতাঙ্গরা আইনের এই সমদর্শী প্রয়োগে খুশি হননি। এজন্য তারা বড়োলাটের সমালোচনা করতেও পিছপা হননি।

দ্বিতীয় আইনটি প্রবর্তন করার ফলে শহরের ইউরোপীয় অধিবাসীরা কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করেন। তাদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সরকার কোর অফ ভলান্টিয়ার গার্ড গঠন করার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আগ্রহী ইউরোপীয় নাগরিকদের এই বাহিনীতে যোগ দেবার আহ্বান জানান হল। আপাত দৃষ্টিতে বেসামরিক প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এটি গঠিত হলেও এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহী সিপাহী এবং অপদার্থ পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কলকাতার শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া। এই বাহিনীর প্রকৃত চরিত্র যে আধাসামরিক, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র ছিল না। এর নেতৃত্বে ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের টাউন মেজর, কর্নেল কাভানাগ। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত সাহেব-মেমসাহেবদের কিছুটা আশ্বস্ত করার জন্য গঠিত এই ভলান্টিয়ার বাহিনীর সীমাহীন ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জ জাত্যাভিমান এবং বেপরোয়া কার্যকলাপ এতটাই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল যে পুলিশ কমিশনারকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়। বাহিনীর উপর তারও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এদের আচরণকে সংযত করতে তিনি সরকারকে অনুরোধ জানান। তার হস্তক্ষেপ বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় না। ভলান্টিয়ার গার্ডদের দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলকাতার সাধারণ ইউরোপীয় নাগরিকরাও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পুলিশ কমিশনারের প্রতিবেদনেও একথা স্বীকার করা হয়। ২৩ জুলাই তারিখে তিনি সরকারকে জানিয়েছিলেন, "একথা সত্য যে গত তিন মাসে কলকাতায় অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষত আগ্নেয়াস্ত্রের বিক্রি দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছে।" তবে তিনি একথা জেনে স্বস্তি পেয়েছিলেন যে বিক্রি হওয়া অস্ত্রশস্ত্রের বেশিরভাগই শহরের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের হাতে গিয়েছে। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেন যে শহরের প্রতিটি খ্রিস্টান বাড়িতেই এক বা একাধিক বন্দুক অথবা পিস্তল মজুত করা আছে।

সাহেবদের এই ধরনের আচরণ থেকে বোঝা যায় যে মে-জুন মাসে কলকাতা এবং শহরতলিতে ইউরোপীয় নাগরিকরা আদপেই স্বস্তিতে ছিলেন না। যেখানেই তারা থাকতেন সেখান থেকেই শ্বেতাঙ্গ প্রহরী নিয়োগ করার অনুরোধ আসতে থাকে। কিন্তু

* *পরিশিষ্ট দেখুন*

উত্তর ভারতের পরিস্থিত তখন উত্তাল। জুন মাসে এলাহাবাদে এবং বেনারসে সৈন্য পাঠাবার ফলে সেনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে এইসব অনুরোধে সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। শুধু কলকাতা এবং বারাকপুরের জন্য তারা কিন্তু বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন মাত্র। এতে সাময়িকভাবে শ্বেতাঙ্গরা কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেও এটা ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস। ১৩ জুন তারিখে জেনরেল হিয়ার্সের একটা আপৎকালীন সিদ্ধান্ত সাময়িক স্থিতাবস্থাকে একেবারে বদলে দিল। তিনি বিশেষ বার্তায় ক্যানিং-কে জানালেন যে ঐ দিন রাতে নাকি ব্যারাকপুরের সিপাহিরা বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোন সূত্রে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পেয়েছিলেন তার কোন ইঙ্গিত লেখ্যাগারে সংরক্ষিত নথিতে পাওয়া না গেলেও তাঁর উদ্বেগ এবং সেই কারণে স্নায়ুবিকারের লক্ষণ স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। তিনি চুঁচুড়া থেকে ৭৮ নং হাইল্যান্ডারদের বারাকপুরে আনতে চান। ক্যানিং হিয়ার্সের উদ্বেগের শরিক না হলেও ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি বারাকপুরের সিপাহিদের নিরস্ত্র করার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তবু তার আশঙ্কা ছিল, এই ধরনের সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত কোম্পানির অন্যান্য রেজিমেন্টের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। কারণ সামগ্রিকভাবে বাংলার সমস্ত দেশীয় সৈনিকদের আনুগত্যকে সন্দেহ করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও ক্যানিং লিখলেন—"already sev eral desertions have taken place since the disarming and some of the men are making their way to Barrackpore with the news".[১৯] হিয়ার্সে কিন্তু ততক্ষণে যা প্রস্তুতি নেবার, তা নিয়ে নিয়েছেন। ১৪ জুন সকালে চুঁচুড়ার হাইল্যান্ডারদের উপস্থিতিতে বারাকপুরের সিপাহিদের নিরস্ত্র করার কাজ সম্পন্ন হল। বারাকপুরের যেসব সিপাহিরা ফোর্ট উইলিয়াম অথবা অন্যান্য সরকারি দফতরে পাহারার কাজে ছিলেন, তাদেরও একই নির্দেশ অনুযায়ী অস্ত্র সমর্পন করতে বাধ্য করা হল। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এককথায় বলতে গেলে এর অর্থ হল ভারতীয় সিপাহিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। বিদ্রোহতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিন-বা-না-দিন, ভারতীয় বলেই তারা সন্দেহভাজন। বাংলায় দমদমে উত্তেজনার প্রথম পূর্বাভাসের পর থেকে ১৪ জুনের মধ্যে আর কখনও সামরিক অথবা বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে স্নায়ুযদ্ধে এতটা বেহাল বলে মনে হয়নি।

এখানেই শেষ নয়। আরও বিস্ময় তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ১৪ জুন সকাল থেকে কলকাতা শহরে যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিল, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ১৩ জুন সিপাহিদের যে বিদ্রোহের আশঙ্কার কথা হিয়ার্সে জানিয়েছিলেন, সেই খবরটি গোপন ছিল না। এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই যে হিয়ার্সের চরেরা সঠিক খবর দেননি। ফলে এই আশঙ্কার কোন তথ্য ভিত্তি ছিল না। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, ১৩ জুন বারাকপুরে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেননি। কিন্তু সন্দেহের বীজ একবার প্রোথিত হলে তাকে নির্মূল করা সহজ নয়। গুজব যে প্রকৃত ঘটনার চেয়ে কম শক্তিশালী নয় তা আরও একবার প্রমাণিত হল। কলকাতার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা ধরেই নিয়েছিলেন যে আগের রাত্রে বারাকপুরে সিপাহিরা প্রকৃতই বিদ্রোহ করেছেন এবং তারা সদলবলে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছেন। একবার কলকাতায় এসে পৌঁছোতে পারলে সব

সাহেব-সুবোরাই হবেন সিপাহিদের চাঁদমারি। কারও জীবনই নিরাপদ নয়। কলকাতায় বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে অযোধ্যার প্রাক্তন নবাবের অসংখ্য অনুচররা যোগ দেবেন। এই মিলিত বাহিনী কলকাতার দখল নিয়ে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাবে।

ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা অনেকেই সেদিনের বিবরণ লিখে গিয়েছেন। সকলের স্মৃতি এক নয়, বর্ণনাতেও তাই পার্থক্য আছে। ১৬ জুন অর্থাৎ ঘটনার দুদিন পরে আলেকজান্ডার ডাফ তার চার নম্বর চিঠিতে যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা পড়লে মনে হব সিপাহিদের বিদ্রোহ একটা অলীক গুজব নয়। তিনি লিখছেন "কলকাতার চারপাশে ঘিরে রেখেছে সশস্ত্র সিপাহির দল। ক্ষোভ এদের অস্থি-মজ্জায়। সামান্য ইঙ্গিত পেলেই এরা রক্তাক্ত ঝঞ্ঝার মতো ইউরোপীয় অধিবাসীদের দিকে ধেয়ে আসবে।" সিপাহিদের তিনি বলছেন "murderous ruffians", যাদের শাস্তিতে নিরস্ত্র করা গিয়েছে বলে তিনি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ।[২০] কে অবশ্য ত্রাসের বিষয়েই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর বর্ণনায় কলকাতা সেদিন ভোর থেকেই যেন অপ্রকৃস্থি। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং বিভ্রান্ত। এই স্যুররিয়্যাল জগতে ইউরোপীয় অধিবাসীরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে পথে নেমে পড়েছিলেন। সকলেই চাইছিলেন হয় গঙ্গার ঘাটে অথবা ফোর্ট উইলিয়ামে পৌছোতে। গঙ্গার ঘাটে পৌছোতে পারলে ঘাটে বাঁধা পানসি ধরে মাঝদরিয়ায় নোঙর করা কোন স্টিমারে চেপে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছবেন—এই ছিল আশা। নতুবা ফোর্ট উইলিয়ামে তারা পেতে চেয়েছিলেন একটু নিরাপদ আশ্রয়। সমসাময়িক একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, "the whole line of the ghauts were crowded with fugitives, and those who could find no shelter in the ships took refuge withing the Fort, of which the squares, the corridors, all the available space every where, indeed, were thronged by many, who passed the night in carriages."[২১]

কর্নেল কাভানাগ তখনও ফের্টের টাউন-মেজর। তার চত্বরেই সেদিন শ্বেতাঙ্গ শরনার্থীর ঢল নেমেছিল। তিনি এদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে শহরের পথঘাট নিরাপদ, প্রাণহানির কোনো আশঙ্কা নেই। আশ্বস্ত করছিলেন বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। তিনি লিখছেন, "আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম চারিদিকে নানা ধরনের লোকজন থিকথিক করছে। সকলেই দমদম এবং ব্যারাকপুর থেকে আজগুবি সব গুজবের শিকার। সকলেই কেল্লায় আশ্রয় পেতে চাইছেন। আমি আমার সাধ্যমত তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। ফল হল না। অনেকেরই ধারণা হল, আমি তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করছি।" সারাদিন এই ত্রাসের পরিবেশ বলবৎ রইল। দিনের শেষে ইউরোপীয় অধিবাসীদের যেন সম্বিত ফিরল। আতঙ্কের রেশ রয়ে গিয়েছিল ঠিকই, তবে শেষ পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরেছিলেন।

এই 'আতঙ্কের রবিবারের' কথা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন ঘটনার সমসাময়িক। প্রধানত সেই কারণেই তাঁর বিবরণ মূল্যবান। শিবনাথের স্মৃতি কিছুটা আবছা, তাই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুনের পরিবর্তে তিনি জুলাই মাসের কথা বলেছেন। তিনি লিখছেন .

> ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠল যে, বিদ্রোহী সিপাহিগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকতা শহর

লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন, দেশীয় বিভাগেও লোকে কী হয় কী হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও দেশীয় খ্রিস্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গভর্নর জেনরেল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—কালাদের অস্ত্রশস্ত্র হরণ কর, সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজেরা তাহার নাম Clemency Canning "দয়াময়ী ক্যানিং" রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পরে যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিষের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না, লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা এবং রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, "হুকুমদার" অর্থাৎ (Who comes rhere?) তাহা হইলেই বলিতে হইত, "রাইয়ত হ্যায়" অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রীয় স্মৃতিকে সমকালীন ঘটনাক্রমের প্রেক্ষিতে স্থাপন করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতার ইউরোপীয় সমাজে প্রবহমান ত্রাসের সমর্থন সরকারি নথিতে এবং ইংরাজদেব স্মৃতিচারণে পাওয়া গেলেও দেশীয় উপাদানে সহজলভ্য নয়। শাস্ত্রীর স্মৃতিকথায় দেখা যাচ্ছে ১৪ জুনে ইউরোপীয়রা যে আতঙ্কিত বোধ করছিলেন তা এদেশের নাগরিকদের অজানা ছিল না। দ্বিতীয়ত অজানিত আশঙ্কার গুজব যে শহরকে কীভাবে গ্রাস করেছিল তার ইঙ্গিতও স্পষ্ট। তৃতীয়ত বাঙালি ভদ্রলোক বড়োলাট ক্যানিং কে যে চোখেই দেখুন না কেন কলকাতার ইংরাজ নাগরিকদের তিনি ছিলেন চক্ষুশূল। তারাই কিছুটা ঠেস দিয়ে, কিছুটা ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ মিশিয়ে তাঁর নাম দিয়েছিলেন দয়াময়। আদতে কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজ সেদিন সরকারের কাছ থেকে যতটা নিরাপত্তা পেয়েছিলেন, চাইছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি। ইচ্ছে থাকলেও এই ক্ষুধা মেটাবার সাধ্য ক্যানিং-এর ছিল না। শ্বেতাঙ্গ সৈনিক পাঠিয়ে মনোবল চাঙ্গা করার দাবি তো শুধু কলকাতার সাহেবরাই করছিলেন না। মফস্বলের থেকেও অনুরূপ অনুরোধ আসছিল। উত্তরভারতের রণাঙ্গনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাংলার শ্বেতাঙ্গ-সেনার ভাঁড়ার তখন তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এই সরল সত্যকে উপলব্ধি না করে কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজ বরং মনে করছিলেন সমদর্শী হবার বাসনায় ক্যানিং তাদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্যের আরও একটি অংশ কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তিনি লিখছেন কলকাতায় তখন অবিশ্বাসের এমন একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল যে এদেশের লোকেরাও নিজেদের বাড়িতে বসে খোলাখুলি দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার সাহস দেখাতেন না। শিবনাথ শাস্ত্রীর এই কথা থেকে অনুমান অসঙ্গত হবে না যে ভারতীয়রা সকলেই সেদিন রাজভক্তির বৃন্দগানে শামিল হননি। নেটিভ-আনুগত্যের আপত নিরীহ প্রকাশভঙ্গির আড়ালে চাপা পড়ে থাকা ব্যতিক্রমী ভিন্নস্বর খুঁজে পাওয়া দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়। দুরূহ, কারণ মহাবিদ্রোহের সময়ে বাঙালি যে রাজভক্তির

সহজপথ বেছে নিয়েছিলেন সেকথা আপ্তবাক্যের মতো আমরা জন্মাবধি শুনে আসছি। ভিন্নস্বরের সন্ধান করতে হলে এই মানসিক ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন আছে।

আবার মূল আখ্যানে ফিরে আসা যেতে পারে। ১৪ই জুনের গুজব কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজকে এতটাই আতঙ্কগ্রস্থ করেছিল যে তার জের চলে আরও অনেকদিন। প্রশাসনও এরপর আর ঝুঁকি নিতে চাইল না। ওয়াজেদ আলি শাহকে নিয়ে পুরানো দুশ্চিন্তা তো ছিলই। ১৫ই জুন সরকার নজরদারি আরও বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাঁকে গার্ডেনরিচ থেকে প্রায় বন্দী করে ফোর্ট উইলিয়ামে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আশ্রয়ে নিয়ে আসা হল। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। কেল্লার কড়া নজরদারির মধ্যে প্রাক্তন নবাবের পক্ষে তার অনুগামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অসম্ভব। ইতিমধ্যে অযোধ্যায় তো প্রায় গণবিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে বিদ্রোহ পুরোপুরি প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত ওয়াজেদ আলি শাহকে কেল্লার চৌহদ্দিতেই আটকে রাখা হয়েছিল।

জুন মাসের এই 'ত্রাসের রবিবার' পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জুন-জুলাই মাসে অন্যত্রও বিদ্রোহের অভিঘাত লক্ষ করা যায়। জুন মাসেই খবর আসে বহরমপুরে সিপাহিদের অসন্তোষ আবার বিদ্রোহে পরিণত হতে পারে। মুর্শিদাবাদে ৩৭ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি ছেড়ে কিছু সিপাহির বেরিয়ে আসার কথাও শোনা গেল। প্রথম খবরটার তথ্যভিত্তি ছিল নেহাতই দুর্বল। তবে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কোম্পানি কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। পদত্যাগী সিপাহিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাবার পরেও বহরমপুরে ৬৩নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি এবং ১১নং অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার সিপাহিদের অনেককেই অস্ত্র সমর্পনে বাধ্য করা হয়। এখানেই শেষ নয়। খবর আসে যে যাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে সেইসব সিপাহিরা স্থানীয় বাজার থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। জেলা আধিকারিকরা লিখছেন এই সব সিপাহিরা অনেকেই পদত্যাগের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু বিকল্প অস্ত্রের ব্যবস্থা না করে ছাড়ার সাহস পাচ্ছিলেন না।

শুধু কলকাতা বা তার আশেপাশেই নয়, ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছিল অন্যত্রও। বিশেষ প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে। জলপাইগুলিতে ৭৩নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির কিছু সিপাহি ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছিলেন। এক হাবিলদারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। এই হাবিলদার একজনকে গুলি করেন এবং অন্যান্যদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করেন। বিদ্রোহীদের সামরিক আদালতে বিচারের জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। শুধু জলপাইগুড়িই নয়, উত্তরবঙ্গের আরও কিছু অঞ্চলেও বিদ্রোহের স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। আর এইসব ঘটনা যত গোচরে আসে ততই প্রশাসনের চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। দার্জিলিং-এ একজন সিপাহিকে শুধুমাত্র প্ররোচনামূলক কথাবার্তা বলার দায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে সরকার জানতে পারে যে জলপাইগুড়ির ক্ষুব্ধ সিপাহিরা নাকি পাশের রাজ্য ভুটানের সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। এই বিষয়টি আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে। এই সময় থেকেই কোম্পানির সামরিক কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন গোর্খাদের আনুগত্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হন, অন্যদিকে ভুটিয়াদের আচরণ সম্পর্কে

উদ্বেগ বোধ করতে থাকেন। ভুটিয়াদের সঙ্গে জলপাইগুড়ির ৭৩ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির যোগসাজসের খবর সংগ্রহের জন্য গোপন চরও পাঠানো হয়েছিল ভুটানে। ভুটান ছাড়া খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের গোষ্ঠীপতিদের আচরণও সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে সংরক্ষিত জুডিসিয়াল এবং প্রসিডিংস-এর জুলাই-আগস্ট মাসের প্রতিবেদনগুলিতে আসাম এবং সংলগ্ন অঞ্চলে মহাবিদ্রোহের প্রসারের স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। এবার সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দু ১ম আসাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি, সারং রাজা কন্দর্পেশ্বর সিং এবং তার দেওয়ান মনিরাম দত্ত।

১৮৫৭ সালের প্রথম ছ'মাসের ঘটনাক্রম থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। পূর্বভারত মহাবিদ্রোহের ভরকেন্দ্র না হলেও এর অভিঘাত থেকে মুক্ত ছিল না। জানুয়ারি মাসের গোড়া থেকেই সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের যে বাতাবরণ গড়ে উঠছিল, তার সঙ্গে ফেব্রুয়ারী-মার্চ থেকে যুক্ত হল একের পর এক বিদ্রোহের ঘটনা। রটনা এবং ঘটনার সামুহিক অভিঘাতে প্রশাসনের স্নায়ুবিকার যে কোন পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে, তার পরিচয় কলকাতা পেয়েছিল ১৪ই জুন তারিখে। এই স্নায়ুবিকার শুধু কলকাতা শহরে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিকথায় মেদিনীপুরের কথাও জানা যায়। এইধরনের আপাত বিচ্ছিন্ন তথ্যসূত্র ছড়িয়ে আছে আরও অনেকের স্মৃতিতে। এগুলিকে ঘটনাক্রমের প্রেক্ষিতে স্থাপনা করলে প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আঠারোশো সাতান্নর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা আরও অনেক নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী থাকবে।

টীকা :

১. মঙ্গল পাণ্ডের ভাঙে আসক্তির উল্লেখ তার সামরিক আদালতে বিচারের নথিতে পাওয়া যায়। জন উইলিয়াম কে এই বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। তিনি লিখেছেন, "inflamed as he was by *bang*, which is to the sepoy what strong drink is to the European soldier, he was no longer master of himself. He was a young man named Mungul Pandy". Jhon William Kaye. *A History of the Great Revolt*, Vol Reprint, 1996, Delhi p. 538.

২. হ্যালিডের এই মিনিটের মূল বয়ান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে সংরক্ষিত জুডিসিয়াল প্রসিডিংস-এ পাওয়া যাবে। এই মিনিটটি সি. ই. বাক্ল্যাণ্ড তাঁর 'বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটেনান্ট গর্ভনরস্' গ্রন্থে হুবহু মুদ্রিত করেন। এ জন্য দেখা যেতে পারে C E Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Being a Narrative of the Principal Events and Public Measures During their periods of office from 1854 to 1898, Vol. I Reprint, 1976, Delhi, PP. 65-162.

৩. Rev. Alexander Duff, The Indian Rebellion Its Causes and Results in a Series of Letters', New York. 1858

৪ W.H.Russell, 'My Indian Mutiny Diary', London, 1857.

৫. জন উইলিয়াম কে, পূর্বোক্তসূত্র, PP. 491-92

৬. উইলিয়াম ড্যালরিম্পল, দি ফল অফ এ ডাইনাস্টি, দিল্লী ১৮৫৭, নয়াদিল্লী, ২০০৬।

৭. জন উইলিয়াম কে, পূর্বোক্তসূত্র, P. 491-92.

৮. 'List of the Bengal Army, Corrected to the 20th of October 1857', Published by Authority, Calcutta

৯. হিয়ার্সের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন জন উইলিয়াম তাঁর পূর্বোক্ত গন্থের প্রথম খণ্ড, P. 496.
১০. আলেকজাণ্ডার ডাফ, (চিঠির ক্রমিক সংখ্যা ১৫) লিখছেন, "From the first I could not but regard and pronounce the mutiny and rebellion as the result of a political conspiracy in which Mohammedan Chiefs and intriguers would be found the prime-movers, Brahmins and other high caste Hindus their willing auxiliaries, and the great mass of Sepoys their sympathizing confreres, in the first instance but their deeped instruments at last. "P. 204.
১১. উইলিয়াম ডালরিম্পল, পূর্বোক্ত সূত্র, P. 23 এবং বিক্ষিপ্তভাবে অন্যত্র।
১২. Iqtidar Alam Khan, 'The Wahabis in Eighteen Fifty Seven Revolt : Brief Reappraisal of their role,' paper presented at the National Seminar organised by the Indian Council of Historical Research 9-10. December, 2006 Seema Aiar, 'Jihadi Muslims and Hindu Sepoys : Rewriting the Eighteen Fifty Seven Narrative Biblio' March-April 2007. pp 10-12
১৩. জন উইলিয়াম কে, পূর্বোক্ত সূত্র, P.498.
১৪. জুডিসিয়াল প্রসিডিংস, ওরিজিন্যাল কনসালটেশনস্, ফাইল নং ৪০০ প্রসিডিংস নং ৫, ২৩ এপ্রিল ১৮৫৭।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. এই হুকুমনামা 'মে প্রোক্লামেশন' নামে পরিচিত। জন উইলিযাম কে-র পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৬৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আদেশটি দেখা যেতে পারে।
১৭. রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ, 'দি ইন্ডিয়ান রেবেলিয়ান : ইট্স কজেস অ্যান্ড রেজাল্টস্ ইন এ সিরিজ অফ লেটারস্', নিউ ইয়র্ক, ১৮৫৮।
১৮. প্রাগুকতে।
১৯. সি. ই. বাক্ল্যাণ্ড, 'বেঙ্গল আন্ডার দি লেফটেন্যান্ট গভর্নরস্, প্রথম খণ্ড, পুর্নমুদ্রণ, দিল্লি ১৯৭৬, পৃ. ৩৩।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪১।
২১. আলেকজান্ডার ডাফ, পূর্বোক্ত সূত্র।

প রি শি ষ্ট

Calcutta Review December 1857

THE INDIAN CRISIS OF 1857

At the close, exactly, of the one-hundredth year after the battle of Plassey, in which Clive seized the keys of Hindostan for the Honorable East India Company,–the Lord of the whole earth, who giveth and taketh away kingdoms. has placed a riddle before the rulers of India, more difficult of solution, more disastrous in its consequences if unsolved or solved wrongly, of far richer reward if rightly understood and vigorously acted upon, than the enigma of the Theban Sphinx–the mutiny of the Bengal native army. At Thebes, the deadly plunge from the rock was the lot of the unsuccessful competitor, the crown of a famous but small Grecian kingdom, the prize offered to the successful interpreter. Here, any misinterpretation of the character and the causes of the revolt of the Bengal sepoys, adopted by the British Government, would inevitably lead to yet direr calamities, and finally to the overthrow of a splendid empire; the right understanding of, and the right dealing with, the present crisis, will cause the name and power of Britain to rise still higher in India and all over the east, will deepen and widen the foundations of a kingdom, which, re-established after this rude shock, may prosper, and prevail, and see no change until all the kingdoms of the world belong to our God and to His anointed.

In days like these, when every heart which has learned to pray is lifted up to the throne on high for the restoration of peace and order in the north of India, which has suddenly been convulsed by a tropical cyclone of revolt. as wild, as savage, as inhuman, as any on record; when every head which has been taught to think strains its powers to discern some rays of light amidst the thick darkness, pens which have never stirred on themes of politics may, yea ought to engage in the discussion of a question of such vital importance, not only to the cause of British supremacy, but to that of law and order, of civilzation, and religious progress among one-sixth of the human race. When the wisest among politicians doubt, waver, and are at their wits' end, amidst the uproar of the tempest and the fearful strainings and groanings of the vessel of the state battling with a raging sea, the unlearned, now ceasing to hear dogmatic and confident discourses, which they might be expected to say their humble "amen" to, may well try to reason for themselves; and when traditionary Government-craft and grey-headed statesmanship are confounded,

children and babes may open their mouths, and chance to utter words, furnishing a clue to the solution of the dreadful puzzle.

Our object is not to recount the history of the mutiny, which has marked the year 1857, in the annals of India, with a red line of blood, never to be effaced from the memory of its rulars or this subjects; but to endure into the nature and the causes of the lamentable convulsion, which will ere long appear to have been a turning point in the affairs of British India, either from great and seemingly increasing prosperity to insecurity and ruin,—or from a century of continuous advancement full of promise, to a golrious age, fulfilling the brightest anticipations of hope in successive triumphs of European civilization, science and religion, among races once the foremist of mankind, but now sunk into that moral and intellectual torpor, which is the never-failing effect of old age upon idolatrous nations. A few short sketches of some of the principal events, the night of horrors, which has passed over northern India, may suffice.

Early in the year, symptoms of discontent showed themselves among the regiments of the Bengal army. Cartridges of a new color, and greased, it was suspected, with objectionable matter, had been issued. The sepoys murmured, grumbled, petitioned, protested. Government, blameable in the first instance for its carelessness, soon corrected their error, and withdrew the objectionable cartridges. Matters were fully explained to the sepoys, but to no purpose. The rumour spread and prevailed, that the Government had formed an insidious plan to subvert the religions of their sepoys, and that the introduction of larded and tallowed cartridges was intended to deprive, as a preliminary step, Mussulman and Hindu sepoys of their caste. All the measures of second-thought wisdom, which the Government adopted, proved unavailing. The 19th regiment B. N. I., stationed at Berhampore, mutinied on the night of the 26th February. They refused to take blank cartridges issued for parade exercise on the following morning, seized their arms, threatened their Colonel and their officers to shoot them, but were at length pacified; and then addressed a petition to the Major General commanding the Presidency division, stating, that for more than two months they had heard rumours of new cartridges having been made at Calcutta, on the paper of which the fat of bullocks and pigs had been spread, and of its being the intention of Government to coerce the men to bite their cartridges. and that, therefore, they were afraid for their religion. They admitted, that the assurance given to them by the Colonel of their regiment satisfied them that this would not be the case; but added, that, nevertheless, when on the 26th of February, they perceived the cartridges to be of two kinds, they were convinced that one kind was greased, and therefore refused them. It must be noted, that the cartridges thus objected to, had been used by the recruits of the 19th regiment up to that date, and that they had been made up by the 7th

regiment which had preceded the 19th at Berhampore. "The men of this regimnet," in the words of the order read to them on the day of punishment, "had refused obedience to their European officers. They had seized arms with violence. They had assembled in a body to resist the authority of their commander The regiment had been guilty of open and 'defiant mutiny." The punsihment awarded to this "open and defiant mutiny" was this. After the lapse of a month, the 19th regiment was ordered to head quarters at Barrackpore, where it arrived on the 31st March. The General in command had connected every element of power within reach of Government. H. M.'s 84th had hastened from Burmah to Barrackpore. A wing of H. M.'s 53rd had marched up from Calcutta. A troop of Madras artillery, on the way to its own presidency, was detained there; a second troop had been called from Dum-Dum : the body-guard of the Governor General was on the spot; every soldier that was available from the presidency appeared on the parade. The Europeans and native Artillery were drawn up on one side, the four native regiments, who were suspected of strong sympathy with the 19th, opposite to the regiment under sentence marched into t .e centre. General Hearsey then read an order which gave a clear account by the offence committed, pronounced upon it a just and sought judgement, the terms of which have been quoted above, and then announced the decree passed by Government upon a regiment guilty of open and defiant mutiny, in the following terms : "It is, therefore, 'the order of the Governor General in Council, that the 19th regiment N. I. be now disbanded; that the native commissioned and non-commissioned officers and privates be discharged from the army of Bengal; that this be done at the head quarters of the presidency division in the presence of every available corps within two days' march of the station; that the regiment be paraded for the purpose, and that each man, after being deprived of his arms, shall receive his arrears of pay and be required to withdraw from the cantonment." The arms were piled, and the colors were deposited with them, but the uniforms were not stripped off. Pay was delivered, and the disbanded regiment was marched off to Chinsurah, to await there the arrival of their wives and families. Thus was the first overt act of mutiny on the part of the Bengal army dealt with by Government. To have stopped short of this–in any other than an Indian army–inconceivably light punishment, would have been an official announcement, that discipline was henceforth to be abolished. Yet, such was the public feeling in India at the time, that most newspapers applauded what was called the temperate yet decided policy of Government.

At Barrackpore were then stationed four native regiments, the 20th, the 34th, the 43rd, and the 2nd Grenadiers. During the month of March the disaffection of the native troops took a serious form. Mutinous

meetings were held. Several arrests of native officers took place. On Sunday, the 29th March, a Brahman sepoy of the 34th regiment, who had perhaps drugged himself to run a muck, attacked and wounded the Serjeant major and the Adjutant of the regiment with sword and musket, within sight of the quarter guard of the 34th. Lieut-Colonel Wheeler ordered the guard to fire on the sepoy. They refused to obey his orders. Lieut-Colonel Wheeler quietly reported the circumstance to the Brigadier. On the approach of a guard of the 43rd, the sepoy shot himself, but his wound was not dangerous. He was then seized. All this happened in the lines of the 34th regiment, of whom none moved in defence of the serjeant major or the adjutant. In this case punishment was inflicted less tardily.

The sepoy who had shot adjustant Baugh's horse, and inflicted severe wounds upon this officer and the sergeant major Hewson, who had come to his assistance, was hung within about a week after the commission of the crime, and the jemadar who had ordered the guard to stand still, when they were commanded to arrest the ... criminal, and upon whom, during the enquiry, all blame was thrown by his men, paid the same penalty after a fortnight. In the mean time a party of the men of the 34th regiments refused to march on guard duty to Calcutta, and were of course, placed under arrest. The punishment of the mutinous regiment was slower. It was on the 6th of May, that the second disbanding took place at Barrackpore. At daylight two sides of a square were formed by H. M.'s 53rd and 84th, the 2nd, 43rd and 70th N. I., two squadrons of cavalry, consisting of the body-guard, the 11th irregulars, and a light field battery with six guns. When the line was formed, the seven companies of the 34th, who had been present in the Barrackpore lines on the 29th March, about four hundred strong, were halted in front of the guns, the order for disbandment was read out, and after a few energetic remarks upon the enormity of their offence, General Hearsey commanded them to pile their arms and strip off the uniform which they had disgraced Their arrears were paid up, and in two hours the disbanded sepoys were marched off to Pulta Ghaut for conveyance to Chinsurah, the grenadiers of the 84th, and a portion of the body-guard, attending their footsteps. Thus half a regiment of mutineers, who had, it was well-known, contemplated massacre and essayed murder, were sent away in peace with their pay in their hands. Thoughtful men began to feel alarmed at the extraordinary leniency of Government in dealing with the spirit of mutiny, which showed itself bolder and bolder all over the cantonments of the Bengal army, and began to light the beacon of incendiarism in all directions, at Umballa, Meerut, Phillour, Lucknow, Dinapore, and other stations. The Governor General's order spoke, indeed, in terms sufficiently clear and strong of the criminal conduct of the regiments.

"The mutinous sepoy was permitted to parade himself insolently before

his assembled comrades, using menaces and threatening gestures against his officers, without an attempt on the part of any to control him.

"No such attempt was made, even when he had deliberately fired at the serjeant-major of the regiment

"None was made, When–upon the appearance of the adjutant, Lieut Baugh, and after having reloaded his musket unmolested, the mutineer discharged it at that officer, and shot his horse

"When the horse fell, not a sign of assistance was given to Lieut. Baugh, either by the quarter guard or by the sepoys not on duty, although this took place within ten paces of the guard

"During the hand-to-hand conflict which followed between the mutineer and Lieut. Baugh, supported by Serjeant Major Hewson, the men collected at the lines in undress, looked on passively, others in uniform and on duty joined in the struggle, but it was to take part against their officers, whom they attacked with the butts of their muskets, striking down the serjeant major from behind, and repeating the blows, as he lay on the ground

"When the adjutant, maimed and bleeding, was retiring from the conflict, he passed the lines of his regiment, and reproached the men assembled there, with having allowed their officer to be cut down beforet heir eyes, without offering to assist him. They made no reply, but turned their backs, and moved sullenly away.

"For the failure of the quarter guard to do its duty, the jemadar who commanded it, has already paid the last penalty of death. In this guard, consisting of twenty sepoys, there were four, who desired to act against the mutineer; but their jemadar restrained them, and when, eventually, the order to advance upon the criminal was given by superior authority, the majority yielded obedience reluctantly."

Such was the language of the Governor General. But, what was his course of action? Two individuals only had suffered death after a tedious process of enquiry, while, to judge from the stern tone of the order, every man of the guard, who remained a quiet spectator of the outrage, should have been tried by court martial, and shot within twenty-four hours. One sepoy of the 34th indeed, made an exception. He ran to the help of the adjutant and saved his life. He was murdered shortly afterwards, and his murderer, of course, escaped detection. The mutinous corps were sent to their homes unmolested. Mutiny was deprived of the terrors of condign, swift, vigorous punishment, and again a large body of disaffected men, irritated, but not humbled or frightened, by loss of pay or pension, was cast adrift upon the country.*

Simultaneously almost, in the beginning of May, Lucknow and

* In justice to the Government it ought, however, to be considered, that, if sterner measures had been adopted, *and had succeeded in quelling the mutiny*, it would never have been known how great was the evil to be repressed, and the severity of the measures employed in its suppression, would have been severely censured by many of those who now condemn the Government for its leniency. One thing is certain, that the measures adopted by the Government were more severe than those adopted on his own responsibility by Sir Charles Napier, upon an occasion which he believed to be equally critical–ED *C R*

Meerut, places far distant, the former the capital of the lately annexed kingdom of Oude, the latter a principal military station forty miles from Delhi, became scenes of demonstrations of mutiny. At Lucknow the 7th Oude Irregulars showed signs of insubordinaton. On the 3rd May, information was given at head quarters, when the European battery of eight guns was at once sent off at top speed towards Lucknow. The cavalry, 48th N. I. and 71st N. I. followed. These regiments were joined by the Queen's 32nd. All were quickly drawn up in front of the mutineers at Moosah Bagh. The artillery unlimbered, the guns were loaded with grape. A port-fire was lighted by some artillery-man, at the sight of which the mutineers threw down their arms, and ran. Their arms were gathered, and the men were confined in their lines. Fifty of the ringleaders were taken prisoners. Thus the first rise was put down with vigorus promptitude. On the 12th of May, Sir Henry Lawrence held a great durbar, in which he delivered a spirited oration in Hindusthani, as introductory to the distribution of handsome rewards among a number of officers and privates of the 48th and 13th N.I. who had distinguished themselves by fidelity and bravery. He gave magnificent sabres, costly shawls, cloaks, and embroidered cloths to a subadar and a havildar, and to the privates handsome swords, turbans, pieces of cloth, and Rs. 300 each. All saw that the representative of the British Government was as ready to reward and honor the deserving, as vigorous in the suppression of insubordination, and the punishment of mutineers.

When this imposing ceremony took place at Lucknow, Delhi, the ancient capital of the Mogul empire, where a pensioner of the house of Tamerlane held his idle court, and spent his eleemosynary revenue of sixteen lacs a year, granted by the East India Company, had become the centre of the sudden revolt. The 3rd cavalry, stationed at Meerut, had, on the 24th April, refused the new cartridges. Major General Hewitt, who commanded there, had taken prompt measures a little in advance of the Barrackpore procedure. Eighty five men were tried by court martial, and sentenced to terms of imprisonment, varying from five to ten years, with hard labor in irons. On Saturday morning 9th May, the troops were drawn up in line, the sentence read out, and the prisoners, stripped of their uniforms, were fettered and marched off the ground. General Hewitt had now, it seems, spent all his vigor. A large body of men had been punished for a crime, which it was known their comrades were quite willing to share with them, and common sense must have suggested the necessity of carefully watching the regiment, and of cutting off every chance of the rescue of the prisoners. But, when these were lodged in jail, the General ordered the 6th dragoon guards, a battalion of H. M.'s 60th rifles, and the artillery, back to their lines. The time, from the Saturday morning parade to six o'clock on Sunday evening, was most likely spent by the native

troops in rousing themselves by the aid of *bhang*, and equally exciting club-meetings, to a state of frenzy; for at that hour, when the evening service was about to commence, and many of the officers and other residents would assemble at the church, a part of the 3rd cavalry galloped to the jail and liberated the prisoners; the rest, together with the 11th and 20th N. I., commenced an attack upon the Europeans collecting at the church, and murdered all who fell into their hands, without distinction of age or sex. Colonel Finnis, whilst attempting to bring his own corps to reason, was shot down by men of the 20th N. I. A considerable number of officers were destroyed in the first moments of the outbreak. Then the mutineers, joined by the liberated convicts and the scum of the large town, (Meerut has a population of 40,000) spread themselves over the station, and, amidst the conflagration of public buildings and private residences, committed acts of atrocity too horrible to relate. Fiendish cruelty and sensuality revelled triumphantly. At least fifteen hundred British soldiers were in their lines at a few miles' distance. There was a corps of heavy dragoons, a battery of horse artillery, and a battalion of rifles, troops enough, and more than enough, to have exterminated the whole crew of mutineers long before the dawn of morning. It was the first day after the full moon. The night was as bright as many a northern day General Hewitt might have crushed in that night the head of the Hydra, which raised itself against the British dominion from the depths of a long matured revolt of pretorian mercenaries. Alas, he was no Hercules, but a Major General, by seniority, in the East India Company's army. Two, yea three hours were spent in preparations, and in marching from a few miles distance the European force, which the mutineers whould have never thought of facing. Meantime the work of butchery and incendiarism went on without let or hindrance, until the tardy arrival of the European soldiers. At their first volley the mutineers fled. They fled in the direction of Delhi, and were followed by the dragoons to the distance of a few miles. Early on Monday morning, some men of the 3rd cavalry galloped into Delhi, and gave the signal of revolt to the native regiments stationed there, the 30th, the 56th, the 74th regiments N. I. These men cut down and shot Mr. Simon Fraser, the commissioner, and several officers, whom they met in the streets. The three regiments immediately joined the mutineers. There were no European troops in Delhi. A troop of native artillery mindful of their old reputation, refused to join, and escorted their officers and some other Europeans to Allyghur. Between eight and nine o'clock, the Meerut mutineers, headed by the 3rd cavalry, marched in open column over the suspension bridge, which spans the Hindun; they were directly admitted into the palace, through which they passed cheering into the city. Resistance was impossible. The mutineers, who had served their horrid apprenticeship at Meerut, were masters. All

Europeans, who fell into their hands, were massacred, men, women, and children. The Mussalman rabble of the great city, which holds 152,000 inhabitants, and the convicts get free from the jail, swelled the number and fury of the lawless sepoy banditti, and celebrated their infernal saturnalia in true eastern style. Most of the European ladies and women were dishonored, and then cruelly destroyed. It is said, that some forty ladies, who had taken refuge in the palace, were kept alive by the mutineers for one fortnight in infamy and despair, and at last turned out naked into the hands of the Delhi mob, who, after wreaking upon them their bestiality, cut off their breasts, and finally hacked them in pieces.

All Government treasure, the money of the bank, whatever belonged to Europeans, was, of course, pillaged. This was the beginning of the four months and four days, during which Delhi was held by the king of Delhi and his army of mutineers, until the British army, under General Wilson, stormed the walls and commenced the capture of the city, which was completed on the 21st September. Complete as was the triumph of the traitor sepoys, it received an ominous check from the valour of nine British soldiers, Lieuts. Willoughby, Raynor and Forrest, Conductors Shaw, Buckly, and Scully, Sub-conductor Crow, and Serjeants Edwards and Stewart, who defended the Delhi magazine against fearful odds to the last extremity, and then blew it up with hundreds of eager foes. Conductor Scully volunteered the sacrifice of his life in the service of his country, and perished amidst the ruins. The majority of his heroic companions, though scorched, bruised, and wounded, effected their escape amidst the general consternation. Allyghur was, at the commencement of the mutinies, held by an apparently loyal corps, the 9th Regt. N. I. In a manner almost incredible, yet perfectly in keeping with the character of the ignorant, credulous, impulsive sepoy, the regiment changed its mind suddenly and marched to Delhi. We relate the strange incident on account of its full exhibition of a singular trait of the sepoy character. One of the emissaries of treason had found his way into the Fort of Allyghur, and was tampering with the men to induce them to join the ranks of the mutineers at Delhi, when he was seized by consent of the whole body, and handed over to the commanding officer. A court martial composed of native officers, was held, which condemned him to death, and a parade was ordered for his execution. At the appointed time, the regiment assembled, and the gallows received its victim. But, before the traitor was cut down, the rifle company from Boolundshahur came in and marched to ground. A fanatic from the ranks stepped out, and proclaimed, that they had destroyed a martyr to the cause of religion, since the Company's Government were firmly bent upon destroying caste throughout India. The men listened, debated, wavered, and finally broke out with loud shouts, declaring their intention of marching to Delhi, which resolve was speedily put in execution. A number of the well-disposed assembled

round the officers, and told them, that, although they were powerless to withstand the general will, they would take care that no harm should happen to them; and they kept their word.

On the 12th May, suspicions arose of the loyalty of the native infantry regiments, and the 8th light cavalry, at Lahore. Sir John Lawrence knew how to act in a case of emergency. A consultation amongst the heads of departments was immediately held, and measures taken forth with perfect secrecy. There was but a single European regiment, H. M.'s 81st. A ball, which had been previously advertised, was attended by all the European residents of the station, care being taken not to exhibit the slightest apprehension of impending danger. The festivities were unbroken, but at daylight the whole of the garrison turned out at what was thought to be an ordinary parade, and then in the front of guns loaded with grape, and with the Europeans on either flank, the four regiments were ordered to lay down their arms. The surprise was complete, and they obyed without a moment's hesitation. Whilst the work of dancing was going on, three companies marched quietly to the fort, turned out the native guards, and took possession. The whole business was managed with tact and discretion, and was completely successful. On the 13th of May, after the news of the Meerut revolt had reached Ferozepore, the 57th and 45th N. I. mutinied. The former regiment listened to reason, returned to obedience, and was disarmed; the latter was attacked by H. M.'s 61st, and the 10th light cavalry, who remained true to their salt, and in great part destroyed during the conflict at the station, and on their subsequent flight across the open country.

At the same time, alarming news spread regarding the safety of Benares and Allahabad, where a very doubtful, spirit prevailed among the sepoys.

Such were the opening scenes of the first act of the Indian tragedy of 1857, soon to be followed by horrors still greater, if possible, by deeds of foul bestiality, in famous treachery, and fiendish cruelty, unparalleled in the history of civilized nations. These first scenes were enacted in the first half of the month of May, at places far apart, Lucknow, Meerut, and Delhi, Ferozepore, Lahore, by large bodies of an army of one hundred thousand men, mutinous to the core, unrestrained by a sense of religion, devoid, with rare exceptions of every feeling of loyalty hovor or morality, by masses of inflamed rebels, banded together against overweaningly confident, unsuspecting, and unprepared masters, aliens in race and color, language, and religion, whom they now hated and despised in exact proportion to the obsequious awe, with which their unquestioned superiority had inspired them in days now past. The four days, from the 10th to the 14th of May, gave British supremacy a shock, which was felt all over India, and from which the Government has begun to recover only

after four long and dreary months of humiliating exposures and panics, of appalling disasters, heart-rending catastrophes, and of anxieties bordering on despair.

On the 16th of May, the supreme Government published the following proclamation, which is a good specimen of Indo-British statesmanship, promulgating manifestos, waste paper in India, but excellently adapted to the notions and the temper of the British houses of parliament, and of the home public in general,–of that art, of which the first adept and master among the Indian Governors-General was the Marquis of Wellesley, who, before his well-planned and successful attack on the formidable and implacable enemy of British power in the south o India, addressed to poor Tippoo Sultan long and labored state-papers on international law and general priciples of Government, which the fanatical Mohammedan could not, if he would, have understood, but which created quite a sensation among political men at home, and fully convinced John Bull, that a more righteous, a more disinterested, a more unavoidable war had never been waged. Lord Canning's proclamation runs thus :

> "The Governor General of India in Council has warned the army of Bengal, that the tales by which the men of certain regiments have been led to suspect, that offence to their religion or injoury to their caste is meditated by the Government of India, are malicious falsehoods
>
> "The Governor General in Council has learnt, that this suspicion continues to be propagated by designing and evil-minded men, not only in the army, but amongst other classes of the people.
>
> "He knows, that endeavours are made to persuade Hindoos and Mussulmans, soldiers and civil subjects, that their religion is threatened secretly, as well as openly, by the acts of the Government, and that the Government is seeking in various ways to entrap them into a loss of caste for purposes of its own.
>
> "Some have been already deceived, and led astray by these tales.
>
> "Once more, then, the Governor General in Council warns all classes against the deceptions that are practised on them.
>
> "The Government of India has invariably treated the religious feelings of all its subjects with careful respect. The Governor General in Council has declared, that it will never cease to do so. He now repeats that declartion, and he emphatically proclaims, that the Government of India entertains no desire to interfere with their religion or caste, and that nothing has been, or will be done by the Government to affect the free exercise of the observances of religion or caste by every class of the people.
>
> "The Government of India has never decieved its subjects, therefore the Governor General in Council now calls upon them to refuse their belief to seditious lies.
>
> "This notice is addressed to those who hitherto, by habitual loyalty and orderly conduct, have shown their attachment to the Government, and a well-founded faith in its protection and justice.
>
> "The Governor General in Council enjoins all such persons to pause

before they listen to false guides and traitors, who would lead them into danger and disgrace.

"By order of the Governor General of India in Council,

CECIL BEADON,
Secretary to the Government of India."

Calcutta Gazette Extraordinary, May 18

This was a bottle of oil poured out upon a stormy sea to quell the wild tumult of its waves. But the Governor General did not put his trust in papers or any other contrivance of mere state craft. He summoned European troops from all quarters, from Burmah, Madras, Ceylon, the Mauritious, Bombay, Persia, with which peace had been concluded, yea from New South Wales; despatched ships to intercept the Chinese expedition under the direction of Lord Elgin, and applied for speedy and considerable reinforcements to the Home Government. Martial law was proclaimed in the disturbed districts. An act was passed, suspending the liberty of the press. In short, no stone was left unturned, no resource was forgotten, in the most strenuous endeavour of collecting every element of strength on the side of the Government, to make head against the sudden storm. It is beside the scope of this article to criticize the measures adopted by Govrnment during an unprecedented crisis, or the siege, if it may so be called, of Delhi, which was ordered and prepared by General Anson, the Commander-in-Chief, who died at Kurnoul, on the road to the scene of operations, commenced by General Barnard who was taken away by cholera before Delhi, carried on by General Reed, whom sickness soon incapacitated, then by Lieut. Col. Chamberlain, who was severely wounded a few days after taking the command, and brought to a successful issue by General Wilson, on the 14th September, when the Government forces, consisting of British, Seikh and Goorkha troops, stormed and took the north side of the walls, with the Cashmere, Cabul and Moorgates, and thus made themselves virtual masters of the rebel city. Nor shall we venture to paint the sickening scenes of the dreadful Cawnpore tragedy, in which five hundred British men, women, and children were butchered, like a flock of sheep, through the revengeful treachery of an upstart, petted and finally disappointed Mahratta Brahman, Nana Saheb, the adopted son of the Ex-Peishwah, Bajee Rao, by an immense band of mutineers, naturally heartless, goaded by the consciousness of unpardonable crime, exasperated by the long and heroic resistance of the handful of Feringhees, and excited to demoniac cruelty by the insolence of momentary triumph, and the undefined dread of final ruin looming in the distance. Nor can we venture upon even a brief outline of the memorable siege of Lucknow, sustained by the fearless, the noble, the faithful Henry Lawrence and his successsors, and their brave

companions in arms, from the end of May to the end of September, against all the powers of a warlike country in insurrection. Neither is it to our purpose to trace the order, in which the mutinymine exploded from the borders of the Punjab to Dinapore, near the angle of the Ganges, where it takes its southerly course, a few hundred miles to the north of Calcutta; from Lucknow in Oude to Indore and Gwalior, Nagpore, Jubbulpore and Saugor in the direction of the Bombay and Madras presidencies, at the terrible rate of almost a regiment a day, either breaking out in violent mutiny, or being cautiously disarmed, during all June, July and Part of August, until one hundred thousand sepoys were involved in the dreadful controversy, the arm of Government for a time paralysed in Bengal and the north-western provinces, and the whole north of the Indian empire to the east and south of the Panjab, where John Lawrence and his honoured associates, with clear heads, stout hearts, and strong hands, kept mutiny and treason in check and awe, appeared involved, or on the eve of being involved in one terrible conflagration. The history of the past five months, closing with the storming of Delhi and the relief of Lucknow, is fresh enough in the hearts of the readers of these pages. Its horrors need no retouching. Our object is not to narrate, but to reflect on the great tragedy, the first act of which has just ended, and to offer the results of patient, serious, impartial search after the true interpretation of the Indian crisis, to the earnest consideration of our readers.

It is certainly a very significant fact in the history of the revolt, which has, with the suddenness and destructiveness of a hurricane, swept over Bengal, Oude, and the north-western provinces, that after the lapes of five months, the all important question as to its character and causes, is yet far from being satisfactorily comprehended by the witnesses of its outbreak and progress, the sufferers in mind, body and estate from its violence and cruelty, and the actors in the bloody scenes of strife between established authority and lawless turbulence. Yet we entertain a strong hope, that we shall succeed in giving such an interpretation of the terrible enigma, as will satisfy readers of common sense, who can divest themselves of prejudice and passion, and have patience enough to dig below the surface of symptoms,–The hopefulness or gloom, the coincidence or disconnectedness, the harmony or contrariety of which may be equally deceptive,–into the reality of things, into the depth of general principles, which act upon unchanging human nature with unvarying uniformity among all races, in all places, and at all times. Our subject of enquiry is the character and the causes of the present crisis. Let it be clearly understood and never forgotten, that the crisis has arisen from a mutiny of the Bengal army.

A mutiny, not an insurrection, has palced in jeopardy, for a season, the

British domination over Hindustan. The revolt has nowhere, except in the recently annexed Oude, assumed the features of a general insurrection. It is true, that the people of the lower provinces have not turned against the mutineers nor hunted them down, like the sturdy peasantry of the Panjab; but who will expect Bengalis to take up arms in any cause? And farther to the north the people have certainly sympathized in a great measure, naturally enough, with a mutinous army drawn principally from themselves. Many a Hindu in the provinces convulsed by the revolt of a whole army, no doubt, considered the cause of the "Kumpani Bahadur" hopeless, and it would be too much to expect subjects of a foreign Government, humane and liberal indeed, but pressing heavily upon the masses of the people by a financial system which derives the principal resources of the state from the land-tax, to endanger or sacrifice property and life in the cause of strangers. We have no right, therefore, to construe the equivocal attitude of the population of several districts into a proof of their participation in a general insurrection against the Government. It is a mutiny, then, which we have to deal with, and a mutiny, not of the Indian army, but of the army of Bengal. One infantry regiment of the Madras army lately showed a stubborn temper at Masulipatam, when they were ordered to march to Hyderabad without their families, but they have remained loyal throughout the crisis. One cavalry regiment who had volunteered for service in Bengal, on the way to the Presidency, attempted a strike for higher wages, and was punished by being deprived of horses and fire-arms by the discharge of native officers, and the stoppage of promotion. There were rumours of insubordination and mutiny in a third Madras regiment, stationed in Burmah. All the rest of the Madras army, from Cannanore to Madras, from Hyderabad to Trichinopoly, all the troops stationed in the Mysore, have remained orderly, steady, loyal under the pressure of considerable temptation. Many Madras regiments have volunteered for employment in Bengal, and the 17th and 27th regiments are doing execllent service there against the mutineers.

The Bombay army, has not behaved so well. Part of the 27th regiment Bombay N. I., mutinied at Kolapore; the 29th regiment at Belgaum; the 21st at Kurrachee, a squadron of the 2nd Bombay light cavalry at Neemuch, and a company of artillery at Hyderabad in Scinde. But as the rest of the Bombay army has proved loyal, the cause of the partial mutinies may be, as is generally believed, the large admixture of Hindusthani sepoys, who are found in the ranks of Bombay regiments to the number of sixteen thousand. Certain it is, that the Bombay sepoys, as a body, have remained staunch, under the severest trial by which the fidelity of the East India Company's Indian army has yet been tested.

Had the whole Indian army mutinied, and had it revolted simultaneously, or had the British power been assailed by a popular as

well as military insurrection, the majority of Europeans in India would have perished within a month, and the reconquest of Hindustan, instead of the pacification of two presidenceis, would be the task now imposed upon the British nation.

The Bengal army consisted of seventy-four regiments of regular infantry, and ten regiments of regular cavalry. It formed, with the irregulars and the contingents, more than one-half of the whole Indian army. With the exception of the Seikhs and Goorkhas, this force was drawn from a locality of comparatively narrow limits, viz : the kingdom of Oude and the adjacent provinces of the Company's dominions, the ancient Aryavarta, and still the reputed focus of pure Hinduism. All who enlisted had to be men of high caste. Men of low caste, or of no caste at all, were expressly excluded, or if by chance found in the ranks, ignominiously expelled. Especially in the cavalry regiments a considerable number of Mohammedans were to be found, but these were partly be descent, partly by habits and feelings, formed under the influnce of Brahmanism, rather hinduized Mohammedans, than true Musulmans; and on the point of caste–thoroughly sympathized with their Brahmanic companions in arms. A warlike population of four or five millions thus furnished the British Government with the chief strength of its military establishment in the northern presidency. The inevitable consequence was, that the Bengal army, unlike the armies of the western and southern, presidencies, which are recruited from different castes, countries and languages, had from its very formation a distinctive character, in which pride of caste was the provinent feature, strongly stamped upon every regiment. The army of the chief presidency enjoyed from the beginning the peculiar privilege, great in the eyes of orthodox Brahmanism, of being engaged for home service only while the Bombay and Madras armies were levied for general service, and had to proceed on foreign duty, like European troops. The Bengal sepoys, when their services were required across the black water, had to be solicited to volunteer, which they did very sparingly, and not by regiments, but individuals. Once, several years ago, a Bengal regiment, by some oversight, received orders to embark for Burmah. They protested, and pleaded the terms of their engagement. The strong-willed Marquis of Dalhousie, little accustomed as he was to yield to men or circumstances, waved the point, and inflicted upon sepoy insolence, no other punishment, but a long and wearsome march by land to the place of the original destination of the regiment. This is the army which has revolted; the largest, the most compact, the most highly privileged, and by far the proudest section of the Indian forces.

Very different views have been taken of the character and causes of the mutiny by men in office and out of office, both in India and in England. One party has ascribed the revolt to religious fanaticism, roused into action by the apprehension of danger from the aggressions of

Christianity, professed by the Government of the country, favoured and assisted by the new Governor General, Lord Canning, forced upon the sepoy by zealots in military office, like Lieut,-Col. Wheeler, who commanded the 34th Regt. B. N. I.,–and preached throughout the length and breadth of the land by an increasing number of missionaries.

Lord Ellenborough, who may be considered as the spokesman of this party, brought the charge against Lord Canning in the House of Lords, that he had given donations to several missionary institutions, declaring it inadmissible in the case of an Indian Governor General, to draw a line of distinction between his public character and his private actions, and contending, that such conduct was fraught with the most imminent danger to the safety of the Indian empire, and proved Lord Canning's unfitness for his high and responsible office. A very feeble defence was made by the friends of the Governor General. Doubts were suggested of the correctness of Lord Ellenborough's information, and it was proposed to make a reference to Lord Canning himself on the subject. Their Lordships seemed to be agreed on the principle, that any personal profession of Christian piety, or any act of munificence on behalf of Christian missions in India, was incompatible with the character of the Vice-regal representative of the British nation in Hindustan, inasmuch as every manifestation of Christian zeal by so high a functionary must appear to the people of India as the symptom of an intention on the part of Government to subvert the religions of the country, and to establish their own. If Lord Canning's private charities endangered the safety of the empire, what must have been the dreadful consequences of the abolition of suttee and infanticide, of the extension to all India of the "Liberty of Conscience Act" which secured to Christian converts, as well as others, the possession of their civil and private rights,–of the legalization of the remarriage of widows, and of other measures worthy of the British name, adopted by former and the present Government? Had not Lord Dalhousie and former Governors General been guilty of the same fault? Had the donations of the Governor General attracted public notice in India? Had any class of people, or any individual, in this country, taken offence and expressed or hinted any apprehensions on that score? No! the anxiety felt by Lord Ellenborough was all his own, and had arisen in his mind from a nervous jealousy, lest the people of India should discover, that the Christianity of their rulers was more than a mere name and hypocrisy. Lord Ellenborough's speech has recieved its best answer from the mouth of a Hindu speaker at a public meeting of the British Indian Association, held in Calcutta on Saturday, 25th July last. Baboo Dakhinaranjan Mukerjee spoke as follows :

> "Lord Ellenborough, on the 9th of June last, was pleased to observe in the House of Lords, that the recent mutinies here are attributable to ar apprehension on the part of the natives, that the Government woul interfere with their religion, that the fact of the Lord Canning's renderin

pecuniary aid to societies, which have for their object the conversion of the natives, operates detrimentally to the security of the British Indian. Governemt, which must be maintained on the principles of Akbar, but could never be maintained on those of Aurungzebe, and if it be a fact, that the Governor General has subscribed to such societies, his removal from office would obviate the danger arising from the error. If the premises laid down by Lord Ellenborough be correct, there could be no two opinions as to the unfitness of Lord Canning to fill the Vice-regal chair, and the urgent necessity of his Lordship's immediate dismissal from office; but in considering so momentous a question, it is requisite, that the facts upon which Lord Ellenborough grounds his premises should be fairly enquired into, and no place is so appropriate to institute that enquiry as Hindustan, nor any assembly more competent to decide on that subject, than the one I have the honor to address. First, let us then enquire, whether the present rebellion has arisen from any attacks made or intended against the religious feelings of the people by the administration of Lord Canning? Secondly, what are the real circumstances, that have caused this rebellion?

"Speaking, as I am, from the place, which is the centre of the scenes of those mutinies, that have drawn, forth the remarks of Lord Ellenborough, and possessing, as we do, the advantages of being identified in race, language, manners, customs and religion with the majority of those misguided wretches, who have taken a part in this rebellion, and there by disgraced their manhood by drawing arms against the very dynasty, whose salt they have eaten, to whose paternal rule they and their ancestors have for the last hundred years owed the security of their lives and properties, and which is the best ruling power, that we have had the good fortune to have within the last ten centuries, and addressing, as I am, a society, the individual members of which are fully familiar with the thoughts and sentiments of their countrymen, and who represent the feelings and interests of the great bulk of Her Majesty's native subjects, I but give utterance to a fact patent to us all, that Government have done nothing to interfere with our religion and thereby to afford argument to its enemies to weaken their allegiance

"The abolition of the diabolical practice of infanticide by drowning children in the Gunga, by the Marquis of Hastings; (Baboo Dakhinaranjan ought to have said the Marquis Wellesley,)—of the criminal rite of suttee suicide, by Load W Bentinck, and the passing of other laws for the discontinuance of similar cruel and barbarous usages, equally called for by justice nad humanity, by Governors General (though they existed among us for ages) never for a moment led us to suspect, that our British rulers would interfere with our religion, or weaken the allegiance of any class of subjects in India. And is it to be supposed that Lord Canning's subscription to the missionary societies has ignited and fanned the awful fire, the flame of which now surrounds the fair provinces of Hindustan, and has changed the obedient and faithful native soldiers of the state into fiends, who delight in plunder, massacre and destruction? No, certainly not. Our countrymen are perfectly able to make a distinction between the acts of Load Canning as a private individual, and his Lordship's doings as the viceroy of Her Gracious Majesty, Queen Victoria.

"Chiefs of all denominations, both Hindu and Mohammedan, as well as the merchants and soldiers of both these races, possess enough of intelligence and shrewdness to know, that what a person does in his *taut Khas*, is quite a different thing to what he does, in his *wohdaw*; and Lord Ellenborough must have been misinformed as to the impression the Governor General's subscription to the missionary societies has produced in this country, when he surmised, that that has occasioned the rebellion, &c

"Aware of the weight, that would be attached by the British public to the views expressed by that personage, we feel it incumbent on us to point out his Lordship's mistake Then, as to the missionaries, a man must be a total stranger to the thoughts, habits and character of the Hindu population, who could fancy, that, because the missionaries are the apostles of another religion, the Hindus entertain an ivcterate hatred against them. Akbar of blessed memory, whose policy Lord Ellenborough pronounces as peculiarly adapted to the Government of India, (and which, no doubt, is so) gave encouragement to the followers of all sects, religions and modes of worship Jaghires and Altunghas, bearing his imperial seal, are yet extant to show that he endowed lands and buildings for the Mahaomedan musjids, Christian churches and Hindu devalayas. The Hindus are essentially a tolerant people, a fact which that sagacious prince did fully comprehend, appreciate, and act upor and the remarks of Lord Ellenborough, that Akbar's policy should be the invariable rule of guidance for British Indian Governors, is most correct, but in the sense we have just explained, and should be recorded in golden characters on the walls of the council chamber. When discussing on Indian subjects, it should always be remembered, that this country is not inhabited by savages and barbarians, but by those, whose language and literature are the oldest in the world, and whose progenitors were engaged in the contemplation of the sublimest doctrines of religion and philosophy, at a time when their Anglo-Saxon and Gallic contemporaries were deeply immersed in darkness and ignorance, and if, owing to nine hundred years of Mahomedan tyranny and misrule this great nation has sunk in sloth and lethargy, it has, thank God, not lost its reason, and is able to make a difference between the followers of a religion which inculcates the doctrine that it should be propagated at the point of the sword, and that which offers compulsion to none, but simply invites enquiry However we may differ with the Christian missionaries in religion, we speak the minds of this society and generally of those of the people, when we say, that, as regards their learning, purity of morals, and disinterestedness of intention to promote our weal, no doubt is entertained throughtout the land, nay, they are held by us in the highest esteem European history does not bear on its record the mention of a class of men, who suffered so many sacrifices in the cause of humanity and education, as the Christian missionaries in India; and though the native community differ with them in the opinion, that Hindustan will one day be included in Christendom, (for the worship of Almighty God in His unity, as laid down in the holy veda, is and has been our religion for thousands of years, and is enough to satisfy all our spiritual wants:) yet we cannot forbear doing justice to the venerable ministers of a religion, who, we do here most

> solemnly asseverate, in piety and righteousness alone are fit to be classed with those Rishis and Mahaturas of antiquity, who derived their support, and that of their charitable boarding schools, from voluntary subscriptions, and consecrated their lives to the cause of God and of knowledge "

It is not, therefore, likely, that any little monetary aid, that may have been rendered by the Governor General in his private capacity to missionary societies, should have sown the germ of that recent disaffection in the native army, which has introduced so much anarchy and confusion in these dominions.

It is to be hoped, that British statesmen will lay aside their alarms, sincere or feigned, when they are assured by Hindus themselves, that they have no apprehensions whatever of Government proselytism.

Every misfortune or mischief, caused by blunders or supineness on the part of the Government in India, has been connected, wherever feasible arguments could be found, with the cause of Christianity.

When in 1813, the great Indian discussions took place in the House of Commons, which resulted in the free admission of Christian missionaries into the dominions of the East India Company, the Vellore mutiny,—which had occurred in 1806, when 113 Europeans had fallen a sacrifice to the fury of sepoys, excited by Government orders commanding a change of dress, and secretly instigated by the Mohammedan princes of the family of Tippu, whom an overconfiding and unsuspecting Government had royally lodged and supported with lavish liberality in the fortress of Vellore,–was used by the party hostile to the spread of the gospel in India, as a strong and irrefragable argument against the admittance of missionaries among a population so extremely sensitive and jealous of any, the least interference with their religion. Yet, what had been the facts of the case? Lord W. Bentick, then Governor of Madras, whose decision was confirmed by the deliberate judgement of the Court of Directors, pronounced after a full investigation of the whole business, had declared,

> "that, whatever difference of opinion the dispute respecting the more remote or primary causes of the mutiny may have occasioned, there has always prevailed but one sentiment, respecting the immediate causes of that event These are on all hands admitted to have been certain military regulations, then recently introduced into the Madras army "

These regulations were the ordering of

> "the sepoys to appear on parade with their chins clean shaved, and the hair on the upper lip cut after the same fashion," "never to wear the distinguishing marks of caste or earrings when in uniform," and "the ordering for the use of the sepoys turban of a new pattern."

Such were the new regulations, made *by a new commander-in-Chief* fresh from Europe, (the prototype in many respects, of General Anson) of whom, however, Wilberforce, the noble advocate of the slave and the Hindu, speaks highly in a note to his substance of speeches, delivered in June and July, 1813.

"It is due to the highly respectable officer, who was at that time first in command in the Carnatic, to state, that he appears to have been misled by the erroneous judgement of some officers of long experience in the Indian army, as well as (in the instance of the new turban) by a court of inquiry, into conceiving, that no bad consequences would result from the new regulaions, and, having once commanded them to be introduced, it became a matter of extreme doubt and difficulty to decide, whether it would be best to retreat or enforce the orders."

Such were the obnoxious regulations, and they were strongly enforced. The refractory non-commissioned officers were ordered to be reduced to the ranks; nineteen of the ringleaders, privates, were condemned to receive severe corporal punishment and to be dismissed the Company's service as turbulent and unworthy subjects. The greater part of these offenders, shewing strong signs of contrition, were, indeed, forgiven, but the sentence was executed in front of the garrison on two of them, each receiving nine hundred lashes. The fire was smothered for a time; but political intrigue kept it alive, fanned the flame in secret, and used every method of increasing the general discontent, until on the 10th of July, the fatal explosion took place, whieh is still unforgotten by the few survivors of that generation. The mutineers, however, were at length overpowered by the timely succour of a squadron of dragoons from Arcot : 350 were killed, and 500 taken prisoners. The new regulations were pessisted in. About the 21st July, they were ordered to be introduced in the subsidiary force at Hydrabad, when the new turban, the orders respecting the marks of caste, carrings and whiskers, threw the whole of that force, amounting to ten thousand men, into the utmost disorder. Everything was ripening for an open revolt, when, by the revocation of the orders, the tumult was instantly allayed, and the troops resumed their obedience. "The revocation operated on the troops," reported an eye witness "with the suddenness and efficacy of a charm." The instant restoration of tranquillity sufficiently marked the true and principal cause of disaffection. Those troops were not Bengal sepoys of the second half of the century. We have enlarged on this subject, because the mutiny of Vellore bears some striking resemblances to the mutiny of 1857, though essentially differing from the Bengal revolt. It is perfectly clear, that the mutiny of 1806, was partly a purely military affair, occasioned by military blunders, partly the fruit of political intrigue, carried on by deposed, but still pampered princes. Yet, seven years later, Wilberforce had in the House of Commons to bring these charges against his opponents :

"Sir, may I not ask, if there was ever any attempt more atrociously unfair than to charge the Vellore mutiny on there having been a greater number of missionaries than before, (which was fully disproved by a pamphlet of Lord Teignmouth published in 1809) or on any increased diligence in the circulation of the Holy Scriptures? Yet, strange to say, such is the force of prejudice, even in sagacious and honorable minds, that to these causes it has been in considerable degree attributed."

In a similar fashion, the Bengal mutiny was by some parties in this country, and is still by certain home papers attributed to the sepoy's jealousy and hatred of missionary operations, which certainly are gradually assuming greater importance, without, however, standing in the remotest connection with the lamentable occurrences of this year. The refutation of this "atrociously unfair charge," afforded both by notorious facts and by most trustworthy witnesses, in complete. Better witnesses on a subject of this kind could not be desired, than members of the British Indian Association, who are the most intelligent and influential opponents of the missionaries in Bengal, and have no inducement whatever to speak better of their Christian antagonists, than they think of them in their hearts. But facts, patent to the world, point in the same direction. Missionaries and missionary families have, indeed, been cut off by the mutineers at Delhi, Futteghur and Sealkote, among other European victims; missionary property, has been destroyed, as well as public and private property, at Delhi, Agra, Loodianah, Allahabad. But nowhere have missionaries or mission property been singled out as peculiar objects of malice, nowhere amongst the tumults of the revolt has the cry been heard, "Down with the Padres!" Missionary victims have been fewer, God be thanked, than might have been expected, especially when their isolated positions, and their reluctance to quit the posts of duty, are taken into cosideration A few special occurrences may be added. The mutiny first broke out at Berhampore, where there is a mission of the London missionary society The 19th native infantry, when excited and under arms there, might with ease have destroyed the mission premises, and murdered the missionaries They never threatened either. They were brought down to Barrackpore and disbanded, and soon after the 34th were disbanded there too. Both regiments were let loose on the country. Opposite Barrackpore is Serampore; a short way farther up is Chinsurah. At both places there are missions. The men went moving up the country. They passed an unprotected mission at Burdwan; they could easily have reached the equally unprotected mission stations at Krishnagur and Kutwa; as they went on, they might have reached, others. But they neither threatened nor touched one of them So at Meerut and Umballah. Before the outbreak of the revolt, there were preliminary symptoms of disaffection given by acts of incendiarism; but nowhere did the incendiaries touch mission premises. At Benares a considerable number of active missionaries is stationed, and the chief civil officer is a zealous Christian. Here were two disaffected native regiments, a Seikh corps, on which it was at first doubtful if reliance could be placed, and 200,000 people supposed to be impatient of missions. Yet the city was preserved in tranquillity, and no missionary has been touched by the hand of violence. Yea, it has been publicly stated in the August number of the *Christian Intelligencer,* published at Calcutta, that, if any European is respected and trusted by natives at present, it is the missionary. All the

influence of public officers and their agents at Benares could not succeed in procuring supplies for the troops and others from the country round, but a missionary, well known to the people, is now going round, the villages, and getting in supplies for the public service. The missionaries and their families are living at that, and some other stations, at some distance from the other residents and from the means of defence, and are surrounded by the people on every side. How remarkable is this state of affairs! The Government who have always fondled and favored superstition and idolatry, are accused of an underhand design to cheat the people into Christianity; and the missionaries, who have always openly and boldly, but still kindly and affectionately, denounced all idolatrous abominations, and invited their votaries to embrace the gospel of Christ for their salvation–they are understood by the people, and, if any Europeans are trusted, the missionaries are the persons. We repeat, therefore, that there is not the slightest symptom of any special animosity against missionaries or their doings; nor of the present disturbance having in any degree whatever been caused by any missionary proceedings.

It would be singular, indeed, if the sepoys of Bengal had been provoked to mutiny by the progress of missions and the fanaticism of missionaries, since, thanks to the Argus-eyed vigilance of a Christian Government, and its strong hand, guarding with jealous care the sanctity of heathen ignorance and idolatrous superstition among its Hindustani army–they of all classes of Hindus, have come least into contact with Christianity and its messengers. To the Bengal sepoys no missions have been directed; they have remained entirely untouched. Christian instruction has never reached them. The majority of them came from Oude, where there has never been a Christian mission. They went on furlough in great numbers yearly, and attended the numerous shrines and temples without let or hindrance. Of Christianity they ordinarily knew no more, than that it was the nominal religion of their beef-eating and wine-drinking officers. Dr. J. Wilson, in a discourse delivered on the 14th and 16th August, on the Indian military revolt, has said with much force and justice.

> "The Bengal army has been greatly and systematically isolated from the liberalizing humanizing, and, I shall add, Christianizing influences, which are beginning quietly and peaceably to affect in many parts of the country large portions of the Indian population. It has been, like the Arevi of the South Sea Islands, neither to be visited nor addressed nor looked upon, either by the enlightened educationist or disinterested religious instructor. Its chaplains are expressly forbidden by Government and military orders to speak to its sepoys on the subject of religion. Its officers are discouraged from addressing a word to them on the great salvation Many of its officers have refused access to their troops to missionaries The circulation of Christian tracks and books among the native troops, has often been interdicted. Individual converts have been expelled from the ranks. Religion has thus been placed beyond the pale of social intercommunion in

the army; and prejudice, and misunderstanding, and misrepresentation, and aversion have been allowed to continue, and to work out their natural mischief. The Bengal army has, consequently, remained, in the main, a mass of ignorance and fanaticism, ready to be exploded by any incidental spark, which imagination, excited by deep and designing men, could discern as falling upon it. Had the sepoys known what Christianity is, what entrance into the Christian church is they could never have dreamed of an intention to destroy their caste by "greased cartidges," or by any other silly or "absurd appliances whatever."

In a similar strain has Baboo Dakhinaranjan complained in the above eited speach beofore the British Indian Association,

"Government now-a-days have made additional provision for the education of the middle and upper classes of their subjects, but there has, I regreat to say, been a sad omission, as regards the education of its native army, ever since the days of its first formation By education I do not mean a course of scholastic training; but some sort of training at least should be imparted to sepoys, whom, of all others, it is most absolutely requisite to humanize and to bring under the fear of God. The soldier's occupation is with arms, his daily business lies in tactics and physical force. Unless he is taught in some shape the duties he owes to his God, his sovereign, and to his immediate employers, he becomes, when infuriated, worse than a cannibal, as has been to our shame deomnstrated, in the recent rebellion."

It is scarcely necessary to mention and refute the accusations brought against the "fanatical," the "bigotted" zeal of Lieut Col. Wheeler. Lord Canning has been led to declare that officer unfit for military command. But such unfitness has only now, in these days of panic and confusion, come to be discovered, though the uncompromising "methodistical" soldier can never have been a favourite with the powers that be, and must have had many enemies. And it must be borne in mind, that he has now been condemned in the face of an honorable acquittal by a Court of Enquiry, not composed of fellow methodists. As to the connection of the Colonel's preachings with the mutiny, the fact is absolutely decisive, that the sepoys have never once be thought themselves of turning the Colonel's religious zeal into a grievance, never mentioned his religious activity, though the subject was almost suggested to them by the harangue of General Hearsey, in April. Had they said a word, had they audibly murmured against the proselytism of their Colonel. the grievous charge would, perhaps, have been set forth in general orders. But the world has heard nothing of the kind. The shrewd, the seditious sepoys were too dull, it appears,to perceive the shocks, which Lieut-Col. Wheeler gave to their Hindu or Mussulaman prejudices, and their extreme jealousy of religious interference, week after week.

But we must protest altogether against the attempt to connect the deplorable events of the last six months with religious feelings, prejudices, jealousies, fears, or anything purely religious whatsoever. How, in the name of common sense, could Mohammedan fanaticism and

Hindu fanaticism agree, as the Mussulman and Brahmanic mutineers have done? Could fanaticism, for the first time in the history of mankind, have submitted to compromises at the time when it burst forth in uncontrolled fury against a race, professing a foreign religion? Could the spirit of the Koran and the spirit of the Shastras fraternize? It is abundantly evident, whatever may be the theoretic possibility or impossibility of such a phenomenon, that no such comprmise has been entered into by the two great parties of the mutiny. The spirit of Mohammedanism has displayed itself in its traditionary character of fanatic violence at Delhi and other places. Hindus, Brahmans, yea Brahman sepoys, and fellow mutineers, have been foreibly converted. The phantom king of Delhi, during the short-lived resurrection of the dead power of the house of Timur, has ordered every Seikh or Hindu or Punjabi prisoner to be slain. Had religious fanaticim been a primary element of the revolt, the camps of the mutineers would have been divided against themselves after the first day of the outbreak. Or, had the progress of Christian missions operated powerfully upon the minds both of Mussulman and Hindu sepoys, had the near prospect of the Christianization of Hindustan goaded the native army into rebellion, now is it, that the Presidency, in which Christian converts are now counted by thousands year after year, should have remained tranquil, and that the scenes of the mutinies should have been laid in those parts of the country, where the progress of Christianity has been almost imperceptible? Were any further proof of the non-religious character of the mutiny required, we should point to its moral aspect, which has, throughout, presented features never found blended with genuine fanaticism. The fanatic may burn or slay, he may flay alive or torture on the rack his wretched victims; he may be carried to the wildest excesses of mad hatred, or the strangest freaks of refined cruelty--but he will never choose the victims of his religious rage for objects of his sensuality. Satiated bestiality may, often does, turn in murderous passion against its victims, but the cruelty of the fanatic is of another kind. Destruction, swift or slow, is its single aim. It rushes upon blood and death too impetuously to be detained and diverted by enervating licentiousness. Fanatical murderers would never have hit upon the hellish whim of putting in a row, like pairs of shoes, as was done at Cawnpore, fifty pair of white men's and thirty of women's feet, carefully cut off at the ankles.

Let us, then, discard, resolutely and entirely, from our minds every solution of the dreadful enigma, drawn direct from any purely religious consideration, from the effects of Christian missions, or any acts of British officers, civil or military, done by them in private and in their private character.

Others, chiefly military men of experience and discernment, have laid the blame at the door of the present radically defective system of military

administration, to which they trace the real causes of the mutiny. Their complaints may be summed up under the following heads, viz :–

1. The more and more prevailing principle of centralization. The bureaucratic system of the Commanders-in-Chief absorbing, or at least weakening, and often neutralizing the powers of subordinate officers, especially of commanders of regiments, has done much of late, they say, to loosen the bonds of discipline, and to deprive regimental officers of the authority and the influence they possessed in former times, when Colonels held almost absolute jurisdiction and power within their regiments, when they could promote or punish according to their own discretion, and act vigorously according to the exigencies of the moment. Then commanding officers, it is said, had much power, but also much responsibility; they were then loved by many of their sepoys feared by some, respected and obyed by all. Now-a-days a Colonel in command of a regiment has little or no power neither is he burdened with much responsibility The sepoy appeals from him to a court martial, to the General of division, to the Commander-in-Chief, and such appeals are not very unfrequently successful. The loss of power hereby entailed on the military authorities in sight, is not compensated by the uncertain action of a scantily informed Board of Chief, at an invisible distance. The influence of the other regimental officers must be impaired in proportion. This is one of the causes of that unruly spirit, which has so much increased of late among the native army.

2. In olden times, officers joined their regiments for life. They entered young, and stuck by their sepoys, grew old among them, and obtained a familiar knowledge, inconceivable almost to people of the present generation, of every thing that concerned their men. They were not overburdened, it is added, with religions principle, had of Christianity little more than the name, and many of them being attached to native women, were almost naturalized among their sepoys by a perfect knowledge of their language, a half-heathen sort of religion, and, Europe and home being well nigh forgotten, by a great similarity of sentiment and principle.

Now-a-days the connection of the regimental officer with his sepoys is very loose. The young Ensign lands with letters of recommendation in his pocket, if he can obtain them through relatives and friends, on which he rests his hopes of exchanging ill-paid and uninteresting garrison duties for staff employment, or some civil appointment, yielding higher salary and honor, and affording greater opportunity for distinguishing himself. He stays with his regiment until he has qualified himself for examination in one or two languages, or until, by interest or favour, he obtains some coverted berth. His heart and mind are away from the regiment, even during the time of his bodily presence, and when he takes leave at last, it is with the earnest wish to stay away as long as possible

3. But there are general causes, good and hopeful in themselves, which act unfavorably on the ancient sympathies between the sepoy and his European officers. Religion–true, personal, practical religion has, (--who will deny it?–) made great progress among the Christian residents in India In every part of India, and in all professions, men are to be found, who honor to the name of Christ The establishment of Bishopries, the multiplication of chaplains, the growing strength of Christian missions, have, under the blessing of the divine Head of the church, contributed much to raise the religious, and still more to raise the outwardly moral character of the European community. Licentiousness and drunkenness are now as much proscribed, as in days of old, they were tolerated, yea encouraged.

> "The steady increase of matrimonial habits among military men, the greater facilities now afforded for revisiting home, the constant, and lively and close interchange, not of letters only but of mind and spirit between all parts of India, and between India and England, kept up by steam, by the rail and by the telegraph, and the spirit of European ascendancy peculiar to the second generation of this nineteenth centrury, all tend insensibly, but surely, to Europeanize and Christianize the sepoy officer, and to deprive him more and more of the ancient leaning towards native ways native customs, and native religions."

4. The absenteeism of officers has been noted by many well infromed men, as one of the main sources of mischief in the management of the native army. It has been justly said, that officers cannot have influence upon their men without familiar and constant intercourse, and sepoys cannot be expected to esteem, to love, or to fear officers, of whom they see little, and know less. The paucity of officers present with a number of the mutinous regiments, has been pointed to as an ominous circumstance. The folloing tabular statement was given in the *Friend of India* of May 28th, shewing the number of officers present with each of the revolted regiments at the time when they mutinied :–

Regts.	Commanding Officer.	Captian.	Lieut.	Cornet or Ensign.
3rd Cavalry ..	1	6	7	none.
9th N. I	1	2	5	3
11th ditto	1	2	8	2
19th ditto	1	4	7	1
20th ditto	1	3	6	3
34th ditto	1	2	8	1
38th ditto	1	2	3	3
45th ditto	1	4	6	3
54th ditto	1	4	6	3
57th ditto	1	2	6	2
74th ditto	1	3	6	2
Total	11	34	68	23

We have, that journal remarked, eleven regiments, belonging to the regular Bengal army, with a complement of 251 officers, excluding medical men, and out of that number, but 136, or little more than half, were present with their respective corps at the time when their aid was most needed. 17 per cent. of the number are ensigns, and eighty officers, or 30 per cent. of the entire number, bearing commissions, are in civil employ or holding detached stations on the staff!

5. The evils of the seniority system have also been pointed out as collateral causes of the revolt, productive of inefficiency in the highest posts of military administration, and mischievous among the native portion of the army, through the constant cheek laid by it upon every impulse of military ambition, and the inevitable inefficency of superannuated men, filling stations of great importance and responsibility, thus forming an isolating dead weight rather than a living conductor between the European officer and the sepoy.

There is no doubt, that all the causes here enumerated, have conduced to diminish the hold, which European officers ought to have, and which in former days they had, in a greater measure than now, upon the minds of their sepoys, but they do not explain the Bengal mutiny. The system of centralization has been equally dominant and rampant in all the presidencies. Staff employment and civil employments have been sought after, as eagerly by the Bombay and the Madras officers, as by their breathren in Bengal. The influences tending to un-Hinduize, to Europeanize and Christianize, the British officer have been as strong, if not stronger, in the western and southern presidenceis, as in the northern. Regimental absenteeism, and the principle of seniority have prevailed all over India, for years, in the same degree. It must be confessed too, that the comparatively young General Anson has been of as little service to India as General Hewitt, and that Bengal regiments have mutinied, whether they had many European officers with them or few. Remembering the infamous 6th regiments B. N. I., who first mutinied, then feigned loyalty, and begged to be led agaist Delhi; first swore eternal fidelity to their officers, hugging them with tears, and then in the evening shot twenty of them dead at the Messhouse at Allahabad, we rather rejoice in the number of British officers saved by their happy absence from the treacherous and cruel fangs of the Bengalis.

One great, fatal defect, for which the home authorities, and they alone, are responsible, has prevailed to a greater and more inexcusable extent in Bengal and the north, than in Bombay and Madras,--the paucity of European regiments, which has, in spite of the streneous representations and strong remonstrances of Lord Dalhousie, in spite of the energetic

applications of General Anson, and in spite of the equally decided demands of Lord Canning, been permitted to increase with the increase of territory, through the annexation of three large provinces, Pegu, Nagpore and Oude.

A fortnight after the outbreak of the mutiny, the subjoined article appeared in the *Friend of India,* which has never been contradicted :

"The following statement of the means of defence provided for India, and our new possessions to the eastward of the Bay of Bengal, will show how little danger has been apprehended from internal foes or outward aggression during the last thirty months We quote the various stations of importance and the numbers of the regiments in garrison –

	1854	1855	1856
Agra............	8th foot	Ditto	3rd Europeans.
Allahabad	None	None	6th Dragoons
Burmah . . .	29th, 10th 2nd European	Ditto Ditto	Ditto. 35th
Calcutta . ... Chinsurah	35th and 98th	35th and 3rd Europeans	53rd
Cawnpore	None	None	1st Europeans
Dugshaie	53rd	Ditto	1st ditto
Dinapore	3rd Europeans	None	50th.
Ferozepore	70th	Ditto	61st
Jullander	60th	Ditto	8th
Kussowlie......	32th	Ditto	75th.
Lahore	10th	10th and 81st	81st
Lucknow	None	None	32nd.
Meerut	14th Dragoons 81st	52nd Europeans	60th
Nowshera	None	None	27th
Peshawur	75th	87th	Ditto and 70th
Proc. Home ...	22nd and 96th	None	None.
Rawul Pindee .	87th	75th	24th.
Sealkote	24th and 27th	27th	None
Subathoo	52nd	None	2nd Europeans
Umballah . . .	9th Lancers	Ditto	Ditto
Wuzeerabad...	61st	Ditto	None
Total, Cavalry...	2	1	2
Infantry ...	21	18	18

From the above it will be seen that in December, 1854, before the annexation of Oude took place, we had three more European regiments than we have now. Of the English troops serving in this country, it is considered, that seven always should be stationed in the Punjab, two in Burmah, one at Calcutta, one at Dinapore, one at Agra, and one at Meerut This leaves a balance of five regiments; but some of these are in absolute need of their customary rest in the hills, so that our whole moveable force is actually reduced, to say–three regiments."

On the day subsequent to the publication of the above, Lord Canning himself observed in a despatch to the Home Government, which, however, failed to make an impression at the time upon the statesmen at home :

> "We confidently affirm, that the Government will be much stronger in respect of all important internal and external purposes, with three additional European regiments of the established strength, than it would be by employing six native regiments of the established strength. At present the relative strength of European to native infantry in the Company's Bengal army is disproportionately small. In the Bombay army it is as 1 to $9\frac{2}{3}$, and in the Madras army as 1 to $16\frac{2}{3}$, while in the Bengal army, it is as 1 to $24\frac{2}{3}$."

It may safely be affirmed, that, had Oude been held by five European regiments instead of one; had Allahabad and Cawnpore had each two European regiments instead of one; had Agra and Meerut been stronger by one regiment of Europeans each; and had Delhi had a garrison of two European regiments; that is, had the north of India been held by thirty British regiments instead of twenty, there would have been no crisis of 1857, and there would have been no mutiny of the Bengal army, perhaps, for ever

It has pleased the far-sighted wisdom of God, and the shortsighted folly of mortals, that it should be otherwise. The Bengal army has broken out into a revolt, which has succeeded, not in overturning the power of the British Government, but in destroying its own existence For the doom of that treacherous, proud, covetous, and murderous brood will be sealed, when once the true character and the real causes of the Bengal mutiny are rightly apprehended by the people and the rulers of Great Britain.

It is one thing to know, with certainty, a powerful drug or skilful operation, by which a dangerous disease might have been prevented altogether, or indefinitely retarded. It is another thing to understand the nature of the disease itself, and to penetrate by a correct interpretation of its symptoms to the root of the distemper. In the one case, you will provide the drug or keep the knife in readiness; in the other, you may succeed in stopping the source of the malady, and in establishing health which needs no physician.

It remains before we proceed further, to examine the correctness of an opinion which seems to gain strength with Indian journalists and others : an esoteric political character is assigned to the revolt. Notwithstanding the deserved estimation of many of its advocates, the number of undeniable facts which seem to favor it, and its general plausibility, we do not hold it, for reasons which we shall explain in the sequel.

At the meeting of the British Indian Association of the 25th July last, adverted to above, Rajah Ishara Chandra Singh, the seconder of Baboo Dakhinaranjan Mukerjee, said :

"the cause of the present rebellion is still deeper, and we every day see new causes ascribed, and persons, who can put pen to paper, come forward with a new theory of their own, yet, I believe, the principal cause still remains as much hidden as before It is to be hoped, that ere long a strict investigation may be held, and that the traitors, who have inflamed a seditious spirit, and converted the hitherto faithful and honest sepoys into a set of murderers of the blackest dye, may be brought to the punishment they so richly deserve

"Popular belief points to the emissaries of defunct dynasties, as the men who have fanned the seditious flame, and who had the presumption to hope, and the daring villany to scheme, the overthrow of the British Government in Hindustan, a government, whose mission it is to repair defects, that ages of tyranny and oppression, under the Mohammedan rule, have engendered in this unfortunate land, and to teach its sons to resume their place among free and enlightened nations of the earth. Those wicked emissaries, taking advantage of the supposed wrongs of sepoys, wrought so successfully upon their ignorant and untutored minds, as to incite them to deeds, of which the devil himself would be ashamed. Every one of them, who have disgraced the name of soldiers, and who by their unheard-of cruelties have brought themselves on a par with the beasts of prey, should be punished with the utmost rigor of the law, so as to deter others from the like offences against the state. As for the instigators, such examples should be made of them, that their very names may be hateful to generations yet unborn."

Hints similar to these contained in Rajah Ishara Chandra Singh's adress have been thrown out of late in several Indian Newspapers, with considerable assurance.

Dr Duff, a name great on all Indian matters, in a paper published through the *British Standard*, July 31st, has put forward this view of the essentially political character of the mutiny very ably and eloquently. He compares the Vellore mutiny of 1806, and the Bengal mutiny of 1857, and points out an almost perfect parallelism in the leading characteristics of the two sepoy outbreaks, divided though they be by the interval of half a century

"What was the real originating cause of an explosion so disastrous?" Dr. Duff asks "The searching scrutiny which followed," he replies, "left no room to doubt, that the primary moving cause was of an essentially political character, while the supposed violation of a sacred religious usage was merely seized on as a plausible pretext by designing intriguers who were inimical to British away. And who were these? By the clearest and most cogent evidence it was proved, that these were none other than the Mohammedan princes of the recently extinguished dynasty of Mysore, the sons of Tippoo Sultan, who fell in the storming of Seringapatam. Royally accommodated in the fortress of Vellore, and replenished with princely revenues, they repaid the debt of gratitude by hatching dark conspiracies against the power that spared, and the hand that so bounteously fed them. Their hired emissaries, under every variety of caste, and character and

costume, swarmed in all directions, armed with the means of bribery and corruption. And these means were employed at once with oriental adroitness and Punic unscrupulonecss. Working on the natural attachment of Mohammedan soldiers to rulers of their own faith, acting on the natural prejudices and bigotry of the Hindu, appealing to the covetousness of the human heart by large promises of pecuniary aggrandizement, and playing, by turns, on the ignorance, and alldevouring credulity of all, they succeeded in inspiring them with vague and indefinite fears for their own religion, on the one hand, and with vague and indefinite hopes of promotion and prosperity under a restored native dynasty on the other The alleged purpose of the British Government to destroy their ancestral faith, and compel them to embrace the hated creed of their European conquerors, was the principal stalking horse of the cunning intriguers; but the destruction of the British power and the re-establishment of a Mohammedan despotism instead was their real object. There were thus, at the outset, the crafty deceivers, and the simple deceived–the dupers and the duped. The originators of the anti-turban agitation, for the accomplishment of their own dark designs, assiduously propagated what they knew to be an infamous lie, the silly victims of the agitation were cozened to believe the artfully contrived lie for a truth; though, doubtless, in the onward progress of events, many of the subordinates became principals, many of the misled misleaders, many of the deceived deceivers themselves.

"And are not some of the leading circumstances of the recent disaffection and wide-spread mutiny precisely parallel ?"

We beg to differ, and shall point out the essential difference of the two mutinies as we proceed.

A purely or primarily political character of the mutiny *seems* indeed to be clearly enough indicated by broad facts patent to the world. In the south-eastern quarter of the field of the revolt, there is the deposed king of Oude, who was taken prisoner at Garden Reach on the morning of the 15th of June, and is still kept in closest confinement within the walls of Fort william. His seizure had been ordered upon the discovery of his ex-majesty's being in league with the rebel sepoys–a discovery fully proved by the interception of important correspondence. A brother of the king was imprisoned by Sir Henry Lawrence at Lucknow, as soon as the Oude revolt had fully broken out. It is evident, then, that Sir Henry Lawrence was cognizant of that person's implication in the mutiny. The Delhi Mogul family have headed the mutiny during more than four months; two of the princes have been shot after the capture of the city, and the old king is a prisoner, awaiting–we trust–his sentence of death. "The king of Delhi" has been the cry of the mutineers in many places; numerous printed proclamations have been dispersed over the north of India in his name. Nana sahib, Kooer (Kumar or Kuver?) Sing of Arrah, the insurgent chiefs of Oude, in fact all the minor heads of the revolt, have professed to act under the authority of the house of Timur It *seems* undeniable that, in

the words of Rajah Ishara Chandra Singh, "defunct dynasties" have planned and instigated the revolt, and if so, it seems at least probable, that the Persian Government, against whom war had been declared and commenced in this same year of 1857, has secretly been in league with the phantom king of Delhi And why not look still farther?–that the Persians and especially the Persian prince at Herat, who proved refractory after the conclusion of peace between the Shah and Queen Victoria, had his instructions from Petersburgh, and, finally, that in Petersburgh the hand is to be sought, which has pulled the strings of the great mutiny of 1857?

To a political instead of a purely military source of the revolt, the strange phenomenon of the "migration of cakes" also seems to point, which commenced somewhere in the neighbourhood of Patna and Moorshedabad, and spread in all directions, until in May it reached Nagpore in Central India. A number of common chapatties, little cakes, made of wheat-flour and salt, were brought to heads of villages with the injunction to multiply the quantity ten-fold, to distribute part among their own community, and to send the remainder to neighbouring places with the same injunction. These masonic orders were faithfully obeyed, the cakes multiplied, and the flood became broader and broader until it reached Central India about the time of the outbreak at Meerut, and the establishment of an army of mutineers in Delhi.

All these facts and signs *seem*, in the opinion of good judges, to point to a political, not a military fountain head of the rebellion.

We beg to differ, and should consider it a calamity, if the true character and the true causes of the mutiny remained hid under the specious mask of political intrigue. The mighty foe of British power in India, would remain formidable indeed, if, even after this dreadful explosion, he succeeded in baffling detection. We shall first endeavour to show,–not indeed, that political intrigues have not been largely mixed up with the mutiny, but–that the mutiny is not the effect of political intrigue, not the product of a widely ramified and long matured conspiracy. Having established this fact, we shall then proceed to lay before our readers what we believe to be the true interpretation of the mysterious and horrible tragedy of 1857.

To begin with the last mentioned chapatti migration. The mystery is still as dark as ever. No reasonable explanation has been offered. It has been said that the object was first to distribute the cakes largely–then after a month or two, to make it known, that they had been sent by Government, that they had contained foul substances, intended to pollute and spoil the caste of all who had tasted them, and by this means to rouse the whole population into violent excitement and fiercest hatred of Government;–in short that the cakes were intended to serve among the

population at large as a counterpart to the sepoy's cartridges. But this interpretation is as doubtful as the phenomenon which it undertakes to explain is mysterious. It may have been, for all we know, the effect of some sudden whim of an individual, or a company of idle fellows, who will never be discovered, or may have had the general object of adding to the ferment, which in those days was at work among the masses, before the great storm burst upon Hindustan proper. A similar Phenomenon, the cause and effects of which have remained an unsolved riddle, happened in Central India forty years ago. It is related in Sir John Malcom's "Memoir of Central India," and has been quoted in the *Delhi Gazette* :

> "The war with the Pindarries was then over (1818), and the country was in a state of tolerable tranquillity, when a sudden agitation was produced among the peaceable inhabitants . a number of cocoanuts were passed from village to village, with the direction to speed them to specific destinations (usually to the chief local authority) From Beyond Joypore (north) to the Deccan (south), and from the frontier of Guzerat to the territories of Bhopal, this signal flew with unheard of celerity. The Potail of every village, where the coconuts came, carried them himself with breathless haste to another, to avert the curse which was denounced on all who impeded or stopped them for a moment. No event followed to throw any light on this extraordinary occurrence. Every inquiry was instituted, and persons were set to trace the route of the signal for several hundred miles, but no information was obtained, and a circumstance which for upwards of a month produced a very serious sensation over all Central India, remains to this moment a complete mystery."

The guilt of the ex-king of Oude, and of the pensioner of Delhi, may, probably will, be fully established. Their connection with the mutineers cannot be denied. Documentary evidence will very likely be produced in abundance to prove that both these men and their immediate counsellors have been drawn into the vortex of the mutiny. It is more than probable from the nature of things, that such has been the case. The state of the army must have been well known to these Mohammedan chiefs. The knowledge which was conveyed to them, no doubt, months before the actual outbreak, of a whole army being disposed or determined to mutiny against the Feringhi Government, must have been to them a temptation of extraordinary power. It is certain, that neither of them has given any, the least intimation to the British Government, in order to secure, by timely warnings of a great danger, its lasting gratitude Why should they have done so? Their ignorance was profound enough, to permit them to cherish the hope, that the great sepoy army would prove a match, more than a match for the small unprepared European forces, scattered over an immense country, to imagine that ere succour could arrive from across the seas, a general rising of all the Mohammedans, joined by large numbers of fresh proselytes, foreshown to them in the phantasmagoria of their

heated brains, and by hordes of wild, lawless men ready to start from the ground as soon as the pressure of established Government were taken away, would give speedy and complete victory to the rebellion, and with one fell swoop cut off the whole Feringhi race from India. It ought ever to be kept in mind, that no Mussulman who does not sincerely renounce his religion, can be trusted by infidel rulers. Mohammedanism is more absolutely antagonistic to Christianity, than any other form of Heathenism. (Heathenism it is, essentially; for the God whose prophet is Mohammed, is as false a God as Shiva, or Krishna, Rama or any other idol.) Other forms of Heathenism have long ceased to make conquests. Mohammedanism, like Christianity, lays claim to the mastery of the world, to be conquered by the sword according to the Koran, by the Word according to the gospel. The Christian may, (at least the Protestant Christian,) nay is bound to, live peaceably under any Government, because his master's kingdom is not of this world; the Mussulman may remain quiet as long as he is conscious of his weakness, and his impotency to throw off the yoke of infidels. But when the standard of the prophet of Mecca is raised the soul of every Mohammedan is stirred by the sight to its inmost depths, and at the cry of Din, Din, the Mussulman shakes off the torpor of every day life, and of acquired habits, and rushes forth as the war-horse at the sound of the trumpet and the clank of arms. Exceptions there may be; no doubt, there are; but they are avowedly rare. To place absolute political confidence in Mohammedans is a fatal mistake, which the British Government has had to rue bitterly, and will have to rue bitterly again, if calamities, like these of 1857, have not the effect of rendering them wiser. How could it be otherwise, therefore, than that Mohammedan princes, like the xe-king of Oude and the phantom King of Delhi, should have fallen into the snare of lending themselves to leaders of a fast ripening revolt of so glorious prospects. They have yielded to the temptation to their own ruin. Thus far the mutiny has, of course, a political character. But the idea, that these chiefs of "defunct dynasties," or their nearest relatives, have been the prime movers in the mutiny, the original instigators of the revolt, is refuted by their conduct since the commencement of the supposed success of their machinations. What has the wretched old king, or the men who acted under his name at Delhi, done since May, to entitle them to the honor of first actors in the terrible performance? The whole conduct of operations on their part has been a miserable failure, down to the capture of the city. As for the Oude ex-king, would he have lived at Garden Reach, doing nothing but carrying on intrigues, had he been the real head of the Oude insurrection? Had he schemed the overthrow of the British Government since his deposition, would he have sent his family to England to petition the Queen, to petition and bribe(!) Parliament for his restoration?

The analogy of the Vellore mutiny, on closer examination, appears inapplicable to the Bengal Mutiny. Dr. Duff takes it for certain, that the intrigues of the Mysore Princes were the primary cause of the former. We doubt this much. The subject was a matter of very earnest controversy among persons who were on the spot, who conducted the after inquiries, and Lord W. Bentinck himself seems to have been at a loss to come to a decision. But a second consideration seems to us decisive. When the same military regulations were announced at Hyderabad, they produced similar effects upon the Contingent. A fearful convulsion was evidently threatening there. It might have equalled the horrors of Vellore. There were no Mysore princes at Hyderabad to stir and nurse mutiny. Dr. Duff may tell us :

> "well then, by your showing as well as by mine, the parallelism is complete I contend, in 1806, the Mysore princes were the prime movers in the mutiny business, and I believe that Mohammedan princes have played the same part in 1857. You say, that both parties only took advantage of an existing spirit of mutiny You change, then, the terms, but preserve the parallelism of the two phenomena." We answer : "no; we indeed, believe, that in the Vellore and in the Bengal mutiny, Mohammedan princes have intrigued with mutinous sepoys, but in 1806, the mutiny rose and fell with the "new orders;" it was an acute mutiny; in 1857, the cartridge blunder became irremediable, because the mutiny of the Bengal army has been a chronic disease The two cases are widely different. When in 1806 the obnoxious regulations were withdrawn, their withdrawal was immediately followed by a perfect calm, and by a cheerful return of the sepoys to subordination "

In 1857, when the Government had taken away any possible ground of suspicion, by allowing, for instance, the 19th regiment to grease their own cartridges with ghee purchased by themselves, the mutinous excitement went on as before. No withdrawal of cartridgs, no furnishing of ghee, no proclamations, no harangues had any effect upon the Bengal mutineers. In 1806, after the revocation of the new orders, the mutinous spirit disappeared, and the intrigues of the sons of Tippoo ceased to trouble the British Government. In 1857, all the honest efforts of a temperate and temporizing Government proved useless. The mutiny took it own course. The ex-king of Oude was imprisoned in Calcutta, his brother in Lucknow–without any effect upon the revolted army. At Delhi neither the old king, nor the younger princes, were considered or treated as the real heads of the rebellion. Had they been the instigators, the planners, the prime movers, they would have held a very different position; when their machinations had been crowned with full success, as it must have appeared to all Delhi on the 11th and 12th of May For these reasons we demur to the proposition that the *original and principal cause* of the Bengal mutiny was political intrigues on the part of fallen Moslem princes. Much less reason do we see to charge the revolt on the secret

hatred of Russia, and the clandestine activity of Russian agents. It would be very unjust to charge a policy as profound and wily as the Czar's with the concoction and direction of a revolt which has distinguished itself as much by its utter want of management, of combination of plans, of harmonious action, of statesmanship, as by its unutterable atrocities, villanies and beastly excesses. Moreover had Russia meant harm to British India, how easily could Russian diplomacy and gold have prevented the timely ratification of the treaty of peace by the Shah of Persia,–a move of exquisite insidiousness, which would have well nigh checkmated the British Government. At the risk of appearing paradoxical, we confess that we are strongly inclined to doubt, whether the mutiny has been the result of a common conspiracy, ramified through the whole Bengal army, and slowly matured by some secret council of plotting Brahmans, Rajputs and Mussulmans. Our reasons are these : 1. A conspiracy of this sort could not, we conceive, have escaped the knowledge of military officers and of civilians, for they were not all asleep, in some parts of the wide field, over which the meshes of the net must have been tied by a slow process of years. 2. Such a revolt committee would have taken the lead from the time of out break. 3. A regular conspiracy would have taken good care to form affiliated clubs in the Bombay and the Madras armies before instead of dispersing emissarries after the commencement of active operations. In the West and South, such emissaries have been caught, but only long after the beginning of the mutiny, and most of them have been men of disbanded or revolted regiments. To sum up the argument of the preceding pages, then,–

The mutiny of 1857, *a revolt of the Bengal army,* has its *primary cause,* neither in religious jealousy and fears, excited in the Bengal sepoys by donations of Lord Canning to missionary institutions, nor by the over-zeal of laymen in the East India Campany's service, nor by the rapid progress of Bengal missions,–nor in the faults of an excessively centralizing system of military administration, and the gradual estrangement of the sepoy from his staff-office-or-civil-appointment-loving, more and more Europeanized officer–nor in the paucity of European regiments in India, nor in policital intrigues carried on by "defunct dynasties" of India, nor by a powerful and inimical European court, nor in conspiracy, taking the word in its usual sense. Neither any one of these causes, nor all of them taken together, appear to us to furnish an adequate explanation of the character of the Bengal mutiny.

We hope to have succeeded in convincing unbiassed readers of the correctness of the negative side of our view, and now proceed to–what appears to us–the correct interpretation of the lamentable events of the season of woe which, we trust, has now come to a close.

1. *The Primary cause of the Bengal mutiny has been the utter want of discipline, and the spirit of insubordination inseparable from the Brahmanic caste system upheld in the Bengal army.*

Military subordination is utterly incompatible with a system of caste, recognized or connived at in an army of mercenaries, officered by foreigners. Honorary distinctions of any kind between the privates of regiments, who must be treated alike by military superiors, are repugnant to the military system. When privates distinguish themselves, they are, in all armies of a helathy costitution, promoted. But the honorary distinctions of caste are of a peculiar kind. The Brahman sepoy is to his comrades, not merely a person of noble birth, but a superior being altogether, surrounded by the glory of priesthood, yea the halo of divinity. His blessing is invoked, his curse is dreaded as the greatest of afflictions His feet are worshipped. His whole person adored as an incarnation of Brahma. All sepoys of lower caste stand to their Brahman comrades in the relation of humblest fags, ever ready to listen, to obey, to serve to propitiate. As to native officers of lower caste, in command of Brahman sepoys, they are in a most embarrassing situation How can they be strict towards men, at whose feet they have to prostrate themselves? How can they dare to thwart the views, the wishes, the whims of those, whose word may consign them to hell? How punish the "Gods of the earth?" How then, are native officers to uphold discipline, when they are held in spiritual subjection by a large number of the men under their commnand"

But how stands the matter of subordination between the European officer and the sepoys as a body? The Brahmanic system, to the essence of which the doctrine of caste belongs, assigns to the British officer a rank below the lowest sepoys, below the lowest native lascar, below the sweeper and the most abject menial. His touch, his breath, yea, his shadow pollutes the brahmanic sanctity of the men, over whom he holds an official superiority, derived from the will of the Government, who feeds and rules the army. Between the British officers and the Hindu regiments, a gulf is fixed, which can never be filled up, which can never be bridged over, by any official connection, familiarity of intercourse, community of dangers, fellowship, on the field of battle or by any act of kindness, friendship love on the part of the European commanders.

Add to the above, that the Brahmans are a naturally superior race, who have achieved triumphs two thousand years ago over the spirit of the majority of the different peoples of India, greater than the victory of the Roman priesthood over the wild nations, by which Europe was over-run after the fall of the Roman empire; Who have held the real sovereignty of India amidst all changes of Hindu and Moslem dynasties for nearly two thousand years, and who are inspired with the proudest spirit of caste, in which the power of clanship, of hierarchical fraternity, and of political association are indissolubly united and fully conscious of their hereditary

superiority,–and you will perceive at once, that military discipline and subordination cannot exist in reality among an army thus constituted and thus commanded. Nor should we lose sight of the improtant fact, that the whole army is one of mercenary slodiers, paid by the rulers of the country, to serve foreign intersets, and sprung from among races subjugated and held in subjection by the sword. If Queen Victoria engaged in the attempt of governing Ireland by the help of a Romish native army, swarming with Jesuits, and officered by protestants, she would be in a situation somewhat similar to that of the East India Company, relying on a Brahmanic Bengal army for the security and stability of their empire.

There is a considerable admixture of Mussulmans in the Indian armies. But this ingredient does not sweeten the cup for the British Government. The hereditary innate hatred of the Mohammedan against infidels, is a complete set-off against the Brahmanic abhorrence of the vile stranger. The spirit on caste also is much of the same character and strength among Indian Mohammedans, as among other natives of Hindustan, who have accepted the Goorooship of the Brahmans.

In the Bengal army the preponderance of the Brahmanic element has exceeded all reasonable limits, while it has prevailed much less in the Bombay army and still less in that of Madras, as will be seen from the following statistics, which are partly taken from Dr. Wilson's admirable discourse, quoted above. Mr. P. Melville, secretary to the military department of the East India Company, in his evidence before the House of Lords, on the 23rd November, 1852, gave the following comparative statement of castes in the regular native infantry of Bengal–Christians (drummers and fifers) 1,118; Brahmans 26,983; Rajputs 27,335; Hindus of an inferior description 15,761. Mohammedans 12,699; Seikhs 50. Total 83,946. These men were almost all from the Upper-provinces, (and particularly the Oude territories) popularly known in India as "Hindustan."

> "About half the Bombay army,–according to the decennial tables of Colunel Jameson,–was in 1851, of the same material from the Upper-provinces, of an average of 16,653 for each of the ten preceding years, out of a strength of 33,145 The number is now, I believe, somewhat reduced."

The Madras army–on a rough guess–has the following proportions of classes :–

Christians	1,100
Mussulmans	15,500
Brahmans and Rajputs	1,800
Maharattas	1,300
Telugu	14,000
Tamil	3,500
Other inferior classes	5,000

The Brahmanic element is lowest in this branch of the Indian army, the number of Mussulman sepoys exceeds the strength of the Mussulman force in the Bengal army. The Madras army, with the exception of one Mussulman cavalry regiment, has remained, if not perfectly loyal, at least perfectly tranquil. This corroborates, we believe, our general view of the Bengal mutiny as to its essentially Brahmanic character. There is no mutiny where Brahmanism does not prevail, let the number of Mussalmans be ever so large.

We shall now produce our witnesses, few, but of unimpeachable intelligence, knowledge, and character, who describe the state of the Bengal army exactly in accordance with the main principle which we have laid down, viz., that the caste system and caste spirit are absolutely incompatible with the maintenance of military discipline.

Our first witness is Major General H.T. Tucker, for many years adjutant-general of the Bengal army, who retired from active service in the beginning of last year. He wrote a letter to the *Times* on the 19th of last July, on the subject of the Bengal mutiny. His letter is an extremely valuable document, as it gives the views of one of the most talented and most experienced superior officers on the Bengal establishment, whose impartiality and perfect knowledge of the army, in which he has spent the greater part of his life, no one will venture to call in question. It is very singular, and a strong proof of the guileless truthfulness of the old soldier, that, after stating the purpose of his communication to be "the exoneration from the charge of supineness of the executive, now carrying out the details of our Government in the east," he proves the correctness in the main of this very charge, with this modification only, that he shews the blame to rest equally on the men of past generations, and on the whole system of military administration pursued in India, and especially in Bengal, during the last forty years.

We must give the valuable testimony of Major General Tucker almost entire. It contains the fullest confirmation of our own views :—

> "Sir—at the time, when the whole country is speculating as to the real causes of the mutiny in Bengal, and while in Parliament, and by the *Times* it seems to be assumed, that our civilians and officers in India have been deceived, blinded and taken by surprise, it becomes a simple act of justice to offer a few brief words of explanation, such as, I trust, will produce conviction, and exonerate from the charge of supineness, the executive, now carrying out the civil and military details of our Government in the east.
>
> "It seems quite to be overlooked, that insubordinate and mutinous tendencies in the native army, are not in reality so novel and strange to us as many suppose, for we have been at any time during the last forty years on the very verge of internal convulsion as strong, fierce, and formidable as the present, and in the success alone of this mutiny is to be perceived

the difference between the former, and the more recent desire displayed for the overthrow of our rule. Let me in proof of this advert to some of the better known attempts in which this feeling has been plainly shewn

"In 1824, we had the Barrackpore mutiny On that occasion a vigor and energy was displayed, which has since been characterized as harsh and bloody. I believe, it was simply necessary . but I have no intention to enter, at this time, into any argument in reference to it The next symptoms of uneasy feeling, following closely on the other, were in 1825 to 1826, when, if we had failed in taking Bhurtpore,—as was fully anticipated by the natives generally,—our rule and supremacy would have received a severe shock, and the fidelity of the sepoys was, in that event, thought by many to be most questionable.

"The fear and anxiety with which the tidings from Bhurtpore were looked for by many officers of rank of that day I can well remember. and one of my oldest and most intimate friends, now holding an important command in India, years ago detailed to me the confession, subsequently make to him, of a conspirarcy shared in by his regiment generally to murder all the European officers of the corps, excepting, I think, two, who were special favorites; and if the celebrated fortress I have adverted to, had not fallen, if reverse and conspiracy had in those days overtaken us, may we not reasonably conclude, that scenes similar to those which now harrow us, would then, in like manner, have occurred?

"For one, I am fully impressed with the conviction, that for very many years, we have been subject this explosion Upon chance of circumstances alone depended the how, when, and where.

"To proceed, we had not many years ago the Scinde mutiny— a very formidable business. We had other less important indications of insubordination and ill will, and more recently, did not Sir Charles Napier energetically contend, that forty thousand sepoys in the Punjab were, to a man, ripe for revolt? There was not tangible or precise proof of it, but that the feeling was there, that a favorable opportunity would at once have evolved it, many besides Sir Charles confidently believed, and I assert, that it is upon such a mine, liable at any convenient moment to explode, we have all along been resting. It may be contended, that this being so, it was the duty of those entertaining the opinion boldly to proclaim aloud their conviction, and to advocate a change but I presume to dispute the correctness of any such assumption

"In Sir Charles Napier's case, the very existence of such a feeling among the sepoys was authoritatively contradicted by the Governor General, Lord Dalhousie, and it must be admitted, that his Lordship had no proofs before him to warrant, as he thought, Sir Charles's statement, or even to enable him fairly to draw any such inference. By a happy combination of circumstances, the mutiny, at that time, of the 66th regiment, was rendered harmless: and it was, doubtless, not considered politic to admit that the sepoy was so tainted, as to be ripe for the wholesale revolt Sir Charles with an intuitive and just perception has so wonderfully divined.

"I believe firmly, that he was right in his judgment, but, as I have said, there was no precise evidence, and thus things have gone on until now. Fifteen months ago, when I relinquished the post of Adjutant-General of the Bengal army, the most entire calm existed; the repose and apparent contentment of the sepoys were perfect; from Peshawar to Calcutta all was perfectly quiet; but the truth is, that even then one little cloud, the fore-runner of many others, was appearing in the horizon. General Anson anxiously desired to invovate His predecessor has been harshly charged with supineness and lethargic apathy, his own, he designed, should be a reign of a very different description, and he attempted to commence it with a curtailment of the leave of furlough, annually granted to the sepoys—a very hasty and injudicious beginning, and apparently so considered by more than myself, for it was then negatived, though I have since heard that at a later period it was successfully advocated

. . ."General Anson left the plains and went up to Simla without making any preparation for the coming struggle, even although he had himself addressed the Government, representing that the sepoys at Umballa, and in other places, were mutinous and disaffected.... ..

"Much has been said to the effect, that hog's lard and cartridges have had nothing to do with the mutiny My own conviction is, that this piece of culpable negligence was as the lighted match to a magazine of powder. The natives generally, and the native army in particular, have been recently strongly impressed, however they came by it—with the idea, that it was intended to subvert their religion, and to make the army converts to Christianity. With this idea prevailing, the discovery that impure matter was mixed up wholesale for the lubrication of cartridges would at once and naturally be pointed to as a conclusive proof of the design of the Government to rob them of their caste, as a preparatory measure; and I do not think there can be the least doubt, that in this sense the discovery was accepted and confirmed to their minds by the omission of any direct explanation on the part of the state, in reference—as they considered it—to the pollution prepared for them.*

"The recent legislation, so comparatively rapid on questions intimately connected with the feelings, and the religion of the natives, together with the wholesale changes introduced into the system of native education in Bengal, with the imprudent and injudicious conduct of certain weak and foolish bigots among us, [read · zealous Christians] have been amply sufficient to dispose the sepoys for the reception of the strongest impressions adverse to our rule The priestly and religious feeling is, next to their notorious vice of covetous avarice, the dominating principle among the sepoys; in fact, in almost every regiment the Brahmanical influence, a very subtle one, has been for years and years dangerously great, though I

On this last point the General's strictures apply to the first time of the commencement of uneasiness among the sepoys only. The first and best season for the clearing up of misunderstandings was missed. But soon after there was no want of explanations, concessions, harangues and proclamation.

assert confidently, that the present generation of officers are not responsible for this vicious system;—they found it, and have had to make the best of it. To have declared too openly against it would simply have been to produce, perhaps, just such a convulsion as, from other causes, has now so miserably overtaken us, while the gradual bit-by-bit attempts to neutralize the strength of the high caste sepoy regulars, have failed of their anticipated effects through insufficiency, and the vice of the system. In a word, to retrace our steps was thought to be as dangerous to us, as to proceed, and many of those best acquainted with the hollowness of our position were thus kept in a state of vacillation, doubting whether the danger would not be greater in sounding the alarm, than in trusting hopefully to providence. That this reasoning was weak, is apparent, but it would have required far more moral courage than most of us are blessed with, to dare the reproaches and the consequences of a sufficiently strong denunciation. Moreover, it would have been not only dangerous to take that course, but ineffectual, for in high places and in low, everywhere, in short, our supposed interests, our fears, and our wishes were arrayed in support of the existing state of things.

"But *now*, now we have the opportunity. The credulous, the weak, and the timid, must all see that pretorian mercenaries are untrustworthy, and that if we are to preserve our Indian empire, we must exercise for the future a far sterner control and authority."

This is the substance of the valuable testimony of Major General Tucker. He points distinctly enough to the truth that military discipline, that subordination and loyalty, cannot be expected of an army of high caste merecenaries, unduly large and uncontrollable by the small number of European troops located in the country. Yet he appears reluctant to lay his finger on the cancerous sore, and to declare boldly, this, this is the real, the primary source of all the ruin, which has overtaken our Indian empire.

It would be a very curious, a painfully interesting inquiry to search out the gradual growth of the high caste ascendancy in the Indo British army, from the catastrophe of the Black Hole to the infinitely more horrible, soul-harrowing catastrophes of Meerut, Delhi and Cawnpore. The principle of the progress of Brahmanical influence in the Indian army, is patent enough. No mere worldly statesmanship is equal to the task of effectually resisting the encroachments of a hierarchy, claiming divine right, after, it has once obtained a status in the body politic. Mere worldly statesmanship is as unable to cope with the Brahmanic, as with the Romish hierarchy. War or servitude is the only choice. "Touch not, handle not!" the only safe principle. If you bend, you will break. Begin with bowing in compliment, and you will have to end with prostrating yourself in adoration. General Job Briggs, in his "India and England compared" (p. 49, 50) says :—

"The native army is made up almost entirely of Hindus and

Mohammedans, while a prejudice among these castes, in which the officers and Government partake, exists against the aboriginal races. Now it so happens, that in the wars of Lawrence, Clive and Coote, in the Carnatic, the aborigines constituted by far the great majority of the sepoys. It was they who opposed Hyder Ally, the ruler of Mysore, and who gained the battle of Plassey, in Bengal, before a Bengal army existed. It was they (the Parwaries of the Bombay army) who, in the siege of Mangalore, together with the 2nd battalion of the 47th Highlanders, under Colonel Campbell, defended that fortress for six months against a besieging army of forty thousand men, and consented to honorable terms of surrender, only when on the point of starvation, having buried within its walls more than half its numbers. The Bhengis of this race, the aborigines of Bengal, constituted a portion of the infantry of the Mogul armies, and it is a fact not generally known, though nevertheless true, that they claimed the honour, as the *indigenes* of the soil, to form the forlorn hope and the storming parties in all its desperate service"

There can be no doubt, then, that Brahmanism, while it gradually monopolized, under the Company's regime—political influence, has slowly, but surely, filled the ranks of the army with members of its military order, its adherents, and its dependents. The caste system has ruined the army, and had well nigh ruined the British Government and India, whose future regeneration is bound up in the prosperity of British rule.

The enlisting regulations in Bengal, as published in the *Bombay Times*, have the following paragraph :— "Especial care must be taken to reject all men of interior castes, such as petty shopkeepers, writers, barbers, oilmen, shepherds, thatchers, pawnsellers, gram-parchers, porters, palkee-bearers, sweet-meat-makers, gardeners and vegetable dealers, and any others habitually employed in menial occupations."

The editor of the *Bombay Times* contrasts with these fastidiously ellectic rules, which sound rather like a translation of some military statutes belonging to a generation or two after the establishment of the law of Manu, and to the Government of some Brahman-inspired ancient Kshatriya king, than an exposition of the principles, on which an European—not to say a Christian—power of the nineteenth century, would think of forming its native Indian army,—the short, simple and rational directions given for the Bombay army : "We receive all but those addicted to theft, drunkenness, or other destructive vices;" and goes on to say : "now, many of the very best men in the Bombay army are of these proscribed castes, and there is no reason whatever for their rejection in Bengal, but the fact, that the Brahman gentlemen of the ranks would *mutiny*, if it were attempted to enlist them. From a return now before us we gather, that the composition of a Bengal regiment in general is as follows :—

350 Brahmans	150 Mussulmans
350 Rajpoots	150 Hindus of good caste *

"An army so composed could not but be a standing menace to the state, and its dissolution an object of the first importance to the stability of our rule in India. Between the first three of these denominations, a thousand ties and sympathies exist, as the dominant races of the country for a thousand years; and to what extent a combination may be successfully achieved by them, we see to-day in the all but general rebellion which has broken out. A commission from home would know how to deal at once with a system such as this, and in connection with it would have to be remedied the evils of our staff, and brigading-systems, promotion by seniority, and a half dozen other peculiarities, some fatal, and all detrimental to the maintenance of any just discipline in the army

"That Sir Charles Napier held and expressed the very same views on the condition of the Bengal army, is notorious When he spoke out, Lord Dalhouse contradicted him publicly and officially, but Major General Tucker hints in his letter of the 19th July, that the denial was rather politic than conscientious. It is equally well-known, that Sir Charles Napier's views were shared in secret by most officers of experience and sound discretion. Messrs. V Smith R. Mangles, and men of their stamp in Parliament, succeeded in ferreting out some written declarations of the same Sir Charles affirmative of the excellency and trustworthiness of the Bengal army, and in neutralizing by their production the effect of his testimony to a truth known in all India, as if a man of genius, eccentric and passionate, like Sir Charles, could never contradict himself without being put out of court,—a pitiful attempt to hide for a few weeks ugly truths, of which they were cognizant themselves, from the eyes of Parliament, and of honest credulous John Bull, who does not like to call his representatives liars. Yet certainly the falsehoods contained in parliamentary debates, transmitted to India, mail after mail, are so many, and so glaring, that old Johnson, had he had to read them, would have emitted long and deep growls 'they lie, Sir, and know that they are lying "

Brigadier General John Jacob, one of the bravest and ablest officers of the Indian army, published in 1851 :

"a few remarks on the Bengal army and furlough regulations, with-a veiw to their improvement, by a Bombay officer"

---

* Compare with this aristocratic scheme the list of the Madras Regiment N I, which happens to be nearest to the writer of these pages :—

	Native Off.	Havildars	Naigues	Privates
Christians	1	1	1	19
Mussulmans	9	23	20	264
Brahmans or Rajpoots	1	2	3	29
Mahrattas	3	1	1	21
Telingas	3	12	16	246
Tamils	3	10	7	49
Other inferior classes	0	2	2	57

(of this last description, fifteen more men are sought for enlistment at present.)

—for which, if we remember aright, he was severely reprimanded by the highest authorities. The calamitous events of this year have given a melancholy testimony to the truth of his views. The pamphlet, which has been reprinted by Messrs. Smith, Taylor and Co., should be read by all who desire to obtain a more than superficial knowledge of Indian military affairs. We extract a few passages corroborative of our veiw .

> "The effect of enlisting men of a certain caste or creed, to the exclusion of others, in the Indian army, is to subject that army to the control—not of the Government, and of the articles of war, but to that of Brahmans and Goseins, Moollahs and Fukheers. The consequences are ruinous to discipline By reason of this evil, a native soldier in Bengal is far more afraid of an offence against caste, than of an offence against the articles of war, and by this means a degree of power rests with the native soldier, which is entirely incompatible with all healthy rule Treachery, mutiny, villany of all kinds, may be carried on among the private soldiers, unknown to their officers, to any extent, where the men are of one caste of Hindus, and where the rules of caste are more regarded, than those of military discipline. To such an extent does this evil exist, that I have known a Bengal commanding officer express his regret at being compelled to discharge an excellent sepoy, because the other men had discovered him to be of an inferior caste, and had demanded his dismissal. In conjunction with the system of promotion which prevails, this attention to caste keeps all real power in the hands of the private soldiers The Bengal sepoys have contrived to have it believed, that their religion is concerned in this business of caste, but this is contrary to truth. This is positively proved by that which takes place in the army of Bombay, wherein hundreds and thousands of men from Hindustan, from the same villages, of the same caste, and even of the same families, brothers by the same fathers and mothers, as the fine gentlemen of the Bengal army, are seen in the ranks, shoulder to shoulder, nay, even sleeping in the same tent with the Mahratta, the Dher, and the Parwarne, without scruple or thought of objection. The Bombay sepoy looks on the European soldier as his model in all things pertaining to soldiership. and endeavours to imitate him; like the European soldier, the native sepoy of Bombay will turn his hand to any labour which he has been ordered to execute. If the lines require cleaning, &c, &c., a working party is ordered out as a matter of course, with pickaxe and powrah, and the work is well done The technical term "working party" is as familiar in the mouth of a Bombay sepoy, as "shoulder arms." Nay, I have known more than once the men of a Bombay regiment to volunteer for such work, as building their officers houses, mess-room, &c, and do the work well too, making the bricks, mixing the mud. &c., &c., entirely by themselves. This would not be credited by the greater part of the Bengal army, and to such a state of helplessness has the recognition of caste in the ranks brought the Bengal sepoy, that a regiment of native cavalry, as I have repeatedly witnessed, is unable to picket. unsaddle or groom its herses, until the arrival of its syces and grass-cutters, sometimes, as I have seen, for several hours after the arrival of the regiment at its ground. In a

> Bombay regiment, before that time had elapsed, the horses would have been picketed, groomed, fed, and watered, stables would have been over, the tents pitched, and the men have had their breakfast. To such an incredible extent has this helplessness been carried and recognized by authority, that a Bengal sentry cannot think of striking the gong at his own quarter guard, and men called "Gunta Pandays", are actually maintained and paid for by Government to do this duty for them."

General Jacob lays great stress upon the evils of the absolute reign of the seniority system in the Bengal army, and justly so. "With such a system of promotion, the good and the bad, the clever and the foolish, the brave and the timid, the energetic and the imbecile are nearly on a par." We add : this is of a piece with the caste system, which knows of no other distinction between man and man, than that of birth. The recognition of individual merit by promotion would, in some measure, however slight, depreciate the value of the one source of honor—caste. This must not be. The honorary privilege of caste may be lost, indeed, by any trespass against the all-absorbing law of caste, but by nothing else. No crime, meanness or villany, no lie, fraud or swindling, no theft, robbery, murder, no vice however degrading or abominable, touches the honor of caste. Nana Saheb is as pure and honored a Brahman, as he was on the day, when, in his childhood, he put on the sacred cord.

Promotion, *i.e.* honorary distinction for the sake of individual merit, by British military authority, would have put power into the hands of the British officer, cast a shade upon the all-sufficiency of the merit of birth, and thus have marred by a grating discord, the sweet harmony of the caste system in the Bengal army. It was proscribed therefore. General Jacob continues :

> "The officers are powerless for good, and the men, keeping just clear of open violence, have their own way in all things. It is astonishing, and says much for the goodness of the raw material of the Bengal army, that under such arrangements the whole fabric has not entirely fallen to pieces. The thing is rotten throughout, and discipline there is not, but it is wonderful that even the outward semblance of an army has been still maintained under such deplorable mismanagement."

What officer or soldier in Europe could believe—unless upon unimpeachable and public testimony, that in the Bengal army, guard duty was performed in the following style : General, then Colonel Jacob, in 1851, published this statement :

> "The first thing done by a Bengal sepoy when he mounts guard, is to strip himself of arms, accoutrements, and clothing; the muskets are piled, and a sentry is posted, who remains, generally (not always) properly accoutred, etc., all the others, including Non-commissioned officers, disarm and strip; if there be any water near, they go and dabble in it after the fashion of all Hindustanis; otherwise they cover themselves with sheets and go to sleep, quite naked, with the exception of a *lungootee*. When the sentry thinks that

> he has been on long enough, he bawls out for some one to relieve him; after a while, up gets a sepoy from beneath his sheet, and after a few yawns and stretches, puts on his clothes and accoutrements, but does not take his musket; that would be too much trouble, and endanger upsetting the whole pile. He then goes to the sentry, takes his musket from him, and occupies his place. Away goes the relieved man and strips like the others. No naique attends with the relief; he remains fast asleep under his sheet...... In the Bengal army four men are allowed to a sentry, instead of three, as with the other armies, so that a sepoy with them is on sentry only six hours altogether during his tour of twenty-four hours, instead of eight as usual. But it is by no means uncommon in the Bengal army to relieve a guard once a week, and even at longer intervals. This was the case, when the Bombay and Bengal troops met at Peshawur, and considerable grumbling and complaining took place, when Sir H. Dundas insisted on the guards being relieved daily."

Lord Melville's (formerly Sir H. Dundas) testimony given in the House of Lords on the 13th of July, 1857, tallies perfectly with the testimony of Col. Jacob in 1851. Lord Melville

> "had no hesitation in saying, that the condition of the Bengal army was the worst in the world. He had never served with so bad an army, nor did he ever witness such a want of discipline among soldiers....These mutinies were not altogether new. The present was not a singular instance. When he was commanding in 1849, on the fomtier, two Bengal regiments mutinied When he returned to this country in 1850, he was requested to give his opinion on the state of the Bengal army. He expressed his opinion in terms of the strongest disapprobation, but was told, that it would be imprudent to express that opinion, however correct it might be. No steps had since been taken to remedy the defects in the discipline of that army, although they could not be unknown to the Court of Directors. To give the House one instance of the state of the Bengal army, he might mention, what happened at the siege of Mooltan. An officer, commanding a company, had a covering party. One night a tremendous disturbance took place. He went to see what was the matter, and found the Bengal regiment obstructing the sepoys of a Bombay regiment, because they were digging the trenches. The Bengal regiment said : "We will fight, but will not work;" and it was not until the officer threatened to have two Bengal men shot, who were the ringleaders, that they could be got to retire; but they did not do one foot of the work traced out by the engineers."

We have heard another version of the occurrence, or perhaps the equally correct report of another incident in that row. Our story runs thus : As soon as the Bengalis saw the Bombay men digging away at the trenches, they bawled out furiously, bidding them to desist. When they would not listen, the Bengalis ran towards them, armed with sticks and clubs, to drive them away, crying : *"We will fight, but not dig."* A fight, indeed, seemed to threaten, when a Bengal officer ran between the disputants, and called to his men : *"Brethren, brethren, let them alone; they are low-castes."* An esteemed friend of ours, a Madras officer, has

furnished us with a Bengal-army scene, worthy of being hung by the side of General Jacob's "sentry," and the "Mooltan trenches" of Lord Melville, Many years ago, our friend visited Benares. He was the guest of the adjutant of one of the Bengal regiments stationed there. One morning he accompanied his host to meet a treasure party whose arrival was due, When the two officers arrived on the ground, the treasure party, who had arrived a little earlier, had made themselves easy without awaiting the adjutant. They had piled arms, put off their accoutrements, and stripped themselves of their uniforms. The treasure bags lay on the ground, some fellows sitting around them, others were engaged in the most important business of a Brahman,—in cooking. The two British officers walked up and down at a little distance from the sepoys, conversing together. On a sudden, one of the cooking men—a Brahman— started up some three or four yards from Capt. M. with a hiss, like an infuriated snake, dashed his cooking pots in pieces over the fire, and—standing erect and bristling with rage—cast a look of deadly hate and defiance at Capt. M. (who had suddenly turned at the noise behind him) and uttered words, which did not sound like compliments or blessings. Our friend instinctively grasped his cane under a strong temptation to give his new acquaintance a sound thrashing. and—turning to his host—cried out : "What does this fellow say, tell me." But the adjutant seized his arm and drew him away, saying : *"never mind, never mind, let us be off; don't stay. You have come too near the man's pots I suppose. That has put him into a rage."* Captain M mechanically followed, amazed and indignant. He said nothing, but never forgot the scene.

General Jacob's "Sentry" exhibits the utter want of discipline; Lord Melville's "Mooltan trenches," the rampant insubordination; Capt. M.'s "treasure party," the insolent-defying contempt of the British officer, which have been long conspicuous in the high-caste army of Bengal. An army, in which the system of caste is recognized, if recognized—dominant, if dominant—destructive of order and subordination, without which a large standing army is a gigantic armed mob, must in time become the plague and ruin of the Government by which it is fed, or be itself annihilated. There is no middle course. Reformation is out of the question.

The system of caste lies at the foundation of modern Brahmanic Hinduism, as the doctrine of hierarchical domination at that of Romanism. The religious and the hierarchical doctrines, in both systems, are inseparably blended. These systems are enormous creepers, which by degrees eat up the life of the trees round which they have entwined themselves. At first they give beauty to the trunk, on which they spread their branches and foliage; when the tree, sapped by them, begins to decay, they appear its powerful supporters; but the end is ruin and

desolation. In former times caste was the strongest stay of Hindu religion and law. It has now taken the place of religion and morality. Laws divine and human have lost their power; and caste has now become all powerful, now purely for evil—in the Hindu world.

"The main facts connected with it," says Dr. Wilson, in his excellent discourse, "are such as the following :

> It had no existence at the time when the oldest Vedic hymns were composed, about fifteen hundred years before the Christian era, for the Brahmans then constituted a profession, and not a hereditary and exclusive caste, while the other divisions in the Hindu community were unknown in the same relationship. The principal distinctions then recognized, were those of Aryas, an intrusive ruling tribe from Arya, and of the subjected or hostile Dásyás. Even up to the time of the composition of the earlier portions of the institutes, ascribed to Manu (500—600 before Christ) the denomination of Arya was preserved by the conquering tribes. The Dasyás to are mentioned in the latter protions of the same work. About the same time the Hindu mind began to speculate on the religious and social relations of men, while forgetful of primitive tradition and history. At first the concept of the divinity as an enormous male, from whose divided body man and woman were formed, was tried and noted. Then the fiction, more acceptable to the aspirant classes of society, and still the foundation of the doctrine of caste, was originated, that the Brahman, now become, hereditary and exclusive in the priesthood, sprung from the mouth of the divinity; while the Kshatrya or ruler and warrior, sprung from the arms of the divinity; the Vaishya or merchant and agriculturist, from his thighs; and the Shudra or slave, originally a denomination of a distinct people on the Indus, from his feet. In these inventions, the object of which is plapable, fraud is most conspicuous. It was only by degrees, that the Brahmans became the monopolists of the priesthood. The Kshatriyas appear to have had their own peculiar caste pretensions independently of those of the Brahmans. The various nations, with whom the Aryás came in contact in the progress of their dominion, were represented as sprung from an adulterous mixture of the original castes, and consequently greatly degraded. Legislation in the hands of the Brahmans soon became unjust, tyrannical, and unreasonable in an inconceivable degree, and that as far as body, soul, honour and property are concerned. The castes were multiplied according to the social occupations and residences of the community, or rather communities, even to the number of thousands. The presenptions for their guidance became frivolous, arbitrary and vexatious beyond imagination, extending to every relation and event of life, and recognizing systems of purity and impurity, of propriety and impropriety, of eating, drinking, clothing, washing, training, worshipping, working, buying, burning, and commemorating, both injurious and irrational. They prefer ceremonies to morality, custom to rectitude, and external improvement to internal purity, error to truth, ignorance to instruction, slavery to liberty, pride of assumed status to humane sympathy and co-operation. Caste which is thus a lie against nature, against humanity, against history, has proved the bane of India, and the greatest obstacle to its well-being. A

> declared by Bishop Heber;—"The system of caste tends more than any thing else the devil has yet invented to destroy the feeling of general benevolence, and to make nine-tenths of mankind the hopeless slaves of the remainder."

2. The seeds of disorganization, inherent, as we have shewn, in the very nature of a high caste army, were gradually developed during the last ten or twenty years under circumstances peculiar to the history of the Indian empire, and the position held by the Bengal army, and brought to full maturity by grave errors of the Home Government, of the Indian administration, and of the body of Bengal officers.

With the rapid growth of the empire by the conquest of Scinde, the Punjab and Pegu, and the annexation of Nagpore and Oude, the importance of the standing army rose apace, and the Bengal army especially grew in numbers and consequence. The Bengal army distinguished itself by valour on many a hard won field of battle. They were praised without stint and measure, and began to think themselves equal to the European soldiers, by whose side they had fought, and bled and conquered.

The internal organization of the more and more preponderating body of Brahmans, Rajpoots, and their dependents, the so-called "caste Hindus", was by degrees perfected. The Brahmanical interest formed an "imperium in imperio." Most regiments became close boroughs, hermetically sealed from the knowledge and interference of their own officers and of the Government. The wily Brahmans well knew how to turn to account the faults of the military system, and the prejudices, the fears, the vanity of their commandants and officers, for carrying on systematically, under a hundred pretexts of privilege, caste, and religion, their encroachments upon legitimate military authority. "The Brahmans" were far more feared than the power of Government. A subadar of the 34th regiment, after his discharge at Barrackpore, bitterly complained of his misfortune. He was told that his punishment was just; he protested his innocence. He was reminded, that, if he himself were loyal, yet he must have been cognizant of the treasonable designs of others, and ought to have denounced them. He replied :

> "Impossible!" "Had I given information, how could I have been sure of finding credit with Government? but had I taken this course, I would have been certain of being killed by 'the Brahmans.' A sepoy, indeed, did give information; he was superciliously handed over to a committee of native officers, who had no difficulty in proving, that he was a habitual drunkard, and subject to fits of insanity."

The insolent pride, and the dangerous disposition of the great body of the Bengal army, were strangely favoured by the fatal policy of the Home Government, who, though fully aware of the serious defects of their military administration in India, and in spite of repeated warnings, given by officers of great discernment and large experience not only failed to

increase the strength of their European troops, in proportion to the growth of their territory, but actually diminished it, in order to make some inconsiderable saving in their Indian military expenditure (£10,000,000 per annum) at the risk, it might be of immense losses, in case of failure, yea of irretrievable ruin. They have acted like a desperate merchant, who orders his vessel to sea, though aware of her unsound condition; he himself stays at home, letting the captain and crew, take their chance, and hoping for the best. The season passes, the ship returns safe. Next season she is painted fresh and put to sea again. If there be no tempestuous weather, if her commander be vigilant, and the crew active, she may, though a rotten concern, yet perform many a voyage. But the first hurricane will break her to pieces, when all hands will perish, and the freight go to the bottom of the sea. Precisely in this manner have the Home Government treated their Indian empire. They knew, certainly ought to have know, the impending danger; but looked on. The cyclone has burst, and it is no merit of theirs, that all has not been lost

The Indian Government has been unequal to the task imposed upon it, for two principal reasons. Its most serious defect has been want of principle, political, moral, or religious. All its wisdom was the wisdom of expediency. There was not boldness enough to break with the ancient traditions of India, and to proclaim themselves, and to act as, lords paramount, in the name of God, of all India. A pageant court was still kept at Delhi at a great expense, with much inconvenience, and as events have shown, much danger. It was not long ago that, by the acknowledgement of a grandson of the old king as legal successor, the Government, of their own choice, perpetuated the nuisance The Government knew, that in many parts of India they were cheated out of a large amount of revenue by surreptitious enams, and by alienations of revenue, which they had a perfect right, according to ancient usage, to resume. But they had not the heart to use their right, and preferred to leave the laboring millions unrelieved, for the benefit of a thousand drones. They might have dictated to those dependent princes, whose thrones were supported by the bayonets of the Company's troops, the lessons of humane and sound policy in a much more straight-forward manner, and acted as the true friends of oppressed people, who are kept in bondage through the power and the name of the Company; but they have forborne.

What idea can Hindus, be they sepoys or ryots, form of the moral character of their Government, when its manifold undeniable excellencies are marred by blemishes inexplicable, except on the ground of insatiable thirst for money, the *auri sacra fames*, one of the principal vices of the sepoy; viz. the large and increasing revenue derived from the sale of spirits, utterly repugnant to the Hindu idea of a paternal government, and

the yearly income of about four millions of pounds, gotten by the cultivation and manufacture, on account of Government, of opium, smuggled into China, under the protection of the British flag, contrary to imperial edicts, contrary to international law, contrary to the dictates of honor and humanity,—because the Indian exchequer wants money, and must have money *per fas aut nefas?*

As for religious principle, the Indian Government have never pretended to have any. It was long doubtful to the Hindus, if Englishmen had or had not any kind of religion. Things have mended very much. Bishops have come, churches have been built, colleges founded, missions established, popular education has commenced. But both Hindus and Mussulmans still look upon Government as supporters of their religious establishments. The word of God is still excluded from the schools, established and maintained by a professedly Christian Government, and when a Governor General, who is attacked at home on account of acts of Christan liberality, and whose Christian character stands unimpeached, proclaims a public day of humiliation and prayer, he is led to consider it politic to avoid in his proclamation the name of "Christian" subjects, or of "Christ." The motives of such a wisdom are utterly incomprehensible to natives of the East, who consider the open profession of religion a point of honor, and dissimulation of sign or mark of utter infamy, and slavish meanness.

The second great deficiency has been that of power, either material or spirtual. Had there been a sufficiently large European army, sepoy insubordination and insolence would have been kept within bounds. The Bengalis, as we have remarked above, would never have risen, if there had been 30,000 European bayonets in sight. But in material power the Government has been for years lamentably deficient. And of the higher spiritual power there has been a total absence. Had the Government of India stood before their subjects in the attitude of Godfearing, God-honoring, and God-serving rulers, a character perfectly compatible with the largest toleration, the most even-handed justice, the most perfect integrity, the most sympathizing humanity, but altogether incompatible with the temporizing, dissimulating, halt-and-lame policy, whose highest principle is that of expediency; had the people of India, had the native army perceived in their Christian rulers something of the old protestant, Cromwellian, true British spirit, they would have felt as if all the powers of heaven and earth were in league with their masters, and would have thought it madness to rise against them, or had they risen, they would soon have found it madness indeed.

But the fiendish spirit of the mutinous army found itself opposed by no such power. Before a bold Christian spirit, it would have quailed. They stood not in awe of the Government, which they determined to resist,

whose timid-looking mildness and moderation provoked their insolence, and whose most solemn declarations and manifestoes they impudently derided.

The chief blame which rests on the officers of the Bengal army is their un-English spirit of yielding to and coquetting with the unreasonable arrogance of their high-caste sepoys. In former days it was said, that Englishmen coming to India left their religion at the Cape of Good Hope. The British officer of the Bengal army seemed to have left his native pride at home. He knew, might have known, ought to have known, in what estimation he was held by high caste Brahmanism, but was content to be looked down upon by the noble twice-born, and prided himself on his management and tact, if he succeeded in keeping the priestly race nominally under his command in tolerably good humour by a steady perseverance in cool and studied complaisance and subserviency. The sepoys were in fact masters; their officers felt it, knew it, and succumbed. They were aware of their absolute ignorance of every thing that was going on within the inner circle of the regiment; they were aware, that there were many things—perhaps matters of importance—discussed, determined upon by the men of their companies and of their regiment at large, of which they saw and heard nothing—and contented themselves with their ignorance. They were proud of the noble blood of their sepoys, as gentlemen are proud of Arab blood horses, and overlooked the intractable viciousness of their favourites, or tried to forget it, and never cared to reflect that the men, whom they admired so much, requited their admiration with the most thorough scorn and contempt. Outward appearances were specious enough. The sepoys, tall, broad-chested, handsome, noble-looking men, admirable parade soldiers, knew well how to pay outward respct, and how to conciliate officers by show of politeness. The officers on the other hand took pains to humor and to conciliate their men. But, with more or less rare exceptions, the intercourse between the two classes was insincere and hollow; and on the part of the sepoys, as events have lamentably proved, full of treacherous hypocrisy.

3. But now the question forces itself upon us. How was it possible for such an army to hold together for years and years? What magic power kept the volcano of revolt quiet? Our answer is : The charm of silver produced that semblance of order, subordination, discipline, and loyalty, which deceived many of the ignorant, and suggested thoughts of comfort and hopefulness to those who had looked behind the scenes, leading them to indulge in the idea that the catastrophe, which had been impending so long, might be staved off still longer by the mercy of providence.

The certainly of liberal pay and pension, combined with the full assurance, that their rulers had made up their minds to yield to their

sepoys as far as possible, to humor and indulge them in all matters connected with, or said to be connected with caste or religion, served for a long period to keep the Bengal army, though mutinous to the core, from actual revolt.

The love of pay and pension, the security of which depended upon the continuance of the British Government, was the powerful magnet, which kept the more and more dangerously oscillating needle of the Bengal sepoys' fealty true to the point of outward obedience. Attachment to the Government, which they had sworn to serve, there was very little, if any, in the hearts of the sepoys. Their traditionary loyalty to their salt had long evaporated; respect for the Government, who had so often given in to the insolent pretensions of their mercenaries, there was none. They had ceased to fear the power of those, whose temporizing policy had impressed the overbearing prætorians with the conviction, that they were themselves dreaded by their masters. They considered themselves the main-stay and prop of a foreign government, and were easily persuaded by their vanity and pride, that their rulers were completely at their mercy. But the Brahman sepoy, while he felt himself fully able, whenever he were so pleased, to subvert the Government of the Company, was yet too shrewd to kill the goose, which—sure as the changes of the moon—laid the golden egg for him twelve times a year. Therefore he chose to be quiet. Therefore he determined on keeping up the show of as much loyalty as was absolutely necessary. He was richly rewarded for his forbearance. One Bengal regiment, during its sojourn in Pegu, laid by three lacs of rupees, which were invested in company's paper. Such men could not have had—at that time—the intention of revolting against the guardians of their hoards. Thus the notorious avarice of the sepoy was the sheet-anchor, which kept the vessel of the Bengal army—within hearing, within sight almost of the breakers of mutiny—in tolerable safety.

4. At length, however, the cable snapped, under an increasing pressure of tide and current, and an extraordinary strain of tempestuous weather. We shall endeavour to present a general outline of the principal circumstances, which of late years have contributed to unsettle the minds of the dominating majority among the Bengal troops, and the various influences of good and evil, which have of late been at work in the atmosphere of the Bengal army, the sudden combination of which has produced the violent storm, whose thunders have rolled over all India, and are now re-echoing from England; whose lightnings have shattered the high prestige of the Company's name, scattered to the winds the faded glory of the Mogul, and deluged with blood the fairest provinces of Hindustan.

The world seemed to change during the last years. Steam formed an invisible bridge between the east and the west, shortening year by year. It

carried India to England brought England to India. The stream of passengers between the high places of India and seat of power in Europe, became broader and deeper, and an increasing number of Indian notabilities, Brahmans, Mussulmans, Parsees, young students aspiring after fame and fortune; merchants, agents, princes and princesses, queens and ministers, became conspicuous in the throng. A *rappovt* between the two great countries of the governing and the governed, bade fair to be firmly established. This boded no good to the ancient régime in India, and to the ascendancy of the representatives of the old order of things.

A change became gradually perceptible, or seemed to take place in the principles and proceedings of Government. The gates of India were thrown open to western arts and civilization, and to the enterprise and activity of a rapidly increasing commerce. The new railroads cut straight through ancient prejudice and the aristocratic arrogance of the higher castes,who preferred low fares and the jostling and huddling together with low-castes and no-castes, to scrupulous seclusion which cost them money. The whistle of the engine sounded like a note of triumph over the downfall of immemorial custom and traditional ideas. If these railroads were not arrested in their progress, were permitted to spread their net over the whole territory of the Company, an ubiquity of Government and of the European soldier would soon be established, perfectly irresistible for any power within the Hindu world. The Telegraph, which over ran India with magic speed, its posts starting up like mushrooms, threatened to put the supreme Government in possession of almost superhuman knowledge, and to complete their absolute hold on their immense domains. The founding of universities and colleges, and the establishment of schools, forming the nuclei of a system of popular education, and whatever else contributed to the spread of western science, was full of ill-boding to the spirit and the champions of ancient Hinduism. The Government, indeed, steadily persevered in reiterating their old professions of non-interference with the religions and customs of the country; in proof of their perfect neutrality, and for the purpose of effectually shutting out Christian proselytism from all their own seats of learning, they excluded the Bible from public schools, and forbade religious instruction. But they could not blind the sharp eye of Brahmanism to the plain fact, that every branch of European science, every communication of sound knowledge in natural history, natural philosophy, astronomy, history, etc. was as subversive of the ancient tradition and religion as the open teaching of the Bible; yea more dangerous, perhaps, because more covered and indirect. The principles and sentiments, the language and the conduct of "Young Bengal" foreshadowed clearly enough the inevitable results. at a time not very far distant, of the new educational movement, at last earnestly commenced by the Indian Government. Last year another inroad was

made by the supreme authority, (though—of course—most strictly adhering to the sacred principle of non-interference) upon time hallowed custom, by the legalization of widow marriages, from no other motives, evidently, than those of humanity, but directly opposed to one of the most inveterate usages of modern Hinduism And, lo, no sooner was the act of legalization passed, then some of the highest families in Calcutta, the focus of innovation, took advantage of the new law, and celebrated publicly, and with due pomp and solemnity, in the presence of crowds of Brahman guests, marriages of the new style

Many of the changes here adverted to, as well as others which we do not stop to enumerate, such as the more and more numerous instances of conversion to Christianity, from among the higher and highest castes, some of them, indeed, the fruit of missionary teaching, but others the result of Government education,—had, perhaps, no very strong direct effect upon the Brahmanic party in the army; but they have created great uneasiness among the still powerful body of conservative Brahmans, with whom the high caste army was connected by a thousand ties. We suspect, that the judicial enquiries into the immediate causes of the military revolt, which Government cannot fail to institute, will implicate many an influential person, whose lips have overflowed with professions of loyalty, while the heart and hand were secretly in league with the mutineers.

The annexation of Oude gave great offence to the sepoys, not indeed because they considered the measure unjust, for according to the popular idea of India, the lord paramount is invested with absolute sovereignty, and is the sole irresponsible dispenser of crowns and sceptres—but because the establishment of the Company's government in their home, formerly the paradise of the Bengal sepoy, sadly encroached upon their wonted privileges. They had not been dependent upon the native courts or upon the native administration for justice, and yet reaped no inconsiderable advantages from misrule. They considered and felt the peasantry below them. They were looked up to as superiors, as the Company's servants. But on Oude becoming a British province, the cultivator of the soil could claim equal rights with the sepoy. The former felt and saw, that all difference was at an end. They, too, could claim protection from the British Government, and could be no longer maltreated by the soldier, secure in the injustice of the native courts. No doubt, the inhabitants of Oude made the sepoy feel the difference that had taken place in his condition. The latter naturally considered himself degraded, and would give way to a strong feeling of discontent, dangerous to his small stock of loyalty.

The innovating propensities of the new Commander-in-Chief were not calculated to allay the rising strom. He touched the furlough

regulations, one of the sorest points. The army felt that the introduction of a new order of things was attempted, and the leaders became conscious, that now or never was the time for striking a blow. It was necessary to establish a mutual understanding between the Brahmanic party, by far the stronger, and the Mohammedan, intimately connected with the chief notabilities of India, the ex-king of Oude and the king of Delhi. A compromise was evidently effected between the two not very harmonious elements. There was to be a new Delhi raj, the restoration, probably, of other Mussulman thrones,—but the Brahmanic party, no doubt, looked beyond the realization of these common plans to a re-establishment of the ancient glories of Brahmanism.

Now came the rumours of China was, the commencement of the war with Persia. The opportunity for a successful revolt was given. Strike, or not? It was difficult to come to a decision. The temptation was great indeed. There could scarcely be a doubt of immediate complete success. There was, certainly, no assurance of liberal pay and ample pension in the distant future, but there would be full treasuries and immense booty besides, enough for this generation. The cartridges made their appearance; they made a sensation. The army took fire. Government explanations were received with a bad grace. Treasonable proposals from Delhi, from Garden Reach, from Oude, were greedily received. Mutiny shewed its face openly, incendiarism lifted the torch. The 19th and 34th regiments were disbanded and scattered over the country. The court martial at Meerut proceeded to stronger measures for the suppression of the defiant spirit of insubordination;—the military authorities then fell into a fatal slumber, and the explosion of the first mine followed The die was cast. The Bengal army rose not so much according to the secret concert of a conspiracy, as by the simultaneous action of the same force upon the same material, through the length and breadth of the territory occupied by the Bengal army.

This is the interpretation of the Bengal mutiny, which we offer to our readers and to the rulers of this great country. The analysis of the disease would naturally lead to the consideration of the remedies called for; but upon this consideration we cannot enter now.

British India has at the close of its first century, passed through a baptism of blood. May the second century see old things pass away, and all things become new, by a baptism of that spirit which infuses new life from above into individuals and nations!

W. W. HUNTER • L.S.S. O'MALLEY

SEPOY MUTINY

Barrackpur

Barrackpur has played an important part in two Sepoy mutinies, of which I condense the following account from Sir J. W. Kaye's admirable work on th Sepoy War, Vol. I., pp. 266-269. 495 *et seq.* --In 1824, during the Burmese War, Bengal troops were needed to take part in the operations, but a difficulty arose as to transport. The Sepoys had not enlisted to serve beyond the seas, but only in countries to which they could march. The regiments were therefore marched to the frontier station of Chittagong, and there assembled for the landward invasion of Burmah. Several corps had already marched, and the 47th Bengal Infantry had been—warned for foreign service, and was waiting at Barrackpur whilst preparations were being made for its march. Meanwhile the British troops had sustained a disaster at Ramu, a frontier station between Chittagong and Arakan, and the news, grossly exaggerated, reached Lower Bengal Strange stories found their way into circulation as to the difficulties of the country to be traversed, and the prowess of the enemy to be encountered. The willingness which the Sepoys had shown to take part in the operations beyond the frontier began to subside, and they were eager to find a pretext for refusing to march on such hazardous service. This excuse was soon found. There was a scarcity of available carriage-cattle for the movement of the troops. Neither bullocks nor drivers were to be hired, and extravagant prices were demanded for wretched cattle not equal to a day's journey. The utmost efforts of the commissariat failed to obtain the needful supply. In this conjuncture a lie was circulated through the Sepoy lines at Barrackpur, that as the Bengal regiments could not be marched to Chittagong for want of cattle, they would be put on board ship and carried to Rangoon, accross the Bay of Bengal. Discontent developed into oaths of resistance, and the regiments warned for service in Burmah vowed they would not cross the sea

The 47th Regiment, commanded by Colonel Cartwright, was the foremost in the movement, that officer endeavoured, by conciliatory measures, to remove the cause of complaint; and Government offered to advance money for the purchase of such cattle as could be obtained. These measures were without avail, and the regiment broke out into mutiny on parade on the 30th October. The Sepoys declared that they would not proceed to Burmah by sea, and that they would not march

unless they were allowed 'double batta'. Another parade was held on the 1st November, when the behaviour of the Sepoys was still more violent. The Commander-in Chief, Sir Edward Paget, a stern disciplinarian, next appeared on the scene. He proceeded to Barrackpur with two European regiments, a battery of European artillery, and a troop of the Governor-General's Bodyguard. Next morning the rebellious regiment was drawn up in face of the European troops, but they still clung to their resolution. After some ineffectual attempts at explanation and conciliation, the men were told that they must consent to march or ground their arms. Not seeing the danger—for they were not told that the artillery guns were loaded with grape, and the gunners ready to fire—they refused to obey the word, and the guns opened upon them. The mutineers made no attempt at resistance, but broke at once, and, throwing away their arms and accoutrements, made for the river. Some were shot down; some were drowned. Many of the leading mutineers were hanged, and the regiment was struck out of the Army List.

Barrackpur was one of the military stations in which the signs of the great military rebellion of 1857 first became apparent. Early in that year the exitment about the alleged pollution of the new cartridges had made inself felt in every cantonment, and on the night of February 27th, the 19th Regiment, stationed at Barhampur, being ordered for parade the following morning, and with a great fear upon them that they would be forced to use the obnoxious cartridges, seized upon the bells of arms and broke out in a tumult. The men, however, appeared more panic-struck than mutinous, and were induced to retire to their lines. On the following morning the regiment fell in on parade as usual, contrite and humble. But it was impossible to overlook the offence, and the regiment was accordingly ordered to Barrackpur to be disbanded.

Four native infantry regiments were at that time stationed at Barrackpur.—the 2d Grenadiers. the 48d the 34th and the 70th. The station was commanded by Brigadier Charles Grant, the division being commanded by General John Hearsey. Many of the Sepoys believed there was a deliberate plot on the part of the English to destroy the caste of the native soldier. On the 28th January General Hearsey reported that an ill feeling was said to exist among the Sepoys at Barrackpur, in consequence of a report having been spread that they were to be forced to embrace the Christian faith. Incendiarism made its appearance in the station, and was clearly traced to the soldiery. A few days after the story of the greased cartridges first transpired, the telegraph station at Barrackpur was burnt down; and other fires, chiefly among the officers' bunglows, followed night after night. They suspicions and fears of the Sepoys increased every day, and General Hearsey endeavoured to restore confidence to their minds by a well-spoken and careful address to the regiments of the brigade. His earnest words had a good effect upon the men for a time, but

it was only transitory; and when they heard what had been done by the 19th at Barhampur, the excitement increased, and an impression got aborad that Government was gathering together a force of European cavalry and artillery, which would suddenly come upon them and destory them. General Hearsey a second time addressed the regiments on parade on the 17th march; but it was plain as the month drew to a close that the hopes which he once entertained of the speedy subsidence of the alarm would be disappointed. 'For when the troops at Barrackpur knew that the 19th were to be disbanded, and that an English regiment had been brought to execute the punishment, they believed, more firmly than they had believed at the beginning of the month, that other white regiments were coming, and that the Government would force them to use the obnoxious cartridges, or treat them like their comrades that were marching down from Barhampur to the disgraced. So the great terror that was driving them into rebellion grew stronger and stronger, and as from mouth to mouth passed the significant words, *"Gora-log aya,"*—"the Europeans have come,"—their excited imaginations beheld vessel after vessel pouring forth its legions of English fighting men, under a foregone design to force them all to apostatize at the point of the bayonet."

In the meantime the repentant 19th were marching down from Barhampur to their punishment, and were expected to reach Barrackpur at the end of March. Two days before their arrival, and outbreak occurred at Barrackpur, On the 29th March, Fresh excitement was created by the arrival of a small detachment of the 53d Europeans, who had come by water from Calcutta. One private of the 34th, named Mangal Pande, inflamed by *bhang*, seized his musket, left his hut, and calling upon his comrades to follow him if they did not wish to become infidels, ordered the bugler to sound the assembly, and fired his musket at a European sergeant-major. who came up on hearing the disturbance. The native officer and men on guard-duty of the 34th saw what was going on, but made no attempt to arrest the fanatic. Lieutenant Baugh, on hearing what had occurred, galoped to the spot, and was fired at by Mangal Pande, the shot hitting his horse. A hand-to-hand conflict took place, in which the lieutenant was wounded, and would most probably have been killed, if a Muhammadan Sepoy had not seized the mutineer and held him till the officer got away. All this took place within a few yards of the quarter-guard, where a Native non-commissioned officer and twenty men were on guard. Numbers of excited Sepoys rushed up on hearing the firing, but, with the exception of the Musalman, no man moved to assist his officer or to arrest the criminal, and some even struck the lieutenant when wounded on the ground. Meanwhile tidings of the tumult reached General Hearsey, who with several officers proceeded to the spot where the mutineer was pacing up and down with his musket in hand. As the officers approached, Mangal Pande turned his piece upon himself, and fell,

wounded, when he was immediately secured and taken to hospital. The man recovered, and both he and the native officer in charge of the guard were tried by court maritial, condemned, and hanged before all the troops in garrison, the former on the 8th and the latter on the 22d April.,

The 19th Regiment, from Barhampur, marched into Barrackpur to their disbandment on the 31st March, the sentence being carried into execution in the presence of all the available troops, European and Native. As a mark, however, of their penitence and good conduct on the march from Barhampur, the sentence was not accompanied with any marks of disgrace. They were not stripped of their uniforms, and were provided at the public cost with carriage to convey them to their homes. In the case of the 34th, however, who had stood by while their officers were being shot at, clemency was out of the question, and on the 6th of May the seven companies of the regiment who had witnessed the outrage were drawn up to receive their sentence of disbandment. There was no mitigation of punishment as in the case of the 19th; so, when they had laid down their arms, the uniforms which they had disgraced were stripped from their backs, and they were marched out of cantonments under an escort of Europeans, the number of the regiment being erased from the Army List. The subsequent spread of the mutiny belongs to the general history of British rule in India, and has found an eloquent chronicler in Sir John William Kaye.

(Statistical Account of Bengal Vol. I Part I Page 75-79)
W. W. Hunter

Barrackpur

The last historical event to be recorded is the outbreak of the Mutiny of 1857 at Barrackpore.[1] At that time Barrackpore was the head-quarters of the Presidency Division of the Army, which was under the command of General John Hearsev, an experienced officer, who had an intimate knowledge of the manners and customs of the sepoys and spoke their language with great fluency. It was garrisoned by four native regiments, viz., the 2nd Grenadiers, the 43rd Light Infantry and the 34th and 70th Native Infantry. As is well known, it had been decided to introduce the Enfield rifle in place of the musket with which the sepoys had hitherto been armed. Cartridges with greased paper were manufactured at the arsenal in Fort William for use with the rifle, and a depot for instruction in handling the new weapon was started at Dum-Dum. It is clear that the

This account is compiled from Forest's *History of the Indian Mutiny*, Kaye's *History of the Sepoy Mutiny* and the *Red Pamphlet*. The last was published in 1857 under the title "*The mutiny of the Bengal Army* by one who has served under Sir Charles Napier." The book, which is somewhat rare, gives a graphic contemporaneous account of the occurrences at Barrackpore.

sepoys under instruction soon suspected that the grease used in the paper was made of the fat of pigs or cows, or both, and that their officers learnt of their suspicions. One day a *khalasi* of the Dum-Dum magazine asked one of the sepoys for a drink of water from his lota. The sepoy refused, saying that the vessel would be contaminated by the lips of a low caste man. The *khalasi* retorted that the sepoy would soon be deprived of his caste, for the Government was busy manufacturing cartridges greased with the fat of cows or swine, which the sepoys had to bite before loading. On hearing of this, the officer in command of the musketry depot at Dum-Dum paraded the men and asked if they had any complaints to make Two-thirds of them stepped to the front, and, respectfully protesting against the mixture used for the cartridge paper, asked that wax and oil might be substituted Reports of these two significant occurrences were submitted to General Hearsey, who on 24th January forwarded them on and recommended that the sepoys themselves might be permitted to make up the cartridges with ingredients obtained from the bazars. His suggestion was accepted, but in the mean time rumours that they were to be forced to become Christians had obtained credence among the sepoys and a mutinous spirit was abroad Proof of their unsettled state was afforded by incendiary fires at Barrackpore, in one of which the telegraph station was burnt down. On the night of 5th February there was a secret meeting of the men of all the regiments at which they declared that they were willing to die for their religion and discussed plans for plundering the station and killing all the Europeans.

General Hearsey, in reporting this, pointed out that the native officers were of no use. "In fact, they are afraid of their men and dare not act; all they do is to hold themselves aloof, and expect that by so doing they will escape censure as not actively implicated This has always occurred on such occasions, and will continue to the end of our sovereignty in India." In order to hear what the men themselves has to say, he instituted a court of inquiry, at which evidence was taken of the objections to the new cartridges. He found that their suspicions were so deeply rooted, as to be ineradicable, and recommended, as the only possible way of allaying the unrest, that the use of the greased paper should be discontinued and that the cartridges should, if possible, be made up of the paper which has hitherto been used for the musket cartridges. He further paraded all the regiments on the 9th February and made a speech to them in which he explained the absurdity of the belief that Government intended to force them to become Christians or wished in any way to interfere with their caste or religion. His words seemed to have a good effect, but the men were again thrown into excitement by the news that on the night of 27th February, the 19th Native Infantry had mutinied at Berhampore. The sepoys of that regiment had not actually committed any act of violence. They retired to their lines when ordered to do so by the Colonel, and they

fell in on parade next morning without any symptom of insubordination. It was decided to punish the regiment by disbandment, and there being only one European regiment between Calcutta and Dinapore a steamer was sent to Rangoon to bring Her Majesty's 84th Regiment.

General Hearsey again addressed the regiments on parade, on the 17th March; but it was plain, as the month drew to a close, that the hopes of the speedy subsidence of the unrest would be disappointed. "For when the troops at Barrackpore knew that the 19th were to be disbanded, and that an English regiment had been brought to execute the punishment, they believed, more firmly than they had believed at the beginning of the month that other white regiments were coming, and that the Government would force them to use the obnoxious cartridges, or treat them like their comrades that were marching down from Berhampore to be disgraced. So the great terror that was driving them into rebellion grew stronger and stronger, and as from mouth to mouth passed the significant words, '*Gora-log-aya*'—'the Europeans have come,'—their excited imaginations beheld vessel after vessel pouring forth its legions of English fighting men, under a foregone design to force them all to apostatize at the point of the bayonet."[1]

On the 29th March, it was reported to Leutenant Baugh, Adjutant of the 34th Regiment, that one of the men of his regiment, Mungual Pandy[2] by name, was marching up and down the lines, armed with a loaded musket, calling upon his comrades to rise, and declaring that he would shoot the first European he came across. Lieutenant Baugh mounted his horse, and, with a pair of loaded pistols in his holsters, rode down to the parade-ground. Immediately in from of the quarter-guard the station gun was posted, from which the morning and mid-day salutes were fired. Mungul Pandy, on hearing of Lieutenant Baugh's approach, concealed himself behind this gun, took a deliberate aim and fired. The ball wounded the horse in the flank, and brought him with his rider to the ground. Lieutenant Baugh however, quickly disengaged himself, and snatching up one of his pistols advanced to Mungal Pandy, who finding himself unable to load his musked a second time, had taken up a sword which he had with him. Lieutenent Baugh fired and missed. Before he could draw his sword, the sepoy was on him, and with one blow brought him to the ground.

The Sergeant-Major of the regiment dashed into his rescue and attempted to seize Mungul Pandy, but was also wounded and struck down. A Muhammadan orderly, Sheikh Pithu by name, who had followed Baugh from his quarters, now rushed forward and, holding Mungul Pandy, gave the two men time to get up and escape. All this took place not thirty yards

1. Key's *History of the Sepoy Mutiny.*
2. In the Hunterian spelling, Mangal Pande Pande is a common name of Hindustani Brahmans

from the quarter-guard of the regiment consisting of 20 sepoys under a jemadar. So far from attempting to rescue their officers, the jemadar forbade the men to stir. The men of the regiment moreover, who turned out in front of the lines and watched the whole occurrence, showed their sympathies lay with Mungul Pandy, turning their back on Baugh, when he passed them, wounded and bleeding, and reproached them for not assisting him.

At this juncture, while Mungul Pandy was striding up and down, calling on his comrades to rise and die for their religion, General Hearsey, who had heard the firing, galloped down to the parade ground accompanied by his two sons. He at once ordered the jemadar of the guard to follow him and seize the mutineer, but the jemadar demurred, saying—"He is loaded and will shoot us " Then, according to General Hearsey's own account—"I again, shaking my revolver and pointing it partly towards him, sharply repeated the order." The jemadar looked askance at me and replied—"The men of the guard are putting caps on the nipples." I said, in a commanding and peremptory voice, "Be quick and follow me" and rode out in front towards the mutineer. The guard followed, my aide-de-camp or horseback close to the jemadar, armed with his revolver; my other son also close to the native officer similarly armed, Major Ross in rear of myself. As we approached the mutineer, we quickened our pace. My son, Captain J. Hearsey, called to me, "Father, he is taking aim at you, look out sharp." I replied, "If I fall, John, rush upon him and put him to death." At the last moment, however, Mungul Pandy turned his weapon upon himself, pulling the trigger with his toe. He fell severely but not mortally wounded and was taken off to hospital. General Hearsey then reproached the sepoys for having refused to move hand or foot to seize the man, to which they sullenly replied that he was mad with *bhang* and had a loaded musket.

"On the 30th March, the 19th Native Infantry arrived at Baraset, about eight miles distant from Barrackpore. It had by this time transpired that they were to march into the latter station for the purpose of being disbanded : still, the behaviour of the men was respectful; and, in order to avert their fancied doom, they had sent in a petition to the Governor-General, offering, in case they were pardoned, to proceed at once to China, or to serve anywhere on land or sea. In short, they showed a repentant spirit and were never less inclined to join in a conspiracy against the State. On arriving on the morning of the 30th at Baraset, they found a deputation from the 34th awaiting their arrival. It has since transpired that these men made them a proposal—the result of their deliberations of the previous night—which it was well for us that they did not accept. On that very morning Her Majesty's 84th from Chinsura. a wing of the 53rd Foot from Dum-Dum, a couple of European batteries from the same place, and the Governor-General's Body-guard (native)

from Calcutta had arrived at Barrackpore, and had been ordered to appear on parade with the native regiments at five o'clock on the following morning. The proposal made by the 34th to the 19th was to the following effect : that they should, on that same evening, kill all their officers march at night into Barrackpore, where the 2nd and 34th were prepared to join them, fire the bungalows, surprise and overwhelm the European force, secure the guns, and then march on to, and sack, Calcutta. Had the 19th been as excitable then as they had shown themselves on the 25th of February, these views might possibly have been entertained; but they were repentant and ashamed of their former excess. That they were not thoroughly loyal is proved by the fact that the tempters were not reported. They were suffered to return unbetrayed, but their scheme was at once and definitively rejected.

"On the following morning, the 19th Regiment marched into Barrackpore An order by the Governor-General in Council, in which their crime was recapitulated, their fears for their religion pronounced absurd, and their disbandment directed was read out to them, in the presence of the assembled troops." In recognition of their penitence and good conduct on the march from Berhampore, the sentence was not accompanied with any marks of disgrace. They were not stripped of their uniforms, and were provided with money to convey them to their homes. They were given the pay due to them and marched away under escort, cheering General Hearsey and wishing him long life.

In the case of the 34th, however, such clemency was out of the question. Mungul Pandy and the jemadar of the guard were hanged by order of Court Martial; the jemadar, when on the scaffold, confessed his guilt, acknowledged the justice of his sentence and adjured his comrades to take warning by his fate. An inquiry into the conduct of the regiment was instituted and the Court found that while the Sikhs and Musulmans were trust-worthy, no reliance could be placed on the Hindus. Lord Canning ordered the disbandment of the companies stationed at Barrackpore, and this order was carried out on 6th May There was no mitigation of punishment, as in the case of the 19th. When they had laid down their arms, the uniforms which they had disgraced were stripped from their backs, and they were marched out of cantonments under an escort of Europeans, the number of the regiment being erased from the Army List. One incident was significant. They were allowed to keep their Kilmarnock hats, as they had paid for them Before crossing the river, many of them were seen to take off their caps, dash them on the ground and trample them underfoot, to show their detestation of the Company's service.

Bengal District Gazetters. 24Pgs. P. 66-72
L. S. S. O'Malley

Barhampur

The cantonments of Barhampur will always be notorious as the scene of the first overt act of mutiny in 1857. The following description of the events which took place is condensed from Sir John Kaye's *History of the Sepoy War in India* (third edition, pp 496-508) :—

At Barhampur there were no European troops, there were none anywhere near to it. A regiment of native infantry, the 19th, was stationed there, with a corps of irregular cavalry, and a battery of post-guns manned by native gunners. It was not difficult to see that if these men were to rise against their English officers, and the people of Murshidabad were to fraternize with them in the name of the Nawab, all Bengal would soon be in a blaze. No thoughts of this kind disturbed the minds of our people, but the truth was very patent to the understandings of their enemies.

At the end of January 1857, it was officially reported that the native regiments at Barrackpur, near Calcutta, were beginning to show strange symptoms of alarm or disaffection. By the first few days of February, the story of the greased cartridges was in the mouth of every sepoy at Barhampur, one hundred miles to the north. On 18th February, a detachment from the 34th, the most notoriously disloyal regiment in the Barrackpur cantonments, reached Barhampur on its way up-country in charge of stud horses. A week later, a second detachment from the same regiment arrived with a party of European convalescents When the men of the 34th reached Barhampur, their comrades of the 19th received them with open arms and open ears. They were old associates, for not long before they had been stationed together at Lucknow, and now the 19th asked eagerly what strange story was this that they had heard from Barrackpur about the greasing of the cartridges. When the men of the 34th spoke of the general belief of the sepoys at the Presidency that the Government deliberately designed to defile them, and of the as men speaking with authority, for they came from the seat of Government, and were not likely to err. So the Barhampur regiment took in the story with a comprehensive faith, and was soon in that state of excitement and alarm which is so often the prelude of dangerous revolt.

The second detachment from Barrackpur arrived on the 25th February; and a parade of the 19th Regiment, 'with blank ammunition,' was ordered for the morning next but one following. But during the intervening day signs of disaffection had become apparent. The men knew that fresh supplies of ammunition had been received from Calcutta, and some of the cartridges, which had been already issued for use on the coming parade, were suspected from their novel appearance. As a matter of fact, these cartridges were not 'greased;' but the men refused to take the percussion-caps served out to them, and gave as their ground for refusal, the strong suspicion they entertained that their cartridges had been defiled. This intelligence was brought to Colonel Mitchell, who was

in command at the station, before the evening had passed away. He at once started for the lines, and summoned the native officers to meet him in the front of the quarter guard. There he delivered to them a plain-spoken address, which by no means allayed their fears. He also resolved to adopt the one precaution which seemed to him calculated to prevent the crisis. Before retiring to rest for the night, he issued orders that the cavalry and artillery should also be prepared to attend the morning parade. But during that night the regiment of infantry rose in open mutiny. Ever since the colonel's interview with the native officers, the excitement had increased. He would not have spoken so angrily, they argued, if mischief had not been intended It had transpired that the cavalry and artillery had been ordered out. Suspicions of foul play then grew into assured convictions, and a great panic seized the whole regiment. How the signal was first give is not clear. There was a common feeling of some great danger approaching through the darkness of the night. Some raised a cry of 'Fire;' some, again, said that the cavalry were galloping down on them; others thought that they heard in the distance the clatter of the artillery wheels. Then some one sounded the alarm, and there was a general rush to the bells of arms. Men seized their muskets, took forcible possession of the dreaded ammunition stored for the morning parade, and loaded their pieces in a bewilderment of uncertainty and fear. Colonel Mitchell was roused from his sleep by the beating of drums and the confused uproar in the direction of the lines. He immediately made his way to the cavelry quarters, and ordered the troppers into the saddle, and the guns to be brought down. It was past midnight when he arrived on the parade-ground. He found the infantry in undress, but armed and belted, drawn up in line, vaguely expectant of something to come, but in no mood to provoke instant collision. There were many loaded muskets in their hands, but not one was fired. The Colonel adopted the course which, in the unfortunate conjuncture that had arisen, was undoubtedly the best. He loaded the guns, closed the cavelry upon them, and ordered the call to be sounded for an assembly of the native officers. The summons was obeyed; and again the native officers stood before their chief. They besought him not to be angry and violent, and urged that the men were ignorant and suspicious, and impelled only by their fears. They promised that the regiment should lay down its arms and return to its duty, if only the troopers and the guns were sent back Colonel Mitchell, after some hesitation, was induced to accept their promises, and to make the further concession that the general parade of all arms, ordered for the morrow, should be counter-manded. Whether the sepoys of the 19th had shown signs of penitence before this concession was made, and had or had not begun to lay down their arms, is a point of history enveloped in doubt. But it would seem that the native officers told the Colonel that the men were lodging their arms, and that he trusted to their honour. The real signal for their submission was the retrocession of the torches. When the

sepoys saw the lights disappearing from the parade-ground. they knew that they were safe.

On the following morning the regiment fell in for parade, without a symptom of insubordination. The excitement of the hour had expended itself; and they looked back upon their conduct with regret, and looked forward to its consequences with alarm. Though clearly demonstrating their apprehensions by sleeping round the bells of arms, they continued to discharge their duties without any new ebullitions; and there was not appearance of any hostile combinations, by which the mutiny of a regiment might have been converted into the rebellion of a Province. Under the guidance of Colonel Macgregor, the Nawab Nazim of Bengal threw the weight of his influence into the scales on the side of order and peace; and whatsoever might have been stirring in the hearts of the Musalman population of Murshidabad, in the absence of any signal from their chief they remained outwardly quiescent

This incident forms the only feature of the Sepoy Mutiny peculiar to the District of Murshidabad. The 19th Regiment was marched down to Barrackpur, to be there disbanded as a punishment for this outbreak, as has been already described in the Statistical Account of the 24 Pargans.

** Statistical Account of Bengal, Vol IX, p. 77 80*
W W Hunter

Dacca

The only political disturbance which has taken place in Dacca District since the English obtained possession of the country was the Mutiny of 1857, In that year the sepoys stationed in the city consisted of two companies of the 73rd Native Infantry. Upon the arrival of the news of the outbreak at Meerut, an uneasy feeling manifested itself among the Dacca sepoys, which gradually increased till the Government found it necessary to despatch a force of a hundred men of the Indian Navy for the protection of the town. The European and East Indian residents, to the number of about sixty, also enrolled themselves as volunteers. This force sufficed to keep the sepoys from any overt act till the 26th Novermber, when the news arrived that the sepoys stationed at Chittagong had mutinied, plundered the treasury, and carried off about three lakhs of rupees. It was thereupon resolved that the Dacca sepoys should be disarmed, and for this purpose the volunteers and sailors were warned to be ready at five o'clock the following morning. The occurrence is thus described by Mr. Brennand, Principal of the Dacca College, and quoted from the "History and Statistics of the Dacca Division" :—

"At the time appointed, there were assembled the Commissioner, the Judge, and some other civilians, and from twenty to thirty volunteers. It

was still dark, and we waited a short time for the signal. The plan was, to begin by disarming the Treasury guard, to place the disarmed men in charge of the volunteers; the sailors would then proceed with their whole force to the Lal Bagh; and it was hoped that the men there would have given up their arms without opposition. Everything appeared to go on well; the guards at the Treasury were disarmed before the signal was given for the volunteers to advance. There were about fifteen of the sepoys standing or sitting outside of their quarters, and the rest of them, making altogether about thirty-six, were supposed to be inside the building. They appeared to be very much dejected, and they reproached their officers for subjecting them to such disgrace, protesting that they would have given up their arms at once to their own officers had they only been asked to do so.

"In the meantime the sailors, on reaching the Lal Bagh, found the sepoys drawn out prepared to make a resistance; they had evidently been apprised of our intention to disarm them. The sentry fired his musket and killed one of our men; his example was followed by the others, and a volley was fired on the sailors as they advanced through the broken wall near the southern gateway. The guns had been placed in position in front of Bibi Paris tomb, so as to command the entrance, and they opened fire upon our men with grape. As soon as the sailors had got well into the place, they fired a volley. Lieutenant Lewis then led them up the ramparts to the left, charging the sepoys, and driving them before them at the point of the bayonet. The sepoys took shelter in their quarters, but they were driven on from building to building by the sailors. At this time Mr. Mays, a midshipman, at the head of eight men, who were under his command, made a gallant charge from the ramparts down upon the sepoy guns; they were soon taken and spiked, and the sepoys began flying in every direction. There was a severe struggle at the end of the rampart : many of the sepoys were driven over the parapet Mr Bainbridge had also a fall over the parapet as he stepped back to avoid the thrust of one of the sepoys. The sailors obtained a complete victory; the sepoys fled and concealed themselves in the jungle, leaving about forty of their number killed Many of those who escaped were severely wounded. Our loss was one killed on the field, four severely wounded, since dead, and nine more or less severely wounded. Dr. Green, who accompanied the sailors, was wounded in the thigh. He was kneeling down at the time attending to one of the sailors who had also been wounded."

The mutineers fled towards Maimansinh and Silhet, but several of the fugitives were captured, brought in, and executed. A portion of them are said to have ultimately succeeded in reaching Bhutan territory.

A Statistical Account Bengal, Vol V p 124-126
W. W. Hunter

Chittagong

At the time of the Mutiny of 1857, the 2d, 3d, and 4th companies of the 34th Regiment Native Infantry were stationed at Chittagong; and in consideration of their good conduct, these companies were by order of the Governor-General in Council, dated the 21st April 1857, excepted from the prohibition of furlough to that regiment, pending an inquiry that was then proceeding at Barrackpur On the 7th June, Mr. Chapman, then Officiating Commissioner, informed the Government of Bengal that the sepoys at Chittagong had expressed a desire to be sent to Delhi against the insurgents, and this 'declaration of the fidelity and devotion of the detachment' was acknowledged by the governor-General in Council Notwithstanding, however, the good conduct and apparent loyalty of the sepoys at Chittagong, they were distrusted by the inhabitants of the town, and on the 13th June the Officiating Commissioner reported to Government that although 'the sepoys have done nothing as yet to give rise to any distrust of them, and their officers are all fully persuaded that their desire to be sent to Dehli to act against the insurgent regiments is as great as it is genuine,' still 'the people would be much relieved if the offer of the troops were accepted.' On the day that this letter was written, the fear which existed among the people became more marked; and on the 19th june, Mr. W. H. Henderson, the Magistratge, reported to the Government that 'a panic has existed' since the 13th June 'amongst all classes of East Indians and Portuguese residents, that the city is to be attacked, and that murder and plunder will be the consequence. A great many of the families have embarked upon vessels lying at anchor in the harbour, and have left their houses, merely coming occasionally on shore during the daytime ' Mr. Henderson concluded his letter in these words : 'I consider this popular excitement deserving the attention of the Government; for although the grounds of this alarm are based upon idle and absurd reports, yet the result might be most dangerous to the minds of the soldiers stationed here, who have already expressed their desire to be sent to Delhi against the insurgents.' The panic among the East Indians and Portuguese did not, however, have any immediate effect on the sepoys; for on July 11th, the Commissioner reported that the panic had completely subsided, and that Captain Dewaal, the officer in command, felt no anxiety about his men. The result showed that there was some cause at least for the popular excitement which the magistrate has reported; but it was not until the night of the 18th November that the outbreak occurred. The Officiating Commissioner, in his report to the Government of Bengal, dated the 19th November 1857, thus describes what took place :— 'The three companies of the 34th Regiment Native Infantry rose suddenly at 11 P.M. last evening; they released all the prisoners from the jail, killed one *barkandaz* (native constable), carried away all the treasure, and left the station at 3 A.M. this morning with

three Government elephants, ammunition, and treasure. There was no time to give information to any one, and each of the residents had to take care of himself and his family. As far as I have been able to ascertain, all the residents have escaped uninjured. . . . No houses were burnt, only the lines and the magazine, to both of which they set fire before leaving the station. . . . The records and stamps are all safe, as also the salt at the '*sadr-ghat golas.*' On the following day, the 20th November, the Commissioner confirmed his statement that no one was killed in the station except the one *barkandaz* mentioned; and he added that 'the mutiny was evidently planned very suddenly, and as suddenly carried out. Not a person in the station, Christian or native, appears to have obtained the slightest notice. The native inhabitants were just as much taken by surprise as ourselves. Of course all was in confusion on the night of the 18th; but it speaks most highly for the good feeling and conduct of the inhabitants that not a single case of theft or plunder took place. . . . I cannot record to strong an expression of the good feeling shown towards Government by all with whom I come in contact.' The mutineers after leaving Chittagong marched northwards, and on the 22d November they crossed the river Pheni and entered the territory of the Raja of Hill Tipperah. Their party consisted in all of about 500 persons, including women and children, and the persons set free from the jail. Although both in Tipperah and Chittagong they abstained from plundering the *bazars*, and paid highly for whatever they could get, still they were reduced to the greatest straits for want of provisions, and several of the women are said to have died from the privations to which they were exposed. On the 3d December, 300 men of the 54th Queen's Regiment arrived at Dacca, and as soon as they had obtained provisions, they started for Tipperah, in order, if possible, to intercept the men of the 34th, before they could reach Sylhet; but the mutineers kept too close to the jungles of Tipperah, and the European troops returned to Dacca without having met them. The Sylhet Light Infantry, however, came up with them on two occasions, and each time beat them. Besides their loss on these occasions, the mutineers found that there was no safety even beyond the Company's territory. Although the Rájá of Hill Tipperah was not strong enough to oppose the well-trained sepoys of the Company, still, those who lingered behind the main body were arrested, sent in to the British authorities, and executed; while others, who in their distress took refuge further east, were in constant fear of being detected by hillmen, and given over to the British authorities for the sake of the reward of £5, offered by Government for the apprehension of each mutineer. The amount of Government treasure taken by the mutineers was Rs. 278,267, I, I. In addition to this, they carried off a chalice, a paten, and an alms-dish, appertaining to the Protestant Church, and some small sums of money, which they found in the Treasury, belonging to the Government school, and to private individuals. The sepoys on their road distributed money freely both in gift

and as payment for provision; and only Rs. 35,103, 8, 5 was subsequently recovered by the authorities of Sylhet and Cachar, and Rs. 17,641, 15, 7 through the Commissioner of Chittagong and the Magistrates of Chittagong and Tipperah.

**Statical Account of Bengal Vol VI p. 121-124*
W W Hunter

Muzaffarpur

The following account of the events that occurred in Tirhut District in 1857, has been compiled from vol. iii. of Sir J. Kaye's 'History of the Sepoy War,' and the correspondence on the subject in the Muzaffarpur Collectorate.

When the news arrived in June 1857 that Dehli was in the hands of the insurgents, there was considerable uneasiness in the minds of all the English inhabitants of Behar. Although few mutinous sepoys had returned to their homes in Tirhut. there was a loud cry for protection from the European community throughout the District, who believed that the *nájíbs* were not to be trusted, and that the Musulmáns, at least, among the general population, would also :se. Nor was the alarm confined to the Christians. The better class of natives began to send away their families and valuables, as early as the middle of June. About the third week of that month, intelligence reached the Tirhut authorities that Wáris Alí, a police *jamádár,* said to have been of the blood-royal of Dehli, was in treasonable correspondence with certain Muhammadans in Patná A young Civilian with four indigo-planters was deputed to arrest the man. The party started in the early morning, and came upon him in the act of writing a treasonable letter to a notoriously disaffected friend living half-way between Patná and Gayá. All preparations for immediate flight were found in his house and stables. Wáris Ali was taken to the station, and shortly afterwards hanged.

On the following morning the troops broke out into open mutiny. Headed by one Jarif Khán, they robbed the Monghyr mail and plundered the Collector's house. They then attacked the Treasury and Jail, but the police and *najibs* stood to their posts and drove them off, on which they decamped towards Aliganj Sewán in Sáran. The Collector, on hearing of the outbreak, returned to Muzaffarpur, where he found everything quiet, and the people ready to welcome the re-establishment of our authority.

No further outbreak took place in Tirhut District. Cases of seditious language, however, were common; while danger was also feared from the movements of mutineers in the adjacent parts. A wandering body of them had entered the *tarái,* north of Purniah, and it was supposed that they might descend on Tirhut from Nepál. At one time, intelligence came that they were only 26 miles north-west from Sursand in the Sitámarhí Subdivision, The danger, however, was not great, as the Station was now

protected by a force of 350 Gurkhás, who had been sent by Jang Bahádur; while a detachment of yeomanry was at Púsá, ready to move where required. As a further protection, it had been thought desirable to fortify the Collectorate office with a parapet wall, ditches and ramparts. But these defensive preparations were never called into use.

A Statistical Account Bengal. Vol. XIII p 214-15
W W. Hunter

Chatra

On the 2d October 1857, a severe action took place at Chatra between H.M.'s 53d Regiment (supported by a detachment of Rattry's Sikhs) and the Ramgarh Battalion, who had mutinied at Ranchi, and were marching with four guns and a large quantity of ammunition to join Kunwar Singh at Bhojpur. The mutiners, posted in great force on the brow of a hill, made a stubborn resistance, but were defeated with a loss of forty men, all their supplies, and the regimental colours at this action Lieutenant (now Major) John Charles Campbell Daunt of the 70th Bengal N.I., and Serjeant Dynon of H.M.'s 53d Foot, won the Victoria Cross for conspicuous gallantry in capturing too guns by pistolling the gunners, who were moving down the detachment with grape.

A Statistical Account of Bengal Vol. XVI p 88
W. W Hunter

Gaya

The follwing paragraphs are condensed from Sir J. W. Kaye's *History of the Sepoy War in India,* vol. iii, pp. 151- 159 :—

The mutiny of the Sepoy regiments at Dinápur on July 25, 1857, and the march of the mutineers into Sháhábád District, have been described in the Statistical Accounts of Patná and Sháhabád Mr. Tayler, the Commissioner of Patná, on receiving news of the disaster which had be fallen Dunba's relieving party near Arrah, gave orders to the chief officers in his Division to withdraw their establishments into the city of Patná.

"In the month of July 1857, the two chief British officers stationed at Gayá were Mr. Trotter the Judge, and Mr. Alonzo Money the Magistrate of Behar. There had, ever since the commencement of the convulsions in Upper India, been indications in the District of an unquiet spirit pervading more or less all classes of the community, and strongest, perhaps, among the Hindu *zamindárs*. In the city itself the Bráhmans had been busy, industriously disseminating the fiction, so rife in all parts of the country, of the mixture of the bones or blood of swine and oxen with the *atta*, or flour, in the *bázárs*. It seemed to be one of their principal objects to corrupt the Sikh soldiery who were posted there, and to win them over to the rebel cause by these fabrications. When it was found that this was of

no avail, they ostracised the Sikhs, declaring them to be Christians. It became necessary to suppress these machinations with a strong hand, so a carpenter, against whom there was proof of having attempted to corrupt two Sikh soldiers, was hanged in the most public manner before all the troops and the police in the place. The example had a salutary effect in the city.

"When news reached Mr. Money that the Dinápur regiments had revolted, he bethought himself of active measures of defence. 'The mutiny of Dinápur,' he wrote to the Bengal Government, 'has thrown Gayá into a ferment. There is nothing, however, to be apprehended from the townspeople. They are surrounded by a new and strong police, and have a wholesome dread of the forty-five English and one hundred Sikhs. The present causes of apprehension are two—the inroad of any large number of Dinápur mutineers, or the approach of the Monghyr and Deoghar Fifth Irregulars, who are sure to rise, I imagine . If the mutineers, or any portion of them, come this way, they will either remain in the District and be joined by disaffected *zamindárs*,or they will make for Gayá. There are plenty of *zamindárs* who would join them, if they once got the upper hand; but n ne, I think, that will hazard life and property before that. The follwing is our plan of operations :— Any body of the mutineers under 300 or 350, are to be met about two miles from the town; 45 English, 100 Sikhs, and 40 *najibs*, besides four or five residents, will oppose them. I shall put the *najibs* between the Sikhs and the English, so they must be staunch or be cut to pieces. The mutineers would be dejected and tired after a long march, and I have no doubt of giving them a good thrashing. If they come in large numbers, I shall place the treasure in a brick-house, which is being provisioned, and we will defend it with the same numbers as above.' "

Affairs were in this state, when news of Dunbar's disaster having reached Patná, Mr. Tayler issued the orders of which I have above spoken. How those orders were received at Gayá cannot be better told than in the words of the Magistrate himself :—

" 'On the 31st of July,' wrote Mr. Alonzo Money, not long afterwards, 'I was sitting in my room, talking to the *subahdár* of the *najibs*, when a letter, marked 'urgent' and 'express,' was put into my hands. I opened it; it was from the Commissioner. It contained a telegraph message from the Government, and an order for me. 'The message spoke of the defeat of Dunbar's party near Arrah, and continued : 'Everything must now be sacrificed to holding the country and the occupation of a central position.' The order desired me and the other civil authorities to come with all our force to Patná, making our arrangements as promptly and quickly as possible. It contained an injunction to remove the treasure, if doing so endangered not personal safety. 'What does the Commissioner Sáhib say?' asked the *subahdár*. I made some excuse, and after a minute or two sent him off. I then despatched a circular round the station, and within an

hour every one was present. It was agreed that we should start at five that evening. . . . At six we started.' They went, leaving everything behind them—seven or eight *lákhs* of rupees in the treasury, and a gaol gorged with criminals; leaving the station and all that it contained under the charge of the *dárogá* and the *subahdár* of the *najíbs,* and set their faces towards Patná in obedience to the orders they had received. But the orders were that they should not abandon the treasure unless their lives were endangered by the attempt to remove it; and there were those at Gayá who thought that they might have safely remained to complete their measures for the safe custody of the coin

"But they had not ridden more than two or three miles, when Alonzo Money fell into conversation with a gentleman of the Uncovenanted Service named Hollings. He was an officer attached to the Opium Agency, and he had no duty demanding his return to Gayá. But he felt acutely the degradation of the sudden abandonment of the station. Mr. Money was moved by kindred feelings. So these two brave men determined to return to Gayá, and see what could be done to save the property of the Government, and lessen the discredit of this precipitate retreat. Whilst, therefore, the rest went on to Patná, Money and Hollings went back to the station which they had so lately quitted. They found things nearly as they had left them. The treasure remained intact; the goal held fast its prisoners. Up to this time the *najibs* had faithfully fulfilled their trust. The return of the Magistrate seemed to give confidence to the people. Many of the most respectable inhabitants waited on Mr. Money, and welcomed him back with expressions of joy. But when, as a measure of precaution, not unwise in itself, he burnt the Government stamped paper, the first feeling of confidence subsided, and presently the *najíbs* rose against us.

"It was now plain that the position of these gallant Englishmen was one of no common difficulty and danger. Not only was there, as far as their information then extended, a prospect of being visited by the Dinápur mutineers and the insurgent rabble under Kuar Sinh, but they were threatened more imminently by an incursion of mutineers from Hazáribágh, where the native troops had also revolted. The first step, therefore, to be taken was to recall the detachment of Her Majesty's Sixty-fourth, which had left Gayá just before the European exodus; and this done, the treasure was to be secured. Every effort was made to collect carriage for the transport of the coin, and on the 4th of August the convoy was ready to depart. But in what direction was it to proceed? The order (it has been shown) which Money had received was that he should convey the treasure to Patná, if it could be done without endangering European life. And this was the course which, in the first instance, he had resolved to pursue. But when false rumours came from Dinapur that a body of mutineers was marching on Gayá, and that martial law had been proclaimed in all the Behar Districts, there seemed to be little hope of so small a party, heavily encumbered, reaching Patná in safety. It was

determined, therefore, at a council of civil and military officers, that the better course would be to take the Grand Trunk Road to Calcutta—a far longer but a safer journey. So the treasure party moved out from Gayá, under command of Captain Thompson

"That night the little party was attacked by a mixed crowd of gaol-birds and gaolers. The escaped prisoners, and the *najíbs* who should have forbidden their escape, had made the expected combination, and had come to seize the treasure. Although it was a night-attack, it was not a surprise. Thompson's men were ready for them, and they gave the would be plunderers a warm reception; some of them were shot down, and the rest were glad to carry their lives back with them to Gayá. From that time Money went on his way uninterrupted and unmolested; and in the middle of August he rode into Calcutta, and delivered over to Government the large amount of treasure which he had rescued from the clutches of the insurgents. Among the exploits of the war scored down to the credit of the Bengal Civil Service, there are few which at the time excited more enthusiasm than this. The Governor-General and his colleagues commended the conduct of Alonzo Money, and sent him back to Gayá with enlarged responsibilities and increased emoluments. Mr. Hollings also had substantial reasons for knowing that his conduct was approved by the higher authorities."

A Statistical Account of Bengal Vol XII p 65 69
W W Hunter

Shahabad

The following paragraphs, describing the events that took place in Sháhábád District during the Mutiny of 1857, are condensed from Sir J. W. Kaye's *History of the Sepoy War* (vol. iii, 1876) :—

The outbreak of the Sepoy regiments at Dinápur on the 25th July 1857, which has been described in the Statistical Account of Patná District (vol. xi. pp. 87–90), resulted in the flight of most of the mutineers across the Són into Sháhábád. This course was directed by two considerations. It is said that many of them had been recruited in this District, and they found here a leader ready to put himself at their head. This was Kuár Sinh (Kooer Sing) of Jagdispur, a Rájput of much influence, nearly fourscore years of age, who had once owned large estates, but was now impoverished. As regards this man, Mr. Tayler, the commissioner of Patná, had written in the middle of June expressive of his loyalty; and again to the same effect a month later. The Magistrate, Mr. Wake, confirmed this opinion. But officers in other districts reported that there were many influential *zamíndárs* eagerly watching his movements, and ready to follow him into rebellion. Mr. Tayler, therefore, invited him to Patná; but this invitation was politely declined, on the plea of old age and bad health. At this time, the Kuár was in money

difficulties, and was endeavouring to clear himself and save his estates by official aid. At a critical moment, however, Government withdrew its assistance, and the Kuár cast in his lot with the mutineers.

The rebel army, consisting of about 2000 sepoys, and a multitude of armed insurgents perhaps four times as numerous, marched on Arrah. They reached the town on the 27th July, and forthwith released all the prisoners in the jail, and plundered the Treasury. The European women and children had already been sent away; but there remained in the town about a dozen Englishmen, official and non-official, and three or four other Christians of different races. Mr. Tayler had supplied a garrison of fifty Sikhs. This small force held out for a long eight days, until rescued by Major Vincent Eyre

The centre of defence had been wisely chosen. At this time, the East Indian Railway was under construction, under the local super intendence of Mr. Vicars Boyle, who, fortunately, had some knowledge of fortification He occupied two houses, now known as the Judge's houses; the smaller of which, a two-storied building, about twenty yards from the main house, was fortified and provisioned. The lower windows, &c. were built up, and sand-bags ranged on the roof. When the news came that the Dinápur mutineers were streaming along the Arrah road, the Europeans and Sikhs retired to the smaller house. The mutineers, after pillaging the town, made straight for Mr. Boyle's little fortress. A volley dispersed them, and forced them to seek the shelter of the larger house, only a few yards off, whence they carried on an almost continuous fire. They tried to burn or smoke out the little garrison, and attempted various other safe modes of attack; but they had no guns. Kuár Sinh, however, produced two small cannon which he had dug up, and artillery missiles were improvised out of the house furniture. Within, there was no thought of surrender. Mr. Herwald Wake, the Magistrate, put himself in command of the Sikhs, who, though sorely tempted by their countrymen among the mutineers, remained faithful throughout the siege. The miserable failure of a relieving party, who had proceeded by water from Dinápur, has been already described in the Statistical Account of Patná District (vol. xi. pp. 87-90). It was headed by Captain Dunbar, and composed of 150 Europeans. Starting from Dinápur by steamer, they landed in Sháhábád, only to fall into an ambuscade between two and three miles from Arrah, and to be driven back in most disastrous retreat.

As time passed away, and no help came, provisions and water began to run short. A bold midnight sally resulted in the capture of four sheep, while water was obtained by digging a well 18 feet deep inside the house. A mine of the enemy was met by countermining. On the 2d August, however, the party inside the house observed an unusual excitement in the neighbourhood. The fire of the enemy had slackened, and but few of them were visible. The sound of a distant cannonade was heard; before sunset

the siege was at an end, and on the following morning the brave garrison welcomed their deliverers.

Major Vincent Eyre of the Bengal Artillery, while steaming up the Ganges with his horse battery of six guns and a company of European gunners, touched at Baxár *en route* for Gházipur, and heard that the Europeans at Arrah were besieged. He immediately landed, and taking with him 150 men of the 5th Fusileers, a few mounted volunteers, and three guns with 34 artillerymen, started for Arrah on the 30th July. Rain had been falling for some weeks, and the country was well-nigh impassable; but after two days' hard marching he arrived at Bíbíganj, where the enemy had destroyed a bridge over a deep stream, which forced him to make a flank movement to get clear of the railway embankment. Here he met the forces of Kuár Sinh, and after a sharp engagement dispersed them with a bayonet charge. They never rallied; and Eyre marched straight into Arrah, where he arrived on the morning of the 3d August.

Having rested his men, he determined to pursue the old Rájput to his residence amid the jungles. He was reinforced by 200 men of the 10th Foot, and 100 of Rattray's Sik s. On the 11th August he arrived before Jagdispur, where a vast amount of grain, &c., had been stored up by the rebel chief. After some jungle-fighting, the stronghold was captured, the grain was redistributed among the villagers from whom it had been forcibly taken, and the principal buildings were blown up. Among these there was a Hindu temple, lately erected by Kuar Sinh, which was not exampted from the general fate. The Kuár himself had fled to Sásserám, with some mutineers of the 40th Regiment; from that place he passed on to Bandá, Cawnpur, and Lucknow. After some months' wanderings, he returned to Jagdispur mortally wounded by a shell, and died a few hours after his arrival. His property was confiscated; and the Jagdispur jungle, in which his retainers lurked till October 1858, was finally cleared by the present proprietors of the Bihiyá estate, and is now entirely cultivated. Mr. Burrows, a contractor on the East Indian Railway, had been presented with the lease of the jungle, on condition that he cleared a certain portion within two years. More active measures, however, became necessary, and Government offered Rs. 6 (12s.) a *bighá* for land cleared by a certain date. With 4000 men at work, a broad path a half-mile wide was driven right through the jungle; while minor gaps were cut at right angles, rendering the whole accessible, and the further concealment of rebels impossible. While this operation was being effected, constant encounters took place between the coolies and the rebels, and the utmost care had to be exercised.

A Statistical Account of Bengal vol. xii p. 217-19
W. W. Hunter

Petition from the East India Company to Parliament
February 1858

HUMBLY SHEWETH.

That your petitioners, at their own expense, and by the agency of their own civil and military servants, originally acquired for this country its magnificent empire in the East.

That the foundations of this empire were laid by your petitioners, at that time neither aided nor controlled by Parliament, at the same period at which a succession of administrations under the control of Parliament were losing to the Crown of Great Britain another great empire on the opposite side of the Atlantic.

That during the period of about a century which has since elapsed, the Indian possessions of this country have been governed and defended from the resources of those possessions, without the smallest cost to the British Exchequer, which, to the best of your petitioners' knowledge and belief., cannot be said of any other of the numerous foreign dependencies of the Crown.

That it being manifestly improper that the administration of any British possession should be independent of the general Government of the empire, Parliament provided, in 1783, that a department of the Imperial Government should have full cognizance of, and power of control over, the acts of your petitioners in the administration of India; since which time the home branch of the Indian Government has been conducted by the joint counsels, and on the joint responsibility, of your petitioners and of a minister of the Crown.

That this arrangement has at subsequent periods undergone reconsideration from the Legislature, and various comprehensive and careful Parliamentary inquiries have been made into its practical operation; the result of which has been, on each occasion, a renewed grant to your petitioners of the powers exercised by them in the administration of India.

That the last of these occasions was so recent as 1853, in which year the arrangements which had existed for nearly three-quarters of a century were, with certain modifications, re-enacted, and still subsist.

That, not withstanding, your petitioners have received an intimation from Her Majesty's Ministers of their intention to propose to Parliament a Bill for the purpose of placing the government of Her Majesty's East Indian Dominions under the direct authority of the Crown—a change necessarily involving the abolition of the East India Company as an instrument of government.

That your petitioners have not been informed of the reasons which have induced. Her Majesty's Ministers, without any previous inquiry, to come to the resolution of putting an end to a system of administration, which Parliament, after inquiry, deliberately confirmed and sanctioned less than five years ago, and which, in its modified form, has not been in operation quite four years, and cannot be considered to have undergone a sufficient trial during that short period.

That your petitioners do not understand that Her Majesty's Ministers impute any failure to those arrangements or bring any charge, either great or small, against your petitioners. But the time at which the proposal is made compels your petitioners to regard it as arising from the calamitous events which have recently occurred in India.

That your petitioners challenge the most searching investigation into the mutiny of the Bengal army, and the causes, whether remote or immediate, which produced that mutiny. They have instructed the Government of India to appoint a commission for conducting such an inquiry on the spot. And it is their most anxious wish that a similar inquiry may be instituted in this country by your [Lordships'] Honourable House; in order that it may be ascertained, whether anything either in the constitution of the Home Government of India, or in the conduct of those by whom it has been administered, has had any share in producing the mutiny, or has in any way impeded the measures for its suppresion; and whether the mutiny itself, or any circumstance connected with it, affords any evidence of the failure of the arrangements under which India is at present administered.

That, were it even true that these arrangements had failed, the failure could constitute no reason for divesting the East India Company of its functions, and transfering them of Her Majesty's Government. For, under the existing system, Her Majesty's Government have the deciding vote. The duty imposed upon the Court of Directors is to originate measures and frame drafts of instructions. Even had they been remiss in this duty, their remissness, however discreditable to themselves, could in no way absolve the responsibility of Her Majesty's Government, since the Minister for India possesses, and has frequently exercised, the power of requiring that the Court of Directors should take any subject into consideration, and prepare a draft dispatch for his approval. Her Majesty's Government are thus in the fullest sense accountable for all that has been done, and for all that has been, forborne or omitted to be done. Your petitioners, on the other hand, are accountable only in so far as the act or omission has been promoted by themselves.

That under these circumstances, if the administration of India had been a failure, it would, your petitioners submit, have been somewhat unreasonable to expect that a remedy would be found in annihilating the branch of the ruling authority which could not be the one principally in fault, and might be altogether blameless, in order to concentrate all the

powers in the branch which had necessarily the decisive share in every error, real or supposed. To believe that the administration of India would have been more free from error had it been conducted by a Minister of the Crown without the aid of the Court of Directors, would be to believe that the Minister, with full power to govern India as he pleased, has governed ill because he has had the assistance of experienced and responsible advisers.

That your petitioners, however, do not seek to vindicate themselves at the expense of any other authority. They claim their full share of the responsibility of the manner in which India has practically been governed. That responsibility is to them not a subject of humiliation but of pride. They are conscious that their advice and initiative have been, and have deserved to be, a great and potent element in the conduct of affairs in India, and they feel complete assurance that, the more attention is bestowed and the more light thrown upon India and its administration, the more evident it will become that the government in which they have borne a part has been not only one of the purest in intention, but one of the most beneficent in act, ever known among mankind; that, during the last and present generation in particular, it has been, in all departments, one of the most rapidly improving governments in the world; and that, at the time when this change is proposed, a greater number of important improvements are in a state of more rapid progress than at any former period. And they are satisfied that whatever further improvements may be hereafter effected in India can only consist in the development of germs already planted, and in building on foundations already laid, under their authority, and in a great measure by their express instructions.

That such, however, is not the impression likely to be made on the public mind, either in England, or in India, by the ejection of your petitioners from the place they fill in the Indian administration. It is not usual with statesmen to propose the complete abolition of a system of government, of which the practical operation is not condemned, and it might be generally inferred from the proposed measures, if carried into effect at the present time, that the East India Company, having been entrusted with an important portion of the administration of India, have so abused their trust as to have produced a sanguinary insurrection, and nearly lost India to the British empire ; and that, having thus crowned a long career of mis-government, they have, in deference to public indignation, been deservedly cashiered for their misconduct.

That if the character of the East India Company were alone concerned, your petitioners might be willing to await the verdict of history. They are satisfied that posterity will do them justice. And they are confident that even now justice is done to them in the minds, not only of Her Majesty's Ministers, but of all who have any claim to be competent judges of the subject. But, though your petitioners could afford to wait for the reversal of the verdict of condemnation which will be believed throughout the

world to have been passed on them and their government by the British nation, your petitioners cannot look without the deepest uneasiness at the effect likely to be produced on the minds of the people of India. To them, however incorrectly the name may express the fact, the British Government in India is the Government of the East India Company. To their minds the abolition of the Company will, for some time to come, mean the abolition of the whole system of administration with which the Company is identified. The measure, introduced simultaneously with the influx of an overwhelming British force, will be coincident with a general outcry, in itself most alarming to their fears, from most of the organs of opinion in this country as well as of English opinion in India, denouncing the past policy of the Government on the express ground that is has been too frobearing and too considerate towards the natives.' The people of India will at first feel no certainty that the new Government, or the Government under a new name, which it is proposed to introduce, will hold itself bound by the pledges of its predecessors. They will be slow to believe that a Government has been destroyed only to be followed by another which will act on the same principles and adhere to the same measures. They cannot suppose that the existing organ of administration would be swept away without ie intention of reversing any part of its policy. They will see the authorities, both at home and in India, surrounded by persons vehemently urging radical changes in many parts of that policy. And interpreting, as they must do, the change in the instrument of government, as a concession to these opinions and feelings, they can hardly fail to believe that, whatever else may be intended, the Government will no longer be permitted to observe that strict impartiality between those who profess its own creed and those who hold the creeds of its native subjects which hitherto characterized it ; that their strongest and most deeply-rooted feelings will henceforth be treated with much less regard than henceforth be treated with much less regard than heretofore . and that a directly aggressive policy towards everything in their habits, or in their usages and customs, which Englishmen deem objectionable, will be no longer confined to individuals and private associations, but will be backed by all the power of Government.

And here your petitioners think it important to observe, that in abstaining as they have done from all interference with any of the religious practices of the people of India, except such as are abhorrent to humanity, they have acted not only from their own conviction of what is just and expedient, but in accordance with the avowed intentions and express enactments of the legislature, framed 'in order that regard should be had to the civil and religious usages of the natives,' and also that 'suits, civil or criminal, against the natives,' should be conducted according to such rules 'as may accommodate the same to the religion and manners of the natives.' That their policy in this respect has been successful, is evidenced by the fact, that during a military mutiny, said to have been

caused by unfounded apprehensions of danger to religion, the heads of the native states, and the masses of the population, have remained faithful to the British Government. Your petitioners need hardly observe how very different would probably have been the issue of the late events, if the native princes, instead of aiding in the supperssion of the rebellion, had put themselves at its head, or if the general population had joined in the revolt ; and how probable it is that both these contingencies would have occurred, if any real ground had been given for the persuasion that the British Government intended to identify itself with proselytism. And it is the honest conviction of your petitioners that any serious apprehension of a change of policy in this respect would be likely to be followed, at no distant period, by general rising throughout India.

That your petitioners have seen with the greatest pain the demonstrations of indiscriminate animosity towards the natives of India, on the part of our countrymen in India and at home, which have grown up since the late unhappy events. They believe these sentiments to be fundamentally unjust; they know them to be fatal to the possibility of good government in India. They feel that if such demonstrations should continue, and, especially if weight be added to them by legislating under their supposed influence, no amount of wisdom and forbearance on the part of the Government will avail to restore that confidence of the government in the intentions of their rulers without which it is vain even to attempt the improvement of the people.

That your petitioners cannot contemplate without dismay the doctrine now widely promulgated that India should be administered with an especial view to the benefit of the English who reside there; or that in its administration any advantage should be sought for Her Majesty's subjects of European birth, except that which they will necessarily derive from their superiority of intelligence, and from the increased prosperity of the people, the improvement of the productive resources of the country, and the extension of commercial intercourse. Your petitioners regard it as the most honourable characteristic of the government of India by England, that it has acknowledged no such distinction as that of a dominant and subject race; but has held that its first duty was to the people of India. Your petitioners feel that a great portion of the hostility with which they are assailed, is caused by the belief that they are peculiarly the guardians of this principle, and that so long as they have any voice in the administration of India, it cannot easily be infringed. And your petitioners will not conceal their belief that their exclusion from any part in the government is likely, at the present time, to be regarded in India as a first successful attack on that principle.

That your petitioners, therefore, most earnestly represent to your [Lordships'] Honourable House, that, even if the contemplated change could be proved to be in itself advisable, the present is a most unsuitable time for entertaining it; and they most strongly and respectfully urge on

your [Lordships'] Honourable House the expediency of at least deferring any such change until it can be effected at a period when it would not be, in the minds of the people of India, directly connected with the recent calamitous events, and with the feelings to which those events have either given rise or have afforded an opportunity of manifestation. Such postponement, your petitioners submit, would allow time for a more mature consideration than has yet been given, or can be given in the present excited state of the public mind, to the various questions connected with the organization of a Government for India; and would enable the most competent minds in the nation calmly to examine whether any new arrangement can be devised for the home Government of India, uniting a greater number of the conditions of good administration than the present; and, if so, which among the numerous schemes which have been or may be proposed, possesses those requisites in the greatest degree.

That your petitioners have always willingly acquiesced in any changes which, after discussion by Parliament, were deemed conducive to the general welfare, although such changes may have involved important sacrifices to themselves. They would refer to their partial relinquishment of trade in 1813; to its total abandonment and the placing of their Commercial Charter in abeyance, in 1833; to the transfer to India of their commercial assets, amounting to £15,858,000, a sum greatly exceeding that ultimately repayable to them in respect of their capital, independent of territorial rights and claims; and to their concurrence in 1853, in the measure by which the Court of Directors was reconstructed, and reduced to its present number. In the same spirit, your petitioners would gladly co operate with Her Majesty's Government in correcting any defects which may be considered to exist in the details of the present system; and they would be prepared, without a murmur, to relinquish their trust altogether, if a better system for the control of the Government of India can be devised. But, as they believe that in the construction of such a system there are conditions which cannot, without the most dangerous consequences, be departed from, your petitioners respectfully and deferentially submit to the judgement of your [Lordships'] Honourable House their view of those conditions, in the hope that if your [Lordships'] Honourable House should see reason to agree in that view, you will withold your legislative sanction from any arrangement for the government in question in at least an equal degree with the present.

That your petitioners may venture to assume that it will not be proposed to vest the home portion of the administration of India in a Minister of the Crown, without the adjunct of a Council composed of statesmen experienced in Indian affairs. Her Majesty's Ministers cannot but be aware that the knowledge necessary for governing a foreign country, and in particular a country like India, requires as much special study as any other profession, and cannot possible be possessed by any

one who has not devoted a considerable portion of his life to the acquisition of it.

That in constituting a body of experienced advisers to be associated with the Indian Minister, your petitioners consider it indispensable to bear in mind that this body should not only be qualified to advise the minister, but also, by its advice, to exercise, to a certain degree, a moral check. It cannot be expected that the Minister, as a general rule, should himself know India; while he will be exposed to perpetual solicitations from individuals and bodies, either entirely ignorant of that country, or knowing only enough of it to impose on those who know still less than themselves, and having very frequently objects in view other than the interests or good government of India. The influences likely to be brought to bear on him through the organs of popular opinion will, in the majority of cases, be equally misleading. The public opinion of England, itself necessarily unacquainted with Indian affairs, can only follow the promptings of those who take most pains to influence it, and these will generally be such as have some private interest to serve. It is, therefore, your petitioners submit, of the utmost importance that any Council which may form a part of the Home Government of India should derive sufficient weight from its constitution, and from the relation it occupies to the Minister, to be a substantial barrier against those inroads of self-interest and ignorance in this country from which the Government of India has hither to been comparatively free, but against which it would be too much to expect that Parliament should of itself afford a sufficient protection.

That your petitioners cannot well conceive a worse form of government for India than a Minister with a Council whom he should be at liberty to consult or not at his pleasure, or whose advice he should be able to disregard, without giving his reasons in writing, and in a manner likely to carry conviction. Such an arrangement, your petitioners submit, would be really liable to the objections, in their opinion, erroneously urged against the present system. Your petitioners respectfully represent that any body of persons associated with the Minister, which is not a check, will be a screen. Unless the Council is so constituted as to be personally independent of the Minister, unless it feels itself responsible for recording an opinion on every Indian subject, and pressing that opinion on the Minister, whether it is agreeable to him or not; and unless the Minister, when he overrules their opinion, is bound to record his reasons, their existence will only serve to weaken his responsibilities and to give the colourable sanction of prudence and experience to measures in the framing of which those qualities have had no share.

That it would be vain to expect that a new Council could have as much moral influence, and power of asserting its opinion with effect, as the Court of Directors. A new body can no more succeed to the feelings and authority which their antiquity and historical antecedents give to the

East India Company than a legislature under a new name, sitting in Westminster, would have the moral ascendancy of the Houses of Lords and Commons. One of the most important elements of usefulness will thus be necessarily wanting in any newly constituted Indian Council, as compared with the present.

That your petitioners find it difficult to conceive that the same independence in judgement and act, which characterizes the Court of Directors, will be found in any Council all of whose Members are nominated by the Crown. Owing their nomination to the same authority, many of them probably to the same individual Minister, whom they are appointed to check, and looking to him alone for their reappointment, their desire of recommending themselves to him and their unwillingness to risk his displeasure by any serious resistance to his wishes, will be motives too strong not to be in danger of exercising a powerful and injurious influence over their conduct. Nor are your petitioners aware of any mode in which that injurious influence could be guarded against, except by conferring the appointments, like those of the judges, during good behaviour; which, by rendering it impossible to correct an error once committed, would be seriously objectionable

That your petitioners are equally unable to see how, if the controlling body is nominated by the Minister, that happy, independence of Parliamentary and party influence, which has hitherto distinguished the administration of India and the appointment to situations of trust and importance in that country, can be expected to continue. Your petitioners believe that in no Government known to history have appointments to offices, and especially to high offices, been so rarely bestowed on any other considerations than those of personal fitness. This characteristic, but for which in all probability India would long since have been lost to this country, is, your petitionar's conceive, entirely owing to the circumstance that the dispensers of patronage have been persons unconnected with party, and under no necessity of conciliating Parliamentary support, that, consequently, the appointments to officers in India have been, as a rule, left to the unbiassed judgement of the local authorities, while the nominations to the civil and military services have been generally bestowed on the middle classes, irrespective of political considerations, and, in a large proportion, on the relatives of persons who had distinguished themselves by their services in India.

That your petitioners, therefore, think it essential that at least a majority of the Council which assists the Minister for India with its advice, should hold their seats independently of his appointment.

That it is, in the opinion of your petitioners, no less necessary that the order of the transaction of business should be such as to make the participation of the Council in the administration of India a substantial one. That to this end, it is, in the opinion of your petitioners, indispensable that the dispatches to India should not be prepared by the

Minister and laid before the Council, but should be prepared by the Council and submitted to the Minister. This would be in accordance with the natural and obvious principle that persons chosen for their knowledge of a subject should suggest the mode of dealing with it, instead of merely giving their opinion on suggestions coming from elsewhere. This is also the only mode in which the Members of the Council can feel themselves sufficiently important or sufficiently responsible to secure their applying their minds to the subjects before them. It is almost unnecessary for your petitioners to observe, that the mind is called into far more vigorous action by being required to propose than by being merely called on to assent. The Minister has necessarily the ultimate decision. If he has also the initiative, he has all the powers which are of any practical moment. A body, whose only recognized function was to find fault, would speedily let that function fall into desuetude. They would feel that their co-operation in conducting the government of India was not really desired; that they were only felt as a clog on the wheels of business. Their criticism on what had been decided without their being collectively consulted would be felt as importunate, as a mere delay and impediment; and their office would probably be seldom sought by those who were willing to allow its most important duties to become nominal.

That with the duty of preparing the dispatches to india, would naturally be combined the nomination and control of the home establishments. This your petitioners consider absolutely essential to the utility of the Council. If the officers through whom they work are in direct dependence upon an authority higher than theirs, all matters of importance will in reality be settled between the Minister and the subordinates, passing over the Council altogether.

That a third consideration, to which your petitioners attach great importance, is, that the number of the Council should not be too restricted. India is so wide a field, that a practical acquaintance with every part of its affairs cannot be found combined in any small number of individuals. The Council ought to contain men of general experience and knowledge of the world; also men specially qualified by financial and revenue experience, by judicial experience, diplomatic experience, military experience, It ought to contain persons conversant with the varied social relations and varied institutions of Bengal, Madras, Bombay, the North Western Provinces, the Pubjab, and the native states. Even the present Court of Directors, reduced as it is in numbers by the Act of 1853, does not contain all the varieties of knowledge and experience desirable in such a body. Neither, your petitioners submit, would it be safe to limit the number to that which would be strictly sufficient, supposing all the appointments to be the best possible, A certain margin should be allowed for failures, which, even with the most conscientious selection, will sometimes occur. Your petitioners, moreover, cannot overlook the possibility that, if the nomination takes place by Ministers at the head of

a political party, it will not always be made with exclusive reference to personal qualifications; and it is indispensable to provide that such errors or faults in the nominating authority, so long as they are only occasional, shall not seriously impair the efficiency of the body.

That while these considerations plead strongly for a body not less numerous than the present, even if only regarded as advisers of the Minister, their other office, as a check on the Minister, forms, your petitioners submit, a no less forcible objection to any considerable reduction of the present number. A body of six or eight will not be equal to one of eighteen, in that feeling of independent self-reliance which is necessary to induce a public body to press its opinion on Minister to whom that opinion is unacceptable. However unobjectionably in other respects so small a body may be constituted, reluctance to give offence will be likely, unless in extreme cases, to be a stronger habitual inducement in their minds than the desire to stand up for their convictions.

That if, in the opinion of your [Lordships'] Honourable House, a body can be constituted which unites the above enumerated requisites of good government in a greater degree than the Court of Directors, your petitioners have only to express their humble hope that your endeavours for that purpose may be successful. But if, in enumerating the conditions of a good system of home government for India, your petitioners have in fact enumerated the qualities possessed by the present system, then your petitioners pray that your [Lordships'] Honourable house will continue the existing powers of the Court of Directors.

That your petitioners are aware that the present Home Government of India is reproached with being a double Government; and that any arrangement by which an independent check is provided to the discretion of the Minister will be liable to a similar reproach. But they conceive that this accusation originates in an entire misconception of the functions devolving on the Home Government of India, and in the application to it of the principles applicable to purely executive departments. The Executive Government of India is, and must be, seated in India itself. The Court of Directors is not so much an executive as a deliberative body. Its principal function, and that of the Home Government generally, is not to direct the details of administration, but to scrutinize and revise the past acts of the Indian Government; to lay down principles, and issue general instructions for their future guidance, and to give or refuse sanction to great political measures, which are referred home for approval. These duties are more analogous to the functions of Parliament, than to those of an Executive Board; and it might almost as well be said that Parliament, as that the Government of India, should be constituted on the principles applicable to Executive Boards. It is considered an excellence, not a defect, in the constitution of Parliament, to be not merely a double but a triple Government. An executive authority, your petitioners submit, may

often with advantage be single, because promptitude is its first requisite. But the function of passing a deliberate opinion on past measures, and laying down principles of future policy, is a business which, in the estimation of your petitioners, admits of, and requires the concurrence of more judgements than one. It is no defect in such a body to be double, and no excellence to be single; especially when it can only be made so by cutting off that branch of it which by previous training is always the best prepared, and often the only one which is prepared at all, for its peculiar duty.

That your petitioners have heard it asserted that, in consequence of what is called the double Government, the Indian authorities are less responsible to Parliament and the nation, than other departments of the Government of the empire, since it is impossible to know on which of the two branches of Home Government the responsibility ought to rest. Your petitioners fearlessly affirm, that this impression is not only groundless, but the very reverse of the truth. The Home Government of India is not less, but more responsible, than any other branch of the administration of the State; in as much as the President of the Board of Commissioners, who is the Minister for India, is as completely responsible as any other of Her Majesty's ministers, and in addition, his advisers also are responsible. It is always certain, in the case of India, that the President of the Board of Commissionners must have either commanded or sanctioned all that has been done. No more than this, your petitioners submit, can be known in the case of the head of any department of Her Majesty's Government. For it is not, nor can it rationally be supposed, that any Minister of the Crown is without trusted advisers; and the Minister for India must, for obvious reasons, be more dependent than any other of Her Majesty's Ministers upon the advice of persons whose lives have been devoted to the subject on which their advice has been given. But in the case of India, such advisers are assigned to him by the constitution of the Government, and they are as much responsible for what they advise as he for what he ordains; while in other departments the Minister's only official advisers are the subordinates in his office—men often of great skill and experience, but not in the public eye; often unknown to the public even by name; official reserve precludes the possibility of ascertaining what advice they give, and they are responsible only to the Minister himself. But what application of terms this can be called responsible government, and the joint government of your petitioners and the India Board an irresponsible government, your petitioners think it unnecessary to ask.

That, without knowing the plan on which Her Majesty's Ministers contemplate the transfer to the Crown of the servants of the Company, your petitioners find themselves unable to approach the delicate question of the Indian army, further than to point out that the high military qualities of the officers of that army have unquestionably sprung in a great degree from its being a principal and substantive army, holding Her Majesty's

commissions and enjoying equal rank with Her Majesty's officers, and your petitioners would earnestly deprecate any change in that position.

That your petitioners, having regard to all these considerations, humbly pray your Honourable House that you will not give your sanction to any change in the constitution of the Indian Government during the continuance of the present unhappy disturbances, nor without a full previous inquiry into the operations of the present system. And your petitioners further pray that this inquiry may extend to every department of Indian administration. Such an inquiry your petitioners respectfully claim, not only as a matter of justice to themselves,but because, when, for the first time in this century, the thoughts of every public man in this country are fixed on India, an inquiry would be more thorough, and its results would carry much more instruction to the mind of Parliament and of the country, than at any preceding period

Viscount Palmerston, House of Commons
12 February 1858

I RISE, Sir, in pursuance of the notice which has been given by Her Majesty's Government, to ask leave to introduce a Bill of first rate importance. I rise to ask leave to introduce a Bill for transferring from the East India Company to the Crown the government of Her Majesty's East Indian dominions. In making that proposal I feel myself bound, in the first place, to say that I do not do it in any spirit of hostility to the East India Company, or as meaning thereby to imply any blame or censure upon the administration of India under that corporation. I believe the East India Company has done many good things in India. I believe that its administration has been attended with great advantage to the population under its rule. And it is not on the ground of any delinquency on the part of the Company, but on the ground of the inconvenience and injurious character of the existing arrangements, that I propose this measure to the House. It is perhaps one of the most extraordinary facts in the history of mankind that these British Islands should have acquired such an extensive dominion in a remote part of the globe as that which we exercise over the continent of India. It is indeed remarkable that those regions, in which science and art may be said to have first dawned upon mankind, should now be subject to the rule of a people inhabiting islands which, at a time when these eastern regional enjoyed as high a civilization and as great prosperity as that age could offer, were in a state of utter barbarism. That is a remarkable circumstance; but still more remarkable is it that these extensive dominions should have been gained no by the power of a nation as a nation, but by an association of individuals, by a mercantile community, supported, indeed, to a certain degree by the power and resources of their country, but mainly indebted for success to their own

energy and enterprise. These two circumstances are undoubtedly singular in the history of the world, but it is quite as remarkable, quite as singular, that a nation like this, in which the science of government is perhaps better understood than in any other, in which the principle of popular representation has so long been established, should have deliberately consigned to the care of a small body of commercial men the management of and extensive territories, such vast interests, and such numerous populations. One could easily imagine that a wilderness in the northern part of America, where nothing lives except fur-bearing animal and a few wild Indians but little removed from the lower creation, might be confined to a company whose chief functions should be to strip the running animals of their fur, and to keep the bipeds sober; but that a great country like this should deliberately consign to the management of a mere commercial company, of a set of irresponsible individuals, a great territory, occupied by different races, professing divers religions, and should place in their hands the determination of all the questions of peace and war and of international relations with independent princes, which must necessarily arise, is, I believe, a circumstance unexampled in the history of mankind. But this country never designedly did any such thing. The existing state of things grew up gradually from a very small beginning. The original settlers began with a factory, the factory grew into a fort, the fort expanded to a district, and the district to a province, and then came collisions with less civilized neighbours, injuries to be resented, attacks to be repelled, and conflicts which always ended in victory and extension of territory. So, gradually, from one transaction to another, grew up that state of things in which the East India Company found itself invested with vast commercial privileges and with most important political functions. This state of things continued up to the year 1784, when there was an infusion of responsibility in respect of its political administrative functions into the affairs of the Company by the establishment of the Board of Control. Matters went on under this new arrangement for a number of years, during which the Company continued, subject to a slight interference from the Board of Control, to discharge its political functions, and at the same time to exercise all its commercial rights. One would have imagined that in a country like this that first step would have been followed up; that before anything else was done the reflective British nation would have pursued the course inaugurated in 1784, and that, as the effect of the measure then adopted was to limit to a certain degree the political functions of the Company, the next step would have been to take them away altogether, and to leave the Company in its original position as a trading association. However, it happens that in this country commercial matters often attract more attention and excite deeper interest than political affairs, and the next step was, not to meddle further with the political functions of the Company, but to take away all the commercial privileges which originally constituted the foundation of its

existence. Accordingly, in the year 1833 the Company altogether ceased to be a commercial association, and became, one may say, but a phantom of its original body. It lost the commercial character for which it was originally founded, and continued to be merely a political instrument, by means of which the administration of India was carried on Now, sir, I venture to think that the arrangement so made was a most inconvenient and most cumbrous arrangement. The principle of our political system is that all administrative functions should be accompanied by Ministerial responsibility—responsibility to Parliament, responsibility to public opinion, responsibility to the Crown; but in this case the chief functions in the government of India are committed to a body not responsible to Parliament, not appointed by the Crown, but elected by persons who have no more connexion with India than consists in the simple possession of so much India Stock. I think that that of itself is a most objectionable arrangement. In this country we are slow to make changes. The indisposition to make changes is wise and useful. As a general principle it is wise, and nations do themselves great mischief by rapid and ill-considered alterations of their institutions. But equally unwise and equally injurious is it to cling to existing . ,rangements simply because they exist, and not to admit changes which can be make with advantage to the nation. What can be more cumbrous than the existing system of Indian administration which is called by the name of the 'double Government'? In the debates of 1853, when the last India Bill was passed, the right hon. gentleman the Member for Buckinghamshire (Mr. Disraeli) asked who was the Government of India, and to whom he was to look as the authority responsible for the administration of that vast empire, Why, sir, there is no responsibility, or rather there is a conflict of responsibility. The Directors possess a power paramount, as the right hon, gentleman said, to everything else, the power of recalling the Governor-General, by which any great system of policy may be at once interrupted. And they have this power, although the Governor-General must have been appointed by the Crown, and the appointment sanctioned by the Directors. The functions of Government and the responsibility have been divided between the Directors, the Board of Control, and the Governor-General in India; the Board of Control representing the Government of the day, responsible to this House, responsibly to public opinion, appointed by the Crown, and exercising functions delegated by it; the Court of Directors, elected by the gentlemen and ladies who happen to be holders of India Stock, many of whom are totally ignorant of everything relating to Indian interests, and perhaps knowing nothing about Calcutta, Bombay, or Madras, except what they learn from the candidates for the directorship as to the presidency to which the cadetship is to belong which is promised in return for their votes. The directors are undoubtedly, in general, men of great experience and knowledge of India, but they are elected by a body of persons who have no peculiar faculty for choosing persons qualified to

govern a great empire in the East. Then comes the Governor-General, invested with great, separate, and independent powers, and among these three authorities it is obvious that dispatch and unity of purpose can hardly by possibility exist. I won't trouble the House by going into a detailed explanation of the method in which business is done, because it is very well known to those hon. Members who have given their attention to Indian affairs, that before a dispatch upon the most important matter can go out to India it has to oscillate between Cannon Row and the India House; that it is proposed by one party, altered by the other, altered again by the first, and sent back to the other; and that the adventures of a dispatch between these two extreme points of the metropolis are often as curious as those *adventures of a Guinea* of which we have all read. It is obvious that this system of check and counter-check must be attended with great inconvenience to the public service, and be productive of great delay. Take for example, a body of twenty gentlemen generally agreeing in their views, and make ten of them sit at the east end of the town and the other ten in Westminster. Propose to them any question of average difficulty and importance, and the probability is that the two parties will come to different conclusions, not being able to exchange opinions and arguments and to arrive at a common result. So it is with the Board of Control and the Court of Directors. The result in cases of material difference must necessarily be a middle term, satisfying the opinions of neither, carrying into effect the principle of neither, unsatisfactory therefore to both, and probably less advantageous to the public service than the opinion of either would have been had it been entirely adopted. Therefore I say that this system of check and counter-check may be carried too far. There is no doubt that certain checks are requisite in every political machine; but you may multiply your checks and counter-checks to such an extent that the functions of the machine, which are intended only to be controlled, are paralysed for every useful purpose. Then what, let me ask, is the position in which Her Majesty's Government stand in this House? When Indian questions are discussed, it is the constant habit of those who take part in the debate, criticizing and impugning what has been done, to hold Her Majesty's Government responsible for everything that occurs. But her Majesty's Government cannot be fairly answerable for things over which they have not a perfect control, and which they cannot entirely direct. It frequently happens, indeed, that the Government of the day are made responsible for acts which were done without their consent, and probably in some cases much to their dissatisfaction. Take, for instance, a matter which has occupied the attention of the House, and which is to form part of the inquiries of the Committee which has been recently chosen—the hiring of vessels to carry troops to India. I will venture to say that a majority of hon. gentlemen here imagine that the Government is the authority by which those arrangements are made. Not in the least. The East India Company is chargeable with the expense of

transporting troops to India; it is the Company which takes up the ships, and not the Government; and, though the opinion of the Government must naturally have weight with the Company, these arrangements are not made by the officers of the Government, but by the officers of the East India Company itself. I say, then, it is most desirable that this complicated machine should be simplified and reduced in fact and form to that which it is imagined to be, but which it practically is not. I may be asked why we take this moment for proposing a change of system The inconveniences of different systems of administration are forced upon the attention of the Government and the country from time to time by peculiar emergencies. Thus the arrangements of the military departments had existed in time of peace, but, though many felt that the division of the Ordnance into separate departments and the distinction between the War Office and the office of the Secretary of State for War were inconvenient, it was not until the war in the Crimean made the Government more directly sensible of the disadvantages of that complicated system that we altered the arrangements, and it was by means of the alterations carried out during the Crimean war that the consolidation was effected, by means of which we were enabled to carry on the struggle with Russia with far greater promptitude, vigour, and success than we should have been able to do if the old system had been continued. I say, then, that as far as regards the executive functions of the Indian Government at home, it is of the greatest importance to vest complete authority where the public have a right to think that complete responsibility should rest, and that, whereas in this country there can be but one governing body responsible to the Crown, to Parliament, and to public opinion, consisting of the constitutional advisers of the Crown for the time being, so it is in accordance with the principles and practice of our constitution, as it would be in accordance with the best interests of the nation, that India, with all its vast and important interests, should be placed under the direct authority of the Crown, to be governed in the name of the Crown by the responsible Ministers of the Crown sitting in Parliament, and responsible to Parliament and the public for every part of their public conduct, instead of being, as now, mainly administered by a set of gentlemen who, however respectable, however competent for the discharge of the functions entrusted to them, are yet a totally irresponsible body, whose views and acts are seldom known to the public, and whether known or unknown, whether approved or disapproved, unless one of the Directors happens to have a seat in the House, are out of the range of Parliamentary discussion. Again, as regards our interests in India, I may state at once that the Bill which I am about to propose to the House is confined entirely and solely to a change in the administrative organization at home, and that we do not intend to make any alreration in the existing arrangements in India. In fact, if Parliament were to adopt the measure which we are about to propose, the only difference, as far as India is concerned, would be,

that the next dispatch would go out signed by the President and the Council for Indian affairs, instead of by the Court of Directors, and that the reply would be addressed to the President of the new Board instead of to the Chairman of the body sitting in Leadenhall Street. Now, I believe there can be no doubt that, so far as the impression on the minds of the people of India is concerned, the name of the Sovereign of a great empire like this must be far more respected, far more calculated to produce moral and political impressions, than the name of a Company of merchants, however respectable and able they may be. We have to deal, in that country, with Princes, some ruling independently and some in a state of modefied dependence upon us, and with feudal chiefs proud of their position, cherishing traditionary recollections of a wide empire, and of great Sovereigns to whom their ancestors owed allegiance. How can we expect such men to feel any great respect for a mere Company of merchants? The respect they feel, the allegiance they yield, would be increased tenfold if the one were given and the other tendered to the Sovereign of a great and mighty empire. I believe, in fact, that what gives force to the Company in India is not the fame or authority of the Company itself, but the knowledge which the people have that behind the Company, and strengthening it, is the power of the British empire, and that, although the ruler may be an officer of a commercial association in name, the real power which they have to look up to is the power of the Sovereign of this great country. I am, therefore, satisfied that the transfer of the government of India to the Crown would, as far as its effect upon the people of India is concerned, be equivalent to a large reinforcement of troops; that the impression which would be produced would be most advantageous, and would tend to consolidate and strengthen the moral and political influence of England in these vast regions of the world. What, then, is the arrangement which we are about to propose? We wish to alter things as little as we can consistently with the great object which we have in veiw. That object is to make the responsible advisers of the Crown answerable for the government of India as well for that of all other possessions of the Crown beyond seas. We wish that the affairs of India should be administered by Ministers responsible to Parliament for the manner in which that country is governed. We propose, therefore, that the functions of the Court of Directors, and, of course, of the Court of Proprietors, shall cease; that there shall be substituted for those bodies a President, assisted by a Council for the Affairs of India; that that President, of course, shall be a member of the Government, and shall be the organ of the Cabinet with reference to all matters relating to India; but, as men who have distinguished themselves in public life in this country, and who are likely from time to time, as changes of administration occur, to be placed at the head of that department, cannot be supposed to possess that detailed local knowledge which is essential to the wise government of the country, we propose that the President shall

be assisted by a Council composed of persons named by the Crown, with the condition that they shall either have been Directors of the East India Company, have served for a certain period in India either in a civil or military capacity, or have resided there a certain number of years unconnected with the local administration. We propose that that the Council shall consist of eight members, that the members shall be appointed for eight years, and that two shall retire by rotation every second year, in order that successive administrations may have the means of renewing the Council from time to time by the introduction of persons returning from India with fresh knowledge and ideas. We think that while, on the one hand, the permanency of a Councillor for eight years will make him an independent adviser of the President, he will not on the other, by being appointed for life, block up the way to the accession of other persons who may from time to time appear more capable of serving the country. Of course, as the proposal is to transfer to the Government of the day full responsibility for the management of Indian affairs and as the President will be the organ of the Cabinet upon Indian matters, just as the Secretary of State for the Colonies and the Secretary of State for Foreign Affairs are the organs of the Government in regard to the departments under their respective care, the decision of the President must be final in all matters which may be treated of in the Council. But, nevertheless, we propose that, if the Councillors differ in opinion from the President, they shall have the right to record that difference, together with their reasons, upon the Minutes of the Council, so as to be able to justify themselves afterwards for the advice they have given. The full power of the President, however, will not extend to matters involving increased expense to the Indian revenue; and, for purposes of that sort, it will be necessary that he shall have the concurrence of four Councillors to any proposals which he may have to submit. In the temporary absence of the President a Secretary of State will be able to act for him, and four members of the Council will be a quorum for the transaction of business. We propose that the Council shall have the power of distributing among themselves the business which comes to them, so as to allot different departments of business to different members of council, who will, of course, make reports to the Council itself. We propose that the President shall be placed on the footing of a Secretary of State, and that the Councillors shall have a salary of £1,000 a year each We propose that all powers now vested in the Court of Directors shall be transferred to this Council, and therefore, that all appointments which have hitherto been made by the Court of directors or by other parties subject to the approbation of the Crown, shall be made by the Crown direct, but that all appointments in India which have hitherto been made by the local authorities shall continue to be made by the local authorities shall continue to be made by those authorities; so that no part of the local Indian patronage will be transferred to the Government of this country.

We propose that the President shall be able to appoint one Secretary, who shall be capable of sitting in this House. It will be convenient that a Cabinet Minister holding that situation shall have the assistance of a Secretary conversant with the business which may come under discussion; but we do not propose that the Councillors shall be capable of sitting in Parliament. We think there would be great inconvenience in such an arrangement; that they would become party men; that they would necessarily associate with one side or the other in this House, and that, with changes of Administration, the relations between the President and the Councillors might then become exceedingly embarrassing. One point which has always attracted the attention of those who have considered these matters, and which has created even a very considerable constitutional difficulty, in any attempt to decide what would be the best system of Government for India, has been the question of patronage. Many men have said that they think the 'double Government' a cumbrous and antiquated machine, which ought to be done away with. That was the opinion in 1853 of a great number of those hon. gentlemen who took part in the discussion, but it was always said 'How can we manage with the patronage? We do not wish to increase the patronage of the Government, and we fear that this transfer of power would greatly augment the patronage of the Home Government.' Now, I have already said with regard to local appointments, all these appointments which have hitherto been made eigher by the Governor-General or by other authorities in India, will continue exactly as before to be made by them, the members of the local Council being named by the Governor-General instead of being named hence. An arrangement was made in 1853 by which all appointments to writerships were given up to open competition. That arrangement we shall of course maintain. Writerships, therefore, are beyond the range of patronage. The appointments to cadetships have hitherto been divided between members of the Court of Directors and the Presidents of the Board of Control. What we propose is to leave the appointments to those cadetships as they have been hitherto. The reduction from the number of Directors to the number of Councillors will give somewhat more patronage to the Councillors, but the addition to the patronage of the President will be hardly perceptible. It must be remembered that hitherto we have had an enormous native army, and it does not seem probable that, for the future, we shall keep up that force at the same strength. As regards the civil appointments, they will remain matters of public competition, and as regards appointments to cadetships they will be made, as I have stated, with, probably, the additional condition that the cadets shall be appointed to probation in some military College, their final appointments to regiments depending on the efficiency of their studies. There is one condition which we propose to attach to this distribution of cadetships—viz. that a certain proportion of first appointments, which we cannot fix in a Bill, but which must be left to the

discretion of the Council from time to time, shall be reserved for the sons of civil and military officers who have served in India According to that arrangement it will be seen that no addition of patronage will devolve upon the Executive Government of an amount which need excite the least constitutional jealousy on the part of the House of Commons. The army in India will consist, as heretofore, of Queen's troops, forming part of the regular army of this country, and local corps enlisted and confined to service in India. With regard to Queen's troops no change will be made. With regard to the others, they will be transferred to the Crown from the service of the Company, subject to the same conditions of service as those under which they are enlisted, and if they dislike that change I think in common justice, they will be entitled to their discharge It is proposed with regard to local military services, that the troops shall be paid out of the revenues of India, and that their services shall be limited to Asia so long as they are paid out of the Indian revenue. At present, I believe, the range of service for the company's troops is coextensive with the limits of the Company's charter, as far as any place eastward of the Cape. It is proposed that, if at anytime a part of the local army shall be employed out of Asia, the troops shall then not be paid out of the Indian revenue. It will be left for this House to determine whether a force so employed shall be paid out of the revenue of this country, and whether their employment is consonant with what the interests of India may be. This will be a sufficient check against the employment of the Indian troops without the consent of Parliament. It is proposed that, where as we transfer to this President of the Council the functions of the Court of Directors, and Board of Control, both of which will be abolished, the functions and powers of the Secret Committee, which govern matters involving great discretion and temporary secrecy, should be vested in the President, as representative of the responsible Minister of the Crown. But we propose that, in any case in which orders shall be sent to India involving the immediate commencement of hostilities, communications there of shall be made to Parliament within one month, if Parliament be then sitting, or within one month after Parliament shall next meet. That interval will allow a sufficient time to elapse to prevent injury to the public service from the too early publication of orders so issued; while it will, at the same time, give Parliament an early opportunity of calling upon the Government for explanation of the causes which had led to such orders. Of course, it will be necessary that there should be an effective audit of the revenues of India and their application. It is required by this Bill that the revenue shall be applied solely for the purpose of government in India. It is proposed that an auditor shall be appointed, with the power of appointing assistant auditors, for the purpose of examining minutely the accounts of receipts and expenditure of Indian revenue, and that the accounts, when audited, shall be laid before Parliament for its consideration. Of course, power will be given to the President of the

Council to issue to the Company such sums as may be necessary to defray the expenditure required for paying their dividends and keeping their books, until the Company determine whether they will or will not avail themselves of the option given them of being paid in a certain time for their stock. This then, sir, is, generally speaking, the outline of our measure. Of course, the details will come under the consideration of the House, if it should, as I trust it will, give us leave to bring in the Bill; and when the Bill shall be in the hands of hon. members, they will then have to consider the details, such as I have described, as well as some other points, to which I have not thought it necessary to advert. But the questions now to be considered is simply the great and large question, whether or not we shall transfer to the executive and responsibel Ministers of the crown the direction of the affairs of our Indian territories, or whether that direction shall be left, as heretofore, under the cumbrous and complicated system described as the 'double government', which, in my opinion, is full of embarrassment, and not calculated to accomplish the purposes good government ought to have in view, and which, though continued heretofore, because no great events have called on Parliament to reconsider it, ought, I think, to be abolished without further delay. Now, I do not think I shall be met by any objections to this principle itself, because, when I recollect what has passed on former occasions in this House, and when I know what is the general opinion of the country on the point, I cannot persuade myself that we shall meet with any strong opposition to the general principle on which the measure is founded. When I look back to what passed in 1853, I find some of the leading Members of this House expressed strong opinions that the time must come, at no distant period, when an entire change ought to be made, and that the introduction of Government nominees into the East India Direction was only the first step to further and ulterior measures; and the only doubt was, whether a full measure ought not at that time to be adopted. But, whatever may have been the opinion of Parliament at that time, I am much mistaken as to the signs and indications of opinion in the country now if the nation at large has not made up its mind that this 'double Government' ought to cease. I am convinced that this is the opinion of the country; and great disappointment would be felt if this House should negative the Bill upon an objection to the principle itself on which it is founded. We shall, no doubt, be met by a motion for delay, and be told that this is not the time for discussing the measure; that India is unsettled; that we should wait until a better moment, a calmer period, and until the difficulties in India are over. Why, that plea for delay is invariably the plea set up by those who are anxious to oppose that which they cannot resist directly, but which they wish to get rid of by the intermediate policy of proposing delay. Why, sir, what is the force of any argument of that kind? They say, 'Do not alter the machine of Government at a time when India is unsettled, and in difficulty, when you

have not fully and finally got rid of the mutiny, and when you have not entirely reestablished authority in every part of the country.' What does that argument amount to when it is analysed? It is said 'Do not change your Government now, because there is in India that to be done which is difficult to be accomplished, and which, therefore, it might require great power to accomplish.' Will, then, any man pretend that a single Government at home will not be a much more effectual instrument for the purpose than a double Government? Will any man pretend to tell me, that with a view to rapidity of discussion and execution, unity of purpose, and responsibility to the public, a Government administered by the responsible advisers of the Crown would not be a far more efficient instrument for everything to be done here than the existing conflict of checks and counter-checks, the system of previous communications and subsequent communications, of objections to a dispatch and its transfer by cabs from onepart of the town to another, by which delay was created, so that a dispatch, which ought to go out to-morrow, might not go out for a month, or be ready until it was too late to send it out. Why, no reasonable man will venture to get up and tell the House that the present machine can be so effective and so powerful a machine for administration at home as the machine we propose to substitute for it Will any man acquainted with India tell me that the name of the Company—which is now pretty well seen through by all the natives in India— can have half or the tenth part of the powerful influence the name of the Crown would carry with it? I declare it is nonsense to say that the Indian chiefs would not feel ten times more respect for the Rajah of England than for the name of any unknown Company. Well, then, I say, if we look to England, the machine we propose to substitute is a much more powerful machine, and if we look to India it is a machine infinitely more influential than the existing one. Then we are told that there is a state of difficulty in India, and what is the proposal of those who want delay? They say, that in order to overcome this difficulty, and to restore tranquility in India, which we are told is a matter of great difficulty, and which will require great strength and power to effect, we should prolong the existence of the present weak instrument, instead of substituting for it a stronger, more powerful, and more effectual machine. In that argument there is no sense, I submit. However, we shall be told by some that the government of India is a great mystery—that the unholy ought not to set foot in that temple—that the House of Commons should be kept aloof from any interference in Indian affairs—that if we transfer the Govrnment to the Ministers responsible to Parliament, we shall have Indian affairs made the subject and plaything of party passions in this House, and that great mischief would arise therefrom. I think that argument is founded on an overlooking of the fundamental principles of the British constitution. It is a reflection on the Parliamentary government. Why, sir, what is there in the management of India which is not mainly dependent on those general

principles of statesmanship, which men in public life in this country acquire here, and make the guidance of their conduct? I do not think so ill of this House as to imagine that it would be disposed, for factious purposes, or for the momentary triumph of party, to trifle with the great interests of the country as connected with the administration of our Indian affairs. I am accustomed to think that the Parliament of this country does comprise in itself as much administrative ability, and as much statesmanlike knowledge and science, as are possessed by any number of men in any other country whatever; and I own, with all respect for the Court of Directors, that I cannot bring myself to think that the Parliament of England is less capable of wisely administering the great affairs of state in connexion with India than the Court of Directors in Leadenhall Street. I am not afraid to trust Parliament with an insight into Indian affairs. I believe, on the contrary, that if things have not gone on so fast in India as they might have done—if the progress of improvement has been somewhat slower than might have been expected, that effect has arisen from the circumstance that the public of England at large were wholly ignorant of Indian affairs, and had turned away from them, being daunted by the complications they imagined them to be involved in; and because Parliament has never had face to face, in this and the other House, men personally and entirely responsible for the administration of Indan affairs. No doubt a good deal has been done in the way of substantial improvement of late years, but that which has been done I may venture to say has been entirely the result of debates in this and the other House of Parliament. And, so far from any discussion on India having worked evil in India, I believe that the greater part of those improvements which the East India Directors boast of in that publication, which has lately issued from Leadenhall Street, has been the result of pressure on the Indian administration by debates in Parliament and discussions in the public press. Therefore, so far from being alarmed at the consequences which may arrive from bringing Indian affairs under the cognizance of Parliament, I believe that a great benefit to India, and through India to the British nation, will result therefrom. Therefore, I say, I see no reason, either on the score of principle or on the score of the augmentation of patronage, or on the score of time, or constitutional danger, why we should not at once pass the measure which it will be my duty to present to the House. Sir, I trust that Parliament will feel that great power is not given to nations without corresponding duties to be performed. We have, by an almost miraculous train of events been entrusted with the care of the destinies of 150 or 160 millions of men—with the government, directly or indirectly, of a vast empire larger in extent than the whole face of Europe, putting the Russian empire out of the question That is a task which involves great responsibility. Do not imagine that it is the intention of Providence that England should possess that vast empire, and that we should have in our hand the destinies of that vast multitude of men,

simply that we may send out to India the sons of gentlemen or of the middle classes to make a decent fortune to live on. That power has been entrusted to us for other and better purposes; and, without pointing to anything particular, I think it is the duty of this nation to use it in such a manner as to promote, as far as they can, the instruction, the enlightenment, and the civilization of those great populations which are now subject to our rule. We have lately had our attention called to scenes of barbarity in India, which would make any man shudder, but are we sholly irresponsible for those scenes? If, during the century for which we have exercised power in India, we had used that power to enlighten and civilize the people, do you think their nature would not, in some measure at least, have been changed, and tha' the atrocious crimes which they have committed would not have been as repugnant to their feelings as they are to those of the people of this country? We ought to bear these things in mind—to remember that we have a great duty to fulfil in India, and I am sure that that duty will be best discharged if we commit its performance to the hands of men who will be accountable to Parliament for their conduct, and who feel themselves bound to acquaint the public of this country, step by step, with the arrangements which they make I am confident, it Parliament should adopt the measure we are about to propose, that, while on the one hand, it will add to the strength of our position in India, while it will increase the power of this country, and render our influence more firm and secure, it will, on the other hand, enable us more efficiently to perform those important duties which, in my view, it was intended that we should discharge when the great Indian empire was transferred to our control. Sir, I beg to move for leave to bring in a Bill for the better Government of India.

Sir George Cornewall Lewis, House of Commons
12 February 1858

I now come to the other point in the petition of the Company; namely, their claiming credit for having exercised their government in India in a manner to command universal admiration, and to render it a model for all Governments on the face of the earth. This is the manner in which the Company speak of themselves in the petition presented to this House :

> 'They feel complete assurance that, the more attention is bestowed and the more light thrown upon India and its administration, the more evident it will become that the Government in which they have borne a part has been not only one of the purest in intention, but one of the most beneficent in act ever known among mankind '

It must be acknowledged that the character which the Company bestow on themselves is not very remarkable for the moderation of its terms. Let us inquire how far this character rests on the evidence of facts. The

Company may be said to have originated with respect to its power at the time of the union of the two Companies, which were consolidated in the reign of William III, and remained substantially a trading Company until the battle of Plassey was fought by Clive, who shortly after laid the foundations of the territorial sovereignty of Bengal, by the acquisition of the duannee. A few years after the Government of England began to make a claim on the Company for a share of their territorial acquisitions, and the Company came to compromise with the Government, by which they were to pay an annual sum of money, instead of, as proposed by Lord Clive to Lord Chatham, the Crown taking possession of the territorial acquisitions. This state of things continued for a few years, until the abuses prevailing in the administration of the Company attracted the attention of the legislature; and in 1773, under the Ministry of Lord North, was passed what was called the Regulating Act, by which Parliament first interfered with the local government of India. By this measure it was attempted to place a control, not on the Company in London, but on the local government in India. The members of the local council in India were named in the Act of 1773. Five members were named, and three went out from England to conduct the local government, two being at the time in India, one of whom was Warren Hastings. The result of that attempt at Parliamentary control was dissensions without end in the Council, duels between two of the members, and a conflict with the Supreme Court; and the experiment ended with a conviction on the part of Parliament that the endeavour to subject the local government to direct Parliamentary control was a complete failure. I should observe, that by the Act or 1773 power was taken for the Secretary of State and the Board of Treasury to examine all the correspondence recived in England from India. Even at that time the principle of Parliamentary control over the proceedings of the Company was established, and it is material for the House to observe the fact, inasmuch as an assumption is made in popular arguments that Parliament for the first time interfered to control the administration of the Company by the Act of 1784. That is a mistake for by the Regulating Act of 1773 a control was taken for the Crown over the nomination of the members of the Council whenever any vacancies occurred; and power also was taken for the Secretary of State and the Board of Treasury to inspect all correspondence received from India. In a few years, however, it was found that those powers were not sufficient, and, in 1781, Lord North carried a Bill by which he enlarged the superintending authority of the Government, and enabled them to control the correspondence sent from the Board of Directors to the authorities in India. This was, in fact, the germ of the system which was afterwards promulgated in Mr. Pitt's Act of 1784. Notwithstanding these successive interferences of Parliamentary control, it was found that the administration of India did not improve—complaints multiplied; and committees of the House were appointed in 1782 and 1783, who made a

long succession of reports, which any gentleman who may be curious to read old documents of that description will find included in four very large folio volumes, compared with which our modern blue books are quite puny and degenerate. The whole subject of the Indian administration was at that time investigated by two committees of this House, one of them presided over by Mr. Burke and the other by Mr. Dundas, who was afterwards President of the Board of Control. Those committees made, I believe, not less than seventeen reports. I state that fact for the purpose of showing that, at the time to which I refer, the whole subject of Indian affairs underwent a most careful investigation by this House. Those, therefore, who suppose that the administration of the East India Company during the ten years from 1773 to 1784 was one course of uniterrupted prosperity must be singularly uniformed in the Parliamentary history of that period. I will take the liberty of reading an extract from resolutions which were moved in this House in 1784 by Mr Burke, in which he deseribes the result of these Parliamentary inquiries, and if it were necessary, if the truth of what I am now stating should be disputed, I could produce a multitude of passages from the reports and from speeches made at that t ne which would support every one of the sweeping condemnations in the passages I am about to read. I ask the attention of the House to this summary of the investigations then made, inasmuch as I think it will show them how far the character which the Company give to themselves for their administration is true during the time when the administration was really that of the Company—when the pure, simple, unmixed management of the Company and their officers existed, with a very imperfect control, though with some control even then. on the part of the Executive Government. These are the terms of the resolution moved by Mr. Burke in 1784 .

> 'The result of the Parliamentary inquiries has been that the East Indian Company was found totally corrupted and totally perverted from the purposes of its institution, whether political or commercial, that the powers of war and peace given by the Charter had been abused by kindling hostilities in every quarter for the purposes of rapine: that almost all the treaties of peace they have made have only given cause to so many breaches of public faith: that countries once the most flourishing are reduced to a state of indigence, decay, and depopulation, to the diminution of our strength, and to the infinite dishonour of our national character; that the laws of this kingdom are notoriously and almost in every instance despised, that the servants of the Company, by the purchase of qualifications to vote in the general Court, and, at length, by getting the Company itself deeply in their debt, having obtained the entire and absolute mastery in the body by which they ought to have been ruled and coerced. Thus their malversations in office are supported instead of being checked by the Company. The whole of the affairs of that body are reduced to a most perilous situation; and many millions of innocent and deserving men who are under the protection of this nation, and who ought to be protected by it, are oppressed by a most despotic and rapacious

> tyranny. The Company and their servants have strengthened themselves by this confederacy, they have set at defiance the authority and admonitions of this House employed to reform them; and when this house had selected certain principle delinquents, whome they declared it the duty of the Company to recall, the Company held out its legal privileges against all reformation, positively refused to recall them, and supported those who had fallen under the just censure of this House with new and stronger marks of approbation.

Now, I affirm that this language, strong as it may sound at this moment to a House not familiar with the scenes of rapine, of extortion, and of every species of abomination which had been brought out in evidence before the committees of 1782 and 1783, is a perfectly faithful representation of the opinion which prevailed in Parliament at that time with respect to the government of the East India Company. I most confidently maintain that this notion which has got abroad—this sentiment—of the great debt of gratitude which we owe to the East India Company is one that was not only entirely unknown, but most alien to the feelings of the generation who knew what the Company was before Parliament had interfered to control it. I do most confidently maintain that no civilized Government ever existed on the face of this earth which was more corrupt, more perfidious, and more rapacious than the Government of the East India Company from the years 1765 to 1784. That was the interval between the period when it first acquired territorial sovereignty and the time when it was placed under Parliamentary control. During that interval the Company exercised the functions of trader and governor in combination, with most imperfect control on the part of the Government and Parliament of this country; and I appeal most confidently to the records of Parliament, to the evidence in the reports and documents of this House, for conclusive proof damnatory of the character of the East India Company as a political body. With these documents before me, I confess that I cannot read without astonishment the character which, the Company have bestowed upon themselves, founded, as that character is entirely upon their acts since the time when they were subjected to Parliamentary supervisions—since the time when there has been a Board of Control to superintend the proceedings of the Directors in London—since the Governor-General and the other Governors of India have been appointed, not by the Directors themselves, but by the Crown and Executive Government of this country, subject to public opinion and to Parliamentary responsibility, Now, all that can be said in favour of the Company, dates from the year 1784. I challenge them to find one bright page in their annals during the whole period when they were not subject to Parliamentary control. It is by confounding the acts of two periods—by suppressing their conduct in bygone days, which have passed from the memory of the present generation, and the records of which are to be found chiefly in histories written by servants of the Company, and therefore not weighing with very great force on their misdoings—and by

concentrating our vision upon subsequent times, when they had become a mere subordinate body acting under the control of the Executive Government,—that they are enabled to claim for themselves this extraordinary credit.

Now, let us briefly follow the history of the Company from the year 1784. We know that before that time Mr. Fox and Mr. Burke—the latter of whom had been the chairman of one of the committees to which I have referred—who was deeply impressed with the enormities of the Company's Government, and who, in the subsequent impeachment of Warren Hastings brought under the attention of the House of Lords, in speeches destined to be coeval with the English language, the misdeeds of the Governor whose acts he impugned—we know that Mr. Fox and Mr Burke combined to frame the clauses of the first India Bill, which nearly annihilated the rule of the Company. There was not at that time any feeling of sympathy with the Company on the part of the people of this country; but the defeat of the measure was attributable to alarm respecting the Indian patronage, and to the belief that, as the Commissioners for India were named in the Bill, and were the partisans of the Executive Government, an unconstitutional power would be conferred upon them. Notwithstanding this prejudice, the Bill passed the House of Commons, but it was thrown out by the House of Lords, in consequence, as was believed, of the personal influence of the King, who took alarm at the independent authority which he thought would be conferred by the measure upon his Minister. The Bill was not defeated from any sympathy on the part of the country with the Company; but Mr. Pitt, with great dexterity, took advantage of the alarm which that measure excited, from the notion that Mr. Fox intended to avail himself improperly of the power which the Bill would have conferred upon the Government, and the Ministry were defeated. The Government fell; Mr. Pitt succeeded them, and he introduced that system of a mixed government which has lasted in a certain form down to the present day. Any gentleman who will take the trouble to read the speech in which Mr.Pitt introduced his measure will see that he laid it down as a principle that there was an overwhelming and imperative necessity for legislating upon the subject of India --that the public opinion of that time absolutely required that the East India Company should not be left to continue in the exercise of its uncontrolled powers. Mr. Pitts, having thrown out the government of Mr. Fox upon the previous Bill, left the East India Company in possession of its powers, both as respects the government and the trade, but he created a Board of Control which was to predominate in all respects over the acts of the Directors. Now the House will observe that the effect of the institution of that Board of Control was wholly to alter the character of the East India Company. Upto this time the East India Company, with the exception of those rudiments of Parliamentary interference which I have described, was a trading Company, exercising sovereign powers over certain

provinces in India. The institutions of the Board of Control placed the East India Company at once, with respect to its governing powers, in a purely subordinate position. They were from that time bound to obey every order which the Board of Control chose to issue. They retained, no doubt, the initiative, and practically they continued to exercise great influence over the affairs of India, but legally and constitutionally they were reduced to perfect subordination, and they were placed completely under the control of this department of the Government. In 1793, Mr. Dundas, who was then President of the Board of Control, brought in a Bill of great length, in which he consolidated all the existing enactments on the subject of the Company, giving them greater definiteness and greater precision; and he brought to complete perfection the system of the double government originated in 1784. He renewed the Company's charter for twenty years; and in that condition it remained until the year 1813. In 1813 the opinions on the subject of free trade had spread more widely in the country the impatience of the trading community at the double monopoly exercised by the East India Company made itself felt, and the Government of the day determined to proposed the abolition of its monopoly of the trade with India, preserving however, its monopoly of the China trade. That mighty change, so far as the East India Company were concerned, was introduced in 1813. They were not prohibited from trading with India; but their monopoly was gone. That, in fact, was the first great stone struck out of the edifice of the East India Company. They had originally been merely a trading Company; their sovereign powers had come incidentally; they acquired incidentally great territorial revenues; but their main and paramount character was that of traders. If the House of Commons of that day had acted under the influence of feelings which we are told now we ought to respect,—if it had been the belief of the Parliament of that time that a boundless debt of gratitude was owing to the East India Company for their acquisitions of territory in India—can any one doubt that their trading monopoly would have been retained as one of the most precious flowers of their prerogative? Parliament, however, was bold enough to lay its profane hands on the ark of the East India Company, and they were deprived of the monopoly of the Indian trade. Deprived of the monopoly of the Indian trade, the Company was distanced by private traders, and I believe they exercised but little of their trading privileges after the time they lost their monopoly. But they retained the monopoly of the China trade for another twenty years At last came the year 1833. In that year Mr. Charles Grant, now Lord Glenelg, was President of the Board of Control. In proposing the Bill of that year to the House of Commons he stated that the Government had two matters for consideration: one was whether the Company should retain their governing powers; the other, whether they should retain their trading powers, Some thought they should be deprived of both. The Government came to the conclusion that the whole of their trading powers

should be abolished by law, that they should cease alltogether to be a trading Company, and that not only should their monopoly of the China trade be abolished, but that they should be prohibited by law from trading either with India or with China; but he stated, however, that the Government did not propose to interfere with the governing powers of the Company, subject, of course, to the control of the executive Government.

Observe the changes which the East India Company had then undergone under the legislation of Parliament. Having originally been only a trading Company—having acquired incidentally governing powers, their governing powers were first placed under the control of a Board of the Executive Government, so that they became only subordinate governors; but they retained their original capacity for trade In 1833 they were prohibited by law from trading, so that by that time they had lost altogether their original functions as traders, and they retained only a portion of governing power in a subordinate capacity. That was the change which under the legislation of Parliament the character and power of the East India Company underwent. Be it remarked that it was a constant diminution of authority and power, and a perpetual invasion of their functions, under the authority of Parliament. Again in 1833, the sentimental view of the question was altogether overlooked--nothing was heard of the debt of gratitude due to the East India Company, but in consequence of more enlightened views on the subject of freedom of trade which then prevailed, as well as of representations of the mercantile classes, the whole trade of China and India was thrown open. The Company then obtained another lease of twenty years, expiring in 1853. During that time they were the mere ghost, as it were, of the former Company, which was once sovereign, which once enjoyed the monopoly of great branches of trade; they became a mere governing body of Directors, all their trading power was gone, and the controlling power and the appointment of their principal officers were vested in the Executive They continued in that inferior position for twenty years under the control of the Government in England, the Ministry sending out instructions, and all the principal authorities of India being appointed, not by the Company as originally, but by Government. Then came the renewal of 1853. There was nothing in the circumstances of that time to call for interference. The twenty years had gone on in a manner not to incur the censure of the House or of the Government; in a greatly improved spirit, owing, as I must maintain, in countradiction to the allegations which have been made, to the vigilance of Parliament and to the effective control of the India Board. But even under those favourable circumstances Parliament did not renew the Charter without further invasion of the original constitution of the Company. By the Act of that year one-third of the Court of Directors was formed of nominees of the Crown, so that only two-thirds remained to be elected by the proprietors of India Stock; and there was good reason for this alternation. When the East India Company existed as traders to

the East Indies it was reasonable that persons who subscribed their money to the common stock, and advanced their capital to carry on their ventures to the East, should have a voice in the election of the Directors, exactly upon the same principle as appliers to the direction of any other joint-stock company. It is the same principle by which shareholders of railway companies elect a board of Directors, or shareholders of the Bank of England, for example, elect the Directors of the Bank. But what was the position of the proprietors of East India Stock, with reference to the Government of India, after the Company had ceased to be a trading Company? Any person may become an East India proprietor by purchase of stock in the open market, and there is therefore now no necessary connexion between the members of the Court of Proprietors and the affairs of India. Originally the proprietors were persons who had advanced capital for carrying on trade with India; but at present they are only proprietors of so many shares of a guaranteed stock, and the purchase of that stock gives them no more real connexion with the affairs of India than the purchase of so much three per cent stock. The constituency which elect the Board of Directors is an accidental body, and has no real relation with the interests or Government of India. The Board of Directors themselves are the mere spectre and phantom of that body which used to carry on the whole trade with India and China, and the proprietors are reduced to the condition of mere holders of an ordinary stock. This is the state to which successive legislative changes have brought that body. The fallacy which pervades the petition of the Company this—It speaks of the East India Company as one and indivisible—as if from the time of the battle of Plassey down to the last renewal of the Charter it had remained unchanged in character, functions, and influence. This truth is, that it has undergone as important changes during those hundred years as the English constitution between the Heptarchy and the reign of Queen Victoria. It is therefore the most transparent sophism—it is offering an insult to our understanding—to apply arguments founded upon the original and unchanged state of the Company to the Company in its modern and altered form.

Robert Vernon Smith, House of Commons
16 February 1858

MR. VERNON SMITH said, that before the hon. member rose his noble friend (Viscount Palmerston) had requested him to postpone the motion of which he had given notice, in order that the House might proceed with the debate on the Indian Government Bill. The hon. gentleman declined to comply with this request, on the score that it was necessary to acquaint the House with certain information not then in its possession that it might be enabled the better to make up its mind on that Bill. He regretted

extremely that the hon. member had taken that course not that he had not been satisfied to hear his statement, but that it might as well have been introduced into the discussion on the India Bill, instead of forming a separate motion, and prolonging that discussion

Mr. H. BAILLIE said, he had given notice of his motion long before the noble Lord's Bill was introduced.

Mr. VERNON SMITH said : he was aware of that; he did not object to the hon. gentlemen's having given that notice, but thought that upon the appeal of his noble friend he might have delivered his speech, full as it was, of documentary information, in the course of the other debate, particularly as he seemed to have used it for the purpose of expressing his opinion on a question upon which that debate turned. Indeed, he should collect from the hon. gentleman's address that the Ministry would have his vote in favour of their Bill, because he had found as much fault as possible with the existing Government of India. If any hon. gentleman thought that to condemn the Board of Control and the present system was at the same time to condemn the Bill of his noble friend they were totally mistaken. To find fault with the Board of Control as well as with the Court of Directors was, infact, to find fault with the present system that the Bill had been introduced to amend.

He hoped that the hon. gentleman would not think him wanting in respect if he abstained from answering—or he should not say answering, inasmuch as he agreed in much that the hon. gentleman had said—but if he followed him at much less length than he had himself occupied in developing his ideas. Many of his views were backed by authorities to which he was not then prepared to reply, because he had not anticipated that the hon. gentleman would go at such great length into the subject. The notice which he gave was that he should 'call the attention of the House to the causes of the present outbreak in India,' and he commenced by stating that it was very difficult to say what were those causes, because none of the men in England who were best qualified to give opinions, including the hon. and gallant gentleman the member for Reigate (Sir Henry Rawlinson) whose advent to that House they had on the previous evening hailed with so much satisfaction, and the hon. member for Leominster (Mr. J. P. Willoughby), could describe them. Where the Directors, the ex-officio councillors of the State upon this subject, had feared to tread, the hon. gentleman has rushed in; but he himself had assigned only one cause for all the evil—the annexation of Oude. He had not canvassed any of those various supposed causes which were suggested last Session by the right hon. member for Bucks, and which he (Mr. Vernon Smith) and others had then discussed. It was singular, but it was notorious, that since that date we had not at all advanced towards a solution of this question; and that at the present moment not only the Government, who might be accused of ignorance and incompetency but

the most eminent men in India, were unable to say what were the causes of mutiny. Even Sir John Lawrence, the man whose opinion were most favourably received in that House, said that he was still ignorant of those causes, and that he could not satisfy himself that there were any conspirary organized before-hand sufficient to account for the most extraordinary proceeding which had, perhaps, ever happened in history. The hon. gentleman then embarked upon an historical disquisition on the general Indian policy of late years, and he fixed upon the year 1833—probably because then the Ministers of the Crown became more responsible for the Government of India—as the date at which a new policy, what he called a policy of annexation, was commenced. He found fault with the policy which had been pursued under the administrations of Lord William Bentinck, of Lord Auckland, of Lord Ellenborough, and of Lord Dalhousie; in fact, with all the noblemen who had administered the affairs of India between 1833 and the present year, and through them with the Governments of all parties who had been in office during that time. Now, no one, he imagined, would accuse either Lord William Bentinck or Lord Auckland of having pursued a policy of annexation, and therefore if such a policy had been adopted the blame must fall principally upon Lord Ellenborough and Lord Dalhousie. But the hon. gentleman was entirely mistaken, because he could not perceive that any such policy had been adopted or acted upon in India. A policy of annexation meant a policy of acquisition—a policy in accordance with which you should take possession of every territory which you could acquire either by conquest or cession. Now, although there had, from time to time, been acquisitions of territory in India, he did not believe that any Minister or any Governor-General had ever, either publicly or privately, laid down such a policy. Annexations were of two kinds, either to extend the frontier, or to absorb the State of a native prince, with whom we had a subsidiary treaty, and whose territory was in the interior of our own possessions. The hon gentleman had referred to both species of annexation, but he had admitted that one kind was founded upon very sound policy. No one could doubt that, during the recent outbreak, we derived great advantage from having annexed the Punjab. Not only did the possession of that province prevent our being attacked from that quarter, but the existence of large forces in the Punjab enabled us to strike at the mutineers much earlier, and more effectually, than we could otherwise have done. It was to those troops mainly that we owed the rapid suppression of the mutiny. The policy of annexation, as it was called, was a very doubtful one, and the only fair way was to judge of each acqusition of territory according to its own justification, and its own value. To a general policy of annexation, not merely he (Mr. Vernon Smith), but every man of sense, must be opposed, nor was it part of the spirit of any Court of Directors or of the Home Government; yet in spite of all the declarations, both oral and written,

made by the Court of Directors and by different Ministers. almost every Governor-General had added something to our possessions. A man who went out to India in that position must go out with a desire for fame. and unfortunately, in India, fame was only to be obtained by the acquisition of territory. That was the great temptation to which Governors-General were exposed, and it was against that, therefore, that the Government at home ought mainly to exert themselves; but he thought that the hon gentleman had failed to show that the Government at home that duty The hon gentleman had endeavoured to distinguish between the Crown and the Court of Directors; but he contended that, in all cases of annexations, if there was any crime, the Crown and the Court of Directors had been equally culpable. In almost every case which he had mentioned they had gone hand in hand. The first mover was the Governor-General, but the backers and supporters of his policy had always been the Court of Directors and the Crown. The hon. gentleman was not accurate when he stated that, with all these annexations, there had been no addition to the number of European troops in India. Although the increase had not been large, it was a fact that, since 1833, the number of Queen's troops had risen from 20,000 to 24,000, while there had also been an additon of three European regiments, one in each Presidency, to the army of the Company. The hon. gentleman might say that the increase was but small; but it had been made; and the reason why the increase had been so small, was, that up to the 10th May, 1857, we had always depended upon native troops. Our policy had been to make the natives so subservient there that they should form regiments of policy to retain the countries which we had annexed; and it had been the admiration of all mankind that the Government of India had been able to do that which all other nations had failed in doing—not only to conquer the nations, but to compel the inhabitants themselves of the conquered countries to maintain our conquests. Proceeding with his history, the hon. gentleman said that the mutiny broke out because the natives saw that a favourable moment had arrived. He much questioned the accuracy of that expression, because he thought that the period of the Crimean was would have been a much more favourable opportunity than that which was selected for the commencement of this outbreak. The hon. Gentleman complained that, at the same time that they were annexing Oude, the Government embarked in the Persian war. That was a matter of fact : but there was no apprehension of any outbreak in Oude, and the Persian war had thrown no obstacle in the way of putting down the mutiny, because the troops which had returned from that expedition were the first which applied themselves to its suppression. That war he had, on a proper occasion, been prepared to defend. not only as having been justifiable and politic, but also as having greatly added to our prestige in India. He was sorry to hear the hon. gentleman say that the annexation of Oude was effected in a

manner most discreditable to Lord Dalhousie, because neither in that House nor elsewhere had that noble lord been well treated by those who now objected to his policy. For nearly two years the annexation of Oude had been before the country, and had even been discussed in that House; yet it was now whispered that the Directors had nothing to do with it. That was totally and entirely incorrect. Lord Dalhousie, as the hon. gentleman had said with something of a sneer, received a pension, but that pension had not even been objected to in the House of Commons, except that an hon. gentleman had asked if the Court of Directors had power to grant it. The Court Directors had thanked Lord Dalhousie, and as one of their reasons for thanks they mentioned the acquisition of Oude. The annexation of that country was effected by Lord Dalhousie with great ability. Such was the confidence of the Directors and of himself in the noble lord, that they left to him, as to the manner of the annexation, a latitude of discretion such as had hardly ever been left to a Governor-General; and they thought then, and still thought, that he had conducted that operation in the best, in the most manly, and in the most creditable manner possible. The hon. gentleman said the notion of annexing Oude was not first entertained by Lord Dalhousie. That was true, for the idea of annexing Oude had existed since 1799. It was held by Lord Wellesley, and every succeeding Governor-General of India down to the time of Lord Dalhousie, not because it was one of the richest territories of India, but because it was in close neighbourhood to our own dominions, and one of the worst governed countries on the face of the earth. There were dispatches in the blue books detailing the horros of the government of Oude, and, indeed, the materials on this point were so numerous that he could occupy the time of the House for hours without exhausting the subject. If the hon. gentleman wanted more information on this subject he would recommend him to read the revelations made by Colonel Sleeman, and see in the work called *The Private Life of an Eastern King* a true description of the condition of affairs under the King of Oude. The hon. gentleman asked if we could point out any difference between the state of Oude in 1801 and 1856. His reply was, it was those very fifty years during which matters had become so much worse in Oude, that at length the period arrived when it because absolutely necessary to put an end to a state of things that could not longer be tolerated. Lord Dalhousie, very naturally, having exercised a splendid reign in India, wished to close it by accomplishing an act which everybody had desired to accomplish, but which no one had ventured to grapple with but himself. The hon. gentleman contended that by the treaty of 1801 we were not entitled to deal in this way with the government of Oude. But Lord Dalhousie had shown in his minute that by the third article the Nawab Vizier engaged that he

'Will establish, in his reserved dominions, such a system of

administration, to be carried into effect by his own officers, as shall be conducive to the prosperity of his subjects and be calculated to secure the lives and property of the inhabitants, and his Excellency will always advise with and act in conformity to the counsel of the officers of the East India Company

The article was never complied with, and therefore had we not fair ground for saying that the treaty was broken on the part of the government of Oude? The hon. gentleman further said we had dealt unfairly with the King of Oude, and that he had no reason to expect he would receive such treatment from an ally like that of the government of India. Lord Dalhousie, it was true, bore testimony to the merit of the King of Oude as an ally; but how could he be otherwise than a faithful ally when we were supporting him upon his throne and supplying him with our soldiers? He was but too happy to gain these objects by rendering us in return some assistance; but all along his conduct was so bad that he was continually receiving warnings. He was warned in 1831 by Lord William Bentinck, who told him that :

If the warning he then gave was disregarded it was his (the Governor-General's) intention to submit to the home authorities his advice that the British Government should assume the direct management of the Oude dominions.'

And His Majesty was informed that the Court of Directors had subsequently granted to the Governor-General the authority which he had asked for that purpose. He was again warned in 1847 by Lord Hardinge, who impressed upon the King 'the great importance of making salutary and decisive changes in his administration', and remarked :

'By wisely taking timely measures for the reformation of abuses as one of the first acts of your reign, you will with honour to your own character, rescue your people from their miserable condition; but if your Majesty procrastinates you incur the risk of forcing the British Government to interpose in the government of Oude.'

Lord Hardinge gave him two years to accomplish that object; but still nothing was done. Lord Dalhousie gave him seven more; nothing was done. Surely after that it was time to interfere. The oppression of his people of which he was guilty was the sole cause and a sufficient justification of that interference. The oppression he promised time after time to remedy and bring to an end; but instead of doing so, his tyranny rose to such a pitch that it was no longer tolerable. Let the House reflect how that oppression was maintained. It was by British bayonets. It was by maintaining troops for his use that the King of Oude was enabled to tyrannize over his unfortunate people; and when the question which Lord Dalhousie had to decide was, whether he would withdraw those troops and expose the country to anarchy and confusion, or take possession of the province, he thought he took the most manly course in deciding upon the latter alternative. If, anarchy and confusion had prevailed in our

immediate neighbourhood, it would have been evident to everybody that it was with our knowledge and cognizance, and every civilized State would have cried out upon us as the authors of the evil—every native State in India would have sneered at our pretentions to superior morality when they saw us conniving at a state of anarchy and disorder in the province of Oude. Lord Dalhousie took the right course, therefore, when he assumed the government of Oude. The hon. gentleman pointed to this annexation of Oude as the chief, if not the only cause of the mutiny. Now, that might be so, and yet the act be justifiable in itself. It might possibly have led to consequences which were not foreseen at the time. Who did foresee what had happened in India? And if we were incapable of foreseeing all the mischief that ensured, he was perfectly willing that the annexation of Oude should be reckoned amongst those acts which we did, and did justly at the time, in our dream of the fidelity of the native army. But when the hon. gentleman pointed to the annexation of Oude as the cause of the mutiny, he (Mr. Vernon Smith) would call the attention of the House, to dates. Oude was not the place where the mutiny broke out. It did not appear there till at least a month after it had broken out at Meerut. But it arose, he said, from the number of sepoys from Oude employed in the army. It was not easy to arrive at exact conclusions in matters of this kind, when it was so often found that what they considered logical results failed them; but it must be borne in mind that there were sepoys in the Bombay army, and in other parts of India, where they showed no disposition to rebel. But the Oude army subsisted on the plunder of the people of Oude, and were no doubt sorry to be deprived of it by the annexation; it was the destruction of monopoly, and very naturally those who had profited by the monopoly were discontented. But the advantage was all on the side of the people of Oude. There could be no doubt that the first account we had from Oude, after the annexation, was that everything was proceeding tranquilly, and that the entire transfer of the provinces to the British dominions had been made, as was stated in one dispatch, without a single drop of blood being shed or even a single murmur. The hon. gentleman said that in 1833 there were secret orders given to the Governor-General to annex the kingdom of Oude. He spoke so positively on the subject, and seemed to have studied it so maturely that he (Mr. Vernon Smith) was loth to contradict him in making that assertion; but he was able to say that when he made inquiry after this secret dispatch he was unable to find it. He inquired of Mr. Waterfield, one of the most experienced clerks to be found in any office under the Crown. He was all that time connected with the Secret Committee, but remembered nothing of such a dispatch. His noble friend (Lord Glenelg) had assisted him with his recolections while he was making his inquiries. His noble friend was President of the board of Control at the time the hon. gentleman had referred to, but neither could be recollect any such

dispatch. All he would now say was that if it could be found it would be produced to the House. He begged to observe, however, that the scheme of annexing Oude was always in contemplation, and that it was one to which no objection was made by the Court of Directors. When the hon. gentleman said. Her Majesty's Government ordered Lord Dalhousie to carry out the annexation of Oude he was mistaken. Lord Dalhousie suggested the dealing with this question himself. He said :

> 'In addressing you upon this subject I would venture to urge upon you an early consideration and decision of the question relating to Oude From indications of your opinion upon this question, which already appear upon record, and from the nature of the case which has now been laid before you, it seems to me impossible that you can ultimately avoid having recourse to the measure which has been recommended for your immediate adoption If under these circumstances you should consider that the experience of eight years will arms me with greater authority for carrying the proposed measure into effect than any Governor-General when first entering on the administration of this empire is likely to command, I beg permission to assure you that I am ready to undertake the duty'

The hon. gentleman, therefore, could hardly assume that the Government originated the intention of dealing with Oude, though as regarded the act he was of course prepared to say that the government was responsible for it as well as the Court of Directors. General Low, who had always been opposed to annexation and who had been quoted by the member for Bucks, in the last Session, as the best authority against that policy, had put upon record a minute of his approval of the annexation of Oude, because of the shameful oppression of the people by the Government, the general infraction of the treaty by the King, and because the relative position of Great Britain to that kingdom differed from that in which it stood to any other native state. He also thought that such a step would prevent future misrule in Oude itself. General Outram, too, the Commissioner at Lucknow, who had stood up for the Ameers of Scinde, subscribed to the policy of annexing Oude, and every man at all acquainted with the country, whose authority was of any value, like wise approved of it. It was upon the strength of their authority Government had acted, and was now prepared to take the responsibility.

Again, the hon. gentleman had told them that the Crown was responsible for most of the wars that had taken place. He (Mr. Vernon Smith) thought upon that point the hon. gentleman was completely mistaken The only case on which the hon. gentleman had dwelt was that of the Afghan war. He (Mr. Vernon Smith) would call to his recollection a speech on that subject made recently at the India House by Mr. Prinsep, which he thought finally settled that question. Mr. Prinsep was at the time Secretary to the Council at Calcutta, and he positively objected in writing to that war, and yet he had the candour and fairness to state during the

discussion the other day at the India House that for the Afghan war the Indian Government was as responsible as Her Majesty's Ministers. He (Mr. Vernon Smith) could only conclude that the hon. gentleman, in bringing forward this motion for the sake of showing that the Crown was not to be trusted with the management of Indian affairs, had only shown that the Board of Control was not to be so trusted, and that, he (Mr. Vernon Smith) contended, was an attack on the existing Government of India. The Board of Control might be as much to blame as the Court of Directors. It was against the union of those two powers that Her Majesty's Ministers had thought fit to act, and to introduce a Bill for the purpose of their abolition. With regard to the return moved for by the hon. gentleman, he did not know of anything in the papers called for which he should not be perfectly ready to produce; but he believed the answer to the principal subjects indicated in the motion would be *nil.* With respect, for instance, to 'copies of a secret dispatch signed by the President of the Board of Control in 1831, addressed to Lord William Bentinck, and ordering him to annex or otherwise assume the administration of the kingdom of Oude', he was told that it would be very difficult to find such a dispatch either at the India House or at the Board of Control. He might here remark, as a proof of the general ignorance that prevailed as to the India administration, that even the hon. gentleman (Mr. Baillie) himself, who at one time had the honour of a seat at the Board of Control, did not seem to be aware that by the forms of office at that Board the President did not sign any secret dispatches. He (Mr. Vernon Smith) believed that the dispatch (moved for) of Lord William Bentinck, explaining his reasons for not carrying those orders into effect', was already before Parliament. Copies of 'the correspondence which took place, through the Secret Department of the India House, between the President of the Board of Control and the Governor-General of India, in the years 1833, 1834, and 1835, in reference to the annexation of Oude', the hon. gentleman could also have if they could be produced; but he had already told the hon. gentleman that the letter of which he had spoken was to him (Mr. Vernon Smith) a perfect novelty. As to 'a copy of a note or minute, signed by Sir Henry Ellis, when a member of the Board of Control, explaining his reasons for dissenting from the projected annexation of Oude', that also might be produced, although the hon. gentleman must be aware that a minute made by a member of any Board, and not officially made, was rather in the nature of a private document. But he (Mr. Vernon Smith) was exceedingly anxious that the whole of the information which the hon. gentleman thought necessary to elucidate the subject under discussion should be placed in his possession and any of the papers indicated in the motion, he should be ready to produce if it was in his power to do so.

GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1858

I. The Government of the territories now in the possession or under the Government of the East India Company, and all powers in relation to Government vested in or exercised by the said Company in trust for Her Majesty, shall cease to be vested in or exercised by the said Company; and all territories in the possession or under the government of the said Company, and all rights vested in or which if this Act had not been passed might have been exercised by the said company in relation to any territories, shall become vested in Her Majesty, and be exercised in her name; and for the purposes of this Act India shall mean the territories vested in her Majesty as aforesaid, and all territories which may become vested in Her Majesty by virtue of any such rights as aforesaid.

II. India shall be governed by and in the name of Her Majesty, and all rights in relation to any territories which might have been exercised by the said Company if this Act had not been passed shall and may be exercised by and in the name of Her Majesty as rights incidental to the Government of India; and all the territorial and other revenues of or arising in India, and all tributes and other payments in respect of any territories which would have been receivable by or in the name of the said Company if this act had not been passed, shall be received for and in the name of Her Majesty, and shall be applied and disposed of for the purposes of the Government of India alone, subject to the provisions of this Act.

III. Save as harein otherwise provided, one of Her Majesty's Principal Secretaries of State shall have and perform all such or the like powers and duties over all officers appointed or continued under this Act, as might or should have been exercised or performed by the East India Company, or by the Court of Directors or Court of Proprietors of the said Company either alone or by the direction or with the sanction or approbation of the Commissioners for the affairs of India in relation to such government or revenues, and the officers and servants of the said Company respectively, and also all such powers as might have been exercised by the said Commissioners alone; and any warrant or writing under Her Majesty's Royal Sign Manual, which by the Act of the session holden in the seventeenth and eighteenth years of Her Majesty, chapter seventy-seven, or otherwise, is required to be countersigned by the President of the Commissioner for the affairs of India, shall in lieu of being so countersigned be countersigned by one of Her Majesty's principal Secretaries of State.

IV In case Her Majesty be pleased to appiont of fifth Principal

Secretary of State, there shall be paid out of the revenues of India to such Principal Secretary of State and to his Under Secretaries respectively the like yearly salaries as may for the time being be paid to any other of such Sectretaries of State and his Under Secretaries respectively.

VII. For the purposes of this Act a council shall be established, to consist of fifteen members, and to be styled the Council of India; and henceforth the Council in India now bearing that name shall be styled the Council of the Governor-General of India.

VIII. Within fourteen days after the passing of this Act the Court of Directors of the East India Company shall, from among the persons then being Directors of the said Company or having been theretofore such Directors, elect seven persons to be with the persons to be appointed by her Majesty as herein-after mentioned the first members of the Council under this Act, and the names of the persons so elected by the Court of Directors shall be forthwith, after such election, certified to the Board of Commissioners for the affairs of India, under the seal of the said Company, and it shall be lawful for Her Majesty, be Warrant under Her Royal Sign Manual, within thirty days after the passing of this Act, to appoint to be members of such Council eight persons : provided always that if the Court of Directors of the East India Company shall refuse or shall for such fourteen days neglect to make such election of such seven persons, and to certify the names of such persons as aforesaid, it shall be lawful for Her Majesty, by warrant under Her Royal Sing Manual, within thirty days after the expiration of such fourteen days, to appoint from among the said Directors seven persons to make up the full number of the said Council : provided also that, if any person being or having been such Director, and elected or appointed as aforesaid, shall refuse to accept the office, it shall be lawful for Her Majesty, by warrant under Her Royal Sign Manual, to appoint in the place of every person so refusing some other person to be a member of the Council, but so that nine members of the Council at the least shall be persons qualified as herein-after mentioned.

IX. Every vacancy happening from time to time among the members of the Council appointed by Her Majesty, not being members so appointed by reason of the refusal or neglect of the Court of Directors or the refusal to accept office hereinbefore mentioned, shall be filled up by Her Majesty, by warrant under Her Royal Sing Manual, and every other vacancy shall be filled up by the Council by election made at a meeting to be held for that purpose.*

X. The major part of the persons to be elected by the Court of Directors, and the major part of the persons to be first appointed by Her Majesty after the passing of this Act, to be members of the Council, shall be persons who shall have served or resided in India for ten years at the least, and (excepting in the case of late and present Directors and officers on the Home establishment of the East India Company who shall have so

* The power of appointment was given to the Secretary of State by 32 & 33 Vict c 97, and the term reduced to ten years.

served or resided) shall not have last left India more than ten years next preceding the date of their appointment : and no person other than a person so qualified shall be appointed on elected to fill any vacancy in the Council unless at the time of the appointment or election nine at the least of the continuing members of the Council be persons qualified as aforesaid.

XI. Every member of the Council appointed or elected under this Act shall hold his office during good behaviour : provided that it shall be lawful for Her Majesty to remove any such member from his office upon an address of both Houses of Paliament.

XII. No member of the Council appointed or elected under this Act shall be capable of sitting or voting in Parliament.

XIII. There shall be paid to each member of the Council the yearly salary of one thousand two hundred pounds, out of the revenues of India.

XIX. The Council shall, under the direction of the Secretary of State, and subject to the provisions of this Act, conduct the business transacted in the united Kingdom in relation to the Government of India and the correspondence with India, but every order or communication sent to India shall be signed by one of the Principal Secretaries of State; and, save as expressly provided by this Act, every order in the United Kingdom in relation to the Government of India under this Act shall be signed by such Secretary of State; and all dispatches from Governments and presidenceies in India, and other dispatches from India, which if this Act had not been passed should have been addressed to the Court of Directors or to their Secret Committee, shall be addressed to such Secretary of State.

XX. It shall be lawful for the Secretary of State to divide the Council into committees for the more convenient transaction of business, and from time to time to rearrange such committees, and to direct what departments of the business in relation to the Government of India under this Act shall be under such committees respectively, and generally to direct the manner in which all such business shall be transacted.

XXI. The Secretary of State shall be the President of the Council, with power to vote, and it shall be lawful for such Secretary of State in Council to appoint from time to time any member of such Council to be Vice-President thereof, and any such Vice-President may at any time be removed by the Secretary of State.

XXII. All powers by this Act required to be exercised by the Secretary of State in Council, and all powers of the Council, shall and may be exercised at meetings of such Council, at which not less than five members shall, be present, and at every meeting the Secretary of State, or in his absence the Vice-President, if present, shall preside, and in the absence of the Secretary of State and Vice-President, one of the members of the Council Present shall be chosen by the members present to preside at the meeting; and such Council may act notwithstanding any vacancy therein : meetings of the Council shall be so convened and held when and as the Secretary of State shall from time to time direct; provided that one such meeting at least be held in every week

XXIII. At any meeting of the Council at which the Secretary of State is present if there be a difference of opinion on any question other than the question of the election of a member of Council, or other than any question with regard to which a majority of the Votes at a meeting is hereinafter declared to be necessary, the determination of the Secretary of State shall be final; and in case of an equality of votes at any meeting of the Council, the Secretary of State, if present, and in his absence the Vice-President, or presiding member, shall have a casting vote; and all acts done at any meeting of the Council in the absence of the Secretary of State, except the election of a member of the Council, shall require the sanction or approval in writing of the Secretary of State; and in case of difference of opinion on any question decided at any meeting, the Secretary of State may require that his opinion, and the reasons for the same, be entered in the minutes of the proceedings and any member of the council who may have been present at the meeting may require that his opinions and any reason for the same that he may have stated at the meeting, be entered in like manner.

XXIV. Every order or communication proposed to be sent to India, and every order proposed to be made in the United Kingdom, by the Secretary of State under this Act, shall, unless the same has been submitted to a meeting of the Council, be placed in the Council room for the perusal of all members of the Council during seven days before the sending or making thereof, execept in the cases hereinafter provided; and it shall be lawful for any member of the Council to record in a minute book, to be kept for that purpose, his opinion with respect to each such order or communication and a copy of every opinion so recorded shall be sent forthwith to the Secretary of State.

XXV. If a majority of the Council record as aforesaid their opinions against any act proposed to be done, the Secretary of State shall, if he do not defer to the opinions of the majority, record his reasons for acting in opposition thereto.

XXIX. The appointments of Governor-General of India, fourth ordinary member of the Council of the Governor-General of India, and Governors of Presidencies in India, now made by the Court of Directors with the approbation of Her Majesty, and the appointments of Advocate-General for the several Presidencies now made with the approbation of the Commissioners for the affairs of India, shall be made by Her Majesty by warrant under Her Royal Sign Manual; the appointments of the ordinary members of the Council of the Governor-General of India, except the fourth ordinary member, and the appointments of the Members of Council of the several Presidencies, shall be made the Secretary of State in Council, with the Concurrence of a majority of members present at a meeting*; the appointments of the Lieutenant-Governors of provinces or territories shall be made by the Governor-General of India, subject to the approbation of Her Majesty; and all such appointments shall be

* This power was transferred to the Crown by 32 & 33 Vict. c. 97.

subject to the qualifications now by law affecting such offices respectively.

XXX. All appointments to offices, commands, and employments in India, and all promotions, which by law or under any regulations, usage, or custom, are now made by any authority in India, shall continue to be made in India by the like authority, and subject to the qualifications, conditions, and restrictions now affecting such appointments respectively; but the Secretary of State in Council, with the Concurrence of a majority of members present at a meeting, shall have the like power to make regulations for the division and distribution of patronage and power of nomination among the several authorities in India, and the like power of restoring to their stations, offices, or employments, officers and servants suspended or removed by any authority in India as might have been exercised by the said Court of Directors, with the approbation of the Commissioners for the affairs of India, if this Act had not been passed.

XL. The Secretary of State in Council, with the concurrence of a majority of votes at a meeting, shall have full power to sell and dispose of all real and personal estate whatsoever for the time being vested in Her Majesty under this Act, as may be thought fit, or to raise money on any such real estate by way of mortgage, and make the proper assurances for that prupose, and to purchase and acquire any land or hereditaments, or any interests therein, stores, goods, chattels, and other property, and to enter into any contracts whatsoever, as may be thought fit, for the purposes of this Act; and all property so acquired shall vest in Her Majesty for the service of the Government of India; and any conveyance or assurance of or concerning any real estate to be made by the authority of the Secretary of State in Council may be made under the hands and seals of three members of the Council.

XLI. The expenditure of the revenues of India, both in India and elsewhere, shall be subject to the control of the Secretary of State in Council, and no grant or appropriation of any part of such revenues, or of any other property coming into the possession of the Secretary of State in Council by virture of this Act, shall be made without the concurrence of a majority of votes at a meeting of the Council.

LIII. The Secretary of State in Council shall, within the first fourteen days during which Parliament may be sitting next after the first day of May in every year, lay before both Houses of Parliament an account for the financial year preceding that last completed of the annual produce of the revenues of India, distinguishing the same under the respective heads thereof, at each of the several Presidencies of Governments, and of all the annual receipts and disbursements at home and abroad on account of the Government of India, distinguishing the same under the respective heads thereof, together with the latest estimate of the same for the last financial year, and also the amount of the debts chargeable on the revenues of India, with the rates of interest they respectively carry, and the annual amount of such interest, the state of the effects and credits at each Presidency or Government, and in England or elsewhere, applicable to the

purposes of the government of India, according to the latest advices which have been received thereof, and also a list of the establishment of the Secretary of State in Council, and the salaries and allowances payable in respect thereof, and if any new or increased salaries or pensions of fifty pounds a year or upwards have been granted or created within any year, the particulars thereof shall be specially stated and explained at the foot of the account of such year; and such account shall be accompanied by a statement prepared from detailed reports from each Presidency and district in India in such form as shall best exhibit the moral and material progress and condition of India in each such Presidency.

LIV. When any order is sent to India directing the actual commencement of hostilities by Her Majesty's forces in India, the fact of such order having been sent shall be communicated to both Houses of Parliament within three months after the sending of such order, if Parliament be sitting, unless such order shall have been in the meantime revoked or suspended, and if Parliament be not sitting at the end of such three, months, then within one month after the next meeting of Parliament.

LV. Except for preventing or repelling actual invasion of Her Majesty's Indian possessions, or under other sudden and urgent necessity, the revenues of India shall not, without the consent of both Houses of Parliament, be applicable to defray the expenses of any, military operation carried on beyond the external frontiers of such possessions by Her Majesty's forces charged upon such revenues.

LVI. The military and naval forces of the East India Company shall be deemed to be the Indian military and naval forces of Her Majesty, and shall be under the same obligations to serve Her Majesty as they would have been under to serve the said Company, and shall be liable to serve within the same territorial limits only, for the same terms only, and be entitled to the like pay, pensions, allowances, and privileges, and the like advantages as regards promotion and otherwise, as if they had continued in the service of the said Company : such forces, and all persons hereafter enlisting in or entering the same, shall continue and be subject to all Acts of Parliament, laws of the Governor-General of India in Council, and articles of war, and all other laws, regulations, and provisions relating to the East India Company's military and naval forces respectively, as if Her Majesty's Indian military and naval forces respectively had throughout such acts, laws articles, reglations, and provisions been mentioned or referred to, instead of such forces of the said Company; and the pay and expenses of and incident to Her Majesty's Indian military and naval forces shall be defrayed out of the revenues of India.

LVII. Provided that it shall be lawful for Her Majesty from time to time by order in Council to alter or regulate the terms and conditions of service under which persons hereafter entering Her Majesty's Indian forces shall be commissioned, enlisted, or entered to serve, and the forms of attestation and of the oath or declaration to be used and taken or made respectively on attesting persons to serve in Her Majesty's Indian forces shall be such as Her Majesty with regard to the European forces, and the

Governor-General of India in Council with regard to the native forces, shall from time to time direct : provided, that every such order in Council shall be laid before both Houses of Parliament within fourteen days after the making thereof, if Parliament be sitting, and, if Parliament be not sitting, then within fourteen days after the next meeting thereof.

LXV. The Secretary of State in Council shall and may sue and be sued as well in India as in England by the name of the Secretary of State in Council as a body corporate; and all persons and bodies politic shall and may have and take the same suits, remedies, and proceeding, legal and equitable, against the Secretary of State in Council of India as they could have done against the said Company; and the property and effects hereby vested in Her Majesty for the purposes of the Government of India, or acquired for the said purposes, shall be subject and liable to the same judgements and executions as they would while vested in the said Company have been liable to in respect of debts and liabilities lawfully contracted and incurred by the said Company.

LXVII. All treaties made by the said Company shall to binding on Her Majesty, and all contracts, covenants, liabilities, and engagements of the said Company made, incurred, or entered into before the commencement of this Act may be enforced by and against the Secretary of State in Council in like manner and in the same Courts as they might have been by and against the said Company if this Act had not been passed.

Proclamation by the Queen to the Princes, Chiefs, and the People of India, 1 November, 1858

Victoria, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the Colonies and Dependencies thereof in Europe, Asia, Africa, America, and Australasia, Queen, Defender of the Faith.

Whereas, for divers weighty reasons, we have resolved, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in Parliament assembled, to take upon ourselves the government of the territories in India, heretofore administered in trust for us by the Honourable East India Company.

Now, therefore, we do by these presents notify and declare that, by the advice and consent aforesaid, we have taken upon ourselves the said government; and we hereby call upon all our subjects within the said territories to be faithful, and to bear true allegiance to us, our heirs and successors, and to submit themselves to the authority of those whom we may hereafter, from time to time, see fit to appoint to administer the government of our said territories, in our name and on our behalf.

And we, reposing especial trust and confidence in the loyalty, ability, and judgement of our right trusty and well-beloved cousin Charles John, Viscount Canning, do hereby constitute and appoint him, the said

Viscount Canning, to be our first Viceroy and Governor-General in and over our said territories, and to administer the government thereof in our name, and generally to act in our name and on our behalf, subject to such orders and regulations as he shall, from time to time, receive through one of our Principal Secretaries of State.

And we do hereby confirm in their several offices, civil and military, all persons now employed in the service of the Honourable East India Company, subject to our future pleasure, and to such laws and regulations as may hereafter be enacted.

We hereby announce to the native princes of India, that all treaties and engagements made with them by or under the authority of the East India Company are by us accepted, and will be scrupulously maintained, and we look for the like observance on their part.

We desire no extension of our present territorial possessions ; and while we will permit no aggression upon our dominions or our rights to be attempted with impunity, we shall sanction no encroachment on those of others.

We shall respect the rights, dignity, and honour of native princes as our own; and we desire that they, as well as our own subjects, should enjoy that prosperity and that social advancement which can only be secured by internal peace and good government.

We hold ourselves bound to the natives of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects, and those obligations, by the blessing of Almighty God, we shall faithfully and conscientiously fills.

Firmly relaying ourselves on the truth of Christianity, and acknowledging with gratitude the solace of religion, we disclaim alike the right and the desire to impose our convictions on any of our subjects. We declare it to be our royal will and pleasure that none be in any wise favoured, none molested or disquieted, by reason of their religious faith or observances, but that all shall alike enjoy the equal and impartial protection of the law; and we do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure.

And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to office in our service, the duties of which they may be qualified by their education, ability, and integrity duly to discharge.

We know, and respect, the feelings of attachment with which the natives of India regard the lands inherited by them from their ancestors, and we desire to protect them in all rights connected therewith, subject to the equitable demands of the State; and we will that generally, in framing and administering the law, due regard be paid to the ancient rights, usages, and customs of India.

We deeply lament the evils and misery which have been brought upon India by the acts of ambitious men, who have deceived their countrymen by false reports, and led them into open rebellion. Our power has been shown by the suppression of that rebellion in the field; we desire to show our mercy by pardoning the offences of those who have been misled, but who desire to return to the path of dutry.

Alredy, in one province, with a desire to stop the further effusion of blood, and to hasten the pacification of our Indian dominions, our Viceroy and Governor-General has held out the expectation of pardon, on certain terms, to the great majority of those who, in the late unhappy disturbances, have been guilty of offences against our Governmnt, and has declared the punishment which will be inflicted on those whose crimes place them beyond the reach of forgiveness. We approve and confirm the said act of our Viceroy and Governor-General, and do further announce and proclaim as follows :

Our clemency will be extended to all offenders, save and except those who have been, or shall be, convicted of having directly taken part in the murder of British subjects. With regard to such the demands of justice forbid the exercise of mercy.

To those who have willingly given asylum to murderers, knowing them to be such, or who may have acted as leaders or instigators of revolt, their lives alone can be guaranteed; but, in apportioning the penalty due to such persons, full consideration will be given to the cirtumstances under which they have been induced to throw off their allegiance; and large indulgence will be shown to those whose crimes may appear to have originated in too credulous acceptance of the false reports circulated by designing men.

To all others in arms against the Government we hereby promise unconditional pardon, amnesty, and oblivion of all offences against ourselves, our crown and dignity, on their return to their homes and peaceful pursuits.

It is our royal pleasure that these terms of grace and amnestry should be extended to all those who comply with these conditions before the first day of January next.

When, by the blessing of Providence, internal tranquillity shall be restored, it is our earnest desire to stimulate the peaceful industry of India, to promote works of public utility and improvement, and to administer the government for the benefit of all our subjects resident therein. In their prosperity will be our strength, in their contentment our security, and in their gratitude our best reward. And may the God of all power grant to us, and to those in authority under us, strength to carry out these our wishes for the good of our people.

Calcutta Review september 1860

THE ADMINISTRATION OF OUDH

Oudh Administration Report for 1858-59,
Published by the Government of India.

THE policy pursued by the Government of India towards Oudh since the reconquest of the country has been of so marked a character and of so novel a kind, and has also been, up to the present time, so decidedly successful, that we think we are quite justified in bringing to the notice of our readers the leading features of this policy and in recording some of its practical results.

The characteristic mark of the treatment which Oudh has received at the hands of its new master has been a large and consistent liberality. By this term we mean not simply munificence in granting rewards to loyal chiefs, nor magnanimity in condoning or lightly chastising rebellion; but the adoption of enlightened and far seeing views on all the main questions of administration, a liberal construction in the assessment of revenue, a liberal sympathy with the higher classes, a vigorous and, as yet, highly successful effort to enlist the influence of the leading men on our side, and, '*pari passu,*' a never ceasing endeavour to cause this liberality to react to the advantage of the poorer classes, without any direct or unpalatable interference of the officers of the local Government. To understand how the present objects of the administration are being worked out, there is one word which should be borne in the minds of our readers a wored which every officer in Oudh should look on as expressing what is the basis of his success and denoting the safest means to ensure it—'*Influence,*' the power of the upright strong willed and just Englishman exerted over those through whom alone he must hope to act, and against whose opposition he will find his best intentions misunderstood, his kindest efforts ineffectual, and his energies thwarted if not wholly thrown away

Let every officer look on himself as valuable to the Government and an efficient servant of it, in proportion as he feels he possesses the power to do good by the exercise of his influence with the population with whom he is directly brought into contact. Let him by unremitting courtesy and above all by untiring patience make himself an object of resort to those who stand in need of his advice and his assistance, and while compelled, as he often is, and as his sympathies lead him, to stand between the strong and the weak, let him recollect that a permanent alleviation of suffering is more likely to be attained by the mediatory weight of his influence, than by the just exertion of his authority.

But we are anticipating ourselves, we are putting the moral before the fable and shall reserve any further reflections for the latter portion of our article, where they may be properly introduced as applications of the particular facts which we now proceed to discuss without further preface.

The period which it is proposed to consider, is that subsequent to the pacification of the province by Lord Clyde. This may be conveniently set down as beginning with the year 1859. Then opened a new era on Oudh, not because a new policy was then initiated, but because it was then just possible to carry out in all their details the measures which has been decided on as appropriate for the Government of the country. True that some protions of the west and south of Oudh had been for some months comparatively quiet; true that the majority of the Bainswara clan was unresisting or prepared to submit; but there were still heads of revolt which required to be crushed or expelled. Not till late in 1858 did Benee Madho leave the fort and jungles of Shunkarpoor. Not till the last month of that year, did Feroze Shah see that the game was up in Oudh, that the soi disant Royal family were only a purposeless puppet in the hands of a skulking rabble, and that the struggle was only maintainable where the hill and forest of Central India gave a wide field for flight and foray to rebellious restlessness. It was not till 1858 that he saw that he was supporting a dynasty which the enthusiasm of its own country had abandoned, and made his escape by that wild dash across Oudh which is looked on as the most daring feat of the war, and which placed him with the shattered remuants of hi· free lances in the welcome fastnesses of Central India.

But by the 1st of January 1859 the whole opposition of the rebels in Oudh was concentrated in the body of men who slowly retreated northwards as the veteran general advanced, till they found themselves across the British boundary in the low wooded hills and valleys which form the frontier of Nepal. A wild country, inhabited by a peaceful people under a rule not ours, stopped in the main any further advance on our part. Nearly all the guns and all the munitions of war had previously fallen into our hands, during the different encounters which occurred wherever our forward columns caught up the wary foe. Disorganized and without any chief of military renown, they still fancied that they had secured a retreat whence, refreshed by rest and aided by the sympathies of the Nepalese, they could hereafter continue the contest and raise again the standard of rebellion. False hopes! From the day when the worn-out remanants of the once confident mutineer sepoys entered the wild hill country of Nepal their doom was sealed. Plundered by the natives, thinned by the desertion of those who longed to exchange the ungenial climate of the north for the sun of their southern villages, and finally decimated by disease which prostrated minds and bodies, they suffered all the miseries which they had themselves inflicted on others; and unable to credit the sincerity of the spirit which offered an amnesty to all past offences, they died in suffering and silence, in forest and in plain,of hunger and sickness, with frightful rapidity.

Some months later a fraction of them, gaunt, famine and fever stricken, victims of combined patriotism and incredulity, returned to Oudh; some to die in our gaols not as prisoners but as hospital patients, and the rest to seek with tottering steps and death stricken limbs the sites

of their former happy homes. Happy indeed he who found a home! Many found sad changes—new masters, new interests, new settlers, new grantees had filled *their* places, and the man who in old times had sought his home proud in the distinction of being a British soldier, now crept back to his village a marked and taunted wretch to drag on his days under survedillance and eat the scanty pittance earned by daily toil.

Future years will reveal the true story of the actual suffering caused by the mutiny of 1857, and which re-acted on the authors of it. When time has given confidence to the tongue we shall hear stories from old rebels whose lips fear now seals up. It is still early to expect the 'confessions of a mutineer.' Complicity in the revolt must still wear the colours thought it meets not with the reward of crime, but hereafter we shall be able more justly to appreciate the sickening blow under which our enemies have been crushed. Those of our readers who have seen the report of the administration of Oudh for the year, 1858 while the province was in the hands of Sir R. Montgomery, will not want to be more than reminded of the steps then taken to bring about a resettlement of the province.

It having been decided that the Revenue administration should be on a different footing for that devised at annexation, when the general character of the settlement was to deal with small village holders in preference to large Talookdars, the necessary basis for the change was sought for and found in the proclamation of the Governor General of March 1858, which declared the whole of the soil of Oudh (with a few exceptions) to be confiscated, and all rights and titles in it to have ceased. This left the Commander-in-Chief at liberty to inaugurate a new regime. No question of existing interests could hamper him in his future course, and he proceeded at once to remedy the confessed evils which our previous mode of settlement had caused. It has been usual to refer to the March 1858, proclamation as an empty blast, a dead letter; but that such was not the case may be learned from the fact that the full penalties of it were enforced against some persistent rebels, who, unable or unwilling to accept the offered amnestry, were either proscribed by us, or placed beyond the pale of negociation by their own obstinate adherence to delusive expectations.

As a matter of fact, land in Oudh of the annual value of Rs. 12,46,720 (or nearly 12¼ lacs) was confiscated under the Governor General's proclamation, and the titles thus vested in Government, have been from time to time given away in rewards to loyal men who did good service in the hour of need. This amount represents an area of about ⅛ of the whole of Oudh, so that if can hardly be said that a measure which has had such effects, was a dead letter, while too, a further significance is added to it by the fact that every estate now held by a Talookdar in Oudh is held by virtue of a sunnud given under the authrity which once deprived him of very acre. But we are harping on old themes, and it is our more immediate object to set before our readers some of the later acts of Government which exemplify the policy pursued towards the province.

Starting then from the 1st January 1859, the date which for

convenience we have assigned to the conclusion of the campaign which replaced Oudh fully in the hands of the Civil power, we shall proceed to sketch the course of successive measures adopted for the well governing of the country and the well being of the people.

The system of the Civil Government of Oudh is too well known to our Indian readers to need more than a brief allusion here. The non-regulation principle of the union of all authority in one head, is that adopted in the Punjab. The Chief Commissioner unites in his person the fullest powers of every branch of the Executive, and the principle is repeated in every subordinate officer within the limits of his own jurisdiction.

The collection of Revenue, the Criminal and Civil Courts, the promotion of all works of public utility, such as roads and bridges, the establishment ferries, bazaars and schools are all vested in the local chief officer, who is termed the Deputy Commissioner. His powers are considerable, and the Code which he is called on so administer is one of stern severity.

Up to the end of 1859 the special Acts XIV., XVI, and XVII. of 1857 were re-enacted and held applicable to Oudh. These enactments, especially XVI., visit all offences against property or person with tremendous penalties. Capital punishment may be legally inflicted in Oudh for burglary if attended with violence, and the same penalty awaits the disturber of the peace in affrays, once so common in the province, and to repress which it was ordered that the sentence of death might be passed and executed on offenders, even in those cases in which no loss of life resulted from the contest.

But this code was for peaceful times. Up to the beginning of 1859, every Commissioner and Deputy Commissioner in Oudh was to be ex-officio a special Commissioner under the Acts of 1857; he was thus armed individually and irresponsibly with the powers of life and death. Happily however the exercise of these functions has been rarely called for, and the Criminal Code has been to all intents and purposes no harsher than it is at the time we write.

Death cannot be inflicted without the concurrence of the Chief Commissioner.

In all secondary punishments the Judicial Commissioner has full and final powers.

Transportation for life, in irons and with labour, unlimited fine and *a fortiori* all modifieations of these sentences, are vested in that Officer

Commissioners, sitting as Sessions Judges, can imprison for 16 years, give 200 stripes and impose fines at discretion.

Next in order stands the District Officer, and his range nearly equals that of a Commissioner in the Punjab—seven years imprisonment, which can be made constructively to involve transportation, 100 lashes and a fine of 10,000 Rs. are the terrors of the law wielded by a District Officer in Oudh.

A Magistrate's full powers belong to a 1st Class Assistant Commissioner; or one of a lower grade may be specially empowerd to the

same extent. By such officers the infliction of the lash up to 50 stripes, is permitted, but no lower authority awards a punishment so terrible in its severity and in its nature inadmissible of remedy by appeal.

The great use of the lash in Oudh practically simplifies the course of appeals.

These are guided by the simple rule that one appeal lies from the sentencing Court to the next Supreme Court where a confirmation of the previous decision is final on judicial grounds; whereas a difference of opinion opens the door to a further apeal.

The Civil administration may be very briefly disposed of. The Deputy Commissioner is Civil Judge in all the Districts of Oudh except in Lucknow, where there is a special Officer for this Department.

All cases up to Rs. 1000 value are determinable by the assistant Commissioner, all above that sum are decided by the Deputy Commissioner. The law of appeal is on the same principle as that in criminal cases, and need not be repeated here.

But increased authority in the Civil Officer was not the only instrucment used by the Government of Oudh. A strong and well disciplined body of Military Police, who, if any thing, were too much rather than too little of the regular soldier, was substituted for the old Thannah police. In a country lately the battle-fleld of a national rebellion, it was probable that, till arms were yielded up, and till feelings irritated by defeat and submission, were smoothed down, there might still be a stubbornness which the untrained activity and rude weapons of the "Burkundaz" could not successfully oppose, and which would call for the disciplined line and martial bearing of a well drilled Infantry Regiment, against which the idea of resistane would seldom occur to the native mind. Fifteen Regiments, each 800 strong, were raised, equipped and modelled on the pattern of the Scinde Police. That force, raised by the orders and under the eye of Sir C. Napier, was considered rightly to have answered well the purposes of its constitution. They consisted to Cavalry and Infantry, and had at least as much knowledge of drill and power of furmation as any of the irregular troops which have always abounded in India.

Strong Detachments of this Military Police, which up to the end of 1858 was used as a force of regulars and as such had been brigaded with the different columns which traversed Oudh, were placed in the sites of our old Police posts or in those towns which it was considered necessary to overawe. Two English Officers of Police were attached to each District, and 3 Districts were placed under the supervision of a Divisional Commandant. As the column swept northward during the two last months of 1858 these Police took up the posts assigned to them, and completed the work of the bayonet and the sabre in fort and jungle by disarming the whole of the population. The known habit of the people of Oudh, in all except a few of the more peaceful and poorer northern jungle tracts, was for each man to carry a sword, dagger and shield, and to these many added a matchlock. The Brahmins and Rajpoots, to a man, had each their

stand of arms. The Mussulmans who chiefly lived in towns were equally furnished, with perhaps a greater preponderance of flint and percussion muskets and pistols. The lower classes used the sword or spear—while the Passee tribe, a numerous and turbulent caste, which under the Oudh Government performed the offices of village watchman, village thief and general marauder, and ran errands for any one who would either pay him or let him plunder others, used the bamboo bow with great skill and affect. During the whole of the cold weather of 1858-59, disarming went on with extraordinary rapidity. Every district Officer, every Officer of Police attended by a detachment of the force, went from village to village, town to town, and compelled a surrender of guns, firelocks, swords and all the other varieties of lethal weapons which Indian handicraft had in its fertility of imagination devised. Evasion was met by firmness, recusance by fine, and by the lash where fine was inapplicable. The terrors of the law were great. Any person convicted of concealment or non-surrender of arms, might be flogged. Fine, limited only by the means of the offender, and confiscation of part or all of his estates, if the culprit was a land-owner, were also the penalties which had to be braved by those who refused to comply with the English officer's demand for his dearly prized and long worn weapons. But the moral effect of the crushed rebellion, the tacit acknowledgment of deserved punishment, and the obvious fairness in a victor to disarm a possible future foe, expedited the work. In many instances the summons was anticipated the work. In many instances the summon was anticipated by the work. In many instances the summon was anticipated by the delivery of arms, heaps upon heaps; in others each individual in a village brought his quota to the Officer's tent pitched in the neighbouring grove. Information was liberally paid for, search was resorted to in suspected cases, and from wells tanks, ponds, pits, ditches, haystacks thatchroofs, sheaves of maize and heaps of straw, were raised cannons old and new, ammunition and all kinds of weapons.

Meanwhile every landholder who was not an absentee, i.e. who had sent in his submission and received back his estate in part or in whole, was called on to level his fort, or his entrenched house. Loopholed walls were thrown down, ditches filled up, bastions razed to the ground, and all jungle in the neighbourhood of these ancient fastnesses cut or burnt. The last official returns, including fortified houses dismantled, give the number of forts destroyed as 1575 and the number of arms surrendered

Cannons,	...	....	720
Firearms,	...	...	1,92,307
Swords,	...	...	5,79,554
Other arms.	...	...	6,94,060
		Total,	14,66,641

To this total we must add largely to allow for arms carried into Nepal by mutineers and rebels, and which have never returned; for arms flung away in flight or captured in action by the military columns, of which no account was taken;—for arms buried by the owners, 1st, with the object

of getting finally rid of them—2nd, with the object of preserving them, and lastly for arms voluntarily broken up by their owners and converted into other implements. It is calculated that nearly two-thirds of the arms of the province are accounted for by formal surrender in the official reports. The remainder must be put down to the heads above given—and when it is considered that at least half of the arms hidden with a guilty purpose, must have been rendered useless by rust, it may be fairly presumed that the people have lost the use absolutely of five-sixths of the weapons in the country. All land is now liable to forfeiture if concealed arms are found on it. Every title deed contains a condition for surrender of all such; and in some cases confiscation and heavy fine have been inflicted on persons who, in spite of all efforts to open their eyes to their own interests or to a sense of their duty to Government, have persisted in retaining cannon and munitious of war.

But we must hasten onwards. Thanks to the activity displayed by the officers in the search for arms, a long continunance of the high pressure necessary at first, was avoided. With the cold weather every village had been visited, every Talookdar had made a surrender, and the fears of domiciliary search and summary requisitions ceased. Confidence was in a manner restored, amicable relations were begun, and the seeds of future intercourse, and peaceful administrative improvements were sown. The wish of the subject to remove all memory of his past and suspicion of his present behaviour, made him very complaisant and unusually accessible to persuasion. The District Officers were not slow to turn the position of the parties to the mutual advantage of both.

"Argilla quidvis imitaberis uda."

We had got our Talookdars at a working temperature, and it was our fault if they were not modelled to our own pattern.

The first step was to define the relations of the village occupants with these their reinstated and acknowledged chiefs. And here it may be worth while to say a few words to those whose ideas of a Talookdar in Oudh are formed according to the generally prevalent notions of the species. A kind of Ishmaelite, against every man and with every man against him, carrying on a perpetual struggle of disloyalty to the royal lieutenants, a deathless feud against his neighbours, breathing an inexhaustible spirit of cruelty and oppression against his luckless peasants, is the usual outline which is easily filled up to taste from the published Records of the internal state of Oudh in former years. But though instances did exist where authority was defined, where family quarrels were perpetuated between rival neighbours, where exaction and rack-rent existed to the ruin of the cultivator. such was not the normal or prevalent state of things. A rebellious chief was generally a good landlord possessing the affection of his tenantry, for it was the unity of his following which enabled him to oppose the demands of the state; and it may be fairly said that so inveterate had the principle of large holdings become, that it was the exception to find small independent proprietors who had not allied

themselves, as inferior to superior to some powerful landlord, either from ties of kin or preferring a secure dependence to the perilus enjoyment of an undefended isolation. This position, now generally acknowledged to be the true one, had been studiously ignored at annexation. Every man in Oudh, who held two villages was assumed to have one more than his share; force must have wrested it from some weaker but rightful owner, and the accumulation of such property was only evidence of more inveterate, more unscrupulous, or more successful iniquity.

But times were changed. Acknowledging the natural relation of the poor to the rich, of the weak to the strong without troubling ourselves to account for it, we are grown wiser and are not careful to intermeddle with the established status of the parties. To tie the upper class by a lease of his land at a low rate to those who lived on it, would be to deprive him of all share in improved cultivation or prosperous seasons and would be also premium on indolence. On the other hand to leave the pessant entirely at the mercy of men, who, though generally alive to the folly of overtasking the working classes. would sometimes gratify dislike by oppression, would not be fair.

It was decided that the inferior village proprietors should be maintained in the possession of all the rights and privileges they were found to be enjoying at the time of annexation. But often the recorded rent-rates were absurdly low, the object of a low rent roll being to present a small surface for taxation to the Collector of the Government Revenue. Large sums under various miscellaneous heads were paid over and above the recorded rent, and those were not by any means all illegal seigniorial exactions—but willingly conceded as the lord's just dues by his tenantry. It was ruled by the Chief Commissioner that all these cesses that were not unjust in their nature nor excessive in amount should cease to be paid separately, and should henceforth be consolidated with the nominal rent of the holding into one specific sum. Then a great step was taken. No less than a record of these consolidated rent payments was carried out. Printed forms of pottahs or leases were supplied in thousands and each man's quota was entered in this by an arrangement between himself and the Talookdar, and this paper was filed by himself, as his touch stone in future questions of rent, in the record department of the District Officers. The case with which this apparently intricate operation was performed was wonderful. In a few months nearly every village in Oudh had filed the attested document which was to regulate its future payments to the Talookdar. These leases will be reviewed and determined on fresh data at the ensuing regular settlement; in the meanshile a fertile source of ill-feeling and contention has been removed.

But at this stage of the proceeding a new difficulty was brought to light.

With characteristic speciousncess of submission, the landholders had apprently met our views in this matter with the greatest readiness; but time developed in them the true state of their feelings. A word dropped

here and there, an expression in a petition, an unwillingness to invest money in land showed that the general feeling of the Talookdars was that the whole of our policy with regard to them was a temporary make-shift, a fair veil to cover far other purposes. "Only," said they" "let our forts be well levelled and our guns all given up, and our jungles cleared, and we shall see a different order of things. Our present lot is too good to last. Can a Government which ejected us in 1856 from our rights, in definance of lawful claims and long possession, now have gone so completely on the other tack, and intend to hold us in possession against the clamorous sub-proprietor?" "Our rebellion is not so easily forgiven, and our present exaltation is only to blind us to a coming downfall."—

It was absolutely necessary to dispel this self-imposed illusion. A mistrust between us and our subjects was the worst of terms on which we could stand—it made everything a hollow pretence—no confidence necessitated no progress, and no progress at such a time would at once turn into a relapse. Nor was it advisable that the village occupant, who still hoped against hope that all he saw was an unsûbstantial fabric to be dissolved as soon as opportunity offered, when he was again to be taken by the hand and set up as lord in his own right of *his* fraction of the common holding, should encourage any longer these illusory dreams. Better that he should know that his position was a final one, and learn to acquiesce in it as he had done before, than that he should nurse his discontent and his expectations in the idea of a god time coming of humiliation for his landlord and triumph for himself.

Impressed with the importance of counteracting these ideas, the Chief Commissioner addressed the Government of India urging it to give the stamp of finality to the settlement which had been made in Oudh. Some act of the Supreme Government, he saw, was wanted to give to the assurance the requisite weight, and make it doubly sure to the mistrusting minds of the native population. It was pointed out that the unsettled state of meenminds was a more instant and crueller injury than the sudden annihilation of hopes founded on claims which we had been recognised no doubt, but which never could be realized unless the principle of the Talookdaree settlement were to be abandoned.

The expected fruits of the new policy were being retarded by the intervention of the cloud of doubts which hung between the state and the people. The sympathies of the aristocracy, to enlist which on our side the Government of India had ostensibly abandoned its policy of 1836, were being chilled and weakened. To decide the point once and for ever was to teach all parties what they had to look to for the future, what permanency of their lot they might reckon on, and to enable them with minds freed on the one side from idle fears and on the other from groundless hopes to appreciate the reality which surrounded them.

The 20th October will be long a memorable day in the annals of Oudh.

The entourage of a Viceroy is always imposing ; and the Governor General of Hindustan needs not to stint a magnificence which his swarthy subjects took on not as the body but the very soul of power. An escort as

large as many of the Brigades which recently traversed Oudh in less peacefull style, an imposing array of tents in which the internal laxury is only adequately vouched for by the external display, a long line of march, in which Cavalry, Artillery and Infantry stretch far as the eye can see and mark their advance by clouds of dust which magnify their masses, a ceaseless locomotion of elephants, cammels, carts, led horses and carriages, form an amount of disturbance and spectacle that gradually impresses the beholder with the magnitude of the event and the importance of the personage who is the centre and moving spirit of the pageantry.

Our Indian readers will have seen or read of these things till use has dalled the powers of admiration, but among the many tableaux of triumphal entries and state processions which thickly strewed the path of Lord Canning in his late progress through upper India, we will undertake to say, that on the occasion was there a feeling of deeper interest awakened in the minds of all concerned than when the Governor General made his entry into the lately conquered city of Lucknow. Space does not permit us to enlarge on the spectacle which will long live in the recollections of those who, with ourselves, saw the glories of that day. We must omit the stately march from the entrance of the city up—up by slow steps, to the bristling rampa ts of the Muchee Bawun Fort. We must not linger to paint the scene as the line rolled on its interminable length in the ruddy gleam of the new risen sun which well set off the moving figures between the crowds of still statue-like natives lining the way, and which lit up with a painter's tint the buildings which lay on the route of march Past the key of Lucknow, past the old Bailline Guard which, grim and threatening with a new enceinte of massive earthwork, thundered out of a Royal salute as the cortege rode on, on through the Civil Lines to the wooded grounds of the Martiniere where the viceregal tents were pitched we must conduct the reader hurriedly, and close the scene by a brief picture of the event which, more than any other in that brilliant week, gave a deep meaning and a sound practical result of the glitter and grandeur of the show.

There are in Oudh about 300 Talookdars or landholders, whose possessions may be denoted bu the more dignified term of Talooks Estates. To these men a reception by their own king had been an unknown honor, or would have involved a risk of personal peril which the honour could have barely compensated some 177, of those were desired to attend at the Durbar to be held at Lucknow by the Governor General of India. Painted as the Oudh Talookdar has been by British colours he has in him more of common humanity than he is often given credit for. He is somewhat simple in his ideas, he is countrified in his appearance, he may be boorish in his manners and altra-provencial in his dialect. His measurements of things English are not easily taken. He was sorely puzzled at the invitation to the Durbar. What could be the object of his going to Court ? He nor his father had ever been there since their grandfather, under a promise of safe conduct, had ventured into the capital and been shot (by dacoits of course) on his way home. He was no

courtier and had nothing to say to the Governor General, and the less that august personage could say to him the more happy and easy would he feel. Some sinister plot must be afoot ; the Durbar tent would be pitched over a charged mine, and the assembled nobility of Oudh would only be united to be infinitesimally divided limb from limb by an explosion which should blow them into fragments—or the Dragoons, who fromed the guard of honour, or the dreaded "Gora Log" (British soldiers) who kept the ground, would be let in the avenge with the bayonet the many bloody scenes which had attended the first steps of mutiny in Oudh. Either idea was unpleasant—yet go they must—yes, the 'hookum' was given in a way which left no option; no deputations of sons or brothers were commutable for the chief of the house, who never before felt so uneasy in the personal enjoyment of his hereditary honour. Absolute in capacity for travelling from illness was his only hope. Well then he must go, and take his chance with the rest of them—he would only go where the others went. So rummaging out his finest clothes and mounting as many spare and useless servants as he had horses to carry, he set out with some uneasiness to the capital of his country.

Now the above picture, though perhaps more the exception than the rule, is no over-statement of the feelings which many of the landholders entertained towards us and our (to them) utterly unintelligible policy. It was a powerful corroboration of the existence of the sentiments which we have noticed above as held by these chiefs in regard to our settlement arrangements. Nothing less than ocular demonstration of the sincerity and guilelessness of Government would convince these rustic Barons of little faith.

The day, the 26th of October, came. The hour of noon appointed for the Durbar saw the park of the Martiniere thronged with the crowd of English Civil and Military Officers, and a mass of Talookdars, who were to be admitted to the presence of the 'Lord Sahib'. The lofty and spacious tents, which form the most striking part of the viceregal encampment, were thrown open to the expectant crowd of courtiers. Tickets of admission had been previously distributed to all whose presence was desired at the ceremony, and a finer sight than met the eye, on entry into the reception tent, could not have been presented. On the left of the throne of the Governor General were seated in rows the full length of the position the British Officers, the uniform of the military contrasting gaily with the sombre black of their Civil comrades. On the opposite side were ranged the Oudh proprietors, a motley group of every age and casts. There was the young lad whom his mother had parted from in terror and distress lest mischief should be fall her first born—there was the aged chief who had seen change after change is Oudh, but none so wondrous as the scene his eyes now looked on, there were the fighting chiefs of Baiswarra, who had lived in chronic rebellion with the former sovereigns of Oudh, men who had been bred up to hold their own with matchlock and sword, and oftener seen at the head of their clan in the field than making salaams on the carpet of one to whom they owed obeisance as their lord. All at once a gun from the Artillery park close by, thunders

forth the first note of a Royal salute, and ere the assembled natives have recovered the shock which all their oriental storcism could not save them from manifesting, another and another discharge usher in the Governor General—and his brilliant staff.

All rise and stand, while acknowledging the obeisances which greet him Lord Canning followed by the Commander-in-Chief slowly passes up to the head of the tent and takes his seat on the throne.

Then follows the business of the day. We will not fatigue our reader with the oft told tale of these impressive ceremonies. They must imagine the Talookdars passing one by one before the presence, and on bended knees presenting his Nuzzur or present of gold coins, the usual tribute which Asiatic custom demands from all who come before a superior. The customary dress of honor is given to each, and those whose loyalty had been manifested in the hour of need, were rewarded with more coslty gifts, a few words of approbation, and more than all with the firman which made him master of a grant of lands than which no gift is dearer to a native of Hindostan. The usual courtesies are exchangd, the perfumes and sweetmeats are handed round and expectation waits for the final scene.

Lord Canning rises, and as all rise too, he in an impressive manner and peculiarly earnest tone, which was not lost on those of his audience who could not understand his words, delivered a speech to the Talookdars of Oudh which by its force, clearness and fitness to the occasion, was hailed by all as the exposition of a statesmanlike and eminently wise policy.

We have dwelt at length on this scene not merely to enliven our otherwise dull pages, but to represent vividly to our readers the position of the Chiefs of Oudh before and after the event of the Durbar. The speech of the Governor General, translated and circulated among those who had so much interest in the import of it, was read far and wide in Oudh, and the effect of it was at once traceable in the altered expression of the chiefs to whom it had been addressed. A confident and happy air succeeded the gloomy looks, which, in spite of all their efforts, had betrayed the sad doubts which, hung about the corners of their minds.

Many a happy individual had received with complimentary expressions from the hand of the Governor General himself the firman which assured him of the permanency of his tenure, all were to receive similar deeds, and all looked on this as the earnest of a security which they had hitherto failed to apprehend. And here, while we leave our landholders in happiness and peace, to enjoy the prospect which had at last opened on their mental vision, we may properly advert to the impression which for sometime pervaded a portion of the Anglo-Indian press as to the real extent of the measure thus happily consummated by Lord Canning. It has been stated that the land revenue in Oudh has been fixed by a perpetual settlement like that of Bengal, the idea of permanence at one carried with it the notion that Government interest had ceased in the future development of the resources of the land. Some said

too, that Government had sacrificed large and valuable crown lands to please and set off lately rebellions proprietors,—that the gain was entirely on one side, and the good will of the Talookdar had been purchased by precious if not unworthy concessions. A third mis-statement we have seen is that the change of policy had also involved a change of revenue demand, that the proportion taken by Government is now so small, that the landholder has no reason to refuse an arrangement which makes his liabilities to Government so much lighter than before. In short the idea prevailed that no new principle had been started, but the the same results might be expected whenever Government was willing to make the same sacrifices to secure them. The facts however will not support any one of the three complexions which have been given to them. The grant principle in the perpetual settlement of Bengal is that the amount of the demand is fixed for ever. In Oudh the assessment of the land revenue, or the amount payable to Government is the one point left open. True the proportion is fixed, but till the whole term is known, the half of it remains also an unknown quantity. It will be the work of future years to discover and assess the value of the land produce in Oudh, and the measures for carrying on the regular survey are already begun.

The second error may be at once corrected by a statement of the fact that in Oudh there were no crown lands i.e. no lands held in proprietorship by the state and tilled by it. The proprietary right to such land as escheated to the sovereign—a rare occurrence—was always vested in some person, usually a courtier, whose influence with the revenue minister enables him to secure the much desired prize. Much land indeed became the property of our Government owing to the confiscation under the proclamation of March 1858, but no acre of that land was ever looked on as more than a source whence the fidelity of our allies could be best rewarded. The whole fell into the hands of Government, to pass away again at once under grant and sunnud of the Governor General to some deserving loyalist. It never had been the policy , nor could it serve the interests of Government, to become landholder in India—and it has only lasted on long established and invariable principles. in the disposition which it has made of the forfeitures which the chance of war has lately thrown into its hands in Oudh.

Neither has the contentment of the native population been purchased by sacrifice of revenue, as the mis-statement which we have placed third in order would imply. The assessment which was made at annexation has been adopted now. The Talookdars in so far as they have superseded the village proprietary then dealt with, pay the same revenue to Government as that demanded in 1856—and the present measure can only claim the advantages of a permanent settlement, in so far as it has removed all doubts as to the parties who are to be admitted to engage for the payment of the Government demand.

Where a Talookdar has been thus admitted the decision in his favour has been declared irrevocable. His superior right is recognized and the inferior proprietors; while secured in their just rights, have been permanently subordinated to him. The natural order of Indian society has

thus been preserved. Not so with the claims of rival proprietors, these, as being the rights of equal parties, are reserved as open questions; and any injustice which is brought to the notice of the authorities, is capable of present enquiry and redress. Such cases however have been comparatively rare. and the tranquillity of the present arrangement has been still further promoted, by reserving all such questions, to which present attention does not seem necessary, to the next or regular period of the settlement, when the information acquired by the professional survey and the other data amassed in the progress of the measure, will enable the Civil Officers to deal with these questions with greater ease and more intimate knowledge of the facts.

But the social position of the Talookdar, as ameliorated by the wise policy of those statesmen to whom have been entrusted the interests of Oudh, has not yet been fully described. At the risk of wearying our readers, we would beg of them to follow us we detail, step by step, the measures which were from time to time enjoined to promote this object.

To give the greatest freedom of action to the well directed influence of these native gentlemen, it was desirable that, while taught that their responsibilities were enhanced they should at the same time feel that no petty feelings of suspicion or jealousy interfered with the liberty of their actions. It is well known that one great gulf which separates the English Officer from his native subjects, is the Native Executive Office through whom the two parties usually correspond. Those gentlemen who from birth, from position and from rank are less patient of the annoyances to which native officials in power are never slow in subjecting them, are estranged from us by the influences at work poisoning the ordinary channels of official communication. No native of rank would willingly bring himself into contact, as an inferior and as a suitor, with those whom he felt were beneath him in social status and importance.

Unhappily too the behaviour of the official was not calculated to reconcile him to his interference. The Tuhseeldar, or native officer of revenue, delighted to show his own consequence by making himself officially disagreeable to one whose word was law in his own ancestral domain, but who, once in Court, was the equal of his lowest peasant, and a defenceless object for all the petty impertinences of authority. To liberate him from this galling yoke and assure him, in all circumstances, of that consideration which his position fairly claimed, was a necessary and welcome measure. It was a measure which would go far to complete the work in hand, and one which, in the creation of cordial relations between us and our most powerful subjects might, it was confidently hoped, have the most important and happiest results.

Those who have studied the character of natives of birth and influence and independent position. will understand us when we say that so long as the Talookdar labored under the annoyances which he might daily meet with, while subjected to the discoureteous official who, by encouraging his peasants to prefer appeals againt his decisions which they heretofore had never dared to question, could at any moment place him in the

undignified position of a litigant cast in a paltry suit for rent; his honours, his estates, his rank were not worth having. A splendid rent roll was dearly purchased by loss of independence, and to become a pensioner on his own estate liable to be defied by the meanest cooly on it, was a position which turned all our gifts into ashes, our grants into gall and our rule into everlasting bitterness.

The loss of arms, the demolition of his fort, the surrender of his cannon were flea-bites in comparison to the sharp thorn of personal degradation which rankled perpetually in his side. He could understand that a strong civilized Government would not tolerate a fort which defied it, and armed men whose only object could be to thwart its authority or commit a breach of its peace, but he would always think with regret of the good old times when, though plundered by a rival, or driven from his fired home by a Chukladar, he was still a chief among his own people, and brooked no divided authority in his clan.

The District Officers were accordingly desired to correspond directly with the Talookdar in the form of khuts or letters. This prevented all chance of applications on one side and orders on the other being misrepresented or tampered with by intermediate influence. A proper style of address, suitable to the position of the party, was enjoined, and these letters were to supersede all the curt and summary formulas in which the usual processes, summonses and notices of the Courts are couched. But further, in some instances District Officers were encouraged, whenever a complaint was preferred against the Agents of a man of property, to send the petition of plaint to the Talookdar himself with a letter expressing a hope that he would take the trouble to repair any injustice which had been committed, but that if he was not able to do this, the case would be tried in the Courts in the ordinary way. This had the effect of putting the Talookdar on his mettle. It was seldom in his interest that the influence of his Agent had been exerted, but more often in a dispute between two sub-tenants in which the interest of the landlord was not at stake, and his interference would probably be that of an impartial arbitrator.

But whether the proceeding resulted in an amicable compromise effected out of Court, or was ultimately decided in Court, the practice involved an interchange of ideas and actions between the Talookdar and the Deputy Commissioner which was at least desirable, To get these men to undertake their responsibilities in a straightforward and manly way, to get them to feel that their own interest and dignity might be consulted at the price of a little trouble in investigating alleged wrongs and reconciling conflicting interests, was a great step, and payed the way for the final experiment of entrusting the most fit of these hereditary chiefs with magisterial and revenue powers. This measure was in fact but the corollary of the preceding measures. To associate the leading men of the aristocracy with us in every branch of the administration, so far as their influence could be beneficially used, was the basis of the system; the

investment of the most fit and most able with judicial powers was the capital which crowned the work.

The late Chief Commissioner, Sir Robert Montgomery had recommended the bestowal of petty magisterial powers on some of the leading Talookdars. The present Chief Commissioner warmly advocated this wider scheme. Deeply impressed with the importance of the measure and anxious to devote himself to the realisation of it, Mr. Wingfield strongly urged Government realisation a small number of the most able and influential landholders in Oudh the criminal and revenue powers of an Assistant Magistrate and Collector within their several jurisdictions.

The experiment was one which required care. To trust such powers in hands of individuals whose ability and integrity did not afford a security against the abuse of them, would be to peril the whole principle involved—and this was one of no ordinary import. Gradually had the Government worked up to this point by the use of liberal and consistent measures, and now it was going to test the value of the men who had been the objects of its care, and to estimate the worth of the material in the working up of which it had taken such pains and trouble. Whether the moment for making the experiment was not somewhat premature may be doubted by some, who, though infavour of the measure, mistrusted the suitability of the men, but if they could be found fit for the exercise of the functions with which it was proposed to intrust them, there was nothing to be gained by delay. Nay the present temper of the Talookdar afforded a seasonable time for the trial—and now it was that he was most accessible to external influences; there was also this argument, that the existing Chief Commissioner was ardently devoted to the project, and in the deep interest he would take in its working and in his selection of the fittest men for the office lay the greater guarantee of success.

Six men were chosen in whose ability trust could be placed, and these men were inducted into the Magisterial Office by Mr Wingfield in person before a large gathering of their clansmen and dependants. These were told what was the nature of the powers with which their chief was now invested, and enjoined to pay him that respect and obedience as their local 'Hakim' which they had hither to paid as to their natural head.

We believe that up to the present time Government has had no reason to repent of the confidence which it has entrusted to these Native Magistrates, but on the contrary that the experiment has succeeded beyond expectation. The facilities which their position gave them for the administration of the law in those petty criminal cases which so vex our Magistrates, and often entail such delay or annoyance on the seekers for justice render their tasks comparatively easy. Their subordinates will serve them far more faithfull than they will us, their foreign masters, and their own notions of justice naturally coincide more with those of the parties between whom they are acting as Judges. It has not been thought proper to entrust them with power to flog, and this reservation, in Oudh, where the lash is freely prescribed, brings their proceedings so constantly before the Deputy Commissioner of the District, who must sanctions their

sentence of stripes before it can be carried out, that these can be but little fear of any abuse of power by the Talookdar not being at once exposed. Moreover the decisions in criminal cases are reviewed every month by the Chief Commissioner. Our readers will have seen that the Supreme Government has lately extended the principle to the Punjaub, and has also largely increased the number of Oudh Talookdars vested with these powers. We augur the best results for this policy if it is cautiously watched and promoted by the influence of the District Officers; but whatever limitation of the principle Government may see fit to lay down after sufficient trial, there can be no doubt that the introduction into the Talookdaree tenures of Oudh. of Revenue adminstration devised for the village communities of the North Western Provinces, could not have resulted in anything but dissatisfaction and failure.

The internal reforms and improvements which have kept pace with the more important measures above detailed, now demand from us such notice as our limits can afford.

Perhaps the most important of these is the abolition of vernacular deposition writing in our Courts. In all cases the Judge who tries the case makes his own record in his own hand. In the pettiest cases a mere note of the purport of the depositions of the witnesses is made, and this is all that appears to record the trial; but in more serious charges an abstract of the current of evidence as it flows from the witness is given, while in the most important or intricate cases, and in these alone, are the replies of the witness to the Magistrate recorded in extenso. All questions are put by the Judge; and this system, by checking the interference of the subordinate Court officials, has raised the administration of justice immensely in the estimation of the people, and has had the happiest effects in simplifying the course of the trial and abbreviating the duration of the proceedings. Formerly it was the reproach of our Courts that the Judge did not confront the parties before himself and hear the charge, evidence, and reply from the parties themselves, but that often the whole was committed to writing by a clerk in technical terms quite unintelligible to the poorer classes, and subsequently recited before the Hakim in a voice and tone defying the comprehension of the deponents, who stood in amazement till the practical enforcement of the final order of punishment or release gave them to understand that their case was disposed of.

This union of the duties of recorder, Judge, prosecutor and Counsel for both parties in the English Officer, naturally increases the labor of the Magisterial Office, but this has in great measure been lightened by the introduction of a highly paid Officer, who, under the title of Clerk of the Court, relieves the presiding Judge of all routine duties which formerly so needlessly occupied a large portion of time which might have been more usefully employed in purely judicial labors.

This Clerk of the Court, or Moonsarim, in not merely a Serishtadar under another name, and irresponsible for his acts as the latter officer who is supposed to do all he does under the order of the Magistrate, but he is responsible for the separate uncontrolled discharge of all that lies in his

department. Thus he scans petitions in Civil suits, points out informalities in them, and sends those suitors who have mistaken the functions of the Civil for those of the Criminal Court (and these are not a few) to their proper quarter. He consults the cause list and if an action clearly lies, he causes the issue of summons and fixes a day for the presence of both parties for settlement of the issues. By this division of labor much relief is afforded to the Judge, and tasked as he is with the preparation of his English records he needs all the aid which his subordinates can give him.

We recollect an expression in one of Mr. Campbell's published circulars in which he alluded to the absurd amount of reliance which natives place in one another, and their unsparing distrust and bitterness when that reliance has been once betrayed The method of doing business among the lower orders of trades-people and agriculturists, is in truth one of the points which strikes an Englishman most forcibly. Verbal agreements are made daily and acted on hourly with all the confidence which in England we should limit to the security of a written deed. But when slips do occur, when accidents put it out of the power of one party to a bargain to fulfil his conditions, these under takings form but a sorry ground-work for a suit for breach of contract. This difliculty is heightened by the fact that the native who will be truthful to his comrades and his fellow dealers, will be like a school boy to his fellow dealers, will be like a school boy to his master, the moment he sets foot in our Courts.

There all acts are fair, and with no bonds to show, a good deal of hard swearing is the inevitable result, the Judge having ultimately to decide on the relative values of two diametrically contradictory assertions. Thus small loans of money—conditional sales, mortgages, contracts for supply of articles of trade and agreements as to price, are daily made with no bonds and without witnesses, and in the most favourable cases the record, if there be one, is a casual entry in the village money-lender's loose sraps of paper, which he calls his "book." The advisability of remedying this state of things needed no arguments to be clear to the understanding of any one, and the establishment of public registrar in towns and villages, who for a trifling fee are bound to register the transactions of any contracting parties who shall appear at their offices for the purpose, has done much to check indiscriminate and indefinite bargains. The attestation of this public notary or registrar, is *'prima facie'* good evidence in Court, and we have no doubt that as the people get to find the practical value of having thier liabilities and demands recorded, they will very generally resort to these bureaux for their own security and satisfaction.

The Cazees in Mahommedan towns and the Ex-Canoongoes, who, under our economical revenue system, have no employment, have been, as far as possible, made use of for this purpose; and the gains thus thrown into their hands render them more tolerant of the loss of their professional posts. These Ex-Canoongoes have been most liberally maintained in the possession of their rent-free tenures for life, in order that they may have

ample means of subsistence until resort to registration shall mark the office of notary yield a sufficient income.

We have already alluded to the Military police of the province and shall have occasion to notice them again, but there is another branch of this subject to which we must devote a short space. This is the Native police or the Chowkeedars. The existence of self-supported local police in every town and village of India is of ancient date. It is one of the approaches which Asiatics made very early to civilization, but beyond which they probably would not have advanced for ages to come. The mixed elements of which modern Indian society is composed were at one time, we may suppose, of a far more discordant and conflicting nature than we see them now after centuries of amalgation. The poor Rural population of India may be said to live in the open air. The men, when not occupied in the fields, congregate in the open space under the shady tamarind or neem tree which usually occupies some central spot in the village; or by the well they sit grouped with that peculiar expression of solidity which must be held to denote satisfaction and enjoyment, as it is invariably worn by the Hindustani when he indulges in squatting on his heels—an occupation which as being clearly less sensual than sleeping or eating, we consider to be the highest and most intellectual relaxation which they voluntarily engage in.

The women of this class carry on their household work inside the small mud or wicker enclosure which fronts every house. The shelter of the roof is more for exceptional than usual resource, and this method of living exposes them much to the depreciations of thieves. These are one of the most ancient institutions of India, and are professional plunderers, either resident or in peripatatic gangs, ostensibly of travellers, but really of plundering vagabonds.

Protection of self, the first law of nature, induced the laboring classes in open villages to provide for the safety of themselves and their property, by appointing an individual as the public guard and watchman of the little commonwealth, and on the principle of setting a thief to catch a thief the members of this force were invariably selected from the classes which were most notorious for thievery. To the inevitable tendency which every profession in India has to become hereditary these village police formed no exception, and we find them now, not as individuals but as families, in every village in Oudh, their services not being confined to their original limits, but at the disposal of the headman as public servants, to watch crops and thrashing floon, to kill the wild pig and antelope which destroy the sugar-cane and growing wheat, to run on errands, to summon tenants on rent day, and finally to act as guides to all travellers, in which last capacity they are mostly known to our English readers. Their remuneration was derived from rent-free land, dues on harvests, marriages, &c. It was considerable for it supported an entire family, and the office was much prized. Indeed Oudh possessed a valuable indigenous system of village police.

The discovery and repression of crime had never been a lending feature in the administration of the Government of Oudh by its Native Rulers. Such duties, if performed at all, were left to the local magnates, and unless the career of an offender was marked with the commission of crimes which constituted him a public nuisance, or carried the cry for aid to the ears of the Court or Resident, the culprit, if caught, expiated his offences on the spot; being either cut down by the hand of the aggrieved party, or more formally punished by mutilation, fine or corporal inflictions at the order of the Zemindar or headman of the village. There did indeed exist a channel for the communication of all important matters to the Government in the reports of the news-writers, but these officials had degenerated into the creatures of the local executive, and gave only so much of the truth and such colouring as it suited them to give.

There was then no direct connection between the rural polices and the paid Officers of Government in Oudh when it felt under British rule, and one of the first steps of the then administration was to introduce the system which prevailed in our older provinces. This system, according to which the chowkeedar is paid a money salary from a cess imposed on the Zemindars, make the chowkeedar, from being the servant of the Zemindar, the servant of Government, and as the late Lieutenant Governor N. W. P., Mr. Thomason, has described him, a disreputable ill-paid burkundaz. It is unpopular with all classes; with the village population because several villages are combined to make a single charge with a good salary and thus each village to longer possesses its own chowkeedars; with the Landholders those authority is weakened, and with the chowkeedars many of whom lose their employments and who found their old perquisites go further than a salary in money.

But with the disposition which our Government has shewn in Oudh to ally itself in the most complete manner with the influential men of the country, and to press their influence into the aid of its own officers, there have been found some difficulties in adhering to the above detailed system, and the Chief Commissioner has considered it advisable to try the experiment of a return to the old method. The result has been to replace the native chowkeedar in his natural position of servant to the landed proprietor, and to leave to the latter the responsibility of reporting crime. Such a course was inevitable in those estates where the proprietor was not only to discover but magisterially to punish offenders. In these cases the responsibility is throughout his and his alone, and he has to answer for the peace and security of the population on his land just as the Magistrate in his more extended jurisdiction over a district. Nor do we see, for our part, that it is any other but a fair extension of the one great principle of the Oudh Government, to throw this same responsibility on every landholder as far as possible. He never was, in the older provinces, exonerated from the duties which his position entailed on him. He could always be taken to task for failure in co-operating with the executive in the repression and discovery of offences—and when the, Oudh

Government had determined that this responsibility should not only be enforced in exceptional cases but as a general rule, it is we repeat but fair to leave the landholder perfectly free to discharge his duty in the manner he found most easy. To deprive him of the control of the machinery and to exact work, was truly to ask for bricks and not to give the straw, and this was often and forcibly represented by themselves as a novel and unfair position from which they appealed to the sense of the executive to relieve them. This has been done, and the few months which have elapsed since the restoration of the village watchman to his original sphere have not given any reasons to regret the change.

The financial embarrassment in which the Government of India found itself on the close of the mutiny had the natural effect of turning attention to all the chief sources of revenue with the purpose of seeing whether any improvements in management or decrease in the expense of collection, might present themselves as means to fill our impoverished treasuries.

The Government of Bengal early turned its attention to the system of Abkaree management. For the sake of our non-Indian readers we may premise that Abkaree is the duty which is paid to Government on the retail of spirits and drugs. The usual and most inexpensive plan pursued by native Government and followed by us is to farm this duty. Taking a district or sub-division of a district as an area, the monopoly of spirits and drugs is let out to the highest bidder, who repays himself by the retail of the articles and is protected by the excise laws from contraband dealers. This method has many circumstances to recommend it, but, it had many grave drawbacks, and it was desirable to know whether any other system would be free from the same evils and yet prove more productive. The Government of India therefore directed that the system of the *direct* management or of Sudder distilleries should be given a trial. The general result of enquiries among the Collectors of Bengal as to the possibility of increasing the revenue by a higher duty than eight annas (equal one shilling) a gallon proved that in the opinion of those gentlemen the spirit was not capable of bearing a higher price than that already demanded.

Mr. Carnegy, the Deputy Commissioner of Lucknow, tried the Sudder Distilery system, and met with a decided success in the attempt. Lucknow is a large and densely populated town of at least 400,000 inhabitants, a large proportion of whom are of a low class. and vicious and profligate. In such a town the consumers of spirits form naturally a large proportion of the population, and thus the extent of the operations gave a favourable avenue for a speedy trial of the point at issue. One Sudder Distillery was established in the city itselt—all others situated in the arrondissement were suppressed, and all retail venders of the article were supplied from the head quarters of manufacture. This was carried on under the superintendence of a native contractor, who manufactured the liquor at $1\frac{1}{2}$ anna a wine quart bottle. It is hardly fair to compare the revenue under this system with the year 1856 which is the only year in which the contract system has been adopted in the city of Lucknow since the

annexation. That was an exceptions year, but the rise of the revenue from Rs. 58,000 in that year to Rs. 80,961 in 1859-60, is not only to be attributed to this cause, but to the superior method of direct management. After a few months, during which the experiment was restricted to the city and suburbs, Mr. Carnegy extended it to the whole district, at first establishing a Distillery at each Tehseel, but ultimately the manufacture was confined to the Central still at Lucknow. The first three months after the adoption of the new system of management, showed a loss in the receipts as against the contract system, but experience in the management having been acquired the succeeding months shewed an increase on the former plan of Rs. 1793 while consumption and consequently intoxication were greatly diminished. In round numbers it is calculated that while the returns under the old contract system may be put at Rs. 75,000 the direct management will return Rs. 1.25,000.

Two qualities of spirit were distilled; one about 30 degrees below London proof. was sold at a price which gave an excise duty to Government of 1-0-6 per gallon. The other, about 25 per cent. above London proof. realized a profit on excise duty to Government of 1-11-6. Thus the feasibility of the spirit duties being raised above the 8 annas a gallon, which was considered in Bengal the maximum that under general circumstances would be obtained, has been clearly shown.

But it would not be fair to generalise from the particular instance of Lucknow under the able superintendence of Mr. Carnegy to the several districts of the province. So much depends on the interest which the individual district officer may take in the operations and the careful selection of the agency, that the Chief Commissioner has not insisted on the introduction of the system into all the districts to the same extent. One Distillery on this principle, however, is to be established at each Sudder Station, where it can be more immediately under the supervision of the Deputy Commissioner, and the method of dealing with the other sub-divisions in his jurisdiction is left to the option of the officer himself. The high prices, however, realized at Lucknow cannot be expected among the poorer agricultural classes, who are naturally more temperate and also under less temptation to spend their money in drink. It may however be mentioned that at the Sudder Stations of the poorest districts of the province the Sudder distillery system has proved highly remunerative and at the same time conductive to morality.

The figures are

Six months under direct management,	... ...	Rs. 18,847
Do. Contract,	... ...	17,054
Increase,	... ...	1,793

It must be remembered that the first three months of the six shewed a decided loss so that the profits of the three last. made when the new system had got into work, have to be set against a large former deficit.

Objections have been made on the score of it being undignified for

Government to engage directly in the traffic of liquor, but so far as enquiry has elicited the feeling of the natives on this point it does not appear that this objection has represented itself to their minds, and that the expression of the feeling where it has occurred may be ascribed to the unpopularity with which the spirit dealers now thrown out of employ naturally regard an invasion of their trade. The better classes do not sympathise with them, there is no tax which is to the native mind so legitimate as the excise on spirits, and the method which brings consumption to a minimum, and revenue to a maximum is in the view of the majority, the best. Nobody sympathise with the would-be sot in India; any difficulty he may meet in the attempt to indulge his vicious propensity is considered as voluntarily incurred and to be a laudable discouragement of intemperance. Now it appears that the Sudder Distillery system, if it be fully carried out and no half measures permitted, must be the best for lowering the consumption and raising the receipts. The Government has the monopoly of the trade and is only prevented from charging too high a price by the certainty that as men will drink spirits they will be driven to contraband stills and smuggling if the legitimate method of supply is beyond their means.

The whole question however is now confessedly on its trial and it would be premature to infer much from our present experience, we will therefore dismiss the subject with the concluding remark that the increased revenue from this source in the Lucknow district has been accompanied with decreased consumption of spirits. A fact from which those who look at the matter from a moral point of veiw may draw their own conclusions.

The constitution of the Military Police has been sketched above. This body has been much reduced in number and comprises now 1,554 cavalry and 7,996 infantry—or 9,550 men, and the cost of it now is barely the half of the sum which at first was appropriated to this head of expenditure. The organization and discipline remain unaltered from those first adopted, but the position of the force in reference to the place which it occupies in the executive machine has been materially modified. The Office of Commandant of Division has been abolished and the District Superintendent of Police has less independence of action than formerly, having been subordinated to the Deputy Commissioner, who cannot in fact be responsible for the state of his district unless he has the undivided control of all matters in it.

The inexperience of the Officers of the police, who were all men who had to learn their new duties, made it imperative that they should receive as far as possible the guidance and advice which the Magisterial authorities could so well have given. But it has been found that the divided systems interposed impassable barriers to this being done, and he only means of rendering the police effective as a detective forced has been to place the Officers completely under the control of the District authority. It is to be regretted perhaps that the previous independence

which was accorded to the Police Officers has been found in some instances to have unfitted them for co-operation in a subordinate position, but the superior experience of the Magistrate ought in fairness in all instances to be acknowledged by the other party, and time alone is wanted to bring both into harmonious working; means have also been devised for giving police officers a knowledge of criminal business, for it has been found almost impossible for an officer who has not served in a Magistrate's court to appreciate the true value of evidence and successfully to conduct a prosecution.

But the praise which is justly due to the Oudh Police as a protective body needs acknowledgment. Their discipline has well fitted them for the work of overawing the discontented remanants of the rebels who would assuredly have taken advantage of a weak police, to form gangs of armed robbers, and, under the form of dacoits, to keep alive a reign of terror and disturbance. No one acquainted with the Police of the old regims would suppose that the security to property and life which has lately reigned undisturbed in the cities and villages of Oudh would have been attained by anything like the force formerly at the disposal of the old Thannhdars. They were indeed blots in our Executive which rather invited result, than repressed violence. With means of resistance only equal to those possessed by the villagers themselves, they could at any moment be outnumbered by the coalition of two or more robber gangs, and the shelter of their semi-fortified post seldom gave them courage to hold out beyond the first opportunity of flight which offered itself. A stealthy evacuation of his post on the night succeeding the threat of an assault, and a devious flight in disguise to the head quarters of the district there to relate, with no smalldisregard to facts, the prodigies of his own valour and the overpowering forces of the enemy, were ordinarily the limits of devotion in the cause of Government, which a good native policeman allowed himself.

But the native of Hindoostan, bold enough to venture when the odds in his own reckoning are sufficiently overpowering to present no chance of failure, is not an enterprising creature. A considerable inducement in the way of certainty of success is required to move him to action, and his superabundant caution is ever on the alert to any symptom which forebotles the possibility of a favourable result to his foe. The mere establishment therefore of the Military Police has been sufficient to quell the martial ardour of the 'mauvais sujet' in Oudh. He sees a force which he supposes invincible, and he at once resigns the idea of entering into anything of which he has such a rooted horror as an encounter on fair terms and of doubtful issue. It must have struck many of our readers how few of our opponents during the late Mutiny have died *fighting*. The Hindoostani is beaten morally. Once let the moral certainty of your superiority possess him, and he ceases to struggle. There is in him none of the animal vivacity which dictates resistance to the last, and only is extinguished by the blow which deprives him of life.

The question of taxation is one of such vast dimensions. and in its nature and scope of so universal Indian interest, that it will not become us here to do more than allude briefly to the experiment in direct taxation which has lately been made in Oudh under the orders of the Governor General.

The general object of increased revenue, to restore the finance of the empire to the equilibrium of income and expenditure which had been so nearly attained before the Mutiny and which that commotion so seriously deranged, was the object of the movement. The principle and detail of the tax were left by the Governor General to the local Government, the only restriction being that the holders of land were not to be subject to the imposts.

A move in the direction indicated, had already been made in the Punjaub, when the authority for the execution of the project was given to Oudh, and the form there assumed by the demand for revenue was the imposition of octroi rates at a higher percentage than formerly. In this there is obviously no new principle; and the arrangement was well calculated to secure its object in so far as it stirred no prejudices and introduced no novelties to alarm the native mind. But the incidence of this tax is general, and can only be heightened in its pressure within very moderate limits. An import duty on articles of food or clothing can only be raised to that point which places no bar to the enjoyment of them by the poorest of the mass of society. Necessary articles cannot be taxed beyond the minimum incomes, and those are soon reached. The moment that point is passed, distress is felt by the lowest grades, and the tax is an oppression. Nor indeed is an octroi tax in any way graduated to the abilities of rich and poor. Each wants food and clothing; and the small reduction which the rich man might make to economise under the pressure of increased rates on these articles, might represent the half of the poor man's food and the whole of his scanly wardrobe; moreover when widely introduced it has a tendency to degenerate into a transit duty.

It is thus clear that, on the whole, the object of making the wealthier classes, the well to do shopkeepers and private gentlemen, contribute a sum proportionate to their means, is wholly unattainable by a system of octroi imposts.

The Chief Commissioner of Oudh saw the position (octroi duties were little known in Oudh) and wisely preferred to attempt the hitherto untried experiment of a direct tax on the profits of all classes, those profits derived from land being, of course, excepted. The obvious difficulty in such a tax is the inaccurate knowledge of the real profits of any individual trader, &c. The first step taken was to get as accurate a return as possible of the population subject to the tax without making the enquiry into men's gains vexatious. But the assessment was not the result of a guess by the district officer. A sound method pervaded the proceedings. Lists were first prepared in which the names of all traders and men of business, other than agriculture, were entered, and in the same lists appeared the estimated amount of profits of such persons. The Tehseeldars and other sub-

ordinate officers entrusted with the preparation of these lists were enjoined to abstain from personal enquiries, and to be guided chiefly by current rumour and presumption. The assistance of all men of experience and influence was largely used in this process and thus, often indeed without any recourse to the individual himself, a fair general estimate of the amount of his returns during the year was made. Headmen of villages, Putwaries, or village accountants, Zemindars who were themselves exempted from the impost, gave the fullest information on these points and with great fairness and judgement. In large estates, the whole process was almost wholly undertaken and carried out by the Talookdar and his agents. But no tax-payer was thus even ultimately rated as a matter of course. The district officers were told not to look on these returns as the basis of their calculations when from their own knowledge or the representations of any individual tax-payer they had reason to distrust their accuracy. In every case they have full discretion to raise or lower the assessment. Having then thus got a clue to the amount of profits a calculation of 3 per cent on them gave a lump sum which was to be raised on the district. The quota of each payer were to be arranged among themselves. In towns a jury of the traders and in rural districts the Zemindars and Talookdars generally undertook this part of the work. and in very rare instances did they find their task hard. The Collectors of the money were remunerated by being allowed to collect two pice over and above every rupee of the tax. The success which has attended the experiment, in all the agricultural districts especially, can only be ascribed to this plan of availing ourselves of the aid of the landlords—by whose influence, if in antagonism. we should have had many difficulties created and a strong feeling of discontent originate and fomented.

The wisdom of the policy of enlisting the influential grades of the population on our side never received a more striking illustration than in this tax. The only places where any difficulties have occurred in assessment and reclamations against the awards of the native juries have been frequent. have been towns where there is no supreme influence to act on the mass of traders. No doubt too, the ordinary difficulties incident to the work of taxation were increased in the large towns, but in no place has there been a single sign of any combination against the payment of the demand. The principle of self-distribution was admirably successful in the rural districts, and if not so satisfactory in the towns it is impossible to say whether any other plan could have been adopted which would certainly have been satisfactory, if indeed any other had been even practicable.

As a consequence of the imposition of this tax, the choongee or octroi duties which had been begun to be levied generally in all marts and important centres of trade, were at once abolished, wherever there did not exist a need for a special establishment of police for purely local purposes. This need exists in very few of the towns in Oudh, so that the octroi impost may be said to have been abolished in Oudh with the exception of Lucknow where it is enforced for the purpose of defraying

the various expenses incident to a large and populous town, in which all the usual necessities of roads public buildings and conservancy have been aggravated by the late destructive operations of war.

Before we quit the subject of taxation we feel bound to allude to the recent Libel case tried at Lucknow which in the eye of the public, before which the case was somewhat tediously paraded, became indentified with the proceedings under which the Trade tax was collected in Oudh. The notoriety with which the Indian Press readily stamped a suit in which one of their confreres played its unprofitable part, relieves us from the necessity of giving our readers any detailed information on the case of *Ramdial versus the Oudh Gazette.*

Holding as we do individually the opinion that an officer of Government is solely responsible primarily to his immediate superior and, ultimately, to the Supreme Government of India for all his official acts, we consider the conduct of the Plaintiff in this case in indicting for Libel a newspaper which maliciously misrepresented his official acts, as a breach of discipline; and a precedent which, if extensively followed, would lower the position which Government must assume in India if it is to command respect, a legal despotism *in esse,* but an autoeracy in *paise* unquestioned in its acts and admitting of no law but the *salus reipablica.*

But a native officer may be excused if he does not appreciate the feeling which would, we believe have deterred any English Officer from noticing false aspersions on his character without distinct permission of his superiors to reply to them by legal or any other proceedings.

It is the destiny of the press in India to be in permanent opposition — it would die of inanition if it could not carp plausibly at every measure by exposing with vigilant acerbity the worse of the two sides which every human question must infallibly were—it would want a credit sufficient to command a circulation if it lacked the ability to represent all rumoured accidents mishaps and shortcomings as the long foreseen consequences of a perverse defuess to their own patriotic yet disinterested instructions. The propensity of human nature to be amused with virulence, the strong propensity of Anglo-Indian nature to subscribe to periodicals of all kinds, make the press in India, if conducted with a due reference to these its grand principles, and no deficiency in audacity, a self-supporting and in some instances a very profitable speculation.

We recollect hearing a story of an Indian Editor whose chequered personal adventures must have given him at least an intimate acquaintance with the criminal administration of India, who in answer to some remonstrances inculcating the theory that *some* regard to truth, impartiality, temperateness and sobriety would prove useful in the conduct of a journal, declined to discuss the point, as it was evident that his friend's estimate of qualifications for the Editorial chair differred in toto from his own humble opinion by which he would be tempted to rank the absence of any such weaknesses as those hinted at by his friend as

more valuable than the most precious literary attainments for the due discharge of his peculiar office.*

The more masculine disposition of the English officer is inclined to look on the attacks of the press as the somewhat cowardly assaults which women at times will make on men, taking advantage of the certainty that if their object of attack has only sufficient self-respect to restrain him from retort they will escape suffering for their violence. But they sometimes err in judgment. The more feminine-minded native has less control of his feelings, he retaliates if he is strong enough to do so, and if his hands and life are clear enough to stand the lists of legal scrutiny.

Our first impression when made aware of the indictment of the *Oudh Gazette* was, that the Plaintiff had let his feelings outrun his discretion. Few men, be they black or white, will run the gauntlet of the unsparing enquiry of a law court which, if not legalized by the necessities of the case would be the most insufferable and impertinent tyranny. The popular opinion, we know, does not hold a high estimate of native official integrity, but here was a man courting enquiry on a direct charge including as he believed bribery, a charge however ultimately disclaimed and withdrawn by the defence. Surely the natural conclusion must be that the Plaintiff must be either a ͏eckless and worthless man or an honest, official, Now no man, not even his accusers, has ever represented Ramdial as a man playing a desperate game, as holding on for bare life to the last shreds of a damaged reputation, putting all his hopes in life on one cast of the die. And this he would have been doing had he come forward with a weak case.

We see therefore no prima facie conclusion that can be arrived at, but that he was an innocent and maligned man. And we take this opportunity of stating this to be our well weighed and deliberate conviction.

At first, as we have said, we thought, that though the actual charges might be false or exaggerated yet that something must have occurred to give rise to the clamour, some act of omission, if not of commission, would be proved; some carelessness, or want of watchfulness over his underlings would be brought forward, and though no positive oppression might be found yet a severity overstepping the bounds of strict legal forms would have been proved to have been exercised which would go far to justify, if not substantiate, the general accusation. But as day after day no individual was brought forward who had suffered from the oppression charged, when the witnesses for the defence boggled about the locality of the place of detention which from its foul nature was the gravamen in many of the alleged instances, and ultimately shifted the scene to a spot which was no place of detention at all or ever used as such. When only the stories and not the men who bare them were produced we felt that the defence was indeed weak, and very like the

* This story is a fact, but we only tell it as a story and not with a view of creating any impression that this worthy is to be considered a type of the class of Indian Editors.

story of Jack Cade's parentage which rested on the bricks of the chimney which his father built, being "alive to this day" to testify to the fact.

But we do not hope to convince those who, after the exposure of the perjury of the witnesses for the defence by the Judge, have made up their minds to an opposite view, and dispute the verdict either from party feeling or from an indolent adoption of the hue and cry which has been set on foot. We repeat that we regret the whole matter. The purpose has been served of getting up a clamour to discredit a measure which all who have understood its details have agreed to call a successful solution of the question of direct taxation in India. From the highest to the lowest in India we are all about to be submitted to a somewhat similar impost; necessity may make us yield tamely, but it cannot recommend taxation to our pockets. What wonder than that while there was a hope that the income tax might be avoided, no one should willingly disbelieve a story which told so palpably against the only attempt on a large scale to depart from the groove of old established precedent is finance. The principle of direct taxation, unussailable while confined to the debates of the Legislative Assembly, might be blasted by a side wind, directed against a messure generically the same at Lucknow. Other concomitant circumstances were not wanting to tempt the assailants to fight with a perseverance which partly, too, owed its existence to the patronage of an official section whose personal feelings threw them into their ranks; and to make a stir and raise a cry to have the credit of exposing errors and, if fortune demanded a victim, to make a virtue of necessity and succumb with a loud claim to the honor of martyrdom, was so precisely what was wished that, next to a victory, the best thing which they could suffer was the defeat, which ultimately befell them. It was a well chosen dilemma and they are entitle to all the credit which those who marvel at a nine days' wonders are sure to give them. But we do not wish to recal the past when we may so well occupy ourselves with our probable future. We will not draw comparisons to the disadvantage of the new scheme of taxation with the one now being quietly carried out in Oudh. We only hope it will be as easily carried out.

By the time these pages meet the reader's eye time will in great measure have justified or removed our doubts. But whatever may be the issue we do not hesitate to express our belief that no measure, so universal in its action, could avoid many difficulties and run counter to many well-founded objections, and that while the Government of India has in this crisis deliberately adopted what seemed least objectionable, it has looked to the devotion and skill of its officers to carry it through, and right certain we are that it will not look in vain.

Having now completed our rapid sketch of the most remarkable transactions which have lately taken place in Oudh, in the internal administration of the province, it remains only to advert to the incidents which attended the crushing out of the embers of rebellion which so long smoulders on the Nepal frontier. The refugees who composed the party of

Birjees Kudar and the Begum his Mother, had, it will be remembered, made an unsuccessful attempt in the months of April and May 1859 to run through the trans-Gogra Districts, cross that river, and get once more into the jungles of Southern Oudh. Had this attempt succeeded, and had any leader of local distinction presented himself to the inhabitants of the Baiswara territory, there would have been, not perhaps a general relapse into rebellion, but an excitement and spirit of resistance would have been aroused, which would only have ceased with the extermination of the foe after a harassing and desultory campaign. But fortunately the Gogra proved an insurmountable obstacle to the intended evasion. Very few of the rebels ever reached its bank and those who did so only found themselves forced to turn back again. In two instances the larger bodies of those rebels were surprised and utterly routed with considerable slaughter, while numerous petty engagements occurred in which the weary and harassed remnants were cut up by the Native Cavalry, or fled without their arms into the hills which they had left. The miserable result of an enterprise which they had fondly anticipated as possible, prostrated their surviving hopes, and it is a matter of history, with which we will not weary our readers, how they succumbed, without a blow, to the Nepaulese force sent to dislodge them from their hiding places.

The only further marks which they afford to trace their in glorious termination are found in the fate which be fell their leaders, Mummoo Khan and Khan Bahadoor Khan. The latter was hanged at Bareilly, contumacious and rebellious to the last. The former by a scrupulous consideration of a plea, to which we ourselves can attach no weight, viz. that he acted under fear and pressure from the sepoy element in Lucknow, escaped the gallows and expiates his ambition as a life convict in the Andamans. Two Oudh Chiefs, the heads of the house of Dhourera and Mittowlie, have also reaped the reward of their baseness in surrendering to certain death English fugitives at the order of the de facto rebel Government. It is somewhat curious that the same Officer who sentenced these criminals for surrendering Englishmen to death finds it impossible to convict the head of the Government who killed them, of murder.

We have now exhausted our subject and our space, and must conclude. We have endeavoured to set before our readers briefly the main principles which guide the present administration of Oudh. We do not fear that those who are best acquainted with the facts should accuse the Government of any unworthy truckling to class prejudices or a powerful aristocracy. The policy of allying the upper classes passively and actively with the executive is professedly that of an aristocratic complexion, and long may it continue so to be, if future years only shall continue to exhibit the present successful results.

The Government now possesses in a marked degree the good will of its subjects in Oudh, and this has been won by a ready acknowledgment of the station and rank of those who give the tone to the mass of the

population. No undue concessions and undiscriminate conciliations have been practised, but the condition on which our favors have been granted has been that of prior unhesitating obedience on their part, not to the orders only, but the wishes of the Government. Instances have occurred where Talookdars have not understood this, and have shewn a spirit of recusancy and fractiousness to what they deemed a mild and perhaps weak Government. But they have met with a stern justice which has effectually cured themselves and opened the eyes of their neighbours to the fact that, willing as we are to meet our subjects half way in all questions of their personal rights and comforts, anxions as we are to see well conducted aristcracy take its proper position in the country, yet, no latitude is allowed in obedience to the orders of Government, and that they will best increase their own influence by promoting the objects which their rulers have at heart.

We do not hesitate to express our belief that the majority of the landholders in Oudh would eagerly seize any occasion which would enable them to exemplify their loyalty and good feeling towards us. The late circulation of Hindee letters which was pretty general in this province and the North West provinces, though it is not considered to have borne any political segnificance but a precaution against the spread of cholera, was first brought to light by Maharaja Maun Sing, one of the most powerful of the Oudh Chiefs—and we do not look on this man, who is foremost in his devotion to the Government, as owing to it so entirely as others do the high position which he enjoys. His voluntary information is merely cited as an evidence of the existence of a feeling which is widely shared by the members of his class, and we venture to predict that under a continuance of the present liberal policy, the feelings of good will and kindness which exist between the officers of Government and the people of Oudh will be surely and rapidly developed to the mutual advantage of both parties.—

We now take leave of our subject, and bid farewell to Oudh and to her Government. Circumstances have lately caused it to occupy a position in the eye of the public beyond the proporties of the interest which it can fairly claim from its area or political importance. When scarcely freed from the effects of the Mutiny of 1857, it was selected as the arena on which the most liberal policy which has yet emanated from the Government of India, was to be introduced.

The abolition of all former landmarks afforded peculiar facilities for inaugurating a new regime, which we suspect will ultimately extend far beyond the limits of the province itself Naturally the experiment has attracted great interest, among all classes of society. In truth,it marks a most important period in the annals of India, and one pregnant with great results—whether for good or for evil time alone can show, but for ourselves we have no doubt of the issue.

Hitherto, the tendency of British rule in India, as in all other places, has been to level all distinctions of races, creeds and classes—to perfect

the system, at the sacrifice of the individual. The result has been everywhere to give great weight to what in England are known as the middle classes. Under our free institutions the growth of such is a matter as course, and where this section of the body politic represents, as it does of England, a great amount of intelligence, a vast amount of industry, and an incradicable love of fair play, law and order, the encouragement which gives weight to such a class can hardly be too freely given.

But, to venture a truism, Asia is *not* Europe. The want of education, and the absence of cohesion among the middle classes in India, the diversity of their interests, and their inherited instinct to follow rather than to lead, places them on a far lower level than the *masses* in England and America.

They are not yet of sufficient substance to form a party and no Government can yet rule India, by attaching itself to the interests of those, who in the hour of trial have no one principle of action to guide them, and no steadiness of character on which their rules can confidently rely for support. The true ally of the British Government in India is, not the independent or quasi-independent prince, or the representatives of the old dynasties, nor is it those low.r classes of society whose welfare and comfort our policy has so eagerly sought and secured; but it is the hereditary class of nobility, the aristocracies of birth and land. These form the class which it is the interest of England to encourage, that she may in her turn look to them for support and assistance. Such men represent real, strong, well-defined and tangible interests—they have a stake to lose, and a status to maintain—and a sound healthy appreciation of their position, while it gives them a clear and determinate principle of action, renders them a reliable support against such convulsions as have lately shaken British rule in India to the very centre. It is idle to speak of patriotism and loylty in a country which has never known either. Despotism, the only mastership which an Asiatic recognises, promotes the growth of neither, and depends on neither for its stability.

We are indisputably supreme in India, we fear no outward rival there, , all our dangers must ever be from the people of the soil of itself. Our empire stands assured to us from day to day by the presence and support of a large British army; but England feels the drain. With the enormous calls upon her strength in every quarter of the globe she cannot give but a portion of per strength to her Eastern Empire. To hold that with the least strain on her population and her finances, is the problem of Indian Government; and to solve that, it should be the object of our rulers to ally themselves with that class of the community which can best ease our burden and best give the assistance we want. We have absorbed rivals; we must seek for the required support from our own subjects, and we believe that in the hour of need this will be best found in the ranks of a judiciously fostered and liberally government native Indian aristocracy.

POLITICAL CONSULTATIONS

Foreign Political Consultations, No. 3022, 31 Dec, 1858*

PROCLAMATION ISSUED BY THE BEGAM IN BIRJIS QADR'S NAME

At this time certain weak-minded foolish people have spread a report that the English have forgiven the faults and crimes of the people of Hindoostan; this appears very astonishing, for it is the unvarying custom of the English never to forgive a fault, be it great or small; so much so, that if a small offence be committed through ignorance or negligence, they never forgive it.

The Proclamation of the 10th November 1858, which has come before us, is perfectly clear, and as some foolish people, not understanding the real object of the Proclamation, have been carried away, therefore, we, the ever abiding Government. Parents of the people of Oudh, with great consideration put foreth the present Proclamation, in order that the real object of the chief points may be exposed, and our subjects be placed on their guard.

First, It is written in the Proclamation, that the country of Hindoostan which was held in trust by the Company, has been resumed by the Queen and that for the future, the queen's Laws shall be obeyed. This is not to be trusted by our religious subjects; for the Laws of the Company, the Settlement of the Company, the English Servants of the Company, the Governor General, and the Judicial administration of the Company are all unchanged; what then is there new which can benefit the people or on which they can rely?

Second. In the Proclamation, it is written that all contracts and agreements entered into by the Company will be accepted by the Queen. Let the People carefully observe this artifice. The Company has seized on the whole of Hindoostan, and if this arrangement be accepted, what is then new in it? The Company professed to treat the Chief of Bhurtpoor as a son, and then took his Territory; the Chief of Lahore was carried off to London, and it has not fallen to his lot to return; the Nowab Shumshooddeen Khan on one side they hanged, and on the other side they took off their hats and salaamed to him; the Peishwa they expelled from

* Eighteen Fifty Seven · Surendranath Sen

Poonah Sitara, and imprisoned for life in Bithoor; their breach of faith with Sultan Tippoo, is well known, the Rajah of Banares they imprisoned in Agra. Under pretence of adminsitering the Country of the Chief of Gwalior, they introduced English customs; they have left no name or traces of the Chiefs of Behar, Orissa and Bengal; they gave the Raes of Furruckabad a small monthly allowance, and took his territory, Shahjehanpoor, Bareilly, Azimgarh, Jounpoor, Goruckpoor, Etawa, Allahabad, Futtehpoor &C., our ancient possessions, they took from us on pretence of distributing pay; and in the 7th Article of the Treaty, they wrote on Oath, that they would take no more from us, if then the arrangements made by the Company are to be accepted, what is the difference between the former and the present state of things? These are old affairs; but recently in defiance of treaties and oaths and notwithstanding that they owed us millions of rupees, without reason, and on the pretence of the mis-Government and discontent of our people, they took our country and property worth millions of rupees. If our people were discontented with our Royal predecessor Waiid Ally Shah, how comes it they are content with us? and no ruler ever experienced such loyalty and devotion of life and goods as we have done! what then is wanting that they do not restore our country.

Further, it is written in the Proclamation, that they want no increase of Territory, but yet they cannot refrain from annexation. If the Queen has assumed the Government why does Her Majesty not restore our Country to us, when our people wish it? It is well known that no King or Queen ever punished a whole Army and people for rebellion; all were forgiven; and the wise cannot approve of punishing the whole Army and people of Hindoostan; for so long as the word 'punishment' remains, the disturbances will not be suppressed. There is a well known proverb 'a dying man is desperate' (Murta, Kya na Kurta) it is impossible that a thousand should attack a million, and the thousand escape.

Third. In the Proclamation it is written that the Christian religion is true, but no other creed will suffer oppression, and that the Laws, will be observed towards all. What has the administration of Justice to do with the truth, or falsehood of a religion? That religion is true which acknowledges one God, and knows no other; when there are three Gods in a religion, neither Mussulmans nor Hindoos, nay–not even Jews, Sun worshippers, or fire worshippers, can believe it true. To eat pigs, and drink wine, to bite greased cartridges, and to mix Pigs' fat with flour and sweetmeats to destroy Hindoo & Mussulman temples on pretence of making roads, to build Churches, to send clergymen into the streets and alleys to preach the Christian religion, to institute English schools, and pay people and monthly stipend for learning the English Services, while the places of

worship of Hindoos & Mussulmans are to this day entirely neglected; with all this, how can the people believe that religion will not be interfered with? The rebellion began with religion, and for it millions of men have been killed. Let not our subjects be deceived; thousands were deprived of their religion in the North West, and thousands were hanged rather than abandon their-religion.

Fourth. It is written in the Proclamation that they who harboured rebels, or who were leaders of rebels, or who caused men to rebel, shall have their lives, but that punishment shall be awarded after deliberation, and that murderers and abettors of murderers, shall have no mercy shown them; while all others shall be forgiven, any foolish person can see, that under this proclamation, no one, be he guilty or innocent, can escape; everything is written and yet nothing is written but they have clearly written that they will not let off any one implicated; and in whatever Village or Estate the army may have halted, the inhabitants of that place cannot escape. We are deeply concerned for the condition of our people on reading this Proclamation, which palpably teems with enmity. We now issue a distinct order, and one that may be trusted that all subjects who may have foolishly presented themselves as heads of Villages to the English, shall before the 1st of January must present themselves in our camp, without doubt their faults shall be forgiven them, and they shall be treated according to their merits. To beleive in this Proclamation it is only necessary to remember, that Hindoo stanee rulers are altogether kind and merciful. Thousands have seen this, Millions have heard it. No one has ever seen in a dream that the English forgave an offence.

Fifthly. In this Proclamation it is written that when peace is restored public Works, such as roads and canals will be made in order to improve the condition of the people. It is worthy of a little reflection that they have promised no better employment for Hindoostanies than making roads and digging canals. If people cannot see clearly what this means, there is no help for them. Let no subject be deceived by the Proclamation.

Foreign Political Consultations, No. 8, 18th March, 1859

CORRESPONDENCE BETWEEN SHEIKH KHAIRUDDIN AND MUHAMMAD HASAN KHAN

From Khyrooddeen to Mahommed Hussun–d/- 13th Novr/58

After Compliments

The English Govt. is very powerful and has annihilated number of rebels, however with a view to putting a stop to the effusion of more blood, it now inclines to mercy. The Government of Hindoostan is desirous that the rebels should abandon their (present) short sighted line of conduct which can only end in their ruin, and cease to fear that the impression a false one entirely, now prevalent that hanging awaits those who surrender, will turn out correct–I herewith forward to you a copy of Her Majesty's Proclamation, issued this month, which contains a declaration of pardon to all. From it you will perceive that those only who have been guilty of the murder of British authorities or subjects shall be liable to punishment, that life will be granted to all leaders among the rebels. Who may have been innocent of such a crime, and that any good deeds they may have performed in the way of saving English officials will be taken into consideration. Under these circumstances you ought to reflect how hopeless of advantage your continuance in the rebel ranks is. If you hold out you will undoubtedly be either captured or slain. You had much better come and give yourself up to me or any European officer you may prefer. I know that you have not murdered any official or subject. You are free from suspicion of any such crime. If then you really wish to participate in the advantages of this mercy, advise likewise the other chiefs such as the Raja or Gonda to do so also, and tell the sepoys that every one will be allowed to go to his own house. Nobody will obstruct them, provided always that they have not been guilty of shedding the blood of any Euro pean or British subject. To kill in fight is not considered a crime.

No.2 d/- 16th Rubee ool sanee–
From Mahommed Hussun Khan to Kyrooddeen

I have received your friendly communication, the tenor of which has caused me much gratification, with its enclosed copy of the Queen's Proclamation, the merciful provisions of which I shall, as you direct be made known to & impressed upon, all in future everyone will be answerable for his own actions. I shall, after being thus assured of Her Majesty's justice, always consider myself as absolved from offences. From the expressions in your letter also my innocence is established. I am much delighted, be-

cause I have never killed any official or subject, although the European officers and their soldiers have slaughtered thousands of innocent and insignificant men, including women, blind men and mendicants, and have burned down their dwellings, looting their property. By the just provisions of Her Majesty's Proclamation all who have been guilty of such murder are liable to punishment. I am one of those men who have saved the lives of European officers, when the mutiny of the troops broke out, and the sepoys ruthlessly murdered their officers, and when those who ventured to aid Europeans in any way were slain along with them and their property looted or destroyed, I then fearlessly sent some of my retainers and saved the lives of two colonels, with the wife and daughter of one of them, entertained them for some time with every care at my own residence and had them conveyed in safety to the Gorruckpore authorities. Subsequently when at the peremptory command of my Chief I, with God's help, restored Gorruckpore to the Kingdom of Oude, to which it had been in former times attached, I preserved all the native officials from being looted or killed, and also shielded from injury several Christians and sent them away safe and sound. I consider myself, therefore, entitled to praise and commendation from the just British authorities. I fully admit the truth of what you write, to frighten me, regarding the power of the British Govt., the annihilation of so many rebels, my own hopelessness of advantage if I remain with the insurgents &c &c. The might & resources, the power and the awe inspiring force which Her Majesty, the Sovereign of Sovereigns, may her prosperity be everlasting, commands, preclude the possibility of successful opposition. The Almightly, however, whose name is 'Strong' and the 'protector' is omnipotent, if an enemy is mighty. He is more mighty, He if He chooses makes the strong weak & the weak strong. Whom He wills He exalts & whom He wills He debastes. This has become apparent to all in this time of confusion Save with God's permission no one can slay or burn. Had the British Government the power of God they would in their retaliation on the sepoys, have destroyed every native of Hindostan. And the thousands of Christians who have fallen by the blood thirsty sepoys would have been saved If you have studied in history the narratives of bouleversements such as the in the world, you will have found them all like the story of Sohak and the Blacksmith's cow. One sees that the man who reads in the way of slaughter as of his creed, first imagines himself as slain,so I neither fear capture or death in the least, should I, as God forbid there I should, be taken prisoner, I have committed no crime to render me, under the Proclamation, liable to punishment. Through Her Majesty's mercy I am assured that no one can do me harm, on the contrary that I shall be released. If on the other hand I am killed while fighting for my religion and my earthly sovereign, I then attain the prosperity of the two worlds. Just as you and all the other employees of Govt. hope to attain worldly advantage and also prosperity in the world to come by fighting determinedly as in a Jehad, on the side of the English Govt., so I also consider it ennobling and sure to benefit me

now & hereafter to fight and die in the tenets of my creed and in the cause of my illustrious sovereign. As the European officers are both considerate in listening to the excuses of inferiors and capable of accurately judging actual worth, they must be favourably impressed with my constancy and fidelity. The phraseology of the proclamation where it promises pardon of offences is somewhat obscure and indefinite, there is nothing to seize upon as an idubitable assurance of such a pardon. For instance it is stated that the generality of men who have committed crime involving injury to the State during this disquieting revolt shall be pardoned on certain specific conditions. Now reflect–all the offences committed are offences 'involving injury to the State.' They are, therefore all to be classed as equal in this respect–moreover the use of the expression 'generality of' and the non-specification of the 'conditions' in a definite manner produce doubt and want of confidence in men's minds. The English rulers of Hindostan have retracted from the binding engagements entered into with the native Princes and acted contrary to the provisions which ought to have been irrefrangible. Who then can look upon obscurely missed contracts such as those they are in the habit of entering into, and which are capable of totally different construction as actually binding on them. The British have exceded all bounds in their breaking of promises–this is notorious–(witness the treaties) between them and the Raja of Lahore, the Peshwa and other Princes too numerous to mention. My business is with the King of Oude. All the world knows of the binding engagements and treaties which existed between those two exalted Powers, the King of Oude & the English Government. According to them the English had no right to establish themselves in Oude. The Rulers of this Kingdom always used to aid the English with their resources & their soliders, and to act in a friendly & conciliatory manner. They never were guilty of any act implying breach of faith and were submissive even to allowing the English to forcible annex Oude. The latter appropriated their residences and their property of all kinds. Even then there was no resistance. The King of Oude never went so far as to fight against them as an enemy, but appealed first to the Resident & then to the Governor General & finally when they disregarded him, he sent his brother and mother to plead (his cause) before the Queen. The Company have as yet paid no attention. Seeing this breaking of covenants & faithlessness the chiefs remain with their fingers on their teeth (i.e., are suspicious and perplexed). Their kingdom has been wrested perfidiously from a dynasty which never opposed & which always conciliated the English Govt., and all kinds of tyranny have been perpetrated. No one now puts any trust in the British. I may sum up with the proverb "Who has not received the reward of his deeds?" The Princes and peoples of Hindostan, witnessing this perfidious oppression, took the opportunity of the revolt of the army (the result also of the English Govt.'s own conduct) and the outbreak took place, involving the slaughter and plunder of thousands of innocent servants of God. The English have now opened the doors of bloodshed more determinedly than their Government used

formerly to provide for keeping them closed. This rebellion arose solely out of the annexation of Oude. Had that not taken place there would have been no bloodshed, because no defection of the Chiefs, who would have on the contrary inflicted chastisement on the mutinous sepoys. If Her Majesty even now acts justly and gives back his Kingdom to the King of Oude all this disturbance will be brought to and end, the justice and mercy of the Queen will be blazoned forth & extolled in the seven regions of the world, and all the Chiefs of Hindostan will return to their allegiance and put a stop to this war and anarchy. From the tenor of Her Majesty's Proclamation it (lit) trickles out that she intends to do this eventually, for it is intended that she will recognise and fulfil all engagements contracted by the Hon'ble E.I. Company or with their sanction–that she expects the native rulers on their part also to execute what they have agreed to, and that she does not wish to extend her territories beyond their present limits. Her Majesty ought, therefore, in accordance with these promises, to fulfil as in justice bound the contract entered into between Sooja ood Dowla and the Company's Govt., and restore the kingdom of Oude to its hereditary rulers, paying no attention to the new treaties extorted subsequently from reigning kings by Residents, for the original compact embraced the descendants of the contracting parties in perpetuity, and consequently all those new compacts which have in contravention of it been forced on later Kings by the Residents are iniquitous and worthless. The Kingdom of Oude is now in the possession of the King, and those portions of it which the British have from time to time taken forcibly have been freed from their rule, such forcible annexations are unworthy of being paid attention to. If the expression 'now in possession' is applied to those territoris actually in the possession of the English at the moment of writing the Proclamation then many portions which at that time were not occupied by them ought to remain in the hands of those in whose actual possession they were. The meaning of all I have written is this. We servants and dependants of the King of Oudh consider it essential to our prosperity in both worlds to display devotion in protecting the Kingdom and opposing the efforts of invaders who seek to gain a footing in it. If we fail in doing so we are traitors and will have our faces blackened in both worlds. "I will not withdraw my hand until it has grasped what it attains to, I will obtain my desired one or perish". If the Queen in merciful consideration of the condition of the inhabitants of Hindostan, & to close the doors of slaughter, or in mere justice, restore Oude to the King, we will all cease fighting and slaying and revert to our allegiance to Her Majesty & her officers, disturbances will then cease in India & all will be peace. I, therefore, beg that you will forward this letter for the consideration of the Governor General, and if he should think proper to fulfil the terms of the Proclamation, abstain from molestation of Oude, and enter into a company in accordance with the provisions of that contracted with Suja ood Dowla, then I will act as vakeel and see all the points in it faithfully executed. I await a speedy answer &c.

From Khyrood Deen to Mahommed Hussun–28th Novr.

After Compliments,

I have received your reply to my letter, from it I perceive that you are still slumbering in folly, for I merely wished to impress upon you, explaining the meaning of the Proclamation that if you at once surrendered, it would be much the better for you. You, however, disregarding this have written a long useless rigmarole in reply, in which you make foolish and unjust aspersions regarding the European soldiery and authorities. For instance you say that the British armies have slain thousands of helpless men, blind, maimed & beggars besides women & children, such an accusation is entirely false and without foundation. You and your retainers have in truth committed and still commit acts such as these, and generally whenever your men begin looting the defenceless, the British sally out and protect them from you. You write that you have never put to death any British officer or subject. how is it then that you have summoned and associated with yourself as an ally & supported Bala Rao, who in conjuction with his brother the Nana caused to be taken captive and butchered serveral hundred innocent European women and children, similar massacres of innocent people nave been perpetrated in many places, massacres such as are not justifiable by any religion, yet you say that you are fighting for your faith. Point out to me any religion which permits such deeds. Your eyes are evidently closed, for you accuse the European soldiers and officers of having committed the crimes which in reality the rebel armies and the budmashes have perpetrated & continue to perpetrate. You call the war you maintain a 'Jehad', tell me how such slaughters of women and children can be justified and by what creed looting is allowable. What you propose concerning the restoration of the Kingdom of Oude and your submission being only consequent on that, is nonsense. Government will never give up one beegah of land which it has once appropriated. What have you to do with such discussions, you may write whatever you choose about yourself, but not of what concerns the State. In short I give you to understand that if you wish to save your life, you must at once surrender. Otherwise be assured that the British forces will very soon attack you from all sides, occupy Gonda & Baraitch and surround & blow you out of, with their guns, the jungle which you look upon as your asylum. The rebels will become so many heads of game to the soldiers & officers. You will then see of what avail your alleged acts of fidelity to Govt. will be. It cares not whether you are induced to surrender. My object in writing was to explain the terms of the Proclamation to you, and thus preclude the possibility of your saying when captured that you had never seen it or you would have surrendered at once. You call the language of the Proclamation obscure, in my opinion it is very clear, if you read it carefully you will understand it entirely. If you reckon upon being set at liberty when captured because you saved the life of Col—& his wife and children, you must bear in mind that the period of grace is

only for 1 month & 10 days from this time, after its expiration that will not be taken into cosideration and you as well as other rebels will when caught be treated as you would have been before the issue of the Proclamtion. You had better come in within the limited time otherwise you will die, after fleeing about from place to place, in the jungles. Reflect on this well before you answer and place no confidence in the rebel army with you and Bala Rao, which has always fled before the European soldiers when they met in battle. How can you expect them to fight in obedience to your orders when they have been so unfaithful to their former masters whose salt they had eaten for 20 or 30 years, perhaps they may make an end of you by making you a target for their musket balls. If you have any sense and if any more years of life remain to you, pay attention to what I say.

Foreign Political Consultations, No 5. 63-69, 27 May, 1859
LETTERS OF NANA SAHEB AND BALA SAHEB

D/Goreckpoor the 27th April 1859

Sir,

I have the honor to forward for the information of His Honor the Lieutt. Governor copy of a vernacular Isteternamah from the Nana of Bithoor brought by a Brahmin into Coll. Pinkney's camp at Dhukehree and delivered to Major Richardson Comdg. Bengal Yeomanry Cavalry with translation of the document and Major Richardson's reply, which have been sent to me by Brigr. Rowcroft C. B.

Goruckpoor,
Commissioner's Office,
The 27th April, 1859

I have the honour to be & c.
Sd/- Alan Swinton
Offg. Commissioner

Translation of an Istiharnamah to Her Majesty the Queen, the Parliament, the Court of Directors, the Governor General, the Lieutt. Government and all officers Civil and Military.

You have forgiven the crimes of all Hindoostan and Murderers have been pardoned–it is strange that your Sepoys have killed your women and children and Mummoo Khan and the people of rank of Furruckabad, who truly are Murderers have been for given, and you have written to Jung Bahadoor to send the Begum and the Rajas to their own country under his guarantee. It is surprising that I who have joined the rebels from helpless ness have not been forgiven. I have committed no murder. Had General 'Hawla' (Wheeler) not sent for me from Bithoor my soldiers would not have rebelled, besides he did not send for my family to the intrenchments. My soldiers were not of my own Country, and I previously urged that so insignificant ('gureeb') a person as myself could render no material aid to the British. But General 'Hawla' (Wheeler) Would not listen to me and invted me (into the intrenchment). When your Army mutinied and pro-

ceeded to take possession of the Treasury my soldiers joined them. Upon this, I reflected that if I went into the intrenchments my soldiers would kill my family, and that the British would punish me for the rebellion of my soldiers, it was, therefore, better for me to die. My ryots were urgent and I was obliged to join the soldiers. For two or three years I petitioned the '(roobkary Kya) Surkar' but no attention was paid to it. At Cawnpore the soldiers disobeyed my orders and began killing the English women and the ryots. All I could save by any means I did save, and when they left the entrenchments provided boats in which I sent them down to Allahabad, your sepoys attacted them. By means of entreaties I restrained my soldiers and saved the lives of 200 English women and children. I have heard that they were killed by your sepoys and Budmashes at the time that my soldiers fled from Cawnpore and my brother was wounded. After this I heard of Istiharnamah that had been published by you and prepared to fight and up to this time. I have been fighting with you, and, while I live, will fight. You are well aware that I am not a murderer, nor am I guilty, neither have you passed any order concerning me. You have no enemy beside me, so, as long as I live will fight. I also am a man. I remain two Coss distant from you. It is strange that you, a great and pwerful nation, have been fighting with me for two years and have not been able to do anything; the more so, when it is considered that my troops do not obey me and I have not possession of any Country. You have forgiven the Crimes of all and the Napal Chief is your friend. With all this you have not been able to do anything. You have drawn all to your side, and I alone am left but you will see what the soldiers I have been preserving for two years can do. We will meet, and then I will shed your blood and it will flow knee deep. I am prepared to die. If I alone am worthy of being an enemy to so powerful a nation as the British, it is a great honor to me, and every wish of my heart is fulfilled, death will come to me one day, what then have I to fear? But those whom you have taken to your side will on the day fixed turn upon you and kill you. You are wise, but have erred in your wisdom, I sent a letter to Chundernugger but it did not reach, this has disappointed me or you would have seen what I could do I will however still try for Chundernugger.

If you think proper send an answer to this. A wise enemy is better than unwise friend.

D/- 17th Rumzan 1275 Hijree
or 20th April 1859.

Copy of a reply sent by Major J. F. Richardson Commanding Bengal Yeomanry Cavalry to the Ishtahar bearing the seal of the Maharaja of Bithoor. Dated the 17 Rumzun 1275 Hijree.

The Ishtahar bearing the seal of the Maharaja of Bithoor sent by the hands of a Brahmin has been received by Major Richardson Commanding European Cavalry who has made himself acquainted with the contents. I now write that the Proclamation which was issued by Her Majesty

the Queen of England, was not for any one party or person, but for all. And the identical terms under which the Nawab of Furruckabad, the Nawab of Banda and other Chieftains and Rajas of Oudh, laid down their arms and surrendered themselves to Government, those terms are open to you and all those who may wish to surrender. In writing as you do that you have not murdered women and children (Mhem our lirken), it becomes you to come in without fear, a reply to this is requseted.

Sd/- J.F. Richardson
Commdg. B.Y. C.

Camp Dhukurea
23rd April 1859

Service Message

From
Mr. Beadon, Calcutta, 2nd May
To
The Lieutenant Governor, Allahabad

The Governor General in Council has received your message of the 30th. He has also received a copy of the Nana's letter and of Major Richardson's reply. He does not approve of that reply, all overtures from the Nana or from any other rebel who has been proscribed or who stands suspected of taking part in murder are to be answered by a simple reference to the Queen's proclamation and by nothing more. Inform Major Richardson by Telegraph that he is not to reply to any further letters from the Nana without taking instructions upon them, and that if any, are received by him he is to send copies immediately to the local Government and to the Government of India.

Electric Telegraph Deptt.
The 3rd of May 1859.

From
Brig. H. Roweroft, Commanding Gorruckpore District
To
Major General Birch C. B. Secy, to the Government of India, in the Military Department, Calcutta.

D/- Goruckpore 7th May 1859

Sir,

I have the honor to forward the enclosed Documents as noted in the Margin,* for submission to His Excelency the Viceroy and Governor General of India.

* Two Native letters original from the Nana and Bala Rao dated 25th and 26th April, 1859, with Translations

Copies of the replies sent by Major Richardson Comdg B. Y Cavy. under the sanction of Coll Pinkney C B , Commdg. the Column

2. I beg to report that I have sent up orders to Col. Pinkney not to allow such communications to be carried on and signed by any subordinate officer, but to take such matter entirely into his own hands, and to keep them from being publicly known in camp as far as possible, obtaining the assistance of Major Richardson or other confidential officer; and, in future, on any letter or overtures being received from such rebel ehiefs, merely to refer them to Her Majesty the Queen's Proclamation in reply, sending in the native letters without delay, for transmission to Government, informing the parties that their letters have been so forwarded.

I have the honor to be &c.
Sd/- H. Roweroft Brig
Commdg, Gorruckpore District

Translation of a letter from the Nana

Major Richardson in his reply to my Ishtihar received on the 23rd April 1859 has noticed only one of the many subjects contained in it. This I accept but I cannot surrender myself in this manner, if a letter, written by Her Majesty the Queen and sealed with her seal, and brought by the Commanding Officer of the Fren h ("Fransees") or the second in command, reach me, I will, placing reliance on these officers, accept the terms without hesitation. Why should I join you, knowing all the "dagabazi" perpetrated by you in Hindoostan? If you are heartily desirous of putting an end to the troubles of the Country, an autograph letter of Her Majesty, brought by the Commanding Officer of the French, I will accept. Some years ago, I sent an Eilchi to London, by whom Her Majesty sent me a letter written with her own hand, and sealed with her own seal. This I have in my possession to this day. If you wish it, the thing can only be done in this way, and to this I consent. If not, life must be given up some day. Why then should I die dishonored? There will be war between me and you as long as I have life, whether I be killed or imprisoned or hanged, and whatever I do will be done with the sword only. Nevertheless if Her Majesty's letter as above described comes to me, the thing may be–I will present myself. If you consider it proper, be sure to send me an answer.

D/Deogurh
22nd Ramzan
26th (sic.) April 1859

From Bala Rao

Translation of a "Petition to the English"

I am the brother of the Nana–from the time of the English I have been with him–he never permitted me to go anywher without his orders, threatening me with disinheritance, so I remained in subjection to him, and was not acquainted with any of his English visitors. This rendered me help-

less. I was however desirous of preserving my honor and kept aloof from all. No one has put in a complaint against me; if any such 'roobkaree' can be produced, I will be guilty. When he rebelled at Cawnpore, he beguiled and took me there, and placed my wife with his women, and they are togather to this day. When the sepoys marched to take the Treasure, I perceived my utter helplessness, for I knew none of the 'Sahib log'. The sepoys would not alow me to leave them, my brother would not permit me to separate from him. I was, therefore, necessitated to act according to my brother's orders. I have saved the life of a child, 9 or 10 years of age, the daughter of the Judge of Futtehpoor, and kept her concealed with my wife, and have shown her to General Budree Nur Sing. I petitioned Jewajee Scindia of Gwalior on my own account (he is yet living) at the time he came to Bithoor, but he replied, he could not keep me alone without permission of the Governor or of my brother. Thus I continued helpless. I am guiltless and this will be found to be the case on enquiry. If you send a reply, I will come to you, and relate every thing. It is in your power to do with me as you wish. You can imprison or kill or hang me. Whatever may happen I will be freed from my present anxities. If you are not for me, the world is not. Who ever dies, dies alone, for thus it happens. According to your reply I will act.

D/8th Bysakh
1916 Summut
or
25th April 1859

Sd/- H. Raweroft Brig.
Commdg. Goruckpore District.

Reply sent to Bala Rao by Major Richardson

Bala Rao, Your representation. dated the 8th Buddee Summut 1916, sent by the hand of the Brahmin, reached me last evening. I have perused it, and in-return send you a copy of the Proclamtion of the Queen of England written in Nagri and bearing Her Majesty's royal seal. The Terms of this Proclamation are such as could only be by a great and good Queen. Read it carefully and having done so, give me your answer. If you do not understand it, I will, on your informing me, explain as far as I can or if you like to send me a trustworthy man whom I guarantee to pass free to and fro, I will explain to him that which you do not understand. Mistake not the Proclamation of England's Queen. You mention that you have Christian child with you. Recollect you are a man, and as such, it is you duty to protect that child from harm. Terms beyond those of the Ishtihar of Her Majesty I have not the power to offer you. As I have no person who can well read Sanskrit, I have had difficulty in reading your representations–it will be better if you reply it Oordoo or Nagri.

THE GAGGING' ACT*

From the CALCUTTA GAZETTE.

Legislative Council, 13th June, 1857.

THE following Act, passed by the Legislative Council of India, received the assent of the Right Honourable the Governor-General this day, and is hereby promulgated for general information.

Act No. XV. of 1857.

"An Act to regulate the establishment of Printing Presses, and to restrain in certain cases the circulation of printed books and papers "

Preamble

Whereas it is expedient to prohibit the keeping or using of printing-presses, types, or other materials for printing, in any part of the territories in the possession and under the Government of the East India Company, except with the previous sanction and license of Government, and under suitable provisions to guard against abuse; and whereas it may be deemed proper to prohibit the circulation, within the said territories, of newspapers, books, or other printed papers of a particular description : It is enacted as follows :—

No Printing-press to be kept or used without the license of government.

I. No person shall keep any printing-press or types, or other materials or articles for printing, without having obtained the previous sanction and license for that purpose of the Governor-General of India in Council, or of the Executive Government of the Presidency in which such printing-press, types, or other materials or articles for printing are intended to be kept or used, or of such other person or persons as the Governor-General of India in Council may authorise to grant such sanction or license; and any person who shall keep or use any printing-press, or types, or other materials or articles for printing, without having obtained such licenses, shall be liable, on conviction before a magistrate, to a fine not exceeding five thousand rupees, or to imprisonment not exceeding two years, or to both.

Power to search for and size unlicensed printing-presses & C.

II. If any person shall keep or use any printing-press, or types, or other materials or articles for printing, without such sanction or licenses

* From the Sepoy Revolt—its causes and its consequences by Henry Mead 1857.

aforesaid, any magistrate, within whose jurisdiction the same may be found, may seize the same, or cause them to be seized, together with any books or printed papers found on the premises; and shall dispose of the same as the Governor-General of India in Council, or the Executive Government of any Presidency, or such other person as the Governor-General in Council shall authorise in that behalf, may direct; and it shall be lawful for any magistrate to issue a search warrant for the entry and search of any house, building, or other place, in which he may have reason to believe that any such unlicensed printing-press, types, or other materials or articles for printing are kept or used.

Application for license to keep printing-press.

III. Whenever any person or persons shall be desirous of keeping or using any printing-press, or types, or other materials or articles for printing, he or they shall apply by writing to the magistrate within whose jurisdiction he proposes to keep or use such press or other such materials or articles as aforesaid, or to such other persons as the Governor-General in Council, or the Executive Government of the Presidency, or such other person as the Governor-General in Council shall authorise in that behalf, may appoint for that purpose. The application shall specify the name, profession, and place of abode of the proprietor or proprietors of such printing-press, types, or other materials or articles for printing, and of the person or persons who is or are intended to use the same, and the place where such printing-press, types, or other materials or articles for printing, are intended to be used; and such application shall be verified by the oath, affirmation, or solemn declaration of the proprietors and persons intending to keep or use such printing-press, types, or other materials or articles for printing, or such of them as the magistrate or other person to whom the application shall be made shall direct : and any person wilfully making a false oath, affirmation, or declaration, shall be deemed guilty of perjury.

Government may grant license subject to conditions and may revoke the same

IV. The magistrate shall forward a copy of such application to the Governor-General in Council, or to the Executive Government of the Presidency, or to such other person as may be authorised to grant the license; and the said Governor-General in Council, or such Executive Government, or other person as aforesaid, may at his or their discretion grant such license subject to such conditions (if any) as he or they may think fit, and may also at any time revoke the same.

Paenalty for using contrary to conditions, or after revocation of licence.

V. If any person or persons shall keep or use, or cause or allow to be kept or used, any such printing-press, types, or other materials or articles for printing, contrary to the conditions upon which the license may have

been granted, or after notice of the revocation of such license shall have been given to, or left for, him or them at the place at which the printing-press shall have been established, he or they shall be subject to the same penalties as if no such license had been granted; and such printing-press, types, and other materials or articles for printing may be seized and disposed of in the manner prescribed in Section II. of this Act.

Books &c. to have the printers and publishers name printed on' them, and copies to be forwarded to the magistrate.

VI. All books and other papers, printed at a press licensed under this Act, shall have printed legibly thereon the name of the printer and of the publisher, and the place of the printing and publication thereof; and a copy of every such book of printed paper shall be immediately forwarded to the magistrate or to such other person as the Government or other persons granting the license may direct; and every person who shall print or publish any book or paper otherwise than in conformity with this provision, or who shall neglect to forward a copy of such book or paper in manner hereinbefore directed, unless specially exempted therefrom by the Governnor-General in Council, or other person granting the license, shall be liable, on conviction before a magistrate, to a fine not exceeding one thousand rupees, and in default of payment to imprisonment for a term not exceeding six calendar months.

Government may prohibit circulation of particular books or newspapers.

VII. The Governor-General of India in Council, or the Executive Government of any Presidency, may, by order to be published in the Government Gazette, prohibit the publication or circulation, within the said territories, or the territories subject to the said Government, or within any particular part of the said territories, of any particular newspaper, book, or other printed paper, or any newspaper of any particular description, whether printed within the said territories or not; and whoever, after such prohibition, shall knowingly import, publish or circulate, or cause to be imported, published, or circulated any such book or paper, shall be liable for every such offence, on conviction before a magistrate, to a fine not exceeding five thousand rupees, or to imprisonment not exceeding two years, or to both; and every such book or paper shall be seized and forfeited.

Interpretation

VIII. The word "printing" shall include lithographing. The word "magistrate" shall include a person exercising the powers of a magistrate, and also a justice of the peace; and every person hereby made punishable by a Justice of the peace may be punishable upon summay conviction.

Act not to exempt compliance with act XI of 1833.

IX. Nothing in this Act shall exempt any person from complying with the provisions of Act XI. of 1845.

Prosecutions

X. No person shall be prosecuted for any offence against the provisions of this Act, within fourteen days after the passing of the Act, without an order of the Governer-General in Council or the Executive Government of the Presidency in which the offence shall be committed, or the person authorised under the provisions of this Act to grant licenses.

Duration of Act.

XI. This Act shall continue in force for one year.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

From the CALCUTTA GAZETTE *Extraordinary, Saturday, 20th June, 1857.*

NOTIFICATION

Fort William, Home Department, 18th June, 1857.

With reference to the provisions of Act No. XV. of 1857, it is hereby notified that applications for licenses to keep or use any printing-press, or types, or other materials or articles for printing within the town of Calcutta, are to be made to the commissioner of police.

The Lieutenant-Governor of Bengal is authorised to grant licenses under the said Act, and to appoint any person or persons to receive applications for such licenses in any part of the lower provinces of the presidency of Bengal except the town of Calcutta.

The Lieutenant-Governor of the north-western provinces is authorised to grant licenses under the said Act, and to appoint any person or persons to receive such applications in any part of the north-western provinces of the presidency of Bengal.

The Governor of the straits settlements, the chief commissioners of the Punjub and Oude, and the commissioners of Mysore, Coorg, Nagpore, Pegu, and the Tenasserim and Martaban provinces, are authorised severally to appoint any person or persons to receive such applications within the provinces, districts, and settlements, under their control.

The conditions upon which licenses to keep or use any printing-press, or types, or other materials or articles for printing will ordinarily be granted, are as follows :—

1. That no book, newspaper, pamphlet, or other work printed at such press, or with such materials or articles, shall contain any observations or statement impugning the motives or designs of the British Government, either in England or India, or in any way tending to bring the said Government into hatred or contempt to excite disaffection or unlawful resistance to its orders, or to weaken its lawful authority, or the lawful authority of its civil or military servants.

2. That no such book, pamphlet, newspaper, or other work, shall contain observations or statements having a tendency to create alarm or

suspicion among the native population of any intended interference by Government with their religious opinions and observances.

3. That no such book, pamphlet, newspaper, or other work, shall contain observations having a tendency to weaken the friendship towards the British Government of native princes, chiefs, or states, in dependence upon or alliance with it.

The above conditions apply equally to original matter, and to matter copied from other publications.

A copy of every book, pamphlet, newspaper, or other work published in the town of Calcutta, is to be immediately forwarded to the commissioner of police.

By order of the Right Hon. the Governor-General in Council.

CECIL BEADON.
Secretary to the Government of India

THE FIRST FRUITS OF THE ACT.

No. 298.

From the SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL, *to* J. C. MURRAY, Exq., *Printer and Publisher of the "Friend of India".*

Dated Fort William, 29th June, 1857

General

Sir,—I am directed to forward for your information the accompanying copy of a letter No. 1202, dated 29th June, 1857, from the Secretary to the Government of India in the Home Department relative to an article which appeared in your paper of the 25th instant.

I have the honour to be, Sir,
Your most obedient Servant,
A. R. YOUNG.
Secretary to the Government of Bengal

No. 1202.

From CECIL BEADON, Esq., *Secretary to the Government of India, to* A. R. YOUNG, Esq., *Secretary to the Government of Bengal.*

Dated the 29th June, 1857.

Home Department

Sir,—The attention of the Governor-General in Council has been given to the first leading article headed, "The Centenary of Plassey", which appeared in the *Friend of India* of the 25th inst., and especially to

the two last paragraphs, which in the judgment of His Lordship in Council are fraught with mischief and calculated at the present time to spread disaffection towards the British Government, both among its native subjects and among dependent and allied states.

The article in question infringes every one of the three conditions upon which licenses to keep a printing-press are now to be granted. It tends to excite disaffection towards the British Government amongst great masses of the people; it tends to create alarm and suspicion among the Hindoo and Mahomedan population of intended interference by Government with their religion, and it tends to weaken the frindship towards the Government of native princes, chiefs, and states, in dependence upon and alliance with it.

Whatever the intentions of the writer may have been, the tendency of the article is as above described, and the publication of such remarks, even if innocent and admissible in ordinary times, is now, under the critical circumstances which rendered the passing of Act No. 15 of 1857 necessary, most dangerous not only to the Government, but to the lives of all Europeans in the Provinces not living under the close protection of British bayonets.

I am directed, therefore, to request that with the permission of the Lieutenant-Governor the views of the Government of India may be communicated to the Publisher of the *Friend of India*, and that he may be warned that the repetition of remarks of this dangerous nature will be followed by the withdrawal of his license.

The Governor-General in Council has no intention of interfering with the fair discussion of public measures, but he cannot now permit the circulationin India of writings so framed as to excite popular disaffection.

I have, &c.,

(Signed) C. BEADON,
Secretary to the Government of India

Council Chamber, 29th June, 1857

(True Copy.)

A. R. YOUNG.
Secretary to the Government of Bengal

From the FRIEND OF INDIA, *June 25th.*

THE CENTENARY OF PLASSEY.

WE have glided into the second centenary of English rule in India, and Hindus and Mussulmans who study the mysteries of fate are well nigh in despair. The stars and scriptures told them that on Monday last we had completed our allotted term of mastership, when the strength which had hitherto been resistless the courage that never faltered, would pass away, and we should become in turn the easy prey of our vassals. The favour of the gods is not a perpetual gift, and though sire and son have witnessed

so often what must to them appear supernatural results. it was but reasonable to suppose that our store of miracles would be exhausted at last. We share with them the belief in hidden influences, only what they look upon as being natural and common place, is to us the domain of the marvellous. It is easy to understand how we gained power, and wealth, and glory, at the commencement of the cycle, but hard beyond measure to find out how we have lost all three at its close. When you can succeed in realising to the imagination the most foolish thing, the most improbable thing, and the most timid thing; and have blended all these together and multiplied them, and worked them into what is called a policy, you may perhaps get some clue to the solution of the problem, but all other modes of induction will hopelessly fail.

The qualities of mind which enable a man to accumulate wealth are often those which hinder him from making a proper use of it. It was necessary for the conquest of Hindustan that the East India Company should exist, for it is only the intense greediness of traders that could have own for us the sovereignty of the country. The enemies of the Company's rule assert that they made and broke treaties, planned and fought battles, for the mere love of gain. Whatever degree of interference with private or public rights was needful for the purpose of collecting revenue, received instant and eager sanction; whatever concerned merely the welfare of Asiatic souls, or the social interests of the great body of Englishmen and Hindus, was either coldly ignored or bitterly assailed. They imported for their own use the might of civilisation, but never cared to exhibit to the nations its beneficent features. Wealth embodied all the attributes of their good deity, to whom was rendered with cheerful devotion the homage of heart and brain. The evil principle was symbolised by power, and where they failed to vanquish they fell down and worshipped. Without a spark of patriotic feeling they set on the brow of England a gem of priceless value; without care for Christianity they paved the way for the overthrow of idolatry. Be it so. but the evil which they wrought has well nigh passed away; the good of which they have been the not unconscious instruments will go on multiplying for ever.

A hurdred years is but a small point in the lifetime of a nation. It may be a period of sowing or of reaping the harvest, of giant labours such as shall influence the destiny of remote generations, or of utter folding of the hands to sleep. We found India destitute of invention and enterprise; ignorant of liberty, and of the blessings of peace. We have placed her face to face with the forces of our civilisation, and have yet to see if there are no subtle invigorating influences that can be transmitted through her aged frame. We have given her liberty such as she has not enjoyed for centuries, and never save by brief and long interrupted snatches. The Hindu stands upon the same platform with the Englishman, shares equal privileges with him, and challenges for himself, as great a measure of the

protection and immunities accorded by the state. He has no politics enemies, and his grievances are all social. There is much to be remedied within, but without all, is quiet and secure. If he has a new part to play in the world's history, the stage is clear for him, and there is an audience ready to sympathise and applaud. Whatever he has in him of creative ability may find easy vent and ready acceptance. We have swept away the obstacles which stood in the path of intellect and courage, it rests only with Nature and himself, whether he achieves success or otherwise. A second Sevajee is happily impossible, but another Luther would find an easier task than that which was imposed upon the monk of Wittenberg. The inventor, the author, the man of science will meet ready welcome and sure reward. We spread out before the dormant Asiatic soul, all the mental treasures of the West, and feel only too happy in being allowed to distribute them.

It is a great crime in some instances to trample out a nationality; to strangle in infancy what might have grown up to be one of the fairest births of Time, but except in the case of the Sikhs, there, is no example of the kind to be alleged against our countrymen. The Mussulman power was effete long before the battle of Plassey, and such as Clive found the Mahomedans in the days of Surajah Dowlali, we encounter them in the time of the deposed king of Oude. Cruel, sensual, and intolerant, they are unfit to rule and unwilling to serve. Claiming to exercise sway as of Divine Right, and yet destitute of every gift with which Nature has endowed the races meant by destiny to dominate over the world, they fell by necessity under the power of a nation replete with energy and resolution, and loathe with all the bitterness of hate the infidels who have subdued them. They will never tolerate our gifts or forgive our supremacy. We may load them with blessings, but the reward will be curses. We stand between them and a fancied earthly paradise, and are not classed in their list of good angels.

The Mahrattas have none of the elements of greatness in their character, and speaking in the interests of the dusky millions, we do not regret Assye, Deeg, and Maharajpore; but it is otherwise with regard to the Sikhs, who had they flourished as we have seen them, two centuries back, or never come in contact with the might of England, would perhaps have uprooted the tenets of Hindu and Mussulman, and breathed a new spirit into the followers of Mohamed and Brahma. Humanity, however, will be content with their overthrow. The Bible is a better book than the Grunth, and Christianity is superior to the Khalsa. Regenerated Hinduism might have obtained a new lease of existence, but it would have gained nothing in morals, and effected but little for human happiness. Its sole gain would have been power and the example of universal destruction.

It may also be alleged against us that we have deposed the Kings, and ruined the nobles of India, but why should the world sigh over that result?

Monarchs who always took the wages, but seldom performed the work, of Government, and aristocrats who looked upon authority as a personal right, and have never been able to comprehend what is meant by the sovereignty of the people, are surely better out of the way. No Englishman in these days deplores the wars of the Roses, and would like to see the Cliffords and Warwicks restored again to life. France bears with calmness the loss of her old nobility; Europe at large makes steady contributions to the list of kings out of employment. Had princes and rajahs in Hindustan been worth conserving they would have retained their titles and power. The class speedily die out in the natural course of mortality, and it is not for the benefit of society that it should be renewed.

Array the the evil against the acknowledged good; weigh the broken pleadges, the ruined families, the impoverished ryots, the imperfect justice, against the missionary and the schoolmaster, the railway and the steam-engine, the abolition of Suttee, and the destruction of the Thugs, and declare in which scale the balance lies! For every anna that we have taken from the noble we have returned a rupee to the trader. We have saved more lives in peace than we have sacrificed in war. We have committed many blunders and crimes; wrought evil by premeditation and good by instinct, but when all is summed up, the award must be in our favour. And with the passing away of the present cloud, there will dawn a brighter day both for England and India. We shall strengthen at the same time our hold upon the soil and upon the hearts of the people.; tighten the bonds of conquest and of mutual interest. The land must be thrown open to the capital and enterprise of Europe; the ryot lifted by degrees out of his misery, and made to feel that he is a man if not a brother, and everwhere Heaven's gifts of climate and circumstance made the most of. The first centuary of Plassey was ushered in by the revolt of the native army, the second may be celebrated in Bengal by a respected Government, and a Christian population.

The *Madras Athenaeum* was "warned" and the *Bangalore Herald supressed,* for reprinting the above article before the Government notification appeared. The latter journal was afterwards allowed to reappear on condition of the editor being dismissed.

No. 329.

From the SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL *to* J. C. Murray, Esq., *printer and publisher of the "Friend of India", Serampore..*

General

Sir,—I am directed by the Lieutenant-Governor of Bengal to forward for your information the accompanying copy of a letter from the Secretary to the Government of India, in the Home Department, No. 54, dated the

3rd inst., relative to the article which appeared in your paper of the 2nd idem, headed "The First Warning."

I have the honour to be, Sir,
Your most obedient Servant,
A. R. YOUNG.
Secretary to the Government of India.

Dated Fort William, 3rd July, 1857

No. 54.

From C. BEADON, Esq., *Secretary to the Government of India, to* A. R. YOUNG, Esq., *Secretary to the Government of Bengal.*

Home Department

Sir,—In consequence of the article which appeared in the *Friend of India* of the 2nd inst., headed "The First Warning," the Governor in Council would have felt it necessary to direct the revocation of the license which had been granted to the publisher of that paper. His lordship in Council only abstains from adopting this course in consequence of an assurance he has received on the part of the representatives of the absent proprietor, that the newspaper shall, during his absence, be carried on so as to avoid all couse of complaint, and within the terms of the license.

The Governor-General in Council desires me to request that this may be conveyed to the publisher.

I have the honour to be, Sir,
Your most obedient Servant,
CECIL BEADON,
Secretary to the Government of India.

Council Chamber, the 3rd of July, 1857

From the FRIEND OF INDIA, *July 2nd..*

THE FIRST WARNING

Lord Canning has done us the honour to select the *Friend of India* as the subject of his first experiment under the Gagging Act. We are, it appears, an *imperium in imperio*, studied by the native masses, watched with anxiety by Moollah and Brahmin, stronger than the East India Company. We have only to insert a couple of paragraphs, and the rebellion broadens and deepens. The chief priests amongst Hindoos and Mussulmans tremble for the safety of their creeds, and allied and dependent princes, looking upon their treaties as so much weste paper, turn a deaf ear to Governor-General and Resident, and prepare to array their fighting men against the Sirkar Bahadoor, Say that our power is complimented at the expense of our patriotism. Yet what journalist could resist the temptations that beset us? What would even the *Times* give to possess such vast means of doing mischief? Who else is their of all the

tribe of editors, that has authority over a hundred and fifty millions of souls, that stirs equally the ryot in his hut, the devotee in his temple, and the ruler on his throne? A few words and we can subvert the allegiance of the people. The servants of the sacred shrines, dear to all races of Asiatics, seek their destiny in these columns; wherever the English soldier is absent, we hold the lives of Europeans in the hollow of our hand. So says Lord Canning, and we may not question the truth of his statement. Here is the Governor-General's opinion of an article in our last which we dare only refer to, except for home purpose.

* * * *

If we were on our defence in a trial for libel, we should be allowed to reprint the obnoxious paragraphs, but it will be sufficient to say that they occurred in the course of a rapid sketch of the results of a century of British occupation, and formed the best apology that we were able to make for the East India Company. We had to speak of a policy which has swept away morarchies and aristocracies in all parts of the land, as if they cumbered the earth; a policy which bore its first fruits in 1757, and its latest just a century afterwards. We advocated it, as has been the habit of this journal for a score of years, and however prepared for hostilities on the part of the present administration, we certainly never expected that the grounds of indictment would be found in the first leading article of our last issue. We have no objection to recant one of the obnoxious paragraphs, but must stand by the hope expressed in the other. We will say, if required, that from Suraj ool Dowlah to the King of Oude, the princes of India have been vilely dealt with, but we cannot forego the pleasing vision that in 1957, a Christian people may live happly under a respected Government.

But what is the use of beating about the bush, and assailing us under false pretences? Our fault is no question of orthodoxy, or want of sympathy with mockery Kings. It is, that whilst doing our utmost to keep eyes and ears closed to much that we were bound to receive, we were forced to denounce the vacillation of purpose, the utter want of organisation, and the wretched crop of results, which have given such a melancholy character to the proceedings of Government since the commencement of the mutinies. We had to choose between the utterance of unpleasant censures or a dishonest silence. Between saying what in the interest of England it were traitorous to suppress, and what it was for the reputation of a few high officials should never have been written. The time had come when it was needful to take a side, and without hesitation we fell into the imperial ranks. As it turns out, we had not counted the cost, but such as our course seemed to entail we were willing to defray. ... the score of public support we have no martyrdom to boast of, having gained a hundred and eleven subscribers since the 1st May, after allowing for all the deaths and withdrawals.

We venture to say that there in not a man in Calcutta, or elsewhere, who will put upon the excepted paragraphs the construction which Lord Canning has chosen to fix on them, or who will adopt any other conclusion than the palpable one, that it is thought more desirable to gag the *Friend of India* at once, than to waste time in finding a sufficient reason for the act. But we submit to his Lordship the following matter for consideration. The people of all classes, who are said to read and study this journal, know as a matter of course that it has always been the advocate of annexation and of Christianity. But all of a sudden it is silent upon those important topics. The shrewd Asiatic need not ask the reason, for he can see for himself that the Government has interfered to prevent their discussion, but he will carry the inquiry a step further, and ask what it is that has prompted the interference. If they intend to reverse the policy of their predecessors, why let them reinstate Kings, restore Jagheers, and deport Missionaries. But if they are not repentant, but merely timid; if they do not abjure the acts, but only shrink from enduring the consequences, why what a dullard he must be, to be duped into inaction by such shallow artifices! Either we advocate what is always injurious to the body politic, or it is the poorest cowardice to coerce us into silence. No man, Mussulman or Hindu, if he has half the brains that the Governor-General allots to him, can fall to recognise in the open tabooing of subjects hitherto left free for comment, the newest and most damning proof of the mistrust which the Government entertains of the allies and native subjects of the Crown of England, and the Honourable Company.

Three weeks since Lord Canning had the sympathy and support of every man of European birth or parentage. To-day there are not half a dozen who would lift up their hands in his favour. But why should be do for himself, what he has failed to do for England? Why care to retain personal when public reputation is irrecoverably gone? When the goodly ship goes down with all her rich freight on board, it is better that the captain should exhibit no anxiety to save his cabin furniture.

And now a word as to the policy of this journal—say for the next three months. We have not intention of testing the ability of Government to put down a rebellion at Serampore. To-day is the last of our independence, and we will not write under compulsion, or invite, for interests which have been created by industry and intellect exerted for a quarter of a century, the ruin which it will now cost Lord Canning nothing to decree. We accept the situation that is made for us, and take leave of political discussion—till the times mend.

THE DACCA NEWS "WARNED."

No. 393.

To A. Forbes, Esq.

Dacca

Sir,—I have the honour to forward herewith a copy of a letter, No. 456, dated the 7th instant, from the Secretary to the Government of Bengal referring to an article published inthe *Dacca News* of the 1st instant, and headed "The Tenure of Land by Europeans in India."

I have the honour to be, Sir,
Your most obedient Servant,
C. F. Carnac,
Officiating Magistrate

Foujdary Adawlut, Zillah of Dacca
The 10th August, 1857

No. 456.

From the Secretary to the Government of Bengal *to the* Magistrate of Dacca.

Dated Fort William, the 7th August, 1857.

General

Sir,—The attention of the Lieutenant-Governor of Bengal has been given to an article in the *Dacca News* of the 1st instant, headed "The Tenure of Land by Europeans in India," which, in his Honour's judgment, manifestly infringes the conditions on which the license to the publisher of that paper was granted. I am directed, therefore, to request that you will warn the publisher that a second infringement of these conditions on his part will compel the Lieutenant-Government to withdraw his license.

I have, &c.,
(Signed) A. R. Young,
Secretary to the Government of Bengal.

(Copy.)

C. F. Carnac,
Officiating Magistrate.

From the Dacca News, *August 1st.*

THE TENURE OF LAND BY EUROPEANS IN INDIA.

Mr. Ewart has moved in the House of Commons for a return showing on what tenure land is allowed to be held by Europeans in India, whether in fee simple, for life or lives, or for years; and if so for what terms of years, and whether renewable on payment of fines or otherwise.—As we may expect that the Court of Directors, which first denied that it had

received a copy of Mr. Halliday's police minute, and then furnished, as the police minute, a minute which was not the police minute—as we may expect that Court to give a false return to Mr. Ewart's motion, we shall give a return of our own, as to the terms on which Europeans hold land in the perpetually settled districts. But before doing so we would remind our readers, that the Perpetual Settlement is a bargain entered into between Lord Cornwallis, on the part of the British Government, and for which he staked the good faith of England—not of the Court of Directors, of the "Company Bahadoor," for that is nil—and the land-holders, that as long as they paid a certain rent to the Government, they were to enjoy in perpetuity the possession of the lands contained within certain boundaries specified in the books compiled at the time of the settlement by the various Collectors, and which had been sanctioned with regard to each particular district by the Government. This is the theory of the Perpetual Settlement. The practice has been very different, especially with regard to Europeans, who about twenty years ago were allowed to hold land on the same terms as natives. The practice is as follows :—

A European is allowed to hold lands as long as these lands do not excite the concupiscence of the Government of the East India Company, administered by a Civil Service, whose salaries depend upon the amount of revenue that can be realised, *per fas aut nefas*, from the country.—Example : Mr. George Lamb, a gentleman well known for many years in the Dacca district, purchased an estate called Chur Doopooriah, paying, under the aforesaid Perpetual Settlement, a rent to Government of two hundred and ninety odd rupees. By the encroachment of a large and rapid river, the whole of this estate was carried away. Mr. Lamb, aware, from long observation of the oscillations of the rivers in Bengal, that the land would re-form, continued to fulfil his part of the bargain entered into with the Government—that is, to pay the revenue during eight or ten years, while the estate in question formed a part of the bed of the river, which is from four to five miles broad. He of course expected that, when the river retired, he would be allowed to take possession of the lands re-formed. There is a law, however, in connection with the Settlement, which states, that if an island is thrown up in the channel of a navigable river, it becomes the property of the Government; and this law is perfectly just, for it presupposes the drying up of the river—a circumstance of frequent occurrence in Bengal—and the formation of land on a spot which had not been included in the Perpetual Settlement, as there was no land existing there at that time. There is also another law very useful in preventing disputes, which is to the effect, that lands which are formed by the retiring of rivers from one bank and their encroachment on the other, are to belong to the proprietor on to whose lands they form. In the case before us, when the river was retiring, the Government in the first place took possession of the dry land which first appeared, as an island; and then of

all the lands successively emerging from the river. as formations on to the island the property of Government. Mr. Lamb, up to the present date, hoping against hope that justice may be done to him, pays the Perpetual Settlement Revenue for Churr Doopooriah, though he is not in possession, nor has had for the last twelve or fourteen years a single bigah of land belonging to this estate. The Collector receives the rents without a murmur, though we believe the Commissioner of Revenue has ordered him to strike the very name of the estate off the books. The case, moreover, was five times decided in Mr. Lamb's favour by the Judges of the Company itself; and, only gained by them when they had succeeded, after a number of years in packing a bench. We would refer the curious with regard to this case to our supplement of the 19th of July, 1857.

A European is allowed to hold lands as long as these lands do not excite the concupiscence of any native; for, if any native should desire to possess them, they will certainly be decreed to him by the Judges of the East Indian Company, who find none so impracticable as European owners of land. Example : Mr. G Lamb purchased at a sale for arrears of Revenue, from the East India Company, an Estate said to comprise within its boundaries certain specified villages. A native about the same time purchased an adjoining estate.Mr. Lamb, from information gathered from the Collector's books. brought a suit for certain villages in the possession of the native, as belonging to his estate. The native brought a cross suit claiming villages of the value of Rs. 1,500 a year against Mr. Lamb. Mr. Lamb lost his suit. The suit of the native was decreed in his favour, giving him village producing Rs. 6,000 a year, instead of Rs. 1,500, which he had sued for. The document on which the Sudder decreed against Mr. Lamb was forgery. It purported to be one of the original papers of the Decenial Settlement (on which the Perpetual Settlement was founded) of Zillah Tipperah. Mr. Lamb proved that the whole of that settlement was made in Arcot Rupees, while this paper was summed up in Sicca Rupees. The Sudder Dewany Adalut, the Supreme Civil Court of Bengal, decided that the word "Sicca" meant "current," and might apply to any rupee. They themselves were, at the time of this decision, receiving their salaries in Sicca Rupees of more than $6\frac{1}{2}$ per cent, greater value than the Company's rupee, and would have repudiated with scorn the proposition of being paid in the Company's rupees.

A European is to be prevented from becoming the possessor of land at any cost whatever.—Example : While the last mentioned case was passing through the courts, Mr. Lamb's opponent got deeply into debt, and his creditors put up his estate for sale. Mr. Lamb was willing to purchase peace at any price, and therefore bid a large sum for this estate, which comprised the disputed lands. Mr. Lamb purchased the estate in his wife's name, in order to avoid, as he thought all disputes. Mrs. Lamb, on becoming purchaser, sued for possession of the estate, but was nonsuited

in the superior court the Sudder one the grouped that she, as an English or Scotch woman, could not sue in her own name, but must be joined by her husband. We have got the best authority for saying that this is not good English law; but supposing it were, there was nothing on the record to show that Mrs. Lamb was either an English or a Scotch woman. She might have been of any other race, among many of whom—the Armenians, Mussulmanees and Hindoos, for instance—married women may possess property apart from their husbands. The objection was not taken in any of the pleadings, and we submit that the appellate court had no power to take it up—but there was an Englishman or Scotchman, well known in their private capacities to the judges on the bench to be such, to be prevented from possessing lands. The case was therefore nonsuited. On this decision being given Mr. Lamb brought a fresh suit, joining himself with his wife. The same-objection would not serve now; but Mr. Lamb lost his case in the appellate court on account of an alleged irregularity in the sale, an irregularity for which no one was responsible but the court which sold, and therefore Mr. Lamb was punished—be it observed, that Mr. Lamb gained every one of these cases in the courts of first instance. It was only when they were appealed to the Sudder, when they were taken down to Calcutta, where Civil Servicisim is rampant, where the necessity of keeping the interloper from gaining a footing in the land is fully appreciated—it was only in Calcutta that he lost them. We could adduce many a case where the same gentleman, who, unfortunately for himself, had a desire to become a landed proprietor, and to improve his lands by introducing the culture of various crops unknown in this part of India, had decree after decree given against him in the Civil Courts; many of them so absurd, that they gave rise to fresh lawsuits in the vain endeavour to have them executed. We could bring instances of parallel cases, where natives only were concerned, where decrees were given in their favour, which would have made Mr. Lamb's fortune had the same law—we shall not desecrate the name of justice by applying it to any of the dicta of the Sudder—been dealt out to him. But the interloper was there. He was to be put down. If he had not been put down, he might have had the presumption to grow cotton; and by supplying Liverpool with that material, to have made the English people take as great an interest in, and become as well acquainted with, the affairs of India as they are with those of America.

However long a European may have been possession of land, every means to the endangering of the salvation of the judges themselves is to be used to oust him from possession, and to give it to a native, with which class the Civil Service believed, till lately perhaps they could do anything. This is an error on the part of the Court Service. Since Reg. II. of 1819, and the Public Works Loan, the native believes that there are no depths so low to which the Company Bahadoor cannot descend, so long as they

have power on their side. The Englishman confesses that the Government is "awful dodgy" but cannot beleive that the men whom he knows well, and knows to be tolerably honest in their private transactions, could be guilty of the rascalities which have been committed under the aforesaid regulation. But we are running away from our subject, which is that, however long a European may have possessed land he must be ousted somehow or another.—Example : Messrs. Lamb and Wise, two gentleman settled in the Dacca district, learned from their attorneys that an estate was to be sold by the Collector, at the instance of the owner's creditors. They agreed to bid for the estate, and to purchase it together. The estate was put up for sale, and they bought it. Though many objections were raised to the manner in which the sale was made, &c. by the late proprietors, at the time of and immediately after the sale, they were all overruled by the courts. Messrs. Lamb and Wise were put in possession, and continued in possession for eleven years eleven months and odd-days. If the twelve years had passed, their title would have been secured by prescription. But before the twelve years had expired, a suit was brought to upset the sale, on the ground that the law prescribed that notice of sale sould be affixed in ten places. It had been so in nine, but there was a doubt with regard to the tenth, whether the place where it was affixed was situated on certain lands or not The case came on in the local courts and was decided in favour of Messrs. Lamb and Wise. It was appealed to the Sudder, where it was, as a matter of course, decided against the interlopers by two judges out of three—decided, we have almost the highest legal authority in India for saying, against the common-sense interpretation of the law. But what can be expected from judges who have absolutely no legal training, and who consider the interloper as a being who has no right to be in India!

Such are a few—we solemnly affirm a very few—of the instances we can give to Mr. Ewart of the tenures on which lands are allowed to be held by Europeans in India. Were we to unfold a half—one third, of what we know, we should be scorned as unjust traducers of the Civil Service of the Honourable the East India Company. Fortunately we can prove every word we have said from the decisions of the Sudder Dewany Adalut—Lord Canning must have wondered why his proclamations were so little believed. It is long—as the evidence of every independent man will prove—since the assertions of the Government of this country have been believed by its subjects.

THE BENGAL HURKARU SUPPRESSED.

The *Hurkaru*, the oldest journal in India, was suppressed on the 18th of September, on account of the appearance, in different issues of the paper, of the following three articles :—

From the BENGAL HURKARU.

"The steamer which arrived on the 10th instant brought us the *Times* of 6th August, which contains a leader beginning 'There are some acts of atrocity so abominable that they will not even bear narration,' and ending, 'Let it be known that England will support the officers who may be charged with the duty of suppressing this mutiny, and of inflicting condign punishment upon the bloodthirsty mutineers, however terrible may be the measures which they may see fit to adopt.'

"The article in the *Times* from which the above quotations are made sould be republished by Government, circulated to all civil and military authorities in substitution of Cecil Beadon's proclamation, dated 31st July, published in your paper of 2nd instant; and the article from the *Times* should be read also to every regiment in India, instead of Sir James Outram's order about the 10th regiment. Little did the *Times* know of Indian officials when he wrote 'Nothing more injudicious than Mr. Colvin's proclamation can be conceived.'

"What will the Thunderer say when he sees Cecil Beadon's proclamation, and Sir James Outram's order from Dinapore? and that the latter has since that order been reappointed commissioner in Oude, besides commanding the Dinapore and Cawnpore divisons, thus superseding Havelock and Neill? The latter is unquestionably the man who ought to have been appointed chief commissioner in Oude, for the energy he has displayed from the time he confined the railway people here to the time he hanged the Brahmins at Cawnpore.

"The imbeciles are not all out of England yet, however; the board of control has Vernon Smith and the war department has Lord Panmure. Witness the answer of the latter, through his organ in the Commons, to Colonel North's question on the 5th August, 'Why it was that the Government were only sending 140 men to reinforce the artillery in India, when the number required to bring that force up to its war complement was 223?' Answer by Sir John Ramsden, 'vide *Times* of 6th August' :—

" 'Sir J. Ramsden said that the artillery force was put under orders for India, the same as the other troops, in compliance with a requisition of the East India Company, and the total force of artillery which they had asked for would be made up by the particular number which had been sent' (hear! hear!)

"That is, the artillery force was rendered inefficient before its departure for India, by reducing it even under the war complement required in Europe, that certain figures sent in by the East India Company might correspond with other figures in the estimates prepared at the war department!

"With such a specimen of the way things are conducted in that department, can any one be surprised that we meet with disasters, from the ruinous effects of which to the nation nothing saves us but the devoted courage of our soldiers and sailors?—yet these are the men whose feelings are being trifled with by old women in India.

"The cavalry horses in the Crimea were starved because Sir Charles Trevelyan, at his desk in London, thought he could there form a more correct estimate of the forage required than the commissary-general on the spot could do—and now we are to have the artillery sent out in an inefficient state because Vernon Smith and *the chair* think that the war complement, which experienced artillery officers have laid down as necessary in Europe, is too large for a fine climate like India, where they no doubt suppose ready-made artillery men grow in the Rose Gardens!"

From the BENGAL HURKARU

THE FRIEND OF HINDOSTAN AND THE STATE-GRINDER

AFTER GEORGE CANNING

(The F. of H. represented by the Chairman of the Court of Directors, and the S. G. by a noble lord.)

F. of H.

Needy state-grinder, whither are you going?
You're quite gone astray, your wheel is out of order.
There is a row blowing up—your actions are all rotten,
so are your speeches!

Weary State-grinder, little do those rascals
Who with their howlings hunt down all their rulers
Think what hard work 'tis, crying all day, "Red tape,
Red tape for ever!"

Tell me, State-grinder, how came you in this plight?
Did the supreme court lay its hands upon you?
Was it the chief, or editor of journal,
Or some low planter?

Was it some judge, for acting without Queen's law?
Rancorous chief, for keeping down his service?
Editor vicious, crying up the people,
Brought you in this fix?

(Have you not read the minute of Sir Thomas?)
Sparks of resentment smoulder in my headpiece,
Ready to blow up as soon as you have told your
Most wretched story.

S. G.

Story ! God bless you ! I have none to tell, sir,
Only one day, I, talking in the council,
Gagged the free press, and then made that J. P. Grant
Gen'ral Obstructor !

Campbell was sent out, for to take me into
His command, they took me before the Commons,
Public opinion then put me in the
Pound as a donkey !

I should be glad to drink your honour's health in
A small pension, if you will kindly give it;
But for my part I never more will meddle
With Hindoostan, sir;

F or H.

I give thee pension ! I will see thee d—d first—
Man whom we trusted, like so many asses;—
Taunted and jeered at, made no end of fun of
Impotent failure !

(*Kicks the State-grinder, overturns his wheel, and exit in a transport of official agony and lost hopes*)

From the BENGAL HURKARU.

All India is eagerly watching the progress of public opinion at home, the eventual declaration of which will decide the future policy of the Government. Our rulers are being put upon their trial, while a jury composed of many millions are weighing the evidence, preparatory to laying their heads together for the considerationof the verdict.

There are many good, honest, simple people in Calcutta, who are both surprised and disappointed that popular indignation has not boiled up to a higher pitch. They are astounded at finding that Lord Canning has not been already ordered home in irons, and that Mr. Beadon has not been sentenced to be tarred and feathered and ridden upon a rail, previously to being placed in some extremely uncovenanted appointment, under a native superior. We are very far from saying that these proceedings would not be appropriate in the cases in question, but we would say to our enthusiastic friends :—My dear sirs, you are too impatient. All in good time. Public opinion is not a mere dramatic performance, got up to make the overland papers exciting, for your pleasure. It is a real earnest process, which takes time for its development, which must be expected to "drag"—in dramatic language,—now and then; which will not always produce starling effects at the most desirable moment; which keeps one waiting a long time between the acts, with nothing but "apples and oranges and a bill of the play" to fall back upon;—but for all that there

can be no rational doubt that the conclusion will find virtue triumphant, and that the villains of the piece will meet with their just doom. But,—we would add to our enthusiastic friends,—what more can you expect ? What more would you have at the present moment? Have you not heard through private letters that the windows of the directors' town houses are by no means safe, and that any one of the honourable court showing himself at Bath or Cheltenham, or elsewhere where Anglo-Indianism most abides, would meet with a reception from the mob compared to which that of Marshal Haynau by the brewers was courteous and flattering? Do you not know that the Duke of Cambridge was heard to say that he should soon have the Indian army under his command? Are you not aware that the mode of communication adopted by the government of the crown towards the government of the court, as home, has already become savage and dictatorial to an extent that six months ago would have aroused Leadenskull-street to a fury of resistance? Do you not see that the comparative satisfaction which has been manifested at the mode of meeting the mutinies has been founded upon want of knowledge of the real facts of the case? Is it not obvious to the stupidest fellow among you, that where our rulers have been praised, they have been praised for doing what they have left undone, or for not doing that which they have done most thoroughly and completely? If her Majesty's Government approve eventually of the conduct of these gentlemen they will have to do so, not merely at the cost of their consisency—which they will care no more about than any other government—but at the cost of their offices, which they will not be disposed to part with for such an incidental consideration as Mr. Halliday, or such a matter of detail as Mr. Beadon—to say nothing of one or two others of the same stamp, and a higher functionary whom they have dragged into the same boat.

We ask the sanguine persons to whom we have addressed the above, what more they would have for the present? To us it seems that Parliament and the public at home have made immense progress towards a proper view of the question. In the House of Lords, the Earl of Ellenborough, and the Marquis of Clanricarde have addressed themselves to it with profound knowledge and sagacity. In the Commons, Mr. Disraeli has made one of the most masterly and statesmanlike speeches that he has ever made in his life; and the question has been met by all who took part in its discussion with a high appreciation of its importance. The press has done its work well, and has been steadily drifting in the right direction, to a position which the *Times* has taken up with a decision and energy which sufficiently show that the voice of the country is on the same side. Throughout the discussion, both in parliament and the press, it is to the honour of all engaged in it, that no party feeling has been shown, however much may have been felt in some quarters. The utmost consideration has been manifested for the local government under the difficult

circumstances in which they were placed, and no signs of any personal prejudice have been made apparent. Even the *Press* and the *Examiner*, the two most systematic opponents of the company's government, have handled Lord Canning as tenderly as if he was a baby, and have let Messrs. Beadon and Halliday alone with a magnanimity which is almost beyond belief, and suggests the suspicion that those usually well-informed journals have not yet acquainted themselves with the fact that there are such persons in existence.

In the meantime, the accused are awaiting the verdict which is to decide their official fate, in a highly characteristic manner, such as we see described in the London police reports as "treating the charged with the utmost levity," or "evincing a hardened indifference to the situation in which they were placed, that was painful to behold." But among these it is only just to remark that the most elevated personage stands out in honourable relief. His grand calmness under the ordeal is comparable to nothing but the demeanour of Miss Madeleine Smith, in similarly trying circumstances, which elicited the wonder and admiration of the rapt people of Glasgow. Let us hope that the omen is a good one, and, for the sake of an illustrious name, and as good intentions as have ever paved India or any other place, that the charges which have been brought against the individual in question will be "not proven.".

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

সিপাহি বিদ্রোহের দিনে প্রবাসী বাঙালি

স্বর্গীয় কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮২০ অব্দে এলাহাবাদ কীডগঞ্জ নামক পল্লীতে পিতা হরবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। হরবল্লভ বাবু এখানে পার্মিটের কাজ করিতেন। তাহার আয় বড় বেশি ছিল না; কিন্তু তখন সস্তা গণ্ডার দিনে তাহাতেই তিনি দোল দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন। তাহার বাড়ি সমূর্তি দুর্গা ও কালী পুজা হইত। তিনি চরিত্রবান, ভক্ত এবং সাত্বিক প্রকৃতির শক্তি উপাসক ছিলেন। তাহার মৃত্যু অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যখন হরবল্লভ বাবুকে তাহার আদেশ মত গঙ্গাযাত্রা করাইবার জন্য দ্বারাগঞ্জের ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি পুত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং জলে নামিয়া যান এবং আবক্ষ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া জপ করিতে থাকেন। এদিকে পুত্রগণকে আদেশ দেন যে যতক্ষণ তিনি জপ করিবেন কেহ তাহাকে স্পর্শ বা বিরক্ত না করে। তিনি যখন অবসন্ন হইয়া হেলিয়া পড়িবেন তখন তাহাকে ধরিয়া অন্তর্জলির জন্য ঘাটের নিকট লইয়া যাইবে। জপ করিবার কালে হঠাৎ জোরে ঢেউ লাগিয়া তিনি একটু হেলিয়া পড়েন। অমনি পুত্রগণ শশব্যস্ত তাহাকে ধরিতে উদ্যত হন। হরবল্লভ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলেন, "এখন ঘরে যাও, এখনও সময় হয় নাই।" এই বলিয়া পুনরায় ইষ্টমন্ত্র জপে রত হন। ক্ষণকাল পরে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রগণকে ইঙ্গিতে জানাইয়া চিরনিদ্রামগ্ন হন। ঘাটের উপর হইতে এবং নিম্নে বহু নরনারী অবাক হইয়া এই ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিল। কয়েকজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালী হোকে এয়সা মরতা হায়!" পূর্বেই একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তিমান পুরুষ বলিয়া হরবল্লভ বাবুর প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি ছিল। পরে এই ঘটনা রাষ্ট্র হইলে তাহার বংশধরগণের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। কালীচরণ বাবু পিতার সাত্বিক ভাব এবং ধর্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে ইংরাজী শিক্ষার প্রচার হইলেও পারস্য ও উর্দু শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। সুতরাং কিছু বাংলা শিক্ষা করিয়া এলাহাবাদ দরিয়াবাদের প্রসিদ্ধ মৌলবিদিগের নিকট তিনি পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ঐ ভাষায় পরে তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত ইংরাজী দপ্তরে উচ্চ বেতনের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং ইংরাজী অবশ্য শিক্ষণীয় ও আদালতে প্রাদেশিক ভাষার প্রচলনের হুকুম জারি হইল, তখন তিনি এলাহাবাদের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বর্ষ। অধিক বয়সে ইংরাজী আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা প্রভাবে ছয় বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইলেন। অধ্যক্ষ লুইস সাহেব তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই কালীবাবুকে তিনি এক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে দিয়া দিলেন এবং তাহার প্রিয় ছাত্রের কৃতকার্যতা দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে "আউধ রয়াল অবজার ভেটরির" (Oudh Royal Observatory) অধ্যক্ষ কর্নেল উইলকক্স কয়েকজন কর্মচারীর জন্য লুইস সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। লুইস সাহেব মাধবদাস বাবাজীর সহিত অন্য যে দুই তিনজন ছাত্রকে পাঠান কালীচরণ বাবু তাহাদের একজন। সাহেব তিন জনের সহিতই স্বতন্ত্র পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন। কালীবাবুকে বিদায় দিবার কালে লুইস সাহেব চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। উইলকক্স সাহেবের নিকট তাহার কোন কষ্ট না হয় সে জন্য তিনি পরিচয় পত্রে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিলেন, এবং বলিয়া দিলেন "যদি সহস্র লোক একদিকে থাকে আর কালীবাবু অন্যদিকে, তাহা হইলে কালীবাবুর কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহা আমার বহু পরীক্ষার ফল জানিবেন।

লখ্‌নউ পৌঁছিয়া কালীবাবু স্বীয় আত্মীয় বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাত করিলেন। ভৈরববাবু লখ্‌নউর রেসিডেন্সীর ট্রেজারের ছিলেন। এই পদ তখন বর্তমান খাজাঞ্চীর মত ছিল না। আর্থিক দায়িত্ব ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের অধিকারে মীমাংসা ও বিচারেরও ক্ষমতা ছিল। উহা তখন যেমন সম্মানের তদ্রূপ আরামের পদ ছিল। বিশেষতঃ ভৈরববাবুর তথায় ভয়ানক প্রতাপ ছিল। তাহার নামে সে সময় লখ্‌নউ-এ বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। নবাব মহলেও তাহার যথেষ্ট প্রতিপতি ছিল। কালীচরণবাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্মস্থানে গমন করিলেন। তাহার কার্যকলাপ এবং আচরণ দেখিয়া উইলকক্স সাহেব তাহার পক্ষপাতী হইলেন। ১৮৪০ অব্দে কর্ণেল মহোদয়কে গবর্নমেন্টের অনুজ্ঞাক্রমে কাবুল যাত্রা করিতে হয়। যাইবার সময় সরকারি কর্ম ব্যতীত তাহার কয়েকটি সাংসারিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার ভার কালীবাবুর উপর ন্যস্ত করিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া সমুদয় কার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়া কালীবাবুর উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন এবং অতঃপর তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন।

কয়েকজন কুমন্ত্রী নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁকে একবার পরামর্শ দেন যে "মানমন্দিরের বাড়িতে রাজপ্রাসাদ করিলেই ঠিক হয়; কারণ গ্রীষ্মের সময় ইহার 'তহখানা' (মৃতিকাভ্যন্তরস্থ গৃহ) অতিশয় মনোরম ও সুশীতল হয়" ইত্যাদি। এই সূত্রে নবাব একদা মানমন্দিব পরিদর্শন করিতে আইলেন। কালীবাবু তখন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নবাব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে অনেক বুঝাইয়া দিলেন। নবাব তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পূর্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ণেল উইলকক্স কিছুদিন পরে পরলোকগমন করেন। তাহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র তখন না থাকায় মানমন্দিরের দপ্তর উঠিয়া যায়; এবং কালীবাবু তাহার আত্মীয় ভৈরববাবুর নিম্নস্থ নায়েব খাজাঞ্জির পদ প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ভৈরববাবুর মৃত্যু হইলে কালীবাবুই তাহার পদে স্থায়ী হন। জেনারেল আউটরাম তখন রেসিডেন্ট ছিলেন। কালীবাবু তাহাব একজন কর্মচারী হইলেও তাহাকে বন্ধুভাবে দেখিতেন।

রেসিডেন্সী এবং নবাব সরকারের কাজকর্ম বেশ শান্তিতে নির্বাহ হইতেছিল। এমন সময় বড়লাট লর্ড ডালহাউসি জেনারেল আউটরামের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং প্রদেশের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। তাহার কারণ "জীবকুলের অভিসম্পাতস্বরূপ নবাবের শাসনকার্যের আর অধিক

প্রশ্রয় দিলে ঈশ্বর ও মানবের নিকট ইংরাজ গবর্নমেণ্টকে অপরাধী হইতে হইবে।" নবাব সরকারের উচ্ছেদসাধন করিয়া জেনারেল বাহাদুর ইংলণ্ড গমন করিলে স্যর হেনরি লরেন্স পঞ্জাব হইতে আসিয়া অযোধ্যার আউটরামের ন্যায় কালীবাবুকে বন্ধুভাবে দেখিতে লাগিলেন। নূতন শাসন প্রণালী বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর কিছুকাল বেশ শান্তিতে কাটিতেছিল। ভাণ্ডার ধনধানে পূর্ণ এবং কর্মচারীরা সকলেই বেশ সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ বিদ্রোহের বাতাস বহিতে লাগিল। পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিল। কালীচরণবাবু কার্যোপলক্ষে ছুটি লইয়া এলাহাবাদ গমন করিলেন। অবসরকালের ভিতরে তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন; এমন সময় চীফ কমিশনর সাহেবের পত্র পাইলেন যে, অবিলম্বে তাহাকে লখ্‌নউ যাইতে হইবে, কারণ যদিও স্পষ্ট কোন লক্ষ্মণ দেখা দেয় নাই তথাপি বিদ্রোহের পূর্বসূচনা হইতেছে। পত্রপ্রাপ্তি মাত্র কালীবাবু লখ্‌নউ যাত্রা করিলেন এবং পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ২৮ জুন শান্তির শেষ দিবস। খাজানা বেশ নিরাপদে ছিল। কালীবাবুর তত্ত্বাবধানে নগদ ও নোটে এক কোটির উপর টাকা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সিন্দুকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার তোড়া ও পঁচিশ হাজার টাকার পয়সা ছিল। এই সমুদয় বেলীগার্ডের দুর্গে সুরক্ষিত ছিল।

২৯ জুন প্রাতে যখন কালীচরণবাবু মফঃস্বলের আমদানি তিন লক্ষ টাকা গুনিয়া রাখিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিল। অগ্রসর হইয়া দেখেন চীফ কমিশনর স্যর হেনীর লরেন্স সঙ্গে কর্ণেল। উভয়েই ভয় বিহ্বল। তৎক্ষণাৎ তিনজনে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন। এদিকে তারে খবর আসিল যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে খাজানা রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কালীবাবু বলিলেন তিনি সমস্ত আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। সাহেব বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন যে "দেশী রক্ষী সৈন্য স্থলে য়ুরোপীয় রক্ষী সৈন্য স্থানে স্থানে বসাইতে হইবে।" কালীবাবু তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তাহা কোন মতেই হইবে না। কারণ সিপাহিগণ তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিয়া সমস্ত খাজানা লুঠ করিবে, এবং আমাদের হত্যা করিবে।" অবশেষে তাহারই পরামর্শ গৃহীত হইল। কালীবাবু খাজানা রাখিবার স্থান ও গারদ (প্রহরী) নির্দেশ করিয়া দিলেন। তদবধি লরেন্স মহোদয় প্রায় সকল শাসন সংক্রান্ত গুরুতর ও গুপ্ত বিষয়ে কালীবাবুর পরামর্শ লইয়া কার্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথায় বিদ্রোহের আতঙ্ক ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। শেষে কালীবাবুর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি খাজানা "মচ্ছিভবনের" দুর্গে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিলেন। তখন পাঁচ লক্ষ টাকা পঞ্চাশ জন ইংরাজ রক্ষীর সহিত পাঠান স্থির হইল। পরদিন প্রাতে গারদ আসিয়া পৌঁছিল এবং টাকার বাক্স সকল বাহির করা হইল। কিন্তু উহাতে সিপাহিগণের সন্দেহ বাড়িল এবং সকলেই ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ ও গোলযোগ করিতে লাগিল। মূর্খ সিপাহিগণ স্থির করিল যাহাতে টাকা কোন মতে হাতের বাহির না হইয়া যায় অবিলম্বে তাহার উপায় করিতে হইবে। একজন গিয়া প্রথমেই কালীবাবুর মাথা উড়াইয়া দিয়া কাজ হাসিল হইয়াছে জানাইবার জন্য বন্দুকের আওয়াজ করিবে আর অমনি কতক সিপাহি ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ করিবে। অবশিষ্টেরা সেই অবকাশে খাজানা লুঠ করিবে। পাঁচ লক্ষ টাকা মচ্ছিভবন অভিমুখে চলিয়া গেল; অমনি একজন সিপাহি বন্দুকে গুলি ভরিয়া সদর গেট

দিয়া তাহার হাবিলদারের সঙ্গে কালীচরণবাবুকে হত্যা করিতে দৌড়িল। কালীবাবুকে দেখিয়াই হাবিলদার জ্ঞানশূন্য হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল "সব টাকা তুমি কেন পাঠাইয়া দিলে?" যে ব্যক্তি চিরকাল তাহাকে প্রভুর সমান দিয়াছে এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছে হঠাৎ তাহার এই বিকট মূর্তি দেখিয়া কালীবাবুর আর বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু তিনি ধীরগম্ভীর ভাবে হাবিলদারের দুই হস্ত ধরিয়া সাদরে এক চেয়ারে বসাইয়া শান্তভাবে বলিলেন, "দেখ, খাজানা এখনও ভর্তি আছে। ভয়ের কোন কারণ নাই। যে টাকা লওয়া হইল তাহা হইতে "গারদের তলব" দেওয়া যাইবে। টাকা ত আমার ঘরে যাইতেছে না? যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তোমরা টাকার সঙ্গে গিয়া সত্য কিনা জানিতে পার।" বলা বাহুল্য কালীবাবুর এই অমায়িক ও নির্ভীক ব্যবহারে এবং তাহার শান্ত চিত্ততা দেখিয়া উন্মত্ত নরঘাতক শান্ত, সন্তুষ্ট এবং পরে লজ্জিত হইয়া তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল; এবং হিন্দু হইয়া বিনা কারণে যে ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই মহাঘাতক হইতে রক্ষা করায় কালীবাবুকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু কালীবাবু তাহাতে নিস্তার পাইলেন না। প্রতি মুহূর্তে সিপাহিদিগের সন্দেহ ও অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিতে বসিল। ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় একসময় বিদ্রোহের বহ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সিপাহিদের দৃঢ় ধারণা যে বাঙালিরাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সর্বাপেক্ষা রাজভক্ত প্রজা এবং পরামর্শদাতা; এজন্য তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে একজন বাঙালির মস্তক যে আনিতে পরিবে তাহাকে ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কালীবাবুর উপর তাহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক আক্রোশ ছিল; কারণ তাহারই কৌশলক্রমে খাজানা লুণ্ঠন রহিত হয়। সুতরাং তাহার মস্তকের জন্য বিদ্রোহীরা পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

কালীচরণবাবু যে গবর্নমেণ্ট ট্রেজারার একথা লখনউ এর ছোট বড় সকলেই জানিত। সুতরাং তিনি অগত্যা অন্ধকার রজনীতে গৃহত্যাগ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুড়িখানা বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখেন; কিন্তু একার্য এত গোপন ছিল যে তিনি এবং বাড়িওয়ালা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি তাহার বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। পথে বাহির হইতে না হইতে শহরের অনেক ভদ্র লোক তাহাকে চিনিতে পারিয়া কোথায় চলিয়াছেন কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে প্রায় ২৬ জন তাহার সঙ্গ লইলেন। ইহারাই তাহার উদ্দেশ্য সাধনার প্রতিবন্ধক ভাবিয়া হঠাৎ এক দেবালয় দেখিয়া তন্মধ্যে পূজার ছলে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে সঙ্গিগণ বহুদূর গিয়াছিলেন। তিনি বহুক্ষণ তথায় লুকাইয়া থাকিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধ করত গৃহে ফিরিলেন। কোন প্রকারে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোর হইবামাত্র ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। বিদ্রোহী দল বেলীগার্ডের দুর্গ বেষ্টন করিল এবং দশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিল। পাঁচশত সৈন্য পাহারা দিতেছিল এবং তাহাদের অবসর (relief) দিবার জন্য নূতন সৈন্যদল আসিলেই তাহারা নগর লুণ্ঠনে যাইতেছিল। দুর্গের ভিতর অল্পই সৈন্য ছিল; কিন্তু স্যর হেনরি লরেন্স এমন দক্ষতার সহিত সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন যে তাহারা অতগুলি বিদ্রোহী সেনার গতিরোধ করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। তিনি দুইজন ইংরাজ সৈন্য, আট জন গোলন্দাজ ও ৫০টি কামান বিদ্রোহীদিগের আড্ডাগুলির সমুখে রাখিয়া দিলেন। দুইজন গোলন্দাজ সৈন্যযুগলের বামদিকে অন্য দুইজন দক্ষিণে রহিল। অবশিষ্ট চারিজন কামানে কেবল বারুদ ভরিতে থাকিল। দক্ষিণের লোকেরা সৈন্যদের হস্তে বারুদভরা বন্দুক দিতে লাগিল আর সৈন্যগণ স্বীয় বামদিকের লোকদিগকে খালি বন্দুক ফিরাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে হাতাহাতি করিয়া কাজ চলিল। মুহূর্তের জন্য কেহ বিশ্রাম লইল না। অধিকন্তু নূতন দিক আক্রমণ করিলে তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে পারিবে বলিয়া ৩২ জন সৈন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।। দুর্গের বাহিরের সিপাহিরা তাহাতে মনে করিল ভিতরে অসংখ্য সৈন্য আছে। এদিকে যুদ্ধ যতক্ষণ চলিতেছিল অবসরপ্রাপ্ত বিদ্রোহিগণ নগর লুণ্ঠন করিতেছিল। তাহারা অতঃপর ষড়যন্ত্র করে যে ধনকুবের নবাব মোনসীনউদ্দৌলার প্রাসাদ লুঠ করিতে হইবে। ইনি মৃত মহমদ আলীসাহের জামাতা এবং নবাব ওয়াজিদ আলিসাহের পিতা আমজদ্ আলি সাহের ভগ্নীপতি। সহরের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অবশ্য তাহার প্রাসাদে অগাধ ধন ছিল। কথিত আছে, যে তিনি নিজেই তাহার পরিমাণ জানিতেন না। লুঠকারীরা তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিলে তিনি ১২ লক্ষ টাকার নোট লইয়া অশ্বারোহণে সহরের বাহির হইলেন এবং একজন বিশ্বস্ত প্রজার গৃহে আশ্রয় লইলেন। তাহার সমস্ত ধন দৌলত পাষণ্ডদের হা৷তে পড়িল। তাহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লুঠ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তথাপি শেষ করিতে পারিল না। ইহার পর তাহারা লখনউ সহর লুঠ করিতে মনস্থ করিল। নগরবাসিগণ পলায়ন কবিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। কেহ গৃহ, কেহ নগর ত্যাগ করিল; কোন কোন ধনী ফকিরের ভেক ধরিল; অপরে নির্জন স্থানে আশ্রয় লইল। শোণিত পিপাসু কুক্কুর দলের ন্যায় দস্যুদল রানিকাটরা প্রবেশ করিয়া কালীবাবুর ভদ্রাসন আক্রমণ করিতে দৌড়িল। রানিকাটরায় তাহারা নিষ্ঠুবতার পরাকাষ্ঠা৷ দেখাইল। প্রথমে তথাকার প্রসিদ্ধ ধনী পণ্ডিত ইন্দ্রনারায়ণ কাশ্মীরী নামে তথাকার মহামান্য ব্রাহ্মণের গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া বাটির ভৃত্যগণকে হত্যা করিল। পণ্ডিতজী প্রমাদ গুনিয়া সমস্ত বিষয় এমনকি স্ত্রীর গহনাগুলি পর্যন্ত বিদ্রোহীদিগের হস্ত অর্পন করিয়া সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করিলেন এবং জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া নিকটস্থ এক মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাহার শেষ জীবন এই দেবালয়েই অতিবাহিত হইল। বিদ্রোহীরা তাহার দুই লক্ষ টাকার বিষয় লুঠ করিয়া পল্লীবাসীদিগকে বলিল, "আমাদের শত্রুতা কেবল ইংরাজ সরকারের কর্মচারীদিগের সহিত। কে কে পাড়ায় আছে, তাহাদের নাম বলিয়া দাও, নতুবা মহল্লার ফাটক বন্ধ করিয়া আগুন লাগাইয়া দিব। ভয়ে সকলে কালীবাবুর নাম করিল এবং তাহার বাড়ি দেখাইয়া দিল। বাড়ির স্ত্রীরা কালীবাবুকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বলিল। কিন্তু তিনি বলিলেন "তাহারা ডাকাইত হইলে লড়াই চলিত। তাহারা যখন গবর্নমেণ্টের চাকর এবং ভয়ানক বিরুদ্ধ, তখন লড়াই করিতে গেলে ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হইবে। লুঠ করিতে পাইলে তাহারা প্রাণে মারিবে না। ক্ষমতা থাকিলে লড়িতে দোষ নাই, না পারিলে সন্ধি করিতে লজ্জা নাই।" এই বলিয়া তিনি ছাদের উপর হইতে বিদ্রোহীদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কেবল ধন চায় অথবা প্রাণও লইতে চায়। তাহারা বলিল কেবল লুঠ করিবে। তিনি তাহাদের শপথ করাইয়া বাড়ির ফাটক

খুলিয়া দিতে বলিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা কালীবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু তারিণীচরণকে কালীবাবু ভ্রমে আক্রমণ করিল এবং সঙ্গীনের মুখ দিয়া তাহাকে দেওয়ালে ঠাসিয়া ধরিয়া গুপ্ত ধনের সন্ধান লইতে লাগিল। তারিণীবাবু অতি সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন। তাহারা ভাবিয়াছিল তিনিই কালীবাবু। কালীবাবু তখন সামান্য একখানি ধুতি পরিয়া এবং অঙ্গে "ভভূতি" (ভস্ম) মাখিয়া ছিলেন। ভ্রাতার এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া দ্রুতপদে গিয়া তাহার গলদেশ হইতে সঙ্গীন সরাইয়া বলিলেন, "এই চাবির গোছা লও, আমি কালীবাবুর পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য; কোথায় কি আছে সব জানি।" দুর্বৃত্তগণ তাহাকে কালীবাবুর ব্রাহ্মণ ভৃত্য ভাবিয়া তাহার কথামত সমস্ত গৃহ লুট করিয়া দুই লক্ষ টাকার ধনরত্ন লইয়া গেল। সেদিনে ফাঁড়া এইরূপেই কাটিয়া যায়। লুটের অব্যবহিত পরেই একজন আসিয়া স্বীয় অংশ চাহিল। কালীবাবু বলিলেন, বিদ্রোহীগণ সব লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "আমি এত মেহনৎ করিলাম, শেষে ফাঁকে পড়িব না কি?" কালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কিসে তাহার এত মেহনত হইল। নির্লজ্জ বলিল "যতক্ষণ লুট হইতেছিল আমি পাহারা দিতেছিলাম।" কালীবাবু ঈষৎ হাসিয়া এক বস্তা বস্ত্র আনিয়া তাহার সমুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, ইহাই অবশিষ্ট ছিল। সে তাহাকে একখানি কাপড় দিয়া সমস্ত লইয়া গেল। সর্বস্বান্ত হইয়া কালীবাবু ভাবিলেন, লুণ্ঠনের ত কিছু রহিল না সুতরাং আর ভয় নাই।

বাড়িতে মাত্র ভাণ্ডার শস্যপূর্ণ ও কূপ জলপূর্ণ ছিল। তিনি ভাবিলেন দুই বৎসর বাড়ির ভিতর নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিবেন। এমন সময় আর একদল সিপাহি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তাহারা কালীবাবুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কালীবাবু স্বয়ং তাহাদের বলিলেন, "আমরা সব কালীবাবুর লোক এখানে আছি, ইতিপূর্বে যাহা কিছু ছিল লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বাসন ও আহারীয় মাত্র পড়িয়া আছে।" সিপাহিরা ভয়ানক ভয় দেখাইল ও কটূক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু কালীবাবু ধীর ও নম্রভাবে তাহাদের বুঝাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তথায় তাহার এক প্রতিবেশী "রঙ্গসাজ" (রথ ব্যবসায়ী) আসিয়া পড়িল। কালীবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "তুমি ত জান সব লুঠ হইয়া গিয়াছে, এখন আর দিবার মতন কিছুই নাই?" সে কোথায় তাহার সমর্থন করিবে, না, সেও দলে মিশিয়া গেল এবং ভয় দেখাইতে লাগিল। জীবন আর নিরাপদ নয় দেখিয়া রঙ্গসাজকে দ্বারে রাখিয়া তিনি ভিতরে গেলেন। অমনি দেখেন প্রাঙ্গণে একটি অঙ্গুরী ও তিনটি টাকা পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সে দুটি উঠাইয়া লইলেন। পথ খরচের সংস্থান হইয়া গেল।

কালীবাবু জীর্ণ মলিনবাস পরিধান করিয়া বাটির খিড়কীদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তীরন্দাজ রক্ষিগণ প্রভুর অবস্থা দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। যে মন্দিরে পণ্ডিত ইন্দ্রনারায়ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন তিনিও তথায় প্রবেশ করিলেন। কনিষ্ঠ তারিণীবাবু নগর ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি কানপুরের পথ ধরিলেন। কিন্তু কিয়ৎদূর গিয়াই ক্লান্ত ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পদযুগল ফুলিয়া উঠিল এবং একস্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি অগত্যা পথিপার্শ্বে এক দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এক জমিদার সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন।

তিনি কালীচরণবাবুর পুরাতন বন্ধু, তাহার বাড়ি কুমায়ুন। তিনি তারিণীবাবুর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া তাহাকে যত্নপূর্বক আপনার গৃহে লইয়া গেলেন এবং তারিণীবাবুকে জনৈক প্রজার জিমায় রাখিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, দেবসেবার জন্য একজন নূতন পূজারী আসিয়াছেন। এইরূপে তারিণীবাবু, আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণবাবু সাধুর বেশ ধরিয়া থাকিলে জীবন নিরাপদ দেখিয়া জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীগণ তাহার মস্তকের জন্য ২৫্ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিল। সুতরাং লখনউ-এ থাকা আর উচিত নয় দেখিয়া তিনি উহা ত্যাগ করিয়া বৈশওয়ার জেলায় তুলসীরাম মিশ্রের বাড়ি লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে কালীবাবুকে সন্ধান করিবার জন্য তাহার বিশ্বাসী ভৃত্যগণ চতুর্দিকে দৌড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন রাম সহায়, মন্দিরে গিয়া কালীবাবুর দেখা পাইল। অতঃপর সেই বিশ্বাসী ভৃত্য নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিয়া কালীবাবুর পরিবারবর্গকে এক প্রতিবাসী বেনের বাড়িতে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে লালা কিশোরী লাল নামে একজন স্ট্যাম্প বিক্রেতা কালীবাবুর সন্ধান পাইয়া মন্দিরে গিয়া পৌঁছিল। তথায় তখন অন্য কেহ না থাকায় কালীবাবু তাহাকে মন্দিরের ভিতর ডাকিয়া তাহার হস্তে পূর্বোক্ত অঙ্গুরী ও তিনটি টাকা দিয়া তাহাকে সাআদতগঞ্জে পণ্ডিত ভবানীদীনের বাড়ি পৌঁছাইযা দিতে অনুরোধ করিলেন, তাহাই হইল। পণ্ডিতজী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি বাড়ি পূর্ব হইতেই তাহার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কালীবাবুকে অতঃপর পণ্ডিতের মত বেশ মালা ও পত্রা ধারণ করিয়া বাগানের বারদোয়ারীতে থাকিতে পরামর্শ দিলেন। কালীবাবু তাহাই করিলেন। পণ্ডিত ভাবনীদীন মালিকে বলিয়া দিলেন তাহার বন্ধু নূতন পণ্ডিতজী তথায় থাকিবেন। পণ্ডিতজী প্রত্যহ তাহার আহার যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কালীবাবু পণ্ডিতজী ও কিশোরীলালকে সেই উদ্যানে তাহার পরিবারবর্গকে আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কারণ তথায় স্থান যথেষ্ট ছিল এবং উদ্যানরক্ষক বিছানা পত্রাদিও সমস্ত যোগাইল। এদিকে মালি তাহাকে পূজারী পণ্ডিত করিয়া ধর্মোপদেশ বা কথকতা করিতে ধরিয়া বসিল। ক্ষুধার কষ্ট, মানসিক উদ্বেগ এবং সকল প্রকার প্রশান্তিতে থাকিলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ না পায় এজন্য কালীবাবু প্রফুল্ল মুখে নানা ধর্মকথা আরম্ভ করিলেন। এমন সময় ভয়ানক গোলমাল শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ ছাদের উপর উঠিয়া ব্যাপার কি দেখিতে গেলেন। পার্শ্বের বাড়ির একজন ধনী ব্যক্তি সেই গোলমাল শুনিয়া ছাদে উঠিয়াছিল। কিন্তু কিসের গোলমাল ঠিক করিতে না পারিয়া ভাবিল উদ্যানের মালি ও পণ্ডিত বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা অমনি উদ্যান লক্ষ করিয়া গুলি করিতে লাগিল। বহু কষ্টে তবে কালীবাবু সিঁড়ি দিয়া নামিতে পারেন। যাহা হউক, ভয়ানক উদ্বেগের সহিত তিনি রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পণ্ডিত ভবানীদীন আসিয়া বলিলেন, উদ্যানের পার্শ্বেই এক শীতলার মন্দির আছে, তথায় মেলা বসে ও বহু লোক সমমত হইয়া গণ্ডগোল করে। এ অবস্থায় পরিবারদিগকে এখানে আনয়ন করা নিরাপদ নহে। অতঃপর আবস্তিজীর বাড়ি তাহাদের আনিয়া রাখা হইল। আবস্তিজীর বাড়ি মন্দিরের খুব নিকটে ছিল। সুতরাং কালীবাবু প্রত্যহ একবার তাহাদের দেখিয়া আসিতেন। কিন্তু এ ভাবেও বেশি দিন চলিল না। সে উদ্যানেও বিপদের আশঙ্কা হইল। বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ ত দূরের

কথা, গ্রামবাসীদিগের হস্তে লাঞ্ছনাভোগ ও অত্যাচারের ভয় ছিল। তখন সাআদতগঞ্জে পল্লীস্থ "মীর সাহেবের উদ্যান" নামে ত্রিশ বিঘাব্যাপী এক উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করাই স্থির হইল। ঐ উদ্যানের নিকট দিয়া তিদিয়া নদী প্রবাহিত। নদীর উভয় পার্শ্বে শর বন এবং তাহার এক মাইলের মধ্যে ইক্ষুক্ষেত। কালীবাবু স্থির করিলেন যদি শত্রুগণ আক্রমন করে তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষেত্র এবং শর বনের ভিতর লুকাইয়া জীবন রক্ষা করিবেন। তিনি ঐ উদ্যানে রহিলেন এবং তথা হইতে মধ্যে মধ্যে স্বীয় পরিজনদিগকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন এইরূপ দেখিতে আসিলে সকলে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে উদ্যান ত্যাগ করিতে অনুনয় করিলেন। তাহারা শুনিয়াছিলেন যে নিকটস্থ একজন ছত্রী তাহার প্রাণসংহার করিতে মনস্থ করিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মহত্যার ভয়ে একজন মুসলমানকে ঐ কার্যে নিযুক্ত কবিয়াছে। কারণ তাহার মস্তক দেখাইতে পারিলে সে বহু মূল্য খেলাৎ ও পঞ্চসহস্র টাকা পুরস্কার পাইবে। এই ভীষণ বার্তা শ্রবণ করিয়া তিনি হৃদয়ের আবেগে রাত্রি দুইটার সময় একাকী সেই ছত্রীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া নির্ভয় চিতে বলিলেন, "কেন তুমি মুসলমানের দ্বারা আমার রক্তপাত করিয়া দেহ কলঙ্কিত করিতে মনস্থ করিয়াছ। আমি উপস্থিত হইয়াছি; আমারই নাম কালীচরণ। তরবারী লইয়া এখনি আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনোমত খেলাৎ ও অর্থ পুরস্কার লও। আর একজনকে কেন তোমার সুনামের ভাগী করিবে? তুমি স্বয়ং পুরুষত্ব দেখাইয়া খ্যাতি লাভ করিতেছ না কেন? আমি ত নিজের জীবন তোমায় দিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। তবে আর 'বিলম্ব কি?' এমন হৃদয় বিদারক ভাবে তিনি ঐ সকল কথা বলিলেন যে, তৎসমুদয় ছত্রীর মর্মস্থলে গিয়া বিদ্ধ করিল এবং সে অশ্রুপাত করিতে করিতে ক্ষমাভিক্ষা করিল এবং বলিল, "আপনি পূর্ববৎ আপনার সন্তানদিগকে দেখিয়া আসিবেন। আপনার প্রাণের আর কোন ভয় নাই।" কালীবাবু জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। উদ্যানরক্ষক টীকারাম ও তাহার ভ্রাতা খুব উচ্চমনা ছিল। তাহারা প্রাণপণ যত্নে কালীবাবুকে রক্ষা করিয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় তথায় এক লোহিত বর্ণের কুক্কুর আসিয়া জুটিল। সে সেই বাগানে থাকিয়া কালীবাবুকে আগুলিয়া বেড়াইত। এমন কি পোকা মাকড়টি পর্যন্ত তাহার নিকট থাকিতে দিত না। যে যাহা কিছু ভুক্তাবিশিষ্ট পাইত তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কালীবাবুর নিকট পড়িয়া থাকিত। এই অনাহূত জন্তুটি কালীবাবুর নির্জনবাসের প্রধান সহায় হইয়াছিল।

ক্রমে বর্ষা নামিল। পথঘাট জলাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। তিনি পণ্ডিতজীকে বিদ্রোহীদিগের গতিবিধি এবং প্রজাকুলের অবস্থা এবং গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে কিনা সন্ধান লইয়া আসিতে বলিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এলাহাবাদকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া লইয়াছেন। তিনি তখন স্বীয় জন্মস্থান, বৃদ্ধ পিতা এবং আত্মীয় স্বজনকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এদিকে সেই ভয়ানক স্থানে আর অধিককাল বাস করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না। অতঃপর সেই দিন সন্ধ্যায় পরিবারবর্গকে দেখিতে গেলেন। এখানে দেখেন তাহাদের বিপদের এক শেষ। শ্যামাচরণবাবুর স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করিয়াছেন। যাহার বাড়িতে তাহারা রহিয়াছেন সেই গোবিন্দপ্রসাদ আবস্তির পিতার বিসূচিকায় দেহত্যাগ হইয়াছে। কলেরা ও বাত সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে।

আবস্তীজীর বৃদ্ধা জননী কালীবাবুর পরিবারেরা আসাতেই তাহার পুত্রের মৃত্যু হইল বলিয়া গোল বাধাইলেন এবং আরও বিপদের আশঙ্কা করিয়া শীঘ্র স্থানান্তরে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু এক পক্ষকাল পরে বিসূচিকায় প্রাণ হারাইলেন। গোবিন্দপ্রসাদের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। কালীবাবু তাহাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তাহার ধারণা দূর হইল না। কালীবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং তারিণীবাবুর এক কন্যা ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কালীবাবুর পরিবারের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখিলেন সেই বৃদ্ধা বলিতেছেন "এখনও তোমরা বাড়ি ছাড়িবে কি না? না ছাড়িলে যাহারা তাহাদেরও সকলকে লইব।" বাড়ি ছাড়াই শেষে স্থির হইল এবং ভ্রাতৃগণের সন্ধান লওয়া হইল। যখন প্রথমে বিদ্রোহ দেখা দেয় কালীবাবু তাহার দুইজন বিশ্বাসী ভৃত্য (পুরী ও দীক্ষিতজীকে) এলাহাবাদে পিতার নিকট পাঠান। তাহাদের সঙ্গে একটি বংশদণ্ড দেন; তন্মধ্যে ১০০ টাকার হুণ্ডী ছিল। ভৃত্যদ্বয় এলাহাবাদের নিকট পৌঁছিয়া দেখিল নদীর উভয় তীর ইংরাজ কর্তৃক সুরক্ষিত। কাহারও গমনাগমনের হুকুম নাই। তাহারা অগত্যা লখনউ ফিরিয়া আসিল; কিন্তু পূর্ব বাসস্থানে প্রভুর সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। কারণ কালীবাবু তখন আবস্তীজীর বাড়ির নিকটস্থ উদ্যানে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বহু অন্বেষণের পর তাহার দেখা পাইয়া সমস্ত নিবেদন করিল। দীক্ষিতজী তৎপরে শ্যামচরণবাবুর সন্ধানে প্রেরিত হইল। দৈবযোগে শ্যামাচরণবাবু তুলসীরাম মিশ্রের বাড়ি চলিয়া আসিয়া কালীবাবু যে উদ্যানে ছিলেন তাহারই এক প্রান্তে গুপ্তভাবে বাস করিতে ছিলেন। সুতরাং তাহাদের সাক্ষাৎ পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। বহু অনুসন্ধানের পর কুমায়ুনের পার্বত্য প্রদেশে তারিণীবাবুর সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে লোক গেল; কিন্তু তিনি প্রয়াগ তীর্থে গিয়া পিতা ও আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া আসিবেন বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ এবং অধ্যবসায় ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা মনে করিয়াছিল ভারতে ইংরাজ বংশ সমূলে নির্মূল হইয়াছে আর পুনরাক্রমণের কোন ভয় নাই। এই ভাবিয়া তাহারা নিতান্ত অসাবধান হইয়া পড়িল। হঠাৎ তখন এক জনরব উঠিল যে কর্ণেল আউটরাম বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া লখনউ-এর নিকটস্থ হইয়াছেন। সিপাহিরা কানপুরের সীমার বাহিরে তাহার গতিরোধ করিবার উদ্যোগ করিল এবং গঙ্গাপার হইয়া পূর্ব হইতে একদল সৈন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। এই উদ্দেশ্যে আট দল সৈন্য লখনউ হইতে কুচ করে। একদিন মাত্র তাহারা অগ্রসর হইয়াছে আর মুষলের ধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সুতরাং তাহারা অধিক অগ্রসর হইতে না পারিয়া চতুর্দিকের গ্রামগুলির মধ্যে আশ্রয় লইয়া ও গ্রাম লুঠ করিয়া রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। অপর পক্ষে ইংরাজ সেনাদল দৃঢ়সংকল্পের সহিত অটলভাবে এক আড্ডার পর আর এক আড্ডা করিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা হঠাৎ নগরদ্বারে আসিয়া এমন ভয়ানক গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল যে, চমকিত শত্রুগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যে যে অবস্থায় ছিল নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। টীকারাম মালি সেই সময় সহরের কোনস্থানে যাইতেছিল। সে পলায়নপর বিদ্রোহীদিগের দলভেদ করিয়া উদ্যানে আসিয়া পৌঁছিল এবং কালীবাবু নিকট সিপাহিদের অবস্থা জ্ঞাপন করিল। কালীবাবু দেখিলেন সহর ত্যাগ করিবার উহাই উপযুক্ত

সময়। তিনি পণ্ডিত ভবানীদীনকে তাহার পরিবার পরিজনগণকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে এবং তথায় তাহার জনৈক বন্ধুর গৃহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলিলেন এবং গোবিন্দপ্রসাদ আবস্তীকে তাহাদের নিরাপদে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা যথাসময়ে লখনউ হইতে ছয় মাইল দূরে মান্দা নামক গ্রামে পণ্ডিজতীর এক বন্ধুর বাড়িতে রাখিয়া আসিয়া আবস্তীজী কালীবাবুকে সংবাদ দিলেন। পরদিন কালীবাবু স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে ডুলিতে তুলিয়া দিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে চলিলেন। এলাহাবাদ পৌঁছিতে আর আট মাইল আছে এমন সময় জনৈক জমিদার সংবাদ আনিল যে, "নাজিম" সৈন্যসহ অন্দরে অবস্থান করিতেছেন। নাজিমের নাম শুনিয়া ডুলিবাহকগণ ডুলি ফেলিয়া পলায়ন করিল। কালীবাবু পথিমধ্যে মহাবিপদে পড়িলেন। অবশেষে অনতিদূরে পাণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গোঁসাইজীর সহিত পরামর্শ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে সে রাত্রি কাটাইলেন। কিন্তু সেখানেও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। একজন যোগী (স্থানীয় পাণ্ডা) দুইজন চেলার সঙ্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগীর হস্তে তরবারি ছিল এবং সে নেশায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। একজন পণ্ডিত কালীবাবুকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডাকে তাহার গুপ্ত কাহিনী সমস্ত বলিয়া দিল। তাহার মস্তকের জন্য যে পাঁচ হাজার টাকা প্রভৃতি পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল সে তাহা জানিত। কালীবাবু গোঁসাইজীকে এ সকল কথা বলিয়া দিলেন। অতঃপর গোঁসাইজী চারিজন সশস্ত্র ভীমকায় সেনা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গভীর রাত্রে দুর্বৃত্ত পাপীর দল কয়েকবার আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু কৌশলক্রমে এবং সারা রাত্রি জগদীশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে তাহার জমিদার বন্ধু কয়েকখানা ডুলি লইয়া আসিলে তিনি রওয়ানা হইলেন। এবং কয়েক মাইল আসিবার পর এলাহাবাদ দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি শহরের ধারে কয়েকজন দস্যু লুকাইয়া ছিল। এ স্থল দস্যুদিগের গুপ্তস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে যাত্রা কালীবাবু তাহার জমিদারবন্ধুর জন্য রক্ষা পাইলেন। দস্যুগণ জমিদারকে বিলক্ষণ চিনিত। তাহাকে দেখিয়াই তাহারা পলায়ন করিল। অবশেষে সকলে এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। কালীবাবু জমিদারকে মিষ্টান্ন ও কিছু অর্থ এবং ভুরি ভুরি ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিলেন। এখানে বলা যাইতে পারে যে, এই সকল জমিদার নামধারী কৃষক সর্দার বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন এবং সাহসী। ইহাদের অর্থ এবং লোকবল যথেষ্ট কিন্তু ইহাদের কথাবার্তা এবং বেশভূষা দেখিতে আমাদের দেশীয় জমিদার বর্গের দ্বারবান শ্রেণির লোক বলিয়াই মনে হয়।

গৃহে পৌঁছিয়া সকলে যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। কালীবাবুর বৃদ্ধ পিতা পরমানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। গৃহে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। এলাহাবাদ তখন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্য চতুর্দিকেই জয়ের পর জয়লাভ করিতে লাগিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ মাসে জেনারেল আউটরাম লখনউ-এর বেলীগার্ড দ্বিতীয়বার দখল করেন। তিনি ২৫২৫০৲ টাকার কেবল পয়সা কানপুরে খাজনা স্বরূপ পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং নগরের বাহিরে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি বহু বিদ্রোহী সেনাকে Loyalty Certificate দিয়া বশ করেন এবং অনেক ইউরোপীয় উচ্চ কর্মচারীকে এলাহাবাদ

পাঠাইয়া দেন। কালীবাবু এই সংবাদ পাইয়া তাহার উপরিতন কর্মচারী কাপ্তান মার্টিন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মার্টিন সাহেব কালীবাবুকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হন। তাহার কারণ বিদ্রোহীরা যখন কালীবাবুর মস্তকের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন, তখন তাহার বিশ্বাসী ভৃত্যগণ তাহার মৃত্যুসংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দেন। কেহ তাহাদিগের নিকট কালীবাবুর সংবাদ চাহিলে বা তাহার নাম মাত্র করিলে তাহারা তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিত। ইহাতে উভয়, বিদ্রোহী এবং রাজপুরুষগণ সকলেরই ধারণা ছিল যে, কালীবাবু আর নাই। তিনি কি প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইলেন জানিবার জন্য সাহেব বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। কালীবাবু বলিলেন বাঁচিয়াছি বটে কিন্তু মরিয়া বাঁচিয়াছি এবং মৃত্যু সংবাদ ইতিপূর্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। এই বলিয়া তিনি তাহার দুঃখের কাহিনী সমস্ত বর্ণন করেন। মার্টিন সাহেব বিদ্রোহের সময় প্রত্যহ রাত্রে মোগলের ছদ্মবেশে বেলীগার্ড দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সহরের সংবাদ লইয়া যাইতেন। সেই সূত্রে তিনি সংবাদ পান যে কালীবাবুর মৃত্যু হইয়াছে।

অতঃপর মার্টিন সাহেব কালীবাবুকে অবিলম্বে কানপুর গিয়া লখনউ হইতে প্রেরিত খাজানার ভার এবং বারমাসের বক্রী বেতন গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। তখন বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমিত হয় নাই এবং কালীবাবুও বহু কষ্টের পর গৃহে থাকিয়া শান্তিভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু রাজভক্ত কালীবাবু মার্টিন সাহেবের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি শীঘ্রই কানপুর যাত্রা করিলেন। পথে একদল গোরা সৈন্য তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিয়া গুলি করিতে উদ্যত হইল। তিনি বহু কষ্টে এবং বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়া তবে প্রাণ পাইলেন। এই সময় পথে ঘাটে যেখানে যেমন দেশীয়কে দেখিতে পাইয়াছে উন্মত গোরারা হয় গুলি করিয়া মারিয়াছে—না হয় গলে রজ্জু বা বস্ত্র বাঁধিয়া বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া দিয়া হত্যা করিয়াছে। যাহা হউক, সৈন্যগণ পরে কালীবাবুকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে নিরাপদে কানপুরে পৌঁছাইয়া দেয়।

তথায় গিয়াই কালীবাবু খাজানার ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে মার্টিন সাহেবও কানপুরের "চীফ ম্যাজিস্ট্রেট" হইয়া যান। পরে কালীবাবু ও তাহার ভ্রাতা মাসের বাকি বেতন লইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া আইসেন। তাহার পিতা মৃত্যুকাল পর্যন্ত আর পুত্রগণকে চক্ষের অন্তরাল করেন নাই।

কানপুর হইতে মার্টিন সাহেব লখনউ-এর কলেক্টর হইয়া যান এবং তথা হইতে পুনরায় কালীবাবুকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন। পত্রের মর্ম এই যে লখনউ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আসিয়াছে, আর কোন ভয় নাই, কেবল একজন সুদক্ষ কর্মচারী পাওয়া যাইতেছে না, অতএব কালীবাবু ও তাহার অপর দুই ভ্রাতা নিশ্চয়ই যেন কর্মস্থলে আসিয়া যোগ দেন। কিন্তু যদি অন্য ভ্রাতৃদ্বয় ঘটনাক্রমে কষ্ট করিতে অপারগ হন, তবে কালীবাবু যেন অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া অফিসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান। কালীবাবুর ভ্রাতারা অসম্মত হইতে তিনি একা লখনউ যাত্রা করেন। অফিসে গিয়া দেখেন সমস্তই নতুন করিয়া গড়িতে হইবে। সুতরাং তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া দপ্তর পুনর্গঠিত করিলেন এবং পূর্ববৎ তহশীলের কার্য সুনিয়ন্ত্রিত করিলেন। লখনউ-এ পুনরায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কালীবাবুর

সুযশ বিস্তারলাভ করিল এবং উচ্চ রাজপুরুষগণ তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ট্রেজারি অফিসারের তাহা অসহ্য হইল। কালীবাবু তাহাকে ঈর্ষাকুল দেখিয়া কর্মত্যাগ করিলেন। ইহা তাহার অল্প গৌরবের বিষয় নহে যে তিনি ৮১ লক্ষ টাকার হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া এক পক্ষকালের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কর্মস্থল হইতে নির্মল চরিত্র ও সুযশ লইয়া এবং পদস্থ রাজপুরুষদিগের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া অবসরগ্রহণ করিলেন। তিনি অবসরকালের কিয়দংশ এলাহাবাদে এবং কিছুকাল বারাণসীতে ক্ষেপন করিতেন। একবার তাহার পুরাতন বন্ধু হরপ্রসাদ সাহেব সীতারামী তাহাকে কাশীবাস করিতে পরামর্শ দেন এবং নিজেও কাশীতে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কাশীনরেশের নিকট কালীবাবুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন। তাহার নিকট কালীবাবুর পরিচয় পাইয়া কাশীনরেশ অতিশয় প্রীত হন এবং তাহাকে দেখিতে চাহেন। রায় বলদেব বক্স সে সময় কাশীনরেশের "মদারুল মোহীম" (ম্যানেজার) ছিলেন। কালীবাবুর সহিত তাহার সম্প্রীতি ছিল। তাহার এবং বাবু হরপ্রসাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কালীবাবু মহারাজার স্টেটে কোন কর্ম গ্রহণ করেন। তাহা হইলে বন্ধুত্রয় একত্রে বাস করিতে সমর্থ হন। এক দিবস তিনি কালীবাবুকে রামনগর প্রাসাদে লইয়া যান। মহারাজা রামনগর প্রাসাদে প্রায় থাকিতেন। তথায় রাত্রে তাহার সহিত কালীবাবুর সাক্ষাৎ হয়। কাশীনরেশ বলেন যে তিনি উভয় সাহী ও ইংরাজী কর্ম অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষনে তিনি তাহার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে চাহেন। তদুত্তরে কালীবাবু নিবেদন করিলেন যে, তাহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়ায় তিনি এক প্রকার অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। মহারাজা বলিলেন, আপনি বসিয়া থাকিলেও আপনার মুখের কথায় অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারে, তখন তিনি আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, বরং কাশীনরেশের সৌজন্যে সম্মানিত বোধ করিলেন। মহারাজা তাহাকে মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ (rob of honour) দিয়া কর্মে বরণ করিলেন। ধনাগার (জবাহীর খানা) ও অস্ত্রাগার তাহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাজা তাহার প্রতি চিরসদয় ছিলেন এবং তাহার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাহার পুত্র মহারাজা নারায়ণ সিংহ সাহেব কালীবাবুর পদ সমান এবং প্রতিপতি পূর্ববৎ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। তাহার ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। কিন্তু বার্ধক্যে তাহার বুদ্ধিবৃত্ত ও কর্মশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। গঙ্গার পূর্ব উপকূলে রামনগর প্রাসাদ অবস্থিত। কাশীতে তাহার পরিবারবর্গকে রাখিয়া তাহাকে রামনগরেই থাকিতে হইত। এলাহাবাদের বাড়িতে বড় একটা থাকিবার অবকাশ পাইতেন না। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই তাহার মনের ভাব হঠাৎ কিরূপ হইল, তিনি মহারাজার অনুমতি না লইয়াই হঠাৎ এলাহাবাদে আসিয়া পুরাতন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই কাশী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু আর তাহাকে কর্মস্থানে যাইতে হইল না। তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিলেন। ১৮৯৩ অব্দের ২৩ এপ্রিল রবিবার সূর্যোদয়কালে বাবু কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ইষ্টমন্তর জপ করিতে করিতে স্বর্গলাভ করিলেন। তিনি কয়েকটি অনন্য সাধারণ গুণ পাইয়া আসিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং শ্রমশীল ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কর্মশক্তি এবং ধর্ম প্রবৃত্তি বিকাশলাভ করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, পারস্য প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙালির

মুখে অনর্গল সাধু ভাষায় নির্ভুল উর্দু শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। পারস্য কাব্যগ্রন্থ হইতে অসংখ্য শ্লোক তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। হাফিজ সিরাজীর দিবান সর্বদা তিনি সঙ্গে রাখিতেন। উহা তাহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। সংস্কৃতেও তাহার বেশ অধিকার ছিল। তিনি প্রায়ই পণ্ডিতগণের সহবাসে শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মালাপে কালক্ষেপ করিতেন। তিনি স্বভাবতঃই দয়ার্দ্রচিত্ত ও বদান্য ছিলেন। তাহার পূর্বেই তাহার অনেক বাল্যবন্ধু এবং তাহার বিপদের সঙ্গী সুখরাম ব্রহ্মচারী, ভবানী দীন পণ্ডিত ও দীক্ষিতজী প্রভৃতির মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি আজীবন সকলের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করিয়াছেন।*

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সদানন্দবাবু ইংরাজী, পারস্য ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কাশীর রাজকুমারের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এবং পরে তহশীলদারের পদপ্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদে বাস করিতে থাকেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। কালীবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণবাবু ও কনিষ্ঠ তারিণীবাবু ইতিপূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে কাশীনরেশের তহশীলদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এলাহাবাদে অবস্থিত করিতেছেন।

** ১৮৯৭ অব্দে বারাণসী. জালালী যন্ত্রালয় হইতে সৈয়দ ওয়াজীর হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত "ইনকিলাবে রোজগার" নামক পুস্তক হইতে ও কালীবাবুর পুত্র জ্ঞানানন্দবাবু এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্য রাম ভট্টাচার্য এম. এ মহাশয়ের নিকট হইতে কালীচরণবাবু সম্বন্ধে যতদূ সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকাশিত হইল।*

—লেখক

জনৈক প্রবাসী

সিপাহি বিদ্রোহের সময় প্রবাসী বাঙালি

স্বৰ্গীয় রাসবিহারী ঘোষের পিতা বাবু গুরুনারায়ণ ঘোষ ১৮০৭ সালে কলেক্টর আমুটী সাহেবের সহিত এলাহাবাদে আইসেন (কলিকাতায় আমুটী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দোকান অদ্যাবধি আমুটী কোম্পানি নামে বিখ্যাত)। এ দেশে তখন ২/৪ জন মাত্র বাঙালি আসিয়াছিলেন। দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আসাকে তখনকার লোকে বিপজ্জনক মনে করিত। গুরুনারায়ণবাবু কলেক্টরি অফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাহার বর্তমান বাটী যেখানে সেই মূচীগঞ্জ নামক স্থান পূর্বে ধমন খাঁ নামক জনৈক মুসলমান জমিদারের এলাকাধীন ছিল। আমুটী সাহেব গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহাকে বারশত টাকা বার্ষিক পেন্‌স্‌ন দিয়া উক্ত স্থান ক্রয় করিয়া নিজ নামে ইহার নামকরণ করেন ও (এখনও ধুমন খাঁর বংশধরগণ উক্ত পেনসন ভোগ করিয়া থাকেন) গুরুনারায়ণ বাবুকে দান করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু গুরুনারায়ণ বাবু সমস্ত পল্লিটা না লইয়া প্রয়োজন মত অল্পস্থান লইয়া তাহাতে বাটী নির্মাণ করেন।

এই বাসভবনে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে রাসবিহারী বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা পাঁচ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিলেন। ইনি আপন পিতামাতার চতুর্থ পুত্র ছিলেন। দয়া, মায়া, পরোপকারিতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে লোকে মনুষ্যপদবাচ্য হয় রাসবিহারী বাবুর তৎসমুদয় যথেষ্ট ছিল। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি স্বগ্রামে (চবিশ পরগণার অন্তর্গত আনোয়ারপুরে) গিয়াছিলেন। বাল্যশিক্ষা তাহার বারাসতের স্কুলে হয়, দেশে যাইবার কিছুদিন পরে ইহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ১২ বৎসর বয়সে পুনরায় এলাহাবাদে আইসেন এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ভূর্তি হয়েন। তৎকালে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকদ্বয় বিখ্যাত ট্রেমস্ ও লিবিস্ সাহেব তাহার বুদ্ধিমত্তা দর্শনে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

বাল্যাবধি রাসবিহারী বাবুর ধর্মে বিশেষ অনুরাগ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু হইয়া জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত বাটী হইতে চলিয়া যান। তাহার ভ্রাতারা অনেক অনুসন্ধানে ত্রিবেণী তীর হইতে তাহাকে লইয়া আইসেন, অবিবাহিতের সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই, ফিরিয়া যাইয়া বিবাহ কর, পরে সন্তানাদি হইলে এ পথের পথিক হইতে পারিবে বলিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ও ভ্রাতৃগণের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছায় তিনি বাটী আসিলেন। তাহার সহোদরেরা অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারাবদ্ধ করিলেন।

তিনি যেরূপ নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন, দেখিতেও সেইরূপ সুন্দর সৌম্যমূর্তি ছিলেন, মিষ্টভাষী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাহার সহিত আলাপ করিয়া লোকে প্রীত হইত। ঘোড়ায় চড়িবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ ছিল। যেমনই দুষ্ট ঘোড়া হউক না কেন তাহার

শাসন মানিত। তিনি এরূপ বলশালী ছিলেন ও এরূপ ব্যায়াম কৌশল শিখিয়া ছিলেন যে তৎকালে কুস্তীতে তাহার সমকক্ষ প্রায় কেহ ছিল না। মিরজাপুরের বিখ্যাত পালোয়ান ওস্তাদ সর্‌নাম সিং এর নিকট তিনি কুস্তী শিখিয়াছিলেন। সর্‌নাম সিংও তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার শক্তির জন্য দুষ্ট বদমায়েস লোকেরাও তাহাকে ভয় এবং ভক্তি করিত। একবার তাহার কোন আত্মীয়ের বাটী ডাকাত পড়িয়াছিল। তিনি শুনিয়া কয়েকজন অনুচর সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "আমি থাকিতে তোরা এইরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিস?" তাহাকে দেখিয়া ডাকাতের দলপতি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "ক্ষমা করুন আমি জানিতাম না ইহা আপনার আত্মীয়ের বাটী"। এই বলিয়া মুহূর্ত মধ্যে সদলে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি সেতার ও তবলা বাজাইতে সুনিপুণ ছিলেন এবং সুগায়কও ছিলেন। তাহার গান শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইত।

স্কুল ছাড়িয়া এতদিনে তিনি কলেক্টর অফিসে কর্ম করিতেন। কর্মত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাটী বুন্দেলখণ্ডে যান। সিপাহিবিদ্রোহের সময় ইহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল ও তিনি কয়েকবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতে বাঁচিয়াছেন। সে সমস্ত বিস্তারিত লিখিতে গেলে একখানি সুন্দর সুবৃহৎ পুস্তক হয়। বাঁদার ৬০ নং পুর্বিয়া পল্টনে দেড়শত টাকা বেতনে তাহার কেরানিগিরি কর্ম হয়। সেই পল্টন আম্বালায় যায়। তিনিও সপরিবারে আম্বালয় গেলেন। সেই পল্টনের অদ্যক্ষ কমাণ্ডিং কর্ণেল ব্যাগেল ও আডজুটেণ্ট কাপ্তেন সেবিয়ার সাহেব ছিলেন। এই সাহেবদ্বয় বিশেষতঃ সেবিয়ার সাহেব তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আম্বালা হইতে সে পল্টন যখন দিল্লি যায় রাসবিহারী বাবু তখন নিজ শ্যালক বাবু কাম্‌তানাথ কীর্তির (তিনি ৬নং পল্টনে কর্ম করিতেন) নিকট স্ত্রী পুত্র রাখিয়া পল্টনের সঙ্গে দিল্লি গেলেন। কর্ণালে পৌঁছিলে সংবাদ আসিল "রোতকে সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। খাজানা লুট করিয়াছে, ইংরাজদের মারিতেছে অতএব তোমরা এই পল্টন লইয়া রোতকে গিয়া তাহাদের শাসিত কর।" সে পল্টন দিল্লি না গিয়া রোতকেই যাইল। সেখানে পৌঁছিয়া প্রথম দিনেই কোর্ট মার্শেলের আইনানুযায়ী তদারক করিয়া ২৫/৩৩ জনকে বিদ্রোহী বলিয়া ধরিয়া আনিয়া ফাঁসি দেওয়া হয় (এই বিদ্রোহীদলের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও বড় জমিদারও ছিলেন)। ২য় দিনেও দোষী নির্দোষ প্রায় ৫০ জনকে ধরিয়া আনা হইল। তাহার দয়াতে নির্দোষী মাত্রেই মুক্তিলাভ করিত অর্থাৎ কোনরূপ অন্যায় বিচার হইত না।

এদিকে বিদ্রোহীগণ প্রত্যহ আপনাদের দলপুষ্ট করিতে লাগিল এবং বেরিলি মীরট প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। সে ভয়ানক সময়ের কথা সকলেই অবগত আছেন।

৬০নং পল্টনের কর্তারা পাছে তাহাদের সিপাহিরা ক্ষেপিয়া ওঠে এই ভয়ে সদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। প্রজারা ও সিপাহিরা সকলেই রাসবিহারী বাবুকে ভালবাসিত ও মান্য করিত। তিনিও রাজার বিদ্রোহাচরণ করা কিরূপ অন্যায় ও বিপদকালে প্রভুর সাহায্য না করা কতদূর কৃতঘ্নের কাজ তাহা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু সিপাহিরা এতই উন্মত হইয়া উঠিল যে রাজা বা প্রভু কিছুই মানিল না।

অন্য সকল পল্টনই প্রায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। ৬০নং পল্টন তখন পর্যন্ত যদিও কার্যত কোনরূপ বিদ্রোহাচরণ করে নাই—কিন্তু আর থাকে না; ইহাদের ভাবভঙ্গীতে সর্বদা অসন্তোষ ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল, যেন কাহারও আজ্ঞার প্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছে হুকুম পাইলেই যেন পালন করিতে ব্যস্ত। এইভাবে দিন কয়েক গেল। একদিন কয়েকজন সিপাহি ২৫/৩০ জন ক্ষত্রিয়ানী স্ত্রীলোক ধরিয়া রাসবিহারী বাবুর নিকট লইয়া আসিল। তাহারা সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোক। সকলেই সুন্দরী এবং অনেকেই যুবতী। তাহাদের সঙ্গে দুটি মাত্র পুরুষ। তাহারা এই ভীষণ বিপ্লবের সময়ে বাড়ি ঘর ছাড়িয়া পাটিয়ালি মুখে যাইতেছিল। যে ভয়ে তাহারা দেশত্যাগ করিয়া পলাইতেছিল তাহাদের তাহাই ঘটিল; পথিমধ্যে কৃতান্তকিঙ্কর সদৃশ উন্মত্ত সিপাহিদের হাতেই পড়িল। পুরুষ ২টি ভয়ে ও অপমানে নির্বাক। স্ত্রীলোকেরা মান ও প্রাণভয়ে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া কাঁদিয়াই আকুল হইল। সিপাহিরা তাহাদেব বাবুকে বলিল, "বাবু সাহেব আপনি এখন ইহাদের বসাইয়া রাখুন, আপনি ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া আমাদের দিবেন; আমরা রাত্রে আসিয়া লইয়া যাইব।" সিপাহিরা চলিয়া গেলে স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলিল, "বাবু আপনি গরিবের মা বাপ, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। সিপাহিদের নিকট পাঠাইবেন না।" তিনি তাহাদের আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, "মা সকল তোমরা কেঁদ না, স্থির হও; আমি তোমাদের সকলকেই বাঁচাইব। তোমরা ইচ্ছামত আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর। তাহারা তাহার কথায় আশ্বস্ত হইল; লজ্জা ভয়ে ও পথশ্রমে তাহারা নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল, জল পান করিয়া সুস্থ হইল। সে সময়ে তাহাদের মনের যে কি ভয়ানক অবস্থা তাহা অনুমেয়। সন্ধ্যা হইলে রাসবিহারী বাবু স্বীয় প্রভু সেবিয়ার সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন ও কয়েক জন বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে দিয়া সেই সব স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুটিকে তাহাদের অভিলষিত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যাইবার কালীন তাহাদের যাহার নিকট যাহা ছিল স্বর্ণমুদ্রা হীরা জড়োয়া গহনা প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিষ দিয়া গেল ও প্রাণ ভরিয়া জগদীশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া গেল। তিনি ঐ সকল ধনরত্ন লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা কোন মতে শুনিল না। বলিল, "আমাদের ধন মান ও প্রাণ সমস্তই যাইতে বসিয়াছিল, আপনার কৃপায় আমরা এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম, এ ছার ধনের জন্য শেষে আবার অনর্থ ঘটিবে। আর আপনার এ উপকারের প্রতিশোধ দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট কাঁচলি ছিল। তাহাতে ছোট বড় অনেক হীরা বসান ছিল। তন্মধ্যে ২ খানি হীরা এত বড় ও এত উৎকৃষ্ট ছিল যে যেরূপ হীরা অনেক ধনশালী মহাজনের গৃহে থাকে না।

রাত্রি হইলে সিপাহিরা আসিয়া দেখিল শিকার তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। দেখিয়া উন্মত্ত সিপাহিরা বাবুর উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্ট বচনে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সহিত তাহাদের এরূপ বুঝাইলেন যে তাহারা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নত মস্তকে চলিয়া গেল। পরদিন তিনি ঐ সমস্ত দ্রব্য কাপ্তেন সেবিয়ার সাহেবকে দিলেন। উদারচেতা সেবিয়ার কিছুই লইলেন না; বলিলেন "এ সকল দ্রব্য জগদীশ্বর তোমায় সদ্‌গুণের

পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছেন, তুমিই ইহা গ্রহণের উপযুক্ত।" রাসবিহারী বাবু বলিলেন "আপনি এ সকল লইয়া চলুন, সমস্তই আপনার, আমাকে যাহা ইচ্ছা করিয়া দিবেন; তাহাই গ্রহণ করিব।" সেবিয়ার সাহেব বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; আর একদিন পরে অর্থাৎ ৮ জুনে ট্রেজরি খুলিবে। খাজানায় জমা করিয়া দিলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এখন তুমি নিজের কাছে রাখ।" ৭ জুনের দিন কোন মতে কাটিল। গভীর রাত্রে যুদ্ধের সঙ্কেত সূচক ভেরী ধ্বনি হইল। আর সমস্ত সিপাহি আপন আপন স্থান হইতে আসিয়া একস্থানে সমবেত হইল। ঐ দিবস এক ব্যক্তি একখানা চিঠি লইয়া একজন সিপাহিকে দিয়া গিয়াছিল। পরে জানা গিয়াছিল দিল্লির বিদ্রোহী সিপাহিগণ এখানকার সিপাহিদের নিজ দলে যোগ দিতে লিখিয়াছিল। সেই পত্রানুযায়ী তাহারা ভিতরে ভিতরে আপনাদের ইচ্ছামত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া গভীর নিশীথে "চলরে দিল্লি চলরে দিল্লি" বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তুমুল কোলাহলে সাহেবরা জাগরিত হইয়া চমকিত হইলেন। অধ্যক্ষ র‍্যান্‌ডেল বলিলেন, "কাহার আজ্ঞায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ইহারা দিল্লি চলিল? ইহাদের ভেরী বাজাইতেই বা কে বলিল?" রাসবিহারীবাবুও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখিতেছেন না, ইহারা ক্ষেপিয়াছে, এখন আর ইহাদের কিছু বলিবেন না। আপনারা শীঘ্র এখান হইতে দিল্লি প্রস্থান করুন। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" কর্ণেল বলিলেন "যদি একশত সৈন্য আমার পক্ষে হয় আমি উহাদের নয় শতকে পরাস্ত করিতে পারি।" রাসবিহারী বাবু তাহাকে সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কারণ তখন আর সে চেষ্টা বৃথা। রাসবিহারী বাবু পুনঃ পুনঃ বলাতে কর্ণেল র‍্যান্‌ডেল, কাপ্তেন সেবিয়ার ও আরও ৫/৭ জন ইংরাজ কর্মচারী সেই রাত্রে দিল্লি প্রস্থান করিলেন। বিদ্রোহী সিপাহির দল সকলে একত্র হইলে প্রথমে সাহেবদের অনুসন্ধান করিল। তাহাদের না পাইয়া বাবুর খোঁজ করিল। বাবু তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের কার্যকলাপ দেখিতেছিলেন। সাহেবরা কিয়দ্দুর গেলে তিনি যাইবেন। কারণ সকলে একসঙ্গে গেলে যদি উহারা দেখিতে পায় সকলকেই মারিবে। বরং তাহাদের সহিত কথোপকথনে খনিক সময় কাটাইলে ততক্ষণে সাহেবরা দৃষ্টিপথাতীত হইয়া যাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়া দাঁড়াইয়া তিনি নিজ কর্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। সিপাহিরা তাহাকে দেখিয়া বলিল, "তুমি আমাদের দলের নেতা হইয়া দিল্লি চল, আমরা দিল্লি জয় করিয়া তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব ও চিরদিন তোমার ভৃত্য হইয়া রহিব।" তিনি ইহাদের অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু নিরস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কৌশল করিয়া কহিলেন, "আমি দ্রব্যাদি লইয়া আসি।" এই বলিয়া তাহাদের নিষেধ না মানিয়া চলিয়া গেলেন। সিপাহিরা তাহাকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। শেষে রাগিয়া ৪/৫ জনে একেবারে তাহার উপর গুলি বর্ষণ করিল। তিনি গুলি আসিতেছে দেখিয়া উপস্থিত বুদ্ধি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে শয়ন করিলেন। গুলি কয়টা চলিয়া গেলে উঠিয়া তিরস্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোরা হিন্দু হইয়া হিন্দুকে মারিস, প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিস। তোরা কি মনে করিয়াছিস্ ইংরাজকে মারিয়া রাজ্য লইবি? তোদের কখন ভাল হইবে না।" তখন তাহারা বলিল, "আপনাকে মারা আমাদের অন্যায় হইয়াছে এবং আমাদের সে উদ্দেশ্যও ছিল না। এখন আমাদের সহিত

চলুন, আমরা আপনার জিনিসপত্র আনাইতেছি।" এই বলিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহারা তাহার দ্রব্যাদি আনাইয়া ঘোর রোলে সকলে দিল্লি যাত্রা করিল। অগত্যা রাসবিহারীবাবুও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনদিনে তাহারা দিল্লি পৌঁছিল। দিল্লির বাহিরে হিন্দু রায়ের কুঠি নামক স্থানে তাম্বু স্থাপন করিয়া গোরা ও শিখ সৈন্য লইয়া ইংরাজ প্রতিনিধিগণ অবস্থিত করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন; বিদ্রোহী সিপাহিগণ প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া সহরে ঘোর অত্যাচার করিতেছিল। এই সময়ে রোতকের সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দ্বার খুলিতে বলায় ভিতর হইতে উত্তর আসিল, তোমরা আমাদের স্বপক্ষে কি বিপক্ষ কিরূপে বুঝিব? প্রথমে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরীক্ষা দাও পরে ভিতরে আসিতে পারিবে। তাহারা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল, রাসবিহারী বাবু তখন পলায়নের প্রকৃত অবসর বুঝিয়া যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পথসম্বল স্বরূপ ২০০ টাকা মাত্র লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি অনবরত চলিয়া সকলে রোতকে আসিয়া পৌঁছিলেন। দৈবশক্তি বলে তিনি এক রাত্রে দিল্লি হইতে রোতকে আসিলেন বটে, কিন্তু তাহার পদদ্বয় এত ফুলিয়াছিল যে জুতা কাটাইয়া খুলিতে হইয়াছিল।

তিনি রোতকে ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু সেখানে তখন মহা বিশৃঙ্খলা, বড়ই গোলমাল। সময় পাইয়া সহরের যত বদমায়েস ডাকাইতি লুট খুন করিতে লাগিল। সাধু সন্ন্যাসী ফকিরগণও তাহাদের হাতে নিষ্কৃতি পাইল না। তাহারা পথিক সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতি দেখিলেই ছদ্মবেশী গৃহস্থ ভাবিয়া নির্যাতন আরম্ভ করিল। আবার সিপাহিরাও ইংরাজের গুপ্তচর ভাবিয়া নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। সে ভয়ানক বিপ্লবের কথা বর্ণনাতীত! চারিদিকে সেই ঘোর বিপদের সময়ে রাসবিহারী বাবু রোতকে ফিরিয়া আসিলেন! লুট, মার, হত্যা, ক্রন্দনে সহর তোলপাড় হইতেছে। কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় না। একস্থানে একটা বড় মাটির স্তুপ ছিল। তাহার উপর একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সেখানে আশ্রয় লইলেন। পূর্বে রোতকে বাসকালীন সন্ন্যাসী তাহাকে চিনিতেন। আশ্রয় দিয়া সন্ন্যাসী তাহার বেশ পরিবর্তন করাইয়া রীতিমত সন্ন্যাসী সাজাইলেন। বলিলেন, "ও বেশে মুহূর্ত মধ্যে ধরা পড়িবে এবং দুজনেরই প্রাণ যাইবে।" তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসিরাই নিরাপদ কোথায়? তবে যতক্ষণ যায় ততক্ষণ ভাল।"

একদিন সেখানে জন কয়েক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ইহাদের নিকট বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। নানা কথার পর একজন সন্ন্যাসী রাসবিহারী বাবুকে তামাকু সাজিতে বলায় তিনি উঠিলেন। নতুন সন্ন্যাসীরা স্তুপবাসী সন্ন্যাসীকে বলিলেন "তোর কাছে কি আছে দে নইলে তোকে হত্যা করিব।" তাহাদের কথার প্রণালী ও পরস্পর ইঙ্গিত প্রভৃতি দেখিয়া রাসবিহারী বাবুর মনে প্রথমাবধি সন্দেহ হইয়াছিল। পরে তাহাদের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া ইহারা যে সন্ন্যাসী বেশে দস্যু বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি কলিকার ছিদ্রে দিবার ঢিল খুঁজিতে খুঁজিতে স্তুপ হইতে নীচে অবতরন করিয়া ভাবিলেন ইহাদের অভিপ্রায় দেখিতেছি ভাল নয়, ইহারা ৫/৭ জনে আক্রমণ করিলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না; বিশেষত ইহারা সশস্ত্র। এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের অলক্ষিতে যাইয়া একটি বৃক্ষে আরোহন করিয়া বসিয়া রহিলেন। ডাকাইতেরা গুপ্তধনের জন্য সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত যাতনা দিলে লাগিল। তাহার হাত পা বাঁধিয়া চিমটা গরম করিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিল।

সন্ন্যাসী যাতনায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। যে স্থানে সন্ন্যাসী বসিত ডাকাতেরা সে স্থান খুঁড়িয়াও যখন কিছু পাইল না তখন তাহারা তাহাকে সেই অবস্থায় সেখানে ফেলিয়া রাসবিহারী বাবুকে এদিক ওদিক খুঁজিল। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নানাবিধ অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল। তাহারা চলিয়া গেলে রাসবিহারীবাবু বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাসীর বন্ধন মোচন করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সাধু তুমি কোথায় ছিলে? ঈশ্বর কৃপায় তুমি যে দুরাত্মাদের হাতে পড় নাই এজন্য তাহাকে ধন্যবাদ দাও। দেখ আমার কি দুর্দশা হইয়াছে। চল আমরা দুজনে এখান হইতে প্রস্থান করি।" এই বলিয়া তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া তাহারা জানিতে পারিলেন, ডাকাতেরা তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। তাহারা অতি দ্রুত বেগে চলিয়া সমুখে এক বৃহৎ জলাশয় দেখিয়া তাহাতেই ঝম্প প্রদান করিয়া সন্তরনে পার হইতে লাগিলেন। সেই জলাশয়ের ভিতরে খানিকটা পাথরের ঢিবি ছিল; তাহা জানা ছিল না বলিয়া অসাবধানতা বশতঃ সন্ন্যাসীর মাথায় তাহাতে দারুন আঘাত লাগিল। রক্তপাত হইয়া চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল দেখিয়া রাসবিহারী বাবু একহাতে তাহাকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া অপর হাতে সন্তরণ কাটিয়া সেই বৃহৎ জলাশয় পার হইলেন। পরপারে আসিয়া অনেক চেষ্টা ও যত্নে সন্ন্যাসীকে সুস্থ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ উভয়ে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিলেন।

দিল্লি হইতে আসিবার সময় পাথেয় স্বরূপ যে ২০০্ শত টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন এ পর্যন্ত তাহা তাহার নিকটেই ছিল। পথিপার্শ্বে একটি কূপের ধারে অতি সামান্য একটু খুঁড়িয়া সেই টাকা পুতিয়া রাখিয়া গেলেন। ভাবিলেন সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি শেষে এই সামান্য টাকার জন্য আবার বিপদে পড়িব।

কিন্তু জগদীশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। রোতকের সকল লোকই তাহাকে চিনিত এবং তিনি পল্টনে চাকুরি করিয়া অনেক টাকা উপার্জন করিতেন এই রূপ মনে করিত। তাই তাহারা তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। রোতকে জন্মেজয় ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। রাসবিহারী বাবু তাহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তাহার বাটীতে গিয়া দেখিলেন সেখানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা ধন রত্ন হইতে সামান্য আহারীয় দ্রব্য পর্যন্ত লুটিয়া লইয়া গিয়াছে; একখানি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত রাখিয়া যায় নাই।

তিনি কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় পর বাটী ফিরিতেছেন। দেখিলেন চারিজন লোক একখানি খাটিয়ায় একটি মৃতদেহ লইয়া তাহার আগে আগে যাইতেছে, ক্রমে তাহারাও জন্মেজয় বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল, দেখিয়া তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। বাহকেরা গৃহস্বামীকে বলিল, "আমরা পল্টনের বাবু মনে করিয়া আপনার পুত্রকে মারিয়াছি। বোধ হয় এ এখনও বাঁচিয়া আছে, চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে।" তাহারা চলিয়া গেলে রাসবিহারী বাবু নিকটে আসিয়া দেখিলেন কালীবাবুর সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত; তিনি অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া জন্মেজয় ও তাহার স্ত্রী চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুকষ্টে তিনদিন পরে তাহার চৈতন্য হয়। ঈশ্বর কৃপায় কালীবাবু সেই ভীষণ মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার পাইলেন।

আর একদিন রাসবিহারী বাবু পথে যাইতেছেন তাহার কানের নিকট দিয়া দুটি গুলি শন্ শন্ করিয়া চলিয়া গেল। নিক্ষেপকারী অবশ্য তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়াই গুলি ছুড়িয়াছিল কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অপার মহিমা বলে তিনি সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন।

আর সহরে থাকা বিপদজনক ভাবিয়া তিনি রোতক ছাড়িয়া একটি গ্রামে গিয়া রহিলেন। শান্তস্বভাব গ্রামবাসিগণ তাহাকে "সাধু" দেখিয়া যত্নপূর্বক দুগ্ধ ফলমূল ইত্যাদি দিয়া যাইত। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাহাকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহাকে মা বলিতেন। ব্রাহ্মণী বিশেষ যত্ন কবিয়া তাহাকে ভালরূপ আহার করাইতেন। বৃদ্ধা সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন তাহার বাটীর পার্শ্বে তাহার একটি শিবমন্দির ছিল। তিনি তাহাকে সেই মন্দিরে থাকিতে ছিলেন।

তাহার সৌম্য মূর্তিতে সন্ন্যাসীর বেশ অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিত। পূর্ব হইতে তিনি কিছু চিকিৎসা বিদ্যা জানিতেন। গ্রামবাসিগণ তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ মনে করিয়া স্ব স্ব অভিপ্রায়ে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাহার কাছে আসিত। স্ত্রীলোকেরা ঔষধ লইতে, ছেলে ঝাড়াইতে, প্রশ্ন গণনা করাইতে আসিত। কেহবা সাধু দর্শনে পুণ্য ভাবিয়া দর্শন করিতে ও আহার সামগ্রী দিতে আসিত। পুরুষেরা কেহ সেতার শিখিতে, কেহ গীত শিখিতে, কেহ ভজন শুনিতে কেহ বা শাস্ত্রালাপ করিতে আসিত। এইভাবে তিনি সেখানে থাকিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং দিন দিন গ্রামবাসীগণের বিশ্বাসও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন।

এদিকে দিল্লি প্রভৃতি স্থানও ক্রমে শাসিত হইল। একদিন সেবিয়ার সাহেবের এক ভৃত্য কোন কার্যোপলক্ষ্যে সেই গ্রামে আইসে। ঘটনাক্রমে তিনি তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হইলেন। পরে তাহার নিকট নিজ প্রভু সেবিয়ার সাহেবকে এই মর্মে এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে "আমি এখানে এই ভাবে আছি। আমাকে লইয়া যান। সেবিয়ার সেই পত্র পাইয়া একশত দুরাণী সৈন্য সঙ্গে দিয়া কাপ্তেন হড়সন্‌কে পাঠান। কাপ্তেন হড্‌সন্ এক সহস্র দুরাণী সৈন্য লইয়া একটি পল্টন গঠিত করেন। তাহার গঠিত পল্টনের নাম হড্‌সন্স্ হর্স্ তাহারই একশত সৈন্য লইয়া তিনি রোতকের নিকট সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও গ্রামের প্রান্ত ভাগে তাঁবু খাটাইয়া সসৈন্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দুইজন সৈনিক প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া বলিল "পল্টনের বাবুকে তোমরা কে লুকাইয়া রাখিয়াছ শীঘ্র বাহির করিয়া দাও নচেৎ তোমাদের গ্রাম শুদ্ধ তোপে উড়াইয়া দিব।" গ্রামবাসীগণ তাহাদের "সাধু"কে "পল্টনের বাবু" বলিয়া কেহই জানিত না। সুতরাং সৈনিকদের কথায় তাহারা মহাভীত হইয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া তাহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তিনি সৈন্যদের ডাকাইয়া বলিলেন, "আমাকে তোমাদের প্রভুর নিকট লইয়া চল। পল্টনের বাবুর সন্ধান আমি বলিয়া দিব।" পরে তিনি গ্রামবাসীদের আশ্বাসিত করিয়া নিজ নিজ গৃহে যাইতে বলিয়া সৈন্যদেব সঙ্গে হড্‌সন্ সাহেবের নিকট আসিয়া নিজ পরিচয় প্রদান কবিলেন, হড্‌সন্ সাহেব তাহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পূর্ব লেখার সহিত হাতের লেখা মিলাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া সৈন্য সহিত দিল্লিতে পৌঁছিলেন। দিল্লিতে পৌঁছিয়া সেবিয়ার সাহেবের আজ্ঞার

নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। সাহেবের হুকুম ও সে দিনের "প্যারোলের" সঙ্কেত জানিয়া দূত ফিরিয়া আসিলে, তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেবিয়ার সাহেব তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তাহার বেশ দেখিয়া বীর সেবিয়ারের চক্ষে জল আসিল। সেই দিনই সাহেব তাহার বেশ পরিবর্তন করাইয়া দিলেন।

দিল্লিতে শান্তি স্থাপিত হইলে তাহারা আম্বালায় আসিলেন এবং তথা হইতে সপরিবারে এলাহাবাদে আইলেন। এই ভয়ানক বিপ্লবের সময় তাহার পরিবারবর্গ অত্যন্ত উদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি জীবিত আছেন এই সংবাদের জন্য কতই অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু এ সংবাদ কেহই নিশ্চয়রূপে দিতে পারে নাই। অধিকন্তু অর্থলোভে অনেকে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি বলিয়া অর্থ আদায় করিত। তাহার বন্ধুগণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু জগদীশ্বর তাহাকে দীর্ঘ জীবন দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, সিপাহি বিদ্রোহের পর তিনি ৪৩ বৎসর জীবিত ছিলেন।

এলাহাবাদ আসিয়া তিনি পুনরায় কলেক্টরি আফিসে কর্ম করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিন কর্মকরনান্তর যথাকালে পেন্সন লইলেন, পেন্সন লইয়া সমস্ত সাংসারিক ভার পুত্রদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরোপসনা ও অবকাশ মত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ অনেক লোক তাহাব নিকট আসিত। (বাটী হইতে তিনি বড় একটা কোথাও যাইতেন না)। কেহই বিফলমনোরথ হইত না। তাহার হাতে রোগী প্রায় মরিত না। অনেক ইংরাজও তাহার নিকট প্লীহা ঝাড়াইয়া আরোগ্য হইয়াছেন। ছোট ছোট ইংরাজের ছেলে-মেয়ে তাহার নিকট অনেকেই ঝাড় ফুঁকের জন্য আসিত। একবার একটি স্ত্রীলোককে সাপে কামড়াইয়াছিল। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার তার চিকিৎসা করেন; কিছুতেই তাহাকে আরোগ্য করিতে না পারিয়া মৃতজ্ঞানে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তাহার অভিভাবকেরা একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য সেই মৃত দেহ পালকি করিয়া রাসবিহারী বাবুর নিকট লইয়া আসিল। তাহার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে কোন বিচক্ষণ ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া মৃত দেহ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারিলেন না। কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিনি তাহাকে আরোগ্য করিলেন।

রাসবিহারী বাবু জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন কিন্তু শেষ দশায় পৌত্রের শোক আর তাহাকে পাইতে হয় নাই। তাহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে পৌত্রটি মারা যায়। তাহার জীবদ্দশায়ই জ্যৈষ্ঠ পুত্র বিহারীবাবু মারা যায়, দুটি জামাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্যার শোকও তাহাকে পাইতে হইয়াছিল।

উপর্যুপরি অনেক শোক পাইয়া তাহার পত্নী, ভয়ানক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় চারি বৎসরকাল কষ্ট পাইয়া অবশেষে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু রাসবিহারী বাবু এই সকল ভয়ানক শোক সমস্ত জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই ধর্ম ও যোগশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তাহার নিকট সতত সাধু সন্ন্যাসীগণের সমাগম হইত। তাহাদের সহিত আলাপে তিঁনি পরম পরিতুষ্ট হইতেন।

অনেকেরই ধারণা অধিক বয়সে লেখাপড়া হয় না, কিন্তু এত বয়সেও তিনি শিবসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠপুত্র মারা যাওয়ার পর

হইতে তিনি চোখে ঝাপসা দেখিতেন, তথাপি তিনি লেখাপড়ায় বিরত ছিলেন না। চশমা চোখে দিয়া আবশ্যকীয় কাজ নির্বাহ করিতেন।

রাসবিহারী বাবু অনেক সৎকাজ করিয়াছেন। এলাহাবাদে কালীবাড়ি করিয়া কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাদেরই জমিতে কালীবাড়ি তৈয়ার হইয়াছে ও কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীকে তিনিই আনয়ন করেন। (এই ব্রহ্মচারী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে কালী স্থাপনা করেন, তন্মধ্যে দিল্লিতে কালীবাড়ি করিয়া বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন।) ধর্মে ঐকান্তিক ভক্তি ছাড়া আরও একটি সদুদ্দেশ্যে কালীবাড়ি স্থাপিত হয়; বিদেশী আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা দুই চারি দিন বিশ্রাম করিয়া ও আহার পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে।

পূর্বে এই সহরের সমস্ত ময়লা ও আবর্জনা গঙ্গার জলে ফেলা হইত। হিন্দুমাত্রেই ইহাতে বিরক্ত হইতেন কিন্তু অপ্রিয় হইবে ভাবিয়া কেহ যখন কর্তৃপক্ষকে নিষেধ করিতেন না; রাসবিহারী বাবু তদানীন্তন কলেক্টর রবাটসন সাহেবকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে উগ্রপ্রকৃতি রবাটসন্ প্রথমতঃ রাগিয়া উঠিলেন। পরে তাহার ন্যায়যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া অন্যায় স্বীকার করিলেন। তদবধি গঙ্গার জলে ময়লা ও জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হইয়া এলাহাবাদের প্রান্তভাগে রাজপুর নামক স্থানে ফেলা হইতে লাগিল। সেই সকল ইট প্রস্তুতের বড় বড় গর্ত ভরাট হইয়া সার প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট লাভও হইতে লাগিল। এই কার্য করাতে তিনি সাধারণের ধন্যাবাদার্হ হইয়াছিলেন।

তিনি এমনই কার্যক্ষম ও সুস্থদেহ ছিলেন যে, দীর্ঘকাল গবর্নমেন্টের চাকুরি করিয়াছিলেন কখন কামাই হয় নাই, কখন ছুটি লয়েন নাই! তাহার কর্মদক্ষতা ও সুস্বাস্থ্যের গুণে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাহার বল অটুট ছিল। ৮৫ বৎসর বয়সেও অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজের সমুদায় কাজ নিজে নির্বাহ করিতেন। ২৮ বৎসর কাল পেন্সন্ ভোগ করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে ১৯০০ সালের ৭ ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্ত পুন্যময় স্থানে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রবাসী ৭ম ভাগ ৮ম সংখ্যা ১৩১৪

ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী

(১৬০০) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন থেকে (১৮৫৯) সিপাহি যুদ্ধের অবসান

১৫৫৬-১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল।

১৬০০—আহমদনগরের পতন

—আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমের বিদ্রোহ।

—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত।

১৬০১—আসিড়গড় দুর্গ দখল।

১৬০২—আবুল ফজলকে হত্যা।

—ওলন্দাজদের ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত।

১৬০৪—কালিকটের জামোরিনের সঙ্গে ওলন্দাজদের চুক্তি।

১৬০৫—আকবরের মৃত্যু এবং জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমের জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে সিংহাসন আরোহণ (১৬০৫-১৬২৭)।

১৬০৫-২৭—জাহাঙ্গীরের শাসনকাল।

১৬০৬—মালাক্কার নিকটে ওলন্দাজদের কাছে পর্তুগিজদের পরাজয়।

—পঞ্চম গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড।

১৬০৮—ইংরেজ কাপ্তেন হকিনস-এর ভারত আগমন এবং জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে চারটি কারখানা স্থাপনের অনুমতি লাভ।

—সুরাটে ইংরাজদের প্রথম কারখানা স্থাপন।

১৬১১—ইংরেজদের মসলিপত্তনম লাভ।

১৬১১-১৭—কামরূপ প্রভৃতি এলাকা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

১৬১৩-১৫—জাহাঙ্গীরের মেবার আক্রমণ।

—অমর সিংহের আনুগত্য স্বীকার।

১৬১৬—জানুয়ারি ১০ স্যার টমাস রোর মোগল দরবারে উপস্থিতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা।

—একটি দিনেমার বাণিজ্য সংস্থা গঠন।

—আহমদনগর দুর্গ অধিকার।

১৬২০—জাহাঙ্গীরের দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গ অধিকার।

১৬২১-২২—পারস্যার কান্দাহার অবরোধ ও অধিকার।

১৬২২—খসরুর মৃত্যু।

১৬২৩—'আম্বয়না'য় ওলন্দাজ-ইংরেজ সংঘর্ষে ইংরেজদের পরাজয়।

১৬২৭—জাহাঙ্গীরের মৃত্যু। ক্ষমতায় শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)।

—শিবাজীর জন্ম (মতান্তরে ১৬২৯/১৬৩০)

১৬২৭-১৬৫৮—শাহজাহানের ক্ষমতা লাভ।

১৬২৮—শাহজাহানের সিংহাসন লাভ।
১৬৩০-৩২—দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
১৬৩১—মমতাজমহলের মৃত্যু।
১৬৩২—হুগলিতে পর্তুগিজ নির্যাতন।
১৬৩৩—আহমদনগরের মোগল অধিকার ভুক্তি।
১৬৩৬—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে সন্ধি।
—আওরঙজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত।
১৬৩৮—মোগলদের কান্দাহার পুনর্দখল।
১৬৪৬—বালখ অভিযান।
—শিবাজী কর্তৃক তোরনা দুর্গ অধিকার।
১৬৪৮-৫৩—পারস্যের কান্দাহার অবরোধ।
১৬৪৯—পারস্যের কান্দাহার পুনরধিকার।
১৬৫৩—আওরঙজেব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত।
১৬৫৬—হায়দাবাদ ও গোলকুণ্ডায় মোগল আক্রমণ।
—বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহের মৃত্যু।
—শিবাজীর জাওলি রাজ্য অধিকার।
১৬৫৭—আওরঙ্গজেবের বিজাপুর আক্রমণ—বিদর ও কল্যাণী দুর্গ অধিকার।
—শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ।
—মসনদ নিয়ে সংঘাত শুরু।
—অহোমদের গৌহাটি অধিকার।
১৬৫৮—ধর্মাত ও সমুদ্রগড়ের যুদ্ধ।
—আওরঙ্জেবের রাজ্যাভিষেক।
—ক্ষমতায় আওরঙ্গজেব (১৬৫৮—১৭০৭)।
১৬৫৯—খাজুয়া ও দেওবাই-এর যুদ্ধ।
—জানুয়ারি ৫—খাজুয়ার যুদ্ধে সুজাকে পরাস্ত করেন আওরঙজেব।
—দারার মৃত্যুদণ্ড।
—আওরঙজেবের দ্বিতীয়বার রাজ্যাভিষেক।
১৬৬০—মীরজুমলার সুজাকে অনুসরণ এবং সুজার আরাকানে পলায়ন।
—শিবাজীর পন্হালা দুর্গ অধিকার।
১৬৬১—মুরাদের প্রাণদণ্ড।
—ইংরেজদের বোম্বাই লাভ।
১৬৬২—অহোম রাজধানী গড়গাঁও মোগলবাহিনীর অধিকারে।
১৬৬৩—বাংলার সুবাদার মীরজুমলার মৃত্যু।
—বাংলার সুবাদার পদে শায়েস্তা খান।
১৬৬৪—শিবাজীর সুরাট বন্দর লুণ্ঠন।
—ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোড়া পত্তন।
১৬৬৫—পুরন্দরের সন্ধি।
—শায়েস্তা খানের পর্তুগিজ দমন ও সন্দ্বীপ দখল।

১৬৬৬—জানুয়ারি ১৯—দশম গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্ম।
—সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু।
—শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম দখল।
—শিবাজীর আগ্রায় গমন।
১৬৬৭—য়ুসুফজাই বিদ্রোহ।
১৬৬৮—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোম্বাই দ্বীপ লাভ।
১৬৬৯—গোকলা অভ্যুত্থান।
১৬৭০—শিবাজীর দ্বিতীয়বার সুরাট বন্দর লুণ্ঠন।
১৬৭১—ছত্রসালের অধীনে বুন্দেলা বিদ্রোহ।
জানুয়ারি ৫—শিবাজী বিখ্যাত সেলের দুর্গ জয় করেন।
১৬৭২—সৎনামী বিদ্রোহ।
—আফ্রিদি বিদ্রোহ।
১৬৭৩—শিবাজীর পনহালা দুর্গ পুনরাধিকার।
১৬৭৪—রায়গড় দুর্গে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক এবং ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ।
—স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
—ফ্রাঁসোয়া মার্ত্যাঁর পণ্ডিচেরী প্রতিষ্ঠা।
১৬৭৫—গুরু তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ড।
১৬৭৭—শিবাজীর জিঞ্জি ভোলোর প্রভৃতি দখল।
১৬৭৮—যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু।
—আওরঙজেবের মারোয়াড় দখল।
১৬৭৯—জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন।
—যোধপুর অধিকার।
১৬৮০—শিবাজীর মৃত্যু।
—ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যর সুযোগ দিয়ে আওরঙজেবের ফরমান জারি।
১৬৮১—মেবারের সন্ধি।
—আওরঙজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান।
১৬৮৩—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে দুর্গ নির্মাণের অধিকার লাভ।
১৬৮৬—ইংরেজের হুগলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন।
—বিজাপুরের পতন।
—আওরঙজেবের বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা দখল।
১৬৮৭—ইংরেজের বালেশ্বর লুণ্ঠন।
—গোলকোণ্ডার পতন।
১৬৮৯—শম্ভুজি হত্যা।
১৬৯০—জব চার্নকের সুতানুটি আগমন।
—ইংরেজের গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতার ইজারা লাভ।
১৬৯১—ইংরেজের ফরমান লাভ।
১৬৯৪—বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের মৃত্যু।
—জব চার্নকের মৃত্যু।

১৬৯৬-৯৭—মেদিনীপুরের চিতুয়া-বরদা পরগণায় আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ। নিজেদের স্বার্থে এদের ব্যবহার করেছিল শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁ।
১৬৯৮—মোগলদের জিঞ্জিদুর্গ দখল।
১৭০০—রাজারামের মৃত্যু এবং তাঁর শিশুপুত্রের তৃতীয় শিবাজী নামে শাসনভার গ্রহণ।
১৭০৫—বাংলার সুবাদার পদে মুর্শিদকুলি খান।
১৭০৭—আওরঙজেবের মৃত্যু।
—আজমের মৃত্যু।
১৭০৮—মুয়জ্জমের বাহাদুর শাহ বা প্রথম শাহ আলম উপাধি গ্রহণ ও বাদশাহী লাভ।
—গুরু গোবিন্দের মৃত্যু।
১৭১২—বাহাদুর শাহর মৃত্যু।
—জহান্দর শাহর বাদশাহী লাভ।
১৭১৩—ফররুখসিয়ারের বাদশাহী লাভ।
—পেশোয়া পদে বালাজী বিশ্বনাথ।
১৭১৪—মারাঠাদের সঙ্গে হুসেন আলির চুক্তি।
১৭১৫—শিখনেতা বান্দা মোগলদের হাতে বন্দি।
১৭১৬—শিখনেতা বান্দা নিহত।
১৭২৩—বারাকপুরের কাছে বাঁকিবাজারে বেলজিয়ামদের কারখানা স্থাপন।
১৭২৪—অযোধ্যার নবাব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন সুবাদার সাদাৎ খান।
১৭৩১—সুইডেনে বাণিজ্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠা।
—চন্দননগরের শাসনকর্তা ডুপ্লেক্সের ভারত আগমন।
১৭৩৫—কলকাতার জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ।
১৭৩৭—নাদির শাহের কান্দাহার আক্রমণ।
১৭৩৭-৩৮—উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষে প্রায় ৮ লক্ষ লোকের মৃত্যু।
১৭৩৮—গজনি ও কাবুল অধিকার করে নাদির শাহ।
১৭৩৯—নাদির শাহের দিল্লি গমন।
—প্রথম পেশোয়া বাজীরাও-এর সলসেট এবং বেসিন অধিকার।
১৭৪০—মারাঠাদের কর্ণাটক আক্রমণ।
—সুবা বাংলার মসনদ দখল করেন আলিবর্দি খাঁ।
—বাজীরাও-এর মৃত্যু।
১৭৪২—ডুপ্লেক্সের পণ্ডিচেরী শাসন ভার গ্রহণ।
১৭৪৩—অম্বররাজ জয়সিংহের মৃত্যু।
১৭৪৪-৪৮—প্রথম ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ—প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ।
১৭৪৬—লা বুঁর্দনের মাদ্রাজ অধিকার।
১৭৪৬-৬৩—আহম্মদ শাহ আবদালির ভারত আক্রমণ।
১৭৪৭—নাদির শাহ নিহত।
—আহমদ শাহ আবদালির আফগানিস্তানের রাজপদ লাভ।
১৭৪৮—আহম্মদ শাহ আবদালির কান্দাহার, কাবুল ও পেশোয়ার জয়।
১৭৪৮-৫৮—ভারত দখলে ব্রিটিশ-ফরাসি সংঘর্ষ।
১৭৫০—আহমদ শাহ আবদালির পঞ্জাব অধিকার।

১৭৫০-৫৪—দ্বিতীয় ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধ।
১৭৫১—আহমদ শাহ আবদালির কাশ্মীর দখল।
—আলিবর্দির মারাঠা বর্গিদের সঙ্গে চুক্তি।
—দাক্ষিণাত্যের সুবাদার মুজফ্‌ফর জং নিহত।
১৭৫১-৫২—ত্রিচিনপল্লী ও আর্কট অবরোধ।
১৭৫২—ত্রিচিনপল্লীতে ফরাসি সেনাপতি জাক ল-র আত্মসমর্পণ।
১৭৫৫—শ্রীরামপুর দিনেমারদের কারখানা স্থাপন।
১৭৫৬—বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু।
—বাংলার নবাব পদে সিরাজ-উদ-দৌলা।
—আহমদ শাহ আবদালির চতুর্থ বার ভারত আক্রমণ।
—সিরাজ-উদ-দৌলার কলকাতা দখল।
১৭৫৬-৬৩—সাত বৎসরের যুদ্ধ।
১৭৫৭—আহমদ শাহ আবদালির দিল্লি লুণ্ঠন।
—ক্লাইভের কলকাতা অধিকার ও আলিনগরের সন্ধি।
মার্চ ২৩—ক্লাইভ এবং ওয়াটসনের চন্দননগর অধিকার।
জুন ২৩—পলাশির যুদ্ধ এবং ইংরেজের বঙ্গ বিজয়।
—সিরাজ-উদ-দৌলা আটক এবং মীরজাফরের পুত্র মিরনের নির্দেশে নিহত।
১৭৫৮—মারাঠাদের লাহোর অধিকার।
১৭৫৯—আহমদ শাহ আবদালির পঞ্চমবার ভারত আক্রমণ।
১৭৬০—বাংলার গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও মীরকাশিমের মধ্যে চুক্তি।
—বাংলার নবাব পদে মীরকাসিম।
—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে নবাব মীরকাশিম। স্থানীয় কৃষক সমাজ সহজে ইংরেজ আধিপত্য মেনে নেয়নি। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই অঞ্চলের জমিদাররাও সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়।
—ওয়ান্দিবাসের যুদ্ধ।
—বিজাপুর, আওরঙ্গবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মারাঠা দখলে।
১৭৬১—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
—পণ্ডিচেরীর পতন।
—হায়দর আলির মহীশূরের সিংহাসন অধিকার। (১৭৬১-৮২)
১৭৬১-১৭৯৯—মহীশূর রাজ্য গঠিত।
১৭৬৩-১৮০০—সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ঘটে সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহার প্রদেশে।

বিদ্রোহের অন্যতম নায়কদের মধ্যে ছিলেন মজনুশাহ, মুশা শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী এবং আরো কয়েকজনে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩-১৮০০ সালের মধ্যে ঘটলেও এই দীর্ঘ কালসীমায় ধারাবাহিক প্রবাহ ছিল না। সুপ্রকাশ রায় এইভাবে বিদ্রোহকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন :

প্রথম পর্ব ১৭৬৩—৬৯
দ্বিতীয় পর্ব ১৭৭০—৭২
তৃতীয় পর্ব ১৭৭৩—৭৮

চতুর্থ পর্ব ১৭৭৫—৮০
পঞ্চম পর্ব ১৭৮১—৮৬
ষষ্ঠ পর্ব ১৭৮৭—৯২
শেষ পর্ব ১৭৯৩—১৮০০

এই দীর্ঘস্থায়ী সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতের প্রথম কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন : "...তৎকালে বিহার ও বঙ্গদেশের কৃষক প্রাচীন গ্রাম-সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বাহির হইবামাত্র এক ভয়ঙ্কর নূতন শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। সুতরাং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বলিয়া কিছু তাহাদের ছিল না। সংগ্রামের অভিজ্ঞতাহীন কৃষকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহের আকারে দেখা দেয়। কিন্তু কোন ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের সফলতার জন্য আদর্শ ও লক্ষ্য, যে নেতৃত্ব, যে সংগঠন ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতা অপরিহার্য, তাহার কোনটাই বিদ্রোহীদের ছিল না, আর তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় তাহা সম্ভবও ছিল না। ... দেশভক্তি ছিল সীমাবদ্ধ ও লক্ষ্যহীন। যে অগণিত খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ বিহার ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ব্যাপিয়া স্বতস্ফূর্তভাবে দেখা দিয়েছিল, সেইগুলিকে একটা ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা মজনু শাহ প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী নায়কের মধ্যে দেখা গেলেও এই বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করা তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল। ... এই বিদ্রোহ স্বতস্ফূর্তভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে চলিবার ফলে ইহার পরিচালকদের মধ্যে আদর্শ ও লক্ষ্যের ঐক্য গড়িয়া উঠে নাই। শেষপর্যন্ত নেতৃত্ব ও ধর্মীয় ব্যাপার লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্রোহের সমস্ত শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ শাসনের উন্নত সামরিক শক্তির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ...সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম ভারতের কৃষক বিশাল অঞ্চল (সমগ্র পূর্বভারত) ব্যাপিয়া একটা বিদ্রোহের আকারে শাসক গোষ্ঠীর সহিত শক্তির দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সংগ্রামের মূল্যবান অভিজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার ভবিষ্যতের সংগ্রামী কৃষকের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৫২-৫৩)

১৭৬৩—জাট নেতা সুরজমলের মৃত্যু।
—মীরকাশিম-ইংরেজ যুদ্ধ।
—ঢাকার ইংরেজ কুঠিতে সন্ন্যাসী আক্রমণ।

১৭৬৩-১৮০০--খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ।

১৭৬৪—বক্সারের যুদ্ধ।
—কলকাতায় পুলিশি ব্যবস্থার সূচনা।
—রামপুর-বোয়ালিয়ার ইংরেজ কুঠিতে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের আক্রমণ।
--ফেব্রুয়ারি বারাকপুর সেনানিবাসে প্রথম বিদ্রোহ।
—বিহারের ছাপরায় দেশ বিদ্রোহ।

১৭৬৫—মীরজাফরের মৃত্যু।
—বাংলায় নবাবী আমলের অবসান।
—বাংলার গভর্নর হিসাবে ক্লাইভের দ্বিতীয়বার ভারত আগমন।
—অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে এলাহাবাদে ক্লাইভের সন্ধি।

—ইংরেজ কোম্পানির বাংলা বিহার ও ওড়িষার দেওয়ানি লাভ।

—বাংলায় দ্বৈত শাসন।

১৭৬৬—ইংরেজ-নিজাম চুক্তি।

—কোচবিহারের দিনহাটায় সন্ন্যাসী নায়ক রামানন্দ গোঁসাই-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহী-বাহিনী লেঃ মরিসনের মুখোমুখি হয়। দুবার যুদ্ধে পরাজিত হলেও, এ বছরের আগস্ট মাসে মরিসনের বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে।

১৭৬৭--বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বাহিনীর আক্রমণে পাটনার ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়। বিহারের সারেঙ্গি (সারন) জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণে প্রথম যুদ্ধ—ইংরেজ বাহিনী পরাস্ত হয়। বিদ্রোহীরা হুসিপুর দুর্গ দখল করে। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণে পরাস্ত সন্ন্যাসী বাহিনী দুর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

—ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদে সমশের গাজির নেতৃত্বে বিদ্রোহ।

১৭৬৭-৬৯—প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৬৭-৯৯--মানভূমে কৃষক বিদ্রোহ (চুয়াড়)।

১৭৬৯—সন্দ্বীপে কৃষক বিদ্রোহ।

--উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা একটি মাটির দুর্গ নির্মাণ ও তার চারপাশে পরিখা খনন করে। তার আগে ১৭৬৬ খ্রিঃ কোম্পানির প্রতিনিধি মিঃ মাটেল উত্তরবঙ্গ ও নেপাল সীমান্তে কাঠ কাটতে গিয়ে সন্ন্যাসী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পরে বিদ্রোহীরা তাদের হত্যা করে। তারপর ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জি তাদের দমন করতে এলে, তারা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ম্যাকেঞ্জি ফিরে আসেন। ১৭৬৯ সালে বিদ্রোহীদের দমন করতে আসেন আবার। প্রথমে বিদ্রোহীরা যুদ্ধ এড়িয়ে গেলেও শীতের শুরুতে তারা আক্রমণ শুরু করে। ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে যোগ দেন লেঃ কীথের নেতৃত্বে একদল সৈন্য। বিদ্রোহীরা পিছিয়ে গিয়ে পালটা আক্রমণে নেপাল সীমান্তে মোরাঙ্গ অঞ্চলে ইংরেজ বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। সেনাপতি কীথ এই যুদ্ধে নিহত হন।

১৭৬৯-৭০—বাংলা ও বিহারে মহাদুর্ভিক্ষ—''ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাউলের একচেটিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অসংখ্য ব্যবসা-কেন্দ্র খুলিয়া বসিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যবসা হইল এই দুইটি প্রদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন লইয়া খেলা। বিপুল মুনাফার লোভে এই মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা এই নিষ্ঠুর খেলাই আরম্ভ করিল। ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ফসল ক্রয় করিয়া মজুদ করিয়া রাখিত। এবং পরে সময় বুঝিয়া, অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি পাইলে, তাহা ওই চাষিদের নিকটেই বিক্রয় করিত। এইভাবে ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের শাসনের প্রথম হইতেই ভারতের শস্য-ভাণ্ডার বলিয়া কথিত বাংলা ও বিহারকে এক স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করে।

''এই ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা হইতে দেখিয়া ইংরেজ বণিকদের লোভ চরমে উঠে। ইহারা ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ও বিহারের সমগ্র ফসল ক্রয় করিয়া সারা বৎসর মজুদ করিয়া রাখে এবং ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কয়েকগুণ বেশি দামে তাহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু খাজানার দায়ে সর্বস্বান্ত কৃষকের পক্ষে সেই চাউল ক্রয় করা অসম্ভব। সুতরাং কপর্দকহীন কৃষকের ঘরে অন্নাভাবে

হাহাকার উঠিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও বিহারের বুকে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের করালে ছায়া নামিয়া আসিল। ইংরেজ বণিকের সৃষ্ট এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হইল। এই দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সনে ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহাকে সংক্ষেপে বলা হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।"
(ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণ তান্ত্রিকসংগ্রাম— সুপ্রকাশ রায়। পৃঃ ১৩)
তথ্যাদি ও বিভিন্ন বিবরণে জানা যায়, এই দুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

১৭৭০-৭১—বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় বিদ্রোহদের আক্রমণ শুরু। বারবার তারা পরাজিত হয়। ৫০০ বিদ্রোহীকে ইংরেজরা গ্রেপ্তার করে। তাদের স্বীকারোক্তির থেকে জানা যায় তারা সকলেই কৃষক এবং গ্রামের শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ।
—দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি। মহাস্থানগড়ে দুর্গ নির্মাণ। ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে পরাস্ত হয়ে মজনুশাহ এই দুর্গে আশ্রয় নেন।

১৭৭০—ঘাটশিলায় চুয়াড় বিদ্রোহ।

১৭৭০-১৮০০—কৃষক তন্তুবায়দের বিদ্রোহ। শান্তিপুর, ঢাকা, সোনারুদ্দি (কাটোয়া মহকুমা) বিভিন্ন অঞ্চলের তন্তুবায়রা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

১৭৭১—মারাঠাদের দিল্লি অধিকার।
—মারাঠাদের মহীশূর আক্রমণ।

১৭৭২—প্রথম মাধবরাও পেশোয়ার মৃত্যু।
—রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম (১৭৭২-১৮৩৩)।
—নাটোর অঞ্চলে সদলে মজনু শাহ সক্রিয় হয়ে ধনী ও জমিদারদের সম্পত্তি লুঠ এবং ইংরেজ ও তাদের অনুচরদের ধরে নিয়ে যেত। এই সময়ে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহীদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।—রংপুরের বিদ্রোহীদের দমন করতে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আসেন ইংরেজ সেনাপতি টমাস। শ্যামগঞ্জে উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলেও, বিদ্রোহীরা ক্রমশ গভীর জঙ্গলে সরে যেতে থাকে। আর ইংরেজ বাহিনী জঙ্গলে এগিয়ে যায়। বিদ্রোহী বাহিনীর কৌশলে তারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। ইংরেজদের দেশীয় পদাতিক বাহিনী স্বদেশি কৃষকদের ওপর গুলি চালাবার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। টমাস এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। ইংরেজ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

১৭৭৩—রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুমোদন।
—বারাণসীর সন্ধি।
—লাসায় ইংরেজ দূত প্রেরণ।
—জানুয়ারি-সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধারম্ভ—সন্ন্যাসী ফকির ও কৃষকদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ।
—ফেব্রুয়ারি ইংরেজবাহিনী দিনাজপুর জেলার সন্তোষপুরে বিদ্রোহীদের দুর্গ অধিকার করায় বিদ্রোহীরা ভুটানসীমান্তের দিকে সরে যায়।
এইভাবে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরে বিদ্রোহীরা পর্যুদস্ত হলে বগুড়ায় বিদ্রোহীরা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রণক্লান্ত ইংরেজ সৈন্যরা আর বিদ্রোহীদের মুখোমুখি না হয়ে, বিদ্রোহীদের বারো শত টাকা কর দিয়ে আপোস করে। এবার বিদ্রোহীরা

ময়মনসিংহ-জামালপুর মহকুমা হয়ে পূর্ববাংলায় প্রবেশ করার সময় ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের কাছারি লুট—তারপর ঢাকা জেলায় প্রবেশ করে। তারপর বিদ্রোহীরা নানাভাগে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

—মেদিনীপুরে আদিবাসী উপজাতি ঘড়ুই বিদ্রোহ।

১৭৭৩-৭৪ রোহিলা যুদ্ধ

১৭৭৪-মার্চ ২৬—ব্রিটিশ বিধান অনুসারে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত।

১৭৭৪-৮৫—ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস।

১৭৭৫—নন্দকুমারের ফাঁসি।

—মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলে খয়রা ও মাঝি বিদ্রোহ।

১৭৭৫-৮৪—প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

১৭৭৬—পুরন্দরের সন্ধি।

—নভেম্বর ১৪—মজনু শাহের বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদলের সংঘর্ষ। অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর বিপুল ক্ষতি। লেঃ রবার্টসন আঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

—একদল সন্ন্যাসী ও মজনুর অনুচরদের মধ্যে সংঘর্ষ। মজনুর উদ্যোগে বিদ্রোহীদের বিভিন্ন উপদলের সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যায়।

১৭৭৬-৮৭—পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ।

১৭৭৭—মীরকাশিমের মৃত্যু।

১৭৭৮-১৮০০—নীল ও নীলচাষীর সংগ্রাম।

১৭৭৯—তলগাঁও-এর যুদ্ধ।

—ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি।

—রঞ্জিৎ সিংহের জন্ম।

১৭৮০-৮৪—দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

—ভারতে প্রথম কলে ছাপা ৪ পৃষ্ঠার সংবাদপত্র হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রকাশ।

১৭৮০-১৮০৪—লবণ শিল্প ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম।

১৭৮০-১৮০০—রেশম চাষিদের সংগ্রাম।

১৭৮০-৯৩—আফিম চাষিদের সংগ্রাম।

১৭৮১—বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহ ক্ষমতাচ্যুত।

—বারাপকুরে ৪র্থ, ১৫তম ও ১৭তম বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির বিদ্রোহ ঘোষণা।

১৭৮২-৯৯—টিপু সুলতানের রাজত্ব।

১৭৮২-৮২—দিনাজপুরে কৃষক বিদ্রোহ।

১৭৮২—সলবাঈ-এর সন্ধি।

—হায়দর আলির মৃত্যু।

১৭৮৩—এক সহস্র অনুচর সহ মজনুর ময়মনসিংহে প্রবেশ।

—রংপুর বিদ্রোহ।

—মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ দুর্ভিক্ষ।

১৭৮৪—যশোহর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ।

—উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ।

১৭৮৪—জানুয়ারি ১৫—কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন স্যর উইলিয়াম জোন্স।

—টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি—বাঙালোরের সন্ধি।

—পিটের ইন্ডিয়া অ্যাক্ট।

—বারাকপুরে সেনা বিদ্রোহ।

১৭৮৫—ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পদত্যাগ।

১৭৮৫-৮৬—বীরভূমের গণ বিদ্রোহ।

১৭৮৬—ভারতের গভর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ।

১৭৮৬—ডিসেম্বর ২৯—মজনু সদলে বগুড়ায় প্রবেশ করে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মজনু গুরুতর আহত। তার অনুচররা সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে যান বিহারের উত্তর সীমান্তে। সেখানেই মাখনপুর নামক স্থানে মজনুর জীবনাবসান ঘটে।

১৭৮৭—মজনুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য ও ভাই মুশা হন দলনেতা। এবছর মার্চে মুশা দলবল নিয়ে রাজসাহী প্রবেশ করেন। একটি যুদ্ধে মুশার অনুচরদের কাছে রানী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনী পরাস্ত হয়।

—ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানী এই সময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

—মজনুর দুই শিষ্য ফেরাগুল শাহ ও চেরাগালি শাহ দিনাজপুরে কয়েকটি অভিযান চালায়।

১৭৮৮—এপ্রিল ৬—চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী মন্দিরে নরবলি।

১৭৮৯—টিপু সুলতানের ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ।

১৭৮৯-৯১—বীরভূম-বাঁকুড়ায় পাহাড়িয়া বিদ্রোহ।

১৭৯০—ফকির ও সন্ন্যাসীরা কয়েক জন জমিদারের ওপর এবং ইংরেজ কুঠিতে আক্রমণ চালায়।

১৭৯০-৯২—তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৯২—মুশা ও ফেরাগুল শাহের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

—মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও মারবাড়ে বিদ্রোহ।

—টিপু সুলতানের পরাজয় ও শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি।

—বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া বিদ্রোহ।

১৭৯৩—বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি। এতদিন গ্রামাঞ্চলে জমিদারদর উপর ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। এখন থেকে সে দায়িত্ব বর্তায় দারোগা ও পুলিশ বাহিনীর ওপর।

—এই সময়ে ফকির ও সন্ন্যাসী বাহিনী বাংলা, বিহার নেপাল সীমান্ত, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মালদহ রাজসাহী ও রংপুর অঞ্চলে, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে সক্রিয় ছিল।

—চার্টার অ্যাক্ট।

১৭৯৫—সমুদ্রযাত্রার নির্দেশের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের প্যারেড গ্রাইন্ডে ১৫নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির বিদ্রোহ। তারা অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশও অমান্য করে। প্যারেড গ্রাউন্ডে সেনাবাহিনীর ওপর গুলি বর্ষণ।

—অহল্যাবাই-এর মৃত্যু।

১৭৯৬—যশোহর খুলনায় প্রজা বিদ্রোহ।
১৭৯৭—ফকির নেতা সোভান আলি দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার সক্রিয় হয়ে ওঠে। ডিসেম্বর মাসে সোভান আলি একজন ফকির আমুদী শাহের দলে যোগ দেয়। কিন্তু দলটি ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়।
১৭৯৭-৯৯—উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফকির ও সন্ন্যাসী আক্রমণ।
১৭৯৮—গভর্নর জেনারেল পদে ওয়েলেসলি।
১৭৯৮-৯৯—দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ।
১৭৯৯—চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।
—তাঞ্জোর রাজ্যের আনুগত্যমূলক মৈত্রীচুক্তি।
—টিপু সুলতানের মৃত্যু।
—মহীশূর রাজ্য বিভাগ।
—ওয়াজেদ আলির সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ।
১৭৯৯-১৮৩৯—পঞ্জাবের রঞ্জিত সিংহের লাহোর দখল এবং 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ এবং ঐক্যবদ্ধ পঞ্জাব রাজ্য গঠনের উদ্যোগ।
১৮০০—নিজামের সঙ্গে আনুগত্যমূলক মৈত্রী চুক্তি।
—মহীশূর বিদ্রোহ।
—কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা।
—উত্তরবঙ্গে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহীরা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।
১৮০১—কর্ণাটকের ইংরেজ শাসনভুক্তি।
—ইংরেজের কাছে অযোধ্যার বশ্যতা স্বীকার।
—অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে ইংরেজ গোরখপুর লাভ করে।
১৮০২—বেসিনে পেশোয়া বাজীরাও এবং ইংরেজদের মধ্যে আনুগত্য চুক্তি। বোম্বাই-এ দুর্ভিক্ষ।
১৮০৩-০৫—দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।
১৮০৩—অসই-এর যুদ্ধ।
—ইংরেজ-ভোসলে সংঘর্ষ এবং দেওগাঁও-এর সন্ধি।
১৮০৩-০৪—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ।
১৮০৪—ভারতে প্রথম ক্রিকেট খেলার উদ্যোগ।
—ইংরেজ-সিন্ধিয়া চুক্তি
—ইংরেজ-হোলকার যুদ্ধ এবং ইংরেজের পরাজয়।
১৮০৪-১৮১৭ ওড়িশায় জমিদার বিদ্রোহ।
—পলিগার বিদ্রোহ।
১৮০৫—লর্ড ওয়েলেসলির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।
—বিলাসপুরে রাজপুত বিদ্রোহ।
—ত্রিবাঙ্কুরে দেওয়ান ভেলু তামাদির বিদ্রোহ।
—রণজিৎ সিংহের অমৃতসর অধিকার।
—জঙ্গলমহল জেলার সৃষ্টি।
১৮০৫-০৭—মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।
১৮০৬—ভেলোরে সিপাহি বিদ্রোহ।

১৮০৬-১৬—মেদিনীপুরে নায়েক বিদ্রোহ।
১৮০৭-১৩—ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড মিন্টো।
১৮০৭—দিল্লি অঞ্চলে সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান।
১৮০৮—মিন্টো কর্তৃক দিনেমারদের শেষ ঘাঁটি শ্রীরামপুর অধিকার।
১৮০৯—জানুয়ারি ২—কলকাতায় নোট প্রচলনকারী বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সূচনা।
—এপ্রিল ১৮—হেনরী ডিরোজিওর জন্ম।
—অমৃতসরের সন্ধি।
১৮১০—বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রাক্তন সেনাপতি আবদুর রহমানের নেতৃত্বে বোহরা মাহদি বিদ্রোহ।
১৮১১-১৪—মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।
১৮১২-১৩—রাজপুতানা ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ।
১৮১২—ময়মনসিংহ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ।
১৮১৩—চার্টার অ্যাক্ট—ভারত নিয়ন্ত্রণ আইন।
১৮১৩-২৩—গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড হেস্টিংস (ময়রা)।
—ব্রহ্ম রাজ বোদোপোয়া কর্তৃক মণিপুর দখল।
—রণজিৎ সিংহের আটক অধিকার।
১৮১৪—এপ্রিল কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরের উদ্বোধন।
—এপ্রিল ৭—কলকাতা-বারাকপুর রয়াল মেল কোচ সার্ভিস চালু।
১৮১৪-১৬—ইঙ্গ-গোর্খা যুদ্ধ।
১৮১৪—বারাণসীর অদূরে সশস্ত্র রাজপুত কৃষক প্রতিরোধে একটি বড় গ্রামের অবাধ নিলাম বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়।
—রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠিত।
১৮১৫-৩১ কচ্ছে অসংখ্যবার বিক্ষোভ।
১৮১৬—সগৌলির সন্ধি।
—নতুন আবাসিক কর প্রবর্তনের প্রতিবাদে বারাণসীতে হরতাল পালিত হয়।
—নতুন পুলিশী কর প্রবর্তনের প্রতিবাদে বেরিলিতে হরতাল।
১৮১৬-৩২—সৌরাষ্ট্রে অব্যাহত বিদ্রোহ।
১৮১৭—পিণ্ডারি দমন।
—সৈয়দ আহমদ খাঁর জন্ম (১৮১৭-৯৮)।
—পেশোয়ার সঙ্গে ইংরেজের চুক্তি।
—কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।
—মহিদপুরের যুদ্ধে ইংরেজের কাছে হোলকারের পরাজয়।
১৮১৭-১৮—জনৈক সামন্তের নেতৃত্বে ওড়িশায় কৃষক বিদ্রোহ।
১৮১৭-১৯—তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।
১৮১৮—পেশোয়ার ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ।
—প্রেস রেগুলেশন অ্যাক্ট।
—তিন আইন (রেগুলেশন-৩) চালু।
১৮১৮-৩২—ভিল বিদ্রোহ।
১৮১৯—সন্দ্বীপে তৃতীয় বিদ্রোহ।

১৮২০—মার্চ ২৩—ভারতীয়দের জোর করে কুলির কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ।
—রাজপুতানায় মের বিদ্রোহ।
—পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শক্তিশালী শিখরাজ্য গঠিত।
—ময়মনসিংহ 'হাতি খেদা বিদ্রোহ'।
—**ওয়াহাবী আন্দোলন**—ইংরেজ কোম্পানির কর্মকর্তারা সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে। যে কারণে, দেশীয় রাজ্যগুলির স্বত্ব বিলোপের নীতি তারা গ্রহণ করে। নিঃসন্তান রাজার দত্তক পুত্রকে মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৮৪৮-৫৮ সালের মধ্যে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। তাঞ্জোর এবং কর্ণাটকের (আর্কট) অধিকার কোম্পানি কৌশলে করায়ত্ত করে। হায়দরাবাদের নিজামের অধিকার ভুক্ত বেরারের সমৃদ্ধ তুলা চাষ এলাকা কেড়ে নেওয়া হয়। ১৮৩১ সালের পর মহীশূরও ধীরে ধীরে চলে আসে কোম্পানির অধিকারে। ১৮৫৬ সালের পর ভারতের মানচিত্র থেকে হারিয়ে যায় অযোধ্যা।
বিক্ষোভ আর বিদ্রোহে ভারতের সর্বত্র এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু সেই সব ক্ষণস্থায়ী বিক্ষোভ। বিদ্রোহ সহজে দমন করা হলেও, ওয়হাবী বিদ্রোহ কিন্তু ইংরেজ সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। "এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হোলকারদের অন্যতম প্রাক্তন সেনাপতি সৈয়দ আহমদ বারেল্‌বী (১৭৮৬-১৮৩১)। তিনি ভারত দখলকারী 'বিধর্মীদের' বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তার আহ্বানে বাংলা ও বিহারের মুসলিম কৃষক ও শহরের কারিগর ও ছোট দোকানদাররা সাড়া দেয়। ওয়াহাবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘোষিত সামাজিক ন্যায়ের নীতিভিত্তিক সমাজ পুনর্গঠনের আহ্বানও জানায়। অবশ্য, এই ন্যায়নীতির কাঠামো ছিল খুবই অস্পষ্ট। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসকরা ওয়াহাবীদের বিহার থেকে বিতাড়িত করলে তারা পুশতু উপজাতিদের এলাকা সিতানায় অনুপ্রবেশ করে। সেখানে শিখদের সঙ্গে ওয়াহাবীদের সংঘাত বাঁধলে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ নিহত হন। তা সত্ত্বেও বাংলা ও বিহারের ওয়াহাবী বারাসাত অঞ্চলের একটি ছোট শহর দখলের পর কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়। একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর কামানের গুলিতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।
"হাজি শরিয়তউল্লার নেতৃত্বাধীন ফারাজী আন্দোলন ছিল ওয়াহাবীদেরই একটি উপশাখা। হিন্দু মুসলমান জমিদার ও ব্রিটিশ নীলকর নির্বিশেষে সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এরা সহিংস প্রতিশোধ গ্রহণ করত। বাংলায় এটি ছিল মূলত মধ্যযুগীয় ধরনের একটি কৃষক আন্দোলন। তাদের পূর্ববর্তী ওয়াহাবীদের মতো এরাও বিশুদ্ধ ইসলামের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরত এবং খোদার দুনিয়ায় সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা বলত। তারা ঘোষণা করত যে, তাদের সম্প্রদায়ের সকল সভ্যই সমান। জমির মালিক খোদা ও নিজ স্বার্থে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার কারও নেই। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে পাটনার ওয়াহাবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা কৃষক ও শহুরে মানুষের বিশেষভাবে বাংলার সিপাহিদের সাদর সমর্থন পেয়েছিল।" ভারতবর্ষের ইতিহাস—কোঃ আন্তোনোভা, গি. বোনগার্দ লোভিন, গি. কতোভস্কি মস্কো। পৃঃ ৪৩২-৩৩

১৮২১-২২—ব্রহ্মরাজ পগিদোয়ার আসাম দখল।

১৮২২—কলকাতায় সেন্টপল্‌স স্কুল প্রতিষ্ঠা।

—মার্চ ২৮—উর্দু ভাষার প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র জাম-ই-জাহান নুমা প্রকাশিত।

১৮২৩—মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।

১৮২৪—জানুয়ারি ২৪—মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্ম।

—কোল বিদ্রোহ।

—কিট্টুরে কৃষক বিদ্রোহ।

—হরিয়ানায় কৃষক বিদ্রোহ।

—বারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহ। মৃত্যু, ধ্বংস, সশ্রম দণ্ড, অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে দমন করা হয় এই বিদ্রোহ। "১৮২৪ সালেব নভেম্বর মাসে বারাকপুর প্যারেড গ্রাউন্ডের বিদ্রোহী সিপাহিদের ফাঁসি কাঠের জায়গায় যে শিশু বটবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল, ১৮৫৭ সালে তা শহিদ সিপাহিদের জীবন্ত স্মারক হয়ে মহীরূপে পরিণত হয়। কোয়ার্টার্স গার্ডের কুঠুরিতে সশ্রদ্ধায় সংরক্ষিত রামদীন তেওয়ারী ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতার ব্যবহৃত নিত্য পূজার সামগ্রীর প্রতি ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত শহিদ মঙ্গল পাণ্ডেসহ সেনানিবাসে কর্মরত দুই লক্ষাধিক সিপাহি প্রতিদিন শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে দীক্ষিত হয়েছে বিদ্রোহীমন্ত্রে। বারাকপুরের বিদ্রোহী শহিদ সিপাহিদের এই গৌরবময় স্মৃতি শুধু প্যারেড গ্রাউন্ডে সীমিত থাকেনি। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের মধ্যে প্রতিটি সিপাহির অন্তরে অনির্বান শিখার মতো প্রজ্বলিত ছিল।..." [ব্যারাকপুরের প্রথম সিপাহি বিদ্রোহ ১৮৫৭—প্রেমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ১৬৬]

১৮২৪-২৫—বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষ।

১৮২৪-২৬—প্রথম ইঙ্গবার্মা যুদ্ধ।

১৮২৪-২৯—কিট্টুর অভ্যুত্থান।

১৮২৫—দাদাভাই নৌরজির জন্ম (১৮২৫-১৯১৭)

১৮২৫-২৭—ময়মনসিংহে প্রথম পাগলপন্থী বিদ্রোহ।

১৮২৬—য়ান্দাবুর সন্ধি।

—ইংরেজদের ভরতপুর অধিকার।

—রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা।

১৮২৬-২৯—সমগ্র পুনা জেলায় মহারাষ্ট্র সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট রামসি বিদ্রোহ। সরকার বাধ্য হয়ে মেনে নেয় প্রজাস্বত্ব ভোগীদের কম খাজনার দাবি।

১৮২৮—ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত।

—ফেব্রুয়ারি ১৯—মির্জা গালিবের কলকাতা আগমন।

—গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

১৮২৯—জানুয়ারি ৭—এশিয়াটিক সোসাইটিতে সর্বপ্রথম বাঙালি সদস্য দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস, রসময় দত্ত এবং রামকমল সেন নির্বাচিত।

—সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৮২৯-৩০—ঠগী দমন।

১৮৩০ নভেম্বর ৬—তিতুমীরের পুড়াগ্রাম আক্রমণ।

১৮৩০-৩১—মহীশূরের বেদনায় খাজনা বৃদ্ধির কারণে কৃষক বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমনে সৈন্য প্রেরণ।
১৮৩০-৪৮—নীল চাষির সংগ্রাম।
১৮৩০-৩৪—ভিজাগাপত্তনমে গণ-অভ্যুত্থান।
১৮৩১—মহীশূরে কোম্পানির শাসন।
—ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু।
—মহীশূরে বিদ্রোহ।
১৮৩১-৩২—বাংলা প্রেসিডেন্সির ছোটনাগপুরে হোস উপজাতির বিদ্রোহ।
১৮৩২—কাছাড় ইংরেজ রাজ্যভুক্ত।
১৮৩২-৩৩—দ্বিতীয় পাগলপন্থী (আরা) বিদ্রোহ।
১৮৩২—মালভূম অঞ্চলে ভূমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা।
১৮৩৩—চার্টার অ্যাক্ট—ভারত নিয়ন্ত্রণ আইন বিধি।
—কোম্পানির জমির মালিকানা গ্রহণ ও কারখানা স্থাপনের অধিকার লাভ।
—মানভূম জেলার জন্ম।
—রামমোহন রায়ের মৃত্যু।
১৮৩৩-৩৫—মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই-এ দুর্ভিক্ষ।
১৮৩৪ এপ্রিল ৫—রামমোহন রায়ের প্রথম স্মৃতিসভা।
—ইংরেজদের কুর্গ দুর্গ দখল।
১৮৩৫ মার্চ ৭—ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে বেন্টিঙ্কের বিধিবদ্ধ প্রস্তাব গ্রহণ।
১৮৩৫-৩৭—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গুম সুরে বকেয়া খাজনার দায়ে স্থানীয় সামন্তের জমিদারি বাজেয়াপ্ত এবং ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের প্রতিবাদে কৃষক বিদ্রোহ।
১৮৩৬—কলকাতায় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৭-৩৮—উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ।
১৮৩৭-৮২—ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ।
১৮৩৮ এপ্রিল ১—কলকাতা মেডিকেল কলেজে ২০ শয্যা বিশিষ্ট আবাসিক হাসপাতালের উদ্বোধন।
—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম (১৮৩৮-৯৪)
—হায়দরাবাদে ব্রিটিশ প্রতিনিধি নিয়োগ।
১৮৩৮-৪৭—ফরিদপুরে ফরাজি বিদ্রোহ।
১৮৩৮-৪২—প্রথম আফগান যুদ্ধ।
১৮৩৯—রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু।
—মার্চ ৩—জামসেদজি নাসেরওয়ানজী টাটার জন্ম
—শাহীয়াদ্রীতে কোল বিদ্রোহ।
১৮৪০—জানুয়ারি ১৮—প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত।
১৮৪১—আফগান অভ্যুত্থান এবং ব্রিটিশ সেনানায়ক বার্নসকে হত্যা।
১৮৪২—ইংরেজের কর্নুল দখল।
—আফগান যুদ্ধে ইংরেজদের বিপর্যয়।

—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিলাত যাত্রা।
—সগরে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের প্রতিবাদে অভ্যুত্থান।
—ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ এলাকায় বিদ্রোহ।
১৮৪৩—এপ্রিল ২০—বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত।
—ইংরেজের সিন্ধু দখল।
—মিয়ানী ও দারো-র যুদ্ধে আমীরদের পরাজয়।
—সিন্ধিয়ার মৃত্যু।
—গোয়ালিয়রের যুদ্ধ।
—দাসপ্রথা বিলোপ।
১৮৪৪—ভূমি রাজস্ববৃদ্ধির প্রতিবাদে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সীমান্তবর্তী কোলাপুর ও সান্তওয়াদী রাজ্যে প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ।
১৮৪৪-৯০—ত্রিপুরায় কৃষক বিদ্রোহ।
১৮৪৪-৪৬—শাহীয়াদ্রিতে কোল বিদ্রোহ।
১৮৪৫—মাড়োয়াড়ি মহাজনদের বিরুদ্ধে রাজস্থানের ভীল চাষিদের বিদ্রোহ কৃষক নেতা ভাংগ্রিয়ার নেতৃত্বে। ক্ষিপ্ত কৃষকরা মাড়োয়াড়ি মহাজনদের দেখা পেলেই তাদের নাক ও কান কেটে দিত। মহাজনরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।
১৮৪৫-৪৬—প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ।
১৮৪৬—লাহোরের সন্ধি।
—ওড়িশায় গোন্ড বিদ্রোহ।
১৮৪৬-৪৭—পালায়াক্কারের নেতৃত্বে কার্নালে কৃষক বিদ্রোহ।
—নাগপুরে রোহিলাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান।
১৮৪৭—ফেব্রুয়ারি ১০—কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম।
—শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম।
১৮৪৮-এপ্রিল ২৯—চিত্র শিল্পী রবি বর্মার জীবনাবসান।
—দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯)।
—সমগ্র ভারত ইংরেজের দখলে।
—গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড ডালহাউসি।
—দত্তক গ্রহণ অবৈধ ঘোষিত।
—ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ।
১৮৪৮-৫৮—সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর ও অন্যান্য রাজ্য অস্তিত্বের বিলুপ্তি।
১৮৪৯—ইংরেজের মুলতান অধিকার।
—পঞ্জাব ইংরেজ দখলে।
১৮৫০—সিকিমের একাংশ দখল করে ইংরেজ।
—ইংরেজের সম্বলপুর দখল।
—তিপ্‌রা বিদ্রোহ।
১৮৫১—বোম্বাইয়ে প্রথম ভারতীয় কাপড়কল স্থাপিত।
—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।
১৮৫২—দ্বিতীয় ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ।
—ব্রিটিশ বাহিনীর রেঙ্গুন ও প্রোম দখল।

—বোম্বাই প্রদেশের মাড়োয়ারি শোষিত গ্রামাঞ্চল শোলপুরে কৃষক বিদ্রোহ। মাড়োয়ারি মহাজনরা প্রাণভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। একজন কুখ্যাত মাড়োয়ারি মহাজন কৃষকদের হাতে নিহত হয়। পুলিশ কয়েকজন কৃষককে গ্রেপ্তার করে। এবং মহাজনদের গ্রামে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে।

—গুজরাটের একটি গ্রামে মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ। কৃষকদের হাতে একজন কুখ্যাত মহাজন নিহত।

১৮৫৩—ইংরেজ বাহিনীর নাগপুর ও বেরার দখল।

—চার্টার অ্যাক্ট।

—বোম্বাই এবং টানার মধ্যে প্রথম রেলপথ।

১৮৫৪—মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।

১৮৫৫—এপ্রিল ১৭—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ প্রকাশিত।

১৮৫৫-৫৬—সাঁওতাল বিদ্রোহ—'সাঁওতাল পরগণা ও বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল জুড়িয়া সাঁওতাল কৃষকদের যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহা প্রথমে জমিদার ও মহাজন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরম্ভ হইলেও ক্রমশ ইহা সাঁওতাল পরগণার স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়। সাঁওতাল নায়ক সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে লক্ষাধিক সাঁওতাল সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে অভিযান করে। প্রথমে জমিদার ও মহাজন গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্যই এই অভিযান চালিত হইয়াছিল। কিন্তু পথিমধ্যে জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী এবং পুলিশ এই অভিযাত্রী বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলে সাঁওতাল বিদ্রোহ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর কাল এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। এই দুই বৎসরে কয়েকটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সাঁওতালদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সমগ্র সাঁওতাল পরগণা, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কতিপয় অঞ্চলও ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হয়। অবশেষে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ও জমিদার- মহাজনগণ তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল এবং সামরিক শক্তি সমবেত করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়।"

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।—সুপ্রকাশ রায়। পৃঃ ৪৩

১৮৫৬—জানুয়ারি ৩—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম অধিবেশন।

—জানুয়ারি ২০—বিপ্লবী ও রাজনীতিজ্ঞ অশ্বিনীকুমার দত্তর জন্ম।

—লালা লাজপৎ রায়ের জন্ম।

—বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্ম (১৮৫৬-১৯২৭)

—ইংরেজের অযোধ্যা দখল। ভারতের মানচিত্র থেকে অযোধ্যা রাজ্যের বিলুপ্তি।

১৮৫৭—কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত।

১৮৫৭ জানুয়ারি ২২—দমদম অস্ত্রাগারে গোরু ও শূকর চর্বিতে এনফিল্ড কার্তুজ নির্মাণের গুজব প্রচারিত হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৬—বহরমপুরে ১৯নং নেটিভ ইনফেনট্রিতে বিদ্রোহ।

মার্চ ২৯—বারাকপুরে ৩৪নং নেটিভ ইনফেনট্রির সিপাহি মঙ্গলপাণ্ডের বিদ্রোহের আহ্বান।

এপ্রিল ৮—বিদ্রোহের অপরাধে মঙ্গলপাণ্ডের ফাঁসি।

—আম্বালায় অশান্তি ও গৃহদাহের ঘটনা। লখনউ-এ ৪৮নং নেটিভ ইনফেনট্রিতে বিদ্রোহ। মীরটে ৩য় লাইট ক্যাভালরিতে ফায়ারিং প্যারেড।

এপ্রিল ২১—মঙ্গল পাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি জানাবার অপরাধে সিপাহি ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি।

মে ১০—মীরাটে সিপাহি বিদ্রোহ—বিদ্রোহীদের দিল্লি অভিযান।

মে ১১—বিদ্রোহীদের দিল্লি দখল। য়ুরোপীয়দের নৃশংসভাবে হত্যা।

মে ১২—বিদ্রোহী সিপাহিদের দিল্লি প্রবেশ।

মে ১৩—বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহ জাফরকে দিল্লির মুঘল সম্রাট ঘোষণা করে।

মে ১৬—গভর্নর জেনারেল ক্যানিং ঘোষণা করেন, সরকার প্রজাদের জাত-ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

মে ১৯—ইটোয়ার পশ্চিমে যশোন্তনগর মীরটের সেনারা ঘিরে ফেলে।

—জেলাশাসক ও কালেক্টর হিউম পশ্চাদপসরণ করেন।

—দোয়াব অঞ্চলের মণিপুর জেলায় সেনা উত্থান।

মে ২৩—আগরায় আতঙ্ক।

মে ২৫—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হোতিমরদানে ৩৫নং নেটিভ ইনফেনট্রির বিদ্রোহ।

মে ২৮—রাজপুতানার নাসিরাবাদে বিদ্রোহ।

মে ৩০—মথুরা ও লখনউ সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ।

মে ৩১—রোহিলখণ্ডের শাহজাহানপুর, ভরতপুর এবং বেরিলিতে সিপাহি বিদ্রোহ।

জুন ৩—নিমকে সেনাবাহিনীর দলত্যাগ।

জুন ৪—কানপুরে বিদ্রোহ—নেতৃত্বে নানাসাহেব।

জুন ৫—কানপুরে ২নং অশ্বারোহী বাহিনীতে বিদ্রোহ।

—ঝাঁসিতে সেনবাহিনী বিদ্রোহ।

জুন ৬—এলাহাবাদে ৬নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর বিদ্রোহ।

—কানপুরে পরিখা অবরোধ।

জুন ৭—আলিপুরে অবস্থিত বাহিনীতে যোগ দেন উইলসন ও বার্নাড।

জুন ৮—বদলি-কি-সরাই-এর যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাস্ত।

জুন ১০—নওগাঁও এ সেনাবাহিনীর দল ত্যাগ।

জুন ১১—লখনউতে পুলিশ বিদ্রোহ।

—নীল এলাহাবাদে উপস্থিত।

জুন ১৪—গোয়ালিয়রে সেনাবাহিনীর দলত্যাগ।

জুন ২৫—কানপুরে হুইলারকে কয়েকটি শর্ত জানান।

জুন ২৭—সতীচৌড়া ঘাটে হত্যাকাণ্ড—স্যর হুইলারের মৃত্যু।

জুন ৩০—লখনউ রেসিডেন্সি অবরোধ।

—চিনহাটায় নারকীয় ঘটনা।

জুলাই ১—ইন্দোরে বিদ্রোহ।

—পিথুরে নানা সাহেব পেশোয়া ঘোষিত।

জুলাই ২—বেরিলির বখত খাঁর নেতৃত্বে সেনা বাহিনীর দিল্লি প্রবেশ।
জুলাই ৪—লখনউ-এ স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু।
জুলাই ৫—লখনউ-এর বিরজিস কাদেরকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা।
—কলেরায় জেনারেল বার্নার্ড-এর মৃত্যু।
জুলাই ৭—হ্যাভলক বাহিনীর এলাহাবাদ থেকে কানপুর যাত্রা।
জুলাই ১৫—কানপুরে বিবিঘরে হত্যাকাণ্ড।
জুলাই ১৭—কানপুরের যুদ্ধে নানাসাহেব বিপর্যস্ত।
—কানপুরে নানাসাহেবকে পরাস্ত করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যাভলক।
জুলাই ২৫—দানাপুরে বিদ্রোহী কুঁওর সিং-এর সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহিদের আঁতাত।
জুলাই ২৭—আরা অবরোধ শুরু।
জুলাই ২৯—উনাও-এর যুদ্ধে হ্যাভলক জয়ী।
আগস্ট ৫—বসিরহাটগঞ্জে বিদ্রোহীদের পরাস্ত করেন হ্যাভলক।
—পুরুলিয়ার রামগড় ছাউনিতে সেনা বিদ্রোহ।
আগস্ট ১৩—হ্যাভলকের কানপুরে পশ্চাদপসরণ।
—ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে জেনারেল কলিন ক্যাম্পবেলের কলকাতায় আগমন।
আগস্ট ১৪—দিল্লি রিজে ভ্রাম্যমাণ বাহিনীসহ জন নিকলসন উপস্থিত।
আগস্ট ১৬—বিদ্রোহী বাহিনীকে বিঠুরে পরাস্ত করেন হ্যাভলক।
সেপ্টেম্বর ৫—জেমস আউটরামের কানপুরে আগমন।
সেপ্টেম্বর ১৪—দিল্লির ওপর আঘাত শুরু।
সেপ্টেম্বর ১৯—কানপুর থেকে হ্যাভলক ও আউটরামের বাহিনীর যাত্রা শুরু।
—লখনউ থেকে মহিলা ও শিশুদের সরিয়ে নেওয়া হয়।
সেপ্টেম্বর ২০—ইংরেজ বাহিনীর দিল্লি পুনর্দখল।
২১—বাহাদুর শাহ বন্দি।
২২—হাডসন হত্যা করেন বাহাদুর শাহের পুত্রদের।
অক্টোবর ১০—আগরায় বিদ্রোহীদের পরাস্ত করেন গ্রেট হেড।
—লখনউ অবরোধ অব্যাহত।
নভেম্বর ৯—লখনউ থেকে পালিয়ে আসেন কাভানাগ।
নভেম্বর ১৭—লখনউ-এ অবরুদ্ধ স্বদেশবাসীর জন্য খাবার সরবরাহ করেন ক্যাম্পবেল।
নভেম্বর ১৯—লখনউ থেকে নারী ও শিশুদের সরিয়ে আনা হয়।
নভেম্বর ২২-২৩—লখনউ থেকে ইংরেজ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ।
নভেম্বর ২৮—কলেরায় আক্রান্ত হ্যাভলকের মৃত্যু।—মৃত্যুর আগে নাইট উপাধি পান।
—কানপুরে তাতিয়া টোপি এবং গোয়ালিয়র বাহিনী জেনারেল উইন্ডহ্যামকে পরাস্ত করে।
ডিসেম্বর ৬—তৃতীয় কানপুর যুদ্ধে ক্যাম্পবেলের হাতে তাঁতিয়া টোপি পরাস্ত।
—ইংরেজদের কানপুর পুনর্দখল।

১৮৫৮ জানুয়ারি ২—খুদাগঞ্জে ফররুখাবাদের নবাব ও বখত খাঁকে পরাস্ত করেন ক্যাম্পবেল।

জানুয়ারি ১৬—ফতেগড় পুনর্দখল করেন ক্যাম্পবেল।

মার্চ ২—ক্যাম্পবেলের লখনউ অভিযান শুরু।

মার্চ ২১—স্যর হিউরোজের ঝাঁসি আগমন।

—ইংরেজরা লখনউ পুনর্দখল করে।

এপ্রিল ৩—ঝাঁসি দখল করেন হিউরোজ।

—রানি লক্ষ্মীবাই-এর কুলপিতে আশ্রয় গ্রহণ।

এপ্রিল ১৯—বান্দার নবাব ভাওরাগড়ে মেজর জেনারেল হুইটলক কর্তৃক পরাস্ত।

এপ্রিল ২৩—জগদীশপুরে কুঁওর সিং আহত হলেও তিনি ক্যাপ্টেন লে গ্রান্ডের বাহিনীকে পরাস্ত করেন—কুলপিতে প্রবেশ করেন হিউরোজ।

মে ২৩—কাল্‌পিতে ঝাঁসির রানি। বান্দার নবাব রাওসাহেব এবং তাঁতিয়া টোপির পরাজয়।

জুন ৫—মৌলবি আহমদুল্লাহ শাহের মৃত্যু।

জুন ১৭—কোটা-কি সরাই-এর যুদ্ধে ঝাঁসির রানির মৃত্যু।

জুন ১৯—ইংরেজ দখলে গোয়ালিয়র।

আগস্ট ২—উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ ইংল্যান্ডের মহারানির। ইংল্যান্ডে পার্লামান্টের দুটি কক্ষে ইন্ডিয়া বিল পাশ।

নভেম্বর ১—সারা ভারতে মহারানির ঘোষণাপত্র প্রচার। বলা হয়, কোম্পানি শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসনভার গ্রহণ।

—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলোপ।

১৮৫৯—জানুয়ারি ৪—হোপগ্রান্ট পরাস্ত করেন বালা রাওকে।

—অযোধ্যার বিদ্রোহীদের তরাই অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ। এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় নানা সাহেব, বিরজিস কাদিব, হজরত মহল, জোয়ালাপ্রসাদ এবং খাঁ বাহাদুর খাঁ।

মার্চ ৪ বিদ্রোহী ২০০ জন সিপাহিকে আন্দামানে নতুন উপনিবেশ গড়ার কাজে নিয়োগ।

মার্চ ২৯—দিল্লির সম্রাটের বিচার ও শাস্তি। রেঙ্গুনে নির্বাসন।

এপ্রিল ৭—নেপালের জঙ্গলে তাঁতিয়া টোপি গ্রেপ্তার।

এপ্রিল ১৮—তাঁতিয়া টোপির মৃত্যুদণ্ড।

জুলাই ৮—বিদ্রোহের অবসান শেষে লর্ড ক্যানিংয়ের রাষ্ট্রে 'শান্তি' ঘোষণা।

১৮৫৯—ভারতের প্রথম প্রজাস্বত্ব আইন (বাংলার ভূমিরাজস্ব আইন)।

১৮৫৯-৬০—বাংলায় নীল বিদ্রোহ।

কার্ল মার্কস

"ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী" থেকে উদ্ধৃতি

১৮৫৬—নবাবের কুশাসনের জন্য **অযোধ্যা আত্মসাৎ।—পঞ্জাবের মহারাজা দলীপ সিংহ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। অহংকারপূর্ণ** একটি "**বিদায়কালীন কার্যবৃত্তি**" লিখে ডালহৌসির প্রত্যাবর্তন; অন্যান্য জিনিসের মধ্যে **খাল, রেলপথ, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ** নির্মাণ; অধিকারভুক্ত অযোধ্যার আয় বাদ দিয়েও **রাজস্বে ৪০ লক্ষ পাউন্ডের বৃদ্ধি**; কলকাতায় বাণিজ্যকারী **জাহাজের** বাহিত মালের পরিমাণ প্রায় **দ্বিগুণ বেশি**; বস্তুত **সরকারি খাতে** ঘাটতি, কিন্তু তার কারণ পূর্ত কর্মে (public works) মোটা খরচ।—**এ জাঁকজমকের জবাব এল সিপাহি বিপ্লব** (১৮৫৭—১৮৫৯)।

১৮৫৭—সিপাহি বিদ্রোহ। কয়েক বছর হল সিপাহি বাহিনী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল : **অযোধ্যার ৪০,০০০ সৈন্য** এতে ছিল, বর্ণ ও জাতির সূত্রে তারা বদ্ধ; সে বাহিনীতে একই নাড়ীর টান সবায়ের মধ্যে, উপরওয়ালারা কোনো রেজিমেন্টকে অপমান করলে সে আপমান লাগত সবায়ের গায়ে; অফিসাররা ক্ষমতাবিহীন; শৃঙ্খলার অভাব; **প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রায় ঘটত**, কোনোক্রমে তার দমন চলত; **রেঙ্গুন আক্রমণে সমুদ্র পাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করল বেঙ্গল** আর্মি, **ফলে তাদের জায়গায় আনতে হয় শিখ রেজিমেন্টগুলিকে** (১৮৫২)। (এ সমস্ত [ঘটে] **পঞ্জাব আত্মসাৎ করার** পর—১৮৪৯-এ —এবং ১৮৫৬-এ **অযোধ্যা গ্রাসের** পর [অবস্থা] আরও খারাপ হয়।) **স্বেচ্ছাচারী কাজ** করে লর্ড ক্যানিং প্রশাসন শুরু করেন; তখন পর্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সিপাহিদের রেগুলেশন মাফিক ভর্তি করা হত **পৃথিবীর যে কোনো স্থানে কাজের জন্য**, আর **বাঙালিদের শুধু ভারতে কাজের জন্য**; ক্যানিং "**কর্মস্থান নির্বিশেষে সৈন্যশ্রেণিভুক্তি ব্যবস্থা" চালু করলেন বঙ্গে**। এটিকে জাতিপ্রথা অবসানের প্রয়াস ইত্যাদি বলে নিন্দা করে "ফকিরেরা"।

১৮৫৭-র গোড়ার দিকে সেইমাত্র প্রচলিত **শূকর ও গরুর চর্বি মাখানো টোটার** (পামের) **প্রবর্তন, ফকিররা** বলতে লাগল, ইচ্ছে করে করা হয়েছে যাতে **প্রত্যেক সিপাহি জাত খোয়ায়**।

সুতরাং **বারাকপুরে** (কলকাতার কাছে) এবং **রানিগঞ্জে** (বাঁকুড়ার কাছে) **সিপাহি বিদ্রোহ**।

২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে, **হুগলির** উপরে) সিপাহি বিদ্রোহ; **মার্চে** বারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহ : এ সমস্তই [ঘটে] **বঙ্গে** (বলপূর্বক দমিত)।

মার্চ ও এপ্রিল আম্বালা ও মীরটের সিপাহিরা বারবার গোপনে **নিজেদের ব্যারাকে আগুন লাগাত; অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লোকেদের ওসকাতে লাগল ফকিররা। **বিঠুরের** (গঙ্গাকূলে) **রাজা নানাসাহেব রাশিয়া,**

পারস্য, দিল্লির রাজন্য এবং **অযোধ্যার ভূতপূর্ব রাজার** সঙ্গে চক্রান্ত করছিলেন, চর্বি-মাখানো টোটার দরুন **সিপাহিদের মধ্যে গণ্ডগোলের** সুবিধা নিলেন।

২৪ এপ্রিল লখনউতে ৪৮ নং বেঙ্গল (রেজিমেন্ট) **৩নং দেশীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনী, ৭ নং অযোধ্যা ইরেগুলার্সের বিদ্রোহ** ইংরাজ সৈন্য আনিয়ে **দমন করলেন স্যর হেনরি লরেন্স। মীরটে** (দিল্লির উত্তর-পূর্বে) **১১নং এবং ২০নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী** ইংরাজদের আক্রমণ করে নিজেদের অফিসারদের গুলি করে মেরে শহরে আগুন লাগিয়ে সমস্ত ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে **চলে গেল দিল্লিতে।**

দিল্লিতে রাত্রিবেলায় **কিছু বিদ্রোহী** ঘোড়ায় চেপে ঢুকল, সেখানকার **সিপাহিরা (৫৪নং, ৭৪নং, ৩৮নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী)** বিদ্রোহ করল, **ইংরাজ কমিশনার, পাদরি, অফিসারবর্গ নিহত**; ন'জন ইংরাজ অফিসার অস্ত্রাগার রক্ষা করে তা উড়িয়ে দিল (দু'জনের মৃত্যু); **শহরের** অন্যান্য **ইংরাজরা** পালিয়ে গেল **জঙ্গলে**, বেশির ভাগ মারা গেল হয় দেশীয় লোকের হাতে নয় ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার দরুন : কয়েকজন নিরাপদে **পৌঁছল মীরটে**, সেখানে তখন সৈন্য নেই। **দিল্লি কিন্তু অভ্যুত্থানীদের হাতে।**

ফিরোজপুরে ৪৫নং এবং ৫৭নং দেশীয় (পদাতিক বাহিনী) **দুর্গ দখলের** চেষ্টা করে বিতাড়িত হল **৬১নং ইংরাজ দলের হাতে**; কিন্তু তারা শহর লুঠ করে আগুন লাগাল, পরের দিন দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়সওয়াররা তাদের তাড়িয়ে দিল।

লাহোরে মীরট এবং দিল্লির খবর আসাতে জেনারেল **করবেটের** আদেশে **সিপাহিদের সাধারণ প্যারেডে** ডেকে তাদের **নিরস্ত্র করা হল (কামানসমেত ইংরাজ সৈন্য** তাদের ঘেরাও করে)।

২০ মে; ৬৪নং, ৫৫নং, ৩৯নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হল **পেশোয়ারে** (লাহোরের মতন); তার পর **অবশিষ্ট ইংরাজ ও বিশ্বস্ত শিখরা নৌশেরা ও মর্দানের** অবরুদ্ধ স্টেশন বাঁচাল, এবং **মে মাসের শেষে** কাছাকাছি স্টেশন থেকে জমায়েত করা **কয়েকটি ইউরোপীয় রেজিমেন্ট** কর্তৃক রক্ষিত **আম্বালার স্টেশন** : এখানে **জেনারেল অ্যানসনের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীর সার ভাগটা জড় হল...পাহাড় স্টেশন সিমলাকে আক্রমণ করা হয়নি**, সেখানে গ্রীষ্মকালের দরুন বিস্তর ইংরাজ পরিবার।

২৫ মে ছোট বাহিনী নিয়ে অ্যানসন **দিল্লি** রওনা হলেন; ২৭ মে তাঁর মৃত্যু ঘটে, তাঁর জায়গা নিলেন **স্যর হেনরি বার্নার্ড; জেনারেল উইলসনের** অধীনে **ইংরাজ সৈন্যদল** তাঁর সঙ্গে মিলিত হয় ৭ জুন (এরা আসে **মীরট থেকে**; পথে সিপাহিদের সঙ্গে কিছু লড়াই হয়)। সারা **হিন্দুস্তানে বিদ্রোহের প্রসার, বিশটি বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে সিপাহিদের বিদ্রোহ** এবং **ইংরাজদের হত্যা**; প্রধান ঘটনাস্থল : **আগ্রা, বেরিলি, মোরাদাবাদ।** "ইংরাজ কুত্তাদের" বিশ্বাস রক্ষা করলেন **সিন্ধিয়া**, কিন্তু তাঁর **"সৈন্যরা" নয় : পাতিয়ালার রাজা**—ধিক!—ইংরাজদের সাহায্যার্থে বড় সৈন্যদল পাঠালেন! **মৈনপুরে** (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে) একটি নবীন জানোয়ার লেফটেনান্ট **দ্য কান্টজো** কোষাগার ও দুর্গ বাঁচালেন।

কানপুরে ১৮৫৭-র ৬ জুনে স্যর হিউজ হুইলারকে অবরোধ করলেন **নানাসাহেব** (কানপুরে বিদ্রোহী **তিনটি সিপাহি** রেজিমেন্ট এবং **দেশীয় ঘোড়সওয়ারদের তিনটি রেজিমেন্টের ভার** তিনি নিয়েছিলেন, এদিকে কানপুর সৈন্যদলের সেনাপতি **স্যর হিউজ**

হুইলারের কাছে ছিল **ইউরোপীয় পদাতিকের একটিমাত্র ব্যাটালিয়ন**, আর বাইরে থেকে **সামান্য কিছু সৈন্য** পেয়েছিলেন [তিনি] : **দুর্গ এবং ব্যারাক** তিনি রক্ষা করছিলেন, সেখানে সমস্ত ইংরাজরা নারী ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল)।

১৮৫৭, ২৬ জুন কানপুর ছেড়ে দিলে ইউরোপীয়দের সবাইকে নিরাপদে ফিরে যেতে দেবার প্রস্তাব করলেন **নানাসাহেব; ২৭ জুন** (হুইলার [এ প্রস্তাব] মেনে নেওয়াতে) জীবিতদের ৪০০ জনকে নৌকায় চেপে গঙ্গা হয়ে যেতে দেওয়া হল, দু'তীর থেকে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করেন নানা; একটি নৌকা রেহাই পায়, আরও কিছু দূর ভাঁটির দিকে সেটিকে আক্রমণ করা হল, [নৌকা] ডুবিয়ে দেওয়া হল, রক্ষীসৈন্যদলের মাত্র চারজন পুরুষ পালাতে পারে। বালুচরে লেগে যাওয়া **নারী ও শিশু** বোঝাই **একটি নৌকা** ধরা পড়ে, লোকেদের কানপুরে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের বন্দি হিসেবে কড়া পাহারায় রাখা হয়; **চোদ্দ দিন পর (জুলাই মাসে) ফতেগড়** (ফরাক্কাবাদ থেকে তিন মাইল দূরে সামরিক স্টেশন) থেকে আরও ইংরাজ বন্দিদের সেখানে টেনে আনল বিদ্রোহী সিপাহিরা।

ক্যানিঙের আদেশে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সিংহল থেকে সৈন্য আনয়ন। **২৩ মে নিলের** নেতৃত্বে **মাদ্রাজের অতিরিক্ত দল** তীরে অবতরণ করল এবং **বোম্বাইয়ের দল সিন্ধুনদের** উজান হয়ে যাত্রা করল **লাহোরে**।

১৭ জুন স্যর পাট্রিক গ্রান্ট (বঙ্গে অধিনায়কের পদে তিনি এসেছিলেন **অ্যানসনের** জায়গায়) এবং এ্যাডজুটান্ট-জেনারেল **জেনারেল হ্যাভলক কলকাতায় পৌঁছিয়েই** সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে রওনা হলেন।

৬ জুন এলাহাবাদে সিপাহিদের বিদ্রোহ, তারা (ইংরাজ) **অফিসারদের** স্ত্রী ও শিশুসুদ্ধ হত্যা করে **দুর্গ দখলের** চেষ্টা করল, দুর্গ রক্ষা করছিলেন কর্নেল সিম্পসন, তিনি **১১ জুন কলকাতা থেকে মাদ্রাজ ফুজিলিয়রসসহ আগত কর্নেল নিলের** সাহায্য পেলেন; শেষোক্তটি **সমস্ত শিখদের বের করে দিয়ে দুর্গ দখলে এনে শুধু ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করেন সেখানে**। (পথে তিনি **বারাণসী** দখল এবং সবে অভ্যুত্থিত ৩৭ নং দেশীয় পদাতিক দলকে পরাজিত করেন; **সিপাহিরা** পালায়); (ইংরাজ) **সৈন্যরা** চারিদিক থেকে পালিয়ে আসে এলাহাবাদে।

৩০ জুন এলাহাবাদে এসে জেনারেল **হ্যাভলক** সেনাপতিত্ব নিলেন, **প্রায়** ১,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য সঙ্গে তিনি **কানপুর** অভিযান করেন, ১২ জুলাই **ফতেপুরে** সিপাহিরা প্রতিহত ইত্যাদি, **আরও কয়েকটি লড়াই**।

১৬ জুলাই হ্যাভলকের বাহিনী কানপুরের উপকণ্ঠে; ভারতীয়দের পরাজয়, কিন্তু **শহরের দুর্গে প্রবেশ করতে** তাঁর অনেক দেরি হয়ে যায়; **রাত্রে নানা সমস্ত ইংরাজ বন্দিদের—অফিসার, নারী, শিশু সবাইকে হত্যা করেন**; তারপর অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়ে **শহর ছেড়ে যান। ১৭ জুলাই** শহরে ইংরাজ সৈন্যদের প্রবেশ।—নানার আস্তানা **বিঠুরে** গিয়ে **হ্যাভলক** বিনা বাধায় অধিকার করে **প্রাসাদ ধ্বংস করলেন, উড়িয়ে দিলেন দুর্গ**, তার পর ফিরে গেলেন **কানপুরে**; সেখানে স্টেশন রক্ষার ভার **নিলকে** দিয়ে **লখনউ** উদ্ধারের জন্য গেলেন; সেখানে **স্যর হেনরি লরেন্সের** প্রয়াস সত্ত্বেও **রেসিডেন্সি বাদ দিয়ে** সমস্ত শহর বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়।

৩০ জুন আশপাশের বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে **রক্ষীসেনাদলের সবাই** বেরিয়ে আসে; প্রতিহত হয়; **আবার রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ; রেসিডেন্সি অবরুদ্ধ।**

৪ জুলাই স্যর হেনরি লরেন্সের মৃত্যু (২ **জুলাই** একটি **গোলার বিস্ফোরণে** আঘাতের ফলে); **ভার নিলেন কর্নেল ইংলিস**; বিদ্রোহীদের মাঝে মাঝে ছোটখাট আক্রমণ করে **তিন মাস** তারা আত্মরক্ষা করে রইল।—**হ্যাভলক কর্তৃক লড়াই**। তিনি **কানপুরে ফিরে গেলে অনেক সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিললেন স্যর জেমস উট্র্যাম, হ্যাভলকও বিভিন্ন** বিদ্রোহী জেলা থেকে এমন অনেক **রেজিমেন্ট** আনিয়ে নিলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর হ্যাভলক, উট্র্যাম ও নিলের অধীনে গোটা দল গঙ্গা পার হল। ২৩ এরা লখনউ থেকে আট মাইল দূরে **অযোধ্যার** গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ **আলমবাগ** আক্রমণ করে দখল করে।

২৫ সেপ্টেম্বর লখনউ উপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে এরা পৌঁছল **রেসিডেন্সিতে**, এখানে **অবরুদ্ধ অবস্থায় আরও দু'মাস** থাকতে হল মিলিত **দলটিকে**। (শহরে লড়াইয়ের সময়ে **জেনারেল নিলের মৃত্যু; উট্র্যামের** হাতে ভীষণ চোট লাগে)।

২০ সেপ্টেম্বর জেনারেল উইলসনের পরিচালনায় ছ'দিন সত্যকার যুদ্ধের পর **দিল্লি অধিকৃত**। ঘোড়সওয়ারি দল নিয়ে **হডসন রাজপ্রাসাদে** ঢুকে পড়ে **বৃদ্ধ বাদশা** ও **বেগমকে (জিনাত মহল)** ধরেন; দু'জনকে কারাগারে বন্দি করা হয়, এদিকে হডসন নিজের হাতে (গুলি করে) **রাজকুমারদের হত্যা করলেন। দিল্লিতে রক্ষীসেনাদল রেখে ঠান্ডা করা হল**। ঠিক তার পর **কর্নেল গ্রেটহেড দিল্লি** থেকে গেলেন আগ্রায়, তার কাছাকাছি হোলকারের রাজধানী **ইন্দোর** থেকে [আগত] একটি **বড় বিদ্রোহী দলকে** তিনি পরাজিত করেন।

১০ অক্টোবর আগ্রা অধিকার করে তিনি কানপুরে রওনা হলেন, সেখানে পৌঁছান **২৬ অক্টোবর; ইতিমধ্যে** বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে **আজমগড়, ছাতরা (হাজারিবাগের কাছে), খাজোয়া এবং দিল্লির** আশপাশের এলাকায় **ক্যাপ্টেন বোআলো, মেজর ইংলিস, পীলের** (শেষোক্তটির সঙ্গে ছিল **নৌবাহিনীর ব্রিগেড**; তাছাড়া তখন লড়াইয়ে নামো-নামো হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে প্রেরিত **প্রবিন ও ফেনের ঘোড়সওয়ারি দল; ভলান্টিয়র রেজিমেন্টও** গড়ে তোলা হয়েছে) এবং **শাওয়ার্সের** কাছে। **আগস্টে** কলকাতার ভার গ্রহণ করে **স্যর কলিন ক্যামবেল** ব্যাপকতর আকারে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

১৮৫৭, ১৯ নভেম্বর লখনউর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধ দলকে উদ্ধার করলেন **স্যর কলিন ক্যামবেল**। (২৪ নভেম্বর স্যর হেনরি হ্যাভলকের মৃত্যু ঘটে); লখনউ থেকে—

১৮৫৭, ২৫ নভেম্বর—কলিন ক্যামবেল রওনা হলেন **কানপুরে**, জায়গাটি বিদ্রোহীরা আবার দখল করেছিল।

১৮৫৭, ৬ ডিসেম্বর কানপুরে কলিন ক্যামবেলের বিজয়ীযুদ্ধ, শহর ফাঁকা করে ফেলে রেখে বিদ্রোহীদের পলায়ন, পিছু ধাওয়া করে **স্যর হোপ গ্রান্ট** তাদের খণ্ডবিখণ্ড করেন। **পাতিয়ালা** এবং **মৈনপুরে** বিদ্রোহীদের পরাজয় যথাক্রমে **কর্নেল সিটন** এবং **মেজর হডসনের** কাছে; এবং অন্যান্য অনেক স্থানে।

১৮৫৮, ২৭ জানুয়ারি ডৌস ইত্যাদিব পরিচালনায় দিল্লির বাদশার কোর্ট-মার্শাল, "অপরাধী" (১৫২৬-এ প্রতিষ্ঠিত মোগল রাজবংশের প্রতিনিধি!) হিসেবে প্রাণদণ্ড; **রেঙ্গুনে আজীবন কারাবাসে** এ দণ্ডের লাঘব। **বছরের** শেষে তা **করা হয়**।

১৮৫৮-এ স্যর কলিন ক্যামবেলের অভিযান। **২ জানুয়ারি ফরাক্কাবাদ** এবং **ফতেগড়** জয় করে তিনি **কানপুরে** আস্তানা গাড়লেন এবং চারিদিক থেকে যাতে সেখানে সৈন্য রসদ ও কামান যা আছে পাঠানো হয় তার আদেশ দিলেন। **বিদ্রোহীরা লখনউয়ের কাছাকাছি দল বেঁধে জমায়েত হল,** তাদের ঠেকিয়ে রাখেন স্যর জেমস উট্র্যাম।—অন্যান্য অনেক ঘটনার পর—**১৫ মার্চ লখনউ পুনরায় অধিকৃত** (কলিন ক্যামবেল, **স্যর জেমস উট্র্যাম** ইত্যাদির পরিচালনায়); শহর লুণ্ঠিত, এখানে **প্রাচ্য শিল্পকলার বহুমূল্য বস্তুর আগার ছিল**; ২১ মার্চ যুদ্ধ শেষ; ২৩ শেষ কামান ছোড়া হয়।—দিল্লির শাহের [পুত্র] **শাহজাদা ফিরোজ, বিঠুরের নানাসাহেব, ফৈজাবাদের মৌলবি** এবং **অযোধ্যার বেগম হজরৎ মহলের** নেতৃত্বে **বিদ্রোহীদের বেরিলিতে পলায়ন।**

১৮৫৮, ২৫ এপ্রিল শাহজাহানপুর দখল করেন **ক্যামবেল; বেরিলির কাছে** বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করলেন **মগ্‌স; ৬ মে অবরোধের কামান ছোড়া শুরু হল বেরিলির উপর,** এদিকে **মোরাদাবাদ অধিকার করার পর জেনারেল জোনস** কথামতো এসে পৌঁছলেন; **নানা** এবং তাঁর অনুচরদের পলায়ন, বিনা **বাধায় বেরিলি দখল।** ইতিমধ্যে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নিবিড়ভাবে অবরুদ্ধ **শাহজাহানপুরকে** উদ্ধার করলেন জেনারেল জোনস; **লখনউ** থেকে আগত **লু গার্ডের ডিভিশন কানোয়ার সিংহের** অধীনে বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভীষণভাবে পরাজিত হল; কিছু দিন পর **ফৈজাবাদের মৌলবি** নিহত, এর আগে **স্যর হোপ গ্রান্ট** পরাজিত করেন **বেগমকে,** তিনি নূতন দল গড়ার জন্য পালিয়ে যান **গোগরা নদীতে।**

১৮৫৮, জুনের **মাঝামাঝি** সর্বত্র বিদ্রোহীদের পরাজয়; সম্মিলিত সংগ্রামে অসমর্থ, লুঠেরা দলে ভেঙে গিয়ে এরা ইংরাজদের বিচ্ছিন্ন নানা দলকে অত্যন্ত চাপ দিতে লাগল। [এদের] কার্যকলাপের কেন্দ্র : বেগম, দিল্লির শাহজাদা এবং **নানাসাহেবের পতাকার নীচে।** মধ্য ভারতে দু'মাস ব্যাপী **(মে এবং জুন) অভিযানে স্যর হিউ রোজ বিদ্রোহীদের শেষ আঘাত দেন।**

১৮৫৮, জানুয়ারি রথগড় দখল করেন রোজ, **ফেব্রুয়ারিতে সাগর** এবং **গাররাকোটা,** তার পর অভিযান করেন **ঝাঁসিতে,** সেখানে রানি* প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

১৮৫৮, ১ এপ্রিল ঝাঁসি রক্ষার জন্য কল্‌পি থেকে আগত নানাসাহেবের খুল্লতাত ভ্রাতা **তাঁতিয়া টোপির** বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম; তাঁতিয়ার পরাজয়।

৪ এপ্রিল ঝাঁসি দখল; রানি এবং তাঁতিয়া টোপি সেখান থেকে সরে গিয়ে **কল্‌পিতে** ইংরাজদের প্রতীক্ষায় রইলেন; **সেখানে যাবার সময়—**

১৮৫৮, ৭ মে—কানিয়া শহরে শত্রুপক্ষের একটি জোরালো দল কর্তৃক **রোজ** আক্রান্ত; **দলটির সম্পূর্ণ** পরাজয়।

১৮৫৮, ১৬ মে কল্‌পির কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন **রোজ;** বিদ্রোহীদের কঠিনভাবে অবরোধ করলেন।

১৮৫৮, ২২ কল্‌পি থেকে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে এসে **ছোটখাট আক্রমণ** কবল বিদ্রোহীরা; পরাজিত হয়ে পলায়ন;

* লক্ষ্মীবাই—সম্পাঃ।

১৮৫৮, ২৩ মে কল্পি অধিকার করলেন রোজ। [যুদ্ধ] এবং গরমে শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যদের জিরিয়ে নিতে দেবার জন্য সেখানে কয়েক দিন থেকে গেলেন তিনি।

২ জুন **নবীন সিন্ধিয়া** (ইংরাজদের পোষা কুকুর) কঠিন লড়াইয়ের পর নিজের সৈন্যদল কর্তৃক **গোয়ালিয়র** থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রাণভয়ে পালালেন আগ্রায়; **গোয়ালিয়র** যাত্রা করলেন রোজ; বিদ্রোহীদের পরিচালনা করে **ঝাঁসির রানি** এবং **তাঁতিয়া টোপি** তাঁর সঙ্গে—

১৯ জুন—**লড়াই করলেন লস্কর পাহাড়ে (গোয়ালিয়রের সামনে)** : **রানি** নিহত, ঘোর লড়াইয়ের পর তাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ; **গোয়ালিয়র ইংরাজদের হাতে।**

১৮৫৮, জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর স্যর কলিন ক্যামবেল, স্যর হোপ গ্রান্ট এবং জেনারেল ওয়ালপোল বিদ্রোহীদের পাণ্ডাদের খুঁজে পেতে তাড়া করার এবং যেসব দুর্গের মালিকানা নিয়ে বিরোধ আছে সেগুলি দখল করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন; **বেগম কয়েকবার শেষ প্রতিরোধের জন্য দাঁড়ান,** তার পর নানাসাহেবের সঙ্গে রাপ্তি নদী পার হয়ে ইংরাজদের পোষা কুকুর **নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের** এলাকায় পালিয়ে গেলেন; নিজের এলাকায় বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়ার অনুমতি তিনি ইংরাজদের দেন, এ ভাবে "শেষ বখেটে দলগুলি ছত্রভঙ্গ হল"; **নানা** এবং **বেগম পালিয়ে গেলেন** পাহাড়ে, তাঁদের অনুচররা অস্ত্র সমর্পণ করল।

১৮৫৯-র গোড়ার দিক, তাঁতিয়া টোপির লুক্কায়ন-স্থান ধরা পড়ে গেল, তাঁর বিচার এবং প্রাণদণ্ড।—লোকে বলে **নানাসাহেবের** মৃত্যু ঘটে নেপালে। **বেরিলির খাঁ** ধৃত, গুলি করে মারা হল তাঁকে; লখনউয়ের মামু খাঁর আজীবন কারাবাস; অন্যরা নির্বাসিত বা বন্দি হল বিভিন্ন মেয়াদে; **বিদ্রোহীদের মূল ভাগ**—তাদের রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়—অস্ত্র ত্যাগ করে **রায়ত হয়ে গেল। অযোধ্যার বেগম নেপালে** কাঠমাণ্ডুতে বাস করতে লাগলেন।

অযোধ্যাভূমি বাজেয়াপ্ত, ক্যানিং ঘোষণা করলেন এটা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সরকারের সম্পত্তি! স্যর জেমস উট্র্যামের জায়গায় স্যর রবার্ট মন্টগোমারিকে অযোধ্যার চিফ কমিশনার করা হল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবলোপ। যুদ্ধ শেষ [হবার] আগেই এটি ভেঙে দেওয়া হয়।

১৮৫৭, ডিসেম্বর : পামারস্টোনের ভারত বিল; ১৮৫৮, ফেব্রুয়ারিতে ডিরেক্টরদের বোর্ডের সবিশেষ প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রথম পাঠ অনুমোদিত, কিন্তু লিবেরাল মন্ত্রিসভার জায়গায় এল টোরিরা।

১৮৫৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি ডিজরেলির ভারত বিল পাশ হল না।

১৮৫৮, ২ আগস্ট লর্ড স্ট্যানলির ভারত বিল পাশ, এতে করে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান** (ঘটল)। **"মহারাণী" ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হল ভারত!**

লেখক পরিচিতি

প্রথম পর্বে লেখক পরিচিতি আছে লেখাব সঙ্গে। পরবর্তী পর্বের লেখক পরিচিতি (যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে) দেওয়া হল এখানে।

উমা মুখোপাধ্যায় (১৯২৬--২০০৩ জানুয়ারি)

ইতিহাসের কৃতী ছাত্রী, ইতিহাসের অধ্যাপিকা ও গবেষক উমা মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ, স্বদেশি আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে গেছেন, তাঁর স্বামী অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে। রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৯), রামপ্রসাদ গুপ্ত স্বর্ণপদক (১৯৬২), শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার (১৯৯৯) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, সূর্য সেন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা আজও অনুসরণযোগ্য। [হরিদাস মুখোপাধ্যায় দেখুন]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২ ?—১৯৩৯)

একসময় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী'। একসময়ে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে রচনাটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। সে আজকের কথা নয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অসাধারণ কীর্তি 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-২টি খণ্ড। ২০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ৫০ হাজার শব্দের এই অভিধান সংকলন করেন। অভিধানটি আজও সমাদৃত। তাছাড়া মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের একটি সটীকা সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর আর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ ইব্রীয় ধর্ম—একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ।

নিখিলনাথ রায় (১৮৬৪—১৯৩২)

মুর্শিদাবাদের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার জন্য আজও বিখ্যাত। বহরমপুর কলেজ থেকে বি এ. এবং পরে বি. এল পাশ করে প্রথমে বহরমপুর জজকোর্টে ওকালতি করতেন। তারপর কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৯০৭—২২ সাল পর্যন্ত কাসিমবাজার মহারাজার নায়েব ছিলেন। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনি', 'সোনার বাংলা', 'জগৎ শেঠ' ও 'প্রতাপাদিত্য' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। অক্ষয়কুমার মৈত্রের মৃত্যুর পর কয়েক বছর 'ঐতিহাসিক চিত্র' সম্পাদনা করেন। বসিরহাটের 'পল্লীবাণী' পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও 'শাশ্বতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করতেন। তাঁর মূল্যবান বহু ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা নানান পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, যা আজও গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

জন্ম : ২৪ পরগনার (উত্তর) হুডায়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬—১৯২৩)

একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন পাঁচকড়ি। বাংলার সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য মূল্যবান রচনা ছড়িয়ে আছে। সেইসব রচনার কিছু সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। যার একটি খণ্ড এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮৮৭ সালে পাটনা কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় ছিল অসাধারণ জ্ঞান। কিছুকাল সরকারি চাকরি ও অধ্যাপনা করলেও, বাকি জীবন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমকালীন বিভিন্ন সাময়িকপত্রের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, লেখক হিসাবে ও কর্মসূত্রে। তাঁর সম্পাদিত 'নায়ক' পত্রিকা সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই পত্রিকায় নিয়মিত কার্টুন প্রকাশিত হত—যা ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। আবার সম্পাদনা ও অনুবাদও করেন। পাঁচকড়ির রচিত ও সম্পাদিত কয়েকখানি গ্রন্থ হল : আইন-ই-আকবরী, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়, দরিয়া (উপন্যাস), সম্রাট আউরঙ্গজেব প্রভৃতি।

আদিনিবাস : হালিশহর (উঃ ২৪ পরগণা)

জন্ম : ভাগলপুর।

প্রমথনাথ মল্লিক (১৮৭৮—১৯৪৩)

কলকাতার বিখ্যাত ধনী পরিবারে প্রমথনাথের জন্ম। শিক্ষালাভ করেন হিন্দু স্কুলে এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় ছিল গভীর বুৎপত্তি। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'সুবর্ণবণিক সমিতি' এবং আমৃত্যু এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কলিকাতার কথা'-২ খণ্ড।

জন্ম : কলকাতায়।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬—)

পিতা বিখ্যাত মনীশ ঘটক। কন্যা মহাশ্বেতা বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছেন। শিক্ষকতা করেন রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে। তারপর যাদবপুরের বিজয়গড়ে জ্যোতিষ রায় কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে ইতিহাস এবং আদিবাসী জনজীবন। নিপীড়িত নির্যাতিত আদিবাসী জনজীবনকে সভ্য জগতের সামনে উপস্থিত করতে গিয়ে, তাদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে মিশিয়ে দেন। বাংলা ভাষায় এ এক বিরল নিদর্শন। লেখার জন্য নানান পুরস্কার পেয়েছেন—তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার, অমৃত পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, আদাদেমি পুরস্কার, মাগসেসাই পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রভৃতি। মহাশ্বেতার লেখক জীবনের বড় পুরস্কার পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ঝাঁসির রানি, নটী, যমুনা কী তীর, মধুরে মধুর, অরণ্যের অধিকার, অগ্নিগর্ভ, অক্লান্ত কৌরব, বীরসা মুণ্ডা, শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা, স্তনদায়িনী, হাজার চুরাশীর মা ইত্যাদি।

শিশু সাহিত্যেও মহাশ্বেতার অবদান কম নয়। আজও জনপ্রিয়তায় তিনি শীর্ষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

বিশ শতকের মানুষই কেবল নয়, বিগত পাঁচশ বছরের মধ্যে তুলনাযোগ্য অপর কোন বাঙালি মণীষীর সন্ধান পাওয়া কঠিন। সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষাক্ষেত্র, রাজনীতি থেকে সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজও তাঁর প্রভাব অতুলনীয়। বাঙালির আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের সাধনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বাঙালির মজ্জায় আজও রবীন্দ্র সঙ্গীতেব অনুপ্রেরণা। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর লেখা গান। বাঙালি যতদিন স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল থাকবে, ততদিন রবীন্দ্র-উপস্থিতি থাকবে ধ্রুবতারার মতো। কবিগুরুর বালককাল ও পরবর্তী জীবনের অনেক কথাই তিনি বিধৃত করে গেছেন তাঁর অসামান্য রচনায়। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২ খ্রিঃ)। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গকৌতুক, প্রবন্ধ, নাটক, দিনলিপি, ভ্রমণ-কাহিনি, ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ক রচনায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক নাট্যও রচনা করেন। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে নোবেল প্রাইজ পান ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। নাইট উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তা ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গতা।

জন্ম : কলকাতার জোড়াসাঁকোয়।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য

রাজেন্দ্রলালের বিখ্যাত গ্রন্থ—বাংলার সামরিক ইতিহাস, "বাঙালির বল"। এই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থটির মাত্র দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর অসংখ্য ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রিকায়।

রামগোপাল সান্যাল (১৮৫০ ?—১৯২১)

উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালিদের জীবনী রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন রামগোপাল। বাংলা ভাষায় লেখা দুখানি জীবনী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—(১) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী এবং (২) বাবু কৃষ্ণদাসপালের জীবনী। ইংরেজি রচনার সংখ্যাই বেশি। তার মধ্যে মাত্র চার খানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম জীবনে কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রের মফস্বল সংবাদদাতা ছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর, ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে কলকাতার তালতলা অঞ্চলে একটি বাড়ি কিনে বসবাস করতে থাকেন। সে সময়ে বেঙ্গলি পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। পরে ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন।

জন্ম · মেহেরপুর (নদীয়া)। আদিবাস কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ি অঞ্চলে।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (১৯২০)

অধ্যাপক হিসাবে সুনামের অধিকারী হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কর্মক্ষেত্র ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ। ঐ কলেজের কৃতী ছাত্র। সারা জীবনই শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর গবেষণা কর্মে অন্যতম সহযোগী ছিলেন স্ত্রী উমা

মুখোপাধ্যায়। দুজনে যুগ্মভাবে বহু গবেষণা করেন এবং বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। বিদেশী শাসনমুক্তির আন্দোলন বিষয়ে এই দুই কৃতী অধ্যাপকের গবেষণাকর্ম উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা তাঁদের অন্যতম কয়েকখানি গ্রন্থ হল—

A Phase of the Swadeshi Movement : National Education (1953), 'Bande Mataram' and *Indian Nationalisn* (1957), *The Growth of Nationalism in India* (1957), *The Origins of the National Education Movement* (1957) [রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত—সংস্করণ ২০০০] *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement* (1958), *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* (1958), *Sri Aurobindo's Political Thought* (1958, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০২) *Sri Aurobindo and New Thought in Indian Politics* (১৯৬৪ পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৭), স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ ১৯৭২—পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৬), জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯৬০—পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৩), স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ (১৯৬১—পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৪) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (১৯৬১—পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০২), স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ (১৯৭২ পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৬), বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বদেশচিন্তা (২০০৪), *Sri Aurobindo and New Thought in Indian Politics* (1964, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৭)।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪—১৮৬১)

মাত্র ৩৭ বছরের জীবন। তার মধ্যে ১৮৫৫ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হরিশচন্দ্র ছিলেন নিপীড়িত মানুষের বন্ধু। বেশিদূর বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করতে না পারলেও এক অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি ছিলেন মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসের একজন উচ্চপদস্থকর্মী। ইতিহাস, রাজনীতি, আইনে ছিল অসাধারণ জ্ঞান। ভালো ইংরেজি জানতেন। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' ও 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি ছিলেন সরকারের কঠোর সমালোচক। ১৮৫৫ সালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কর্তৃত্ব ও সম্পাদনার ভার গ্রহণের পর সরকার ও বিদ্রোহীদের তীব্র সমালোচনা করেন। নীলকর বিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

আদিনিবাস শ্রীধরপুর (বর্ধমান)। কলকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২৬—২০০৩ জানুয়ারি)

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অন্যতম প্রবক্তা সমকালীন চিন্তানায়কদের মধ্যে ছিলেন স্বাতন্ত্র চিহ্নিত। বাগ্মী ও সুলেখক হিসাবে ছিলেন সুপরিচিত। অক্সফোর্ডের ডিলিট

ব্যারিস্টার হীরেন্দ্রনাথ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। প্রগতি লেখকসংঘ, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখকশিল্পী সংঘ এবং সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির ও চীন ভারত মৈত্রী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা থেকে পাঁচবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার এবং 'পদ্মবিভূষণ' সম্মান লাভ করেন। হীরেন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থ 'তরী হতে তীর' সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর এক অসামান্য চালচিত্র। তাঁর লেখা ২০ খানি বাংলা বইয়ের অন্যতম কয়েকখানি হল : 'চঞ্চুষাকাণঃ', 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি', 'চরৈবেতি চরৈবেতি', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'গ্রীসের ইতিহাস'। ইতিহাসও যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তা বোঝা যায় 'গ্রীসের ইতিহাস' পড়তে গিয়ে। হীরেন্দ্রনাথের ইংরেজিতে লেখা বইয়ের সংখ্যা ২৬। বাংলা ও ইংরেজিতে কয়েকখানি বই সম্পাদনা করেন এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তরে'র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।

নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

Keye, John	History of the Sepoy War	3 Vols.; London 1864-7
Malleson, G	The Indian Mutiny	6 Vols.; London 1878-80
Trevelyan, G.O.	Gawnpore	London 1866
Lord Roberts	Forty-one Years in India	Vols-1.; London 1897
Brocke W	A Biographical Sketch of Sir Henry Havelock	London, 1858
Beames, John	Memoirs of a Bengali Civilian	London 1961
উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	নানা সাহেব	কলকাতা ১২৯০
চণ্ডীচরণ সেন	ঝানসীর রাণী (২য় সং)	কলকাতা ১৩০৯
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঝাঁসীর রাণী	কলকাতা ১৩১০
মার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্	ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ (অনুবাদ)	মস্কো ১৯৭৬
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বিদ্রোহে বাঙালী ও আমার জীবনচরিত	কলকাতা ১৩৩১
দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়	সিপাহী যুদ্ধ	কলকাতা ১৩৩৮
প্রমোদ দাশগুপ্ত	ভারতীয় মহাবিদ্রোহ-১ম খণ্ড	কলকাতা ১৯৫৭
	পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড	কলকাতা ১৯৮১
	... ... ২য় খণ্ড	কলকাতা ১৯৮৪
বিকাশ গুপ্ত	ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ	কলকাতা ১৯৭৪
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সিপাহী বিদ্রোহ বা মিউটিনি	কলকাতা ১৯২২
Alexander Lewllyn	The Siege of Delhi	London, 1977
Dolores Domm	India in 1857	Berlin, 1977
Eric Stokes	Peasant and the Raj	Delhi, 1978
Saul David	The Indian Mutiny	Penguin Books; 2003

P. C. Joshi	Rebellion 1857	K. P. Bagchi; 1986
P.K.O Taylor	What Really Happened During the Mutiny	Delhi, 1997
K. C. Yadav (যাদব)	The Revolt of 1857 in Haryana	Manohar, 1977
মণি বাগচি	সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	কলকাতা ১৩৬৪
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ	কলকাতা ১৩৬১
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	ঝাঁসীর রাণী	কলকাতা ১৩৬৩
যদুনাথ সর্বাধিকারী	সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ	কলকাতা
শ্যামাপ্রসাদ বসু	ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ	কলকাতা ১৯৮২
রজনীকান্ত গুপ্ত	সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৫ খণ্ড)	কলকাতা ১৩১৭
সখারাম গণেশ দেউস্কর	ঝাঁসীর রাজকুমার	কলকাতা ১৩১৫
সত্যেন সেন	মহাবিদ্রোহের কাহিনী	কলকাতা ১৯৭১
সুকুমার মিত্র	১৮৫৭ ও বাংলাদেশ	কলকাতা ১৯৬৪
সুধীন্দ্রনাথ রাহা	সিপাহী বিদ্রোহ	কলকাতা
	সিপাহী যুদ্ধে বহরমপুর	১৯৫৭
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ বা ড: মজুমদার, ড: সেন ও বিরুদ্ধ পন্থীদের আলোচনার পর্যালোচনা	কলকাতা ১৯৮২
মুনতাসীর মামুন	ঢাকা : ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দলিলপত্র	ঢাকা ১৯৯৭
অশোক মেহতা	আঠারো শ সাতান্নের বিদ্রোহ	কলকাতা ১৩৫৩/১৩৬৩
শ্রীপান্থ	মঙ্গল পাণ্ডের বিচার	কলকাতা ২০০৪
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ১ম খণ্ড	কলকাতা ১৩১৬
Mukherjee, H.	Indian's struggle for Freedom	Calcutta, 1962
Gupta P.	Nana Sahib and the Rising at Cawnpore	Oxford, 1963
Satish Chandra	Medieval India; Part-II	New Delhi, 1980
Srivastava, A.L.	The Mughal Empire	1959
Dharmpal	Tatya Tope	1955
Choudhury, S.B.	Civil Disturbances during the British rule in India (1755-1857)	Calcutta, 1955
Thomson D.	Europe since Napoleon	Cambridge, 1965
Chowdhury, S. B.	English Historical Writings on the Indian Mutiny	Calcutta, 1979
Christopher Hebert	The Great Mutiny; India 1857	Penguin, 1980

Savarkar, V.D.	The Indian War of Independence, 1857	Bombay, 1947
ড. শশিভূষণ চৌধুরী	সিপাহী বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	কলকাতা ১৯৯৬
	ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ-১৫০	কলকাতা ২০০৭
ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু	ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ	১৯৮২
	মহাবিদ্রোহ : বাংলা, পাঞ্জাব কলকাতা	১৯৮৬
প্রেমাংশুকুমার বন্দ্যো.	বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ ১৮২৪	কলকাতা ২০০৬
আশীষ মণ্ডল	সিপাহী বিদ্রোহে বহরমপুর	বহরমপুর ১৪০১
অপূর্ব মণি দত্ত	সম্রাট বাহাদুর শার বিচার	কলকাতা ১৯৫৮
অজাত শত্রু (ছদ্মনাম)	নাঙ্গা তলোয়ার	কলকাতা ১৯৮২
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	সিপাহী বিদ্রোহ	---
Cotton, H:	Indian & Home Memories	London, 1911
Hutchinson, L:	The Empire of the Nobobs	London 1937
Collier, R;	The Sound of Fury	London, 1963
Hardy, P;	The Muslims of British India	Cambridge 1972
Edwards, M	Red year : The Indian Rebellion of 1857	London, 1974
Travelyan, G. M	English Social History	London, 1962
Spear, P.	A History of India	Penguin, 1978
	New Cambridge Modern Hisoty; Vols.-X	
Sen S. N.	Eighteen-Fifty-Seven	Delhi, 1957
Majumdar, R. C.	British Paramountcy and Indian Renaissance	Bombay, 1963
Majumdar, R. C.	History of the Freedom Movement in India, Vols.-I	Calcutta, 1971
Majumdar, R. C.	The Sepoy Mutiny and The Revolt of 1857	Calcutta, 1963
Majumdar, R. C.	Advanced History of India	
Bipan Chandra	Modern India	New Delhi, 1977
Mukherjee, R. K.	The Rise and Fall of the East India Company	Bombay, 1973

নির্ঘণ্ট